দীর্ঘপথের যাত্রী

সপ্তম বর্ষ, ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৪০ | ১ম সংখ্যা

ঈষৎ দয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে,
ওষ্ঠ তোমার কিছু কৌতুকে হাসে,
মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু সুর।
আলো আঁধারের বন্ধনে আমি বাঁধা,
আশা নিরাশায় হৃদয়ে নিত্য ধাঁধা,
সঙ্গ যা পাই তারি মাঝে রহে দূর।

নির্ম্মম হ'তে কুণ্ঠিত হও মনে ;
অনুকম্পার কিঞ্চিৎ কম্পনে
ক্ষণিকের তরে ছলকে কণিক সুধা।
ভাণ্ডার হতে কিছু এনে দাও খুঁজি'
অন্তরে তাহা ফিরাইয়া লও বুঝি,
বাহিরের ভোজে হৃদয়ে গুমরে ক্ষুধা।

ওগো মল্লিকা, তব ফাল্গুন রাতি
অজস্র দানে আপনি উঠে যে মাতি'
সে দাক্ষিণ্য দক্ষিণ বায়ু তরে।
তা'র সম্পদ সারা অরণ্য ভরি',
গন্ধের ভারে মন্থর উত্তরী
কুঞ্জে কুঞ্জে লুণ্ঠিত ধূলি পরে।

উত্তর বায়ু আমি ভিক্ষুক সম
হিম নিঃশ্বাসে জানাই মিনতি মম
শুষ্ক শাখার বীথিকারে চঞ্চলি'।
আকিঞ্চনের রোদনে ধেয়ান টুটে,
কৃপণ দয়ায় ক্বচিৎ একটি ফুটে
অবগুণ্ঠিত অকাল পুষ্প কলি।

যত মনে ভাবি রাখি তারে সঞ্চিয়া,
ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লয় মোরে বঞ্চিয়া
প্রলয়-প্রবাহে ঝরে-পড়া যত পাতা।
বিস্ময় লাগে আশাতীত সেই দানে,
ক্ষীণ সৌরভে ক্ষণগৌরব আনে।
বরণ মাল্য হয় না তাহাতে গাঁথা॥

১০।১।৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
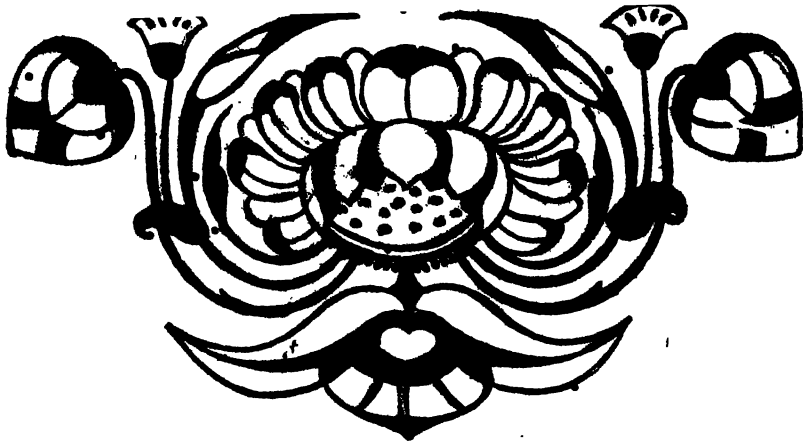
১৮

বন্দনা বলিল, খাবার হ'য়ে গেছে নিয়ে আসি মুখুয্যে মশাই ?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তোমার কেবলি চেষ্টা হচ্চে আমার জাত মারার। কিন্তু সন্ধ্যো আহ্নিক এখনো করিনি আগে তার উদ্যোগ করিয়ে দাও!

—আমি নিজে করে দেবো মুখুয্যে মশাই ?

—নইলে কে আর আছে এখানে যে করে দেবে? কিন্তু মার পূজোর ঘরে যেতে পারবোনা—গায়ে জোর নেই,—এই ঘরে করে দিতে হবে। আগে দেখবো কেমন আয়োজন করো, খুঁৎ ধরবার কিছু থাকে কিনা, তখন বুঝে দেখবো খাবার তুমি আনবে না আমাদের বামুন ঠাকুর আনবে।

শুনিয়া বন্দনা পুলকে ভরিয়া গেল, বলিল আমি এই সর্ত্তেই রাজি। কিন্তু একজামিনে পাশ যদি হই তখন কিন্তু মিথ্যে ছলনায় ফেল করতে পারবেন না। কথা দিন।

—দিলুম কথা। কিন্তু আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে কি তোমার এত লাভ?

—তা আমি বলবো না, এই বলিয়া বন্দনা দ্রুত প্রস্থান করিল।

মিনিট দশেকের মধ্যে সে স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া একটি জলপূর্ণ ঘটি লইয়া প্রবেশ করিল। ঘরের যে দিকটায় খোলা জানালা দিয়া পূবের রোদ আসিয়া পড়িয়াছে সেই স্থানটি জল দিয়া ভাল করিয়া মার্জ্জনা করিয়া, নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া লইল, পূজার ঘর হইতে আসন কোশাকুশি প্রভৃতি আনিয়া সাজাইল, ধূপদানি আনিয়া ধূপ জ্বালাইল, তারপরে বিপ্রদাসের ধুতি গামছা এবং হাত মুখ ধোয়ার পাত্র আনিয়া কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, আজ সময় নেই ফুল তুলে এনে মালা গেঁথে দেবার নইলে দিতুম, কাল এ ত্রুটি হবে না। কিন্তু আধঘণ্টা সময় দিলুম এর বেশি নয়। এখন বেজেছে ন'টা—ঠিক সাড়ে নটায় আবার আসবো।

এর মধ্যে আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না আমি চললুম। এই বলিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

বিপ্রদাস কোন কথা না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। আধঘণ্টা পরে বন্দনা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া বিপ্রদাস একটা আরাম চৌকিতে হেলান দিয়া বসিয়াছে।

—পাশ না ফেল্‌ মুখুয্যে মশাই?

—পাশ ফার্ষ্ট ডিভিজনে। আমার মাকেও হার মানিয়েছ। কার সাধ্য বলে তোমাকে ম্লেচ্ছ,—ম্লেচ্ছদের ইস্কুল-কলেজে পড়ে বি-এ পাশ করেছ।

এবার তা হলে খাবার আনি?

—আনো। কিন্তু তার আগে এগুলো রেখে এসোগে, বলিয়া বিপ্রদাস কোশাকুশি প্রভৃতি দেখাইয়া দিল।

—এ আর আমাকে বলে দিতে হবে না মশাই জানি, বলিয়া পূজার পাত্রগুলি সে হাতে তুলিয়া লইয়াছে এমন সময়ে ঘরের বাহিরে বারান্দায় অনেকগুলি উঁচুগোড়ালি জুতার খুট্‌ খুট্‌ শব্দ একসঙ্গে কাণে আসিয়া পৌঁছিল এবং পরক্ষণে অন্নদা দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া বলিল, বন্দনা দিদি, তোমার মাসিমা—।

মাসি এবং আরও দুই তিনটি অল্প-বয়সা মেয়ে একেবারে ভিতরে আসিয়া পড়িলেন, বিপ্রদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল, আসুন।

মাসি বলিলেন, নীচে থেকেই খবর পেলুম বিপ্রদাসবাবু ভালো আছেন—

বিপ্রদাস কহিল, হাঁ আমি ভালো আছি।

আগন্তুক মেয়েরা বন্দনাকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, ভিজা চুলে গরদের শাড়ী ভিজিয়া পিঠের পরে ছড়ানো, দুই হাতে পূজার জিনিস-পত্র, তাহার এ মূর্ত্তি তাহাদের শুধু অপরিচিত নয় অভাবনীয়। বন্দনা বলিল, আপনারা দোর ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ান এগুলি রেখে আসিগে।

একটি মেয়ে বলিল, ছোঁয়া যাবে বুঝি?

হাঁ, বলিয়া বন্দনা চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পরে সে সেই বেশেই ফিরিয়া আসিয়া বিপ্রদাসের চেয়ারের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মাসি বলিলেন, আমাদের না জানিয়ে তুমি চলে এলে সেজন্য রাগ করিনে, কিন্তু আজ তোমার বোনের বিয়ে—তোমাকে যেতে হবে।

মেয়ে দুটি বলিল, আমরা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেচি।

বন্দনা বলিল, না মাসিমা আমার যাওয়া হবে না।

—সে কি কথা বন্দনা! না গেলে প্রকৃতি কত দুঃখ করবে জানো?

—জানি, তবু আমি যেতে পারবো না।

শুনিয়া মাসির বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা রহিল না, বলিলেন, কিন্তু এই জন্যেই তোমার বোম্বায়ে যাওয়া হল না,—এই জন্যেই তোমার বাবা আমার কাছে তোমাকে রেখে গেলেন। তিনি শুনলে কি বলবেন বলো ত?

সেই মেয়েটি বলিল, তা ছাড়া সুধীরবাবু—মিষ্টার ডাটা—ভারি রাগ করেছেন।—আপনার চলে আসাটা তিনি মোটে পছন্দ করেননি।

বন্দনা তাহার দিকে চাহিল কিন্তু জবাব দিল মাসিকে, বলিল, আমি না গেলে প্রকৃতির বিয়ে আটকাবেনা কিন্তু গেলে মুখুয্যে মশায়ের সেবার ত্রুটি হবে। ওঁকে দেখবার এখানে কেউ নেই।

—কিন্তু উনি ত ভালো হয়ে গেছেন। তোমাকে যেতে বলা ওঁর উচিত, এই বলিয়া মাসি বিপ্রদাসের দিকে চাহিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক কথা। আমার যেতে বলাও উচিত বন্দনার যাওয়াও উচিত। বরঞ্চ না গেলেই অন্যায় হবে।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া কহিল, না—অন্যায় হবে আমি মনে করিনে। বেশ আপনি বলচেন যেতে আমি যাবো কিন্তু রাত্রেই চলে আসবো, সেখানে থাকতে পারবো না। এ অনুমতি মাসিমাকে দিতে হবে।

—একটা রাতও থাকতে পারবে না?

—না।

আচ্ছা তাই হবে, বলিয়া মাসি মনে মনে রাগ করিয়া দলবল লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিপ্রদাস বলিল, দেখলে তো তোমার মাসিমা রাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল হলো কেন?

বন্দনা বলিল, রাগ করে গেলেন জানি, কিন্তু শুধু খেয়ালের বশেই যেতে চাইচিনে তা নয়। ওদের যা-কিছু সমস্তর উপরেই আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। তাই ওখানে আর যেতে চাইনে মুখুয্যে মশাই।

—কেন বলোত?

—কেন তা হঠাৎ বলা শক্ত। আমি সর্ব্বদাই এ কথা নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করি কিন্তু জবাব খুঁজে পাইনে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারি ওদের মধ্যে গিয়ে আমার না থাকে সুখ না থাকে স্বস্তি। একবার বোম্বায়ের একটা কাপড়ের কলের কারখানা দেখতে গিয়েছিলুম, কেবলি আমার সেই কথা মনে হতে থাকে,

—তার কত কল কত চাকা আশে পাশে সামনে পিছনে অবিশ্রাম ঘুরচে—একটু অসাবধান হলেই যেন ঘাড়-মুড় গুঁজড়ে তার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। ওসব দেখতে যে ভালো লাগেনা তা নয় তবু মনে হয় বেরুতে পারলে বাঁচি। কিন্তু আর দেরি করবোনা আপনার খাবার আনিগে, বলিয়া বাহির হইতে গিয়াই চোখে পড়িল দ্বারের সম্মুখে পায়ের ধূলা, জুতার দাগ.; থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খাবার আনা হলোনা মুখুয্যে মশাই, একটু সবুর করতে হবে। চাকর দিয়ে এগুলো আগে ধুইয়ে ফেলি. এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল বিপ্রদাস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, এত খুঁটিনাটি তুমি শিখলে কার কাছে বন্দনা ?

শুনিয়া বন্দনা নিজেও আশ্চর্য্য হইল, বলিল, কে শেখালে আমার মনে নেই মুখুয্যে মশাই, বলিয়া একটু চুপ করিয়া কহিল, বোধ হয় কেউ শেখায়নি। আমার আপনিই মনে হচ্চে, আপনাকে সেবা করার এরা অপরিহার্য্য অঙ্গ, না করলেই ত্রুটি হবে। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিকালের দিকে অভ্যস্ত এবং যথোচিত সাজ-সজ্জা করিয়া বন্দনা বিপ্রদাসের ঘরের খোলা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, মুখুয্যে মশাই চল্লুম বোনের বিয়ে দেখতে। মাসি ছাড়লেননা বলেই যেতে হচ্চে।

বিপ্রদাস কহিল আশীর্ব্বাদ করি তুমিও যেন শীঘ্র এই অত্যাচারের শোধ নিতে পারো। তখন ঐ মাসিকে পাঞ্জাব থেকে হিঁচড়ে বোম্বায়ে টেনে নিয়ে যেও।

—মাসির ওপর রাগ নেই কিন্তু আপনাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবো। ভয় নেই গাড়ী-ভাড়া আমরাই দেবো আপনার নিজের লাগবেনা। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া কহিল, ফিরতে আমার রাত হবে কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থা করে গেলুম, অন্যথা হলে এসে রাগ করবো।

—রাগ করার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না ও ব্যাপারটা বাড়ীশুদ্ধ সকলের অভ্যাস হয়ে গেছে। না করলেই সকলে আশ্চর্য্য হবে। হয়ত ভাববে বিয়ে বাড়ীতে খেয়ে তোমার অসুখ করেছে।

বন্দনা হাসি-মুখে মাথা নাড়িয়া সায় দিল, বলিল, সন্ধ্যে-আহ্নিক করতে নীচে যাবেন না যেন। অন্নদি এই ঘরেই সব এনে দেবে। তার আধঘন্টা পরেই ঠাকুর দিয়ে যাবে খাবার, একঘন্টা পরে ঝড়ু ওষুধ দিয়ে আলো নিবিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে যাবে। এই হুকুম সকলকে দিয়ে গেলুম। বুঝলেন ?

—হাঁ, বুঝেচি।

—তবে চল্লুম।

—যাও। কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে বন্দনা এ কথা স্বীকার করবোই। কারণ, যে-পোষাকটা পরেছো এইটেই হলো তোমার স্বাভাবিক, যেটা এখানে পরে থাকো সেটা কৃত্রিম।

—সে কি কথা মুখুয্যে মশাই,—ওরা যে বলে মেয়েদের জুতো পরা আপনি দেখতে পারেন না ?

—ওরা ভুল বলে, যেমন বলে তোমার হাতে আমি খেতে পারিনে।

বন্দনা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ভুল হবে কেন মুখুয্যে মশাই, আমার হাতে খেতে সত্যিইত আপনার আপত্তি ছিল।

বিপ্রদাস বলিল, আপত্তি ছিল, কিন্তু আপত্তিটা সত্যিকারের হলে সে আজও থাকতো, যেতোনা।

কথাটা বন্দনা বুঝিলনা কিন্তু বিপ্রদাসের উক্তি অসত্য বলিয়া মনে করাও কঠিন, বলিল, দ্বিজুবাবু একদিন বলেছিলেন দাদার মনের কথা কেউ জানতে পারেনা, যেটা শুধু বাইরের তাই কেবল লোকে টের পায় কিন্তু যা অন্তরের তা অন্তরেই চাপা থাকে,—মুখুয্যে মশাই এ কি সত্যি ?

উত্তরে বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিল, তারপরে বলিল, বন্দনা তোমার দেরি হয়ে যাচ্চে। যদি সত্যিই থাকতে সেখানে ইচ্ছে না হয় থেকোনা,—চলে এসো।

চলেই আসবো মুখুয্যে মশাই থাকতে সেখানে পারবোনা। এই বলিয়া বন্দনা আর বিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

পরদিন সকালে দেখা হইলে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বোনের বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হলো ?

— হাঁ হলো—বিঘ্ন কিছু ঘটেনি।

— নিজের জিদই বজায় রইলো মাসির অনুরোধ রাখলে না ? কত রাত্রে ফিরলে ?

— রাত্রি তখন তিনটে। মাসির কথা রাখা চললো না, রাত্রেই ফিরতে হলো। একটুখানি থামিয়া বোধ হয় বন্দনা ভাবিয়া লইল বলা উচিত কিনা, তারপরেই সে বলিতে লাগিল, মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিলুম কিন্তু কাজ করে এসেচি অনেক। এক বছরে যা করতে পারিনি মিনিট পাঁচ-ছয়েই তা তা হয়ে গেল। সুধীরের সঙ্গে শেষ করে এলুম।

বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, বলো কি !

— হাঁ তাই। কিন্তু ওকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে আসিনি। আজ সকালে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন তার নাম হেম। হেমনলিনী রায়। ওর জিম্মাতেই সুধীরকে দিয়ে এলুম। আবার আমার সেই বোম্বায়ের কলের কথাই মনে পড়ে, তার মতো ওদের ওখানেও ভালোবাসার টানা-পোড়েনে দেখতে দেখতে মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। আবার ভাঙেও তেমনি।

বিপ্রদাস তেমনি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারটা হলো কি ? সুধীরের সঙ্গে হঠাৎ শেষ করে আসার মানে ?

বন্দনা কহিল, শেষ করার মানে শেষ করা। কিন্তু তাই বলে ওখানে হঠাৎ বলেও কিছু নেই মুখুয্যে মশাই। ওদের তাল অসম্ভব দ্রুত বলেই বাইরে থেকে 'হঠাৎ' বলে ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। সুধীর আমাকে ডেকে বললে আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। বললুম, কি অন্যায় হয়েছে সুধীর ? সে বললে কাউকে না বলে—অর্থাৎ তাকে না জানিয়ে—অকস্মাৎ এ-বাড়ীতে চলে আসা আমার খুব গর্হিত কাজ হয়েছে। বিশেষতঃ, সেখানে বিপ্রদাস বাবু ছাড়া আর কেউ নেই যখন। বললুম, সেখানে অন্নদা দিদি আছে। সুধীর বললে, কিন্তু সে দাসী ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বললুম ও-বাড়ীতে তাঁকে দিদি বলে সবাই ডাকে। শুনে সেই হেম মেয়েটি মুখ টিপে একটু হেসে বললে, পাড়াগাঁয়ে ও-রকম

ডাকার রীতি আছে শুনেচি, তাতে দাসী-চাকরের অহঙ্কার বাড়ে আর কিছু বাড়ে না। তারা নিজেরাও বড় হয়ে ওঠে না। সুধীর বললে, এঁদের কাছে তুমি বলেচো যে এখানে থাকতে পারবে না রাত্রেই ফিরে যাবে। কিন্তু সে-বাড়ীতে তোমার একলা থাকাটা আমরা কেউ পছন্দ করিনে। তোমার বাবা শুনলেই বা কি বলবেন? বললুম, বাবা কি বলবেন সে ভাবনা তোমার নয় আমার। কিন্তু আরও যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদের মধ্যে কি তুমি নিজেও আছো? হেম বললে, নিশ্চয়ই আছেন। সকলকে ছাড়া ত উনি নয়। এই মেয়েটার গায়ে-পড়া মন্তব্যর উত্তর দিতে এখনও ইচ্ছে হল না তাই সুধীরকেই বললুম, তোমার এ কথার জবাবে আমিও বলতে পারতুম যে অনর্থক ছুটি নিয়ে তোমার কলকাতায় থাকাটা আমিও পছন্দ করিনে কিন্তু সে কথা আমি বলবো না। তুমি যে নোঙরা ইঙ্গিত করলে তা ইতর-সমাজেই চলে, তোমাদের বড়-দলেও সে যে সমান সচল এ আমি জানতুম না, কিন্তু আর আমার সময় নেই, গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি চললুম। সেই মেয়েটা আবার বলে উঠলো, যা অশোভন, যা অনুচিত তার আলোচনা ছোট-বড় সকল দলেই চলে জানবেন। বললুম, আপনারা যত খুসি আলোচনা চালান আমার আপত্তি নেই। আমি উঠলুম। সুধীর হঠাৎ কেমন ধারা যেন হয়ে গেল,—মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো,—নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, তোমার মাসিমাকেও জানিয়ে যাবে না? বললুম, তাঁকে জানানোই আছে বিয়ে হয়ে গেলেই আমি চলে যাবো যত রাতই হোক। সুধীর বললে, কাল তোমার সঙ্গে কি একবার দেখা হতে পারবে? বললুম, না। সে বললে, পরশু? বললুম, পরশুও না।

— তার পরের দিন?

— না, তার পরের দিনও নয়।

— কবে তোমার সময় হবে?

— সময় আমার হবে না।

—কিন্তু আমার যে একটা বিশেষ জরুরি কথা আলোচনা করবার আছে?

—তোমার হয়ত আছে কিন্তু আমার নেই। এই বলে উঠে পড়লুম।

সুধীর আমাকে যে চেনেনা তা' নয়, সঙ্গে এগিয়ে আসতে সাহস করলেনা সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি গাড়ীতে এসে বসলুম।

বিপ্রদাস ঈষৎ হাসিয়া কহিল, এর মানে কি শেষ করে দেওয়া বন্দনা? একটুখানি কলহ। সন্দেহ যদি থাকে দেখা হলে তোমার মেজদি'কে জিজ্ঞেসা করে নিও।

বন্দনা হাসিল না, গম্ভীর হইয়া বলিল, কাউকে জিজ্ঞেসা করার প্রয়োজন নেই মুখুয্যে মশাই, আমি জানি আমাদের শেষ হয়ে গেছে এ আর ফিরবে না।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বিপ্রদাস হতবুদ্ধি হইয়া রহিল,—বলো কি বন্দনা, এত বড় জিনিস কি কখনো এত অল্পেই শেষ হতে পারে? সুধীরের আঘাতটাই একবার ভেবে দেখো দিকি।

বন্দনা বলিল, ভেবে দেখেচি মুখুয্যে মশাই। এ আঘাত সামলাতে সুধীরের বেশি দিন লাগবে না আমি জানি ঐ হেম মেয়েটিই তাকে পথ দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আমি নিজের কথা ভাবছিলুম। শুধু সে

গাড়ীতে বসেই ভেবেছি তা নয়, কাল বিছানায় শুয়ে সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। অস্বস্তি বোধ করেচি সত্যি কিন্তু কষ্ট আমি পাইনি।

—কষ্ট পাবে রাগ পড়ে গেলে। তখন এর জন্যেই আবার পথ চেয়ে থাকবে। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

এ হাসিতেও বন্দনা যোগ দিল না, শান্তভাবে বলিল, রাগ আমার নেই। কেবল এই অনুতাপ হয় যে চলে আসার সময়ে যদি কঠিন কথা আমার মুখ দিয়ে বার না হতো। দেখিয়ে এলুম যেন দোষ তার,—জানিয়ে এলুম যেন মর্ম্মাহত হয়ে আমি বিদায় নিলুম। কিন্তু তা তো সত্যি নয়,—এই মিথ্যে আচরণের জন্যেই শুধু লজ্জা বোধ করি মুখুয্যে মশাই, আর কিছুর জন্যে নয়। তাহার কথার শেষের দিকে চোখ যেন সজল হইয়া আসিল।

বিপ্রদাসের মনের বিস্ময় বহুগুণে বাড়িয়া গেল, এ যে ছলনা নয় এতক্ষণে সে বুঝিল। বলিল, সুধীরকে তুমি কি সত্যিই আর ভালোবাসো না

—না।

—একদিন ত ভালোবাসতে? এত সহজে এ ভালোবাসা গেল কি করে?

—এত সহজে গেল বলেই এত সহজে এর উত্তর পেলুম। নইলে আপনার কাছে মিথ্যে বলতে হতো। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি জানতে চাইলেন কোনদিন সুধীরকে ভালোবেসেছিলুম কিনা। সেদিন ভাবতুম সত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু তার পরেই আর একজন পড়লো চোখে,—সুধীর গেল মিলিয়ে। এখন দেখি সেও গেছে মিলিয়ে। শুনে হয়ত আপনার ঘৃণা হবে, মনে হবে এমন তরল মন ত দেখিনি। আমি জানি মেয়েদের এ লজ্জার কথা,—কোন মেয়েই এ স্বীকার করতে চায়না—এ যেন তাদের চরিত্রকেই কলুষিত করে দেয়। হয়ত আমিও কারো কাছে মানতে পারতুম না, কিন্তু কেন জানিনে আপনার কাছে কোন কথা বলতেই আমার এতটুকু লজ্জা করে না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, হয়ত এই আমার স্বভাব, হয়ত এ আমার বয়সের স্বধর্ম্ম, অন্তর শূন্য থাকতে চায় না হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে। কিম্বা, এমনিই হয়ত সকল মেয়েরই প্রকৃতি, ভালোবাসার পাত্র যে কে সমস্ত জীবনে খুঁজেই পায় না। এই বলিয়া স্থির হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তার পরেই বলিয়া উঠিল,—কিম্বা হয়ত খুঁজে পাবার জিনিস নয় মুখুয্যে মশাই,—ওটা মরীচিকা।

বিপ্রদাস তেমনিই মৌন হইয়া রহিল। বন্দনার যেন মনের আগল খুলিয়া গেছে, বলিতে লাগিল, এই সুধীরের সঙ্গেই একবছর পূর্ব্বে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছিল শুধু তার মায়ের অসুখ বলেই হতে পারেনি। কাল ঘরে ফিরে এসে ভাবছিলুম বিয়ে যদি সেদিন হয়ে যেতো আজ কি মন আমার এমনি করেই তাকে ঠেলে ফেলে দিতো? মনকে শাসনে রাখতুম কি দিয়ে? ধর্ম্মবুদ্ধি দিয়ে? সংস্কার দিয়ে? কিন্তু অবাধ্য মন শাসন মানতে যদি না চাইতো কি হতো তখন? যাদের মধ্যে এই ক'টাদিন কাটিয়ে এলুম ঠিক কি তাদের মতন? এমনি ষড়যন্ত্র আর লুকোচুরিতে মন পরিপূর্ণ করে শুকনো হাসি মুখে টেনে

টেনে লোক ভুলিয়ে বেড়াতুম ? এমনি পরস্পরের নিন্দে করে, হিংসে করে, শত্রুতা করে ? কিন্তু আপনি কথা কইচেন না কেন মুখুয্যে মশাই ?

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মনের মধ্যে যে ঝড় বইচে তার ভয়ানক বেগের সঙ্গে আমি চলতে পারবো কেন বন্দনা, কাজেই চুপ করে আছি।

বন্দনা বলিল, না সে হবে না, এমন করে এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না। জবাব দিন।

—কিন্তু শান্ত না হলে জবাব দিয়ে লাভ কি ? তোমার আজকের অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় একথা তুমি বুঝতে পারবে কেন ?

—কেন পারবো না মুখুয্যে মশাই, বুদ্ধিত আমার যায়নি।

—যায়নি কিন্তু ঘুলিয়ে আছে। এখন থাক। সন্ধ্যার পরে সমস্ত কাজ কর্ম্ম সেরে আমার কাছে এসে যখন স্থির হয়ে বসবে তখন বলবো। পারি তখনি এর জবাব দেবো।

—তবে সেই ভালো এখন আমারও যে সময় নেই—এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল। বস্তুতঃ তাহার কাজের অবধি নাই। সকালে ছুটি লইয়া অন্নদা কালীঘাটে গেছে, সে কাজগুলাও আজ তাহারই কাঁধে পড়িয়াছে। কত চাকর বাকর, কত ছেলে এখানে থাকিয়া স্কুল কলেজে পড়ে,—তাহাদের কত রকমের প্রয়োজন। কাজের ভিড়ে তাহার মনেও পড়িল না সে সারা রাত্রি ঘুমায় নাই সে আজ ভারি ক্লান্ত।

সন্ধ্যার পরে বিপ্রদাসের রাত্রির খাওয়া সাঙ্গ হইল, নীচের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া বন্দনা তাহার শয্যার কাছে আসিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিল, বলিল, মুখুয্যে মশাই, একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন ?

বিপ্রদাস বলিল, সচরাচর তাইত দিয়ে থাকি। প্রশ্নটা কি ?

বন্দনা বলিল, মেজদিদিকে আপনি কি সত্যিই ভালোবাসেন ? ছেলেখেলায় আপনাদের বিয়ে হয়েছে—সে কতদিনের কথা—কখনো কি এর অন্যথা ঘটেনি ?

বিপ্রদাস অবাক হইয়া গেল। এমন কথা যে কাহারো মনে আসিতে পারে সে কল্পনাও করেনি, কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, তোমার মেজদিদিকেই বরঞ্চ এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসা কোরো।

বন্দনা বলিল, তিনি জানবেন কি করে ? আপনার আসল মনের কথা ত শুনেচি কেউ জানতে পারেনা। না বলতে চান বলবেননা আমি একরকম করে বুঝে নেবো কিন্তু বললে সত্যি কথাই আপনাকে বলতে হবে।

—সত্যি কথাই বলবো, কিন্তু আমাকে কি তোমার সন্দেহ হয় ?

—হয়। আপনি অনেক বড় মানুষ, কিন্তু তবুও মানুষ। মনে হয় কোথায় যেন আপনি ভারি একলা, সেখানে আপনার কেউ সঙ্গী নেই। এ কথা কি সত্যি নয় ?

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিল না, বলিল, স্ত্রীকে ভালোবাসা যে আমার ধর্ম্ম বন্দনা।

বন্দনা বলিল, ধর্ম্ম যতদূর প্রসারিত ততদূর আপনি খাঁটি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কি সংসারে কিছু নেই?

—দেখতে ত পাইনে বন্দনা।

বন্দনা বলিল, আমি দেখতে পাই মুখুয্যে মশাই। বলবো সে কথা?

বিপ্রদাসের মুখ সহসা যেন পাণ্ডুর হইয়া উঠিল,—বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ মুখে যেন রক্তের লেশ নাই দুই হাত সম্মুখে বাড়াইয়া বলিল, না, একটি কথাও নয় বন্দনা। আজ তোমার ঘরে যাও,—কাল হোক পরশু হোক,—আবার যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে আলোচনার বুদ্ধি ফিরে পাবে তখন এর জবাব দেবো। কিম্বা হয়ত আপনিই তখন বুঝবে ঐ যারা তোমার মাসির বাড়ীতে বুদ্ধিকে তোমার আচ্ছন্ন করেছে তারাই সব নয়। ধর্ম্ম যাদের কাছে অত্যাজ্য তারাও আছে, জগতে তারাও বাস করে। না না আর তর্ক নয়,—তুমি যাও।

বন্দনা বুঝিল এ আদেশ অবহেলার নয়। এই হয়ত সেই বস্তু যাহাকে বাড়ীশুদ্ধ সকলে ভয় করে। বন্দনা নিঃশব্দে ঘর হইয়া বাহির হইতে গেল।

(ক্রমশ)

শরৎচন্দ্র

সাতভাল

অধ্যাপক শ্রীহুমায়ুন কবির

১
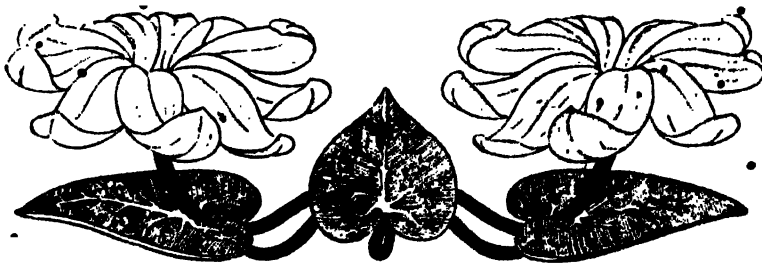
সাতভালের এই সাতটী তালাও
সাতটী যেন বোন।
সাতটী দেহে একটী শুধু মন।
হিমালয়ের ঘরের মেয়ে
বাইরে এসে তারা
উদার আকাশ পানে চেয়ে
হ'ল আত্মহারা।
তাই তো তাদের বক্ষে জাগে
নীল আকাশের ছবি
পূব আকাশের রক্তরাগে
রাঙায় উদয় রবি।
চারি পাশের পাহাড়গুলি
কুতূহলের ভরে
নীল আকাশের বার্ত্তা ভুলি'
চাহেনা আর নয়ন তুলি,
কেবল শুধু দিবস রাতি
তাকায় তাদের পরে।
পেল খুঁজে মনের সাথী
সাতটী সরোবরে।
পাহাড় বুকের বনের ছায়া,
তাই তো হ্রদের জলে
গভীর মাঝে সবুজ মায়া
সূর্য্যালোকে ঝলে।

২

গিরিশিখার আড়াল থেকে
যখন ভোরের বেলা
পূব আকাশে আবির মেখে
আসে রবির ভেলা,
দিক হতে ঐ দিগন্তরে
নিমেষ মাঝে আলোয় ভরে,
বনের মাঝে তরুর শাখে
লুকায় আঁধার-ত্বরা
ঘুম ভাঙ্গানো পাখীর ডাকে
মুখর সকল ধরা।
দোয়েল ডাকে, কোয়েল ডাকে,
বনের পাখী কত,
ডাকে কোথায় পাইন শাখে
ঝিল্লী অবিরত।

দাঁড়িয়ে থাকে পাইনগুলি
উষার সাথে জাগি'
নীল গগনে মাথা তুলি
সূর্য্যোদয়ের লাগি।
সূঁচের মতন তীক্ষ্ণ পাতা
ভোরের আলোর সোনায় গাঁথা।
তারি মাঝে কোথায় লাগে
নব হরিৎ রেশ,

সবুজ সোনার লীলা জাগে,
স্বপ্ন-পুরীর দেশ।
বনের মাঝে পাইন গাছে
দিবস রাত্রির দেখা
গোড়ায় আঁধার জড়িয়ে আছে,
মাথায় আলোর রেখা।

৩

দুপুর বেলায় স্তব্ধ গগন,
স্তব্ধ হেথায় ধরা,—
বনের ছায়া নিদ্রালুতায় ভরা।
তরুশাখায় থাকি থাকি
ওঠে ডাকি অলস পাখী
নিমেষ তরে নীরবতায়
গভীরতর করি',
পথ ছেয়ে যায় শুষ্ক পাতায়
অলস বায়ে ঝরি'।
জীবন ধারার চঞ্চলতার
হেথায় নাহি ছায়া
হেথায় রাজে অতল অপার
স্তব্ধ অটুট্ মায়া।

কিসের সাড়া হঠাৎ জাগে'
সুপ্ত কানন মাঝে,
কাহার বাণী দীপ্ত রাগে
তরুশাখায় বাজে।

কাননরাণী তন্দ্রালসা
নয়ন মেলি চায় সহসা;
হঠাৎ জাগে পাইন বনে
তপ্ত নিদাঘ বায়,
পাতায় পাতায় গভীর স্বনে
মর্ম্মরিয়া যায়।
নিদ্রা অলস বনে লাগে
জীবন চঞ্চলতা,
দুরন্ত উচ্ছ্বাসে জাগে
যৌবন ব্যগ্রতা।

রাতের স্নিগ্ধ আকাশ তলে
বসে তারার মেলা
সাতটী তালের অথির জলে
লুকোচুরী খেলা।
অন্ধকারে স্তব্ধ নীরব
কাননরাণীর সঙ্গীরা সব,
গিরিশিখর ঊর্দ্ধ পানে,
নয়নে নিদ নাহি,
জেগে থাকে কিসের ধ্যানে
পূব আকাশে চাহি'।
সুপ্ত ভুবন সুপ্ত গগন,
পবন স্পন্দহারা,
হ্রদের জলে ধ্যান মগন
নীল আকাশের তারা।

হুমায়ুন কবির

সাহিত্য সভার কি কাজ ?

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র এম্‌-এ, পি-আর-এস

বালী সাধারণ গ্রন্থাগার ও বালী সাহিত্য সভা যখন স্থাপিত হয়, প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন জীবিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন "সন্ধ্যাসঙ্গীত" ও "প্রভাত সঙ্গীত" ব্যতীত আর বড় একটা কিছু লেখেন নাই বলিলেও চলে, শরৎচন্দ্র তখন শিশু, আজকালিকার তরুণ সাহিত্যিকরা তখন জন্মান্তরে প্রবীণ, কংগ্রেস তখন লর্ড ডাফরিণের আশীর্ব্বচন শিরোধার্য্য করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে মাত্র, বাংলার বিদ্বৎসমাজ তখন জন স্টুয়ার্ট মিলের ও হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রতিভার চমকে দিশাহারা। তারপরে সাতচল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সাতচল্লিশ বৎসরের ইতিহাস যে-প্রতিষ্ঠানের জীবন স্মৃতিতে মুদ্রিত রহিয়াছে তাহার বর্ত্তমান পরিচালকগণ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগতই হউক আর সমাজগতই হউক শুধু বয়সের একটা সম্মান ও সৌন্দর্য্য আছে। আয়ু যাহার দীর্ঘ সঞ্চয়ও তাহার প্রচুর, সে সঞ্চয়ের বাজার দর যাহাই হউক না কেন। সে সঞ্চয়ের উত্তরাধিকারী যাহারা একাধিক জীবনের ভূয়োদৃষ্টির ফল নিজেদের জীবনের প্রারম্ভেই তাঁহারা পান কিনা এবং কতটা পান তাহা কে বলিতে পারে? পাইলে সেটাও তো একটা কম লাভ নহে।

সংসারে অনেক জিনিসের মত সাহিত্যসভারও একটা দরকার আছে এবং এবিষয়ে ওকালতি করিবার সুযোগ পাইলে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কাজ নাই। বিপদ্ বরং অন্যদিকে। সাহিত্যসভার প্রয়োজনীয়তায় সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তি আপাততঃ বিরল, আমাদের বর্ত্তমান সভায় যদিই বা কেহ থাকেন তিনি নিশ্চয়ই আত্মগোপন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রয়োজন কথাটার অর্থ বিচার করিতে বসিলে মতভেদের এমন কি মারামারি গোছের একটা দলাদলিরও যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। সাহিত্য সভার কাজ সাহিত্য-বহির্ভূত লক্ষ্যের অনুগামী নহে। জাতিদের দুঃখ দূর করিতে হইলে সাহিত্য-সভা প্রশস্ত স্থান নহে। পলিটিক্সের নিশান উড়াইয়া কুস্তির পালোয়ানী ও মাতামাতি করা বা স্বেচ্ছাসেবকের ফিতা আঁটিয়া সমাজ সংস্কারের পিছনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাওয়া সাহিত্যের তথা সাহিত্য সভার কাজ নহে। সাহিত্যের অসাহিত্যিক কোন লক্ষ্য নাই, থাকিতে পারে না। জাতীয় জীবনে ও জাতি গঠনে সাহিত্য স্বধর্ম-বিরোধী পন্থা অবলম্বন করিয়া কোন সাহায্য করিতে পারেনা। পলিটিক্সের নেশা যাঁহাদের পাইয়া বসিয়াছে, তাঁহাদের এ কথাটা মনে রাখা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠ" "সীতারাম" ও "দেবী চৌধুরাণী" বাঙ্গলার আধুনিক ইতিহাসে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার মূলে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি। দুঃখের বিষয় আমাদের সোস্যালিষ্ট তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুদের বস্তি-জীবনের কাহিনীতে রসসৃষ্টির পরিবর্ত্তে অধিকাংশ সময়ে সোস্যালিষ্ট আইডিয়াগুলিই গজ্ গজ্ করিতে থাকে। অধিকাংশ সাহিত্য সভাতেও দেখিতে পাই যুযুৎসু হইতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস পর্য্যন্ত সবই আলোচিত হয় কিন্তু মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি নামের কেহ যে এই বাংলা দেশে ছিলেন বা আছেন তাহার নিশানা পাওয়া শক্ত।

সাহিত্য সভার কাজ তাহা হইলে কি? প্রথম কাজ সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকদের মেলামেশার কেন্দ্রস্থল হওয়া। সাহিত্যিক আড্ডাখানা জাতীয় জীবনের একটা বড় প্রতিষ্ঠান। কাফিখানা যে শেক্‌স্‌পিয়রের জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন, এবং তিনি কফিখানাতেই মারামারি করিয়া মারা গিয়াছিলেন বলিয়া যে গল্প আছে সে গল্প সত্য না হইলেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। ফ্রান্সের চটুল রচনা demi-mondeদের বৈঠকখানায় অর্দ্ধেক ফরাসী সাহিত্যের সৃষ্টি। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রমথ চৌধুরীর পরশুরামের ও দীনেশরঞ্জন দাসের বৈঠকখানাগুলির দানও বড় কম নহে। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা ভাগলপুরের সাহিত্য মজলিসেই লালিত পালিত হইয়াছিল। প্রত্যেক সাহিত্য সভাই যদি এই রকম এক একটি বৈঠকখানা হয় তবে বাঙ্গলা সাহিত্যের ভবিষ্যতের জন্ম উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণই দেখিতেছি না।

মজলিস জিনিসটার দাম আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বুঝিতেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের মজলিসই কালিদাসের কবি-প্রতিভার কোরকটিকে রসমী মনের স্নিগ্ধ অথচ প্রবুদ্ধ উত্তাপে একটু একটু করিয়া ফুটাইয়াছিল। ভারতবর্ষের কাব্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, ও চিত্রশিল্পের ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গের ও জমীদারগণের মজলিসগুলি মাতৃস্নেহের স্থান অধিকার করিয়া আছে। আর্টিষ্টের জীবনের আবহাওয়া

আর্টের tradition কতটা কাজ করে কলিকাতার ঠাকুর পরিবার তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খুব উচুদরের প্রতিভা হয়তো শিক্ষা ও সমাজ সৃষ্টি করিতে পারে না, ঈশ্বর অথবা প্রকৃতিই সৃষ্টি করে। কিন্তু একথাও ঠিক প্রতিভা বলিয়া আমরা যাহাকে ভুল করি অধিকাংশক্ষেত্রেই তাহা শিক্ষিত ও ব্যবস্থিত শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। যে সমাজ যে ধরণের আর্ট যতটা পাইবার উপযুক্ত তাহাই পায়। যে সমাজে বা নেশনে আর্টের tradition যে রকম, মোটের উপর সেই রকমই আর্টিষ্ট সেখানে জন্মগ্রহণ করে। দেশের সাহিত্যসভাগুলি যদি সত্যকার শিল্পচর্চ্চার ও শিল্পীজীবনের মজলিস হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতের অনেক তরুণ শিল্পীই অনুকূল আবহাওয়ার ও traditionএর অভাবে শিল্পচর্চ্চায় অশক্ত বা নিরুৎসাহ হইবেন না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে একটা সংঘ বা প্রতিষ্ঠান কখনও কেবল অবাধ ও অনিয়মিত মেলামেশার মজলিস হইতে পারে না, প্রতিষ্ঠানের একটা বাঁধাধরা কাজ দরকার যে কাজ কয়েকজন সাধারণ ব্যক্তি পরস্পরের সহযোগে অনেকদিন ধরিয়া করিতে পারে। সাহিত্য সভার এমন কোন কাজ আছে কি? জাতীয় জীবনের শ্রম বিভাগে সাহিত্য সভার দায়িত্ব কি? আজকাল বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার যুগ চলিতেছে। Liberty, Equality and Fraternityর পরিবর্ত্তে এখন slogan হইয়াছে Economy ও Organisation। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কিছুদিনের মধ্যেই সাহিত্য ক্ষেত্রেও আমরা Five year Planএর কথা শুনিতে পাইব। সুতরাং এখন হইতেই সাবধান ও প্রস্তুত হওয়া দরকার। আমাদের সাহিত্যসভাগুলিরও প্রত্যেকটিকে এক একটি নিজস্ব কাজ বাছিয়া লইতে হইবে যে কাজ বহু সাধারণ সাহিত্য-রসিক সভ্যের সহযোগে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিয়া সেই সাহিত্য সভাকে জাতীয় সাহিত্য জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবে।

সুখের বিষয় এই ধরণের কাজ করিবার অবসর ও আবশ্যকতা অন্ততঃ আমাদের বাঙ্গলা দেশে আছে। বহুদিন পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি, কখনও ইতিহাস লেখে নাই, নিজেকে চেনে না, নিজেকে বোঝে না। মায়ের দরদে তিনি বাঙ্গালীর বোধ স্মৃতিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ইতিহাসের আল মশলায় নানা রঙীন চিত্র কল্পনা করিয়া তাঁহার অমর তুলিকায় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে কাজ হইয়াছে, সেই কাজের ফল সম্পূর্ণ ভাল হইয়াছে কিনা, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক বলিতে পারেন, কিন্তু সে অন্যকথা। বঙ্কিমের পর বাঙ্গালী ইতিহাস শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিছু কিছু রচনাও করিয়াছে, কিন্তু সে কতটুকু। মোটের উপর এখনও আমরা বড় অনৈতিহাসিক অত্যন্ত uncritical। ইতিহাসের বোধ না থাকিলে সমালোচক হওয়া যায় না এবং মন critical না হইলে ইতিহাসের দিকে নজর পড়ে না। ইতিহাস ও সমালোচনা পরস্পরাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ কতবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার লেখার ভালো সমালোচনা হয় না, বাঙ্গালী সমালোচনায় বড় পরাঙ্মুখ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনস্তাপ দূর করিবার কোন চেষ্টাই এক রকম আজ পর্য্যন্ত হইল না। তিনি য়ুরোপে জন্মিলে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার প্রত্যেকটী কবিতার, গল্পের ও উপন্যাসের বিচিত্র ব্যাখ্যার গুঞ্জরণে সাহিত্যজগৎ মুখরিত হইয়া উঠিত। তাঁহার সাহিত্যজীবনের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি লইয়া শত শত পুস্তক রচিত হইত, এবং তাঁহার রচনার প্রত্যেক ছত্রই বিষয়ে তাঁহার নিজের মত স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের একদল লোক রবীন্দ্রনাথের লেখা বুঝিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন এবং আর একদল লোক রবীন্দ্রনাথের লেখা বুঝিয়া ততোধিক বিস্ময়ে আরও নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কবি নিজে শান্তিনিকেতনে "বলাকা" ক্লাশে "বলাকার" কবিতাগুলির যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা অনুলিখিত হইয়া "শান্তিনিকেতন" পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। এই গুলির মূল্য যে কতখানি তাহা রবীন্দ্র-ভক্ত মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু কেন যে তাঁহার অন্যান্য সকল কাব্যগ্রন্থের ও উপন্যাসের এই রকম ব্যাখ্যা আজও বাহির হইল না, আমাদের আলস্য ও মূঢ়তা ছাড়া তাহার অন্য কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শান্তিনিকেতনের নূতন ও পুরাতন অধ্যাপকবৃন্দের ও ছাত্রগণের এই বিষয়ে একটা অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য ছিল ও এখনও আছে। এমন কি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় যে এখনও রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটী সমগ্র অথচ স্বল্পকায় ভূমিকা বাহির করিয়া সাধারণের হাতে দিতে পারিলেন না ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি প্রামাণ্য chronologyর জন্য Thomson সাহেবের বই ঘাঁটিতে হয়, ইহার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? আলোচনার দিক হইতে রবীন্দ্রনাথকেই যে ভুগিতে হইয়াছে তাহা নহে, অন্যান্য কবির ও ঔপন্যাসিকের অবস্থা আরও শোচনীয়।

আমার মনে হয় দেশের সাহিত্য সভাগুলির এইদিকে এক প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, ধৈর্য্য ধরিয়া চাষ করিলেই সুফল ফলিবে এবং তাহার জন্য সাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও রসবোধই যথেষ্ট, কোন অসাধারণ প্রতিভার

ও শক্তির প্রয়োজন নাই। ঐতিহাসিক হইতে হইলে প্রত্নতাত্ত্বিক হইতে হইবে এমন কি মানে আছে ? সমসাময়িক ইতিহাস রীতিমত লিপিবদ্ধ করিতে থাকিলে প্রত্নতাত্ত্বিকের ব্যবসায়ে ক্রমশঃই মন্দা পড়িতে থাকিবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই ইতিহাস রচনার কাজ সাহিত্য সভার একান্ত কর্ত্তব্য। জীবিত সাহিত্যিকের গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী তৈয়ার করা, প্রত্যেক গ্রন্থের জন্মেতিহাস তাঁহার নিকট শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা, তাঁহার নিজের জীবনের সকল তথ্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় করা, প্রত্যেক গ্রন্থ ও চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার মতামত নির্ণয় করা—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ইহাই প্রথম ও প্রধান সোপান ; এই ভাবে সংগৃহীত মাল মশলাই হইবে ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকের প্রধান উপজীব্য।

তথ্য সংগ্রহ ব্যতীত সাহিত্য সভার প্রধান কাজ হওয়া উচিত সাহিত্য চর্চ্চা, সাহিত্যের বিধিমত আলোচনা অর্থাৎ সমালোচনা। কোন বিষয়ে সত্য নির্ণয় করিতে হইলে বহু স্থানের, বহু স্তরের, বহু লোকের মতামত জানা ও প্রকাশ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা ; আর্টের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। প্রাচীন ও আধুনিক সকল সাহিত্যিকদের সম্বন্ধেই নিত্য নব নব আলোচনা হওয়া উচিত এবং এই আলোচনাগুলির সংঘাত ও সহযোগ হওয়া দরকার। এইজন্য বিভিন্ন সাহিত্য-সভাগুলির মধ্যে একটা Federation হওয়া উচিত কিনা তাহা বিশেষজ্ঞেরা বিবেচনা করিবেন। দরদী, অন্তরঙ্গ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ব্যাপকভাবে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর না চলিলে বাঙ্গলা সাহিত্যের শিল্প-মূল্যগুলির ও বিবর্ত্তনের সম্বন্ধে একটা কোনো রকমের মতৈক্যও কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আর্টের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব ও মৌলিকতার দাম যত উচুতেই হউক না কেন আর্টের কতকগুলি শিল্পসূত্র ও কষ্টি-পাথর খাড়া করিতেই হইবে ; আর্টের মূল্য নিরূপণে এইগুলি প্রতীয়মান না হউক অপ্রতীয়মান অবস্থায় থাকিবেই। মোটের উপর কতকগুলি মূল্য ও মূল্যমান স্বীকৃত না হইলে জনমত অথবা সমসাময়িক রুচি অন্তঃসারশূন্য নামমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকিবে, মৌলিকতার একটা শাসন ও বাঁধন থাকিবে না এবং শিল্পী ও শিল্প-রসিক উভয়েই একটা নির্দ্দেশের অভাব অনুভব করিবেন।

মতের ও আইডিয়ার অনির্দ্দিষ্টতা ও তাণ্ডব রকম ফের বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা অভিশাপ স্বরূপ হইয়াছে। অমুক বড় না অমুক বড়, বস্তুতান্ত্রিকতা দরকার না আদর্শবাদ দরকার, শ্লীলতাই সাহিত্য-ধর্ম্ম না সর্ব্ব প্রকার সংস্কার বর্জ্জনই সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য এ বিষয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মাঝে মাঝে একই রকমের তর্ক তোলেন এবং দুঃখের বিষয় তাঁহারা প্রত্যেকেই অপরের যুক্তির পাশ কাটাইয়া গিয়া নিজের তীব্র ব্যক্তিগত কথাই সাত কাহন বলেন। সমালোচনা আরও অনেক বেশী বস্তুগত ও ব্যাপক হওয়া উচিত। তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিক লেখকগণ অনেকেই আর্টের দিক থেকে মোটেই বস্তুতান্ত্রিক নন্, এই সোজা কথাটা কেন যে অধিকাংশ সময়েই দেখাইয়া দেওয়া হয় না বুঝা শক্ত। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষকগণকে আমি নখী দন্তী শৃঙ্গীদের দলেই ফেলি এবং সেই রকমই ভয় করি। কিন্তু তাই বলিয়া মৌলিকতার ও সংস্কার-হীনতার নামে যাঁহারা আর্টিষ্টের ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া ফাঁকি দিয়া কাজ সারিতে চাহেন, অনভিজ্ঞতা, দৃষ্টিহীনতা ও আলস্যকে আধুনিকতার জাপানী সিল্কে মুড়িয়া রাখেন, বাল সুলভ আত্মম্ভরিতায় যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরকে নিজেদের পাঁচ ইয়ারের বৈঠক-খানায় পরিণত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা শক্ত। তাঁহারা আর্টিষ্ট নন ইহাই তাঁহাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ।

সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিককে আমি বলি আলস্য, উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করিতে হইবে। সাহিত্য-রসিকগণের আত্মগোপন করিয়া থাকিলে চলিবে না, বাহিরে আসিয়া সাহিত্য বোধ জাগাইবার ও বাড়াইবার জন্য রীতিমত আন্দোলন চালাইতে হইবে। সাহিত্য সমালোচনাকে তত্ত্ব-বিজ্ঞানের ও নীতি-বিজ্ঞানের পঙ্ক ও জনজাল হইতে উদ্ধার করিয়া আর্টের সুসজ্জিত ফুলবাড়ীর ভুরভুরে সুগন্ধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সাহিত্য-শিল্পীকে কষ্ট করিয়া দেখিতে হইবে, ধৈর্য্য ধরিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সকল সময়ে সকল বিষয়ে গুছাইয়া কাজ করিতে হইবে, অনেকটা যেমন আমরা পথের পাঁচালীর গ্রন্থকার বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে দেখি। আর্ট তো আর ম্যাজিক নয় সকল পার্থিব সম্পদের মতই আর্ট আয়াসসাধ্য। Sir James Barrie সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "Hard work more than any woman in the world is the one that stands up best for her man. She is the prettiest thing in literature." বাঙ্গলার তরুণ সাহিত্যিককে ও বাণী সাহিত্য-সভাকে আমি এই বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যিকের কথাগুলি প্রণিধান করিতে বলি। *

শ্রীঅমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র

* বাণী সাহিত্য-সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

যজ্ঞ-ভঙ্গ

শ্রীমতী নীলিমা দাস

স্বষ্টি-প্রভাতে এ কী হেরি আজ! ঘিরে' আসে ঘোর অন্ধকার!
দক্ষপুরীর দুর্গ-প্রাচীর,—টুটে' বুঝি তাঁর বন্ধভার!
বিশ্ববিনাশী প্রলয়-ঝড়ের পূর্ব্ব সুচনা—ভয়ঙ্করা!
থম্ থম্ করে বসুন্ধরা!

শিব-হীন যাগ করে মহাভাগ দক্ষ, মন্ত্র গগন ছায়!
পতিগতপ্রাণা সতী গত-প্রাণা, তনুদেহখানি লোটে ধূলায়!
পুরনারী কাঁদে; দেবতার দল নির্ব্বাক্—ভয়ে কম্পমান।
হোম-ধূম ঢাকে দূর বিমান!

* *
*

হোথা ধূর্জ্জটী ধেয়ানমগ্ন কৈলাসকূটে, কঙ্কালাসীন!
নন্দী বন্দে চরণোপান্ত, আঁখিনীরে ভাসে আঁখি-নলিন্!
জাগো ভৈরব! জাগো হে ভয়াল! দৃষ্টিতে কর স্বষ্টি লয়,—
সতীহীন শিব! বিভূতিময়!

চেয়ে দেখো আজ, ওহে নটরাজ! সকলি যে গেলো—ঘরণী, ঘর!
ধুতুরার বিষে দিশেহারা তুমি কতোকাল রবে, দিগম্বর!
গৃহহীন শিব! গৃহ যে শূন্য,—কার কাছে যাবে হস্ত পাতি'?
সতী নাই, নাহি গৃহের ভাতি!

নবনীততনু ধূলায় লোটায়, প্রিয়-অপবাদে পরাণহীন!
দেখিবে না তারে? শব নিয়ে, শিব! কতোকাল র'বে ধেয়ানলীন?
বড়ো অভিমানী সে যে, শূলপাণি! অভিমান তার ভাঙাবে কবে?
কতোকাল রবে শবোৎসবে!

* *
*

সহসা শায়িত শব-কঙ্কাল হি-হি-রবে তোলে কী চীৎকার !
নর-কপালের হাড়ে হাড়ে লাগে ঠোকাঠুকি, জাগে হুহুঙ্কার !
ঝড়-ফুৎকারে কাঁপে ব্যোমপথ,—সপ্তপৃথ্বী টলায়মান !
ত্রিনেত্র মেলি' চাহে ঈশান !

কটি-নিবদ্ধে বিষধর ফোঁসে, খসে বাঘ-ছাল নৃত্য-ঘায় ;
ত্রিনয়নে জ্বলে বহ্নির জ্বালা, গ্রন্থিল জটা গগন ছায় !
সংহার-সুখে চলে শঙ্কর, মৃত্যু মরিছে চরণ-চাপে।
দেবতা-দানব দাপটে কাঁপে !

হের পালে পালে ডাকিনী পিশাচ ভূতপ্রেত ওই চলিছে সবি ;
চলে অগ্রগ সে-বীরভদ্র ধূর্জ্জটী-জটে জনম লভি' ;
শবভুক যত শ্মশান-শিবারা শিব-সহচর এ-উৎসবে,—
মরণোল্লাসে মেতেছে সবে !

* *
*

একটি নিমেষ,—তারপরে শেষ ! শুধু ধূম্ আর ভস্ম চিতার !
নাহি কোলাহল, স্তব্ধ নীরব,—দীর্ঘনিশাসও বহে না আর !
দক্ষপুরীর দুর্গ-তোরণে ধ্বংস-কেতন উড়িছে আজ।
এ কী লীলা তব হে নটরাজ !

ওই হের, হর-নয়নে বুঝি বা লাগিল আবার ধুতুরা-ঘোর,
ঢুলে' আসে আঁখি ; ত্রিভুবনসহ ত্রিলোচন আজি নেশায় ভোর !
স্তব্ধ ধরণী, স্তব্ধ বাতাস ; দিগ্বধূ জপে ইষ্টনাম !
সৃষ্টির বুঝি শেষ বিরাম !

ও কি ? সতী-শব স্কন্ধে তুলিয়া শিব যে টলিছে, রূপ-মাতাল !
তৃতীয় নয়নে ও-বরতনুর লাগিল কি জ্যোতি, হে মহাকাল ?
এ কেমন-ধারা রূপের আরতি ?—সৃষ্টি যে যায় সৃষ্টিধর !
ঘরণীর লাগি' ভাঙিবে ঘর ?

কত তনু তব বুকে জড়াইলে, মিটিল না তবু তনু-তিয়াস ?
তনুতীর্থার তনুভস্মে কি, শ্মশানেশ্বর ! হবে বিলাস ?
চাহ ফিরে ওগো রূপ-ভোলা ভোলা ! ভুলে যে ভুলিলে, রূপ-মাতাল
জাগো ভৈরব ! জাগো ভয়াল !

শ্রীনীলিমা দাস

প্রাচ্যের পরিচয়

অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌.এ

কিছুকাল হইতে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনায় আমরা "প্রাচ্য" ও "প্রতীচ্য" এই দুইটি কথা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। ভারতীয় সভ্যতাকে শুধুমাত্র "ভারতীয়" বলিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না, আমরা বলি ইহা প্রাচ্য সভ্যতা। মুখে মুখে কথাটি চলিয়া গিয়াছে, সব সময়ে ইহার সুনির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য বিচার করিয়া কথাটি ব্যবহার করি না। আমাদের শিক্ষিত সমাজে প্রাচ্য শব্দের এই যে ব্যাপক প্রচলন আমার মনে হয় ইহার রহস্য আলোচনার বিষয়। অনেক প্রশ্ন ইহার সহিত জড়িত আছে, সমস্ত প্রশ্নের সমাধান এখনও আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। আমি আজ যে আলোচনার অবতারণা করিতেছি তাহার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসার উদ্রেক, জ্ঞানের পরিবেশন নহে।

প্রাচ্য শব্দের প্রাচীনকালে যে ব্যঞ্জনাই থাক্ না কেন, আধুনিক কালে ইহা ইংরাজী "ওরিয়েন্টাল" (Oriental) শব্দের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিভিন্ন যুগে পশ্চিম বা ইউরোপের চক্ষে প্রাচ্য জগতের যে যে চিত্র প্রতিভাসিত হইয়াছে, "ওরিয়েন্টাল" কথাটির মধ্যে সেই সমস্ত বিচিত্র দ্যোতনা অনুস্যূত হইয়া আছে। পাশ্চাত্য ইউরোপ প্রাচ্য এশিয়ার পরিচয় পাইয়াছে খণ্ড খণ্ড ভাবে, আংশিক ভাবে। প্রথম হইতেই একটা সমগ্র সম্পূর্ণ পরিচয় লইয়া সেই পরিচয়ের প্রতীকস্বরূপ "ওরিয়েন্টাল" শব্দের সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং যুগে যুগে পরিচয় যত ব্যাপকতর ও ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল শব্দটির ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য্য ততই রূপান্তরিত হইতে থাকিল। হেরোডোটসের প্রাচ্য জগৎ, রোমক সাম্রাজ্যের প্রাচ্য জগৎ, ক্রুসেডারের প্রাচ্য জগৎ, মার্কোপোলোর প্রাচ্যজগৎ, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচ্য জগৎ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যজগৎ—এগুলি পরস্পর বিভিন্ন।—ইউরোপে যে সময় হইতে নিজের একটা বিশিষ্ট সত্তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতেই নিজ হইতে যাহা কিছু স্বতন্ত্র, যাহা কিছু বিষম প্রকৃতি, তাহার প্রতীক স্বরূপ "প্রাচ্য" সংজ্ঞাটি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। প্রতীচ্যের কল্পনায় প্রাচ্য হইল তাহার "not-self"—অর্থাৎ "যাহা আমি নই তাহাই প্রাচ্য।" এই যে "not-self" তাহার পরিচয় কালে কালে বদলাইয়া যাইয়াছে বটে, কিন্তু "East and West", "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য", এই dichotomy, এই মূলগত দ্বৈতবিভাগের আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যত্যয় দেখা যাইতেছে না। এক সময় ছিল যখন প্রাচ্যদেশ ছিল কতকগুলি বড় বড় যথেচ্ছচারী সম্রাটের লীলাভূমি। এশিয়ার পশ্চিমাংশই ছিল এই জগতের কেন্দ্র। প্রজা সাধারণ ছিল এই সকল নির্ম্মম ঐশ্বর্য্যদৃপ্ত রাজবর্গের অত্যাচার-নিপীড়িত ক্রীতদাস স্বরূপ। গ্রীশে যখন পৌররাষ্ট্র সমূহে গণতন্ত্রের যুগ চলিতেছে তখন প্রাচ্যের এই চিত্রই প্রতীচ্যচিত্তে প্রতিভাসিত হইয়াছিল। পরে যখন রোমক সাম্রাজ্যের গৌরব যুগ আসিল তখন রোমের ধনীসমাজের চক্ষে প্রাচ্যদেশ ছিল মণিমুক্তা ধনরত্ন গন্ধদ্রব্যাদি বিলাসসামগ্রীর আকর—ঐশ্বর্য্যবিলাসীর স্বর্গ। খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যদেশময় যে ধর্ম্মোন্মাদের স্রোত বহিয়া গেল, সেই ধর্ম্মপ্লাবনের যুগে প্রাচ্য হইল অধ্যাত্মসাধনের দেশ, যোগরহস্যের দেশ, সংসারবৈরাগ্যের দেশ। মুসলমান ধর্ম্মের উদ্দীপনায় যখন আরব ও তাতার আসিয়া দুই দিক হইতে ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় খৃষ্টান ইউরোপের প্রান্তদ্বয় বিধ্বস্ত করিল তখন প্রাচ্যদেশ হইল বর্ব্বর ধর্ম্মবিধ্বংসী এন্টি-খৃষ্টের (antichrist) দেশ,

খৃষ্টধর্মীর দেশ। ক্রুসেড্ যুদ্ধ উপলক্ষ্যে যখন প্রাচ্য প্রতীচ্যের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটিল তখন সে ছবি আবার বদলাইয়া গেল। প্রতীচ্য যাহাকে নিছক সয়তানের রাজ্য মনে করিয়াছিল সেখানে দেখিল এমন এক মার্জ্জিত সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, যাহা অনেক বিষয়ে তাহার তদানীন্তন সভ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠ। মার্কো পোলো যখন সুদূর চীন হইতে মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁয়ের গৌরবশ্রীমণ্ডিত রাজদরবারের সংবাদ লইয়া আসিলেন তখন প্রতীচ্যের চক্ষে প্রাচ্যের মর্য্যাদা আর একটু বাড়িয়া গেল। ভারতের মোগল সাম্রাজ্য, পারস্তের সাফাবিদীয় সাম্রাজ্য, ইহারাও এই চিত্রটি নূতন নূতন বর্ণে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। মোটের উপর যে ছবিটি ফুটিয়া উঠিল তাহাতে প্রাচ্যজগতের ভাবসম্পদ অপেক্ষা অপ্রতিহত রাজশক্তির মহিমা, মণিমাণিক্যের সমুজ্জ্বল দ্যুতি, শিল্পসম্ভারের ঐশ্বর্য্য, প্রাসাদ মন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া—এই দিকটাই ইউরোপের চক্ষে চমক লাগাইয়া দিল। যখন ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের আমলে স্যার উইলিয়ম জোন্স্ কলিকাতা সহরে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করিলেন তখন হইতে ইউরোপে প্রাচ্য পরিচয়ের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া গেল। সংস্কৃত ও পারসীক সাহিত্যের জ্ঞান ভাণ্ডার ও ভাবসম্পদ যখন ইউরোপের পণ্ডিত সমাজের নিকট উন্মুক্ত হইল তখন হইতে প্রাচ্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ ধারণার উদ্ভব হইল।

প্রথম ধারণা হইল প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে। পূর্ব্বদেশই জগতের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির জন্মভূমি, ইহার অতিবৃদ্ধ স্থবিরতার মধ্যে না জানি কত যুগের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার রহস্য সঞ্চিত হইয়া আছে, বার্দ্ধক্যের যে সম্মান, যে গৌরব তাহা ইহার পুরাপুরি প্রাপ্য! রোমান্টিক যুগের ভাবপ্রবণ চিত্তে প্রাচ্যের এই প্রাচীনত্ব অনেক ভাবুকতার সৃষ্টি করিয়াছে। মনস্বী এড্মণ্ড্ বার্ক্ যখন হেষ্টিংসের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছিলেন তখন তাঁহার উদ্দীপনার মূলে ছিল ভারতের প্রাচীনত্বের মর্য্যাদা।

এই প্রাচীনত্ব উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ধারণা জুটিল—সে হইল প্রাচ্যের স্থাবরতা। এশিয়ার দীর্ঘজীবনের যে কাহিনী ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে লাগিল তাহার মধ্যে নাকি জীবনের চঞ্চল গতি নাই; আছে কেবল পুরাবৃত্তের পুনরাবৃত্তি, গতানুগতিকের গড্ডালিকা প্রবাহ। কেহ বলিল এ মহাদেশের রক্তপ্রবাহ এত মন্থরগতি যে বহুকাল পূর্ব্বেই ইহা বার্দ্ধক্যের কবলে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যে অবসাদ ইহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে তাহা মৃত্যুরই পূর্ব্ব লক্ষণ। আবার অনেকে বলিলেন—"না, মৃত্যু বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়াছে, এখন যাহা দেখিতেছ তাহা "মমি" মাত্র। বিধাতার যে উদ্দেশ্য প্রাচ্যের উদ্ভব হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সাধন করিয়া সে বহুকাল পূর্ব্বেই জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। সে আসিয়াছিল ক্লাসিকাল সভ্যতার পথ প্রস্তুত করিতে। পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া সে রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া গিয়াছে। তাহার পরে আসিয়াছে ক্লাসিকাল, সেও রোমান্টিক সভ্যতার অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া চিরাবসর গ্রহণ করিয়াছে। জগতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্য ইতিহাসে ইহাদের আর কোন নিজস্ব স্থান নাই।"

প্রতীচ্য গতিশীল, যৌবনচঞ্চল, প্রাচ্য স্থবির ও স্থাবর। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যের আর একটা গুণ আবিষ্কৃত হইল। সে তত্ত্বান্বেষী, ধ্যানমগ্ন, সংসারবিমুখ, বহির্জ্জগৎ, বস্তুজগতের প্রতি সে একেবারেই উদাসীন। বৈভব ঐশ্বর্য্য, সমাজ, রাষ্ট্র, গ্রাসাচ্ছাদন, ঐহিক কল্যাণের বিচিত্র উপকরণ—এ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সে কৌপীনকন্থা সার করিয়াছে, পরোক্ষার্থসাধনেই আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই কথাই অন্যভাবে বলা হয় যে সে স্বপ্নবিলাসী, স্বপ্নের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

এইরূপে ঐতিহাসিক গবেষণার দূরবীক্ষণ সহযোগে সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া প্রাচ্য প্রকৃতির নানা বিশেষত্ব আবিষ্কৃত হইতে থাকিল। সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাণিজ্য বিস্তার ও শাসন বিস্তার সূত্রে বাস্তবপ্রাচ্যের সহিত সংস্পর্শ। ফলে যে চিত্র গুড়িয়া উঠিল তাহাতে নানা অসঙ্গতির একত্র সমাবেশ ঘটিল। এ চিত্রের মধ্যে যে রস অনুস্যূত তাহা অদ্ভুত রস। সাপ, বাঘ, ধুলা, কাদা, মরু, জঙ্গল, যোগী, উমেদার, আমীর, দরবেশ, ফুকি, মাহারাণি, কুলি, বাবু, চালাকুঁড়ে, তাজমহল, কাঁথা, কিংখাব, রং বেরঙের মানুষ—

সব শুদ্ধ লইয়া এ এক কিম্ভূত কিমাকার দেশ, এক হেঁয়ালীর রাজ্য। ইহার এক কথায় পরিচয় ইহা অপ্রতীচ্য, ইহা ইউরোপের "not I"—"আমি নই।" কিপ্লিং প্রমুখ রসশিল্পীগণ এই জগৎ অবলম্বন করিয়াই ইউরোপের রসিক-সমাজে exotic অদ্ভুত রসের চাটনী পরিবেশন করিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে সঙ্গে আসিল এক নূতন অভিজ্ঞতা। মৃত এশিয়ার শুষ্ক অস্থিপঞ্জরে কোথা হইতে যেন এক নূতন প্রাণের চঞ্চলতা আসিয়া পড়িল। "অসভ্য জাপান" রাতারাতি ঘুমের ঘোর ছাড়িয়া একেবারে ইউরোপের রাজচক্রের মধ্যস্থলে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া বসিল। চীন, পারস্য, আরব, আফগানিস্থান, এমন কি চিরনিদ্রিত ভারত সব যেন একযোগে চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল। একেবারে ভৌতিক কাণ্ড! ইউরোপের চিত্তে এক নূতন শঙ্কার উদ্ভব হইল—তাহার প্রথম নামকরণ হইল পীতাতঙ্ক (The yellow peril), পরে ব্যাপকভাবে তাহাকে বলা হইল—"The problem of the coloured Races" অর্থাৎ "রঙীন জাতির সমস্যা"।

এই হইল প্রতীচ্যের প্রাচ্য পরিচয়ের ইতিহাস। ইউরোপের পণ্ডিত ও মনস্বী সমাজে এমন অনেকেই আছেন যাঁহারা গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে প্রাচ্য জগতের নিবিড়তর পরিচয় লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমি এখানে ইউরোপের সাধারণ লোকচিত্তে প্রাচ্যের যে চিত্র মুদ্রিত হইয়া আছে তাহাই নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম।

এখন আমাদের চিত্তে প্রাচ্য জগৎ সম্বন্ধে কি ধারণা আছে তাহা একবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বে আমরা কখনও "প্রাচ্য" বলিয়া আত্মপরিচয় দিই নাই। ওকথাটি বর্ত্তমানকালে ইংরাজী "Oriental" শব্দের অনুবাদ মাত্র। ইংরাজ যখন আমাদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত করিলেন তখন আমরা শিষ্যোচিত শ্রদ্ধার সহিত চিত্তক্ষেত্র হইতে পূর্ব্ব সংস্কারের জঞ্জাল সরাইয়া ইউরোপের বিজ্ঞানসমুজ্জল জগচ্চিত্র আত্মসাৎ করিয়া লইলাম। ইউরোপ যে বস্তু যে ভাবে দেখিয়াছে, আমরাও সে বস্তু ঠিক সেই ভাবে দেখিতে শিখিলাম। ইউরোপের চক্ষে যাহা নিকট, যাহা সুস্পষ্ট, আমাদের চক্ষেও তাহা নিকট ও সুস্পষ্ট হইয়া গেল, ইউরোপের চক্ষে যাহা সুদূর ও অস্পষ্ট, ঘরের পাশে থাকিলেও আমাদের কাছে তাহা সুদূর ও বাষ্পাকার হইয়া গেল। আমরা প্রাচ্য-জগতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও তাহার পরিচয় শিখিয়া লইলাম শিক্ষাগুরু ইউরোপের কাছে। সুতরাং আদিকাল হইতে প্রতীচ্যচিত্তে প্রাচ্যের যে সকল বিভিন্ন খণ্ডচিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে সেগুলির একত্র কম্পোজিট ফটোগ্রাফ লইয়া গড়িয়া লইলাম আমাদের প্রাচ্য জগৎ। মানসিক প্রতিক্রিয়াও হইল একরূপ। প্রাচ্যজগৎ ইউরোপের মনে যে অদ্ভুত রস (bizarre, exotic) সৃষ্টি করে, আমাদের মনেও সেই রসই জাগাইয়া দিল। এই কিম্ভূতকিমাকার দেশের অধিবাসী বলিয়া আমরা লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলাম। আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ আসবাব, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, চিন্তা চেষ্টা সর্ব্ববিষয়ে প্রাচ্যত্বের বিলোপসাধনে যত্নবান্ হইলাম। ক্রমে ক্রমে নূতন দীক্ষার ভাবঘোর কাটিতে লাগিল। আমরা পাশ্চাত্য ওরিয়েন্টালিষ্ট পণ্ডিত-দিগের গ্রন্থপাঠ করিতে লাগিলাম। মেকলের পরিবর্ত্তে মাক্স্ মুলরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম। নূতন গুরু ও তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের গ্রন্থমধ্যে প্রাচ্যসভ্যতার বহু প্রশংসা পত্র পাওয়া গেল। চিরকাল মাথা হেঁট করিয়া থাকা যায় না। প্রশংসা পত্রগুলি সযত্নে মুখস্থ করিয়া লইয়া সভা সমিতিতে প্রাচ্যগৌরব প্রচার করিয়া বেড়াইলাম। আমরা প্রাচীন জাতি, স্থিতিই আমাদের আদর্শ, গতি নহে; আমরা জড়বিমুখ, আমরা তাত্ত্বিক; ঐহিক জীবনের উপকরণ আমরা উপেক্ষা করিয়াছি, পরমার্থই আমাদের একমাত্র অর্থ—ইত্যাদি বহু সান্ত্বনাবাক্যে আমরা আমাদের আধুনিক জীবনের জড়তা ও আলস্যের সুন্দর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাইয়া গেলাম। জাতীয় আত্মাভিমান এই ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সরকারী চাকরীর স্বচ্ছন্দ সহজ পন্থায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইলাম দগ্ধোদরস্বার্থে।

কিন্তু এক্ষেত্রেও অধিককাল দাঁড়ান গেল না। কে ঠেলিতেছে জানি না, কিন্তু একটা প্রবল শক্তি আমাদিগকে কেবলই আশ্রয়ভ্রষ্ট করিয়া দিতেছে। জীবনপ্রবাহের

চঞ্চল নদীর উর্ম্মিমালা আমরা ভয়ে ভয়ে যতই এড়াইয়া যাইতে চাই, কে যেন আমাদিকে ঠেলিয়া দিতেছে সেই আবর্ত্তের মধ্যে। কে যেন বলিতেছে—"সাঁতার তোমাকে দিতেই হইবে, কারণ সাঁতার দেওয়াই প্রাণের ধর্ম্ম।" এ অবস্থায় আত্মপরিচয়ের এক নূতন ধারার উদ্ভব হইল। এ ধারা ঐতিহাসিক গবেষণার খনিত্রমুখে উৎসারিত হয় নাই, নব জাগ্রত প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশাবেগের চাঞ্চল্যে ইহার জন্ম। প্রাচ্য আজ ডাকিয়া বলিতে চায়—"আমি মরি নাই, আমি আছি। আমার নিজস্ব পরিচয় আমার অন্তরের মধ্যেই আছে; আমি চলিতে আরম্ভ করিলে আমার চরণপাতের ভঙ্গীতেই আমার সে পরিচয় জগতের মাঝে প্রকট হইয়া উঠিবে। আমি প্রাচীন, আমি মৃত? আমি যখন ঘুমে অচেতন ছিলাম তখন আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম আমি প্রাচীন, আমি মরিয়াছি। আজ আমি অন্তরে যখন প্রাণের আবেগ অনুভব করিতেছি তখন আমি কেমন করিয়া বলিব আমি প্রাচীন, আমি মহাস্থবির? ইতিহাস বলিতেছে আমি স্থাবর? সে কোন্ ইতিহাস? ইতিহাস কি একটা স্থাণু, অতীতের কোন্ এক প্রচ্ছন্ন গহ্বরে পাথরের মত জমাট বাঁধিয়া বসিয়া আছে, খুঁড়িয়া তুলিলেই সাক্ষ্য দিবে? ইতিহাস ত মনের সৃষ্টি; প্রত্নতত্ত্ব দেয় মাল মশলা, জড় উপাদান; ঐতিহাসিকের মন দেয় তাহাকে গঠন ও গতি। যখন আমি জড় হইয়া পড়িয়াছিলাম, অলস হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন আমি ভাবিয়াছিলাম বটে আমি স্থাবর, অচঞ্চল। কিন্তু আজ যে চাঞ্চল্যের বেগ অন্তরে অনুভব করিতেছি, আমার অতীতের মধ্যে সেই প্রাণশক্তিরই ত অজস্র লীলা দেখিতেছি। আমি বিষয় বিমুখ, আমি তত্ত্বান্বেষী? আমি ঐশ্বর্য্যবিলাসী, আমি ভোগ পরায়ণ? আমি বিধ্বংসী? আমি শান্তিনিষ্ঠ? আমি সমস্তই, আমি বহুরূপী—যেহেতু আমি প্রাণবান্।"

প্রাচীর অন্তরের আজ এই যে উচ্ছ্বাস ইহা কি আমরা অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভব করিতেছি না? অনুভব নিশ্চয় করিতেছি কিন্তু সে অনুভূতি এখনও একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে নাই। এশিয়ার প্রত্যেক দেশেই আজ এ অনুভূতির সাড়া পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু খণ্ড খণ্ড ভাবে। আমরা এদেশে যখন প্রাচ্য শব্দ উচ্চারণ করি তখন মুখ্যতঃ ভাবি ভারতবর্ষের কথা, তাহার চতুষ্পার্শ্বে থাকে অন্যান্য প্রাচ্য দেশের অস্পষ্ট খণ্ড পরিচয়ের একটা বাষ্পমণ্ডল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের প্রাচ্য-জগৎ কল্পনা এতদিন ইউরোপের প্রাচ্যকল্পনার প্রতিচ্ছায়া মাত্র ছিল। সে ছিল শুদ্ধ মাত্র জ্ঞানের বিষয়, সে কল্পনার সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল সামান্যই। কিন্তু আজকাল যেন "প্রাচ্য" শব্দের সঙ্গে একটা হৃদয়ের রং লাগিয়াছে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানী মনীষী ওকাকুরা যখন তাঁহার "Ideals of the East" গ্রন্থে চীন ও জাপান শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "Asia the great mother is one"—"মহিমাময়ী এশিয়া জননী এক"—তখন সে কথা আমাদের হৃদয়ে একটা অভূতপূর্ব্ব ঝঙ্কার দিয়াছিল। এশিয়াবাসীর মুখে "প্রাচ্য" শব্দের এই যে উচ্চারণ শুনিলাম ইহা যেন একটা বহুকালবিস্মৃত ভাবের নূতন উদ্বোধন বলিয়া মনে হইল। ইহা যে একটা কল্পনা প্রসূত ভাবুকতামাত্র তাহা আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না।

আমার মনে হয় আমরা যে আজ শুধু ভারতীয় বলিয়া আত্মপরিচয় না দিয়া প্রাচ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছি, তাহার পিছনে একটা যথার্থ প্রেরণা আছে। ইউরোপের যে সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষা আজ আমাদিকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, যাহার চাপে আমরা চিন্তায় ভাবে কর্ম্মে ব্যবহারে স্বচ্ছন্দভাবে আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিতেছি, তাহার সামনে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার জন্য আমরা শক্তি চাহিতেছি। বলবৃদ্ধি হয় আত্মীয় সহযোগে। আমাদের আত্মীয় কাহারা? ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আমরা শিখিয়াছিলাম আমরা ইণ্ডো-এরিয়ান্ জাতির অন্তর্ভুক্ত, পারসিক ও ভারতের আর্য্যভাষাভাষীগণ ইউরোপীয় জাতিসমূহের দূর জ্ঞাতি। সে জ্ঞাতিত্বের মূল প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন সুদূর কন্দরে নিহিত তাহা বৈজ্ঞানিক তর্কের বিষয়। ঐতিহাসিক যুগে সে আত্মীয়তার কোন চর্চ্চা হয় নাই। বিজ্ঞান কার্য্যকারণ সম্পর্কের দূরব্যাপী শৃঙ্খল গড়িয়া

তুলিতে পারে বটে কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক ঘটাইতে পারে বলিয়া শুনা যায় নাই। কিন্তু এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে নানাবিধ সম্পর্কের যে আদান প্রদান হইয়াছিল ও হইতেছে তাহা ঐতিহাসিক যুগের মধ্যেই। সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়া এখনও প্রাচীনভারত সাধনার অংশভাক্। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই যে ভাবের কারবার চলিয়াছিল তাহার কি কোন প্রভাব নাই? শক হইতে মোগল পর্য্যন্ত মধ্য ভারতের যাযাবর জাতিসমূহ এশিয়ার ইতিহাসে যে লীলা করিয়াছে তাহা কি কেবলই ধ্বংসলীলার তাণ্ডব নৃত্য? পারসীক সাহিত্য কি সমগ্র মুসলমান জগতে প্রাচ্য সাধনার এক সুন্দর ভাবসমৃদ্ধ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে নাই? নানাদিক দিয়া প্রাচ্যজগতের বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে ভাবের কারবার চলিয়াছিল, ভাবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গুণে দূর হইয়াছে নিকট, নিকট হইয়াছে দূর। প্রাচীন গ্রীশের সাহিত্য সভ্যতা ইতিহাস আমাদের নখদর্পণে, কিন্তু চীন বা পারস্যের কথা তুলিলেই আমরা অসহায় হইয়া পড়ি, মনে হয় যেন সৌরজগতের প্রান্তবর্ত্তী কোন্ সুদূর গ্রহ উপগ্রহের কথা হইতেছে। যে নূতন ভাবের উদ্বোধনের কথা বলিতেছিলাম তাহা তখনই যথার্থ শক্তির উৎস হইবে যখন এই আত্মীয় পরিচয় সম্পূর্ণতা লাভ করিবে, যখন এশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার ইতিহাস প্রত্যেক প্রাচ্য দেশবাসীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। এ ইতিহাসের মাল মশলা এতদিন দুরধিগম্য ছিল। কিন্তু এখন আর সে কথা বলা চলে না। প্রধানতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের চেষ্টাতেই সে ইতিহাস ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। কিন্তু জন কএক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত সাধারণ শিক্ষিত সমাজে এ ইতিহাস কেহ চর্চা করে না। চর্চা করিলে শুধু যে প্রাচ্য জগতের পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহা নহে, মানবজাতির ইতিহাসে প্রাচ্য মহাদেশ যে কি স্থান অধিকার করে তার একটা যথাযোগ্য ধারণা করা সম্ভব হইবে।

প্রাচ্যের পরিচয় দান করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগুলির মধ্যে এ পরিচয় জানিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে পারিলেই আমার প্রবন্ধ সার্থক হইয়াছে মনে করিব। আমি যে আকাঙ্ক্ষার কথা বলিতেছি তাহা শুদ্ধমাত্র জ্ঞানপিপাসা নহে; সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যেমন আত্মীয়সমাজের পরিচয় লইতে চায়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় যুক্ত করিবার জন্য, আশা, স্মৃতি, আদর্শ ও কল্পনার আদান প্রদানের জন্য, জগৎ সমাজের কাছে নিঃসঙ্কোচে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইবার জন্য, সেই মনোভাব লইয়া, শ্রদ্ধার সহিত, প্রীতির সহিত, আজ যদি আমরা প্রাচ্য সাধনার মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইতে পারি তাহা হইলে জাতীয়সাধনার, ভারতীসাধনার, বঙ্গবাণীসাধনার ক্ষেত্রে আমরা যে অভিনব সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইব তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

ব্যর্থ

"জোনাকী"

মরণের আগে প্রার্থনা রেখো, প্রিয়,
একদিন, শুধু একদিন মোরে
কঠিন বাঁধনে বেঁধে নিয়ো।

একদিন শুধু পুরায়ো মনের বাসনা,
নয়নে নয়ন মিলায়ে নীরব ভাষণা,
কম্প্র অধরে সাধিয়া সাদরে
একটু অমিয় রমণীয়।

যুগযুগান্তে নব নব রূপে
আসিয়াছ মোর সাধনে,
পড়িয়াছ বাঁধা এই ক্ষীণ বাহু বাঁধনে।

চিরজনমের পিয়াসী দুজন
চাপিয়া গিয়াছি মরম কূজন,
এসেছে বাসর, হয়নি পূজন
মনের কুসুমে কমনীয়॥

ফিরিয়া গিয়াছে ব্যর্থ রজনী
কাঁদিয়া গিয়াছে পাপিয়া।
বৃথাই অলস জাগর যামিনী যাপিয়া।

তোমার আমার মিছা দেখাদেখি
দিঠিতে দিঠিতে চিঠি লেখালেখি,
পুলকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

কাটিয়াছে বেলা অকাজে
আলসে অবশে সলাজে।
পূজার লগন হয়েছে মগন অতীতে,
প্রসাদ লভেনি এ চিত পরমারতিতে।
দোঁহে এক হয়ে সম সুরে লয়ে
গাহি নাই স্তুতি-গীতিকা,
রচি নাই দোঁহে পূজার অর্ঘ্যবীথিকা।

সকল সাধনে চিরআরাধনে
হেরি নাই চির বরণীয়,
জীবনে মরণে সুচির স্মরণে শরণীয়॥

নাটকের ক্ষেত্র

অধ্যাপক শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম-এ

অনেকে দুঃখ করিয়া থাকেন যে বাঙলায় ভাল নাটক নাই, নাটকের যথার্থ পরিপুষ্টি এখনও এখানে হয় নাই। অবশ্য নাটক লেখা হইয়াছে অনেক কিন্তু তার মধ্যে কতগুলি স্থায়ী হইবার যোগ্য সে সম্বন্ধে তাঁহাদের ঘোর সন্দেহ আছে। বাঙলার গন্থ-সাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বিশ্ব-সাহিত্য আসরে আজ তাহার স্থানও হইয়াছে। ভাষার মাধুর্য্যে, গভীরতা ও প্রাণস্পর্শিতায়, লালিত্যে ও ভাবের বৈচিত্র্যে আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে ইহাকে লজ্জায় বা দীনতায় মাথা হেঁট করিতে হয় না, বরং অনেকে বলেন তাহার বুক ফুলাইয়া চলিবারও ক্ষমতা হইয়াছে। বাঙলার উপন্যাসও কয়েকজন মনিষীর হস্তে বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। মারাঠী প্রভৃতি অন্য সাহিত্যের তুলনায় বাঙলায় অন্যান্য গন্থ-সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী না হইলেও ভাব ও বৈচিত্র্যের দিক হইতে দেখিলে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার বিশেষ কারণ নাই। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে এ যাবৎ আমরা এমন কিছুই করিতে পারি নাই যাহার জন্য মনে আশা, হর্ষ বা গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি। রাজপথের দুইধারে প্রাচীর গাত্রে যতই রং বে-রংএর বিজ্ঞাপন টানাই না কেন, বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চ হইতে বিজয়-বৈজয়ন্তী যতই উড়াই না কেন, মহাকবি আখ্যায়িকা প্রদান, মর্ম্মরমূর্ত্তি পূজন প্রভৃতি দ্বারা নিজেদের দৈন্য ঢাকিবার যতই চেষ্টা করি না কেন, যখন নির্জ্জনে নাটক সম্বন্ধে চিন্তা করি, তখন মনে হয় নাটকের ক্ষেত্রে আমরা এমন কিছু করিতে পারি নাই যাহা স্থায়ী হইবার যোগ্য বা যাহার জন্য আমরা গৌরব অনুভব করিতে পারি।

দেশ প্রেমিকের কাছে এ কথাগুলি হয়ত অত্যন্ত অবাস্তব বা রূঢ় মনে হইবে, স্বদেশ প্রীতির দিনে এই অমানুষিক দেশ-দ্রোহী বক্তব্যের জন্য দু একবার অর্দ্ধচন্দ্র পাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু সত্যের অপলোপ করা লাভজনক হইলেও নীতিসঙ্গত হইবে না। দেশ-প্রেমের মাপকাটি দিয়া সাহিত্য বিচার করিতে যাইলে পরিণামে অশুভ ছাড়া শুভ হয় না। কাজে কাজেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক নাটকের ক্ষেত্রে বাঙলার দৈন্য প্রকাশ করা ভিন্ন উপায় নাই।

কিন্তু ইহার কারণ কি? যে দেশে নাটকের একটা ধারা রহিয়াছে, যে দেশের নাট্যশাস্ত্রের মধ্য দিয়া আলঙ্কারিকগণ মুক্তহস্তে বিভিন্ন রসের বিতরণ ও পরিবেশন করিয়াছেন সে দেশে বর্ত্তমান যুগে নাটকের দৈন্যের কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতে হইলে প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে যে সব দেশে ও যে সব সময়ে নাটকের যথার্থ অভ্যুত্থান ও পরিপুষ্টি হইয়াছিল তাহার খবর রাখা একটু প্রয়োজন।

সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টির মূলে এক প্রবল ইচ্ছা বা আবেগ বিদ্যমান। নানা প্রকারে, নানা রকমে এ শক্তির পরিচয় পাই। উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষা, বিরহ, অতৃপ্তি, আনন্দ প্রভৃতি নানা আকার ধারণ করিয়া এই শক্তি মনরাজ্য আলোড়িত করে। মনের ইতিহাস যতই জটিল ও রহস্যপূর্ণ হউক না কেন, রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধভরা এ ধরণীর সঙ্গে তাঁর এক নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। বাহ্যজগতের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে মনের মধ্যে সেই নিদ্রিত শক্তি নানা রঙে, নানা রূপে জাগরূক হয়। আমাদের এখন দেখিতে হইবে যে, এ ইচ্ছাশক্তি নাটক-সৃষ্টির মূলে নিহিত রহিয়াছে তাহা কোন পরিবেশের মধ্যে উদয় হয়।

এই পরিচয়ের ফলে দেখিতে পাইব যে বিভিন্ন দেশের নাটকের মধ্যে বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বে তাহারা যে পরিবেষ্টনের মধ্যে উঠিয়াছে তাহার মধ্যে সাদৃশ্য আছে—তাহারা অনেকটা এক প্রকার।

ইহা করিতে হইলে বিভিন্ন দেশের নাটকের সঙ্গে একটু পরিচয় আবশ্যক। প্রথম প্রতীচ্যের কথা লওয়া যাউক। প্রতীচ্যে বা ইউরোপ খণ্ডে নাটক দুই আকার গ্রহণ করিয়াছে—রোমান্টিক এবং ক্লাসিকাল্। দেশের সাময়িক অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের পার্থক্যের জন্য এই দুই শ্রেণী নাটকের মধ্যেও আবার অনেক বিভিন্নতা আসিয়া পড়িয়াছে। সকল প্রকার ক্লাসিকাল্ নাটক যে একই ভাবে প্রণোদিত তাহা নয়, এবং সকল দেশেরই রোমান্টিক নাটক যে একই মন্ত্র পুনরাবৃত্তি করিয়াছে তাহাও নয়। গ্রীস দেশের Aeschylus ও Sophocles হইতে যে নাটক-ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা একই ভাবে Alferi বা Racine যাইয়া মিশিয়াছে, এ কথা বলা চলে না। নদীর মত কালভেদে, দেশভেদে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু পুরাণোর সহিত তার মোটামুটি সম্বন্ধ কখনই বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তেমনি ইংলণ্ডে যে রোমান্টিক নাটকের জন্ম হইয়াছিল তাহা স্পেন্ ও জার্ম্মাণীতে ঠিক একই ভাবে দেখা দেয় নাই। সাহিত্য বিশেষতঃ নাটক, জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, অতএব জাতীয় জীবনের পার্থক্যতার সহিত নাটকের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে এইরূপ ছোটখাটো বিভিন্নতা থাকিলেও মোটামুটি ক্লাসিক এবং রোমান্টিক নাটকের মধ্যে, বাহ্যিক বিভিন্নতা ছাড়া, চরিত্রগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করা অসম্ভব নয়। দুটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ক্লাসিক্ নাটকে বস্তু বা গল্লাংশ সর্ব্বপ্রধান, রোমান্টিক নাটকে চরিত্রের বিকাশই মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র তাহার কাছে এতই বড় জিনিষ যে অনেক সময় বস্তুকে খর্ব্ব করিয়া, বাধা দিয়া, চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য স্বাগতোক্তির বা (soliloquy) অবতারণা করা হয়। কিন্তু নাটকের এদিকে বেশী ঝোঁক নাই। ঝোঁক না থাকিবার কতকগুলি কারণও ছিল। যেখানে মানব জীবন অদৃষ্টের নিবিড় জালে বেষ্টিত, এক বিশাল দৈবের ছায়ায় প্রোথিত, যেখানে কর্ম্মের অনুপাতে ফলভোগ হইত না, সেখানে চরিত্রের বিকাশের সুযোগ কোথায়? ইহা ছাড়া নাটকে চরিত্র-উন্মেষের পথে আরও দু একটী ছোট অন্তরায় ছিল।

গ্রীস দেশে মুখোস পরিয়া অভিনয় করিত, নীলাকাশের চন্দ্রাতপ তলে বিশ ত্রিশ হাজার লোকের সম্মুখে সে অভিনয় হইত। মুখের ভাব ভঙ্গীর দ্বারা নাটকে অন্তর্জগতের রহস্য প্রস্ফুটিত হয়, চরিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; কিন্তু যেখানে মুখ মুখোসে ঢাকা সেখানে চরিত্রের উন্মেষের ইঙ্গিত কোথায় পাওয়া যাইবে? দ্বিতীয়তঃ বিশ ত্রিশ হাজার লোকের সম্মুখে চিৎকার করা বড় সহজ ব্যাপার নয়; অত উচ্চস্বরে কথা কহিয়া মনের সূক্ষ্ম গভীরতম ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চরিত্রের দিকে ঝোঁক না থাকিবার আর একটী কারণ গ্রীক নাটকের unity of time। গ্রীক নাটকের নিয়ম হইতেছে ২৪ ঘণ্টার অধিক ঘটনার বিস্তার হইবে না। মানব-চরিত্রের বিকাশ চব্বিশ ঘণ্টায় বোধ হয় না, বোধ হয় চব্বিশ বৎসরের নয়—তাহা সময়-সাপেক্ষ। এই সব এবং অন্যান্য কারণে ক্লাসিকাল্ নাটক বস্তু-প্রধান।

নাটকের মূলমন্ত্র মানবজীবনের সহিত নির্ম্মম অদৃষ্টের পরিহাস। এই বিপুল বিশ্বে একটী অজানা, কঠোর চিরন্তন নিয়ম বিরাজ করিতেছে। এই শক্তি মানুষের নাগালের বাহিরে। কখনও তাহা বাহিরেই থাকে, বজ্রাঘাতের মত হঠাৎ মাথায় আসিয়া পড়ে আবার কখনও বা মানুষের প্রবৃত্তি বা কর্ম্মের সহিত জড়িত হইয়া যায়। Aeschylus এ আমরা এ শক্তির প্রথম প্রকারের আবির্ভাব দেখি, Sophocles এবং Ervipides এ ইহা দ্বিতীয়রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু এশক্তি বাহিরেই থাক বা ভিতরেই থাক, তাহার কাছে মানুষের মাথা হেঁট করা ভিন্ন উপায় নাই। ইহার বিরুদ্ধে অভিযান করার অর্থ নিশ্চিত অনর্থকে আহ্বান করা। মানুষকে ইহা মানিয়াই লইতে হইবে, ইহার সম্মুখে মাথা নত করিতেই হইবে, লড়াই করা বৃথা। তবে যাঁহারা ধীর, স্থিতধী তাঁহারা আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, স্থির চিত্তে ইহার নির্ম্মম শাসন গ্রহণ করেন, আর জন সাধারণ ইহার কাছে চাঞ্চল্য বা ক্লৈব্য প্রকাশ করে, ভীরুর মত আচরণ করে। এই কঠোর অনুশাসন ধীর ভাবে সহ্য করিবার যাঁর যত ক্ষমতা আছে তিনি তত বড় বীর। এই হইতেছে গ্রীক নাটকের ভিতরকার কথা। এইজন্য যে দেশে এই শ্রেণীর নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই দেশেই Stoic Philosophy র প্রচলন ছিল।

ইউরোপখণ্ডে এই শ্রেণীর নাটকের আদিম জন্মভূমি গ্রীস। সাহিত্য যদি জাতীয় জীবনের মুকুর হয় তবে হয়ত গ্রীক নাটক পড়িয়া অনেকে মনে করিবেন প্রাচীন গ্রীকেরা ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিল, তাহাদের মধ্যে পুরুষাকারের চিহ্ন ছিল না। ইতিহাসে কিন্তু সে কথা বলে না। যদি পুরুষাকারের অভাব থাকিত তবে কি করিয়া তাহারা এত বড় বড় যুদ্ধ করিল, কি করিয়া সুন্দর রাষ্ট্র-তন্ত্র গঠন করিল, কি করিয়া এত বড় cultureএর অধিকারী হইল? তাহাদের জীবনে ও নাটকে তাহা হইলে সামঞ্জস্য কোথায়? কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা যাক। গ্রীস সাগর-মেখলা পর্ব্বতময় একটু ছোট দেশ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ক্ষুদ্রতার মধ্যে গ্রীকের জন্ম ও কর্ম্ম। সসীম লইয়া তাহার কারবার। এবং সীমার মধ্যে তাহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, হস্ত সিদ্ধ, শক্তি বা পুরুষাকার অব্যাহত। জাতীয়-জীবনের স্ফূর্ত্তি এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে যতদূর সম্ভব, হইয়াছিল। মানুষের জীবন লইয়া, ইন্দ্রিয়-জগত লইয়া তাহারা প্রধানতঃ ব্যস্ত। এই সঙ্কীর্ণতা তাহাদের এতই মজ্জাগত, যে তাহাদের দেব দেবীও মানুষের আকারে কল্পিত, তাঁহাদের স্থান সুদূর অনন্ত আকাশে নয়, Olympic পর্ব্বতের বেশী উর্দ্ধে তাহারা উঠিতে পারেন নাই। এই সসীমের ভাব গ্রীকের ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যে বিদ্যমান। কিন্তু সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তাহারা তাহাদের চিন্তাস্রোত বদ্ধ রাখিতে পারে নাই। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে ও জাতীয় জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা তাহাদের গণ্ডির বাহিরে টানিয়া আনিয়া অজানার দিকে মুখ ফিরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সে আদিম রহস্যের দিকে তাহারা ভয়ে ভয়ে চাহিয়াছে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের চক্ষে দেখে নাই। এই অজানার ভয়ের জন্য তাহারা প্রতিপদে উহাকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছে, উহার কাছে নত হইয়াছে। পাখি উড়াইয়া, পাখি কাটিয়া গ্রহনক্ষত্রের গতি দেখিয়া, oracle বা দৈববাণী শুনিয়া দেবদেবীদের আহুতি দিয়া, অজানাকে তুষ্ট করিয়াছে।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরে অন্য এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ্য যে সাহিত্য, সে সাহিত্যের, সে নাটকের পরিসর যতই অল্প হউক না কেন, গ্রীকবাসীর মনের মধ্যে যে অসীমের ত্রাস ছিল তাহার ছায়া তাহাতে ফেলিয়াছে। সীমার বাহিরে এই যে অজানা অনন্ত রহস্যময় এক অসীম রাজ্য রহিয়াছে, তার কাছে গ্রীক বড়ই ভীত। তাই মৃত্যু তাহার কাছে এত বেশী ভয়ের জিনিষ, তাই সেই অসীমের কাছে তাহার মাথা স্বতঃই নোয়াইয়া পড়িত। সীমার মধ্যে পুরুষাকার যথেষ্ট থাকিলেও অসীমের কাছে সে অসহায়, তার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা ছিলনা, বড় জোর করিতে একটা আস্ফালন—একটা heroic gesture.

যে নাটকের এই মূলসূত্র তাহার জন্মস্থান এথেন্স এবং জন্মকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী। Aeschylus, Sophocles এবং Euripedes এ তিন মহাকবি একই সময় বর্ত্তমান ছিলেন এবং একই শতাব্দীর মধ্যে ইঁহাদের দেহাবসান হয়। যে সময় গ্রীক নাটকের অভ্যুত্থান হয় তখন এথেন্সের কি অবস্থা ছিল তাহা জানা আবশ্যক। ইহাদের জন্মের কিছু পূর্ব্বে হইতেই ঐ দেশ ভূমধ্যসাগরের কূলে এবং এশিয়া মাইনরের চারিদিকে নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপনে ব্যস্ত। ফলে Italy, Sicily, Spain, Gaul, Africa এবং Asia minorএ ইঁহাদের উপনিবেশ স্থাপিত হইল। বিভিন্ন জাতির সহিত, বিভিন্ন সভ্যতার সহিত আদান-প্রদান হইতে লাগিল এবং এই সংঘর্ষের ফলে জাতীয় জীবনের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া বিকাশ ও পরিপুষ্টি লাভ হইল। কিন্তু গৃহকোণে তখনও শান্তি ও সুশৃঙ্খলা ছিল না বলিয়া ইহার পূর্ণফল পাওয়া গেল না। পরে যখন বহুদিন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতা ভোগের পর, Solon এর সুশাসন দেশকে গণতন্ত্র ও উন্নতি পথে লইয়া গেল, তখন হইতে নব জীবনের সূচনা আরম্ভ হইল। Solonএর পর Pesistratus প্রভৃতি মনিষীগণ দেশের অবস্থা আরও উন্নত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে এমন এক ঘটনা ঘটিল যাহা সমগ্র জাতীয় জীবনকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। মিড্‌দিগকে পরাজিত করিয়া পারস্য এশিয়াখণ্ডে এক প্রবল শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যৌবনগর্ব্বে দীপ্ত পারস্য জাতি দিগ্বিজয়ে মন দিল। ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় বাধা বন্ধহীন হইয়া তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের উপর যাইয়া পড়িতে লাগিল। মহাপরাক্রান্ত পারস্য সম্রাট সায়রসের সার্ডিস

নামে একটী রাজধানী ছিল। Athens এর সাহায্যে Asia minorএ গ্রীকউপনিবেশিকগণ এই রাজধানী পুড়াইয়া দিল। সম্রাটের রাগ পড়িল গ্রীসের উপর। গ্রীস জয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি বিপুল সেনানী লইয়া গ্রীস আক্রমণ করিলেন। বিভিন্ন গ্রীক জাতি এই আসন্ন বিপদের সম্মুখে জীবন মরণের মোহনায় এক হইয়া দাঁড়াইল। জাতীয় একতা সর্ব্ব প্রথম নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিল। সাপে বর হইল। ফল হইল Maratha যুদ্ধে অজেয় পারস্ত সৈন্তের পরাজয়। অসম্ভব সম্ভব হইল। যুদ্ধ জয় করিয়া গ্রীক জাতীয় গৌরব ও স্পর্দ্ধা শতগুণ বাড়িয়া গেল, তাহারা এক নূতন জীবনের সাড়া পাইল। এক বিরাট দেশাত্মবোধ জাতীকে মাতাইয়া তুলিল। কিছুকাল পরে যখন দায়রবুসের পুত্র খসরার্ব (Xerxes) পুনরায় গ্রীস আক্রমণ করিল তখন Thermopylaeর গিরিসঙ্কটে আবার এক অপূর্ব্ব ত্যাগের ও বীরত্বের অভিনয় হইল। গ্রীক হারিল, এথেন্স পুড়িল, সত্য, কিন্তু এ ভস্মাবশেষ হইতে নূতন এথেন্স অল্প-কালের মধ্যেই গড়িয়া উঠিল। অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় কলুষতা দূর করিয়া পবিত্র জীবন পাইল এবং এই এথেন্স হইল Confederacy of Delosএ একচ্ছত্র, সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইহার ফলে Athensএর এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য পাইবার সুযোগ ঘটিল। Athensকে গ্রীসের সাম্রাজ্ঞী করিবার যে মধুর স্বপ্ন Pericles একদিন দেখিয়া-ছিলেন, তাহা এতদিনে সত্যে পরিণত হইল। যখন নানা বিভিন্ন জাতির সহিত সংঘর্ষের ফলে জাতীয় জীবন প্রসারিত হইয়াছে, দেশময় প্রবল কর্ম্মবৃত্তি দেখা দিয়াছে, ক্ষুদ্র গ্রীস অজেয় পারস্ত সম্রাটের সহিত শক্তি পরীক্ষায় জগতের চক্ষে গৌরব-মণ্ডিত হইয়াছে, সমগ্র গ্রীস-ব্যাপী এক বিরাট দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে দেখা দিল গ্রীক নাটক। তৎকালীন গ্রীসবাসীর অন্তরে দেশ প্রেমের কি বহ্নিশিখা জলিতেছিল তাহা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যায় Aeschylusএর Persae নাটকখানি পড়িলে। কিন্তু জাতীয় উদ্দীপনার সহিত, কর্ম্মবৃত্তির সহিত রাষ্ট্রীয় গৌরবের দিনে যে নাটকের উত্থান, জাতীয় জীবনের অবসাদের সহিত তাহার হইল পতন। Peleponesus এর যুদ্ধে Athens এর নির্য্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে এ গৌরব-সূর্য্য চির-দিনের জন্য অস্তমিত হইল।

ইহার আড়াইশ বৎসরের মধ্যেই গ্রীসের স্বাধীনতার অবসান হইল। রোম গ্রীস জয় করিল, কিন্তু গ্রীসের সভ্যতাও সাহিত্যের নিকট পরাভব মানিল। Carthage প্রভৃতি জাতির সহিত সংঘর্ষে রোমের জাতীয় জীবন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, বাণিজ্যের দ্বারা ধনভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে, দেশাত্মবোধ সর্ব্বত্র বিরাজমান, শৌর্য্য ও বীর্য্যে অজেয় রোম জাতীয় গর্ব্বে স্ফীত। এই সুযোগে নাটক আসিল। কিন্তু গ্রীক-সাহিত্যে মুগ্ধ রোম নিজেদের প্রতিভার অনুকূল পথ না তৈয়ারি করিয়া অনুকরণে মন দিল। Quintus Ennius Lucis Accins প্রভৃতি নাট্যকারগণ হুবহু গ্রীক নাটক অনুকরণ করিতে লাগিলেন। জাতীয় প্রতিভা সহজ ধারায় বহিতে না পারিয়া বদ্ধজলায় পরিণত হইল। পৌরুষের প্রতীক মূর্ত্তি রোম অদৃষ্টবাদী গ্রীক নাটকের আবর্ত্তে পড়িয়া নিজেকে হারাইলেন। যে নাটক উদ্ভব হইল তাহা বাহিরের জিনিষ হইয়া রহিল, জাতীয় জীবনের সহিত তার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল না। সে কালের চীনা রমণীর লৌহ পাদুকায় আবদ্ধ পদ যুগলের মত তাহা চিরকাল বিকৃত ও খর্ব্ব হইয়া রহিল। ফলে যখন Augustan age-এ Senecca আসিলেন, তাঁহার প্রতিভা সত্ত্বেও নাটককে নিজ পথে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। তিনি Euripedes কে অনুকরণ করিয়া বদ্ধ আসরে খানিকটা সজীবতা আনিলেন সত্য কিন্তু ফল বিশেষ হইল না।

যে নাটক লিখিলেন তাহা না হইল গ্রীক, না হইল রোমান। অথচ পরবর্ত্তী যুগে রুচি-বিকারের দিনে এই নাটকই হইল ইউরোপবাসীর আদর্শ।

গ্রীস মরিয়াছে, রোম বর্ব্বরের হাতে ধ্বংস পাইয়াছে। ইউরোপের মন হইতে গ্রীস ও রোমের সাহিত্য ও সভ্যতা অপসারিত হইয়াছে; এক নূতন ধর্ম্ম, নূতন রাষ্ট্রনীতি সেখানে বিরাজ করিতেছে, সর্ব্বত্র mediaeval church এবং Feudalismএর জয় গানে মুখরিত। কিন্তু চিরদিন সমান

যায় না; ক্রমে ক্রমে সে ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি প্রাণহীন হইয়া পড়িল। পনর শত বৎসরের পর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের পর আবার বিস্মৃত classic সাহিত্যের দিকে ইউরোপ-বাসীর নজর পড়িল। এক নূতন জগত আসিয়া লোকচক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইল; তখন যাহা কিছু পুরাণো তাহাই হইল ভাল, তাহাই সুন্দর বলিয়া ইউরোপ আকণ্ঠ পান করিল; গ্রীক লাটিনের পার্থক্য বুঝিল না, যাহা কাছে পাইল তাহাই গ্রহণ করিল। এক রকম আধা-ক্লাসিকালের বন্যা ইউরোপে প্রবাহিত হইল। মূল গ্রীক সাহিত্যে ফিরিয়া যাইবার ধৈর্য্য রহিল না। উদ্‌গ্রীব হইয়া গ্রীকের অনুকরণে লিখিত লাটিন সাহিত্যই হইল সে যুগের আদর্শ। গুরু হইলেন Senecca এবং প্রথম পথপ্রদর্শক হইল ইতালি।

ফরাসী দেশেই এ ঢেউ খুব চলিল এবং এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে যাহা কিছু তাহাদের নিজের ছিল তাহাও ভাসিয়া গেল। ফরাসী-জাতি একবারে এই নূতন ক্লাসি-কালের নেশায় মত্ত হইলেন। কাজে কাজেই যখন নাটক লিখিবার সময় আসিল তখন নিজেদের সহজ স্বাভাবিক পথ না ধরিয়া দেশ এই অনুকরণের মধ্যে আত্ম প্রকাশ করিল। ফরাসী চরিত্রে অবশ্য এমন কিছু ছিল যাহা গ্রীকদের সঙ্গে মিল খায়। তজ্জন্য সেখানে যাইয়া এই বিকৃত ক্লাসিক শক্তি সংগ্রহ করিল। Brandes একস্থানে বলিয়াছেন "The spirit of the French people resembles the Gk. spirit on its absolute freedom from awkwardness, its love of lightness, elegance, form and colour, passion and dramatic life." বলদীপ্ত, ধনগর্ব্বিত জ্ঞানে ও মানে শ্রেষ্ঠ ফরাসী জাতি, দু'একটী দেশ ছাড়া বাদবাকি সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে তাহাদের এই নূতন রুচি প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই নূতন পথের কাণ্ডারী হইলেনEuripedes এবং বিশেষতঃ Seneca কিন্তু যিনি নিজে অসিদ্ধ তিনি অপরকে সিদ্ধ করিবেন কিরূপে? তথাপি ফরাসী নাটক লাটিন নাটকের মত অতটা কৃত্রিম বা নির্জীব হইল না। পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাদের তখনকার জাতীয় জীবনে এমন কিছু ছিল যাহা এই ধাঁচের সহিত খানিকটা মিল খায় এবং সেই জন্য উহা একবারে অস্বাভাবিক হইল না। কর্ণেয়ির (cornelli) Cid এই পথের প্রথম পথিক এবং রাসিন (Racine) ইহার প্রধান যাত্রী। কর্ণেয়ির পূর্ব্বে ফরাসীর এক প্রকার নিজস্ব নাটক ছিল তাহা মধ্যযুগের ধর্ম্মবিষয়ক নাটক mystery বা miracle এর মতন। ইহার সঙ্গে মিশ্রিত হইল Seneccaর অনুকরণ। কর্ণেয়ি নিজে ছিলেন রোমান্টিক কিন্তু সে যুগের রুচি ও প্রথার দিকে নজর রাখিয়া ক্লাসিকাল নাটকের ছাঁচে নাটক লিখিলেন। কিন্তু কর্ণেয়ির পক্ষে যাহা কষ্টকল্পিত হইল রাসিনের বিরাট প্রতিভার কাছে তাহা সহজ হইয়া পড়িল। ফলে তাঁহার নাটকে প্রাণের স্পন্দন, ব্যথার অবদান, জীবন সংগ্রামের নিষ্ঠুর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইল। কিন্তু ইহা গ্রীক নাটক হইল না। না হইল ইহার বস্তু বা কাহিনী সরল, না পড়িল তাহাতে অসীম রহস্যের ছায়া। ইহা হইল নিতান্তই পৃথিবীর জিনিষ, সীমার মধ্যে বদ্ধ, অসীমের হাওয়া ইহার গাত্রে কোনদিনই লাগিল না। তাহা হইলেও ইহা চমকপ্রদ। ঝড়ের রাতে রুদ্ধ-দ্বার বাতায়ন উজ্জ্বল দীপালোকে আলোকিত, সঙ্গীত মুখরিত, চটুল বাক্যা-লাপ-প্রতিধ্বনিত গৃহকোণের ন্যায় ইহা সীমাবদ্ধ, তথাপি সুন্দর, সুখপ্রদ ও চমৎকার। তবে সে বদ্ধ বাতাসে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। সে নাটকের পাত্রপাত্রীগণ বাহিরে অন্ধকার রাতে কি ঘটিতেছে তাহার খবর রাখে না, প্রকৃতির তাণ্ডব-লীলা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লয়, গৃহকোণে নিজেদের কথায়, নিজেদের চিন্তায় মশগুল্।

রাসিনের ন্যায় প্রতিভাবান লেখকও যে এই বিকৃত ক্লাসিক ছাঁচের মধ্যে নিজেদের প্রতিভার স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, তাহার কতগুলি কারণ ছিল। প্রথম হইতেছে তৎকালীন তথা-কথিত ক্লাসিকাল্ রেওয়াজের ঢেউ, যাহা প্রায় সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে প্রবাহিত হইয়া লোককে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী-চরিত্রের সহিত গ্রীক চরিত্রের খানিকটা সাদৃশ্য, যাহার কথা Brandes বলিয়াছেন। তৃতীয় কারণ তৎকালীন ফরাসী দেশের আভ্যন্তরিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। বহুদিন ধরিয়া রাজন্যবর্গের ভীষণ অত্যাচারে ধর্ষিত ও পিষ্ট জনসাধারণ পৌরুষ হারাইয়া অদৃষ্টবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময় রাজা ছিলেন ভগবানের

সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। তাহার ক্ষমতা ছিল অসীম, ঐশ্বর্য্য ছিল অপরিমেয়, আদেশ ছিল অপ্রতিহত। তিনি বলিতেন "I am the state." মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণ প্রতিমুহূর্ত্তেই এই ক্ষমতা অনুভব করিত; অত্যাচারে, অবিচারে তাহারা একবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। এই ব্যবহারের প্রতিশোধ লইয়াছিল তাহারা পরে রক্ত-গঙ্গা বহাইয়া ফরাসী-বিদ্রোহে। ফরাসী নাটক গ্রীক নাটকের ন্যায় অনেকটা আভিজাত্য-ভাবাপন্ন হইলেও ইহার লেখকেরা ছিলেন মধ্যবিত্ত বর্দ্ধিত লোক। তাই নবযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও অদৃষ্টবাদী গ্রীক নাটকের ছাঁচে মনভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না, কিন্তু গ্রীক নাটকের ভিতরকার কথা ইহারা ধরিতে পারে নাই।

এখন দেখা যাক কখন এই নাটকের জন্ম হইয়াছিল। কর্ণেয়, মলিয়র, রাসিন প্রভৃতি নাট্যকারগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এই শতাব্দী ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ লুইয়ের গৌরবে মণ্ডিত। Richelien ও Mazarin প্রভৃতি প্রবীণ সচীবগণের মন্ত্রণা ও কার্য্যকুশলতার গুণে ঘরে বাহিরে বুরবনদের শক্তি অজেয় হইয়া পড়িয়াছিল। সমর-সচীব Louvois যে বিশ্ববিস্তৃত ফরাসী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা অনেকটা সত্যে পরিণত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ লুইয়ের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে অকস্মাৎ এক নূতন প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেল। Spain, Austria Belgium প্রভৃতি নানা দেশের সহিত সংঘর্ষে জাতীয় জীবন পরিপুষ্ট হইল। দেশাত্মবোধ ও জাতীয় গৌরবের চরম সীমায় পৌছিয়াছিল। ঐশ্বর্য্য, বলে জ্ঞানে ও মানে লুই তখন অদ্বিতীয়—তিনি Le grand monarque. Strachey বলিয়াছেন, when Louis XIV assumed the reins of Government, France suddenly and wonderfully came to her maturity; it was as if the whole nation had burst into splendid flower. In every branch of human activity, in war, in administration, in social life, in art and literature the same energy was apparent, the same glorious success. At a bound France won the headship of Europe. ঠিক এই মহত্ত্বের সময়, জাতীয় গৌরবের দিনে, উদ্দীপনার আলোকে ফরাসী নাটকের অভ্যুত্থান হইল। এইবার চলুন ইতালিতে। ইতালিতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই বিকৃত classical আদর্শে লিখিত এক শ্রেণীর নাট্যকার উঠিলেন যাঁহাদের মধ্যে Alferi ১৭৪৯—১৮০৩ প্রধান। তিনি classical ধাঁচ পুরাদস্তুর বজায় রাখিয়াও নাটকের মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তির সংঘর্ষ আনিয়া ফেলিলেন যাহাতে তাহারা রোমাণ্টিক নাটকের সীমানায় যাইয়া পড়িল। দেশাত্মবোধ হইল Alferi নাটকের মূলমন্ত্র এবং ইহা ঠিক উপযুক্ত সময়ে উঠিয়াছিল। ইতালি যখন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হইয়া স্পেন, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্সের হস্তে বিধ্বস্ত, যখন সম্ভ্রান্ত লোকেরা ও পুরোহিতগণ সর্ব্বপ্রকার উন্নতি চেষ্টার পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন উত্তর ইতালিতে Peidmont নামে একটী ছোট রাজ্য সুশাসন দ্বারা নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তৎকালীন ইতালির আদর্শস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। Versailles এর অনুকরণে গঠিত কিন্তু Versailles এর বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে মুক্ত এই রাজ্যের রাজধানী Turin নগর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়াছিল। Peidmont এর রাজা পুরাতন Savoy বংশোদ্ভূত Charles Emmanuel অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে রাজ্যবিস্তারে মন দিয়াছিলেন এবং শতধা বিচ্ছিন্ন, বিদেশীর পদতলে লাঞ্ছিত ইতালির অপরাপর রাজ্যগুলির মধ্যে একতা ও দেশাত্মবোধ আনিতে সচেষ্ট হইলেন। যখন এ ধারণা অপর কাহারও মনে জাগে নাই তখন এই নূতন জাতীয়তার ও স্বাধীনতার ভেরী বাজাইলেন Alferi এবং তিনি ছিলেন একজন Peidmont বাসী। এই নব-জাগরণের সঙ্গে উঠিল ইতালির নাটকগণ।

ইউরোপের classical নাটকের প্রকৃতি ও তাহাদের অভ্যুত্থানের সময় সম্বন্ধে মোটামুটি দুচার কথা জানা গেল। ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে নাটকের জন্ম হইয়াছিল এবং সে সকল ঘটনা নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতটা সহায়তা করিয়াছিল তাহারও এক প্রকার ধারণা হইল। এখন রোমাণ্টিক নাটক সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

ক্লাসিক্যাল নাটকের সহিত তাহার প্রভেদ অনেক। ভাবে ও ভাষায় অনেক পার্থক্য রহিয়াছে; সমস্ত কথা বলা এখানে সম্ভব নয় এবং সাধ্যাতীত, দু একটী মূল কথা কিন্তু জানা দরকার। Classical নাটকে ঘটনা অতি সামান্য কিন্তু Romantic নাটকে ঘটনার বাহুল্য অত্যন্ত বেশী। দু চারটী বাদ দিলেও নাটকের বিশেষ ক্ষতি হয়না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন নাটকে সন্ধি বা Situation লইয়াই প্রধান কারবার, কিন্তু নূতন নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য চরিত্রের বিশ্লেষণ ও বিকাশ। এই হইতেছে তার কাছে সব চেয়ে বড় কথা। এই দুই পার্থক্য ছাড়া আর একটী পার্থক্য আছে। গ্রীক নাটক যদি অদৃষ্টবাদী হয়, যদি অদৃষ্টের কাছে অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ই ইহার মূলসূত্র হয়, তবে রোমান্টিক নাটকের ধর্ম্ম ইহার ঠিক বিপরীত। মানব মনের অজেয় শক্তির জয় ঘোষণা ইহার মূলমন্ত্র। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল ঘটনার সহিত মানব জীবনের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ দ্বারাই তাহার চরিত্রের বিকাশ এই হইতেছে তার প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহার কাছে অদৃষ্ট একটা সম্পূর্ণ অলৌকিক অজানা নির্ম্মম শক্তি নহে, ইহা মানুষের কার্য্যপ্রসূত, প্রবৃত্তির দ্বারা রঞ্জিত। ইহাকে বশ কিম্বা জয় করিবার অধিকার মানুষের আছে। হয়ত এ চেষ্টা ফলবতী না হইতে পারে, হয়ত বা শেষ পর্য্যন্ত পরাজয়ই সম্ভব, তথাপি যুদ্ধ করিতে হইবে, লড়াই না করিয়া বশ্যতা স্বীকার করা মানুষের ধর্ম্ম নয়। আশা, চেষ্টা ও কার্য্য লইয়াই মানব জীবন, নৈরাশ্য ও জড়তা শুধু মৃত্যুর পথ দেখাইয়া দেয়। অতএব মানুষকে বাঁচিতে হইলে প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে এবং এই আজীবন সমরই এ নাটকের কাহিনী। এই সময়ে মানব চরিত্রের বিকাশ; সেইজন্য রোমান্টিক নাটকে চরিত্র লইয়াই বেশী কারবার। বহির্জ্জগতে কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ নয়, অন্তর্জগতের, ভাবরাজ্যের আন্দোলনের খবরও তাহাকে রাখিতে হয়। গণ্ডীর বাহিরে যে অনন্ত দেশ ও কাল রহিয়াছে তাহার সন্ধান, তাহার সঙ্গে সীমাবদ্ধ এই জীবনের সম্বন্ধ স্থাপন এই হইতেছে তাহার উদ্দেশ্য। তুরস্কের হস্তে রোমক রাজ্যের ধ্বংসের পর যে নব যুগ আসিয়াছিল সে যুগের ধর্ম্মই হইল মানব মনের অজেয় পৌরুষের ঘোষণা, এবং রোমান্টি নাটকে এই ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে, এই যুগ-ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছে।

ইংলণ্ড ও স্পেনে এই শ্রেণীর নাটকের জন্ম এবং পরবর্ত্তী কালে জার্ম্মানীতে ইহার পুনর্জন্ম হয়। ইংলণ্ডের Romantic নাটক সম্বন্ধে বিশেষ বলার আবশ্যক নাই কারণ ইংরাজ বিজিত ভারতে তাহা অনেকেই জানেন। অষ্টম হেনরী, এডওয়ার্ড ও মেরীর রাজত্বকালে দেশে বেশী শান্তি ছিলনা, নানাপ্রকার বিবাদ বিসম্বাদে কাটিয়াছিল। পোপের সঙ্গে বিবাদ, Spain ও Franceএর সঙ্গে ঝগড়া, ঘরোয়া বাকবিতণ্ডা এই লইয়াই লোক ব্যস্ত ছিল। কিন্তু Elizabethএর সিংহাসনারোহণের পর হইতেই দেশে এক নূতন অবস্থার সূত্রপাত হইল। বহুকাল বিবাদের পর ফরাসী দেশের সহিত সন্ধি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে লোকে নিশ্চিন্ত মনে চাসবাস, ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল। স্পেন ও পর্ত্তুগালের দেখাদেখি ইংরাজও অদম্য উৎসাহে দেশ আবিষ্কারে বাহির হইল কিন্তু প্রথম প্রথম বিশেষ কৃতকার্য্য না হইয়া স্পেনের জাহাজ লুঠনে মন দিল। ফলে অজস্র ধন গৃহে আসিল। ফ্রান্স, স্পেন, রাসিয়া জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের সহিত সংঘর্ষণের ফলে জাতীয়-মনের আয়তন বৃদ্ধি, জাতীয় জীবনের প্রসার হইতে লাগিল। তারপর মহাপরাক্রমশালী স্পেনের armada ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় গর্ব্ব ও গৌরব চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল।

এই দেশব্যাপী গৌরব ও সমৃদ্ধির মধ্যে, জাতীয় উদ্দীপনার দিনে Marlowe, Shakespeare প্রভৃতি মহারথীগণ নাটকের আসরে দেখা দিলেন। গ্রীস এবং ইতালিতে মহাকাব্যের খাত দিয়া যেমন দেশ-প্রেমের বন্যা বহিয়াছিল, ইংলণ্ডে নাটকের—বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটকের মধ্য দিয়া সে প্রবাহ বহিল। জাতির অদম্য উৎসাহ অসীম দেশাত্মবোধ বাধাবন্ধহীন রোমান্টিক নাটকের মুক্ত ধারায় অনন্তের দিকে ছুটিয়া যাইয়া বিশ্বের রহস্য মাঝে আছড়াইয়া পড়িল, মানব মনের গভীরতম প্রদেশে আঘাত করিতে লাগিল। যাহা দৃশ্য, যাহা সসীম, যাহা নিশ্চিন্ত তাহা হইল তুচ্ছ, যাহা অদৃশ্য, অসীম যাহা কল্পনালোকের,

তাহা লইয়া হইল ইহার খেলা। রোমান্টিক নাটকের উৎকর্ষ ও মহত্ব এই খানে।

স্পেনে যে রোমান্টিক নাটকের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা Elizabethan নাটকের সমসাময়িক। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর অর্দ্ধেকের কিছু উপর পর্য্যন্ত (১৫৮০—১৬৮০) ইহার অভ্যুত্থানের সময়। Ballad বা বীরগাথা মুখরিত, রোমান্সের রঙ্গভূমি, স্পেনে যে রোমান্টিক নাটকের রেওয়াজ চলিবে তাহা বিচিত্র নয়। তাহার ধর্ম্ম, তাহার রোমান্স, তাহার Chivalry তাহার আমোদ প্রমোদের রীতি ও জাতীয় গর্ব্ব এই ধরণের নাটকের অনুকূল হইয়াছিল। যে দেশে মনোবৃত্তি অত প্রবল, যে জাতি প্রতিহিংসার গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছে, যাহার আত্মমর্য্যাদা প্রতি মুহূর্ত্তেই কারণে অকারণে ক্ষুণ্ণ হয় সে জাতির মন সাম্য, শান্ত ক্লাসিকাল নাটকের মধ্য দিয়া কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে? তথাপি সে যুগে ল্যাটিন নাটকের প্রভাব এতই বেশী ছিল যে Cerventes বাস্তবিকই ঐ পুরাণো পথে নাটক চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। Don Quixoteএর মত পুরাদস্তুর রোমান্সের লেখক যে এরূপ করিতে পারেন ইহা হইতেই তৎকালীন ক্লাসিকাল রুচির প্রভাব বুঝা যায়। কিন্তু তিনি বাধা পাইলেন জাতীয় চরিত্রের কাছে, বাধা পাইলেন Lope de vega ও Calderonএর হস্তে। Lope de vega প্রায় দুই হাজার নাটক লিখিলেও বাহিরের লোকের কাছে স্পেনের আদর্শ নাট্যকার Calderon। গত যুগের Chivalryর কাল্পনিক জীবন তাঁহার নাটকের মালমসলা যোগাইল এবং তাঁহার নাটকের প্রধান ভাব হইল ভীষণ প্রতিহিংসা। তাঁর Amar despues de la muerte (Love triumphant over death) নামক নাটক পাঠ করিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। করুণার অশ্রু জলে সিক্ত প্রবৃত্তির সংঘাতে মুখরিত হাস্য কৌতুকে রঞ্জিত এই সব অপূর্ব্ব নাট্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

এই নাটকের আবির্ভাব হইয়াছিল জাতীয় জীবনের এক মহাদিনে। প্রায় আটশত বৎসর অধিকারের পর গ্রানাডায় রণক্ষেত্রে মুরগণ চিরদিনের জন্য পরাস্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সভ্যতা, তাহাদের শিল্প ও স্থাপত্য গভীর ভাবে স্পেনের জাতীয় জীবনে দাগ রাখিয়া গেল। স্পেন বুঝিল যে জাতি মধ্যযুগের অন্ধকারে জ্ঞানশলাকা হস্তে সমগ্র ইউরোপের গুরুগিরি করিয়াছে, যে জাতি সেভাইলের Giralda, alhambra ও Cordovaর মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে জাতিকে রণক্ষেত্রে পরাস্ত করিলেও মনক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা সহজ নয়। Fernando ও Isabella রাজত্বকালে ক্রমশঃ দেশে একতা ও শান্তি ফিরিতে আরম্ভ করিল, কলম্বস্ সুদূরে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া স্পেনকে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়া দিলেন, জাতীয় শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে যখন দ্বিতীয় ফিলিপ দেশের রাজা হইলেন তখন স্পেন সমগ্র ইউরোপের এক প্রকার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। Portugal, Naples, Sicily, Sardina, Milan, Holland, Belgium, জার্ম্মানির কতক অংশ, St. Helena, America, Philippines তখন স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত। বিভিন্ন জাতির সহিত সংঘর্ষের, বিভিন্ন সভ্যতার সহিত ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে জাতীয় জীবন পরিপুষ্টি লাভ করিল, জাতীয় গৌরব স্পেনবাসী প্রতি অঙ্গে অনুভব করিতে লাগিল। প্রাকৃতিক শক্তির হস্তে Armada বিধ্বস্ত হইলেও স্পেনের স্পর্দ্ধা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইল না। ইংলণ্ডের নিকট উহা জীবন মরণের ব্যাপার ছিল, আর স্পেনের নিকট উহা খেলাসৌখীন দিগ্বিজয়। তাই ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ যাহা অত বড় করিয়া দেখিয়াছেন তাহা বাস্তবিক Spainএর পক্ষে অত বড় ছিল না। Marathonএর যুদ্ধে গ্রীসের নিকট জীবন মরণের ব্যাপার হইলেও পারস্যের কাছে উহা ছিল ক্রীড়া বিশেষ। যখন দেশে এই প্রকার উদ্দামশক্তি ও গৌরব বর্ত্তমান, যখন বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষে জাতীয় জীবন উদ্বুদ্ধ ও প্রসারিত, তখনই আসিয়া দেখা দিল স্পেন দেশীয় রোমান্টিক নাটক। Lope de Rueda যে নাটকের সূচনা করিলেন তাহা পূর্ণতা লাভ করিল Calderonএ। জাতীয় গৌরবের অস্তের সঙ্গে সঙ্গে নাটক লেখাও বন্ধ হইয়া গেল।

একশত বৎসর নীরব ও নির্জ্জীব থাকিয়া রোমান্টিক

নাটক জার্মানীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। এই শতবর্ষের মধ্যে ক্লাসিকাল রুচি জয়ী হইয়া সমগ্র ইউরোপখণ্ডে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে, দেশ বিদেশ আবিষ্কারের সহিত মনের প্রসার হইল, নূতন আশায়, নূতন প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিল। ভাবে ও কল্পনায়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নীতিতে এক নূতন অনুপ্রেরণা দেখা দিল। গত শতাব্দীর প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মানব মন আর থাকিতে না পারিয়া উদ্দামের পানে, উচ্ছৃঙ্খলার পাত্রে মুক্তির দিকে ধাবিত হইল। জীবন-ঘেরা যে অনন্ত রহস্য রহিয়াছে তাহার সন্ধানে চলিল। Rousseau, Kant প্রভৃতি মনিষিগণ হইলেন ইহার পথপ্রদর্শক। মধ্য-যুগের ভাব ও রীতির বিরুদ্ধে এক মহা অভিযান আরম্ভ হইল। নিদ্রিত, ধর্ষিত জনশক্তি মুক্তির বিষাণে জাগিয়া দাঁড়াইল। ইহার অল্পদিন পরেই উর্ব্বর ফরাসী দেশ নরশোণিতে আরও উর্ব্বর হইয়া উঠিল। ঐশ্বর্য্যের, ক্ষমতার, অত্যাচারের, অবিচারের লীলাভূমি ফ্রান্স নিমিষে ধ্বংস হইল। অসুরবলদীপ্ত জনশক্তি চতুর্দ্দিকে ত্রাস ও শঙ্কার সৃষ্টি করিয়া সমগ্র ইউরোপের সিংহাসন কাঁপাইল। পরক্ষণেই ধূমকেতুর ন্যায় Napolean আসিয়া ইউরোপের মনে ত্রাস জাগাইয়া চিরদিনের মত মিলাইয়া গেলেন।

যে ভাবের সূচনা স্পেন ও ফ্রান্সে, ইংলণ্ড ও ইতালিতে দেখা দিল, জার্ম্মানীর কোন কোন রাজ্যে তার প্রতিধ্বনি গিয়া পৌঁছিল। মধ্যযুগের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত Holy Roman Empireও ধ্বংস হইল। সে স্তূপ হইতে উঠিল দুটী শক্তি Prussia এবং Austria, এবং এই Prussiaই শতধা বিভিন্ন জার্ম্মান জাতিকে ঐক্যের নূতন মন্ত্র শিখাইল। Sweedes দের বিরুদ্ধে ফেবেলিনের যুদ্ধের পর যে জাতীয়তার সূত্রপাত হইয়াছিল ফ্রেড্রিক দি গ্রেটের সিংহাসন আরোহণের পর তাহা পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। নানা দিকে, নানাপ্রকারে সে নব জীবনের চিহ্ন দেখা গেল; অপমানের তীব্র হলাহলেমত্ত হইয়া বিদেশীয় শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রসবাকের যুদ্ধে ফরাসী ও অন্যান্য জার্ম্মান রাজ্যকে পরাজিত করিয়া Prussia শ্রান্ত ও ভীত দেশ-বাসীর সম্মুখে এক নূতন জাতীয়-জীবনের আদর্শ ধরিল। ঘরে বাহিরে, বহির্শত্রু ও মনের শত্রুর সহিত বুঝাপড়া চলিল। তথাকথিত ক্লাসিকাল রুচির বিরুদ্ধে, মধ্য যুগের ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধে চলিল এক মহা অভিযান এবং এই Sturm und Drang যুগের মধ্য দিয়াই গড়িয়া উঠিল জার্ম্মান জাতি। এই জাগরণের দিনে, জাতীয় মনের প্রসার ও উদ্দীপনার সময় আসিলেন ভাইমারের রাজসভায় শিলার, গেটে, হার্ডার ও ভাইলাণ্ড। এ নূতন জীবনের স্রোত কোন খাতে বহিলে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইবে, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন গেটে, এবং কখনও কল্পনার রাজ্যে, কখনও গ্রীক রূপকথায় মধ্যে কখনও বা ইতিহাসের মধ্যে পথ সন্ধান করিতে লাগিলেন। শিলারের Don Carlos, ও Wallenstein, গেটের Faust, Egmont, Iphigenie এই সন্ধানের নিদর্শন।

প্রতীচ্যে নাটকের অভ্যুত্থান কাহিনী এক প্রকার শুনা গেল। এইবার প্রাচ্যের কথা বলা আবশ্যক। অতীত যুগে প্রাচ্যের দুইটী দেশে নাটকের অভ্যুত্থান ও উন্নতি হয়। একটী হইতেছে চীন দেশ, অপরটী ভারতবর্ষ। পারস্যে আধুনিক কালে নাটক বলিতে যাহা বুঝি তাহা ছিল না। চীন নাটক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় কিছুই নাই, তবে যে বিশাল মানব-সঙ্ঘে ১৫০০ মাইল বিস্তৃত প্রাচীর প্রস্তুত করিতে পারে তাহার সম্বন্ধে কোনো কথাই অবিশ্বাস করা চলে না। বর্ত্তমান জগতে যা কিছু অভিনব শুনিতে পাওয়া যায় তাহার অনেকগুলিই বহু পূর্ব্বেই চীনে ছিল। বারুদ ও মুদ্রাযন্ত্র যাহা আজ প্রতীচ্যকে জগতের অধীশ্বর করিয়া তুলিয়াছে, তাহা পুরাতন চীনের জিনিষ। এমন দেশে যে নাটক থাকিবে তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। তবে শুনা যায় চীন দেশের নাট্য শাস্ত্রের উচ্চ আদর্শে চীনা নাটক কখনই পৌঁছিতে পারে নাই। তবুও তাহাদের

যে সব নাটক ছিল তাহা চীনের গৌরবের দিনেই জাগরণের দিনেই লিখিত। তাহাদের অভ্যুদয়-কাল ১২৬০ খৃঃ হইতে ১৩৬৮ খৃঃ পর্য্যন্ত। চেঙ্গিজ খাঁয়ের বংশধরগণ যখন সদর্পে সুদূর নাইপারের তীর হইতে চীন পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, যখন কুবলা খাঁ টাইমুর প্রভৃতি বীরগণের চরণে পূর্ব্ব এশিয়া পদানত, যখন ইউরোপ ও এশিয়ার নানা জাতির সংঘর্ষে, অবিচ্ছিন্ন জয়ের উল্লাসে মঙ্গলজাতি স্ফীত, জয়োন্মত্ত, তখনই Hsiang chi (হিসিয়াং চি) প্রভৃতি নাটক লিখিত হইয়াছিল। কুবলা খাঁর রাজত্ব কাল সম্বন্ধে Giles বলিয়াছেন "Never in the history of China was the nation more illustrious, nor its power more widely felt than under his sovereignty." তবে চীন জাতি কখনই গতানুগতিক নয়, তাহাদের সব জিনিষ করিবার একটা মৌলিক প্রথা ছিল, তাই নাটক লিখিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই, কিরূপে নাটকের আলোচনা ও রসাস্বাদন করিতে হইবে সে সম্বন্ধে এক অভিনব পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তাহারা সেইজন্য কোনো কোনো নাটকের মুখবন্ধে লিখিত "যদি কেহ এই পুস্তককে অশ্লীল বলে তবে তাহার জিহ্বা নরকে ছিঁড়িয়া ফেলা হইবে!"

এইবার ভারতের কথা। ইউরোপে প্রচলিত রোমাণ্টিক বা ক্লাসিক নাটক হইতে ইহা স্বতন্ত্র। ইহার রীতিনীতির সঙ্গে অন্য জাতীয় নাটকের আন্তরিক মিল নাই। অনেকে গ্রীক নাটকের সহিত ইহার কতক পরিমাণ সাদৃশ্য দেখিয়াছেন এবং এমন কথাও বলিয়াছেন যে গ্রীক নাটকের ছায়া ইহার উপর পড়িয়াছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য বা ছায়া অতি বাহ্যিক, ইহাদের মধ্যে অন্তরের মিল নাই। একথা সত্য যে গ্রীক নাটকের ন্যায় ইহার পাত্রপাত্রীগণের আভিজাত্য থাকা প্রয়োজন, ইহার বস্তু বা গল্পাংশ প্রসিদ্ধ সরল সম্ভব হওয়া আবশ্যক, এবং গ্রীকের ন্যায় ইতিহাস, মহাকাব্য ও রূপকথার ভাণ্ডার হইতে তাহা সংগ্রহ করা বিধেয়। কোনো কোনো প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে নাটকের ঘটনা রাজি এক দিবসের মধ্যেই বদ্ধ থাকা উচিত, কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমই বেশী ভাগ স্থলে দেখা যায়। উত্তররাম-চরিতের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে ব্যবধান ১২ বৎসর। গ্রীক নাটক অপেক্ষা ইহার রুচি ও শ্লীলতা জ্ঞান আরও বেশী, শুধু ভীষণ দৃশ্য বা মৃত্যু নয়, এমন কি চুম্বন, আলিঙ্গন পর্য্যন্ত সংস্কৃত রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনীত হইবে না।

গ্রীক নাটকের সহিত সাদৃশ্যও যেমন আছে অসাদৃশ্যও আছে। সংস্কৃত নাটক উহা অপেক্ষা দীর্ঘ, এবং রোমাণ্টিক নাটকের ন্যায় অঙ্কে ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। গ্রীসের গৌরব বিয়োগান্ত নাটকে বা tragedyতে, কিন্তু সংস্কৃতে নাট্য-শাস্ত্রে ইহা একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু এই সব সাদৃশ্য বা পার্থক্য অতি ব্যাহ্যিক ব্যাপার। সংস্কৃত নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রস সৃষ্টি, তাহা আদি রসই হউক বা বীর রসই হউক, এবং এই রস সৃষ্টির জন্য যেটুকু কাহিনীর প্রয়োজন, যেটুকু চরিত্রের উন্মেষ আবশ্যক, নাট্যকার তাহাই করিয়াছেন তাহার অধিক নয়। গ্রীক নাটকে যেমন বস্তু বা plotএর দিকে পূর্ণদৃষ্টি, রোমাণ্টিক নাটকে যেমন চরিত্রবিকাশই চরম উদ্দেশ্য, তেমনি সংস্কৃত নাটকে রস-সৃষ্টি একমাত্র লক্ষ্যের বিষয়। নাটকের অন্যান্য বিষয় ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য সাহিত্যমাত্রেরই রস-সৃষ্টি উদ্দেশ্য, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের সমস্ত ব্যাপার বাঁধাধরার মধ্যে চরিত্রগুলি কতকগুলি typeএর মধ্যে ফেলা এবং সেইজন্য রোমাণ্টিক নাটকের উদ্দাম সজীবতা ও স্বাধীনতা ইহাতে নাই, গ্রীক নাটকের প্রসার ও রহস্যও নাই। ইহার রস কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট, তেমন সতেজ ও চিরনূতন নয়। এ নাটকে কাহিনীর গতি শ্লোকাবৃত্তির দ্বারা সর্ব্বদাই বাধা পাইতেছে, গল্পের বা চরিত্রের দিক হইতে দেখিলে এ শ্লোকগুলি বাদ দিলেও বিশেষ ক্ষতি হয়না, কিন্তু রসসৃষ্টির দিক হইতে বিবেচনা করিলে এগুলি অপরিত্যাজ্য; ইহারাই রসপুষ্টির সহায়ক। বস্তুতঃ সংস্কৃত নাটকের ভাব ও ভাষা, চরিত্র ও কাহিনী, নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয় কলা সমস্ত এক উদ্দেশ্যের দিকে চলিয়াছে এবং তাহা হইতেছে শৃঙ্গার বা বীর রসের সৃষ্টি। উদ্দেশ্য দ্বারা

যদি কর্ম্ম বিবেচিত হয় তবে একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতেই হইবে যে সংস্কৃত নাটকে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে।

এমন যে নাটক তাহার রাজপ্রাসাদে জন্ম, রাজপ্রসাদে লালিত এবং কোনো কোনো সময় রাজার নামেই প্রচলিত। পাশ্চাত্য নাটকের তুলনায় তাহার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, কিছু পরিমাণে কৃত্রিম। তৎকালীন ভারতের যে জীবন পথে, ঘাটে, বিহারে, মন্দিরে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, বিক্ষোভিত সাগরবক্ষে যাপিত হইত, যে জীবনের ছায়া ভারতের চিত্রে, ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যে ভারতের এলোরায় ও অজন্তায়, সাঁচি তোরণে বরবুদরে ও অসংখ্য মন্দির-গাত্রে পড়িয়াছে, সে জীবনের সংবাদ এ রাজপ্রাসাদে লালিত আভিজাত্য সম্পন্ন নাটকের মধ্যে প্রায়ই পাওয়া যায় না। দুচারখানি প্রকরণের কথা ছাড়িয়া দিলে একথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ চলে না। ভাসের চারুদত্তে বা শুদ্রকের মৃচ্ছকটিকে বা বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসে কিম্বা ভবভূতির মালতীমাধবে ইহার কিছু আভাস থাকিলেও বেশীভাগ স্থলে ইহা নাই। নাটকের জন্ম নগরে, সুতরাং নাগরিক জীবন লইয়াই ইহার কারবার। এ জীবন কিরূপ সঙ্কীর্ণ ও সৌখীন তাহা বাৎসায়নের কামসূত্রে বেশ স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাৎসায়নের মতে যিনি নাগরিক তিনি হইবেন ধনী ও সুরুচি সম্পন্ন; পোষাক পরিচ্ছদ ও প্রসাধনের দিকে তাঁহার বিশেষ নজর থাকিবে, লোধ্ররেণু ও গন্ধদ্রব্য মাখিয়া মালা পরিয়া তিনি রাজপথে বাহির হইবেন। তিনি সুগায়ক ও গ্রন্থপ্রিয় হইবেন। পিঞ্জরের পাখিকে কথা শেখান, তিতিরের ও মেড়ার লড়াই দেখা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। দিবসে মনোহর পুষ্পোদ্যানে গল্পগুজব এবং রাত্রে নৃত্য গীত, পত্নীর সহিত আলাপনাদি এবং মধ্যে মধ্যে বারাঙ্গনাগৃহে চাটুকার পরিবৃত হইয়া কাদম, গৌড়ী মাধ্বী প্রভৃতি আসব পান ও সাহিত্যচর্চ্চা এই ছিল নাগরিকের জীবন। এ সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্যে অসীম রহস্যের স্থান কোথায়? যে অজানা নির্ম্মম অদৃষ্টের রহস্য গ্রীক জীবনে এক বিরাট ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল, ভারত প্রাক্তনের বা পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্মফলের অঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া তাহার সমাধান করিয়াছে এবং সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আদিম অব্যক্ত রহস্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সুতরাং যে যবনিকার ছায়ার তলে গ্রীক নাটকের যথার্থ মহত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, যাহা সর্ব্বদাই মনকে জানার সীমা হইতে অসীমের দিকে ঠেলিয়া দেয়, সে রহস্যের ছায়া সংস্কৃত নাটকে পড়ে নাই। জানার অল্প পরিসরের মধ্যে ইহার জীবন। অবশ্য স্বীকার করতেই হইবে যে সংস্কৃত নাট্যকারদের প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু সে পরিচয় শুধু অলঙ্কারের জন্য, রসসৃষ্টির সহায়ক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহার মধ্য দিয়া অনন্ত রহস্যের সন্ধান করা হয় নাই, রসেতেই তাহা পর্য্যবসিত হইয়াছে, রসের পশ্চাতে যে আনন্দময় যে রসো বৈ রহিয়াছেন তাহাতে পৌছান হয় নাই। স্বর্গের অপ্সরা ও দেবদেবীগণের সাহায্যে সন্ধি বা সঙ্কটোদ্ধার বহুস্থানে হইয়াছে কিন্তু তাহা ভয় বা বিস্ময় উৎপাদন করে নাই। সংস্কৃত নাটকের এই সঙ্কীর্ণতা ও অপূর্ণতা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা মূল্যহীন হয়না। এ গণ্ডীর মধ্যে কবিগণ যে জীবন আঁকিয়াছেন তাহা সত্য ও সুন্দর। অপূর্ব্ব ছন্দে ও রসে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে যে স্বপ্নালোক সৃষ্ট হইয়াছে তাহা চিরকাল মানব সমাজে আদরের বস্তু হইয়া থাকিবে। কবিতার হিসাবে, রসোৎপাদনের দিক হইতে দেখিতে যাইলে তাহা অতুলনীয়।

এই প্রকার যে সংস্কৃত নাটক তাহার যথার্থ গৌরবের সময় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে পর্য্যন্ত। কালিদাস, দণ্ডিন, বিশাখদত্ত, শ্রীহর্ষ ভবভূতি এই যুগের লোক। মৌর্য্য সম্রাটদিগের গৌরবের দিনে কোনো নাটক ছিল কিনা তাহার সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে নাটক লেখার প্রচলন ছিল এ কথা এখন অনেকে স্বীকার করেন। তুরফানের বালুকা রাশির মধ্যে প্রোথিত তিনখানি নাটকের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে এবং লুডার্স সাহেব কর্তৃক তাহাদের পাঠোদ্ধারও হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একখানি বুদ্ধচরিত রচয়িতা অশ্বঘোষের লিখিত সারিপুত্র প্রকরণ। নাট্যশাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে লিখিত ইহা একখানি প্রকরণ। যখন একজন স্থবির বৌদ্ধ ভিক্ষু নাটক লিখিতে যাইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেন নাই তখন সে যুগে নাটক লিখিবার একটা বাঁধাধরা নিয়ম ছিল, ঐতিহ্য ছিল বলিয়াই বোধ

হয়। তাহা না থাকিলে এ ধরণের নাটক সে নিয়মের শৃঙ্খলে বদ্ধ হইত না। তৎকালীন ও তৎপূর্ব্বে বহুনাটক না থাকিলে এবং নাটক-লেখার ধারা ক্রমান্বয়ে না চলিয়া আসিলে এ নিয়মগুলির এত জোর থাকিত না। অশ্বঘোষকে কণিকের সমসাময়িক ধরা হয়, অতএব তিনি হয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগের বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বে বহুনাটক থাকার অনুমান অযথা নয়।

ভাসের আবির্ভাব কাল এখনও নিরূপিত হয় নাই। যদিও কালিদাস বাণভট্ট প্রভৃতি মহাকবিগণ সৌমিল্য কবিপুত্রাদি প্রাচীন নাট্যকারদের সহিত ভাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নাটক সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা ছিল না। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ভাসের ১৩খানি নাটক আবিষ্কার করেন, এবং সেই অবধি তাঁহাকে লইয়া নানারূপ আলোচনা গবেষণা চলিতেছে। Sten konowএর মতে তিনি বোধ হয় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগের লোক, মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী তাঁহার বাসস্থান এবং রুদ্রদমনের পুত্র মহাক্ষত্রপ উপাধিধারী রুদ্রসিংহের সমসাময়িক। সমুদ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত রুদ্রসিংহ ইনি নহেন। এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে পশ্চিম ক্ষত্রপদের উন্নতির দিনে, গৌরবের সময়ে ভাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। রুদ্রদমন ও তাঁহার বংশধর কর্ত্তৃক বিস্তৃত তখনকার শকরাজ্য শুধু মালবে ও সৌরাষ্ট্রে আবদ্ধ ছিলনা, কচ্ছ, সিন্ধু, কণকণও তাহা বিস্তৃত ছিল এবং প্রতীচ্যের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য ভারতের পশ্চিম উপকূলে যে সব বন্দর ছিল সেগুলিও ইঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

Keith সাহেব কিন্তু বলেন তিনি খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যকালের লোক। এই অনুমান সত্য হইলে ভাস গুপ্ত-সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে তাঁহার নাটক লেখা আরম্ভ করেন এবং কালিদাসের কিছু পূর্ব্বে তিনি ছিলেন। বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্য অতুল বিক্রমে ও মহিমায় ৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। সমুদ্রগুপ্তের জয়যাত্রা ভারতের ইতিহাসে এক বিরাট ব্যাপার। আর্য্যবর্ত্তের নয় জন ও দাক্ষিণাত্যের ১১ জন নৃপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল; সমস্ত উত্তরাপথ করায়ত্ত করিয়া সসাগরা ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর রূপে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ক্ষত্রপদের নির্ম্মূল করিয়া রাজ্যের গৌরব আরও বৃদ্ধি করেন। তৎপরে কুমারগুপ্তের হস্তে হুন বিজয় হয়। এই সব ঘটনা দেশ মধ্যে এক অভিনব শক্তি আনয়ন করে, এক নূতন জীবনের সূচনা করিয়া দেয়। ক্ষত্রপদের সহিত যুদ্ধ, হুন্ বিজয়, সুদূর চীন, রোমান্ প্রভৃতি জাতির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ ও ভাবের আদান প্রদান, এই সব ঘটনা একটির পর একটী আসিয়া দেশ মধ্যে এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনা আনিয়া দেয়, এবং এই উদ্দীপনা ও সংঘর্ষের দিনে উদিত হয় সংস্কৃত নাটকের গৌরব-সূর্য্য। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের গৌরবের কাহিনী সকলেই জানেন, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

একশত বৎসরের পরের কথা বলিতেছি। কুমারগুপ্তের হস্তে পরাজিত বর্ব্বর হুনজাতি ভীষণ প্রতিশোধ লইয়াছে; উল্কার মত আসিয়া বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য ছারখার করিয়া দিয়াছে। উত্তরাপথের অধীশ্বর হইয়াছে হুন্ জাতি। কিন্তু অধিক দিন সে রাজ্য স্থায়ী হইল না, হুন্ নৃপতি মিহিরগুল ভারতবাসীর কাছে পুনরায় পরাজিত হইলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এশিয়াস্থিত হুনরাজ্য তুরস্কের হস্তে ধ্বংস পাইল। এখন গুপ্তবংশের দৌহিত্র সন্তান হর্ষবর্দ্ধন ৩৫ বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়া উত্তর ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট। হিমালয়ের পাদমূল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত। দেশমধ্যে বিভিন্ন শক্তির সহিত সংঘর্ষে ও চীন প্রভৃতি দেশের সহিত ভাবের আদান প্রদানে দেশমধ্যে এক নব জীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল, এক অদম্য ইচ্ছা শক্তি লোকের মনে জাগরূক হইয়াছিল। এমন সময়ে শক্রবিজয়-দীপ্ত হর্ষ নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনিই লিখুন বা তাঁহার সভাকবি বাণ লিখুন তাহাতে বায় আসে না, ফলকথা এই মহিমা-মণ্ডিত যুগে নাটক আরম্ভ হইল।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব্বের ন্যায় আবার উত্তর ভারত ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। কাহারও সমগ্র উত্তর-ভারতে একাধিপত্য রহিল না সত্য, কিন্তু তাঁহারা বিশেষ হীনবল হইয়া পড়িলেন না। নিজ রাজ্যের সীমায়

মধ্যে থাকিয়া নিজেদের-শৌর্য্যে, নিজেদের ঐতিহ্যে নিজেদের শক্তিতে গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন। এই সব রাজ্যের ইতিহাস এত অসম্পূর্ণ যে কোন কথাই নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। যাহা হোক এমনি একটা পুরাতন প্রসিদ্ধ রাজ্যে, কাব্য সঙ্গীত মুখরিত সেই উজ্জয়িনীতে, অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে ভবভূতি তাঁহার প্রভু মহাকালের জন্য তিনখানি অমর নাটক রচনা করিলেন। ইহার পর হইতে সংস্কৃত নাটকের অবনতি আরম্ভ হইল।

প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে নানা প্রকার পার্থক্য থাকিলেও, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে যে সব পরিবেশের মধ্যে নাটকের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। যখনই বিভিন্ন জাতির সহিত সংঘর্ষের ফলে, বিভিন্ন সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতে, জাতীয় জীবনে উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে, জাতির কর্ম্মবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, যখনই দেশ প্রেমের বন্যা মুক্ত-ধারায় প্রবাহিত হইয়া প্রবল ইচ্ছা শক্তি সৃষ্টি করিয়াছে জনসাধারণের মন আন্দোলিত করিয়াছে তখনই নাটকের জন্ম হইয়াছে। এ কাহিনী গ্রীস, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, চীন ও ভারতে বিভিন্ন কালে বিবৃত হইয়াছে। যখন বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন মানবসঙ্ঘের মধ্যে এই নিয়ম দেখা গিয়াছে তখন নাটকের সহিত এই পরিবেশের সম্বন্ধ শুধু কাকতালীয় সম্বন্ধ বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহার মধ্যে কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়াই অনুমান হয়। তবে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে যে পরিমাণ মাল মসলা প্রয়োজন তাহা আমার নাই। আমি শুধু একদিক দেখাইয়াছি—কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ এবং তাহার মধ্যে নাটকের উৎপত্তি। কিন্তু এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে অপর দিকও দেখা প্রয়োজন। যদি কোনো দেশে, যে পরিবেশের মধ্য হইতে নাটক-উৎপত্তি হইয়াছে, সে পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও নাটক না জন্মাইয়া থাকে তবে তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে না। আজ যাহা বলিলাম তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য জনসাধারণের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

বাঙলার আজ যে নাটকের দৈন্য তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই পরিবেশের অভাব। যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ, যে জাতীয় গর্ব্ব, যে সংঘর্ষের ফল নাটকের মূলে রহিয়াছে, যাহা নাটককে জাতীয় জীবনের মুকুর করে, তাহা বর্ত্তমান যুগে বাঙলা দেশে নাই, যতই কেননা মুখে আমরা আস্ফালন করি। যদি কোনো দিন যুগযুগান্তর ধরিয়া নিষ্পিষ্ট ধর্ষিত এই জাতীয় জীবনে প্রকৃত উদ্দীপনা আসে, জাতীয় কর্ম্মবৃত্তি প্রবল হইয়া জাতিকে মহৎ করে, সপ্তকোটি কণ্ঠে দেশের জয়গান গীত হয়, সপ্তকোটি বক্ষে দেশ-প্রেমের লেলিহান শিখা জাতীয় কলুষতা ও সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে পূর্ণাহুতি লয়, তবে সেই দিনেই বাঙলায় প্রকৃত নাটক লিখিত হইবে এবং সে নাটক বিশ্ব-সাহিত্য-আসরে স্থান পাইবে।

আনন্দকৃষ্ণ সিংহ

ধরণীর ধূলি

শ্রীসুশীলকুমার দেব

সন্ধ্যাগমে পরিমল লণ্ডনের ২৮ নং ক্রমোয়েল্ রোডের ভারতীয় ছাত্রাবাসের আড্ডা থেকে ফিরছে বাড়ীর পথে। যেই হ্যাম্পষ্টেডে টিউব ষ্টেসনের প্ল্যাটফরমে নাম্‌বে অমনি তার-ই সঙ্গে একটি মহিলা গাড়ীর ঐকই দরজা দিয়ে নাম্‌লেন; এবং পরিমলকে যাবি-যাচ্ছি কর্‌তে দেখে তার ইতস্তত ভাব ফাঁসিয়ে দেবার জন্যেই যেন বল্লেন, 'মাপ কর্‌বেন, আপনি কি সুজিত রায়ের বন্ধু?'

মন্দ নয় তো?—জানা নেই শুনা নেই, একেবারে সুরু থেকেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আলাপ!

পরিমলের চোখে কৌতূহল উঁকি দিয়ে উঠ্‌ল। মুখে বল্লে, 'হেঁ'।

মিস্ ক্লেইটন্ বল্লেন, 'রায় আমার ওখানে মধ্যে মধ্যে বেড়াতে যান। আপনিও এলে আমি আনন্দিত হবো।'

পরিমলের মুমূর্ষু আক্কেল গা-ঝাড়া দিয়ে জাগ্‌ল। সে বল্লে, 'আমিও আনন্দিত হবো। আপনার বাড়ীর নম্বরটা সুজিতের কাছে পাবো আশা করি।'

ঠিক হয়ে গেলো সুজিতের সঙ্গে পরিমল মিস্ ক্লেইটনের বাড়ী ইতিমধ্যেই একদিন নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাবে।

পরিমল এই অজ্ঞাতনামা মহিলার মুখের শান্ত শিষ্ট সরস আবেদনের মধ্যেই বুঝ্‌তে পেলে, যাঁর সঙ্গে তার কথা হলো ইনি নিশ্চয় অভিজাতবংশীয়া।

মিস্ ক্লেইটন্ যে কতোখানি অভিজাত সেটা বুঝ্‌তে তাকে এতোটুকুও বেগ পেতে হয়নি। কারণ যেদিন প্রথম সে সুজিতের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে যেয়ে উপস্থিত হলো, সেদিনই কথা-প্রসঙ্গে শুন্‌লে, যে, মিস্ ক্লেইটন্ এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সিনেমাচ্ছন্ন লণ্ডনের, একটি ছবি-ঘরেও পদার্পণ করেন নি। এও আবার সম্ভব!

তাই নয় শুধু। সুজিত বলেছে, শ্রমিকদলের মুখপত্র "ডেলী-হীরাল্ড" তিনি কখনো পড়েননি। রক্ষণশীলদলের কুলীন কাগজ "টাইম্‌স্" প্রভৃতি তাঁর একমাত্র পাঠ্য।

সুজিত আরো বলেছে যে, থিয়েটারে যান: তবে সাধারণত সেই সব দিনে—যখন রাজা-রাণী ও রাজপরিবার-ভুক্তেরাও প্রেক্ষা-গৃহের গৌরব বৃদ্ধি কর্‌তে গিয়ে উপস্থিত হন্।

ব্যাপারটা কিন্তু মূলে অন্যরকম। ফ্যাসন্তেবল্ মহলে চেকনাই অর্জ্জনের গরজ মিস্ ক্লেইটনের আদৌ নেই। এক নাট্যাভিনয় যখন চমৎকার হবে বলে তাঁর বিশ্বাস হয় তখন-ই মাত্র যান। তবে কিনা মধ্যে মধ্যে এরকম হয়েছে—এই সব দিনে কাকতালীয়বৎ লণ্ডনের আভিজাত্যও প্রেক্ষা-গৃহের মহার্ঘতম আসনগুলি অধিকার করে বসেছেন তাঁরই সঙ্গে পাশাপাশি হয়ে।

অধিকতর আলাপ-পরিচয়ের ফলে পরিমল দেখ্‌লে, মিস্ ক্লেইটন্ গণ-তন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। তিনি প্লেতোর নাম করে বলেন, জন-সাধারণ হচ্ছে যেন "বিশালকায় পশু": একে প্রবুদ্ধ করা ও বুদ্ধি-শুদ্ধি দিয়ে উন্নততর জীবনের পথে প্রচালিত করা ষ্টেটের ধর্ম্ম। সেজন্যে সুবুদ্ধিপরায়ণ অল্প-সংখ্যক জননায়কের প্রয়োজন আছে। যে-অর্থে প্লেতো "রাজর্ষি"—পরিচালিত ষ্টেটে গণ-তন্ত্র স্থাপনে ইচ্ছুক ছিলেন—তেমনি সত্য-ধর্ম্মের 'পরে প্রতিষ্ঠিত যে-গণ-তন্ত্র—মিস্ ক্লেইটনের কাছে ওই আদর্শ রাজনীতি।

পরিমল জিজ্ঞেস্ কর্‌লে সুজিতকে, 'সুজিত, উনি বিয়ে করেন না কেন?' এ-ও কি কৌলিন্য?'

সুজিত বল্লে, 'সেরকমই তো মনে হচ্ছে।'

মোট কথা মিস্ ক্লেইটন্ স্বাধীন-স্বভাবা। তাঁর পিতা কানাডায় সৈন্যদলের মধ্যে প্রচুর পরাক্রম দেখিয়ে ক্রমে দু'বার যাচিত হয়েও 'লর্ড' উপাধি ও আনুষঙ্গিক সমৃদ্ধিকে

প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তৃতীয়বারে পরিবারবর্গের পীড়াপীড়িতে উপাধিটি গ্রহণ করতে বাধ্য হন্। সেই রক্তের কন্যা মিস্ ক্লেইটন্।

মিস্ সেই শ্রেণীর মহিলা—যাঁরা আভিজাত্যের মধ্যে জন্ম নিয়েও ভোগ-সুখকে জীবনের একতম লক্ষ্য না করে যা-হোক্-কোনো-একটা আদর্শের অনুপ্রাণনায় জীবন কাটাতে চান।

লণ্ডনের উপপুর হ্যাম্প্‌ষ্টেডে তাঁদের বাড়ী। সুজিত-পরিমলও বাসা পাক্‌ড়েছে ঐ পল্লীতে।

পরিমল একদিন তাঁদের বাড়ীতে ঢুকেই দেখ্‌লে বৈঠকখানার দেয়ালে একখানা ভারতবর্ষের মানচিত্র টাঙানো। পরিমলের বাড়ী কোথায় তা-ই মিস্ ক্লেইটন্ ঐ মানচিত্রে দেখ্‌তে চাইলেন। মানচিত্র বেশ পুরাণো। তাতে সিলেটের নাম নেই। তবু পরিমল তাঁকে জায়গাটা কোথায় আন্দাজে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে দিলে।

সিলেটের কথা তুল্লেন মিস্।

'কমলা নেবুর জায়গা?' জিজ্ঞেস্ করলেন, 'সিলেটের সর্ব্বত্রই কি কমলা নেবু হয়?'

পরিমল বল্লে, 'সব জায়গায় হয় না। কমলার চাষ প্রধানত যে-অঞ্চলে তার নাম খাসিয়া পাহাড়—সিলেটের উপান্ত। সিলেটের কমলা বল্‌তে পাহাড়ী কমলা।'

'খুব মিষ্টি—না?' মিস্ বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'আমরা স্বদেশে (ইংলণ্ডে) ফল-মূলের জন্যে অন্যান্যদের মুখাপেক্ষী। ভারতবর্ষ পৃথিবীতে ফলমূল শাক্‌সব্‌জীর জন্যে সুখ্যাত্। কভেণ্ট্ গার্ডেন্ (লণ্ডনের মার্কেট্) থেকে ব্যবসায়ীরা ভারতের আম সরবরাহ করার চেষ্টা করছে, শুন্‌ছি। দাম নাকি একেক্‌টা আমের ছ'পেনি করে হবে। খুব মিষ্টি আম—না?'

'বোম্বাই আম?—ফলের রাজা।'

পরিমল খবরের কাগজে দেখেছিল, বোম্বে থেকে আম রপ্তানি হয়ে লণ্ডনে এবং প্রথমেই রাজবাড়ীতে এক চালান আসায় রাজ-পরিবারের ভূয়সী উচ্ছ্বাস উঠেছে।

তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাত্র দু'সপ্তাহ কেটেছে। একদিন বিকেলে পরিমল সত্যি সত্যি একগণ্ডা আম নিয়ে মিস্ ক্লেইটনের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। সেদিন সেখানে যথারীতি আপরাহ্নিক চা-পানের আয়োজন ছিল। এর মধ্যে সুপক্ব বোম্বাই আমগুলি যে কী রকম সুভোগ্য হলো তা সেদিনের উৎসাহ-দৃপ্তা মিস্ ক্লেইটনের সস্মিত উজ্জ্বল আনন থেকেই স্পষ্ট ধরা পড়্‌ল।

লেডী ক্লেইটন্ বৃদ্ধা—এতোই বৃদ্ধা যে, বাতের দরুণ ভালো করে হাঁটতে পারেন না। কিন্তু ঐদিন রাত্রে তিনিও যার-পর-নাই খুসি হয়ে পরিমলকে একেবারে নৈশ ভোজনটি শেষ করে যেতে অনুরোধ করলেন।

ঘটনাক্রমে তখন মিস্ ক্লেইটনের ভ্রাতৃজায়া তাঁদের বাড়ীতে এসে রয়েছিলেন। ইনি রুমানিয়ার সঙ্গীতের শিক্ষয়িত্রী রূপে তত্রত্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজের অন্তর্বর্তিনী হয়েছেন। লণ্ডনে এসেছেন শাশুড়ীর অসুখ উপলক্ষে এবং নিজের সপ্তম বর্ষীয় বিদ্যার্থী শিশু-পুত্রকে ইংলণ্ডের পাব্‌লিক্ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিতে।

কথায় কথায় বল্লেন, পণ্ডিত ভাত্‌খাণ্ডের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে এবং তিনি শুনে খুবই সুখী হয়েছেন তাঁর কাছে যে, ভারতীয় ও বিলিতি যন্ত্র-সঙ্গীতের মধ্যে অজ্ঞাতসারে ভারতবর্ষে একটা বোঝাপড়া হতে আরম্ভ হয়েছে এবং যথাসময়ে কণ্ঠ-সঙ্গীতের মধ্যেও আদান-প্রদান হয়তো বা হওয়া সম্ভব।

এই বলেই পিয়ানোর কাছে আসনে গিয়ে বস্‌লেন এবং বল্লেন, 'খেয়াল-মিশ্রিত ধ্রুপদের ঢঙের গান যে য়ুরোপেও আছে সেটা আপনাকে শোনাব কি?'

অতঃপর বাজাতে আরম্ভ করলেন; অবোধ্য ভাষার একটি গানও গাইলেন—হাঙ্গেরীর গান। সুরটি শুনে মনে হচ্ছিল—অবিকল ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য, খেয়ালের মিষ্টতা।

লেডী ক্লেইটন্ একখানা আরাম কেদারায় কম্বলে পা মুড়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে শুন্‌ছিলেন, মিস্ ক্লেইটন্ মাঝে মাঝে পরিমলের দিকে চেয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সুরের মিল দেখানো উপলক্ষে চোখ ঠার দিচ্ছিলেন, তাঁর নবাগতা ভ্রাতৃজায়ার পুত্র শ্রীমান্ কেনীথ্ মনের আনন্দে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

গানের শেষে পরিমলের পালা।

বেচারী পরিমল কোনোদিন পিয়ানোতে বাজাতে

অভ্যাস করেনি। অবশ্য তার ইচ্ছা ছিল, সাহস ছিল, ক্ষমতাও ছিল। তবে এযাবৎ সে এগোয়নি কিছু।

যাই হোক, বাজাতেই হবে তাকে এবং যুগপৎ গানও গাইতে হবে। অনুরোধের পরে উপরোধ। সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে সে একহাতে পিয়ানো বাজিয়ে (যেন হার্মোনিয়ম্ বাজাচ্ছে এম্‌নি) বাঙালী গান একটা গেয়ে দিলে। সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী তার কণ্ঠের তারিফ্ কর্‌লেন; সর্ব্বোপরি মিস্ ক্লেইটন্ হয়ে উঠ্‌লেন প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অপিচ পরিমল দেখে, মিস্ ক্লেইটন্ প্রচ্ছন্নভাবে বরাবর তার খোস্-গল্প কর্‌তে পার্‌লে যেন হাতে স্বর্গ পান।

মা'র দিকে মুখ করে বল্লেন মিস্, 'মা, সঙ্গীতের সাধনা ভারতের জাতীয়তার একটি বিশেষাঙ্গ। তা নইলে কি ওদেশে মানুষের মন সঙ্গীতের চর্চ্চায় অতোখানি তলিয়ে গিয়ে রাগ-রাগিণীর অজস্র অজস্র মণি-মাণিক্য আবিষ্কার কর্‌তে পারে?'

স্বদেশবাসীর এ হেন সাধুবাদ পরিমল স্বকর্ণে কদাপি শোনেনি। সেজন্যে তার চিত্ত সহজে প্রসন্ন হয়। তার জন্য, মিস্ ক্লেইটন্‌দের সংস্কৃতিবান্ পরিবারে মেলামেশা তার সার্থক।

গেলো কিছুদিন। এখনো পরিমল কোনো ক্লাব বা সমিতিতে গতায়াত করে লণ্ডনের বৃহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে আরম্ভ করেনি।

মিস্ ক্লেইটন্ বুঝিয়ে বল্লেন, 'চৌধুরী, তোমাকে কাছাকাছি এক চমৎকার ক্লাবে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। কোন্ দিন যাবে বলো। তার আগে অবশ্য আমার লাইব্রেরীর সঙ্গে পরিচয় ঘটানো দরকার। তুমিও তো বই খুব ভালোবাস'। বল্‌তে বল্‌তে সিঁড়ি বেয়ে উপর তলার দিকে চল্লেন।

পরিমলও চল্ল পিছুপিছু। সিঁড়ি ছাড়িয়ে ঠিক বাম হাতের দিকে লম্বালম্বি যে-ঘরটা সেটাই লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরী কক্ষে সেদিন থেকে কতোদিন যে প্রাতে ও সন্ধ্যায় পরিমল মিস্ ক্লেইটনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে তার ইতিহাস লিখ্‌লে একখানা মোটা বই হয়ে যায়। সকালে যখন পরিমল এঁর বাড়ীতে আস্‌ত তখন মিস্ নিশ্চয়ই থাক্‌তেন তাঁর পাঠাগারে; এবং অভ্যাসমতো বিনা বাক্যব্যয়ে পরিমল সটান্ সেখানে যেয়ে উপস্থিত হত। বাড়ীর লোকেরা জান্‌ত পরিমলের পাঠাগারে প্রবেশ বাধাহীন। কেউ টু কর্‌ত না। যেদিন ইচ্ছা হত বল্‌ত, 'আস্‌তে পারি কি?' যেদিন বলার প্রয়োজন হয়নি সেদিন না-বল্লে এ-নিয়ে কারুর মাথা ব্যথা হত না।

মিস্ ক্লেইটন্ বই থেকে চোখ্ তুলে হর্ষ-ধ্বনি কর্‌তেন, 'এই যে পরিমল, এসো এসো।'

তারপর আলাপ চল্‌ত গড়গড়িয়ে—তুষারাবৃত পিচ্ছিল ঢালু পথে তুষার-পিণ্ডের মতন, যত গড়িয়ে এগোয় ততই অল্পে অল্পে মুটিয়ে যায়। কখনো ভ্রমণ-কথা, কখনো রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি চর্চ্চা, কখনো বা কষ্টিনষ্টি বয়সের তফাৎকে ডিঙিয়ে দু'টিকে মিলিয়ে-মিশিয়ে অভিন্ন হৃদয় করে তোলে।

পরিমল ভাবে, তাদের কথার সূত্রে যে-যে বিষয় গাঁথা পড়ে তাতে সবই থাকে: শুধু দু'টি ব্যক্তির মধ্যে কেউ কাকে সেই সূত্রে গাঁথা পড়্‌তে দেয় না। ইচ্ছে হয়, মুখ ফুটে জিজ্ঞেস্ করে, 'মিস্ ক্লেইটন্, মন নিয়ে কত আর ঘাত-প্রতিঘাত হবে?—আমাদের হৃদয়ের দ্বার অনিরুদ্ধ হোক্।' কিন্তু মুখও ফোটে না, হৃদয়ও নিরুদ্ধ থেকে যায়। মিস্ সব সময় যে শান্ত সম্ভ্রমের আবরণে আবৃত থাকেন তার কোথাও এতটুকুন ফাঁক নেই। পরিমল ভাবে, সৃষ্টিকর্ত্তা কি এঁর চরিত্রে ফাঁকি রাখেন নি?

প্রকৃত পক্ষে মিস্ একজন নীতিজ্ঞা। তার মানে, "বন্ধু-পরিষদ" নামে লণ্ডনে একটি সংস্কৃতি-সমিতি আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে জর্জ্জ ফক্স্ এই পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তারই সভ্য ইনি। সভ্য বল্‌তে কথায় সভ্য নয়, জীবন দিয়ে সভ্য। সরল জীবনের মধ্যে মানসিক আভিজাত্যকে রূপায়িত কর্‌তে মিস্ রয়েছেন পুরুষবন্ধনহীনা অবিবাহিতা এবং সামাজিক আভিজাত্যের দম্ভকে পাত্ত দেননি বলে হয়েছেন নিরাড়ম্বর ও শান্তিপ্রিয়। নানা দেশীয় সুশিক্ষিত ও বরেণ্য নরনারী ঐ সমিতির কৃষ্টি-প্রচারী কার্য্যাবলীতে যার যার ক্ষমতানুযায়ী অবদানের দ্বারা নিজেদের সম্মানিত বোধ করেন। মিস্ ক্লেইটন এই সমিতির নানা অধিবেশনে

ভারতবর্ষ বিষয়ক গবেষণায় প্রথমাবধি যোগ দিয়ে এসেছেন। ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয়-প্রসঙ্গে তাঁর আমোদ আহ্লাদ উৎসাহ।

মিস্ ক্লেইটন্ অধিকন্তু হৃদয়বতী মহিলা। কিন্তু তাঁর দরদ সম্পূর্ণরূপে আজো আত্ম-প্রকাশ করেনি। এইখানেই পরিমলের দুঃখ। কিন্তু পরিমলই বা কি করতে পারে। সুজিত বলে, 'হৃদয়ের ক্ষত বে-আব্রু করে কে দেখাতে চায় বল্।'

পরিমল বলে, 'ক্ষতকে আলো-বাতাসের স্পর্শ বাঁচিয়ে যে অন্ধকারে গোপন করে রাখে সে তো ক্ষত বাড়িয়ে তোলে। মিস্ ক্লেইটন্ নিজের সহজ জীবনে এই জটিলতা রচনার পক্ষপাতিনী হবেন?'

'প্রেমে নৈরাশ্য থেকে সবই হয়।'

পরিমল মাথা নেড়ে প্রত্যুত্তর দেয়, 'অসম্ভব। এঁর প্রেম সামান্য মানুষের প্রতি—তা-ও শুধু একজনের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে এঁদো ডোবায় পর্য্যবসিত হবে? মিস্ ক্লেইটন্ অতো ছোটো নন্।

সুর উঁচিয়ে সুজিত বলে, 'দেখা যাক্। এখনো তো মোটে পঁয়ত্রিশ, এ তো গৌরীদানের দেশ নয়। এদেশের পক্ষে মিস্ ক্লেইটন্ এখনো তরুণী বা যুবতী। দেখোই না শেষটা, বাপু, কি হয়।'

কী আর হবে! মিস্ ক্লেইটনের বাড়ীতে পূর্ব্ববৎ পরিমলের নেমন্তন্ন হতে থাকে।

একদা হ্যাম্প্‌ষ্টেডের ক্লাবে মিসের নির্দ্দিষ্ট দিন মতো যেতেই পরিমলের চোখের সামনে অতঃপর এক নতুন জগৎ খুলে গেলো—তারুণ্যোচ্ছ্বাসিত লঘু নৃত্য, কৌতুকহাস্য, চটুল চাহনির সম্ভার। তরুণ-তরুণী-মিশ্র ক্লাবে যোগদান পরিমলের কাছে অভিনব হলেও রমণীয় অনুভূতি।

ক্লাব ঘরের ভিতরে মিস্ ক্লেইটন্ খুনি বিশেষে দাঁড়িয়ে গালগল্প করছিলেন। পরিমল ঢুকেছে দেখে দূর দেখে নড্ করলেন।

ঢুকতেই পরিমলের কোটের পিছনে এক টুকরো কাগজ পিন্ দিয়ে এঁটে দিয়েছে গীশা নামে একটি মেয়ে—এই ক্লাবের অন্যতমা সেক্রেটারী এবং এই পাড়ারই অধিবাসিনী। কাগজে লেখা—'মেরী পিক্‌ফোর্ড'—সেই সুন্দরী ললিত-লবঙ্গ-লতা, হলীয়ুড বিজয়িনী ছায়া-চিত্রের মহারাণীর নাম।

পরিমল জিজ্ঞেস্ করছিল, এর মানে কি?

গীশা হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিয়েছিল, 'মানে আর কি? মেরী পিক্‌ফোর্ডের আত্মাকে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলুম।'

অর্থাৎ যে-কেউ ক্লাবে ঢুক্‌বে তার-ই পিঠে এম্‌নিতর কোনো নাম মেরে দেওয়া হয়। অনন্তর আগন্তুক ব্যক্তিটী ক্লাবের উক্ত অধিবেশনে ঐ নামে পরিচিত হবে এবং ঐ নামোচিত ব্যক্তির অভিনয় তাকে করে যেতে হবে—আগা-গোড়া করে যেতে হবে—হাস্যাস্পদ হলেও।

মন্দ নয় তো! ভীম-মার্কা ছেলে পরিমল; সে করবে ছায়া-চিত্রিণীর অভিনয়? পরিহাস আর কাকে বলে!

তবু ভালো, সেই অধিবেশনে এমন একটিও লোক ছিল না (মিস্ ক্লেইটন্ ছাড়া) যাকে সে চেনে। সুতরাং অচিন্ সমাজে যা-তা অভিনয় করে গেলেও তার মানহানি হবে না; বরং ঐ হাস্য-মুখরা চঞ্চলা মেয়েটাকে যদি অভিনয়-ছলে একটু সায়েস্তা করতে পারে, মন্দ কি—মান না বাড়ুক, ফূর্ত্তি বাড়বে তো।

কাছে এসে একবার সহাস্যে তার পৃষ্ঠদেশে চোখ বুলিয়ে গেছেন মিস্ ক্লেইটন্; এবং দূর হতে পরিমলের ঠাট্টা-মস্করার নমুনা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে দেখছিলেন।

হুটোপাটির মধ্যেই ক্লাবের কেক্-চক্‌লেটের সৎকার আরম্ভ হলো। গীশা গলায় বাস্কেট ঝুলিয়ে আরো অনেক পরিবেশিকার সঙ্গে বাস্কেট থেকে খাবার বণ্টন করছে। বেছিকে পরিমল বসেছে এলো সেইদিকে। পরিমলের প্লেটে একেকখানা কেক্ দেয়, আর মোলায়েম সুরে বলে, 'খাও না আরো কিছু।' মেয়েটা কত রঙ্গই না জানে!

খাওয়ার পরেই একটা জল্‌সা বস্‌ল। পরিমল ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে যতোটুকু পারে চোখ-কান দিয়ে গ্রহণ করলে। কিছুক্ষণ চল্ল এইরকম।

এবারে নাচ। পরিমলকে উস্‌খুস্ করতে দেখে গীশা কাছে এসে বল্লে, 'মেরী পিক্‌ফোর্ডের নাচটাচে কেমন অধিকার আছে?'

পরিমল কালোরাতী মুদ্রায় মুখ বাঁকিয়ে বল্লে, 'আমার নাচ সর্ব্ব-সাধারণের কাছে সস্তায় বিকোয় না।'

'বোঝা গেছে।'

গীশা চলে যাচ্ছিল। পরিমল নিজের বেয়াদবীতে লজ্জিত হয়ে মুখ-জোড়া দিলে, 'আমি নাচ জানিনে।'

'বোঝা গেছে।'

বলেই এক হেঁচ্‌কা টানে পরিমলকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে তার মুখোমুখী হয়ে নাচের পদ্ধতিতে তাকে ধর্‌লে, নাচও সুরু করে দিলে। পরিমল নেহাৎ বেকুবের মতন গীশার পায়ের তালের সঙ্গে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' ধরণে সঙ্গত করতে চেষ্টা কর্‌লে—পার্‌লে না। অথচ গীশা হাস্‌তে হাস্‌তে পরিমলকে টেনে হেঁচ্‌ড়ে খেংকাটির মতন নাচের মহলা দিচ্ছে। পরিমলের ইজ্জৎ থাকে না। গীশার হাসিতে যোগ দিতে গিয়ে পরিমলের মনে হচ্ছিল, এক্ষুণি কেঁদে ফেল্‌বে। হাজার হোক্ মরদ যে সে। অতএব নাচের তালের মাথায় চূণকালি পরিয়ে গীশাকে পাল্টা টানে বুকে জড়িয়ে ধর্‌ল এবং বল্ল, 'আমার নাচের ধরণই আলাদা। চাও, এইবার নাচ শিখো আমার কাছে।'

গীশা হাসির হর্‌রার মধ্যে পরিমলের বুকে লুটিয়ে পড়্‌ল। মিস্ ক্লেইটন্ গীশা-পরিমলের যুগল-মিলন লক্ষ্য কর্‌লেন।

আবার পরের সপ্তাহে ক্লাবের নৈশ অধিবেশন। পরিমলের সঙ্গে দেখা হতেই গীশা পাশে এসে অভিনন্দন কর্‌লে। পরিমলের মনে হলো যেন গীশা তারই উপস্থিতি অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল। মিস্ ক্লেইটন্ পরিমলকে সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন। তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করলে গীশা: ক্ষণেকের তরে মিসের মুখের শুভ্র স্বচ্ছতা অন্তর্হিত হয়ে মুখখানা কাঠ হয়ে গেলো।

মিস্ পরিমলকে গীশার হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘরের ইতি-উতি অভিমুখে যেন কা'কে খুঁজ্‌ছেন এমনি-ধারা কিছুকাল বেড়িয়ে কোনো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ চালালেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে গীশা ও পরিমলকে অনুসরণ না করে স্থির থাক্‌তে পার্‌ছিল না।

বন্ধুেরা যখন গল্পগুজব বেশ জমিয়ে নিয়েছেন তরুণ-তরুণীরা তারই মধ্যে এক খেলা আরম্ভ করে দিলে।

প্রারম্ভেই খেলা সম্বন্ধে পরিমলকে এক আধ কথায় নমুনা দিয়ে গীশা নব-বন্ধুর সাহচর্য্য দাবী করার ভঙ্গীতে ইসারা কর্‌লে। গীশার রকম সকম যেমন তাতে অনিবার্য্য সম্মতি লাভ তার ভাগ্যে ঘট্‌বেই। গীশা বন্ধুকে সঙ্গী করে এলো ঘরের বাইরে। ভিতরে অন্তেরা বৃত্তাকারে বসে এদের প্রত্যাগমন অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল।

গীশা পরিমলকে নিরিবিলিতে বল্লে, 'আমি হবো নীরো—সেই যে রোমান্ রাজা, রোমের অগ্নিকাণ্ডও যাকে বংশী-বাদন থেকে নিবৃত্ত কর্‌তে পারেনি। আর তুমি হও তার বাঁশী। কেমন?' এই বলে পরিমলের থুত্‌নীতে দিলে এক টোকা।

আত্ম-সম্মান-বোধে উত্তপ্ত পরিমল গম্ভীর চালে গীশার নাক ধরে এক টান দিলে। তারপর বল্লে, 'মরি মরি, উনি হবেন রাজা আর আমি কিনা বাঁশি! আমি নীরো—তুমি বাঁশি।'

গীশা বল্লে, 'না, আমি নীরোর বাঁশি হবো না। এতো নিরর্থক কপট শূন্যগর্ভ বাঁশি বোধ করি দুনিয়ায় দুটো হয়নি।...আহা, দেরী হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি একটা যা-হয় ঠিক করো।' বলেই পরিমলের দুই কান দুই হাতে মলে দিলে।

পরিমল গীশাকে একটি পুরুষোচিত প্রত্যুত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু দুঃসময় চিন্তা করে থাম্‌ল। বল্লে, 'তোমাকে বাঁশি হতেই হবে, বলে দিচ্ছি। কৃষ্ণের বাঁশি হও তুমি—আমি হবো কৃষ্ণ। জানো তো, এই বাঁশির রবে কৃষ্ণসখারা গোচারণে চল্‌ত, গো-বলীবর্দ্দ-কুল বিচরণে এবং গোপিনীগণ ক্ষিপ্র পদ-চারণে বেরোত।'

গীশা বল্লে, 'ও! ঐ মহাভারতের কৃষ্ণ? যাহোক্ কপাল ভালো। তোমার মিস্ ক্লেইটনের দয়ায় গল্পটি শোনা আছে। বাঁচালে, বাপু, ভাই সই। চলো এই বেলা দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

প্রত্যাবৃত্ত হয়ে তারা কক্ষের [illegible] স্থান অধিকার করে বস্‌লে।

বৃদ্ধের খেলোয়াড়-গোষ্ঠীর মধ্যে একে-একে প্রত্যেকে প্রশ্ন করছে বার করতে এদের নাম। যেমন কেউ জিজ্ঞেস্ করলে পরিমলকে,

'আপনি কি রাজা?'

জবাব হলো, 'হাঁ।'

আরেকজন: 'চতুর্দ্দশ লুঁই?'

পরিমল: 'না।'

আরেকজন: 'ফরাসী দেশের রাজা?'

'না।'

'য়ুরোপের?'

'না।'

'ভারতের?'

'হাঁ।'

ভারতের ইতিহাস-কোষ থেকে নৃপতির নাম ঘেঁটে বার করা সভ্যদের পক্ষে দুরূহ। কেউ বল্লে, 'পাটৌড়ীর নবাব?' কেউ বল্লে, 'আলোয়ারের রাজা?'

যখন কারুর জবাবই যুৎসই হলো না তখন রীতিমতন একটা impasse-র সৃষ্টি হলো। বয়স্কের দলেও পড়্‌ল সাড়া। অবশেষে মিস্ ক্রেইটন্ প্রশ্ন করলেন,

'আধুনিক, পৌরাণিক না ঐতিহাসিক রাজা?'

পরিমল বল্লে, 'ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দুই-ই।'

খেলার নিয়ম মাফিক্ একেকজনে প্রশ্ন করার কথা। কিন্তু ঐ impasse-র দরুণ একা মিস্ ক্রেইটন্ই প্রশ্ন করতে লাগ্‌লেন:

'রামায়ণের রাজা?'

'না।'

'মহাভারতের?'

'হাঁ।'

'পাণ্ডু?'

'না।'

'ইনি কি যোদ্ধাও?'

'হাঁ।'

'কৃষ্ণ?'

'হাঁ।'

ক্রীড়াচক্রস্থিত সকলে মিস্ ক্রেইটনের বিজ্ঞাবুদ্ধিতে এতোক্ষণ প্রায় তাক্ লেগে যাচ্ছিল। কৃষ্ণের নাম শুনে কিন্তু অনেকেরই ধড়ে যেন নাড়া পড়্‌ল। আরে কৃষ্ণ?—সেই 'ত্রাণকর্ত্তা' ভারতীয় যীশু? আর যায় কোথা! অনেকেই মাথা নাড়্‌লেন—বটে বটে।

কিন্তু খেলা শেষ হয়নি। গীশা কার ভূমিকায় নেমেছে, তাই এখন প্রশ্নচ্ছলে নির্দ্ধারণীয়। তবে গীশাকে খেলার প্রথামতো কৃষ্ণের সম্পর্কিত কিছু হতেই হবে।

মিস্ ক্রেইটন্ই জিজ্ঞেস্ করলেন, হাসি-হাসি মুখে, 'কি তুমি রাধা?'

ব্রীড়াবনতমুখী গীশা বল্লে, 'না।'

মিস্ই প্রশ্ন করতে লাগ্‌লেন, 'যশোদা?'

'না।'

ঐ ক্লাবে একজন ভারত-প্রত্যাগত ইংরেজ অরিয়েন্টালিষ্ট্ ছিলেন। তিনি যশোদার নামোল্লেখে বিমূঢ়বৎ মিস্ ক্রেইটন্‌কে প্রশ্ন করলেন, 'এই নাম তো মহাভারতে কোথাও পেয়েছি বলে মনে হয় না?'

অরিয়েন্টালিষ্টের সম্মানার্থ মিস্ শশব্যস্তে বল্লেন, 'আপনার বোধ হয় স্মৃতি-ভ্রম হচ্ছে; ইনি কৃষ্ণের ধাত্রী।'

অমনি সোৎসাহে অরিয়েন্টালিষ্ট্ বল্লেন, 'ঠিক ঠিক। আপনার কথাই ঠিক।' এবং বিজ্ঞের মত বার কয়েক মস্তক আন্দোলন করলেন। পরিমলের দুঃখে হাসি পাচ্ছিল।

মিস্ পুনঃ প্রশ্ন করলেন, 'স্ত্রী না পুরুষ?'

গীশা বল্লে, 'কোনোটাই নয়।'

'পশু?'

'তা-ও নয়।'

'তাহলে কি বাঁশি?'

'হাঁ।'

সকলে আনন্দরব করলেন। অরিয়েন্টালিষ্ট্ মিস্ ক্রেইটনের বিজ্ঞাবত্তার সুখ্যাতি করতে করতে বল্লেন, আগামী বন্ধু-পরিষদের অধিবেশনে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর আলোচনার পক্ষে তিনি প্রস্তাব উপস্থিত করবেন।

ক্লাব থেকে বাড়ী ফেরার পথে পরিমল গীশাকে টিট্‌কারী দিলে, 'কি তুমি রাধা?'

কুটিল কটাক্ষ হেনে গীশা শুধু বল্লে, 'বোঝা গেছে।'

পরিমল গীশাকে বন্দিনী করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত কস্কে পালিয়ে গীশা দিলে ছুট্ ডানহাতি, রাস্তাটায় বাড়ীর দিকে। পরিমল দূর থেকে 'গুড নাইট' ছুড়ে দিলে। চাপা হাসিতে নীরব নিঝুম পথ মৃদু গুঞ্জিত ক'রে গীশা চলে গেলো।

পরের দিন সকাল বেলায় 'নিত্যকৃত্য' মতো মিস্ ক্লেইটন্ লাইব্রেরী ঘরে ডায়েরী নিয়ে দিনলিপি লিখ্‌তে বস্‌লেন। কয়েকটি ফিতা বই-এর পাতার বাইরে ঝুলছিল। ফিতা-গুলি সব একরঙের নয়। কোনোটা নীল কোনোটা পীত কোনোটা বা সবুজ—এম্‌নি হরেক রঙের ফিতা। তারই মধ্যে একটি ফিতা—বাইরের রঙটা সাদা এবং যেটুকু বইর ভিতরে তার রঙটা লাল, টক্‌টকে লাল। ডায়েরী ঠিক ঐখানটায় খুললেন। লেখা পাতাগুলো পেছন দিকে উল্টিয়ে একেবারে এই বিভাগের গোড়াকার পৃষ্ঠায় এসে তাঁর আঙুল থাম্‌ল।

পড়্‌লেন নিজের হাতের গুটগুট লেখা পরিষ্কার: মানুষের প্রতি মানুষের যৌন আকর্ষণকে জীব-বৃদ্ধির সমর্থক যুক্তি হিসেবে দেখা আমার রীতি। এই আকর্ষণকে উপাদান করে ষ্টেট্ সমাজ বা জাতির অতি-জনন বা জন-নিয়ন্ত্রণ যথা-রুচি বিধান করতে পারে। মানি এ কথা। কিন্তু এই আকর্ষণকে জাতির বা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ থেকে প্রত্যাহৃত করে প্রেমার্ত্ত স্ত্রী-পুরুষের ব্যক্তিগত সম্ভোগ-সর্বস্বতায় পরিপূর্ণ হতে দেওয়া কি বৃহত্তম মনুষ্যত্বের দিক থেকে সঙ্কীর্ণতা নয়? ব্যক্তিনিবদ্ধ আত্মার ক্ষুধার চেয়েও কি সমাজের তথা জাতির তথা বিরাট মানবাত্মার পূর্ণতর পূর্ণতম ক্ষুধার পরিতৃপ্তি পরম বাঞ্ছনীয় নয়?···

এগিয়ে আরেক পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পড়লেন: ব্যক্তি যদি না বাঁচে, মরে যায়, তবু জাতি বেঁচে থাকে। একের অভাবে অনেকের মধ্যে কম্‌তি পড়ে যায়, পূর্ণ বিলয় ঘটে না। কিন্তু অনেকের পক্ষে তা নয়। অনেক যখন যায়, একও তখন তারি মধ্যে গেছে। একের চেয়ে তাই অনেকের প্রাধান্য।······আমি কি হেঁয়ালি করছি?······ আমার প্রাণ মন চিত্ত যে শুধু অনেককে নিয়েই পরিতৃপ্ত হতে চায় না—একককেও চায়।······

মুহূর্ত্তকাল গুম্ হয়ে রইলেন। তারপর পাতা উল্টে গেলেন শেষ দিকে। লিখ্‌তে কলম তুললেন। খস্ খস্ করে লিখ্‌লেন: মনুষ্যত্বকে মনে হচ্ছে যেন বিরাট প্রাসাদ। প্রাসাদের ঊর্দ্ধতম কক্ষগুলি স্বর্গলোক পর্য্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। আর তারি সিংহ-দরজায় রক্ষীরূপে অধিষ্ঠিত হৃদয়-দেবতা। এঁর নির্দেশ তুচ্ছ করে অগ্রসর হবার মতন অভয়-পত্র মানুষের কই?

কলমটা খাতার পাশে রেখে একবার উন্মুক্ত বাতায়নের ফাঁকে আকাশের দিকে তাকালেন। আবার কলম হাতে তুললেন; লিখ্‌লেন এক লাইন্: আমি কি সে নির্দেশ পেয়েছি?

এমন সময় দরজা-গোড়ায় পরিমলের শুভ আবির্ভাব।

লেখনী রেখে বলে উঠ্‌লেন মিস্, 'পরিমল, আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলুম। ঐ আকাশের দিকে নীলিমায় আমি তোমার আগমন প্রত্যক্ষ করছিলুম।'

পরিমলও ঢুকতে ঢুকতে উদ্দীপ্ত সুরে বল্লে, 'ভবিতব্যতা কে খণ্ডাতে পারে? এই দেখুন না, আপনার দিব্য দৃষ্টির সমান্তরালে আমারও চিত্তে আগমনের প্রেরণা জাগ্‌ল। ঐ দিকে আকাশটাই মাঝখানের সমস্ত শূন্যখানি ভরাট্ করে যোগাযোগ করে দিলে।'

উপযুক্ত উত্তর দানের তৃপ্তিতে পরিমল খুশী। একেবারে মিস্ ক্লেইটনের সাম্‌নাসাম্‌নি এসে বস্‌লে।

মিস্ বল্লেন, 'চৌধুরী, তুমি কবি।'

পরিমল বল্লে, 'সুতরাং আপনিও।'

মিস্ একটুখানি সচকিত হয়ে বল্লেন, 'মানে?'

'কবির মর্ম্ম কি অকবিতে বোঝে কখনো?'

মিস্ তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রেরণায় বল্লেন, 'তাহলে কাব্য-সমালোচকদেরও তুমি কবি বোল্‌বে?'

পরিমল বল্লে, 'নিশ্চয়ই—ততোটুকু, যতোটুকু তারা সমঝদার। অপিচ স্বাধীনভাবে যদি রস-প্রকাশ করতে পারেন তাহলে তো পুরোপুরি কবি বলব।'

'আচ্ছা চৌধুরী, কাব্যের উৎস কোথায় বলো দিকিন্?'

'কেন—হৃদয়?'

পরিমল আজ মিস্ ক্রেইটনের বাক্যালাপে হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করছিল। না থেমে প্রতিপ্রশ্ন করলে, 'একটা বিষয়ে আপনার মত জানতে ইচ্ছে হয় আমার: হৃদয়ের সঙ্গে [illegible] সম্পর্ক কি, সেটা বলুন দেখি?'

'[illegible] তো তুমিই দিলে, পরিমল।'

'কই, আমি কি বলেছি—কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে রস। মানুষের জীবনে এই রসের অনুভূতি হৃদয়ের আনন্দরূপে আত্ম-প্রকাশ করে?'

'এই তো তুমিই উত্তর দিলে তোমার প্রশ্নের।'

'আগে তো দিইনি।'

'কিন্তু তুমি যে এই উত্তর দেবে তা আমি জানতুম।'

'কি রকম?'

'বাঃ, তোমার মন আমি জানিনে?'

'আপনি তাহলে আমাকে বোঝেন?'

'তুমি যেমনটি আমাকে বোঝো।'

'সে কি রকম আবার?'

'এই আধেক আলো, আধেক অন্ধকার।'

'এই বুঝি বোঝা হলো?'

'এর বেশী বুঝলে যে একে অন্তের মধ্যে কাব্য-রস উথলে উঠ্‌ত, চৌধুরী। আমাদের দু'জনেরই আনন্দের লক্ষ্য হয়ে উঠ্‌ত একই রস। কাব্য যে অন্তত দু'টো ব্যক্তির মধ্যে সমন্বিত আনন্দময় রসের প্রকাশ।'

'অন্তত দু'টো ব্যক্তি কেন?'

'তৃতীয় ব্যক্তিও যদি একই রস একই সঙ্গে উপভোগ করতে থাকে তাহলেও কাব্যের অভিব্যক্তি হয়। তবে আমি ভাবছিলুম কিনা, কেবল দু'টিতেই বুঝি রসের অনুভূতি নিবিড়তর হওয়া সম্ভব!—একজন রসকে প্রকাশ কোরবে, অন্যজনে তা-ই প্রকাশ করতে সাহায্য কোরবে; একজনে দেবে যে-আনন্দ অন্যজনে প্রতিদানে তা-ই ফেনিয়ে বাড়িয়ে তুলবে। জীবন কাব্যময় হয়ে উঠবে।'

পরিমল মিস্ ক্রেইটনের কাছে ইত্যাকার উত্তর প্রত্যাশা করেনি। সে উৎসাহিত হয়ে বল্লে, 'তৃতীয় কোনো অরসিক তো আমাদের কাব্যচর্চায় নেই, মিস্ ক্রেইটন্।'

'আছে কিনা তাই ভাববার কথা। কতো অশরীরী তৃতীয় অরসিক, ভূতের মতন, দ্বৈত জীবন-কাব্যে বিরোধ ঘটিয়ে উৎপাত ঘটিয়ে, জীবন-কাব্যকে জীবন-নাট্যে—ট্র্যাজিক্ নাট্যে—রূপান্তরিত করে, পরিমল! তুমি ছেলেমানুষ কিনা, তাই কাব্যের মিলনটাকেই বড়ো করে দেখো, নাট্যের বাস্তব-জীবন-সম্পৃক্ত বিরোধটা তোমার চোখ এড়িয়ে যায়।'

তরুণ পরিমলের সহসা মনে হলো, বিধাতা যদি এতোদিন পরে কৃপা করে মিস্ ক্রেইটনের মুখ খুলে দিলেন, তবে এমনি ধারা তাঁকে মনে মেরে রাখলেন কেন? মিস্ ক্রেইটন্ কেন আশঙ্কা-সন্দেহ-ভয় বর্জ্জিতা দ্বৈত-জীবনকাব্য-ঘটন পটীয়সী আশা-উচ্ছলা সবলা মনোহারিণী ললনা রূপে জীবন ক্ষেপন করেন না!

পরিমল মাঝে মাঝে টেবিলে মেলে-রাখা ডায়েরীর দিকে চেয়ে দেখছিল। তার জিজ্ঞাসু চাউনির উত্তর দিলেন মিস্ 'এ আমার মানস।'

'মানস'—ও! 'আপনার নিজের দিনলিপি?'

পরিমল বইখানাকে টেনে কাছে এনে দেখলে, মোরক্কো মলাটে সোনার অক্ষরে লেখা 'My Mind'। পরিমল তার মনের অজান্তে আরেকটি সম্ভাবিত ইংরেজী নাম উচ্চারণ করে ফেল্লে—My Memoirs—সাধারণত মামুলি ধরণে যা থাকতে পারত।

মিস্ তৎক্ষণাৎ বল্লেন, 'না,. না জীবনেতিহাস বলতে কল্পলোকে আমার মানসিক অন্তঃসন্ধান ছাড়া আর বড়ো কিছু অন্য বালাই নেই। তাইতো আমি নাম রেখেছি 'মানস'।

পরিমল সুযোগ পেয়ে বল্লে, 'কল্পলোক থেকে বাস্তব-লোকে আপনি প্রকাশিত হোন্ না কেন? জীবন-কাব্যের অর্দ্ধেক পরিপূর্ণতা তো বাস্তবতার মধ্যে, মিস্ ক্রেইটন্।'

মিস্ সুধোলেন, 'সেজন্যেই আর কাব্য হলো না, পরিমল। সৃষ্টিকর্ত্তা স্বকীয় কল্পলোক থেকে যে রসের ধারা বস্তু লোকে উৎসারিত করে দিলেন তাইতেই তো তাঁর জীবন কাব্যে পরিণত হলো। তা কি বুঝি না? তাইতেই তো ব্রহ্মা কবি—কাব্য তাঁর সৃষ্টি, পৃথ্বীর নরনারী আর লোকান্তরীণ গন্ধর্ব কিন্নর দেবদেবী যক্ষরক্ষের হৃদয়-বেদ এই কাব্য। আমার জীবনে হলো উল্টো: হৃদয়ের বিস্তার

কর্মে সার্থকতা পেলে না—এমন কি গল্পকাব্যেও পেলে না সার্থকতা; একেবারে সেই আদিম অন্ধকারের মধ্যে রয়ে গেলুম যেখানে আর অস্ফুট ভাষার সঙ্গে শুধু লুকোচুরীই করে মরছে।'

পরিমল লক্ষ্য করলে, মিস্ ক্রেইটনের মুখের দীপ্তি চোখের সুদূর দৃষ্টি হৃদয়ের সরসতায় ডুবুডুবে ভাব ধারণ করে আছে। তার ইচ্ছে হয় সান্ত্বনা দিয়ে বলে—ওগো অভিসপ্তা রমণী! অন্ধকার যে আলোরই রূপান্তর, অভিশাপেও যে শুভাশীষ্ লুক্কায়িত থাকে, ঘনকৃষ্ণ-মেঘখণ্ডের সীমান্তেও তো শুভ্র রজত-রেখা দেখা দেয়;—তোমার ভয় কি?

কিন্তু মুখে কিছুই বলে না। মনের ভাব চেপে অন্তকথা পাড়ে। বলে, 'আপনি এতো হরেক রঙের ফিতা জুতেছেন বুঝি ডায়েরীর বিষয়-বিভাগগুলি চিহ্নিত করার জন্যে?'

মিস্ উত্তর দেন, 'হুঁ।'

'আচ্ছা, সব ফিতারই একেক্ রকম রঙ্; এইটে শুধু দু'রঙা কেন?' বলে ঐ সাদা-লাল ফিতাটা তুলে ধরলে।

মিস্ ধীরস্বরে বল্লেন, 'এ আমার হৃদয়-গত বিবরণীর বিভাগ কিনা।'

'তা যেন বুঝ্লাম; দু'রঙ্ কেন?'

'কারুর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ যদি দৃপ্ত শিখার লালিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে অথচ তার প্রকাশ যদি বাইরে কিছু না হয় তাহলে তুমি একে কী বল্বে?—আমার বক্তব্য যা বলেছি রূপকের মধ্য দিয়ে: সাদা মানে রঙের অভাব—অপ্রকাশ অন্ধকার; লাল মানে মৌলিক রঙ্—প্রকাশ, দীপ্তির চরম। কেমন হয়েছে?'

পরিমল বল্লে, 'অসম্ভব রকম সুন্দর কল্পনা এবং অসম্ভব রকম সুন্দর অভিব্যক্তি। রীতিমতন কাব্য।'

মিস্ উত্তর করলেন, 'কাব্য নয়, পরিমল—নাটক।'

মতান্তরেও পরিমলের অমিত উৎসাহ। সে বল্লে, 'তবু তো শিল্প-কর্ম্ম!'

পরিমল বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করে রেখে দিলে। মিস্ ক্রেইটন্ পরিমলের ঢলঢলে মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, 'চৌধুরী, আমি তোমার একখানা ছবি আঁকব। তোমাকে রোজ ঘণ্টা আধ-ঘণ্টা Sitting দিতে হবে আমার এই লাইব্রেরী ঘরে।'

'আপনি ছবি আঁকেন?' জিজ্ঞেস্ করলে পরিমল।

মিস্ পরিমলকে লাইব্রেরী-ঘরের দেয়ালে টাঙানো কয়েকখানা দ্বিবর্ণ ত্রিবর্ণ ও বহুবর্ণ ছবি ও ছোটো ছোটো দু'খানা চিত্রিত আলেখ্য দেখালেন—সবগুলিই তাঁর নিজের অঙ্কন-ক্ষমতার অভিজ্ঞান।

পরিমল শুধোলে, 'আপনার আঁকা?'

মিস্ বল্লেন, 'এবারে তোমার ছবি একখানা এঁকে তুল্ব, বুঝ্লে? ঐ দেখ্ছো, চিত্র-ফলকে কেনভাস্ চড়িয়ে রেখেছি। বলো, কোন্ সময়ে তোমার আস্তে সুবিধে। আমার মনে হয় বিকেল বেলাই প্রশস্ত—তোমার পক্ষে, আমার পক্ষেও।

পরিমল বল্লে, 'আমার আবার ছবি!'

মিস্ ক্রেইটন্ পরিমলের মুখ একপাশ থেকে ক্ষণেক পরিবীক্ষণ করলেন; তারপর কাছে এসে তার মুখখানা দু'হাতের মধ্যে সাদরে তুলে ধরে ইন্দীবর চক্ষুদ্বয় পরিমলের মুখের 'পরে ন্যস্ত করে বল্লেন, 'চৌধুরী, তোমার মুখখানা কী সুন্দর! প্রোফাইল্ আরো সুন্দর।'

পরিমল লাল হয়ে উঠ্ল। অনন্তর তখনকার মতো কথা দিয়ে গেলো যে, কিছুদিন রোজ বিকেলে Sitting দিয়ে যাবে।

প্রথম দু'তিন দিন বেশ চল্ল। রীতিমতন ভাটা পড়তে আরম্ভ করল দ্বিতীয় সপ্তাহে। ছবিখানা অনেকদূর এগিয়েছে কিন্তু এই শেষের দিক্টায়ই পরিমলের উপস্থিতি অধিক প্রয়োজনীয়, যদিও একসঙ্গে তিনদিন তার দেখাই নেই।

মিস্ ক্রেইটন্ যথাসময়ে রোজ অপেক্ষা করে থাকেন। অবশেষে একদিন ব্যর্থকাম হয়ে বিকেলে নিকটস্থ ক্যাম্প্ ষ্ট্রেডের অধিত্যকায় বেড়াতে চল্লেন। হিলিমিলি রাস্তায় দু'জন একজন নীরব সান্ধ্যভ্রমণোদ্দেশে বেরিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে পথিপার্শ্বস্থ তরুশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে মিস্ দেখ্ছিলেন, পথ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে একটি তরুণী দৌড়ে পালাচ্ছে, আর তাকে ধর্বার জন্যে তার পিছু পিছু ছুটছে একটি তরুণ। সন্ধ্যার আব্ছা অন্ধকারের পটভূমিতে অনতিস্ফুট

প্রান্তরের মধ্যে তরুণ-তরুণীর দৌড়াদৌড়ি যেন স্বপ্নময় তন্দ্রালু রাত্রিশেষের ভাঙা ভাঙা স্বপ্ন-কণার মতো লাগ্‌ছিল। মেয়েটি দৌড়ে দৌড়ে হয়রাণ হয়ে থমকে দাঁড়ালো, তরুণ তাকে দু'কাঁধে দু'হাত দিয়ে বন্দী করলে। তরুণী খিল্‌খিল্‌ করে খালি হাস্‌ছে আর ছাড়া পাবার জন্যে দুষ্টুমি-ভরা চোখে প্রার্থনা করছে। শেষে যুবক শান্তগতিতে তরুণীর হাত নিজ হাতে লয়ে এগিয়ে চল্ল। তরুণ-তরুণীর ঘুম-ভাঙানিয়া লীলাকলার উন্মাদনায় প্রৌঢ়া আনিদ্রিতা সন্ধ্যা মাঝে মাঝে শিউরে উঠ্‌ছিলেন তরু-শ্রেণীর পত্র-মর্ম্মর তাই মিস ক্লেইটনের কর্ণকুহরে এসে ধ্বনিত হচ্ছিল। আঁকাবাঁকা পথে তরুণ-তরুণী অদৃশ্য হয়ে গেলো; মিস্‌-ও ধীরমন্থর পদে গৃহাভিমুখে ফিরলেন।

পরের দিন সকালে মিস্‌ ক্লেইটনের লাইব্রেরী-ঘরের দরজা থেকে পরিমলের গলার আওয়াজ হলো, 'আস্‌তে পারি কি?'

মিস্‌ অভ্যর্থনা করতে দাঁড়ালেন। বল্লেন,- 'এদ্দিন্‌ আসোনি কেন?'

'কাজের হিড়িকে আস্‌তে পারি কই?'

'সে কি, তোমার পরীক্ষা তো অগাষ্টে। এখন মোটে জুন মাস। এক্ষুণি অনবসর তোমার?'

'টিউটরিয়াল্‌ জমে যায় ভয়ানক। কিছুদিন একটু খেটেখুটে নিলুম। পরীক্ষার সময়ও কাজে লাগ্‌বে।'

'ভালো ছেলে, ভালো ছেলে। খাটুবে বৈকি। তবে কিনা ছবির বিষয়টা আশা করি ভুলেই গেছো।'

'সেই কথাই তো বলতে এলাম।'

'এলেই বা কেন? দু'লাইনের চিঠিতে সৌজন্য-সূচক মুক্তি-ভিক্ষা করলেই তো হ'ত।'

মিস্‌ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। পরিমলের ভয়ানক লজ্জা লাগ্‌ছিল। গলার ভিতরে লজ্জায় দম আটুকে সে বল্লে, 'দেখ্‌বেন, আজ থেকে আর কামাই হবে না।'

মিস্‌ বল্লেন, 'ধন্যবাদ, চৌধুরী।' একটু শ্লেষের মতন শোনালো। তারপর বল্লেন, 'ঐ দেখো, ছবির রঙ্‌ পুরোনো হতে চল্ল। নতুন রঙ্‌ বসাতে গেলেই এখন একটু গোঁজামিলা গোছের হবেই হবে।'

পরিমল আরো লজ্জিত হলো। বস্তুত অনুশোচনা সব সময় নিরর্থক নয় ভেবে বল্লে, 'তারী তো আমার ছবি! তারই জন্যে আপনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন।'

মিস্‌ মুচ্‌কি হেসে বল্লেন, 'ওই তোমার ভুল। তোমার সুন্দর মুখের জন্যেই যে আমার এই চেষ্টা।'

পরিমল বল্লে, 'ইস্‌?'

মিস্‌ বল্লেন, 'সত্যি তাই। সুন্দর জিনিষের কী দাম তা-ও তোমাকে বোঝাতে হবে, পরিমল? ও! কাল যদি তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে আস্‌তে—দেখ্‌তে প্রকৃতির এক অভিনব রূপ। রূপ কতো মুগ্ধকারী হয় কাল বিকেলে তার আভাস মিলেছে হ্যাম্প্‌ষ্টেডে।'

'অধিত্যকার দিকে তো কাল আমরাও গেছ্‌লুম।'

'তাই নাকি—কখন?'

'ঠিক সন্ধ্যার সময় গেছ্‌লুম।'

'বটে? প্রকৃতির শান্ত ওজঃস্বিতার রূপ কেমন মনে হলো?'

'আমরা তো দৌড়োদৌড়ি করে কাটালুম।'

'আর কে ছিল তোমার সঙ্গে—সুজিত?'

'না,—'

'কে?'

পরিমল কোটের দু'পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে বল্লে, 'শীশা।'

'ও!'

মিস্‌ ক্লেইটন্‌ একখানা কোচে বসে পড়লেন। পরিমলকেও বস্‌তে বল্লেন।

অতঃপর ছবি সম্বন্ধে যখন আলাপ হচ্ছিল তখন একবার পরিমল বল্লে, 'শীশার খুব ইচ্ছে যে ছবি আঁকতে শেখে। কিছু কিছু অভ্যাস করেছে নিজেই। টেক্‌নিক্‌টা ভালো করে জানতে তার আগ্রহ।'

মিস্‌ বল্লেন, 'আমার কাছে স্কেচ্‌ তুলতে শেখার খানকয়েক ভালো বই আছে। শীশাকে বলে দিও, এখানে এসে দেখে শুনে শিখে নেবে।'

পরিমল সম্মতি জানালে, 'হুঁ, বোল্‌ব।'

তার চলে যাওয়ার পর দিনলিপিতে মিস্‌ লিখ্‌লেন:

"কেউ যদি আমায় জিজ্ঞেস করে—জগতে সবার চেয়ে

অসহনীয় কি? আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কোর্‌ব—হৃদয় বেদনা।"

অমনি উঠে অসমাপ্ত ছবির সুমুখে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগ্‌লেন।

যাই হোক্‌, অপরাহ্ণ-যোগে নিয়মিত চিত্রণের ফলে ছবি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এলো। এদিকে গীশাও মাঝে মাঝে আস্‌ছে মিস্‌ ক্লেইটনের বাড়ীতে টেক্‌নিক শিখ্‌তে।

গীশাকে মিস্‌ তাঁর লাইব্রেরীর সংগ্রহের খান-কয় বইও পড়্‌তে দিয়েছেন এবং বলেছেন, কোনো বিষয় বুঝ্‌তে ওর কষ্ট হলে তা যেন অকুণ্ঠিত মনে তাঁকে জিজ্ঞেস করে।

গীশা যখনই বই ফিরিয়ে দেয় তখনই মিস্‌ স্বেচ্ছাক্রমে সেই পুঁথির দুটো একটা তথ্য নিয়ে কথা পাড়েন। মিস্‌ ক্লেইটনের পরিপাটি আলোচনা শুন্‌তে শুন্‌তে গীশার মস্তিষ্কের চিন্তাগত জঞ্জাল কেটে যায়। প্রসন্ন মনে বাড়ী ফির্‌তে ফির্‌তে গীশা ভাবে, এই যে এইমাত্র তার পাশ দিয়ে একদল লোক অতিক্রান্ত হলো নিশ্চয়ই তারা তার মতন উচ্চ বিষয়ের গবেষণায় কাল কাটিয়ে ফিরে যাচ্ছে না, নিশ্চয়ই তারা তার তুলনায় পরিচ্ছিন্ন মানস-ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি হ'য়ে ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে, সে নিজে তাদের চেয়ে ঢের ভালো—অনেকখানি উঁচুতে উঠে পড়েছে।...আর ঐ যে মহিলা উদ্ধত পদক্ষেপে আশে পাশে না তাকিয়ে বন্দুকের গোলার বেগে নির্ম্মম গর্ব্বে সোজাসুজি ছুটে চলেছেন তার আভিজাত্য নিশ্চয়ই মিস্‌ ক্লেইটনের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর—তার পরিধেয় পোষাক মিসের চাইতে মূল্যবান্‌ হলেও; কে জানে যে ইনি সাজ-পোষাকের 'মুখোসে আপনার দীনহীন স্বভাবগতিক ঘৃণ্য জীবন-যাপনের নীতি-পদ্ধতি লুকিয়ে রাখ্‌ছেন না। এমন তো বহু দেখা যায়। কিন্তু বিদ্যাবিনয়সম্পন্না মিস্‌ ক্লেইটন্‌?—স্বভাব-শুদ্ধ স্বচ্ছ-চিত্ত অভিজাত-রত্ন! উঃ! মিস্‌ ক্লেইটনের মতো হতে পার্‌লে...

গীশা সোৎসাহে ছবি আঁক্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। মিস্‌ও দিব্য তৃপ্তিতে সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌লেন।

গীশা দুখিনী মেয়ে। অনেকক্ষণ একাসনে বস্‌তে তার কষ্ট হয়। অধিকন্তু অতি চঞ্চলা সে। মনে মনে তার দৌড়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মিস্‌ ক্লেইটনের লাইব্রেরী তো একটা মাঠ নয় যে দৌড়ুবে। অতএব তার জন্যে একখানা সুখাসন লাইব্রেরী ঘরে রচিত হলো; গীশা এসে ঐখানেই বসে। তারই পাশে ছোট্ট [illegible] একখানি—তাতে ছবি আঁকে। ইচ্ছে ধরলে গুন্‌গুন্‌ [illegible] আপন মনে গান গায়! মিস্‌ ক্লেইটন্‌ গীশার [illegible] নিজেও কর্ম্ম-চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

অঙ্কন-প্রসঙ্গে দু'জনের মধ্যে পরিমলের কথা চলে।

গীশা একদিন বলে বস্‌লে, বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার মাখামাখির যুগে আধুনিক কালে অসবর্ণ বিবাহ যদি রীতি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে মিশ্রণের ফলে উৎকৃষ্ট সন্তান-সন্ততির সম্ভাবনা আছে। পরিমলের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয় তাহলে সন্তানগুলি কি ভালো হবে না?

গীশা আরও বল্লে, বাড়ীতে বাপ-মা'র কাছে একথা তুল্‌তেও সে ভয় পায়। কারণ তারা এমনি ধারা তত্ত্ব-বিচার কখনো করেন নি। মিস্‌ ক্লেইটন্‌ যদি স্বপক্ষে মত দেন তাহলে গীশার অন্তত সাহস বাড়ে।

কথা কইতে কইতে গীশা ছবি আঁকা বন্ধ করে মিসের কাছে পরামর্শের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুন্‌তে শুন্‌তে মিস্‌ আসনে পশ্চাদ্দিকে এলিয়ে পড়েন, চিন্তা-মগ্না হন্‌, গীশার মুখে তাকিয়ে দেখেন উদ্বেগ আশা আকাঙ্ক্ষা, পরে ধীরে অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস্‌ করেন, 'গীশা, তুমি পরিমলকে বিয়ে করতে চাও কেন?'

'ওকে আমার খুব ভালো লাগে।'

'এই শুধু?'

'ওকে যেমন ভালো লাগে আর কাউকে ঠিক তেমনটি লাগে না।'

'তা বিয়ে না কর্‌লে হয় না?'

'বিয়ে না কর্‌লে ওকে কাছে পাবো কি করে?'

'কাছে পাবার-ও কি কিছু দরকার আছে, গীশা?'

এর কী উত্তর!

গীশা বল্লে, 'তা না হলে ভালোবাস্‌ব কেমন করে?'

মিস্‌ বল্লেন, 'মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, শুভ কামনা দিয়ে, শুভবুদ্ধি দিয়ে, যথাসম্ভব সাহচর্য্যের আয়োজন রচনা করে।'

'কাছে না পেলে তা হয় কি ?'

দূরে থাক্‌লেই বা ক্ষতি কি ?' দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে বল্লেন, 'ছেলে-পিলে চাও তুমি—না ?'

শীশা কিছুই বল্লে না। রক্তিম মুখ নীচু ক'রে বসে রইলো।

মিস্ বলে যেতে লাগ্‌লেন, 'দেহের সুখ থেকে মনের সুখটাই কি ভালোবাসার আসল জিনিষ নয় ?'

শীশা নিরুত্তর।

মিস্ দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন। জোরালো কণ্ঠে দৃপ্ত ভঙ্গীতে বল্লেন, 'দেহ-সম্বন্ধ ? ছি ছি, ভালোবাসাকে ক্লেদ-পূর্ণ করে তো এ-ই। স্নিগ্ধ ভালোবাসা যে চায় সে করুক্‌গে বিয়ে। তুমিও তাই চাও ? ইতর-সাধারণের দলে মিশে যাবে ? ছি ছি !'

শীশা সরল মনে পরামর্শ চাইলে। ফলে মিস্ হলেন চণ্ডীমূর্ত্তি। তাইতো, এ কী ! মিস্ ক্লেইটনের চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখ শীশার মনে প্রতিবিম্বিত হয়ে রইলো। রাত্রে তার ঘুম হলো না—এই ভেবে যে, মিস্ এম্‌নিতর অনুযোগের সঙ্গে কথা বল্লেন কেন ?

পরের দিন তার মাথা-ব্যথা ধর্‌ল। বিকেলে মিস্ ক্লেইটনের বাড়ী না যেয়ে যে-পথে পরিমল বেড়াতে বেরোয়, তারি কাছাকাছি পার্কে আপন মনে বেড়িয়ে বেড়ালো। দ্বিতীয় দিন রাত্রে ক্লাবের অধিবেশন। ক্লাবে পরিমলের সঙ্গে হাস্য-কৌতুকে তার মন আবার হাল্কা; মিস্ ক্লেইটনের গুরুগম্ভীর বক্তৃতা শ্রেফ্ ভুলেই গেলো। এর পরের দিন যখন আবার ওঁর বাড়ী যাবার কথা তখন তার মনে বিরক্তি জেগে উঠেছে। ঠিক কর্‌লে, যাবে না। এমন কি তার পরের দিনও যাওয়া স্থগিত রাখ্‌লে। এম্‌নি গড়িমশি কর্‌তে কর্‌তে যেদিন গিয়ে উপস্থিত হলো সেদিন মিস্ বন্ধু-পরিষদের একটি সভায় চলে গেছেন। সুতরাং দেখা বাদ্ পড়্‌ল। শীশাও প্রায় ভুলেই গেলো—সে ছবি আঁকা অভ্যেস কর্‌ছে।

পরিমলকে বল্লে, 'মিস্ ক্লেইটনের বাড়ী যাওয়া মানে চার্চ্চে যাওয়া। ভালো লাগে না ও সব। একঘেয়ে বক্‌নি শুন্‌লে হাতে পায়ে খেঁচুনি ধরে যায়। তুমি যেও বাপু; আমার এই শেষ।'

'না, না' পরিমল বলে, 'তোমাকে যেতেই হবে। তোমার টেক্‌নিক্ কিছুটা আয়ত্ত হলেই বরং যথারীতি বিদায় নিয়ে চলে এসো। এম্‌নি যাওয়া বন্ধ করা ভারী খারাপ হবে।'

ঐ সপ্তাহে লণ্ডনে "ওয়ারেন্ হেষ্টিংস" নামে একটি পালার অভিনয় চল্‌ছিল। রুমানিয়ার ভ্রাতৃজায়ার আতিথ্য-চর্য্যা কর্‌তে মিস্‌কে যেতে হলো পালা দেখ্‌তে। শ্রীমান্ কেনীথও সঙ্গে। প্রেক্ষা-গৃহের চারদিকে নিরীক্ষণ করে কেনীথ বল্লে, 'আজ মিঃ চৌধুরী আসবেন।'

কেনীথের মা শুনে বল্লেন মিস্‌কে।

মিস্ সুধোলেন, 'তুই জান্‌লি কিসে ?'

কেনীথ্ বল্লে, 'সকাল বেলায় যখন তোমরা বেরিয়ে গেছ্‌লে তখন মিঃ চৌধুরী আর ঐ যে ছোটো স্কার্ট-পরা মেয়েটি তারা দু'জনে এসেছিল। চৌধুরীকে আমি বল্লুম, আজ আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি। চৌধুরী জান্‌তে চাইলে কোন্ থিয়েটারে। আমি বল্লুম, পিসিমা বলেছেন—তোমাদের দেশের কি একটা পালা নাকি অভিনয় হবে। যাও যাবেন।'

মিস্ : 'তখন ওরা কি বল্লে ?'

'বল্লে, আমরা এখন যাই ; দেখা তো হলো না—হবে দেখা সময় মতো।' এই বলেই কেনীথ্ চারদিকে আবার চাইতে লাগ্‌ল। চাইতে চাইতে বল্লে, 'নিশ্চয়ই এখন সময় হয়েছে। দেখো না পিসিমা তোমার ঘড়িটায়...এই তো তিন মিনিট্ মোটে বাকী। কই, এলো না যে চৌধুরী, পিসিমা ?'

বাতি নিভ্‌ল।

মিস্ চিন্তিত হলেন। শীশা-পরিমলও নিশ্চয় এসেছে তাহলে। একজন আরেকজনকে ছেড়ে আসবে না। পরিমল হয়তো শীশাকে নাট্য-মঞ্চে ভারতীয় সন্নিবেশ দেখাবার জন্যেই নিয়ে এসেছে।...

অবকাশের সময় অন্যদের দেখাদেখি কেনীথেরও বরফ খেতে ইচ্ছে হলো। সে বল্লে, 'ভয়ানক গরম লাগ্‌ছে। লাগ্‌ছে না মা ?...ইণ্ডিয়ায় খুব বরফ পাওয়া যায়, না ? তা না হলে—ওখানে যা গরম !...গরমে কালো করে, না, রোদ্দুরে—মা ?'

কেনীথ্-জননী পরিচারিকাদের কাছ থেকে বরফ নিতে ব্যস্ত ছিলেন। উত্তর দিলেন, 'রোদ্দুরে।'

কেনীথ মঞ্চোপরি কালো রঙের পাত্র-পাত্রী দেখে আপন মনে বল্লে, 'রঙ্-প্রসাধনটা বেশ। 'ইণ্ডিয়ান্ ইঙ্ক্' গুলে কালো রঙ্ করেছে নাকি?...চৌধুরী—কিন্তু এ রকম কালো নন্'...

আবার বাতি নিভ্‌ল।

মিস্ ক্লেইটন ভাব্‌ছিলেন, চৌধুরী গীশাকে অভিনয় দেখিয়ে পরে হয়তো কোনো ভারতীয় রেস্তর'ায় নিয়ে যাবে। সেখানে দুজনে গল্প-গুজবে কাটাবে অনেকক্ষণ। ভারতীয় খানাপিনা গীশার কেমন লাগে তাই পরিমল পরখ করবে।

গীশা বোল্‌বে, 'ও! কী ঝাল, খেতে পারিনে বাপু।'

পরিমল জলটা এগিয়ে দেবে, অবশেষে ভারতীয় মিষ্টিতে গীশাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে একটা সিগ্রেট ধরাবে। নিশ্চয়ই পরিমল সিগ্রেট খায়। অবশ্যি তাঁর সাম্‌নে কদাচ খায়নি এবং সিগ্রেটের নামও কখনো করেনি। কিন্তু খায় নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে—মানে, তাঁকে লুকিয়ে। আর গীশাই কি খায় না? পরিমলের সঙ্গে খাবে বৈকি। হয়তো বা একটাই সিগ্রেট ধরিয়ে দু'জনে খাবে। দু'জনের অধর চুম্বিত সিগ্রেট দু'জনের অধরোষ্ঠে বন্দী হয়ে বেড়াবে।...গীশার মন যে রকম তৈরী হয়ে এসেছে তাতে পরিমলের বুঝ্‌তে এতোটুকুও বাকী থাকবে না। পরিমল বিয়ের প্রস্তাবটা হয়তো সেই সঙ্গে—হয়তো কেন, সেদিন গীশা যা বল্লে তাতে আর সন্দেহ কি?...

মিসের চোখে স্বপ্নের ঘোর লেগেছে। স্বপ্নের মধ্যে স্মৃতি-লোক থেকে একখানি মুখ ভেসে উঠ্‌ল...একটি যুবক... আজ সে রাজোপাধিভূষিত ইংলণ্ডের সেরা সমাজের অন্তর্ভুক্ত ...একদিন প্রথম যৌবনে তাঁর মোহ হয়েছিল বিয়ে কর্‌তে মিস্‌কে...তিনি হেলায় কর্ণপাতও করেন নি...মনে আছে, মাত্র তিনি জোয়ান্ অব্ আর্কের জীবনীটি শেষ করেছেন—সেই গ্রাম্য কৃষক-কন্যা জোয়ান্—ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে তিন শ বছরের রেষারেষির অবসান ঘটিয়ে যে ফরাসী দেশের গৌরব রক্ষা করেছিল, ডাইনীর অজুহাতে যে-বিচারকেরা তাঁকে শেষে পুড়িয়ে মার্‌লে তাদেরকে অভিসম্পাত না দিয়ে যে ঈশ্বর-বাণীর নির্দেশানুযায়ী মরণকে বরণ কর্‌লে; তাঁরই জীবনীটি পড়া হয়ে যাবার পরেই সেই যুবক এসে প্রস্তাব করলে...কী অনুকম্পার সঙ্গে তিনি তাঁকে মোহের বিরুদ্ধে লড়াই কর্‌তে উপদেশ দিয়ে দিলেন...ভগ্নহৃদয়ে যুবক ফিরে গিয়েছিল; সম্মাননার উচ্চতম ভূমিতে অধিরূঢ় হয়েও এই অবধি সেই যুবক বিয়ে করেননি, যদিও তাঁর নাকি বহু প্রণয়কাঙ্ক্ষিণী সমাজে আছেন—এম্‌নি শোনা যায়...অবশ্যি মিস্ তাঁর মোহে জড়িয়ে পড়েন নি...আদর্শের মতো মহান কিছু নেই, বিনিময়ে যাবতীয় মূল্যই অগ্রাহ্য.. সেসব ঘটনা যেন এই বিগত মুহূর্ত্তে ঘটে গেলো—তবু আজ আবার মনে জাগ্‌ছে কেন?...আহা গীশা-পরিমল দোঁহে দোঁহাকার সুখে কী নিরুদ্বিগ্ন চিত্তেই না বসে বসে অভিনয় দেখ্‌ছে...তারা কি একবার-ও আমার কথা ভাব্‌ছে?... না, না, না...কেনই বা ভাব্‌বে? ইস্, ছেলোগুলো কী বোকা!...গীশা পরিমলকে কেমন গাধা বানিয়ে ছেড়েছে... পরিমল দু'দিনেই গীশা-ধ্যান গীশা-প্রাণ হয়ে উঠ্‌ল... ননসেন্স্!

কেনীথ্ বল্লে, 'কেন, পিসিমা, তোমার ভালো লাগ্‌ছে না? এই জায়গাটা তো বেড়ে দেখালে।' মিস্ চোখ্ খুলে বল্লেন, 'উ' পালাটা ফেনিয়ে ফেনিয়ে কী লম্বাই না করেছে!'

অভিনয় শেষে উপর-তলা থেকে যখন মিস্ ক্লেইটনরা নীচে মোটরে গিয়ে উঠ্‌লেন তখন হঠাৎ পশ্চাতি-শ্রুত হাস্যধ্বনিতে মিস্ একাগ্র হয়ে শুনলেন গীশার কণ্ঠ-কল্লোল। গীশার প্রাণের আনন্দের ঢেউ হাসির ফোয়ারায় উছ্‌লে পড়্‌ছে—সুর-বাঁধা "গিটার্"-যন্ত্রে অঙ্গুলি-স্পর্শ পড়্‌লে আকাশময় ঝুমঝুমি শব্দ যেমন হয়।...উঃ! অতো হাসি ভালো নয়।...

মোটরে বসে কেনীথ-জননী নানা সমালোচনার অবতারণা কর্‌লেন। কেনীথও জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাস মতো কাটাছাটা মতামত দিয়ে মায়ের সঙ্গে কথোপকথন বাঁধিয়ে তুল্‌লে।

ওদিকে, কেনীথ্ প্রমুখাৎ মিসের থিয়েটারে যাওয়ার জল্পনা শুনে গীশা-পরিমল ঠিক কর্‌লে, অভিনয়ের পরের দিন সকালেই মিস্‌কে বিরক্ত না করে আসবে বিকেলে; এবং তাদের আগমনীর নিয়ম-বিক্ষেপের কারণ দর্শাবার মতন

কয়েকটা অজুহাতও বানিয়ে রাখলে। উপরন্তু অপরাহ্নের নিরন্তর অবকাশকে ফলবান করার জন্যে তারা একটা প্ল্যান-ও সেই সঙ্গে এঁটে ফেল্লে।

গীশা বল্লে, 'স্কেটিং করতে যাবো।'

পরিমল বল্লে, 'ফের স্কেটিং? আমি তাহলে চল্লুম।

'বেশ আমি একাই যাবো।'

বাদানুবাদ সত্ত্বেও যথা সময়ে তারা স্কেটিং করতে ছুটল তাদেরি পল্লীর তুষার-সত্রে। বরফে লুটোপাটি খেয়ে পরিমল তো অস্থির; গীশা অন্যান্য উপস্থিত সমালোচকদের বিদ্রূপ হাস্যে যোগ দিয়ে পরিমলকে আরো অস্থির করে তুলল।

পরিমল বল্লে, 'বেশ, তোমার কথায় স্কেটিং-এ এলাম; এবারে আমার কথায় স্কালিং-এ চলো, কালই সকালে—হাইড পার্কে।'

গীশা বল্লে, 'পরোয়া করি নাকি? দেখা যাবে সার্পেন-টাইনে তোমার দিশি কেরামতি কদ্দূর টেকে। তুমি তো জলের পোকা বলে খুব গর্ব্ব করো। আচ্ছা, আলাদা দু'টো বোট্ ভাড়া নেবো; তারপর লাগাও রেস্।...জিৎহার কে ঠিক কোরবে? তুমি চাও মিস্ ক্লেইটনকেই বিচারক করতে?—বেশ, করো। উনি তোমার পক্ষই টানবেন—জানি। তবে দেখব, কার জিৎ হয়?'

এতৎ প্রসঙ্গে মিস্ ক্লেইটনের নামোচ্চারণ বিধি-বিরুদ্ধ—ধান ভানতে শিবের গীত যেমন। পরিমল জিভে কামড় দিলে।

খাসা ফূর্ত্তিতে যখন সকাল বেলাটা-ও কেটে গেলো তখন বিকেলের-ও একটা প্রোগ্রাম চাই। হলো-ও তাই। ফলে অপেক্ষমানা মিস্ ক্লেইটনের বাড়ীতে সেদিনও তারা অনুপস্থিত রইলো।

ইতিমধ্যে বন্ধু-পরিষদের সভায় অরিয়েণ্টালিষ্ট্ মহোদয় ভারতের পুরাণেতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেছেন। সুতরাং মিসেরও ডাক পড়ল। তাঁর কিন্তু ইচ্ছে ছিল পরিমলকে এই সুযোগে পরিষদে নিয়ে যাবেন। পরিমলকে আগে থেকে আভাসও দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এ-কয়দিন তার দেখা না পাওয়াতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মিস্ উদগ্র হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, একেবারে পরিমলকে নিয়েই যাবেন; তাই আরেকটা দিনই না-হয় অপেক্ষা করলেন। আলোচনা তো সবে আরম্ভ।

অবশ্য অপেক্ষা করাই সার হলো; পরিমল এলো না। তবে এলো গীশা। গীশাকে পরিমলের কথা জিজ্ঞেস্ করাতে বল্লে, 'শরীর খারাপ হয়ে চৌধুরী শয্যাশায়ী হয়ে আছে।' মিস্ থিয়েটারের নাম করে সুধোলেন, 'তোমাদের ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কেমন লাগল?'

'কিসের?'

'থিয়েটারে তুমি যাওনি?'

'না!'

'পরিমল বুঝি একলা গেছল?'

'কবে?'

'তা কেনীথ্ যে বল্লে, তোমরাও আসবে থিয়েটারে সময় মতন।'

'থিয়েটারে নয়তো। মিঃ চৌধুরী কেনীথ্‌কে বল্লে আপনাকে বলতে যে, আপনারা তো থিয়েটারেই চল্লেন সেদিন রাত্রে। সুতরাং আরেকদিন যথাসময় আসব আমরা।'

'তাই নাকি? ও! বুঝতে কী ভুলই করেছে কেনীথ্।'

অল্পক্ষণ ছবি আঁকার মক্স করে গীশা বল্লে, 'রোজই আপনাকে কষ্ট করতে হয়। আমাকে ঐ স্কেচের বড়ো বইখানা কয়দিনের জন্যে যদি অনুগ্রহ করে বাড়ীতে নিতে দেন তাহলে ঘরে বসে অভ্যাস করতে আমার খুব সুবিধে হয়।'

মিস্ বল্লেন, 'তা বেশ তো। নিয়ে যাও না। কিন্তু দেখো, বইখানা আমার খুব আদরের; আর বিশেষজ্ঞের সাহায্যে বইএর মলাট দু'পাটি লাগাতে খরচও হয়েছে ঢের। নষ্ট যেন না হয়।'

গীশা বই নিয়ে গেলো বটে কিন্তু সপ্তাহেকের মধ্যে এলোও না, বই-ও ফিরিয়ে দিলে না। মিস্ কিছুই বুঝতে পারলেন না। স্থির করলেন অন্তত পরিমলের খবরটা নেওয়া দরকার। তদনুযায়ী অপরাহ্নে নিজেই পরিমলদের বাড়ী এসে হাজির। বাড়ীর লোকের কাছে শুনলেন, পরিমল তখনো শয্যাশায়ী—তবে পনেরো আনা সেরে উঠেছে; কাল পরশু নাগাৎ ঘরের বার হতে পারবে।

পরশু দিন অসুখ থেকে উঠে পরিমল মিস্ ক্লেইটনের বাড়ীতে বেড়াতে গেলো সকালবেলা। মিস্ তাকে সতর্ক করে দিলেন: এখনো তাকে কিছুদিন আহারের বাচবিচার করে চলতে হবে, বড়ো শুকিয়ে গেছে ইত্যাদি।

গীশার কাছে বইর খোঁজ নেবে বলে পরিমল মিসের বাড়ী থেকে সরাসরি বাঁহাতি রাস্তায় গীশার আস্তানার দিকে চল্ল।

গীশা বল্লে, 'আমার মাথা কাটা গেছে। বই হারিয়ে ফেলেছি।'

পরিমল বল্লে, 'সে কী!'

গীশা পুনরুক্তি করলে, 'হারিয়ে ফেলেছি।'

'কাব্যি করা হচ্ছে—না?'

'আরে না, না; শোনোই না। বই নিয়ে আস্বার সময় ঐ সিনেমার পাশের রাস্তায় ভীষণ ভিড় ছিল—সিনেমা-ফের্তাদের ভিড়। আমি বই সঙ্গে করে বরাবর আস্‌ছি—পেছন থেকে ছাতির খোঁচায় বইখানা ধপাস্‌করে পড়্‌ল ফুটপাথের ওপর একটা লাইটপোষ্টের হাত দু'তিন দূরে। আলোর মধ্যে দেখলুম, যে স্কেচ্‌টা মিস্ ক্লেইটনের বাড়ীতে নকল করছিলুম ঠিক সেইখানটায় বইখানা খোলা হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি বইখানা তুলে বগলচাপা করে সাবধানে চল্লুম। তারপর পেছন থেকে কে যে একটানে বইখানা কেড়িয়ে নিয়ে উধাও হলো কিছুই বুঝতে পারলুম না। কেউ কেউ আমার সঙ্গে খোঁজাখুঁজিতে যোগ দিলে। কোনো ফায়দা হলো না। শেষে হতভম্ব হয়ে বাড়ি ফিরে এলুম।... কি করি, বলো দিকিন্? দশ পাউণ্ড দাম ঐ বইর। অতো টাকাই বা পাই কোথায়, মিস্‌কেই বা কি বলি?'

'আশ্চর্য্য। চুরী?'

শেষে মীমাংসা করতে গিয়ে পরিমল বল্লে, টাকা তো তার কাছেও নেই। সুজিতের টাকা ভাগ্যিস্ দেশ থেকে এসে পৌঁছেছে। তার কাছ থেকেই ধার এনে আপাতত মিস্‌কে ঐ একখানা বই কিনে দিতে হবে।

বইর ঠিকানা আন্‌তে মিস্ ক্লেইটনের কাছে যেতে হলো আবার পরিমলকে বিকেলে। মিস্ লাইব্রেরী ঘরে পরিমলের ছবি নিয়ে কাজ করছিলেন। পরিমলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উৎসাহ বাড়ল। সযত্নে তাকে গীশার সুখাসনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খবর কি নতুন?'

পরিমল আম্‌তা আম্‌তা মুখে বই হারানোর ঘটনা আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করলে। মিস্ পরিমলকে সলজ্জ দেখে তার কুণ্ঠা দূর করতেই যেন ঈষৎ ক্রোধের সঙ্গে বল্লেন, 'গীশা—ছ্যাব্‌লা মেয়ে।'

পরিমল মিসের চোখাচোখী হয়ে ঘাড় সোজা করে উত্তর দিলে, 'গীশা আপনার বইর দামটা পাঠিয়ে দিয়েছে। এই যে—' বলেই পকেট্ থেকে দশ পাউণ্ডের নোট্ খুলে টেবিলে রাখ্‌লে।

মিস্ ক্লেইটন্ নির্ব্বাক্।

অবশেষে বল্লেন, 'আমাকে খবরটাও তো দিলে না গীশা।'

পরিমল বল্লে, 'সেই দোষের জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।'

তিনি বল্লেন, 'ক্ষমা কে চাইছে?—তুমি না গীশা?'

পরিমল লজ্জিত হয়ে বল্লে, 'আমরা দু'জনেই।'

'টাকাটা তাহলে তুমিই দিচ্ছো?'

'হুঁ, গীশার পক্ষ হয়ে।'

মিস নির্ব্বাক্। পরে বল্লেন, 'এতোখানি!'

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল।

পরিমল সুধোলে, 'গুড্ নাইট্।'

মিস্ কোমল সুরে বল্লেন, 'চৌধুরী, একবার যদি কাল তুমি সকালে একলাটি আসো।'

সম্মতিতে মাথা নেড়ে পরিমল বিদায় নিলে।

মিস কোমল হয়ে বল্লেন, 'গুড্ নাইট্।'

সকাল বেলা। মিস্ ডায়েরীতে বহুক্ষণ লিখে গেলেন। পরিমল ছিল না। থাক্‌লে দেখ্‌ত মাঝে মাঝে দু'তিন ফোঁটা অশ্রু মিসের চোখ গড়িয়ে লেখার ওপরে পড়্‌ছিল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে মুছে মিস্ লিখে যাচ্ছিলেন। একদিনে দিন-লিপি অতোখানি লেখা মিসের জীবনে এই প্রথম।

পরিমল যখন এলো তখন মিসের দু'চক্ষু শুকিয়ে লাল। দাঁড়িয়ে তাকে অভিনন্দন করলেন।

মিস্ পরিমলের একখানা হাত আপনার হাতে তুলে নিলেন। অমনি টস্ টস্ করে চোখে জল ঝরতে লাগল।

বল্লেন, 'পরিমল, তোমার মুখখানি কী সুন্দর!'

পরিমল মুখ নত করে রইলো।

মিস তার মুখ দু'হাতে তুলে ধর্‌লেন। তাকাতে তাকাতে বল্লেন, 'একটা অনুরোধ আমার শুনবে?'

'কি?'

'তুমি আর আমার কাছে এসো না।'

পরিমল চুপ হয়ে রইলো।

মিস্ আবার বল্লেন, 'আমাদের মধ্যে এতো মাখামাখি ভালো হয়নি।'

পরিমল বল্লে, 'কেন?'

মিস্ শান্ত ভাবে বল্লেন, 'এডাম্ ও ঈভের পতনের দরুণ যুগ যুগ ধরে তাদের উত্তর পুরুষেরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে এসেছে পাপের অনুবৃত্তি করে। আদিম নর-নারীর সুনামকে এই বিড়ম্বনার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে তার উত্তরপুরুষেরা কেউই সাহায্য কর্‌তে পারে না কি, পরিমল?'

পরিমলের তর্কের ইচ্ছা সমূলে লোপ পেয়ে গেছে।

মিস তার মুখখানাকে শেষবারের মতো নিরীক্ষণ কর্‌তে কর্‌তে বল্লেন, 'চৌধুরী, তুমি আর আমার কাছে এসো না।'

পরিমল বিদায় নিতেই মিস ত্বরিতগতিতে চিত্র-ফলকের দিকে ফিরে আপনার অসমাপ্ত ছবির কাছে দাঁড়িয়ে কেন্‌ভাসের 'পরে নীচে লেখনী-যোগে চিত্রের নামকরণ কর্‌লেন: He Taught Me A Lesson, মানে, 'আমার শিক্ষাগুরু।'

কলম টেবিলে রেখে, কক্ষান্তরে দ্রুতপদে হাত-মুখ-চোখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে এলেন। অনন্তর লাইব্রেরী কক্ষেরই মেঝেয় নতজানু হয়ে নিমীলিত নেত্রে করপুট বুকে ন্যস্ত করে ঊর্দ্ধমুখে প্রার্থনা কর্‌তে লাগলেন, 'দেবতা! শক্তি দাও, শক্তি দাও।'

সুশীলকুমার দেব

মুক্তি

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

কি সুরে বাজালে বাঁশী, প্রাণ নিলে হরি,
বাহির হইনু আমি পাগলিনী প্রায়
স্বজন বান্ধব প্রিয় গৃহ পরিহরি,
মিলন হইল আজি তোমায় আমায়।
ক্ষুদ্রগৃহে এতদিন ছিল যে বন্ধন,
নিমিষে হইল মুক্ত পরশে তোমার,
টুটিল সকল ভ্রম মিছার স্বপন,
নিখিল এ বিশ্ব এবে হেরি আপনার।
পর্ব্বত গুহায় নদী জনম লভিয়া,
শুনে যবে দূরাগত সাগরের গান,
শত বাধা বিঘ্ন দলি চলে সে ছুটিয়া
সিন্ধুবুকে মিশাইতে আপনার প্রাণ।
নদী সম প্রাণ মোর চলিয়াছে ছুটি
সার্থক জনম মম পদে তব লুটি।

যৌবন ও অপরাধ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

দণ্ডার্হ অপরাধের ভয়াবহ বৃদ্ধি সম্প্রতি ছনিয়ার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। গুগলফ নামক রাশিয়ান ডাক্তারের বোমার আঘাতে ফরাসী রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট পল ডুমারের হঠাৎ মৃত্যু ভুলিতে না ভুলিতেই রয়টার খবর আনিল যে, জ্যাঙ্গারা নামক ইতালীয়ের দ্বারা চিকাগোর মেয়র এ্যাণ্টন কারমাক হত হইয়াছেন। গুণ্ডাগণ কর্তৃক অপহৃত লিণ্ডবার্গ-শিশুর অপমৃত্যু মার্কিন জাতির একটী ছরপনেয় কলঙ্ক। লণ্ডনের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ক্রীষ্টমাশ হামফ্রে (১) তাহার পুস্তকে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন যে, ইংরাজ যুবকগণের দণ্ডার্হ অপরাধ কিরূপে অন্ধভাবে—তীব্রবেগে অতল নরকের দিকে ছুটিতেছে। সিংহলের ক্ষুদ্র দ্বীপে, গত বৎসর প্রায় ১০৫০০ দণ্ডজনক অপরাধ হইয়াছে এইরূপ গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে প্রকাশ। আমেরিকার এটর্ণি জর্জ্জ উইকার শ্যাম (২) বলেন যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও দণ্ডনীয় তরুণ অপরাধীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। চারিদিক হইতে চীৎকার উঠিতেছে যে, এইরূপ যুবক অপরাধীর অধিকতর কঠোর শাসন হওয়া উচিত। তাই সর্ব্বদেশেই এইরূপ অপরাধের প্রতিকার করিবার জন্ত ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত চেষ্টাও যথেষ্ট হইতেছে।

দণ্ডনীয় যুবাপরাধের ভীতিজনক বৃদ্ধি যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্র হইতেছে খবর কাগজের ক্রিমিনাল রিপোর্টগুলি পড়িলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। এই ক্রম বর্দ্ধমান যুবাপরাধ বর্ত্তমান মানব-সমাজের একটী কালিমা। সাধারণতঃ এইরূপ যুবকগণের বয়স ১৮ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে। তাহারা যে, অশিক্ষিত, কুলী ও পতিত সমাজের লোক তাহা নহে—তাহাদের অধিকাংশই ভদ্রলোক ও শিক্ষিত। কোন জন্মজ দুর্ব্বলতা হইতে যে, যুবকগণ অপরাধী জীবন যাপন করিতে চায়—সে প্রাচীন ভাব আর বিশ্বাসযোগ্য নহে। নূতন অপরাধ-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ অপরাধী মনের ভাব অধ্যয়ন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

জেমস্ ডেভন্স্ (৬) বলেন যে, আইনমান্তকারী লোকদের মধ্যে যেমন পার্থক্য দেখা যায় অপরাধীদের মধ্যেও ঠিক তেমনি। আকৃতিতে তাহাদের মধ্যে ও সমাজের ভাল-লোকদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আর সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করা, দোকান ভাঙ্গা, পকেট কাটা প্রভৃতি কার্য্যগুলি তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বকই করে। বাধাবিপত্তির বিষয় সম্পূর্ণ জানিয়াই তাহারা এই পেশা গ্রহণ করে। এবং এই সময় তাহারা এমন কর্ম্ম-তৎপরতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং কৌশল প্রদর্শন করে যে, মনে হয় তাহারা কোনও অভিজ্ঞ ফুটবল টীমের অপেক্ষা ন্যূন নহে। যখন তাহারা ধৃত হয়, বা আদালতে বিচারাধীন হয় বা জেলে থাকে—তাহারা আদৌ লজ্জা বা অপমান বোধ করে না। শুধু যুবকগণ নহে যুবতীগণও এই সব ডাকাতিতে গোয়েন্দাগিরির কার্য্য করে। যুবকগণ কোন অভাব বোধে যে, সাধারণতঃ এইরূপ কুকর্ম্ম করে তাহা নহে—তাহাদের উৎসাহের উৎস হইতেছে ক্রীড়াশক্তি। লোকে যেমন কোন কর্ম্মকে জীবনের বৃত্তি বা পেশারূপে গ্রহণ করে তেমনি ইহারা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে চায়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সার আর, এ্যাণ্ডারসন তাঁহার পুস্তকে (৭) একটী চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। গল্পটী এই : একবার লণ্ডনের কোন মন্ত্রী আমেরিকার একটী জেল দর্শন করিতে যান। তথায় একটী ভদ্রসন্তানকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহার অবস্থা উন্নতির উদ্দেশ্যে আলাপ করিতে যাইলে যুবক অপরাধীই বাধা দিয়া বলিল,—'আমার বিশ্বাস ইংলণ্ডে আপনারা শৃগাল-শীকারকে খুব আমোদ জনক ক্রীড়া মনে করেন'।

মন্ত্রী সম্মতি জ্ঞাপন করিলে যুবক বলিল, "আপনারা একবার অকৃতকার্য্য হইলেই কি এই শীকার ত্যাগ করেন?" মন্ত্রী নীরব রহিলে যুবক পুনরায় বলিল—"ইহা সত্য যে, আমি একবার অকৃতকার্য্য হইয়াছি কিন্তু আমি পরের বারে কৃতকার্য্য হইবার খুব আশা রাখি।" ইহাই হইল তথাকথিত সভ্য-সমাজের যুবকদের মানসিক অবস্থা !!

বর্ত্তমান যুবকগণের এই যথেচ্ছাচারিতার অনেক মুখ্য ও গৌণ কারণ আছে। অবশ্য চৌর্য্য-ভাব যাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে—যাহারা এইরূপ কর্ম্ম স্বভাবের বশে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও করে—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা যুবাপরাধের প্রধান কারণ। চিকাগোর ক্লিফোর্ড আর, শ এবং হেন্‌রি ডি, ম্যাক্‌কে সাহেবদ্বয় বলেন যে, অপরাধীগণ যে, গৃহে ও সমাজে জাত, ও লালিত-পালিত সেই সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া শিশুকাল হইতেই তারা এই ভাব গ্রহণ করে। আমেরিকার বিখ্যাত সিং সিং জেলের ওয়ার্ডেন লিউয়িশ ই, লয়েশ (৫) সাহেব বলেন যে, শিশুকাল হইতেই যুবকগণ সাধারণতঃ ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে আইন অমান্যকারিতা ও অবাধ্যতা শিক্ষা করে। লণ্ডনের মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট আর, এইচ, ডুমেট্‌ বলেন যে, সাধারণ নগরবাসী বা গ্রামবাসীর লোভনীয় কার্য্যগুলি বিশেষভাবে দোষাবহ। তাহারা গৃহের বা দোকানের দ্রব্যসম্ভার এরূপ সাজাইয়া গুজাইয়া রাখেন যে, দরিদ্র বা অভাবগ্রস্ত লোকের তাহা অপহরণ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই উদিত হয়। এবং এই দ্রব্যসম্ভার রাখিবার এমন ঢং যে, লোকে তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া কিনিতে চায় এবং অর্থাভাবে তাহা না পারিলে চুরি বা রাহাজানির দ্বারা পাইতে ইচ্ছা করে। গত ইউরোপীয় মহাসমরও উহার আর একটী কারণ। যুদ্ধ একটী জঘন্য, ঘৃণ্য পাশববৃত্তি বৃদ্ধিকর জাগতিক প্রতিষ্ঠান। যুদ্ধের পর মানব মনে অস্থিরতা ও বিদ্রোহভাব এমন বদ্ধমূল হয় যে, নানাভাবে তাহা প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহভাবের সংক্রামক ব্যাধি জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কমিউনিজ্‌ম, ফ্যাসিজ্‌ম, অর্থমূলক শিক্ষা, চাকুরীহীনতা, আর্থিক দুরবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি, যন্ত্র-সভ্যতা অপরাধের গুণ পরিমাপূর্ণ পুস্তক বা ফিলম প্রভৃতি অসংখ্য কারণে বিশ্ব-সমাজের এই দুরবস্থা উপস্থিত। সর্ব্বোপরি সমাজে, রাষ্ট্রে, গৃহে ও স্কুলে, ঘরে ও বাহিরে কোথাও ধর্ম্মাদর্শ আর জীবিত নাই। লিউয়িশ্‌ ই, লয়েশ (৩) সাহেব সিং সিং জেলের যাবৎজীবন অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, শতকরা ৯৫ জন কয়েদী বাল্যকালে কোন নির্দ্দোষ ক্রীড়া শিক্ষা করে নাই, শতকরা ৭৫ জন কোন গৃহশিল্প বা জীবিকামূলক কোন বৃত্তি শিখে নাই এবং শতকরা ৯৯ জন ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিল না এবং তাহাদের অধিকাংশের পূর্ব্বকৃতাপরাধের অভিজ্ঞতা আছে। এই অপরাধের মূল-বিনাশ করিবার উপায় কি? হেরল্ড বেগবি (৮) সাহেব বলেন যে, কমিউনিষ্টদের মনুষ্যজাতিকে একটী সৈন্যদলে পরিণত করিয়া এক নবজগৎ সৃষ্টি করিবার যেমন বৃথা প্রয়াস তেমনি দণ্ডনীয় দোষীদের সংখ্যা কমান অসম্ভব। সংস্কারমূলক চেষ্টা অপেক্ষা প্রতিকারমূলক চেষ্টা বেশী আবশ্যক। অপরাধীকে সংশোধন করা অপেক্ষা অপরাধের মূলে কুঠারাঘাত দরকার। সংস্কারও চাই—কিন্তু প্রতিকারের মূল্য বেশী। উদাহরণমূলক শাস্তির দ্বারা সমাজে শান্তিরক্ষা করিতে হইবে। বেত দেওয়া, ফাঁসি দেওয়া, জেলে রাখা, সমাজ হইতে দূরে রাখা ও জরিমানা প্রভৃতি অবশ্যই চাই, তবে অপরাধের মূলোৎপাটিত করিবার জন্য প্রতিকার আবশ্যক। নাথেনিয়াল (৯) ক্যাণ্টর সাহেব বলেন যে, সংস্কারমূলক শাস্তিরূপ আমেরিকার প্রথা প্রচলনে বেশী লাভ হইবে। যতদিন না তাদের নৈতিক চরিত্রগঠন ও সৎস্বভাব লাভ হয় ততদিন মাত্র অপরাধীদের জেলে রাখা উচিত। পাটনার বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার (১০) প্রশান্তকুমার সেন মহাশয় বলেন যে, 'ন্যায় মানুষ বিশেষের সম্মান করে না'—এই প্রবীণ ধারণা দ্রুতগতিতে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে। অপরাধ অনুযায়ীই শাস্তিবিধান করা উচিত—ইহাই তাহার মত—কিন্তু ক্রীষ্টমাস্‌ হামফ্রেজ প্রভৃতি অপরাধতত্ত্ববিৎগন মানুষবিশেষে স্বল্পাপরাধেরও গুরুতর শাস্তির পক্ষপাতী। অনেকে অপরাধকে মনোব্যাধি বিশেষ মনে করিয়া চিকিৎসা বিধান করিতে বলেন। কেউ কেউ আবার বলেন যে, অপরাধী মাত্রেরই কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত; তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে,

আইনকানুনের বর্ম্মাবৃত বর্ত্তমান জগতে অপরাধ করিয়া ফাঁকি দেওয়া যায় না এবং এই প্রবৃত্তিতে জীবিকা অর্জ্জন ত দূরের কথা—তাদের জীবনও নিরাপদ নয়। ক্লেয়ারেন্স ড্যারো (১১) সাহেব বলেন যে, অপরাধীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন দোষ বা দুর্ব্বলতার জন্যই তার এই দুর্ভাগ্য, তাই তারা অনিচ্ছাসত্বেও ইহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং তাদের প্রতি কঠোর না হইয়া কোমল ও ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। কঠোর শাস্তির দ্বারা অপরাধীর মন ও হৃদয় অপরিবর্ত্তনীয় রূপে কঠোর হইয়া যায়, তখন তাদের আর সংস্কার করা অসম্ভব। তাই ইংলণ্ডে হাওয়ার্ড প্রভৃতি সাহেবগণ দণ্ডবিধি আইনের সংস্কার গত শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। দণ্ডবিধান কিরূপে করা উচিত তাহা আইন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরই বিচার্য্য। কারণ মিসেস দে (১২) মেজারিয়ার বলেন যে, অপরাধের পরিমাপ করিয়া তাহার উপযুক্ত ও ন্যায়মূলক দণ্ডবিধান খুবই শক্ত—কারণ বিশেষজ্ঞগণ অপরাধতত্ত্বকে বহুভাবেই অধ্যয়ন করিয়াছেন।

সমাজ-শরীরের এই বিষ ও দূষিত রক্ত দূর করিবার জন্য সমষ্টি চেষ্টার প্রয়োজন। কেন মানুষ অপরাধ করে ও সৎপথে যায় না! এই ক্ষণে অপরাধ-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বটি দর্শনের আলোকে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। অপরাধ তত্ত্ব-বিৎগণ বলেন যে, অপরাধীদের মধ্যে পাপাশক্তি বা অপরাধা-শক্তি অপেক্ষা দায়িত্ব বোধের অভাবই বেশী ক্রিয়াশীল। সুতরাং নীতি ও দায়িত্ব-বোধের জ্ঞানটি সমাজের মনে বিশেষরূপে জাগ্রত করা উচিত। এই লজ্জাকর অবস্থার জন্য পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, দর্শন ও শিক্ষার ত্রুটীগুলি বিশেষভাবে নিন্দনীয়। ভারতীয় দর্শনের কর্ম্মবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদের আলোকে অপরাধতত্ত্ব আরও গভীরভাবে বোঝা যাইতে পারে। কয়েদীরা ত মানুষ, তাদের পূর্ব্ব জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কী রূপে তাদের চরিত্র বোঝা সম্ভব। কুলক্রমাগত ও বংশপরম্পরা প্রাপ্ত গুণ (Heridity) যখন অপরাধ সমস্যার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিতে পারে না তখন একটি দার্শনিক সমালোচনা ও সমাধান অত্যাবশ্যক—কেন অপরাধীর আত্মা অপরাধ হইতে বিরত হয় না। যদি পুনর্জ্জন্মবাদ ও কর্ম্মবাদের ভিত্তিতে পাশ্চাত্যের অপরাধ-বিজ্ঞান পুনর্নির্ম্মিত হয়—তবেই উহা পূর্ণ হইতে পারে। এইচ্. পি, ব্লাভাট্স্কি (৪) সাহেব বলেন যে, নীতিহীনতা ও অপরাধের উর্ব্বর ভূমি হচ্ছে—এই বিশ্বাস যে, মানুষ কৃত অসৎ কর্ম্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। ছেলে বেলা হইতে তাদের এইটী মর্ম্মগত হওয়া উচিত যে, মানুষকে সৎকর্ম্মের ন্যায় অসৎ কর্ম্মের ফল শুধু একজন্মে নয় জন্ম জন্মান্তরেও ভোগ করিতে হইবে; কর্ম্মফল কেহই এড়াইতে পারে না। এমন কি ঈশ্বরের করুণাও এইরূপ স্থানে কোন কিছু করিতে পারে না। কর্ম্ম ও পুনর্জ্জন্মবাদের ভিত্তিতে দণ্ডাই অপরাধীর প্রকৃত সংস্কার সম্ভব, অন্যথা নহে।

মানবাত্মা এত পাপাসক্ত হইতে পারে না যে, তাহার সংশোধন অসম্ভব। মানবাত্মা অব্যক্ত ব্রহ্ম।

মানুষ এত পাপ ও কুকর্ম্ম করিতে পারে না যাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত সুপ্ত দৈবস্ফুলিঙ্গ নষ্ট হইতে পারে। তুলার পাহাড় কখনও অগ্নি কণাকে চিরতরে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। কিছুকালের জন্য অস্থায়ীভাবে—মানবাত্মার ব্রহ্ম-শক্তি পূর্ব্বকৃতাপরাধের চাপে ঢাকা আছে—এই সুপ্ত-শক্তি জাগ্রত করিবার জন্য অস্তিগর্ভ ও ভাবাত্মক (positive) প্রচেষ্টা দরকার। সব শিক্ষা ও সংস্কারের মূল এই প্রত্যক্ষ, অবক্র, অস্তিগর্ভ উপায়—সর্ব্ব প্রকার নিষেধার্থক, নাস্তিগর্ভ উপায় ত্যাগ করা উচিত। মানব-চরিত্রের মহাগৌরব অপরাধীদের ও শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। লোমব্রোসো হইতে বর্ত্তমান অবধি অপরাধ তত্ত্ববিজ্ঞান বলিতেছেন যে, অপ-রাধীদের কোন সচিহ্ন দল বা জাতি নাই। সমাজের মধ্যে একদল ব্যক্তি এইরূপ সর্ব্বদা আছে—এই ভিক্টোরিয়া যুগের ধারণা আমূল মিথ্যা। মানুষের দৈব-চরিত্র কদাপিও চিরতরে নষ্ট হইতে পারে না। এই ভুল ধারণা আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে। গাজীপুরের বিখ্যাত সাধু পওহারীবাবার ঘটনাটি দ্বারা উহা বিশদ হইবে। একদিন রাত্রিতে পও-হারীবাবার আশ্রমে একটী চোর ঢুকে। চোরটি, পাছে সাধু জাগিয়া উঠে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি জিনিষগুলি গুছাইতে গিয়া কি একটা শব্দ করিয়া ফেলে। সাধুও অজ্ঞাতসারে পাশ ফিরাইতে যাইলে খাটের একটু শব্দ হয়। সাধুটীর ভয়ে শব্দ শুনিয়া সামান্য জিনিষপত্র লইয়াই চোর পলাইয়া

যায়। সাধু সবই জানিতেন। চোরটিকে পলাইতে দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। তিনি উঠিয়া সমস্ত জিনিষ পত্রগুলি বাঁধিয়া মাথায় করিয়া ছুটিলেন ও চোরটাকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে ধরিলেন। চোরটী ভয়ে কাঁপিতেছে ও কাঁদিতেছে। চোরটী সাধুর মতলব না বুঝিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। তখন সাধু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন তুমি ভয় পাইও না। আমি তোমাকে ধরিতে আসি নাই। তোমার অভাব অনেক, সংসারে স্ত্রী পুত্র অনাহারে আছে, আমার ত কোন অভাব নাই, তুমি সব জিনিষ আনিতে পার নাই বলিয়া এই সব দিতে আসিয়াছি। তুমি এইগুলি লইয়া বাড়ী যাও। চোরটি জীবনে কখনও এইরূপ ব্যবহার পায় নাই। আশাতীত ভাবে এই ব্যবহার পাইয়া তাহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেইদিন হইতে চৌর্য্যবৃত্তি ছাড়িয়া সাধু জীবনযাপন করিতে লাগিল। বুদ্ধদেবের স্পর্শে অঙ্গুলিমালা নামক ডাকাতের জীবনও এইরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র জীবনের স্পর্শেও অনেক পাপী সাধু হইয়া গিয়াছে।

যতদিন না পাশ্চাত্যের তরুণ সভ্যতা প্রাচ্যের এই দুইটী 'বাদ' গ্রহণ করে ততদিন হেরিডিটির মত ও ঘটনাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য সম্ভবপর হইবে না। হেরিডিটি ও পুনর্জন্মবাদ উভয়েই মিলিত হইলে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে একটী ঐক্য পাওয়া যাইবে। অবশ্য প্রাচীন প্রাচ্যের এই মতবাদ নবীন পাশ্চাত্য ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতেছে। এই কর্ম্মবাদের উপর সমগ্র বিজ্ঞানের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত। ঈশা সত্যই বলিয়াছেন—যিনি যাহা বপন করিবেন তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুযায়ী আমাদের বর্ত্তমান জীবন হইয়াছে—এবং বর্ত্তমানের কর্ম্মানুযায়ী আমরা ভবিষ্যৎ জীবন পাইব। হেরিডিটি শরীর বা স্থূলরাজ্যে প্রযোজ্য কিন্তু মনোজগৎ বা আধ্যাত্মিক রাজ্যে উহার ক্ষমতা বেশী নাই—তথায় কর্ম্মবাদের লীলাভূমি। মহম্মদ ছিলেন মেষ-পালক, কৃষ্ণ গোপালক, ও ঈশা ছিলেন কার্পেণ্টার। হেরিডিটির দ্বারা ত আর এসবের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, কাজেই কর্ম্ম ও পুনর্জন্মবাদ আনিতে হয়। সুতরাং দণ্ডবিধি ও অপরাধ বিজ্ঞান উক্ত মতদ্বয়ের আলোকে অধ্যয়ন করা উচিত।

যৌবনের উদ্যম ও শক্তির জোয়ার যখন আসে তখন তাহাকে একটী সৎপথে চালিত করিতে হইবে। 'কুড়ে'র মাথা যে, শয়তানের কারখানা'—একথা অক্ষরে অক্ষরে অতি সত্য। প্রথমতঃ যুবকের অভাবগুলি—অন্ততঃ সাদাসিদে খাওয়া পরার অভাবটী—দূর করিতে হইবে। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও নানা প্রকার ক্রীড়ার দ্বারা তরুণ উদ্যমের একটী পথ করিয়া দিতে হইবে। পাহাড়ে চড়াই, সমুদ্রে ডোবা বা আকাশে উড়া প্রভৃতি পাশ্চাত্যের বর্ত্তমান অসম সাহসিক খেলাগুলি অতি উত্তম। নচেৎ তরুণ শক্তি কুমতলবে নিয়োজিত হইবে। সঙ্গীত, শিল্প, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বা কোন সমাজ সেবার কার্য্য দ্বারা শক্তির ক্রীড়াভূমি শরীর হইতে মনে আনিতে হইবে। শক্তি চায় প্রকাশ ও সৃষ্টি, কাজেই যুবকগণের মনোযোগ কোন সৎকার্য্যে আকৃষ্ট করিতে পারিলেই উত্তম। মন যখন জড় ভূমি ছাড়িয়া চিন্তারাজ্যে উঠে তখন মানুষ অপরাধ আর করিতে পারিবে না। ব্যক্তিগত উদাহরণ দ্বারা তাহাদের দেখাইতে হইবে যে, আধ্যাত্মিক রাজ্যেই শক্তির পূর্ণ প্রকাশ, কাজেই শক্তি বাহিরে বৃথা ব্যয় না করিয়া সংযত করা উচিত।

জুভেনাইল জেল বা কোর্টের অবশ্য আবশ্যকতা আছে কিন্তু অপরাধের বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত ইহা দ্বারা হইবে না। তাই প্রত্যেক সমাজে সম্মিলিত চেষ্টার আবশ্যক। প্রথমতঃ দরকার গৃহস্থ জীবন বা গৃহের আদর্শগুলি উন্নত করা। পিতা-মাতাকে শিশুর সমস্ত ভার নিতে হইবে। ধাত্রীর নিকট সব ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন যে, শিশু ৯ বৎসর বয়সেই সব শিক্ষা শেষ করে। আজকালকার শিশু ৯।১০ অবধি দিনে কয় ঘণ্টা মাতৃ-ক্রোড়ে থাকে। বিবাহিত জীবনের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। আজকাল 'বার্ট্রাণ্ড রাসেল'-বিবাহই আমাদের সামাজিক আদর্শ। গৃহকে একটী মন্দির ও বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। বিবাহিত জীবনে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য চাই। আজকালকার গৃহ যেন এখন একটা ক্লাবে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীনদের নিকট শাস্ত্রপাঠ, উপাসনা ও ধর্ম্মজীবন একটা জীবনের দৈনন্দিন অভ্যাস

ছিল, এখন নবীনদের তাহা আদৌ নাই। শিশুদের ছেলেবেলা হইতেই মনঃ সংযম ও ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দেওয়া উচিত। মনস্তত্ত্ববিৎগণ বলেন যে, লোকের ভুল সংশোধনার্থে দোষ প্রদর্শন করিলেও কেহ তাহা পছন্দ করে না, তাই লোকে মনঃ সংযম অভ্যাস করিলে আপনার ভুল আপনিই বুঝিতে পারিবে। ইহাই সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। শিক্ষাতত্ত্ববিৎগণ আরও বলেন যে, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শিশুকে রাখ—তাহার শিক্ষা আপনিই হইবে। মন্টেসারি শিক্ষার ইহাই সার কথা। আর গৃহেই আমাদের তদ্রূপ ক্ষেত্র তৈয়ার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়। বর্ত্তমানের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিই নাস্তিক ও ধর্ম্মহীন। শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আজকাল আর নাই। বর্ত্তমানের শিক্ষা কেবল অর্থাগমের উপায় মাত্র। আর শিক্ষকদের চরিত্রহীনতার সীমা নাই, তাহারা আবার শিখাইবে কি? শিক্ষকগণ শিশুদের দ্বিতীয় পিতামাতা আর বিদ্যালয় শিশুদের হয় গৃহ। শিক্ষকের এই মহাদায়িত্ব তাহারা যেন ভুলিয়া না যান? শিশুদের মনে সৎভাব ও সৎআদর্শ দিয়া দিতে হইবে। তাহাদের জীবনকে উচ্চাদর্শের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। শিক্ষকগণ ত ভাবী সমাজের স্রষ্টা। শিক্ষকগণ যেমন আদর্শ দেখাইবেন শিশুরা তাহাই দেখিয়া শিখিবে, বলিবারও তত আবশ্যক নাই। তৃতীয় ধর্ম্মস্থান। মন্দিরগুলি ও ধর্ম্মগুরুদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রায় লোপ পাইয়াছে। সমাজে যত চরিত্রবান মহৎ ব্যক্তির উপস্থিতি থাকে—সমাজ অজ্ঞাতসারে ততই উন্নত হইবে। প্লেটো বলেন যে, সমাজ ও শহর হইতে অসৎ দূর করিবার একমাত্র উপায় জ্ঞানী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ধর্ম্মও আজ ব্যবসাদারীতে পরিণত! হায় কি দুর্ভাগ্য আমাদের! সমাজের যারা ধর্ম্মগুরু তাদের জীবন আরও উন্নত হওয়া চাই, তাদের ব্রহ্মানুভূতি চাই—কথায় আর কতদিন চিড়া ভেজে? মহৎ লোক ত দূরের কথা সমাজে আজকাল একটা সৎ লোকও পাওয়া কষ্টকর। গৃহ, বিদ্যালয় ও মন্দির এই তিনটীর মূল সংস্কার করিলে অপরাধের বংশনাশ হইতে পারে। সমাজের ও দেশের নেতাগণের করুণ দৃষ্টি এই সমস্যাটীতে বিনীতভাবে আকৃষ্ট করিতেছি।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

(1) "The menace in our midst" by Christmas Humphreys.
(2) "Report of the national Com. on Law Observance and Imforcement," 1931 by the Chairman, George Wickesham.
(3) "Twenty Thousand Years in Sing Sing" by Lewis E, Lawes.
(4) "Key to Theosophy" by H. B. Blavatsky.
(5) "Life and Death in Sing Sing" by Lewis E. Lawes.
(6) "The Criminal and the Community" by J. Devon.
(7) "Crime and Criminals" by Sir R. Andersan.
(8) "Punishment and Personality" by H. Begbie.
(9) "Crimes, Criminals and Criminal Justice" by N Cantor.
(10) "From Punishment to Crime" By P. K. Sen.
(11) "Crime—Its Cause and treatment" by C. Darrow.
(12) "Boys in Trouble" Mrs. Le Mesurier.

এ দুই এক নয়

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

"হ্যালো! পার্থ—"

"আরে বিমান যে, হঠাৎ কোথা থেকে?"

—বহুদিন পরে ভবানীপুরে একটা চায়ের দোকানে পার্থর সঙ্গে বিমানের দেখা। আলাদা দুটো দরজা দিয়ে দুজনে প্রবেশ করে' একই সঙ্গে বস্‌তে যাবে একই টেবিলের দুদিকে—এমন সময় দুজনে মুখোমুখি। সঙ্গে সঙ্গে—যেমন সাধারণতঃ হয়ে থাকে—দুপক্ষ থেকেই বিস্ময় সূচক শব্দ আর তার সঙ্গে উল্লাসধ্বনি।

পার্থ বল্লে—কতদিন পরে দেখা, বোধ হয় সাত বৎসর হবে, না হে?

বিমান দোকানের চাকরটাকে বল্লে দুকাপ চা দিতে—তারপর পার্থের কথার উত্তরে বল্লে—'তা হ'বে বৈকি, সেইত কলেজ ছাড়ার পরই আমি দিল্লী চলে যাই—তারপর ত এই কলকাতায় আস্‌ছি।"

চা দিয়ে গেল—কাপটা মুখে তুল্‌তে তুল্‌তে পার্থ বল্লে—সাত বৎসর ধরে কি সমানে দিল্লীতেই আছ নাকি?

"—হ্যাঁ তা আছি বৈকি—ওখানেই একটা স্কুলে মাষ্টারী কর্চ্ছি কি না!"

—তোমাদের বাড়ীর নূতন খবর কি হে?

বিমান দুটো চপ দিতে বলে, বল্ল নতুন খবর বিশেষ কি এমন? তবে হ্যাঁ, ওলোটপালোট একটু হয়েছে বৈকি—বাবা আর মা কিছুদিন হোলো সংসারের মায়া কাটিয়েছেন, আর ছোট বোন বিজুটারও বিয়ে হয়ে গেছে হুগলীতে এক প্রফেসরের সঙ্গে। আমি এখন "একলা চলরে"—ভাব।

পার্থ একটু হেসে বল্লে—"এ রকম—'একলা চলরে' ভাবে আর কতদিন চল্‌বে? বিয়ে থাওয়া কর্চ্ছ কবে?"

"—যেদিন তোমাদের ঐ বিধাতা বলে ভদ্রলোকটী এই মাষ্টারীর বদলে একটা ভদ্রগোছের চাকরী জুটিয়ে দেবেন, সেদিন আমিও জুটিয়ে নেব কোনও একটী তরুণীর কোমল দুটী পাণি"—একটু হেসে বল্লে "অবশ্য তা'র জন্য ব্যাকুল যে বিশেষ হ'য়ে পড়েছি তা ভেব না যেন; কারণ আছি ত বেশ—থাকি মেসে, মাসে মাসে টাকা ক'টা ফেলে দিই,—নিশ্চিন্ত। তবে সেই মেসের উড়ে চাকরটার বদলে যদি কোন একজন তার পেলব হস্তে সকালের চা কাপটি নিয়ে এসে বিছানার কাছে ধরে আর সেই কর্কশ কণ্ঠের 'বাবু'র বদলে মিঠে সুরে কেউ যদি 'ওগো' বলে ডাকে তাহ'লে নেহাৎ মন্দ লাগে না বোধ হয়। তবে এ ক্ষেত্রেও ঐ Theory of relativity খাটে। কারণ ঐ উড়ে চাকরটা আছে বলেই না ঐ একটী কমনীয় জীবকে লাভ কর্ব্বার সামান্য একটু আশঙ্কা অন্তরের মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হয়ত তিনি বেশী দিন অধিষ্ঠান কল্লে আবার ঐ উড়ে চাকরটার বিরহেতেই পাগল হ'য়ে উঠব। তখন হ'য়ত তাঁকে বল্‌তে হবে হাত জোড় করে—'দেবী, প্রসন্ন হয়ে' আমাকে রেহাই দিন—আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।—"

পার্থ হো হো করে হেসে উঠল—ব্যাগ থেকে পয়সা বা'র কর্ত্তে কর্ত্তে বল্লে—"থাম, থাম! দেবীদের উপর দেখছি তোমার অসীম শ্রদ্ধা। এখন চল, ওঠা যাক। দুকাপ চা আর দুটো চপ খাওয়ার পর এর চেয়ে বেশীক্ষণ বসে' থাকলে ওরা হয়ত উঠিয়ে দেবে।... কোথায় উঠেছ? নিশ্চয় তোমার সেই ফেভারিট ক্যালকাটা হোটেলে; যাই হোক, এখন আমার ওখানে চল, আজ মধ্যাহ্ন আহারটা ওখানেই সারবে। আজকে আমার দেবীটি নিজে হাতে ফাউলের 'কারি' রাঁধছেন

দেখে এসেছি—তুমি যদি যাও ত খুব খুসী হ'বেন নিশ্চয়। কারণ মেয়েরা যতই শিক্ষিতা হোক না কেন তা'দের ঐ দুর্ব্বলতাটুকু তা'রা জয় কর্ত্তে পারে না। নিজে হাতে রেঁধে কাকেও খাওয়াতে—বিশেষতঃ কোনও অতিথিকে—তা'রা খুব ভালবাসে।"

...দুজনে তা'দের রেন্‌কোট দুটো কাঁধে ফেলে রাস্তায় নেমে এল। বিমানের কাঁধের উপর একটা হাত রেখে পার্থ বল্লে—"ঐ ফুটপাথে চল—ঐ রমেশ মিত্রের রোড দিয়ে যেতে হ'বে"—রাস্তাটা পার হ'য়ে নিয়ে পার্থ আবার জিজ্ঞাসা কর্লে—"ভাল কথা, এদিকে কোথায় এসেছিলে?"

বিমান একটু হেসে বল্লে—এসেছিলাম পূর্ণ থিয়েটারে। জানইত বায়স্কোপ দেখাটা ছিল আমার একটা নেশা—তবে তোমাদের মত 'সীরিয়াস' বই আমার ভাল লাগ্‌ত না। আজ সকালে কাগজে দেখলাম 'পূর্ণ'তে বাসটার কীটনের 'পারলার, বেডরুম এণ্ড বাথ' রয়েছে—তাই এসেছিলাম দেখ্‌তে। এসে কিন্তু দেখি House full—মনের দুঃখে পাশের ঐ চায়ের দোকানটীতে ঢুকে পড়্‌লাম। কিন্তু এখন দেখছি House full হয়ে ভালই হয়েছে—কারণ ও 'ফিল্‌ম্‌' কালও থাক্‌বে কিন্তু Curry ত আর কাল থাক্‌বে না—"

পার্থ অল্প একটু হেসে বল্লে—শুধু 'কারি' কেন—আমার 'ডিয়ারি'টীর সঙ্গে আলাপ করেও খুসী হবে বোধ হয়।

বিমান বেশ একটু অবাক হয়েই বল্লে—সে কি হে, তুমি কি বংশের 'কালাপাহাড়' হয়ে দাঁড়ালে নাকি? তোমার সেই গার্‌জেন্ মামাত দাদাটী ত ভীষণ 'মরালিষ্ট' হে—অতি-মানবের মত তাঁকে 'অতি-মরালিষ্ট' বলা চলে। তোমার মুখেই শুনেছিলাম বোধ হচ্ছে যে একবার তোমার কে একজন খুড়তুত ভাই এসেছিলেন—তোমার বোন রেখা তার পাশে বসে গল্প করেছিল বলে তার নাকি মহালাঞ্ছনা হয়েছিল সেই ভদ্রলোকটী চলে যাওয়ার পর। বলেছিলেন—"অত বড় বারো তের বছরের ধিঙ্গী মেয়ে কি বলে একজন পুরুষের অত গা ঘেসে বসে গল্প করে?—হলই বা খুড়তুত ভাই—তবুও পুরুষ মানুষ ত?"—তাঁর মতে নাকি মেয়ে একটু বড় হলে নিজের বড় সহোদর ভাইএর সঙ্গেও বেশী মেলামেশা করা নীতির দিক দিয়ে ক্ষতিজনক। আর সেই বাড়ীতে আমার মত একজন লোক—যাকে লোকে বিবেকানন্দের Second edition বলে অন্ততঃপক্ষে ভাবে না—গিয়ে আলাপ কর্ব্ব—বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে নয়—একেবারে বাড়ীর 'বৌ'এর সঙ্গে—বল কি? তোমার সেই দাদাটী যে আমাকে পুলিশে দেবেন হে!

পার্থ যেন প্রথমটায় বেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। পরে সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বল্লে—"সে দিন এখন আর নেই। সে দাদাটী এখন আমাকে ছেড়ে অন্যস্থানে চলে গেছেন। কারণ প্রথমতঃ দেখ্‌লেন যে আমি আর তাঁর নীতির বাঁধন মেনে চল্‌তে চাইনা, আর দ্বিতীয়তঃ—থাক সে আর বলে দরকার নেই; তবে এইটুকু কথা জেনে রেখে দিও যে—'প্রদীপের নীচেই সব চেয়ে বেশী অন্ধকার'—বলে যে প্রবাদটা এতদিন চলে আস্‌ছে সেটা যে নেহাৎ মিথ্যা নয়, সে অভিজ্ঞতা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন।

বিমান একটু হেসে বল্লে—তাই নাকি? তাহ'লে ত দেখছি তুমি এখন একেবারে "স্ত্রী"—কিন্তু তোমার দেবীটি আবার আমার সঙ্গে চট করে প্রথম দিনেই আলাপ কর্ত্তে রাজি হবেন কেন?

পার্থ তা'র সিগারেটের কৌটা বার করে বিমানের হাতে একটা সিগারেট দিল, তারপর নিজে একটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্লে, সে সব দিন নেই হে বন্ধু—এখন স্বাধীনতা—মৈত্রী সাম্যের যুগ।—আমাদের প্রিয়ারা এখন সব 'রইব না বদ্ধ ঘরে'র দল। অবশ্য ভেব না এতে আমার বিশেষ কোনও আপত্তি আছে—মোটেই না, কারণ আপত্তি কর্লে যে গৃহের কোণে ঐ একটীর মুখ দেখেই সারাটি জীবন কাটাতে হয়—

বিমান তা'র কথার উত্তরে বল্লে—তোমার বিশেষ কোনও আপত্তি নেই বল্‌ছ, আর আমি বল্‌ছি আমার ও বিষয়ে পুরো মত, কারণ তোমার ত তবু গৃহের কোণে

একটাও আছে, আমার আবার তাও নেই—স্রেফ নির্জ্জলা জীবন—"

কথা বল্‌তে বল্‌তে ওরা এতক্ষণে পার্থের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছিল। পার্থ রাস্তা থেকে ফুটপাথে উঠে বল্লে—ওহে আমরা এসে গেছি, এইটে আমার বাড়ী, এস।

বাইরে বারান্দায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিয়ে পার্থ একটা ডাক দিল।

মিনিটখানেক পরে দরজা খুলে গেল—পার্থের পাশ দিয়ে বিমানের চোখে পড়ল ফরসা একটা হাত, শাড়ীর একটু প্রান্তভাগ আর কালো চুলের খানিকটা।

পার্থ বল্লে—ওহে, এস ঘরের মধ্যে।

বিমান ঘরে ঢুকে দেখ্‌ল—শূন্য ঘর; সে হাত, শাড়ী আর চুলের অধিকারিণী অন্তর্হিতা।

পার্থ তার রেন্‌কোটটা চেয়ারের উপর রেখে পাঞ্জাবীটা খুলে আলনায় রাখতে রাখতে বল্লে—আমার প্রিয়াটী শিক্ষিতা ও আলোকপ্রাপ্তা হ'লেও ঠিক 'আপ-টু-ডেট' হয়ে উঠ্‌তে পারেনি, সামান্ত একটু 'শাই' —

টেবিলের উপর একখানা Literary Digest পড়ে ছিল, বিমান সেইটার পাতা উল্টাতে সুরু করেছিল। বইটা থেকে মুখ না তুলেই বল্ল—ও Shynessটুকু থাকা ভাল, না হ'লে ভাল লাগে না। অনেক সময় অনেক কিছু নিছক মিষ্টি হওয়ার চেয়ে তার মধ্যে একটু টকের আমেজ থাকা ভাল। অবশ্য এটা আমার মত—নৈলে ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি—

পার্থ দরজার কাছে গিয়ে ডাক্‌ল—কই, এদিকে এস—আমার এই নবাগত বন্ধুটীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি'।—

পার্থের ডাক শুনে মীনা ধীরে ধীরে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

পার্থ একটু হেসে বল্লে—মীনা দেবী, আমার স্ত্রী—বিমান মজুমদার, আমার কলেজের সহপাঠী—।

বিমান নির্লিপ্তভাবে মুখটা তুলে হাত দুটো মাথায় ঠেকিয়ে নমস্কার কর্ত্তে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল—আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কল্লে—"আরে মীনা, নাকি?"

মীনার চোখেও তখন লেগেছে চমকের চমকানি—মুখে ফুটে উঠেছে একটু বিস্ময়, একটু আনন্দের আভাস।—মনের কোণে স্মৃতির জালে টান পড়েছে।

পার্থ ব্যাপারটা দেখে খুব খুসী। হো হো করে হেসে উঠল সে। বল্লে—আরে, তোমার দেখছি যাকে বলে Old Chums—ক্যাঁ? ভারী মজা হয়েছে ত?

বিমানের প্রথম চমকটা কেটে গেছে। বল্লে—"আরে, তোমার বিয়ে হয়েছে মীনার সঙ্গে—মীনা তোমারই স্ত্রী?"

পার্থ তার কাঁধ দুটো একটু Shrug করে বল্লে—আমি ত তাই জানি। তবে ওঁর মত উনিই জানেন ভাল। আচ্ছা ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর—মীনা, তুমি আমার স্ত্রী—অর্থাৎ আমি তোমার স্বামী এ কথা স্বীকার কর ত?"

মীনা লজ্জিত হয়ে উঠল—মনের লজ্জাকে রূপ দিতে মুখটাকে একটু ফেরাল বোধ হয়।

পার্থ বল্লে—দেখলে ত, কি রকম 'শাই'? স্বামীকে 'স্বামী' বলে স্বীকারটুকু কর্ত্তেও লজ্জা—অথচ আজকাল কার কোনও কোনও মেয়ে শুনি স্বামীকে স্বামী বলে অস্বীকার কর্ত্তেও লজ্জা বোধ করে না। না, মীনা, তুমি একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর সম্পত্তি—

বিমান তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বল্লে—আজ আমার ভাগ্য মহা সুপ্রসন্ন। একদিনে দুই পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা; একজন পুরুষ আর একজন নারী—আবার তা'রাই হোলো স্বামী স্ত্রী। যাই হোক, এখন ডাক্‌ব কি বলে,—মীনা না বৌদি?"

এবার মীনা কথা কইল। গায়ের কাপড়টা একটু ঠিক করে নিয়ে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসল। চোখের কোণে তা'র তখনও লজ্জার একটু ছোঁয়াচ লেগে রয়েছে। বল্লে—কবে এলে কলকাতায়? তোমার সঙ্গে ত প্রায় তিন চার বৎসর পরে দেখা। বাড়ীর সব খবর কি? বিজুর বিয়ে হয়ে গেছে?—"

পার্থ বাধা দিয়ে বল্লে—আরে ও সব মামুলী কথা পরে জিজ্ঞাসা কোরো। আমি জানি সব, আমি পরে ওদের সব খবর তোমাকে দেব। এখন দুটো এমন কথা বল যাতে তোমাদের ঘুমিয়ে-পড়া পুরানো বন্ধুত্বটা জেগে ওঠে,

আর সেই জাগরণ দেখে আমি তোমাদের দুজনের সাধারণ বন্ধু হিসাবে মনের মাঝে পুলকের সঞ্চার করি।

মীনা একটা কটাক্ষ হেনে বল্লে—"কি যে রসিকতা কর তা'র ঠিক নেই—" বলে সে উঠে দাঁড়াল, বল্লে—তোমাদের জন্যে চা তৈরী করে আনি—

পার্থ বল্ল—খুব ভাল প্রস্তাব। তবে দেখ, তোমার ও আমার এ পুরাতন বন্ধুটীকে আজ চা খাইয়েই ছেড়ে দিও না—তোমার হাতের 'ফাউল কারি'র লোভ দেখিয়ে ওকে আজ টেনে এনেছি। রাতের আহার ল্যাজ ওর এখানেই।

মীনা বেশ একটু খুসী হয়েই বল্লে—বিমানদা, খাবে ত? ভারী খুসী হ'ব কিন্তু।—"

পার্থ একটু দুষ্টামির হাসি হেসে বল্লে—হবে না? পুরাণো বন্ধু ত?

মীনা ধমক দিয়ে বল্লে—আবার! ও রকম বল্লে চা করে দেব না কিন্তু!

পার্থ যেন মহা অনুতপ্ত—বল্লে, আচ্ছা, আর বল্‌ব না, এবারকার মত ক্ষমা—

মীনা চলে গেল।—তা'র চলনে একটু নাচনের ছন্দ লেগেছে—শত সংযমের ফাঁকেও সেটা যেন একটু ধরা পড়ল গতির ভঙ্গীতে।—

মীনার চা তৈরীর ফাঁকে নানা কথার মাঝে বিমান পার্থকে জানিয়ে দিল কি করে মীনার সঙ্গে তা'র হোলো পরিচয়। সে যখন দিল্লীতে তখন একদিন তাদেরই পাশের বাড়ীতে আসেন মীনার বাবা সপরিবারে বদলি হ'য়ে। সেখানেই তা'র হয় আলাপ তাদের বাড়ীর সকলের সঙ্গে, মীনাও তা'দের মধ্যে একজন। দু বৎসর পরে উপরওয়ালার বিধানে মীনার বাবা দিল্লী পরিত্যাগ করেন—তারপর মীনার সঙ্গে এই প্রথম দেখা।—

মীনা দু'কাপ চা নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল।—

তিনজনে টেবিলের ধারে বসেছে। বাহিরে আকাশে কালো মেঘের সমারোহ—অন্ধকার হয়ে এসেছে—জলো হাওয়ার ঝাপটা লাগ্‌ছে গায়। হয়ত বৃষ্টিপাত সুরু হবে, হয়ত তা'র আর বিরাম থাক্‌বে না।

অল্পই আলোকে তা'রা পরস্পরের মুখ ভাল দেখতে পাচ্ছিল না। মীনা উঠে দাঁড়াল আলোটা জ্বালবার জন্য। পার্থ তা'কে বাধা দিয়ে বল্লে—বস, এই সময়ে অন্ধকারটাই লাগ্‌ছে ভাল। যদিও কবিরা বলেন এই রকম প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতা বিরহী মনেরই নাকি সাথী। অথচ আমাদের ঘরে আজ মিলনের মেলা—ঘরে এখন হয়ত Hundred candle power এর বাতি জ্বলাই উচিত। কিন্তু তবুও বাতি জ্বালা এখন সহ্য হচ্ছে না—এখন এই অন্ধকারই বড় ভাল লাগ্‌ছে।

হঠাৎ দেওয়ালের ঘড়িটা নিজের অন্তরে সাতবার আঘাত করে বাইরের লোককে জানিয়ে দিল—সন্ধ্যা তখন সাতটা। পার্থ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল—বিমানের কাঁধে একটা হাত রেখে বল্ল—কিছু মনে করো না ভাই, আমাকে এক্ষনি একবার বেরুতে হ'বে—ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আসব নিশ্চয়।—

বিমান একটু আশ্চর্য্য হয়েই বল্ল—সে কি হে, দেখ্‌ছো না–বাইরে একটা দুর্য্যোগ সুরু হবে যে! তা'র ত সূত্রপাত দেখা দিয়েছে—

পার্থ একটু হেসে বল্‌লে—কি কর্ব্ব বল? ব্যবসা করে খেতে হয়—সাড়ে সাতটায় 'এনগেজমেণ্ট'—না গেলেই নয়। আকাশ যদি ভেঙ্গেও পড়ে তাহলেও যেতে হ'বে। আচ্ছা তোমরা ততক্ষণ গল্প কর। আশা করি, আমার অভাব তোমরা বুঝতেই পার্ব্বে না। কি বল মীনা—একে দেওর বৌদি—তার উপর পুরাণ বন্ধু—

মীনা এবার বেশ একটু কেঁপে উঠ্‌ল।

পার্থ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লে—আচ্ছা তুমি চটে যাচ্ছ ত? বিমানকে জিজ্ঞাসা কর, সে সহজে সত্যের অপলাপ করে না—

বিমান বল্‌ল—নিশ্চয়ই! তোমার মূল্য এখন আর কতটুকু। তুমি ত Catalytic agent মাত্র। আমাদের মিলিয়ে দিয়েই তোমার কাজ সারা। তুমি দেড়ঘণ্টা কেন —দশঘণ্টা কাটিয়ে এস—খুসীই হব বরঞ্চ তাতে।

পার্থ আবার তার প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠ্‌ল—বল্‌লে, দেখলে ত মীনা—একেই বলে Frankness—সরল প্রাণের কথা।—

'Churio' বলে সে পাঞ্জাবীটা গায় দিয়ে রেনকোটটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়্‌ল।—এবার আর অন্ধকারে থাকাটা মীনা সমীচীন মনে কল্লনা—উঠে লাইটের 'সুইচ্‌'টা টিপে দিল। ঘরটা গেল আলোয় ভরে। দুজনেই তাকাল দুজনের মুখের দিকে। মীনার মনে যেন আবার সারা রাজ্যের লজ্জা এসে জড়ো হোলো। বিমানকে বল্লে—"তুমি কিছু মনে কোরো না বিমানদা, আমি আস্‌ছি এক্ষণি—" বলে তড়িৎ গতিতে বার হয়ে গেল।

বিমান একা বসে রৈল। এ সময় অন্য কেউ হ'লে হয়ত অনেক কিছুই ভাব্‌ত। মীনার কথা নিয়েই মনটা হয়ত তার নাড়া চাড়া কর্ত্ত। পুরান বান্ধবীর সঙ্গে আজ এই অকস্মাৎ মিলনের ফলে মনের মাঝে হয়ত তা'র এক অজানা আবেগের সৃষ্টি হোতো, হয়ত অতীতের সেই মধুর স্মৃতি মাখান দিনগুলির মাঝে নিজের অস্তিত্বকে সে ডুবিয়ে দিত, কিংবা হয়ত আকাশের ঐ কালো মেঘগুলির দিকে তাকিয়ে তাদের এই মধুর মিলনের দিনে বিরহী যক্ষের সমবেদনায় তার চোখের কোণে অশ্রু এসে জমাট বাঁধত। বিমান কিন্তু একেবারে যাকে বলে বে-রসিক। সে বাহিরের ঐ মেঘমেদুর আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেলে বসে' ছিল বটে, কিন্তু বসে' যা ভাব্‌ছিল তা' কোনও লোকের এ রকম সময়ে ভাবা সম্ভব নয়। নির্জ্জন পুরীর মাঝে পুরাণ বান্ধবীর নিছক একাকী সঙ্গ, বাইরে এমন যোগাযোগ, এমন সময়ে সে কিনা সব কিছু ছেড়ে ভাব্‌ছে, এখনি ভীষণভাবে যে ঝড় জল আরম্ভ হ'বে তা'র মধ্যে সে তা'র আস্তানায় ফিরবে কি করে!...এ রকম লোককে দ্বীপান্তরে পাঠান উচিত, ও বোধ হয় মানুষ খুন কর্ত্তে পারে!

মিনিট পনেরো পরে মীনা এসে দাঁড়াল। সে এর মধ্যে গা ধুয়ে, লালপেড়ে একখানি শাড়ী পড়ে এসেছে। মাথার কাপড়ের পাশ দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ অমাবস্যার মত ঘন কালো চুল তার নিটোল কাঁধের উপর দিয়ে এসে বুকের উপর ছড়িয়ে পড়েছে—কপালে তা'র একটী ছোট্ট সিন্দুরের টিপ।—

বিজলি-আলোর ছোঁয়াচ লেগে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তা'কে।—

চোখ তুলে তাকাতে বিমানের বড় ভাল লাগল তা'কে। এ যেন সে মীনা নয় যে মীনাকে সে চার বৎসর আগে চিন্‌ত। এ যেন এক নূতন রূপ নিয়েছে সে।

তখন ছিল সে পার্ব্বত্য নদীর মত—গতিতে তখন তার ছিল চঞ্চলতা। এখন যেন সে পলিমাটীর বুকের উপর দিয়ে বহে যাওয়া নদী—গতি আছে কিন্তু সে উচ্ছলতা নেই। তখন তার দেহের মাঝে যে উন্মাদনার দেখা মিলত এখন আর তা' মেলে না। এখন সেখানে এসেছে শান্ত, সৌম্য একটা ভাবের আবেশ। তখন তার চোখের কোণে যে চাহনি ছিল তার মাঝে ছিল মরণের হাতছানি, আর আজ তার সেই চাহনির মাঝে বাসা বেঁধে আছে জীবনের সমারোহ। তখন তা'র মাঝে ছিল দেহের নিমন্ত্রণ, এখন হয়ত সেখানে মিল্‌বে মনের মিতালি।—

বিমান শুধু বল্লে—"সুন্দর!"

মীনা একটু হেসে জিজ্ঞাসা কল্লে—কি সুন্দর?

—তুমি, তোমাকে কি সুন্দর যে লাগছে দেখ্‌তে! এই চারবৎসরে সৌন্দর্য্যের অনেকখানি উচু সুরেই উঠে গেছ।—

মীনা একটু লজ্জিতই হয়ে পড়ল বোধ হয় কারণ তার গৌরবর্ণ মুখটার উপর একটা যেন রক্তের আভা দেখা দিল।

সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বল্লে—তুমি কি এখনও দিল্লীতেই স্কুলে কাজ কর্চ্ছ?

বিমান শুধু বল্‌লে—হ্যাঁ।

এর পর মীনা বিমানদের বাড়ীর দু একটা খবরাখবর জিজ্ঞাসা করার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বস্‌ল—তুমি এখনও বিয়ে করনি বিমানদা?

জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখটা রাঙা হয়ে' উঠল। এতক্ষণে ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে তা'রা যেন সেই আগেকার দিনে আবার একটু ফিরে এসেছে। মীনার অন্তরের কিনারায় কোথা থেকে এসে অতীতের দু একটা স্মৃতির ঢেউ আছড়ে পড়তে সুরু করেছে।—চারবৎসর আগে তা'দের মাঝে হয়ত একটু প্রণয়ের সঞ্চার হয়েছিল

কিন্তু আজ ত তা'র কোন চিহ্নই নেই। তবুও মীনার মুখ ওরকম আকারণে রাঙা হয়ে ওঠে কেন?

মীনার সৌন্দর্য্য রং ধরিয়েছিল আজ বিমানের চোখে, তা'র মনে নয়। মীনার প্রশ্নের সে সোজা সরল উত্তরই দিতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ তার মনের কোণে লাগ্‌ল এক খেয়ালের দোলা। ভাবল সে, মন্দ কি, অন্যায়ই বা কোথায়? ঐ নারীর অন্তরে হয়ত উঠ্‌বে ক্ষণিক একটা আলোড়ন, তা'র মিথ্যা অভিনয়ে হয়ত ওর বুকের মাঝে জাগ্‌বে একটা সাময়িক সহানুভূতির বেদনা, তাতে ক্ষতি কি?

মীনার প্রশ্নের উত্তরে সে বল্‌লে—না, বিয়ে করিনি—কর্ব্বও না কখন।" তার কণ্ঠে একটা উদাস সুরের রেশ ভেসে এল।—

এ উত্তরে মীনার মনটা উঠ্‌ল দুলে। সে তার সুরটাকে অনেকখানি মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা কল্লে—"কেন বিমানদা?"

এবার বিমানের সুর শুধু উদাস নয়—চোখের দৃষ্টিও উদাস।—

বল্‌লে—মীনা, হৃদয় একজনকে বিলিয়ে দিয়ে পরে শুধু দেহের সম্পর্ক পাতাবার জন্য আর একজনকে বিয়ে করাটাকে আমি ব্যভিচার মনে করি—" বেশ গম্ভীরভাবেই বল্‌ল সে একথা—অদ্ভুত ক্ষমতা ওর।—

খানিকক্ষণ চুপ করে রৈল দুজনেই—তারপর বেশ একটা আল রকম দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে বল্‌ল—মিনু, (এবার আর মীনা নয়)—জীবনে একজনকে ভালবেসে অন্য আর কাকেও বিয়ে কর্ত্তে তুমিই কি পরামর্শ দাও?"—চোখটা ওর একটু ছল ছল করে উঠ্‌ল নাকি? ওর পক্ষে আশ্চর্য্য কিছুই না।

মীনার বুকের মাঝে তুফান উঠেছে—বেদনার বিক্ষেপ চলেছে সেখানে। বিমানের এ প্রণয়ের আস্পদ যে কে তা সে জানে তবুও অন্তর তার সায় দিতে চায় না। তার অনিচ্ছা সত্ত্বেই তা'র মুখ দিয়ে যেন বার হয়ে এল—"কাকে তোমার হৃদয় বিলিয়ে দিয়েছ বিমানদা?"

বিমান তা'র মাথাটা দুই হাতের মধ্যে ঢেকে বল্লে—মিনু, সবই ত জান, তবুও একথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কেন? চারটে বৎসরের কি এতই বেশী ক্ষমতা যে আমাদের সেই দুই বৎসরের যত কিছু মধুর স্মৃতি সব তোমার অন্তর থেকে মুছে নিয়েছে? তাও যদি নিয়ে থাকে,—থাক; কিন্তু আমাকে সেই স্মৃতিটুকু জড়িয়ে ধরে জীবনের বাকীটুকু কাটিয়ে দিতে দাও। আমি ত কিছুই প্রত্যাশা করি না, তবে একটা আশাকে এতদিন অন্তরের মাঝে পোষণ করে আসছিলাম যে আর যাই হোক না কেন, তোমার অন্তরের কোনও নিভৃত কন্দরে আমার জন্য একটু স্থান এখনও আছে নিশ্চয়। জানি না সে আশা অমূলক কিনা।—"বিমান এবার মুখ তুলে তাকিয়ে দেখ্‌লে যে মীনার মনের আলোড়ন দেহের উপর রূপ নিয়েছে। তার সারা শরীরের উপর দিয়ে যেন একটা শিহরণ খেলে যাচ্ছে—তার বুকের ওঠানামা বেশ দ্রুতগতিতেই চলেছে। সে সম্মুখের টেবিলটার একটা কোণে একটা হাত রেখে মাটীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে—চোখে বোধ হয় তার পলক পড়্‌ছে না।—

বিমান এবার একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে বস্‌ল যে। উঠে গিয়ে মীনার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে অতি কাতর ভাবে বল্‌লে—"মিনু, ভেব না আজ সুযোগ পেয়ে সেই অতীতের কথা তুলে অন্যায় দাবী কিছু কর্ব্ব তোমার কাছে মনের দিক থেকে। মোটেই নয়। শুধু এইটুকু জান্‌তে চাই—তোমার আমার মধ্যে একদিন যা রূপ নিতে সুরু করেছিল তা'র রেখার সীমা কি অসময়েই টানা হয়ে গেছে? তোমার অন্তরে আমার যে অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আজ কি তা এখনও আছে? যদি থাকে তাহ'লে সেইটুকুই আমাকে জানিয়ে দাও—মিন্ (এবার মীনা বা মিনু নয় এবার আবার মিন্)—যদি সত্যি হয়, তাহ'লে আমাকে শুধু বল "তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ভুলিনি, তোমাকে ভুলবও না কখনও?"—সেই হ'বে আমার জীবনের চরম স্বার্থকতা, জীবন পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। তোমার ঐ কথা ক'টাই আমার জীবনের সকল কাঁটাকে ধন্য করে ফুল ফুটিয়ে তুলবে, সমস্ত ব্যথার মাঝে ক্ষণে ক্ষণে বাঁশীর সুরের মত কানে এসে বাজবে।—"বলেই, ওকি, বিমান

রবীন্দ্রনাথের "বিদায়-সম্বল" আবৃত্তি সুরু করে দিল যে—

"—যাবার দিকের পথিক সে-কথা
ভরি লয় তা'র প্রাণে।
পিছনের ঐ শেষ আকুলতা
পাথেয় বলি সে জানে।
যখন আঁধারে ভরিবে সরণী,
ভুলে ভরা ঘুমে নীরব ধরণী,
"ভুলিব না কভু"—এই ক্ষীণ ধ্বনি
তখনো বাজিবে কানে"—

কি রকম মিষ্টি করেই বল্ল! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজের এ কবিতা অত মিষ্টি করে' আবৃত্তি কর্ত্তে পার্ত্তেন কি না সন্দেহ।

বিমান বোধ হয় এখনি বেদনায় ভেঙ্গে পড়বে—এমনি ভাব করেছে। বাঃ, চোখ দুটোতে কারুণ্যের ভাবও এনেছে অনেকখানি। বল্লে—"বল মিন্, শুধু ঐটুকু জানতে দাও—"

বাইরে বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়ে গিয়েছে। মীনা হঠাৎ বিমানের হাতের বাঁধন থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বার হয়ে গেল ঘর থেকে,—বলে গেল, আসছি বিমানদা, উপরের জানালাগুলি বন্ধ করে দিয়ে আসি—হয়ত বিছানায় ছাট লাগ্‌ছে—"

মীনা চলে যেতেই বিমানের মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। কোথায় গেল তা'র চোখের সে করুণ চাহনি—এখন ত তা'র চোখের কোণে কৌতুকের হাসি টলমল কর্চ্ছে। সে যেন অভিনয়ান্তে রঙ্গমঞ্চ থেকে সাজঘরে চলে এসেছে—

ভাবল সে,—এর মধ্যে অন্যায় কি?—সত্যিই ত আর সে love-making চালাচ্ছে না বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুর অনুপস্থিতিতে। এত একটা fun—সেত শুধু একটা experiment কর্চ্ছে মাত্র যে সে কি রকম অভিনয় কর্ত্তে পারে—মিথ্যাটাকে সত্যির রং দিয়ে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে কিনা। পার্থকে না হয় আড়ালে এ কথা একদিন জানিয়ে দিলেই হবে—সে উপভোগই কর্ব্বে নিশ্চয়। তবে মীনা জানলেই মুস্কিল—

মীনা উপরে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল—কিন্তু তা' বন্ধ কর্ল্লে না। তা'র বুকে মুখে এসে বৃষ্টির ছাট লাগ্‌তে লাগল।—

বিমানের সব কথাই সে সত্যি বলে মেনে নিয়েছিল। তার বুকটা ব্যথায় দুলে উঠ্‌ছিল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। চার বৎসর আগে তা'দের মাঝে ঘনিষ্ঠতার ফলে তা'র মনের কোণে কোথায় হয়ত প্রেমের একটা কুঁড়ি জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু সে কুঁড়ি ফুটবার আগেই ত তার জীবনান্ত হয়ে গেছে। মনের মাঝে শত শত বার তন্ন তন্ন করে খোঁজ করে সে দেখল যে কোথাও সে কুঁড়ির চিহ্নমাত্রও নেই। কবে কখন শুকিয়ে তা ঝরে পড়ে গেছে, তারপর কোথায় সে শুক্‌নো ঝরে-পড়া কুঁড়ি উড়ে গেছে কে জানে। অথচ তা'র বিমানদার মনের মাঝে সে কুঁড়ি ফুটে ফুলে ফলে ভরে উঠেছে। একজন মানুষ তা'কেই তা'র প্রাণমন বিলিয়ে দিয়েছে, তা'কে ভালবেসেই সে বাঁচতে চায়, এ কথা জেনে যে তা'র মনে আনন্দের ঢেউ ওঠে না, শরীরে যে শিহরণ জাগে না, এ কথা মিথ্যা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐ মানুষটাকে যে সে আর ভালবাসে না, ভালবাসতে পারে না, এ কথাও যে তেমনি সত্যি। সে শুধু জান্‌তে চায় তাকে সে ভালবাসে কিনা এখনও, কখনও ভুলবে না কি না সে। সত্যি কথা যা' তা' জানালে বিমানদার বুকটা হয়ত ব্যথায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। সে, তা'র দেহকান্তী নয়—শুধু তা'র একটা মাত্র মুখের কথাকে অবলম্বন করে জীবনের পথে চল্‌তে চায় সে। মীনা ভেবে ঠিক কর্ত্তে পার্চ্ছিল না কি কর্ব্বে সে।...আকাশের বুকে বিজলি খেলে গেল, রাস্তাতে একটা রিক্সওয়ালা এই বৃষ্টির মধ্যে ভাড়ার আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা ভিখারী সম্মুখের ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছে...

মীনা ভাবলে বিমানদাকে বাঁচাতে হ'লে, তা'র জীবনটাকে ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা কর্ত্তে হ'লে, তা'কে মিথ্যা বল্‌তে হয়, ছলনা কর্ত্তে হয়, প্রেমের অভিনয় কর্ত্তে হয়। হয়ত পার্থের কাছে তা'তে সে হ'বে অপরাধী, কিন্তু এ

দিকেই বা তা'র কি অধিকার আছে আর একজনের জীবনকে এমনি করে বিস্বাদ করে দিতে, তার জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য হরণ করে নিতে? সময় সময় সত্যভাষণই ত পাপ। ভালবাসা বলতে যা বোঝায় তা হয়ত বিমানকে সে বাসে না, তা'বলে তার প্রতি স্নেহ প্রীতিরও ত অভাব নেই। সহানুভূতির বেদনায় চোখদুটীতে তা'র অশ্রু এসে জমাট বেঁধেছে। সে ঠিক কল্ল, মিথ্যাই বল্‌বে সে। শুধু বল্‌বে নয় এমন ভাবে বল্‌বে যা'তে সে কোনও রকমে অবিশ্বাস না করে। হ্যাঁ, প্রেমের অভিনয়ই কর্ব্বে সে। তা'তে তা'র অন্তরের মাঝে হয়ত হ'বে সত্যের মৃত্যু, কিন্তু আর একজনকে সে দুহাতে তুলে দেবে তা'র জীবন—

সে নীচে নেমে এল।

এর মধ্যেই বিমান একটা সুন্দর Pose নিয়ে বসেছে। বাইরের দিকে দৃষ্টি তার নিবদ্ধ। সে দৃষ্টি যেন কোথায় কোন অসীমের মাঝে হারিয়ে গেছে। একটা সিগারেট ধরিয়েছে বটে কিন্তু টান্‌ছে না, হাতেই সেটা পুড়ে যাচ্ছে। চোখ দুটোর কোণায়—ওকি, জল এনেছে যে, সিগারেটের ধোঁয়া লাগাল নাকি চোখে? অদ্ভুত ক্ষমতা! এক মুহূর্ত্তে এ রকম ভাব বদলাতে পারে—কোথায় লাগেন শিশির ভাদুড়ী বা নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী। অভিনেতা বটে বিমান, মীনা ঘরে ঢুকেছে বিমান যেন জানেই না—

বিমানের Pose কাজে লেগেছে। মীনা ঘরে ঢুকেই তা'র এই উদাস ভাব লক্ষ্য করেছে। চোখের জলটুকুও মীনার দৃষ্টি এড়ায়নি। তা'র অন্তরটা বেদনায় গুমরে কেঁদে উঠল—ইচ্ছা হোলো, তার বিমানদাকে সে একটু আদর করে। তা'র এ পবিত্র প্রেমের প্রতিদান দিতে না পারলেও সে ও প্রেমকে শ্রদ্ধা করে।—

সে এগিয়ে গেল, বিমানের পিছনে এসে দাঁড়াল। বিমান ঠিক সময় মত—(মীনা অত কাছে এসেছে যেন সে জানেই না)—একটা টানা লম্বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। চোখ থেকে অশ্রুর ধারা তখন তা'র গাল বয়ে গড়িয়ে নাম্‌ছে।—

মীনা আস্তে আস্তে বিমানের মাথার হাত রাখ্‌লে—

বিমান প্রথমে কিছু বলল না, চুপ করে বসে রৈল। মনে মনে ভাব্‌ল—Great success. কয়েক মিনিট এমনি ভাবে কেটে যাওয়ার পরে নিজের মাথার উপর থেকে মীনার হাত দুটো নামিয়ে নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে বন্দী করে, বল্‌ল—পারলে না মিনু, আমাকে ঐ পাথেয়টুকু দিতে? দুঃখ কোরো না, কি কর্ব্বে বল, হৃদয় ত কারো অধীন নয়।"—তা'র গলার স্বরে মনে হয় যেন খুব খানিক কেঁদে এইমাত্র চুপ করেছে।

মীনা ব্যথায় গলে গেল। জিজ্ঞাসা করলে—বিনুদা (বিমানদা নয়), সত্যিই তুমি আমাকে এত ভালবাস যে 'আমি তোমাকে ভালবাসি, কখনও তোমাকে ভুলব না' এইটুকু শুনেই তুমি তোমার জীবন পথে চল্‌তে পার্ব্বে আনন্দের সাথে?—

বিমান বল্‌লে—"পার্ব্ব মিনু।—"

"তবে শোন বিনুদা,"—স্বরটা একটু তার কেঁপে উঠল—আমার অন্তরের মাঝে একদিন তোমার যে অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে অধিকার তোমার এখনও ঠিক সেই রকমই আছে—এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। তোমায় কখনও ভুলিনি, ভুলবও না কখনও—"—বলে সে আস্তে আস্তে বার হয়ে গেল ঘর থেকে।—

খানিক পরে পার্থ ঘুরে এল। সে জামা কাপড় বদলে নিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরাল, পরে বিমানের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল—"কি রকম কাটালে বল সন্ধ্যাটা আজ?"

বিমান হেসে বল্‌লে—এর চেয়ে ভালভাবে কাটান আর সম্ভব কিনা জানি না। তোমার স্ত্রী ও আমার একাধারে বান্ধবী ও বৌদির সঙ্গে তোমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রেমালাপ জমিয়ে তুলেছিলাম হে—এই ভরা ভাদরে এই অবিরল বরিষণের মাঝে—

পার্থ হো হো করে হেসে উঠল, বিমানের পিঠ চাপড়ে বল্‌লে—That's like a clever fellow—আমি হ'লেও তাই কর্ত্তাম। চল, খাওয়া যাক্‌গে। প্রেমালাপের পর fowl curry জমবে ভাল।—

খানিকক্ষণ পরে বিমান বিদায় নিল দুজনের কাছ থেকে। বৃষ্টিটা তখনকার মত থেমেছে বটে—তবে আকাশের বুকে

কালো মেঘের যে রকম আনাগোনা চলেছে তাতে মনে হয় শীঘ্রই আবার বৃষ্টি অবিরাম ধারা সুরু হ'বে।—

গভীর রাত্রি—বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘের পাশ দিয়ে তখন চাঁদের হাসি ফুটে উঠেছে—

মীনা জানালার ধারে বসে ভাবছে আজ সন্ধ্যায় তা'র অভিনয়ের কথা—

ভাবছে, সত্যের সে টুঁটি টিপে ধরে মিথ্যাকে দিয়েছে প্রশ্রয়। হয়ত এতে হয়েছে সে অপরাধী, কিন্তু সে আর একজনকে ত তার বিষাদ জীবনে মাধুর্য্যের আস্বাদ দিয়েছে, বাঁচবার জন্য তাকে দিয়েছে সঞ্জীবনী।...আত্মত্যাগের মহিমায় তার মুখ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—তার সে সুন্দর মুখখানির উপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে।—

ঠিক ঐ একই সময়ে সহরের আর এক প্রান্তে বসে বিমানও ভাবছে তার আজকের অভিনয়ের কথা। একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট টান্‌ছে আর ভাবছে—Nice fun—Great success.—মীনা সত্যিই ভাবলে, আমি তাকে ভালবাসি—তার ভালবাসা না পেলে আমার সারাজীবনটা হ'য়ে যাবে ব্যর্থ? তার গোটা কতক কথা হবে আমার চিরজীবনের সম্বল? সত্যি ভাবলে সে?—How silly। করলাম প্রেমের একটু অভিনয় and she took it seriously! তা'তেই সে গেল ভুলে! বললে, আমাকে সে ভালবাসে, কখনও ভুলবে না আমাকে—all rot. যাই হোক, অভিনয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা আমার আছে এ স্বীকার কর্‌তেই হবে—কত সহজে মীনাকে করলাম fooled.—আত্মপ্রসাদের হাসি একটা তার চাপা ঠোটের কোণে ভেসে উঠল। বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে—ধোঁয়াগুলি কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠে শূন্যে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রলাল রায়

নূতন

সুফী মোতাহার হোসেন

আমার অন্তর আজি গাঢ় নীলে নীল হয়ে হাসে
মর্ম্ম-মাঝে স্নিগ্ধবাম্ সেফালীর সৌরভ লুটায়।
বীণাতন্ত্র সুগভীর রণি উঠে সকল হিয়ায়
ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় কোথা হতে কে আসে কে আসে
কার লঘু পক্ষ রেখা চিদাকাশে ছায়াসম ভাসে
চম্পক অঙ্গুলি দিয়া কে রূপসী ঈষৎ সরায়
তিমির রহস্য জাল; কেবা জাগে স্বপন সভায়!
একাগ্র ব্যাকুল ব্যগ্র আঁখি দিয়া কে মোরে সম্ভাষে!

সহস্র যোজন দূর তারকার আলোর মতন
কবে কোন্ আদি যুগে অলোক অলকা তার ত্যজি
ভুবনের পথে পথে সে কি মোরে ফিরেছে খুঁজিয়া
অযুত প্রাণের উৎসে, মৃত্যুহীন পরসাদ নিয়া?
তাহার পায়ের ধ্বনি বাতাসে বাতাসে গেল বাজি
ত্রিভুবনে উঠে রব: কে আসিছে অপূর্ব্ব নূতন!
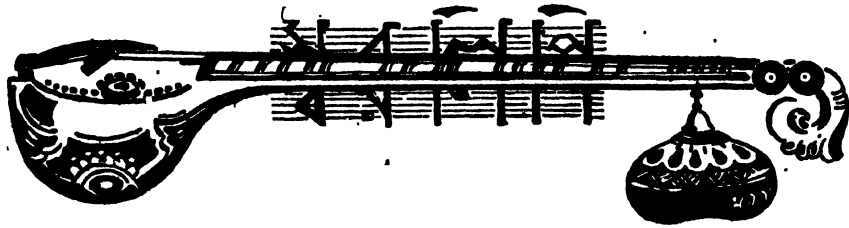
তিলক কামোদ—তেতালা

পায়ো জী মৈনে রাম রতন ধন পায়ো
বস্তু অমোলিক দী মেরে সতগুরু
কৃপা কর অপনায়ো।
জনম জনম কী পুঁজি পাই
জগমেঁ সভী খোবায়ো।
খরচৈ ন খুটৈ বাকো চোরন লুটৈ
দিন দিন বঢ়ত সবায়ো।
সতকে নাব খেবটিয়া সতগুরু
ভবসাগর তর আয়ো।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর
হরখ হরখ জস গায়ো।

কথা—মীরাবাই

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ
(সঙ্গীত রত্নাকর)

আস্থায়ী—

০ ১ ২´ ৩
পা ধা মা গা । রা গা রসা সা I ন্‌া রা গা রা । গা মা পা ধা I
পা • য়ো জী মৈ • নে• • রা • ম র ত ন ধ ন

০ ১ ২´ ৩
পমা মা গা -া । পা -া পা পা I ধা মা পা পা । র্সনা র্সপা ণা ধা I
পা• • য়ো • ব • স্তু অ মো • লি ক দী• • • • মে রে

০ ১ ২´ ৩
পা মা গা় গা । গা -রা পা পা I পধা পধা মা গা । রগা মা গমা পা II
স ত গু রু কৃ পা • ক র• • • অ প না • • য়ো • •

অন্তরা—

০ ১ ২´ ৩
মা পা না না । র্সা না র্সা -া I পনা র্সর্রা র্সা না । র্সা -া র্সা -া I
জ ন ম জ ন ম কী • • পু • • • জি • পা • ই •

০ ১ ২´ ৩
না র্রা র্গা র্রা । র্মা র্গা র্রর্সা র্সা I না র্সা নর্সা র্রা । ণা ধা পা -া I
জ গ মে • স ভী থো • • • বা • • • • য়ো • • •

মা পা র্সা -া । পা ণা ধা পা I পা ধা মগা রা । রগা রা পা পা I
থ র চৈ • ন • খু টৈ চো • র • • • ন • • লু টে

০ ১ ২´ ৩
মা পা ণা ধা । পা ধা মা গা I রগা মা গমা পা । মপা ধা মা গা II
দি ন দি ন ব চ্ ত স বা • • • • • য়ো • • • •

২য় অন্তরা—

০ ১ ২´ ৩
মা পা না -া । র্সা না র্সা -া I পা না র্সা র্রা । র্সা না র্সা র্সা I
স ত কে • না • • • খে ব টি রা স ত গু রু

০ ১ ২´ ৩
না র্রা র্গা র্রা । র্মা র্গা র্রা র্সা I না র্সা নর্সা র্রা । ণা ধা পা -া I
ভা ব সা • গ র ত র আ • • • • য়ো • • •

০ ১ ২´ ৩
মা পা র্সা -া । পা ণা ধা পা I পা ধা মা গা । রগা রা পা পা I
মী • রা • কে • প্র ভু গি রি ধ র না • • গ র

০ ১ ২´ ৩
মা পা ণা ধা । পা ধা মা গা I রগা মা গমা পা । মপা ধা মা গা II
হ র খ হ র খ জ স গা • • • য়ো • • • •

তান—

২´ ৩
১। ´ন্‌রা গরা গমা পর্সা। পণা ধপা মগা রসা I
আ • • • • • • • • • • • • • • •

২´ ৩
২। পনা র্সর্রা র্সণ্রা ধপা। মগা রপা মগা রসা I

০ ১´ ২ ৩
৩। র্সর্রা র্সপা ণধা পমা। গরা পমা গরা সন্‌। I সরা গরা গমা পর্সা। ণধা পমা গরা সসা II
আ •

সমাজে নারীর স্থান ও বর্ত্তমান নারী প্রগতি

শ্রীসুকুমার মিত্র এম-এ

প্রত্যেক যুগের একটী বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে পিছনে ফেলে রেখে চল্‌বার চেষ্টা এ যেন সব যুগেরই অভিসন্ধি। এ অভিসন্ধি যে সব সময় সফলতার রূপ পায় এমন নয়, তবে এই চলার পথে সে তাহার নিজস্ব মূর্ত্তিকে আবিষ্কার করে এবং কালের পৃষ্ঠায় তাহার বৈশিষ্ট্যের ছাপ অক্ষয় করিয়া আঁকিয়া রাখিয়া যায়।

যদিও একথা ঠিক যে বর্ত্তমান যুগকে বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই, কারণ তাহার প্রকৃত বিচারক হইবে ভবিষ্যতের অনাগতের দল, তথাপি দুই একটী বিষয় এতই সুস্পষ্ট যে যুগবৈশিষ্ট্যের ছাপ ইতিমধ্যেই তাহারা বহন করিতেছে। এমনই একটী যুগান্তকারী ও নবযুগের অভ্যুদয়কারী বিষয় হইল 'সমাজে নারীর স্থান ও তাহার বর্ত্তমান প্রগতি।'

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,—
হে বিধাতঃ?'

কবির সুরে নারীর আকুল আহ্বান হয়ত বিধাতার কানে পৌঁছিয়াছে, বিধাতা হয়ত বহুকাল হইতে, হয়ত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই নারীকে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু সে অধিকার হইতে নারীকে চিরদিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে পুরুষের পৌরুষ, আর পুরুষের চির অতৃপ্ত লালসা। নারীকে অতিমাত্রার সম্মান দেখাইতে যাইয়া পুরুষ হয়ত কোনও দিন তাহাকে দেবীর আসনও দিয়াছে কিন্তু সেই দেবীত্বের মুখোসকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় নারী তাহার প্রাণের দৈন্য দূর করিবার অবসর পায় নাই। মাতৃত্বের প্রতি পূজাকে সার্থক করিতে যাইয়া জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতাকে নারী যে কত যুগ ধরিয়া খর্ব্ব করিয়া আসিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' নারীকে প্রকৃতির সৃষ্টিক্রিয়ার একটী যন্ত্রস্বরূপ মাত্র মনে করিতে শিখাইয়াছে। আর দেশের যাঁহারা আধ্যাত্মিক গুরু, তাঁহারা কামিনী কাঞ্চনকে ত্যাগ করিতে বলিয়া কামিনীকে কাঞ্চনের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ'—'অতীব যুক্তি পূর্ণ কথা লইলেও 'কন্যার শিক্ষা ও পালন এই উভয় ব্যাপারই নেহাৎ গোঁজামিল দিয়া এ তাবৎ কাল চলিয়া আসিতেছে। একই বাটীতে পুত্র ও কন্যার লালনপালন বিষয়ে যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে তাহা বোধ হয় ব্যাখ্যা না করিলেও সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। শাস্ত্র ও লোকাচার উভয়ই এমনভাবে রচিত হইয়াছে—অবশ্যই পুরুষদের দ্বারা—যে তাহাতে এমন কোনও ফাঁক না থাকিতে পায় যদ্দ্বারা নারী কোনও দিন কোনও রূপ সুখ সুবিধা ভোগ করিতে পারে। নারীও যে যৌন সম্মতিদ্বারা পুরুষকে অত্যাচার করিবার যথেষ্ট সুযোগ না দিয়াছে, এমন নয়। স্ত্রীশিক্ষাকে এতকাল আমাদের দেশে অনধিকার চর্চ্চারূপেই গণ্য করা হইয়াছে। আমাদের (পুরুষদের) সুবিধার জন্যও যে নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে মনে স্বীকার করিলেও মুখে স্বীকার করি নাই। অবরোধ প্রথার দ্বারা নারীকে পর্দ্দানশীন করিয়া বাহিরের আলোহাওয়ার জগৎ হইতে তাহাকে যেমন নির্ব্বাসন দিয়াছি, শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার মনের উপর ততোধিক ভয়াবহ পর্দ্দা টানিয়া দিয়াছি। ভাবি নাই, বুঝি নাই যে এই অন্তঃপুরচারিণী, আমাদের দেশের, আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ যাহারা, তাহাদের জননী। এ জ্ঞান আমাদের হয় নাই যে ইহাদের বঞ্চিত করিয়া আমাদের জাতিকে আমরা পঙ্গু করিতেছি। সীতার, সাবিত্রীর, গায়ত্রীর কথা স্মরণ

করাইয়া তাহাদের বলিয়াছি—সতীত্বের অম্লান তেজে তোমরা জগৎকে উদ্ভাসিত কর; কর্ত্তব্যের বোঝা তাহাদের উপর যৎপরোনাস্তি চাপাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের কি অধিকার আছে তাহা কোনও দিন জানাই নি পাছে আমাদের এমন সুন্দর সনাতন কালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের আত্মরক্ষা করিবার কৌশল কোনও দিন শিখাই নাই, নিজেরা তাহাদের রক্ষা করিব এ শক্তিও কোনও দিন অর্জ্জন করি নাই—তাই তাহারা শক্তিরূপিনী হইয়াও আমাদের শক্তি দিতে পারে না—জড়পিণ্ডের মত আমাদের বুকের উপর পাষাণের বোঝা হইয়া রহিয়াছে।

নারীর উপর পুরুষের যে অবাধ ভোগ দখলের অধিকার—তাহা 'পতি পরম গুরু' ঐ একমাত্র মন্ত্রেই সিদ্ধ হইয়াছে। পুরুষের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি এই যে পুরুষ, পুরুষ; পুরুষ নারী নয়। পুরুষের ভাগ্য পরীক্ষার পথে—তাহার অবাধ স্বাধীনতার মাঝখানে নারী যে একটা অন্তরায় তাহা পাকে প্রকারে পুরুষ বুঝাইয়া আসিতেছে—সেই জন্যই পুরুষের মতে 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা'।

'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই সাধুবাক্যের অনুসরণ করিয়া স্ত্রীকে যদি বা কোনও দিন সহধর্ম্মিণীর আসন দেওয়া হইয়া থাকে, (সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ আছে) সহধর্ম্মিণীর আসন কোনও দিন দেওয়া হয় নাই। স্ত্রীপুরুষের সম্মিলিত শক্তি জগতের কল্যাণের জন্য নিবেদিত হইয়া স্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গিনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। আমাদের দেশে বিবাহের অনুষ্ঠানে মাল্যবিনিময় হয় বটে কিন্তু চিত্ত বিনিময়ের ব্যাপারটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহ্য থাকিয়া যায়। বিবাহের দ্বারা পুরুষের বিত্তসংযোগ হয় বটে, কিন্তু চিত্তসংযোগ না হওয়ায় নারীকে পুরুষ চিনিবার চেষ্টা খুব কমই করে—এবং 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী' এই সদুপদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া স্ত্রীর মতামতকে চিরদিন উপেক্ষা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

নারীত্বের প্রতি আমাদের অসম্মান চরমে উঠে বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে। বরকন্যাকে দাঁড়াইয়া নারীকে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে আমরা কোনও দিন কার্পণ্য করি নাই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নারীর মূল্য আমরা কি দিই তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কন্যার বিবাহ, কন্যার ও কন্যার পিতার পক্ষে কত বড় অগৌরবের ও মর্ম্মান্তিক লজ্জার বিষয় তাহা ভাষায় বুঝান কঠিন। কন্যা যেন বিক্রয়ের জন্য আনীত সামগ্রী বিশেষ—তাহাকে বর পক্ষীয়গণের নয়নলোভন করিবার জন্য কোনও রূপ সজ্জারই ত্রুটি করা হয় না। কন্যার মধ্যে হৃদয় বলিয়া যে কোনও বস্তু থাকিতে পারে, তাহা বোধ হয় কল্পনার মধ্যে আনাও মহাপাপ। তাহার আত্মসম্মান জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়াই তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। পাত্রীর পিতা যদি বরকে অধিক পণ দিবার মত অবস্থাপন্ন না হ'ন অথচ সমাজে পতিত হইবার ভয়ে যদি তাহাকে অবাঞ্ছনীয় পাত্রের হস্তেও সমর্পণ করেন, সে বিষয়ে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা অথবা সেই বিবাহে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করা কন্যার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন ও অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে। যে দুর্ভাগা দেশে কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করাই একটা অপরাধ—যে সমাজে পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা, অপার করুণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার নারীজন্ম উদ্ধার করারই নামান্তর, সেখানে কন্যার বিবাহে বরপণরূপ দণ্ড যে অতি ন্যায্য বিধান হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? যদিচ বরপণরূপ বর্ব্বর প্রথা দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে বর আপনাকে পণের মূল্যে বিক্রয় করিতেছে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার বিপরীত ফলই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কন্যার যে কোনও রূপ স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার চক্ষেই দেখা হইয়া থাকে এবং সতীত্বের ছাপ খাইবার জন্য নির্য্যাতন বা লাঞ্ছনার কোন মূল্যকেই সে অধিক বলিয়া মনে করে না। এই ভাবে কুললক্ষ্মী বা গৃহলক্ষ্মীর টীকা ললাটে পরিবার জন্য নারী স্বেচ্ছায় ক্রীতদাসীর জীবনযাপন করে। এই চরম আত্মনিবেদন আমাদের এত সহজপ্রাপ্য বলিয়াই ইহার অস্বাভাবিকতা আমাদের চোখেই পড়ে না।

গৌরীদানের পুণ্য অর্জ্জন করিবার জন্য কন্যার জীবন বলিদানের ব্যবস্থাকে আমরা বহুদিন হইতে প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছি। বিবাহ সম্বন্ধে কোনও রূপ ধারণা মনে বদ্ধমূল

হইবার পূর্ব্বেই কন্যার অবিবাহিতা নাম খণ্ডনের জন্য আমরা কন্যার জীবন মরণের ভার জরাগ্রস্ত, অতিবৃদ্ধের হস্তে সম্প্রদান করিতেও ইতস্ততঃ করি নাই। আর বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা বালিকাকে বৃদ্ধের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে পিতৃগৃহে পুনঃ প্রবেশ করিতে দেখি তখন তাহার উপর ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর বিধান চাপানকে সমাজশৃঙ্খলা রক্ষার পরম প্রয়োজনীয় স্তম্ভস্বরূপ ঘোষণা করাকে আমরা নৃশংস অমানুষিকতা বলিয়া কোনও দিন মনে করি নাই। আমাদের এই অদ্ভুত বিধান দেখিয়া দেবতা অলক্ষ্যে হাসেন, আর সমাজপণ্ডিরা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলেন—সবই লীলাময়ের ইচ্ছা, সবই অদৃষ্ট, 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের নিগড়ে অসহায়া বালিকাকে বন্ধন করা যাঁহারা সমাজ রক্ষার একটা চমৎকার উপায় বলিয়া মনে করেন সেই তাঁহারাই বিগতদার হইলে সংসার রক্ষার বা বংশরক্ষার খাতিরে পড়িয়া পৌত্রী বা দৌহিত্রীর বয়সের কন্যার পাণিপীড়নের ব্যাপারের মধ্যে কোনও রূপ অযৌক্তিকতা খুঁজিয়া পান না।

সন্তানপালন সম্বন্ধে কোনওরূপ শিক্ষা পাইবার পূর্ব্বেই মাতৃত্বের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে, এমন অবিচার সহ্য করিবার শক্তি শুধু আমাদের দেশের নারীরই আছে। শিশুমৃত্যুর অস্বাভাবিক হার যে অপরিণতদেহা বালিকা-মাতার সন্তানপালন সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয়ই প্রদান করে সে বিষয়ে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই, তবে আক্ষেপ করিবার যথেষ্টই আছে। সনাতন রীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে গিয়া আমরা যে আমাদের জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে বসিয়াছি তাহা আমরা কোনও দিন ভাবি না। এ সম্বন্ধে হয়ত তর্ক উঠিতে পারে যে সর্দা আইনের ফলে যে নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে ইহাতেই কি এই সমস্যার মীমাংসা হইবে? অধিক বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকিয়া বিবাহিতা হইলেই কি কন্যার জীবন সকল সময় সুখপ্রদ হইবে? প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ সকল সময় হয়ত সুখের নাও হইতে পারে কারণ তাহার পছন্দ অপছন্দ করিবার একটা ক্ষমতা জন্মিয়াছে এবং পতি নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা না পাইলে অর্থাৎ তাহার বাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিত মিলনের পথে কোনওরূপ অন্তরায় উপস্থিত হইলে তাহার মনে স্বতঃই একটা ক্ষোভ জন্মিতে পারে। অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার মতামতের কোনও বালাই নাই এবং বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে কোনওরূপ সুচিন্তিত ধারণা না থাকায় পিতা, মাতা বা অন্য অভিভাবকের দ্বারা নির্ব্বাচিত ব্যক্তির সহিত পরিণয়ে কোনওরূপ অসন্তোষ মনের মধ্যে স্থান পায় না। অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহের আরও একটা সুবিধা এই যে কন্যার প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে তাহার ভার অনেকটা লঘু হইয়া যায়। কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিতে হইলে তাহাকে শিক্ষিতা, সংযম সাধনে অভ্যস্তা, গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা এক কথায় গৃহলক্ষ্মীর আদর্শে প্রতিষ্ঠিতা করিবার জন্য যথেষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। বাল্যবিবাহ প্রথা হয়ত এই দায়িত্বের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার একটা চমৎকার উপায় বলিয়া আমাদের দেশে এত সমাদর পাইয়াছে, তাহাও কারণ হইতে পারে। বাল্যবিবাহ প্রথার মধ্যে সুফল আর যাহাই থাকুক বিবাহের উদ্দেশ্য যে ইহাতে সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়, এবং পিতামাতার দিক হইতে যে কঠোর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া হয় এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

হিন্দু নারীর যাঁহারা উপাস্য, যাঁহারা আদর্শ, যাঁহাদের কথা স্মরণ মাত্রে সম্ভ্রমে শির আনত হয়, সেই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী ইঁহাদের কাহারও জীবনে বাল্যবিবাহের সমর্থন আমরা পাই নাই। পাইয়াছি তাঁহাদের পতি-নির্ব্বাচনের অধিকারের মধ্য দিয়া, স্ত্রী স্বাধীনতার নিকলঙ্ক, অনুপম উদাহরণ। সংযুক্তার স্বয়ম্বর সভার কথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন। রাজপুত রমণীদের ত্যাগ ও প্রেম, বীরত্ব ও মহিমা, আত্মসম্মান জ্ঞান ও আত্ম-নিবেদন, বিস্ময় বিমূঢ় জগতের সম্মুখে রাজপুত কাহিনীকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। আজও বাল্যবিবাহ প্রথা যাঁহারা সমর্থন করেন, জানিতে ইচ্ছা হয়, কোন্ অধিকারে এই সকল মহীয়সী নারীর পবিত্র নাম তাঁহারা উচ্চারণ করেন?

নারীর পতনের ইতিহাসের পশ্চাতেও রহিয়াছে পুরুষের মর্ম্মন্তুদ অবিচার। নারীর অক্ষমতার সুবিধা লইয়া অবিচার পুরুষ বহুপ্রকারেই করিয়া থাকে কিন্তু নারীর পতনের কাহিনীর বহু ক্ষেত্রেই পাশবিকতার যে বীভৎস চিত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় তাহার কলঙ্ক দুরপনেয়। বালবিধবা মাত্রেরই জীবন একটা দুর্ব্বহ অভিশাপ স্বরূপ। সমাজ শৃঙ্খলা অটুট রাখিবার জন্য বালবিধবার উপর ব্রহ্মচর্য্যের বিধান চাপান সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইতে পারে কিন্তু সংযম অভ্যাস ও শিক্ষালাভ করিবার কোনও সুব্যবস্থা না থাকাতে সেইরূপ জীবনের কঠোরতা হয়ত কোনও কোনও বিধবার পক্ষে অত্যন্ত গুরুভার বলিয়া মনে হইতে পারে। জীবনে সমস্ত সুখ হয়ত তাহার সম্পূর্ণরূপে অনাস্বাদিত, মাতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়ত তাহার প্রবল, একটী ক্ষুদ্র গৃহকোণ অধিকার করিয়া গৃহিণী পদে অভিষিক্ত হইবার সাধ হয়ত তাহার খুব বেশী, যাহার নিকট হৃদয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, ব্যথা, গোপন কথা, অকপটে, নিঃশেষে, নিভৃতে নিবেদন করিতে পারে, পৃথিবীর মধ্যে এমনই একজন নিকটতম, প্রিয়তম আত্মীয়লাভের জন্য হয়ত তাহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল; স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ এবং সহবাসের সুযোগ এত অল্প ঘটিয়াছে যে হয়ত বিবাহিত জীবনের স্মৃতি অতিশয় ক্ষীণ, সেই স্মৃতিটুকুকে বহন করিয়া অপরিমেয় ভোগের আবেষ্টনীর মধ্যে সুদীর্ঘ জীবনযাপন করার চেষ্টায় হয়ত তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে—আকণ্ঠ পিপাসায় তাহার হৃদয় মরুভূমির মত শুষ্ক, নীরস—সেই সময় কেহ যদি সুমিষ্ট, সুপেয়, নির্ম্মল জল দিব বলিয়া আশ্বাস দেয় তখন পাত্রাপাত্র বিচার করিবার মত অবস্থা তাহার থাকে কি? যে আকাশ কুসুম সে এতদিন আপনার মানসলোকে রচনা করিয়া আসিয়াছে, সেই স্বপ্ন যদি আজ বাস্তবের মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়—সে নন্দনকাননের সুখ-ভোগের প্রলোভন জয় করিবার শক্তি কয়জনের আছে? কোনও এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় সে এক অজ্ঞাত কল্পলোকের পথে যাত্রা আরম্ভ করে—অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান হইয়া চতুর প্রতারকের মিথ্যা আশ্বাসে আত্ম-সমর্পণও করে। কঠিন বাস্তবের সংঘাতে যখন তাহার চেতনা ফিরিয়া আসে, তখন কোথায় বা তাহার কল্পলোক, কোথায় বা তাহার হৃদয় দেবতা। সমাজের তুলাদণ্ডে সেই অসহায়া নারীর বিচারের কোনও ত্রুটীই হয় না। সমাজে তাহার স্থান নাই, সমাজের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া তাহাকে আশ্রয় দিবার মত শক্তি ও সাহসও কাহারও নাই, সুতরাং কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পাপের পঙ্কিল পথে সে নামে ধীরে, ধীরে—তারপর যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া তাহার জীবনের ব্যর্থতার প্রতিশোধ সে যে ভাবে গ্রহণ করে তাহার বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন। সমাজের দেহে দূষিত কার্ব্বঙ্কলের মত সে যে সমাজ একদিন তাহার জীবনকে অভিশপ্ত করিয়াছে তাহাকেই তিলে তিলে অন্তঃসার শূন্য করিতে থাকে। নারীর মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করিবার জন্য তাহার স্বপক্ষে একটীও অঙ্গুলি উত্তোলিত হয় নাই বটে, কিন্তু সেই নির্লজ্জ, কাপুরুষ পুরুষ সমাজের মধ্যে সাধু সাজিয়া অনায়াসেই নবীন জীবনযাপন করিবার সুযোগ পায়। তাহার কার্য্যকে সমর্থন করিয়া যুক্তির অবতারণা করিবার লোকেরও অভাব হয় না। কুহকিনী, মায়াবিনীর মোহ হইতে সে যে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছে, তাহার ক্ষমা পাইবার পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুপারিশ। যৌবনের এই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধবয়সে তরুণদিগকে উপদেশ দিবার মনোরম উপকরণ রূপে তাহার স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতে থাকে।

আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ইহাই সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি বলিয়া মনে হয় যে সমাজ হইতে বহিষ্কারের পথ আমরা খুবই প্রশস্ত রাখিয়াছি কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিবার সমস্ত পথই অতি সযত্নে অর্গলবদ্ধ করিয়াছি।

দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারা নারীহরণ ও নারীধর্ষণের চাঞ্চল্যকর সংবাদ আমাদের দেশের মত সংবাদপত্রের বহুলাংশ অধিকার করিয়া প্রাচুর্য্যের পরিচয় না দিলেও অন্যদেশেও এরূপ ঘটনা লোকের শ্রুতি বা দৃষ্টির অগোচর নহে, কিন্তু এমন কোনও দেশ নাই যেখানে নারীর প্রতি এইরূপ হৃদয়হীন অবিচার করা হইয়া থাকে। বীর পুরুষদিগের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি যে অবস্থাতেই এই ঘটনা ঘটুক না কেন সেই নারীকে উদ্ধার করিবার

পর যখন তাহাকে স্বামী ও আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তখন সেই অসহায়া রমণী কিঞ্চিৎ সুবিচারের প্রত্যাশা করে অর্থাৎ স্ত্রীর অধিকার না পাইলেও গৃহে থাকিয়া দাসীর অধিকারও যাহাতে পাইতে পারে, এইরূপ মিনতি জানায়;—তখন তাহার চরিত্রের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া জানাইয়া দেওয়া হয় তাহাকে গৃহে স্থান দিলে সনাতন-ধর্ম্মের বিমল আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহার প্রতিকূলাচরণ করা হইবে; অতএব এইরূপ দুরাশাকে হৃদয়ে পোষণ না করিয়া সে যেন আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। অপরাধ না করা সত্ত্বেও সমাজের বিচিত্র বিধান সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পাপ ও কলঙ্ক যখন তাহার ললাটে লেপন করিয়া দেয় তখন তাহাই কি তাহাকে আত্মহত্যা কিম্বা তদপেক্ষা অধিক সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবার জন্য উত্তেজিত করিবে না?

সমাজের এই সকল অবিচার আমরা বহুদিনই দর্শকরূপে উপভোগ করিয়া আসিয়াছি এবং ইহার প্রতিকার সাধনে সনাতন ধর্ম্মের অটলভিত্তিও শিথিল হইতে পারে এইরূপ কল্পনাই করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া চিরদিন চলে না। বাস্তব যখন যুগ-পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল তখন নারীসমস্যার প্রতিকারের ভার নারী আপন হস্তেই তুলিয়া লইল। অবশ্য এ পরিবর্ত্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী, কারণ অত্যাচারের চক্র চিরদিন কখন সমানভাবে চলে না, বিশেষতঃ সে চক্রের তলে যাঁহাকে নিষ্পেষিত করিতে হইবে, চক্র ঘোরাণোর ব্যাপারটা যখন তাহারই দ্বারা সমাধা করা হইয়া থাকে। তাই নারী-নির্য্যাতনের চক্রও একদিন অচল হইল। যেদিন নারী বুঝিল স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, ইহা প্রকৃতিদত্ত, পুরুষের অধীনতার নাগপাশে সে আপনাকে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়াছে, তখন হইতেই সে আপনাকে পাশমুক্ত করিবার পন্থা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনুসন্ধানের ফলে সে জানিতে পারিল সে নিজেকে যতটা অসহায় মনে করে ততটা অসহায় সে নয়। তাহার দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ তাহার মনে মরিচা পড়িয়াছে, দেহ অপেক্ষা তাহার মন কম পঙ্গু নয়। শিক্ষার শাণ পড়িলে তবে তাহার মনের মরিচা ঘুচিবে। তখন হইতেই স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন ব্যাপকভাবে দেখা দিল, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবশ্য সহানুভূতিশীল পুরুষদের চেষ্টায় যেটুকু নারী-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল সেটি নেহাৎ ঢিমে তেতালাতেই চলিতেছিল। নারী ক্রমশঃই নিজের সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে লাগিল। সে দেখিল দৈহিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনেরও তাহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। আত্মরক্ষার জন্য পুরুষের কৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করিয়া সে যদি শক্তিচর্চ্চার দ্বারা আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার শক্তি ও সাহস অর্জ্জন করিতে পারে তবে তাহা নিন্দনীয় কিসে? এই ব্যায়াম অনুশীলনের ফলে নারী উপলব্ধি করিল সে নারী বটে তবে নারীত্বের কমনীয়তা ও মাধুর্য্যকে স্থায়িত্ব দিতে হইলেই যে সকল সময় তাহাকে অবলা হইতে হইবে তাহা নয়, কারণ সে শক্তিরূপিণীও বটে। ঘরে বাইরে নারী অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল। ঘড়ির পেণ্ডুলম (দোলক) একদিক হইতে একেবারে অপর দিকেই চলিয়া যায়, মধ্য পথে থামে না। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারেও তাহাই ঘটিল, সকল বিষয়েরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল, ব্যাপার চরমে পৌঁছাইল। অবশ্য এ নারীপ্রগতির হাওয়া আমাদের দেশে সবে মাত্র পৌঁছিয়াছে; ইহার আরম্ভ সাগরপারের দেশ হইতে। নারীপ্রগতির সবটাই যে ভাল হইতেছে এমন কথা আমি কেন যে-কোনও নারী-সমিতির সভানেত্রীর শ্রীমুখ হইতেও নির্গত হইবে না। ভুল ভ্রান্তি ইহার মধ্যে অনেক ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে। সকল আন্দোলনেরই গোড়ার কথা ভাঙ্গা, তারপর গড়া। এখন ভাঙ্গনের যুগ চলিয়াছে, গঠনের যুগ আরম্ভ হইতে সময় লাগিবে। পুরাতনের মধ্যে সব কিছুকেই যে আবর্জ্জনার স্তূপের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল এমন নয়, কিন্তু ভালমন্দ অনেক সময় এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে যে অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রয়োজনীয়কে বিদায় দিবার সময় আমাদের অনিচ্ছায় আবশ্যকীয় অনেক কিছুই বিদায় গ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—নারীর জড়তা নাশের ও শক্তি অর্জ্জনের প্রয়োজন হয়ত অনেকখানিই ছিল, কিন্তু লজ্জাসরম বিসর্জ্জন দিবার কোনও প্রয়োজনই হয়ত ছিল না। কিন্তু এ সমস্ত

বিষয়ের বিচার এত জটিল ও দুরূহ যে জড়ত্বনাশের সীমা কোথায় শেষ হইয়া লজ্জার সীমাকে অতিক্রম করে তাহা নির্ণয় করাই কঠিন হয়।

বর্ত্তমান নারীপ্রগতির মধ্যে যেটা অংশ সর্ব্বাপেক্ষা চক্ষুর পীড়াদায়ক সেটা হইতেছে এই যে নারী অনেক স্থলে পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভ করিতে গিয়া অন্ধ অনুকরণের দ্বারা পুরুষের একটি নিকৃষ্ট সংস্করণ হইতেছে। সেইরূপ দুই একটী ক্ষেত্রে আমার মনে হয় বর্ত্তমান নারী প্রগতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আপন বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়া স্বাধীনতা ভোগ করা স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর।

নারী ও পুরুষের শক্তি পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের সম্পূরক। সুতরাং স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যে পুরুষের স্বাধীনতার টান পড়িবে এরূপ অহেতুক কল্পনার কোনও স্থান নাই। গৃহেও যেমন নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য আছে (কর্ত্তা ও গৃহিণীর কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য যেমন কমিটি বসাইবার প্রয়োজন হয় না) বাহিরেও সেইরূপ পুরুষের কর্ত্তব্যের পাশে নারীর কর্ত্তব্যের যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে—যে স্থান এখনও হয় শূন্য না হয় অপটুভাবে পুরুষের দ্বারা পূর্ণ। গৃহে যেমন নারীর কার্য্যের মধ্যে রুচি ও পারিপাট্যের যথেষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি, স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সেই কমনীয়তার মূর্ত্তি বাহিরেও ফুটিয়া উঠিবে আমরা আশা করিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে হাঁসপাতাল, জেলখানা, শিশুশিক্ষালয়, যুদ্ধনিবারণ ও শান্তিস্থাপন, নগরের মধ্যে উদ্যান বিরচন প্রভৃতি প্রত্যেকটী বিষয়েই উন্নতি সাধনের পক্ষে নারীর প্রভাবের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। নারী স্বাধীনতা পাইলেই যে গৃহকর্ম্ম অচল হইয়া যাইবে, বিবাহ লোপ পাইবে, সৃষ্টির ক্রিয়া রহিত হইয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা অমূলক। মনে করুন আমার বিবাহ করা বা না করার স্বাধীনতা আছে। সেই স্বাধীনতা আছে বলিয়াই যে আমি বিবাহ করিব না, এমন কোনও কথা নাই। তবে এমন হয়ত ঘটিতে পারে যে কাহারও পক্ষে বিবাহ করা তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে একটী বিরাট অন্তরায়, সেইরূপ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বিবাহ না থাকায় সেই নারী হয়ত আপন প্রতিভার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে।

যুগ যুগ ধরিয়া শত শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও নারী যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা স্বতঃই আমাদের মধ্যে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। পুরুষের প্রতিভার নিকট নারীর প্রতিভা যে ম্লান হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পুরুষ আপন প্রতিভার উন্মেষের ক্ষেত্র পাইয়াছে, নারীর ভাগ্যে তাহা লাভ করা আজও ঘটিয়া উঠে নাই। তথাপি নারীর দান অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের অপেক্ষা কম নয়। সাহস, বুদ্ধি, কর্ম্মনৈপুণ্য, শিল্প, কলা, সাহিত্য, ধর্ম্মপ্রচার, সমাজ-সংস্কার, জাতিগঠন, যুদ্ধজয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর দান একেবারে অকিঞ্চিৎকর না হইলেও পুরুষের প্রতিভার নিকট তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে কিন্তু প্রেম, ভক্তি, ত্যাগ, সেবা এ সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্মগত অধিকার এবং এ সকল ক্ষেত্রে পুরুষ আজও নারীর সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই এবং আশা করা যায় কোনও দিনই পারিবে না।

পত্নী-প্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ দিতে গেলে সম্রাট সাজাহানের কথাই মনে পড়ে। ভাবিয়া চিন্তিয়া আরও গুটিকয়েক নাম আমরা সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু পতিপরায়ণাদের সুগভীর আত্মহারা প্রেমের দৃষ্টান্ত—এ যে গণনা করা যায় না। সে প্রেম জগতের ইতিহাসকে অম্লান জ্যোতিঃতে ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছে।

মীরাবাঈয়ের ভক্তি এক অতীন্দ্রিয় জগৎ অধিকার করিয়া আছে। তাহার সন্ধান আমরা 'প্রেম নদীকা তীরা' ছাড়া আর কোথায় পাইব? ভগবান বুদ্ধের জন্য শ্রীমতীর আত্মদান নটীর পূজাকে যে রূপ দিয়াছে ত্যাগের কাহিনীর মধ্যে তাহা অনতিক্রমনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে আবার আমরা দেখিতে পাই, শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষে যখন

'বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে
শুধালেন জনে জনে,
ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা?'—

তখন সেই লজ্জায় আনতশির ভক্তগণের মধ্য হইতে 'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়াই' কেবলমাত্র ভিক্ষাপাত্র সার করিয়া বলিয়াছিল 'কাঁদে যারা বাক্যহারা, আমার সন্তান তারা'। ধাত্রীপান্নার সন্তান বিসর্জ্জন, আত্মবিসর্জ্জনকেও পরাস্ত করিয়াছে। নারী যেন সেবা মূর্ত্তিমতী। ফ্লোরেন্স নাইটিন্‌গেল, সিষ্টার নিবেদিতা প্রভৃতির জীবন যেন সেবাকেই কেন্দ্র করিয়া উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

নারীর ভক্তির প্রগাঢ়তা ও ত্যাগের গভীরতা কত অপরিমেয় হইতে পারে তাহার অনুপম উদাহরণ বৌদ্ধ ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। (উদাহরণগুলি অবশ্য মাধুর্য্য ও সজীবতার জন্যই এখানে উদ্ধৃত হইল, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি কোনও পক্ষপাত বশতঃ নয়)। বুদ্ধত্বলাভের পর ভগবান বুদ্ধ যখন ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছিলেন, তখন সকলেই ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া, ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া আপন আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছিল। সে সমস্ত দান সেই শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পুরুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। একবস্ত্রা রমণীর লজ্জা নিবারণের শেষ সম্বল জীর্ণবস্ত্র খণ্ডটী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যখন বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্রের মধ্যে নিপতিত হইল, সে দানকে তুচ্ছ করিবার শক্তি সেই মহামানবেরও হয় নাই।

ত্যাগ, সেবা, ভক্তি, প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার অমেয় বলিয়া পুরুষের সহিত সমক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নারী যে বরাবর পরাস্ত হইয়াছে এমন নয়, সমকক্ষতা লাভও সে করিয়াছে, এবং এমন অনেক স্থান আছে যেখানে পুরুষকে পরাজয় স্বীকারও করিতে হইয়াছে। অবশ্য বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মত অবতার কিম্বা কালিদাস, শেক্সপীয়র, গেটে, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীর মত অতিমানবকে নারীমূর্ত্তিতে আমরা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু খনা, লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, গার্গী—ইঁহাদের দানকে অগ্রাহ্য করা যায় না। নিউটন, গ্যালিলিও, আর্কিমেডিস, ফ্যারাডে, সার জগদীশের ন্যায় প্রকৃতির রাজ্যের গোপন তত্ত্ব উদ্ভাবন ও আবিষ্কার নারীর ভাগ্যে এক প্রকার ঘটিয়া উঠে নাই বলিলেই হয়, কিন্তু শিশু মনস্তত্ত্বের যে গোপন রহস্য আবিষ্কারের ফলে মন্তিসোরী শিক্ষার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল তাহা কি আমাদের উপেক্ষণীয়? পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী, ঝাঁসীর মহারাণী প্রভৃতি মহীয়সী নারীর সৈন্য পরিচালনা, রণ-কৌশল ও নির্ভীকতা কি কোনও বীর পুরুষের সশ্রদ্ধ অনুকরণের যোগ্য। ফরাসী স্বাধীনতার ইতিহাসে জোয়ান অফ্ আর্কের আত্মনিবেদন স্বদেশপ্রেমিক মাত্রকেই মুগ্ধ করে। এই সকল নারী সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও জগতের ইতিহাসে ইঁহাদের প্রভাব আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

পুরুষের সহিত প্রায় সমান সুবিধা ভোগ করিয়া প্রতি-যোগিতার সুযোগ নারী অতি অল্পদিনই হইল পাইয়াছে। সম্পূর্ণ সমান সুযোগ পাইতে অবশ্য এখনও বহু যুগ কাটিয়া যাইবে, তাহার পথে এখনও অনেক অন্তরায়। গৃহের বাহিরে নারীর শুভাগমন অতি অল্পদিন হইল হইয়াছে; পশ্চাতে তাহার বিপুল অভিজ্ঞতাও নাই। তবু এই নূতন ক্ষেত্রে সে যে অত্যাশ্চর্য্য শক্তি দেখাইয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

ইউরোপের সমর প্রাঙ্গণে কৃত্রিম সভ্যতার আবরণ যেদিন খসিয়া পড়িল, নগ্ন পাশবিকতার বিকট মূর্ত্তি যেদিন সাম্রাজ্য লোলুপতার বীভৎস রূপ ধারণ করিল, 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি'—এই যখন পুরুষদের অবস্থা—নারী প্রগতির ইতিহাসে সেইদিন নবযুগের অভ্যুদয় হইল। ঘরে এবং বাহিরে এমন কোনও বিভাগ ছিল না, যেখানে নারীশক্তির মহিমা প্রকটিত না হইল। সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচারকার্য্য সম্পাদন, যুদ্ধের রসদ যোগান, ডাকঘরের কার্য্য পরিচালনা, আহতদিগের সেবা শুশ্রূষা, জাতীয় শিক্ষাকে অব্যাহত রাখা, ফ্যাক্টরীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণ, সকলের অন্নসংস্থান—সমস্ত বিভাগেরই উচ্চ ও নিম্নপদ নারীই পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল কারণ বৃদ্ধ, অক্ষম ও শিশু ব্যতীত দেশের সেই দুর্দ্দিনে অন্য কোনও পুরুষের গৃহে থাকিবার অধিকার ছিল না। যে যোগ্যতার পরিচয় সেইদিন নারী দিয়াছিল তাহাই তাহাকে নূতন পথে চলার সাহস ও অধিকার দুইই দিল। সেই মহাযুদ্ধের কালানল প্রজ্বলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর হৃদয়েও সে অগ্নিশিখা উদ্দীপিত হইয়াছিল তাহাই তাহাকে আপন শক্তির সহিত পরিচয় করাইয়া দিল; সেই আলোকে নারী আপনাকে চিনিল,

জগৎকে চিনিল। সেই স্বাধীনতার হাওয়ার তরঙ্গ আমাদের দেশের নারীকেও স্পর্শ করিয়াছে; শিক্ষার মধ্য দিয়াই যে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা, একথার সত্যতা আমাদের দেশের নারী জাগরণের মধ্য দিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শিক্ষার নামে এতদিন যে প্রহসন চলিয়া আসিতেছিল, (বোধোদয়, কথামালা, ফার্ষ্ট বুক শেষ করিবার পূর্ব্বে বিবাহের দ্বারা শিক্ষার পূর্ণচ্ছেদকে প্রহসন ছাড়া আর কি বলা যায়?) আজ তাহার অবসান হইয়াছে। শিক্ষা ও জীবন সংগ্রামের বহু ক্ষেত্রে নারীর বিজয়বৈজয়ন্তী আজ উড্ডীয়মান।

বর্ত্তমান শিক্ষার আদর্শ যে খুব মহৎ এবং তাহার দ্বারা যে আদর্শ নারীর সৃষ্টি হইতেছে এমন কথা আমি বলি না। সে হিসাবে দেখিতে গেলে বলিতে হয় পুরুষদের শিক্ষাতেও সে সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা আমরা পাইতেছি না। আমার মতে এইটুকু আশার কথা, আনন্দের কথা যে আমার দেশের যে অর্দ্ধাংশ এতদিন ঘুমঘোরে অচেতন ছিল, সে আজ জাগিয়াছে। তাহার জাগরণ কি পুরুষকেও নববলে বলীয়ান করিবে না? দেহের একাংশ অসুস্থ, ব্যাধিগ্রস্ত থাকাই কি সমগ্র দেহের নিষ্ক্রিয়তা, নিশ্চেষ্টতা, গতি হীনতার জন্য দায়ী নয়? আজ নারীজাগরণের মধ্য দিয়া অর্দ্ধাঙ্গের সে অসুস্থতা, সে পঙ্গুতা যদি দূর হইয়া গিয়া থাকে, তাহাই কি জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সুস্থতা, সচলতা, সাবলীলতা আনয়নে সহায়তা করিবে না?

নারী আন্দোলনের ত্রুটি বিচ্যুতি গুলিকে আমরা যেন ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারি। যদি ইহার মধ্যে অসামঞ্জস্য, মাত্রাহীনতা কিছু পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বের নিষ্ক্রিয়তারই প্রতিক্রিয়া। সামঞ্জস্য, সুর, মাধুর্য্য, মাত্রা আবার ফিরিয়া আসিবে। ইতিমধ্যে আমরা যেন ধৈর্য্য না হারাই, সেই অনাগতকে বরণ করিবার শক্তি ও সাহস অর্জ্জন করিবার সাধনা আমরা যেন করিতে পারি।

সুকুমার মিত্র

স্বপ্নময়ী

শ্রীরসময় দাশ

তুমি মোর স্বপ্ন শুধু—তার বেশী নয়;
ক্ষণিক কিরণ পাতে তব পরিচয়
পেয়েছি অনেকদিন। বিদ্যুৎ-ঝলকে
এ কালো মেঘের বুক দিয়েছ পলকে
আলোকে রঙিন করি; তারপর হায়!
মিলায়েছে ছবি তব শুব্ধ তমসায়;
একাকী আঁধার বিশ্বে ব্যর্থ হাহাকারে
হে চঞ্চলা! কতবার খুঁজেছি তোমারে।
এ আলো ছায়ার খেলা সারা দিনমান
ভাল নাহি লাগে আর; নিত্য ভাসমান
সংশয়-বেদনা স্রোতে,—মিথ্যা মনে হয়;—
মুখামুখি আজি তব চাহি পরিচয়!—
বাঁধিয়া তোমারে নিতি বাহুর বন্ধনে
ব্যথিয়া তুলিতে চাই—চুম্বনে চুম্বনে!

বাঁশীদারের বেহালা

(শেকভ্ হইতে)

শ্রীবিনায়ক সান্যাল এম্‌-এ

ছোট্ট সহরটি! পাড়াগাঁ-ও হার মানে। কতকগুলো বুড়ো লোকের আড্ডা, তারা আবার মরার নামটি করে না। হাঁসপাতাল কিম্বা জেলের জন্তেও কফিনের দরকার হয় খুবই কম। এক কথায় ব্যবসা বেজায় মন্দা। জেকব্ আইভ্যানফ্ যদি সদর সহরের কফিন্ তৈরীর কাজ করত তাহ'লে এত দিনে কোন্‌না একখানা বড় বাড়ীর মালিক হত সে; আর লোকে তাকে সোজাসুজি 'জেকব্' বলে না ডেকে নিশ্চয়ই বলত 'মিস্‌টর আইভ্যানফ্'। আর এখানে? লোকগুলো তাকে কেবল 'জেকব্' বলেই ক্ষান্ত নয়; কি জানি কেন তারা তার ডাকনাম রেখেছে 'ব্রন্‌জ্'। অতি সাধারণ একজন কৃষাণের মতই সে তার দিন গুজরান করত একখানি কুঁড়ে ঘরে; তার একটি মাত্র ঘরে থাকৃত—সে আর তার স্ত্রী মার্থা, একটি উনোন, একজোড়া বিছানা, কতকগুলো কফিন্, বসে-কাজ-করবার একখানা বেঞ্চ, এবং ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর আর যা কিছু ছোটখাট আসবাব।

জেকবের তৈরী কফিন্‌গুলো হ'ত বেশ কাজ-চলা ও মজবুত্। চাষাভুষো বা গাঁয়ের সাধারণ লোকেদের জন্তে কফিন্ গড়্‌ত সে নিজের মাপে; আর তাতে বড় বেশি এদিক্ ওদিক্ হ'ত না; কারণ, যদিও তার বয়স হয়েছিল সত্তরের ওপর, তার চেয়ে দশাসই মানুষ সে অঞ্চলে বড় ছিল না; এমন কি জেলের মধ্যেও না। ভদ্রলোক বা মহিলাদের বেলায় সে তার লোহার গজ-কাঠিটি দিয়ে মাপ নিয়ে তবে কাজ আরম্ভ কর্‌ত। ছেলেদের কফিনের বায়না সাধ্যপক্ষে সে নিতে চাইত না, আর যদি বা নিত, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কোন মাপজোপ না করেই লেগে যেত কাজে। দাম নেবার সময় বল্‌ত, "কি জানেন, এই সব ছোটখাট ব্যাপারে মাথা ঘামাতেই মন সরে না।"

এই ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করে' সে যা পেত তার ওপরেও তার আরও কিছু আয় হ'ত বেহালা বাজিয়ে। সহরে' ইহুদিদের একটা বাজনার দল ছিল; বিয়ে টিয়ের আসরে তারা মাঝে মাঝে বাজাত। সেই দলের 'মূল গায়েন' ছিল মোজেস্ বলে এক কর্ম্মকার, বাজনা থেকে পাওনার আধা-আধিই হাতাত সে। জেকবের হাত ছিল ভারি মিষ্টি, বিশেষ করে' রুষীয় স্বরে সে ছিল একেবারে ওস্তাদ্। দিন পিছু ৫০ কোপেক (প্রায় বারো আনা) ছিল তার দক্ষিণা, আর তা ছাড়া পেলাটা আস্‌টাও কিছু পেত শ্রোতাদের কাছ থেকে। বাজনার দলে সে যখন জম্‌কে বসত, প্রথমেই তার মুখ হয়ে উঠত লাল, আর ঘামের ধারা বয়ে যেত সমস্ত মুখ দিয়ে, কারণ মজ্‌লিসের গরমে বাতাস হ'য়ে উঠত ভারি, আর পেঁয়াজের গন্ধে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হ'ত। তার পর আর্ত্তনাদ করে উঠত তার বেহালা, তার ডান দিকে বেজে উঠ্‌ত একটা বেজায় মোটা খাদের আওয়াজ আর বাঁ দিকে করুণসুরে ডুক্‌রে উঠত একটা বাঁশী। এই বাঁশী আলাপ কর্‌ত একজন লাল দাড়িওয়ালা, রোগা, ইহুদী,—মুখময় লাল নীল শিরা-উপশিরা। বিখ্যাত ধন-কুবের রথস্‌চাইল্ডের নামে ছিল তার নাম। খুব চটুল সুরও, করুণ করে বাজাবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এই হতভাগা ইহুদীর। সঙ্গত কোন কারণ না থাকলেও একটু একটু করে জেকবের মন এই ইহুদী জাতটার প্রতিই ঘৃণা ও বিদ্বেষে ভরে' গিয়েছিল, বিশেষ করে তার রাগটা পড়েছিল এই রথস্‌চাইল্ডের ওপর। এর সঙ্গে জেকবের প্রায়ই ঝগড়া বাধ্‌ত, আর সে একে গাল দিত অকথ্য ভাষায়; দু এক ঘা দেবার চেষ্টাও করেছিল একবার; কিন্তু রথস্‌চাইল্ড এতে নিতান্ত মর্ম্মাহত হয়ে ভ্রূকুটি করে' বলেছিল, "তোমার গানের

প্রতি যদি আমার শ্রদ্ধা না থাকত তো কোনদিন তোমাকে ছুড়ে ফেলে দিতাম জানলা গলিয়ে"।

এই বলেই সে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। তারপর থেকেই বাজনার দলে জেকবের নিমন্ত্রণ হ'য়ে এল বিরল। লোকের নিতান্ত অভাব হ'লে, বা ইহুদীদলের কোন একজনকে না পাওয়া গেলে তবেই পড়ত তার ডাক।

জেকবের মেজাজটা কখনই বেশ ভাল থাকত না, কারণ বড় বড় ক্ষতি লোকসান তার লেগেই ছিল। যেমন এই ধরুন না, রবিবার কি অন্য ছুটির বারে কাজ করা একটা মস্ত পাপ, আর সোমবারটাও বেশ দিন ভাল নয়। এই রকম ক'রে বছরে প্রায় দুশো দিনের কাছাকাছি বাধ্য হয়েই তাকে চুপটি করে বসে' থাকতে হত হাত গুটিয়ে। এটা কি সোজা লোকসান মশাই? যদি কোন বিয়ের ব্যাপারে গান বাজনার পাট না থাকত কিম্বা মোজেস্ তাকে যোগ দিতে না ডাকত সেও ধরুন আর একটা লোকসান। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর ভদ্রলোক যক্ষ্মারোগে প্রায় দু'বছর শয্যাশায়ী ছিল; এই দীর্ঘ দিনগুলি জেকবের তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা কোরেই কেটেছে। কিন্তু কি আক্কেল দেখুন; সহরে চিকিৎসা করাতে গিয়ে শেষটা কিনা সেখানেই মোলো! এতেও কোন্ টাকা পঁচিশ লোকসান না হ'ল, কারণ কফিন্‌টা বেশ কারুকাজ করা, দামী গোছেরই হবার কথা তো?

এই ক্ষতি লোকসানের চিন্তা জেকবকে বেশী ক'রে জ্বালাতন করত রাত্রেই। তাই সে বিছানার পাশেই তার বেহালাখানা রেখে দিত, আর দুশ্চিন্তাগুলো যখন সার বন্দি হয়ে তার মগজে এসে ঢুকত তখন সে তার বেহালার তারে দিত ঝঙ্কার; ঘন অন্ধকার সুরে সুরে ভরে উঠত আর জেকবের প্রাণটাও হত ঠাণ্ডা।

গত বছর হঠাৎ মার্থার অসুখ হ'ল। বুড়ির শ্বাস নিতে কষ্ট হ'ত, চলতে গিয়ে পা টলত, আর পিপাসায় তালু আসত শুকিয়ে। তা হ'লেও সে উনোনটা জ্বাললে এবং জলও আনতে গেল। সন্ধ্যা নামলে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সারাদিন ধরেই জেকবের বেহালার আলাপ চলল। যখন অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে এল, কি করবে ভেবে না পেয়ে সে খুলে বসল তার লোকসানের খতিয়ান। যোগ দিয়ে দেখলে তার ক্ষতির পরিমাণ হাজার তিনেকের নীচে নয়। এই ক্ষতির বহরে সহসা সে এমনি চঞ্চল হ'য়ে উঠলো যে গণনার তক্তাখানা ফেললে ছুড়ে, আর দুপা দিয়ে সেখানা মাড়াতে লাগলো। খানিক পরেই সেখানা তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জোরে জোরে ঝাঁকি দিলে; সঙ্গে সঙ্গে তার গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগলো। কপাল বেয়ে ঘামের ধারা নামল, মুখ হ'য়ে উঠল রাঙা। যে টাকাটা লোকসান হ'ল সেটা ব্যাঙ্কে জমা থাকলে বছরের শেষে সুদ আসত কম পক্ষে চল্লিশটি ক'রে টাকা। সুতরাং এ চল্লিশ টাকাও পড়ল লোকসানের খাতায়। এমনি করে যে দিকেই সে তাকায় শুধু 'নির্জলা' লোকসান, ক্ষতির পর কেবল ক্ষতি।

হঠাৎ মার্থা ডেকে বললে, "জেকব্, আমি বোধ হয় আর বাঁচব না"। স্ত্রীর পানে সে ফিরে তাকাল। জ্বরের তাপে তম্‌তম্ করছে তার মুখ, আনন্দের দীপ্তিতে যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। ব্রনজ একটু ভয় পেয়ে গেল কারণ স্ত্রীকে ম্লান ও অসুখী দেখাই তার চিরদিনের অভ্যাস। তার মনে হ'ল মার্থা যেন সত্যিই মৃত। চিরদিনের কুটিরখানি, কফিনগুলি, আর জেকবকে ছেড়েই যেন তার এমন উল্লাস। ভিতরের ছাদের দিকে তার দৃষ্টি। ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়ছে,—যেন পরিত্রাতা মৃত্যুর সঙ্গে তার মুখোমুখি আলাপ চলছে।

ঊষার প্রথম কিরণে প্রাচীমূল আরক্তিম। পত্নীর পানে তাকিয়ে জেকবের প্রথম মনে হ'ল বোধ হয় জীবনে সে তার মুখের পানে তাকায় নি, দুটো মিষ্টি কথা পর্য্যন্ত তাকে বলেনি। একখানা রুমাল কিনে দেওয়া কিম্বা বিয়ে বাড়ী থেকে সামান্য খাবার জিনিষ এনে দেওয়ার কথাও কখনও তার মনে হয়নি। উল্টো, তাকে ধমকেছে,—নিজের ক্ষতি লোকসানের জন্যে তাকে গাল মন্দ করেছে, ঘুঁসি উঁচিয়ে তাকে মারতে পর্য্যন্ত গিয়েছে। সত্যিকারের প্রহার তাকে কখনও করেনি বটে কিন্তু তাকে ভয় দেখিয়েছে বিস্তর। প্রতিবারই বকুনির সময় সে ভয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়েছে। হাঁ, ক্ষতি লোকসানের অজুহাতে তার বরাতে চা-ও জোটেনি কোনদিন, গরম জল খেয়েই তাকে তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আজ সে

প্রথম বুঝলে কেন তার মুখে আজ অনভ্যস্ত আনন্দের অরুণা-ভাব এসেছে। আতঙ্কে সে শিউরে উঠল।

সকাল হ'লেই এক পড়শীর কাছে সে ধার করে' নিয়ে এল এক ঘোড়া, আর গাড়ীতে করে মার্থাকে নিয়ে চলল হাসপাতালে। সেখানে রোগীর সংখ্যা বেশী নয়, তাই অপেক্ষা বিশেষ করতে হ'ল না,—মাত্র ঘণ্টা তিনেক। সুখের বিষয় সে দিন ডাক্তারবাবু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন তাঁর সহকারী ম্যাক্সিম্। বয়সে প্রবীণ, কলহ এবং পান দোষ থাকলেও, লোকে বলত তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান নাকি ডাক্তারের চেয়ে অনেক বেশী।

স্ত্রীকে নিয়ে যেতে যেতে জেকব্ বললে, "প্রণাম হই হুজুর, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে সে জন্যে মাপ করবেন। আমার সঙ্গের এই মহিলা কিছু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। আমার এই জীবন-সঙ্গিনী—অবশ্য এই বিশেষণে আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে,—

ভ্রূকুঞ্চিত করে', গোঁফে তা দিতে দিতে ডাক্তারের সহকারী মার্থার দিকে তাকালেন। একটা নীচু টুলের ওপর 'দলা'র মত বসে' ছিল সে। শীর্ণ মুখ, দীর্ঘ নাসা, ঠোঁট দুটি একটু খোলা—যেন তৃষাতুর পাখী।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সহকারী ধীরে ধীরে বললেন "ভালো, ভালো,—হ্যাঁ, তা, কেস্‌টা ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের বলেই তো বোধ হচ্ছে; এদিকে সহরে আবার টাইফয়েডও সুরু হয়েছে, করা যায় কি বল? ঈশ্বরের ইচ্ছায় বৃদ্ধা এর নির্দ্দিষ্ট আয়ু ভোগ করেছে। বয়স কত হ'ল জানো?"

"আজ্ঞে সত্তর হ'তে আর একটা বছর বাকী।"

"ওঃ। তাহ'লে তো যথেষ্ট বেঁচেছে। সব জিনিষেরই একটা শেষ আছে মানো তো?"

"সে কথা যথার্থ হুজুর।" বিনয়ের সঙ্গে একটু হেসে জেকব্ বললে, আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—একটা তুচ্ছ কীটও কিন্তু মরতে চায় না।"

বুড়ির মরণ-বাঁচন যেন তাঁরই হাতে ঝুলছে এই রকম একটা ভঙ্গি করে সহকারী বললেন, "তা না চায় তো কি করা যায় বল? এখন কি করতে হ'বে বলি, শোন। একটা ঠাণ্ডা জলপটি কপালে দাও্‌গে, আর এই পুরিয়া রোজ দুটো করে খাওয়াও। এখন আসি তা হ'লে।"

ডাক্তারের মুখ দেখে জেকব্ বুঝলো পুরিয়া টুরিয়ার সময় বহুক্ষণ চলে গিয়েছে। স্পষ্ট অনুভব করলে যে মার্থার শেষ সময়ের আর বড় বেশী বিলম্ব নেই—নিতান্ত আজ না হয়, তো কাল। ডাক্তারের কনুইটা ছুঁয়ে, চোখ মিটমিট্ করে' তাঁর কানে কানে সে বলতে লাগল, "একটু রক্ত মোক্ষণ করালে হয় না, ডাক্তারবাবু?"

"আমার সময় নেই, সময় নেই; দোহাই, কর্ত্তা, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে তুমি পথ দেখো। রেহাই দাও আমাকে।"

মিনতির সুরে জেকব্ বললে, "দয়া করে যাহোক একটা ব্যবস্থা করুন, বাবু। পেটের ব্যামো হ'লে পুরিয়া বা ওষুধে কাজ হ'ত। কিন্তু ওর লেগেছে ঠাণ্ডা। শর্দ্দি কাশীর চিকিৎসার গোড়াতেই তো রক্ত-মোক্ষণের নিয়ম আছে।"

ডাক্তার কিন্তু ইতিপূর্ব্বে অন্য রোগীকে তলব পাঠিয়ে-ছিলেন। অবিলম্বে একটা স্ত্রীলোক একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ করলে।

ডাক্তার বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "যাও, যাও হে বাপু—মিছামিছি হল্লা ক'র না।"

* "পেয়ালার ব্যবস্থা যদি নিতান্ত নাই হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে অন্ততঃ গোটা কয়েক জোঁক ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দিন, সারা জীবন আপনার কেনা হয়ে' থাকবো।"

ডাক্তারের মেজাজ হঠাৎ চড়ে' উঠলো, চীৎকার করে' বললেন, "চুপ আর একটিও কথা নয়; উল্লুক কোথাকার।"

জেকবও উঠলো চটে', তার মুখচোখ হ'ল লাল; কিন্তু সে মুখে কিছু বললে না, মার্থার হাত ধরে ধীরে ধীরে আপিস থেকে বেরিয়ে গেল। আবার যখন তারা গাড়ীতে এসে বসল তখন হাসপাতালের পানে একবার বিরক্তি ও বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চেয়ে সে বললে, "খাসা দলটি এখানে জুটেছে যাহোক্। হতভাগা ডাক্তার পয়সাওয়ালা লোক হ'লে

* রক্ত মোক্ষণের একটি প্রণালী—অনুবাদক।

তার ব্যবস্থা করত রীতিমত। আমি গরীব কিনা, তাই একটা জোঁক লাগাতেও হ'ল নারাজ, শুয়োর কোথাকার!"

কুটীরে যখন তারা ফিরল, প্রায় দশ মিনিটকাল মার্থা উনোনের গা ধরে রইল দাঁড়িয়ে। তার মনে হ'ল যদি সে শুয়ে পড়ে জেকব্ তাকে তার লোকসানের কাহিনী শোনাতে বসবে—শুয়ে থাকা এবং কাজ না করার জন্যে লাগাবে ধমক। জেকব্ কিন্তু তার দিকে করুণ চোখে চেয়ে ভাবতে লাগ্‌ল, তাইত কাল পরশু দুটো দিন উৎসব, তার পরের দিনটা রবিবার, তারপর আবার সোমবার, সেদিন কাজ করা কিছুতেই চলে না। তা হলে দিন চারেক তো এখন চল্‌ল অকাজের পালা; এরই মধ্যে যদি ভাল মন্দ একটা কিছু হ'য়? কফিনটা আগে ভাগেই তৈরী রাখা ভাল। লোহার গজ-কাঠিটি হাতে নিয়ে বৃদ্ধার কাছে গিয়ে সে মাপ নিতে লেগে গেল। তার পরে মার্থা শুয়ে পড়্‌ল, আর এদিকে জেকব্ ভগবানের নাম করে' হাত দিল কাজে।

কাজ শেষ হ'লে চোখে চশমা এঁটে জেকব্ তার খতিয়ান টুক্‌লো, "মার্থা আইভানফের কফিন্ বাবদ—২ টাকা দশ আনা।" লিখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

সমস্ত দিন বুড়ী চোখ বুঁজে বিছানায় পড়ে রইল, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে, দিনের আলো যখন মিলিয়ে যায় যায়, সহসা সে জেকব্‌কে তার কাছে ডাক্‌লে; বল্‌লে, "মনে পড়ে জেকব্ সেদিনের কথা। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হ'ল ভগবান্ আমাদের একটি সন্তান দিয়েছিলেন? মনে পড়ে কোঁকড়া কোঁকড়া সোণালি-চুলে-ছাওয়া তার সেই মুখখানি? মনে পড়ে নদীর তীরে উইলো গাছটির নীচে বসে আমরা কত গান গাইতাম?" তারপর একটু তীব্র হাসি হেসে আবার বল্‌লে, "গরীবের বরাতে টিঁক্‌লো না, বাছা আমার মারা গেল।"

জেকব্ প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কোনমতেই সেই শিশু অথবা উইলো গাছের কথা তার মনে এল না। সে বল্‌লে, "মার্থা, তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ?"

পুরোহিত এলেন, শেষ কৃত্য সমাধা হ'ল। তারপর মার্থা বিড়বিড় করে' আবোল তাবোল কত কি বক্‌তে লাগ্‌লো; ভোরের দিকে সত্যিই সে চলে গেল।

আশেপাশের যত বুড়ীরা তাকে নাইয়ে ধুইয়ে পোষাক পরালেন আর কফিনের মধ্যে দিলেন শুইয়ে। পাছে পুরুতকে কিছু দিতে হয় এই ভয়ে মন্ত্র পাঠ কর্‌লে জেকব্ নিজে; কবরখানার চৌকীদার সম্পর্কে ছিল তার ভাই, তাই কবরের খরচ কিছুই লাগ্‌লো না। চারজন চাষী শব ব'য়ে নিয়ে গেল,—ভালবাসার খাতিরে, পয়সার লোভে নয়। শবের সঙ্গে চল্‌লো গাঁয়ের যত বুড়ী, ভিখিরী আর হ্যালাখ্যাপা দুটো লোক। যাবার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হ'ল তারাই ভক্তি ভরে ক্রুশচিহ্ন স্মরণ করলে। কারো মনে কোন ক্লেশ না দিয়ে সব বেশ সুন্দর ভাবে, আর সস্তায়, নির্ব্বাহ হ'য়ে গেল দেখে জেকব্ ভারী খুসী। মার্থার কাছে যখন সে শেষ বিদায় নিয়ে তার কফিন্ স্পর্শ কর্‌লে তখন তার মনে হ'ল, "কাজটা হ'ল নেহাৎ মন্দ নয়।"

কবরখানা থেকে বাড়ী ফির্‌বার পথে তার ভারি কষ্ট হ'তে লাগ্‌লো। শরীরটা বড় খারাপ বোধ হ'ল; নিঃশ্বাস আগুনের মত গরম, পা আর চলে না, জলের জন্যে সে আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। তাছাড়া নানান চিন্তা তার মাথায় এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। মনে হ'ল, মার্থার প্রতি সে চিরদিন অবিচারই করে' এসেছে, দুটো মিষ্টি কথা পর্য্যন্ত তাকে বলেনি কোনদিন। অর্দ্ধ শতাব্দীর দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন তার পিছনে পড়ে আছে—মনে হয় না এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখন সে মার্থার জন্যে কোন চিন্তা কোরেছে, কুকুর বিড়াল ছাড়া মানুষ বলে' তার পানে কোনদিন ফিরে তাকিয়েছে। কিন্তু তবুও এই নিরীহ নারী প্রতিদিন উনোন জেলেছে, রুটি সেঁকেছে, তরকারী রেঁধেছে, জল এনেছে, কাঠ কেটেছে। রাত্রে বিয়ের আসর থেকে যখন মাতাল হয়ে সে ঘরে ফিরেছে শ্রদ্ধাভরে তার বেহালাখানি সে দেওয়ালের গায়ে টাঙিয়ে রেখেছে, আর তাকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে উৎকণ্ঠিত ভীরু দৃষ্টিখানি তার মুখের 'পরে মেলে ধরেছে।

এমনি সময় রথস্‌চাইল্ড স্মিতমুখে হেঁট হয়ে নমস্কার করতে করতে তার দিকে এগিয়ে এল।

বল্‌লে, "তোমাকে সারা সহর ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি খুড়ো। মোজেস তোমাকে নমস্কার জানিয়ে এখুনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বার কথা বলেছেন।"

কাজ করবার মেজাজ জেকবের ছিল না। তার কান্না পাচ্ছিল।

"আমাকে বিরক্ত কর না" বলেই সে এগিয়ে চল্‌লো। দৌড়ে তার পাশে গিয়ে সভয়ে ইহুদি বল্‌লে, "বল কি খুড়ো? সে কি হয় কখন? মোজেস বিরক্ত হবেন যে। তিনি তোমাকে এখুনি দেখা কর্‌তে বলেছেন।"

ইহুদির এই একঘেয়ে কথায়, তার মিটমিটে চোখ, আর মুখের লাল শিরাগুলো দেখে জেকব্‌ গেল ক্ষেপে। তার লম্বা সবুজ জামা আর শীর্ণ, ভঙ্গুর মূর্ত্তিটার পানে সে ঘৃণা ভরে তাকালো। বলে উঠলো, "আমাকে বিরক্ত করার মানে কি বল্‌ তো। সরে পড় বলে দিচ্ছি।"

ইহুদির মেজাজও গেল বিগ্‌ড়ে, সেও চীৎকার করে বল্‌লে, "আমাকেও ঘাঁটিও না বলছি—বেশী চালাকী কর তো বেড়া ডিঙিয়ে দেব ফেলে।"

"দূর হ' আমার সুমুখ থেকে" ঘুঁসি উঁচিয়ে জেকব বল্‌লে, "তোর মত শূয়োরের সঙ্গে আর একগাঁয়ে বাস করছি নে।"

ভাব দেখে রথস্‌চাইল্ড ভয়ে পাথর হ'য়ে গেল। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল, আর হাত তুলে', নেড়ে যেন আসন্ন আঘাত থেকে আত্মরক্ষার ভঙ্গি কর্‌তে লাগ্‌লো, তারপর হঠাৎ লাফ মেরে উঠেই দিল সোজা ছুট্‌। দৌড়তে দৌড়তে সে মাঝে মাঝে লাফিয়ে উর্দ্ধে তে আর হাত নাড়তে লাগ্‌লো। দেখা গেলো তার দীর্ঘ কৃশ পিঠখানি বেতসের মত কাঁপছে! ব্যাপার দেখে ছেলের দলে মহা আনন্দ; * 'শিনি! শিনি' করে' তারা তার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলো। কুকুর-গুলোও ঘেউ ঘেউ করে' এই শিকারে যোগ দিল। কে যেন একজন শিষ দিয়ে আর হি হি করে হেসে উঠ্‌লো; তাই শুনে কুকুরগুলো ডেকে উঠলো দ্বিগুণ জোরে আর উৎসাহের সঙ্গে।

এর পরে তাদের মধ্যে কোনটা নিশ্চয়ই তাকে কামড়ে থাকবে, কারণ একটা করুণ হতাশ আর্ত্তনাদে আকাশ মথিত হয়ে উঠলো।

চারণ ভূমির মধ্য দিয়ে খেয়ালের ঝোঁকে জেকব্‌ সহরের প্রান্তে এসে পৌঁছলো। সঙ্গে চীৎকার রত ছেলের দল। "ঐ বুড়ো ব্রন্‌জ্‌ যায়, ঐ বুড়ো ব্রন্‌জ্‌ যায়" এই তাদের বুলি, জেকব্‌ ক্রমে নদীর ধারে এসে পড়্‌লো। তীব্র কূজন করে' "স্নাইপের" ঝাঁক এদিক ওদিকে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌লো, আর পাতি হাঁসগুলো শব্দ করে' (গা ভাসিয়ে) সাঁতার দিয়ে চল্‌লো। রৌদ্রের তাপ অসহ্য বোধ হচ্ছিল; রশ্মিগুলি নদীর জলের উপর এমন উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বল্‌ছিল যে সেদিকে তাকান কষ্টকর হ'য়ে উঠ্‌ছিল। নদীর ধার দিয়ে যে পথ চলে গিয়েছে আনমনে জেকব্‌ সেই পথ ধরেই বরাবর চল্‌তে লাগ্‌লো। একটি স্থূলকায় মহিলা তার চোখে পড়্‌লো, স্নানাগার থেকে সে সবে বেরিয়ে আসছে। জেকব্‌ মনে মনে ভাব্‌লে, "একটা আস্ত ভোঁদড়।"

স্নানাগার থেকে অল্পদূরে কতকগুলি ছেলে মাংসের টোপ দিয়ে কাঁকড়া ধর্‌ছিল। জেকব্‌কে দেখে দুষ্টামি করে' তারা বলে উঠ্‌লো, "ঐ বুড়ো ব্রন্‌জ্‌ ঐ বুড়ো ব্রন্‌জ্‌।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেইখানে ঠিক্‌ তার সামনে বহুকালের এক শাখা-বহুল উইলো গাছ—প্রকাণ্ড তার গুঁড়ি, আর তার একটি ডালে একটি কাকের বাসা। সহসা জেকবের স্মৃতি মথিত করে জেগে উঠ্‌লো একটি ক্ষুদ্র জীবন্ত মূর্ত্তি—কুঞ্চিত তার কেশপাশ, আর মার্থার বর্ণিত সেই উইলো গাছ। হ্যাঁ, এ সেই গাছই বটে, শান্ত, সবুজ ও বিষাদময়। বেচারী কী বুড়োই না হ'য়েছে!

সেই তরুতলে বসে' সে অতীতের ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে গেল। পরপারে যেখানে এখন মাঠ ধু ধু করছে সেইখানে সেকালে দীর্ঘ বার্চগাছে-ভরা বনভূমি, আর দূর দিগ্‌বলয়ে ঐ যে পাহাড়ের ভগ্ন গাত্র দেখা যাচ্ছে সেটা ছিল পাইন বনের নীলিমায় নিবিড়। পাল তোলা নৌকাগুলি নদীর বুকে তরঙ্গ তুলে যাতায়াত কর্‌তো। কিন্তু এখন সব শান্ত ও স্থির; একটীমাত্র বার্চগাছ অতীতের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে' ওপারে, যেন লাবণ্যময়ী তরুণী যৌবনের আনন্দে উদ্বেল। নদীর জলে এখন কেবল হাঁসের দল সাঁতার খেলে বেড়ায়। কোন কালে যে সেখানে তরণীর চলাচল ছিল তা বিশ্বাস করাও আজ কঠিন, এমন কি তার মনে হ'ল হাঁসের সংখ্যাও

* গ্রাম্যভাষায় ইহুদিদের ডাক নাম।

যেন কম। স্বপ্নাবেশে জেকব্ চোখ বুঁজলো আর তার সামনে দিয়ে একে একে শ্বেত মরালের দল অনাহত প্রবাহে চলে যেতে লাগ্লো।

তার আশ্চর্য্য বোধ হ'ল, এই দীর্ঘকালের মধ্যে একদিনও কেন সে এদিকে আসেনি, আর যদি বা এসে থাকে এই চারুচিত্রের পানে চোখ মেলে চায়নি কেন। সুন্দর ও প্রশস্ত এই স্রোতস্বিনী; এখানে মাছ ধরে' ব্যবসাদার, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, অথবা ষ্টেশনের ধারে হোটেলওয়ালার কাছে বেচে বেশ দু পয়সা সে কামাতে পারতো, আর টাকাটা ব্যাঙ্কেও রাখা চলতো, দাঁড় বেয়ে নদীর বুকে ঘুরে ঘুরে বেহালার আলাপ শুনিয়েও সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই কিছু না কিছু আদায় হ'তো। খেয়া পারাপারের একটা ব্যবসাও হয়তো খুলতে পারতো এই নদীতে; কফিন্ তৈরীর চেয়ে সে কাজ লাভজনক হ'তো অনেক। কিছু না হ'ক সে হাঁসও তো পালতে পারতো, আর শীতকালে সেগুলি মেরে পাঠিয়ে দিত মস্কো। শুধু পালক থেকেই আয় হ'ত বছরে অন্ততঃ টাকা দশেক। কিন্তু এসব সুযোগই সে হারিয়ে বসেছে; জীবনে সে কিছুই করেনি। সারাজীবন ধ'রে তার ক্ষতির ভরাই হয়েছে ভারী! আর যদি সবগুলি কাজই সে একসঙ্গে করতে পারতো! যদি সে মাছ ধরতো, বেহালা বাজাতো, নৌকা চালাতো, হাঁস পাল্তো, কি বিপুল মূলধনের মালিক হ'তো সে এতদিনে। কিন্তু এসব করার স্বপ্নও সে দেখেনি কোনদিন। নিরানন্দ ও নিরর্থক তার দিনের দলগুলি কালের জলে ভেসে গিয়েছে। অমূল্য জীবনটা তার কাণা কড়ির মূল্যে গেছে বিকিয়ে। সামনে আর কোন আশা নাই, পিছনে কেবল ক্ষতির বোঝা পুঞ্জিত,—সেকথা ভাবতেও তার শরীর শিউরে ওঠে। কিন্তু এই সব ক্ষতি অপচয় এড়িয়ে কেন মানুষ বাঁচতে পারে না? বার্চ্চ ও পাইন্ বনের গাছগুলি নির্ম্মূল করে কেটে নিয়ে গেল কে? ঐ মাঠগুলিই বা শূন্যে পড়ে আছে কেন? কেন মানুষ যা করা উচিত নয় শুধু তাই করে? কেন সে সারাজীবন তার স্ত্রীকে বকে' বকে' আর ঘুঁসি তুলে ভয় দেখিয়ে এসেছে! আর এখুনি ঐ ইহুদিটাকেই বা কেন সে অপমান করেছে আর ভয় দেখিয়েছে? মানুষ মানুষের কাজে সর্ব্বদাই বাধা দেয় কি জন্যে? জগতে কত ক্ষতিই না হয় এর থেকে? ক্রোধ আর হিংসা না থাক্লে পরস্পরের কাছ থেকে লাভ পাওয়া যেত প্রচুর।

সারা সন্ধ্যা ও রাত্রিটা জেকবের সেই বিস্মৃত শিশু, উইলো গাছ, হাঁস আর মাছ, তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের মত মার্থার মূর্ত্তিখানি, রথস্চাইল্ডের করুণ পাণ্ডুর মুখচ্ছবির স্বপ্ন দেখেই কেটে গেল। অদ্ভুত সব মুখ চতুর্দ্দিক থেকে তার দিকে ভেসে এসে তার কানে জীবন-ভোর তার ক্ষতির কথাই গুঞ্জন করে গেল। শয্যায় শুয়ে সে ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করতে লাগ্লো আর সমস্ত রাতে পাঁচবার সে বিছানা ছেড়ে উঠলো বেহালার সুরালাপের জন্যে।

সকালে অতি কষ্টে সে শয্যা ছেড়ে উঠ্লো এবং বরাবর হাঁসপাতালের দিকে গেল। ডাক্তারের সহকারী সেই ভদ্রলোক, পূর্ব্বের মতই তারও মাথায় জলপটি লাগাবার ব্যবস্থা করলেন, আর কতকগুলি পুরিয়া দিলেন খেতে। তাঁর ভাব ভঙ্গিতে ও কণ্ঠস্বরে এবারেও জেকব বুঝল ব্যাপার বড় সুরাহা নয়, কোন পুরিয়ার আর সাধ্য নেই যে তাকে বাঁচায়। ফিরবার পথে সে ভাবলে 'একটা ভাল ফল হবে তার মৃত্যুতে, পানাহার করতে বা খাজনা দিতে আর হবে না; লোকের মনে ব্যথাও সে আর দিবে না এবং যেহেতু মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর এই সমাধি শয়নে ঘুমিয়ে থাকে, লাভের অঙ্ক হবে তার বিপুল। তা হলে দেখা গেল, জীবনেই মানুষের লোকসান, মৃত্যুতে তার লাভ। এ যুক্তি খুবই সঙ্গত সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারি করুণ। কেন এই জগৎ এমন অদ্ভুত ভাবে কল্পিত যে মানুষের জীবন, যা সংসারে একবার মাত্রই পাওয়া যায়, সেটা কেবল নিষ্ফলতার হাহাকারেই মিলিয়ে যাবে?

ম'রতে হ'বে বলে তার কোন দুঃখ ছিল না, কিন্তু যখন সে বাড়ী পৌঁছে তার বেহালাখানির পানে তাকালো তখনই তার বুকটা কেমন টন্ টন্ করে উঠলো; তার দুঃখের আর অবধি রইলো না। কবরের ভিতরে সে বেহালা নিয়ে যাবে কেমন করে'? অনাথের মতই এটা থাক্বে পড়ে এবং এর অবস্থা হ'বে ঐ বার্চ্চ আর পাইন বনের মত। সংসারে সব কিছুই চিরদিন হারিয়ে এসেছে আর চিরদিন হারাবেও। জেকব্ বাইরে গিয়ে বেহালাখানি বুকে নিয়ে দেউড়ির ওপরে এসে

বস্‌লো। ক্ষতি-অপচয়ে-ভরা তার জীবনটার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে বেহালার তারে তুল্‌লে ঝঙ্কার, জান্‌তেও পার্‌লে না কি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী সুরের তার তন্ত্রীগুলি কেঁদে উঠেছে—দরদর ধারে অশ্রুধারা তার কপোল বেয়ে ঝর্‌তে লাগ্‌লো। চিন্তা যতই গম্ভীর হতে লাগ্‌লো বেহালার আলাপও হ'ল ততই করুণ।

হঠাৎ খিল ওঠার শব্দ হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাগানের দুয়োর দিয়ে ঢুকে পড়্‌লো রথস্‌চাইল্ড। বাগানের ভিতর দিয়ে পথ সংক্ষেপ ক'রে দৃঢ়পদে সে এগিয়ে এল। তারপর হঠাৎ থেমে গুঁড়িমেরে বস্‌লো এবং খুব সম্ভব ভয়ে, অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাতে চেষ্টা কর্‌লে বেলা তখন ক'টা।

তাকে আসবার ইসারা করে' ধীরভাবে জেক্‌ব বল্‌লে, "কোন ভয় নেই, চলে এস, চলে এস।"

ভয় ও অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' রথস্‌চাইল্ড ধীরে ধীরে জেকবের কাছে হাজির হ'ল এবং প্রায় গজ দুই তফাতে এসে দাঁড়ালো। একটা মোলায়েম গোছের সেলাম ক'রে বল্‌লে, "দোহাই তোমায়, মেরো না। মোজেস্‌ আবার আমাকে তোমার কাছেই পাঠিয়েছেন। তিনি বল্‌লেন 'ভয় পেও না, জেকবের কাছে গিয়ে বল তাকে না হ'লে আমাদের কোন মতেই চল্‌বে না।' আসছে বিষ্যুদবারে একটা ভারী জাঁকের বিয়ে আছে, সত্যি বল্‌ছি খুড়ো। মিষ্টর 'শেপো-ভেল্‌ফ্‌' দিচ্ছেন তাঁর মেয়েন দিয়ে; একটি চমৎকার ছোকরার সঙ্গে। বিয়েটার খরচপত্রও হ'বে বিস্তর।" এই বলে' সে চোখের একটা অর্থপূর্ণ ভঙ্গি কর্‌লে।

কষ্টে শ্বাস টেনে জেকব্‌ উত্তর কর্‌লে, "আমি তো পার্‌ব না যেতে; বড় অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি, বাবাজি!"

সে আবার সুরের আলাপ কর্‌তে লাগ্‌লো, অশ্রুর নির্ঝর ঝরে' পড়্‌লো তার বেহালার উপর। বুকের 'পরে হাত জোড় করে,' সাগ্রহে একদিক মাথা ঝুঁকিয়ে রথস্‌চাইল্ড শুনলে সেই মৃদু করুণ তান। তার ভীত চকিত দৃষ্টি ক্রমে বেদনায় ভারী হয়ে উঠ্‌লো। বেদনার আনন্দে সে চোখ তুলে চইলে, আর আপন মনেই বলে উঠ্‌লো—'আ—হা!' অশ্রুজলের প্লাবন বয়ে' গেল তার দু'চোখ দিয়ে, সবুজ জামাটা জলে ভিজে উঠ্‌লো।

সমস্ত দিন জেকব্‌ শুয়ে রইলো যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো। সন্ধ্যাবেলা পুরোহিত শেষ কৃত্য সমাপন করতে এসে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন জীবনে বিশেষ কোন পাপের কথা তার স্মরণ হয় কি না।

নিলীয়মান স্মৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে' জেকব্‌ আর একবার স্মরণ কর্‌লে মার্থার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি, আর কুক্কুর-দষ্ট হতভাগ্য ইহুদির হতাশাময় আর্ত্তনাদ। প্রায় অস্ফুটস্বরে সে বল্‌লে, "আমার এই বেহালাখানা রথস্‌চাইল্ডকে দিন।"

"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে" পুরোহিত উত্তর করলেন। এরপরে ঘটনা এমনি দাঁড়ালো যে সহরের সবাই প্রশ্ন কর্‌তে লাগ্‌লো, "আচ্ছা, এই চমৎকার বেহালাখানা রথস্‌চাইল্ড পেলে কোথায় বলতে পার?"

অনেকদিন হ'ল রথস্‌চাইল্ড বাঁশী বাজান ছেড়ে দিয়েছে—এখন সে কেবল বেহালা বাজায়। বাঁশীর মতই তার ছড়ির টানে আজও সেই বিষাদের সুরই বেজে ওঠে। আর যখন সে দেউড়ির গোড়ায় বসে জেকব্‌ যে-গান বাজিয়েছিল সেই তানটি ফিরিয়ে আন্‌তে চায়, তখন তার আলাপ এত মর্ম্মান্তিক করুণ হয়ে ওঠে যে, যে শোনে সেই কাঁদে; আর সে নিজে চোখ তুলে আপন মনেই বলে 'আ—হা'। এই নূতন সুরটি গাঁয়ের লোকদের এতই মুগ্ধ করেছে যে রথস্‌চাইল্ডকে বাড়িতে আন্‌বার জন্যে বণিক ও চাকুরে মহলে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে' যায়, আর তাকে ফরমাস করে' একই গান তারা ফিরে ফিরে দশবার শোনে।

বিনায়ক সান্যাল

প্রতিভার উন্মেষ *

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, এম্‌-এল্‌-সি

আমরা যখন হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ি—সে আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—তখন ছেলেদের জন্য স্কুলে কোন লাইব্রেরীর ব্যবস্থা ছিল না, স্কুল পাঠ্য পুস্তক লইয়াই তাহাদের তুষ্ট থাকিতে হইত। স্কুলের অফিস ঘরে ২।৪ আলমারী Reference বই থাকিত বটে—তবে তাহা ছেলেদের জন্য নয় আবশ্যক মত শিক্ষকেরা তাহা হইতে বই লইয়া ব্যবহার করিতে পারিতেন। পাঠ্য পুস্তকেরও বৈচিত্র্য ছিল না। এখন অনেক স্কুল লাইব্রেরী ছেলেদের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে ছেলেদের চিত্তাকর্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। সেজন্য পুস্তকের সদ্ব্যবহার যেরূপ হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না। পুস্তক নির্ব্বাচনেও বহু গলদ থাকিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান স্কুল লাইব্রেরী সম্বন্ধে ২।১ জন শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম, তাঁহারাও বর্ত্তমান ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহেন। আধুনিক কালের উন্নত প্রণালীতেই স্কুল লাইব্রেরী পরিচালিত হয় এরূপ ইচ্ছা তাঁহারাও পোষণ করেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থা ছেলেদের পাঠেচ্ছা বর্দ্ধনের অনুকূল নহে ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন।
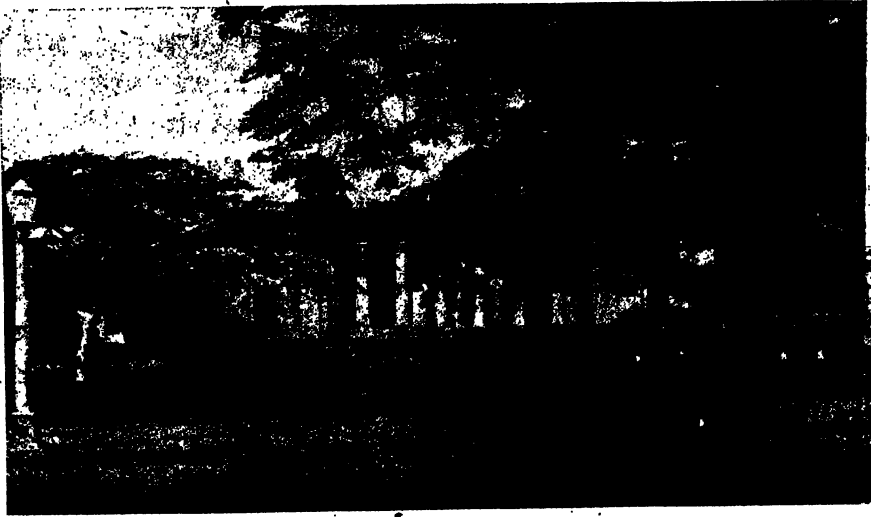
হাওয়াই লাইব্রেরী (Hawaii Library)

জোর করিয়া ঔষধ গলাধঃকরণের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ভাল লাগুক বা না লাগুক তাহা বাধ্য হইয়া ছাত্রদের পড়িতে হয়। তা বলিয়া সব পুস্তকই যে তাহাদের জন্য বাছাই করিয়া দিতে হইবে তাহার কোনও মানে

* হুগলী জেলা বোর্ড আফিসের সভাগৃহে প্রদত্ত বক্তৃতা

নাই। স্কুল সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীতে অপাঠ্য পুস্তক তো থাকিবেই না, অন্ততঃ থাকা উচিত নহে। সুতরাং করাই হইতেছে এখনকার দিনে লাইব্রেরীয়ানের অন্যতম কার্য্য। কেবল পুস্তক সংরক্ষণ লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য নহে—পুস্তকের সহিত পাঠকের আজীবনস্থায়ী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধন ও তাহার তৃপ্তিসাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করা লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য। পুস্তকের নিকট অবাধ গতি থাকিলে পুস্তক চুরির আশঙ্কা কেহ কেহ করিয়া থাকেন। আমার বিশ্বাস অবাধ গতি থাকিলে এই আশঙ্কা অনেকটা অমূলক বলিয়া

কিরূপে লাইব্রেরীর বই খুলিতে হয় তাহাই দেখান হইতেছে

তাহা হইতে স্বাধীন ভাবে ছেলেদের বই বাছাই করিয়া লইতে দিলে তাহার ফল ভালই হইয়া থাকে। দরজা দেওয়া আলমারীর মধ্যে পুস্তক আবদ্ধ করিয়া রাখা আদৌ সমীচীন নহে, খোলা তাকে বই রাখা আবশ্যক। সেখানে পাঠকের অবাধ গতি থাকিবে। তবে তো পাঠক ইচ্ছামত বই বাছাই করিয়া লইতে পারিবে। পুস্তক সংরক্ষণ মান্ধাতার আমলের উপযোগী হইলেও আধুনিক যুগে পুস্তকের সার্থকতা হইতেছে অবাধ ব্যবহারে।

জেরুজালেম—ডেভিড্ উল্ফ্‌সন্ হাউস্ (Jewish National and University Library)

পুস্তকের তাক উজাড় করিয়া পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিপন্ন হইবে। চুরি একটা নিকৃষ্ট বৃত্তি, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে তাহা আবদ্ধ। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে ওরূপ কুপ্রবৃত্তি

শিক্ষয়িত্রীর অভিধানাদির কক্ষ (Reference Room)

বিষয় আছে যে তাহা কেবল ছেলেদের কেন, তাহাতে বুড়াদেরও শিক্ষার বস্তু পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক কঠোর তত্ত্ব এত সহজ ও সরল করিয়া লেখা হইয়াছে ও হইতেছে যে তাহা ছেলেরা অনায়াসেই আত্মস্থ করিয়া লইতে পারে। চিত্রে তাহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। শিশু-সাহিত্য চিত্র-সম্ভারে পূর্ণ থাকায় অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে। পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিতে না পারিলে পুস্তকে প্রীতি জন্মাইবে কি করিয়া ? এই সব অভিনব পন্থা অবলম্বিত হওয়ায় জ্ঞানস্পৃহা বর্দ্ধনের যথেষ্ট

সুসানবুদর বিদ্যালয়ের শাখা পাঠাগারের প্রবেশ পথ

থাকা সম্ভবপর নহে। যদি বা দুই এক জনের থাকে সৎসঙ্গ গুণে তাহা সংশোধন হওয়া অসম্ভব নহে। দু'চারখানা পুস্তক চুরি যাওয়ার আশঙ্কায় জ্ঞানের পথ অঙ্কুচিত করা সঙ্গত নহে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের আমল অপেক্ষা আজকালকার ছেলেরা তাহাদের উপযোগী পুস্তক সম্পদে গরীয়ান। এত সচিত্র ও বিচিত্র পুস্তক ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে যে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহার মধ্যে যে বাজে জিনিষ নাই তাহা বলিতেছি না, তবে অনেকগুলিতে এত শিক্ষণীয় সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছে। অতীব পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের স্কুল লাইব্রেরীগুলি চিত্তাকর্ষক করিবার কোনও ব্যবস্থা

ব্রুক্লীন পাব্লিক্ লাইব্রেরী—ব্রাউন্স্‌ভিল্ শিশু-বিভাগ। বালক বালিকারা পুস্তক গ্রহণ ও প্রত্যর্পণ করিতেছে

স্কুল লাইব্রেরীতে তাহা যোগাইয়া দেন, মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন পুস্তক পাল্টাইয়া দেন; তাহার ফলে ছেলেদের পাঠের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়। এরূপ ভাবের ব্যবস্থায় স্বল্প ব্যয়ে স্কুল লাইব্রেরীগুলি মনোজ্ঞ করা সম্ভব হইয়া থাকে। নূতন নূতন পুস্তক ও পত্রিকার আমদানীতে একঘেয়ে ভাবের পরিবর্ত্তে বৈচিত্র্যে আনন্দ হইতেছে না। কেহ কেহ অর্থ-কৃচ্ছ্রতার অজুহাতে নিশ্চেষ্টতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। আমরা কিছুদিন হইতে শিশু-সাহিত্য সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি। এই স্বল্প অভিজ্ঞতার ফলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে শিশু-সাহিত্য সংগ্রহ বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার নহে। স্কুল লাইব্রেরীর জন্ম বার্ষিক যে টাকা বরাদ্দ থাকে তাহার দ্বারাই স্কুল লাইব্রেরীগুলিকে চিত্তাকর্ষক করা সম্ভব। ফল ভাল হইলে বরাদ্দ আরও বাড়িতে পারে। অন্যান্য দেশে স্কুল লাইব্রেরীর পুস্তক সরবরাহের ভার থাকে সেই সব স্থানের সাধারণ পাঠাগারের উপর। তাঁহারা শিশু বিভাগে বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখেন, নানাবিধ শিক্ষাপ্রদ মাসিক ও সাময়িক পত্র লইয়া থাকেন,

লাইব্রেরী গঠনকারীগণ—পশ্চাৎভাগের দক্ষিণ কোণে লাইব্রেরীটি অবস্থিত

স্ফুরিত হইয়া থাকে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে এরূপ প্রথা অচিরে অবলম্বন করা আবশ্যক।

আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান এবং অবকাশ কালের সদ্ব্যবহার এবং তত্ত্বানুশীলন ও গবেষণার জন্য পুস্তক পাঠে আগ্রহ বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ অন্যতম কর্ত্তব্য। বৃহত্তর ভারতের বাহিরে হইলেও তাহার অতি নিকট প্রতিবেশী ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জে একটা অভিনব পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে স্কুল লাইব্রেরী ছাড়া প্রত্যেক প্রাথমিক বা Elementary বিদ্যালয়ে Class room লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক Class বা শ্রেণী সংযুক্ত সেই শ্রেণীর উপযোগী লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে ছেলেদের

বালক বালিকারা পুস্তক-তালিকার ব্যবহার শিখিতেছে।

স্কুল লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য হইতেছে (১) লাইব্রেরীর সাহায্যে ছাত্র এবং শিক্ষক স্কুলপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা, (২) স্কুলের উপযোগী লাইব্রেরীর মালমশলা-সংগ্রহ এবং তাহার সুপরিচালন, (৩) স্বাধীন ভাবে লাইব্রেরী ব্যবহার শিক্ষা এবং পুস্তককে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া, (৪) সমাজনীতি শিক্ষা বিষয়ে স্কুলের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় দায়িত্ব গ্রহণ, (৫) আজীবন জ্ঞান চর্চ্চার অভ্যাস উদ্দীপন, (৬) আনন্দলাভ জন্য পাঠানুরক্তি এবং (৭) লাইব্রেরী ব্যবহারের অভ্যাস সংবর্দ্ধন।

স্কুলের প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে কেবলমাত্র গল্প উপন্যাস ও লঘুসাহিত্যের মোহে আকৃষ্ট না হইয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞান, হাতে কলমে ব্যবসা ও বাণিজ্য বিষয় এবং চিত্ত-বিনোদনের উপযোগী উৎকৃষ্ট পুস্তকসকল ইচ্ছামত পড়িতে পায় স্কুল লাইব্রেরীতে তাহার ব্যবস্থা থাকা

শিশুকক্ষে তরুণ অভ্যাগতগণ

পড়িবার জন্ত মাঝে মাঝে অবকাশ দেওয়া হয়। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকায় ছেলেরা সহজেই সেখানে আকৃষ্ট হয়। প্রতি বৎসর সেই দ্বীপে স্কুল লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত সেখানে ৪,৬৯৬টী স্কুল সংলগ্ন লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পুস্তক সংখ্যা ১,৬০২৫৪৬ ষোল লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত ছেচল্লিশ। এই সব লাইব্রেরীতে লাইব্রেরী বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের সুপরিচালনার গুণে ছেলেদের মধ্যে পাঠস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সেখানে খোলা তাকে বই রাখা আরম্ভ হইয়াছে, ছেলেদের সেখানে অবাধ গতি। তাহাদের ইচ্ছামত বই বা মাসিক পত্রাদি তাহারা নিজেরাই দেখিয়া শুনিয়া বাছাই করিয়া লইয়া থাকে। তাহাতে লাইব্রেরীর কার্য্যকারিতা শত গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ ২০ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে স্কুল সংলগ্ন কোনও লাইব্রেরীর অস্তিত্বই ছিল না, ঠিক আমাদের দেশের মত পিছাইয়া ছিল। কি করিয়া এত অল্পকাল মধ্যে এত দ্রুত উন্নতি ঘটিল তাহার ইতিহাস বড়ই কৌতুকোদ্দীপক। জনৈক মার্কিন বালিকা ফিলিপাইনের একটী স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হইয়া যান। সেখানকার স্কুলের লাইব্রেরীর অভাব তিনিই প্রথম অনুভব করেন এবং প্রতিকারকল্পে স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করেন।

জনবহুল লাইব্রেরী কক্ষের জ্ঞানান্বেষী পাঠকেরা সত ই ধ্যান নিমগ্ন!

কিন্ডার-গার্টেন শিশুরা ছবির বই উপভোগ করিতেছে

মেমোরিয়াল্ জুনিয়র হাইস্কুল লাইব্রেরী—স্যান্‌ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া
উৎসাহশীল বৈমানিকেরা তাঁহাদের বিমানপোতাদি দেখাইতেছেন।

মত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা এবং তাহার উৎকর্ষ সাধনের আকাঙ্ক্ষা মনে উদ্দীপনা আনিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক পরিচালনার সুযোগ ঘটে। এরূপ ভাবের শিক্ষা ভাবীজীবনের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে। কোন কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) বিভাগের জনৈক বালক খেলার এরোপ্লেন গড়িতে গড়িতে এখন আসল এরোপ্লেন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে।

কি করিয়া স্কুল লাইব্রেরী ব্যবহার করিতে হয় য়ুরোপ ও আমেরিকায় সে সম্বন্ধে তত্রস্থ

অনেক স্কুল লাইব্রেরীর শিশু বিভাগে কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেখানে খেলার ছলে কার্ড বোর্ড জোড়াতাড়া দিয়া নানারূপ আবশ্যকীয় জিনিষ তৈয়ার করিতে শেখে—কেহ এঞ্জিন, কেহ মোটর গাড়ী, কেহ এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়া উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। শৈশবকাল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ, আদর্শ

বরোদা লাইব্রেরী—শিশু-বিভাগ

লাইব্রেরীয়ানগণ ছাত্রদের ডাকিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। এক এক দলে ২৫ জনের বেশী ছাত্র লওয়া হয় না। লাইব্রেরীয়ান সাদরে ছেলেদের অভ্যর্থনা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে এই লাইব্রেরী তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি। তারপর বিভিন্ন বিভাগ দেখাইয়া বলেন—এইটী সংবাদপত্র বিভাগ, এখানে মানুষের অপরিপক্ক চিন্তা দেখিতে পাইবে; তারপর সাময়িক পত্র বিভাগ, এখানে সুচিন্তিত সংবাদ এবং চলতি

বরোদা লাইব্রেরীর অন্তর্গত একটি কক্ষ

চিন্তার ধারা পাওয়া যাইবে, তারপর পুস্তক দাদন বিভাগ, সেখানে ঘরে লইয়া গিয়া পড়িবার জন্য অতীত এবং বর্ত্তমান কালের উৎকৃষ্ট ভাবধারা এবং অপূর্ব্ব কল্পনা সঞ্চিত আছে, তারপর যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিভাগ (Reference), সেখানে অতি সুন্দর ও সহজভাবে যাহার যে বিষয়ে জানিবার আবশ্যক চাহিবামাত্র তাহা যোগাইবার ব্যবস্থা আছে। অতি সহজ ও মনোজ্ঞভাবে লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তারপর কি করিয়া পুস্তক খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ এবং তদনুযায়ী তালিকা কি ভাবে রাখিতে হয় ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া তাহারা তাহা বুঝিল কি না দেখিবার জন্য তাহাদের হাতে কলমে পরীক্ষা লওয়া হয়। একজন একখানি পুস্তকের নাম করিল তাহা বিষয়-নির্দ্দেশের (Subject index) তালিকা ও ডিউইর (Dewey) দশমিক শ্রেণীবিভাগ দেখিয়া বাহির করিতে বলা হয় এবং তাকে কি ভাবে বই সাজান আছে এবং কি প্রণালীতে সহজে ও স্বল্পক্ষণ মধ্যে তাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তাহার শ্রেণীবিভাগ জন্য যে সব কথা ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যাখ্যা কিরূপে করা হয় তাহার একটু নমুনা এখানে দিতেছি :—

·০০০ হইতে ·০৯৯ পর্য্যন্ত · সাধারণ পুস্তক—(General works) সংবাদ পত্র, বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) এবং অন্যান্য বই যাহাতে নানা বিষয়ের তথ্য আছে সেগুলি সাধারণ পুস্তকপদবাচ্য হইবে।

১০০ হইতে ১৯৯ পর্য্যন্ত দর্শন (Philosophy) মন—কি ভাবে মনের কার্য্য চলিতেছে এবং তাহার দ্বারা আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

২০০ হইতে ২৯৯ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম (Religion)—ভগবৎ সম্বন্ধীয় পুস্তক, ধর্ম্ম পুস্তক, পূজা পদ্ধতি, জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রভৃতি।

৩০০ হইতে ৩৯৯ পর্য্যন্ত সমাজতত্ত্ব (Sociology), লোকে কি ভাবে পরিবারবর্গ লইয়া সহরে এবং পল্লীগ্রামে একত্রে বাস করে, তাঁহাদের বিস্তারিত, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা, রাজ্যশাসন প্রণালী, ব্যবস্থাপক সভা, আইনকানুন, এবং আচার ব্যবহার সংক্রান্ত পুস্তক।

৪০০ হইতে ৪৯৯ পর্য্যন্ত ভাষাতত্ত্ব (Language)—স্বদেশ ও বিদেশীয় ভাষার ব্যাকরণ, গদ্য ও পদ্য রচনার প্রণালী সম্বন্ধে পুস্তক এবং তৎ তৎ ভাষার অভিধান।

বরোদা লাইব্রেরীর একটি অংশ

৫০০ হইতে ৫৯৯ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান (Science) দু রকম অঙ্ক (mathematical) এবং স্বভাবজাত (natural)। অঙ্ক (mathematical) তাহাতে পাটীগণিত (arithmetic) বীজগণিত (algebra) জ্যামিতি (Geometry) এবং উচ্চ গণিত আছে। স্বভাবজাত (natural) হইতেছে জ্যোতিষমণ্ডলী (Astronomy), উত্তাপ (Heat) আলোক (Light), শব্দ (Sound) বিদ্যুৎ (Electricity) রসায়ন (Chemistry), ভূতত্ত্ব (Geology), Biologyতে জগতের অধিবাসী অর্থাৎ জীবজগৎ—আদিম মানব এবং তাহার ইতিহাস, বৃক্ষ লতার জীবন (Plant Life) কীট পতঙ্গ জন্তু মৎস্য ও পক্ষী জীবন সংক্রান্ত পুস্তক।

৬০০ হইতে ৬৯৯ পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় শিল্প (useful arts)—এটা একটা মিশ্র শ্রেণী (mixed clss)। ইহার আরম্ভ চিকিৎসা বিদ্যায়। ইহার আবিষ্কার, রোগ নিরোধ এবং রোগের চিকিৎসা তাহার পর আসিতেছে সব রকম ব্যবসা এবং শ্রম-শিল্প বা crafts, সূক্ষ্ম শিল্প বা fine arts ইহার অন্তর্গত নহে।

এই ভাবে আমরা পাই সবরকম ইঞ্জিনিয়ারিং পুস্তক, বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক এবং ব্যোমায়ন পরিচালন সংক্রান্ত পুস্তক, আপিসের কাজ সংক্রান্ত পুস্তক।

সঙ্কেত লেখা (Short-hand) টাইপ করা (typing) এবং হিসাব রাখা (Book- keeping) কলকারখানার প্রস্তুত জিনিষ, চাষবাস, উদ্যান, গৃহস্থালী ব্যবস্থা (domestic economy) এবং বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ সংক্রান্ত পুস্তক।

৭০০ হইতে ৭৯৯ পর্য্যন্ত সুকুমার বা কলা শিল্প (fine Arts) মনোহর উদ্যান (fine gardening), সুদৃশ্য গৃহ নির্ম্মাণ শিল্প (architecture) ক্ষোদাই কার্য্য (carving) নক্সার কার্য্য (drawing) চিত্র (painting) আলোকচিত্র

(photography), গীতবাদ্য (music) অর্থাৎ নরনারী তাহাদের পারিপার্শ্বিক (surroundings) স্থান সৌন্দর্য্যশালী করিবার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছে তৎসংক্রান্ত বই, চিত্তের প্রফুল্লতা সাধন জন্য ক্রীড়া কৌতুক বা জীবনে থাকিবে কবিতা, নাটকাভিনয়, প্রবন্ধ, মনোহারী বাগ্মিতা এবং বিশুদ্ধ রহস্য (humour) সংক্রান্ত পুস্তক।

৯১০ হইতে ৯৯৯ পর্য্যন্ত—এই শ্রেণীতে তিনটি বিভাগ আছে. ইতিহাস—জাতি হিসাবে (nation) জনগণের (peoples)

শিশু লাইব্রেরী—বেথ্‌নাল গ্রীন্
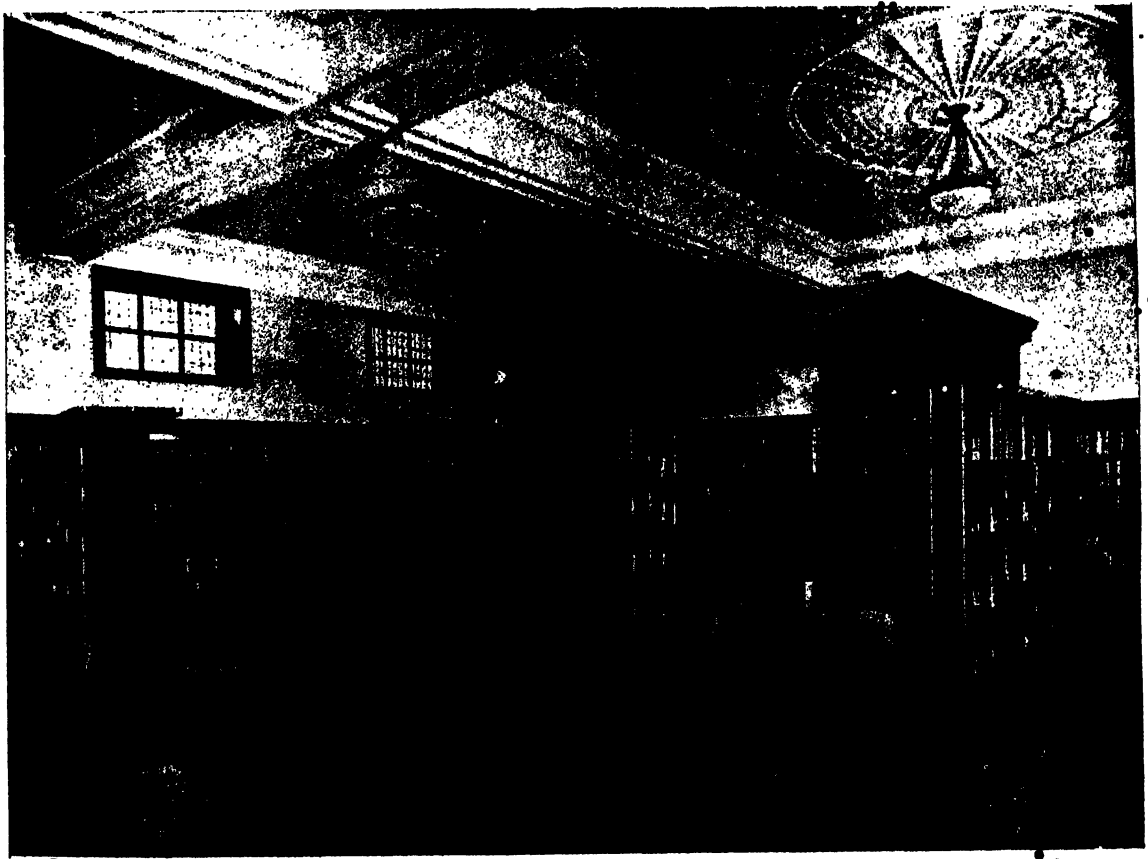
যাহাতে আনন্দ এবং সুখ সম্পদ বৃদ্ধি হয় তৎসংক্রান্ত পুস্তক।

৮০০ হইতে ৮৯৯ পর্য্যন্ত সাহিত্য (Literature) লেখনী পরিচালনা দ্বারা কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে, মনোজ্ঞভাবে চিত্তে প্রফুল্লতা আনিয়া দেয় তাহার মধ্যে কাহিনী; ভূগোল—বহির্জগতের পরিচয়, দেশ বিদেশের, নগর উপনগরের বৃত্তান্ত এবং ভ্রমণকাহিনী; জীবনচরিত—মহাপুরুষদের জীবনের ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তক।

তারপর দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান হয় প্রত্যেক শ্রেণীতে কত

রকম বিভাগ আছে। যেমন ৯ অর্থে ইতিহাস, ৯৫ অর্থে এশিয়ার ইতিহাস, ৯৫৪ অর্থে ভারতের ইতিহাস, ৯৫৪·০২ মুসলমান আমলের ইতিহাস এবং ৯৫৪·০২৩ অর্থে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস। আবার ইহার মধ্যে যে সব বই আছে সেগুলি লেখকের পদবীর বর্ণাক্ষর অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায়

পুস্তক রাখিবার একপ্রকার সেল্‌ফ্‌

তাকে পর পর সাজান আছে, আর তাহার নীচে তাকের উপর ঐ বিষয়ের লেবেল মারা আছে, যাহাতে বই রাখিবার বা খুঁজিবার কোন অসুবিধা না হয়। তারপর প্রত্যেক ছাত্রকে বিষয়ের নির্ঘণ্ট (Subject index) একখানি করিয়া দেওয়া হয়—তাহার ব্যবহার প্রণালী বুঝাইয়া দিয়া প্রতিবাক্য (Synonyms) অর্থ ইত্যাদি বুঝান হয়। যদি তাহারা মাছ ধরা (fishing) সম্বন্ধে বই চায় আর তাহার উল্লেখ নির্ঘণ্টে না পায় তাহা হইলে ছিপে মাছ ধরা (angling)এ কি উল্লেখ আছে তাহা দেখে। যদি কেরোসিন তৈলের (petroleum) কথা জানিতে চায়, যেখানে তৈলের কথা আছে সেইখানে খুঁজিলে তাহার উল্লেখ পাইবে ইত্যাদি শিখাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে ছেলেরাই লাইব্রেরী সংক্রান্ত মোটামুটি সব বিষয় বুঝিয়া লয় এবং আবশ্যক হইলে নিজেরাই কাজ চালাইয়া লইতে পারে। অতি সহজভাবে পুস্তক বাহির করিয়া লইয়া কার্য্যান্তে যথাস্থানে রাখিয়া দিতে পারে। কাহারও দোষে কাহাকে সময় অপচয় করিতে হয় না, ক্ষিপ্রতার সহিত নিয়মানুবর্ত্তিতার দ্বারা সব কাজ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয়। ইহা একটা কম শিক্ষণীয় বিষয় নহে। এক ঘণ্টা শিক্ষার ফলে এত বড় একটা গুরুতর বিষয় কিরূপ সহজসাধ্য হইয়া যায়। ছেলেরা খেলার মত করিয়া স্ফূর্ত্তির সঙ্গে এই সব কাজ করে। ইহার ফলে তাহাদের পুস্তকের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে বন্ধুত্ব জন্মে পাঠানুরক্তি অতিমাত্রায় বাড়িয়া থাকে এবং প্রতিভা উন্মেষের একটা সুযোগ ঘটিয়া যায়।

জ্ঞান ভিন্ন কোনও জাতি বড় হইতে পারে না—Knowledge is power—জ্ঞানই শক্তি। শক্তিমান হইতে হইলে বলীয়ান হইতে হইবে। এই জ্ঞানবলে য়ুরোপ ও আমেরিকা সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য করিতেছে। জ্ঞানই তাহাদের শক্তিমান করিয়াছে। আমাদের দেশ অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। যে দেশে শতকরা ৯৭ জন লোক নিরক্ষর সে দেশের আশা ভরসা কোথায়? তাহার উপর যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার গোড়ায় গলদ থাকিয়া যাইতেছে। Child is the father of the Man—

শৈশবের শিক্ষার বনীয়াদ পাকা করিলে তবে জাতি গড়িয়া উঠিবে। তোতা পাখীর মত পাঠ্য পুস্তক কণ্ঠস্থ করাইয়া কেরাণীর জাতি তৈয়ার হইতে পারে—প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম—যদি মানুষ চান, যদি জাতি গড়িতে চান, শিক্ষার ধারা পাল্টাইয়া দিয়া আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করুন্। বর্ত্তমান সভ্য জগতের বিশেষতঃ নব জাগরিত জাতিদের মধ্যে শিক্ষার ধারা নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে আর আমরা নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছি ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি আছে?

আমাদের ছেলেদের শিক্ষার ভার আমাদিগকেই লইতে হইবে—দেশের ভবিষ্যৎ যে তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। এরূপ গুরুতর বিষয়ে—পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে কি চলে? শিক্ষার সুব্যবস্থার গুণে ১৪ বৎসরের ইংরাজ বালক যে সাধারণ জ্ঞান লাভ করে—আমাদের দেশের একজন বি-এ, এম্-এ, তাহার সমান সাধারণ বিষয়ে (General knowledge) জ্ঞান-সম্পন্ন হইতে পারে না কেন? তাহারা যেভাবে শিক্ষা পায়—আমাদের ছেলেরা সেরূপ শিক্ষার সুযোগ পায় না তাই এই পার্থক্য।

একস্থান হইতে অপর স্থানে টানিয়া লইয়া যাইবার উপযোগী বুক্ সেল্ফ.

আমেরিকায় ত ছেলেদের বাড়ীতে স্কুলের পড়া করিতেই হয় না—ছেলেরা স্কুলের পড়া স্কুলেই শেষ করিয়া আসে। দুর্দ্দশার চরম সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে, জাতীয় জীবন মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইছে, মৃত্যুবরণ বা নবজাতি
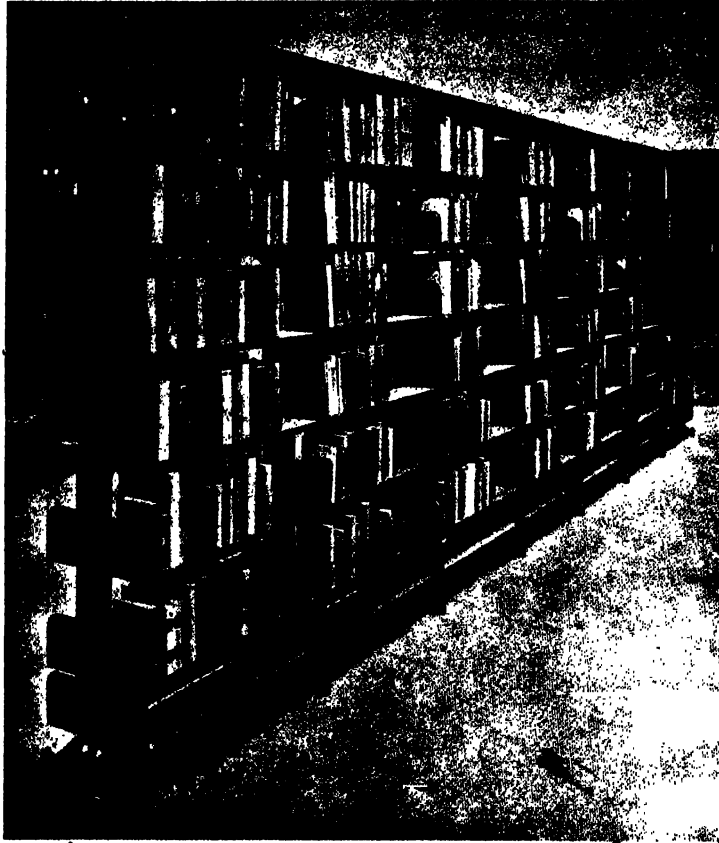
লাইব্রেরীতে পুস্তক রাখিবার সেল্‌ফ্‌

সেজন্য বলিতেছি শিক্ষার গুরুভার বহন জন্য প্রস্তুত হউন নব জাগরিত জাতিদের শিক্ষাপ্রণালী অনুধাবন করুন দেশ গঠন এই দুইটার মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ তাহা বাছিয়া লউন।

শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়

মানুষের শত্রু নারী

শ্রীসুবোধ বসু

সাত

অরুণাংশু উপরে উঠিয়া গেল। বারাণ্ডার ঠিক চলিবার জায়গায় চেয়ার থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু ছিল,—এবং অরুণাংশু গিয়া তার সাথে ঠোক্কর খাইল। আঘাত লাগিয়াছিল মন্দ না, কিন্তু ওর আর্ত্তনাদ করিয়া বেদনা প্রকাশ করা নয়,—হাতল ধরিয়া চেয়ারটাকে ও দুম্ করিয়া এক দিকে ছুঁড়িয়া দিল। যত রাজ্যের যত হতভাগাগুলি চাকর জুটিয়াছে এ বাড়ির,—কারুর চোখে যদি এ পড়ে! না হয় সে খাইতেছিলই বা অন্যমনস্ক হইয়া, কিন্তু তার জন্য পথের মাঝখানে একটা চেয়ার ফেলিয়া রাখিতে হইবে যেন!

অরুণাংশু ঘরে ঢুকিয়া অভ্যাস মত দরজার ধারের সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালাইল। কিন্তু আলো হইতেই ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। আরেঃ,—এ কোন্ ঘরে আসিল আবার,—আরো দু-দুটো ঘর আগাইয়া গেলে তবে যে তার নিজের ঘর—সে খেয়াল নাই। বিরক্ত হইয়া অরুণাংশু বাহির হইয়া আসিল।

ও-বারান্দা হইতে রাস্তাটা দেখা যায়। বাদাম গাছটা, পথের বাঁক, আর তার পরেই,—কী অসভ্যরে ছোঁড়াটা,—একজন মেয়ে গান গাহিতেছে, আর তার ঘরের নীচের রাস্তা দিয়া হাঁটাহাঁটি করিতে হইবে! একটা চড় বসাইয়া দিলেই ভাল হইত! এই রকম করিলে বুঝি মানুষের সহ্য হয়!

উঃ,—দরজাটার সাথে গিয়া অরুণাংশু ধাক্কা খাইল। এবং তার ফল এই হইল যে একটা ছোট্ট ছেলের মত বিচারহীন আক্রোশে ও দরজাটাতেই দুম দুম্ করিয়া কটা ঘুষি বসাইয়া দিল। ওর সব কিছুকেই ঘুষি মারিতে ইচ্ছা হইতেছে। সাদা দেওয়ালগুলিকে, গাছটাকে, আকাশ চাঁদ সবাইকে। কেউ যদি ওকে এখন রাগাইত তবে আর তার রক্ষা ছিল না।

অবশেষে অরুণাংশু তার নিজের ঘরে পৌছিল।

জামার বোতামটা খুলিতেছে না,—কী জ্বালাতন রে! এক টান্ দিয়া অরুণাংশু সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। স্যাণ্ডাল? স্যাণ্ডাল কোথায়? যত জুতোর গাদা জড়ো হইয়াছে,—দারুণ রাগে পা দিয়া সে সাম্নে যত সব জুতোগুলিকে ঘরের চারদিকে ছিট্‌কাইয়া দিল। ঘরের সব কিছু সে চুরমার করিয়া দিবে!

তারপর হঠাৎ গিয়া মাটীতে পা রাখিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল। এটা ওর স্বভাব নয়। অসময়ে ও কখনো বিছানায় শোয় না,—তাছাড়া হাত পা না ধুইয়া অমন রাস্তার ময়লা লইয়া তো নয়ই। কিন্তু পুরা এক মিনিট অরুণাংশু শুইয়া রহিল। তারপর যেমন অকস্মাৎ সশব্দে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল তেমনি আবার উঠিয়া বসিল। তারপর সম্পূর্ণ অকারণে গিয়া জান্‌লার একটা কাঁচের মধ্যে ঘুষি বসাইয়া দিল।

ঝন্ ঝন্ শব্দে টুক্‌রা টুক্‌রা কাঁচ ঝুরঝুর করিয়া নীচে পড়িল। এবং সাথে সাথে অরুণাংশুর হাতের অনেক অলক্ষ্য ছিদ্র দিয়া তাজা রক্তের ধারা ছুটিয়া বাহির হইল,— দেয়ালীর দিনের ফুলঝুরির মত।

কাঁচের ভাঙা শব্দ শুনিয়া একটা চাকর ও পাশের ঘর হইতে রেণুকা ছুটিয়া আসে। অরুণাংশু তখন বাঁ হাত দিয়া ডান হাতের পাতা চাপিয়া ধরিয়াছে,—আর ওর কাপড়ে চুয়াইয়া পড়িতেছে রক্তের ফোঁটা।

দেখিয়াই তো রেণুকা সভয়ে চেঁচাইয়া উঠিল, এ কী?

অরুণাংশু গম্ভীর ভাবে কহিল, কিছু নয়।

কিছু নয়? মাগো, টস্‌টস্ করে রক্ত পড়ছে।

পড়ুক গে।

বাঃ রে!—। তারপর চাকরটাকে কহিল, শ্যাম, তুই

শীগগিরি করে জল নিয়ে আয় তো। আয়োডিন আনব দাদা?

অরুণাংশু কহিল; কারুর কিছু আনতে হবে না। যা করবার নিজেই করব আমি। কচি খোকা নাকি যে—হৈ চৈ করতে হবে।

চাকর শ্যাম কহিল, আজ্ঞে জল একটু আনি, ধুয়ে ফেল্‌বেন।

অরুণাংশু চীৎকার করিয়া কহিল, চুপ রও। কী চাস্ এখানে তুই? যা শীগ্‌গির, ডাক্তারী করতে হবে না।

অরুণাংশুর সেই কারণ-হীন রাগটা আবার ফুলিয়া উঠিতেছে। চাকর-বাকর সবাই মাতব্বরী করিতে আসিবে। দিবে নাকি ওকেই একটা থাপ্পর! এখনো যাইতেছে না? আর সহ্য হয় না। যাক্,—বাঁচা গেল! এখনো ওটা না গেলে কী যে অরুণাংশু করিয়া বসিত কে জানে!

নিজেই অরুণাংশু ধুতির একটা অংশ দিয়া হাতটা জড়াইয়া ফেলিল। হাত কাটিয়াছে ওর নিজের খুসী,—কার তাতে কি!

রেণুকা অরুণাংশুর ভাবগতিক দেখিয়া আর কিছু বলা নিরাপদ মনে করে নাই। ঠেকিয়া ও শিখিয়াছে এমন সব জায়গায় চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ,—কিন্তু একেবারে মুখবন্ধ করা ওর স্বভাব নয়।

কহিল, কি, কাঁচে ঘুষি লাগিয়েছিলে বুঝি?

অরুণাংশু কহিল, বেশ করেছিলুম।

কেন?

ইচ্ছা। তুই যাবি কিনা বল্।

উত্তর দিবার জন্ম অপেক্ষা না করিয়াই রেণুকা পালাইল।

অরুণাংশুর মোটেই খাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু খাওয়া না খাওয়া মায়ের কাছে থাকিলে তো আর নিজের ইচ্ছায় হয় না। আর এতো রেণুকা নয় যে ধম্‌কাইয়া তাড়াইবে।

কিন্তু ডালে হলুদ বেশী হইল, তরকারী নুনে বিষ, মাছে গন্ধ! বেশ তো আর কারুর অমন মনে নাই হইল, কিন্তু ওর অমন লাগিলে কী করিবে! ক্ষুধা নাই তাই অমনতর। করিতেছে? তাতেই বা কী, ওতো খাইতে চাহেই নাই! না না, আর কিছু করিয়া দিতে হইবে না। আঃ, কি জ্বালাতন, বলিতেছে আর কিছু লাগিবে না! তবু বিরক্ত করা!

প্রায় কিছুই অরুণাংশুর পেটে পড়িল না।

ওর ভাল লাগিতেছে না কিছুই। দূর! আঃ! ছাই! কিন্তু কেন যে দূর ও ছাই তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু মহা বিরক্তিতে ওর মন ভরিয়া আছে।...কী অসভ্য ছেলেরে বাপু, মেয়েদের জান্‌লার তলায় দাঁড়াইয়া থাকা! সত্য সত্যই একটা চড় মারিলে তবে রাগ যায়! ক'পয়সার জমিদার?

অরুণাংশুর হাতটা নিশপিশ করে। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ডান হাতটা যে ব্যথায় টাটাইতেছে তা প্রায় ওর মনেই হয় না। ইচ্ছা করে জগত চরাচরে যা কিছু আছে সব কিছুই নির্ব্বিচারে ভাঙিয়া ফেলে আর দেওয়ালের ফটোগুলি, ও বড় আয়নাটা ডাম্বেলটা ছুঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেয়। বিজলী আলোর বাল্‌বটা ফাটাইয়া দিবে নাকি?

জান্‌লাটার কাছে গিয়া কতক্ষণ সে বসিয়া রহিল। কিন্তু অল্পক্ষণ মাত্র, তারপর আসিয়া বসিল টেবিলটার উপর। পা দিয়া চেয়ারটাকে উল্টাইয়া ফেলিল। ওঃ একটা ঝড় যদি উঠে এখন, কিংবা যদি একটা ভূমিকম্প হয়!

কিছুই যখন আর ভালো লাগে না তখন অরুণাংশু আলো নিবাইয়া সটান্ বিছনায় গিয়া পড়িল।

কিন্তু ঘুম আসিতেছে না। শুইয়া পড়িলে অন্যদিন অরুণাংশুর ঘুম আসিতে বড় জোর দেড় মিনিট লাগে। একেবারে দেড় মিনিট লাগে না এমন নয়! কিন্তু আজ কী হইয়াছে ভগবান জানেন,—লক্ষ্মীছাড়া ঘুমটা আসে না কেন। কী গরম আজ! আঃ,—আর এই মশা! এরকম জঙ্গলে ভদ্রলোক থাকে নাকি আবার!

গাছের পাতার শব্দ শোনা যায়! কী হতভাগা পাখী ঐ প্যাঁচাগুলি। একটু ঘুম আসিতেছিল তাও ভাঙাইয়া দিল। এবং আর সময় পাইল না, যত রাজ্যের শিয়ালগুলি অত্যন্ত অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। ইষ্টিশানে হয়ত বা কোনো মালগাড়ি আসিয়া থাকিবে। একটা ইঞ্জিনের ক্ষীণ সিটি শোনা গেল! রাত কত হইয়াছে কে জানে। চাঁদটাকে

আর দেখা যায় না,—হয়ত কৃষ্ণচূড়াবনের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। রাত্রে টিকটিকিগুলির শব্দও এত হয়!

অরুণাংশুর মাথাটা আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঘুম আসা প্রায় অসম্ভব। না, ঘামে ভিজিয়া উঠিল। নিরুপায় হইয়া অরুণাংশু শক্ত বিছানাটা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন অসুখ বিসুখ করিয়াছে কিনা কে জানে! হাতের কাটার ব্যথাটা এতক্ষণে চাড়া দিয়া উঠিল। উঃ,—দূর্ ছাই!

হাওয়া লাগিলে মাথাটা হয়ত ঠাণ্ডা হইতে পারে। জান্‌লাটার ধারে আসিয়া অরুণাংশু চুপ করিয়া দাঁড়াইল। চারদিকে এখন আর জ্যোৎস্না নাই,—একটা আব্‌ছায়া প্রায় অন্ধকারে পরিণত হইবার জোগাড়। পথের বাঁকের বাদাম গাছটা চোখে পড়ে। তার উপরেই একটা তারা জলজল করিতেছে। একরাশ আব্‌ছায়ার মত দূরে একটা খড়ের গাদা চোখে পড়ে। একটা জংলা গন্ধ আসিতেছে।

নিঃশব্দে অরুণাংশু ঐখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা পৃথিবী হইতে কত যোজন দূরে কে জানে। কিন্তু তবু ঘুম-হারা চোখে যুগের পর যুগ তা'রা নিদ্রিত ধরার দিকে চাহিয়া থাকে। কোন্ আকর্ষণে যে থাকে কে জানে তা! আর কত কাল থাকিবে অমন্ করিয়া! চিরকাল নাকি?

ঘরের ভিতরটা অরুণাংশুর অসহ্য মনে হইতে লাগিল। ওর রাত জাগার যত অস্বস্তি যেন এখানে ভীড় করিয়া আছে।

অন্ধকার বারান্দাটায়ও অরুণাংশু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু ভাবিতেছে কিনা তা সে নিজেও বলিতে পারে না। কখনো কখনো রাত্রিরে পাখীদের কর্কশ ডাক শোনা যায়। একটা গাছের পাতায় কখনো একটা সাড়া পড়ে। অন্ধকারেও এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া প্রায় সব কিছুই দেখা যাইতেছে। চিরদিন আলোর মধ্যে দেখা সব কিছুর একটা নতুন রূপের সাথে পরিচয় হইতেছে।

সিড়ি দিয়া অরুণাশু নীচে নামিয়া আসিল। একবার ওর মনে হইল স্বপ্নের ঘোরে চলিতেছে নাকি? চমকিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তারপরই,—দূর্, তা কেন। সমুখের বাগানটায় একটু হাঁটিবে। উপরের চাইতে নীচের এই জায়গাটাই ঠাণ্ডা বেশী হইবে বোধ হয়। বাঃ, চমৎকার গন্ধটাতো! কী ফুল এটা? মাথাটাতে সামান্ত হিমটুকু লাগিতেই কিন্তু ওর বড় আরাম লাগিতেছে! গাছের পাতা, না শূন্যে খানিকটা ছায়া দুলিতেছে? বাঃ, এমনটী হইলে শীগ্‌গিরই ঘুম আসিয়া পড়িবে!

জ্যোৎস্নার যা একটুস্ আভাস ছিল তাও সুপ্ত হইয়াছে। অন্ধকার আকাশে সংখ্যাতীত তারা ফুটিয়া উঠিল।

পায়ের তলাটা একটু যেন শক্ত বোধ হইতেছে। এ দিকটায় ঘাস নাই বোধ হয়। অরুণাংশুর নিজের বিছানাটাও এম্‌নি শক্ত। কোমলের মধ্যেও মাধুর্য্য আছে,—একবারে নাই এমন নয়। আচ্ছা, মাটীতে গাছের ছায়া পড়িলে কি রকম জানি দেখায়, তার ঠিক উপমা মনে হইতেছে না। ঠিক, হইয়াছে। কোজাগরীর সময় মা যেমন আল্‌পনা দেন্ তেমনিতর দেখিতে! আর,—

এ কী? বাঁ দিকটায় ঐ বড় বাদাম গাছটা কেন? বাড়ির গেট্ খুলিয়া কখন্ বাহির হইল সে। হাঁ, ভুল নয়ত, এটাতো রাস্তাই বটে? সঙ্গে সঙ্গে একটা চমকানি অরুণাংশুর সমস্ত শিরায় বিজুলির মত ছুটিয়া গেল। এ কী জাগরণ না স্বপ্ন? চোখে হাত দিয়া অরুণাংশু দেখিল,—তা'রা বন্ধ নয়। তবে? মাথাটা কি সত্যই খারাপ হইয়া গেল নাকি? এ কি মায়া, এ কি ভোজবাজী?

মধ্য নিশায় সমস্ত জগত যখন চোখ মুদিয়াছে,—সাড়া নাই, শব্দ নাই, এবং বোবা অন্ধকার নিঃশ্বাসও ফেলে না, তখন অরুণাংশু স্বপ্নগ্রস্তের মত অকারণে একাকী সুজাতার জানালার তলায় দাঁড়াইয়া আছে!

অরুণাংশু চমকাইয়া উঠিল! তারপর আর একবার মাত্র ভয়ার্ত্ত-চোখে উপরের দিকে তাকাইয়া সহসা অরুণাংশু পাগলের মত সমুখ দিকে ছুটিয়াছে। কী হইল এ সব,—কী এর অর্থ, এম্‌নি করিয়া সে কখন্ আসিল!

কিন্তু আজ কি সমস্ত রাতটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে নাকি? রাত্রিই কি স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিয়াছে! অরুণাংশু সহসা থামিয়া গেল। ফিরিয়া সে যখন আবার সুজাতার জানালার তলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন সে স্পষ্ট শিহরিয়া উঠিতেছে। হাঁ, সে শিখিয়া লইয়াছে কেমন করিয়া জানালার তলায় হাঁটিতে হয়। অন্ধকার,—চমৎকার অন্ধকার। কোথা হইতে গন্ধ আসে এমন!

নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়াও সে রাতে অরুণাংশুর আর ঘুম আসিল না। হাঁ, ঘুম আসিতেছে না কিছুতেই! নাই বা আসিল। (ক্রমশঃ)

সুবোধ বসু

বেনজামিন্ ফ্র্যাঙ্ক্লিন্

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এক

স্থান—আঠারো শতাব্দীর গোড়ার ভাগের ফিলাডেলফিয়া নগর। কাল—রবিবার সকাল। নগরের অধিবাসীরা প্রথানুযায়ী গির্জ্জায় চলেচেন উপাসনা করতে। পথের উপর চলতে চলতে তাঁরা দেখলেন, একটী বিদেশী ছেলে সেই পথের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। তার এক হাতে একখানি এক-পয়সা দামের রুটি। দুই বগলে আরও দু'খানা। শ্রমজীবিদের মতো মলিন তার পোষাক—দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে সেগুলি ধুলি-ধূসরিত ও জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে। ছেলেটীর দুই চোখ শ্রান্তিতে অবসন্ন—নিদ্রাতুর!

নগরের ভদ্র অধিবাসীদের দেখে ছেলেটি থম্‌কে দাঁড়ালো তারপর তাদের অনুসরণ ক'রে গির্জ্জায় এসে উপস্থিত হ'ল এবং সেইখানেই এক নিভৃত স্থানে তার শ্রান্ত দেহ মেলে দিয়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়ল।

বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিনের মূর্ত্তি·
ওয়াটার বেরি, কনেক্টিকট্, আমেরিকার যুক্ত রাজ্য

ফিলাডেলফিয়া এখন আমেরিকার মধ্যে তৃতীয় প্রধান শহর। কিন্তু বেনজামিন ফ্র্যাঙ্ক্লিন্ যেদিন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে সেই শহরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন ফিলাডেলফিয়া ছিল, যাকে বলে,—অজ পাড়াগাঁ। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে সেখানে তখন বাড়ী তৈরী হ'ত। খবরের কাগজের নাম পর্য্যন্ত সে দেশের লোক তখন জানতো না। বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের চোখের সুমুখে এই গ্রাম একদিন দেশের অন্যতম প্রধান শহরে পরিণত হ'ল; তিপ্পান্ন বছর পরে এই গ্রামেরই একজন প্রধান নাগরিক হিসাবে বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন আমেরিকা-যুক্ত রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে তার স্বাধীনতা ঘোষণার দলিল রচনা করেছিলেন।

বেনজামিন ফ্র্যাঙ্ক্লিনের মতো বহুমুখী প্রতিভা আকাশের বুকে কচিৎ দৃষ্ট গ্রহ-তারকার মতো! সচরাচর চোখে পড়ে না। তাঁর সদা-সক্রিয় মনের অন্তর্দৃষ্টি ছিল যেমন গভীর তেমনি বিশাল। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব নব চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়ে তিনি মানব সমাজের কত যে কল্যাণ সাধন করেছেন তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। অপরিমেয় তাঁর দান। অপরিশোধ্য তাঁর ঋণ।

দুই

সরল জীবনের উচ্চ আদর্শ নামে যে ইংরাজি প্রবাদ-বাক্যটি আছে, বেনজামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনে সেই কথাটি যেন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সামান্য সাবান এবং মোমের বাতি প্রস্তুতকারক। বেনজামিনের প্রথম কাজ ছিল, তাঁর পিতাকে সেই কাজে সাহায্য করা। একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যতীত অন্য সব বাহুল্যকে বর্জ্জন ক'রে যদিও বেনজামিন নিজের

৭ ক্র্যাভেন ষ্ট্রীট—ইংলণ্ডে বেঞ্জামিনের বাসভবন
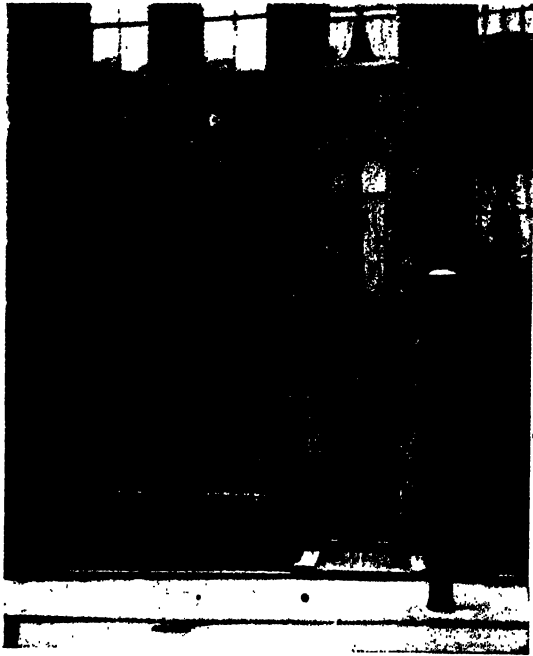
জীবনকে অনাড়ম্বর সরল পথে চালিত করেছিলেন তবুও তাঁর জীবন কোনদিন বৈরাগ্যের কঠোরতা লাভ করে নি। বৈরাগ্য সাধনার মধ্যে তিনি মানুষের মুক্তি কামনা করেন নি। মানুষকে তিনি অতিশয় ভালবাসতেন। মানুষের সঙ্গ, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায়, আচার-ব্যবহারে তাঁর অন্তরের সুমধুর প্রকৃতির, রসবোধ এবং রহস্য-প্রিয়তার পরিচয় অনুক্ষণ ফুটে উঠ্‌তো। ১৭২৫ সালে অতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম ক'রে (তখনকার দিনে অটলান্টিক পার হওয়া রীতিমত দুঃসাহসের কাজ ছিল) লণ্ডন শহরে তিনি এক ছাপাখানায় কাজ আরম্ভ করেছিলেন। সেই সময় থাকতেন তিনি এক বৃদ্ধার কাছে। খরচ বাবদ তাঁকে দিতেন সপ্তাহে তিন সিলিঙ্ ছ'পেনস্। কিছুদিন বাদে বেনজামিন খবর পেলেন তাঁর কর্ম্মস্থলের নিকটবর্ত্তী একটি বাসা আছে এবং সেটি সাপ্তাহিক দু'সিলিঙে পাওয়া যেতে পারে। বেনজামিন চিরদিন অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। সম্বাদ পেয়ে, তিনি বাসা বদল করবার সঙ্কল্প করলেন। সপ্তাহে এক সিলিং ছ'পেন্স বাঁচবে! মাসে, ছ'সিলিং! বছরে…! কিন্তু তাঁর গৃহস্বামিনী তাঁকে এত পছন্দ করতেন এবং তাঁর সঙ্গ ও আলাপ আলোচনা এত ভালবাসতেন যে তিনি তাঁর ভাড়া কমিয়ে বেনজামিনকে তাঁর বাড়ীতেই রাখলেন।

বেনজামিন কখনো সুরা বা ঐ জাতীয় কোন মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন নি। তিনি যখন ছাপাখানায় কাজ করতেন তখন তাঁর সহকর্ম্মীরা রসিকতা ক'রে তাঁকে Water-American ব'লে অভিহিত করত। তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে বিশেষ কৌতূহলের বস্তু ব'লে মনে করত। ছাপাখানায় কাজ করে, অথচ মদ খায় না—অদ্ভুত লোক! বেনজামিন দেখতেন, দিনের মধ্যে তাদের প্রত্যেকে, ছেলে-বুড়ো নির্ব্বিশেষে, অন্তত ছ'পাট ক'রে বীয়ার পান করছে। তারা তাঁকে বলত, কাজে শক্তি বাড়াবার জন্যেই তারা বীয়ার খায়। নেশার জন্যে নয়। বেনজামিন তাদের যুক্তি শুনে দুঃখিত হতেন। বারবার তাদের বোঝাতে চাইতেন যে, তিনি জীবনে এক গণ্ডুষ বীয়ারও পান করেন নি, কিন্তু ছাপাখানার মধ্যে দৈহিক শক্তিতে তিনি কারুর চেয়ে কম নন—তাদের যুক্তি নিতান্তই অর্থহীন! তারা তাঁর কথা শুনে মনে মনে হাসতো। প্রকাশ্যে বিশেষ প্রতিবাদ করত না।

জীবনে সুনীতির আদর্শকে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করলেও বেনজামিন বড় কম আমোদ-প্রিয় ছিলেন না! বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাসি-তামাসা প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি মুক্ত অন্তরে যোগ

দিতেন। একবার এক বিচিত্র উপায়ে তিনি সঙ্গীদের প্রচুর আনন্দ দান করেছিলেন। বোষ্টনে থাকার সময় তিনি সাঁতার দিতে শিখেছিলেন। একদিন এক বন্ধুদের দলের সঙ্গে তিনি নৌকাযোগে চেল্‌সীয়া গিয়েছিলেন। জলপথেই প্রত্যাবর্ত্তন করা হচ্ছিল। সেই সময় তিনি দেহের সমুদয় বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বহুদূর পর্য্যন্ত নৌকার পাশে সাঁতার কেটে এসেছিলেন। সাঁতার দেবার সময় এমন সব সুন্দর সুন্দর হাত পায়ের
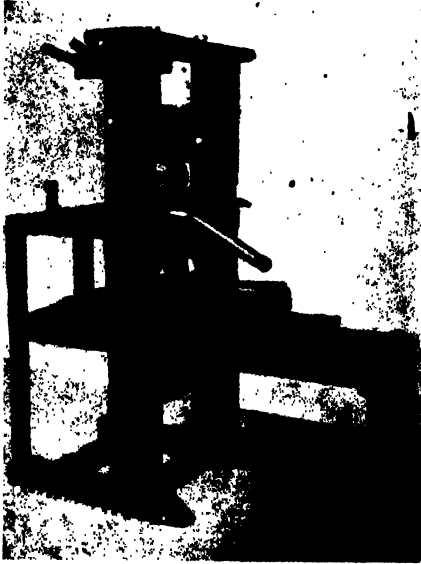
ওয়াট্‌সের ছাপাখানায় কাজ করিবার সময়ে বেঞ্জামিন
এই মুদ্রাযন্ত্রটি ব্যবহার করিতেন বলিয়া অনুমান হয়

ভঙ্গী দেখিয়েছিলেন, যা দর্শকবৃন্দ আগে কখনো দেখেনি। সুদক্ষ সাঁতারু হিসাবে বিলাতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিন

আমেরিকার সংবাদ-পত্র জগতের একজন অগ্রণী পথিক-রূপে বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের নাম চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। ১৭৩০ সালে ফিলাডেলফিয়া নগরে তিনি নিজে মুদ্রাকরের ব্যবসা সুরু করেন। শিক্ষানবীশ রূপে তিনি New England Courant নামক সংবাদ-পত্রের কাজ দেখা শোনা করতেন। ঐ কাগজখানি ছিল সারা আমেরিকার মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রিত সংবাদ-পত্র! তাঁর আগে মাত্র একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। New England Courant এর মালিক ছিল তাঁর বৈমাত্র ভাই—জেম্‌স্। জেমস্‌কে অনেক বন্ধুরা উক্ত কাগজখানি বন্ধ করে দিতে পরামর্শ দিয়েছিল। তারা বলত—আমেরিকায় ইতিমধ্যেই একখানি সংবাদ পত্র বেরুচ্ছে; এবং দেশের পক্ষে ঐ একখানি পত্রিকাই যথেষ্ট; নতুন কোন কাগজ প্রকাশ না করাই যুক্তিসিদ্ধ। তাতে লোকসান হবার সম্ভাবনা আছে। বেনজামিন পরবর্ত্তী জীবনে সকৌতুকে এই গল্পটি বন্ধুদের কাছে বলতেন।

কিছুদিন পরে তিনি নিজে Penusylvania Gazette নাম দিয়ে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। অধুনা কাগজখানির নাম গেছে বদলে। Saturday Evening Post নামে উক্ত পত্রিকাখানি আজো পৃথিবীর মধ্যে একখানি উচ্চ শ্রেণীর সংবাদ-পত্র ব'লে বিবেচিত হয়।

সংবাদ পত্রখানির প্রথম অবস্থায় বেনজামিন একান্ত অনাড়ম্বর ভাবে তার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতেন। কপি কম্পোজ করা, জমাদারের কাজ এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা—এ সমস্তই করতেন একক তিনি! তাছাড়া তার অন্য কাজও ছিল, যথা, কাঠের টাইপ তৈরী করা, ব্লক প্রস্তুত করা, ইত্যাদি। গভর্ণমেণ্ট যখন কাগজের মুদ্রার প্রচলন করতে চাইলেন তখন বেনজামিন-ই সর্ব্বপ্রথম তামার পাতের সাহায্যে ছাপার কাজ ক'রে সাফল্য অর্জ্জন করেন।

সেই সময় বেনজামিন ফ্র্যাঙ্ক্‌লিন একটি মনিহারী দোকান করেছিলেন—ছোট্ট দোকান, সামান্য পুঁজি। ঐ দোকানখানি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। তাঁর চরিত্রের মধ্যে কোন অসার গর্ব্ব বা দাম্ভিকতার ছোঁয়াচ্ ছিল না। যখন প্রেসে শিক্ষানবিশীর কাজ করেছেন সেই সময় তিনি একটি বহু আলোচিত সাময়িক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তারপর সেটিকে নিজে ছাপিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে, যেমন ক'রে হকার কাগজ বিক্রি করে তেমনি ক'রে, কবিতাটি বিক্রয় করেছিলেন।

চার

স্ত্রী-ও স্বামীর মতোই কম খরচে কাজ চালাতে জানতেন। তিনি মনিহারি দোকানটি দেখা শোনা করতেন এবং তারই সঙ্গে অসাধারণ পারদর্শিতার সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্র সংসারটি চালনা করতেন। বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে কোনদিন সেদিকে মাথা ঘামাতে হয়নি। বেনজামিনের আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে না ছিল বাহুল্য, না আড়ম্বর ;—দুধ এবং রুটি। প্রত্যহ। এই দুধ রুটি একটি

"The Water American"
এই নামে বেঞ্জামিন্ তাঁহার মুদ্রাকর বন্ধুদের নিকট পরিচিত ছিলেন

মাটির পাত্রে তাঁকে পরিবেশন করা হ'ত। একখানি দস্তার চামচ্ সহযোগে তিনি তা পরম পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করতেন। বহুদিন পরে, তখন বেনজামিন ফ্র্যাঙ্ক্লিনের নাম পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে, একদিন এই ভোজন-ব্যবস্থার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হয়েছিল। পরিবর্ত্তন দেখে বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন যেন বজ্রাহত হয়েছিলেন—সেই নতুন ব্যবস্থা নাকি "অসম্ভব ব্যয় বাহুল্যের কারণ হয়েছিল, যা বেনজামিন কল্পনা করতেও দ্বিধা বোধ করেন!" ব্যাপারটি এমন কিছুই নয়—স্ত্রী-স্বামীর জন্যে একটি চীনামাটির ভোজ্যপাত্র এবং একটি রূপার চামচ্ ক্রয় করেছিলেন, এই তাঁর অপরাধ !!

তখন কিন্তু তেমনি তরো হাজারটি রূপার চামচ্ অনায়াসে ক্রয় করবার মতো বিত্ত বেনজামিনের সঞ্চিত হয়েছে—তাঁর ব্যবসাগুলি তখন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করছে!

বেনজামিন বলতেন, চিরদিন তিনি সামান্য ব্যয়ে, বিলাস-বাসনা-বর্জ্জিত সরল ভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন ব'লেই কখনো তাঁকে অর্থ চিন্তায় মগ্ন থাকতে হয়নি; এবং তা হয়নি ব'লেই তিনি জীবনের অন্য নানাদিকে মস্তিষ্ক চালনা করবার অবকাশ পেয়েছেন।

বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন সারাজীবন ধ'রে লোকের হিতসাধনে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। যে সমাজের মধ্যে তিনি বাস করতেন, কেমন ক'রে তার উন্নতি সাধন করা যায়, কেমন ক'রে এই পৃথিবীর বন্ধুর যাত্রাপথে মানুষের চলার পথ সুগম করা যায়—তারই চিন্তায় তাঁর পরবর্ত্তী জীবন নিবেদিত হ'য়েছিল। লোক সমাজের এত বড় একজন কল্যাণ কামী বন্ধু জগতে খুব বেশী জন্মগ্রহণ করেন নি। মানুষের প্রতি এই প্রীতি তাঁকে মানুষের মনে অমর ক'রে রেখেছে।

ব্যবসায়ে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করলেন বিজ্ঞানের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। কিন্তু যুবা বয়স থেকেই দেশের কাজে তিনি বিশেষ ভাবে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাই এখন ইচ্ছা সত্ত্বেও বিজ্ঞান-চর্চ্চার উপযুক্ত অবসর লাভ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো—দিন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময়েই তাঁকে সাধারণের কাজে আবদ্ধ থাকতে হ'ত। দেশের লোক তাঁকে একজন বিজ্ঞ সুধী এবং কার্য্যক্ষম ব্যক্তি রূপে ভক্তি করত। পেন্‌সিল ভেনিয়া শহরে কোন দেশের বা দশের কাজ তাঁর পরামর্শ ভিন্ন অনুষ্ঠিত হ'ত না।

সাধারণের কাজে বেনজামিন শুধু পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন না—তাদের সঙ্গে এক যোগে কাজও করতেন। নিজের পল্লী, সম্প্রদায় বা দেশের মঙ্গলের জন্যে তিনি

কোন আপাত ছোট. কাজ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। আমাদের দেশের যে মহাত্মা আজ সারা জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন, বহু বৎসর পূর্ব্বেকার আমেরিকা-বাসী বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়।

বর্ষাকালে বাড়ীর সুমুখে পথের উপর হাঁটুভোর জল এবং সেই রকম কাদা জমেছে—বেনজামিন নিজের

স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব করিবার জন্য পাঁচজন সদস্যের সমিতি
টমাস্ জেফারসন্, জন আডামস্, বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্ক্লিন্, রবার্ট লিভিংষ্টন্ ও রবার্ট শুরম্যান

দরজার সুমুখের অনেকখানি স্থান স্বহস্তে পরিষ্কার করলেন। তারপর আশেপাশের প্রতিবেশীকে ডেকে তাদেরও তেমনি ক'রে নিজেদের বাড়ীর সুমুখের পথ পরিষ্কার করতে বললেন। এমনি ক'রে তাঁর পল্লীর সমস্ত পথটি জল-কাদা মুক্ত হ'য়ে সুগম হ'ল।

তখনকার দিনে শহরে ময়লা ফেলা গাড়ী ব'লে কোন বস্তু ছিল না। রাস্তাঘাটের ঝাড়ুদারও না। বেনজামিন খখরচে লোক নিযুক্ত ক'রে সেই কাজ করালেন এবং নগরবাসীদের তার উপকারিতা বুঝিয়ে দিলেন। ক্রমে বিধিবদ্ধ উপায়ে নগর পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হ'ল।

এমনি কোরে, বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন পেন্সিলভেনিয়া শহরে প্রথম শহর কতোয়ালির ব্যবস্থা করলেন। আমেরিকার মধ্যে প্রথম সাধারণ গ্রন্থ পাঠালয় তাঁর সৃষ্টি। প্রথম হাঁসপাতাল তাঁর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার 'ফায়ার ব্রিগেড্' তাঁরই কীর্ত্তি!

তারপর তিনি শহরের মধ্যে সৈন্য বিভাগ তৈরী করবার জন্য চেষ্টিত হলেন। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শহরে স্বদেশরক্ষী সৈন্যদল স্থাপিত হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক থেকে বহু সাধ্য-সাধনার পর আঠারোটি কামান আনা হ'ল এবং জনসাধারণের কাছে লটারী ক'রে টাকা তুলে এক ছোট দুর্গ প্রস্তুত করা হল। দুর্গ প্রস্তুত হবার পর বেনজামিন ফ্র্যাঙ্ক্লিন সৈন্যদলের মধ্যে একজন সাধারণ সেনানী রূপে তাঁর প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যপালন করতে লাগলেন!

পাঁচ

জীবনের এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ফ্র্যাঙ্ক্লিন্ শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বিজ্ঞানসাধনার কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করতে অক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাশীল মনের তীক্ষ্ণ একাগ্র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জীবনের নানা বিষয়ে কয়েকটি বিস্ময়কর আবিষ্কার ক'রে জগতের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ঘুড়ী এবং ঐজাতীয় অন্যান্য ব্যোমপথে উড্ডীন-ক্ষম বস্তুর সাহায্যে তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে বিদ্যুৎ এবং ইলেক্ট্রিসিটি উভয়ে অভিন্ন—দুটি জিনিষের স্বরূপ এক। এই সূত্রে তিনি অট্টালিকার,ছাদের উপর অধুনা ব্যবহৃত বাজ-কাঠি বা বিদ্যুত কাঠি (Lightning Rod) আবিষ্কার করেন। উক্ত বাজ-কাঠি এখন লোকসমাজে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর বস্তু।

রঙ সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে তাঁর ধারণা হয়

যে কতকগুলি রঙ উত্তাপ প্রতিফলিত করে; অন্য কয়েকটি রঙ উত্তাপ শোষণ করে। তাঁর ধারণা পরীক্ষা করবার জন্যে একদিন তিনি বিভিন্ন রঙের কয়েক টুক্‌রা কাপড় বরফের উপর স্থাপন করলেন,—বরফের উপর তখন খুব রৌদ্র এসে পড়েছে। কিছুক্ষণ পরে রঙীন কাপড়গুলি তুলে বরফের উপরকার সেই সেই স্থানগুলি পরীক্ষা করে তিনি দেখ্‌লেন—কালো রঙের নীচেকার বরফ সব চেয়ে বেশী গ'লেছে। নীলের নীচে অপেক্ষাকৃত অল্প। অন্যান্য হাল্‌কা রঙের নীচে আরও কম। শাদা কাপড়ের নীচেকার বরফ যেমন ছিল, তেমনি আছে।

বেঞ্জামিনের সমাধি—ক্রাইষ্ট চর্চ, ফিলাডেলফিয়া

এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, শাদা রঙ সূর্য্যকিরণের উত্তাপ নিজের মধ্যে গ্রহণ না ক'রে তাকে প্রতিফলিত করেছে এবং কালো রঙ সেই উত্তাপকে নিজের মধ্যে শোষণ করেছে। সুতরাং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কালো বা নীল কাপড়ের পরিচ্ছদ অপেক্ষা শাদা বা অন্যান্য হাল্কা রঙের পরিচ্ছদ অধিকতর আরামপ্রদ হবে।

পিপীলিকাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ ক'রে তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মায় যে, তারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে ভাব এবং সংবাদের আদান-প্রদান করে। মনের ধারণা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি ভারী একটি মজার উপায় অবলম্বন করলেন।—একটি মিষ্টরস পূর্ণ পাত্র সহজ-গম্য স্থানে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বহুসংখ্যক পিপীলিকা সেই পাত্রটির কাছে জড় হল। তখন তিনি সেই পাত্রটিকে দড়ির সাহায্যে কড়িকাঠের সঙ্গে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখলেন এবং সমস্ত পিপীলিকাগুলিকে আবদ্ধ ক'রে রেখে মাত্র একটিকে মুক্ত ক'রে দিলেন। সেই পিপীলিকাটি দড়ি বেয়ে কড়ি কাঠের উপর দিয়ে তার বাসায় ফিরে গেল। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখা গেল কড়িকাঠের উপর দিয়ে দড়ির গায়ে এবং পাত্রের মধ্যে অগণ্য পিপীলিকার শোভা যাত্রা চলেছে। এই থেকে ফ্রাঙ্কলিন সিদ্ধান্ত করলেন, অত অল্প সময়ের মধ্যে অতগুলি পিপীলিকা দুর্গম স্থানের ঐ রসপাত্রটির সন্ধান কিছুতেই পেত না, যদি না ক্ষণকাল পূর্ব্বেকার সেই মুক্ত পিপীলিকাটি দলের মধ্যে সংবাদ দান করত!

বিক্ষুব্ধ জলরাশির উপরে উপযুক্ত পরিমাণে তৈল প্রয়োগ ক'রে সেই জলরাশিকে যে শান্ত করা যায়—এ-কথাও বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন-ই আমাদের প্রথম শুনিয়েছেন।

টীকার দ্বারা যে বসন্ত রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়—এ ধারণা তাঁর মধ্যেই উদিত হয়। টীকা আবিষ্কার করেন ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার, ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে। ১৭৩৬ সালে যখন ফ্র্যাঙ্কলিনের এক পুত্র বসন্ত রোগে মারা যায় তখন তিনি বলেছিলেন—"যদি বসন্তের আগেই রোগের বিষ তার দেহে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারতাম, তা'হলে হয়ত সে মারা যেত না।"

সর্ব্বসময় লোকসমাজের কল্যাণের জন্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেও বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন নিজের আত্মোন্নতির প্রতি সর্ব্বদা সজাগ থাকতেন। স্বরচিত জীবন-কাহিনীতে তিনি একস্থানে বলেছেন যে, তাঁর আত্মা নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করবার জন্যে সকল সময়েই উদ্গ্রীব থাকতো। কখনো, কোন অবস্থাতেই তিনি কোন মন্দ কাজ করবেন না—এই ছিল তাঁর ব্রত।

একটি নোট-বই-এর মধ্যে তিনি তাঁর কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতেন।

এই তীক্ষ্ণ-ধী মনস্বীর অন্তরের অনুসন্ধিৎসা ছিল দুর্নিবার। কর্ম্মশক্তি ছিল অফুরন্ত। মানুষের কল্যাণ কামনার যে দৃষ্টান্ত তিনি জগতের কাছে রেখে গেছেন, অপাপবিদ্ধ জীবনের স্বর্গীয় মহিমায় সে-দৃষ্টান্ত সমুজ্জ্বল। এমন একটি মহাপ্রাণ পুরুষের আবির্ভাব যে-কোন দেশের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করে।

বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এ পৃথিবীতে এসেছিলেন, ১৭০৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী। ১৭৯০ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে তিনি আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু এবং দেশের কাছ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর স্বদেশবাসী আজো বৎসরের ওই দুটী দিনের কথা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করে। চিরদিন করবে।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তুমি এস মোর মাঝে

আবদুল গফ্ফার চৌধুরী

আমারে ঘিরিয়া থেকো চির-নিশিদিন,
আমার সকল কাজে সব অবসরে
আড়াল করিয়া তুমি থেকো দুটী করে;
বেঁধে লও তব সুরে এ জীবন-বীণ্।
নীরবে হৃদয়ে বসি মোর ক'টী গান
শুনিয়ো কেবল তুমি ওগো মোর প্রিয়,
একা শুধু তুমি মোর ভালবাসা নিয়ো;
আমার যতেক গীতি করিয়ো মহান্।

এসো তুমি মোর মাঝে নব নব রূপে
দিয়ো প্রিয় বলি মোরে তব মহাযূপে,
তব রূপে অন্ধ কর মোর দু'নয়ন,
ঢেলে দাও কর্ণে মোর তোমারি বচন।
এসো হে অরুণালোকে গোধূলি বেলায়
নীরবে চরণ ফেলি জীবন ভেলায়।

সমর্পণ

আবদুল গফ্ফার চৌধুরী

সকল স্বপন মোর ভেঙে কর চুর
এ কী খেলা খেল তুমি ওগো নিরমম?
লাথি মেরে চূর্ণ কর হৃদি বীণা মম
বাজাতে কি আরো কোনো গীতি সুমধুর?
যেদিকে বাড়াই বাহু আলোর আশায়
ঠেলে তুমি দাও ফেলে অন্ধকার পথে,
এ কি বন্ধু তুলে নিতে তব আলো রথে
ঠাঁই দিতে মোরে তব মহা-হৃদি ছায়?

চালাও আমারে যথা চাহে তব মনে,
জানি তব মহা ইচ্ছা আছে তারি সনে
ফেলিবেনা অন্ধকারে দেখাবে আলোক;
অমর জ্যোতিঃতে দীপ্ত হ'বে দুটী চোখ।
এ হৃদয়-ক্ষতে জানি রাখিবে ও হাত
মুছে যাবে আঁখি প্রাতে সকল আঘাত।

সাঁতার

শ্রীশান্তি পাল

সাঁতার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় সাঁতারের চর্চ্চা মোটেই ছিল না—একথা বলিলে ভুল বলা হয়। ঐ সঙ্ঘ গঠনের বহু পূর্ব্বে আমরা নিয়মিত রূপে প্রত্যহ গঙ্গায় সাঁতার দিতাম। আমাদের দল জোড়াসাঁকোর কতকগুলি তরুণ সাঁতারুদের সহিত মিলিত হইয়া ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া সাঁতার চর্চ্চা করিত। মোট কথা তখনকার দিনে নানাপ্রকারের এত কৌশল ছিল না বটে, কিন্তু গঙ্গাতীরের অধিবাসী দিগের মধ্যে অনেকেই অল্পবিস্তর সাঁতার জানিতেন বা সাঁতারের চর্চ্চা করিতেন। জলের সহজ প্রাপ্যতা বশত পল্লীগ্রামের ছেলেরা সাঁতার কাটিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়া থাকেন, এমনকি পল্লীগ্রামের মহিলা দিগের মধ্যেও অনেকেই বড় বড় দীঘি সাঁতার দিয়া পারাপার হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব সন্তরণ আমাদের পৈতৃক এবং জাতিগত বিদ্যা। বাঙলা দেশে জলের অভাব নাই, চতুর্দ্দিকে খাল, বিল, নদী ও পুষ্করিণীতে পরিপূর্ণ।

শ্রীশান্তি পাল

আধুনিক সাঁতারের সহিত পূর্ব্বেকার সাঁতারের তুলনা করিলে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে দাঁড়-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার ও ডুব-সাঁতারের বেশী প্রচলন ছিল। দাঁড়-সাঁতারে দুহাত তুলিয়া বা এক হাতে ছাতা মাথায় দিয়া এবং অন্য হাতে দাঁত মাজিতে মাজিতে গঙ্গার মাঝখানে বা অপর পারে যাওয়া তখনকার দিনে যথেষ্ট সম্মান-জনক বলিয়া বিবেচিত হইত। আমার পিতাঠাকুর স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র পাল তখনকার দিনে একজন বিখ্যাত সাঁতারু ছিলেন। এক সময়ে তিনি ইয়োরোপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তিনি খরস্রোতা টেম্‌স্‌ নদী সোজাসুজি পার হইয়াছিলেন এবং ভারতীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম "ইংলিস প্রণালীতে পঁচিশ মাইল সাঁতার দিতে সাহস করেন।" তাঁহাকে দুটি বড় বড় পিতলের ঘড়া জলে পূর্ণ করিয়া গঙ্গার মাঝখান হইতে আনিতে দেখিয়াছি। রায় বাহাদুর রসময় মিত্র, অভয় চরণ পাল ইঁহারাও বড় সাঁতারু ছিলেন; বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ছুটীতে বা পূজা পার্ব্বণে প্রায় গঙ্গায় সাঁতার দিতেন। তখনকার দিনে ডুব-সাঁতারেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ডুবিয়া কে কত দূর যাইতে পারে তাহার প্রতিযোগিতা প্রায়ই আমাদের ভিতর হইত।

চিৎ ও দাঁড়-সাঁতারের প্রচলন আজকাল আর কলিকাতায় প্রায় নাই বলিলেই চলে। চিৎ-সাঁতার এখন একটা উচ্চ অঙ্গের সাঁতারের মধ্যে পরিগণিত নয়—অবশ্য বড় বড় সাঁতারুদের মনের এইরূপ ধারণা। তাঁহারা এই চিৎ-সাঁতারবাজদের অত্যন্ত হীন বলিয়া বিবেচনা করেন। আজকালকার দিনে যদিও প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেক প্রতিযোগিতার তালিকার মধ্যে একটী করিয়া ১১০ গজ চিৎ-সাঁতারের পাল্লা থাকে বটে কিন্তু তাহাতে

অনেকেই তাচ্ছিল্যের সহিত নাম দেন না। কিন্তু ঐ সাঁতারের যথেষ্ট উপকারিতা আছে। চিৎ-সাঁতারের কৌশলের দ্বারা জলনিমজ্জিত ব্যক্তিকে যেমন করিয়া কিনারায় আনিবার সুবিধা হয়—তেমনটি অন্য কোন সাঁতারে হয় না। মনে পড়ে ১৯২০ সালে, নভেম্বর মাসে রথতলা ঘাটের সম্মুখে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য, নিবারণ বাবু, ঐ চিৎ-সাঁতারের কৌশলে ভাগরথীর মধ্যস্থলে নিমজ্জমানা একটী যুবতীকে সলিল-সমাধির করাল গ্রাস হইতে অদ্ভুতভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

আজ-কালকার সাঁতারের পরিকল্পনা কিন্তু অন্য রকমের; এখনকার দিনে যিনি যত দ্রুত সাঁতার কাটিয়া যাইতে পারেন তিনি তত বড় সাঁতারু বলিয়া বিবেচিত ও সম্মানিত হন। এই শ্রেণীর সাঁতারুরা দ্রুত-গমন সাঁতার ভিন্ন অন্য ধরণের সাঁতার কৃতিত্বের সহিত কাটিতে পারেন না বা কাটিতে চেষ্টাও করেন না। তার প্রধান কারণ তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার লাভ করা। অনেক বড় বড় নামজাদা সাঁতারু দেখিয়াছি যাঁহারা জল হইতে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে আদৌ সাহস করেন না। রক্ষা করা ত দূরের কথা, ঘটনাস্থল হইতে গা ঢাকা দিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া দাঁড়ান।

তখনকার দিনে "পাড়ি" ছিল না, একথা বলা চলে না। সাধারণতঃ আমরা জলে কান পাতিয়া এক হাতে সাঁতার কাটিতাম, এই ধরণের সাঁতারকে আমরা "কান প্যাড়" বলিতাম, অর্থাৎ এখন যেটা—"ওয়ান হ্যাণ্ড ষ্ট্রোক বা সাইড ষ্ট্রোক" বলিয়া পরিচিত। দ্রুত যাইবার জন্য আমরা কখন কখন দুটি হাতই ব্যবহার করিতাম। এই ধরণের সাঁতারকে "পাড়ি" বলিতাম, অর্থাৎ এখন যাকে ডবল ওভার আর্ম বলি। কখনও দুই হাত জলের মধ্যে রাখিয়া, পাস ফিরিয়া, কাঁধে ধাক্কা দিয়া আর কখনও বা কান পাতিয়া এক হাতে টানিয়া, কখনও বা মুখ সামনে রাখিয়া দুহাতে টানিয়া গঙ্গা পারাপার হইতাম।

এখনকার দিনে "পাড়ি"র এত উন্নতি হইয়াছে যে আমরা ৩০।৪০ মাইল পথ মুহূর্ত্তের জন্য হাত বন্ধ না করিয়া দুই হাতে টানিয়া অর্থাৎ "পাড়ি" দিয়া সাঁতার দিতে কষ্ট বোধ করি না। আহিরীটোলা ও বাগবাজারের ছেলেরাই একার্য্যে পথ প্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য তার প্রধান কারণ, তাদের জলের নিকটেই বাস, যে স্থানে স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটা হয় সে স্থানেই অল্প বিস্তর "পাড়ি"রও ব্যবহার আছে। আহিরীটোলা ও বাগবাজারের ছেলেদের মধ্যে বাজি রাখিয়া কে কত অল্প সময়ের মধ্যে গঙ্গা পার হইতে পারে বা গঙ্গাবক্ষস্থ ভাসমান বয়ার তলদেশ হইতে মাটি তুলিতে পারে, এরূপ সাহসের কার্য্য প্রায়ই দেখিতাম। পল্লীগ্রামের ছেলেদের মধ্যে ডুব-সাঁতারে পুষ্করিণী পার হওয়া বা পুষ্করিণীর তলদেশ হইতে মাটি তোলা, জলক্রিয়ার একটি অঙ্গ বিশেষ। মোট কথা সে কালের সাঁতারুদের ভিতর এমন একটা শক্তি বা ক্ষমতা ছিল যাহার দ্বারা অনেক সময়ে অনেক স্থলে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে সলিল-সমাধির গ্রাস হইতে অনায়াসেই উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সে শক্তির অনেকটাই হারাইয়াছি এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতার পরিচয়ও দিয়াছি। সন্তরণ সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা তালিকার মধ্যে চিৎ সাঁতার জীবন-রক্ষা প্রণালী ও দাঁড়-সাঁতারের পাল্লা নিবদ্ধ করিয়া ঐ সকল বিষয়ে সাঁতারুদের বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিতে সচেষ্ট হন।

পূর্ব্বে মধ্য কলিকাতায় সাঁতার চর্চ্চা করিবার বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না। সাঁতার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে "ওয়াই-এম-সি-এর" গ্রে সাহেব ও প্রফুল্ল বিশ্বাস মহাশয় প্রভৃতির উদ্যোগে ঐ সমিতির কতকগুলি সভ্য মিলিয়া সার্কুলার রোডে মহারাজ কাশিম বাজারের বাটীর ভিতরস্থিত পুষ্করিণীতে প্রথম সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করেন। উঁহাদের মধ্যে একজনের জলে মৃত্যু হওয়ায় ফলে কিছুকাল সাঁতার কাটা বন্ধ থাকে। ১৯১২ সালে ১৯শে নভেম্বর শিবপুর কলেজঘাটে একটা ভীষণ নৌকা-

ডুবি হইয়া বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হন। ওয়াই,-এম,-সি; এ-র সভ্যদের মধ্যে সতীশ বন্দোপাধ্যায় অরবিন্দনাথ সেন, রমণীমোহন গুপ্ত, প্রকাশচন্দ্র মিত্র, অমলকুমার গুপ্ত, পি সীতারাম শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কয়েকটি যুবক নিমজ্জিত ব্যক্তিদের উদ্ধার সাধন করিতে গিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। তাঁহাদের নামগুলি পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে গ্রে সাহেব ও রায় বাহাদুর হরিধন দত্ত প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া "ষ্টুডেন্টস হ'লে" একটী সাধারণ সভা করেন এবং কলিকাতায় সাঁতারের আবশ্যকতা ও উপকারিতা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন এবং একটী "এ্যাসেসিয়েসন"ও গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠান কার্য্যে ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার, রাজা হৃষীকেশ লাহা, রায় বাহাদুর রাধাচরণ পাল, সার রাজেন্দ্র মুখার্জী, পিকফোর্ড, উইলসন ও ওট সাহেব প্রমুখ সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সাহায্যে ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে "কলিকাতা সুইমিং এ্যাসোসিয়েসন" নামে সর্ব্বসাধারণের ভিতর সাঁতার শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য একটী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূতপূর্ব্ব "চেয়ারম্যান" ম্যাডক্স সাহেবও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

এই এ্যাসোসিয়েসন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি "বাথ" নির্ম্মাণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই "বাথের" নক্সা মার্টিন কোং করেন এবং গঠন কার্য্যে ৮০,০০০৲ মুদ্রা ব্যয় হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। অবশেষে ১৯১৩ সালে উক্ত সঙ্ঘ গোলদীঘিতে প্রথম সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ঐ সালে ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাব, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মেট্রোপলিটন, মোহন বাগান আহিরীটোলা প্রভৃতি অনেক ক্লাবই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। বাঙ্গালী সাঁতারুদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিবারণ দে, উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শৈলেন বসু, অগ্নিকুমার সেন, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু সন্তরণ সমিতির আবির্ভাব হয়। আহিরীটোলা, বাগবাজার, কলেজ স্কোয়ার ক্রেগুস পোলো—পরে সেণ্ট্রাল সুইমিং ওয়াই-এম-সি-এ, পদ্মপুকুর, খিদিরপুর ক্লাব শ্মশানেশ্বর, আনন্দ, হাটখোলা প্রভৃতি সমিতির অস্তিত্ব আজও পর্য্যন্ত বজায় আছে; কিন্তু গত বৎসর হইতে এ্যাসোসিয়েসনের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইতেছি না, ইহার কারণ কি?

গঙ্গা বক্ষে দীর্ঘ বা দূরপাল্লার সাঁতারের প্রথম প্রচেষ্টা আহিরীটোলায় হয়। ১৯২২ সালে মে মাসে আহিরীটোলা সুইমিং ক্লাবের উদ্‌যোগে প্রথম সাত মাইল—উত্তর পাড়া হইতে মাণিক বোসের ঘাট পর্য্যন্ত—সাঁতারের প্রতিযোগিতা হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সালে আগষ্ট মাসে আহিরীটোলা ক্লাব (আহিরীটোলা সুইমিং নয়) ১৩ মাইল সাঁতারের আয়োজন করেন। এ প্রতিযোগিতায় আশুবাবু প্রথম স্থান অধিকার করেন। পুনরায় ইহাঁদের দেখাদেখি সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় জীবন রক্ষা সমিতির সভ্যেরা ২২ মাইল সাঁতারের আয়োজন করিয়াছিলেন। চন্দননগর হইতে আহিরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত সীমা নির্দ্দেশ হয়। এই প্রতিযোগিতায় বাগবাজার ক্লাবের সভ্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু ও সেণ্ট্রাল ক্লাবের সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের মধ্যে প্রথম স্থান লইয়া একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। বিচারকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সতীশবাবুর পক্ষ এবং কেহ কেহ ধীরেন বাবুর পক্ষ অবলম্বন করেন। ফলে অনেক তর্ক বিতর্কের পর ধীরেনবাবু জয়ী হন। এই সাঁতারের প্রতিযোগিতার দিনে দুটি ভীষণ দুর্ঘটনা হয়। প্রথমটি শ্যামনগরের নিকট মোটর বোট ডুবিয়া ডাঃ চাটার্জ্জীর মৃত্যু এবং অপরটী আহিরীটোলা ঘাটের জেটি ভাঙ্গায় তাহার চাপে বহু লোকের প্রাণ বিয়োগ। ১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসে আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যেরা ৩০ মাইল সাঁতারের আয়োজন করেন—হুগলী হইতে আহিরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত। অকস্মাৎ জোয়ার আসায় এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ায় সাঁতারুদের পথিমধ্যে তুলিয়া লওয়া হয়। ১৯২৫ সালে নূতন উদ্যমে সেই ৩০ মাইল প্রতিযোগিতা পুনরনুষ্ঠিত হইলে হাটখোলা ক্লাবের গোপীনাথবাবু প্রথম স্থান অধিকার করেন। উক্ত সালেই শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় আর একটী ২৩ মাইল সাঁতারের আয়োজন (ভাটপাড়া হইতে কুমারটুলি পর্য্যন্ত) হয়। এই প্রতিযোগিতারও প্রথম স্থানের জন্ম শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষের সহিত (যিনি দীর্ঘকাল সাঁতারের জন্ম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন) হাটখোলা ক্লাবের শ্রীযুক্ত জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়ের "ডেট্ হিট" লইয়া মতদ্বৈত হয় এবং বিচারে জ্ঞানবাবুই জয়ী হন।

আজ ১৯৩৩ সালে, আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সন্তরণকারীদের তুলনায়, অল্প দৌড়ের পাল্লায় অনেক পিছনে পড়িয়া আছি। এ বৎসরের রেকর্ড দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে হইলে আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রণালীর দ্বারা শিক্ষা করা উচিৎ। এই শিক্ষা করিতে হইলে হয় জাপান কিম্বা আমেরিকার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। উপযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত দুইটি দেশে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এ দেশের অধিকাংশ সন্তরণকারিগণ গায়ের জোরে সাঁতার কাটিয়া থাকেন—কোন নিয়মের ধার ধারেন না বা কোন উপযুক্ত লোকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন না। অনেকের ধারণা সাঁতার আবার কাটিব কি! এর আবার নিয়ম কানুন কি আছে! কিন্তু যাঁহারা বিনা শিক্ষা দীক্ষায় বড় সাঁতারু হইয়াছেন, দুঃখের বিষয় তাঁহারা নিজেরাও জানেন না কি কৌশলে তাঁহারা সাঁতার কাটিতেছেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা সদুত্তর দিতে পারেন না। আরো দুঃখের বিষয় যে, আমাদের সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ এতদ্বিষয়ে এত অনভিজ্ঞ যে তাঁহারা উৎসাহিত করা দূরে থাকুক বরং অধিকাংশ সময়ে নবীন সাঁতারুদের নিরুৎসাহই করিয়া থাকেন।

কলিকাতায় মহিলাদিগের সাঁতার দিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। করপোরেশনের অধিকারভুক্ত অধিকাংশ পুষ্করিণী আমরা—পুরুষেরা—দখল করিয়া বসিয়াছি। জনসাধারণের কর্ত্তব্য দুইটি "বাথ"—একটী উত্তর কলিকাতায় এবং অপরটি দক্ষিণ কলিকাতায়—কেবলমাত্র মহিলাদিগের জন্যই নির্ম্মাণ করা। দেশের সম্ভ্রান্ত এবং ধনবান ব্যক্তিরা যদি সামান্য একটু চেষ্টা করেন তাহা হইলে উপরোক্ত "বাথ" নির্ম্মাণ করা যে অনায়াসে সম্ভবপর হয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত শান্তি পাল মহাশয় দীর্ঘকালস্থায়ী সাঁতারে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষের সন্তরণ-গুরু এ কথা অনেকেই অবগত আছেন। শান্তিবাবু বিচিত্রায় সন্তরণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিবেন,—বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তাহারই ভূমিকা স্বরূপ। আশা করি এ প্রবন্ধগুলি সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। বিঃ সঃ।

কালো ছেলে

শিল্পী— শান্তকুমার গুপ্ত

তিন অঙ্ক

শ্রীসুকুমার দে সরকার

এক
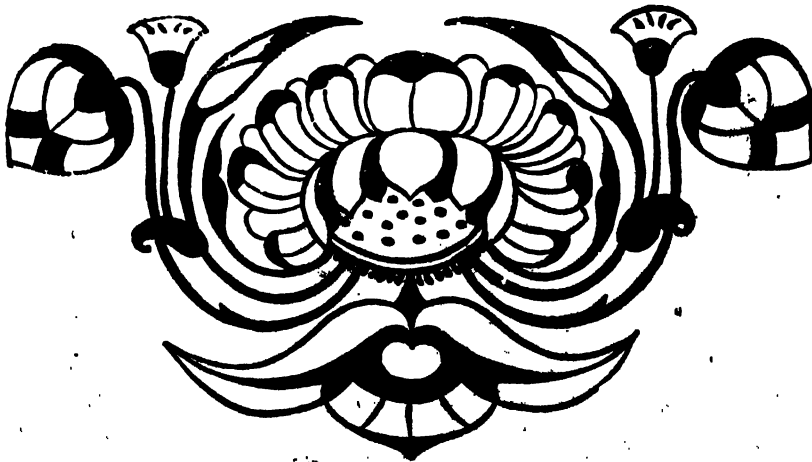
সুকুমার টেবিলের উপর বসে পড়ছিল হঠাৎ হাত লেগে পাশের দামী দোয়াতদানীটা পড়ে ভেঙ্গে গেল। ত্রস্তে সে উঠে দেখে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে জিনিসটা। একটুও কালী পড়েনি কারণ কালী ছিল না, সুকুমার চিরদিনই fountain penএ লেখে,—কিন্তু শুকনো কালীমাখা দোয়াতের ভিতরের অংশটা পড়েছিল যেন ওই পরিষ্কার সাদা দোয়াতটার ভিতরের কলঙ্কটুকু সামনে ধরে। সুকুমার সেটা তুলে টেবিলের উপর রাখল।

পড়া তার বন্ধ হো'ল। কতদিন আগের কথা তবু তার মনে হচ্ছিল যেন এই সেদিন। সে দীপ্তির টেবিল থেকে জোর করে দোয়াতটা তুলে এনেছিল, যে কালীতে সে লিখত সেইটুকুই থেকে থেকে শুকিয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে করেই সুকুমার সেই দোয়াতে অন্য কালী রাখেনি।

দীপ্তি, দীপ্তি—

ওঃ সেই শেষের দিনগুলি! সুকুমার দীপ্তির টেবিলে বসে এটা ওটা ঘাঁটছিল, দীপ্তি কি কাজে বাইরে গিয়েছিল। হঠাৎ চিঠির প্যাডের মধ্যে সুকুমার একটা চিঠি দেখতে পেলে দীপ্তির হাতের লেখা। কৌতূহল চাপতে পারেনি সুকুমার। দীপ্তির বন্ধুকে লেখা চিঠি, তার কথাই বেশী। মেয়েরা বন্ধুর কাছে যখন এরকম চিঠি লেখে তাতে পুরুষ বন্ধুর গুণ-কীর্ত্তনের চেয়ে দোষের সংখ্যাই বোধ হয় বেশী থাকে—লঘুভাবে লেখা। পড়তে পড়তে সুকুমারের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে, এমন সময়ে দীপ্তি ঘরে আসে। এক মিনিটের মধ্যেই অবস্থাটা দীপ্তির কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে; সে হাসতে হাসতে বলে "বা রে আমার চিঠি তুমি পড়ছ যে!"

সুকুমার দাঁড়িয়ে ওঠে। তারপরে একটু থেমে বলে "আমার সম্বন্ধে তোমার সত্যকারের ধারণা আজ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, তোমায় আমায় এই শেষ দেখা"—

দীপ্তি আচ্ছন্নের মত জলভরা চোখে ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে।

তারপরের দিনগুলি সুকুমারের কি কেটেছে! সেও দীপ্তিকে সত্যই ভালবেসেছিল। কত রকম noble revenge তার মাথায় এসেছিল—শেষে সে ঠিক করেছিল দীপ্তির বিবাহের দিন সে শুধু যাবে আর জোর করে নেওয়া সেই দোয়াতটাই তাকে উপহার দিয়ে আসবে। তার পর থেকে সে শুধু অপেক্ষা করছিল একটা লাল চিঠির।—

দুই

দীপ্তি, দীপ্তি—

আরও আগের কথা মনে পড়ে সুকুমারের—সেই হর্ষ-বিষাদ ভরা দিনগুলির কথা। তখন কিছুদিন আলাপ হয়েছে দীপ্তির সাথে।

সেদিন সুকুমার Knut Hamsun এর Panখানা নিয়ে এসেছিল দীপ্তিকে পড়তে দিতে। যে বইটা ওর ভাল লাগত ও দীপ্তিকে দিত পড়তে। দীপ্তি বইটা নিয়ে বলেছিল—"পড়েছি বইটা, তবু দিয়ে যান আর একবার পড়ব।"

সুকুমার একবার মুখ তুলে দীপ্তির দিকে তাকিয়েছিল, তার পরে দুজনেই হেসে ফেলেছিল।—

দু'দিন পরে সুকুমার দীপ্তির টেবিলে বসে ওই বইটাই ওল্টাচ্ছিল, হঠাৎ প্রথম সাদা পাতাটায় সে দেখতে পেলে মেয়েলী অক্ষরে পরিষ্কার ছোট ছোট করে লেখা—

O my Love's like a red red rose
That's newly sprung in June.
O my Love's like a melodie
That's sweetly play'd in tune.

পাশে দীপ্তির মুখখানা তখন গোলাপের মতই রাঙা হয়ে উঠেছিল। তার পরে ওদের দিনগুলি কত সহজ হয়ে আসে!—

তিন

আরও আগে—

ষ্টেশনারী দোকানে সাজান চমৎকার দোয়াতদানীটা দেখে সুকুমারের ভারী পছন্দ হয়, যদিও সে fountain penএ লেখে। সঙ্গে টাকা ছিল না, কিছু টাকা এনে সে দেখে দোয়াতদানীটা সহপাঠিনী দীপ্তি দেবীর হাতে। জগতে এমন খেয়ালী ঘটনা বোধ হয় দু'একটা ঘটে থাকে, না হলে এত লোক থাকতে দীপ্তি দেবীই বা কেন দোয়াতটা নিতে আসবেন। সুকুমার কপালে হাত দুটি ঠেকিয়ে বলে "আপনি নিলেন বুঝি, আমি কিন্তু ওইটাই কিনতে এসেছিলাম।"

"বেশ'ত আপনিই নিন তা'হলে আপনার যখন প্রথম আবিষ্কার।" বেশ সহজ ভাবে দীপ্তি বলে।

"না না আপনি নিয়ে যান—আমার কিন্তু লোভ রইল, একদিন হয়ত কেড়ে আনব।"

ভ্রূকুঁচকে দীপ্তি বলে "কেড়ে নেওয়া অত সোজা বুঝি।"

সুকুমার হাসে,—এমনি করেই তাদের আলাপের সূত্রপাত।

* * * *

চমক ভাঙে সুকুমারের।

একটা অদ্ভুত ভাব তার মুখের উপর ফুটে ওঠে।— এই দোয়াতদানীটার স্মৃতি জড়িত, একটা লাল চিঠির অপেক্ষা সে কতদিন করেছে—কত কথাই সুকুমারের মনে ভেসে আসতে লাগল, এমন সময়ে টেবিলের উপর তুলে রাখা সেই কাঁচের টুকরোটাতে তার আঙুল একটুখানি কেটে গেল। ব্লটিং প্যাডের উপর আঙুলটা চেপে ধরতেই তার নজর পড়ল কোণের দিকে coverটা চাপা দেওয়া একটা লাল খাম, উপরে লেখা শুভ পরিণয়। এতক্ষণ সে দেখতে পায়নি। চিঠিটা খুলে পড়তে বেশী সময় লাগেনি, কিন্তু শেষ করেই সে ডেকে উঠল—

"দীপ্তি, দীপ্তি—"

হাস্যমুখী দীপ্তি এসে প্রবেশ করে বলে উঠল "দোয়াতটা ভাঙলে কি করে, আঙুলটাও কেটেছ দেখছি, নাঃ দোয়াতটা তোমায় বড় জ্বালালে।" সুকুমার তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে উত্তর দিলে "যাকগে— এই দেখ ২৪শে অমরের বিয়ে—রেবার সঙ্গেই। আমি একবার যাচ্ছি অমরের কাছে।"

দীপ্তির সুকুমারের সঙ্গেই বিবাহ হয়েছিল। সে ভুলটুকু বুঝতে সুকুমারের একেবারে দেরী হয়ে যায়নি।

শ্রীসুকুমার দে সরকার

বিতর্কিকা

৯। নয়মাত্রার ছন্দ

বিভাস নাগ

নবমাত্রিক পর্ব্ব তৈরি হতে পারে কিনা এ নিয়ে অমূল্যবাবু আলোচনা করছেন। তাঁর ধারণা হয়েছে নয়মাত্রার ছন্দ তৈরী হ'তে পারে। আমার ধারণা নয়মাত্রার পর্ব্ব দিয়ে কোন সুশ্রাব্য ছন্দ তৈরী হতে পারে না, যদি তৈরি হয়ও তাতে নয়মাত্রার প্রাণ থাকবে না, থাক্‌বে তার অস্পষ্ট একটা ছায়া মাত্র। তার কারণ আমি লিপিবদ্ধ করছি, আশাকরি অমূল্যবাবু রুষ্ট হবেন না।

মুখ্যত পর্ব্ব তৈরী হতে পারে দুই, তিন বা চার মাত্রায়। পাঁচ ছয় কিম্বা সাতমাত্রার পর্ব্বও বাংলা ছন্দ-সাহিত্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যৌগিক পর্ব্ব। দুটি দুই, তিন বা চারমাত্রার খণ্ড পর্ব্বে তাদের সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাদের প্রকৃতিটা হয়ে পড়েছে খঞ্জ। অবশ্য ছয়মাত্রার পর্ব্বে এই খঞ্জতা দোষ নেই; তার কারণ, এ হ'ল যুগ্মসংখ্যার পর্ব্ব। প্রাচীন আক্ষরিক ছন্দে যুগ্মসংখ্যার পর্ব্বের বহুল ব্যবহার আমাদের জিহ্বাকে আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিল; তাই মাত্রিকছন্দের এ পর্ব্বটিকে নিয়ে আমাদের মোটেই মুস্কিলে পড়্‌তে হয়নি। এ পর্য্যন্ত অমূল্যবাবু হয়ত মেনে নিবেন। হয়ত একথা বল্লেও তাঁর আপত্তি নেই যে পর্ব্বের পঙ্গুতা সৃষ্ট হয় দুটি কারণে: ১। পর্ব্বে অযুগ্ম সংখ্যা থাক্‌লে এবং তৎসঙ্গে ২। পর্ব্ব যৌগিক হ'লে।

এ ধারণা নিয়ে এখন নয়মাত্রার পর্ব্বের প্রকৃতি বিচার করা যাক্‌। প্রথমত নয় অযুগ্মসংখ্যা; তাই নয়মাত্রার যে ছন্দ তৈরী হ'বে তা হ'বে পঙ্গু। কিন্তু পঙ্গু ছন্দ তৈরী হলেও না-হয় একটা কিছু হ'ত। নয় এমনি সংখ্যা যে তাকে এমন দুভাগ করা যায় না যা হবে দুই, তিন বা চার মাত্রার সমষ্টি। দুই তিন বা চারের তিনটি খণ্ডপর্ব্ব নিয়ে তবে নয়মাত্রার পর্ব্ব তৈরী হয়। দুটি খণ্ডপর্ব্বে যে যৌগিক পর্ব্ব সৃষ্ট হয় তা-ই যখন হয়ে পড়ে পঙ্গু, তখন তিন পর্ব্বের সমষ্টিতে যে জটিল যৌগিক পর্ব্ব সৃষ্ট হবে সে ত আতুর হ'তে বাধ্য; তার নড়্‌বার চড়্‌বার শক্তিই কল্পনা করা যায় না।

কাজেই আমার বক্তব্য, নয়মাত্রার পর্ব্ব না হওয়াই ভাল। এ জড়বস্তু জিহ্বাকে না দেবে সুখ, না দেবে কাণকে তৃপ্তি। তবু যদি নয়মাত্রার ছন্দ না হ'লে বাংলা-সাহিত্য খুঁতখুঁত করতে থাকে তবে একটা ছন্দ তৈরী করা যায় কিন্তু অমূল্যবাবুর পর্ব্ববিভাগ মতে নয়। সাত মাত্রার পর্ব্ব যে সঙ্কেতে তৈরী, (৩ মাত্রা + ৪ মাত্রা) সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে, অর্থাৎ আগে হ্রস্ব এবং পরে দীর্ঘ পর্ব্বাঙ্গ দিলে, নয়মাত্রার ছন্দ কতকটা স্বাতন্ত্র্য পায়।

যথা: ৯=৪+৫

অথবা ৯=৩+৬

(এখানে পাঁচ বা ছয় মাত্রার যৌগিক পর্ব্বকে মুখ্য পর্ব্ব বলে গণ্য করতে হ'বে)

দৃষ্টান্ত:

৪ ৫ ৪ ৫

১। যদি একা : সন্ধ্যাকালে | চুপিচুপি : ডাকিয়া মোরে | —
| কও কথা।

৩ ৬ ৩ ৬

২। শুভ্র : রাতে আনমনে | বসিয়া : শিলাতলে যদি |
| গাঁথ মালা।

কিন্তু আমার এ পর্ব্বাঙ্গ বিভাগ অমূল্যবাবু নাকচ করে দিবেন এই বলে যে যেহেতু "দৈর্ঘ্যের ক্রম অনুসারে পর্ব্বাঙ্গ গুলিকে সাজান হয় নাই, সুতরাং বাংলাছন্দের একটি মূল রীতির ব্যভিচার হইয়াছে।" তার উত্তরে আমার বল্বার এইমাত্র আছে, এ 'ব্যভিচার' তবে রবীন্দ্রনাথও করেছেন। তাঁর পাঁচমাত্রার ছন্দ 'মদনভস্মের পর' কবিতার 'রতি-বিলাপ' প্রভৃতি বহু ব্যভিচারী পর্ব্বের সন্ধান পাওয়া যাবে।

২। "বাঙালীর জাতীয় পোষাক"

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

গত আশ্বিনের বিচিত্রায় শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তাফী মহাশয় এবং কার্ত্তিকের বিচিত্রায় সম্পাদক মহাশয় বাঙালীর জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা মনে হয়েছে।

আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, 'আপরুচি খানা এবং পররুচি পাহেন্না।' আমরা অনুকরণপ্রিয় জাত ব'লে এই 'পররুচি পাহেন্না'কে এমন ভাবে গ্রহণ করেছি যে, অন্যের কাছে আমাদের পোষাক হাস্যজনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল আমরা সাহেবদের অনুকরণে ছোট ঝুলের পাঞ্জাবী এবং গলাখোলা মাত্র একটি বোতাম সম্বলিত কোমর পর্য্যন্ত ঝুলের কোট ব্যবহার করতে সুরু করেছি। আমরা যখন অনুকরণ করি তখন পর রুচিটা আমাদের নিজেদের রুচিসঙ্গত কিনা এটা মোটেই ভেবে দেখিনা। আমাদের নিজস্ব পোষাক কিছু না থাকায় যার যা খুসী তাই পরেই আমরা অম্লান বদনে রাস্তায়, আসরে সং সেজে চলি এবং অপরের কাছে হাস্যাস্পদ হই। আমার মনে পড়ে বহুদিন পূর্ব্বে একজন বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখেছিলেন যে, তাঁর কোন মেম বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, যে, বাঙালীরা সাহেবদের যা underwear সার্ট তাই শুধু পরে রাস্তায় চলে এতে লজ্জা করে না? সত্যি শুধু সার্ট পরে রাস্তা চলা বা কোন সভায় যাওয়া কেমন বিসদৃশ ঠেকে। কাপড়ের উপর সার্ট একেবারে অচল।

আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের লোক বাস করে। তাদের সকলের ছোঁয়াচ লেগে আমাদের জাতীয় পোষাক হয়ে দাঁড়িয়েছে অদ্ভুত। পোষাক পরিচ্ছদ নিজের শীলতা রক্ষার জন্যে। কিন্তু আজকালের ফ্যাসান যে কতদূর শ্লীলতা রক্ষা করে এ বিচার্য্য। অনেক নারীরা তাঁদের পোষাক থেকে অনাবশ্যক কুঞ্চনাদি ও চাদর ওড়না বর্জ্জন করে বিলিতী কায়দায় তাঁদের পোষাককে এতদূর সরল করে নিয়েছেন যে, তাতে শালীনতার হানি হয়েছে বলেই আমার মনে হয়। তাঁদের পোষাক সম্বন্ধে আলোচনা করলেই ভাল হয়।

আমাদের নিজেদের পোষাক কি ছিল এ খেই হারিয়ে গেছে আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চাপে। আমরা মুসলমান যুগে চোগা চাপকানকেও আমাদের নিজস্ব করেছিলাম, আবার এযুগেও কোট প্যাণ্টকেও নিজস্ব করে নিয়েছি। এই জাতীয়তাবাদের যুগে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পোষাকেও থাকা উচিত। যখন অন্যের পোষাক গ্রহণ করবো তখন চোস্তভাবে তাদের মতই পোষাক পরবো। অর্দ্ধেক তাদের এবং অর্দ্ধেক নিজেদের—এ প'রে অন্যের কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ করা উচিত নয়।

আমারও মনে হয় যে, আমাদের ধুতি ও পাঞ্জাবীই ঠিক পোষাক। কোট আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে পারলাম না। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান কাজেই পাঞ্জাবীর উপর চাদর যেমন অনাবশ্যক তেমনি পাঞ্জাবীর উপর কোটও অনাবশ্যক বলেই মনে হয়। তবে হেমন্তকালে অথবা শীতকালে গলা বন্ধ কোট ব্যবহার করায় আপত্তি নেই। ধুতি ও পাঞ্জাবীই আমাদের জাতীয় পোষাক হওয়া উচিত।

পাঞ্জাবী এমন হবে যাতে ফ্যাসানও বজায় থাকবে এবং শ্লীলতাও বজায় থাকবে। এক সময় পাঞ্জাবীর ঝুল ছিল আগুল্‌ফলম্বিত, এখন কমে দাঁড়িয়েছে কোমর পর্য্যন্ত।

যাদের দেখে ঝুল ছোট করেছি তারা ছোট ঝুলের জামা পরে তাদের প্যান্টের নীচে পরে থাকে। আমরা কাপড়ের উপর পরি কাজেই ঝুল এমন হওয়া উচিত যাতে কোমরের কিছু নীচে পর্য্যন্ত ঝুল থাকে।

ধুতিতে কোঁচা আমাদের একান্ত অনাবশ্যক জিনিষ। কোঁচা আমাদের কার্য্যতৎপরতায় বিঘ্নদায়ক। কোঁচাকে যখন মালকোঁচা করি তখন আমাদের কর্ম্মদক্ষতা বেড়ে যায়। কোঁচাকে গুটিয়ে নাভি প্রান্তে গোঁজারও বিঘ্ন অনেক। আমাদের অনেকেরই উদরের গড়ন একটু "বাড়ন্ত"। কাজেই কোঁচার এক প্রান্ত গোঁজাতেই পেট বড় দেখায় তারপর আর এক প্রান্ত যোগ হ'লে উদরের অবস্থা পোষাকের চেয়েও হাস্যকর হবে। খদ্দর অনেকেই আট হাত লম্বা ব্যবহার করেন এবং তাতে কোনই অসুবিধা হয় না, বরং অনাবশ্যক কোঁচার ভার লাঘব হয়। সব রকম ধুতিই আমরা অনায়াসে আট হাত লম্বা পরতে পারি, তাতে অর্থের দিক দিয়েও সুবিধা এবং সৌষ্ঠবের দিক দিয়েও সুবিধা।

তারপর আমাদের জুতা সম্বন্ধেও কিছু বলবার আছে। কাপড়ের সঙ্গে সু কেমন বেমানান মনে হয়। সু কোট প্যান্টের সঙ্গেই বেশী খাপ খায়। কাপড়ের সঙ্গে এলবার্ট, সেলিমশাহী কিম্বা ঐ ধরণের কোন জুতাই বোধ করি বেশী মানানসই হয়। আমাদের অনেক আসরে জুতা খুলে বসতে হয়। তাতে সু জুতার চেয়ে এই সব জুতায় সুবিধা অনেক, চটকরে খোলা পরা চলে।

সকল জাতেরই শিরস্ত্রাণ আছে। আমাদের গরম দেশ, রোদের তাতে বাইরে কাজও করতে হয় অথচ মাথায় ভগবান দত্ত চুল ছাড়া আর কোন আবরণই নেই। আমাদেরও কোন রকম শিরস্ত্রাণের প্রচলন করা উচিত যাতে আমাদের মাথা বাঁচে। গান্ধী-টুপীর মত অমনি কোন রকম সাদা কাপড়ের টুপী হলেই বোধহয় মন্দ হয় না। সাদা কাপড় তাপ নিবারক।

৩। তুই, তুমি, আপনি

শ্রীসুরতনাথ নিয়োগী

শ্রাবণের বিচিত্রায় শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত তুই, তুমি, আপনি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন; অথচ এ পর্য্যন্ত কেহই উহাদের কোন একটিকে খোলা খুলি ভাবে ব্যবহার করতে সাহস পাননি। সকলের লেখার মধ্যেই যেন কোথায় না কোথায় একটু খুঁত রেখে গেছেন। শ্রীমনীন্দ্রনাথ মণ্ডল গত আশ্বিনের সংখ্যায় বলিয়াছেন 'তুমি, বা আপনি'র যে কোন একটীকে চালাতে পারলে মন্দ হয় না'। অথচ কোনটী তাঁহার ইচ্ছা স্পষ্ট তাহা ব্যক্ত করেন নাই। আবার পর মুহূর্ত্তেই বলেছেন 'কিন্তু মুড়ি মুড়কীর একদর হয়ে যায়'। ইহার অর্থ কি? আর এক স্থানে বলেছেন যে, ব্রাহ্মণেতর জাতিরা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য জাতিরা পরস্পরকে নমস্কার করেন। প্রণাম অর্থে যাহাই হউক আজকালকার কালে কেবল হাত দুইটীই কপালে ওঠে ও মুখে প্রণাম শব্দ উচ্চারণ করে। আর অন্যান্য জাতির বেলায় তফাতের মধ্যে কেবল নমস্কার বলা হয়। বস্তুতঃ কার্য্য হিসাবে দুইটাই এক। ইহার কারণ শিক্ষালাভ। শিক্ষিত সমাজে এসব প্রণাম নমস্কারের মারামারি নেই। সেখানে সাম্য ভাব আছে 'Good morning' যাহার বাংলা অর্থ 'সুপ্রভাত' এবং সেই স্থানেই তুই, তুমি ও আপনির মধ্যে 'আপনিই' নিজের স্থান একচেটে করে নিয়েছে। শিক্ষিতের সংখ্যা যতই বাড়বে ঐ তিনটীর অন্য দুইটী ততই লোপ পেতে থাকবে।

শ্রীনব গোপাল দাস আই-সি-এস্ এক স্থানে বলেছেন, 'সনাতনের জট ধরে টান মারতে আপত্তি, কারণ এখনও জিতবার আশা খুবই কম...' তা' হলে সব বিষয়েই সনাতনের দোহাই দিয়ে বসে থাকলে সমাজ সংস্কার করা

চলে না। কালের পরিবর্ত্তনে অনেক কিছুই পরিবর্ত্তন হয়। সমাজের মধ্যে নূতনত্ব কিছু করতে গেলেই অনেক ঠেকা খেতে হয়, তবে জিনিষটার প্রচলন হয়।

সম্পাদক মহাশয় 'তুমি' শব্দ ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহার মধ্যে রূঢ়তা কোথায় আছে তাহা ফণি বাবুই ভাল জানেন। ছেলে মা-বাপকে তুমি বলেই সম্বোধন করে থাকে। তা'তে কি রূঢ়তার ভাব প্রকাশ পায়? আপনি, তুমি যে শব্দই ব্যবহার করা যা'ক কণ্ঠের বিকৃতিতেই রূঢ়তা প্রকাশ পায়। 'তুমি' শব্দটা খুব সাফল্য জনক মনে হয়।

ভগবানকে যখন আমরা তুমি বলেই সম্বোধন করি তখন কি তা'তে রূঢ়তার ভাব থাকে? আর একটী কথা এই তিনটীর মধ্যে 'তুমি' শব্দটাই আমরা আধুনা অধিকতর ব্যবহার করে থাকি। কারণ 'আপনি' শব্দটা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এবং আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা যে কত তা সকলেই জানেন। পিতা পুত্রকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করেন। মাও সময় সময় ছেলেকে ঐ একই সম্বোধন করে থাকেন। বন্ধু, বান্ধবের মধ্যেও তুমি শব্দের প্রচলন অধিক। তা'ছাড়া ঝি, চাকর, মুদি, গোয়ালা ধোপা, নাপিত ইত্যাদি যাদের সঙ্গে আমরা নিত্য কথাবার্ত্তা কয়ে' থাকি, তাদের সকলকেই আমরা তুমি বলেই সম্বোধন করি।

অপরিচিত ব্যক্তিকেই আমরা প্রথম 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করি। এবং কিছু দিনের মধ্যেই কখনও বা ক্ষেত্র বিশেষে দু এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহা তুমিতে রূপান্তরিত হয়। তবেই দেখা যায় 'তুমি' শব্দের প্রচলন এদেশে অধিক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

একজন জজ্ সাহেবকে "সাহেব তুমি আমার জরিমানাটা কমিয়ে দাও" বলতে মুখে আট্‌কাবে না; কিন্তু নিজের ছেলেকে "আপনি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন" বলতে মুখে বেধে যায়।

আপনি বললেই যে সম্মানটা বেড়ে যায় আর তুমি বললে সেটা কমে যায়—তার কোন অর্থ নেই। তাহলে পুত্রের নিকট মাতাপিতার কোন সম্মান থাক্‌বে না বা থাকত না। এই 'তুমি' শব্দ যখন সকল লোকের উপর প্রয়োগ করা হবে তখন এর সম্মানও 'আপনি'র থেকে কিছু কমে যাবে না।

৩ ক। আপনি, তুমি ও তুই

শ্রীসুকুমার ঘোষ

তিনটি শব্দই বহুদিন হ'তে চ'লে আসছে। এদের প্রয়োজনীয়তা আমাদের এম্নি মজ্জাগত হ'য়ে গেছে যে এখন এদের কাউকেই বিদায় দেওয়া অসম্ভব। বাদ দিতে গেলেই আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে অনেক কিছুই বাদ দিতে হয়।

"আপনি"—যদি 'আপনি'-কে রেখে বাকী দু'টি বাদ দিই সেটা হয়ত ভাল দেখাবে না—কারণ রবীন্দ্রনাথ কি মহাত্মাজীর সঙ্গে কোন একটা মদ্যপ বা চরিত্রহীনকে একাসনে আনতে বোধ হয় কারো মন সায় দেবে না। আরো, আমাদের ছোট ভাই বোনদের 'আপনি'র চাইতে তুই বলে সম্বোধন করতে পারলেই তৃপ্তি বেশী পাই। বন্ধুদের মধ্যে 'তুমি'র প্রচলন বেশী, এমন কি অন্তরঙ্গতা যেখানে বেশী সেখানে 'তুই' ব্যবহারও যথেষ্ট।

"তুমি"—কে রেখে আর দু'টি বাদ দিলেও চলতে পারে না। কেননা কোন অপরিচিত লোককে বা আমাদের পূজনীয়া ও পূজনীয় দেশনেতাদের, যাঁদের আমরা ভক্তি করি অন্তর দিয়ে, তাঁদের তুমি বলতে মন সায় দেয় না।

বিহারীরা 'তুমি' অর্থাৎ তুম্ কথাটা এম্নি আত্মসম্মান-হানিকর মনে করে যে একটা হাজামকে (নাপিত) যদি তুম্ বলা যায় তা'তে সে হাতাহাতি করতেও দ্বিধা করে না। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ইহা বিরল নহে। সুতরাং "আপনি"ও চাই। 'তুই' এর প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বেই বলেছি।

"তুই"—কে রেখে আর দু'টি যে বাদ দেওয়া চলে না তা' লিখে কেবল পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ছাড়া আর বেশী কি লাভ হবে।

এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ আলোচনা হ'লে খুবই ভাল হয়।

পুস্তক পরিচয়

উর্ব্বশী ও আর্টেমিস।—শ্রীবিষ্ণু দে প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এম-সি-সরকার এণ্ড্ সন্স্, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

এই সুদৃশ্য কবিতার বইখানি হাতে করেই ভালো লাগে। মলাটে কোনো কড়া রঙে চোখ আহত হয় না, সোনার জলের হরফে আষ্টেপৃষ্ঠে লেখকের নাম দেখা যায় না। মনে হয় লেখকের প্রকৃতি লাজুক, রুচি অবিকৃত। আশা হয় পাতা উল্টে গেলে সত্যিকারের কবিতাই পাব, কোনো তেজোদৃপ্ত দাম্ভিকের ছন্দ ও শব্দ নিয়ে কসরৎ, বা তার ভাবের অভাবনীয়তার ভাণ, কঠিন লোষ্ট্রখণ্ডের মত পাতা থেকে ছিটকে এসে মনপ্রাণ ক্ষতবিক্ষত করে দেবে না।

সে আশায় নিরাশ হতে হয় না। কবিতার সবগুলিই যে আশ্চর্য্য ভালো, তা অবশ্য আমি বলতে চাই না। অনেক স্থলে মনে হয় অনুভূতি যথেষ্ট তীব্র নয়, চিন্তা তেমন স্বচ্ছ নয়। ভাববিলাসের দিকে কবির একটা প্রবণতা আছে, আর আছে গ্রীসীয় দেবদেবীর নামের প্রতি একটা অযথা মোহ। চিন্তার আর খানিকটা কাঠিন্য থাকলে ভালই হত; কবিতাগুলির মেরুদণ্ড তা'হলে কোনো কোনো স্থলে এত পেলব না হয়ে হত সুদৃঢ়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কবিতাগুলি প'ড়ে মন স্নিগ্ধ হয়, এবং এ সংশয় থাকে না যে লেখক সত্যই সেই সদা-ঘোষিত অথচ রুচিদুষ্ট জীব—তরুণ কবি। তরুণ মনের সৌকুমার্য্য লেখায় সর্ব্বত্র ফুটেছে; এবং যেহেতু অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ ছাড়া এ লেখার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না, অতএব লেখককে প্রকৃত কবিই বলিতে হয়। দেখে বিস্মিত বোধ হয়, এই নগরের কোলাহল ও কুৎসিৎ আবেষ্টনের মধ্যে, চারিদিকের এই প্রাণনাশী স্বার্থদ্বন্দ্ব ও চিত্তের হীনতার ভিতরে, এমন একটী কমনীয় সৌন্দর্য্য-পিপাসু মন আজও জেগে রয়েছে। চক্রীদের বক্রচিন্তা তাকে স্পর্শ করেনি; চারিদিকে সে চেয়ে দেখছে অপলক মুগ্ধ নেত্রে, তাতে যেন প্রথম বিস্ময়ের অঞ্জন এখনো মাখা। এ কবির কাছে পৃথিবী আজও হয়নি মাধুরী-হীন, নির্দ্দয় সংসারের রক্ত-লোলুপ নৃশংসতা তার দেহ মনকে এখনো দেয়নি পঙ্গু ক'রে। তাই পড়ি,—

মোর পাশে
রূপকথা-স্বপ্ন বহে, প্রেমের কবিতা বহে
শ্রাবণের পূর্ণ দীঘি লাবণ্যের চোখে।
লাবণ্যের মায়া আজ ধরেছে আমায়
লাবণ্যের মূর্ত্তি আজ ছায়
আমার পৃথিবী ছায়
সমুদ্র আকাশ
দিনের ধমনীছন্দ, রাত্রির নিঃশ্বাস।

আবার,—

আলো তবু গোধূলি মলিন
ধোঁয়ায় মলিন এই শব্দখর কুৎসিত নগরে
তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নামে নবীন ধরার মায়া
ধরি' তার দুই স্নিগ্ধ করে।

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

অনামীঃ—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা। "এই বইখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থের এক পয়সাও গ্রন্থকারের পকেটে যাবে না—সবই উৎসর্গ হবে শ্রীঅরবিন্দের পূত আশ্রমের সেবায়।"

অনামী বইখানি বিরাট গ্রন্থবিশেষ—৪১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রথমেই বইখানির আকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—আকার বাংলা খাতার ধরণের। প্রচ্ছদপট বিশেষত্বপূর্ণ কিন্তু

বাহুল্য বর্জ্জিত—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র শ্রীপ্রশান্ত কুমার রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

বইখানি চারখানি পৃথক বইএর সমষ্টি—তাদের নাম অনামী, রূপান্তর পত্রগুচ্ছ ও অঞ্জলি। রূপান্তরের গোড়ায় একখানি সুন্দর ছবি আছে—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত।

প্রথমেই "পত্রগুচ্ছ" পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যত পত্র ব্যবহার করেছেন তার অধিকাংশ এখানে ছাপিয়েছেন। বলা বাহুল্য এ পত্রগুলি বহুমূল্য। এর মধ্য দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা-সম্পর্কিত অনেক কথা জানা যায়। সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত জানার সুযোগও এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে আছে। বর্ত্তমান যুগের দুই একজন সাহিত্য রথী সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত প্রণিধান যোগ্য। Wells সম্বন্ধে তিনি বল্‌ছেন, "Wells is a super-journalist, super-pamphleteer and story-teller and nothing more. I imagine that within a generation of his death, he will cease to be read or remembered." Bernard shaw সম্বন্ধে তাঁর মত :—"Shaw is not a dramatist ; I don't think he ever wrote a drama ; Candida is perhaps the nearest he came to one, (p. 271)। এর থেকে বোঝা যায় শ্রীঅরবিন্দ শুধু সাধনায় নিমগ্ন থাকেন না, সমস্ত বই পড়ার অভ্যাসও তাঁর আছে। অনেককে বল্‌তে শুনেছি শ্রীঅরবিন্দ বেঁচে নেই। দিলীপকুমারের চিঠিগুলির থেকে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ হবে। এবং সেই হিসাবে চিঠিগুলিতে তারিখ থাকলে আরো ভাল হ'ত। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসুর একটা মত তাঁর পত্রে পাওয়া গেল। সুভাষ লিখেছেন :—"তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) ধ্যানী—আর আমার মনে হয়, বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর—যদিও বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়"। (৩৫৩ পৃঃ)।

শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত আর যাঁর যাঁর চিঠি দিলীপবাবু ছেপেছেন তাঁদের নাম :—Georgo W. Russell (A. E), Bertrand Russell, Ronald Nixon (now Krishnaprem), Sahed Suhrawardy, Romain Rolland, Hareen chattopadhyaya, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীশচন্দ্র সেন প্রভৃতি।

কৃষ্ণপ্রেমের জীবন ত্যাগে অদ্বিতীয়—তাঁর চিঠির গভীরতা এবং earnestness অসাধারণ। কিন্তু এগুলি চিঠি লেখার গুণ নয়। চিঠি লোকে লেখে এবং পড়ে আনন্দের প্রেরণায়—চিঠির মধ্যে প্রশ্নের ঠাসবুনোনি থাক্‌লে চিঠি ভারি হ'য়ে ওঠে এবং পাঠককে ক্লান্ত করে। চিঠি লেখার সরলতা, সরসতা এবং দীপ্তির গুণে রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি ঝলমল করচে।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের পত্রগুলি সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। তিনি চমৎকার বাংলা লেখেন, ইংরাজি লেখা সম্বন্ধে তাঁর সুনাম ত আছেই। বাংলা থেকে ইংরাজি তর্জ্জমাও তাঁর সুন্দর। দিলীপবাবু সত্যিই বলেছেন যে "এতখানি প্রতিভা নিয়ে আপনি বেশির ভাগ সময়ই দিলেন জজিয়তিতে।" (৩৮৬ পৃঃ)

"পত্রগুচ্ছে"র পর 'অনামী'র কবিতায় মনোনিবেশ করলুম। 'অনামী' নামকরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—কোন একটা বিশেষ নাম দেওয়া সম্ভব হয়নি ব'লে বোধ হয়। এর মধ্যে দিলীপকুমারের অনুবাদপ্রিয়তার পরিচয় আছে। কি ইংরাজি, কি বাংলা, কি সংস্কৃত, কি ফরাসী—যেখানে যে ভাষায় তিনি যেটুকু ভাল জিনিষ পেয়েছেন তার অনুবাদ ক'রে আমাদের সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেচেন। শ্রীঅরবিন্দের কবিতার অনুবাদ, হারীন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার অনুবাদ, Walt Whitman, Shelly, Keats, Tennyson Milton, Wordsworth, Baudelaire, Anatole France, Browning, D.H. Lawrence, Emerson James Cousins, Nietzsche, Goethe, কালিদাস, ভবভূতি, উর্দ্দু গজল, কবীর, মীরবাঈ প্রভৃতি মনীষীদের যেখানে যেটুকু তাঁর ভাল লেগেচে তিনি অনুবাদ ক'রে পাঠককে উপহার দিয়েচেন। তাঁর অধ্যবসায় এবং সংগ্রহ-স্পৃহা অপূর্ব্ব।

"রূপান্তরে"র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি দিলীপকুমারের অনামীর পরের লেখা। রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখেছেন

(৩৪৮ পৃঃ), "কিন্তু এ কি ব্যাপার হে? হঠাৎ ছন্দ পেলে কোথা থেকে? × × অকস্মাৎ তোমার কান তৈরী হ'য়ে গেল কি উপায়ে?" এর থেকে মনে হয় দিলীপকুমারের আগের কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে যদি চ রবীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ ছিল, পরের কবিতাগুলি সম্বন্ধে আর তা নেই। এই পরের কবিতাগুলি 'রূপান্তরে'. সন্নিবেশিত হয়েচে। এই কবিতাগুলির প্রেরণা সাহিত্যিক নয়, ধর্ম্মনৈতিক (Spiritual)।

"অঞ্জলি"র কবিতাগুলি "শ্রীমা"র প্রার্থনা। মূল ফরাসী, তার ইংরাজি অনুবাদ এবং তার বাংলা (কবিতায়) অনুবাদ পাশাপাশি দেওয়া হয়েচে। এ সম্বন্ধে কিছু বলা অনধিকার চর্চ্চা। এ বস্তু আমাদের বলাবলির অনেক উর্দ্ধে।

দিলীপকুমার বইএর ভূমিকায় জানিয়েছেন যে তাঁর কবিতাগুলি শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র মোহিতলাল প্রভৃতির কাছে সমাদর পেয়েছে। একথা জানার পর তাঁর কবিতার সমালোচনা করতে আমার বাধে। এক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে বইখানির পরিচয় এবং আমি উপরে তাই দিয়েছি।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি :—অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ, বি-এল্ প্রণীত। রামধনু কার্য্যালয়, ১৬নং টাউন সেণ্ড রোড হইতে প্রকাশিত। ১২৭ পৃষ্ঠা। দাম বারো আনা।

এই অপূর্ব্ব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসখানি পড়ে যেমন প্রীত তেমনি চমৎকৃত হ'য়েছি। ইতিপূর্ব্বে "পদ্মরাগ" উপন্যাসখানিতে লেখক ডিটেক্‌টিভ গল্প রচনায় অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই এ উপন্যাসখানি হাতে পেয়ে মনের মধ্যে একটা বড় রকমের আশা পোষণ করেই পড়তে আরম্ভ করেছিলাম, এবং সেজন্য নিরাশ হ'তে হয়নি। এ উপন্যাসের আখ্যানবস্তু জটিলতর, কিন্তু লেখকের স্বচ্ছ সরল ভাষায় তা অতীব সহজ ভাবে পাঠকের নিকট বিবৃত করা হ'য়েছে। কোথাও কষ্ট-কল্পনা নেই। ন্যায় শাস্ত্রের অনুমোদিত যুক্তির সাহায্যে জটিল রহস্যগুলির উদ্‌ঘাটন একটির পর একটি। শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহ সজাগ থাকে। স্কুল কলেজের তরুণ ছাত্রদের পক্ষে বইখানি বিশেষ উপযোগী। এমন একখানি বই তাদের চিন্তাশক্তি স্ফুরণের বিশেষ সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

অতিথি :—শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত। বীণা লাইব্রেরী, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। ৭১ পৃষ্ঠা,—দাম আট আনা।

এটি একটি প্রহসন। 'বিচিত্রা'র পাঠকবর্গের নিকট লেখক অপরিচিত ন'ন। এ প্রহসনটিও 'বিচিত্রা'য় কিছুদিন আগে প্রকাশিত হ'য়েছিল। বইখানি বেশ সরস, সুখপাঠ্য ও কৌতুকজনক। চরিত্রগুলি সবই বাস্তবজীবন থেকেই গৃহীত। ঘটনার সমাবেশও সম্ভাব্যতার বাইরে নয়,—যদিও কিছু অসাধারণ। বইখানি বৈঠকখানায় বন্ধুবান্ধব মিলে অভিনয় করার বিশেষ উপযোগী, পড়েও প্রচুর আনন্দ পাওয়া যাওয়া যায়।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

আইন সদস্যের পদে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ভাইস্‌রয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের আইন-সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদটীতে বাঙ্গালীরা বরাবর তাঁহাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সার নৃপেনের নিয়োগে এসেম্ব্লীর অন্যান্য প্রদেশের সদস্যেরা কতটা খুসী হইয়াছেন বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত যোগ্যতার কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। এই পদ গ্রহণ করিয়া সার নৃপেন আর্থিক দিক দিয়া যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার এই পদ গ্রহণে অন্যদিক দিয়া বাংলা ক্ষতিগ্রস্ত হইল কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। অধুনা তিনি সাধারণ ব্যাপার সমূহে যে প্রকার আগ্রহের সহিত আত্মনিয়োগ করিতেছিলেন, তাহাতে বাঙ্গালী তাঁহার নেতৃত্ব পাইবার আশা করিতে পারিত। তাঁহার এই নিয়োগে সে সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া গেল।

রবীন্দ্র পদক

দিল্লীর বাঙ্গালী ক্লাব, ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জয়ন্তীর স্মৃতিরক্ষার জন্য এবং বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের চর্চ্চা বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্লাব কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি বৎসর একটি সুবর্ণ পদক দিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যই প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে বাংলার সহিত ও তাঁহাদের পরস্পরের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে। কাজেই, যাহাতে বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা বৃদ্ধি পায়, এরূপ সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই প্রশংসনীয়; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চর্চ্চার ত আবার বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।

সার এম-ইক্‌বালের অক্‌স্‌ফোর্ডে নিমন্ত্রণ

অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্বালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের এবং রোড্‌স্ মেমোরিয়াল ট্রাষ্টিগণের পক্ষ হইতে লর্ড লোথিয়ান, আগামী বৎসর অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্বালয়ে রোড্‌স্ মেমোরিয়াল বক্তৃতা দিবার জন্য সার এম-ইক্‌বালকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

অন্যান্য দেশের অতিশয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আনিয়া বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ও শিক্ষার্থীদিগকে তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভের ও তাঁহাদের সহিত আলোচনাদি করিবার সুযোগদানের জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রোড্‌স্ মেমোরিয়াল লেক্‌চারসিপের প্রতিষ্ঠা হয়।

সার এম্-ইকবাল এই বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত প্রথম ভারতবাসী। তাঁহার পূর্ব্বে জেনারেল স্মাট্‌স্ ও অধ্যাপক আইনষ্টাইন এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

হিবার্ট বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া সার এস্ রাধাকৃষ্ণন্ এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুগভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সার ইক্‌বালও দেশের ও তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিবেন, আমরা এরূপ আশা করি।

জয়নারায়ণ ঘোষাল

আধুনিক ভারতবর্ষের গঠনে বাঙ্গালীদের দানের কথা অন্যান্য প্রদেশবাসীরা ভুলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু, আমরা যাহাতে আত্মবিশ্বাস না হারাই, আমাদের কৃতিত্বের ইতিহাস হইতে যাহাতে আমরা ভবিষ্যতে অগ্রসর হইবার প্রেরণা পাইতে পারি, এইজন্য আধুনিক ভারতবর্ষ গঠনে যে-সকল বাঙ্গালী শক্তি, প্রতিভা উদ্যম ও অর্থ নিয়োগ

করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা বিশেষ ভাবে আমাদের জানিবার প্রায়োজন আছে।

ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাসে জয়নারায়ণ ঘোষালের বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি কলিকাতার একটি বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাশী গমন করেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণী সভায় আচার্য্য রায় বক্তৃতায় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, "বেনারসের অধিবাসী শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ ঘোষালের প্রদত্ত ২০০০০ টাকার সুদ হইতে এবং সরকারের অতিরিক্ত মাসিক সাহায্য ২৫২ টাকা লইয়া ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস্ চ্যারিটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।......জয়নারায়ণের এই স্কুলটির ইতিহাস ব্যতীত ইংরাজী শিক্ষার কোন বিবরণই সম্পূর্ণ হইবে না বলিয়া এখানে অসঙ্কোচে তাঁহার কথা অবতারণা করিতেছি।......অধ্যক্ষ পি-রাসেল যথার্থ ই বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি সমগ্র উত্তর ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইংরাজী বিদ্যালয় বলিয়া দাবী করিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তির ইতিহাস উপন্যাসের ন্যায় রোমঞ্চকর"...

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল

নয়াদিল্লী হইতে ২২।১২।৩৩ তারিখে এ-পি-রিপোর্টে প্রকাশ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল পাশ হইয়াছে, বিলটি পাশ করিতে পরিষদের কিঞ্চিদধিক একমাস সময় লাগিয়াছে। বেসরকারি সদস্যগণ বিলটি যাহাতে ভারতের আর্থিক দুরবস্থা অপনোদনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়, সেজন্য অনেক সংশোধক প্রস্তাব আনিয়াছিলেন; কিন্তু, বেশীর ভাগই পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। সিলেক্‌ট্ কমিটি হইতে খসড়া প্রকাশিত হইবার পর, লণ্ডনে এই ব্যাঙ্কের একটি শাখা প্রতিষ্ঠার এবং কৃষি ঋণ প্রদান বিভাগ খুলিবার প্রস্তাব দুইটি ইহার সহিত সংযোজিত হওয়াতে, বিলটির অল্প কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে।

সরকার বিরোধীদল যাহাতে মূলতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কটি ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক চালিত হয় ও ভারতীয় স্বার্থরক্ষা করে সেজন্য অনেকগুলি সংশোধক প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবের মধ্যে উপরে লিখিত প্রস্তাব দুইটি বাদে আর কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কারণ, অধুনা পরিষদে মালব্য-নেহেরু নাই। বিরোধীদলের শোচনীয় পরাজয় সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বলিয়াছেন, দলসমূহের উপযুক্ত সংগঠন এবং বহু সদস্যের অনুপস্থিতিই সরকার-বিরোধীদলের পরাজয়ের কারণ। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই সব স্বয়ংসিদ্ধ নেতাদের উপর দেশের স্বার্থরক্ষার কতটুকু ভার ন্যস্ত করা উচিৎ।

বিরোধীদলের সর্ব্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল যে, ব্যাঙ্কটি অংশীদারী ব্যাঙ্ক না হইয়া সরকারী ব্যাঙ্ক হউক। বিপদের মাত্রা কতকটা কমাইবার জন্য পরে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল যে, এক ব্যক্তি ২৫০ শতের উপর অংশ ক্রয় করিতে পারিবেন না। কিন্তু সে প্রস্তাবটিও গৃহীত হয় নাই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া বলিতে হয় যে, বিরোধীদলের প্রস্তাবটিই সর্ব্বাংশে সমীচীন হইত। অংশীদারী ব্যাঙ্ক হওয়াতে অল্প-সংখ্যক ইংরেজ ও ভারতীয় ধনিক কর্ত্তৃকই সমস্ত অংশগুলি ক্রীত হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া গেল। ফলে ব্যাঙ্কটি দেশের স্বার্থরক্ষা না করিয়া এই অল্প-সংখ্যক ধনিকই যাহাতে দেশকে আরও ভাল ভাবে শোষণ করিতে পারেন, তাহারই ব্যবস্থা হইয়া রহিল।

আরও অভারতীয়েরা কত পরিমাণ সেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, (শতকরা অন্ততঃ ৭৫টি সেয়ার ভারতীয়দিগের নিকট বিক্রয় করা হইবে এই মর্ম্মে একটী সংশোধক প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু গৃহীত হয় নাই) অধিকাংশ সেয়ারই যে ভারতস্থিত ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ ক্রয় করিয়া ভারতের আর্থিক সংগঠনকে ভবিষ্যতে নিজেদের মুঠার ভিতর পুরিবার চেষ্টা করিবেন, এ আশঙ্কা করা যাইতে পারে। সত্য বটে, আইন সচিব বলিয়াছেন যে, ব্যবস্থা পরিষদ ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যতে এই বিলটি সংশোধন করিতে পারিবেন; এমন কি, এই অংশীদারী ব্যাঙ্কটিকে সরকারী ব্যাঙ্কেও পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। কিন্তু, ভবিষ্য-পরিষদের এই সম্ভাবিত সৌভাগ্য-

সত্ত্বেও, ভারতের স্বার্থরক্ষিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। ভবিষ্যৎকালে এই বিল সম্বন্ধে যে কোনও প্রস্তাবই হউক না কেন, প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে, বড় লাটের অনুমতি লাভ করিতে হইবে (হোয়াইট পেপার ১১৯ ধারা)। কিন্তু, ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে-প্রস্তাব ব্রিটিশ জনমত কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, সেরূপ কোনও প্রস্তাবই উত্থাপন করিবার অনুমতি বড় লাট কখনই দিবেন না।

আলোচনা প্রসঙ্গে সার জর্জ্জ সুষ্টার বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে শতকরা ৭৫টির বেশী সেয়ারই ভারতীয়গণ ক্রয় করিবেন, ইহা তাঁহার স্থির বিশ্বাস। কিন্তু, এই মর্ম্মের প্রস্তাবটি তাঁহার বিরোধিতার জন্যই বিধিবদ্ধ হয় নাই। তিনি স্বপক্ষে যে-সকল যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার কোনও মূল্য আছে বলিয়া মনে হইল না। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয়গণ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রজাগণের মধ্যে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি করিলে, তাহার ফল ভারতের পক্ষে খারাপ হইবে। সার জর্জ্জের এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রথম কথা এই যে, ভবিষ্যতে যখন এই ব্যাঙ্কটি ভারতের আর্থিক সংগঠনে স্তম্ভস্বরূপ হইবে, তখন ব্যাঙ্কটির উপর ভারতীয়গণেরই মাত্র পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত। কারণ, অতীতে দেখা গিয়াছে, যাঁহারা শুধু দরিদ্র ভারতীয়গণের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত বড় বড় শপথ করিয়াছেন, তাঁহারাই ভারতীয়গণকে নিঃস্ব করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, অভারতীয় ব্রিটীশ প্রজাগণ, ভারতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব থাকিবেন, তাহা হইলেও, ভারতীয়গণ যদি নিজেদের দেশের উন্নতিকল্পে নিজেদের শক্তি নিয়োগ করিবেন, এই দাবী করেন, তবে তাহাকে ভারতীয় ও অভারতীয় ব্রিটীশ প্রজার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হইতেছে বলিলে, নিতান্ত অন্যায় বলা হয়।

একজন গভর্ণর, দুইজন ডেপুটি গভর্ণর ও আটজন অংশীদার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ডিরেক্টর কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কটি পরিচালিত হইবে। ইহার উপর কৃষি প্রভৃতির ন্যায় বিশেষ স্বার্থবিশিষ্ট লোকদের প্রতিনিধি যাহাতে থাকিতে পারেন, সেজন্য বড়লাট ইচ্ছা করিলে চারিজন ডিরেক্টর মনোনীত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতেই স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শেষোক্ত চারিজন ডিরেক্টরকে বড়লাট কাহারও মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই মনোনীত করিতে পারিবেন। এমন কি, রাজস্ব-সচিবের সহিত পরামর্শ করিবারও আবশ্যকতা থাকিবে না। কৃষি এবং তৎসম বিষয়ের স্বার্থরক্ষার জন্য যখন এই চারিজন ডিরেক্টর মনোনীত হইবেন, তখন যাহাতে রাজস্ব-সচিব এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া এই ডিরেক্টরগণকে নির্ব্বাচিত করিবেন, এইরূপ আইনই যে হওয়া উচিৎ ছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আরও একটা কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে সমস্ত বণিকসভা, এবং আর্থিক স্বার্থ-রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে সকল সভা বা সমিতি আছে, তাহার একজন প্রতিনিধিও এই ডিরেক্টরদিগের ভিতর থাকিবেন না। অবশ্য বড়লাট ইচ্ছা করিলে, শেষোক্ত চারিজনের মধ্যে ২।১ জন এই সকল সভার প্রতিনিধিও স্থান পাইতে পারেন। কিন্তু, এই সকল সভা তাঁহাদের প্রতিনিধি মনোনীত হইবার দাবী যাহাতে না করিতে পারেন, সেইজন্যই বোধ হয়, কৃষি ও তৎসম বলা হইয়াছে।

তিনজন গভর্ণর ও ডেপুটি গভর্ণর বড়লাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। তবে সার জর্জ্জ আশ্বাস দিয়াছেন যে, দুইজন ডেপুটি গভর্ণরের মধ্যে একজন যাহাতে ভারতীয় হন, গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। ডেপুটি গভর্ণর দুইজনই ভারতীয় হইবেন এই মর্ম্মে একটি সংশোধক প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু, সার জর্জ্জ সুষ্টার তাহাতে আপত্তি করায় তাহা গৃহীত হয় নাই। আপত্তির প্রথম যুক্তি ভারতীয় ও অভারতীয় ব্রিটীশ প্রজার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করিতে চাহেন না। কিন্তু, এ যুক্তি যে অসার তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ইউরোপের অনেক দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ যাহাতে সেই দেশবাসীই হন, এইরূপ আইন আছে। ব্যাঙ্ক-অব্-ইংলণ্ডেরও পরিচালক-বর্গেরও আইন অনুসারে ইংলণ্ডজাত ব্রিটীশ প্রজা হওয়া দরকার। আর একটি প্রধান আপত্তি, হয়ত ঐ সকল

পদে উপযুক্ত ভারতবাসী পাওয়া যাইবে না। অথচ, সার জর্জ্জ সুষ্টার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ব্যাঙ্কের সকলগুলি উচ্চপদের, এমন কি গভর্ণরের পদেরও যোগ্য। কিন্তু, তাঁহার সন্দেহ, এই সকল ব্যক্তি চাকরি গ্রহণ করিবেন না। আমাদের বিবেচনায় সার জর্জ্জের এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ এই সকল ব্যক্তিকে যদি আহ্বান করা যায়, তবে, তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ তুচ্ছ করিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষায় যে যত্নবান হইবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ কিছু নাই। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, এই সকল ব্যক্তি চাকরি গ্রহণে সম্মত হইবেন না, তাহা হইলেও, এরূপ বিধান থাকা উচিত ছিল, যদি উপযুক্ত ভারতীয় না পাওয়া যায়, তবেই মাত্র অভারতীয় নিয়োগ করা হইবে।

দেশব্যাপী আন্দোলন, বিরোধিতা এবং ভারতীয় বিশেষজ্ঞদিগের প্রতিকূল মত সত্ত্বেও টাকার দর এক শিলিং ছয় পেন্সই থাকিয়া গেল। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমাদের শিক্ষার প্রকৃত গলদ কোথায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সভায় আমাদের শিক্ষার-বাহন সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

"ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা করিতে গিয়া প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই যে, বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা প্রথম ভুল করিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির বন্ধ্যাত্বের এই সর্ব্বপ্রধান কারণ বেশীদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের সমসাময়িক কয়েকজন সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী ইংরাজী ভাষাকে অপেক্ষাকৃত গৌণ মর্য্যাদায় সংস্থাপনের ফল বিষময় হইবে বলিয়া মনে করেন।... ... ... একজন শিক্ষিত লোকের সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। মাতৃদুগ্ধ পানের সময় যে অস্ফুট ভাষায় আমাদের প্রথম বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয়, সেই ভাষার মধ্যবর্ত্তিতাই ন্যূনতম সময়ে এবং প্রকৃষ্ট উপায়ে এই জ্ঞান লাভ করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দু ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান ব্যবস্থার সাফল্য দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি যে এই উপায়ে সংশোধিত হইতে পারিবে, তাহাও বলিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য রায়, পণ্ডিত মালবীয় প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বেও অনেকবার এই কথা বলিয়াছেন।

মহীশূরের শিক্ষাকর্তৃপক্ষও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যে-সকল স্কুলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান করা হয় সেখানকার ছেলেরা ইংরাজী স্কুলের ছেলেদের চেয়ে সকল বিষয়েই অধিকতর যোগ্য।

ভারতীয় নব-পদ্ধতির চিত্রকলা

লণ্ডনে ভারতীয় নবপদ্ধতিতে অঙ্কিত প্রায় একশত খানি চিত্রের একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। চিত্রগুলি বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদের দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল এবং দেশীয় ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিত্র অঙ্কনের যে নবপদ্ধতি প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গীয় পদ্ধতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, এই চিত্রগুলি তাহার সকল প্রকার কার্য্যের সম্যক্ পরিচয় দিতে পারিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বরদা উকীল প্রদর্শনীটির আয়োজন করিয়াছিলেন এবং উদ্বোধন করিয়াছিলেন সার স্যামুয়েল হোর। চিত্রগুলি রেখার বলিষ্ট ভঙ্গীতে, ভাবের গভীরতায়, সুকোমল ঐশ্বর্য্যে এবং সুসমঞ্জস সুষমায় সকল সমঝদার ব্যক্তিদের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল এবং চিত্রজগতে বঙ্গীয় চিত্র-পদ্ধতির যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে স্বার্থের সংঘর্ষ ও রাজনীতিক চালবাজী বিভিন্ন জাতির মধ্যের ব্যবধানকে শুধু বাড়াইয়া চলিয়াছে। চিন্তা ও সৌন্দর্য্যানুভূতির ঐক্যই মাত্র মানুষের মধ্যে এখন সংযোগসেতুর কাজ করিতেছে। ইহা যত দৃঢ় হয়, এই সাধারণ মিলনক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মানুষ যত মানুষের আত্মীয় হইয়া উঠিতে পারে, আমরা ততই

কল্যাণের পথে অগ্রসর হই। সার স্যামুয়েল হোরও ইহার উপযোগিতার কথা এবং মনের উপর ইহার মনেবোচিত স্বাস্থ্য-প্রদ সুফলের কথা বলিয়াছিলেন।

ডাকমাশুল বৃদ্ধিতে ডাক বিভাগের আয় বাড়িয়াছে কি

নিখিলভারত আর-এম-এস কনফারেন্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত এস-সি-মিত্র, এম-এল-এ, তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন :

"১৯৩১ সাল হইতে ডাক মাশুল বাড়িয়াছে, কিন্তু, তাহাতে আয় না বাড়িয়া কারবার অনেক কমিয়া গিয়াছে—এবং তাহার ফলে ৩, ২৮৯ জন ক্লার্ক ও সরটার এবং ২, ৮৬৮ জন পোষ্টমেনের চাকরি গিয়াছে এবং আরও লোককে ছাড়াইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে।......ঘাটতি এত বেশী হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না, যাহাতে জনসাধারণের দাবী অনুযায়ী এনভেলাপের দাম এক আনা এবং পোঃ কার্ডের দাম অর্দ্ধ আনা করা অসম্ভব হইতে পারে।"

ডাকবিভাগ সাধারণ লোকের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র উপায়, এবং বিদ্যাবিস্তারের প্রধান সহায়ক। ইহার পরিচালন ব্যাপারে ব্যবসাবুদ্ধি অপেক্ষা সাধারণের হিত এবং সুবিধার কথাই অধিকতর বিবেচ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু, ডাকমাশুল যদি আরও অনেক বেশী পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া যায় এবং সকলে অল্প প্রয়োজনে ও বিনা কষ্টে ইহার ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলে, ইহার জন-প্রিয়তা বাড়িয়া আয় বেশী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

চীন ও ভারতবর্ষ

চীন শুধুমাত্র ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ নহে, প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে এই উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বর্ত্তমানেও এই দুই দেশের সমস্যা সমূহ অনেকটা এক প্রকারের এবং সে সকলের সমাধানের জন্য উভয় দেশই পরস্পরের অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান হইতে পারিবে।

যদিও ভারতবর্ষ পরাধীন এবং চীন স্বাধীন দেশ, তাহা হইলেও চীনের উন্নতি ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা বাহিরের হস্তক্ষেপে অবিরতই বাধাগ্রস্ত হইতেছে।

বিপুল জনসংঘের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব, বৈদেশিক শোষণ হইতে আত্ম-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, গ্রামগুলির সংস্কার, পৌর ও গ্রাম্য জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরস্পর বিরোধী আদর্শের সমন্বয় সাধন প্রভৃতি সমস্যা উভয় দেশেরই একপ্রকার।

সম্প্রতি চীনের ইয়েন চিং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক মিঃ এইচ-সি-চ্যাং ভারতের পল্লী-সংগঠন চেষ্টা, কৃষি প্রণালী প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন।

প্রাচ্যের সকল দেশেই নবজাগরণের চাঞ্চল্য অনুভূত হইতেছে এবং উন্নতির জন্য সর্ব্বত্রই প্রবল প্রয়াস চলিয়াছে। ভারতবর্ষের ও উন্নতিকামী দেশহিতৈষীগণের এই সকল দেশের কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত লোকদের এই উদ্দেশ্যে এই সকল দেশে প্রেরণ করিতে পারেন।

মিঃ চ্যাং, ভারতের সর্ব্বপ্রকার প্রগতি আন্দোলনের প্রতি চীনবাসীদের সহানুভূতির কথা ও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের পুস্তকাবলী

রামমোহন রায়ের সমগ্র প্রচেষ্টা, চিন্তা ও ভাবধারার সহিত সম্যক পরিচয় না ঘটিলে, ভারতবর্ষের সমসাময়িক ইতিহাসের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এজন্য রামমোহন রায়ের সমগ্র পুস্তক ও নিবন্ধাদির একটি প্রামাণ্য এবং সটীক সংস্করণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। রামমোহনের প্রকৃত স্মৃতিরক্ষার দিক হইতে ইহার মূল্য কম নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ এই প্রকার পুস্তক সম্পাদন ও প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক হইবেন এবং শ্রীযুক্ত অমলহোম প্রভৃতি বিশিষ্ট ও যোগ্য ব্যক্তিরা এই কার্য্যে সহায়তা করিবেন। এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদন কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

পুস্তকখানিতে রাজা রামমোহনের বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, পার্শী এবং হিন্দী সর্ব্বপ্রকার লেখাই স্থান পাইবে এবং ইহাতে টীকা, সুবিস্তৃত সূচী, ঐতিহাসিক ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধীয় ভূমিকা থাকিবে।

নিখিলভারত নারী সম্মিলন

লেডী আবদুল কাদীরের সভানেতৃত্বে কলিকাতা টাউন হলে নিখিলভারত নারী সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হইয়া গেল। কর্ম্মে, চিন্তায় এবং অধিকারে নারীরা যে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহিতেছেন, এবং নারী প্রগতির অগ্রবর্ত্তিনীরা এ সকল বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, তাহা সভানেত্রীর সুচিন্তিত অভিভাষণ এবং সভায় গৃহীত সুদীর্ঘ প্রস্তাবাবলী হইতে বুঝা যাইবে। আমাদের সামাজিক ও অন্যবিধ মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়িত্ব আমাদের অপেক্ষা আমাদের নারীদের কম নহে এবং ইহা উভয়কেই সমভাবে স্পর্শ করে। কাজেই, এলাহবাদ ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপক যে প্রস্তাবটি এই সম্মিলন কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সহশিক্ষা সম্বন্ধে নারীদের প্রতিনিধি মূলক মত বলিয়া তাহার বিশেষ মূল্য আছে। যদিও সভানেত্রী মেয়েদের প্রকৃতি এবং প্রয়োজনের অধিকতর উপযোগী শিক্ষাবিধির কথা বলিয়াছেন এবং যদিও এই প্রকার শিক্ষাবিধির বাঞ্ছনীয়তা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, তবুও একথাও সত্য যে শিক্ষাকে ব্যাপক এবং ইহার বিস্তৃতিকে ত্বরিত করিতে হইলে, বর্ত্তমান সহশিক্ষার প্রবর্ত্তন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

সভাসমিতির কার্য্যাবলী, আলোচনা ও বক্তৃতা যে ইংরাজীতে চালাইতে হয় এবং হিন্দুস্থানীর প্রতি যে এখনও যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করা হয় নাই, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাদের জাতীয়তার পক্ষে একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন এবং এ বিষয়ে হিন্দীর অবিসম্বাদী দাবী ও উপযোগিতার কথা বলিয়াছেন।

ইহা তাঁহার একার কথাও নহে, এবং এ জাতীয় প্রথম কথাও নহে। বড় এবং ছোট সকল নেতাই সময়ে এবং অসময়ে বহুবার এ কথা বলিয়াছেন এবং হিন্দীভাষীরা বিশেষ তৎপরতা উদ্যম ও সঙ্ঘবদ্ধতার সহিত হিন্দীকে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

সমগ্র ভারতবর্ষে একটিমাত্র ভাষা থাকিলে, অথবা সকলের বোধগম্য কোনও সাধারণ ভাষা থাকিলে যে, ভারতবর্ষের যোগাযোগ ঘনিষ্টতর হইত এবং আমাদের জাতীয় ঐক্য আরও দৃঢ় হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যদি শুধুমাত্র একটি সাধারণ ভাষার উপর জোর না দিয়া আমাদের শিক্ষিত লোকেরা নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য যে কোনও একটি প্রধান ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন, অর্থাৎ বাংলাভাষীদের মধ্যে কেহ হিন্দী, কেহ মারাঠী কেহ তামিল কেহ তেলেগু শিখিতেন এবং অন্যান্য প্রদেশবাসীরাও আবার এই নিয়ম অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্টতর হইত।

কোনও একটি ভাষার উপর বিশেষ জোর দিবার প্রধান অসুবিধা এই যে, অন্য ভাষাভাষীরা ইহার অবিসম্বাদী দাবী স্বীকার করিতে চাহিবেন না। সাধারণ ভাষা হইবার দাবী বাংলার বেশী কি হিন্দীর বেশী, সে বিষয়ে অনেক বাঙ্গালীর মনে সন্দেহ আছে।

কোনও একটি প্রাদেশিক ভাষাকে সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া নিবার আর একটি অসুবিধা এই যে, এই ভাষাভাষী বহুসংখ্যক লোক অন্য প্রদেশবাসীদের উপর একটা সুবিধা ভোগ করিবেন। বক্তৃতায়, বিতর্কে এবং শিক্ষায় তাঁহারা যে অধিকতর সুবিধা ভোগ করিবেন, তাহাতে অন্যান্য প্রদেশবাসী লোকদেরই কতকটা অন্যায় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে।

আরও একটা কথা এই যে, বর্ত্তমানে বাধ্য হইয়াই বাহিরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে এবং কোনও সময়ে বাধ্যতার অভাব ঘটিলেও, বাহিরের সহিত সম্বন্ধ রক্ষার প্রয়োজন চিরদিনই থাকিবে। এদিক দিয়াও নিখিল-ভারতীয় ব্যাপার সমূহে ইংরাজীভাষার ব্যবহার অবাঞ্ছনীয় নহে।

বাঙ্গালী পদার্থবিৎ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ

তরুণ বাঙ্গালী পদার্থবিৎ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ লণ্ডনের ইন্‌ষ্টিটিউট অব ফিজিক্সের এসোসিয়েটসিপ প্রাপ্ত

হইয়াছেন। তরুণ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারী হইলেন। শ্রীযুক্ত সি-ভি-রামণের আবিষ্কৃত মতের প্রতিবাদ করিয়া লণ্ডনের বৈজ্ঞানিক পত্রিকা গুলিতে ইনি অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধগুলি বিশেষজ্ঞ মহলে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক কে-সি-করের শিক্ষাধীনে গবেষণা করিতেছেন

জার্ম্মানিতে উচ্চ-শিক্ষা

গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে জার্ম্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। শারীরিক ও মানসিক পরিণতি, নৈতিক চরিত্র এবং জাতীয় বিশ্বাসের যোগ্যতানুসারে মাত্র ১৫,০০০ হাজার ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্য গ্রহণ করা হইবে। প্রতি দশজন ছাত্রে একজন ছাত্রী গৃহীত হইবেন। ক্রমে এই সংখ্যা আরও কমান হইবে। আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি শিক্ষার উচ্চ-বিভাগে ছাত্র কমাইবার কথা বলিতেছেন। যদিও জার্ম্মানির শিক্ষার সমগ্র অবস্থা এবং আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা এক নহে এবং কোনও প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে সে কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

জাপান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি

শেষ পর্য্যন্ত জাপান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তির চেষ্টা সফল হইল। বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার আন্তর্জ্জাতিক স্বীকৃতি হিসাবে হয় ত ইহার কিছু মূল্য আছে। জাপান ভারতের তুলার বড় খরিদ্দার এবং এই বিবেচনাই ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মনোভাবকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কাজেই, ইহাতে বাংলার দিক হইতে সুবিধা কিছুই হইবে না। এই চুক্তিটা শুধুমাত্র কার্পাসজাত দ্রব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জাপান ৩২ কোটী ৫০ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানি করিবার পরিবর্ত্তে দশ লক্ষ বেল তুলা ক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং ১৫ লক্ষ বেল তুলা ক্রয় করিলে ৪০ কোটি গজ বস্ত্র রপ্তানি করিতে পারিবেন। বার কোটি ৬০ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানি করিবার জন্য তুলা ক্রয়ের কোনওরূপ বাধ্যতা থাকিবে না।

গত পাঁচ বৎসরে জাপান গড়ে বার্ষিক ৩৮ কোটি গজ বস্ত্র ভারতে রপ্তানি করিয়াছে এবং ১৫ লক্ষ বেল তুলা ক্রয় করিয়াছে।

সুশীলকুমার বসু
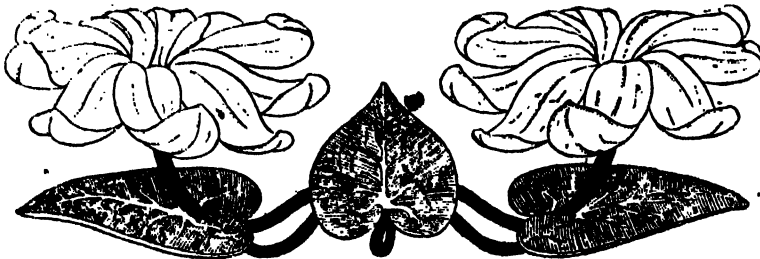
নানা কথা

রামমোহন রায়

রামমোহনের মৃত্যুর শতবর্ষ পরে আজ আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের পূজা নিবেদন করলাম, উপলব্ধি করলাম তাঁর মহত্ত্ব, সুললিত ও আবেগময় শব্দের ঝঙ্কারে তাঁর গুণকীর্ত্তন করে অন্তরের মধ্যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলাম। এই স্মৃতি-পূজার অনুষ্ঠানে কোনো সম্প্রদায়-ভেদ ছিল না; সকল সম্প্রদায়ই একত্র মিলিত হ'য়ে অন্তরের গভীরতম তল থেকে শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য আহরণ করে নিবেদন করেছি, রামমোহনের স্মৃতির উদ্দেশে এটা শুভ লক্ষণ। এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে বর্ত্তমানে ভারতের আকাশ সম্প্রদায়-বিরুদ্ধের মেঘে যতই আচ্ছন্ন থাক্ না কেন,—রামমোহন আমাদের জন্য যা' কিছু চিন্তা করেছিলেন, কর্ম্ম করেছিলেন—তা' একেবারে বৃথা হয় নি। তখন আমাদের এই স্মৃতিপূজার অর্ঘ্য যদি শব্দ-ঝঙ্কারের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে না,—যদি প্রতিদিনকার কর্ম্ম থেকে রস আহরণ করে তাকে সজীব ও তাজা রাখ্‌তে পারি,—তবেই বলব,—আমাদের এই পূজায় আন্তরিকতা ছিল।

বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন জাতির সমন্বয় ও মিলন,—এই হোলো ভারতবর্ষের চিরকালের এবং বর্ত্তমানের সাধনা। এই সাধনার সিদ্ধিমন্ত্রটি রামমোহন আমাদের দিয়ে গিয়েছেন তাঁর জীবনে ও কর্ম্মে। মতভেদ সত্ত্বেও মানুষ এক। এক সার্ব্বজনীন দেব-মন্দিরের সিংহাসনতলে বিশ্বের মানুষ এসে মিলিত হ'বে,—জ্ঞানে, প্রেমে ও শুভকর্ম্মে,—এই ছিল রামমোহনের কৈশোরের স্বপ্ন। তাঁর এই ঐক্যবোধ নিয়ে মানুষের ভেদ-বুদ্ধিকে তিনি আঘাত করেছেন বারে বারে। সেই ভেদ-বুদ্ধির চারিধারে যুগ যুগ ধরে নির্ম্মিত দুর্ভেদ্য প্রাকার তিনি ভেদ করতে সমর্থ হ'য়েছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত,—দিয়েছিলেন তাঁর কিশোর স্বপ্নকে প্রথম রূপ। সেই ব্রাহ্ম-সমাজ আজ শতাব্দীর ঝড়-ঝাপ্‌টা মাথায় বহন করে মানবজাতির গৌরবময় ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করে আছে, হয়-ত বা কখনো কখনো তার বাহ্যিক রূপটা অহিফেনতার বেড়াজালে আবদ্ধ হ'য়ে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে,—কিন্তু তার অন্তরের অনুপ্রেরণা মৃত্যুঞ্জয়ী, তা' দিন দিন বিস্তীর্ণ হ'য়ে অবস্থান্ করছে মানুষকে ঐক্যের পতাকাতলে এসে মিলিত হবার জন্য।

মানুষের মধ্যে বিচিত্রতার অন্ত নেই, এই বৈচিত্র্যে মনুষ্যত্ব সমৃদ্ধ; এবং ঠিক সেই জন্য ঐশ্বর্য্যের মধ্যে দিশেহারা হ'য়ে সাধারণ মানুষ মাঝে মাঝে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়েই থাকে। মানুষের চিন্তা বিচিত্র, অনুভূতি বিচিত্র, কর্ম্ম বিচিত্র,—আদর্শ বিচিত্র, আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র, সাধনা বিচিত্র; তাই সমৃদ্ধ ঐক্যের মধ্যে এই বৈচিত্র্যের সমন্বয়-সাধনের জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব। রামমোহনের জীবনে নিবিড় ধর্ম্মোপলব্ধির মধ্যে সকল বৈচিত্র্যের সমন্বয় ঘটেছিল, তাঁর বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁকে পরিচালিত করেছিল,—তাঁর গভীরতম অন্তরের একটি নিবিড় উপলব্ধি, ধর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শের সংঘাতের কোলাহলের মাঝখানে তিনি নিপুণ যাদুকর শিল্পীর মত প্রত্যেক আদর্শটির তারে তারে বাজিয়েছিলেন এমন সুর,—যার পরিপূর্ণ সঙ্গতিতে সৃষ্টি হ'য়েছিল একটা বিরাট ঐক্যতান। তার রেশ শতাব্দী পার হ'য়ে এসে এখনো বাজে আমাদের কানে। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই ঐক্যতান বাজিয়ে আমরা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি,—কিংবা কোলাহলের মাঝখানে জীবনটাকে ব্যর্থ করে ফেলতে পারি। রামমোহন আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন—আমাদের কোন্ পথ।

ভারতের ইতিহাসে এমন একটা যুগে রামমোহনের জন্ম হ'য়েছিল,—যে মনে হয় অনেক শতাব্দীর ও দারিদ্র্যের দুঃখ বহন করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ভগবানের আশীর্ব্বাদ থেকে

বঞ্চিত হয় নি। সে যুগকে ভারতের ইতিহাসে অন্ধকারতম যুগ বললেও অত্যুক্তি হয় না। মধ্যযুগের সে মানসিক শক্তি যা বৈষ্ণব ও সুফী সাহিত্যের খরস্রোতে ভারতের প্রাণশক্তিকে স্ফূর্ত রেখেছিল এবং অপরিসীম সাহসের সহিত হিন্দু-মুসলমানের মত দুটি বিভিন্ন, এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণ বশতঃ বিরোধী কৃষ্টির মধ্যে সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস পেয়েছিলেন,—সে শক্তি তখন হ'য়ে এসেছিল ক্ষীণ এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন সুপ্তির মধ্যে বিরামলাভ করেছিল। অপরপক্ষে ভারতীয় মনের যা' চিরকালের স্বভাব,—ভাব ও ভাবনার সঙ্গে চিত্তের একটা অচ্ছেদ্যপ্রায় বন্ধন,—তারই ফলে যুগ-যুগের সঞ্চিত অনেক প্রাণহীন প্রথা ও সংস্কার নিশ্চল পাথরের মত জাতীয় জীবনের স্রোতকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। রামমোহন আনলেন এই শোচনীয় বদ্ধনদশা থেকে মুক্তির বাণী, ভারতীয় মেধাকে করলেন পুনঃ-সঞ্জীবিত;—নইলে প্রতীচ্যের মত এমন শক্তিশালী চিত্তের সংঘাতে বোধ হয় ভারতের ইতিহাসের বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ রচিত হ'ত অন্যভাবে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় রামমোহনের জীবনের ও রচনা-বলীর প্রভূত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। শুধুই রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষে বীরপূজা নয়, রামমোহন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে জ্বালিয়েছিলেন যে-আলো,—সেই আলো প্রজ্জ্বলিত করতে হ'বে আমাদের জাতীয় জীবনে। সেই আলোকেই আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার একমাত্র সমাধান।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

ভারতীয় বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠাতা এবং বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালীর অন্যতম প্রবর্ত্তক হিসাবে,—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আমাদের দেশবাসীর চির-স্মরণীয়। ঠিক একশ' বছর আগে,—যে বৎসর রামমোহন-রায়ের মৃত্যু হয় সেই বৎসর ২রা নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করে সুদীর্ঘ একাত্তর বৎসরের জীবন তিনি দেশ-সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা, তেজস্বিতা, স্বদেশপ্রাণতা, অদম্য শক্তি ও উৎসাহ, অক্লান্ত কর্ম্মক্ষমতা নিয়ে তিনি নেমেছিলেন একটা বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে। বিশ্ব-বিদ্যালয়, ব্যবস্থাপক সভা, কলিকাতা মিউনিসিপালিটি, এসিয়াটিক সোসাইটি, আমেরিকার ইন্‌ষ্টিটুট অফ হোমিও-প্যাথি,—সর্ব্বত্র তিনি অকাতরে পরিশ্রম করতেন। বিজ্ঞানের প্রতি যে তাঁর শুধুই অসীম অনুরাগ ছিল তা' নয়,—তিনি সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন, যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের চিন্তাধারা যে পথে পরিচালিত হ'য়েছে তার সঙ্গে নিবিড় যোগ না রাখ্‌তে পারলে দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত। তাই তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করে ভারতীয় বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। এটা তাঁর চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি,—অন্য কোনো কাজ না করলেও, এরই জন্য তিনি দেশবাসীর স্মৃতিতে চিরকালের জন্য আসন দাবি করতে পারতেন।

তাঁর পরিচালিত "Journal of Medicine" আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হ'য়েছিল। এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে তাঁর অন্তরে ছিল পীড়িত মানবের জন্য অসীম দরদ। দেওঘরে তিনি একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন,—দরিদ্র ছাত্রদের তিনি অকাতরে সাহায্য করতেন।

তাঁর মৃত্যু হ'য়েছিল ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ সালে। আমরা আশা করি, আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী উপযুক্ত ভাবে তাঁর স্মৃতিপূজার আয়োজন করা হ'বে।

পরলোকগত হরেন্দ্রলাল রায়

বিগত ১৫ই পৌষ আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, চিন্তাশীল সাহিত্যিক হরেন্দ্রলাল রায় এম-এ, বি-এল্ মহাশয় তাঁর ভাগলপুরের জাহ্নবী নিবাস ভবনে ইহজীবন পরিত্যাগ করেছেন। কিছুকাল হ'তে তিনি ব্যাধি পীড়িত দেহে একেবারে শয্যাগত ছিলেন; সুতরাং এই দুর্দ্দিন যে আসন্ন হয়ে আসছিল তা অনুভব ক'রে আমরা সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকতাম।

হরেন্দ্রলাল ছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহোদর,—অগ্রজ। এ পরিচয়ে তাঁর বংশের পরিচয় হয়ত অনেকের নিকট প্রতীয়মান হ'ল, কিন্তু তাঁর নিজের দিক থেকে এ পরিচয় যে কোনো পরিচয়ই নয়, ব্যক্তিগত ভাবে যাঁরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁরা সে কথায়

প্রেম ও প্রতিমা

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস এম-এ, বি-এল

১

গোধূলির লগ্ন শেষে ধরিত্রীর বক্ষে যথা তিমিরের নিঃশব্দ সঞ্চার,
রজনীর শেষ অঙ্কে অতিমাত্র অনায়াসে পূর্ব্বাচলে জাগে যথা রবি;
কিশোরীর বক্ষমাঝে ইঙ্গিতের মতো যথা জেগে ওঠে কাম ক্ষুরধার,
তেমনি আমার মনে আপনি ভাসিয়া ওঠে ওই তব কমনীয় ছবি।
ভুলে যাবো ভুলে যাবো যত ভাবি ভুলে যাবো, ভুলে যাবো ও মূর্ত্তি তোমার,
ভুলিতে পারি না আমি! ভোলা কি সহজ কথা ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য করবী?
আমার এ রূপ-ক্ষুধা প্রচণ্ড পিপাসা এ যে মায়ামরু মৃগ-তৃষ্ণিকার;
তোমার সৌন্দর্য্যে আমি অন্ধ-আঁখি! তাই আমি নব নব সৃষ্টির গরবী!
তুমি তো জানো না, হায়, নিজেরে হারায়ে আমি হয়ে আছি শুধু তোমাময়,
আমার মুহূর্ত্তগুলি তোমার মধুর নামে বিরহ-বিধুর স্ফুরমান;
দিন-ভোর শান্তি নেই, রাত্রি-ভোর নিদ্রা নেই, আনন্দের নেই যে সময়,
তোমার ধ্যানের ছন্দে স্পন্দিত হইয়া নিত্য আজ আমি রচি তব গান।
ধ্যান-কৃশ তনু মোর তোমার রূপের স্বপ্নে প্রেমানন্দে হয়েছে চিন্ময়,—
বাহুতে হবে না বন্দী, ছন্দে আমি আঁকি তাই রূপ তব অক্ষয় অম্লান।

২

তোমারে বেসিছি ভালো একান্ত আপন মনে হৃদয়ের অনন্ত গহনে,
তোমার ওমূর্ত্তি, সখি, বারে বারে ভুলিবারে চেষ্টা আমি নিত্য করি বৃথা,
প্রতি দণ্ড প্রতি পল তব স্মৃতি অবিচল জাগিয়া রহে যে দেহ-মনে,
গোপন অন্তরে মোর ধ্বনিত হও যে নিত্য, সুবিচিত্রা প্রজ্ঞাপারমিতা!
তোমারে বেসেছি ভালো, এ কথা জানে না কেহ, জানেনাক বিশ্ববাসীজনে,
তুমিও জানো না হায়, কেঁদে কেঁদে কে কোথায় রচিতেছে মরণের চিতা,
অন্তরে লুকায়ে রেখে উত্তপ্ত আশ্লেষ ভরে ভাবে নিত্য স্তব্ধ ধ্যানাসনে
তোমার কুমারী মূর্ত্তি,—কি দারুণ শান্তি সে যে! হে মোর দীপ্তা অপরিচিতা!

তোমারে বেসেছি ভালো, এ কথা তুমিও হায় স্বপনেও জানিবে না কভু,
তবুও গোপনে হায় বাঁচায়ে রাখিতে হবে সবার মনের অন্তরালে,
এমনি নিঃসঙ্গ হয়ে মনেরে বঞ্চনা করি স্পর্শ-সুখ পেতে হবে তবু,—
একটী সে নারীদেহ, তিল তিল রেখা তার বিচ্ছুরিত দিকচক্রবালে।
কল্পনা রোমাঞ্চসুখে মনের মুকুরে মোর অপরূপ অপূর্ব্ব সে নিধি
সন্ধ্যার আমেজ সম অলক্ষিতে ফিরে এলো রঙহীন আকাশ পরিধি।

৩

তোমার ও বরতনু প্রস্ফুটিত রূপে যেন, গন্ধে আমি মুগ্ধ হয়ে রই,
দূর হ'তে ঘ্রাণ লয়ে, ফিরাইয়া লই মুখ, আঁখি মুদি অলস আকুল ;
তোমার ও দেহ-পদ্ম দেখি আর শ্বাস রুধি কামনাকাতর মত হই
নিমিষের তরে শুধু সসঙ্কোচে দেখে লই রাঙা গাল, ঠোঁট আর চুল।
তোমার ও রূপ হেরি মনোমাঝে কেঁদে ওঠে সলজ্জিত প্রথম প্রণয়ী,
কুণ্ঠিত ও তনু ঘেরি অমেয় রহস্য কত ভেবে মন বেদনা আকুল ;
তোমার তনুর ছন্দে আমার বেসুরা প্রাণে দু-চারিটী সুর গেঁথে লই
তুমি যবে আনমনা একান্ত নিকটে এসে ছুঁয়ে যাও আলতো আঙুল।

হয়তো কখনো তুমি শুধু মুহূর্ত্তের তরে মোর পানে হাসি-মুখে চাও,
অঙ্গের সুবাস ঢালি দু-চারিটী কথা কয়ে সহজে যাও গো কভু চলি,
তুমি তো জানো না, সখি, তোমার দেহের স্বাদ পিছনে রাখিয়া তুমি যাও,
আমি তাহা বহুক্ষণ সুখে করি আস্বাদন, শিহরণে পড়ি আমি ঢলি।
স্পর্শের তরঙ্গগুলি পিছে যাহা ফেলে যায় সুন্দর সুডৌল তনুখানি
অগাধ রোমাঞ্চসুখে আমি তাহে করি স্নান, স্পর্শস্নিগ্ধ অবশ পরাণি।

৪

সামান্য নারীর মত তুমিও পাতিবে ঘর, হবে জায়া ললিতা প্রেয়সী,
তোমার ও স্বর্ণতনু স্বর্ণমূল্যে বিকাইবে পুরুষের পরশপীড়নে,
সৃজন-আনন্দ মোহে কুমারীর মধু দিঠি খসিবে সলজ্জ শিহরণে,—
তবুও ভাবি যে আমি তুমি দেবী, কাব্যলক্ষ্মী, অসামান্যা মহামহীয়সী!
তোমারে পাবো না কভু, দুঃখ তাহে নাহি কিছু হে অস্পৃশ্যা সুন্দরী শ্রেয়সী,
এই যে দারুণ জ্বালা সহিতেছি তনু মনে প্রতি পলে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
তাতেও নাহিক দুঃখ, মৌনমুখে সয়ে র'ব অভ্রভেদী আত্মবিসর্জ্জনে,—
তোমার ও নাম-মন্ত্রে সৃজি লব মহাতীর্থ মহাকাল অনন্তবয়সী।

এই দুঃখ শুধু মনে তব দেহ-পদ্মমধু অপরে করিবে আস্বাদন,
সামান্য নারীর মত তুমিও পাইবে সুখ আপনারে করি অর্ঘ্যদান ;
আমার অদেখা তনু অপরে দেখিবে খুঁটি প্রতি অণু করি উদ্‌ঘাটন,—
আমার সে মহাতীর্থ আমি যা পূজিব নিত্য কামনার কেলী পুষ্পোদ্যান!
এ দুঃখ কাহারে কব, আমার নীরব স্তব একান্ত অক্ষম অসহায়,
কোথাও কাহারো মন বিপুল বিরহ সহে র'বে না র'বে না প্রতীক্ষায়।

দেবেন। এঁদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং অনেক গৃহ এঁরা আনন্দময় করে তুলুন এই আমাদের প্রার্থনা।

ফরিদপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী এবং সাহিত্য সম্মেলন

গত ৭ই জানুয়ারী হ'তে ফরিদপুরে একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী আরম্ভ হয়েচে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার বি-এল এই প্রদর্শনীর সভাপতি হয়েচেন। প্রদর্শনীটি মাসাবধিকাল খোলা থাকবে এবং আগামী ২৭শে ও ২৮শে জানুয়ারী প্রদর্শনীতে একটি সাহিত্য সম্মেলন করবার ব্যবস্থাও হয়েচে। উক্ত সম্মেলনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন। প্রদর্শনীর সাধারণ সভাপতি শ্রীযুক্ত লাল মিঞা সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অমায়িক আচরণের ফলে প্রদর্শনী এবং সম্মেলন উভয়ই যে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই।

কলিকাতায় এম, সি, সি

গত ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে এবং জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে কলিকাতায় ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় এম, সি, সির সহিত ভারতীয় বিভিন্ন দলের যে খেলা হয়েছিল এখানে তার বিবরণ দেবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ অনেকে স্বচক্ষে সে-সকল খেলা দেখেচেন এবং যাঁরা দেখেন নি তাঁরা বন্ধুবান্ধবের মুখে কিম্বা দৈনিক সংবাদপত্রে সে বিষয় অবগত হয়েচেন। আমরা শুধু নিখিল ভারত খেলোয়াড়দের সহিত এম, সি, সির চতুর্দ্দিবসব্যাপী প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করে ক্রিকেট খেলায় বাঙালীদের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটি কথা বলতে চাই। নিখিল ভারত দলের মধ্যে একজন বাঙালীকেও খেলার জন্যে নেওয়া হয়নি তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছিনে, কারণ নির্ব্বাচন জাতির মুখ চেয়ে হওয়া উচিত নয়, খেলোয়াড়ের যোগ্যতা অনুসারেই হওয়া উচিত,—এবং সম্ভবত বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল;—যদিও শ্রীযুক্ত কে বসুকে বাঙ্গালীর পক্ষ থেকে নির্ব্বাচিত করা উচিত ছিল বলে অনেকেই মনে করেন;—আমরা শুধু এই কথা বলতে চাই যে কেবলমাত্র এম, সি, সি দলের খেলোয়াড়দের খেলা দেখেই নয়, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশেরও খেলোয়াড়দের খেলা দেখে এ কথা বুঝতে কারো বাকি ছিল না যে ক্রিকেট খেলায় বাঙালীরা অন্যান্য জাতির বহু পশ্চাতে প'ড়ে আছে। কলিকাতায় খেলা হ'ল অথচ সমস্ত বাঙলা দেশ থেকে একটিও উপযুক্ত খেলোয়াড় পাওয়া গেল না, এ সত্যই লজ্জার কথা। হয়ত এ অযোগ্যতার জন্য বাঙালী জাতির দরিদ্রতাই প্রধানত দায়ী, কারণ অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য অফিসাদিতে দেহ ক্ষয় না ক'রে সমস্ত দিন বহুব্যয়ে প্রস্তুত মাঠে ক্রিকেট খেলা অভ্যাস করবার মত স্বচ্ছল অবস্থা বেশি বাঙলীর নেই, এবং যাদের আছে তাঁরা সাধারণতঃ তাকিয়া আলবোলা ইত্যাদি ফরাসোচিত সামগ্রীর পক্ষপাতী। কিন্তু বাঙালী জাতির অবহেলাও যে এ বিষয়ে অংশত দায়ী সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। আশা করি এবারের এই অপমানের গ্লানি ভবিষ্যতের শিক্ষার সম্পদ হয়ে থাকবে।

এম্ সি সিও কলিকাতায় এই কথা প্রমাণ ক'রে গেছেন যে অতি লোভে তাঁতী শুধু একবারই নষ্ট হয়নি, এখনও মাঝে মাঝে হ'য়ে থাকে। ভারতবর্ষের অপমানের মাত্রা বাড়াবার মোহে তাঁরা নিজেদের সৌভাগ্যকে খর্ব্ব ক'রে গেছেন—এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন। অপর পক্ষে ভারতীয় দলের নেতা শ্রীযুক্ত নাইডুর বিবেচনা শক্তির প্রশংসা সকলেই করছেন।

মাতৃ-ক্লিনিক

কলিকাতার মধ্যবিত্ত পরিবার সমূহের সুচিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য ১৬৬ নং হ্যারিসন রোডস্থ মাতৃ-ক্লিনিক থেকে একটি চিকিৎসক সঙ্ঘের আয়োজন করা হয়েছে। বিলাতে শ্রমিক শ্রেণীর চিকিৎসার জন্য এই রকম Panel of Doctorsএর ব্যবস্থা আছে,—তার জন্য সরকার থেকে অনেক টাকা খরচ করা হয়। আমাদের দেশে দরিদ্র পরিবার সমূহের চিকিৎসার জন্য সে রকম কোনো ব্যবস্থা করা আজও সম্ভব হয়নি। মাতৃ-ক্লিনিক থেকে কয়েকজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক মিলে একটা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছেন। আপাততঃ ছয় মাসের জন্য পরীক্ষা করে দেখা হ'বে,—এমন কোনো ব্যবস্থা এদেশে চলে কিনা। যদি চলে ত পাকাপাকি ব্যবস্থা হ'বে। কলিকাতার মধ্যবিত্ত অবস্থার পরিবারবর্গ সামান্য কিছু মাসিক বা ত্রৈমাসিক চাঁদা দিয়ে এই ব্যবস্থার সমস্ত সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ সাধারণ রোগের জন্য সকাল নটা থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত তাঁরা বিনামূল্যে একজন সুচিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র পেতে পারেন,—ঔষধের মূল্য অবশ্য আলাদা লাগবে। কঠিন ব্যাধির সময় যদি কোনো বিশেষ পারদর্শী চিকিৎসকের পরামর্শের প্রয়োজন হয়,—তবে সেই চিকিৎসকের নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক অপেক্ষা অল্পমূল্যে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাতৃ-ক্লিনিকে আবেদন করলেই বিস্তৃত নিয়মাবলী পাওয়া যাবে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই রকম কোনো ব্যবস্থার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে—তা নিঃসন্দেহ। শুধুই দরিদ্র পরিবারবর্গের দিক দিয়ে নয়, চিকিৎসা ব্যবসায়ের দিক দিয়েও, এরকম ব্যবস্থা যদি চর্লে ত দেশের কল্যাণই হ'বে। মানুষের জীবনে রোগ আছেই, এবং তার চিকিৎসারও প্রয়োজন। অথচ রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত বিচক্ষণ চিকিৎসকের জীবনধারণোপযোগী পারিশ্রমিক দিতে দেশের বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের সময় অধিকাংশ লোকই অক্ষম। শুধু কলিকাতার কথাই যদি ধরি,—তবে দেখা যায় কলিকাতায় রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাঁদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই জীবিকা অর্জ্জন করা এক রকম সমস্যার ব্যাপারই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,—তার কারণ চিকিৎসকের পারিশ্রমিক দেওয়াটা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই বিশেষ দুরূহ। অনেকেরই আবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহ না কেহ ডাক্তার আছেন। তাঁদের পরিবারবর্গের বিনামূল্যেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'য়ে যায়; যাঁদের সে সুবিধা নেই, তাঁদের পক্ষে অনেক সময়েই বিনা চিকিৎসায় রোগের নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, যদি না তাঁরা কোনো দয়ালু চিকিৎসকের সাহায্য বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারেন। এ রকম অবস্থায় চিকিৎসা ব্যবসায়ের মত অতি প্রয়োজনীয় ব্যবসাতেও দেশের মেধা আকৃষ্ট হওয়া শক্ত। এখনো যে চিকিৎসা-শিক্ষালয়গুলিতে ছাত্রের অভাব হয় না, তার কারণ বোধ হয় এই যে অন্য সকল ক্ষেত্রেই অর্থাগমের পথ এক রকম বন্ধ। মাতৃ-ক্লিনিকের প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-সঙ্ঘের পরীক্ষা যদি সফল হয়, তবে দরিদ্র পরিবারবর্গও অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়েরও ভবিষ্যৎ একেবারে নৈরাশ্যপূর্ণ হয় না।

টকি শো হাউস্

বিগত ১লা জানুয়ারী শ্যামবাজার ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটের 'টকি শো-হাউসে'র উদ্বোধন উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়েচে। উদ্বোধন ক্রিয়ার সভাপতিত্ব করেছিলেন কলিকাতার সুপরিচিত নাগরিক এবং ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত মহাশয়। এই চিত্রায়তনটি পূর্ব্বে নির্ব্বাক ছিল, শ্রীযুক্ত নীলমণি দে এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অদম্য উদ্যমের ফলে সম্প্রতি সবাক্ হ'য়েচে। তদুপলক্ষেই উদ্বোধন-উৎসব। কর্ত্তৃপক্ষ মূল্যবান যন্ত্র স্থাপিত করেছেন, কিন্তু শুধু সেজন্যই নয়, প্রধানতঃ সৌভাগ্য বশতই বোধ হয়, চিত্রগুলির বাক্যস্ফুরণ হয়েচে অতি সুস্পষ্ট। চিত্রকয়টিকে যে-ভাবে আমূল সংস্কৃত করা হয়েচে তার মধ্যে সুরুচির পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। উত্তর কলিকাতার ভদ্রপল্লীতে অবস্থিত এই চিত্রালয়টি যে জনপ্রিয় হয়েচে তার পরিচয় আমরা গভীর রাত্রেও আমাদের কার্য্যালয়ে বসে পাই যখন অভিনয়ান্তে গৃহগামী দর্শকবৃন্দের কণ্ঠরবে এবং পদশব্দে ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট্ মুখর হয়ে ওঠে।

বৎসরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছোট গল্প

১৩৩৯ সনে প্রকাশিত ছোট গল্পগুলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়েকটি নির্ব্বাচন করে একখানি পুস্তক প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেছেন—মেসার্স পি-সি সরকার এণ্ড সন্স। এ ধরণের চয়ন-পুস্তক ইংরাজী সাহিত্যে আছে,—আমাদের সাহিত্যে এ চেষ্টা এই প্রথম। আশা করি এ চেষ্টা ফলবতী হবে, কেননা এ ধরণের পুস্তকের বাজারে চাহিদা আছে বলে মনে হয়। নির্ব্বাচন যদি ভালো হয়, তবে সমালোচনার পক্ষে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সাহিত্যের হিসাব নিকাশ করবার জন্য, এ পুস্তক কিছু সহায়তা করতে পারে। গল্প নির্ব্বাচনের ভার পড়েছে,—আমাদের উপর। কাজটি কঠিন কিন্তু আমরা সাধ্যমত শ্রেষ্ঠগল্প নির্ব্বাচনেরই চেষ্টা করব সে কথা বলাই বাহুল্য।

হুগলী জেলা সাহিত্য-সম্মেলন

এই সাহিত্য-সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র (ইনি রাজা দিগম্বর মিত্রের সুযোগ্য বংশধর—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য) সাহিত্য-সম্মেলনগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন,—তা' প্রণিধানযোগ্য। এইখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল—

"জাতীয় জীবনে এরূপ সাহিত্য সম্মেলনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সাহিত্য শুধু জীবনের আলেখ্য নয়, সাহিত্য দেয় জীবনে প্রেরণা। নিখিল বিশ্ব-জীবনের দিকে দিকে যেখানেই নব নব আন্দোলন সৃষ্টি হয়েচে, তাদের সকলের মূলে ছিল সাহিত্যের প্রভাব। রাজনৈতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আছে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোন মুক্তি-যজ্ঞের জন্যে যে দুর্জ্জয় শক্তির প্রয়োজন, সাহিত্যিক সৃষ্টি করে সেই শক্তি। আর রাষ্ট্র নেতা সেই শক্তিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যথা স্থানে সমাবেশ করে। সমাজের কল্যাণের কাজে যদি রাজনৈতিক নেতার জীবনের প্রয়োজন থাকে তার চেয়ে ঢের বেশি প্রয়োজন আছে সাহিত্যিকের। তাই মনে হয়, আজ দেশে যদি এই ধারণা জন্মে থাকে যে সাহিত্য শুধু জাতির বিলাসের পরিচয়, জাতির এগিয়ে যাওয়ার পথে তার প্রভাব অতি সঙ্কীর্ণ, তাহ'লে, সে ধারণাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারব না।"

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Satatchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259 Upper Chitpore Road, published by and the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

সাক্ষ্য দেবেন। আধুনিক পাঠক সমাজে হয়ত হরেন্দ্রলাল কতকটা অপরিচিতই ছিলেন,— কিন্তু এককালে তিনি 'নবপ্রভা' মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, এবং তাঁর চিন্তাভাবোদ্দীপক রচনাবলী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করত। হরেন্দ্রলাল ছিলেন নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, উদারচেতা, সুবক্তা, জ্ঞানী, পণ্ডিত। সর্ব্বপ্রকার নীচতা এবং হীনতাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা এবং বর্জ্জন করতেন। পঠনপ্রিয়তায় তাঁর সমকক্ষ আর একজনকে আবিষ্কার করা কঠিন ছিল, —জরা এবং ব্যাধির তাড়নায় জীবনীশক্তি যখন স্তিমিত অপচিত, তখনো গ্রন্থ ছিল তাঁর পার্শ্বসহচর। হরেন্দ্রলালকে স্মরণ ক'রে মনে হয়, তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর ব্যক্তি যে-শ্রেণী ক্রমশ যেন ক্ষয়ই পাচ্ছে বৃদ্ধিলাভ করছে না। তাঁর মৃত্যুতে ভাগলপুর সহর একজন বিশিষ্ট নাগরিক থেকে বঞ্চিত হল। হরেন্দ্রলালের শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে আমরা আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন

গত ৯ই জানুয়ারী মঙ্গলবার কলিকাতার আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গোলদীঘির মহাবোধি সোসাইটি হলে পরলোকগত মৃদঙ্গাচার্য্য নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-তর্পণে একটি শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন ক'রেছিলেন সঙ্গীত বিশারদ রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ছোটে খাঁ সাহেব, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বাবু, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সহরের বহু খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ সভার কার্য্যে যোগদান ক'রে মৃতব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। স্বর্গীয় মৃদঙ্গাচার্য্যের জীবনী এবং কীর্ত্তি সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়, দুর্লভ বাবু, গোপেশ্বর বাবু, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আলোচনা করেছিলেন। ৺নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেণীর মৃদঙ্গবাদক শুধু বাঙলা দেশেই নয় সমগ্র ভারতবর্ষেও বিরল। সঙ্গীতের অপরূপ রূপটির পরিপূর্ণ উপলব্ধি ছিল ব'লে মৃদঙ্গ সঙ্গতের দ্বারা যে কোনও গায়কের গানকে তিনি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ করতে পারতেন। নগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে বাঙলা দেশের সঙ্গীত গগনের একটি দিক অন্ধকার হয়ে গেল। বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ৬৮ বৎসর বয়সে নগেন্দ্রবাবু পরলোক গমন করেন।

গত এলাহাবাদ নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে বাঙলার যে সকল কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীত বিশারদ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন তাঁদের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিগত ৬ই জানুয়ারী আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক একটি উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন অধিকার ক'রেছিলেন শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র মিত্র এম-এ ডি-লিট্ (বিচিত্রা) এবং পরে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দে (উদয়ন)। এলাহাবাদ সদস্যগণকে মাল্যদানের পর উপস্থিত সঙ্গীতজ্ঞগণ গীত বাদ্যের দ্বারা সমবেত সভাজনকে পরিতৃপ্ত করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, শ্রীমতী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী রাধারাণী প্রভৃতি গান গেয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তবলা, শ্রীমতী বীণাপাণি হারমোনিয়ম এবং শ্রীমান মদন মুখোপাধ্যায় (৭ বৎসরের বালক) পাখোয়াজ বাজিয়েছিলেন। এলাহাবাদ সঙ্গীত সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য ডি-এস্ সি, সৌভাগ্যক্রমে সভায় উপস্থিত ছিলেন, শ্রীযুক্ত মণি পাল ৪০ মিনিটে তাঁর মৃত্তিকা মূর্ত্তি গঠিত ক'রে সকলকে চমৎকৃত করেন।

এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কর্ম্মযোগী রায় এবং শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উদ্যমে উল্লিখিত সভা দুইটি বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল।

একাডেমি অফ্ ফাইন্ আর্ট্‌স্

এই নবজাত প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীর কথা আমরা গত মাসে উল্লেখ করেছিলাম। গত ২০শে ডিসেম্বর বাংলার গভর্ণর বাহাদুর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করেছিলেন,—এবং ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইহা খোলা ছিল। প্রদর্শনীটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়েছিল এবং বহু সৌন্দর্য্য-পিপাসু দর্শকবৃন্দকে প্রচুর আনন্দদান

সক্ষম হয়েছিল। আমরা অচিরেই এই নবজাত একাডেমির উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপরিচয় সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত করব,—তাই এখানে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। প্রদর্শনী থেকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট চিত্র সংগ্রহ করে রঙীন প্রতিলিপি 'বিচিত্রার' পাঠকবর্গকে উপহার দেবারও ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের পত্রিকা

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাখানি আমাদের হস্তগত হ'য়েছে। এর সম্পাদন কার্য্যের ভার নিয়েছেন, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীমতী ষ্টেলা ক্রামরিশ্। তাঁদের পরিচালনায় যেমনটি হওয়া উচিত আশা করা যায়, পত্রিকাটি ঠিক তেমনি হ'য়েছে। মুদ্রণ সৌষ্ঠবে ও গবেষণা সমৃদ্ধ রচনার সমাবেশে সুধী-সমাজে এমন পত্রিকা যে বিশিষ্ট সমাদর লাভ করবে তা নিঃসন্দেহ। প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধগুলির বিষয় তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল—

(১) A Note on a Painted Banner (শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী), (২) India's Position in the Art of Asia (Mr. J. Strzygowsky), (৩) Indigenous Painters of Bengal (শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত), (৪) The Painter's Art in Ancient India: Ajanta (শ্রীযুক্ত এ-কে কুমার স্বামী), (৫) Some Aspects of Time in Indian Art (Mr. H. Zimmer), (৬) The Kirtistambha of Rana Kumbha (শ্রীযুক্ত ডি-আর ভাণ্ডারকর) (৭) Nagara and Vesara (শ্রীযুক্ত কে-পি-জয়সয়াল), (৮) Sculptures from Candravati (শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়), এবং (৯) An Illustrated Salibhadra Ms. (শ্রীযুক্ত পূর্ণচাঁদ নাহার)। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের দুটি চিত্রের প্রতিলিপি ও দুটি ছোট কবিতা, এবং কিছু পুস্তক সমালোচনাও আছে। বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং চিত্রগুলির প্রতিলিপিও বেশ পরিষ্কার ছাপা হ'য়েছে। ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার করতে বিশেষ সহায়তা করবে এই পত্রিকাখানি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বৎসরে দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হ'বে। আমরা এমন পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কুমারী বেলারাণী সরকার

আজকাল সাঁতারের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'য়েছে। কুমারী বেলা রাণী মার্টিন কোম্পানীর এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত জে-কে সরকারের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা। কয়েক মাস পূর্ব্বে সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বেলা-

রাণী যোগ দিয়েছিল এবং কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণা হ'য়েছিল। এই বালিকার কৃতিত্বে আমরা প্রীত হ'য়েছি এবং তাকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি, কিন্তু এত অল্প বয়সে এতখানি শারীরিক ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হ'তে পারে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।
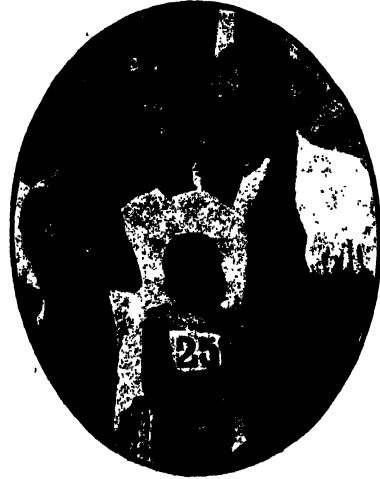
এম্ এল্ সাহা লিমিটেড

আমাদের দেশে শরীর ধারণোপযোগী জিনিষ ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা এত সীমাবদ্ধ যে সে সব দ্রব্যের ব্যবসায় চালানো বিশেষ কঠিন। তাই এই সব ব্যবসায় রীতিমত চালান যাঁরা তাঁদের ব্যবসায় বুদ্ধি ও সততার তারিফ না করে উপায় নেই। গ্রামোফোন ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র, সিনেমা, রেডিও ও ফোটোগ্রাফির দ্রব্য সমূহের বিক্রেতা হিসাবে এম্-এল্ সাহা লিমিটেড শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। ৭-সি লিন্‌ডসে ষ্ট্রীটে ও ৫।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে,—দুটি দোকানে এঁদের নানা রকমের প্রচুর মালের আমদানি। বর্ত্তমান বাজারে এঁদের ব্যবসায়ের এই যে সন্তোষজনক অবস্থা,—এর একমাত্র কারণ এঁরা সকল সময়েই নিম্নতম মূল্যে উৎকৃষ্টতম জিনিষ সরবরাহ করে থাকেন। সঙ্গীত ও ফটোগ্রাফির চর্চ্চায় যাঁরা জীবনটাকে আনন্দময় করে তুলতে চান, এম্-এল্ সাহার দোকানে গেলে সহজেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমরা শুনে সুখী হ'লাম,—যে, জানুয়ারী মাসের মধ্যে যাঁরা একটি "মেলোফোন পপুলার" গ্রামোফোন কিনবেন তাঁদের এঁরা ক্রেতার পছন্দমত ৬টি Decca রেকর্ড উপহার

কুটিরপুঞ্জ—মজঃফরপুর

শিল্পী — শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন্ আর্টস-এর প্রদর্শনীর অন্তর্গত

সপ্তম বর্ষ, ২য় খণ্ড ফাল্গুন, ১৩৪০ ২য় সংখ্যা

বাতাবির চারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন শান্ত হোলে আষাঢ়ের ধারা
বাতাবির চারা
আসন্ন-বর্ষণ কোন শ্রাবণ প্রভাতে
রোপণ করিলে নিজহাতে
আমার বাগানে।

বহুকাল গেল চলি ; প্রখর পৌষের অবসানে
কুহেলি ঘুচাল যবে কৌতূহলী ভোরের আলোক,
সহসা পড়িল চোখ,—
হেরিনু শিশিরে ভেজা সেই গাছে
কচিপাতা ধরিয়াছে,
যেন কী আগ্রহে
কথা কহে,
যে কথা আপনি শুনে পুলকে-দোলে ;
যেমন একদা কবে তমসার কূলে
সহসা বাল্মীকি মুনি
আপনার কণ্ঠ হতে আপন প্রথম ছন্দ শুনি'
আনন্দ সঘন
গভীর বিস্ময়ে নিমগন ॥

কোথায় আছ না-জানি এ সকালে
কি নিষ্ঠুর অন্তরালে,—
সেথা হতে কোনো সম্ভাষণ
পরশে না এ প্রান্তের নিভৃত আসন।
হেনকালে অকস্মাৎ নিঃশব্দের অবহেলা হতে
প্রকাশিল অরুণ আলোতে
এ কয়টি কিশলয়।
এরা যেন সেই কথা কয়
বলিতে পারিতে যাহা তবু না বলিয়া
চলে গেছ প্রিয়া।

সেদিন বসন্ত ছিল দূরে
আকাশ জাগেনি সুরে,
অচেনার যবনিকা কেঁপেছিল ক্ষণে ক্ষণে
তখনো যায়নি সরে দুরন্ত দক্ষিণ সমীরণে।
প্রকাশের উচ্ছৃঙ্খল অবকাশ না ঘটিতে,
পরিচয় না রটিতে,
ঘণ্টা গেল বেজে
অব্যক্তের অনালোকে সায়াহ্নে গিয়েছ সভা ত্যেজে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য-সম্মিলনের রূপ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেদিন হুগলি-জেলায় কোন্নগর গ্রামে এমনি এক সাহিত্যিক সম্মেলনে স্নেহাস্পদ লালমিঞা ভাই সাহেব আমাকে যখন আপনাদের ফরিদপুর সহরে আসার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন তখন সেই নিমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করে এই অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমি যাবো সত্য কিন্তু এবার যেন এ আসরে বহু-আচরিত বহু-প্রচলিত গতানুগতিক প্রথার পরিবর্ত্তন হয়। বলেছিলাম, তোমাদের ফরিদপুরের মিলন-ক্ষেত্রে এবার যেন সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-রস-পিপাসুগণের সম্যক মিলনের কার্য্যটা যথার্থ ভাবে সুসম্পন্ন হতে পায়; কাজের তাড়ায়, প্রবন্ধের ভিড়ে, সু ও কু-সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণের বাগ্-বিতণ্ডায় এর আবহাওয়া যেন ঘুলিয়ে উঠতে না পারে।

বছরে বছরে বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় কখনো বা বাঙলার বাইরে কখনো বা ভিতরে—কখনো পূর্ব্ব কখনো পশ্চিম বাঙলায়, কিন্তু সর্ব্বত্রই চলে ঐ এক নিয়ম এক রীতি। সেখানে হয় সবই, হয়না কেবল পরিচয়। হয়না শুধু ভাবের আদান প্রদান, বাকি থেকে যায় পরস্পরের মন জানাজানি। তার অবকাশ কই? বড় বড় সুচিন্তিত সারবান প্রবন্ধের ভারে ভারাক্রান্ত সম্মিলনী মেলা-মেশার সময় করবে কি নিশ্বাস নেবার ফুরসৎ করে উঠতে পারে না। সেখানে না থাকে পান-তামাক না থাকে চা। নড়-চড়ার যো নেই পাছে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, হাস্য-পরিহাসের সাহস নেই পাছে বে-আদপি প্রকাশ পায়, আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ মেলেনা পাছে গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। যেন আদালতের আসামীর মতো সেখানে সবাই গম্ভীর সবাই বিপন্ন। আড়-চোখে সবাই চেয়ে দেখে প্রবন্ধের খাতায় আরো ক'পাতা লেখা পড়তে তখনো বাকি। তারপরে আসে সভাভঙ্গের পালা—চলে ইষ্টিসানে ছুটোছুটি। শুধু পালাবার পথ নেই যাদের তারাই কেবল ক্লান্ত দেহ-মনে ফিরে চলে বাসায়।

এই হচ্ছে মোটামুটি সাহিত্য-সম্মিলনীর বিবরণ। তাই প্রার্থনা জানিয়েছিলাম এই ফর্দ্দে আরও একটি বিড়ম্বনার কাহিনী যেন ফরিদপুরের অদৃষ্টেও সংযুক্ত হয়ে না যায়।

বিগত দিনের সাহিত্যিক অনুষ্ঠানগুলিকে স্মরণ করে এ প্রশ্ন আজ আমি করবোনা সেই সকল লেখাগুলির কোন্ সদগতি অদ্যাবধি হয়েছে,—কারণ, এ জিজ্ঞাসা বাহুল্য।

আপনাদের হয়ত মনে হবে কিছু একটা সারালো ও ধারালো লেখা আমার লিখে আনা উচিত ছিল যা ছাপালে হয় সভাপতির অভিভাষণ, কিন্তু তা আমি করিনি। পারিনে বলে নয়, সময় ছিলনা বলে নয়, অহেতুক ও অকারণ বলেই লিখিনি। তবে এটা কি? এ শুধু মুখে-মুখে বলার শক্তি নেই বলেই এই সভায় উপস্থিত হবার অনতিকাল পূর্ব্বে দু-ছত্র টুকে এনেছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে এ সভার লক্ষ্য কি? উদ্দেশ্য

কি ? আমার মনে হয় লক্ষ্য শুধু এই কথাটা মনে রাখা এ আমাদের উৎসব, এ আমাদের আনন্দের অনুষ্ঠান। জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসিনি, যুক্তি-তর্কের বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য অবলম্বন করে এখানে এসে আমরা সমবেত হইনি। সাহিত্য-চর্চ্চার ক্ষেত্র আর যেখানেই কেননা হোক এখানে নয়। এই কথাটাই আজ আমার অন্তর বলে। তাই আমি এসেছি উৎসবের মন নিয়ে, আমি এসেছি হৃদয়ের আদান-প্রদানে পরস্পরের সুনিবিড় পরিচয় নিতে। এ উপলক্ষ না ঘটলে হয়ত কোনদিন আমাদের আপনাদের দেশে আসা হ'তোনা, আপনাদের সৌজন্য সহৃদয়তা সৌভ্রাত্র ও আতিথ্যের স্বাদ গ্রহণ করা ভাগ্যে জুটতোনা। এই আমাদের পরম লাভ, এই আমাদের আজকের সভার সার্থকতা। আরো একটা কথা বড়ো করে আজ আমার বারম্বার মনে হয়। মাতৃভাষার সেবক আমরা,—সাহিত্যের পুণ্য মিলন-ক্ষেত্র ছাড়া এতগুলি হিন্দু-মুসলমান ভাই-বোনেরা আমরা একাসনে বসে এমন ভাবে মিলতে পারতাম আর কোন্ সভাতলে ?

আর একটা কথা বলার বাকি আছে। সে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা। আমার গভীর আনন্দ ও তৃপ্তির কথা শতমুখে বলা। কিন্তু মুখ আমার একটি, তার সাধ্য সীমাবদ্ধ। এই ক্ষোভের কথাটাও জানিয়ে রেখে আমি বিদায় গ্রহণ করলাম।

—শরৎচন্দ্র

১৩ই মাঘ ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ

ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

হুমায়ুন কবির

পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত মহিলা এবং ভদ্র-মণ্ডলী,

ফরিদপুর সাহিত্য সম্মিলনের পক্ষ থেকে আপনাদিগকে এখানে সাদরে অভ্যর্থনা করবার ভার আজ আমার উপরে পড়েছে। সে ভার আনন্দ এবং গর্ব্বের সঙ্গে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। আমার চেয়ে এ গৌরবের বহুগুণে যোগ্যতর যে অনেকে রয়েছেন সে কথা আমার মত করে আর কেউ অনুভব করতে পারবেন না—আমার নিজের অযোগ্যতার কথাও লজ্জায় অক্ষমতায় আমি আপনার মনে জানি। তবু আমার চেয়ে বহু ভাবে বহু শ্রেষ্ঠ, এমন সকলের বদলে আমারই ভাগ্যে এ সম্মান কেন এল, সে প্রশ্ন আমি তুলব না—সে প্রশ্ন তোলায় অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ হবে। নির্ব্বাচন যাঁরা করেছেন তাঁদেরকেই দায়ী করে আমি বলতে পারি যে, স্নেহ ক'রে, প্রীতির স্নিগ্ধতায় আমার সকল অক্ষমতাকে মার্জ্জনা ক'রে এ গৌরবের দায় আপনারাই আমাকে দিয়েছেন। আপনাদেরই সাহায্য সহানুভূতি এবং সহযোগ সে দায়মোচনে আমার একমাত্র ভরসা।

আপনাদেরই পক্ষ থেকে তাই আমি আজ শরৎচন্দ্রকে এ সভায় সভাপতিরূপে বরণ করছি। তাঁর শুভাগমনে আমাদের এ সাহিত্য সম্মিলন গৌরবান্বিত হ'ল, পরিপূর্ণ হল, সার্থক হল। শরৎচন্দ্রের পরিচয় আপনাদের কাছে দেওয়া অবান্তর—শরৎচন্দ্রই শরৎচন্দ্রের পরিচয়। বাংলার আকাশ বাতাস তাঁর রচনায় রূপ পেয়েছে—কেবল পৃথিবীর আকাশ নয়, মানুষের অন্তরের আকাশও তাঁরি কল্পনার রঙে রাঙিয়ে উঠেছে। বাংলার মাটীর মতন বাঙ্গালীর জীবনও বাইরের লোকের কাছে বড় বৈচিত্র্যহীন, বড় একঘেয়ে। কিন্তু যাঁর চোখে অমৃতের অঞ্জন, যাঁর অন্তরে কল্পলোকের ধারা, তিনিই আমাদের দেখালেন যে এ বৈচিত্র্যহীনতা কেবলমাত্র প্রথম দৃষ্টিতে। শরৎচন্দ্রের যাদুকাঠির ছোঁওয়ায় তাই কল্পলোকের পর্দ্দা খুলে গেল—আমরা দেখলাম প্রসারিত আকাশের তলায় প্রসারিত মাঠের বুকে রঙের কি বিচিত্র কারিকুরি, জীবনের নদীধারার একটানা স্রোতেও কতদিকে কত তরঙ্গ, কত আন্দোলন হিল্লোল বিচ্ছুরিত হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশে শরৎচন্দ্র কেবলমাত্র রহস্যলোক আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হন নাই। বাংলাদেশে বাংলাদেশের নদীর যে গতি, বাঙ্গালীর জীবনেও তিনি তারই বাণী জাগিয়েছেন। তাঁর সজাগ কল্পনা ও সজীব চিত্রবৃত্তি তাই কেবল পুরাতনের মধ্যেই নূতনকে খুঁজে ফিরে নাই, নূতনকে আহ্বান করে পুরাতনের মধ্যে তারও আসন রচনা করতে চেয়েছে। তাই তাঁর রচনার মূলসুর পথচলার সুর—পথে নিত্যনূতন আবিষ্কারের আনন্দের সুর। পথের বোঝাও চলার আনন্দে সজীব হয়ে ওঠে—বাংলার জীবনের মূক অপ্রকাশিত বেদনাও তাই শরৎচন্দ্রের রচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। তারাও চলতে চায়। সঙ্গীতের কারাগহ্বর অতিক্রম করে অনাগত কালে বিকশিত হয়ে ওঠবার সাধনায় তারা চঞ্চল।

কাব্যশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে বরণ করছি—তিনি আমাদের শেষ মুহূর্ত্তের দাবী অকুণ্ঠিত চিত্তে যে ঔদার্য্যে মেনে নিয়েছেন, সত্যই তা বিস্ময়কর। তবে তিনিতো আমাদেরই একজন। ফরিদপুরের লোক হিসেবে এ সম্মিলন তাঁর ওপর এ দাবী করতে পারে, আমাদের এ বিশ্বাস তিনি সম্পূর্ণ রক্ষা করেছেন।

তিনি সাহিত্যরসিক, নিজেও সুসাহিত্যিক, কিন্তু তাঁর নিজের মনে সমালোচক প্রবল হয়ে উঠেছে বলে নিজের লেখা প্রকাশে নিজেই কুণ্ঠিত—যতটুকু প্রকাশিত করেন, তাও ছদ্মনামে। তবু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে সুরেশ্বর শর্ম্মার পরিচয় না জানলেও তাঁর নাম বাংলাভাষা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই জানেন। মজলিসী হিসাবে তাঁর পরিচয় আর আমি দেবনা—এখানে যাঁরা সমজদার, তাঁরা নিজেই সে পরিচয় পাবেন।

লোকসাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সাহিত্যশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় —এঁরা দুজনে ইচ্ছাসত্ত্বেও ঘটনাক্রমে আজ আসতে পারেন নি। তাঁদের এ অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু অনিবার্য্য অনুপস্থিতিতে আমরা সকলেই দুঃখিত, এবং তাঁরা যে সভাপতিত্ব স্বীকার ক'রে নিয়ে এ সম্মিলনে যোগদান করতে চেয়েছিলেন সেজন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিচিত্রার সম্পাদক সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ যে কত গভীর সে কথা জানি আমরা, আর জানেন তিনি। আপনাদের শুধু এইটুকু জানাব যে আজ যে শরৎচন্দ্র এখানে উপস্থিত, তার কৃতিত্ব বোধ হয় উপেনবাবুর সব চেয়ে বেশী। তিনি সে দায়িত্ব নিয়ে দায়িত্ব রক্ষা করেছেন। বিহারে যে প্রলয়কাণ্ড হয়ে গেল, তাঁর আত্মীয় বান্ধব তার স্পর্শ এড়াতে পারেন নি। মৃত্যুর সে ভ্রূকুটীকে অগ্রাহ্য ক'রে তিনি যে আজ এসেছেন, সেজন্য আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাব কি করে?

সমবেত মহিলা এবং ভদ্রমণ্ডলী, আপনাদের পক্ষ থেকে সমাগত অভিহিত অভ্যাগত যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সবাইকে ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত ভাবে আমরা সাদরে বরণ করছি।

ফরিদপুরের অতীত কীর্ত্তির কাহিনী দীর্ঘ ক'রে আজ আপনাদের ক্লান্ত ক'রব না। তবু সে কীর্ত্তির কথা দুয়েকটি না বললে আমার বক্তব্য হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতীত কীর্ত্তি স্মরণের একমাত্র সার্থকতা জাতির প্রাণের উদ্বোধন ও উদ্দীপনা—এ কথা মনে রাখলে অতীতের কঠিন সাধনার দোহাই দিয়ে বর্ত্তমানের নিশ্চেষ্টতাকে আমরা ঢাকবার চেষ্টা করব না।

বহু পূর্ব্বের পুরাতন কাহিনীর কথা আমি বলতে চাইনে। কিন্তু দেশের যে জীবন-মন্দার দিনে ইংরেজ এদেশের শাসন-ভার গ্রহণ করল, সেদিনকার ভাগ্যবিপাকের দিনেও এই ফরিদপুরে প্রাণের প্রবাহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। পদ্মার খর স্রোতের মতনই পথ না পেলে তা পথ কেটে বয়ে এসেছে। তাতে ঘর ভেঙ্গেছে, পাড় ভেঙ্গেছে, কখনো চড়া প'ড়ে নদী শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু যেখানেই প্রাণের প্রকাশ, সেখানেই তার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। সে প্রাণ-প্রবাহ কোন্ পথ খুঁজেছিল, সে কথাও বিচার ক'রবার বিষয় বটে; কিন্তু পথের সমস্ত দোষ গুণের চেয়ে বড় কথা প্রাণের প্রবাহ। ভুল করলে দুঃখ পেতে হয় সত্য, কিন্তু জীবন শেষ না হ'লে তো ভুলেরও শেষ নাই। তাই ভুল এড়াতে গিয়ে মৃত্যুর চেয়ে ভুল ক'রে বেঁচে থাকাও ভাল। ধর্ম্মে রাজনীতিতে সমাজ সংস্কারে তাই প্রাণের প্রবল প্রকাশে ভুল হতে পারে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্টতায় দস্তুরমাফিককে মেনে নেওয়ার চেয়ে সে ভুলও শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

ইংরেজ আগমনের দিনে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে এদেশে সমাজ জীবন শিথিল হয়ে এসেছিল—সেদিন এখানেই হাজী শরিয়ৎউল্লার প্রেরণায় ফরাজী আন্দোলনের উদ্ভব। বাংলার মুসলমানের ওপর তার প্রভাবের কথা ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন। হিন্দু যেদিন হিন্দু বলে নিজেকে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করত, সেদিন এই ফরিদপুরের শশধর তর্কচুড়ামণি এ মনোভাবের অপমান সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুললেন। ফরিদপুরের সুরেন্দ্রনাথ অম্বিকাচন্দ্রই বাঙালীর রাজনৈতিক মন্ত্রগুরু—এখনও সহস্র কর্ম্মী সে মন্ত্রকে আপনার বিশ্বাসমত সাধ্যমত শক্তিমত পূর্ণ করবার সাধনায় রত। সকলের নামোল্লেখ আজ সম্ভবপর নয়—কিন্তু পীর বাদশামিয়া, সুরেশচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্রের কথা কে না জানে। আমাদের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের সাধনার পরিচয়ও আমরা সকলেই পেয়েছি।

প্রকাশের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব যাই হোক না কেন, প্রাণের প্রকাশ বলে তার মূল্য স্বীকার

তো করতেই হবে। এ প্রাণ-প্রবাহ ধর্ম্ম সমাজ রাজনৈতিক সংস্কারের চেষ্টায় বদ্ধ থাকেনি—সাহিত্যকলার সৃষ্টিতেও আপনার অক্ষয় যৌবনের দাবী প্রকাশ করেছে। আজো সাতৈরের পাটী ভারতবর্ষে অনুপম—আজো এখানকার কাঁথা, এখানকার পল্লীচিত্রের জোড়া বাংলাদেশে বেশী নেই। সাহিত্যেও বাংলার আদি কবিদের অন্যতম সৈয়দ আলাওল এই ফরিদপুরেরই লোক। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ এখানে নেই—তা নইলে তিনিই আজ আমাদের হয়ে আমাদের সমস্ত অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতেন, ফরিদপুরের অতীত গৌরবের কাহিনী, আজ আমাদের শোনাতেন। অতুলপ্রসাদের নাম বাংলাদেশে কে না জানে? বাংলা গানে তিনি নতুন ঢং এনেছেন, বাঙালীর কল্পলোকে আনন্দের পরিমাণ তাঁর স্পর্শে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। তিনিও আমাদের এখানকার লোক—অসুখ বলে আসিতে পারেন নি, কিন্তু দেশের ডাকে তাঁর প্রাণে যে সুর বেজেছে, তা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র, রাঘব পাণ্ডবীয় গ্রন্থকার কবিরাজ পণ্ডিত—তাঁদেরও জন্মস্থান এইখানে। এখানকার পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ একা সমস্ত মহাভারত সম্পাদনের ভার নিয়েছেন। স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের মৃত্যুতে আজ বাংলা সাহিত্যের যে কি ক্ষতি হ'ল তা কেবল কল্পনাই করা যায়। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে ফরিদপুরের লোক বড় কম নয়—কাকে বাদ দিয়ে কার নাম ক'রব, সেও এক সমস্যা! তবু বিজয়চন্দ্র, নলিনীকান্ত, আব্দুল ওদুদ, আবুল হোসেন, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, কাজী মোতহার হোসেন, জসীমউদ্দিন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—এঁদের নাম উল্লেখ করতেই হয়।

নামের তালিকা বাড়িয়ে আপনাদের বিরক্ত করব না, কিন্তু নব্যভারতের সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর বিষয় একটী কথা বলতে চাই। তিনি যে কেবল সাহিত্যিক ছিলেন তা নয়, সমাজসংস্কারে তাঁর চেষ্টার কথা আপনারা অনেকেই জানেন। তখনকার দিনে ফরিদপুর সুহৃৎ সভার মতন সংগঠন আরও ছিল কি না জানিনে, তবে তাঁর অন্তঃপুর শিক্ষাবিভাগের মতন প্রতিষ্ঠান যে ছিল না, সে কথা বোধ হয় জোর করে বলা চলে। ফরিদপুরে যে তখন এ চেষ্টা হয়েছিল, তা কেবল গৌরবের কথা নয়, আশার কথাও বটে।

এ ইতিহাস পুনরাবৃত্তির একমাত্র সার্থকতা আজকের দিনে আমাদের কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা এবং অনুপ্রেরণা দেওয়া। অতীত কীর্ত্তিকে লঙ্ঘন করেই অতীত কীর্ত্তির মর্য্যাদা রক্ষা করা যায়; তা নইলে যা সঞ্চিত হয়েছে, কেবল সেই নিয়ে তৃপ্ত থাকলে অতীতেও কোন দিনই সে কীর্ত্তি স্থাপিত হ'ত না অতীতের গৌরব তাই বর্ত্তমানের পক্ষে কেবল অনুপ্রেরণা নয়—তাকে অতিক্রম করবার জন্য স্পর্দ্ধ আহ্বানও বটে। সেই আহ্বানকে স্বীকার করে নিয়েই জীবনযুদ্ধে আমাদের জয় হোক বা না হোক, অন্ততঃ যুদ্ধের সম্মান দাবী করতে পারি।

আজ বাংলার জাতীয় জীবনে যুগসন্ধির দিন। পুরাতন কীর্ত্তি আমাদের ক্ষমতার বাহিরে, কিন্তু পুরাতনের মোহ আমাদের মনেপ্রাণে জড়ানো। আধুনিক জগতে পুরাতন মনোবৃত্তি নিয়ে তাই আমাদের লাঞ্ছনার সীমা নেই। রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ও তারই একটী লক্ষণ, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই আমরা তার পরিচয় পাই। সাহিত্যে আধুনিকের সঙ্গে পুরাতনের দ্বন্দ্ব, লোকসাহিত্যের সঙ্গে অভিজাত সাহিত্যের বিরোধ, হিন্দুসাহিত্যের সঙ্গে মুসলমান সাহিত্যের বিভেদ—এ সমস্তই মনের নিৰ্জ্জীবতার লক্ষণ। শিক্ষা নিয়ে আজ যে মতভেদ, তারও গোড়ার কথা এইখানে। কল্পনার ধারা আমাদের শুকিয়ে এসেছে বলে জীবন আমাদের সঙ্কুচিত, নানাপ্রকার বাধা নিষেধে কণ্টকিত মনের হীনতায় ও ছুঁৎমার্গে কলঙ্কিত। কল্পনার মুক্তি ভিন্ন তাই আমাদের মুক্তি নাই—তাই জীবনকে আবার স্বচ্ছন্দ করে তুলতে হলে, আমাদের চিত্তের লুপ্ত ঐশ্বর্য্যকে আবার ফিরিয়ে আনতে হলে চাই আমাদের সাহিত্যে নবীন সঞ্জীবতা।

এই আমাদের সাহিত্য সম্মিলনের উদ্দেশ্য, এতেই আমাদের সার্থকতা। শরৎচন্দ্রকে সভাপতি পেয়ে তাই আজ আমরা গৌরবান্বিত—আমরা ব্যগ্রচিত্তে তাঁর কাছে আবার সেই বাণী শুনতে চাই যাতে কল্পনা আমাদের আবার বেঁচে উঠবে, সবল সুস্থ মানুষ হয়ে আমরা পৃথিবীতে আপনার অধিকারে বেঁচে থাকব। সেই প্রাণমন্ত্রের শরৎচন্দ্র পুরোহিত—তাঁকে আমরা সাদর শ্রদ্ধায় আজ সভাপতিত্বে বরণ করি।

হুমায়ুন কবির

১৯

পরদিন বিকালের দিকে বন্দনা আসিয়া বলিল, মুখুয্যে মশাই আবার চললুম মাসিমার বাড়ীতে। এবার আর ঘণ্টা কয়েকের জন্যে নয়, এবার যতদিন না মাসি আমাকে বোম্বায়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন ততদিন।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ আরজেন্ট টেলিগ্রামে এসেছে বাবার হুকুম। কালই সকাল বেলা মাসি গাড়ী পাঠাবেন আমাকে নিতে।

বিপ্রদাস কহিল, অর্থাৎ বোঝা গেল তোমার মাসির প্রতিশোধ নেবার অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি আছে। এ বোধ হয় তাঁরই প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব। কই দেখি কাগজটা ?

—না সে আপনাকে আমি দেখাতে পারবোনা।

শুনিয়া বিপ্রদাস ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ভগবান যে কারো দর্প রাখেন না এ তারই নমুনা। এতদিন ধারণা ছিল আমাকে জড়ানো যায় না কিন্তু দেখচি যায়। অন্ততঃ তেমন লোকও আছে। তোমার মাসির মাথায় এ ফন্দিও খেলেছে। দাওনা পড়ে দেখি অভিযোগটা কতখানি গুরুতর, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

এবার বন্দনা কাগজখানা তাহার হাতে দিল। রায় সাহেবের সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম,—সমস্তটা আগাগোড়া পড়িয়া সেটা ফিরাইয়া দিয়া বিপ্রদাস বলিল, মোটের ওপর তোমার বাবা অসঙ্গত কিছুই লেখেন নি। নিঃস্বার্থ পরোপকারের বিপদ আছে, অসুস্থ আত্মীয়কে সেবা করতে আসাটাও সংসারে সহজ কাজ নয়।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আমাকে কি আপনি মাসির বাড়ীতেই ফিরে যেতে বলেন ?

—সেই ত তোমার বাবার আদেশ বন্দনা। এ তো বলরামপুরের মুখুয্যে বাড়ী নয়,—হুকুম

দেবার কর্তা এ ক্ষেত্রে তোমার মুখুয্যে মশাই নয়,—মাসি আবার আদেশটা দিয়েছেন বাপের মুখ দিয়ে, অতএব মান্য করতেই হবে।

বন্দনা বলিল, এ হলো আপনার মামুলি বচন। বাবা জানেন না কিছুই, তবু সেই আদেশ, ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, শুনতে হবে? মাসির বাড়িটি যে কি সেতো আপনি জানেন।

বিপ্রদাস কহিল, জানিনে, কিন্তু তোমার মুখে শুনেচি সে ভালো যায়গা নয়। আমি সুস্থ থাকলে নিজে গিয়ে তোমাকে বোম্বায়ে পৌঁছে দিয়ে আসতুম কিন্তু সে শক্তি নেই।

—এই অবস্থায় আপনাকে ফেলে চলে যাবো? যে-মাসিকে চিনিনে তাঁর জিদটাই বড় হবে?

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, কিন্তু উপায় কি? ছেড়ে যাওয়া শক্ত মনে হচ্ছে?

—হাঁ। আমি পারবনা যেতে।

—তবে থাকো। বাবাকে একটা তার করে দাও। কিন্তু মাসি নিতে এলে কি তাঁকে বলবে?

—যেতে পারবো না শুধু এই কথাই বলবো। তার বেশি নয়।

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মাসি কিন্তু এতেই নিরস্ত হবেন না। এবার হয়ত বাড়ীতে আমার মাকে টেলিগ্রাম করবেন।

এ সম্ভাবনা বন্দনার মনে আসে নাই, শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, বলিল, আপনি ঠিকই বলেছেন মুখুয্যে মশাই, হয়ত কাজটা শেষ হয়েই গেছে - খবর দিতে মাসির বাকি নেই। কিন্তু কেন জানেন?

বিপ্রদাস কহিল, জানাত সম্ভব নয়, তবে এটুকু আন্দাজ করা যেতে পারে যে এতখানি উদ্যম তাঁর নিস্বার্থও নয়, তোমার একান্ত কল্যাণের জন্যও নয়। হয়ত কি একটা তাঁদের মনের মধ্যে আছে।

বন্দনা বলিল, কি আছে আমি জানি। ভাইপো এসেছেন ব্যারিষ্টারি পাশ করে,—মাসি দিয়েছেন আমাদের আলাপ-পরিচয় করিয়ে। দৃঢ় বিশ্বাস সে-ই আমার যোগ্য বর। কারণ বাবার আমি এক মেয়ে, যে সম্পত্তি তিনি রেখে যাবেন তার আয়ে উপার্জ্জন না করলেও ভাইপোর স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

বিপ্রদাস বলিল, ভাইপোর কল্যাণ চিন্তা পিসির পক্ষ থেকে দোষের নয়। ছেলেটি দেখতে কেমন?

—ভালো।

—আমার মতো হবে?

বন্দনা হাসিয়া বলিল, এটি হলো আপনার অহঙ্কারের কথা। মনে বেশ জানেন এত রূপ সংসারে আর নেই। কিন্তু সে তুলনা করতে গেলে সংসারের সব মেয়েকেই যে আইবুড়ো থাকতে হয় মুখুয্যে মশাই। আপনার পানে চেয়েই তাদের দিন কাটাতে হয়। তবু বলবো দেখতে অশোককে ভালোই, খুঁত খুঁত করা অন্ততঃ আমার সাজে না।

—তাহলে পছন্দ হয়েছে বলো?

—যদি হয়েও থাকে, সে পছন্দর কেউ দোষ দেবে না বলতে পারি। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, পাঁচটা বাজলো আপনার বার্লি খাবার সময় হয়েছে—যাই আনিগে। ইতিমধ্যে অশোকের কথাটা আর একটু ভেবে রাখুন, বলিয়া সে চলিয়া গেল। মিনিটপাঁচেক পরে সে যখন ফিরিয়া

আসিল তাহার হাতে রূপার বাটীতে বার্লি—বরফের ভিতরে রাখিয়া ঠাণ্ডা করা—নেবুর রস নিঙড়াইয়া দিয়া কহিল, এর সবটুকু খেতে হবে ফেলে রাখলে চলবে না। সেবার ত্রুটি দেখিয়ে কেউ যে আমার কৈফিয়ৎ চাইবে সে আমি হতে দেবো না।

বিপ্রদাস বলিল, জুলুমের বিদ্যেটি ষোল আনায় শিক্ষে করে নিয়েচ, কারো কাছে ঠকতে হবে না দেখ্‌ছি।

বন্দনা বলিল, না। কেউ জিজ্ঞেসা করলেই বলবো মুখুয্যে মশায়ের ওপর হাত পাকিয়ে পাকা হয়ে গেছি, আমাকে ঠকাতে কেউ পারবে না।

খাওয়া শেষ হইলে উচ্ছিষ্ট পাত্রটা হাতে করিয়া বন্দনা চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার একটি কথার জবাব দেবেন মুখুয্যে মশাই?

—কি কথা বন্দনা?

—সংসারে সকলের চেয়ে আপনাকে কে বেশি ভালোবাসে বলতে পারেন?

—পারি।

—বলুন ত কি নাম তার?

—নাম তার বন্দনা দেবী।

শুনিয়া বন্দনা চক্ষের পলকে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মিনিট পনেরো পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বিছানার কাছে একটা চৌকি টানিয়া বসিল। বিপ্রদাস হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অমন করে ছুটে পালিয়ে গেলে কেন বলোত?

বন্দনা প্রথমে জবাব দিতে পারিল না তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, কথাটা হঠাৎ কেমন সইতে পারলুম না মুখুয্যে মশাই। মনে হ'ল যেন আমার কি-একটা বিশ্রী চুরি আপনার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

—তাই এখনো মুখ তুলে চাইতে পারচোনা?

তা' কেন পারবোনা, বলিয়া জোর করিয়া মুখ তুলিয়া বন্দনা হাসিতে গেল, কিন্তু সলজ্জ সরমে সমস্ত মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু আত্মসম্বরণ করিতে করিতে বলিল, কি করে আপনি এ কথা জানলেন বলুন ত?

বিপ্রদাস কহিল, এ প্রশ্ন একেবারে বাহুল্য বন্দনা। এতই কি পাষাণ আমি যে এটুকুও বুঝতে পারিনে? তা ছাড়া সন্দেহ যদিও কখনো থাকে, আজ তোমার পানে চেয়ে আর ত আমার নেই।

বন্দনা আবার মুখ নীচু করিল। বিপ্রদাস বলিল, কিন্তু তাই বলে ও চলবেনা বন্দনা, মুখ তুলে তোমাকে চাইতে হবে। লজ্জা পাবার তুমি কিছুই করোনি, আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই। চাও, মুখ তোলো, শোনো আমার কথা।

এ সেই আদেশ। বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় আমার ওপর খুব রাগ করেছেন,—না মুখুয্যে মশাই।

বিপ্রদাস স্মিতমুখে কহিল, কিছুমাত্র না। এ কি রাগ করার কথা? শুধু আমার মনের আশা এইটুকু যে, এ-ভুল তোমার নিজের কাছেই একদিন ধরা পড়বে। কেবল সেইদিনই এর প্রতীকার হবে।

—কিন্তু ধরা যদি কখনো না পড়ে? একে ভুল বলেই যদি কোনদিন টের না পাই?

—পাবেই। এর থেকে যে সংসারে কত অনর্থের সূত্রপাত হয় এ যদি না একদিন বুঝতে পারো ত আমিও বুঝবো আমাকে তুমি ভালোবাসোনি। সুধীরকে ভালোবাসার মতো এ-ও তোমার একটা খেয়াল—মনের মধ্যে কাউকে টেনে এনে শুধু আপনাকে ভোলাতে চাও। তার বেশি নয়।

বন্দনার মুখ মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া উঠিল, অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, সুধীরের সঙ্গে তুলনা করবেন না মুখুয্যে মশাই এ আমি সইতে পারিনে। কিন্তু এর থেকে সংসারে যে অনর্থের সূত্রপাত হয় আপনার এ কথা মানবো—মানবো যে এ অমঙ্গল টেনে আনে, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে বলে স্বীকার কর্'বো না। মিথ্যেই যদি হতো, এতটুকু ভালোবাসাই কি আপনার পেতুম? পাইনি কি আমি?

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বিপ্রদাস নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া শুনিতেছিল, সেইটা সজোরে বাহির হইয়া আসিতে তাহার গভীর শব্দে সে নিজেই চমকিয়া উঠিল, বলিল, পেয়েছো বই কি বন্দনা, তুমি অনেকখানিই পেয়েছো। নইলে তোমার হাতে আমি খেতুম কি করে? তোমার রাত্রি-দিনের সেবা নিতে পারতুম আমি কিসের জোরে? কিন্তু তাই বলে কি গ্লানির মধ্যে, অধর্ম্মের মধ্যে নিজে নেমে দাঁড়াবো, তোমাকে টেনে নামাবো? যারা আমার পানে চেয়ে চিরদিন বিশ্বাসে মাথা উঁচু করে আছে সমস্ত ভেঙে চুরে তাদের হেঁট করে দেবো? এই কি তুমি বলো?

বন্দনা দৃপ্তস্বরে কহিল, তাহ'লে আপনিও স্বীকার করুন আজ ছাড়তে যা পারেন না সে শুধু এই দম্ভটাকে। বলুন সত্যি করে ওদের কাছে এই বড় হয়ে থাকার মোহকেই আপনি বড় বলে জেনেছেন। নইলে কিসের গ্লানি মুখুয্যে মশাই,—কাকে মানতে যাবো আমরা অধর্ম্ম বলে? মানুষের মন-গড়া একটা ব্যবস্থা—মানুষেই যাকে বারবার মেনেছে, বারবার ভেঙেছে—তাকেই? আপনি পারলেও আমি এ পারবো না।

বিপ্রদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, তোমার পেরেও কাজ নেই, আমাদের মধ্যে একজন পারলেই কাজ চলে যাবে। ইংরাজি বই অনেক পড়েচো, মাসীর বাড়ীতে আলোচনা অনেক শুনেচো, সে সব ভোলা সহজ হবে না,—সময় লাগ্‌বে।

বন্দনা কহিল,—আপনি আমাকে তামাসা করচেন আমি কিন্তু একটুও তামাসা করিনি মুখুয্যে মশাই, যা বলেচি সমস্তই সত্যি বলেচি।

—তা' বুঝেচি। কিন্তু এ পাগলামি মাথায় এনে দিলে কে?

—আপনি।

—বলো কি? এ অধর্ম্ম-বুদ্ধি দিলুম তোমাকে অবশেষে নিজে আমিই?

—হাঁ আপনিই দিয়েচেন। হয়ত না জেনে কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ নয়।

শুনিয়া বিপ্রদাস নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, কিন্তু আপনি যাকে অধর্ম্ম বলে নিন্দে করলেন তাকে ত আমি মানিনে,—আমি জানি যাকে ধর্ম্ম বলে স্বীকার করেছেন আপনি একমনে সে শুধু আপনার সংস্কার। অত্যন্ত দৃঢ় সংস্কার কিন্তু তার বড়ো নয়।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল, বলিল, হয়ত এ কথা তোমার সত্যি বন্দনা, এ আমার সংস্কার,—সুদৃঢ় সংস্কার। কিন্তু মানুষের ধর্ম্ম যখন এই সংস্কারের রূপ ধরে বন্দনা, তখনি সে হয় যথার্থ, তখনি হয় সে সহজ। জীবনের কর্ত্তব্যে আর তখন ঠোকাঠুকি বাধে না, তাকে মানতে গিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করে মরতে হয় না। তখন বুদ্ধি হয়ে আসে শান্ত, অবাধ জলস্রোতের মতো সে সহজে বয়ে যায়। বুঝি একেই বলেছিলুম সে দিন এ হলো বিপ্রদাসের অত্যাজ্য ধর্ম্ম—এর আর পরিবর্ত্তন নেই।

—কোন দিনই কি এর পরিবর্ত্তন নেই মুখুয্যে মশাই?

—তাইতো আজও জানি বন্দনা। আজও ভাবতে পারিনে এ জীবনে এর পরিবর্ত্তন আছে।

এতক্ষণে বন্দনার দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, বিপ্রদাস সযত্নে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিল, কিন্তু পরিবর্ত্তনেরই বা দরকার কিসের? ভালো তোমাকে বেসেচি,—রইলো তোমার সেই ভালোবাসা আমার মনের মধ্যে,—এখন থেকে সে দেবে আমাকে দুঃখে সান্ত্বনা, দুর্ব্বলতায় বল, ভার যখন আর একাকী বইতে পারবোনা তখন দেবো তোমাকে ডাক। সে-ও রইলো আজ থেকে তোমার জন্যে তোলা। আসবে ত তখন?

বন্দনা বাঁ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, আসবো যদি আসার শক্তি থাকে,—পথ যদি থাকে তখনও খোলা,—নইলে পারবোনা ত আসতে মুখুয্যে মশাই।

কথাটা শুনিয়া বিপ্রদাস চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তখনই বলিল, বটেইত! বটেই ত! আসার পথ থাকে যদি খোলা,—চিরদিনের তরে যদি বন্ধ হয়ে সে না যায়। তখন এসো কিন্তু। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থেকো না।

বন্দনা চোখের জল আবার মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার একটি ভিক্ষে রইলো মুখুয্যে মশাই, আমার কথা যেন কাউকে বলবেন না।

—না বলবোনা। বলার লোক যে আমার নেই সে তো তুমি নিজেই জানতে পেরেচো।

—হাঁ, সেও আমি জানি।

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। বিপ্রদাস কহিল, সে দিন বলেছিলে আমাকে একা। এই বিপুল সংসারে আমি যে এতখানি একা এ কথা তুমি কি করে বুঝেছিলে বন্দনা?

বন্দনা বলিল, কি জানি কি করে বুঝেছিলুম। আপনাদের বাড়ী থেকে রাগ করে চলে এলুম, আপনি এলেন সঙ্গে। গাড়ীতে সেই মাতাল সাহেবগুলোর কথা মনে পড়ে? ব্যাপারটা বিশেষ কিছু

নয়,—তবু মনে হলে যাদের আমরা চারপাশে দেখি তাদের আপনি নয়, একাকী কোন ভার কাঁধে নিতেই আপনার বাধেনা। এই কথাই বলেছিলেন সেদিন দ্বিজুবাবু,—মিলিয়ে দেখলুম কারও কাছে কিছুই আপনি প্রত্যাশা করেন না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কেবলি আপনাকে মনে পড়ে—কিছুতে ঘুমোতে পারলুম না। শেষরাত্রে উঠে দেখি নীচে পূজোর ঘরে আলো জ্বলচে, আপনি বসেচেন ধ্যানে। এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভোর হয়ে এলো, পাছে চাকররা কেউ দেখতে পায় ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এলুম আমার ঘরে। আপনার সে মূর্ত্তি আর ভুলতে পারলুম না মুখুয্যে মশাই, আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, দেখেছিলে নাকি আমাকে পূজো করতে?

বন্দনা বলিল, পূজো করতে ত আপনার মাকেও দেখেচি কিন্তু সে ও নয়। সে আলাদা। আপনি কিসের ধ্যান করেন মুখুয্যে মশাই?

বিপ্রদাস পুনরায় হাসিয়া বলিল, সে জেনে তোমার কি হবে? তুমি ত তা' করবেনা।

—না করবোনা। তবু জানতে ইচ্ছে করে।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা কহিতে লাগিল, আমার সেইদিনই প্রথম মনে হয় সকলের মধ্যে থেকেও আপনি আলাদা, আপনি একা। যেখানে উঠলে আপনার সঙ্গী হওয়া যায় সে উঁচুতে ওরা কেউ উঠতে পারেনা। আর একটা কথা জিজ্ঞেসা করবো মুখুয্যে মশাই? বলবেন?

—কি কথা বন্দনা?

—মেয়েদের ভালোবাসায় বোধ হয় আর আপনার প্রয়োজন নেই—না?

—এ প্রশ্নর মানে?

—মানে জানিনে এমনি জিজ্ঞেসা করচি। এ বোধহয় আর আপনি কামনা করেননা,—আপনার কাছে একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে।—সত্যি কিনা বলুন।

বিপ্রদাস উত্তর দিলনা শুধু হাসিমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

নীচের প্রাঙ্গণে সহসা গাড়ীর শব্দ শুনা গেল আর পাওয়া গেল দ্বিজদাসের কণ্ঠস্বর। এবং পরক্ষণেই দ্বারের কাছে আসিয়া অন্নদা ডাকিয়া বলিল, দ্বিজু এলো বিপিন।

—একলা নাকি? না, আর কেউ সঙ্গে এলো?

—না, একাই ত দেখচি। আর কেউ নেই।

শুনিয়া বন্দনা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, যাই মুখুয্যে মশাই, দেখিগে তাঁর খাবার যোগাড় ঠিক আছে কি না। বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সকালে দ্বিজু আসিয়া যখন বিপ্রদাসের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল তখন ঘরের একধারে বসিয়া বন্দনা পূজার সজ্জা প্রস্তুত করিতেছিল, দ্বিজদাস বলিল, এই পঞ্চমীতে মায়ের পুকুর-প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ ব্যাপার দাদা।

—মায়ের কাজে ত বৃহৎ ব্যাপারই হয় দ্বিজু, এতে ভাবনার কি আছে? বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

দ্বিজদাস কহিল, তা' নয়। এবার সঙ্গে মিলেছে বাসুর ভালো-হওয়ার মানৎ-পূজো—সেও একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ। অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দ্দ তৈরি হচ্ছে,—কুটুম্ব-সজ্জন অতিথ-অভ্যাগতের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা বৌদিদির মুখে মুখে পেলুম তাতে আশঙ্কা হয় এবার আপনার অর্থে ওরা কিঞ্চিৎ গভীর খাবোল মারবে। সময় থাকতে সতর্ক হোন।

বন্দনা মুখ তুলিলনা কিন্তু সামলাইতে না পারিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। বিপ্রদাস বিষয়ী লোক, বিপ্রদাস কৃপণ, এ দুর্নাম একা মা ছাড়া, প্রচার করিবার সুযোগ পাইলে কেহ ছাড়েনা। বিপ্রদাস নিজেও এ-হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, এবার কিন্তু তোর পালা। এবার খরচ হবে তোর।

—আমার? কোন আপত্তি নেই যদি থাকে। কিন্তু তাতে ব্যবস্থার কিছু অদল-বদল করতে হবে। বিদায় যারা পাবে তারা টোলের পণ্ডিত-সমাজ নয়, বরঞ্চ টোলের দোর বন্ধ করে যাদের বাইরে ঠেলে রাখা হয়েছে,—তারা।

বিপ্রদাস তেমনিই হাসিয়া কহিল, টোলের ওপর তোর রাগ কিসের? লোকের মুখে-মুখে এদের শুধু নিন্দেই শুনলি নিজে কখনো চোখে দেখলিনে। ওদের দল-ভুক্ত বলে হয়ত আমি পর্য্যন্ত তোর আমলে ভাত পাবোনা।

দ্বিজদাস কাছে আসিয়া আর একবার পায়ের ধূলা লইল, কহিল, ঐ কথাটা বলবেন না। আপনি দু-দলেরই বাইরে, অথচ তৃতীয় স্থানটা যে কি তাও আমি জানিনে। শুধু এইটুকু জেনে রেখেচি আমার দাদা আমাদের বিচারের বাইরে।

বিপ্রদাস কথাটাকে চাপা দিল। জিজ্ঞাসা করিল, আমার অসুখের কথা মা শোনেননি ত?

—না। সে বরঞ্চ ছিল ভালো, পুকুর প্রতিষ্ঠার হাঙ্গামা বন্ধ হতো।

—আত্মীয়দের আনবার ব্যবস্থা হয়েছে?

—হচ্চে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—সকলকেই। সকন্যা অক্ষয়বাবুর আমন্ত্রণ-লিপি গেছে—মায়ের বিশ্বাস বৃহৎ ব্যাপারে মৈত্রেয়ীর অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে যাবে। আমার ওপর ভার পড়েছে তাঁদের নিয়ে যাবার।

—মা আর কাউকে নিয়ে যাবার কথা বল্লে দেননি?

—হাঁ। অনুদিকেও নিয়ে যেতে হবে। কলেজের ছেলেরা যদি কেউ যেতে চায় তারাও।

—তোর বউদিদির কোন ফরমাস নেই?

—না।

নীচে আবার মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। হর্ণের চেনা আওয়াজ কানে আসিতেই বন্দনা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, মাসিমার গাড়ী। আমি দেখিগে মুখুয্যে মশাই। আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে নিন—দেরি হয়ে যাচ্চে। বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

—আমিও যাই মুখ-হাত ধুইগে। ঘণ্টাখানেক পরে আসবো, বলিয়া দ্বিজদাসও চলিয়া গেল। বিপ্রদাসের পূজা-আহ্নিক সমাপ্ত হইল, আজ খাবার ফল-মূল দিয়া গেল অন্নদা। মাসির বাড়ী হইতে যে মেয়েটি নিতে আসিয়াছে বন্দনা ব্যস্ত আছে তাহাকে লইয়া। এ খবর সে-ই দিল।

দ্বিজদাস যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল। হাতে তাহার বিরাট ফর্দ্দ, কলিকাতার অর্দ্ধেক জিনিস কিনিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া চালান দিতে হইবে। দুই ভাইয়ে এই লইয়া যখন ভয়ানক ব্যস্ত তখন দরজার বাহির হইতে প্রার্থনা আসিল, মুখুয্যে মশাই আসতে পারি কি? পায়ে কিন্তু আমার জুতো রয়েছে।

—জুতো? তা'হোক এসো।

বন্দনা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। যে-বেশে বলরামপুরে তাহাকে প্রথম দেখা গিয়াছিল এ সেই বেশ। বিপ্রদাস অত্যন্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কোথাও যাচ্চো নাকি বন্দনা?

—হাঁ, মাসিমার বাড়ীতে।

—কখন ফিরবে?

—ফেরবার কথা ত জানিনে মুখুয্যে মশাই। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল, কিন্তু অন্য দিনের মতো পায়ে হাত দিয়া স্পর্শ করিল না। মুখ তুলিল না শুধু কপালে হাত ঠেকাইয়া দ্বিজদাসকেও নমস্কার করিল তাহার পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

রূপহীনা বসুমতী

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী

উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা চারু চিত্রলেখা—
কখনোকি পা'বনাক দেখা ?
স্বর্গ হ'তে আসিবেনা নামি—
আমরা সবাই স্বর্গকামী,
জানিনাতো ভাগ্য কিবা করে,
চিত্রগুপ্ত কোথা ল'বে ধরে' ।
মিশ্রকেশী, অলম্বুষা তন্বী তিলোত্তমা,
আপনি যে আপন উপমা,
পড়েছেন খেয়ান ধরিয়া
বিধি তারে কেমন করিয়া—
সাধ শুধু হেরি একবার,
অপরূপ সে রূপ সম্ভার ।
রূপহীনা ম্লানমুখী আজি বসুমতী—
রমণীর ভিন্ন গতি মতি,
পরুষ পুরুষ সম সাজি,
কুঞ্চিত কুন্তল শোভা আজি
বহেনাক শিরে, লজ্জাহীন
প্রসাধনে তুচ্ছ প্রতিদিন ।
নেত্র আর চিত্ত আজ দুই পিপাসিত,
হেরিবারে সেরূপ ঈপ্সিত,
ছিল যাহা সতী দেহ ভরি',
পদ-নখ শোভা শিরে ধরি,
দিত দেখা লাবণ্য পূর্ণিমা,
না জানি সে কেমন প্রতিমা ।

মৃত্যু

ওগো মৃত্যু, এই মর্ত্ত্য আমাদের মুক্তির দুয়ার
সুখ দুঃখ হাসিপ্রেম নিন্দা জ্বালা, কত কি যে আর,
নির্ব্বাপিত তব শান্তি জলে,
সেই জানে চিত্তে যার চির-চিতা জ্বলে ।
শিশু হয়ে আসি সবে, সদানন্দ সুখের স্বপন,
হাসিকান্না দেয়ালায় সুখদুঃখ নিত্য সঙ্গোপন,
তারপরে দেয়ালা কোথায় ?
বুক পিঠ নুয়ে পড়ে কাতর ব্যথায় ।
শোভাময়ী বসুমতী ম্লান হয় নিমেষে নিমেষে,
বসন্তের পুষ্পে কীট, মধু মাঝে বিষ এসে মেশে,
জন্মতার দিনে দিনে বাড়ে,
ঝরায় কুসুম রাশি সুষমা সম্ভারে ।
তারপরে তুমি এসো ঘন-শ্যাম মেঘ শ্রাবণের,
নিদাঘ দাহন শেষে অনুরাগী প্রণয়ী মনের,
স্নিগ্ধ মুগ্ধ পরশের মত,
তৃপ্ত নেত্র, চিত্ত হ'তে তাপ অপগত ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শ্ভেভালিয়ে দুদ্রেনেক

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস

বিখ্যাত ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক শ্ভেভালিয়ে চার্লস দি দুদ্রেনেকের জীবনকাহিনী খুবই রহস্য এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথা আজিও জানা যায় নাই। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল তাহা এককালে সন্দেহের বিষয় ছিল, কারণ সমসাময়িক কাগজপত্র এবং পুস্তকাদিতে তাঁহার নামের বহু বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত নামটিই তাঁহার প্রকৃত নাম বলিয়া জানা গিয়াছে। এদেশে আসিয়া তিনি নিজেদের বংশগত নাম Dudrenek-Keroulas এর ঐরূপ সংক্ষিপ্তাকার করিয়া লইয়াছিলেন।

চার্লস দুদ্রেনেক ফ্রান্সের ব্রেষ্ট নগরের অধিবাসী এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তাঁহার পিতা ফরাসী নৌবিভাগে একজন 'কমোডোর' ছিলেন। পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার উৎকর্ষের প্রতি তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার অনুশীলন নহে, ধর্ম্ম এবং নীতিজ্ঞান, মার্জ্জিত সুরুচির শিক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয়েই তিনি পুত্রকে সাধ্যমত সুশিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে বলিতে ভারতবর্ষে সমাগত ভাগ্যান্বেষী সৈনিক বলিতে ইউরোপীয় সমাজের যে শ্রেণীর জীব বুঝায় দুদ্রেনেক তাহা ছিলেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়,—বংশমর্য্যাদা বা শিক্ষাদীক্ষা তাঁহার জীবনে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই, বরং সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের দলেও তাঁহার মত ভীরু, নির্লজ্জ, কৃতঘ্ন, কাপুরুষের সংখ্যা খুব কম দেখা যায়।

অল্পবয়সে দুদ্রেনেক নৌ-বিভাগে প্রবেশ করেন এবং অনুমান ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী সমরপোতে 'মিডসিপ-ম্যান' পদে নিযুক্ত হইয়া পন্দিচেরীতে আগমন করেন। তখন এ দেশীয় রাজাদিগের দরবারে ইউরোপীয় সৈনিকের বড় আদর। সকলেই ইউরোপীয় সৈনিকদের সাহায্যে নিজ নিজ সেনাদল শিক্ষিত করিতে সচেষ্ট। দেখিয়া শুনিয়া অপরাপর বহু ফরাসী যুবকের মত দুদ্রেনেকও ভারতবর্ষীয় রাজন্যবৃন্দের কর্ম্মে, অসিহস্তে অর্থ ও যশ অর্জ্জনে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার জীবনের এই সময়ের পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না। যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় তখন তিনি প্রখ্যাতনামা রেণে মারী মাদেকের দলভুক্ত একজন সৈনিক। মীর্জ্জা নজফ খাঁর জাঠদিগের সহিত সংঘটিত বিখ্যাত বারসানার যুদ্ধে (২২।১০।১৭৭৩) তিনি উপস্থিত ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন। সে কথা সত্য না হইতেও পারে। মাদেকের বিস্তীর্ণ জায়গীরের শাসনকার্য্যের সহিত যে সকল ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল দুদ্রেনেক তাঁহাদের অন্যতম সে কথা ইতিপূর্ব্বে মাদেকপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনমানসে মাদেক গোহদের রাণা ছত্রসিংহকে নিজ ব্রিগেড বিক্রয় করিয়া দিয়া (মার্চ্চ ১৭৭৭) পন্দিচেরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন (২২।৫।১৭৭৭)। তখন অপরাপর সহকর্ম্মীগণের মত দুদ্রেনেকও নূতন প্রভুর কর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু মাদেকের হস্তচ্যুত হইয়া তাঁহার সেনাদল আর অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। রাণা ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনের পর তাঁহাদের প্ররোচনায় ফরাসী অফিসারদের বেতন দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন; এমন কি মাদেকের প্রাপ্য বক্রী অর্থও তিনি প্রদান করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। ক্রমেই দল ভাঙ্গিতে লাগিল। অনেকেই ভাগ্যান্বেষণে অন্যত্র গমন করিল। অনুমান ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে দুদ্রেনেকও সার্দ্ধানায় বেগমসমরুসকাশে ভাগ্যপরীক্ষার্থ আগমন করিলেন।

নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে দুদ্রেনেক প্রায় নয় বৎসরকাল

অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের এই সময়ের বিশেষ কোন কথাই জানা যায় না। ২২শে জুন ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে সার্দ্ধানার পাদ্রি গ্রেগরি ও তাঁহার এক পুত্রের দীক্ষাদান কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা উক্ত পুরোহিত মহাশয়ের রেজেষ্টারী খাতা হইতে প্রকাশ। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বেগমের সৈন্তাধ্যক্ষ কাপ্তেন এ ভান্স দি বইনের নিকট কর্ম্ম লইলে দুদ্রেনেক তদীয় শূন্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কয়েকটি কথা ভিন্ন দুদ্রেনেকের ভারতবর্ষে আগমন হইতে তুকোজীরাও হোলকরের কর্ম্ম গ্রহণ পর্য্যন্ত (১৭৭৩-৯১) সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী জীবনের আর সকল কথাই অজ্ঞাত।

দি বইন গঠিত সিন্ধিয়ার সৈন্যদলের সাফল্যদর্শনে তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী তুকোজীরাও হোলকর ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত বাহিনী গঠনে সমুৎসুক হইয়া তিনি ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মাসিক তিন সহস্র টাকা বেতনদানে নিজ কর্ম্মে গ্রহণ করিলেন। প্রথমে চারি ব্যাটালিয়ন সিপাহী লইয়া ছোট একটি দল গঠিত হইল। কিন্তু দুদ্রেনেকের দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই লাখেরীর শোণিতরঞ্জিত সমরক্ষেত্রে দি বইনের হস্তে তাঁহার ব্রিগেড বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সিন্ধিয়া এবং হোলকরে বিবাদের কারণ ইতিপূর্ব্বে দি বইন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, এখানে শুধু লাখেরী যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া যাইবে। এই যুদ্ধেই সর্ব্বপ্রথম উভয়পক্ষীয় ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষদ্বয় নিজ নিজ হস্তগঠিত শিক্ষিতবাহিনী লইয়া প্রকাশ্য বল পরীক্ষায় অবতরণ করিলেন। সিন্ধিয়ার পক্ষে ছিল দি বইনের নয় হাজার পদাতিক, লকবাদাদার কুড়ি হাজার মারাঠা অশ্বারোহী এবং আশীটি কামান; হোলকর পক্ষে ছিল দুদ্রেনেকের চারি ব্যাটালিয়ন সিপাহী, ত্রিশ হাজার বার্গীসেনা এবং পঞ্চাশটী কামান। আসল যুদ্ধ হইল উভয় পক্ষের পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত পদাতিক এবং গোলন্দাজ সেনায়, সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত অশ্বারোহীর দল যুদ্ধে বিশেষ কোন অংশ না লইয়া শুধু সাহায্যকারী রহিল।

দি বইন দেখিলেন শত্রুসেনা যুদ্ধার্থ যেস্থান নির্ব্বাচন করিয়াছে তাহা সত্যই দুর্ভেদ্য। উচ্চ এক ভূখণ্ডের উপরে তাহাদের পদাতিক এবং তোপখানা অবস্থিত;—তাহার সম্মুখে বহুদূর বিস্তৃত এক জলাভূমি, তন্মধ্যে সৈন্য পরিচালন অসম্ভব,—প্রান্তদ্বয়ে অশ্বারোহীগণ অবস্থিত। তাহার পর দুইদিকেই নিবিড় অরণ্য, সে পথে অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য! নিম্নদেশ হইতে উক্ত উচ্চ ভূখণ্ডে আরোহণ করিবার একমাত্র উপায় ঐ জলাভূমির মধ্য দিয়া নিতান্ত অপরিসর ক্রমোচ্চ একটি পথ। দি বইন বুঝিলেন যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে তাঁহার যুদ্ধ করা প্রয়োজন, হঠকারিতায় প্রয়োজন হওয়াই সম্ভব। শুনা যায় তাঁহার সকল যুদ্ধের মধ্যে তিনি এইটিকেই ভীষণতম বিবেচনা করিতেন এবং বলিতেন ঐরূপ ঘোর সঙ্কটে তিনি আর কখন পড়েন নাই। বাস্তবিক লাখেরীর যুদ্ধজয় তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের নিদর্শন।

তিন ব্যাটালিয়ন সিপাহী এবং ৫০০ রোহিলা সৈনিককে দি বইন উক্ত সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। উহারা দেখা দিবা মাত্র শত্রুসেনা মহোৎসাহে তাহাদের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। সম্মুখবর্ত্তী জলার জন্য তাঁহার গোলন্দাজগণ যথাস্থানে কামান সমূহ সন্নিবেশ করিতে পারিল না, বরং বিপক্ষের অগ্নিবৃষ্টিতে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইল। বহুসংখ্যক সৈনিক হতাহত হইল, অনেকগুলি কামান চূর্ণ হইয়া গেল, গোলাবারুদের গাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া তজ্জনিত বিস্ফোরণে অনেকে প্রাণ হারাইল। শত্রুবাহিনী মধ্যে এরূপ বিপর্য্যয় দর্শনে উৎফুল্ল হোলকর নিজ সওয়ারদিগকে অরণ্যের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখ আক্রমণে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার আদেশ দিলেন। এত বিপদেও দি বইন অধীর হইলেন না। তাঁহার সাহসে ও বীরত্বে সিপাহীগণও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথে বিপক্ষের অশ্বারোহীগণ দেখা দিবামাত্র তাহারা একযোগে শ্রাবণের ধারাপাতের ন্যায় তাহাদের প্রতি অনলবৃষ্টি করিল। বার্গীরা যুদ্ধকালে চয়ের কার্য্য করিতে জনপদসমূহ উৎসাদিত করিয়া শত্রুকে বিব্রত করিতে এবং চৌথ সংগ্রহ কার্য্যে যতটা সুদক্ষ ছিল সম্মুখ সমরে তাদৃশ নিপুণ ছিল না। সেই ভীষণ লৌহবৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন

সময়ে আপাদমস্তক লৌহবর্ম্মাবৃতদেহ বাদসাহী মোগল অশ্বারোহীবাহিনী লইয়া স্বয়ং দি বইন তাহাদের উপর প্রচণ্ডবেগে নিপতিত হইলেন। সে বেগ রোধ করিবার সাধ্য বার্গীদলের ছিল না। তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

পাটন এবং মেরতার সংগ্রামে তাঁহার কালানলবর্ষী তোপখানা শত্রুসেনাকে কতকটা বিমথিত করিয়া ফেলিবার পর দি বইন নিজ পদাতিক সিপাহীগণের সাহায্যে রণজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার কামান সমূহ কোন কার্য্যকর হইল না দেখিয়া তিনি বুঝিলেন সিপাহীগণের উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই; উহাদের দ্বারাই আজ রণজয় করিতে হইবে। কিন্তু উচ্চ ভূখণ্ডের উপরে অবস্থিত অটুট শত্রুবাহিনীকে অপরিসর পথে আরোহণ করিয়া সম্মুখ আক্রমণে পরাজিত করা যে কি প্রকার কঠিন বিপজ্জনক কার্য্য তাহা সহজেই অনুমেয়। মোগলদের প্রতি তিনি একার্য্যের জন্য নির্ভর করিতে সাহসী হইলেন না। বার্গীদের বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেও, বিপক্ষের অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে ক্রমোচ্চ সঙ্কীর্ণ পথে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাদের তোপখানা অধিকার করিতে যে উহারা পারিবে না বরং তাঁহার সহিত যুদ্ধে ইস্মাইলবেগের সৈন্যগণের মত বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইবে একথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। এজন্য মোগলদের স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিয়া তিনি সিপাহীদের অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। তখন উপলখণ্ডবিনির্মুক্ত নির্ঝরিণীর মতই শিক্ষিত বাহিনী ঘোররোলে সম্মুখে ছুটিল।

দুদ্রেনেকের সৈন্যগণও এ যুদ্ধে যথেষ্ট সাহস দেখাইয়াছিল। তাহাদের শিক্ষাকার্য্য তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই সত্য, তথাপি তাহারা যে বীরত্ব ও দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। শত্রুসেনাকে আগুয়ান হইতে দেখিয়া তাহারা যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত গোলাগুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে আক্রমণকারিদিগের অনেকে ধরাশায়ী হইল, অপরিসর পথ মনুষ্যদেহে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তথাপি তাহারা নিবৃত্ত হইল না। শত্রুর গোলাগুলি বালকের ক্রীড়াকন্দুকের মতই অগ্রাহ্য করিয়া ভূপতিত সহযোগী বৃন্দের দেহের উপর দিয়া তাহারা ভীমবেগে ধাবিত হইল এবং নিমেষ মধ্যে ব্যবধান পথ অতিক্রম করিয়া শত্রুসেনার উপর নিপতিত হইল। উহারাও প্রাণপণে যুদ্ধ করিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বহু যুদ্ধবিজয়ী সিন্ধিয়ার বীর সৈন্যগণকে প্রতিহত করা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত হইল না। ইউরোপীয় সেনানায়কগণ স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। উহাদের অধিনায়ক শেভালিয়ে দুদ্রেনেক কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া রণস্থলে মৃতের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া কোন মতে আত্মপ্রাণ রক্ষা করিলেন। তাঁহার ৩৮টী কামান শত্রুর করায়ত্ত হইল। বিপর্য্যস্ত সেনাদল মহাভয়ে কোনরূপে চম্বলনদী পার হইয়া একেবারে মালবদেশে গিয়া থামিল। নিষ্ফল আক্রোশে তুকোজী প্রতিদ্বন্দ্বীর অধিকৃত উজ্জয়িনী নগরী লুণ্ঠন করিয়া কথঞ্চিত প্রাণের জ্বালা নিবৃত্ত করিলেন।

এইরূপে বিগত সাত বৎসরকাল ধরিয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লইয়া সিন্ধিয়া এবং হোলকরের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল লাখেরীর যুদ্ধে তাহার অবসান হইল। ইহার পর তুকোজীরাও যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন তন্মধ্যে তিনি আর সিন্ধিয়ার সহিত বল পরীক্ষায় লিপ্ত হন নাই।

কিন্তু দুদ্রেনেকের সিপাহীগণ বৃথায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহারা রণস্থলে যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে তুকোজী আবার আশায় বুক বাঁধিলেন। আবার তিনি আর একদল সৈন্য গঠনের জন্য তাঁহাকে যথোপযুক্ত অর্থ দিলেন। ১৭৯৩ সাল নূতন সিপাহী সংগ্রহ করিতে এবং তাহাদের শিক্ষাদান কার্য্যে কাটিয়া গেল। দুই বৎসর পরে আবার সমরক্ষেত্রে দুদ্রেনেকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এবার আর সিন্ধিয়ার শত্রুরূপে নহে,—নিজামের সুবিখ্যাত ফরাসী সেনাধ্যক্ষ জেনারেল রেমণ্ডের বিরুদ্ধে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কর্ডালা বা খড়দার যুদ্ধে (১২।৩ ১৭৯৫) সম্মিলিত মহারাষ্ট্রীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হোলকরের সেনাদলের অধিনায়ক রূপে তিনি উপস্থিত ছিলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে মারাঠাদের ইহাই শেষ সম্মিলিত জাতীয় প্রচেষ্টা।

উভয়পক্ষে দুইলক্ষের অধিক সৈন্য উপস্থিত হইলেও খড়দায় গর্জ্জনের অনুরূপ বর্ষণ হয় নাই,—হইয়াছিল যুদ্ধের একটা সামান্য অভিনয় মাত্র। যুদ্ধারম্ভের অনতিকাল পরেই অশীতিপরবৃদ্ধ নিজাম অনর্থক ভয়ে ভীত হইয়া রেমণ্ডকে অমীমাংসিত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া তদীয় বেগমমণ্ডলীসহ তাঁহাকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার আদেশ দিলে মারাঠারা হেলায় বিজয়লাভ করিল। পরাজিত নিজাম তিনক্রোর টাকা অর্থদণ্ড এবং দৌলতাবাদ প্রদেশ সমর্পণ করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। মারাঠা জগতে আনন্দের স্রোত বহিল। উৎফুল্ল তুকোজীরাও সেনাদল বৃদ্ধি করিবার আদেশ দিলে দুদ্রেনেক আরও দুইটি ব্যাটালিয়ন গঠন করিলেন।

খড়দাযুদ্ধের স্বল্পকাল পরেই পেশবা মধুরাও আত্মহত্যা করিলেন। মন্ত্রী নানা ফড়ণাবীশ তাঁহাকে যে প্রকার অতি যত্ন করিতেন তাহার ফলে পেশবাকে একপ্রকার নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হইত, তাঁহার কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। অতি যত্নে উত্যক্ত মধুরাও একদিন প্রাসাদের ছাদ হইতে লম্ফপ্রদানে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন (২৫।১০।১৭৯৫)। বহু গোলযোগের পর রঘুনাথ রাওয়ের পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও তাঁহার শূন্য গদিতে বসিলেন (৪।১২।১৭৯৬)। তিনিই উক্ত গৌরবময় পদের শেষ অধিকারী। পর বৎসর ১৫ই আগষ্ট তারিখে পুণানগরে তুকোজীরাও হোলকর পরলোক গমন করেন। তাহার পর ১৩ই মার্চ্চ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফড়ণাবীশের মৃত্যু হইল। বাস্তবিক এই কয়েক বৎসরের মধ্যে মহাদজী-প্রমুখ নেতৃবর্গের দেহত্যাগ মারাঠাজাতির পরম দুর্ভাগ্যের কারণ সন্দেহ নাই। তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের স্বার্থপর আত্মকলহ ও জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল অদূরদর্শী আচরণের ফলে শীঘ্রই মারাঠাজাতির সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। এখানে সকল কথা বলিবার স্থান নাই, কৌতূহলী পাঠক তজ্জন্য মারাঠাজাতির ইতিহাস দেখিতে পারেন।

তুকোজীর দেহত্যাগের পর রাজ্যাধিকার লইয়া তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিল। জ্যেষ্ঠ কাশীরাও দুর্ব্বলচিত্ত, ভীরু এবং ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। কনিষ্ঠ মলহর রাওয়ের সাহস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অবধি ছিল না। তিনি স্বয়ং রাজ্যলাভে সচেষ্ট হইলেন। যশোবন্তরাও এবং বিঠলরাও নামক তুকোজীর অবৈধ পুত্রদ্বয় এই ভ্রাতৃবিরোধে তাঁহার সহায় হইলেন। অসমসাহসী বীর এবং দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা যশোবন্ত ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তাহার পক্ষে কাশীরাওয়ের মত লোকর অনুগত হইয়া চলা সম্ভব ছিল না। হোলকররাজ্যে বিপ্লব দেখিয়া সিন্ধিয়া পরম উল্লসিত হইলেন। এই সুযোগে তথায় আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি সচেষ্ট হইলেন। শীঘ্রই কাশীরাও ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনিও ইহাই চাহিতেছিলেন। দৌলৎরাও কাশীরাওয়ের পক্ষাবলম্বন করিবামাত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নানাফড়ণাবিশ অপর ভ্রাতৃবৃন্দকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী কিন্তু প্রথমে কাশীরাওয়ের প্রতি সুপ্রসন্না হইয়াছিলেন। পুণার উপকণ্ঠে ভাম্বুরী নামক স্থানে নিজ শিবির মধ্যে আক্রান্ত হইয়া মলহররাও নিহত হইলেন। তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র খাণ্ডেরাও সিন্ধিয়ার হস্তে ধৃত হইয়া পুণায় বন্দীভাবে রক্ষিত হইলেন। যশোবন্ত এবং বিঠল কোনমতে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

কাশীরাও সিন্ধিয়াকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়া নিজেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। শীঘ্রই সকলে দেখিল যে মানসিক-বিকৃতির জন্য তিনি রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনি এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে সিন্ধিয়ার আশ্রিত মধ্যে পরিণত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই যশোবন্তরাও দৌলৎ-রাওয়ের কবল হইতে হোলকরবংশের প্রণষ্ট মানগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর ধাররাজ্যে আশ্রয় লইয়া তিনি আত্মশক্তি সম্বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। হোলকররাজ্যের অনেক প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কাশীরাওকে অবলম্বন করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার সিন্ধিয়ানুগত্যদর্শনে বিরক্ত হইয়া যশোবন্তের পক্ষ পরিগ্রহণ করিলেন। এই সময়েই বিখ্যাত পাঠান সর্দ্দার আমীরখাঁর সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। অতঃপর বন্দী খাণ্ডেরাওয়ের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিয়া যশোবন্ত প্রতিপক্ষের রাজ্য লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং সিংহাসনের প্রার্থী না হইয়া

এই কার্য্য করা তাঁহার রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে।

ভ্রাতৃবিরোধজাত এই সময়ে প্রথমটায় ছুদ্রেনেক কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন স্থির করিতে পারেন নাই। সবিশেষ বিবেচনার পর তিনি কাশীরাওয়ের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ণেল লুই বুর্কুঁয়া নামক ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের আত্মচরিত মতে পরবর্ত্তী দুই বৎসরকাল ইন্দোররাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর ছিলেন ছুদ্রেনেক; কাশীরাও শুধু নামেই রাজা ছিলেন।* কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও তাঁহার সেনাদলের জন্ম দরবারে ছুদ্রেনেকের প্রভাব যে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল সে কথা অস্বীকার করা চলে না। যশোবন্ত কর্ত্তৃক নিজ রাজ্যলুণ্ঠন দর্শনে উত্যক্ত দৌলৎরাও পরিশেষে ছুদ্রেনেককে তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। তিনি কিন্তু শত্রুর বলে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখাইয়া মার্টিন† এবং লেপিনেৎ নামক দুইজন অধস্তন সেনানীকে দুই ব্যাটালিয়ন সিপাহী দিয়া পাঠাইলেন। এক পার্ব্বত্য পথে যশোবন্ত অতর্কিত আক্রমণে উহাদের বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। এসংবাদে ছুদ্রেনেক নিজ সমস্ত সেনাদল লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এবার যশোবন্ত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন (মার্চ্চ ১৭৯৮)। তাঁহার সমগ্র তোপখানা এবং শিবিরস্থ যাবতীয় দ্রব্যাদি বিপক্ষের হস্তগত হইল। ছুদ্রেনেকের জামাতা মেজর জঁ প্লুমে (Jean Plumet) এবং ডা কোষ্টা নামক একজন পর্ত্তুগীজ সেনানী এই যুদ্ধে সবিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন।‡ শীঘ্রই কিন্তু আবার ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইল। এবার যশোবন্ত পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ লইলেন। পরাজিত ছুদ্রেনেক প্লুমের হস্তে যুদ্ধভার সমর্পণপূর্ব্বক ইন্দোররাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। তিনিও বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিলেন না। শীঘ্রই যশোবন্ত শত্রু-কবল হইতে নিজ পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন।

এদিকে আমীর খাঁর কৌশলে ছুদ্রেনেকের বাহিনী মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল। অধিকতর বেতন দিবার প্রলোভন দেখাইয়া তিনি সিপাহীগণের মধ্যে অনেককে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছিলেন। যাহারা দলে থাকিল তাহারাও ঘোর অসন্তুষ্ট এবং বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া রহিল। এ অবস্থায় আর যুদ্ধ করা চলে না। বিপন্ন এবং ভীত ছুদ্রেনেক তখন যশোবন্তের সহিত সন্ধিস্থাপনে সমুৎসুক হইলেন এবং তজ্জন্ত আমীরখাঁর শরণ লইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি একবার আমীরখাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। তদবধি ক্রুদ্ধ পাঠান সর্দ্দার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যতদিন না তিনি পরাজয়ের কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া শত্রুকে সমুচিত প্রতিফল দিতে সমর্থ হইবেন ততদিন তিনি মস্তকে আর উষ্ণীষ ধারণ করিবেন না। আমীর খাঁ তাহার পর হইতে পাগড়ীর পরিবর্ত্তে মাথায় একটি রেশমী রুমাল জড়াইয়া রাখিতেন। ছুদ্রেনেক এ কথা জানিতেন।

আমীরখাঁ ছুদ্রেনেকের প্রস্তাব যথাস্থানে জ্ঞাপন করিলে যশোবন্তরাও তাঁহাকে প্রলোভনে করায়ত্ত করিয়া বিনাশ সাধন করিবার আদেশ পাঠান সর্দ্দারকে দিলেন। স্বয়ং নিষ্ঠুর প্রকৃতি এবং অনেক সময় ধর্ম্মাধর্ম্মনীতিজ্ঞান বিরহিত হইলেও এক্ষেত্রে আমীরখাঁ শরণাগতের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে সম্মত হইলেন না। ছুদ্রেনেকের কোন অনিষ্টসাধন করা হইবে না, বরং তাঁহার সহিত পদোচিত সুভদ্র ব্যবহার করা হইবে যশোবন্তের নিকট হইতে এবম্বিধ প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ করিয়া আমীরখাঁ তাঁহার আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। ছুদ্রেনেক তখন চোলি-মহেশ্বরের অদূরে জামঘাট নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। বিপন্ন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত শত্রুর প্রতি বিরোচিত সুভদ্র ব্যবহারের জন্ম আমীরখাঁর সত্যই প্রশংসা করিতে হয়। পক্ষান্তরে শ্রেভালিয়ে মহাশয় তাঁহার গৌরবময় পদবীর একান্ত অনুপযোগী যে নির্লজ্জ কাপুরুষতার পরিচয় এই সময় দিয়াছিলেন তাহারও তুলনা খুব কম দেখা যায় সে কথা বলা প্রয়োজন।

* Journal of the Punjab Historical Society, Vol. IX.

† ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের মধ্যে মার্টিন নামক একাধিক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ জেনারেল ক্লদমার্টিন এবং তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দি বইনের সেনাবিভাগের লেফটেনান্ট মার্টিন ফরাসী ছিলেন। আগ্রার পাদ্রিসেন্টস কবর স্থানে সিন্ধিয়ার সৈনিক আর একজন লেফটেনান্ট ফ্রেডারিক মার্টিনের সমাধি আছে। ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বর্ষ বয়সে তাহার দেহান্ত হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি জাতিতে ইংরাজ।)

‡ Asiatic Annual Register, 1799, P. 97.

আমীরখাঁর আগমন সংবাদে ছুদ্রেনেক মধ্যপথে আসিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং পরম সমাদরে তাঁহাকে নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন। দরবার মধ্যে তাঁহাকে প্রধান স্থান দিয়া নিজে তিনি বরাবর কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ নিজ মস্তকাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক তাঁহার চরণপ্রান্তে রাখিলেন। আমীর খাঁকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যে সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি দিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—"আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। আমি আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছি। এই লউন আমার তরবারী। আমি আপনার বন্দী। আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার বাসনা থাকে, করুন। আমি কোন বাধা দিব না। এই লউন আমার উষ্ণীষ। আপনার লোকজনেরা কোথায়? তাহাদিগকে বলুন, আমাকে লইয়া যাউক।" এ কাতর প্রার্থনায় কাহার না মন গলে? ছুদ্রেনেকের বশ্যতায় আমীরখাঁ পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং সদ্ভাবের নিদর্শনস্বরূপ তৎপ্রদত্ত শিরস্ত্রাণ লইয়া নিজের রেশমী রুমালটী তাঁহাকে দিলেন। ছুদ্রেনেক নিজ সেনাদল এবং সমরসম্ভারাদি তাঁহার করে সমর্পণ করিয়া যশোবন্তের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। তখন হোলকরের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিবার জন্য আমীর খাঁ তাঁহাকে লইয়া যশোবন্ত সমীপে গমন করিলেন। শুধু তাঁহার মধ্যবর্ত্তীতার জন্য যশোবন্ত ছুদ্রেনেককে সমাদর করিতে বাধ্য হইলেন। নতুবা স্বেচ্ছায় কার্য্য করিবার অবকাশ পাইলে তৎপরিবর্ত্তে তিনি যে শেভালিয়েরর প্রাণদণ্ড বিধান করিতেন সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে পরিণামে ঘোর বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। যথাস্থানে সে কথা বলা যাইবে। অতঃপর যশোবন্ত ছুদ্রেনেককে রাজস্থানে টঙ্ক-রামপুরা জনপদ অধিকারে পাঠাইলেন। তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে উক্ত প্রদেশের শাসনভার তাঁহার করে সমর্পিত হয়। পরবর্ত্তী দুই বৎসরকাল তাঁহার এইখানেই কাটিয়াছিল।

ভাগ্যলক্ষী যশোবন্তের প্রতি ক্রমশঃ সুপ্রসন্না হইতেছিলেন। অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু তাঁহার পক্ষে এক্ষণে যে সুতন্ত্র, সংযত, রাজোচিত ভাবে থাকা প্রয়োজন একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি নিজ লুণ্ঠনলোলুপ, দস্যুবৃত্তিপরায়ণ অনুচরবৃন্দ মধ্যে অনেকাংশে শৃঙ্খলা ও বাধ্যতা আনয়ন করিলেন। রণস্থলে সিন্ধিয়ার সমকক্ষ হইবার জন্য তিনিও তাঁহার মত শিক্ষিত সেনাদল গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখনকার দিনে এদেশে তরবারী বিক্রয়েচ্ছু ইউরোপীয় সৈনিকের অভাব ছিল না। উহাদের সাহায্যে আরও দুইটি ব্রিগেড গঠিত হইল। সুপ্রসিদ্ধ ভাগ্যান্বেষী সৈনিক কর্ণেল উইলিয়ম গার্ডনার প্রথমটির এবং মেজর প্লুমে দ্বিতীয়টির অধিনায়কপদে নিযুক্ত হইলেন। প্রত্যেক ব্রিগেডে চারি ব্যাটালিয়নে চারি হাজার সিপাহী ছিল। এইরূপে শক্তি সঞ্চয় করিয়া হোলকর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত প্রকাশ্য বলপরীক্ষায় অবতরণ করিলেন।

কিন্তু সে কথা বলার পূর্ব্বে প্রাচীন রাজপুত বীরত্বের শেষ নিদর্শন সাঙ্গানের বা মালপুরার যুদ্ধের কথা বলা আবশ্যক। সাঙ্গানেরের শোণিতরঞ্জিত সমরক্ষেত্রে আবার ছুদ্রেনেকের দেখা পাওয়া যায়। পাটন এবং মেরতাযুদ্ধের ফলে সমগ্র রাজস্থান বিজয়ী সিন্ধিয়ার পদানত হইলেও রাজপুতগণ মধ্যে মধ্যে মস্তকোত্তোলন করিতে ছাড়িত না। এজন্য মারাঠাদিগকে প্রায়ই রাজপুতানায় যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত থাকিতে হইত। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জয়পুরাধিপতি প্রতাপসিংহ অঙ্গীকৃত রাজকর প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া আসন্ন সমরের জন্য শক্তিসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিলেন। মারবাররাজ বিজয়সিংহও তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেন। এ সংবাদে হিন্দুস্থানের সুবেদার লকবা দাদা প্রতাপসিংহকে বক্রী অর্থ প্রদান করিতে আদেশ দিয়া এক চরম পত্র প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন লকবা দাদা সসৈন্যে রাজ-পুতানায় প্রবেশ করিলেন। বিশহাজার বার্গীসৈন্য এবং কর্ণেল অ্যান্টনি পলম্যান (Pohlmann) নামক হানোভরীয় সেনাপতি পরিচালিত দ্বিতীয় ব্রিগেড তাঁহার সহগামী হইল। যশোবন্তের কি মনে হইল! তিনি সিন্ধিয়ার সহিত বিরোধ তখনকার মত বিস্মৃত হইয়া ছুদ্রেনেককে উহাদের সাহায্য করিবার আদেশ দিলেন। তদনুসারে তিনিও টঙ্ক হইতে সসৈন্যে আসিয়া পলম্যানের সহিত যোগ দিলেন।

সাঙ্গানের জয়পুর সহর হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রাম। প্রতাপসিংহ এইখানে সেনাসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। মারাঠাবাহিনীর আগমন সংবাদে তিনিও সাধ্যমত আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যোধপুর হইতে দশহাজার রাঠোর যোদ্ধা আসিয়া তাঁহার বলবর্দ্ধন করিয়াছিল। রাজা স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে সেনাদল পরিদর্শন করিয়া উৎসাহ সূচক বাক্যে সকলকে আশান্বিত করিয়া তুলিলেন। মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার আদেশে মাঙ্গলিক পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা হইল। আর্ত্তদরিদ্র বিপ্রগণকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করা হইল। রাজ-জ্যোতিষীগণ যুদ্ধের জন্য শুভদিন নির্দ্দেশ করিয়া দিলে রাজপুত সেনা ঐদিনে বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে স্থির হইল। ক্রমে মারাঠারা সাঙ্গানের সমীপে আসিয়া উপনীত হইল। লকবা দাদা দুইভাগে নিজ সেনাদল সংস্থাপন করিলেন। পুরোভাগে পদাতিক বাহিনী—দক্ষিণপ্রান্তে পলম্যানের এবং বামপ্রান্তে ডুব্রেনেকের ব্রিগেড—স্থাপিত হইল। উহাদের পশ্চাতে প্রায় সহস্রপদ ব্যবধানে অশ্বারোহীগণ রক্ষিত হইল। রাজপুতরা বিপক্ষ অপেক্ষা পদাতিকবাহিনীতে দুর্ব্বল ছিল, কারণ রাজস্থানে অশ্বারোহী সৈনিকেরই সমধিক আদর ছিল। পদাতিক বা গোলন্দাজ, বন্দুক বা কামান তথায় কখন খড়্গ বা ভল্লকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। সপ্তদশ সহস্র অসমসাহসী অশ্বারোহী সৈনিকই ছিল রাজপুতদের আশা। তদ্ভিন্ন দশ ব্যাটালিয়ন পদাতিক এবং আশিটী কামান তাহাদের পক্ষে ছিল।

উষারম্ভের সহিত উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল।* কিছুক্ষণ ভীষণ গোলাযুদ্ধের পর পলম্যান এবং ডুব্রেনেক উভয়েই সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। বার্গীদিগকে সিপাহীগণের পশ্চাতে আসিবার আদেশ প্রদত্ত হইলেও তাহারা মহাভয়ে ভীত হইয়া তাহা পালন না করায় পদাতিকগণের উপরেই যুদ্ধের সমস্ত ভার পড়িল। শত্রুসেনাকে আগুয়ান হইতে দেখিয়া রাজপুত যোদ্ধারা মহোৎসাহে তাহাদের প্রত্যাক্রমণ করিল; জয়পুরীরা পলম্যান এবং রাঠোররা ডুব্রেনেকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। সর্দ্দার শিবসিংহকে দশসহস্র অনুচরসহ প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া ডুব্রেনেক প্রমাদ গণিলেন এবং অগ্রগমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া মেরতা যুদ্ধে দি বইন অনুসৃত রণনীতির অনুকরণে নিজ সেনাদল শূন্যগর্ভ চতুষ্কোণাকারে সাজাইয়া শত্রুকে বাধাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাঠোরসেনা ক্রমেই কাছে আসিয়া পড়িল, ক্রমেই তাহাদের ধাবনের বেগ বাড়িতে লাগিল। রণস্থলের সকল কোলাহল কামানের বজ্রনাদ বন্দুকের শব্দ, বীরের হুঙ্কার, আহতের আর্ত্তনাদ, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহতি—ডুবাইয়া তাহাদের ধাবনজনিত অশ্বখুরোত্থিতশব্দ দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল।* ডুব্রেনেকের কামানসমূহ এক সঙ্গে ঘোররবে অনলবর্ষণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে পুরোবর্ত্তী রাঠোরসৈনিকগণ সংখ্যায় দেড় সহস্রেরও অধিক—ছিন্ন ভিন্ন দেহ বিগতপ্রাণ হইয়া ধরাশায়ী হইল। পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। তাহারা সহযোগীবৃন্দের দেহের উপর দিয়াই ভীমবেগে ধাবিত হইল এবং বাত্যাতাড়িত সাগরোর্ম্মি যেমন তটভূমিকে প্লাবিত করিয়া ফেলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তেমনই ভাবে শত্রু সেনাদের বিধ্বস্ত বিমথিত করিয়া ফেলিল। প্রবল ঝটিকা যেমন পথিমধ্যে অট্টালিকা কুটীর পাদপাদির কোন নিদর্শন না রাখিয়া সকলই সমভূমি করিয়া দিয়া যায় রাঠোররাও সেইরূপ ডুব্রেনেকের সেনাদল ভেদ করিয়া যাইবার কালে কোন দিকে জীবনের কোন চিহ্ন রাখিয়া গেল না। সেনাপতি মহাশয় স্বয়ং এক কামান শকটের নীচে আত্মগোপন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। ইউরোপীয় অফিসরগণ সকলেই নিহত হইলেন। উহাদের মধ্যে কাপ্তেন পেশ নামক জনৈক ইংরাজ সৈনিকের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য।†

* মালপুরা যুদ্ধের প্রকৃত তারিখ লইয়া মতভেদ দেখা যায়। কমটন নিজ গ্রন্থে একস্থানে ১৫ই এপ্রিল ১৮০০ এবং অপর একস্থানে মার্চ ১৭৯৯ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা হইতে যে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ প্রকৃত সময় বলিয়া মনে হয়।

* জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর কথা।

† হুণ্ডার যুদ্ধে (৬।৫।১৮০১) সিন্ধিয়ার সেনাদলভুক্ত একজন কাপ্তেন পেশ আহত হইয়াছিলেন। কমটনের মতে উভয় ব্যক্তি অভিন্ন। "মালপুরায় ঐ ব্যক্তি হয়ত নিহত হয়েন নাই, আহত হইয়াছিলেন মাত্র এবং আরোগ্যলাভ করিয়া পেন্স'র কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন" তিনি বলেন। একথা সত্য নাও হইতে পারে। শুনিয়াছি মীরাট সহরে কাপ্তেনবংশ এখনও বাস করিতেছে।

দুদ্রেনেকের ব্রিগেড ধ্বংস করিয়া রাঠোররা পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগীদিগকে আক্রমণে ছুটিল। উহারা কিন্তু আর তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইল না; রাজপুতদের নিজেদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মহাভয়ে সবেগে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। তখন মহোল্লাসে রাঠোররা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে তাহারা এমন একটি বিষম ভুল করিল যাহার ফলে পরিণামে তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। পলাতকদিগকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া বহুদূরে চলিয়া যাওয়ার জন্য রাঠোররা যুদ্ধ হইতে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য হইয়া পড়িল। পরাজিত হইয়া তাহারা নিজেরা পলায়ন করিলে ফল যাহা হইত, তাহাদের কৃতকার্য্যতার ফলও তাহাই দাঁড়াইল। আসল যুদ্ধের উপর তাহার প্রভাব ব্যর্থ হইল। ঠিক যে সময়টীতে রণস্থলে তাহাদের উপস্থিতি একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল সেই সময়টিতেই তাহাদের সাহায্য পাওয়া গেল না।

এদিকে পলম্যান তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী জয়পুরীসেনাকে পরাস্ত করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে প্রতাপ সিংহ নিজ অশ্বারোহীদের সমবেত করিয়া তাঁহাকে সম্মুখ আক্রমণে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় 'চার্জ্জ' করিলেন। এই সময়ে রাঠোররা যদি শত্রুবাহিনীর অপরপ্রান্ত আক্রমণ করিতে পারিত তবে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু তাহারা তখন কোথায়? কচ্ছবহগণ পলম্যানকে বিতাড়িত করিতে ত' পারিল না, বরং তাঁহার তোপখানার প্রচণ্ড পীড়নে বিপর্য্যস্ত হইয়া নিজেরাই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল এবং একেবারে উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত জয়পুরনগর মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। প্রতাপ সিংহের হস্তী নিহত হইল, তিনি কোনমতে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। যাবতীয় দ্রব্যাদিসহ তাঁহার শিবির, মায় মণিরত্নখচিত তাঁহার স্বর্ণময় উপাস্য দেববিগ্রহগুলি, ৭৪টী কামান এবং ৩০টী পতাকা পলম্যানের হস্তগত হইল।

মধ্যাহ্নকালে বিজয়ঘোষণাসূচক দামামা ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে রাঠোররা দূর হইতে দেখিল যে বিপক্ষের শিবিরে জয়পুরী পতাকা বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে। ইহাতে তাহাদের আনন্দোল্লাসের অবধি রহিল না। কচ্ছবহগণও পলম্যানের সেনাদলকে পরাজিত করিয়া তাহাদের শিবির অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে ভাবিল। তখন কতকটা অসতর্ক বিশৃঙ্খল ভাবে শ্রান্তক্লান্ত সৈন্যগণ অগ্রসর হইল। অকস্মাৎ পলম্যানের কামানসমূহ শতমুখে অগ্নি-উদ্গিরণ করিল, নবাধিকৃত রাজপুত তোপগুলিও তন্মধ্যে ছিল। সম্মুখবর্ত্তী রাঠোর সৈনিকগণ ব্যাপারটা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেই ছিন্ন ভিন্ন দেহে বিগতপ্রাণ অবস্থায় ধরাশায়ী হইল। তখন নিজেদের বিষম ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পুনরায় দলবদ্ধ ভাবে "চার্জ্জ' করিতে রাঠোররা সচেষ্ট হইল। কিন্তু মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করিয়া শত্রুসেনা তাহাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। তখন হতাবশিষ্ট রাঠোরসেনা রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

ইহার কয়েকদিন পরে জেনারেল পের বহুসৈন্য লইয়া আসিয়া পলম্যানের নিকট হইতে প্রধান সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাহার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক যুদ্ধেই রাজপুতদের সকল শক্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর সমগ্র রাজস্থান আবার বিজয়ী সিন্ধিয়ার পদানত হইয়া পড়িল। প্রতাপ সিংহ এবং বিজয়সিংহ গুরু অর্থদণ্ড সমেত দেয় রাজকর প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। সন্ধি-স্থাপনের কয়েকদিন পরে জয়পুরাধিপতি পের এবং তাঁহার অধস্তন ষোড়শজন ইউরোপীয় সৈনিককে নিজ রাজধানী পরিদর্শনার্থ আমন্ত্রণ করিয়া পরম সমাদরে আপ্যায়িত করিলেন। প্রাণের দায়ে পের'র কৃপাকণালাভার্থ তাঁহার এ আকিঞ্চন তাহা সহজেই অনুমেয়।

কর্ণেল জেমস স্কিনার মালপুরার সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের এবং জয়পুররাজের আতিথ্যের বিশদ বিবরণ জন্য কৌতূহলী পাঠক তাঁহার জীবনচরিত দেখিতে পারেন।* স্কিনারের মতে মালপুরা যুদ্ধে রাঠোরদের 'চার্জ্জে' দুদ্রেনেকের ব্রিগেডের আট হাজার সৈনিকের মধ্যে মাত্র দুইশত ব্যক্তি রক্ষা পাইয়াছিল। পলম্যানের সৈন্যক্ষয় তিনি এক হাজারেরও

* **J. Baillie Fraser**—Military Memoirs of Col. James Skinner (1851).

অধিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মচরিতে লোকসংখ্যা সর্ব্বত্রই নিতান্ত অতিরঞ্জিতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের প্রথম ইতিবৃত্ত লেখক মেজর লুই ফার্ডিনাণ্ড স্মিথ উভয় ব্রিগেডের সৈন্যক্ষয় যথাক্রমে পাঁচশত হইতে ছয়শত মধ্যে এবং ১৩৬ জন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। †

চিরশত্রু এই দুই মারাঠা অধিনায়কের মিত্রতা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইল না। অচিরেই আবার তাঁহারা দ্বন্দ্বে মাতিলেন। বর্ষ শেষ হইবার পূর্ব্বেই দুদ্রেনেক নিজ ব্রিগেড পুনর্গঠিত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। আবার যশোবন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজ্যলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎপীড়নে মালবদেশ উৎসাদিতপ্রায় হইল। পুণার রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত থাকায় দৌলৎরাও এ যাবৎ হোলকরের প্রতি তাদৃশ মনসংযোগ করিবার অবকাশ পান নাই। তদ্ভিন্ন বাইদিগের অর্থাৎ পরলোকগত মহাদজী সিন্ধিয়ার বিধবাগণের এবং তাঁহাদের পক্ষাবলম্বী সৈনবী ব্রাহ্মণনেতা লকবাদাদার বিদ্রোহ দমন, হান্সির রাজা জর্জ্জ টমাসের সহিত যুদ্ধ ইত্যাদি কার্য্যে তাঁহার সেনাদল ব্যাপৃত থাকায় যশোবন্তের বিরুদ্ধে অধিক সৈন্য পাঠান সম্ভব হয় নাই। সে সকল কথা অন্য স্থানে বলা যাইবে, এখানে শুধু হোলকরের সহিত যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে; কারণ দুদ্রেনেকের সহিত অন্য বিষয়ের সম্বন্ধ ছিল না।

যশোবন্তের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষার্থ আশু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, নচেৎ সমগ্র জনপদ মরুভূমে পরিণত হইবে একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ১৮০০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সিন্ধিয়া নিজ সেনাদলসহ পুণা হইতে বাহির হইলেন এবং ধীর মন্থর গতিতে মালবদেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে যশোবন্তরাও তৎপূর্ব্বেই উজ্জয়িনী নগর লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে তাহার অদূরে সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ করিলেন। বুরহানপুরে পঁহুছিয়া দৌলৎরাও একথা শুনিয়া কর্ণেল জর্জ্জ উইলিয়ম হেসিঙ্গ নামক তাঁহার একজন ওলন্দাজ জাতীয় সেনাপতিকে চারি ব্যাটালিয়ন সৈন্যসহ নগর রক্ষার জন্য পাঠাইলেন। তখন বর্ষাকাল, পথঘাট সব জলপ্লাবিত, তথাপি যথাসম্ভব দ্রুত গমনে অগ্রসর হইয়া অল্প কয়েকদিনের মধ্যে হেসিঙ্গ উজ্জয়িনীতে আসিয়া পহুঁছিলেন। সিন্ধিয়া ঐ নগরের জন্য এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে হেসিঙ্গের গমনের কয়েকদিন পরে কাপ্তেন ম্যাকইণ্টায়ারকে দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য দিয়া তাঁহার সাহায্য জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহার তিন দিন পরে আবার কাপ্তেন গাতিয়ে (Gautier) নামক ফরাসী সৈনিকের নেতৃত্বে দুই দল এবং তাহারও কয়েকদিন পরে মেজর জন ব্রাউনরিগ নামক তাঁহার বিখ্যাত আইরিশ সৈন্যাধ্যক্ষকে আরও দুই ব্যাটালিয়ন সিপাহী এবং প্রথম ব্রিগেডের সমগ্র তোপখানাসহ তিনি পাঠাইলেন। এইরূপে তাঁহার সৈন্যগণ চারিটী পৃথক অংশে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ৩০-৪০ মাইল ব্যবধানে অগ্রসর হইল; এ অবস্থায় আবশ্যকমত পরস্পরকে সাহায্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রতিপক্ষের এ বিষম ভ্রমের সুযোগ লইতে যশোবন্তের মত সুদক্ষ যোদ্ধার বিলম্ব হইল না। উহাদের সম্মিলিত হইবার অবকাশ না দিয়া প্রত্যেক দলটী নিজ সমগ্র শক্তির দ্বারা পৃথক আক্রমণে বিধ্বস্ত করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন।

তখনকার মত উজ্জয়িনী অধিকার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়া হোলকার সর্ব্বপ্রথম ম্যাকইণ্টায়ারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এদিকে আমীরখাঁ হেসিঙ্গকে আক্রমণের ভান করিয়া উজ্জয়িনীতে আটক রাখিলেন। উক্ত নগর হইতে ২৭ মাইল দূরবর্ত্তী নিউরী নামক স্থানে প্রবলতর শত্রুসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ম্যাকইণ্টায়ার সাধ্যমত আত্মরক্ষা করিবার পর অস্ত্র পরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। বিজয়োৎফুল্ল যশোবন্তরাও তখন ব্রাউনরিগকে আক্রমণে ছুটিলেন। সহযোগীর পরাজয় সংবাদ পাইয়া তিনি হোলকরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং কালবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দ্রুতগতি নর্ম্মদা পার হইয়া তিনি গাতিয়ের দলের সহিত যোগ দিলেন এবং অগ্রগমনে নিরস্ত হইয়া সুন্দর একটী স্থান নির্ব্বাচন করিয়া আত্মরক্ষার আয়োজনে নিরত হইলেন। স্থানটী

† Major L. F. Smith—A Sketch of the Rise, Progress, and Termination of the Regular Corps in the service of the Native Princes of India (1805), p. 13.

স্বভাবতঃই খুব সুদৃঢ় ছিল, তদ্ভিন্ন পরিখাদি দ্বারা তাহা আরও দৃঢ়ীকৃত করিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটী রাখিলেন না। পশ্চাতে বর্ষাপ্লাবিত নর্ম্মদার সলিলপ্রবাহ; সম্মুখে ও পার্শ্বের পার্ব্বত্য ভূমি গভীর অপ্রশস্ত দরিপথে পরিব্যাপ্ত, কোন পথেই শত্রুর অশ্বারোহী সেনার আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না। ব্রাউনরিগের নিকট মাত্র চারি ব্যাটালিয়ন পদাতিক এবং একশত রোহিলা সওয়ার ছিল, কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি তোপখানায় খুব প্রবল ছিলেন। বোম্বাইয়ের একটি সমসাময়িক সংবাদপত্রে এই যুদ্ধে হোলকর পক্ষে মেজর প্লুমে পরিচালিত ১৪ ব্যাটালিয়ন পদাতিক, পাঁচ হাজার রোহিলা ও পঞ্চাশ হাজার মারাঠা অশ্বারোহী, ২৭টী বড় এবং ৪২টী ছোট তোপ ছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। একথা নিতান্ত অতিরঞ্জিত হইলেও সংখ্যাধিক্য যে তাহাদের দিকে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সকাল সাতটার সময় উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। চারিঘণ্টা ব্যাপী ভীষণ গোলা যুদ্ধের পর হোলকরের সৈন্যগণ শত্রুকে সম্মুখ আক্রমণে অগ্রসর হইল। কিন্তু ব্রাউনরিগের প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টিতে তাহাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। শীঘ্রই উহাদের সকল সাহস বিলুপ্ত হইল, তাহারা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না; অধিনায়কের আদেশ, অনুনয়, উপরোধ সকলই ব্যর্থ হইল। তখন বাধ্য হইয়া হোলকর পশ্চাৎপদ হইলেন। শুনা যায় এই যুদ্ধে তাঁহার প্রায় এক সহস্র লোকক্ষয় হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সংবাদ পত্র মতে প্লুমে শত্রু-করে বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাউনরিগের ১০৭ জন (কোন মতে তিন শতের অধিক) সৈনিক বিনষ্ট হইয়াছিল। দেবজী গোখলে নামক একজন মারাঠা সর্দ্দার এবং লেফটেনান্ট রোবোথাম (Rowbotham) নামক একজন আইরিশ সৈনিক নিহত হইয়াছিলেন। নর্ম্মদা যুদ্ধে বিজয়লাভের ফলে ব্রাউনরিগের নাম সমগ্র দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বাস্তবিক এই যুদ্ধ জয় তাঁহার সামরিক কৃতিত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পরাজিত হোলকর ক্ষুণ্নমনে ইন্দোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং আমীরখাঁকে হেসিঙ্গের প্রতি প্রহরায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনী হইতে আগমন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু পাঠান সর্দ্দারের এ ব্যবস্থা মনঃপূত হইল না। তিনি যশোবন্তকে তাঁহার আদেশের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া পরাজয়ের কালিমা মুছিয়া ফেলিবার জন্য উজ্জয়িনী আক্রমণে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। এবার যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল তাহা ইতিহাসে "উজ্জয়িনীর যুদ্ধ" (২রা জুলাই ১৮০১) নামে সুপরিচিত। সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। আমীরখাঁর পাঠান অশ্বারোহীগণের প্রথম চার্জ্জেই বিপক্ষের বার্গীদল পলায়ন করিল। তিনি অতঃপর তাহাদের পদাতিকগণের উপর তীব্র গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে শীঘ্রই তাহাদের দলে বিষম গোলযোগ দেখা দিল। তাহা দেখিয়া হোলকর নিজ সিপাহীগণকে উহাদের আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। কাপ্তেন ফ্লুরী নামক একজন ফরাসী সৈনিক প্লুমের ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণের সহিত হেসিঙ্গের সিপাহীগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। পরিশেষে হোলকর স্বয়ং তাঁহার অশ্বারোহীদলের প্রচণ্ড এক "চার্জ্জ" দ্বারা উহাদের সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। যশোবন্তরাও তখনকার দিনের একজন সুদক্ষ অশ্বসাদি সেনানায়ক ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি সেনাপতিত্বের সুন্দর পরিচয় দিয়াছিলেন। বেগতিক দেখিয়া যুদ্ধারম্ভের অনতিকাল পরেই কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষ হেসিঙ্গ রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাদল সমূলে বিধ্বস্ত হইল, শিবিরস্থ যাবতীয় দ্রব্যাদি কুড়িটী কামানসহ বিপক্ষের হস্তগত হইল। অধস্তন ইউরোপীয় অফিসরগণ সকলেই হতাহত অথবা বন্দী হইলেন। আহত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন হেসিঙ্গের মাতুল মেজর লুই দেরিজ (ফরাসী), কাপ্তেন জন জেমস ডুপো (ওলন্দাজ) এবং লেফটেনান্ট হাম্ফারষ্টোন (ইংরাজ)। নিহত হইয়াছিলেন নিম্নলিখিত আটজন,—জন্‌গ্রেহাম, জনম্যাকফারসন এবং এডওয়ার্ড মণ্টেগু এই তিনজন কাপ্তেন * এবং আয়কাট

* আগ্রা সহরের ক্যাণ্টনমেণ্ট কবরস্থানে সিন্ধিয়ার সেনাদলভুক্ত একজন কাপ্তেন ম্যাকফারসনের বিধবা পত্নী জাণী ম্যাকফারসনের কবর আছে।

ডুলান, হ্যাডন, লেনী ও মেডোজ এই পাঁচজন লেফটেনাণ্ট। পরদিন হোলকরের সেনাদল কর্ত্তৃক উজ্জয়িনী লুণ্ঠিত হইল।

বুরহানপুরে বসিয়া এ পরাজয় সংবাদে দৌলৎরাও প্রমাদ গণিলেন। প্রতিপক্ষকে আর উপেক্ষা করা উচিত নহে, তাহার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে নিজ পূর্ণ উদ্যম প্রয়োগ করা প্রয়োজন একথা বুঝিয়া তিনি চতুর্দ্দিক হইতে নিজ সেনাবল সমবেত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পেশবার দরবারে নিজ স্বার্থরক্ষাকল্পে তিনি পুণানগরে নিজ শ্বশুর সূর্য্যরাও ঘাট্‌গে এবং কর্ণেল রবার্ট সাদারলণ্ডকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট দশহাজার বার্গী এবং পাঁচ ব্যাটালিয়ন পদাতিক সৈন্য ছিল। তিনি এক্ষণে উঁহাদের সসৈন্যে বুরহানপুরে আসিবার আদেশ দিলেন। তদ্ভিন্ন আলিগড় হইতে পের‍ঁকেও শ দুই ব্রিগেড পদাতিক এবং "হিন্দুস্থানী সওয়ার" দলসহ দাক্ষিণাত্যে আসিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। হিন্দুস্থানে নিজ প্রাধান্য রক্ষার জন্য পের‍ঁ অপরাপর মারাঠা সর্দ্দারবৃন্দের সহিত বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। ঠিক এই সময়টিতে তিনি হান্সির রাজা জর্জ্জ টমাসকে চূর্ণ করিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেজন্য তিনি তাঁহার নিকট যে সৈন্যদল ছিল তাহা কোনমতে হাতছাড়া করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। দৌলৎরাওকে তিনি শীঘ্রই সাহায্য লইয়া যাইতেছেন বলিয়া লিখিলেও কার্য্যতঃ কিছুই করিলেন না। সিন্ধিয়ার পুনঃ পুনঃ আদেশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও নানা অজুহাতে সে সকল কাটাইয়া দিয়া বর্ষাপগমের পর টমাসের সহিত তিনি যুদ্ধে মাতিলেন। প্রভুর স্বার্থে পের‍ঁর এই ঔদাসীন্য অর্থাৎ তাঁহার স্বার্থপরায়ণতা এবং বিশ্বাসঘাতকতাই মারাঠা স্বাধীনতা বিলোপের অন্যতম কারণ। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী হইতে সে কথা সুস্পষ্ট হইবে।

উজ্জয়িনীর যুদ্ধের পর সিন্ধিয়া প্রায় তিনমাস কাল নর্ম্মদাতীরে পের‍ঁর প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশা নাই দেখিয়া অবশেষে তিনি নিজ সন্নিকটবর্ত্তী সেনাদলের সাহায্যে হোলকরের সহিত বল পরীক্ষা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই বুঝিলেন এবং তদনুসারে বর্ষাপগমের পর নদীসমূহ পারাপারের উপযোগী হইলে ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে নর্ম্মদার সলিলরাশি উত্তীর্ণ হইয়া মালবদেশে প্রবেশ করিলেন। কোটাসিন্ধু-নদীতীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া দৌলৎরাও উজ্জয়িনী লুণ্ঠনের প্রতিশোধ লইবার জন্য সাদারলণ্ডকে ইন্দোর অধিকারে প্রেরণ করিলেন। যশোবন্তও নিজ রাজধানী রক্ষায় অগ্রসর হইলেন। ১৩ই অক্টোবর তারিখে নগর প্রাকারের বহির্ভাগে উভয় সেনাদলে সাক্ষাৎ হইল। হোলকর পক্ষে দশ ব্যাটালিয়ন পদাতিক, পাঁচ হাজার রোহিলা ও পঁচিশ হাজার মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। কিন্তু তাঁহার ইউরোপীয় সেনানায়কবৃন্দের মধ্যে কেহ এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত। কেহ কেহ বলিয়াছেন উঁহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে এবম্প্রকার সন্দেহের বশীভূত হইয়া যশোবন্তরাও নিজেই তাহাদের দূর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু একথা সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ তিন বৎসর পরে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার বৃটীশজাতীয় সৈনিকগণ স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অসম্মত হইলে তিনি তাহাদের সকলকারই প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন। অনুরূপ অবস্থায় এসময়ে উঁহারা যে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইত না তাহা না বলিলেও চলে। এ সম্বন্ধে Major R. L. Ambrose নামক তাঁহার জনৈক ইংরাজ সেনানীর * কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন যে ইন্দোর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে হোলকরের সেনাদলভুক্ত ইউরোপীয়গণ (ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ফরাসীজাতীয় ছিল) কর্ম্মত্যাগ করিয়া পলায়ন

সমাধিলিপি হইতে প্রকাশ যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে একশত বৎসর বয়সে তাহার দেহান্ত হইয়াছিল। উভয় ম্যাককায়সন অভিন্ন কিনা নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। কাপ্তেন এডওয়ার্ড মর্টেঞ্জ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিক কর্ণেল মর্টেঞ্জর দেশীয়া রমণী গর্ভজাত পুত্র। ইংলণ্ডের কেনসিংটন সামরিক বিদ্যালয়ে তাহার শিক্ষালাভ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ণ শঙ্কর ফিরিঙ্গি বলিয়া কোম্পানীর সেনাদলে প্রবেশ লাভ সম্ভব না হওয়ায় ঐ ব্যক্তি সিন্ধিয়ার কর্ম্ম গ্রহণ করে। কর্ণেল মর্টেঞ্জ ইংলণ্ডের এক লর্ড বংশীয় ছিলেন।

* এই ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা নাই। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখিয়া তিনি কোম্পানীর ডিরেক্টরসভাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তাহাতে রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

করিয়াছিল এবং ইহাই তাঁহার পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।' সাদারলণ্ডের, নিজের ব্রিগেডের দশ ও কর্ণেল ফাইডেল ফিলোজের ছয়, সর্ব্বসমেত চৌদ্দ ব্যাটালিয়ন পদাতিক এবং ২৫০০০ অশ্বারোহী ছিল। তদ্ভিন্ন অনিয়মিত সৈন্য উভয়পক্ষে কত ছিল জানা নাই। মোটের উপর ইন্দোর যুদ্ধে প্রায় দেড়লক্ষ লোক উপস্থিত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

১৪ই অক্টোবর প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ পূর্ব্ব পরাজয়ের কালিমা মুছিয়া ফেলিবার আশায় মহোৎসাহে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। হোলকরের সেনাদল সুপ্রশস্ত এক খাতের অপর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল; তাহাদের কামানসমূহ এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল যে শত্রুরা খাত পার হইবার চেষ্টা করিবামাত্র উহার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র গোলাবৃষ্টি করা যাইতে পারে। আমীরখাঁ নিজ পাঠান সওয়ারগণসহ সুবিধামত বিপক্ষের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। সারাদিন ব্যাপী তুমুল গোলাযুদ্ধের পর অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় সাদারলণ্ডের সিপাহীগণ নালা পার হইয়া শত্রুকে আক্রমণে অগ্রসর হইল; অশ্বারোহীগণ শুধু আমীরখাঁকে বাধা দিবার জন্য যথাস্থানে দণ্ডায়মান রহিল। শত্রুসেনা উহাদের বাধা দিবার জন্য তীব্র অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, সিন্ধিয়ার বীর সৈনিকগণকে প্রতিহত করিতে তাহারা পারিল না; মুহূর্ত্ত মধ্যে খাত পার হইয়া উহারা ভীষণ আক্রমণে বিপক্ষের তোপখানা হস্তগত করিল। এমন সময়ে আমীরখাঁ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী মারাঠা অশ্বারোহী-দলকে পরাজিত করিয়া হোলকরের সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সাদারলণ্ডের আদেশে তাঁহার সেনাদলের একপ্রান্ত ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং নালা পার হইয়া আক্রমণোদ্যত পাঠান সওয়ারগণের প্রতি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। অপর প্রান্ত পূর্ব্বের ন্যায় শত্রুর পদাতিকগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত রহিল। দৈবক্রমে খাত পার হইবার কালে আমীরখাঁর অশ্ব বিপক্ষের গুলির আঘাতে নিহত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ধরাশায়ী হইলেন। অধিনায়ককে দেখিতে না পাইয়া সৈন্যগণ মনে ভাবিল তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন—তাঁহার পতনে তাহাদের সকল সাহস বিলুপ্ত হইল, তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। অতঃপর সাদারলণ্ডের সিপাহীগণ সকলে একযোগে শত্রুর পদাতিকগণকে আক্রমণ করিল। ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধের পর হোলকরের সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। তাঁহার যাবতীয় শিবিরস্থ দ্রব্যাদি, ৯৮টী তোপ, ১৬০টী গোলাবারুদের গাড়ী এবং রাজধানী বিজেতৃগণের হস্তগত হইল। বলা বাহুল্য বিজয়ী সৈন্যগণ পরমোৎসাহে উজ্জয়িনী লুণ্ঠনের প্রতিশোধ লইল। তাহাদের পক্ষে সর্ব্বসমেত প্রায় চারিশত লোকক্ষয় হইয়াছিল। লেফটেনাণ্ট রষ্টক নামক একজন ইউরোপীয় সৈনিক নিহত হইয়াছিলেন।

পরাজিত হোলকর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রথমে মহেশ্বর এবং তথা হইতে রাজপুতানায় পলায়ন করিলেন। বালারাও এবং সদাশিবরাও নামক সিন্ধিয়ার দুইজন সর্দ্দার তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে রতলাম লুণ্ঠন করিয়া যশোবন্তরাও ভেণ্ডির দুর্গে আসিয়া দুর্গাধীশ শক্তাবৎ সর্দ্দারের নিকট হইতে তিন লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। তথা হইতে উদয়পুর লুণ্ঠনে যাইবার বাসনা তাঁহার ছিল; কিন্তু অনুসরণকারীরা নিকটে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সর্দ্দার ও রাণা নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। অতঃপর হোলকর নাথদ্বারে পলায়ন করিলেন। নাথদ্বারের শ্রীনাথজীর মন্দির সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ। দেবপ্রতিমা প্রণামকালে যশোবন্তরাও নিজ পরাজয়ের জন্য দেবতাকে বিষম তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার এত ভক্তি, এত পূজাপাঠসত্ত্বেও তিনি যে পরাজিত হইলেন, বাস্তবিক ইহা কি শ্রীনাথজীর কম অপরাধ? তজ্জন্য তাঁহার তিন লক্ষ টাকা দণ্ড হইল! জামীনরূপে হোলকর মন্দিরের সেবাইতগণের মধ্যে অনেককে ধরিয়া লইয়া গেলেন, প্রধান পুরোহিত দামোদরজী শ্রীনাথজীকে উদয়পুরে পাঠাইয়া দেন। ইহার পর নাথদ্বার দীর্ঘকাল জনসমাগম শূন্য পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল।

হোলকর অতঃপর আজমীর গমন করেন। তিনি যে যে স্থান দিয়া গিয়াছিলেন সর্ব্বত্র হইতেই অর্থাদায় করিতে ছাড়েন নাই। সংগৃহীত অর্থের কতকাংশ তিনি আজমীরে খাজাপীরের দরগায় দান করিলেন। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন হিন্দুর দেবতার দ্বারায় ত কিছু হইল না, পীরের অনুকম্পায় যদি কিছু সুবিধা হয়! সিন্ধিয়ার সেনাপতিরা উদয়পুর অবধি আসিয়া হোলকরের অনুসরণে নিরস্ত হইলেন এবং রাণার নিকট হইতে তিন লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবী করিলেন। হতভাগ্য রাণার অত টাকা দিবার সামর্থ্য ছিল না; কিন্তু তজ্জন্য তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না।—স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসপাত্রও অন্তঃপুরিকাগণের আভরণাদি বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে টাকা দিতে হইল। সিন্ধিয়া ও হোলকরের বিরোধে রাজপুতানার অদৃষ্টে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না।*

(ক্রমশঃ)

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* Tod's "Rajasthan" Vol. I. 477.

লিসেল *

ডক্টর কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়

১

বার্লিন শহর। রাত্রি প্রায় ৯টা। শার্লটেনবুর্গ টেক্নিশে হোখ্‌শুলের(১) নিকটে এক রেস্তোর‌াঁতে হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশান অফ্‌ সেণ্ট্রাল ইউরোপের [Hindusthan Association of Central Europe] সম্পাদক সুধীর চাটুয্যে ও সহকারী সম্পাদক মহম্মদ নওয়াজ কোণের এক টেবিলে ব'সে "শকোলাদে"(২) পান করছে। সমিতির এক দুরূহ প্রশ্নের আলোচনা চলেছে। সমস্যা, বার্লিন অধিবাসী ভারতীয়দের একতা-বদ্ধ করা যায় কী ক'রে? অতি কঠিন প্রশ্ন! জার্ম্মান মেয়ে বিবাহ ক'রে একদল হিন্দুস্থানী বার্লিনেই ঘর বসত করেন, তাঁদের মনোভাব এক রকম—কারণ তাঁরা তেমন শিক্ষিত নন। আবার ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি নিয়ে যে সব ছাত্র বার্লিনে অধ্যয়ন করতে এসেছেন, তাঁদের মেজাজ অন্য রকম। এ ছাড়া প্রকাণ্ড সমস্যা, বাঙ্গালীর তথাকথিত প্রাদেশিকতা আর অবাঙ্গালীর ভীষণ বাঙ্গালী বিদ্বেষ। সব চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার, হিন্দু-মুস্‌লিম্‌ বিবাদ। তারপর পরস্পরের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, মনোমালিন্য ও ঈর্ষার তো কথাই নেই! এই সব জটিল প্রশ্নের আলোচনা চলেছে, এমন সময়ে সদা-প্রফুল্ল ডাঃ নির্ম্মলচন্দ্র রায় হাসতে হাসতে ঢুকলে। তার হাসি তার কথাবার্ত্তা আর তার সদানন্দ মনের এমনি প্রভাব যে সে যেখানে যায় সেখানে কিছুক্ষণের জন্যে একটা আনন্দের তরঙ্গ বয়, লোকে দুশ্চিন্তা, মনোবেদনার কথা ভুলে যায়। ওভার কোটটা খুলে চেয়ারের কাঁধায় রেখে, সেই চেয়ারেই ব'সতে ব'সতে সে বললে, "হেলো, হেলো—কী হ'চ্ছে? আমার আসতে দেরি হ'য়ে গেল রাগ ক'রো না!"

সুধীর :—বুঝেছি, বুঝেছি—কী করা হচ্ছিল চাঁদের?

নির্ম্মল :—হাঃ, হাঃ, হাঃ! [ঠিক সেই সময়ে সেই রেস্তোর‌াঁর লিসেল নাম্নী বিংশ-বর্ষীয়া 'ওয়েত্রেস্‌' নির্ম্মলকে দূর থেকে দেখে উৎফুল্ল হ'য়ে ছুটে এসেছে এবং চেয়ারের কাঁধা হ'তে তার ওভার কোটটা নিচ্চে।]

নির্ম্মল :—বোঝই তো ভাই!—আমি তো তোমাদের মত ভাল ছেলে নই! সে না ছাড়লে আমি কি ক'রে? [লিসেল ওভার কোটটা নিয়ে তার প্রতি সহাস্যে চেয়েছে] নমস্কার লিসেল!—কেমন আছ?

লিসেল [আনন্দ উচ্ছ্বসিতা] নমস্কার হের্‌ রায়! বহু ধন্যবাদ! আপনি ভাল আছেন?

নির্ম্মল :—খুব ভাল—খুব ভাল! ধন্যবাদ!—নাঃ—কী খবর? পুরণো বন্ধুটা এখনো রয়েছে—না আবার নতুন কেউ বাহাল হ'ল?

লিসেল [খিল খিল ক'রে হেসে উঠে] আবার ঐ সব কথা! মেয়েজাত আপনাদের মত 'ট্রয়লোস'(৩) নয়! আমরা অমন—

নির্ম্মল হুঁ, হুঁ, হুঁ—সব জানা আছে [সুধীর ও নওয়াজের ও মুচকে হাসি] কী বলছে?

লিসেল [পুনরায় খিল খিল ক'রে হেসে উঠে] ওঃ, ভারি জানেন—

নির্ম্মল :—আমি জানি না?

১। Scharlottenburg Technische Hoch schule :—জগৎ-বিখ্যাত শিল্প বিশ্ববিদ্যালয়।

২। Schokolade :—কোকোজাতীয় পানীয়।

৩। Treulos :—অবিশ্বাসী।

---

* উচ্চারণ :—লিZেল্‌। অনেকটা "চিকিৎসা বিভ্রাটের" কবিরাজের কথা, "হয়, Zাস্তি পারনা"র "Z" এর মত এই 'স' এর উচ্চারণ।

লিসেল :—হ'য়েছে—হ'য়েছে ! ওসব যা তা কথা রেখে এখন বলুন আপনার জন্যে কি আনবো ? [ছোট একটা নোট বই বার ক'রে]

নির্ম্মল :—ঠিক কথা ! কী আনবে ?—আচ্ছা—

লিসেল :—আপনার প্রিয় হোয়াইট বোর্দো ? না—[অপর দুজনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে] ওঁদের মত শ—কো—লা—দে ! 'তসুক্যার—ভ্যাসের' !(৪) [সকলে হেসে উঠলো]

নির্ম্মল :—ইয়া(৫)—ইয়া(৫) !—তুমি বড় চালাক ! আচ্ছা হোয়াইট বোর্দোই—আর—

লিসেল [ছোট্ট পেন্সিল দিয়ে লিখতে লিখতে] হোয়াইট বোর্দো ! আর ?—কিছু স্যাণ্ডউইচ্ ?

নির্ম্মল :—বেশ, স্যাণ্ডউইচ্ ! স্যাণ্ডউইচ্ কিন্তু তিনজনের মতন !

লিসেল [লিখতে লিখতে] তিনজনের জন্যে ! আর কিছু ?

নির্ম্মল :—আপাততঃ এই !

লিসেল [বিস্মিত]—কেন ?

নির্ম্মল [সুধীর ও নিজকে দেখিয়ে] তা হ'লেই আমরা নরকস্থ হব !

লিসেল [অধিক বিস্মিত] সে কি ?

নির্ম্মল :—হাঁা গো—হাঁা ! আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে ঐ রকম লেখা আছে !

[লিসেল ভিন্ন সকলের হাসি]

লিসেল :—ও বুঝেছি ! কিন্তু সসেজে গরুর মাংস নেই, থাকে শুয়রের মাংস ! আপনারা নির্ভয়ে খেতে পারেন।

নির্ম্মল :—তাও আমরা খাই না।

লিসেল :—তা হ'লে কিসের স্যাণ্ডউইচ্ আনবো ?

নির্ম্মল :—কেন মাটন্ বা মুর্গীর।

লিসেল :—তাতো এখানে পাওয়া যায় না !

নির্ম্মল :—তা হ'লে ডিম বা শশার।

লিসেল [লিখে নিয়ে] বেশ ! ডিম বা শশার স্যাণ্ডউইচ তিন প্লেট্, আর একটা 'হোয়াইট্ বোর্দো' ! কেমন ? এখুনি আনছি [দ্রুত প্রস্থান]

নির্ম্মল :—খাসা মেয়ে !

সুধীর :—নির্ম্মল ভাই শোন ! তোমাকে সকলে ভালবাসে !

নির্ম্মল :—আমি যে সকলকে ভালবাসি !

সুধীর :—তা জানি !—তাই তো বলছি, সকলে তোমার কথাই শুনবে। তাদের একটু বুঝিয়ে শুনিয়ে—

নির্ম্মল :—নাও ঠেলা ! তোমাদের জ্বালায় আর পারি না ! কাজ—আর কেবল কাজ ! এসেছো বাবা, ভূস্বর্গ এই আশ্চর্য্য শহরে, যে দুদিন আছো হাসো, খেলো এখানকার লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা কর, এ জাতটা কেমন তা বোঝার চেষ্টা কর—বড় জোর পড়াশুনো ক'রে নিজের কাজ গুছিয়ে বাড়ী ফেরো ! তা নয়, দল পাকিয়ে পরস্পরে গুঁতো গুঁতি আরম্ভ করেছো—আর এর মধ্যেই ঝগড়া—

সুধীর :—আহা, অত চট কেন ? ঝগড়া মেটাবার জন্যেই তো তোমাকে অনুরোধ করা হচ্চে—

নির্ম্মল :—তোমাদের এ ঝগড়া কোন দিন মিটবে না ! ও বৃথা চেষ্টা—

সুধীর :—তুমি কাজের সময়েই হ'য়ে পড় নিরাশাবাদী ! তোমার কোন ওজর শুনবো না—তোমাকে চেষ্টা করতেই হবে ! এখানে ব'সেও হিন্দু মুস্‌লিমের ঝগড়া আর বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর বিবাদ জার্ম্মানদের কাছে আমাদের দেশকে কত ছোট ক'রে দিচ্ছে বোঝ ?

নওয়াজ :—ঠিক কথা মিঃ রায় ! আপনাকে চেষ্টা করতেই হবে—

নির্ম্মল :—তারা কি আর আমার কথা শুনবে ? [এমন সময়ে মধুর হাসির ছটায় সুন্দর মুখ উজ্জ্বল ক'রে লিসেল এলো, তার হাতে একটা ট্রে। ট্রের ওপরে এক শ্বেত সুধার বোতল, তিনটি সুধা-পাত্র, আর তিন প্লেট স্যাণ্ড্-উইচ্]

নির্ম্মল [মুগ্ধ হ'য়ে তাকে একবার দেখে] কী—অত হাসি কেন ? বন্ধু এসেছে বুঝি ?

৪। Zucker-Wasser :—চিনি গোলা জল।

৫। Jah-Jah ! :—হাঁা, হাঁা !

লিসেল [ট্রেটা টেবিলে রেখে] হি, হি, হি! ভারি মজা হ'য়েছে।

নির্ম্মল :—বটে!—বন্ধুর কীর্ত্তি নিশ্চয়!

লিসেল [কৃত্রিম বিরক্তির স্বরে]—যান্!—জানেন না যেন আমার বন্ধু টন্ধু নেই!

নির্ম্মল :—ইস্! এতো সুন্দরী আবার বন্ধু নেই! কতদিন হ'ল বার্লিনে এসেছো?

লিসেল [প্রশংসায় সন্তুষ্ট] সত্যি নেই!—এসেছি মাত্র একমাস! [তিন জনের সামনে তিনটি সুধাপাত্র ও তিন প্লেট স্যাণ্ডউইচ রাখতে রাখতে] আমাদের কি যে ভাবেন!

নির্ম্মল :—খুব ভাল।

লিসেল :—ভারি! তাহ'লে এমন যা তা বলতেন না।

নির্ম্মল :—কিছু খারাপ বলিনি—

লিসেল :—না খারাপ নয়! বন্ধু নিয়ে এই যা তা ঠাট্টা—

নির্ম্মল :—এতো সম্পূর্ণ "হিউম্যান্"!

লিসেল :—তার মানে, তোমরা খুব সরল, স্বাভাবিক, তোমাদের হৃদয় ব'লে জিনিষ আছে—

লিসেল [সন্তুষ্ট] ও! [প্রফুল্ল মনে ছুরি কাঁটা প্রত্যেক প্লেটের পাশে রাখতে রাখতে] হৃদয়ের মাত্রা কিন্তু বেশি হ'লেই মুস্কিল!

নির্ম্মল :—বটে, বটে! কেন বল তো?

লিসেল [শ্বেত সুধা নির্ম্মলের পাত্রে ঢালতে ঢালতে] তাহ'লেই বিষম ভুগতে হয়! পুরুষজাত যে জিনিষ!

নির্ম্মল :—ইস্!—এর মধ্যেই অভিজ্ঞতা হ'য়েছে? না শোনা কথা কপচাচ্ছ?

লিসেল [কৃত্রিম কোপ-কটাক্ষপাত ক'রে] যান্!—আপনি ভারি দুষ্টু! [খানিকটা সুধা টেবিলে পড়লো] যাঃ, দেখুন কি কাণ্ডটা হ'ল!—এ আপনার দোষ—

নির্ম্মল :—মেনে নিলুম!

লিসেল :—তা'তে তো সব হবে! এখন উপায়?

নির্ম্মল [পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে] পুঁছে দিচ্ছি!

লিসেল [বাধা দিয়ে] না, থামুন! [অ্যাপ্রণ দিয়ে টেবিল পুঁছতে পুঁছতে] আপনার জ্বালায় আর পারি না—

নির্ম্মল :—আমি বড় জ্বালাতন করি, না?—

লিসেল [সে কথা উপেক্ষা ক'রে অপর দুজনের প্রতি] আপনারা মাপ করবেন—

নির্ম্মল :—ওঁদের জন্তে একটুও ভেবো না! মেয়ে দেখলেই ওঁদের মুখ বন্ধ হ'য়ে গেলে কি হয়, ওঁরাও ভারি শিভ্যাল্‌রাস্! ভারতবাসী মাত্রেই "শিভ্যাল্‌রাস্"!

লিসেল [টেবিল মোছা শেষ হ'য়েছে—সন্তুষ্ট] হুঁ—উ! খুব ভাল!! [পুনরায় বোতল নিয়ে সুধীরের গ্লাসে ঢালতে অগ্রসর হ'ল]

সুধীর :—আমাকে নয়—ধন্যবাদ!

লিসেল [বিস্মিত] কেন?

সুধীর :—আমি মদ্য-পান করি না।

লিসেল :—ও! [নওয়াজের প্রতি] আপনাকে দেই?

নওয়াজ :—ধন্যবাদ, না!

নির্ম্মল [অট্টহাস্য সহকারে] হাঃ, হাঃ, হাঃ! আমিই এখানে একমাত্র পাপী [ক্ষিপ্র হস্তে সুধীরের গ্লাসটা কাছে টেনে এনে, লিসেলের প্রতি] বোতলটা দেখি—[লিসেলের হাত থেকে বোতল নিয়ে সেই গ্লাস পরিপূর্ণ ক'রে—বোতলে ভাল ক'রে কর্ক আঁটতে আঁটতে] এই—এই—[বোতলটা টেবিলের ওপরে রেখে,—পূর্ণ গ্লাসটা লিসেলের সামনে তুলে ধ'রে] লিসেল্‌শেন্, আমার সুইট-হার্ট, এটা তুমি ধর! ধর!!

লিসেল [স্তম্ভিত, একটু ভীত, মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে]—আজ্ঞে! আপনি হয়তো জানেন না, এ রেস্তোরাঁতে এ সব চলে না! কিছু মনে করবেন না! [ছোট মেয়েরা যেমন ক'রে হাঁটু নুইয়ে অভিবাদন করে সেই রকম ক'রে] ধন্যবাদ! [প্রস্থানোদ্যত] আশা করি ওটা আপনার ভাল লাগবে [প্রস্থান]।

নির্ম্মল :—হাঃ, হাঃ, হাঃ! তোমরা হ'চ্চ স্পর্শ-মণি! না হ'লে তোমাদের সংস্পর্শে এসে জার্ম্মান্ যার সামনে ধরা সুধার পাত্র প্রত্যাখ্যান ক'রে! [এক নিঃশ্বেসে গ্লাসের সবটা সুধা পান ক'রে] আঃ! চমৎকার—অতি চমৎকার! [খালি গ্লাস সজোরে টেবিলের ওপর রাখলে —গ্লাস সশব্দে গেল ভেঙ্গে]—যাক্!!

সুধীর :—নির্ম্মল, বাড়াবাড়ি ক'র না। এটা হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়শনের পরিচালক সভার বৈঠক!

নির্ম্মল :—জানি! [লিসেল ছুটে এসে কাঁচ কুড়োতে আরম্ভ করলে] গ্লাসের কত দাম লিসেল?

লিসেল :—তা দিয়ে কি হবে?

নির্ম্মল :—বটে! [অপর গ্লাসে পুনরায় বোতল থেকে ঢালতে ঢালতে] তোমাকে শেষে গুণোগার দিতে হবে না?

লিসেল :—না, না! আপনি নিশ্চিন্ত মনে পান করুন।

নির্ম্মল :—বেশ!—আচ্ছা লিসেল [পুনরায় প্রায় অর্দ্ধেক গ্লাস এক চুমুকে শেষ ক'রে] বার্লিন তোমার কেমন লাগে?

লিসেল :—প্রথম দশ বারদিন বেশ লেগেছিল, এখন আর ভাল লাগে না!

নির্ম্মল [একটা স্যাণ্ডউইচ মুখে দিয়ে] সে কি?—বার্লিন ভাল লাগে না?

লিসেল :—আমি পাহাড়ী মেয়ে, পাহাড়ের জন্যে মন কেমন করে।

নির্ম্মল :—তোমার পাহাড়ে বাড়ী? কোথায়?

লিসেল :—ক্যোনিগ্‌সের কাছে বের্খ্‌টেস্ গাড়েনে!

নির্ম্মল :—আল্‌প্সের ওপরে?

লিসেল :—হ্যাঁ—সে বড় সুন্দর জায়গা। [কাঁচ কুড়ানো]

নির্ম্মল [অল্প পরে] কিন্তু!—তোমার শহর ভাল লাগে না? সে তো ভাল লক্ষণ নয়! তাহ'লে কি সত্যিই তোমার বন্ধু জোটেনি? [হঠাৎ সুধীর ও নওয়াজের ওপর নজর পড়ায়] কি হে! তোমরা খাচ্ছ না যে? স্যাণ্ডউইচেও দোষ?

সুধীর :—না, খাচ্ছি [উত্তরে স্যাণ্ডউইচ মুখে দিলে] এখন তাহ'লে কাজ আরম্ভ হ'ক্।

নির্ম্মল :—কাজ? আবার কি কাজ? [পাত্র নিঃশেষ পূর্ব্বক পান ক'রে] যত বাজে কাজ!

[সেই মুহূর্ত্তে নাচের বাদ্য বেজে উঠলো—ষ্ট্রাউসের "দোনাও ভেলেন" (৬), সেই হৃদয়গ্রাহী সুর-তরঙ্গের তালে তালে পা ফেলে বহু তরুণ-তরুণী যুগলমূর্ত্তিতে ঘুরে ঘুরে, দুলে দুলে 'ভাল্‌তস্' নাচ সুরু করলে। নির্ম্মলও টেবিলের নীচেয় কএকবার তালে তালে পা ঠুকে]

নির্ম্মল :—চল লিসেল—নাচা যাক্!

লিসেল [কাঁচ কুড়ানো সবে শষ হে'য়েছে] ছিঃ! কাজ ফেলে নাচলে কর্ত্রী কি বল্‌বেন?

নির্ম্মল [উঠে দাঁড়িয়ে] হোঃ! তার জন্যে আবার ভাবনা! চল, চল। [লিসেলকে সঙ্গে করে নিয়ে নাচতে নাচতে নাচের আসরে চলে গেল]

সুধীর [প্রথমটা স্তম্ভিত হ'য়েছিল! পরে] নাঃ। ও একেবারে উৎসন্ন গেছে! ওর আর কিছু হবে না।

নওয়াজ [মুচকে হেসে] বার্লিনে এটা খুবই স্বাভাবিক।

২

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আজ প্রায় তিন মাস জার্ম্মানীতে এসেছে। বিদেশ-যাত্রার পূর্ব্বে সে কিছু কাল এক আশ্রমে থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেছিল, শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যে—যাতে বাহ্যসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্যের আবহাওয়ার মধ্যেও সে ঠিক থাকতে পারে। তাকে জাহাজে তুলে দেবার সময়ে তার বন্ধুবান্ধব সকলে আশা করেছিল এবং তার নিজের মনেও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইউরোপ তার গায়ে একটা আঁচড়ও দিতে পারবে না, সে যেমনটি যাচ্ছে ঠিক তেমনটি ফিরে আসবে, শুধু একটা ডিগ্রী নিয়ে চ'লে আসবে মাত্র।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বার্লিনে আসার এক মাসের মধ্যে সে হ'ল শয্যাশায়ী। এমন কি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হ'ল। তার যে কী অসুখ তা কিন্তু কেউ বুঝ্‌তে পারলে না। এটা ঠিক সে দিন দিন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লো—এমন কি উত্থান-শক্তি রহিত হ'ল! তার শরীর হ'ল কঙ্কাল-সার আর তার ক্রমাগত ভয় হয়—তার হাত পা বুঝি অবশ হ'য়ে আসছে, তার মৃত্যু বুঝি আসন্ন! শেষে সেই হাসপাতালের অধ্যক্ষ তাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে

৬। Donaw-wellen :—দান্যুব জল-তরঙ্গ। সম্ভবতঃ এই সুরকেই ইংরাজীতে বলে, Blue Danube.

বললেন তার কোন ব্যাধি নেই। মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতার ফলে শরীর মন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে। এর একমাত্র ঔষধ, কোন ভাল জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাকে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিতে রাখা!

হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশানের সভ্যরা পড়লো মহা ফাঁপরে! কে এই দুঃসাধ্য সাধন করবে? একটা ভাল জায়গায় নয় তাদের কেউ তাকে নিয়ে গেল, কিন্তু ঐ মনমরা মানুষের প্রাণে স্ফূর্ত্তি জাগাবে কে? এমন সময়ে সেখানে এলো নির্ম্মল—তার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্যপালন করতে—অর্থাৎ হরেনকে একবার দেখতে। ঐ কর্ম্ম-বিমুখ মানুষটা এ কাজ নিয়মমত ক'রে যায় বটে, কিন্তু ও যে এই বিষম প্রশ্নের কোন সমাধান করতে পারে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। কিন্তু অধ্যক্ষের এই মন্তব্য শুনে সে লাফিয়ে উঠে বললে, তাহ'লে সে যা ভেবেছিল তাই ঠিক! এবং সকলকে নিশ্চিন্ত ক'রে মহা উৎসাহের সহিত ঘোষণা করলে, হরেনকে ভাল করবার ভার এখন থেকে সে নিলে। লিসেলের নিকট হ'তে তার পিতার নামে এক পরিচয়পত্র নিয়ে, সে হরেনকে নিয়ে ব্যাভেরিয়ার বের্খ্‌টেস্‌-গাডেনের দিকে রওনা হ'ল। নির্ম্মলের সদা হাস্যময় সঙ্গ ও তার সুনিপুণ পরিচর্য্যার ফলে পথেই গেল হরেনের অর্দ্ধেক অসুখ সেরে।

জার্ম্মানীর মানসরোবর 'ক্যোনিগ্‌ সে' হ্রদ—আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের ওপরে। এর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ভুবন-বিখ্যাত। এর নিকটেই এক গ্রাম, নাম তার বের্খ্‌টেস্‌-গাডেন। এই গ্রামে থাকেন লিসেলের পিতা—তিনি কৃষক। তাঁর ছোট্ট বাড়ীতে যেটি সব চেয়ে বড় ঘর, তাতে দুটি খাট পড়েছে। একটি নির্ম্মলের, অপরটী হরেনের। বাকি আসবাবপত্রের মধ্যে, মাত্র দুটি চেয়ার, একটা তেপায়া গোল টেবিল, আর একটা অতি অল্প মূল্যের কাঠের আলমারি—তাতে কাপড় জামা রাখা হয়। ঘরের কোণে একটা চটা ওঠা 'ওয়াশ্‌-ষ্ট্যাণ্ড' আছে বটে, সেটা এতো খেলো যে তা থাকায় ঘরের সামান্য সৌন্দর্য্যও নষ্ট হ'য়েছে। কাঠের দেওয়াল, তার নগ্নতা যেন চোখে ঠেকে। কিন্তু পর্দ্দা-শূন্য জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের গাছপালার দৃশ্য আর দূরে সারি সারি আল্‌পসের তুষার-শুভ্র শিখরের দৃশ্য মন-প্রাণ এতো ভ'রে দেয় যে ঘরের দৈন্য নজরেই পড়ে না।

প্রাতঃকাল বেলা প্রায় ৯টা। নির্ম্মল ও হরেন্দ্র সবে প্রাতরাশ শেষ করেছে। একটি ১৬।১৭ বছরের পাহাড়ী মেয়ে চায়ের বাসন-পত্র নিয়ে যাচ্চে। মেয়েটিকে দেখতে অবিকল লিসেলের মত, কিন্তু আরো সরল। দুই গণ্ডের লোহিত আভা শহরের বাতাসে এতটুকু ম্লান হয় নি। নীল চক্ষুর সরল দৃষ্টিতে শহুরে চতুরতার কোন চিহ্ন নেই। বেশ অতি সাধারণ পাহাড়ী কৃষকমেয়ের মতন। বিপুল সোণালী চুল দুই গুচ্ছ বেণীতে বাঁধা। স্বাস্থ্য এতো ভাল যে একটু স্থূল বলেই মনে হয়। শহুরে শারীরিক রেখা কোথাও পরিস্ফুট নয়—হয়তো শহুরে 'স্মার্ট ড্রেসে'র অভাবে তা ফোটে নি। মেয়েটির নাম, অ্যানি।

নির্ম্মল:—খাসা কফি হ'য়েছে অ্যানি!

অ্যানি:—সত্যি? [সন্তুষ্ট, মুখে সরল হাসি ফুটেছে] আমার মা এ কথা শুনে ভারি খুসি হবেন।

নির্ম্মল:—তোমাদের এখানে বড় ভাল মাখন পাওয়া যায়, নয়?

অ্যানি:—হাঁ 'মাইন্‌ হের্‌'! (৭) আমাদের ঘরের দুধ থেকে রোজ টাট্‌কা মাখন তোলা হয় কি না—তাই অত ভাল!

নির্ম্মল:—ঠিক, ঠিক! দেখো, কাল থেকে দুধ একটু বেশি দিও। আমার বন্ধুটি কফি পান করেন না—শুধু দুধ খান!

অ্যানি [বিস্মিত] অ্যাঁ!—খালি দুধ খান? উনি শুধু দুধ খেতে পারেন?

নির্ম্মল:—দুধ আমরা বড় ভালবাসি! বিশেষ ক'রে এতো ভাল দুধ!

অ্যানি:—ও!! [কুতূহল] আচ্ছা! আপনারা গরুর মাংস খান না কেন?

নির্ম্মল:—গরু যে দেবতা, তার মাংস কি খায়, ছিঃ!

অ্যানি [অতি বিস্মিত] অ্যাঁ! গরু দেবতা? আপনারা তাকে পূজো করেন তা' হলে?

নির্ম্মল:—করি!

৭। Mein Herr :—মহাশয়!

অ্যানি [বিস্ময়ের সীমা নেই] আমরা যেমন মেরি মাতাকে [ক্রস্ করা] করি ?

নির্ম্মল :—আমাদের শাস্ত্রে বলে গাভীর শরীরে তেত্রিশ কোটী দেবতা বাস করেন।

অ্যানি [পরম অভিভূত] ও !! [একটু ভেবে] তাহ'লে আমাদের দেবতা ভার্জিন মেরি [ক্রস্ করা] আর আপনাদের দেবতা ভার্জিন্ গাভী ? [পুনরায় ক্রস্ করা]

[নির্ম্মল হাঃ, হাঃ, হাঃ ক'রে উচ্চে হেসে ফেললে, হরেনও না হেসে থাকতে পারলে না]

অ্যানি [থতমত খেয়ে] আপনারা এতো হাসলেন কেন ?

নির্ম্মল :—ঠিক হ'ল না ! আর একদিন সব বুঝিয়ে বলবো।

অ্যানি [প্রস্থান করতে করতে] বেশ, আর একদিন সব শুনবো [দরজার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অতি উৎফুল্ল হ'য়ে] ঐ দেখুন লিসেল—লিসেল এসেছে, লিসেল ! [বেগে দরজায় বাহিরে গিয়ে—উভয় ভগ্নীর আলিঙ্গন, চুম্বন, "কেমন আছিস্ অ্যানি ?" "তুই কেমন আছিস লিসেল্শেন্ ?" ইত্যাদির আওয়াজ ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে।]

নির্ম্মল [বিস্মিত] লিসেল এসেছে ? [লিসেলের বেগে প্রবেশ, পশ্চাতে অ্যানিও এসে, চায়ের বাসন-পত্র নিতে লাগলো]

নির্ম্মল [হাত বাড়িয়ে] লিসেল ?—কখন এলে ?

লিসেল [ছুটে এসে কর-মর্দ্দন পূর্ব্বক] হুঁ—উঁ ! [আনন্দে শরীর বাঁকিয়ে] এইমাত্র এলুম ! কেমন আছেন ?

নির্ম্মল :—তুমি কেমন আছ ? একবারও ভাবিনি তুমি আসবে ! [উভয়ের মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস—তখনো কর-মর্দ্দন চলেছে]

লিসেল [আবার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে] এ—লুম ! ভাল আছেন ?

নির্ম্মল [আবার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে] তুমি ভাল আছ ?

লিসেল [আবার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে] খুব ভাল ! ধন্যবাদ !! [হরেন্দ্রের ওপর নজর পড়ায়, হাত ছেড়ে দিয়ে] ও !—ইনি আপনার বন্ধু ?

নির্ম্মল :—হ্যাঁ, এই আমার বন্ধু হরেন। আর হরেন, এই আমাদের লিসেল।

লিসেল [হেসে হাত বাড়িয়ে] কেমন আছেন ?

[হরেন্দ্র সঙ্কুচিত। ঘাড় হেঁট ক'রে রইল, লিসেলের হাত বাড়ানোর অর্থই যেন ঠিক বোঝে নি !]

নির্ম্মল :—লিসেল কে বুঝলে না ? এর চিঠি নিয়ে আমরা এখানে এসেছি !

হরেন [নির্ম্মলের দিকে চেয়ে] অঁ্যা ?—ও ! [লিসেলের দিকে অল্প হাত বাড়ালো—লিসেল ততক্ষণে হাত সরিয়ে নিয়েছে]

লিসেল :—আপনি কেমন আছেন ?

হরেন [অদ্ভুত স্বরে] আজ্ঞে ?

নির্ম্মল :—ও এখনো জার্ম্মান্ শেখেনি !

লিসেল :—ও ! জার্ম্মান্ শিখতে কত দিনই বা লাগবে !

নির্ম্মল :—তুমি শেখানোর ভার নিলে ও শিগ্গীর শেখে বটে !

লিসেল :—আমি তো এসেছি মাত্র দুসপ্তাহের জন্য।

নির্ম্মল :—মাত্র দুসপ্তাহের জন্যে ?

লিসেল :—তার বেশি ছুটি পেলুম কোথায় ?

নির্ম্মল :—বটে ! এতো অল্প ছুটি নিয়ে এতো দূরে এলে কেন ?

লিসেল :—মা যে লিখলেন আসতে ! আপনাদের কী দরকার না দরকার তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, তাই আমাকে বিশেষ ক'রে লিখেছেন আসতে !

নির্ম্মল :—আমাদের তো কোন কষ্ট হ'চ্ছে না ! কী বল হরেন ?

হরেন :—অঁ্যা ?

নির্ম্মল :—তা এসেছো বেশ করেছ ! তবু দশ বারদিন আনন্দে কাটানো যাবে ! কী বল ?

লিসেল [আনন্দে হেসে] নিশ্চয় !

নির্ম্মল :—কিন্তু যাওয়া আসার ভাড়াটা আমাদের কাছে নিও।

লিসেল:—ছিঃ, এমন কথা কি মুখে আনে! আপনারা না আমাদের অতিথি? [আবার হেসে উঠে, নির্ম্মলের দিকে হাত বাড়িয়ে] চলুন এখন বেড়াতে যাই। [নির্ম্মলের হাত ধ'রে] এমন সুন্দর সকালে কি কেউ ঘরে ব'সে থাকে?

নির্ম্মল:—তুমি যে এই এলে, একটু বিশ্রাম কর।

লিসেল:—না, না চলুন! কতদিন পরে আবার আমার চির-পরিচিত পাহাড়ী রাস্তা, ঝরণা, বাগান, গুহা সব দেখতে পাবো—আমার প্রাণ যে কি ব্যাকুল হ'য়েছে বুঝছেন না? চলুন, চলুন।

তিন জন বার হ'ল বেড়াতে। মাঝে নির্ম্মল—লম্বায় প্রায় ছয় ফিট, ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, পরিধানের স্যুটটা অতি আধুনিক, সম্পূর্ণ নিখুঁত। নির্ম্মলের ডান পাশে লিসেল, নির্ম্মলের ডান হাত তার বাঁ হাতের মধ্যে নিয়েছে। লিসেল তখনো পাহাড়ী মেয়ের বেশ পরেনি—তার পরিধানে বার্লিন তরুণীর আধুনিকতম বেশ। মাথার সোনালি চুল বেণীতে বাঁধা নয়—বেণী বাঁধার উপায় নেই, কারণ ওয়েট্রেসের কাজ করতে গিয়ে তাকে 'বব্' ক'রতে হ'য়েছে। একমাস বার্লিনে থেকে তার গণ্ডের লোহিত আভা অনেকটা ম্লান হ'য়েছে বটে, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে মুখে বুদ্ধিমত্তার মাত্রা বেশী ফুটেছে। পাহাড়ী স্থূলত্ব শহরের হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে—তার দেহলতা এখন এমনি লালিত্যপূর্ণ, তার গঠন-ভঙ্গী এতই সুন্দর যে তার চলাকে মনে হ'চ্ছিল ছন্দে ছন্দে নাচা। তার হাসির মধুর ঝঙ্কার মাঝে মাঝে বৃক্ষ-লতা-পাথরকেও ঝঙ্কৃত করছিল। তার সুমিষ্ট কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত আলাপ যেন অবিরাম সুরের লহরী সৃষ্টি করছিল,—আর মাঝে মাঝে নির্ম্মলের প্রাণখোলা হাসি সেই সঙ্গীতের সঙ্গত রচনা করছিল।

আর হরেন?—নির্ম্মলের বাঁ দিকে, ঘাড় হেঁট ক'রে, মুখটি বুঁজে চলেছে! জার্ম্মাণীতে 'স্যুট' না পরলে চলে না, তাই এক জোড়া ইস্ত্রি-হীন পেন্‌টুলেন আর একটা ঢোলা জামা গায়ে চ'ড়েছে। সেটা যে বহে মেলে ওঠার এক ঘণ্টা আগে চাঁদনী চক্ থেকে 'রেডি মেড্' কেনা হ'য়েছিল, তা নিঃসন্দেহ। কামিজ অতি নোংরা, তার ঘেমো গন্ধ দূর থেকে পাওয়া যায়। গলার কলারে সাতপুরু ময়লা। আর গলায় একটা ছয় আনা দামের 'টাই' জড়ানো আছে বটে, কিন্তু সেটা যে কী তা কাছে এসে নিরীক্ষণ না করলে চেনা শক্ত। মাথার হ্যাট তথৈবচ।

পাহাড়ের কোলে রাস্তা। রাস্তার ধার দিয়ে অবিরাম ঝর-ঝর ঝর-ঝর উদাও স্বরের ঐক্যতান রচনা করে নির্ঝর ছুটেছে ধরার বক্ষে আশ্রয় পেতে। রাস্তার দু'ধারে পাহাড়—ছোট বড় মাঝারি। রাস্তা কখনো একটা অনুচ্চ পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেছে, কখনো বা টানেলের ভেতর দিয়ে ছুটেছে, আবার কখনো পাহাড়ী ক্ষেতের বক্ষ ভেদ ক'রেছে। দূরে দূরে আল্‌পসের শুভ্র চূড়া দৃষ্টিগোচর হ'চ্চে। এক একটা পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি ছোট ছোট কুটীর—দূর থেকে মনে হ'চ্চে যেন খেলার ঘর, সূর্য্যের আলোয় চিক্‌মিক্ করছে। সমস্ত দৃশ্যে এমন একটা সৌন্দর্য্যের মিষ্টতা, এমন একটা কমনীয়তা অনুভব করা যায় যে, মনে হবে এখানে প্রকৃতি আপন খেয়ালে বন্য-সৌন্দর্য্যের বিশালত্ব সৃষ্টি করেনি—মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে মানুষেরই স্বাস্থ্যকর, কল্যাণকর, তৃপ্তি-দায়ক, বাস-ভূমি সৃষ্টি ক'রেছে। বার্লিনে, হাম্বুর্গে, এসেনে, লাইপজিগে অতিকায় যন্ত্র দৈত্যের সেবা করতে করতে পরিশ্রান্ত হ'য়ে মানুষ আসে এই মনোরম আশ্রয়ে বিশ্রাম করতে, স্বাস্থ্য ফিরে পেতে, জীবনী-শক্তির ভাণ্ডার পুষ্ট করতে। বেলা বারোটা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে তারা বাড়ী ফিরলে। সেই দিন হ'তে নিত্য তারা সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যায় বেড়াতো।

একদিন তারা গেলো 'ক্যোনিগ্‌সে'র হ্রদে—প্রত্যুষে! ইচ্ছা—দিনটা হ্রদে কাটায়। সারাদিনের জন্যে একটা নৌকা ভাড়া করা হ'ল। মনোরম হ্রদের বিস্তৃত বক্ষে তারা অনেকক্ষণ নৌকা চালালে। কখনো নির্ম্মল, কখনো লিসেল, কখনো দুজন এক সঙ্গে নৌকার দাঁড় বাইলে। আর হরেন? ঘাড়টি গুঁজে চুপ ক'রে ব'সে রইল! বহু যুগল-মূর্ত্তি নৌকা নিয়ে বার হ'য়েছে, বহু যুগল-মূর্ত্তি স্নানের বেশে কিনারায় বিশ্রাম করছে, কোথাও কোথাও তরুণ-তরুণী আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে জল-কেলি করছে। কালো পাহাড়ের কোলে নীল জল, কালো পাহাড়ের গায়ে সবুজ গাছপাতা,

জার্ম্মান তারুণ্যের রূপমাধুরীর ছটায় উজ্জ্বল হ'য়েছে, জার্ম্মান তারুণ্যের প্রাণোচ্ছ্বাসে প্রকম্পিত হ'য়েছে—হরেন রাখলে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করে। অনতিপ্রসর হ'লেও হ্রদটা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই ক্রোশ। তার উপকূলের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোট্ট বসতি আছে, সেইখানে পর্ব্বত-শৃঙ্গে ওঠার রাস্তা আরম্ভ হয়েছে। সেখানে একটা রেস্তোরাঁও আছে। সেই রেস্তোরাঁয় তারা মধ্যাহ্ন-ভোজন করলে। তারপর মতলব হ'ল, পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে। কিন্তু হরেন অসমর্থ। সুতরাং সে রইল রেস্তোরাঁয়, আর নির্ম্মল ও লিসেল বার হ'ল পাহাড়ে উঠতে। কিছুদূর ওঠার পর লিসেল বললে, "আমার মত অত শিগ্‌গীর পাহাড়ে চড়তে পারেন ?"

নির্ম্মল :—হাঃ, হাঃ ! পাহাড়ী মেয়ে হ'লেও, আমি পুরুষ আর তুমি নারী, এ কথা ভুলে যেও না !

লিসেল :—ইস্‌ ! ভারি পুরুষ ! দেখা যাক্ কে আগে এই পাহাড়ের মাথায় ওঠে।

নির্ম্মল :—না, না। হেঁকা-দমকা করতে গিয়ে শেষে তোমার একটা বিপদ হ'ক !

লিসেল :—হি, হি, হি ! আমার হবে পাহাড়ে উঠতে বিপদ ! তবে আপনার বিপদ হ'তে পারে বটে, কারণ আপনি অনভ্যস্ত !

নির্ম্মল :—বেশ বাপু, আমারই বিপদ হবে, ওতে দরকার নেই।

হঠাৎ লিসেল দৌড়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলে, আর চীৎকার করতে লাগলো, "আমায় ধরুন দেখি হের্‌-রায় !" নির্ম্মল আর নিজকে সম্বরণ করতে পারলে না। সেও দৌড়ে উঠতে আরম্ভ করলে। কিছুক্ষণ পরেই নির্ম্মল অনেক এগিয়ে গেল। লিসেল হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণে উঠছে দেখে তার জন্তে অপেক্ষা করলে। লিসেল তার কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "নাঃ, একমাস বার্লিনে থেকে আমি অপদার্থ হ'য়ে গেছি। কিন্তু আপনার যে অদ্ভুত শক্তি তা স্বীকার করতে হ'ল।" একটা প্রকাণ্ড পাথরে পা দিয়ে উঠে নির্ম্মলকে ধরতে গিয়ে লিসেলের পা গেল পিছলে। নির্ম্মল তৎক্ষণাৎ তাকে ধ'রে ফেললে। উভয়ে একবার নীচের দিকে তাকালে—কী ভীষণ ! আর একটু হ'লে লিসেল যেতো প'ড়ে—হ'য়ে যেত সব শেষ !! দুজনে ভীত হ'য়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালে। দুজনেরই বুক কেঁপে উঠেছে। নির্ম্মল লিসেলকে অনায়াসে শূন্যে তুলে নিরাপদ জায়গায় নামালে।

নির্ম্মল :—তুমি বড় চঞ্চল !

লিসেল [হেসে]—আপনি না থাকলে এতক্ষণে যমের বাড়ী হাজির হতুম।

নির্ম্মল :—বড় বাহাদুরী ! চল এখন নীচে নামি।

লিসেল :—এখনি নীচের কি ? এই তো পাহাড়ের গোড়া !

নির্ম্মল :—আর উঠে দরকার নেই—চল।

লিসেল :—তা কি হয় ! আর একটু উঠলে বরফ দেখা যাবে, অন্ততঃ সেটা দেখবেন চলুন ! চূড়ায় নয় নাই উঠলেন।

নির্ম্মল :—বরফ দেখে কাজ নেই, চল [লিসেলের হাত ধ'রে নামবার উপক্রম]

লিসেল [অকস্মাৎ হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে উঠতে উঠতে] হের রায়, এবার ধরুন দেখি ! [ক্রমাগত দৌড়ান] এবার আর পারছেন না—এবার আর কখনই পারবেন না—

নির্ম্মল [ভীত] লিসেল ! আবার ? [দৌড়ে উঠে লিসেলকে ধ'রে ফেলে] থামো ! তুমি বড় দুষ্টু [তার হাত বগলের মধ্যে নিয়ে] নীচে চল—তোমাকে আর ছাড়ছি না—

লিসেল :—হি, হি, হি ! আমি চিরকালই দুষ্টু !

বিশেষ ক'রে পাহাড়ে উঠলে আমার দুষ্টুমি যায় বেড়ে [হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠে] উঃ ! আমার হাতে বড় লাগছে। [নির্ম্মল চমকে তার হাত ছেড়ে দিলে] হি, হি, হি ! [লাফাতে লাফাতে দূরে সরে গিয়ে] বলেছিলেন না আমাকে আর ছাড়বেন না ? এখন ? [পুনরায় দৌড়াবার উপক্রম ক'রে] এবার ধরুন দেখি—

নির্ম্মল [ছুটে গিয়ে তার হাত ধ'রে] না, লিসেল না ! তোমার পায়ে পড়ি আর অমন ক'র না।

লিসেল :—আচ্ছা ! অত ক'রে যখন বলছেন, আপনার কথা নয় শুনলুম। কিন্তু নীচে নয়—উপরে চলুন। অনেক ওপরে !

নির্ম্মল :—অনেক ওপরে ? কোথায় ?

লিসেল :—বললুম যে—যেখান থেকে এ পর্ব্বত চিরকাল তুষার-শুভ্র ! সে বড় সুন্দর জায়গা—দেখবেন চলুন না !

নির্ম্মল [প্রতিবাদ বৃথা বুঝে] চল ! কিন্তু আস্তে আস্তে উঠতে হবে।

লিসেল [হেসে] বেশ তাই হবে।

নির্ম্মল :—আমার হাত ধর। আর বরাবর আমা হাত ধ'রে উঠতে হবে।

লিসেল :—আচ্ছা তাই সই। চলুন। [লিসেল নির্ম্মলের হাত ধ'রলে, উভয়ে আবার পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলে]

নির্ম্মল :—তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ—বরাবর আমার হাত ধ'রে উঠবে !

লিসেল :—আপনার বিশ্বাস একবার কথা দিলে আর তা ভাঙবো না ? [উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে একবার তাকালে। নির্ম্মল কোন উত্তর দিলে না। দুজনে চুপ করে অনেকক্ষণ উঠলে]

লিসেল [হঠাৎ জিজ্ঞাসা] আচ্ছা, আমি পড়ে গেলে কী করতেন ?

নির্ম্মল :—অ্যাঁ ?

লিসেল :—কী ভাবছিলেন ?

নির্ম্মল :—তেমন কিছু নয় ! কী যেন জিজ্ঞাসা করলে ?

লিসেল :—তেমন কিছু নয় !

নির্ম্মল :—না, না, কী যে জিজ্ঞাসা করলে ! কী বল না !

লিসেল :—আগে বলুন আপনি কি ভাবছিলেন ?

নির্ম্মল :—ভাবছিলুম পাহাড়টা কত সুন্দর ! [লিসেলের মুখের দিকে তাকিয়ে] আর এই গম্ভীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে তোমার চাঞ্চল্য—

লিসেল [বাধা দিয়া] আমিও ভাবছিলুম এখান থেকে প'ড়ে গেলে কী মজাটাই হ'ত !

নির্ম্মল :—ছিঃ, ওকথা মুখে এনো না।

লিসেল :—সত্যি আমি প'ড়ে গেলে কী করতেন ?

নির্ম্মল :—ও কথা থাক্।

লিসেল :—আপনি তাহ'লে বড় বিপদে পড়তেন, নয় ? কিন্তু আমি যে দুষ্টু, আবার যদি এমন কিছু ক'রে বসি যাতে ক'রে একেবারে নীচে প'ড়ে যাই ?

নির্ম্মল :—আমি কাছে থাকতে তা হ'তে দিচ্চি না।

লিসেল :—ইস্ ! আপনার তো ভারি মুরদ ! দু দুবার হাতছাড়িয়ে পালালুম, আটকাতে পেরেছিলেন ?

নির্ম্মল :-- লিসেল ! তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ—

লিসেল :—সে তো এখনকার মত। ভবিষ্যতে ? আপনি তো আর চিরকাল আমাকে আগলাবার ভার নেবেন না ?

নির্ম্মল :—লিসেল ! আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর ভবিষ্যতে আর কখনো এমন কাজ করবে না !

লিসেল [হেসে উঠে] আপনি বড় ভীতু !

নির্ম্মল :—মেনে নিলেম আমি ভীতু। কিন্তু তুমি, প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনো এমন কাজ করবে না।

লিসেল [আরো উচ্চে হেসে উঠে] হি, হি, হি ! সারা জীবনের জন্যে কখনো এমন ভাবে প্রতিজ্ঞা করা চলে ? [হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কোন কথা না ব'লে আবার দুজনে কিছুক্ষণ উঠলো]

লিসেল [অকস্মাৎ] আপনাকে দেখে আমার কাকে মনে পড়ে জানেন ?

নির্ম্মল :—কাকে ?

লিসেল—আমার এক বড় ভাই ছিলেন, তাঁকে। এই পাহাড়ে কতদিন তাঁর সঙ্গে চড়েছি, কতবার ঐরকম প'ড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেছি। তিনি আমাকে তার জন্যে কত বকতেন—কিন্তু আমি আর শুধরালুম না। আমি যে পাহাড়ী মেয়ে—বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই আমার জন্মগত স্বভাব।

নির্ম্মল—তিনি এখন কোথায় ?

লিসেল [শুষ্ককণ্ঠে]—মারা গেছেন—যুদ্ধে।

নির্ম্মল :—ও !

[নীরবে আরো কিছুক্ষণ ওঠার পর, একটা ঝোপ পার হয়ে অকস্মাৎ তারা দিগন্ত বিস্তৃত বরফের কিনারায় পৌঁছালো]

লিসেল [উৎফুল্ল] ঐ দেখুন [উৎসাহের সহিত] দেখুন কত সুন্দর !

নির্ম্মল [মুগ্ধ-নেত্রে দেখতে দেখতে] হ্যাঁ, অতি সুন্দর! [উভয়ে আর একটু অগ্রসর হ'য়ে অল্‌পসের চির-শুভ্র অংশে পদার্পণ ক'রে] বাঃ—সত্যি কী আশ্চর্য্য—কী অপূর্ব্ব!

[উভয়ে মুগ্ধ হ'য়ে কিছুক্ষণ দেখলে]

নির্ম্মল [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] চল এখন নীচে নামি।

লিসেল—বরফের ওপরে একটু যাওয়া যাক্ চলুন।

নির্ম্মল—না, নামি! হরেন বেচারি একা রয়েছে!

লিসেল—ও, তাও বটে! তা'হ'লে চলুন! [নামতে সুরু করলে] আপনার বন্ধুটি বড় ভাল মানুষ, নয়?

নির্ম্মল—শুধু ভাল নয়, দেব-চরিত্র, পরম ধার্ম্মিক!

লিসেল—আচ্ছা, উনি অমন বিমর্ষ হ'য়ে থাকেন কেন?

নির্ম্মল—শরীর খারাপ তাই মনে স্ফূর্ত্তি নেই।

লিসেল—বেচারি! [নামতে নামতে, অল্প পরে] আচ্ছা, উনি কি নারী-বিদ্বেষী?

নির্ম্মল—অমন কথা বল্‌ছো কেন?

লিসেল—উনি যে মেয়ে দেখলেই গম্ভীর হন, কথা বলেন না।

নির্ম্মল—ও! [স্বল্প হেসে] উনি ব্রহ্মচারী, মেয়েদের সঙ্গে ওঁর কথা বলতে নেই।

লিসেল—সে কি?

নির্ম্মল—তোমাদের দেশে যেমন 'মনক' হয় না? —অনেকটা সেই রকম।

লিসেল [বিস্মিত] উনি 'মনক'?

নির্ম্মল—না, তা ঠিক নয়! ওঁর মনোভাব সেই রকম।

লিসেল—ও বুঝেছি। [চুপ ক'রে কিছুক্ষণ নামার পর]

নির্ম্মল—আচ্ছা লিসেল, তোমার কোন সুন্দরী বান্ধবী আছে?

লিসেল—কেন?

নির্ম্মল—হরেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে।

লিসেল—কি জন্যে?—উনি না 'মনকে'র মত!

নির্ম্মল [হেসে] যতই ব্রহ্মচারী হ'ক্, সুন্দরী বান্ধবী ওর মনে স্ফূর্ত্তি আনার চেষ্টা করলেই ওর মুখে ফুটবে হাসি, ওর জীবন হবে সরস, ওর প্রাণে ভরবে আনন্দ! তারই অব্যর্থ ফলে ওর শরীরও হবে সুস্থ। যাক্—এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝবে না। তুমি শুধু তোমার কোন রূপবতী বান্ধবীর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দাও।

লিসেল—এই জঙ্গলে রূপসী কোথায় পাই বলুন?

নির্ম্মল—আহা, তুমি তো এই জঙ্গলেরই মেয়ে গো! তোমার মত অত সুন্দরী না হলেও, অনেকটা তোমার মত হ'লেই যথেষ্ট!

লিসেল—সত্যি নাকি?

নির্ম্মল—নিশ্চয়! জানো না তো তুমি কত সুন্দর। [লিসেল অত্যন্ত গম্ভীর হ'ল। কোন কথা বললে না। নীরবে উভয়ে কিছুক্ষণ নামার পর]

নির্ম্মল—তুমি যে আর কথা বল্‌ছো না।—কী ভাবছো?

লিসেল—তেমন কিছু নয়।

নির্ম্মল—[সেই প্রকাণ্ড পাথর লক্ষ্য ক'রে] ইস, এই সেই পাথর! [দাঁড়িয়ে] আর একটু হ'লে কী বিপদই হ'ত?

লিসেল—বেশ হ'ত!

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে তারা দেখলে, নির্ম্মলের নামে এক টেলিগ্রাম এসেছে—তার দাদা পাঠিয়েছেন। তিনি লণ্ডন থেকে বার্লিনে এসেছেন, মাত্র দুই তিন দিনের জন্যে। নির্ম্মল যেন তৎক্ষণাৎ ফিরে যায়।

অগত্যা তখুনি জিনিষপত্র গুছিয়ে নির্ম্মলকে রওনা হ'তে হ'ল। লিসেল ও হরেন্দ্র তাকে গাড়ীতে তুলে দেবার জন্যে ষ্টেশনে এলো। গাড়ী ছাড়ার অল্প পূর্ব্বে মিনতির স্বরে নির্ম্মল লিসেলকে বললে, "হরেনকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম। দেখো ও যেন সুস্থ হয়।"

লিসেল শুধু বললে, "যথাসাধ্য চেষ্টা করবো"।

"যথাসাধ্য নয়, নিশ্চয় করবে। ওকে সুস্থ করার ভার আমার ওপর ছিল, সে ভার তোমাকে দিয়ে গেলুম।

বুঝলে ?" গাড়ী দিলে ছেড়ে।" আউফ্-ভিদার-সেহেন।"(৮) আউফ্-ভিদার-সেহেন।"—তারপর যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল রুমাল নাড়া—তার পর সেই রুমাল দিয়ে সারা রাস্তা চোখ মুছতে মুছতে লিসেল এলো বাড়ী। আর হরেন্দ্র ? সারা রাস্তা তার পাশে ঘাড়টি গুঁজে, মুখটি বুঁজে এলো, একটা কথাও বললে না।

৩

নির্ম্মলের কী যেন হ'য়েছে। তার অতিপ্রিয় নৃত্যশালায় আর সে বড় যায় না। গেলেও নাচে না বা নাচে আনন্দ পায় না। তার বন্ধুদের বৈঠকে গিয়ে আর সে প্রাণ খুলে হাসে না। হাসলেও সে হাসি যে পূর্ব্বের মত স্বচ্ছ নয় তা সকলেই অনুভব করে। কেউ তার পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করলে সে হয়তো দ্বিগুণ উৎসাহে হাসি ঠাট্টা করে, কিন্তু তখন তার কৃত্রিমতা এতই প্রকট হয় যে সময়ে সময়ে তা বিকট ঠেকে। অনেকেই বুঝেছে তার কিছু একটা হ'য়েছে।

যেদিন লিসেলের ফেরবার কথা সেদিন সেই 'শারলোটেনবুর্গে'র রেস্তোরাঁয় সে গেল সান্ধ্য-ভোজন করতে। এক অভূত-পূর্ব্ব অনুভূতি নিয়ে সেখানে ঢুকলে। কিন্তু এলো অন্য এক পরমা সুন্দরী তরুণী মেনুকার্ড নিয়ে, জিজ্ঞাসা করলে, "মহাশয় কি পান করবেন ?"

নির্ম্মল —অঁ্যা ? [মেনুকার্ডটায় নজর দিয়ে] দাঁড়ান।

তরুণী —ওয়াইন-কার্ডটা কি আনবো ?

নির্ম্মল —অঁ্যা—ও, ওয়াইন্-কার্ড ?—না।

তরুণী —তাহ'লে ফিকে না গাঢ়ো ?

নির্ম্মল —বিয়ার নয়, সোডা ওয়াটার। [অস্থির-চিত্ত, তার কিছুই ভাল লাগছে না, মেনুকার্ডটা বিরক্তির সহিত ছুড়ে দিয়ে] নাঃ, কিচ্ছু অর্ডার করার নেই। [চারিদিকে নিরীক্ষণ করা]

তরুণী —মহাশয় কি কারো জন্তে অপেক্ষা করবেন ? [প্রস্থানোদ্যত]

নির্ম্মল :—শুনুন।—আপনাদের এখানে লিসেল নামে যে "ওয়েত্রেস" ছিল সে কোথায় ?

তরুণী [মুচ্‌কে হেসে] ও, তার আজ আসবার কথা ছিল বটে, কিন্তু আসেনি।

নির্ম্মল —আসেনি ! কেন ?

তরুণী —তা জানি না। জানতে চান তো কর্ত্রীকে ডেকে দিচ্চি।

নির্ম্মল —ডাকুন তাঁকে ! [তরুণীর প্রস্থান]

[নির্ম্মল আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো, কী হ'ল ?]

কর্ত্রী [কাছে এসে] নমস্কার, মাইন হের্‌।

নির্ম্মল :—অঁ্যা !—ও, নমস্কার ! লিসেল এলো না কেন ?

কর্ত্রী :—তা জানি না ! সে আরো পনেরো দিনের ছুটি চেয়েছে—

নির্ম্মল :—কেন ? কোন কারণ জানায় নি ?

কর্ত্রী :—আমাকে তো কিছু জানায় নি [হাত-ব্যাগ খুঁজতে খুঁজতে] কে হের্‌ রায়ের জন্তে এক চিঠি দিয়েছে ! আপনিই কি সেই ?

নির্ম্মল [আগ্রহের সহিত হাত বাড়িয়ে]—হঁ্যা, দিন ! [পত্র-গ্রহণ] পত্রে লেখা ছিল :—

প্রিয় হের্‌ রায় !

আপনার বন্ধু পূর্ব্বের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছেন। মনে হয়, আর কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন। আশা করি, এখন আপনি বিশ্বাস করছেন, আপনার প্রিয় বন্ধুর ভার অনুপযুক্ত ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করে যান নি। ইতি

লিসেল।

এর অধিক আর একটা কথাও লেখা ছিল না। কোন কারণ লেখা ছিল না, কেন সে এলো না।

ঠিক ১৫ দিন পরে নির্ম্মল আবার সেই রেস্তোরাঁতে এলো সান্ধ্য-ভোজন করতে। কিন্তু সেদিনও লিসেল আসেনি ! সেদিনও কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল—এবার কোন খবরই নেই !! নির্ম্মল হ'ল উদ্বিগ্ন ! তবে কি হরেনের অসুখ বাড়লো ? সে কি সেখানে যাবে ? কিন্তু

৮। Aufwiedersehen :—পুনর্দর্শনায়।

৭। Mein Herr :—মহাশয়।

নাঃ, কোন প্রয়োজন নেই—কোন প্রয়োজন নেই! তাকে কে চায়?

প্রায় ছয় মাস পরে সেই 'রেস্তোরাঁ'তে সান্ধ্য-ভোজন করতে এসে নির্ম্মল দেখে, কোণের এক গোল টেবিলে কয়েক জন ভারতীয় ছাত্র বসেছে। সম্ভবতঃ হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনের সভা! তাই বটে! সুধীরের সামনে অনেক কাগজ, খাতা ছড়ান র'য়েছে। নির্ম্মলকে দেখেই সুধীর হেঁকে বললে, "নির্ম্মল! এখানে এস। তবু ভাল তুমি যে এলে।"

নির্ম্মল প্রথমটা ইতঃস্তত: করছিল, সুধীরের আহ্বানে সেই দিকে যেতে বাধ্য হ'ল।

নির্ম্মল [গোল টেবিলের কাছে এসে] কী হে? তোমাদের মিটিং নাকি?

সুধীর—বাঃ, জানতে না?

নির্ম্মল—জানলে হয়তো আসতুম না [অন্যত্র যাবে কি না ভাবছে]

সুধীর [দাঁড়িয়ে তার হাত ধ'রে] কোথায় যাবে? দেখ কে এসেছে!

নির্ম্মল [ফিরে দাঁড়িয়ে, কুতূহল] কে? [সকলের দিকে চেয়ে, এক অতি হৃষ্টপুষ্ট, অতি আধুনিক সুট্ পরিহিত ব্যক্তিকে দেখে] ও! হরেন না?

হরেন [দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে] চিনতে তাহ'লে পারলে!

নির্ম্মল [কর-মর্দ্দন ক'রে] বাঃ চিনতে আর পারবো না! কিন্তু তুমিতো বেশ আদব কায়দা শিখেছো! চেহারাও খাসা শুধ্রেছে! বেশ, বেশ! কবে এলে? [সকলের উপবেশন]

হরেন—আজ সকালে।

দেশপাণ্ডে—সত্যি মুখার্জির চেহারা এতো ভাল হ'য়েছে যে ওকে চট্ ক'রে চেনা শক্ত!

সুধীর—তার জন্যে ও নির্ম্মলের কাছে ঋণী।

হরেন—নিশ্চয়!

[নির্ম্মলের সামনেও এক গ্লাস 'শকোলাদে' এলো, নির্ম্মল কোন আপত্তি ক'রলে না।]

নির্ম্মল [হরেনকে] লিসেল কেমন আছে?

হরেন—ভাল।

নির্ম্মল—এতদিন কোন খবর দাও নি কেন?

সুধীর—লিসেল কে?

হরেন—বের্খ্টেস্ গাডেনে আমার ল্যাণ্ড্-লেডির মেয়ে।

নওরাজ [মুচ্কে হেসে] খুব সুন্দরী! Ideal country beauty!

দেশপাণ্ডে—ও, হাঁ্যা, হাঁ! যে ছুঁড়িটা এখানে 'ওয়েট্রেস্' ছিল!

হরেন—তাই শুনি বটে।

ইয়াসিন:—ওঃ! সেই ছুঁড়ি? সে কিন্তু পয়লা নম্বরের ফ্লার্ট্!

নওরাজ—সত্যি নাকি?

ঘোষাল—কোন কাণ্ড বাধিয়ে আসনি তো হরেন?

হরেন—ছিঃ! কী যে বল? তোমাদের কি কথার একটু সংযমও নেই?

দেশপাণ্ডে—তা ঠিক! মুখার্জিকে এসব কথা বলা চলে না।

ইয়াসিন—কেন, মুখার্জি কি লোহার তৈরী?

দেশপাণ্ডে—মুখার্জি এ সবের অনেক ওপরে!

ঘোষাল—তা জানি না! এ সব ব্যাপারে ব্রহ্মচারীদেরই বিশ্বাস কম!

[নির্ম্মলের মুখে বিরক্তি ও ক্রোধ ফুটে উঠেছে]

সুধীর [তাই দেখে]—তোমার কি হ'ল নির্ম্মল?

চক্রবর্ত্তী—আজ কমাস হ'তে নির্ম্মলের যেন কী হয়েছে!

ঘোষ—সে কথা ঠিক!

সুধীর—সত্যি, তোমার কী হ'ল বল তো?

ঘোষাল—ও নিশ্চয় প্রেমে পড়েছে! [কয়েক জনের হাসি]

নওরাজ সত্যি নাকি মিঃ রায়?

নির্ম্মল [অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে] মাপ কর, আমার অন্য এন্গেজ্মেন্ট আছে।

সুধীর [তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে, তার হাত ধ'রে] রাগ ক'রনা নির্ম্মল ব'স! [সকলে স্তব্ধ]

নির্ম্মল [হাত ছাড়িয়ে, প্রস্থানোদ্যত] 'সরি', আমাকে এখুনি যেতে হবে।

সুধীর—মাপ কর নির্ম্মল! আমি সত্যি দুঃখিত যে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হ'ল। কিন্তু এ সবই ঠাট্টা, সেটাতো বোঝ? তবু, আমি কথা দিচ্চি এ প্রসঙ্গ আর উঠবে না। তুমি ব'স।

[স্নেহের সহিত কাঁধে হাত দিয়ে বসাবার চেষ্টা]

নির্ম্মল—আমি তোমাদের কী কাজে আসবো?

সুধীর—তুমি একটু ব'স, তাহ'লে বুঝবো তুমি আমাদের ক্ষমা ক'রলে।

[নির্ম্মল ও সুধীর উপবেশন করলে]

নির্ম্মল—তাহ'লে এখুনি কাজের কথা হ'ক।

সুধীর—বেশ, সে ভাল কথা।

ঘোষাল—আমাদের যে প্রসঙ্গটা চলছিল সেটা আগে হ'ক!

দেশপাণ্ডে—কোন প্রসঙ্গ?

ঘোষাল—ভারতীয় ছাত্রের জার্ম্মাণ মেয়ে বিবাহ করা উচিত কি না, এবং কেউ করলে এ অ্যাসোসিয়েশন্ তা সমর্থন করবে কি না।

হরেন—আমার মত তো প্রকাশই করেছি—অমন বিবাহ অতি অবাঞ্ছনীয় মহা অনিষ্টকর।

দেশপাণ্ডে—ঠিক কথা! আমারও ঐ মত।

নির্ম্মল—এ প্রসঙ্গের প্রয়োজন?

সুধীর—প্রয়োজন হ'য়েছে। রমেন সরকার এক জার্ম্মান মেয়ে বিয়ে করেছে এবং অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের নিমন্ত্রণ ক'রেছে।

নির্ম্মল—অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হিসাবে না ব্যক্তিগত ভাবে?

সুধীর—অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হিসাবে। তাই এই আলোচনা। আমার মতে এরূপ বিবাহ আমাদের সমর্থন করা উচিত। কয়েকজন [একত্রে] হিয়ার, হিয়ার।

হরেন [দাঁড়িয়ে, আবেগের সহিত]—বন্ধুগণ, আমি পরিষ্কার দেখছি আপনাদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্যের চমকপ্রদ সভ্যতার প্রভাবে আত্ম-বিস্মৃত হ'য়েছেন। আপনাদের জন্মভূমি—পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ-বৈশিষ্ট্য বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমগ্ন করেছেন। আমি অনুরোধ করি একবার ভেবে দেখুন আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ কে? বার্লিনের ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মধ্যে থেকেও, আপনাদের চিন্তাকে একবার নিয়ে যান সেই প্রাচীন ভারতের নৈমিষারণ্যে বা তপোবনে! ভেবে দেখুন, সেই সব পর্ণ-কুটীর হ'তে যে চিন্তা-ধারার উৎপত্তি হ'য়েছে—তার গভীরতার কাছে এই জড়বাদ-সম্মত সভ্যতা কত তুচ্ছ কত নিকৃষ্ট! আপনারা ভুলবেন না, আপনারাই সেই মহানুভব ঋষিদের বংশধর। বেদব্যাস, ভীষ্ম, শুকদেব, আচার্য্য শঙ্কর আপনাদেরই পূর্ব্বপুরুষ! আপনাদের আদর্শ—শঙ্কর প্রতিম স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁকে আমেরিকার অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী বিলাসিনীরা বহু চেষ্টা ক'রেও বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি! আর আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনাদের পূর্ব্ব পিতামহী তাঁরা না, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী? [আবেগের মাত্রা চরম সীমায় উঠেছে] সেই সব পূত-চরিত্রা, সতী শ্রেষ্ঠাদের আসনে যে সব কুলাঙ্গার বসাতে চায় এই পাশ্চাত্যের দুশ্চরিত্রা, সুরাসক্তা, ব্যাভিচারিনীদের—

একই সময়ে { কয়েক জন :—হিয়ার, হিয়ার!
অপর কএক জন :—শাট্ আপ্!

অকস্মাৎ এক ভীষণ চপেটাঘাতের আওয়াজে সকলে চমকে উঠে দেখে, নির্ম্মল হরেনের গালে এক বিরাশি সিক্কার চড় বসিয়েছে এবং হরেন মাটিতে লুটাচ্চে। সকলে স্তম্ভিত, কয়েকজন হরেনকে সাহায্য করতে গেল। নির্ম্মল গম্ভীর ও শান্তভাবে সে স্থান পরিত্যাগ করলে।

৪

আরো তিন মাস অতীত হয়েছে। নির্ম্মল প্রতিদিন সেই রেস্তোরাঁতে সান্ধ্যভোজন করতে আসে। প্রতি সন্ধ্যায় যন্ত্র-চালিতের মত সে সেখানে আসে। একা আহার করে, অন্য মনস্ক হ'য়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে, চ'লে যায়। মুখে কখনো একটা কথাও ফোটে না।

সেদিনও নির্ম্মল তার নির্দ্দিষ্ট টেবিলে আহার ক'রতে বসেছে। প্রতি সন্ধ্যার মত সেদিনও নৃত্যের বাদ্য সমবেত তরুণ-তরুণীকে চঞ্চল ক'রে তুললে, নৃত্য আরম্ভ হ'ল।

কিন্তু সেই 'জ্যাজে'র উন্মত্ত সুর, বহু যুগল-মূর্ত্তির আনন্দোচ্ছ্বাস আর তালে তালে পা ফেলার শব্দ নির্ম্মলের কানে যেন প্রবেশই করলে না। তার সামনে কাঁটা, চামচ, প্লেট সবই এলো, একটা সোডাওয়াটারও এলো। তাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা না ক'রে ওয়েট্রেস্ তার আহার এনে দিল। ওয়েট্রেস্ জানে প্রত্যহ সে কি খায়, তাই জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন। নিত্য নূতন আহারের বিলাস, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার মস্ত বৈশিষ্ট্য তা যেন এ ব্যক্তি ভুলেই গেছে।

বাদ্য থেমে গেছে। আহারও শেষ হ'য়েছে। তার দৃষ্টি টেবিলের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিবদ্ধ রয়েছে—যেন সে সেই স্থানের অনু, পরমাণুর বিন্যাস-প্রণালীর গবেষণা করছে, এমন সময়ে তার কানে এক অতি পরিচিত স্বর বাজলো, "হের্ রায়!" মুখ তুলে দেখে, লিসেল!

নির্ম্মল—লিসেল?

লিসেল—ইয়া হের্ রায়!—নমস্কার!—কেমন আছেন?

নির্ম্মল [তখনো বিস্ময়ের সীমা নেই] লিসেল?

[লিসেলের মুখের প্রতি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল]

লিসেল [হাত বাড়িয়ে] নমস্কার হের্ রায়!

নির্ম্মল [এতক্ষণে হুঁস হ'য়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে কর-মর্দ্দন ক'রে] তুমি সেই লিসেল্? [তাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করা]

লিসেল—সন্দেহ হ'চ্ছে?

নির্ম্মল—না!—কিন্তু, তোমার কি হ'য়েছে?

লিসেল [মুখ ফ্যাকাসে হ'ল] কেন?

নির্ম্মল [গম্ভীর] কিছু নয়! ব'স, [চেয়ার দেখিয়ে] ব'স।

লিসেল [উভয়ে ব'সলে]—আমাকে বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে নয়? তাই আমাকে প্রথমটা চিনতেই পারলেন না!

নির্ম্মল [অধিক গম্ভীর] তোমার অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। [কণ্ঠ-স্বরে প্রচ্ছন্ন ব্যথা] কবে এলে?

লিসেল—আজ।

নির্ম্মল—ও!! [হঠাৎ হেসে উঠে, সে হাসি যে অতি কৃত্রিম তা প্রকট হ'ল] কী খাবে লিসেল? ফিলেট্ অফ্ বীফ্? না ডিনার শ্নিট্‌শেল্? না হোল্‌ষ্টাইনার? না—

লিসেল—ধন্যবাদ, আমার সান্ধ্যভোজন সারা হ'য়েছে।

নির্ম্মল—আমারও! এসো তাহ'লে দুজনে এক বোতল বোর্দো স্পিট্ করি, কি বল? হাঃ, হাঃ, হাঃ।

লিসেল—ধন্যবাদ, না!

নির্ম্মল [আবার গম্ভীর হ'য়ে] কেমন আছ লিসেল?

লিসেল [ভীত, বুঝতে পারছে না নির্ম্মলের কি হ'য়েছে] —মন্দ নয়! আপনি কেমন আছেন?

নির্ম্মল:—ভাল! [স্নেহের স্বরে] কিন্তু লিসেল! তোমাকে এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? [লিসেলের মুখ আরক্তিম হ'ল, সে মাথা হেঁট করলে]

নির্ম্মল:—কী হ'ল? [লিসেলকে আবার নিরীক্ষণ ক'রে তার অবস্থা সম্বন্ধে এবার নিঃসন্দেহ হ'য়ে চমকে উঠে নীরব রইল]

দুজনে সেই ভাবে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। নির্ম্মলের মুখে উদ্বেগ, ব্যথা ও দুর্জ্জয় অভিমান একত্রে ফুটে উঠেছে, লিসেল লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রয়েছে! কয় মিনিট, বা কয় সেকেণ্ড তারা অমন ভাবে ছিল বলা শক্ত, কিন্তু তাদের মনে হ'য়েছে, যুগ যুগান্তরের জন্যে এক পাহাড় তাদের মধ্যে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়ালো!

তাদের এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করলে বামা-কণ্ঠের জিজ্ঞাসা, "মহাশয়দের আর কিছু চাই?" দুজনেই চমকে তার দিকে চাইলে, সে ওখানকার নূতন "ওয়েট্রেস্"। নির্ম্মল লিসেলের দিকে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে চাইলে, লিসেল বললে, "আমার কোন প্রয়োজন নেই।" ওয়েট্রেস্ চলে গেল।

লিসেল:—আমাকে সাহায্য করবেন?

নির্ম্মল:—কী সাহায্য করতে পারি?

লিসেল:—হরেন কোথায় বলতে পারেন?

নির্ম্মল [চমকে উঠে] হরেন! —হরেন?

লিসেল [দৃঢ়স্বরে] হ্যাঁ, হরেন! এতে অত বিস্মিত হবার কি আছে? সে আমার ভাবি স্বামী!

নির্ম্মল:—হরেন তোমার ভাবি স্বামী?

লিসেল:—হ্যাঁ! সে আমাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত! সে কোথায়?

নির্ম্মল :—ও !! [নির্ব্বাক]

লিসেল [নির্ম্মলের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে] চুপ ক'রে রইলেন যে ?

নির্ম্মল —অ্যাঁ ? হরেন কোথায় তুমি জান না ?

লিসেল —জানলে আপনাকে বিরক্ত করতুম না।

নির্ম্মল —কত দিন তার খবর পাও নি ?

লিসেল —তিন মাসের ওপর। একদিন সন্ধ্যাবেলায় একটু বেড়িয়ে আসি ব'লে বেরিয়ে, আর সে ফেরেনি। তারপর আর তার কোন খবর পাইনি। প্রথমে আমাদের ভয় হ'ল, হয়তো তার কোন বিপদ হ'য়েছে, হয় তো অন্ধকারে কোন পাহাড়ের অজানা পথে উঠতে গিয়ে প'ড়ে গেছে, তাকে আর পাওয়া যাবে না! কয়েক দিন আমরা তার কত সন্ধান করলুম কোন খবর পেলুম না। আমরা বড় হতাশ হ'য়েছিলুম, এমন সময়ে ষ্টেশনমাষ্টার আমাদের খবর দিলে, যে দিন সে হারিয়েছে সেই দিন রাত্রেই এক ভারতবাসী বার্লিনের টিকিট কিনে রওনা হ'য়েছে। আমরা তখন নিশ্চিন্ত হ'লুম, বুঝলুম সে এখানে এসেছে। কিন্তু তার পর আর সে কোন খবর দিলে না। তার কি হ'ল কিছুই বুঝতে পারছি না হের রায়—

নির্ম্মল [নিবিষ্ট মনে শুনতে শুনতে]—হায়রে হতভাগিনী !—

লিসেল [আঁতকে উঠে] অ্যাঁ!! [ভীত দৃষ্টিতে নির্ম্মলের দিকে চেয়ে, নির্ম্মল ঘাড় হেঁট করেছে] ও!! [কেঁদে ফেলে] তাহ'লে সত্যিই সে আর নেই ?

নির্ম্মল —না, না, তুমি যা ভাবছো তা নয়, সে বেঁচে আছে।

লিসেল —বেঁচে আছে ? [ক্রস্ করা] হোলি মাতা, তোমায় ধন্যবাদ! [নির্ম্মলকে] তবে তার নিশ্চয় খুব অসুখ করেছে ?

নির্ম্মল —না, তাও নয়—সে সম্পূর্ণ সুস্থ!

লিসেল —সুস্থ ? [পুনরায় ক্রস্ করা] ধন্যবাদ, হোলি মাতা! [তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে] চলুন হের্ রায়, আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে চলুন—

নির্ম্মল —ব'স লিসেল, ব'স—

লিসেল —না, না—আর দেরি করবেন না! আপনি না আমার দাদা! ছোট্ট বোনটির ব্যথা বুঝুন!—চলুন!

নির্ম্মল [দীর্ঘশ্বাস] খুব বুঝি লিসেল! পারতুম তো তোমাকে উড়িয়ে সেখানে নিয়ে যেতুম। কিন্তু এখুনি সেখানে যাবার কোন উপায় নেই—

লিসেল —কেন ?—কী হ'য়েছে ?—ও, সে বুঝি বার্লিনে নেই ?

নির্ম্মল —না।

লিসেল —কোথায় ? লাইপ্জিগে ? হাম্বুর্গে ? ড্রেসডেনে ? কোথায়—কোথায়—কোথায় ?

নির্ম্মল —ভারতবর্ষে।

লিসেল [আঁতকে উঠে] অ্যাঁ—ভারতবর্ষে ?

নির্ম্মল —হ্যাঁ, আজ তিন মাস হ'ল সে গেছে ভারতবর্ষে।

লিসেল —ওঃ [মূর্চ্ছা]

নির্ম্মল [তাড়াতাড়ি তাকে ধ'রে] লিসেল! [তার মাথা নেড়ে] লিসেল!! [বুঝলে সে মূর্চ্ছিতা! তাকে এক সোফা-চেয়ারে শুইয়ে] কী সর্ব্বনাশ!!! [তৎক্ষণাৎ জলের গ্লাস থেকে হাতে ক'রে জল নিয়ে তার মুখে, চোখে ছিটিকে দিতে লাগলো]

ওয়েট্রেস্ [ছুটে এসে] কী হ'ল ?

[রেস্তোর'ার কর্ত্রী ও বহু ব্যক্তি ছুটে এসে ভিড় ক'রলো]

নির্ম্মল [তখন লিসেলকে মেনু-কার্ড দিয়ে বাতাস করতে, করতে] আপনারা অনুগ্রহ ক'রে স'রে যান, ভিড় করবেন না!

১ম ব্যক্তি :—তুমি কোন দেশের লোক হে ?

২য় ব্যক্তি :—দেখছেন না ও বিদেশী ?—আর মেয়েটা জার্ম্মান!

৩য় ব্যক্তি :—ঠিক কথা, মেয়েটা তো জার্ম্মান!

৪র্থ ব্যক্তি :—আর ও লোকটা নিগ্রো, পূর্ব্বে ফরাসী কালা সৈন্য ছিল!!

২য় ব্যক্তি :—আর জার্ম্মান মেয়ের ওপর অত্যাচার করেছে!!

১মা নারী :—আপনারা কেউ পুলিশ ডাকুন। [দু এক জনের প্রস্থান]

২য় ব্যক্তি :—পুলিশ ডেকে কি হবে, ওকে মেরে সায়াস্তা কর—

কর্ত্রী :—আহা, ওর অনিষ্ট করবেন না, উনি অতি সৎ—

২য়া নারী :—ইস্! ভারি দরদ! শাঁশালো খদ্দের বুঝি?

৩য়া নারী :—জার্ম্মান মেয়ের ওপর ও অত্যাচার করেছে, ওর দিক নিতে লজ্জা করে না?

কর্ত্রী :—এ কি বলছেন আপনারা? উনি অতি সৎ—

৪র্থ ব্যক্তি :—থামো বেহায়া! শুয়ারটাকে মার না হে!

২য় ব্যক্তি :—এই শুয়ার! [নির্ম্মলের কলার ধারণ]

নির্ম্মল :—সরে যান্! [এক ঝাঁকুনি দিয়ে নিজ্‌কে মুক্ত করলে]

৪র্থ ব্যক্তি :—তবে রে শয়তান! [নির্ম্মলের পৃষ্ঠে ঘুঁষি মারা]

নির্ম্মল [ফিরে দাঁড়িয়ে] আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, সরে যান্!

[৪র্থ ব্যক্তি পুনরায় তার মুখে ঘুঁষি মারলে। নির্ম্মল বিদ্যুৎবেগে ৪র্থ ব্যক্তির মুখে এতো জোরে ঘুষি মারলে যে সে ভূ-লুণ্ঠিত হ'ল। তার ঘুষির বহর দেখে প্রথমে সকলে চমকে উঠেছিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই কয়েক জন তাকে জাপটে ধরলে এবং অপর কয়েক জন তাকে কিল, চড়, লাথি মারতে আরম্ভ করলে। কর্ত্রী চীৎকার ক'রে সকলকে সরিয়ে নির্ম্মলকে বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করছে—এমন সময়ে এক পুলিশ কর্ম্মচারী ও কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল্ প্রবেশ ক'রে সকলকে সরিয়ে নির্ম্মলকে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে গ্রেপ্তার করলে]

কর্ম্মচারী :—আপনি কোন দেশের লোক?

নির্ম্মল :—ভারতবাসী।

কর্ম্মচারী :—ও মেয়েটি কে?

কর্ত্রী :—ও মেয়েটি আমার ওয়েট্রেস্ ছিল, হের্ অফিসার। আর এই ভদ্র লোক ওর বন্ধু। দুজনেই অতি সৎ—

বহু নর-নারীর কণ্ঠ [একত্রে] :—থামো। নির্লজ্জ—বেহায়া—

কর্ম্মচারী :—আপনারা থামুন! মেয়েটির কী হ'য়েছে?

নির্ম্মল :—ও মূর্চ্ছিতা—

১ম ব্যক্তি :—মূর্চ্ছিতা অমনি হ'য়েছে?

২য় ব্যক্তি :—ও শুয়ার অত্যাচার করেছে—

৩য় ব্যক্তি :—কালা বিদেশী, সম্ভবতঃ নিগ্রো—জার্ম্মান মেয়ের ওপর অত্যাচার করবে?

২য়া নারী :—আর নির্লজ্জা কর্ত্রী তাকে সমর্থন করছে?

বহু নর-নারীর কণ্ঠ [একত্রে] বেহায়া!—

কর্ম্মচারী :—হ'ল্লা করবেন না! [নির্ম্মলের প্রতি] আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।

নির্ম্মল :—বেশ তো! আশা করি এ মিথ্যা অভিযোগ বিশ্বাস করেন নি—

কয়েক ব্যক্তি [গর্জ্জন-পূর্ব্বক]—মিথ্যা অভিযোগ!

কর্ম্মচারী—আপনারা থামুন! [নির্ম্মলের প্রতি] আমার সঙ্গে চলুন!

নির্ম্মল [মিনতি পূর্ব্বক] হের অফিসার! আমার একান্ত অনুরোধ ওর চেতনা ফিরিয়ে আনতে একটু অবসর দিন। আমি ডাক্তার—

২য় ব্যক্তি—কী? ঐ কালা গুণ্ডাটা জার্ম্মান মেয়েকে ছোঁবে?

৪র্থ ব্যক্তি [নাকে রুমাল চেপে ততক্ষণে উঠেছে] প্রাণ থাকতে তা হ'তে দিচ্ছি না—ও গুণ্ডা—ও গুণ্ডা—

সমস্বরে কয়েকজন চীৎকার করলে—ও গুণ্ডা, ও গুণ্ডা!

১মা নারী—আপনি ওকে নিয়ে যান, আমরা মেয়েটির শুশ্রূষা করবো—ও কে?

কর্ম্মচারী—ইয়া, ইয়া! [এমন সময়ে এক অ্যাম্বুলেন্‌স ষ্ট্রেচার এলো, নির্ম্মল তাই দেখে উৎফুল্ল হ'ল]

নির্ম্মল [খাড়া হ'য়ে] চলুন হের্ অফিসার, আমি প্রস্তুত!

কর্ম্মচারী—ইয়া ভোল![1] [নির্ম্মলকে নিয়ে প্রস্থান]

---

১ (Jah-wohl :—বহুৎ আচ্ছা।

অ্যাম্বুলেন্‌স-ষ্ট্রেচার ক'রে লিসেলকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। জনতা তখনো হল্লা করছে। নারীর দল কর্ত্রীর সঙ্গে ভীষণ বচন-যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। চতুর্থ ব্যক্তি অপর সকলের সম্মুখে আস্ফালন করছে।

৫

এর পর আরো তিন চার দিন কেটে গেছে। বার্লিনের এক হাসপাতালে এক ছোট্ট ঘরে লিসেল রুগ্ন শয্যায় শায়িতা আর তার কাছে এক চেয়ারে নির্ম্মল উপবিষ্ট।

নির্ম্মল—আজ কেমন আছ লিসেল?

লিসেল—ধন্যবাদ, অনেক ভাল।

নির্ম্মল—কোন ভয় নেই, শিগ্‌গীর সম্পূর্ণ সেরে উঠবে।

লিসেল [দীর্ঘশ্বাস]—সেরে উঠেই বা কী হবে!

নির্ম্মল—আমি না তোমার দাদা?

লিসেল—তার জন্যে ধন্যবাদ হোলি মাতা [ক্রস্‌ করা] অনন্ত-কোটী ধন্যবাদ! [উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর]

লিসেল—নির্ম্মল!

নির্ম্মল—বল লিসেল!

লিসেল—তার ঠিকানা কি তোমাদের মধ্যে কেউ জানে না?

নির্ম্মল—সে যে কাউকে না বলে চলে গেছে!

লিসেল [দীর্ঘশ্বাস] তাহ'লে আর কোন উপায় নেই!

নির্ম্মল—হতাশ হ'য়ো না লিসেল! আমরা ইঙ্‌লিশ্‌ কন্সালেটে দরখাস্ত করেছি। তারা নিশ্চয় তার ঠিকানা সংগ্রহ করবে।

লিসেল—হ'তে পারে।

নির্ম্মল—ভেবো না লিসেল, নিশ্চয় তা পাবে, শিগ্‌গীর পাবে।

নির্ম্মল—আচ্ছা, তুমি না একবার বলেছিলে ভারতবাসী মাত্রেই "শিভ্যালরাস্‌।" [নির্ম্মল লজ্জায় মুখ ফেরালে] তবে কেন সে চলে গেল? [নির্ম্মল নিরুত্তর] বল না, সে কেন পালিয়ে গেল?

নির্ম্মল—তার কারণ কি এখনো বোঝনি?

লিসেল—সত্যি ঠিক বুঝতে পারি না! পালানোর কি প্রয়োজন ছিল? আমাকে যদি সে বলতো আমাদের বিবাহ সম্ভব নয়, তাহ'লেও কি তাকে আমি ভালবাসতুম না?

নির্ম্মল—হয়তো বেশী ভালবাসতে!

লিসেল—তবে?—তবে কেন সে অমন কাপুরুষের মত পালালো?

নির্ম্মল—সে তোমার ভালবাসা চায়নি।

লিসেল [চমকিত, উঠে ব'সে] কি বললে?—সে আমার ভালবাসা চায় নি!—অসম্ভব!!

নির্ম্মল—তুমি এখনো বালিকা, তাই—

লিসেল—অসম্ভব- সম্পূর্ণ অসম্ভব! প্রতিদিন সে আমার কাছে যে ভাবে প্রণয় নিবেদন করতো তা যদি একটু শুনতে, কখনো এ কথা বলতে না—

নির্ম্মল [মুখে স্বল্প হাসি] না শুনেও তা অনুমান করতে পারি—

লিসেল:—তবে? তবে কেন বল সে আমার ভালবাসা চায়নি? প্রাণে গভীর অনুভূতি না থাকলে অমন ক'রে বলা কখনো কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? তুমি জানো না আমার একটা মিষ্টি কথা শোনার জন্যে সে কত লালায়িত হ'ত, একদিন আমার মুখ একটু শুক্‌নো হ'লে সে কী ক'রতো—

নির্ম্মল—বুঝেছি—লিসেল! বুঝেছি—

লিসেল—আমার স্নেহ, আমার যত্ন, আমার সেবা ছাড়া তার এক মুহূর্ত্ত কাটতো না—সে আমার ওপর শিশুর মত নির্ভর করতো! তার নব জীবন আমারই সৃষ্টি, আমি ছাড়া তা টিঁকতে পারে না—

নির্ম্ম।—জানি—জানি লিসেল—

লিসেল—তবু বলবে সে আমার ভালবাসা চায় নি?

নির্ম্মল—সে যে তা বোঝে না—

লিসেল—বোঝে, নিশ্চয় বোঝে! তাই সে ব্যাকুল হ'ত তোমাদের সেই স্বর্গোপম মাতৃভূমিতে যত শিগ্‌গীর সম্ভব আমাকে তার পত্নীরূপে নিয়ে গিয়ে বন্দিনী করতে।

নির্ম্মল—লিসেল?

লিসেল—হাঁা, হাঁা! সে বলতো সেখানেও পাহাড়ের কোলে এক মনোরম হ্রদ আছে—যার সৌন্দর্য্য নিরুপম!

তারই কূলে পুষ্প ও পদ্মের সৌরভে নিত্য আমোদিত এক অতি সুন্দর বাগানে আমাদের কুটীর হবে—"

নির্ম্মল [দাঁড়িয়ে] থামো লিসেল! থামো—

লিসেল—সে কুটীরের হব আমি রাণী—

নির্ম্মল [বাধা দিয়ে] থামো—থামো!

লিসেল :—তার এই সোনার স্বপ্ন আমি—আমি যেন শেষে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হ'য়ে ভেঙ্গে না দেই—তাহ'লে তার জীবন হবে ব্যর্থ—মরুভূমির মত শুষ্ক—সে করবে আত্মহত্যা!!

নির্ম্মল—আশ্চর্য্য! তুমি নির্বিচারে এ সব বিশ্বাস করেছিলে?

লিসেল :—কেন করবো না? সেও না ভারতবাসী?

নির্ম্মল :—ভারতবাসী মাত্রেই কি সাধু হয়?

লিসেল :—তুমিই তো বলেছিলে সে দেব-চরিত্র, পরম ধার্ম্মিক!

নির্ম্মল [যেন বজ্রাহত] ওঃ!! [দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে, পরে হাত নামিয়ে] লিসেল! —স্বীকার করি—সব দোষ আমার। আমি,—আমি সেই হীন প্রবঞ্চককে তোমার জীবনে উল্কার মত এনে দিয়েছি—

লিসেল [চমকে উঠে] হীন প্রবঞ্চক!! [নির্ম্মলের প্রতি তীব্র—অসন্তোষের দৃষ্টিপাত ক'রে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই চক্ষু নামিয়ে] নাঃ, সবই আমার অদৃষ্টের দোষ [দীর্ঘশ্বাস— কিছুক্ষণ নীরব থেকে]—আচ্ছা, এও তো হ'তে পারে সে আবার আসবে?

নির্ম্মল :—অসম্ভব!—অমন বৃথা আশা পোষণ ক'রে আবার প্রতারিত হ'য়ো না। তার ফেরার ইচ্ছা থাকলে, অমন না ব'লে পালাতো না আর তোমার এই অবস্থা জেনেও তিন মাসের মধ্যে কোন খবর না নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতো না।

লিসেল :—সে কথাও ঠিক! [দীর্ঘশ্বাস] কোন প্রাণে সে গেল, কি ক'রেই বা থাকবে—

নির্ম্মল—বেশ থাকবে, তোমাকে দিয়ে তার আর কোন প্রয়োজন নেই!

লিসেল :—হা ভগবান, এও সম্ভব! [গভীর দীর্ঘশ্বাস] আমার ভালবাসা চায়নি তো অমন ক'রে কী চাইতো?

নির্ম্মল :—সে যা চেয়েছিল তা সে যথেষ্ট পেয়েছে!

লিসেল :—তার অর্থ?

নির্ম্মল :—তুমি তা বুঝবে না, শুধু এইটুকু নিশ্চয় জেনো, ভালবাসি, বিবাহ করবো, তুমি ভিন্ন তার জীবন মরুভূমি, এই সব মিথ্যা অভিনয় ক'রেই সে তার অভিষ্ট লাভ করেছে।

লিসেল [এতক্ষণে ঠিক বুঝে] ও!! [শিহরণ]

নির্ম্মল জানালার ধারে সরে গেল। জানালা দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকালে। তার প্রাণে কী আলোড়ন, কে তা বুঝবে? আর লিসেল সেই অবস্থায় ব'সে, দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে অশ্রু-বর্ষণ করতে থাকলো। তার প্রাণে কী ব্যথা, কে তার পরিমাণ করবে? কিছুক্ষণ পরে নির্ম্মলের মনে যে একটা প্রবল ভাবান্তর হ'ল তা তার মুখে, চোখে ফুটে উঠলো।—সে যেন এক দৃঢ়সঙ্কল্প করলে। তারপর ধীরে ধীরে লিসেলের কাছে এসে সস্নেহে তার পিঠে হাত দিয়ে, কোমল কণ্ঠে বল্লে, "কেঁদো না লিসেল, তোমার এ দুঃখের অবসান আমি করবো।" লিসেলের অশ্রু-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হ'ল, ক্রন্দনের অস্ফুট স্বর নির্গত হ'ল, প্রাণের গভীরতম বেদনার বহিঃ-প্রকাশ তার সর্ব্ব শরীরে কম্পন এনে দিল। নির্ম্মল অনেকক্ষণ তার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে অনেকটা শান্ত ক'রে বল্লে, "লিসেল, আমি তোমাকে ভালবাসি!" লিসেল চোখ মুছে স্থিরভাবে উত্তর করলে, "তা জানি।" নির্ম্মল বল্লে, "আমি তোমাকে এখুনি বিবাহ করতে চাই! তুমি রাজি?" লিসেল চমকে উঠলো, অল্পক্ষণ নীরব থাকার পর বল্লে, "না!"

নির্ম্মল—কেন নয়?

লিসেল—আমি পতিতা।

নির্ম্মল—তুমি পতিতা? তুমি হ'চ্চ নন্দনের শুভ্র পারিজাত, ভুলে পৃথিবীতে জন্মেছ! সে হতভাগ্যের সাধ্য কি তোমাকে স্ত্রী রূপে পায়? আমি তোমাকে চাই লিসেল, আমি তোমাকে চাই—

লিসেল—না, না এ তোমার সাময়িক উচ্ছ্বাস—

নির্ম্মল—মাসের পর মাস, কত মাস কী ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কাটিয়েছি তা যদি জানতে—

লিসেল—অসম্ভব—অসম্ভব! [দুই হাতে মুখ ঢাকা]

নির্ম্মল—অসম্ভব মোটেই নয় লিসেল! আমরা এখুনি বিবাহ ক'রে নব-জীবন আরম্ভ করবো! লিসেল, রাজি হও!

লিসেল [কিছুক্ষণ নীরব থেকে, হাত নামিয়ে, দৃঢ়স্বরে] —না!

নির্ম্মল [স্তম্ভিত] কেন নয়?

লিসেল—রাগ ক'র না নির্ম্মল! তুমি আমাকে চাও, তা হয়তো সম্ভব—

নির্ম্মল—হয়তো নয়, সেটা ধ্রুব-সত্য!

লিসেল—মেনে নিলুম। কিন্তু আমার ভাবী সন্তানকে তুমি চাও না, চাইতে পারো না—চাওয়া অস্বাভাবিক!

নির্ম্মল—কিন্তু লিসেল—

লিসেল—আমিও তোমার স্কন্ধে সে ভার চাপাতে পারি না—অসম্ভব, অসম্ভব! এত নীচতা আমার পক্ষে সম্ভব নয়! ওর পিতা কাপুরুষ—তাই ব'লে ওর জননীও তাই হ'তে পারে না! ওর পিতার দোষ খণ্ডন ক'রে ওকে মানুষের মত মানুষ করাই হবে আমার সারা জীবনের সাধনা। আমি সামান্য কৃষকের মেয়ে—আমার তাতে কিসের লজ্জা?

নির্ম্মল—বুঝেছি লিসেল, বুঝেছি! কিন্তু আমি স্বেচ্ছায়, সানন্দে সে ভার গ্রহণ করবো!

লিসেল—না, না, তোমার আমার বিবাহ অসম্ভব!

নির্ম্মল—তোমাকে পেলে সুখী হব, না পেলে আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হবে।

লিসেল—তুমি এখন এ কথা ভাবছো—কিছুকাল পরে আর তা ভাববে না। তখন আমার সন্তানকে তুমি আপদ মনে করবে—তার জন্যে তোমাকে আমি দোষ দিতেও পারবো না। অথচ ঐ সন্তান হবে আমার নয়নের মণি—আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল! ওর প্রতি তোমার এতটুকু অবহেলা, এতটুকু অবজ্ঞা, এতটুকু উপেক্ষার নিদর্শন আমাকে এতো আঘাত দেবে যে হয়তো তোমার ওপরই আমি বিতৃষ্ণ হ'য়ে উঠবো। জেনে, শুনে যাতে সে সম্ভাবনা এত বেশি সে কাজ আমি করতে পারি না!

নির্ম্মল—আমি এতই হীন যে তোমার সন্তানকে আমার করবো না?

লিসেল—জানি তুমি মহৎ! তোমার ওপর এ সন্দেহ করা দারুণ অন্যায়। তুমি হয়তো ওকে আপন ক'রে নেবে, কিন্তু তাও হবে তোমার অনুগ্রহ! অবজ্ঞা বা অনুগ্রহ কোনটার অধীন আমার সন্তানকে করতে পারি না—আমি যে তার মা!!

[নির্ম্মল সসম্ভ্রমে মাথা হেঁট ক'রে নিরুত্তর রইল।]

আরো সাত দিন কেটে গেছে। সেই হাসপাতাল, সেই কক্ষ। কয়েকজন নার্স ক্রমাগত ছুটোছুটি করছে। দুই জন ডাক্তার লিসেলের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁদের কাজ করছে। নির্ম্মল সেই ঘরের বাইরে একটা ছোট্ট চেয়ারের কাছে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘর থেকে কোন লোক বার হ'লে ব্যাকুল হ'য়ে তাকে জিজ্ঞাসা করছে—লিসেল কেমন আছে? প্রায়ই কোন উত্তর পায় না। প্রত্যেকে ভীষণ ব্যস্ত—কথা বলার ফুরসৎ কোথায়? একজন ডাক্তার বার হ'ল। নির্ম্মল তাকে কাতর অনুনয় করলে, "দয়া ক'রে বলুন হের্ ডক্টর! কী হ'ল?"

ডাক্তারের একটু দয়া হ'ল, সংক্ষেপে বললে, "এখনো কিছু হয়নি!" "সে কেমন আছে?" "বড় দুর্ব্বল। শেষ অবধি কী দাঁড়ায় বলা শক্ত।" ডাক্তার গেল চলে। ভয়ে নির্ম্মলের সর্ব্ব শরীর শিউরে উঠলো। দুশ্চিন্তা ও মানসিক উদ্বেগ ইতিমধ্যেই তার মুখকে এত পরিবর্ত্তিত করেছে যে তাকে চেনা শক্ত। এই নিষ্ঠুর সংবাদ তার মুখের উপর যেন আর এক পোঁচ কালী ঢেলে দিলে। হঠাৎ এক ভীষণ চীৎকার এল। নির্ম্মল ক্ষিপ্তের মত ছুটে সেই কক্ষে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলে, এক নার্স তাকে বাধা দিলে। সে চীৎকার আরো উচ্চে উঠলো—আর তার স্বর এত বিকৃত যে নির্ম্মলের মনে ভীতির উদ্রেক হ'ল। সে স্বর আরো উচ্চে উঠলো আরো বিকৃত হ'ল—নির্ম্মলের হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল—কম্পিত কণ্ঠে সে নার্সকে অনুরোধ করলে, "আমাকে ছেড়ে দাও—তাকে একবার দেখে আসি! "অনর্থক ভয় করছেন! এ রকম হ'য়েই থাকে। আপনি

ওখানে গিয়ে আরো খারাপ করবেন!" চীৎকার আরো উচ্চে উঠলো, আরো বিকৃত হ'ল! "তোমার পায়ে পড়ি সিষ্টার আমাকে ছেড়ে দাও!" "অসম্ভব! আর একটু ধৈর্য্য ধরুন!" নার্স দুই হাত দিয়ে দরজা আগলালে। কয়েক মিনিট যাবৎ সমানে সেই বিকৃত চীৎকার এলো। নির্ম্মল পাগলের মত দরজার সামনে ঘুরতে লাগলো। হঠাৎ চীৎকারের মাত্রা কমে এলো। নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করলে, "কী হ'ল?" নার্স হেসে বললে, "সন্তান হ'ল!" তখন আর চীৎকার আসছে না—একটা কাতর ধ্বনি মাত্র আসছে। নির্ম্মল বললে, "আমাকে তা হ'লে ছেড়ে দাও, দেখে আসি।" "আর একটু অপেক্ষা করুন!" এক সদ্য-জাতের প্রথম ক্রন্দনের রব ভেসে এলো! নার্স হেসে বললে, "শুনলেন?—অত ভাবছেন কেন?" "তাহ'লে এখন আমাকে ছাড়ো, আমার সন্তান দেখি!" "আর একটু সবুর করুন!" হঠাৎ সব স্তব্ধ হ'য়ে গেল! সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ!! নির্ম্মল আঁতকে উঠলো, "কি হ'ল?" নার্সও ঠিক বুঝতে পারলে না—তার মুখও শুষ্ক! নির্ম্মল তাকে নির্ম্মম সরিয়ে ঘরে ঢুকলো। দেখে, লিসেলের মুখে অম্লজান বাষ্প ধরা হ'য়েছে—তার নির্ব্বাপিত প্রায় জীবন-প্রদীপ আবার জ্বালাবার জন্যে। নির্ম্মল ছুটে তার কাছে এলো। লিসেল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘুমিয়ে প'ড়েছে—চির নিদ্রা? গম্ভীর ভাবে এক ডাক্তার লিসেলের হাত টিপে দেখলে—বুকে কল বসিয়ে শুনলে—চোখ উল্টে দেখলে—বৃথা! সত্যিই চির নিদ্রা!! নির্ম্মল চীৎকার করে উঠলো, "লিসেল!" পাগলের মত তার দুই অসাড় হাত বুকের মধ্যে নিলে, "লিসেল!—লিসেল!!"—আর লিসেল!

কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সন্দেহ

শ্রীধীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আকাশ, আলোয়, অখিল বিশ্বে
যে খেলিছে লুকোচুরি,
আমার আঁধার অন্তর মাঝে
রূপ কিগো দেখি তাঁ'রি!

রূপবতী আজো কাঁদে-

শ্রীমনোজ বসু

সেই রূপবতী কাঁদে—আজো কাঁদে আলুলি' কেশ!
কোন দূর গ্রামে পথ-ঘাট নির্জ্জন…
রাতের বাতাস থমকিয়া থাকে…নিঃসাড় বেণুবন…
বিলের শিয়রে ম্লান-আঁখি চাঁদ নির্ণিমেষ।

গ্রামের বধূরা হয়ত আজিকে ঘুম-ভাঙা শয্যায়
দেখে, মাঝবিলে আলেয়ার দল জ্বলে, আর নিভে যায়—
আর দেখে, এক অতুল রূপসী সেখানে বালুর চরে
জ্যোৎস্নায় একা নদীকূলে ঘুরে মরে।

মোর সে-কালের অতি পুরাতন ভুলে-যাওয়া এক নাম—
নিশীথ রাত্রে সেই নাম ধরে রূপসী আকুল ডাকে;
আর, আমছায়ে সেকালের এক ভাঙাচোরা খেলাঘর—
রূপসী সেখানে পা দু'টি ছড়ায়ে সারারাত বসে থাকে।

সে রূপবতীরে ফেলে আসিয়াছি কোন সে গাঙের পার!
পথ দেখাবার ছিল এক মণি;—গিয়াছে চুরি।
আজি এ নিশীথে উতলা হয়েছে জ্যোৎস্নার পারাবার!—
হেথা নিশি-পাওয়া আমি একা-একা উদাস ঘুরি।
তোমরা আমার হারাণো মণিটি ফিরে এনে দেবে হাতে?
—তেপান্তরে সে বিরহিণী কোথা বলিবে ভাই?
হারা কৈশোর পথ ভুলে গিছে কোন বিলে নিশিরাতে
ওই যে আমারে আকুল ডাকিছে,—শুনিতে পাই।…

যে নাটাই-ঘুঁড়ি ছেড়া ছবি-বই ফেলে এনু অবহেলি'
তারি মাঝে বসে রূপবতী মোর কেঁদে করে রাতি ভোর।
কাঁদে খেলাঘর, কাঁদে আমছায়া, সেকালের নদী-বিল—
নিশীথ রাত্রে সেই গ্রামকূলে কাঁদে হারা কৈশোর।

বাংলাভাষার বানান ও মুদ্রণ

শ্রীসুধীর মিত্র

বাংলাভাষা খুব বেশী দিনের ভাষা নহে। ইহার গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র একশত বৎসর—তৎপূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাকে নামে মাত্র ভাষা বলা যাইতে পারে। এখনকার ভাষার সহিত শতবর্ষ পূর্ব্বকার ভাষার তুলনা করিলে মনে হয়,—এ ভাষার সহিত সে ভাষার আকাশ পাতাল তফাৎ, এক ভাষা বলিয়া চিনিতেই কষ্ট হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেরূপ দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা যে কোন জাতির পক্ষে গৌরব ও শ্লাঘার কথা হইতে পারিত। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কোন ভাষাই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা, বাংলাও পারে নাই। পৃথিবীর অনেক বড় বড় ভাষা শত শত বৎসর পার হইয়া আসিয়াও পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই, সেদিক দিয়া হিসাব করিলে বাংলাভাষার গৌরব করিবার অনেক কিছুই আছে। তবুও আজ ইহার যে সকল ত্রুটি ও অভাব আছে তাহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সে সকল ত্রুটি সংশোধন ও অভাব মোচনের ভার সমগ্র বাঙালী জাতির উপর। বাংলাভাষা এখনই গড়িবার সময়—আজও পুরাপুরি গড়িয়া ওঠে নাই। এখন যে সংস্কার সাধ্যায়ত্ত হইবে, আর পঁচিশ বৎসর পরে তাহা সম্ভবপর না-ও হইতে পারে। কারণ, ক্ষত অধিকদিন স্থায়ী হইলে তাহা নিরাময় হওয়া কঠিন। পৃথিবীর অনেক শক্তিশালী ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, সে সকল ভাষায় অসংখ্য প্রকারের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাহার সংস্কার প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে পারিতেছে না—তাহার প্রধান কারণ, মানুষের শত শত বৎসরের অস্থি মজ্জাগত সংস্কার ও অভ্যাস তাহার বিপক্ষে কাজ করিতেছে। যে শিকড় মানুষের মনে বহু যুগ ধরিয়া ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে—তাহার ভিত্তি সহজে টলেনা। বাংলা-ভাষার বয়স খুব বেশী হয় নাই বলিয়া ইহার কোনরূপ সংস্কার করিবার প্রয়োজন হইলে এখনই সেদিকে নজর দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা এক্ষেত্রে মাত্র দুটি প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি—একটি বাংলা শব্দের বানান গঠন সম্পর্কে এবং অপরটি ইহার মুদ্রণাদি কার্য্যের সুবিধার জন্য টাইপকেস্ সম্বন্ধে—এ দুটি গলদ বাংলাভাষার আদি হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভাষার পক্ষে শব্দের বানান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য। শুদ্ধরূপে বানান না করিতে পারা শুধু লজ্জার কথা নয়—না পারিলে ভাষা শিক্ষাই ব্যর্থ হইয়া যায়। এই জন্য শিক্ষার্থীকে দীর্ঘ সময় ধরিয়া বানান প্রক্রিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। যে ভাষার বানান প্রক্রিয়া যত সহজ, সে ভাষা আয়ত্ত করাও তত সহজ। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ ভাষার ন্যায় বাংলাভাষার বানান পদ্ধতি এত জটিল যে—জীবনের সব সময় ভাষার নিকট সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও অনেকে বানান ভুল করিয়া থাকেন এবং উহা ঠিক করিয়া লইবার জন্য অভিধানের সাহায্য প্রায়ই লইতে হয়। কারণ বাংলায় বানান করিবার স্বতন্ত্র রীতি কিছু কিছু থাকিলেও উহা এত অসম্পূর্ণ যে তাহার উপর নিসংশয়ে নির্ভর করা চলে না। প্রয়োগ পরম্পরায় যে বানান ভাষায় আসিয়া পড়িয়াছে আমাদেরকে সেই বানানই অনুসরণ করিতে হয়—ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহা ভুল বলিয়া বিবেচিত হয়। ভাষায় যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারাই যখন সময় সময় বানান লইয়া বিপদে পড়েন তখন সাধারণ লোকের পক্ষে উহা যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অল্প বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকেরা রচনা অনেক সময় নির্ভুল

করিতে পারেন—কিন্তু বানান শুদ্ধ করিতে পারেন না। যেমন কেহ লিখিলেন,—"শতিশ বাবু নিরিহ প্রকৃতির লোক—কিন্তু তাঁহার ব্যবহার বড়ই বিশদৃশ।" রচনা হিসাবে ইহাতে ভুল না থাকিলেও বানান ভুলের জন্য ইহা অপাঠ্য।

যদিও ধ্বনিকে (শব্দকে) রূপ দিবার জন্য বর্ণের (অক্ষরের) উৎপত্তি, তবুও পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণের ধ্বনির সমতা নাই। হয় একই বর্ণের সাহায্যে বিভিন্ন ধ্বনিকে রূপ দিতে হয়, আর না হয় কয়েকটি বর্ণ বিভিন্ন স্থলে একই ধ্বনির বাহন হইয়া থাকে—ফলে, বানান প্রক্রিয়া ভাষায় জটিলতর হইয়া উঠে। ইংরাজী ভাষায় একটি অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। ইহার u বর্ণটি বিভিন্নরূপ প্রয়োগে বিভিন্ন ধ্বনির বাহন হইয়া থাকে, যথা,—Put = পুট, But = বাট, Unity = ইউনিটি; অবশ্য অন্যান্য বর্ণগুলি সম্বন্ধেও একথা সত্য। অথচ এই u এবং অন্যান্য বর্ণগুলির ধ্বনি সর্ব্বত্র সমান থাকিলে বানান প্রক্রিয়া অনেক সহজ হইতে পারিত এবং সমস্ত শব্দগুলির বানানের জন্য গোটা অভিধানটি মুখস্থ করিতেও হইত না। বাংলায়ও অনুরূপ গলদ বর্ত্তমান—উচ্চারণের সঙ্গে বানানের ঐক্য কোন কোন স্থলে ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। আমরা লিখি এক, এখন, পড়ি য়্যাক, য়্যাখন—লিখি প্রতি, প্রচুর, পড়ি প্রোতি, প্রোচুর ইত্যাদি। ইংরাজীর তুলনায় বাংলার উচ্চারণের গলদ অনেক কম হইলেও বাংলা উচ্চারণের অনেক সমস্যা আছে এবং তাহা সমাধান হওয়াও বাঞ্ছনীয়—তবে এ ধরণের বৈষম্য খুব জটিল নয়।

কিন্তু, যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণের সাহায্যে একই ধ্বনি উচ্চারিত হয়—বাংলা বানানের অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি হয় সেইরূপ ক্ষেত্রে। বর্ণের প্রয়োগ দ্বারা ধ্বনি উৎপাদন করিতে পারিলেই বানান শুদ্ধ হয় না—ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের প্রচলিত অর্থও বুঝানো চাই। ইংরাজীতে Poot লিখিলেও পুট হইতে পারে কিন্তু ঐরূপ বানানে প্রচলিত অর্থ প্রকাশ করে না বলিয়া উহা অশুদ্ধ। বাংলায় আমরা 'স্বামী' ও 'সামী'তে অথবা 'শোভা' ও 'সোভা'তে উচ্চারণের কোন পার্থক্য করি না—অথচ husband এই অর্থে "স্বামী" এই বানান না লিখিয়া উপায় নাই—এবং 'স' দিয়া শোভা লিখিতে গেলেও উহা Pootএর ন্যায় হাস্যকর হইবে।

আমরা বানান করিয়া কথা বলি না বা উচ্চারণ করি না। বানান উচ্চারণকে অনুসরণ করিবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। অথচ উচ্চারণের উপর নির্ভর করিয়া বানান করিবার স্বাধীনতা আমাদের নাই—থাকিলে অনেক হাঙ্গামা চুকিয়া যাইত। আধুনিক সাহিত্যিকদের অনেকে বানান ধ্বনি-মাত্রিক করিবার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। ইঁহারা ভাল স্থলে ভালো, গরু স্থলে গোরু অর্থাৎ অকারান্ত বানান যাহা 'ও'-র ন্যায় উচ্চারিত হয়—সেই সকল স্থলে 'ও' যুক্ত করিয়া ধ্বনির শুচিতা রক্ষা করিতেছেন—কিন্তু অধিকতর জটিলতার দিকে (অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণ যেখানে একইরূপ ধ্বনি উচ্চারিত করে সেদিকে) কোনরূপ সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন না। *

অ-কার ও-কারের প্রসঙ্গ আমরা আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া, বানানের যে দিকটি বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে

---

* সাহিত্যিকেরা অ-কারান্ত শব্দে ও-কার যোগ করিয়া ধ্বনির সমতা রক্ষা করিতেছেন, এবং করাও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বত্র এ নিয়ম অনুসরণ করেন না, ফলে জটিলতা বাড়িয়াই চলিতেছে। যাঁহারা 'গরু'কে গোরু লেখেন তাঁহারা সরু=সোরু, তরু=তোরু, মরু=মোরু, লেখেন না। সর্ব্বত্র এক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে গেলে প্রথমটা একটু অসুবিধা হইত বটে—কিন্তু পরিণামে সুবিধা হইত অনেক। একই ধরণের বানানে কোন কোন স্থলে ইঁহারা ও-কার যুক্ত করিয়া লেখেন, কোন কোন স্থলে লেখেন না। একই ব্যক্তি বিভিন্ন রচনায় বা পুস্তকে বিভিন্ন রীতির অনুসরণ করেন, ইহাও অনুচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শেষের-কবিতা'য় কয়েকটি বানান এইরূপ করিয়াছেন, যথা:—যতো, ততো, কতো, ছিলো, গেলো, হ'লো, ক'র্‌বো, ব'ল্‌বো ইত্যাদি—অথচ তৎপরবর্ত্তী বহু রচনায় দেখিলাম শেষের কবিতার "হ'লোর" পরিবর্ত্তে হোলো, ছিলো'র পরিবর্ত্তে ছিল; কতো'র পরিবর্ত্তে কত; ক'র্‌বো-র স্থলে করব ইত্যাদি এইরূপ বহু বানানের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। ছাপার ভুল কিনা জানি না। বানানের এইরূপ অসঙ্গতি শরৎচন্দ্র এবং তৎপরবর্ত্তী লেখকগণের রচনায়ও দৃষ্ট হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার একই শব্দের বানান বিভিন্ন সাহিত্যিকের হাতে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, যেমন—'হইত' শব্দটি হইতে কেহ লেখেন হ'ত, কেহ হোত, কেহ হ'তো এবং কেহবা হোতো এইরূপ লিখিতেছেন। বহু অকারান্ত শব্দ আছে যাহা আমরা ওকারান্ত হিসাবে উচ্চারণ করি—কেহ গুটীকত পাঁচ দশটিতে ও-কারান্ত বানান চালাইতেছেন—আবার কেহ কেহ সেগুলি বাদ দিয়া অন্য কয়েকটিতে ঐরূপ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ লেখেন হয়তো, শরৎচন্দ্র লেখেন হয়ত—এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত বিভিন্ন সাহিত্যিকের লেখা খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। বানান ধ্বনি-মাত্রিক নহে বলিয়া সাহিত্যে এইরূপ গোঁজামিল দেখা দিয়াছে।

সেই দিকের কথা আলোচনা করিব। বাংলা বর্ণমালায় যে সকল বর্ণের ধ্বনি সমান বা প্রায় সমান সেই সকল বর্ণের মধ্যে কয়েকটিকে রাখিয়া অতিরিক্ত গুলিকে বাদ দিতে পারিলে এই ভাষায় বানানের বোঝা অনেকটা কমিয়া যায় এবং প্রত্যেক বর্ণের ধ্বনিগত মৌলিক ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়া বানানের রীতি প্রচলিত হইলে বৈজ্ঞানিকও হয় বটে।

বাংলা বর্ণমালায় মূর্দ্ধণ্য ণ এবং দন্ত্য ন; তালব্য শ, মূর্দ্ধন্য ষ এবং দন্ত্য স; হ্রস্ব ই এবং দীর্ঘ ঈ; হ্রস্ব উ এবং দীর্ঘ ঊ; বর্গ্য জ এবং অন্তস্থ য এই কয়েকটি বর্ণের যথাযথ প্রয়োগ লইয়া বানানে অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করিয়া থাকে—তা'ছাড়া আরও একটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় অন্তস্থ ব বা ফলার ব এর প্রয়োগ লইয়া। যুক্তাক্ষর সম্বলিত বানানগুলির কথা পরে আলোচনা করিব।

উপরিউক্ত প্রত্যেকটি জোড়া হইতে এক একটি বর্ণ রাখিয়া অতিরিক্ত গুলিকে বাদ দিতে পারিলে বানান সমস্যা অনেকাংশে সহজ হইয়া উঠে এবং ভাষাকেও বোধ করি অনাবশ্যক বোঝা হইতে মুক্ত করা হয়। আমাদের মনে হয়, উপরিউক্ত বর্ণগুলির মধ্য হইতে দন্ত্য ন, দন্ত্য স, হ্রস্ব-ই, হ্রস্ব-উ, এবং বর্গ্য জ-কে রাখিয়া বাকীগুলিকে ভাষার অঙ্গহানি না করিয়াও বর্ণমালা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের সম্ভবযোগ্যতা কতখানি আলোচনা করা যাক্।

মূর্দ্ধণ্য ণ এবং দন্ত্য ন এর মধ্যে আমরা উচ্চারণগত কোন পার্থক্য করি না। সংস্কৃত হইতে মূর্দ্ধণ্য ণ আসিয়াছে—এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের ণত্ব বিধি অনুসারে বাংলাতেও চলিতেছে। অবশ্য বাংলায় ইহার প্রয়োগ কোন কোন স্থলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—সেইজন্য গণ্ড-গোলেরও সৃষ্টি হইয়াছে অনেক। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে র-কারের পরবর্ত্তী ন, মূর্দ্ধণ্য হয়, যথা:—বর্ণ, কর্ণ, পর্ণ, ইত্যাদি। বাংলায় সোনা, পান ও কান ঐ তিনটি সংস্কৃত শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া শেষোক্ত বানানত্রয়ে কেহ কেহ 'ণ' প্রয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা লেখেন সোনা, কান ও পান—কিন্তু কবি ৺সত্যেন দত্ত ঐ বানান তিনটিতে কোন কোন ক্ষেত্রে ণ ও কোন কোন ক্ষেত্রে ন দিয়াছেন। আশুতোষ দেবের অভিধানে ঐ তিনটি বানান ণ দিয়া করা হইয়াছে—সংস্কৃত-ঘেঁসা বাঙালী পণ্ডিতেরা অনেকে ঐরূপ ক্ষেত্রে 'ন' দেখিলে চটিয়া যান এবং ছাত্রদের পরীক্ষার খাতায় নির্ব্বিচারে বানান ভুল কাটেন। আবার, সংস্কৃত ব্যাকরণের মর্য্যাদা স্থানে স্থানে বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। সংস্কৃত ণত্ববিধি অনুসারে, শর, ইক্ষু, পক্ক, আম্র, খদির এই কয়টি শব্দের পরস্থিত 'বন' শব্দের দন্ত্য-ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়, যথা—শরবণ, আম্রবণ ইত্যাদি। কিন্তু নবীন সেন হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ আম্রবনে মূর্দ্ধন্য প্রয়োগ করেন নাই, অন্ততঃ এরূপ ঘটনা চোখে পড়ে নাই। কাজেই বাংলায় নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বানান চলিয়া আসিয়াছে, আজ বর্ণমালা হইতে মূর্দ্ধন্য ণ ছাঁটিয়া দিলে অনেক গণ্ডগোল চুকিয়া যাইবে, ক্ষতিও হইবে না। মজার কথা এই যে স্কুল পাঠ্য দুখানি বাঙলা ব্যাকরণে উপরিউক্ত ক্ষেত্রে বন শব্দের ন কে ণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কোন শব্দের আদিতে ণ হয়না, কাজেই ণ বর্জ্জন করা সুবিধাজনক।

শ, ষ ও স—এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণও বাংলায় একরূপ। ত-বর্গ এবং শুদ্ধ ঋ বা র সংযুক্ত হইলে ইহাদের উচ্চারণ ইংরাজী S অক্ষরের ন্যায় হয়, অন্যত্র Sh-র ন্যায় হইয়া থাকে। শ ও ষ অপেক্ষা স-এর প্রয়োগ বাংলায় অধিক এজন্য আমরা স-কে রাখিবার পক্ষপাতী। বর্গ্য জ এবং অন্তস্থ-য এর উচ্চারণে বাংলায় কোন তারতম্য দেখা যায় না—অর্থাৎ আমরা 'য'-কে 'জ' এর মতোই উচ্চারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। 'যাওয়া' স্থলে 'জাওয়া' লিখিলে কোনই ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই।

ব্যাকরণে দেখিতে পাই, স্বর দুই প্রকার—হ্রস্ব ও দীর্ঘ। হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণে অল্প এবং দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে দীর্ঘ সময় লাগে। প্রস্তাবিত বর্ণের মধ্যে ই, উ হ্রস্ব ও ঈ, ঊ দীর্ঘ স্বর। আমাদের মনে হয়, দীর্ঘ স্বরদ্বয় বাদ দিলে কোনই ক্ষতি হইবে না। দীর্ঘ স্বর সংস্কৃত ভাষার অনুকরণে বাংলায় আসিয়া দীর্ঘ আসন জুড়িয়া বসিলেও বাংলায় ইহাদের কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, আমরা হ্রস্ব ও

দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে কোন তারতম্য করিনা, করিলে তাহা এত সূক্ষ্ম যে উহা বাদ দিলে ভাষার কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। বাংলা ধ্বনি-বিজ্ঞান বা Phonology অনুসারে ঈশ্বর ও ইচ্ছা, পুণ্য ও পূর্ব্ব প্রভৃতি স্বরের ধ্বনিগত কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। * কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ক'য়ে দীর্ঘ ঈকার দিয়া 'কী'-এর প্রচলন করিয়াছেন—বর্ত্তমানে ইহা ভাষায় রীতিমত চলিয়া গিয়াছে। 'কী' স্থলে 'কি' লিখিলে কি অসুবিধা হইত' জানিনা। আমরা বক্তৃতা, গান বা আবৃত্তি করিবার সময় অনেক সময় দীর্ঘ এবং অত্যন্ত দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া থাকি—তাহাতে যদি কোন অসুবিধা বোধ না হইয়া থাকে তাহা হইলে "কি"-কে দীর্ঘভাবে উচ্চারণ করিতে বিশেষ বাধা হইবে কেন? যদি নিতান্তই অসুবিধা হয়, দীর্ঘস্বর বুঝাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন রাখিলেও চলিতে পারে—যে কোন স্থানে দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণের প্রয়োজন সেইখানেই ঐ চিহ্নটি প্রয়োগ করিলে চলিবে। ইংরাজী অভিধানে Mine কথাটির i-এর মাথায় দাগ দিয়া মাইন্ বুঝানো হইয়া থাকে—এমনি কোন কোন চিহ্ন দিয়া দীর্ঘ স্বরের অভাব মিটাইতে পারা যাইবে—তবে ইহার কোন আবশ্যকতা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাবে এই শব্দের বানান অনেক সময় বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে এবং বানান সংস্কারের চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন ধ্বনি-মাত্রিক পদ্ধতি না থাকায় তাঁহারাও নানাপ্রকার অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিতেছেন সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। একই অর্থে একই ধ্বনির বিভিন্নরূপ বানান শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় জটিলতা বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ বিভিন্ন বানানগুলির মধ্যে সবগুলি শুদ্ধ কিনা তাহা অনেকের পক্ষেই জানা কষ্টকর। শিক্ষক মহাশয়েরা ও অধ্যাপকগণ অনেক সময় কোন একটিকে শুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া অপরটি ভুল সাব্যস্ত করেন এ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। * ফুটনোটে লিখিত শব্দগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, যে সকল বর্ণের ধ্বনি সমান—বানানের বিভিন্নতা সেই সকল ক্ষেত্রেই হইয়াছে এবং বানান বিভিন্ন হইলেও ধ্বনি বা উচ্চারণ সর্ব্বত্রই সমান রহিয়াছে।

আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী বানানের যে পরিবর্ত্তন হইবে তাহার কিছু নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

ণ স্থলে ন=প্রমান, প্রেরনা, কারন, প্রান।

শ ষ স্থলে স=সুসান্ত, সাঁড়, স্যামল, সান্মাসিক।

য স্থলে জ=জৌবন, অভিজোগ, জাওয়া।

ঈ স্থলে ই=নিরিহ, বিভিসিকা, হস্তি।

ঊ স্থলে উ=বধু, পুর্ব্ব, উসা।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, উহাদের মধ্যে উচ্চারণগত কোন বৈশিষ্ট্য বা ঐক্য নষ্ট হয় নাই। অতিরিক্ত বর্ণগুলি বর্জ্জন করিলে শব্দের উচ্চারণের যখন ব্যাঘাত জন্মে না—অধিকন্তু বানানের বোঝা কমিয়া যায় তাহা হইলে বর্জ্জন করিতে বাধা কি?

কথা উঠিতে পারে বিভিন্নরূপ বানানে যেখানে একইরূপ ধ্বনির উৎপন্ন করিয়া বিভিন্ন অর্থের সূচনা করে সেরূপ ক্ষেত্রে কি হইবে? যথা:—বীণা—বাঁশী; বিনা—ব্যতীত।

এরূপ ক্ষেত্রে শব্দের প্রয়োগ অনুসারেই অর্থ স্বচ্ছন্দে সূচিত হইতে পারে—সেজন্য গতানুগতিক বানানের প্রয়োজন

* বাংলায় "চক্ষুরোগ" কথাটির বানান অশুদ্ধ—চক্ষূরোগ শুদ্ধ। অথচ চক্ষুকর্ণ, চক্ষুলজ্জা, চক্ষুদান প্রভৃতি শব্দগুলির বেলায় ঊ-কার হয় না। ইহার তাৎপর্য্য কি? চক্ষূরোগে দীর্ঘ ধ্বনি হইতেছে কি?

* আরও অন্যান্য অনেক শব্দের ন্যায় নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান দুই প্রকারে শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের মধ্য দিয়া বিকল্পে শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়—আবার কতকগুলি প্রয়োগ বশতঃ ভাষায় চলিয়া গিয়াছে। বানান গঠনের কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকিলে বা বিভিন্ন বর্ণের বা স্বরের মধ্যে উচ্চারণের বৈষম্য থাকিলে এরূপ হইত না। কয়েকটি শব্দ যথা:—একটি, একটা; বেশি, বেশী; কুটির, কুটীর; চিৎকার, চীৎকার; রজনি, রজনী; তরি, তরী; প্রতিকার, প্রতীকার; নিচে, নীচে; বন্দি, বন্দী; সুচি, সূচি; মক্ষিকা, মক্ষীকা; শালুক, শালূক; ময়ূর, ময়ুর; মণ, মন (৪০ সের); রশনা, রসনা; মুষল, মূষল, মুসল; (মুদ্গর) মশি, মশী, মষি, মষী, মসি, মসী; (লিখিবার কালি), শালিখ, সালিখ; জাদু (রবীন্দ্রনাথ) যাদু; মুখোস, মুখোষ (রবীন্দ্রনাথ); জবন, যবন; জামাতা, যামাতা ইত্যাদি।

হইবে না। যদি বলি, নারদ বিনা বাজাইয়া গান করেন, অথবা, শ্রম বিনা বিদ্যা হয় না—তাহা হইলে কোন্‌টি কোন অর্থে প্রযুক্ত হইল বুঝিয়া লইতে কষ্ট হইবে না। আমরা একই শব্দ স্থান বিশেষে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি—পৃথিবীর সব ভাষাতেই এ রীতি বর্ত্তমান। যখন বলি "বঙ্গ ভাষার সংস্কার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনকে সংস্কার-মুক্ত করিতে হইবে"—তখন দুটি সংস্কারের অর্থ বুঝিতে অসুবিধা হয় কি?

সংস্কৃত শব্দ বহুল হইলেও বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার শৃঙ্খলে বাংলাকে চিরদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কোনই হেতু নাই। বহু ভাষা হইতে পুষ্ট-কলেবর হইলেও বাংলা একটি স্বতন্ত্র এবং জীবন্ত ভাষা। অতএব বাংলা শিক্ষা করিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতে হইলে তাহা অহেতুক উৎপীড়ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়াও বাংলা যত্ব ণত্বের পুরা-পুরি কিনারা হয় না। যদি হয়ও, অন্য ভাষা হইতে যে শব্দগুলি আসিয়াছে তাহাদের উপায় কি? তাহারাও কি সংস্কৃত সূত্রাধীনে নিয়ন্ত্রিত হইবে?

হাসপাতাল, স্কুল (ইংরাজী) সাবেক, সহর (আরবী, পার্শী) সাবান, সালসা (পোর্ত্তুগীজ), সোডা, সেনেট (ইটালী) সাটিন (চীন) সাগু (মালয়) বিস্কুট (ফরাসী) বায়স্কোপ (গ্রীক) প্রভৃতি শব্দগুলির 'স' স্থানে 'শ' ব্যবহার করিলে হয়ত প্রচলিত রীতি অনুসারে ভুল বলা হইবে—কিন্তু কোন্ নিয়মানুসারে ভুল হইল তাহা স্পষ্টতঃ বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকেরা সহর বানান করেন 'শ' দিয়া, আবার অনেকে করেন 'স' দিয়া, কোন্‌টি ঠিক? ভাষার বলিয়া গিয়াছে বলিয়া দুটিকেই শুদ্ধ বলা ছাড়া উপায় নাই। পক্ষান্তরে হাসপাতাল বা সালসা ইত্যাদি শব্দের স স্থানে শ ব্যবহার করিলে অনেকে হয়ত আপত্তি করিবেন—কিন্তু কারণ দেখাইতে পারিবেন না। ইংরাজী Dish (ডিস্) কথাটি বাঙলায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ লেখেন স দিয়া, কেহ বা ব্যবহার করেন 'শ'—অথচ কোনটিকেই ভুল বলিবার জো নাই। বৈদেশিক শব্দে এরূপ গোলমাল নিয়তই চলিতে থাকিবে, এবং একদল অপর দলের বানান ভুল বলিয়া বিবেচনা করিবেন যতদিন একপক্ষের কৃত বানানটির দিকে অপর পক্ষের নজর না পড়ে।

বাংলাভাষার এখনো শব্দ-সম্পদের বহু দৈন্য আছে—এখনো বহুভাষা হইতে নূতন নূতন শব্দ সংগ্রহ করিয়া ইহার দেহ পুষ্ট করিবার প্রয়োজন হইবে। বানান ধ্বনি-মাত্রিক হইলে কোন শব্দ চয়নের সময় যত্ব ণত্ব, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি লইয়া অনাবশ্যক মাথা ঘামাইতে হইবে না এবং যে যাহার খুসী মত বানান চালাইয়া ভাষাকে দুর্ব্বহ ভারে এবং শিক্ষার্থীকে দুরূহ সমস্যায় ফেলিতে পারিবেন না। *

ভাষার আসল মাপকাঠি হইতেছে সাহিত্য, ব্যাকরণের কসরৎ নয়। সাহিত্য সৃষ্ট হইতে থাকিলে ব্যাকরণ নিজের পথ খুঁজিয়া লইবে, সেজন্য ব্যাকরণের দোহাই দিয়া সাহিত্যে প্রচলিত বানান জোর করিয়া চালাইবার প্রয়োজন হইবে না। ব্যাকরণের বাঁধা-ধরা গণ্ডীর বাহিরে না আসিতে দিলে ভাষার পঙ্গুত্ব কোনদিন ঘুচিবে না। যে সব বানান ব্যাকরণসঙ্গত না হইয়াও আজ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে ব্যাকরণ তাহা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে। এবং আজ যদি সাহিত্যিকেরা বানানের উক্তরূপ সংস্কার চালাইয়া লইতে চেষ্টা করেন—ব্যাকরণ তাও সসম্মানে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

প্রত্যেক বাঙালী আশা করেন ও ইচ্ছা করেন যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের বহুল প্রচার হয়—বিদেশীরাও পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভাষার ন্যায় বাঙলা শিখিয়া বাঙালীর চিন্তা, কল্পনা ও ভাবের সহিত পরিচিত হন এবং বাঙলার সহিত বহির্জ্জগতের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এখনো রবীন্দ্রনাথের

* রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ বহু সাহিত্যিক অনেক সময় দেশজ ও বৈদিশিক শব্দে স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী বানান চালাইয়া থাকেন—কোন পদ্ধতি না থাকিলে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বানানের কিছু কিছু অসঙ্গতি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি—অন্য ধরণের আর কয়েকটি দেখাইতেছি। কেহ কেহ লেখেন,—

শিস্, খুশী, গাড়ী, সিল্ক, শাড়ী, জিনিস, মুখোস, মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল, ইত্যাদি, আবার কেহ কেহ লেখেন—

শিষ, খুশী, গাড়ি, শিল্ক সাড়ী জিনিষ, মুখোষ, মরীয়া হয়ে উঠ্‌ল—এরূপ দৃষ্টান্ত অজস্র পাওয়া যাইবে—ফলে শিক্ষার্থীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে।

জন্য অনেক অ-বাঙালী বাংলা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করেন—কিন্তু বাংলার বর্ত্তমান সংখ্যাতীত বর্ণ (টাইপ) ও দুরূহ বানান পদ্ধতি তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্ব প্রধান বিঘ্ন উৎপাদন করে এবং অনেকে প্রথমে কিছুদিন বাংলা শিখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া সে চেষ্টা ছাড়িয়া দেন—বর্ত্তমান লেখকের ২।১টি ক্ষেত্রে এরূপ অভিজ্ঞতা আছে। বঙ্গের বাহিরে বহু অনুন্নত জাতি আছেন—তাঁহাদের নিজস্ব কোন সাহিত্য নাই এবং সেজন্য তাঁহাদের ভারতীয় উন্নত ভাষাগুলির মধ্য হইতে যে কোন একটি গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙ্‌লা শিক্ষার পথ দুরধিগম্য না হইলে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বাঙ্‌লা শিখিয়া মনে প্রাণে বাঙালী হইয়া উঠিতে পারিতেন। অবশ্য কষ্টসাধ্য হইলেও অনেকে কঠিন ভাষা শিক্ষা করেন কিন্তু তাহার কারণ অনেক।

পূর্ব্বের অনুচ্ছেদগুলিতে অসংযুক্ত বর্ণ সম্বন্ধীয় বানান সমস্যার কথা আলোচনা করিয়াছি এবং সম্ভাবিত সরলতর পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমার মতামত দিয়াছি। কিন্তু বাংলার যুক্তবর্ণগুলিকে প্রকৃতপক্ষে একটি একটি পৃথক বর্ণ মনে করিতে হইবে—দুইটি বর্ণের সংযোগে তাহাদের উৎপত্তি হইলেও তাহাদের পৃথক পৃথক আকৃতি আছে এবং তাহারা পৃথক পৃথক ধ্বনির প্রতীক্ বলিয়া বিবেচিত হয়। শিশুদের এবং বিদেশীয়দের পক্ষে ইহা আয়ত্ত করা যে কত কষ্টসাধ্য বহুদিন ধরিয়া এই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইতে হইতে আমাদের পক্ষে তাহা পরিমাপ করা সম্ভব হইবে না। ইহার সহিত মুদ্রণ সমস্যারও বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বাংলার টাইপ সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়ায় বাংলা টাইপ-রাইটার এবং মুদ্রণের কয়েকটী বিশেষ বিভাগে বাংলার এখনো প্রবেশাধিকার জন্মে নাই। ইহাতে প্রচারের পক্ষে, কাজ কর্ম্মের পক্ষে এবং ভাষা কার্য্যোপযোগী হইবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। আমার নিম্নের আলোচনায় এই সম্বন্ধে সরল পদ্ধতি অবলম্বন করিবার এবং বাংলা টাইপের সংখ্যা কমাইয়াও শব্দের ধ্বনি-মাত্রিকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া যাহাতে বানান করা যায় তাহার আলোচনা করিতেছি।

বাংলার একটি শোচনীয় গলদ—ইহার মুদ্রণ সমস্যা। মুদ্রণকার্য্য যত সহজে করা যায় ততই ভাল। ১৩৩৯ সালের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার বাংলার টাইপকেস্ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহার গলদ ও মুদ্রণের অপরিসীম যন্ত্রণা, কষ্ট ও অসুবিধার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মুদ্রণকার্য্য বা টাইপকেস্ সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা না থাকিলেও মনে করি টাইপের সংখ্যা কমাইতে পারিলে এ সমস্যার সমাধান হয়। বাংলা বর্ণের সংখ্যা মোট অর্দ্ধশত হইলেও কিন্তু ছাপিবার সময় টাইপ বা অক্ষরের প্রয়োজন হয় অর্দ্ধ সহস্র—৫৬৩টি। বাংলায় যুক্তাক্ষরাদি প্রচলিত থাকায় টাইপের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে। এজন্য ১৩৪০এর ভাদ্রের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় বাংলা হরফগুলি রোমীয় অক্ষরের ধরণে লিখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাহাতে—"একটির পর একটি তদুপরি আর একটি অক্ষর চড়িয়া বসিতে পারিবে না।" শ্রদ্ধেয় প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় এই মতের পরিপোষক জানিতে পারিলাম। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের মতে ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে হসন্ত বিবেচনা করিতে হইবে তাহার পর স্বর বসিবে। যথা,—

কর্ত্তব্য পরায়ণ=ক অ র ত ত অ ব য় অ প অ র আ য় অ ণ।

স্ত্রী=স ত র ঈ।

উপরিউক্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় আ-কার, ই-কার প্রভৃতি স্বরের চিহ্ন এবং ব্যঞ্জনের ফলাগুলি তুলিয়া দিতে চান। লেখক এ প্রণালীকে অত্যন্ত সহজ এবং সুবিধাজনক মনে করিয়াছেন—আমরা কিন্তু তাহার বিপরীত মতই পোষণ করি। আমাদের মনে হয়, উক্ত প্রণালী একেবারেই অচল—কারণ ঐ প্রণালী অনুসারে ছাপিতে হইলে বর্ত্তমান অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ এবং সময় সময় চতুর্গুণ স্থানও লাগিতে পারে—অর্থাৎ এখনকার পদ্ধতিতে এক পৃষ্ঠায় যতগুলি শব্দ ছাপিতে পারা যায়—ঐ ব্যবস্থার পর ততগুলি শব্দ ছাপিতে প্রায় ৩।৪ পৃষ্ঠা লাগিবে। ফলে মুদ্রণের পরে তদনুসারে পুস্তকের মূল্যও বাড়িবে—বর্ত্তমান সময়ের একখানি আট আনা মূল্যের মাসিকের দাম হইবে দেড় অথবা দুই টাকা। দরিদ্র দেশে কাগজও

কাটিবে না—শিক্ষার পথও রুদ্ধ হইবে। সস্তার প্রতিযোগিতার বাজারে বঙ্গভাষা কোণঠাসা বা পর্দ্দানসীন হইয়া রহিবেন। তাছাড়া কবিতার একটি লাইন লিখিতে ও ছাপিতে তখন ৩।৪টি লাইনের প্রয়োজন হইবে; রবীন্দ্রনাথের ছন্দ হয় ত বা টুক্‌রা ভাগ করিয়া গরমিল করিয়া ছাপিতে হইতে পারে—অতএব সে ক্ষতিও অপূরণীয়—আর ছাপিলেও দেখিতে প্রীতিকর হইবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ। সর্ব্বোপরি, যে জন্য এই সংস্কারের কথা মনে উঠিয়াছে সেই মুদ্রাকরের দুঃখ ত ঘুচিবেই না বরং অনেকটা বাড়িয়া যাইবে—ছাপিতে সময়ও লাগিবে তিনগুণ। আর এ প্রণালীতে অভ্যস্ত হইতে নিতান্ত কম সময় লাগিবে না। অবশ্য সুবিধাও কিছু না হইবে তাহা নহে কিন্তু তুলনায় অসুবিধাই হইবে বেশী।

আমাদের আর একটি প্রণালীর কথা মনে হইতেছে—এ প্রণালীতে বাংলা টাইপের সংখ্যা অনেক কম হইবে এবং শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের কল্পিত প্রণালীতে যে সব অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারিত এ প্রণালীতে তদপেক্ষা অনেক কম হইবে এবং যদি সামান্য অসুবিধা হয় সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া তাহা অবলম্বন করিলে কোনক্রমেই লোকসানের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়।

আমরা আ-কার, ই-কার ইত্যাদি স্বরের চিহ্ন এবং য-ফলা, র-ফলা এই দুটিকে মাত্র রাখিয়া ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে (বিশেষতঃ যে স্থলে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ভাঙ্গা হইতেছে) হস্ চিহ্ন দিয়া লিখিবার পক্ষপাতী। যথা,—

কর্ত্তব্য পরায়ণ=কর্‌তব্য পরায়ণ
স্ত্রী=স্‌ত্রী
সম্মান=সম্‌মান
শৃঙ্খল=শৃঙ্‌খল

এই প্রণালী সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় ও সমস্যার কথা আলোচনা করিতেছি।

(১) যে অক্ষরের বাম দিকে হস্ চিহ্ন থাকিবে তাহা পরবর্ত্তী অক্ষরের সহিত সংযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। যুক্তাক্ষরের উপরিস্থ বর্ণটি হসন্ত দিয়া এবং নীচেরটি স্বরান্ত রাখিয়া লিখিতে হইবে। যথা,—শ্লোক=শ্‌লোক। ব্রাহ্মণ=ব্রাম্‌হন, কেন্দ্র=কেন্‌দ্র। *

(২) বাংলায় বর্গ্য ব ও অন্তস্থ ব উভয়েরই আকার একরূপ; উচ্চারণগত পার্থক্যও আমরা করি না। অন্তস্থ ব কেবল কোন কোন ক্ষেত্রে সংযুক্ত ব্যঞ্জন দ্বিত্বভাবে উচ্চারিত করে, যথা অদ্বিতীয়=অদ্দিতীয়, ঈশ্বর=ঈশ্‌শর,—এরূপ বানান করিলে ক্ষতি কি? ইংরাজী W-বর্ণটি অন্তস্থ ব প্রয়োগে অনেক সময় বুঝানো হইয়া থাকে, যেমন Swarna=স্বর্ণ। নাগরীতে "কাবুলিবালা" লিখিলে "কাবুলিওয়ালা" উচ্চারিত হয়,—ঐ ভাষায় অন্তস্থ-ব এর আকার স্বতন্ত্র আছে—কিন্তু বাংলায় শব্দের আদিতে ইহা প্রয়োগের রীতি নাই। রবীন্দ্রনাথ Wordsworth লিখিয়াছেন, ওয়ার্ডস্বার্থ,—অধিকাংশই লেখেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ,—অন্তস্থ-ব এর স্বতন্ত্র আকার না থাকায় ওয়ার্ডস্‌বার্থ লেখা যায় না। † সংস্কৃত ভাষাদিতে অন্তস্থ-ব এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ আছে, এই ভাষায় স্বামী "সোয়ামী" রূপেই উচ্চারিত হয়, আমরা বলি সামী। সুতরাং শব্দের শোভাবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত শব্দের নিচে একটি ব-ফলা জুড়িয়া বাংলা শব্দকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? যাঁহারা

---

* প্রবাসীতে (১৩৩৯, মাঘ—৫১৩ পৃঃ) শ্রীযুত অন্নদাচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধে জানিতে পারিলাম যে বাংলায় যে সকল যুক্তাক্ষর শব্দের আদিতে বসে (যথা, ক্র, গ্র, প্র, ব্র, ভ্র, জ্ঞ, স্ক, স্থ, স্ত, হ্ব, স্ন, স্প, স্ফ, প্রভৃতি) সেই সকল অক্ষরের উপরকারটিতে হসন্ত জুড়িয়া এবং নিচের অক্ষরটি স্বরান্ত রাখিয়া মুদ্রিত করা এবং লেখা ডাক্তার সুনীতি বাবুর মত। যথা,—স্‌টেসন। অন্নদা বাবু এই প্রণালী সমর্থন করেন নাই। তিনি বলেন; ইহাতে মুদ্রণ কার্য্যে অধিক সময় লাগিবে, কাগজ বেশি লাগিবে এবং পাঠের মহা অসুবিধা হইবে। কথাটা আংশিক সত্য হইলেও আমরা মনে করি এ সকল অসুবিধা অতিক্রম করা যাইবে এবং যদি কোন অসুবিধা হয় তাহা এত সামান্য যে উপেক্ষা করা চলিবে। আমরা শেষাংশে তাহার আলোচনা করিব।

† রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডস্বার্থ লিখিয়াছেন, শিক্ষিত লোকেরা ঐ নামের সহিত পরিচিত বলিয়া। যাঁহারা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নাম শুনেন নাই তাঁহারা উহাকে "ওয়ার্ডসার্থ" বলিয়া পড়িলেও দোষ দিবার কিছু ছিল না। কারণ এরূপ স্থলে এরূপ প্রয়োগ বাংলার সম্ভবতঃ আর নাই।

উচ্চারণ সংস্কার করিবার পক্ষপাতী অর্থাৎ যাঁহারা সংস্কৃতানু-রূপ অন্তস্থ-ব এর ধ্বনি বাঙালীর ছেলেকে এখন শিখাইতে চান, তাঁহারা ঐ 'ব' কে বাদ দিয়া 'য়া' বা 'ওয়া' যোগ করিয়া উহা করিতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে 'য়া' স্থলে 'আ' যোগ করিলে ভালই হয়, যথা স্বস্তি=সোআস্তি; স্বাধীনতা=সোআধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু যে উচ্চারণ বাঙলায় লুপ্ত হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া আনিবার সার্থকতা দেখি না।

(৩) ণ্ ন্ ম্ য্ র্ ল্ ব্—ইহারা কোন ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হইলে যথাক্রমে ্ণ ন ্য ল ্ব এইরূপ রূপ ধারণ করে—এই সংযোগকে ফলা বলা হয় যথা ক্য (য-ফলা) প্র (র-ফলা) ম্ম (ম-ফলা) ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে ব-ফলার প্রয়োজন হইবে না—সে কথা পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। য-বর্ণ-মালায় থাকিবে না, কিন্তু য-ফলা রাখিতে হইবে,—র্-ফলাও থাকিবে—কিন্তু আর কোন ফলা থাকিবে না। অন্যান্য ফলাগুলি ভাঙিয়া লিখিলে কোন অসুবিধা হইবে না, যেমন,—অগ্নি=অগ্‌নি ইত্যাদি। যে ক্ষেত্রে ম-ফলা একেবারে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, সে ক্ষেত্রে বাদ দেওয়াই সম্ভবতঃ শোভন হইবে—বাস্তবিকই অনেকক্ষেত্রে ম-ফলা উচ্চারিত হয় না, যেমন আমরা "শ্মশান"-কে বলি "শশান", এরূপ অবস্থায় 'শশান' এইরূপ বানানে ক্ষতি কি? আবার, সংস্কৃতে "পদ্ম" কে পড়ি পদ্‌ম (অ)—বাংলায় পড়ি পদ্দঁ—শেষোক্ত বানানটি পূর্ব্বোক্ত বানান অপেক্ষা সরল নয়, এজন্য "পদ্ম" কে আমরা পদ্‌ম লিখিবারই পক্ষপাতী। বাঙালীর ছেলেরা 'রুক্মিনী' কে রুক্কিনী রূপে উচ্চারণ করে, মৌলিক উচ্চারণ 'রুক্‌মিনী'—সংযুক্তাক্ষর ভাঙিয়া লিখিলে 'রুক্‌মিনী'ই হইবে। যদি এই মৌলিক উচ্চারণে কাহারও আপত্তি থাকে তিনি উপরের ১ নিয়ম অনুসারে দুটি বর্ণকে সংযুক্ত করিয়াই না হয় উচ্চারণ করি-বেন। যে ক্ষেত্রে ম-ফলার স্বতন্ত্র উচ্চারণ আজিও প্রচলিত আছে সে ক্ষেত্রে ত কথাই নাই, যথা বাঙ্ময়=বাঙ্‌ময়, সম্মান=সম্‌মান।

(৪) ব্যঞ্জনের সহিত স্বরের এবং ব্যঞ্জনের সহিত ব্যঞ্জনের সংযোগ কালে কতকগুলি বর্ণের আকার বা রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, যথা গ+উ=গু, র্+উ=রু, হ্+উ =হু, ক্+র্=ক্র, ত+র=ত্র ইত্যাদি। এরূপ পরিবর্ত্তন উঠাইয়া দিয়া বর্ণের আকার সর্ব্বত্র সমান রাখিতে হইবে, যথা গ্‌, র্‌, হ্‌, ক্‌, ত্‌ ইত্যাদি। পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় অক্ষরের আকারের এইরূপ সমতা রাখিবার পক্ষপাতী। ইহাতে যেমন অনায়াসে শিখিবার সুবিধা তেমনি মুদ্রণ কার্য্যেরও সুবিধা হইবে।

(৫) উ-কার, ঋ-কার, র-ফলা প্রভৃতি চিহ্নগুলি অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া টাইপ ঢালাই হইয়া থাকে—এরূপ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেকটি টাইপ আলাদা থাকিবে—ছাপার সময় প্রয়োজনানুসারে বসাইয়া দিলে চলিবে, তাহাতে নীচে যদি একটু ফাঁক থাকে থাকিলই বা। যদি নিতান্ত অসুবিধা হয়, চিহ্নগুলি সুবিধা মত বদলাইয়া লইলেও চলিতে পারে। র-ফলা (্র) এইরূপ না লিখিয়া (•) বিন্দু চিহ্ন বা অন্য কোন সুবিধাজনক চিহ্ন দিয়া করিলে ক্ষতি কি? মুদ্রণ কার্য্যের জন্য চিহ্ন যেখানেই পরিবর্ত্তন করিলে সুবিধা হইবে সেখানেই আমরা পরিবর্ত্তনের পক্ষ-পাতী। তবে পরিবর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন হইবে বলিয়া বোধ হয় না—কারণ "কর্ন্" টাইপে* আজকাল ি ী ু প্রভৃতি জুড়িবার রীতি বর্ত্তমান আছে। সুতরাং মনে হয় "কর্ন্" টাইপে বাংলা ছাপার কাজ চলিতে পারিবে।

(৬) উচ্চারণের দিক দিয়া দেখিলে ক+ষ=ক্ষ স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে বর্ণমালায় স্থান পাইবার যোগ্য। সংস্কৃতে

*'কর্ন' টাইপ সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। শ্রীযুক্ত অজয় সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধে (পৌষ—১৩৩৯, ৩২৮ পৃঃ) দেখিলাম—" টাইপের যে অংশটুকু টাইপের ডাঁটার বা থামের (Stem or shank) উপর হইতে বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে তাহাকে ইংরাজীতে কার্ন (Kern) বলে। সেইজন্য যে টাইপে কার্ন থাকে, তাহাকে কার্নযুক্ত অক্ষর (Kerned letter) বলে। বাঙ্গালা টাইপ কেসে প্রায় সকল ব্যঞ্জন বর্ণের এবং তিন চারিটি স্বরবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কার্নযুক্ত দেহ আছে—এই-গুলিকে কম্পোজিটারেরা বাঙ্গালায় 'কর্ন' টাইপ বলে। টাইপগুলির আকার ঠিক মূল টাইপের মত, কেবল উপরে ও নিয়ে অল্প ফাঁক আছে,—যেখানে চন্দ্রবিন্দু, রেফ, হ্রস্ব ইকার বা দীর্ঘ-ঈকার বা ব-ফলা ইত্যাদি জুড়িয়া দিতে পারা যায়।

ইহার উচ্চারণ ক্+ষ্ এর মতোই হইয়া থাকে; যথা লক্ষ্মী=লক্ষ্মী—বাংলায় এরূপ উচ্চারণ প্রচলিত নাই। বাংলায় ইহা প্রাচীন কাল হইতে 'খ' এর ন্যায় এবং সময়ান্তরে ক্+খ্ এর ন্যায় উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। যথা, ক্ষীণ=খীন; ক্ষত=খত, চক্ষু=চক্‌খু, বৃক্ষ=বৃক্‌খ, শিক্ষা=শিক্‌খা। এই অনুসারে 'ক্ষ' কে বর্ণমালা হইতে বাদ দিয়াও কাজ চলিতে পারে না কি? যদি চলে, সুবিধা হইবে; তবে মুদ্রণের সময় একটি টাইপ বেশী লাগিবে; সুতরাং 'ক্ষ'-কে বর্ণমালায় স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে রাখা ভাল। অসুবিধার সৃষ্টি না হইলে, বাদ দিতে ক্ষতি কি?

(৭) ঞ-র সহিত জ অথবা চ-বর্গের কোন বর্ণ যুক্ত হইলে 'ঞ' ন-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, অঞ্চল=অন্‌চল, অঞ্জন=অন্‌জন, লাঞ্ছনা=লান্‌ছনা—অতএব ঞ'র পরিবর্ত্তে আমরা এরূপ ক্ষেত্রে ন দিয়া কাজ চালাইতে পারি। এরূপ বানান সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি থাকিলে, অঞ্‌চল, লাঞ্‌ছনা প্রভৃতি ঞ-তে হস্ চিহ্ন দিয়া লিখিতে পারিবেন কিন্তু পড়িতে হইবে উক্ত নিয়মানুসারে বর্ত্তমানের মত ঞ্ স্থানে ন্।

(৮) কিন্তু জ-এর সহিত ঞ যুক্ত হইলে বর্ণের আকার ও উচ্চারণ দুই-ই বদলাইয়া যায়—সুতরাং জ্+ঞ=জ্ঞ-কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে বর্ণমালায় এবং টাইপ কেসে রাখাই যুক্তি সঙ্গত। ইহার উচ্চারণ অনেকটা দ্বিত্ব গ-এর ন্যায়, যথা বিজ্ঞ=বিগ্‌গঁ। আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ কেহ 'জিজ্ঞেস্' স্থলে জিগ্‌গেস্ লিখিতেছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই জ্ঞ-কে বাদ দেওয়া বোধ হয় সম্ভবপর হইবে না—সেই জন্যই স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে বর্ণমালায় রাখিবার পক্ষপাতী।*

(৯) রেফ্ যুক্ত হইলে চ, ছ, জ, ত, দ, ধ, হ, ম, য ও ল বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়—যথা কর্দ্দম, কর্দম, অর্চ্চনা, অর্চনা ইত্যাদি। বাংলায় কিন্তু বরাবরই দ্বিত্ব হইয়া আসিয়াছে—বিদ্যানিধি মহাশয় ব্যতীত আর কাহাকেও দ্বিত্ব না করিয়া লিখিতে দেখিয়াছি কিনা মনে পড়িতেছে না। আমাদের প্রণালী অনুযায়ী এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিত্ব বর্ণ একেবারেই উঠাইয়া দিতে হইবে এবং রেফ স্থলে র-এ হস্ চিহ্ন দিয়া লিখিতে হইবে। (রেফ্-কার রাখা সুবিধা হইলে অবশ্য রেফ্ রাখা যাইতে পারে—পরে এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।) অতএব বর্ব্বর=বর্‌বর, বর্ত্তমান=বর্‌তমান, অর্জ্জুন=অর্‌জুন এইরূপ ভাবে বানান করিতে হইবে।

(১০) ধ্বনির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে সকল শব্দ অপেক্ষাকৃত সরলভাবে বানান করা চলিতে পারে সেই সকল শব্দের বানান সুবিধা ও প্রয়োজনানুসারে বদলাইয়া লইতে হইবে। ইহাতে বানান ও মুদ্রণ উভয় কার্য্যেরই সুবিধা হইবে। এরূপ সরলতর পদ্ধতিতে বানান করিবার রীতি কোন কোন শব্দের বেলায় বিকল্পে শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। যথা,—উপলক্ষ্য=উপলক্ষ, বাঙ্‌লায় দুইটিই শুদ্ধ। তেমনি ঊর্দ্ধ=ঊর্ধ, অন্তর্দ্ধান=অন্‌তর্ধান, ধৈর্য্য=ধৈর্জ, কার্য্য=কার্জ, সূর্য্য=সূর্জ, আচার্য্য—আচার্জ এইরূপ বানান করিবার রীতি প্রচলন করা সুবিধাজনক। রেফ্-কার না রাখিলে তৎ পরিবর্ত্তে র্ লিখিতে হইবে, যথা=ঊর্ধ=ঊর্‌ধ।

(১১) ঃ বিসর্গের পরস্থিত ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হইয়া থাকে, যথা দুঃখ=দুখ্‌খ; নিঃসন্দেহ=নিস্‌সন্দেহ এরূপ ক্ষেত্রে বিসর্গকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহার আবশ্যকতা নাই, কারণ স্বরের পর বিসর্গ বসাইতেই হইবে বলিয়া ইহাকে বর্ণমালা হইতে বাদ দেওয়া চলিবে না।*

(১২) যদিও রেফ্-কার রাখিবার প্রয়োজন নাই তথাচ সুবিধা হইলে আমরা রেফ-কার রাখিবার পক্ষপাতী। র্-এর স্থলে রেফ্ দিয়া কাজ চালাইয়া লইলে মুদ্রণের স্থান (space) একটু কম লাগিবে, আর কোন সুবিধা বিশেষ নাই। টাইপ রাইটারে টাইপ করিতে 'রেফ্' স্থলে 'র' হইলেই বোধ হয় সুবিধা হইবে।

(১৩) বাঙ্‌লা বর্ণমালায় ঋ এবং ঋ-কার এ দুটির প্রয়োজন খুব বেশী নাই। ঋ আমরা 'রি' এর মতই উচ্চারণ করি—কদাচিৎ একটু পার্থক্য হয়। শব্দের আদিতে ঋ লইয়া যে কটি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্‌লায় আসিয়াছিল আজ

*জিজ্ঞেস্ কে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়—"জিগ্‌গেস্" লিখিয়া থাকেন

*সাধারণতঃ, বস্তুতঃ, জ্ঞানতঃ প্রভৃতি তস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির অন্তেস্থিত বিসর্গ বাদ দেওয়া উচিত। আধুনিকেরা কেহ কেহ বাদ দিতেছেন দেখিয়াছি।

পর্য্যন্ত তদধিক একটি শব্দেও আমরা ঋ ব্যবহার করি না। এমন কি ইংরাজী river কথাটি পর্য্যন্ত বাংলা টাইপে লিখিতে হইলে আমরা 'ঋভার' না লিখিয়া 'রিভার'ই লিখি। সুতরাং ঋণ=রিণ, ঋতু=রিতু এইরূপ বানান করিলে ধ্বনির দিক দিয়া ক্ষতির কারণ দেখি না। ঋ-কারের প্রয়োগ স্থলেও আমরা র-ফলা দিয়া লিখিতে পারি—ইহাতে ক্ষতির আশঙ্কা নাই, থাকিলেও অতি সামান্য। পৃথিবীকে প্রিথিবি লিখিলে অনভ্যাস বশতঃ প্রথমতঃ একটু দৃষ্টিকটু হইতে পারে—কিন্তু লাভ হইবে অনেক—ঋ এবং রি-এর দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে।*

এখন দেখা যাক্ কতগুলি টাইপ হইলে বাংলা ভাষা মুদ্রিত করিতে পারা যাইবে।

স্বরবর্ণ যথা,—অ, ই, উ, ঋ, এ ঐ ও ঔ=সংখ্যা		৮
স্বরের চিহ্ন—া ি ু ৃ ে ৈ ী	= "	৭
ব্যঞ্জন বর্ণ,—ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ট, ঠ, ড, ঢ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ ব, ভ, ম। র, ল, হ, স। ং ঃ ঁ। ড় ঢ় য়, ক্ষ, জ্ঞ	— "	৩৬
ব্যঞ্জনের চিহ্ন—য-ফলা, র-ফলা	— "	২
মোট সংখ্যা		৫৩
ঋ, ঋ-কার ঞ বাদ দিলে ও রেফ কার রাখিলে—(৫৩+১-৩) সংখ্যা দাঁড়াইল		৫১

৫৩টি টাইপের যে হিসাব দেওয়া হইল তাহার মধ্যে ঞ-কে আমরা স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পারি—কারণ ঞ আমরা কদাচিৎ ব্যবহার করি এবং শব্দের আদিতে কোথাও ঞ নাই।

এখন কথা হইতেছে ইহাতে অসুবিধা হইবে কি না? যুক্তাক্ষর প্রণালী বর্জ্জিত হওয়ায় ছাপিবার স্থান সামান্য একটু বেশি লাগিবে তজ্জন্য যে সামান্য ক্ষতি হইবে, ইহার অন্যান্য দিকের উপযোগিতার কথা বিবেচনা করিয়া সে ক্ষতি স্বীকার করা ব্যতীত উপায় কি? মুদ্রাকরের সময় একটু যেমন বেশি লাগিবে, তেমনি অনেক অসুবিধার হাত হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইবেন। প্রুফ রীডারদেরও অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে। পাঠক বা লেখকেরও কোন অসুবিধা হইবার কথা নয়—এ প্রণালীতে অভ্যস্ত হইতে একদিনের বেশি সময় লাগিবে না। প্রথমটা একটু অস্বস্তি বোধ করিলেও পরে আরাম পাইবেন।

ইংরাজী বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা ২৬টি, Capital ও Small letters ধরিলে হয় ৫২টি—সুতরাং উপরিউক্ত প্রণালী অনুসারে ভাল বাঙলা টাইপ রাইটার সৃষ্টি হইতে পারে। স্বর ও ব্যঞ্জনের চিহ্নগুলি একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে আরও ভাল হয়। নাগরীতে কে কৈ কো কৌ লিখিতে যথাক্রমে के कै को कौ এইরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়—বাংলায় এরূপ চিহ্ন প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক সুবিধা হইবে, Space বা স্থান একটু কম লাগিবে তাছাড়া লিখিবারও সুবিধা যথেষ্ট—এরূপ পরিবর্ত্তন যুক্তিসঙ্গতও বটে। শব্দের ডাহিন দিকে চিহ্ন থাকায় টাইপ-রাইটারে অনায়াসে টাইপ করা যাইবে—কারণ যেমন আগে উচ্চারণ করি ক, পরে বলি ও=কো, তেমনি কো টাইপ করিতে আগে ক-পরে ও-কার চিহ্ন বসাইতে পারা যাইবে এবং সেইরূপই হওয়া উচিত। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে আগে এ-কার পরে ক এবং তৎপরে আ-কার চিহ্ন বসাইয়া 'কো' টাইপ করা মারাত্মক অসুবিধা। তেমনি ই-কারকেও পরিবর্ত্তন করিয়া ডাহিন দিকে বসাইবার মত করিয়া লইতে পারিলে, প্রথমটা হাস্যকর হইলেও, ভাল হইবে।

ইংরাজী টাইপ কেসে মোট টাইপ থাকে ১৬০ প্রকারের, বাংলায় এই প্রণালী অনুসারে টাইপের সংখ্যা হইবে ৫৩+৪৯ (সংখ্যা, চিহ্ন, কমা, বিরাম চিহ্ন, স্পেস

---

* শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় প্রবাসীতে (ভাদ্র ১৩৪০, ৬৪৬ পৃঃ), ঋ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "ঋ-কারের রি উচ্চারণ বাংলা দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত। পৈতৃক এবং পৈত্রিক দুই শুদ্ধ।" পরে পুনরায় বলিতেছেন যে, "যাহারা ভাল লেখাপড়া শেখে নাই তাহারা প্রির স্থানে পৃয় লিখিলে প্রতিবাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু শিক্ষিত লোক যখন মসৃণ, সরীসৃপ সদৃশ, জন্তুগৃহকে, মস্রিণ, সরীস্রিপ সদ্রিশ, জন্তুগ্রিহ রূপ উচ্চারণ করেন তখন তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। ঋ-র উচ্চারণ রূ ই হউক, বা রি-ই হউক উহা ব্যঞ্জনস্পৃষ্ট নহে।"

মাত্র দু-একটি ক্ষেত্রে আমরা ঋ-কারের প্রকৃত উচ্চারণ করি—অধিকাংশ স্থলেই করিতে অভ্যস্ত নই। সেই জন্য দু-একটা কথার বেলায় বিশেষ উচ্চারণ মানিয়া লইলেই চলিবে—যেমন অনেক কথার সম্পর্কে আমরা বর্ত্তমানে বিশেষ উচ্চারণ মানিয়া লইয়াছি।

ইত্যাদি ৭ বর্ত্তমান বাংলা টাইপ কেসে ৪৯ টি টাইপ রক্ষিত হয়)=১০২; অর্থাৎ ইংরাজী টাইপ কেস্ অপেক্ষা বাংলা টাইপ কেসে ৫৮টি টাইপ কম থাকিবে। * ইংরাজী টাইপ কেসে ১৬০টি টাইপ থাকাতেও যখন কোনরূপ অসুবিধার কথা শুনা যায়না তখন বাংলার আরও কিছু টাইপ বাড়াইয়া ১৬০টি করিলে মুদ্রণ কার্য্যের সময় অপেক্ষাকৃত কম লাগিবে। অর্থাৎ কম্পোজিটরদের কম্পোজ করিতে সময় একটু কম লাগিবে)।

বর্ত্তমান টাইপ-কেসে ব্যঞ্জনবর্ণের অ-কারান্ত টাইপ ব্যতীতও হসন্তযুক্ত টাইপ রাখিতে হয়—অর্থাৎ ক একটি টাইপ, ক্ আর একটি টাইপ। আমরা যে প্রণালীর আলোচনা করিলাম তাহাতে স্বতন্ত্র হসন্তযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ রাখিতে হইবে না—বর্ণের নীচে হসন্ত জুড়িতে হইবে, ইহাতে সময় একটু বেশী লাগিবে। যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত হওয়ায় হসন্তযুক্ত টাইপের প্রয়োজনও অনেক বেশী হইবে সন্দেহ নাই—এ-কারণ প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনের (যাহা হসন্ত হইয়া ব্যবহৃত হইতে পারে) সঙ্গে হসন্ত চিহ্ন জুড়িয়া আর এক সেট্ টাইপ, কেসে রাখিলে আর হসন্ত চিহ্ন জুড়িবার প্রয়োজন হইবে না—পরিশ্রম একটু বাঁচিয়া যাইবে। এরূপ হসন্তযুক্ত ব্যঞ্জনের সংখ্যা ২৩টির অধিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। (৩৬টি ব্যঞ্জনের যে হিসাব হইয়াছে তাহার মধ্য হইতে ঘ, ঝ, ঢ, ক্ষ, হ, ং, ঃ, ঁ, ড়, ঢ়, য়, ক্ষ, জ্ঞ এই কয়টি বর্ণের স্বতন্ত্র হসন্ত যুক্ত টাইপ রাখিবার প্রয়োজন নাই,—সুতরাং ৩৬-১৩=২৩টি হসন্ত যুক্ত টাইপ রাখিলেই চলিবে)। এদিক দিয়া দেখিলেও টাইপের সংখ্যা মাত্র ৫৩+৪৯+২৩=১২৫টির অধিক হইবে না। মুদ্রণ কার্য্যের আরও একটু সুবিধা করিতে হইলে স্বর বা ব্যঞ্জনের যে যে চিহ্ন টাইপের সঙ্গে সংযুক্ত করিলে ভাল ভাবে মিশিতে পারে না সেই বা সেই সেই চিহ্নগুলি টাইপের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া আর ২।১ সেট্ টাইপ রাখা যাইতে পারে। যেমন, র-ফলাদি টাইপের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে বসাইতে গেলে নীচে একটু ফাঁক থাকে—অতএব র-ফলা সংযুক্ত করিয়া আর এক সেট্ টাইপ করিয়া লইলে চলিবে। যাহা হউক ১০০ বা ১০২, অথবা ১২৫ বা ১৬০টির যে কোন ভাগটি অধিক সুবিধাজনক হয় তাহাই লইয়া বাঙ্‌লা টাইপ কেস্ গঠিত হইতে পারে।

ভাষাকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত এবং অল্প সময়ে ও অনায়াসে অধিক সংখ্যক লোকের কাজে লাগাইবার জন্য অনেক ভাষাতেই সংস্কারের প্রয়াস চলিতেছে—সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাংলা বর্ণমালার প্রস্তাবিত সংস্কার কার্য্যে পরিণত হইলে বিদেশী লোকের পক্ষে ভাষা শিক্ষার প্রকাণ্ড অন্তরায় দূরীভূত হইবে—বাঙালীর ভবিষ্যৎ শিশুদিগকে দুর্ব্বহ বোঝা হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইবে এবং সকলের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ হইবে। বাঙ্‌লার প্রকাণ্ড দাবী থাকা সত্ত্বেও আজ হিন্দুস্থানী ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে বসিয়াছে—আজ যদি বাংলা শিক্ষার পদ্ধতি সরলতর হয় তাহা হইলে বাংলার দাবী অন্য প্রদেশ বাসীরা শুধু মাত্র গলার জোরে উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

আমাদের প্রস্তাবে ভাষার কার্য্যকারিতা ও শক্তি নষ্ট না হইলে কথা উঠিবে এ সংস্কার কিরূপে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব।

তুরস্কের বর্ণমালার যেরূপ আমূল পরিবর্ত্তন দ্রুত সম্ভব পর হইবে তাহাতে বাঙ্‌লাই বা না হইবে কেন? তুরস্কের তুলনায় বাংলার প্রস্তাবিত সংস্কার নিতান্তই নগণ্য। অবশ্য তুরস্কের সংস্কারের পশ্চাতে যে প্রচণ্ড রাজশক্তি কাজ করিয়াছে বাংলায় তাহা নাই—কিন্তু বড় আশার কথা বাঙালীর মনোরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে আছেন—যিনি বাঙ্‌লা ভাষাকে আজও নব নব রূপে পল্লবিত করিয়া সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় অর্জ্জন করিতেছেন। তা-ছাড়া আরও বহু চিন্তাশীল সাহিত্যিক, ভাষাতত্ত্ববিৎ ও সাংবাদিক রহিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া দেশের প্রথিতযশা পণ্ডিত ও সাংবাদিকগণকে লইয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারেন। এবং এই প্রস্তাবিত সংস্কার অসঙ্গত না হইলে উক্ত পরিষদ অল্পকালের মধ্যেই এ প্রণালীকে সম্পূর্ণতা দিতে পারেন এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়েও উহা আইন-সঙ্গত করাইয়া লইতে পারেন। *

শ্রীসুধীর মিত্র

---

* ঋ, ঋ-কার, ৯ বাদ দিলে টাইপ হইবে ৫১+৪৯=১০০টি; ইংরাজী কেস্ অপেক্ষা ৬০টি কম।

* পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদে পঠিত।

জন্মগত

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

বাপ মায়ের একমাত্র ছেলে।—লোকে বলে, "সবে ধন নীলমণি।" ছেলেবেলায় চেহারা ছিল বেশ গোলগাল; তাই, মা আদর করে' নাম রেখেছিল, আলু।

তারপর কত বচ্ছর কেটে গিয়েছে; মা-ও নেই, বাপও নেই, কিন্তু তাঁদের দেওয়া আদরের নামটি ঠিক বাহাল আছে।

এখন তা'র বচ্ছর চব্বিশ বয়স; দীর্ঘ, ঋজু, রুক্ষ শরীর; মাথায় তৈলনিষিক্ত চুলে তেড়ি কাটা। মুখের তীক্ষ্ণ রেখায় রেখায় নানা অভাবের, দুশ্চিন্তার, জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস সুস্পষ্ট।

ছেলেরা এখন তা'র চেহারার কথা তুলে উপহাস করে; বলে,—আলু না চিঁচিঙ্গে।

গয়লাপাড়ার বস্তির একখানা জীর্ণ খোলার ঘর।—

ঘর না গহ্বর! যেমন অন্ধকার, তেমনি স্যাঁৎসেঁতে—আলো বাতাসের প্রবেশ নিষেধ। ঘরের প্রবেশ-পথের মুখেই কাঁচা নর্দ্দমা,—পল্লীর যাবতীয় ধনী দরিদ্রের বাড়ীর যত পঙ্কিল জল নির্গমের পথ। আশপাশের দরমা দেওয়া ঘরে হিন্দুস্থানী মুচিরা জুতো তৈরী করে। কাঁচা চামড়া আর পচা পাঁকের দুর্গন্ধে বাতাস ভারি হ'য়ে ওঠে। মুচিরা সসম্ভ্রমে ঘরটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' বলে,—আলুবাবুকো ডেরা।

আলু কখন ঘরে থাকে, আর কখন থাকে না, বলা বড় কঠিন। মাঝে মাঝে দিন দুই চার অন্তর্ধান হয়, তারপর হঠাৎ একদিন হয় ত' ধূমকেতুর মতন উদয় হয়; দিন দুই চার তাঁকে দেখা যায়, তারপর আবার বন্ধ ঘরে তালা ঝুলতে থাকে।

তাঁকে কেন্দ্র করে' পাড়ার ইতর ভদ্রের কৌতূহলের আর সীমা নেই। কোথায় তা'র বাড়ী? কী করে সে?…

সে কিন্তু স্বচ্ছন্দে সকলের প্রশ্ন সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। দাঁত বা'র করে' হাসতে হাসতে বলে,—হেঁ হেঁ, কি জানেন, আমার আবার বাড়ী; নিজেই ভুলে গেছি;—স্রোতের ফুল মশাই, স্রোতের ফুল, যখন যে ঘাটে লাগি।—বলে' আর সেখানে দাঁড়ায় না।

সেদিন সকালবেলা আলু গায়ে কাপড়টা জড়িয়ে দাঁতন করতে করতে সাহাবাবুদের বাড়ী গিয়ে হাঁক দিল,—বলি, কই হে কালাচাঁদ, বেশ করে' এক ছিলিম তামাক সাজো ত' বাবা,—মুখটা ততক্ষণ আমি ঝাঁ করে' ধুয়ে নিচ্ছি;…বাবুদের এখনও সকাল হয়নি' না কি হে?…

আপনি আজকার দিনটা তামুক খেয়ে নাও বাবু,—কালাচাঁদ বললে,—তামুকের পাট বোধ হয় এবার এখান থেকে উঠলো; আজকার মতন সেজে দিচ্ছি, কিন্তু বাবুরা ঘুম হ'তে উঠবার আগেই…

সে অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যের বাকীটুকু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে।

আলু যেন আকাশ থেকে পড়ল। বাধা দিয়ে বললে,—কেন হে,—কি ব্যাপার কি?

কালাচাঁদ তা'কে হাত পা নেড়ে, নানারকম মুখভঙ্গী করে' যা বুঝিয়ে দিলে, সোজা কথায় তা'র ভাবার্থ হ'চ্ছে এই যে, কাল থেকে বৈঠকখানা ঘরের কতকগুলি মূল্যবান্ ফ্যান্সি জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে না, এবং বাবুদের বিশ্বাস পাড়ার কোন জানাশোনা লোকই সেখানে আড্ডা দিতে এসে, সেগুলিকে চক্ষুদান দিয়েছে; সেইজন্য বাবুদের কড়া হুকুম আর কাউকে সে ঘরে আড্ডা জমাতে দেওয়া হবে না।

চৌবাচ্চার জলে আলুর ততক্ষণে মুখ ধোয়া হ'য়ে গেছে। সে কাপড়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে,—তাই ত', সত্যিই ত,'—সে কথা এককড়িবাবু একশ' বার বলতে পারেন,—এ ত'

রাগ হবারই কথা ;···তা' বই, দাও দাও, দু'টো টান দিয়ে নি'।

আলু তামাক খেতে সুরু করে' দিলে। আর কালাচাঁদ মনে মনে ভাঁজতে লাগল, সে কি করে' আলুকে এ অপ্রিয় সত্যটুকু জানাবে যে বাবু তা'কেই বিশেষ করে' এই চুরির জন্ম সন্দেহ করেছেন।

আলুও কপট নির্লিপ্ততার অন্তরালে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, —বাবুরা কেউ সে সময়ে দেখতে পায়নি ত' ?

আগেই বলা হ'য়েছে ছেলেবেলায় আলু দেখতে বেশ নধর গোলগাল ছিল ; তার ওপর তা'র গায়ের রঙ ছিল ধব্‌ধবে ফরসা, আর কথাবার্ত্তাও ছিল তার ভারি মিষ্টি।

কিন্তু তা'র জন্মক্ষণে কি দোষ ছিল কে জানে, সেই বয়স থেকেই কেউ তা'র সঙ্গ তেমন পছন্দ ক'রত না। অবশ্য তা'র যে কোন একটা কারণ ছিল না এমন নয়। তা'র বয়স যখন মাত্র ছ' বছর, সেই সময় সে প্রথম তা'র বাবার পকেট থেকে না বলে' পয়সা তুলে নিয়ে খরচ করেছিল, আর সে কথা পরে বাবাকে বলাও আবশ্যক বোধ করেনি। কিন্তু তার গ্রহবৈগুণ্যে সেই গোপন কথা পরে জানাজানি হয়ে যায় ও তা'র অর্ব্বাচীন বালক সঙ্গীরা সেই সূত্রে তা'র ওপর নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত বিশেষণ আরোপ করতে থাকে।

তারপর যখন তা'র বছর চোদ্দ বয়স, গ্রামের স্কুলে পড়ে, সেই সময়ে ষ্টেশনে এক যাত্রীর ব্যাগসংক্রান্ত কি একটা গোলমালের জন্ম এক দুষ্টবুদ্ধি পাহারাওয়ালা অত লোকের মধ্য থেকে কে জানে কেন তাকেই গ্রেপ্তার করে। থানায় গিয়ে বিচিত্র সুরে তা'র সে কী কান্না !—ওগো, বাবুগো, এবার আমায় ছেড়ে দাও ;···আমি কখনও এমন কাজ করি নি,' আর করবও না কখনও,···পায়ে পড়ছি তোমাদের বাবু···আমি ভদ্দর লোকের ছেলে···

প্রথম অপরাধী ও নিতান্ত বালক দেখে দারোগা তা'কে খুব ভর্ৎসনা করে' ও ভবিষ্যতে সাবধান হওয়ার উপদেশ দিয়ে সেবারকার মতন ছেড়ে দিয়েছিল। পাড়ার সকলে মনে করলে এবার বোধ হয় আলুর শিক্ষা হয়েছে, আর সে ওপথে পা বাড়াবে না। কিন্তু এর পর মাস দুই তিন যেতে না যেতেই সে একদিন তা'র এক দূর সম্পর্কের মামার বাড়ী যায় ও সেখানে নিজের পরিচয় দিয়ে যথেষ্ট আদর যত্ন আদায় করে। সেখান থেকে ফিরে আসার পর দিনকতক সকলেই তার বেশভূষার পারিপাট্য দেখে অবাক হয়ে' গেল ; আর ওদিকে তার মামার বাড়ীতেও কতকগুলো কি জিনিষপত্র আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশ্য দুষ্টলোকে কার্য্য কারণ বিচার করে' এই প্রসঙ্গে অনেক রকম অপ্রিয় কথা বলত কিন্তু আলু সে সব কথায় কর্ণপাত করত না।

এক একজনের ওপর পুলিশের লোকের কেমন যেন একটা জাতক্রোধ থাকে ; একটা যেমন তেমন সামান্ত ছুতো পেলেই তা'রা তাকে নানারকমে অপদস্থ করতে ছাড়ে না।

না হ'লে সেবার কতকগুলো পাহারাওয়ালার হাতে আলুকে অমন নির্য্যাতন সইতে হয় ? আলু তবু তাদে বোঝাবার জন্ম চেষ্টার কসুর করে নি ; —ভিড়ের মধ্যে অমন ভুল অনেকেরই হয় ;—নিজের জামার পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে অপরের পকেটে কি আর অজান্তে হাত ঢুকে যায় না ? না, নিজের পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলছি মনে করে', লোকে অমন ভিড়ে পাশের লোকের পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলে ফেলে না ?···ভুল কার না হয় ?···মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, ইত্যাদি।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। তার এত জ্ঞানগর্ভ বাণী সবই বৃথা হ'ল। তারা রাস্তার ওপর দিয়ে তাকে রুলের গুঁতো দিতে দিতে টানতে টানতে থানায় নিয়ে গেল আর সমস্ত রাত্রি হাজতে থাকবার সুব্যবস্থা করে দিলে।

পরের দিন তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে এনে হাকিমের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতেই, সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে, হাত দিয়ে কপাল চাপড়াতে লাগল,—হুজুর, আমি বাঁশবেড়ের বাঁড়ুয্যেগুষ্টির ছেলে,···ডাকসাইটে বংশ আমাদের, সবাই জানে,···হায়, হায়, হায়, কত বড় ঘরের ভদ্দরলোকের ছেলে আমি···লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারব না···

হাকিমের হুকুমে তার পক্ষকাল কারাদণ্ড হ'ল।

সেই তার প্রথম কারাবাস।

নির্দ্দিষ্টকাল কারাভোগের পর প্রথম যেদিন সে মুক্তিলাভ করল, তার মুখে লজ্জার অথবা অনুতাপের ক্ষীণতম ছায়াও দেখা গেল না। সে যেন তীর্থ পর্য্যটনের পর বাড়ী ফিরছে, এমনি নিশ্চিন্ত প্রশান্তি তা'র ব্যবহারে।

পরে আরও কতবার এই একই অপরাধে তাকে পুলিশ ও আদালতের হাতে কত শাস্তিই মাথা পেতে নিতে হয়েছে, কতবার কত কারাবাসই করতে হয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই।

লোকলজ্জা অথবা অনুতাপ, ওসব এখন আর তার আসে না। লোকের উপহাসে অথবা কলঙ্কে বিচলিত হওয়ার মতন মানসিক দৌর্ব্বল্য এখন আর তা'র নেই।

হাতের কাছে পরের কোন জিনিষ সুবিধামত অবস্থায় দেখলে সে অবলীলাক্রমে সেটিকে করায়ত্ত করতে দ্বিধাবোধ করে না।

মহম্মদ মহসীনের বিষয়ে শোনা যায়, তাঁর ডান হাত যা' দান করত, বাম হাত তা' জানতে পারত না। আলুরও এখন কতকটা তাই। সে এক হাতে যে জিনিষকে চক্ষুদান করে, তার অপর হাত তা' জানতে পারে না। এমনি সহজ, অকুণ্ঠিত, অনাড়ম্বর ও বিজ্ঞানসম্মত তার কার্য্য-প্রণালী।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে আলু বাড়ী ফিরছে; দিনটা প্রায় বৃথাই গেছে, রোজগারপাতি কিছুই হয়নি,—সুবিধামত শিকারও জোটেনি,—ঘরে রেস্তও তেমন কিছু নেই। মনটা খুব খারাপ।

অপ্রসন্ন মনে পথ চলতে চলতে হঠাৎ তার কানে এল কে যেন শিশুকণ্ঠে তা'কে ডাকছে,—মামা, ও মামা, আলুমামা, শুনছেন…

প্রথমটা সে ডাকে সাড়া দেয় নি। তা'কে আবার পথে ডেকে কথা কইবে, এমন বালক ত' কেউ নেই। এই জনবহুল রাজপথে কে হয়ত' কাকে ডাকছে। কিন্তু যখন তার নিজের নাম কানে এল, তখন সে আর না ফিরে পারল না। ছেলেটি ততক্ষণে ছুটে এসে তার হাত ধরেছে।—মামাবাবু, আপনাকে মা ডাকছেন,…ঐ যে, ঐখানে, মোটরের সাম্নে দাঁড়িয়ে,… চলুন না…

আলু ছেলেটির সঙ্গে এগিয়ে চলল।

—কি আলু, চিনতে পারো ভাই?…দেখেও ত' দেখ না,…বেশ যা' হোক্। প্রসন্ন হাসির দীপ্তিতে সুধার মুখ তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বিস্ময়! অপার বিস্ময়! আলু কিছুক্ষণ অভিভূত হ'য়ে রইল। সেই সুধাদি! যাকে ছেলেবেলায় সে সত্যিই নিজের সহোদরা বলেই জানত; সেই সুধাদিই তার সাম্নে দাঁড়িয়ে তাকে পরমাত্মীয়ের মতন সস্নেহে আহ্বান করছেন।

হাঁ, ছেলেবেলায় সুধাদির রূপের সুখ্যাতি ছিল বটে; কিন্তু তখন সে রূপের কিই বা বুঝত? এখন বুঝছে হাঁ, রূপ বটে; বাঙালী মেয়ের মধ্যে হাজারকরা একটাও বিরল। রূপ ত' নয়, অগ্নি-শিখা!

—কি ভাই, দিদিকে কি চিনতেই পারলে না নাকি?…পরিচয় দিতে হবে? সুধা খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন এক টুক্‌রো নদী হঠাৎ কথা ক'য়ে ফেলেছে।

আলুর হতভম্বভাব তখনও ঠিক কাটে নি। সে আম্‌তা আম্‌তা করে বললে—আপনি…সুধাদি…এখানে…

—এখানে এসেছিলাম ভাই, গোটাকতক জিনিষ কিনতে ওঁর জন্যে…মানে, উনি আবার কাল আগ্রা যাচ্ছেন কিনা কি কাজে।…শুনলাম নাকি খুড়িমা মারা গেছেন? কত খোঁজ করেছিলাম, তোমার কিন্তু সন্ধান পাইনি।…তা' তুমি এখন কোথায় আছ?…এমন রোগা আর ঢ্যাঙা হয়েছ যে আর চেনাই যায় না।…আমি প্রথমটা ত' চিনতে পারিও নি;—তারপর যখন চিনলাম, অজিতকে বললাম,—ডাক, ডাক্, তোর আলু মামাকে, ঐ বুঝি চলে গেল।…ছেলেবেলায় কেমন গোলগাল নেটিপেটি ছিলে।…ক'দ্দুর যাবে? চল না, আমার সঙ্গে মোটরে, নামিয়ে দেব 'খন।…ও, তুমি ওদিকে যাবে না?…আচ্ছা, তা হ'লে ভাই, তুমি কবে আমার বাড়ী যাবে বল?…যেতেই হবে কিন্তু একদিন।

আলু তার সেই শৈশবের সুধাদি'কে আজ যেন নবরূপে দেখলে। শান্ত, সরলা, গ্রাম্য বালিকা নয়; যেন লীলাচঞ্চলা নির্ঝরিণী, স্বচ্ছ স্রোতে বেগবতী। যৌবনশ্রীতে সমস্ত শরীর দীপ্ত।

নিজেকে সহসা আজ অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য ব'লে তার মনে

হ'ল। সে যেন আজ নিজেকে এই মহিমময়ী নারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখ হ'তে লুপ্ত করে' দিতে চায়।

অতি ভয়ে ভয়ে ক্ষীণকণ্ঠে সে বললে,—কবে যাব বলুন, যেদিন বলবেন…

—যেদিন ব'লব ? তোমায় বুঝি না বললে তুমি যাবে না ? দিদির কাছে ভাই যাবে, তার আবার ··ওই দেখ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালই হয়েছে,—কাল বাদ পরশু যে ভাই ফোঁটা, …যেও, তুমি যেও ; পরশুই যেও তাহ'লে ; সকালে আমার ওখানেই খাবে।…ভুলো না যেন ভাই, হ্যাঁ কেমন ?…ও, তোমায় আমার ঠিকানাটাই বলা হয় নি ; আচ্ছা, এই যে, আমার হ্যাণ্ডব্যাগেই কার্ড আছে। এই নাও ভাই, এই কার্ডেই আমার ঠিকানা দেওয়া আছে, বাড়ী খুঁজে পেতে কিছু কষ্ট হবে না ;…যেও তা'হ'লে নিশ্চয়ই ; মনে থাকবে ত' ? কবে যাবে বল দিকি ?

—পরশু।

হ্যাঁ, পরশু ;…আচ্ছা, আজ আসি তাহ'লে।… ড্রাইভার !

যতক্ষণ না মোটরটা দৃষ্টিপথের বাইরে বিলীন হ'য়ে গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আলু একভাবে সেইখানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তারপর নিজের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার "ডেরা"র দিকে পা চালিয়ে দিলে।

সারা রাত্রি খাটিয়ায় শুয়ে ছটফট করে।—চোখে ঘুম নেই ;—মাথার মধ্যে যেন আগুন লেগেছে। সমস্ত মনো-রাজ্যে যেন সেই চিন্তাটিই একাধিপত্য করতে চায়।—

সুধাদি !—সুধাদি ! সেই বাল্যকালের একান্ত আপনার সুধাদি ! এই কলকোলাহলময়ী সহরের জনারণ্যের মধ্যে কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল ?…বেশভূষায়, চলনে, বলনে, আভিজাত্য যেন ঠিক্‌রে পড়ছে ; নোতুন ফিয়েট্ গাড়ীটা, ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে ;—বাড়ীটাও নিশ্চয় তাই। না জানি, তাতে' কত সৌখীন আসবাবপত্র আছে।…তা' আছে বই কি।…কিন্তু থাকলেই বা ; তা'তে আর কা'র কি।… একদিন হয় ত' তিনি আত্মগরিমা চরিতার্থ করার জন্যে নিজের সুখ ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে, দুটো মিষ্টি কথা বলে, কি না হয় একপাত লুচি খাইয়ে ছেড়ে দেবেন ; তারপর ?… তারপর তার ত' আবার সেই এঁদোপড়া কদর্য্য বস্তি।… হাঁঃ, দিদি—দিদি না কচু ; এক দিনের চাল মারবার দিদি। …আচ্ছা, বেশ ত', পরশু একবার যাওয়াই যাবে ; দেখাই যাক্ না। তারপর যদি সুবিধা হয় ত' এক আধটা দামি কোন জিনিষ চাদরের মধ্যে ক'রে ……হ্যাঁ, বেশ হবে, চাদরটা গায়ে দিয়েই যেতে হবে,—সেই ভাল। কালকের দিনটা গেলে হয় ;…একটা দাঁও কি আর না জুটবে ?…

ভাবতে ভাবতে আলু মধ্যরাত্রির পর ঘুমিয়ে প'ড়ল।

অজিত লোহার ফটকের পাশে লাল কাঁকর দেওয়া রাস্তায় খেলা করতে করতে হঠাৎ কলকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠল,—ওমা, মামাবাবু এসেছেন ; এই যে মামাবাবু, এই দিকে আসুন…

বাড়ীর ভেতর থেকে সুধার গলা শোনা গেল ;—কে, আলু এসেছে ? ওকে ভেতরে নিয়ে এস ত' বাবা।

আলু অবাক্ হ'য়ে দেখে। খাসা বাড়ীটি। বাংলো ধরণের একতলা বাড়ী ; রাণীগঞ্জ টালি দিয়ে ছাওয়া ছাত। সদর দরজার দুই পাশ দিয়ে লতানো গাছ উপরে উঠে গেছে। চারিধারে সবুজ মখমলের মতন খোলা জমি। ফুলের বাগানে অজস্র নাম-না-জানা রঙীন ফুল ফুটে আছে ; দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। চমৎকার বাড়ী ; পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন অথচ অনাড়ম্বর।

সুধার সে অদৃষ্টপূর্ব্ব কর্ম্মোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখে আলু অবাক হ'য়ে গেল।

অবাক হওয়ারই কথা। সে যেন সুধার আর এক রূপ। বোধ হয় সে স্নানান্তে রান্নাঘরে ঢুকেছিল ; ভিজে একরাশ এলো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ; মাথায় অল্প একটু ঘোমটা। আগুনের তাপে আরক্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা ফুটে উঠে মুখখানিকে যেন শিশিরস্নাত কমলের মতন স্নিগ্ধ কমনীয় ক'রে তুলেছে। সেদিন যেখানে ছিল সমৃদ্ধির অকারণ সমারোহ, আজ সেখানে সংযম ও সুশোভন শুচিতা ; সেদিন যে দৃষ্টিতে ছিল উদ্ধত উত্তেজনা. আজ সেখানে মৌন স্নেহ ; সেদিন শরীরের রেখাগুলি ছিল কঠিন, আজ কোমল।

সুধা রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে মধুর একটু হেসে বললে,—

শুধু পায়সটা বাকী ছিল ভাই, এইবার হ'য়ে গেল।...সেই কোন্ রাত থাকতে উঠে হেঁসেলে ঢুকেছি, তাই না সেরে উঠতে পারলাম।...একটু ব'স ভাই, চট্ করে তোমার আসনটা করে' দিয়ে আসি।

খানিক পরেই এসে বল্লে,—এস ভাই, তোমার আবার আপিস আছে ;...বোধ হয় একটু বেলা হ'য়ে গেল ;...তা' একদিন অমন একটু বেলা...

আলু বাধা দিয়ে বল্লে,—নাঃ, চাকরি আর কোথায় ?

—কেন ? তাহ'লে কি কর ? দাঁড়াও, দাঁড়াও, এখুনি খেতে ব'স না ;—বারে, ভাই ফোঁটার দিন নতুন কাপড় পরতে হয় বুঝি জান না ?... এই নাও, এই নোতুন ধুতি, চাদর আর পাঞ্জাবী প'রে খেতে ব'স। ছাড়া কাপড়-গুলো বাইরে উঠোনে ফেলে দাও, বড় ময়লা হ'য়েছে, কাচিয়ে দেব' খন।...আবার একটা চাদর ঘাড়ে ক'রে এসেছ কেন ? ...তুমি কাপড় ছাড়, আমি আসছি।

সুধার মুখে চাদরের উল্লেখ শুনে আলু চম্‌কে উঠলো। ছি, ছি, এই সুধাদি'র বাড়ী সে এসেছে চুরি করতে! লজ্জায় সে সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠল।

সুধা এক সেট নোতুন সোনার বোতাম এনে বললে,—নাও, হাত পাতো ; এই বোতাম আমি তোমাকে দিলাম, যা'তে দিদিকে কখনও অন্ততঃ মনে পড়ে। জামায় ঐ বোতাম লাগিয়ে নাও ;—হয়েছে ? আচ্ছা এইবার খেতে বস'।

আলু অবাক ;—স্বপ্ন দেখছে নাকি ? সে যন্ত্রচালিতের মতন আহার আরম্ভ করে দিলে। বিস্ময়, লজ্জা, আনন্দ, অনুতাপ প্রভৃতি নানা বিরুদ্ধভাবের সমন্বয়ে তখন তার কণ্ঠতালু যেন শুকিয়ে উঠেছে।

—কেমন হয়েছে ভাই রান্না ?

—বেশ, চ-ম-ৎ-কা-র,—আলু বলে,—আপনি নিজেই কি বরাবর রাঁধেন নাকি ?

—ওমা, শোনো কথা ; তা রাঁধব না ?...উড়ে বামুনের হাতে উনি খাবেন, আর আমি হাত পা গুটিয়ে তাই বুঝি চেয়ে চেয়ে দেখব ? তা' কখনও হয় ?

আলু লজ্জিত হ'য়ে বলে,—তবে কষ্ট ক'রে এত—মানে মিছামিছি...

সুধা বাধা দিয়ে বলে,—বটে ? মিছামিছিই বটে। তোমরা পুরুষ মানুষ, ঠিক্ হয় ত' বুঝবে না ; কিন্তু বচ্ছরের এই একটি দিন, আমাদের কাছে যে কি !...এখন তুমি বড় হয়েছ, কিন্তু এমন একদিন ছিল ভাই, যেদিন তুমি আমাকে আপনার দিদি বলেই জানতে।...ও কি না না, ও মিষ্টিটা ফেল না ; লক্ষ্মীটি খেয়ে ফেল।...আচ্ছা, হ্যাঁ, ভাল কথা ; তোমার চাক্‌রি বাক্‌রি নেই বলছিলে না ? তবে তোমার এখন ত' বড় কষ্ট ? তা হ্যাঁ, দেখ, কিছু মনে ক'র না, যদি কখন টাকাকড়ির দরকার হয়,—কথায় বলছি,—আমার কাছে এস', লজ্জা কর না।...পায়সটা সব খেয়ে ফেল।... আর ওঁকে তোমার একটা চাকরীর জন্যেও বলব'খন।—ওরে, ও রামধনিয়া, বাবুর হাতে জল দেনা।—

আহারের পর দীর্ঘকাল বিশ্রাম ক'রে, আলু যখন তার সুধাদি'কে নমস্কার ক'রে রাস্তায় বার হ'ল, তখন তার বিবেক তার অন্তরকে রীতিমত কশাঘাত করছে। ছি, ছি, সেদিন রাত্রে সে এই সুধাদি'র বিষয়ে কী হীন ধারণাই ক'রেছিল ? মা'র পেটের বোনও এত ভাল হয় না। সে স্মৃতির অতল তলে একবার ডুব দিয়ে দেখলে, এমন আন্তরিক আদর, যত্ন, এমন দরদ সে ইতিপূর্ব্বে আর কারও কাছে পেয়েছে ব'লে সহসা মনে করতে পারলে না। অবিশ্বাস, অপমান, উপহাস, এমন কি প্রহার, এই হ'ল তার জীবনের সঞ্চয়। কিন্তু হঠাৎ তার এ কি হ'ল ! সুধাদি' অযাচিত আশাতীত স্নেহের অভিসিঞ্চনে তার জীবনকে যেন সরস মধুময় ক'রে তুললে। জগতে তা' হ'লে অকপট স্নেহ, নিঃস্বার্থ ভাল-বাসাও সত্যি আছে ! সংসারটা তাহ'লে নিছক্ বারিহীন তপ্ত মরুভূমি নয়, স্থানে স্থানে সুশীতল জলও আছে।

আলুর জীবন-কুঞ্জ যেন সহসা শত পিকের কুহরণে গীতি-মুখর হ'য়ে উঠল। তার বদ্ধদ্বার মানসলোকের অবরুদ্ধ দরজার আগল ভেঙে যেন সৌরভস্নিগ্ধ সমীরণ ঢুকে পড়েছে। তার অন্তরের পুঞ্জীভূত মলিনতার মধ্যে যে অভিশপ্ত জীবন-দেবতা দীর্ঘকাল মূর্চ্ছাহত হ'য়েছিল, আজ যেন রূপকথার রাজকন্যার সোনার কাঠির স্পর্শে তা' আবার জেগে উঠল। মনে হ'ল, হ্যাঁ, এ জীবন অমূল্যই বটে ; হেলাফেলার, অবহেলার তুচ্ছ জিনিষ এ নয়। যে ভুল সে এতদিন ক'রে

এসেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত দরকার। তাকে আবার বাঁচতে হবে,—মানুষের মতন করে বাঁচতে হবে; জীবনের গতিকে ভিন্ন পথে চালিত করতে হবে।

এই সময়ে পথের ধারে এক দেবমন্দির দেখে, সে বহুকাল যা' করেনি', তাই করার জন্য যেন একটা প্রেরণা অনুভব করল;—হাত দুটি যোড় ক'রে ভক্তিভরে বহুক্ষণ ধ'রে দেবতাকে তার অন্তরের প্রণতি জানালে। চ'লতে চ'লতে পথে বহু ব্যাধিগ্রস্ত ভিখারী দেখে তার আজ সহসা কিছু দান করবার বড় ইচ্ছা হ'ল;—পকেটে হাত দিয়ে দেখলে সেখানে একটা পাই পয়সাও নেই। সে আজ দান করতে না পেরে মনে একটা অননুভূতপূর্ব্ব দারুণ অশান্তি বোধ করতে লাগল।

অনেকক্ষণ আনমনে হাঁটতে হাঁটতে সে সহসা দেখলে একটা পথের মোড়ের মাথায়, ছোট্ট ফুটফুটে একটি পাঁচ ছ' বছরের মেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তার গলায় একটি সোণার হার চিক্‌চিক্ করছে। সেই হারটার দিকে একবার দৃষ্টি প'ড়তেই মুহূর্ত্তে আলুর মাথার মধ্যে যেন কী হ'ল; এতক্ষণের চিন্তা সব যেন জট খেয়ে গেল। তার ক্ষণজাগ্রত নৈতিক চেতনা অতিক্রম ক'রে উদগ্র লোলুপতা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করলে। তার লুব্ধ দৃষ্টি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সে সাবধানে একবার চারিদিক দেখে নিলে, কেউ দেখতে পাচ্ছে কি না; তারপর ক্ষিপ্র অভ্যস্ত হাতে মেয়েটির গলা থেকে হারটা খুলে নিয়ে পাশের একটা সরু গলির মধ্যে মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

গজল

এম, আনোয়ারা বেগম

যমুনা-তীরে কদম-তলে
শ্যামের বাঁশী বাজে গো
সকাল সাঁঝে দাঁড়িয়ে থাকে
নিতুই নব সাজে গো
বাঁশীর স্বরে পরাণ হরে
বুকের পরে বেদন-হানে
হিয়ার মাঝে পুলক ব্যথায়
কালার স্মৃতি রাজে গো
বিরহী মনে সকল ক্ষণে
বেদনা-সনে মূরতী আঁকা
সজল আঁখি আঁচলে ঢাকি
বসে না হিয়া কাজে গো
ননদী ডাকে কলসী কাঁকে
যমুনা বাঁকে জল-ভরণে
বৈঁচী কাঁটায় বসন জড়ায়
চরণ জড়ায় লাজে গো

জাগৃহি *

শ্রীআশুতোষ সান্যাল বি-এ

'উঠো' 'জাগো' এই বাণী উদেঘাষিত হয়ে গেছে কবে:
শুনিয়াছে সর্ব্বলোক উচ্চকিতে এ বিশাল ভবে
সে আহ্বান। খুরধার নিশিত সে দুর্গম দুস্তর
দুরত্যয় সরনীটি বিঘ্নবাধা-সঙ্কুল বিস্তর!
প্রভাত এসেছে নিয়ে প্রস্ফুটিত প্রসূন-সম্ভার,
খড়্গ হানি' ব্রীড়াময়ী নম্রমুখী ফুল-কলিকার
কুঞ্চিত কুণ্ঠায়! তারে আজি প্রাতে হয়নি বলিতে—
"উঠো জাগো হে কুট্মল, এই ধরণীতে"।
ফুটিয়া উঠেছে সে যে ধীরে ধীরে আপন লীলায়,
ভরি' তার মর্ম্মকোষ এ বিশ্বের গন্ধ সুষমায়—
নিভৃতে নীরবে। হায়! দুঃখ-মাঝে মানুষেরে ভবে,
কুসুম-কোরকসম বিকশিত হ'তে আজ হবে।
শত দৈন্য ব্যথামাঝে হৃদয়ের দল মেলি' দিয়া,
সবে মোরা একসাথে মহানন্দে উঠিব ফুটিয়া!

---

* রবীন্দ্রনাথের 'মনুষ্যত্ব' নামক প্রবন্ধ পাঠান্তে রচিত

রাত্ জেগে পড়ি রবিঠাকুরের গীতবিতান

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

১

নিশীথ নিরালা, আলোকে উজল
নিশি-শিথান,
আমি পড়ি জেগে র'বিঠাকুরের
গীতবিতান।
অদূরে ঝিল্লী গুম্‌রি' মরিছে,
তারারা হারানো রাগিণী স্মরিছে
স্বপন-পরীরা মঞ্জীরে তোলে
শিঞ্জীতান ;—
আমি পড়ি জেগে রবিঠাকুরের
গীতবিতান।

২

মত্ত জোছনা প্লাবন ছন্দে
সুর-বিভোর,
সুরভি মাতাল বাতাস খুঁজিছে
প্রেয়সী ওর।
কুঞ্জ মাঝারে র'য়েছে যে প্রিয়া
প্রাণের গোপন প্রেম-দরদিয়া,
তাহারে ঘিরিয়া রচে সে মধুর
বাঁশরী তান।
আমি পড়ি জেগে রবিঠাকুরের
গীতবিতান।

৩

মাটির প্রদীপে মিটিমিটি জ্বলে
শলিতা-শিখা,
সে আলো-পরশে উজল হয়েছে
কাজল লিখা।
প্রেমিক কবির গোপন প্রাণের
প্রেম নন্দিত কত না গানের
মানস সবিতা সুরের স্বপনে
করে সিনান।
আমি পড়ি জেগে রবিঠাকুরের
গীতবিতান।

৪

ছন্দ লীলায় সীমানা পেয়েছে
অসীম ভাষা—
স্তব্ধ সুরের অন্তরালের
গোপনে আসা।
কবির গভীর বিরহ-মিলন
রণিছে পরাণে আজি অনুখন ;
বিরহী বক্ষে প্রেমিক প্রাণের
জাগিছে গান।
আমি পড়ি জেগে রবিঠাকুরের
গীতিবিতান।

৫

সে গান তোমার হারানো রাগিণী
স্মরণে আনে
যে দিন প্রেমেরে মুখর করিলে
সুরে ও তানে।
আজ তুমি নাই, নাই সেই সুর,
আছে সেই ভাষা একই প্রেমাতুর,
সে ভাষা তোমারই প্রেমের স্বপনে
ভরিল প্রাণ ;
আমি পড়ি তাই রবিঠাকুরের
গীতিবিতান।

অন্ধ্র শিল্পী চিত্রবীর ও আধুনিক বাঙলার শিল্পকথা

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

বিচিত্রা ও অন্যান্য বাঙলার বিবিধ পত্রিকায় দেশের শিল্প ও শিল্পীদের বিষয় যে আলোচনা হচ্ছে সুদূর প্রবাসে বসে তা' দেখে আমরা খুবই আনন্দিত হচ্চি। কেবল মাঝে মাঝে মনে হয় যখন নন্দলাল, স্বর্গীয় সুরেন গাঙ্গুলী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্র গুপ্ত, শৈলেন, হাকিম মহাম্মাদ, সামীউজ্জমা, ভেঙ্কেটাপ্পা ও এই লেখক প্রভৃতি পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্বে শিক্ষালাভ করছিলেন তখন এই সব প্রবন্ধ লেখকরা কোথায় ছিলেন? যদিও অনেকে হয়ত কলকাতাতেই ছিলেন কিন্তু তখন এই শিল্পতত্ত্বের দিকে কখনও ঘেঁসেন নি। তাছাড়া আরো আশ্চর্য্য মনে হয় যখন দেখি নন্দলালের যে সকল চিত্রকলায় তাঁর নামের প্রতিষ্ঠা তার খোঁজ মোটেই যিনি রাখেন না তিনিও নন্দলাল যে অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য এইটুকু মাত্র খোঁজ রেখেই নন্দলালের বাহাদুরীর কথা লোকসমাজে জাহির করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কোনো কারণে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের, নন্দলালের বা লেখকের কোনো বিশেষ শিষ্য প্রিয় হয়ে উঠলেই যে তিনি শিল্পজগতে উচ্চ স্থান অধিকার করবার যোগ্য হয়ে উঠবেন একথা সতসিদ্ধ নয়—কালের কষ্টিপাথরে উপযুক্ত রসিক-জহুরীর হাতেই যাচাই হয়ে তবে শিল্পী টেঁকসই হয়ে থাকেন। আমাদের দেশে রসিক জহুরীরই দৈন্যের কথা এই সব শিল্পকলার বিষয় প্রবন্ধগুলি পড়লে আমাদের নিকট জাহির হয়। তবে ভরসা এই যে এইরূপ শিল্প বিষয় আলোচনার ফলে জহুরীও হয়ত কোনো না কোনো কালে দেশে তৈরী হয়েও উঠতে পারে। অবশ্য এই সকল প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু শিল্পকলার ভাল-মন্দের বিচার, শক্তিটা যে চিত্রকর হলে বা না হলেই সহসা গজিয়ে ওঠে একথাও আমরা বলি না।

শ্রীযুক্ত ভি আর চিত্রা

অবনীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব কেবল একটি মাত্র শিষ্য সৃষ্টি করায় যে নয় জাতীয় শিল্পের ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দেশের শিল্পকে দাঁড় করানোই যে তাঁর বিশেষ কাজ একথা বলাই বাহুল্য। কাজে কাজেই কোনো একজনের মাষ্টার হিসাবে আজ আমরা তাঁর কদর করি না। অবনীন্দ্রনাথ ভারত শিল্পকলার একটি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করে একটি শিষ্য-মণ্ডলীকে গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের গড়েছিলেন হাতে করে নয় প্রেরণা যুগিয়ে এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের মধ্যে প্রত্যেককে ফুটতে দিয়ে। তাই যাঁর

শিল্প দৃষ্টি আছে তিনি দেখবেন অবনীন্দ্রনাথ যেমন নন্দলালের ভিতর প্রাচীন অজন্তার শৈলীর অনুশীলন দ্বারা (Classical art) প্রাচীন বোনেদী আর্টকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছেন, তেমনি ক্ষীতিন্দ্রনাথের মধ্যে বৈষ্ণবভাবের Lyrical ধরণের ছবি আপনি ফুটেচে তাকে তিনি বাধা দেননি তার সহজ পথটী ধরতে। এরই ফলে নন্দলালের গৌরব "শিবসতী", "সতী" ছবিতে, ক্ষিতীনের গৌরব "চৈতন্য" "রাধা" প্রভৃতি চিত্রে, শৈলেনের গৌরব মেঘদূতের

আয়েষা

'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে একটি চিত্র (এই ছবিটি মাদ্রাজ ফাইন্ আর্টস্ সোসাইটির ১৯৩০ সালের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে ভারতীয় ধারায় অঙ্কিত চিত্র সমূহের মধ্যে প্রথম পুরস্কার অর্জ্জন করে)

প্রেরণার সন্ধান পেয়ে তাঁকে সেই দিকেই চলতে দিয়েছেন, এবং শৈলেনের ভিতর অল্পবয়সে স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় বিরহ-বিধুর হিয়ার সন্ধান পেয়ে কাঙ্‌ড়া শৈল-শিল্পের অনু-প্রেরণার দ্বারা মেঘদূতের বিরহের ছবি জীবন্ত করে ফোটাবার অবকাশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া যে শিষ্যের হাতে চিত্রাবলীতে এবং Lyrical শিল্প নিয়ে যিনি জীবন কাটাচ্ছেন তাঁর গৌরব "প্রণাম," "সুরের আগুন" প্রভৃতির হেঁয়ালী প্রভৃতিতে আমরা দেখতে পাই। তাছাড়া হাকিমের "লয়লা মজনু", সামী উজমার "গোলেবাকেওয়ালী"র ছবির কথা সকলেই জানেন। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

পথের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তাঁর ঐতিহাসিক চিত্রকলায়। লক্ষ্মণসেনের ছবিটিতে তার লক্ষণ আজও জাজ্বল্যমান আছে। বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত "শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ"ও "অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও নাতিশিষ্য" প্রবন্ধ দুটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আশ্রমে শিশু-বিভাগে পড়েন। তাঁদের তরুণ চোখের কৌতূহল দৃষ্টি তখন পড়ল আমার আঁকা জোঁকার উপর এবং অঙ্কছেদে যোগ দিলেন আমার সঙ্গে অঙ্কনে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে লর্ড কারমাইকেলের শুভাগমন উপলক্ষ্যে তাঁরা আমার হলেন সহায় অভ্যর্থনা-সজ্জার
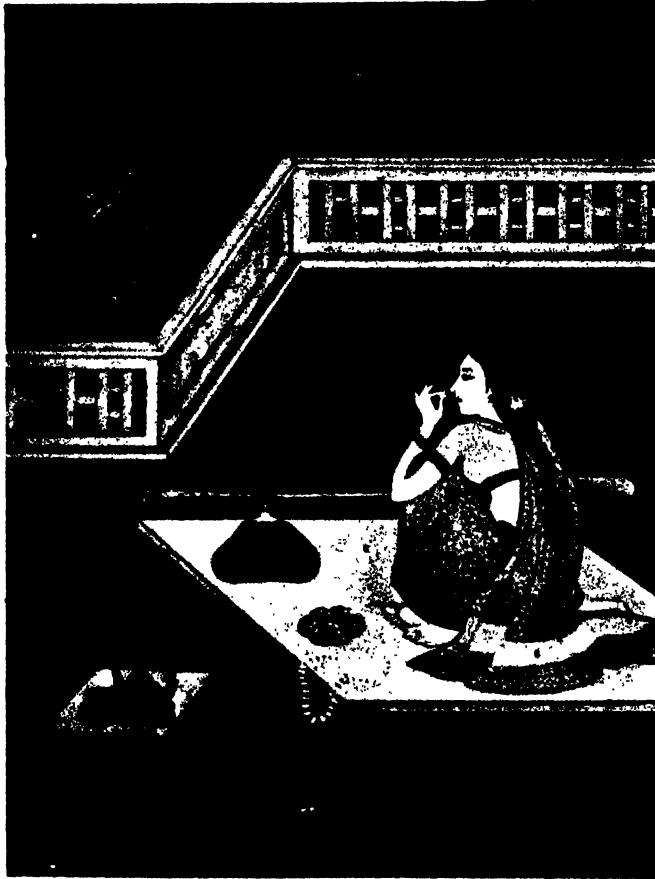
বীণাবাদিনী

শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৯১২ সালে যখন পূজনীয় কবি আমাকে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন তখন আমার কাছে যাঁরা শিল্পকলায় হাতে খড়ি দিলেন তাঁদের মধ্যে মুকুল দে ছাড়াও দুজন এখন বেশ নামজাদা হয়ে উঠেচেন। শ্রীমান মণিভূষণ গুপ্ত ও শ্রীমান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা তখন

আয়োজনে। রাতারাতি আমাদের গাছের নীচে আল্পনা এঁকে চন্দ্রবেদীকা রচনা করে চন্দনচর্চ্চিত করে—বাঁশের উপর খোদাই ক'রে তাতে লাক্ষার কাজ করে অভিভাষণের আধার তৈরী করে—এক কাণ্ড করতে হয়েছিল। মনে পড়ে কবি স্বয়ং রাত ১২।১ টা পর্য্যন্ত হ্যারিকান লণ্ঠনের

আলোতে আমাদের আল্পনার কাজ দেখেছিলেন। এরূপ জীবন্ত প্রাণের কাছে আমরা যখন উৎসাহ পেয়ে কাজ করতুম তখন আমাদের মধ্যে গুরু-শিষ্য বোধ চলে যেতো, আমরা শিক্ষা ও শেখানোর গণ্ডি কেটে চলতাম আনন্দের সঙ্গে। মণিগুপ্ত বা ধীরেন একদিনের জন্যেও বুঝতে

নন্দলাল বসু কলকাতা থেকে আশ্রমে এসে বিশ্বভারতীর তরফ থেকে কলাভবনের গোড়াপত্তন করে দিয়েই আবার The Indian Society of Oriental Artএর শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন। তখন আবার আমার শান্তিনিকেতন আশ্রমে ডাক পড়েছিল

আমার কুটির
(মিস্ এস্-পি হাতী সিংএর সংগ্রহ হইতে)

পারেননি যে আমি তাঁদের গুরুস্থানীয় হয়ে সেখানে কাজ করচি। সে এক যুগ কেটে গেছে যেটি কবির গীতলি ও ফাল্গুনীর যুগ।

ঠিক তার পরবর্ত্তীকাল হ'ল যখন আমি মাঝে ১৯১৫ সালে আশ্রম ছেড়ে চলে যাই এবং তারপর ১৯১৯ সালে

নন্দবাবুর প্রতিষ্ঠিত কলাভবনটিকে চালাবার ভার নেবার জন্যে। পূজনীয় কবির অনুরোধে ১৯১৯ সালে আমি পুনরায় আশ্রমেস্থ কলাভবনে যোগ দি। আমার সঙ্গে কলকাতার গভর্মেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের কয়েকজন আমার ছাত্রও বিশ্ব-ভারতীতে যোগ দিলেন। তার মধ্যে হিরাচাঁদ দুগাড়,

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সেই সময় আশ্রমে আমার কাছে এলেন শ্রীমান হরিপদ রায়, বিনায়কমাসোজী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রবীর ভদ্ররাও এবং কয়েকজন ছাত্রী। আমি এখন শ্রীমান চিত্রবীর ভদ্র সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় যদিও তাতে নেই, কিন্তু সুছন্দ বর্ণ ও রেখা বিন্যাসের পরিচয় আমরা খুবই পাই। সেই ছন্দের দোলা যাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত তাদের মধ্যে চিত্র-শিল্প চর্চ্চা অনধিকার চর্চ্চা বলা যেতে পারে না। তাই আমরা দেখেছি, যখন লাজুক তরুণ ছাত্র শ্রীমান্ চিত্রবীর আমাদের আশ্রমে

একটি সাঁওতাল যুবক
(ত্রিচীনোপলিবাসী ডক্টর আর-এ জনসনের সংগ্রহ হইতে)

রাওএর কথাই বলব। ইনি এখন তাঁর নাম "বীরভদ্র রাও চিত্রা" করে দিয়েছেন।

শ্রীমান্ চিত্রবীর অন্ধ্র দেশের লোক। সে দেশে শিল্পকলা অর্থাৎ কারুকলারই বিশেষ চর্চ্চার পরিচয় আমরা পাই তাদের কাপড়ের উপর ছাপা রঙিন কাজে। ঠিক চিত্রকলার প্রথমে এলেন তখন তাঁর কাছে ভারত শিল্পের রঙের ও রেখার সৌকুমার্য্যের রস খুব সহজেই ধরা পড়েছিল। আমাদের শিক্ষা দেবার পদ্ধতির মধ্যে সর্ব্বদা এই কথাই লুকানো থাকে যে অবনীন্দ্রনাথ যেমন স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বকে বিনাশ না করেও আমাদের তৈরী করেছিলেন তেমনি

আমাদের শিষ্যদের'ও সূক্ষ্ম রসানুভূতি তাঁদের প্রত্যেকের সংস্কারগত বৈচিত্র্যের মধ্যে ফুটতে দেওয়া। ছাত্রদের নিয়ে এই পরীক্ষা করবার সুযোগ হয়েছিল আশ্রমে শিক্ষকতা করবার সময় এবং তার ফলে রমেনের, বিনোদের, অর্দ্ধেন্দু, মাসোজী প্রভৃতির মধ্যে বেশ একটা স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক পাওয়া গিয়েছিল। আমার আশ্রম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই গোড়ায় গোড়ায় অজন্তার বোনেদী শিল্পকে সহায় করে নন্দলাল যা' করেচেন তা হয়ত তাঁর পক্ষেই ঠিক খেটে গেছে, কিন্তু তার পরিচয় অপরের হাতের কাজে পেলে ভাল লাগবার কথা নয়। নিজের ব্যক্তিত্বকে বজায় রেখে যে চলতে পেরেচেন এই হ'ল আনন্দের সংবাদ চিত্রবীরের শিল্পের পক্ষে।

প্রিয়দর্শিকা

সব শিল্পীরা নন্দলালের অধ্যক্ষতায় কিছুকাল তাঁর নিকট অজন্তা শৈলীর গূঢ় রহস্যের পরিচয় পান, তার ফলে অজন্তার মুদ্রাদোষ বোনেদি শিল্প হলেও এঁদের কারু কারুর মধ্যে এমন নিবিড়ভাবে প্রবেশ করেচে যে তাঁরা প্রায় নিজেদের বিশেষত্বও হারাতে বসেচেন। তার পরিচয় আমরা মাসিক-পত্রে পরিবেষিত তাঁদের ছবিগুলিতে দেখতে পেয়েচি।

চিত্রবীর যে কেবল চিত্রশিল্পী তা নয়, তিনি কারুশিল্পীও বটেন। তাঁর চিত্রের ভিতরও সেই দেশজ সংস্কারগত কারুশিল্পের পরিচয় আমরা দেখতে পাই এবং তাতে তাঁর শিল্পে বিশেষত্বেরই পরিচয় দেয়। আমরা কেবল ধরা ছোঁয়া যায় না এইরূপ শিল্প, চারুশিল্পেই (চিত্রকলায়) মুগ্ধ হই। কিন্তু যা' ধরা ছোঁয়া যায় এরূপ কারুশিল্পের পরিচয়

যখন আমরা পাই তখন তার ভিতর রস পাই না। বাঙালীরা ভাবপ্রবণ, কবির দেশের লোক, তাই তাঁরা কেবল ভাব চান কিন্তু ভাবকে ধরে রেখেচে এমন কারুকলাকে বুঝতে চান না। তাই আমরা এই বীরভদ্রের শিল্পের মধ্যে কারুশিল্পের শৈলীর কোনখানটিতে পরিচয় পাব তারই বিষয় আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হলাম।

যারা তৈরী যা' কিছু সৌন্দর্য্য-পরিচায়ক শিল্প। চারু শিল্পের একটি আভিজাত্য এই আছে যে সেটি ভাবপ্রবণ এবং তার রেশ মনের মধ্যে ধ্বনিত হ'তে থাকে সেটিকে দেখার পরেও আই সেটিতে ভূমার আস্বাদ আমরা পাই,—গতিশীলতার দরুণ (Dynamic বলে) আর কারুশিল্পের আবেদন আমাদের সেটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রীতি

একটি পুস্তকের প্রচ্ছদপট
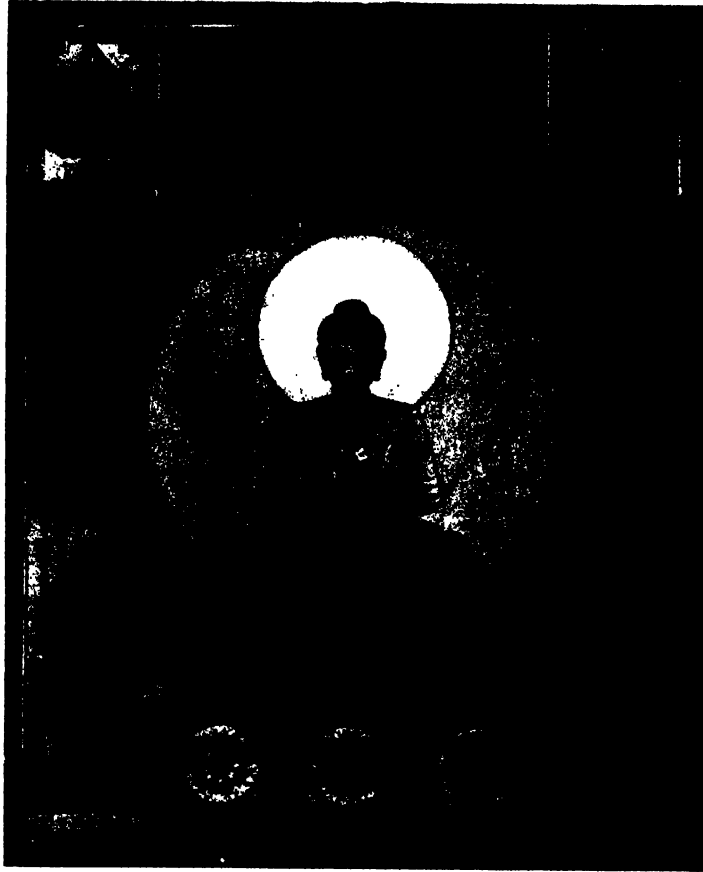
গোড়ায় কারু ও চারু শিল্পের মধ্যে আসল লক্ষণ কি কি তারই কথা বলি। চারুশিল্প—চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য। এখানে আমরা চিত্রকলার কথাই বলচি। আর কারুকলা, বস্তু-শিল্প যথা কাঠ, ধাতু, কাগজ প্রভৃতির উৎপাদন করা। বর্ণবিন্যাস, রেখাবিন্যাস ও গঠনের মধ্যে সেটি স্থির (Static)। বিলাতে অতি আধুনিক শিল্প-কলা এই শ্রেণীর Abstract এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর আবির্ভাব হয়েচে। কলকারখানার

যুগে তাড়াতাড়ি আঁকা ও গড়া চাই। তাই Significant form হ'লেই হ'ল—এঁকে যাও পোঁচ্‌-প্যাচ্‌—বসে বসে ভাবলে আর চলবে না—উড়ে চলেচে উড়ো জাহাজ,—রপ্তন করে দিতে হ'বে দেশে দেশে পণ্যের সঙ্গে শিল্পের আমাদের ছবি আর তেমন চিত্রিত হচ্চে না বোলে বলেছিলেন, "ভাল করে ভেবেচিন্তে ছবি আঁকা বৃথা, কেন না কেউ কিনবে না, এবার সস্তাদরের ছবি আঁকব। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" দেশের "অন্ন চিন্তা ভয়ঙ্করী"—

চাঁদ সওদাগর
(একটি বাংলা পুস্তকের জন্য ডি-আর চিত্রা কর্ত্তৃক ১৯২৬ সালে অঙ্কিত
শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় বার্-এট্‌-ল র সংগ্রহ হইতে)

বোঝা। তারই ঢেউ আমাদের দেশের আধুনিক নামজাদা কোনো শিল্পীর মধ্যে যা' এসেচে, সেটির মধ্যেও ঐ একই কথা লুকানো আছে বোঝা যায়। নন্দলাল আমার তাই আর্ট অন্নর বাহন হওয়ায় হৃদয়ের জায়গায় উদরে গিয়ে পৌঁচেছে। এই হ'ল আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে ভারতের শিল্প-শৈলীর বিরাট ব্যবধান এবং এর সামঞ্জস্য হওয়া অর্থাৎ

ভারতীয় বৈঠকখানা
(আসবাবগুলি শ্রীযুক্ত ভি-আর চিত্রা কর্তৃক পরিকল্পিত সেগুন কাঠে নির্ম্মিত এবং রোজ্‌ উডে চিত্র-খচিত)
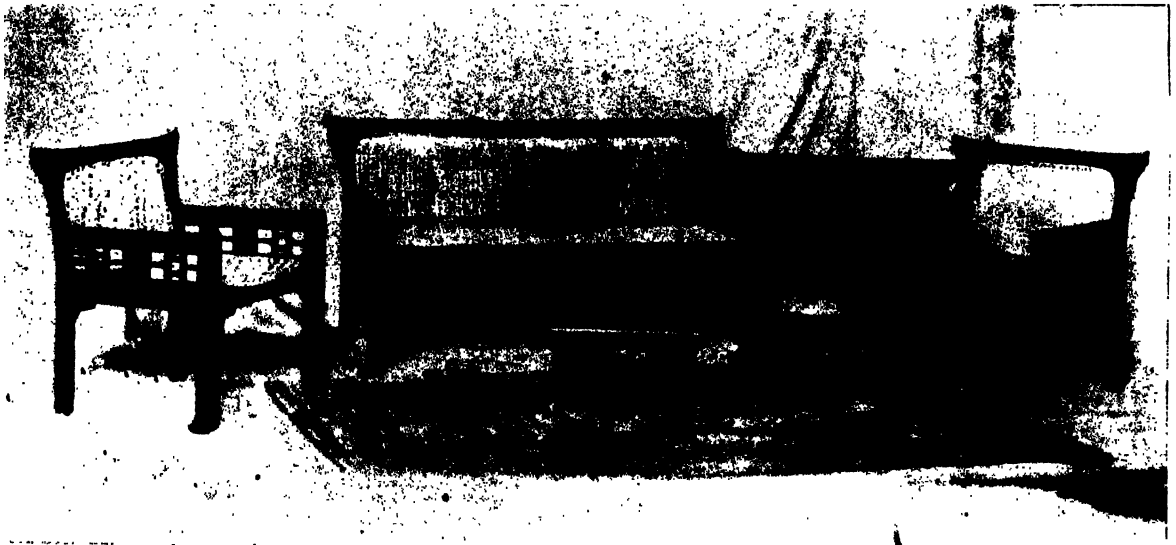
শ্রীযুক্ত ভি-আর চিত্রা কর্তৃক পরিকল্পিত রোজ্‌ উডে নির্ম্মিত বৈঠকখানার আসবাব

বেদ ও বাইবেলের সামঞ্জস্য করা। সেদিন কবে হবে তাই আজ বসে বসে ভাবচি।

চিত্রবীরের চিত্রকলার কথা বর্ণনা না করে তাঁর চিত্রের দ্বারাই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা গেল। চিত্রগুলিই শিল্পীর শিল্পের মহিমা আপনিই ঘোষণা করবে।

অসিতকুমার হালদার

বিদায় বাণী

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

পৃথিবীতে মানুষ সুখ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝে আমার অদৃষ্টে ভগবান তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যায়ামপুষ্ট শরীরে যথেষ্ট শক্তি ও স্বাস্থ্য ছিল। বাবা মৃত্যুকালে ব্যাঙ্কে কিছু মোটা টাকার সংস্থান এবং গ্রামে বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত ভাল ভাবেই করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। ২৫ খানি গ্রামের মালিকানি স্বত্ব এবং প্রজাবর্গের আনুরক্তি,আমাদের অঞ্চলে আমাকে সৌভাগ্যবান বলিয়াই ঘোষণা করিত। মার অসীম স্নেহ, আদর ও যত্ন পিতার অভাব বুঝিতে দিত না। সহরের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর, গ্রামের বাস ভবনে স্থায়ীভাবে তরুণী সুন্দরী পত্নী এবং বাবার সযত্ন সংগৃহীত গ্রন্থরাজির সাহচর্য্যে পরম নিরুদ্বেগে দিন চলিয়া যাইতেছিল।

বাল্যকাল হইতেই আমার শিকারে প্রচণ্ড নেশা ছিল। প্রেমময়ী পত্নী ও গ্রন্থের সাহচর্য্য, মাতার অপরিসীম স্নেহ হইতে মাঝে মাঝে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া শিকারের উন্মাদনায় অধীর হইয়া দূরবর্ত্তী জলার মধ্যে, বনে, অথবা আমাদের গ্রামপ্রান্তবর্ত্তিনী পদ্মার ধারে চলিয়া যাইতাম। মাসের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারিবার শিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। তবে প্রধানতঃ পক্ষী শিকারেই আমার প্রাণী সংহারবৃত্তি চরিতার্থ হইত।

বাবার একখানি মজবুত ও সুন্দর বজরা ছিল। পদ্মার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি হেমন্তের আগমনে যখন সংযত শোভায় মনোহারিণী হইয়া উঠিত, তখন মাঝে মাঝে ঊষাকে সঙ্গে লইয়া বজরায় পদ্মার বুকে বেড়াইয়া আসিতাম। পদ্মার বাধাবন্ধহীন তরঙ্গময় জলরাশি আমাকে অজ্ঞাত আকর্ষণে টানিয়া লইত। তাহার কল্লোলিত স্রোতধারায় কত না অতীত ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত—তাহার বিক্ষোভিত বক্ষে কত না যুগযুগান্তরের অকথিত বাণী—তাই যেন সে প্রকাশের ভাষা পাইয়া অধীর আগ্রহে নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ভ্রমণের সময় কোন এক অজ্ঞাত পুলকে ও বিস্ময়ে আমি বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। কিন্তু ঊষা নদীবক্ষে বেড়াইবার জন্য যে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিত, তাহা নহে। তবে আমার আনন্দ হইবে জানিয়া সে জলবিহারে আপত্তি করিত না।

পদ্মা আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। কয়েক বৎসর হইতে আমাদের কূলে ভাঙ্গন বন্ধ হইয়া অপর তটভূমিকে পদ্মা আলিঙ্গনে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমাদের বাড়ীর কিছুদূরে একটি ছোট নদী বা খাল ছিল। সেইখানেই আমার বজরা বাঁধা থাকিত।

এবার হেমন্তের আবির্ভাবে শীতের পূর্ব্বাভাস অনুভব করিতেছিলাম। শিকারের প্রবৃত্তি কয়দিন হইতেই উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঊষা এবার আমাকে শিকারে কোনমতেই যাইতে দিবে না বলিয়া দৃঢ় পণ করিয়াছিল, তাই শিকারের মনোভাবকে কিছু সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

* * *

কলিকাতা হইতে কতকগুলি শিকারের নূতন গ্রন্থ আনাইয়াছিলাম। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ শিকারীর কাহিনী পাঠ করিতেছি, এমন সময় ঊষা পানের ডিবা হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন গ্রামের উপরি সুপ্তির যবনিকা বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমার ঘরের জানালা বারমাস রাত্রি কালেও উন্মুক্ত থাকিত। দারুণ শীতের সময়ও উহা বন্ধ হইত না। বন্ধ হাওয়ায় আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া পড়ে।

খোলা বাতায়ন পথে দেখিলাম, চতুর্দ্দশীর চন্দ্রালোক চারিদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্নাধারায় যে অপূর্ব্ব

মাদকতা ছিল, তাহা আমার মস্তিষ্কে বিভ্রম উৎপাদন করিল। শিকার কাহিনী পাঠে আমার চিন্তারাজ্যে দুর্দ্দমনীয় শিকার-স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

উষা আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বই পড়ছ?"

সে ইংরাজী জানিত। বইখানি আমি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম।

"শিকারের বই? ও ছাই-পাঁশ পড় কেন? কি হবে জীবজন্তু শিকারের বই পড়ে?"

দেখিলাম, তাহার সুন্দর মুখে অপ্রসন্নতার ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে। জানিতাম, তাহার চিত্ত অত্যন্ত কোমল। সে প্রাণীহত্যা সহ্য করিতে পারিত না বলিয়া পূজার সময়—ছাগবলির সময়—কখনও পূজা প্রাঙ্গণের কাছেও আসিত না। অথচ তাহার মত ভক্তিমতী নারী আমি কমই দেখিয়াছি। প্রতিমার সম্মুখে যখন সে যুক্ত করে, নিমিলিত নয়নে দাঁড়াইয়া মনে মনে দেবীর ধ্যান করিত, তখন তাহার সমগ্র আননে এমন একটা মধুর দীপ্তি, নির্ভরতা ফুটিয়া উঠিত, যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাহার কোমল মধুর চিত্তের অবস্থা বুঝিয়া, আমার মা উষাকে "দয়াময়ী মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বাড়ীর দাসদাসী, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী সকলেই উষার বিনয়নম্র ব্যবহারে তাহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল।

উষার হাত হইতে গোটা-কয়েক খিলি পান লইয়া চর্ব্বন আরম্ভ করিলাম। পানের প্রতি আমার আকর্ষণ না থাকিলেও উষাকে আনন্দ দিবার জন্য পান খাইতাম।

আমার চিত্ত তখন শিকারীর কৌতূহল উদ্দীপক বর্ণনার মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেও বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া উষাকে পার্শ্বে আকর্ষণ করিলাম।

বাহিরে সত্যই তখন জ্যোৎস্নারাত্রির উৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। শিশিরসিক্ত বাতাস ও জ্যোৎস্নাধারার শ্যামল গাছের পাতায় পাতায় নৃত্যের ছন্দে যেন একটা সুরের তরঙ্গ তুলিতেছিল। উষা আমার দেহে ভর দিয়া সেই দিকে চাহিয়া বলিল "কি সুন্দর!"

সত্যই সুন্দর। উষার মন ঠিক যেন কবিতার ছন্দে ও তালে ভগবান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তাহার কথায় কাব্যালোকের একটা মাধুর্য্য যেন ওতপ্রোত থাকিত। কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা ও স্নিগ্ধতার প্রলেপে, তাহা শ্রোতার কর্ণে ও প্রাণে সত্যই আনন্দ ও তৃপ্তির সঞ্চার করিত। এজন্য কেহই তাহার মনে কখনও সামান্য আঘাত দিতে চাহিত না। আমাদের সংসারে সে যেন মূর্ত্তিমতী কমলার ন্যায় শতদলের উপর দাঁড়াইয়া শুধু কল্যাণ, তৃপ্তি ও আনন্দ বিতরণ করিত। কোনও দিনই আমি তাহার মনে ব্যথা দিবার মত কোনও কাজ করি নাই। পত্নীগর্ব্বে আমার হৃদয় অনুক্ষণ পূর্ণ থাকিত।

উষার পরম নির্ভরতাপূর্ণ স্পর্শানুভূতি আমার দেহের মধ্যে যে আনন্দ শিহরণ তুলিয়াছিল, তাহা নিরুদ্বেগে উপভোগ করিয়া ধন্য হইবার জন্য আমি তাহার দক্ষিণ করপুটে দুই করতলে মৃদুভাবে চাপিয়া ধরিলাম।

দেখিলাম তাহার দীর্ঘকৃষ্ণতার নয়ন যুগল তখনও বাহিরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

অদূরে কোন শাখা ও পত্রবহুল বৃক্ষান্তরাল হইতে একটা পরিচিত পাখীর গীতিঝঙ্কার অকস্মাৎ হেমন্তের শিশিরসিক্ত রাত্রির মাধুর্য্যে যেন প্রাণ স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল। উষা বলিয়া উঠিল "শুনছো!"

বলিলাম, "শুনছি বৈকি, খুব চমৎকার!"

আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, "তবে তোমরা কোন্ প্রাণে এমন পাখীর প্রাণ নষ্ট কর?"

কোন্ কথা হইতে কোন্ প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। উষার সহিত আমি সর্ব্বপ্রযত্নে শিকারের আলোচনা এড়াইয়া চলিতাম।

এই সময় পাখীটা উচ্চসপ্তকে গাহিয়া উঠিল।

বইখানা টেবলের উপর রাখিয়া বলিলাম, "চল এবার আমরা শুই গে যাই।"

মৃদু হাসিয়া উষা বলিল, "কিন্তু তুমি আমার কথাটার উত্তর দিলে না? যে পাখীরা এমন মধুর গান করে, তাদের গুলী করে তোমাদের মনে মায়া হয় না?"

কি উত্তর দিব? শিকারীর মন লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাই জানে শিকারে কি আনন্দ। সুতরাং

ইহার উত্তর উষাকে দেওয়া নিষ্ফল। বলিলাম, "ওসব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় চল। খুব ভোরে উঠ্‌তে হবে।"

* * *

মনটা শিকারে যাইবার জন্য সত্যই পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। ভোরে উঠিয়াই বজরা ঠিক করিতে আদেশ দিয়াছিলাম, আহারাদি পদ্মাধারেই সারা যাইবে। মাধবটা গা হাত পা টিপিতে যেমন ওস্তাদ রান্নাতেও তেমনি দড়। মার কাছে সে অনেক রকম রন্ধনের কৌশল শিখিয়াছিল। শৈশব হইতেই সে আমাদের বাড়ীতে প্রতিপালিত। শিকারে যাইবার সময় সে সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। বজরায় সে খিচুড়ী পাক করিবে বলিয়া যাবতীয় সরঞ্জাম গুছাইয়া লইয়াছিল।

সকাল বেলা স্নান সারিয়া চা-পানের পর যখন ভিতরে আসিলাম, দেখি উষা ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নয়নের ছল ছল কাতর দৃষ্টি সহসা আমার অন্তরে আঘাত করিল।

"অমন করে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে কেন রাণী!"

অশ্রুসিক্ত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া সহসা সে আমার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল। তারপর ভগ্নস্বরে বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, শিকারে যেওনা। আমার মন যেন কেমন্ করছে।"

তাহাকে সাদরে গৃহমধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "ছিঃ লক্ষ্মি! এত ভয় কেন?"

আমার বিশাল বক্ষদেশে তাহার মাথাটি রাখিয়া সে অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "আমি বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি, যেন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে—কতদূরে চলে গেছ—চারিদিকে অন্ধকার, তোমাকে জন্মের মত হারিয়ে ফেলেছি—"

সত্যাই উষা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বড় বিব্রত হইয়া উঠিলাম। বজরা সজ্জিত—পদ্মা যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তাহার তীরে তীরে এ সময় কত পাখীর মেলা।

দুই হাতে সন্তর্পণে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিলাম। চূর্ণ অলকগুচ্ছগুলি দক্ষিণ করে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিয়া রুমালে উষার অশ্রুধারা মুছাইয়া দিলাম। তাহার আননের করুণ স্নিগ্ধ মাধুর্য্য আমার সমগ্র চিত্তকে তরঙ্গাহত করিয়া তুলিল। পরম আদরে তাহাকে সন্নিহিত আসনের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "সেই সন্ন্যাসী এসে তোমাদের কাছে আমার সম্বন্ধে নানা কথা বলে যাবার পর থেকেই দেখছি তুমি বেশী অধীর হয়ে পড়েছো। সেই কথা ভেবে ভেবেই স্বপ্ন দেখেছ। ওসব কিছু ভেবোনা, রাণি! সন্ধ্যের মধ্যেই ত আমি ফিরে আসবো।"

উষা আবার আমার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না গো না, আমার মন কেমন করছে—"

আমি বলিলাম, "তা বেশ ত, তুমিও আমার সঙ্গে চল। আমি মাকে গিয়ে বল্‌ছি। তাহলে দুজনে ত কাছে কাছেই থাক্‌ব।"

উষা বলিল, "না গো, আমি পদ্মায় যেতে পারব না। এখন কি মা নৌকোয় চড়তে দেবেন?"

কথাটা ইঙ্গিত পূর্ণ। উষা কেন যে এ কথা বলিল, তাহা আমি জানিতাম।

উচ্চহাস্যে তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাহার কোমল রক্তাধরে চুম্বন দিয়া বলিলাম, "ও কথাটা আমার মনে ছিল না। সে ঠিক কথা, এখন তোমার নৌকা চড়া নিষেধ।"

উষার গোলাপী গণ্ডে লজ্জার অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "তুমি বড় দুষ্টু,—যাও!"

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উষাকে আবার আদর করিয়া বলিলাম, "ক ঘণ্টা বইত নয়। ভগবানকে ডেকো—রাধামাধবের চরণামৃত পান করেই আমি যাচ্ছি। দেখো নিরাপদে ফিরে আস্‌বো।"

আর কথার অবকাশ না দিয়াই দ্রুতগতিতে বাহিরে চলিয়া আসিবার সময় উষার দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইলাম।

* * *

বজরার পাল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অনুকূল পবনে বজরা পাখীর মত উড়িয়া চলিয়াছিল। বর্ষার ভীমা

পদ্মার সে উত্তাল রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি মানুষের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করে—হেমন্তের শীতল স্পর্শে তাহা যেন নটিনীর নৃত্যছন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে।

প্রভাত রৌদ্রের মধুর উজ্জ্বল দীপ্তি পদ্মাবক্ষে যেন মায়া লোক সৃষ্টি করিয়াছিল। স্রোতে আবর্ত্ত নাই, তরঙ্গের বিক্ষোভ নাই—আছে শুধু অনাবিল জলরাশির উপর ক্ষুদ্র হিল্লোল। চুরুট ধরাইয়া জলরাশির দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলাম। মাধব বজরার অপর দিকে রন্ধনের আয়োজন করিতেছিল। মাঝি হাল ধরিয়াছিল—মাল্লারা আপন মনে গৃহস্থালীর সুখ দুঃখের আলোচনায় মগ্ন। দাঁড় ধরিবার প্রয়োজন ছিল না।

তীরের দিকে চাহিলে মন স্নিগ্ধ শান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। হৈমন্তিক শস্যসম্ভার তখনও ক্ষেত্রের বক্ষোদেশ আলো করিয়া রহিয়াছে।

ঘননীল আকাশে শুধু আলোক তরঙ্গের উচ্ছ্বাস। পদ্মার বুকে নীলিমা—বিস্তারের প্রতিবিম্ব লক্ষখণ্ডে বিভক্ত হইয়া মনকে যেন কোন্ এক অজানা আকর্ষণে মোহাবিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল!

সিগারটা পুড়িয়া প্রায় শেষ হইয়া পড়িয়াছিল। পদ্মার বুকে উহাকে ফেলিয়া দিলাম।

আজ এমন ভাবে পদ্মার রূপ আমার চিত্তকে অভিভূত করিতেছে কেন? যখন ধ্বংসলীলার কোন আয়োজন নাই, তখন সেই রণরঙ্গিনী ভীমার ভৈরবী মূর্ত্তির কথা জাগিয়া উঠিতেছে কেন?

অন্যমনস্ক হইবার জন্য মাঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কতক্ষণে আমরা আলাতুলীর চরে পৌঁছিব?"

—"আরও এক ঘণ্টা হুজুর।"

মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার খিচুড়ি নামিবে ত?

সে উত্তর দিল, "আজ্ঞে আর দেরী নাই। পনের মিনিটের মধ্যে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

আহার সম্বন্ধে আমার বিশেষ দৃষ্টি বরাবরই আছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করিতেই হইবে। এজন্য বাড়ীর সকলেই আমার প্রতি সুখী ছিল। কোনও দিন আমার জন্য কাহাকেও অন্ন লইয়া বসিয়া থাকিতে হয় নাই।

রিষ্ট ওয়াচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে। সাড়ে দশটায় শিকারের স্থানে পৌঁছিব। দশটার মধ্যে আহার সারিয়া লইলেই হইবে। ফিরিবার সময় প্রতিকূল পবনে আসিতে হইবে। অপরাহ্ণ চারটার বেশী থাকা চলিবে না। চার ঘণ্টার কমে বাড়ী পৌঁছিতে পারিব না।

বন্দুকের বাক্স খুলিয়া তাহাকে একবার পরীক্ষা করিয়া লইলাম! পাখিমারা সট্ বেল্টে সাজানই ছিল।

বন্দুকটি হাতে করিতেই একটা বিচিত্র শিহরণ শরীরের মধ্যে অনুভূত হইল। শিকারের আনন্দ যে সাত্ত্বিকতাপ্রসূত ইহা কেহই বলিবে না। হিংসা হইতে যে আনন্দ জন্মে, দার্শনিকগণ তাহার যে সংজ্ঞাই নির্দ্ধারণ করুন না কেন, উহার বিকট উল্লাসকে আমি এখন আনন্দ সংজ্ঞাই প্রদান করিব।

মাধব ডাকিল "হুজুর, সব তৈরী।"

বন্দুক এক পাশে রাখিয়া বলিলাম "আচ্ছা।"

*   *   *   *

আশ্চর্য্য! একটিও শিকারযোগ্য পাখী সমগ্র চরভূমিতে খুঁজিয়া পাইলাম না। এমন সময় এ অঞ্চলে নানাপ্রকার পাখীর ঝাঁক প্রতি বৎসর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজ যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্র প্রভাবে পক্ষিকুল অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। পদ্মার মধ্যে এই চরটি বহুদিনের পুরাতন। দীর্ঘদিন পদ্মার স্রোতধারা ইহাকে একপার্শ্বে রাখিয়া অপর দিক ভাঙ্গিয়া বহিয়া চলিয়াছে। চরভূমিতে নানাজাতীয় বহু পক্ষীর সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু আজ তাহারা কোথায় গেল?

বজরা বাঁধিয়া রাখিয়া মাধবের সঙ্গে প্রায় চার ঘণ্টা ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু শিকারযোগ্য কোনও পাখীই দেখিতে পাইলাম না। ব্যর্থতায় কোন কোন মানুষের জিদ বাড়িয়া যায়—আমার প্রকৃতি সেইরূপ। যতই ব্যর্থ হইতে লাগিলাম ততই মনে হইল, শিকার কিছু করিতেই হইবে। এমন নিষ্ফল যাত্রা হইতে দিব না।

মেঘলা দিনে

শিল্পী—শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিচিত্রা
ফাল্গুন, ১৩৪০

সূর্য্যালোক অম্লান দীপ্তি দিতেছিল—আকাশের নীলিমা তেমনই মেঘলেশশূন্য। শুধু সূর্য্য তখন পশ্চিম গগনে চলিয়া পড়িয়াছে। শব্দহীন চরভূমি—কোনও স্থানে পরিপক্ব ধান্য-ভারে শোভাময়। কোন কোন অংশে চাষীরা ধান কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু বহুবিস্তৃত এবং দীর্ঘ চর-ভূমিতে তাহাদের কণ্ঠস্বর বিশেষ কোনও নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারে নাই।

চারিদিকে তীক্ষ্ণ, সন্ধানী ও সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলাম। বন্দুকটিকে মাঝে মাঝে সজোরে চাপিয়া ধরিতেছিলাম। তখন মনের এমনই অবস্থা যে, একটা কিছু পাইলেই হয়—শিকারী যখন শিকার পায় না, সে সময় তাহার মানসিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা যে শিকারী নহে, তাহার পক্ষে বুঝা অসম্ভব।

পুনরায় ঘড়ির দিকে চাহিলাম, সাড়ে তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। আর বেশী বিলম্ব করাও ত চলিবে না।

সহসা একটা অনতি উচ্চ চরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। ঐ না দুইটি পাখী পাশাপাশি বসিয়া আছে?

মাধব তখন অনেকটা পশ্চাতে। আমি সম্মুখ হইতে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম। হ্যাঁ, এক যোড়া চক্রবাক্, হংস জাতীয় এই পাখী আমি বহুবার দেখিয়াছি—শিকারও করিয়াছি। কবির বর্ণনায় চক্রবাক্ দম্পতির প্রণয়-কথা শতবার পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

না, এ সুযোগ কোন মতেই ত্যাগ করা যায় না। সন্তর্পণে বন্দুক তুলিয়া পার্শ্বস্থ লতাগুল্মের আড়াল হইতে লক্ষ্য করিলাম। আমার লক্ষ্য কদাচিৎ ব্যর্থ হইয়াছে। আমার আবির্ভাব চক্রবাক্ দম্পতিকে তখনও যেন সচেতন করিয়া তুলে নাই।

মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোড়াটি টিপিলাম। একটা আর্ত্ত চীৎকার—পাখার ঝট্‌পট্ শব্দ—সঙ্গে সঙ্গেই একটা পাখী লুটাইয়া পড়িল। দেখিলাম অপরটি ঊর্দ্ধলোকে দ্রুত উত্থিত হইতেছে। সেই সঙ্গে সমগ্র বায়ুস্তর তাহার কাতর আর্ত্তনাদে আলোড়িত, মথিত ও ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে।

অকস্মাৎ সেই আর্ত্তচীৎকার আমার হৃৎপিণ্ডে সবলে গিয়া আঘাত করিল। পাখীর এমন একটা করুণ বিলাপ জীবনে যেন কখনও শুনি নাই।

মাধব ছুটিয়া আসিল। নিহত পাখীটিকে তুলিয়া ধরিয়াই বলিয়া উঠিল—"এটা চ'খী"।

আমি ইঙ্গিতে তাহাকে উহা ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলাম। তখন আমার বাগেন্দ্রিয় যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল!

চক্রবাক তাহার প্রণয়িণীর বিয়োগে সমগ্র আকাশতল বিলাপের গৈরিক ধারায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। পাখীর এমন শোক জীবনে দেখি নাই—হয়ত দেখিয়া থাকিলেও তাহা লক্ষ্য করি নাই। তবে প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী মোঁপাসার একটি গল্পে এমনই ধারা কাহিনী পাঠ করিয়াছিলাম।

কেন এই হত্যা করিলাম! পরম নিশ্চিন্ত মনে চক্রবাকী তাহার প্রেমাস্পদের পার্শ্বে বসিয়াছিল। আমি কেন তাহার প্রাণনাশ করিলাম? অসহ্য! চক্রবাকের এ দুর্দ্দমনীয় শোক মানুষের দুঃখ যন্ত্রণাকেও যেন অতিক্রম করিতে চাহে।

মাধব পুনরায় পাখীটিকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, "খবরদার ছুঁস্‌নে। ওখানেই পড়ে থাক্।"

আমি দ্রুতপদে বজরার দিকে ফিরিলাম। মাধবও আমার অনুসরণ করিল। চক্রবাকীর মৃতদেহ সেইখানেই পড়িয়া রহিল। চক্রবাক ঊর্দ্ধদেশে তখনও চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তেমনই হৃদয়ভেদী আর্ত্তচীৎকারে বায়ুমণ্ডলকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল।

বন্দুকটাকে পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া দুই কর্ণ প্রাণপণে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম।

মাধব আমার ব্যবহারে যে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিল তাহা বুঝিলাম। ব্যাঘ্র শিকারেও যাহার মনে দুর্ব্বলতা মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশ পায় নাই, একটা সামান্য পাখী মারিয়া সে এমন বিচলিত হইল কেন, ইহা বুঝিবার মত শক্তি তাহার ছিল না।

* * * *

জোরে—প্রাণপণ বেগে টা'না—।

দাঁড়ি ও মাঝি আমার মুহুর্মুহু আদেশে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

বজরার মধ্যে আমি অস্থির হইয়া উঠিতেছিলাম। চক্রবাকের চীৎকার তখনও যেন আমার কানে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল।

পদ্মার বিস্তীর্ণ বক্ষে তখনও পূর্ণিমার চন্দ্রালোক। একটা স্বচ্ছ যবনিকা দূরের বস্তুকে দৃষ্টিপথ হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পদ্মার কলস্বরে ও কি গান বাজিয়া উঠিতেছে? ভৈরবীর করুণ রাগিণী? বাতাস কি আমার কানে কানে কথা বলিবার জন্য ব্যাকুল?—বনদেবী কি আজ আমাকে অভিশাপ দিবার জন্য বদ্ধ পরিকর?

"মাঝি, আর কত দূর?"

"হুজুর আর দেরী নেই। বাঁকটার ওপারেই আমাদের খাল।"

নদীর তীর সবই পরিচিত। বুঝিতেছিলাম শীঘ্রই বাড়ী পৌঁছিব। কিন্তু অধীর মন তথাপি একজন সমর্থক খুঁজিতেছিল।

আর দেরী নাই—আর অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে বাড়ী পৌঁছিব। গৃহ আজ আমাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে। সকালে উষার ম্লান, কাতর মুখ দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার আয়ত নেত্রযুগলে অশ্রুধারা বহিতে দেখিয়াছি। সে আমাকে আজ শিকারে আসিতে নিষেধ করিয়াছিল—বহুবার কাতর মিনতি জানাইয়াছিল। তাহার কথা শুনিলে ভাল হইত।

চক্রবাকীর মৃত্যু মলিন চক্ষুর দৃষ্টি সহসা আমার চিত্তে জাগিয়া উঠিল!

উষার মুখ—আমার চিরবাঞ্ছিতা দয়িতার নয়নের করুণ দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে আমার মনকে এমন নিপীড়িত করিয়া তুলিতেছে কেন? তাহার কাতর আহ্বান যেন বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। সমগ্র চিত্ত দিয়া সে যেন আমাকে আহ্বান করিতেছে।

ও কি! দিগন্ত প্লাবিত করিয়া বিরহবিধুর চক্রবাকের হা হা ধ্বনি কি এতদূর ভাসিয়া আসিতেছে? ঐ ক্ষুদ্র কণ্ঠের শোকোচ্ছ্বাস কি চরভূমি হইতে বিশ মাইল দূরবর্ত্তী এখানকার আকাশকেও আলোড়িত করিতে পারে? অতটুকু দেহের অন্তরালে এত শক্তি—এত প্রেম কে দিয়াছে?

"মাঝি?"

"হুজুর!"

"জোরে ঝাঁকি মার্। ওরে, তোরা জোরে দাঁড় টান্। অনেক রাত হয়ে গেল যে!"

"এই ত খালে ঢুকলাম হুজুর! আর দশ মিনিট!"

বজরা তখন খালের মধ্যে সত্যই প্রবেশ করিতেছিল। আর বিলম্ব নাই। ঐত বাঁধা ঘাট দেখা যাইতেছে।

প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে পৌঁছিবার জন্য আমার সমগ্র অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

আটখানি দাঁড় এক সঙ্গে জলে পড়িতেছিল, উঠিতেছিল।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, রাত্রি প্রায় ৯টা বাজে। প্রায় ১৪ ঘণ্টা বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি। আমার উষা-রাণী না জানি কি করিতেছে। মার জন্য চিন্তা ছিল না। তিনি তাহার ছেলের শিকার ব্যাপারে দীর্ঘকালের অনুপস্থিতি সহ্য করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু উষা ভালবাসিত না বলিয়া আমি শিকার স্পৃহা অনেকটা কমাইয়া আনিয়াছিলাম।

"হুজুর ঘাটে এসেছি।"

তৎক্ষণাৎ একলম্ফে তীরে নামিয়া, বন্দুকটা আনিতে বলিয়াই দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিলাম।

* * * *

বাড়ীর প্রাঙ্গনে এত লোক কেন?

রুদ্ধশ্বাসে, কম্পিত বক্ষে ফটক পার হইয়া ছুটিয়া চলিলাম একবার চকিতে চাহিয়া দেখিলাম, সকলেই আমার প্রজা। কেন তাহারা এ সময় এভাবে উপস্থিত?

কিন্তু আমার রসনা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য স্পন্দিত হইল না! একটা হিমশীতল অবসাদ অকস্মাৎ দেহের মধ্যে আবির্ভূত হইল।

নায়েব মহাশয়ের উৎকণ্ঠিত মুখমণ্ডল দেখিয়া নিমেষের জন্য স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, "আপনি শিগ্‌গীর ভেতরে যান ডাক্তারবাবুরা আছেন।"

ডাক্তারবাবু? কি হইয়াছে যে, ডাক্তারবাবুরা উপস্থিত হইয়াছেন?

অকস্মাৎ মনে পড়িল, উষা আসন্ন-প্রসবা। তবে, তবে—

দ্রুতবেগে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম।

একটা চাপা শোকোচ্ছ্বাস যেন কানে গেল। কে কাঁদিতেছে?

একটা বড় ঘরের দ্বারপ্রান্তে আমাদের প্রবীণ ডাক্তার বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ। "এসেছ সুধীর? কিন্তু—"

কিন্তু কি?—বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখি, সহরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার দাস ঘর হইতে বাহির হইবার চেষ্টায় পা বাড়াইয়াছেন।

আর—আর অদূরে ও কে? আমারই—আমারই প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনীর দেহ নিশ্চল, নিথর।

"পার্ল্লাম না সুধীরবাবু! বেলা ১২টা থেকে চেষ্টা করলাম। ছেলে কেটে বার করেও—"

পাশের ঘর হইতে মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সহরের প্রসিদ্ধা ধাত্রী নতমুখে দাঁড়াইয়া রুমালে চক্ষু মুছিতেছেন। তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, এই কিছু পূর্ব্বেও আপনার স্ত্রী একবার শুধু আপনাকে দেখবার জন্যে বড় ছট্‌ফট্ করছিলেন,—আর বড় কেঁদেছেন, কিন্তু,—"

নাই! সবই শূন্য! সমস্ত অন্ধকার! আজ যে আমার উষা নাই! আমার প্রাণের উষা, আমায় ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল? একবার শেষ দেখা!—

সুদূর দিগন্ত হইতে যেন হা হা রব ভাসিয়া আসিল। চক্রবাকের বুকফাটা ক্রন্দন যেন সমগ্র কক্ষকে মথিত—বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল। উষার উন্মিলিত কৃষ্ণতার নয়নে চক্রবাকীর মৃত্যুমলিন দৃষ্টি কি শেষ বিদায় বাণী রাখিয়া গিয়াছে!

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

তিরিশে

শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য

আমারে ডেকোনা আর তোমাদের উৎসব-অঙ্গনে,
চেয়োনা আমার সঙ্গ তোমাদের আনন্দ-লীলায়,
তোমরা এখনো দীপ্ত নিত্যনব আলোক-রঙ্গনে,
এবারের মতো মোর শেষরশ্মি যৌবন-মিলায়।
বিংশতি বসন্ত তা'র পরিপূর্ণ চুম্বনের ডালি
উজাড়ি' ঢালিছে আজো তোমাদের সর্ব্ব দেহে মনে,
আমার সকল ঘট একে একে হ'য়ে যায় খালি,
বিশাল জগৎ আসে ক্ষুদ্র হ'য়ে ত্রিংশতের কোণে।
সম্মুখে অনন্ত আশা—আলোকের উজ্জ্বল উৎসাহ,
তোমরা সন্তরি' চলো সমুচ্ছল যৌবন-জোয়ারে,
আমি ক্লান্ত, ভগ্নোদ্যম, ক্ষান্ত মোর শক্তির প্রবাহ,
আমারে ডেকোনা মিছে তোমাদের প্রাণ-পারাবারে।
তীর থেকে আমি শুধু দেখে নিই সকরুণ চোখে
তোমাদেরি মাঝে মোর হারানো সে অতীত স্বপ্নকে।

যৌবন

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ

তোমার প্রেমের লাগি আকুল ক্রন্দন
ধ্বনিয়া উঠেছে আজ সর্ব্ব দেহে মনে।
তোমার অনন্ত রূপ রস ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে ব্যাকুলি তোলে সমগ্র জীবন।
কোমল অমল কান্ত স্নিগ্ধ অতুলন
পরশ-অসহ, দীপ্ত কোন্ বিশ্ব-কোণে
ফুটেছ আকাঙ্খাতীত কামনার ধন?
উৎসারি অমিয়মাখা স্বর্ণ শতদল
জীবনের স্বপ্ন মম মূর্ত্ত হয়ে ফুটি
ভুবন ভরিয়া তব সুধার ধারায়?
আকাশ ব্যাকুল হল পবন চঞ্চল
সাগর নমিয়া পড়ে পদতলে লুটি
সঙ্গীতের সুর কাঁপে তারায় তারায়।

এভারেষ্ট বা গৌরীশঙ্কর অভিযান

শ্রীপিনাকীলাল রায়

ইউরোপের মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ পর্ব্বতারোহীর দল (British mountaineers) এভারেষ্ট অভিযানে যাত্রা করেন। ১৯২১ সালের পূর্ব্বে কোনো আরোহীই এই এভারেষ্ট শৃঙ্গে উঠিবার জন্য ২৪,৬০০ ফিটের অধিক ঊর্দ্ধে অগ্রসর হইতে পারেন নাই কিম্বা ২৩,৫০০ ফিটের চেয়ে ঊর্দ্ধে উঠিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে সাহসী হন নাই। মোটের উপর তখন এভারেষ্ট শৃঙ্গ হইতে চতুর্দ্দিকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে মনুষ্য-পদস্পৃষ্ট হওয়া দূরে থাক বরং তথায় উঠিবার কল্পনাও কেহ করিতে পারে নাই। ১৯২০ সালের শেষভাগে মহাযুদ্ধের অবসান হয়। তারপর ১৯২১ সালের প্রথম ভাগে একদল ব্রিটিশ পর্ব্বতারোহী, কর্ণেল হাওয়ার্ড বেরীর নেতৃত্বে (Under Colonel Howard Bury) এভারেষ্ট অভিযানে রওনা হন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম যতদূর সম্ভব পার্ব্বত্য আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং যে পথ ধরিয়া তাঁহারা ঊর্দ্ধে উঠিবেন, সেই পথ ও তৎসংলগ্ন চড়াই ও উৎরাইগুলির অবস্থান কতকটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, পূর্ব্বদিকস্থ রংবাক তুষার উপত্যকার (Valley of The east Rongbuk Glacier)
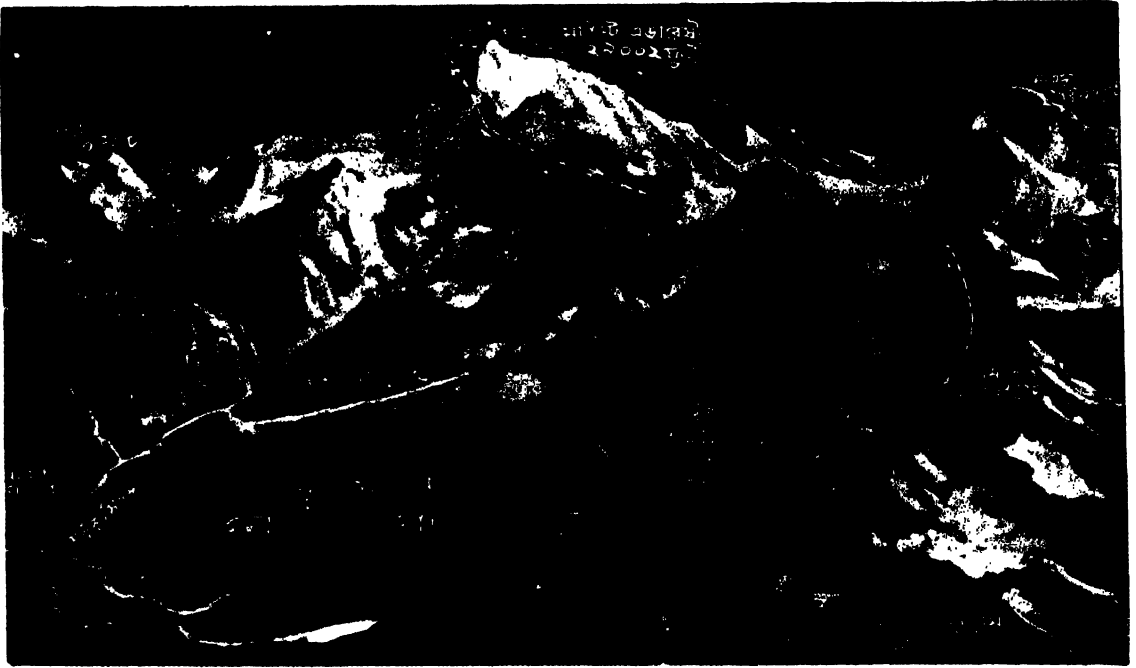
এভারেষ্ট শৃঙ্গের উপর সর্ব্বপ্রথম এরোপ্লেন অভিযানের দৃশ্য,—
গত ৩রা এপ্রেল তারিখে হষ্টন এভারেষ্ট এক্স্‌পিডিশান্‌-এর এরোপ্লেন কর্ত্তৃক ইহা সংঘটিত হইয়াছিল।

উপর দিয়া ২৩,০০০ হাজার ফিট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিবার একটি রাস্তা (Route) আবিষ্কার করেন। এই স্থান হইতে পূর্ব্বোত্তর পর্ব্বত-মালা (North East Ridge) বাহিয়া ঊর্দ্ধে উঠিবার মত আর একটি পথের সন্ধান তাঁহারা পান। এই পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে যখন তাঁহারা উত্তর দিকে সর্ব্বশেষ উৎরাই (North Peak) "চ্যাংসি" শৃঙ্গে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ঋতুর প্রভাব তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিলেন। অর্থাৎ তখন আশ্বিন মাসের প্রায় প্রথম সপ্তাহ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে। দারুণ শীতে ও তুষার পতনে সকলেই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহারা সেবারের মত হিমালয়ের অনেক গুপ্ত রহস্যের সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর ১৯২২ সালের প্রথম অভিযান জেনেরাল ব্রুসের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। পূর্ব্ব রংবাক তুষার উপত্যকার পার্শ্বে ও উপরে কয়েকটি ক্যাম্প্ (Camp) স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম ক্যাম্প ১৭,৪০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে, দ্বিতীয়টি ১৯,৪০০ ফিট্ এবং তৃতীয় ক্যাম্পটি ২১,০০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে স্থাপিত হয়। এই একুশ হাজার ফিটের ঊর্দ্ধে অধিরোহণ করা যদিও খুবই সঙ্কটজনক ও কষ্টসাধ্য তবুও তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল কেবলমাত্র কয়েকজন কষ্টসহিষ্ণু ও বলিষ্ঠ পাহাড়ীর সাহায্যে ও তাহাদের অভিজ্ঞতায়। এইরূপে তাঁহারা শেষ পূর্ব্বোত্তর দিকস্থ "চ্যাংসি" শৃঙ্গে উঠিয়া তাঁহাদের চতুর্থ ক্যাম্প স্থাপন করিতে সক্ষম হন। এই স্থান হইতে ২০শে মে তারিখে তাঁহারা এভারেষ্ট অভিমুখে যাত্রা সুরু করেন। জীবন মরণ তুচ্ছ করিয়া এত বড় দুঃসাহসিকের কাজে পা বাড়াইতে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ কোনো দিন এতদূর অগ্রসর হওয়া দূরে থাক, কল্পনাও করে নাই।

এই স্থল হইতে তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হন। প্রথম দলে ছিলেন ম্যালোরি, সমারভেল্, নর্টন, এবং মোরশেড। ইঁহারা বিনা অক্সিজেনে অগ্রসর হন ও ইঁহাদের মধ্যে তিনজন ২৬,৯৮৫ ফিট্ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে অধিরোহণ করিতে সক্ষম হন। আর একদলে দুইজন—ফিন্চ (Finch) ও জিওফ্রে ব্রুস্ (Geoffrey Bruce) তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে সুরু করেন এবং তাঁহারা অক্সিজেনের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত দলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ২৭,২৩৫ ফিট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে যাহারা এই পথ ধরিয়া এভারেষ্ট অভিমুখে আসিয়াছিল তাহাদের চেয়ে ইহারা ২৭০০ ফিট বেশী আরোহণ করেন।

এভারেষ্ট শৃঙ্গের ২৮০০০ ফিট ঊর্দ্ধ হইতে মিঃ সমারভেল কর্তৃক গৃহীত চিত্র। সম্মুখের উচ্চদেশে কৃষ্ণবর্ণ আংরাখায় আবৃত যে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যায় উনিই সুপ্রসিদ্ধ পর্ব্বতারোহী কর্ণেল নর্টন।

এই স্থান হইতে উভয় দলই প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন এবং পূর্ব্ব রংবাক্ উপত্যকার সর্ব্ব নিম্ন ক্যাম্পে ফিরিয়া আসেন।

পুনরায় ৭ই জুন তারিখে ম্যালোরি, সমারভেল্ এবং ক্রফোর্ড চৌদ্দজন পাহাড়ী সঙ্গে লইয়া সেবারকার মত আর একবার শেষ চেষ্টা করেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে যেখানে তাঁহাদের চতুর্থ ক্যাম্প স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই অভিমুখে অগ্রসর হন। কিছুদূর উর্দ্ধে উঠিবার পর নৈসর্গিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সূচিত হয় এবং হঠাৎ একটা নিদারুণ বিয়োগান্ত ব্যাপারে (Tragedy) এবারকার যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই দলে যত জন লোক ছিলেন সকলেই সহসা স্খলিত তুষারের গতি মুখে পতিত হইয়া, তুষারের সঙ্গে গড়াইতে গড়াইতে অনেক নীচে আসিয়া পড়েন। সাতজন পাহাড়ী মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অবশিষ্ট লোক তুষার ও ক্ষুরধার প্রস্তরের সহিত প্রাণপণ শক্তিতে যুঝিতে যুঝিতে অবশেষে বিকলাঙ্গ দেহ লইয়া মৃত্যুর মুখ হইতে কোনো রকমে পরিত্রাণ লাভ করে।

স্যার রবার্ট ব্রুসের জাতি সহজে হটিবার পাত্র নহে। তাঁহারা প্রকৃতির সহিত উপর্য্যুপরি দুইবার যুদ্ধ চালাইয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহারি ফলে ১৯২৪ সালে জেনেরাল ব্রুস্ পুনরায় তৃতীয়বার এভারেষ্ট অভিমুখে তাঁহার অভিযান চালাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু "অদৃষ্ট অদৃষ্ট কভু তুষ্ট নয় নয়"। পূর্ব্ব রংবাক তুষার উপত্যকার উপর তৃতীয় ক্যাম্প স্থাপিত হইবার পর এমন বিশ্রী ঝড় বৃষ্টি ও তুষার পতনের সূচনা হইল যে তাঁহারা প্রাণ লইয়া একদম নীচে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এই দুর্যোগ প্রায় মাসাধিক কাল স্থায়ী ছিল।

তারপর প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলে, জুনের প্রথম সপ্তাহে, নানারকম রক্ষাকবচে সুসজ্জিত হইয়া ও সেই পূর্ব্বের পথ ধরিয়াই তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করেন এবং ১৯২২ সালে যে স্থানে চতুর্থ ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছিল সেই পূর্ব্বোত্তর দিকের সর্ব্বশেষ উৎরাই "চাংসি" শৃঙ্গে তাঁহারা এবারও চতুর্থ ক্যাম্প স্থাপন করেন। এই স্থান হইতে নর্টন ও সমারভেল্ অক্সিজেনের সাহায্যে এভারেষ্ট শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকেন। তাঁহারা ২৫,৩০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া পঞ্চম ক্যাম্প এবং ২৬,৪০০ ফিট উর্দ্ধে ষষ্ঠ ক্যাম্প স্থাপন করেন। তারপর ঐ স্থান হইতে তাঁহারা অনেক কষ্টে সৃষ্টে ২৮,১২৬ ফিট উর্দ্ধে অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের ঠিক নিম্নে গিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে আসিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের দেহের সমস্ত শক্তি যেন হঠাৎ কোনো অশরীরীর আকর্ষণে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এমনিই আশ্চর্য্য ব্যাপার যে একফুটও উর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা তখন আর তাঁহাদের নাই, কিন্তু নিম্নে নামিবার শক্তি তাঁহাদের যথেষ্টই ছিল। তখন তাঁহাদের মনে হইতেছিল যেন কোনো অদৃশ্য হস্ত তাঁহাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া নিম্নে ঠেলিয়া দিতেছে আর কোথা হইতে যেন একটা শব্দ আসিতেছে—বম্-বম্ বম্!

যাহা হউক উক্ত স্থান হইতে তাঁহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইলেন দেখিয়া ৮ই জুন তারিখে ম্যালোরি ও আইরভিন্ অক্সিজেনের সাহায্যে আর একবার শেষ চেষ্টা করিলেন। এবার যদিও তাঁহারা ২৮,২৩০ ফিট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিবার শক্তি পাইয়াছিলেন কিন্তু সেই স্থানেই তাঁহাদের জীবনের মেয়াদ ফুরাইয়া গেল, দুটি নিঃস্বার্থপরায়ণ অমূল্য জীবন হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের তুষারতলে চির সমাধিস্থ হইয়া রহিল।

তাঁহারা তথায় কিরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইল তাঁহার কোন সংবাদই কেহ জানিতে পারিত না যদি না মিঃ ওডেল্ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পশ্চাদানুসরণ করিতেন। তাঁহাদের মৃত্যু সম্বন্ধে মিঃ ওডেলের বিবরণ হইতে যাহা কিছু জানা যায় তাহা এই—

"প্রায় ২৬০০০ ফিট উর্দ্ধে আমি একটি ক্ষুদ্র শৃঙ্গের উপর উঠি। সে স্থানের বরফের অবস্থাটা সুবিধাজনক মনে হইল না। অন্যান্য স্থানের জমাট বরফএর চেয়ে সে স্থানের বরফ যেন কতকটা নরম ও শিথিল ভাবাপন্ন। তখন সে স্থানটা বিপজ্জনক ভাবিয়া অতি সন্তর্পণে আরও ১০০ ফিট উর্দ্ধে আর একটি শৃঙ্গে উঠিয়া পড়িলাম। "বাইনাকুলারের" সাহায্যে উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম সেই স্থান হইতে প্রায় ২০০০ ফিট উচ্চে শ্বেতবর্ণ বরফের উপর কৃষ্ণবর্ণ আংরাখায় আবৃত দুটি মনুষ্য মূর্ত্তি। তখনো আমার দেখা

শেষ হয়নি, এমন সময় দেখিলাম, আমার উর্দ্ধদেশের সঞ্চিত তুষার রাশি হঠাৎ নিম্নগামী হইতেছে এবং পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম যে, শ্বেতবর্ণ এভারেষ্ট শৃঙ্গের রং হঠাৎ বদলাইয়া গিয়া তাহার স্বাভাবিক রূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—সে তাহার লুক্কায়িত কৃষ্ণবর্ণের দন্তপাতি বাহির করিয়া কি কারণে যেন অকস্মাৎ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। এই বিভৎস দৃশ্যে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং কি যেন একটা আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে এই ভয়ে, আপনা আপনি আমার চক্ষু দুটী মুদ্রিত হইয়া আসিল। পর মুহূর্ত্তেই চাহিয়া দেখি, অনেকটা দূরে, কি যেন একটা ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ, শ্বেতবর্ণ বরফের সঙ্গে নীচে নামিয়া যাইতে যাইতে, একটা উচ্চ প্রস্তর খণ্ডে আটকাইয়া গেল। পরক্ষণেই আর একটি উক্তরূপ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিলাম, প্রথম পদার্থটি যে প্রস্তর খণ্ডে আটকাইয়া গিয়াছিল তাহারই উপর উঠিয়া পড়িয়াছে ও দ্বিতীয়টি ঠিক ভাঁটার মত গড়াইতে গড়াইতে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য মুহূর্ত্তের মধ্যে মেঘে ঢাকিয়া গেল। প্রথম পদার্থটির সহিত দ্বিতীয় পদার্থটি এক সঙ্গে মিলিত হইতে পারিল কি না তাহা আর দেখা গেল না।"

এই বিয়োগান্ত ব্যাপারের পর নয় বৎসর যাবত আর কেহই হিমালয়ের এভারেষ্ট অভিমুখে যাইতে সাহসী হয় নাই। তারপর এই সেদিন, গত এপ্রিল মাসে মিঃ হাগ্ রাট্‌লেজ্ (Mr. Hugh Ruttledge) চতুর্থ বার এভারেষ্টের পথে তাঁহার অভিযান পরিচালিত করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক মাস ধরিয়া হিমাদ্রির নানাস্থান পরিদর্শন করেন। স্থানীয় অধিবাসী পাহাড়ীদের মুখে পর্ব্বতের সঙ্কটজনক স্থানগুলির ও নৈসর্গিক সুবিধা অসুবিধার বিষয় সম্বন্ধে নানারকম তথ্য সংগ্রহ করিয়া, যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া, তিনি পুনরায় অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। যদিও তিনি জানিতেন যে, এই হিমালয়ের পথের সর্ব্বত্রই বিপদসঙ্কুল তবু তিনি বলিতে পারেন না যে, সেই সমস্ত বিপদ্ আপদ (difficulties) ১৯২৪ সালের চেয়ে কম কি বেশী হইবে।

মিঃ রাট্‌লেজ্ ২১০০০ ফিট্ উর্দ্ধে, সেই পূর্ব্ব রংবাক্ তুষার উপত্যকার ঠিক পার্শ্বদেশে, তৃতীয় ক্যাম্প স্থাপন করেন। এই স্থান হইতে "চ্যাংসারিজের" দূরত্ব প্রায় এক হাজার ফিট্, আর এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করাই সব চেয়ে বিপজ্জনক। কারণ পা, বুক ও হাত এই তিনটির উপর ভর দিয়া প্রায় সোজাসুজিভাবে বরফের প্রাচীর বাহিয়া এই হাজার ফিট্ স্থানটুকু অতিক্রম করিতে হইবে। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে "চ্যাংসির" এই বরফ প্রাচীর বাহিয়া প্রাচীরের মস্তক দেশে অর্থাৎ ২২০০০ ফিট্ উর্দ্ধে তাঁহার চতুর্থ ক্যাম্প স্থাপন করেন। তারপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ ক্যাম্প দুইটি ২৫০০০ ফিট্ ও ২৬০০০ ফিট্ উর্দ্ধদেশে পর পর স্থাপন করিয়া, পরিশেষে ২৭০০০ ফিট্ উর্দ্ধে, এভারেষ্ট শৃঙ্গের স্কন্ধদেশে গিয়া আরোহণ করেন।

পূর্ব্ব রংবাক্ তুষার উপত্যকার দৃশ্য

তিনি যে সময়ে এভারেষ্টের কাঁধে উঠিয়া বসিয়া আছেন, ঠিক সেই সময়ে—সেই ৩রা এপ্রিল তারিখে আর একটি অভিযান শূন্য পথ দিয়া (By Aeroplanes) এভারেষ্ট অভিমুখে রওনা হয়। "হষ্টন্ ওয়েষ্টল্যাণ্ড এণ্ড ওয়ালেস্ এয়ারোপ্লেনস্" কোম্পানীর দুইখানি "উড়ো জাহাজ" কর্ণেল এল্, ভি, এস্, ব্লেকার, লর্ড ক্লাইডেসডেল্, ফ্লাইট্ লেফ্টেন্যাণ্ট ডি, এফ, ম্যাকিন্টায়ার এবং মিঃ এস্, আর, বেনেট্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। তাঁহারা বেহার—পূর্ণিয়ার "লালবালু এয়ারোড্রোম্" বা উড়ো জাহাজের আড্ডা হইতে প্রাতে ৮-২৫ মিনিটের সময় দুইটি উড়ো জাহাজে চড়িয়া যাত্রা করেন এবং দেড় ঘণ্টার পর, ১০-৫ মিনিটের সময় তাঁহাদের উড়ো জাহাজ দুটি পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্টের মস্তকোপরি ১০০ ফিট্ উর্দ্ধে—শূন্যদেশে উঠিয়া উড়িতে থাকে। এভারেষ্ট ও লোট্সি শৃঙ্গদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া উহারা প্রায় ১৫ মিনিটকাল ২৯১০২ ফিট্ উর্দ্ধে অবলীলাক্রমে উড়িয়াছিল। উঠিবার সময় এয়ারোপ্লেন দুটি পূর্ব্ব রংবাক্ তুষার উপত্যকার ও নর্থ-পিক্ বা চ্যাংসি শৃঙ্গের উপর দিয়া গিয়াছিল কিন্তু নামিবার সময় তাঁহারা লোট্সি শৃঙ্গকে বামে রাখিয়া ও রংবাক্ তুষার উপত্যকার কতকটা অংশের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে, সুস্থ শরীরে স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন।

মিঃ হাগ্ রাট্লেজ এভারেষ্টের স্কন্ধদেশে বসিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। যে অসাধ্য সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি জীবন মরণ তুচ্ছ করিয়া পদব্রজে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা এই হতভাগা "উড়োদলের দ্বারা" যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি আর অগ্রসর হইলেন না। উৎসাহহীন—উদ্যমহীন—শক্তিহীন—অবসন্ন দেহ লইয়া সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

১৯২৪ সালে যে পথ ধরিয়া ম্যালোরি ও আইরভিন্ সাহেব এভারেষ্ট শৃঙ্গে প্রায়ই উঠিয়া আর ফিরিতে পারেন নাই, বোধ হয় এই সেই মহাপ্রস্থানের পথ! যুধিষ্ঠির আধ্যাত্মিক শক্তির বলে যে স্থানে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, আজ এই ১৯৩৩ সালের গত এপ্রিলে, সেই স্থানটা দেখিয়া আসিয়াছে একদল জড় বৈজ্ঞানিক। কিন্তু এই শূন্যপথে ও পদব্রজে যাওয়ার মধ্যে যে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের ব্যবধান আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? যেদিন দেখিব, কোনো জড় তান্ত্রিক পদব্রজে কিম্বা শূন্যপথে গিয়া এভারেষ্ট শৃঙ্গের মস্তক পদস্পৃষ্ট করিতে পারিবেন ও তথায় তাঁহার বিজয় নিশান প্রোথিত করিয়া নির্ব্বিবাদে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইবেন সেইদিন বুঝিব যে, প্রতিচীর এই বিংশ শতাব্দীর জড়শক্তি প্রাচীর আধ্যাত্মশক্তির সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া, পরস্পর পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই মণিকাঞ্চন সংযোগ কখনও হইবে না, হইতে পারে না—যদিই বা কোনোদিন এই অসম্ভব সম্ভব হইয়া যায়, তাহা হইলে, তার চেয়ে পরমানন্দের কথা আর কী হইতে পারে!

ইংরেজদের আমলে, হিমালয় পর্ব্বতের যে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গদ্বয় "এভারেষ্ট" ও "লোট্সি" নামে জাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহাই আমাদের যুগ যুগান্তের "গৌরী শঙ্কর"! দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রে কৈলাসপুরী ও তন্মধ্যস্থ দেবতা গৌরী ও শঙ্করের চিত্র শৈশবকাল হইতেই আমাদের চিত্তপটেও আঁকা হইয়া রহিয়াছে। পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া, এই গৌরীশঙ্কর পর্ব্বতই যে কৈলাসপুরী এবং এই পুরীর মধ্যেই যে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গৌরী ও দেবতা শঙ্করের অধিষ্ঠান, তাহা আমরা জানিতে পারি। পুরুষের বাম পার্শ্বে যে প্রকৃতির স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে ইহাও এদেশের চিরাচরিত প্রথা এবং প্রকৃতির আকৃতি যে পুরুষ অপেক্ষা কথঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতর তাহাও একটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের অধীন। সুতরাং এই কল্পনার উপর, গৌরী ও শঙ্করের আকৃতিগত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এবং নিসর্গ ও দেবতাকে এক যোগসূত্রে গ্রথিত করিয়া, যিনি এই শৃঙ্গদ্বয়ের নামকরণ করিয়াছিলেন "গৌরীশঙ্কর" (বর্ত্তমান "এভারেষ্ট"—"লোট্সি") তিনি তাঁহার তৎকালিক সাহিত্য-শতদল অরূপের রূপের মধ্য দিয়া যে, কেমন ভাবে দলে দলে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা জগতের কোনো জাতির সাহিত্যের সহিত তুলনা হয় না—হইতে পারে না। কিন্তু আজ আমরা সেই ভারতীয় বৈশিষ্ট-জ্ঞাপক "গৌরীশঙ্কর" নাম দুটি ভুলিয়া গিয়াছি আর তাহার পরিবর্ত্তে পাঠশালার ভূগোল হইতে প্রাণপণ শক্তিতে মুখস্থ করিয়া রাখিতেছি দুটি বিজাতীয় নাম "এভারেষ্ট" ও "লোট্সি"। হায়রে নিঃস্ব জাতি, আজ জগতের মাঝে নিজের পরিচয় দিবি কেমন করিয়া?

পিনাকীলাল রায়

মানবের শত্রু নারী

শ্রীসুবোধ বসু

আট

পরদিন ভোরে অরুণাংশুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অলীক বলিয়া মনে হইল। স্বপ্ন দেখিয়াছে হয়ত! নইলে অমন্ পাগ্‌লামী করাও সম্ভবপর হয় বুঝি! সারাটা রাত কী অদ্ভুত ভাবে যে কাটিয়াছে তার ঠিক নাই। অমন করাও বুঝি কারুর দ্বারা সম্ভব। সারারাত পাতা নড়া, একটু জংলা গন্ধ, অশান্ত পায়চারি,—আর হ্যাঁ, অকারণেই ওর চোখ দুটো একটু যেন সজল হইয়া উঠিয়াছিল। দূর, তাই না আরো কিছু,—একদম অসম্ভব।

কিন্তু অরুণাংশু মনে মনে বেশ জানে ও-সব মোটেই স্বপ্ন নয়। যতই নিজেকে ভুলাইতে চাক্, মন কি আর ভোলে। তাই তাড়াতাড়ি ও 'মানবের শত্রু নারী' খুলিয়া লইল। সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে উপরের যে জায়গায় 'শত্রু' কাটিয়া অন্য একটা কথা বসান হইয়াছে। কে কাটিয়াছে ওটা? রেণুকা তো স্বীকার করে না,—ও বলে ওর হাতের লেখা মোটেই ঐ রকম নয়!

একপাতা, দু' পাতা, তিন পাতা,—বহুবার পড়া পাতাগুলিই অরুণাংশু উল্টাইয়া যায়। জগত সম্বন্ধে, নারী সম্বন্ধে ওর অভিজ্ঞতা খুবই কম। 'মানবের শত্রু নারী' হইতেই ও অনেক জ্ঞান আহরণ করিয়াছে। কোনদিন তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ হয় নাই। শাস্ত্রের কত জায়গা এবং নিজের সদুঃখ অভিজ্ঞতা হইতেই একজন সাধু বইটা লিখিয়াছে। এই বইয়ের তুলনা হয় না!

সমস্ত রাত জাগিয়া অনেক দেরী করিয়াই অরুণাংশু আজ উঠিয়াছিল। রোদ উঠিয়াছে,—প্রখর রৌদ্র। পড়িতে আর ইচ্ছা হয়না, কিন্তু পড়িতেই হইবে তাকে। মনটা শান্ত করার বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

আচ্ছা, কাল রাতে যদি ঐ মেয়েটা তাকে দেখিয়া ফেলিত? যদি হঠাৎ তার ঘুম ভাঙিয়া যাইত, আর সে আসিয়া দাঁড়াইত জানালার পাশে? কী হইত তবে? লজ্জায় তা হইলে আর সারা জগতের কাছে মুখ দেখান যাইত না। অমন ক্ষ্যাপামীতেও লোককে পায়,—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল নাকি? অন্য কেউ হইলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু সে নিজে,—একেবারে অমার্জ্জনীয়। 'মানবের শত্রু নারী' পড়িয়াছিল তবে কোন্ কাজে,—এতদিন ওকে অতটা শ্রদ্ধা করিবার তবে আর কোন্ ঠেকা ছিল! কী নিস্তব্ধ ছিল কাল রাতটা! অন্ধকারে বাদাম গাছটাকে কী চমৎকারই দেখাইতেছিল! রাস্তাটা যেন ঠিক ঘুমাইতেছিল। আর অন্ধকারে ঐ বাড়িটা কেমন জানি, রূপ কথায় শুধু তার একটা উপমা পাওয়া যায়! টিকটিকির শব্দে কেমন চমকিয়া উঠিয়াছিল। আর ঐ,—দূর্ ছাই, পড়া ছাড়িয়া ভাবিতেছে কী এ সব!

তাড়াতাড়ি মাথাটা নাড়িয়া অরুণাংশু বোধ হয় সব কল্পনা তাড়াইতে চেষ্টা করিল। এ বইটাকে আজ আবার সম্পূর্ণ পড়িতে হইবে!

বড় বড় আদর্শের কথা বলা হইয়াছে এই 'মানবের শত্রু নারীতে'। ভোগ একদম বর্জ্জন করিতে হইবে। জগতটা মিথ্যা,—মায়া বাড়াইয়া আর লাভ কী। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই যেন সংসারে অনাসক্ত হইতে যত্নবান্ হয়! উঃ,—এর চেয়ে বড় কথা জগতের আর কোন্ দর্শন বলিতে পারিয়াছে! দর্শনের একেবারে শেষের কথা।

এক পাতা, দু পাতা, তিন পাতা,—পাতার পর পাতা অরুণাংশু উল্টাইয়া যাইতেছে। সকল রকম দুর্ব্বলতার এমন্ কড়া জবাব আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অপূর্ব্ব বই এই 'মানবের শত্রু নারী'!

কিন্তু সহসা এ কী! বাহিরে কাহার যেন গলার সুর শোনা গেল! এবং শোনা মাত্র অকস্মাৎ বইটা অরুণাংশুর হাত হইতে একেবারে নীচে পড়িয়া গেল। হাতে আর একটুকুও জোর নাই যেন, একটা অসীম দৌর্বল্যে তাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সুজাতা ক'দিন এ বাড়িতে আসে নাই। অরুণাংশু জানেনা, অনেকটা তার উপরই অভিমান করিয়া ও আসা বন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সুজাতার কোন কিছুই বেশীক্ষণ মনে থাকে না। আজ আসিয়া ওর এতই উচ্ছ্বাস আর এত অজস্র হাসি সুরু হইয়াছে যে তাকে চাপিতে গেলে শুধু উল্টা ফল হয়। ও যেন একটা জল-প্রপাত,—কথা বলার আর খুসীর অন্ত নাই।

রেণু তুই কী দুষ্টু, বল্‌তো,—যাস্‌নি কেন, আমাদের বাড়িতে একদিন? বাঃ রে, আমি না এলে বুঝি আর যেতে হবে না। বেশ কথাতো! হা হা,—সুন্দর দেখাচ্ছে? দেখাবেই তো,—কী একখানা চেহারা আমার,—যেন মন্থরার সহোদর বোন্! আজ দুপুরে তেঁতুল মাখা খাবি? জ্বরকে ভয় পাই নাকি? আসুক না,—শুয়ে শুয়ে এম্‌ব্রয়ডারি করব,—ক্ষতি কি! যাবি আজকে পূজো দেখতে,—মাগো যা ম্লেচ্ছ আমরা, মা দুর্গার চেলারা শেষে প্রবেশ নিষেধ না করে দেয়। সারা রাত কাল যা ঘুমিয়েছি তা আর বলার নয়,—কি মজার একটা স্বপ্ন দেখেছি জানিস্? যেন মস্ত বড় একটা ঢোল কাঁধে চড়িয়ে পূজো বাড়িতে আবোল তাবোল্ বিস্তর বাজাচ্ছি, আর,—মাগো, হেসে আর বাঁচিনে। ঢোল-আলা গুলো কি রকম নাচে দেখেছিস্?

অরুণাংশুর সারা শরীরে কারণ-হীন একটা শিহরণ পড়িয়াছে? কী, ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরিল নাকি? কুইনাইন খাইতে হইবে? তবে? তবে কী এটা? এমন আর কোনো দিন হইয়াছে বলিয়া তো ওর মনে পড়ে না! কী এর অর্থ?

সুজাতার কথার আর শেষ নাই। কত কথাই ও যে বলিতে পারে! আর এমনি জোরে বলিবে যে আশে পাশের কারুর আর তার প্রত্যেকটা শব্দ না শুনিয়া উপায় নাই। কিন্তু ওর গলাটা মিষ্টি,—সেটা অস্বীকার করা যায় না।

চুপ করিয়া অরুণাংশু বসিয়া রহিল। কী হইল সব,—দূর্ ছাই, সব কিছুই যে ঘুলাইয়া যাইতেছে।

এমন সময় মায়ের গলা শোনা গেল। বাইরে সে নিশ্চয়ই সুজাতার সাথে কথা জমাইয়া দিয়াছে। অরুণাংশু সব শোনে না, কিন্তু যতই সে ঔদাসীন্যের ভাণ দেখাক্ ওর সে সব কথা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে না এমন নয়। কিন্তু তা শুধু অমনি,—কেউ কথা বলিলে তা শুনিতে ইচ্ছা হয় না বুঝি? আর কিছু নয়!

হ্যাঁ মাসীমা,—মা তো আসবে বলেছে, হয়ত আজকে দুপুরেই আসবে। দেখুন তো, রেণুকা আমাদের বাড়ী যায় না কেন? আমি বুঝি শুধু শুধু আসব। ওঃ,—হাতের এই আঁচড়টা। কে আবার, বাদল দিয়েছে। ওর সঙ্গে কাল যুদ্ধ করলুম কিনা,—হা হা। বলে, মেয়েদের গায়ে জোর নেই। পাজীটাকে খুব ধরে কিলিয়ে দিয়েছি। খাব? কী লোভের কথা! কিন্তু মাসীমা,—পেটে কি আর জায়গা আছে নাকি?

অরুণাংশুর আর পড়া হইল না। ঘরের মধ্যে সে প্রায় টলমল করিতে লাগিল। কী যে মেয়েটা কথা বলিতে পারে,—সারাক্ষণ ওর হাসি! ওর গলাটা মিষ্টি। ওর নাম বুঝি সুজাতা? অর্থ কি তার?

এক সময় রেণুকা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, ওরে বাবা, দরজার কাছে অমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বুঝি? আর একটু হলে ধাক্কা খেতাম যে।

অরুণাংশু কহিয়া উঠিল, হ্যাঁ, তোকে বলেছে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

ছিলে না?

হ্যাঁ, দাঁড়িয়েছিলুম না আরো কিছু। মাপ নিচ্ছিলাম দরজাটার,—একটা পরদা না হ'লে ভদ্রলোকের চলে বুঝি?

ওঃ। কতটা বড় চাই,—ক'গজ?

কয় গজ? মাপ্তি করিয়াছে। হাতের আশে পাশে টেপ থাকা দূরের কথা দরজা মাপা যায় এমন একটা

পেন্সিলও ছিল না। তাইতো,—বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে. তো সে এইবার।

কহিল, পাঁচ গজ।

পাঁচগজ? বলো কি তুমি, একটা পরদা বুঝি পাঁচ গজ হয় কখনো?

ছটো হ'তে পারে না বুঝি? চুপ করতো, গিন্নীপনা করতে হবে না সবটাতে। কত যেন বোঝেন তিনি!

অকস্মাৎ রেণুকা কহিল, সুজাতাদিকে বিয়ে করনা দাদা তুমি!

অরুণাংশু প্রথমটা সত্যসত্যই একেবারে চমকাইয়া উঠিল। কিন্তু সেটা শুধু মাত্র একটুক্ষণের জন্ত। তার পরই ও চেয়ার হইতে উঠিয়া রেণুকার দিকে তাড়া করিয়াছে,—তবে রে লক্ষীছাড়ী, দেখাচ্ছি তোকে।

রেণুকা হয়ত আগের জন্মে হরিণী ছিল। কোন্‌খান দিয়া কখন্ যে ও অন্তর্দ্ধান করিল, তা প্রায় টেরও পাওয়া গেল না।

অন্তদিন হইলে এরপর অরুণাংশু উপদেশ ও চিত্তশুদ্ধির জন্ত 'মানবের শত্রু নারীর' পাতা উল্টাইত। আজ কিন্তু তাতে ওর রুচি হইল না। নিঃশব্দে বারান্দায় আসিয়া সম্মুখের রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। সব কিছু যেন কেমন হইয়া গেছে। গাটা ওর বারবার কাঁটা দিয়া ওঠে, স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটা অবাস্তবতার মোহ থাকে আজ ওর প্রত্যেকটী জাগার ক্ষণ তেমনতর মনে হইতেছে। কে জানে কী যে মাতলামী ওর ঘাড়ে চাপিয়াছে! কতরকম যে মেয়েদের নাম হয়! ঐ মেয়েটার নাম সুজাতা,—তাই না?

রাস্তা দিয়া একটা লোক টবের গাছ বেচিতে লইয়া যাইতেছে। অরুণাংশুর কোন্ খেয়াল হইল, কে জানে। ছুইটা পাম্ কিনিয়া ও ঘরের কোনার রোগা তে-পায়াটাতে রাখিয়াছিল। চমৎকার সবুজ পাতা তো! আঃ, কাঁটার সাথে আবার একটা খোঁচা লাগিল। ওদের সাথে অতটা ঘনিষ্ঠতা ভাল নয় সেটা ভুলিলে আর চলে কি করিয়া!

আরেঃ, তার চুলে যে প্রায় জটা বাঁধিয়াছে। আশ্চর্য্য, এতদিন তো চোখে পড়ে নাই। আর চুল আঁচড়াইলেই বা ক্ষতি কি? এলোমেলো চুল থাকিলে বুঝি কম জ্বালাতন! স্বামী প্রত্যয়ানন্দের বইয়ে চুলের উপর ঔদাসীন্ত দেখাইবার উপদেশ আছে। কিন্তু এ কি আর শুধুমাত্র বাবুগিরির জন্ত সে আঁচড়াইতে চায়! অসুবিধা হয় না বুঝি? আর চুলগুলি এই রকম জঞ্জালের মত থাকিলে মানুষকে অদ্ভুত দেখায়ই তো! দূর, আয়নাতে কী বিশ্রী ছবি পড়িয়াছে, চুল এবার হইতে আঁচড়াইতে হইবে!

ছুপুরবেলায় সুপ্রিয়াদেবী আসিলেন,—আর তার সাথে যে সুজাতা আসিবে তা তো জানাই ছিল। মায়ের ও মেয়েদের এমনি গল্প সুরু হইল যে অরুণাংশুর আর সুস্থিরতা রহিল না। কোন্ জায়গায় প্রতিমা ভাল হইয়াছে,—রংতা বিলিতী, পূজায় কি সব নতুন রেকর্ড বাহির হইয়াছে, মাছ মোটেই ভাল পাওয়া যাইতেছে না, সেদিন কাঁচা কাঁচা ক'টা কমলা লেবু আনিয়াছিল আর ফুলকপি,—এমনই সব হরেক রকমের কথাবার্ত্তা।

সুজাতা রেণুকে টানিয়া আনিয়া বারান্দায় একটা কোণায় গল্প করিতে বসিয়াছে। মা'র কাছে থাকিলে ইচ্ছা মত হাসা যায় না। গান্ করনা একটা রেণু! হ'লোই বা দুপুর,—তার জন্ত গান গাইলেই বুঝি দোষ হবে। ঈস্ মেয়েকে মেয়ের মাটিতে আর পা পড়ে না। হ্যাঁ পা পড়ছে না ছাই,—পায়ে স্যাণ্ডালটা আছে ঠাকরুণ সে কথা ভুললে চল্‌বে কেন।

তারপর ওদের বসিয়া আর ভাল লাগে না। এ-ঘর ও-ঘর, ছাদ সিঁড়ি, বারান্দা ওরা ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল।

অরুণাংশুর কেন জানি প্রতিক্ষণই মনে হইতেছে, এই বুঝি বা ওরা আসিয়া তার ঘরে ঢুকিল। ওর তাতে একটু যে শঙ্কা ভাব তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু যে একটা উৎকণ্ঠা আছে, তা নয়, এমন একটা ভাব ওকে কেতকী ফুলের হঠাৎ-গন্ধের মত দোলা দিতেছে যাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলা যায় আগ্রহ। যখনই ঘরের কাছে কিছু একটা শব্দ হয় তখনই অরুণাংশু চমকিয়া ওঠে। দূর, কেউ কেউ ঘরে ঢুকিবে তাই বুঝি সে মনে করিয়াছিল। পাগল! হ্যাঁ সে হয়ত ভাবিয়াছিল,—অন্ত কিছু একটা ভাবিয়াছিল নিশ্চয়ই। ওর বহিয়া গিয়াছে কোন মেয়ে আসিয়া ঘরে ঢুকিল কি ঢুকিল না তা ভাবিতে! ঐ যে

কার পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে না? তাড়াতাড়ি অরুণাংশু আড় চোখে চাহিয়া দেখিল। দরজার সাথে বিড়ালটা পরিত্রাণে মাথা ঘষিতেছে। অরুণাংশু একটা বই ছুঁড়িয়া মারিল। বইটা কুড়াইয়া লইতে আসিয়া একবার সন্ত্রস্ত ভাবে বাইরে তাকাইয়াছিল কিন্তু কাউকে দেখিতে পাইল না।

সুজাতা ও রেণু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কতবার অরুণাংশুর ঘরের কাছ দিয়া গেল। কতবার এ পথ দিয়াই ওরা ফিরিল। কী মুস্কিল হইয়াছে, অরুণাংশুর গায়ে মিথ্যামিথ্যিই একটা হঠাৎ শিহর পড়ে কেন? ম্যালেরিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ঠিক তেমনও নয়। ও যেন একটা স্বপ্ন দেখার মত,—আর একটা সব ভুলাইয়া যাওয়ার অনুভূতি!

এর পরে অরুণাংশু যে কাণ্ড করিয়া বসিল তা সে কোনো দিন কল্পনা করিতেও পারে নাই। টেবিলের উপর 'মানবের শত্রু নারী'টা পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ সেদিকে চোখ পড়িতেই ওর মনে সহসা একটা হিংস্র ভাব চাড়া দিয়া উঠিল। গুরু বধের খবর ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়,—ধর্ম্মযুদ্ধে অর্জ্জুনমাত্র সে পাপ একবার করিয়াছিল। কিন্তু অরুণাংশু যেমন সহসা এবং বাহ্যতঃ কোন কারণ না থাকাতেও করিয়া বসিল তার ইতিহাস বিরল। 'মানবের শত্রু নারীর' শত টুকরা করিয়া ছেঁড়া পাতাগুলি বাতাসে সাদা সাদা পোকার মত উড়িয়া কে যে কোন্ পথে গেল তার সন্ধান রাখা সম্ভবপর নয়।

যা খুসী অরুণাংশুর তাই করিবে সে। বেশ, তার ইচ্ছা সে চুল আঁচড়াইয়া পরিপাটী করিবে, তার ইচ্ছা সে ভাল জামা পরিবে, আর,—হ্যাঁ, যা তার ভাল লাগিবে তাই সে করিবে,—নাই বা মিলিল তা সাধুর উপদেশের সঙ্গে। মেয়েদের গলা মিষ্টিই তো। মেয়েরা যদি বন্ধু হয় তবেই বা ক্ষতি কোথায়!

আচ্ছন্নের মত অরুণাংশু ঘরের এধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে সুরু করিল। যাক্ ওর এত দিনের শেখা সব জ্ঞান লুপ্ত হইয়া, জগতটা রসাতলে যাক্ তাতেও ক্ষতি নাই। বেশ, ও যদি মায়া হয়, মায়াই ভাল। একেই মায়া বলে বুঝি। আগে কে জানিত মায়া এই রকম হয়। জগৎ ঠিক মত চলিতেছে তো,—না মাটীই স্বপ্ন হইয়া উঠিয়াছে!

ঘরে আর থাকা যায় না। ইচ্ছা হইতেছে উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়ে। যদি একটা পক্ষীরাজ পাওয়া যাইত! গ্রহে গ্রহে কত আকর্ষণ,—সেই আকর্ষণের পথে টানুক না কেউ তাকে, নব নব তারকার আলোয় ও এমন সব পথ দিয়া ছুটিয়া চলিবে আর শুধু একটা অস্পষ্ট ছবি ওর শিরা উপশিরায় শিহরিয়া উঠিতেছে।

পাগলের মত রাস্তাটা দিয়া ও হনহন্ করিয়া ছুটিয়া চলিল। বাদাম গাছ, ঘুঘুপাখী, খড়ের ঘর, রৌদ্রের মধ্যে একটুকু ছায়া,—আর,—তাদের বাড়িতেই তো আছে সুজাতা। ও যাদু জানে নাকি? সেদিন টেবিলে ওর সবগুলি আঙুল সুছন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। আর কপাল হইতে ওর চুল তুলিয়া নেওয়া! আঙুরের গুচ্ছের মত চুলগুলি,—ওঃ, মায়া বুঝি এই রকম! ভারী চমৎকার তো!

নয়

অরুণাংশুর অবস্থা হইয়াছে প্রায় আবার সাধিলে খাইব গোছের। কিন্তু যখন দরকার ছিলনা তখন কান ঝালাপালা করিত। অথচ এখন সে সম্বন্ধে কেউ আর কথাবার্ত্তা উঠায়ই না,—সবাই একদম চুপ্ চাপ! নিজেই বা সে-সব কথা উঠায় কি করিয়া। বড় হাঙ্গামা হইয়াছে তো।

তাছাড়া ঐ জমিদারটা,—ঈস্ ভারী তো জমিদার,—তিন বিঘার মালিক তো তার চাল্ দেখ না। আরেকদিন তাকাউক দেখি ওটা,—একটা ঢিল মারিয়া সতর্ক করিয়া দিবে। কিন্তু ঢিল মারিলেই তো আর হইবে না। ছোকরাটাকে জখম করাই তো আর তার শেষ উদ্দেশ্য নয়।

অরুণাংশু এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে যে মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া আর উচিত নয়। কিন্তু অন্তত আরেকবার আক্ষেপের কথাটা না জানাইলে কেমন করিয়া আর অরুণাংশু আত্মত্যাগ করিয়া মাতৃভক্তি দেখায়। কিন্তু কী যে হইয়াছে মা'র, ওসব কথা আর উঠায়ই না। অরুণাংশুর

যে দারুণ পাপ হইতেছে সে কথাটা ভাবিয়াও দেখেনা একবার। এই রকম করিলে আর কিছুতেই পারা যায় না।

যতই দিন যাইতে লাগিল অরুণাংশুর ভয় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এক সময় ঐ বাড়ির ছেলেটাকেই ও বিবাহের একান্ত যোগ্য বলিয়া ঘৃণা দেখাইয়াছে। কিন্তু এখন ওর ক্রমশই উল্টা মনে হইতেছে। ঈস্,—ভারী তো জমিদার! কী বিয়ে করিবার ইচ্ছা রে,—মরি আর কি! হাবা-বোকা সবাই বিয়ে করিবে,—এ যেন ভাত খাওয়ার মত সহজ, গিলিলেই হইল! জগতে কে যে বিবাহ করিবার যোগ্য এ-বিষয়ে অন্তত পক্ষে মনে মনে ওর আর বিনয় নাই। নিজেকে ক্রমেই ওর প্রায় ইস্কাবনের টেক্কা মনে হইতেছে,—ওর মত জগতে তার জুটী হয় না!

কিন্তু তা হইলে কি হয় সবাই চুপ্ চাপ্! দুর্ ছাই,—এদের সব হইয়াছে কী। অরুণাংশুর প্রায় রাগিয়া যাইবার উপক্রম। সবাই রাজ্যের যত অবান্তর কথা কহিবে, কিন্তু যেটা কাজের কথা ভুলিয়াও যদি এখন আর তা বাহির হয়। অথচ ইতিমধ্যে ছোক্‌রা-জমিদার কি সব জোগাড় যন্ত্র করিতেছে কে বলিতে পারে!

ঘুমাইতে ঘুমাইতে সেদিন তো সহসা চমকিয়া জাগিয়াই উঠিয়াছিল। যাক্,—বাঁচা গেল, স্বপ্ন, সত্য নয়। কিন্তু সত্য হইয়া যাইতেই আর বাধা কি। তিন-পয়সার জমিদার,—ভারী তো একটা সে। এঃ,—কেষ্ট বিষ্টু যেন! ব্যাপারটা তার পক্ষে খুব আরাম করিবার মত নয়। লক্ষীছাড়া ছোঁড়াটা কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে,—ওর ভয়ে অরুণাংশুর মনে আর শান্তি নাই। ঘুম হইতে উঠিয়াই ভাবে,—এই রে, মারিল বুঝি, কোন্ খবর না আজ শুনিতে হয়। অথচ মায়ের এই রকম ঔদাসীন্য দেখিলে কার না রাগ হয়,—একটু হুঁস্ থাকে যদি। ক'বার সে একটু বেশী রকম চেঁচাইয়া না করিয়াছে বটে,—তার জন্য নিজেরও তার কম অনুতাপ নয়,—কিন্তু তাই বলিয়া বুঝি মা চুপ করিয়া যাইবে একদম। নিতান্ত অবুঝদের লইয়া পড়িয়াছে অরুণাংশু,—কিন্তু নিজেই বা সে ও প্রসঙ্গ তোলে আর কেমনে। ট্র্যাজিডি গল্পেই তার শোভায়, কিন্তু নিজের জীবনে সেটা ফলিতে আসিলে আর উৎসাহ থাকে না।

দুপুর বেলায় নিজের ঘরে বসিয়া অরুণাংশু অসম্ভব সব কল্পনা করিতেছিল। ছোক্‌রা-জমিদারকে একদিন ঘুষো-ঘুষিতে চ্যালেঞ্জ করিলে কেমন হয়। ওর ফুলা গাল দুইটা তা হইলে বেশ করিয়া সমতল করিয়া দেওয়া যাইত। আর ভুঁড়িটা বুঝি কোমরের উপরে থাকে না, ওখানে যদি জয়ঢাক বাজান যায় তবু নিয়মে আট্‌কাইবে নাকি? কিন্তু ডাকিলেই কি আর লড়িতে আসিবে ওটা! নিতান্তই ভীরু,—কাপুরুষ। অথচ বিয়ে করিবার সখটা পুরামাত্রা। যা না বিয়ে করগে, জগতে কত মেয়েই তো আছে,—কিন্তু এদিকে কেন? অরুণাংশুর রাগ কি আর অমনি হয়।

এমন সময় মা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। দুপুরের খাওয়া এই মাত্র শেষ হইয়াছে। মায়ের যত ইচ্ছা আর অভিযোগ তার বেশীর ভাগটা এই অবসরের সময়ই অরুণাংশুকে শুনিতে হয়। আগে ওর দুয়েকদিন বিরক্তই হইত। হয়ত 'মানবের শত্রু নারীর' একটা চমৎকার অধ্যায় পড়িতেছে এমন সময় আসিয়া অত্যন্ত অসার আলাপ জুড়িয়া দিল। কিন্তু আজ কদিন হইতে মা আর আসিতেছিল না, অরুণাংশুর উল্টা তাতেই রাগ হইতেছিল। মাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে আশান্বিত হইয়া উঠিল। যাক্, বোধ হয় একেবারে ভোলে নাই।

মা কহিলেন, কি রে, পড়ছিস নাকি। তাহ'লে আরেক সময় আসব'খন।

আরেক সময়? আরেক সময় আসিবার আর কোন্ প্রয়োজন। এখনই সে শুনিতে প্রস্তুত,—বিলম্ব করিয়া আর কোনো লাভই নাই।

তাড়াতাড়ি অরুণাংশু কহিল, না না মোটেই পড়ছি না। ব'সো না মা তুমি।

মা কহিলেন, তোর যাবার সময় হ'য়ে আসচে বুঝি?

অরুণাংশু কহিল, হ্যাঁ, মা। তোমার বলবার থাকে যদি কিছু তো বল না। চলে যাবার আর বেশী দেরী নাই আমার।

মা কহিলেন, না, বলার আর তেমন কি। বাড়িটা তৈরী হচ্চে,—কলকাতায় গিয়ে একটু খোঁজ খবর নিস্ তার।

শুধু এই, আর কিছু নয়,—আমি ভাবলাম আর কিছু বুঝি!

না, আর কি বলবো আবার। তাছাড়া কথা বললে কত শুনিস তুই,—বলতে বলতে তোর হার মেনেচি।

অরুণাংশুর মাতৃভক্তির নতুন একটা আদর্শ পৃথিবীর কাছে ধরিবে,—মা কি একটা চালাকি না কি,—স্বর্গাদপি গরীয়সী। বলুক মা,—অরুণাংশু এক্ষুনি রাজী হইয়া যাইবে। যাক্, মার যে খেয়াল ফিরিয়া আসিয়াছে এই যথেষ্ট,—নইলে ছোক্‌রা-জমিদার শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল অবস্থাটা। এবার তাড়াতাড়ি কিছু একটা না হইলেই অরুণাংশু গিয়াছে। মা'দের বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। একেবারে নাই যে, তা নয়।

তাড়াতাড়ি সে নিজেকে বিলাইয়া দিবার সুরে কহিল, না, তোমার কথা শুনেচি বৈকি,—বেশ তো একবার বলেই দেখনা শুনি কিনা।

মা কহিলেন, যাক্, এই সুবুদ্ধিটুকু বজায় থাক্‌লেই হয়। দেখ্ স্বাস্থ্য হচ্চে সবার ওপরে। দুধ না খেলে শরীর থাকে না কি কখনো!

শুনিয়া অরুণাংশুর তো চক্ষুস্থির! এরই জন্ম এত ভূমিকা। আর দুধের জন্যই এত বড় একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে। নিজের গালেই ওর একটা চড় বসাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কেউ ঘরে না থাকিলে মাথার চুল্ টানিয়া ছিঁড়িত। দুধ! ভারী তো দুধ! আর কিছু বলিবার পাইল না মা। কোনো কিছুর খেয়ালই যদি এদের থাকে,—ছাই, ভালো লাগেনা! বিশ্বসংসারে এত কিছু আছে, দুধ খাওয়া ছাড়া মা আর কি কিছু করিতে বলিতে পারিল না!

কিন্তু তারপরও কি মা দরকারী কথার দিক দিয়া যায়। খাওয়া পরার কথা, আত্মীয় স্বজনের সংবাদ, গল্প,—যত রাজ্যের যত অবান্তর কিছু তার দিকেই মা'র ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

মা কী কথা কহিতেছে অরুণাংশু আর শুনিতেছে না। একবার হঠাৎ চমকাইয়া সে শুনিল মা বলিতেছে, সেদিন সুজাতার মা—

তাড়াতাড়ি অরুণাংশু জিজ্ঞাস করিল, কার মা?

মা কহিলেন, ঐ তো বাদলের মা।

মাকে নিয়া আর পারা যায় না। স্পষ্ট সে শুনিয়াছে আরেকজনের মা বলিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিতেই ঘুরাইয়া বলিল, বাদলের মা। সুজাতার মা বলিলে সে যেন আর চেনেনা,—কেমন যে করে এরা। ছ্যাৎ!

হ্যাঁ, কী বলছিল বাদলের মা? আমার কথা?

নারে, আমার ডাঁটা গাছগুলো খুব ভাল হয়েছে তাই।

অরুণাংশুর আর সহ্য হইতেছে না। এমন করিলে ভালো লাগে নাকি কারুর। অকস্মাৎ ওর পাঠানুরাগ এমনি প্রবল হইয়া উঠিল যে আর বলার নয়। মা প্রশ্ন করিলেও ও আর মোটেই শুনিতেছে না। শুনিবে কি করিয়া,—অদরকারী প্রশ্ন কি শোনা যায় নাকি? এতগুলি প্রশ্নের মধ্যে একটাও জবাব দিবার উপযুক্ত নাই। তেমন একটা প্রশ্ন হইলে সে জবাব দিত বৈকি,—কান তার সতর্কই আছে!

সুজাতার উপরও ক্রমেই অরুণাংশুর রাগ হইতেছে। আগে তো সারাক্ষণ এই বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত,—হাসি আর কথার তোড়ে আশপাশ চারদিক মুখর হইয়া উঠিত। অথচ এখন একদম দেখা নাই। নাইবা আসিল,—ওর বহিয়া গেছে। বাড়িতে কেউ ঢুকিয়া হাসাহাসি করিলেই বরং ওর ভালো লাগে না!

বাঃ, বেশ তো জোৎস্না উঠিয়াছে। রাস্তায় বাহির না হইলে জ্যোৎস্না তেমন বোঝা যায় না। ঈস্, কারুদের বাড়ির ধারে সে যাইতেছে না আরো কিছু,—বাদাম গাছটার তলায় মাত্র যাইবে সে,—আর এক পাও আগাইবে না।

বেশ, যদি বাড়িটার সম্মুখ দিয়াই যায়, তবেই বা দোষ কি। বাঃ রে, পথটা ধরিয়া বেড়াইতে যাইতে পারিবে না বুঝি? কোন জান্‌লার দিকে তাকাইতে ওর একটু মাত্রও ইচ্ছা নাই,—দালানটা কতটা উঁচু তাই শুধু চাহিয়া দেখিতেছে। নাঃ, আর বেশী দূর যাইয়া কাজ নাই,—যে পথ দিয়া আসিয়াছে সেখান দিয়া সে আবার ফিরিয়া যাইবে।

এমন করিয়া জ্যোৎস্নার মায়া ওর চোখে আগে কখনো পড়ে নাই। রূপালী রঙ দিয়া জগতের এমন চেহারা কে

করিল! পথে, বাগানে, দালানের গায়ে কী যে মন্ত্র পড়া হইল তা আর বলা যায় না। বাদাম গাছের ফাঁক দিয়া একটা বাড়ি চোখে পড়ে। আরেকটা জান্‌লা। জান্‌লার ধারে নিশ্চয়ই একজন বসিয়া আছে। কে জানে তার গায়ে মুখে জ্যোৎস্না কত বিচিত্র ছোঁয়া দিয়াছে। একদিন ট্রেণে সেই রকম জ্যোৎস্না পরশ দেখিয়াছিল সে।

দূর্ ছাই, কী যে সব ভাবিতেছে। হ্যাঁ, অম্‌নি সে জ্যোৎস্নায় বেড়াইতে আসিয়াছিল। শুধু বেড়ান। আর কিছু নয়। এখান দিয়া হাঁটিলেই বুঝি আর কিছু মনে করিতে হইবে। আর হাছাড়া এতে লাভই বা কী। যেটা খুব সহজ হইতে পারিত, তখন তার ঘুম ছিল মনে। ঘুম ভাঙিয়া আজ যদি চম্‌কাইয়া উঠিল, যা সোজা ছিল তা আর সোজা নাই। এমন জ্যোৎস্নায় কৃষ্ণচূড়ার পাতা স্বপ্ন তৈরী করিবে, বাদাম গাছের ফাঁকে চাঁদের এক টুক্‌রা দেখা যাইবে, মাটীতে কত যে ছবি আঁকা হইবে তার ঠিক নাই,—তখন এমন যে সব কথা ও কল্পনা মনে আসিয়া আকুলতার ভীড় করিতে পারে 'মানবের শত্রুতে' তার সন্ধান কোনো দিনই দেয় নাই। তারা মায়ার কথা বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে। কিন্তু তার সম্বন্ধে আর কিছু বলে নাই। মায়া লাগাইবার জন্য যে জগত-সংসার তৈরী, তার আলো, তার ছায়া, তার জ্যোৎস্না, তার কৃষ্ণচূড়ার পাতা, তার পুরুষ তার নারী,—কে জানিত এ!

অরুণাংশু মায়ার মধ্যে জাগিয়া উঠিল। না পাওয়ার বেদনায় ওর চোখ দুইটা কেমনতর সজল হইয়া ওঠে। না-বলা কথার সকল ওর বুকের মধ্যে গুমরাইয়া উঠিতেছে। ওর মানব জীবনের সূত্রপাত হইল।

(ক্রমশঃ)

সুবোধ বসু

বারেক

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

করুণাঘন নয়ন মেলি বারেক চাহ আমার পানে
বিরহ-বীণা উঠুক পুনঃ মুরছি নব মিলন গানে!
স্বপন-লোকে হে মোর প্রিয়া
এসো গো নব স্বপন নিয়া
নয়নে তব স্মরণ এসে আপন ছায়া হেরিতে জানে;
করুণাঘন নয়ন মেলি বারেক চাহ আমার পানে!

আমারি চোখে চাহিয়া দেখো গভীরতম সে আঁখি কোণে
আজিকে তব স্মরণ-সুধা মিলন-মায়া-জালেরে বোনে।
আজিও তব মুখের ছবি—
হেরিয়া হোলো পাগল কবি
আজিও মম হৃদয় দুরু তোমার পদধ্বনিটি শোনে!
আমারি চোখে চাহিয়া দেখো গভীরতম সে আঁখি কোণে!

মম না হাসা হাসির রাশি হাস্তে তব লুটিতে চাহে—
শুকিয়ে যাওয়া অশ্রু কত আবার পুনঃ ফুটিতে চাহে!
আবার ব্যথা মুঞ্জরিয়া
উঠেছে গানে গুঞ্জরিয়া
হৃদয়-বীথি আবার পুনঃ জলিয়া ওঠে দুখেরি দাহে!
শুকিয়ে যাওয়া অশ্রু কত আবার পুনঃ ফুটিতে চাহে!

ঘুমানো প্রীতি জেগেছে সখী; বুঝাব তারে কেমন করি?
মরম মূলে উঠেছে দুলে তোমার প্রেম-সোণার তরী!
যেদিকে হেরি তোমারি ছায়া
পেয়েছে আজি নবীন কায়া
মেলিলে বাহু ভাবি যে মনে তুমিই গেছো পরশে ভরি!
ঘুমানো প্রীতি জেগেছে সখী; বুঝাব তারে কেমন করি!

শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ঘোষের কৃতিত্ব

রেঙ্গুন রয়েল লেকে দীর্ঘকালব্যাপী সন্তরণ

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার

শ্রীশান্তি পাল

ইংরাজী ১৯৩৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় হেদুয়া পুষ্করিণীতে শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষ যে অবিরাম ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সাঁতার কাটিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সাঁতারের ২৪ দিনের মধ্যে প্রফুল্লকুমার পুনরায় রেঙ্গুন রয়েল লেকে একাদিক্রমে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট সাঁতার কাটিয়া পৃথিবীর সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছেন। রেঙ্গুনে সাঁতার কাটিবার বিশেষ কারণ, "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকা হেদুয়ার সাঁতারটি গ্রাহ্য করেন নাই, এবং বলেন সাঁতারের পরিদর্শনের ভার সমিতির গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, অতএব ইহা সরকারী ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমি দেশীয় সংবাদ পত্রের মারফতে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম এবং প্রমাণ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম যে উক্ত সাঁতার সরকারী ভাবে নিশ্চয় গ্রহণ করা যাইতে পারে; কারণ এই বিরামহীন সাঁতার পৃথিবীর যে কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা স্থানীয় সমিতি বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়াছে। কখন কোন কালে, কোন ক্ষেত্রেই অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েসন্ বা সুইমিং ফেডারেশন্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় নাই।

বামে—শ্রীশান্তিপাল
দক্ষিণে—শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ

গত ৩১শে আশ্বিন মঙ্গলবার ইংরাজী ১৭ই অক্টোবর অমৃত বাজার পত্রিকায় আমি যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম তাহা বিচিত্রার পাঠকবর্গের জন্য এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

"অবিরাম সন্তরণে পৃথিবীর রেকর্ড ছিল ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট। মিস *টামুর নাম্নী শ্বেতাঙ্গ মহিলা সন্তরণে এই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকা (২৬শে, ২৭শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায়) এবং "ইংলিশম্যান" পত্রিকা (২৫শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায়) এবং "এড্‌ভান্স" পত্রিকা ৮ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট অফিসিয়্যাল্ রেকর্ড্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ সম্প্রতি ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট অবিরাম সাঁতার কাটিয়াছেন। সুতরাং তিনি দাবী

করিতেছেন যে, তিনিই পৃথিবীর রেকর্ড ভাঙ্গিয়াছেন। "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকা বলিতেছেন যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষের সন্তরণের আরম্ভ কোন কর্তৃস্থানীয় লোকের তত্ত্বাবধানে হয় নাই, সুতরাং প্রফুল্ল ঘোষের কৃতিত্বকে সরকারী ভাবে রেকর্ড বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আমি এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ ঠিক সময় লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি রিভলবারের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করেন। সাঁতার আরম্ভ করিবার সময় কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, বহু সন্তরণ বিশেষজ্ঞ

রেঙ্গুন রয়েল্ লেক্-এর এক অংশে সমবেত জনতা

এবং বিচারকগণ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, মিঃ শৈলেশ চন্দ্র পালিত (এটর্ণি-য়্যাট্-ল) কলিকাতার সেরিফ বদ্রিদাশ গোয়েঙ্কার বিশেষ সেক্রেটারী এল্ কে কুঠারী, নিখিল ভারত ওয়াটার-পোলো টিমের ক্যাপ্টেন মিঃ এন্ ঘোষ, প্রফেসর বিষ্ণু ঘোষ, ঢাকা "ইষ্ট বেঙ্গল টাইম্‌স্" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ চারু দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এতদ্ব্যতীত আমরা অলিম্পিকের বিচারক ও সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদিগকে এই উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। "ষ্টেটস্‌ম্যান" দুই দিন বিজ্ঞাপিত করিলেন যে পৃথিবীর সন্তরণ রেকর্ড ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট অথচ যে দিন শ্রীযুক্ত ঘোষ এই রেকর্ড ভাঙ্গিলেন, সে দিনই আবার চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন যে পৃথিবীর রেকর্ড ৭৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ, তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিবার পর প্রকাশিত হইল যে পৃথিবীর সন্তরণের যে ৭৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট রেকর্ড তাহা জানাই ছিল। তবে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষকে ইহা জানান হয় নাই; কারণ শ্রীযুক্ত ঘোষ ইহাতে ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িতে পারেন।

"ষ্টেটস্‌ম্যানের" এই আচরণ সম্বন্ধে এই বলা চলে যে তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে ঘোষ ৭৫ ঘণ্টা অবিরাম সন্তরণের জন্য নামিয়াছিলেন এবং ঘোষ অবিরাম ১০০ ঘণ্টা সাঁতারের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ সন্তরণ কালে আবহাওয়ার দরুণ যে অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন তাহা "ষ্টেটস্‌ম্যান" উত্তম রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। একটি জিনিষ তাঁহারা লোক চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ ৬৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কোন জীবন-রক্ষক ব্যতিরেকেই এবং কোন চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়াই সাঁতার কাটিয়াছিলেন।

এই সাঁতারের রেকর্ড পাইয়া সংবাদ পত্রে নানারূপ সমালোচনাও হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গ নিশ্চয় অবগত আছেন। আমি এখানে মূল ঘটনাটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রথমতঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সাঁতার আরম্ভ করিবার দিন ধার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দিবস ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের ওয়াটার-পোলোর ফাইন্যাল ম্যাচ ও বাৎসরিক সন্তরণ প্রতিযোগিতার ২৷১ টি সাঁতারের

প্রতিযোগিতা থাকায় কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ্ এগ্‌জিকিউটিভ্ অফিসার মিঃ জে, সি, মুখার্জীর অনুরোধে দিন পিছাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। দিন পরিবর্ত্তনের সংবাদ সংবাদপত্রে যথা সময়ে প্রকাশিতও হইয়াছিল। নানা কারণে ও প্রফুল্লকুমারের শারীরিক অসুস্থতার জন্ম কার্ড বিলি করিয়া অনেককেই আমন্ত্রণ করিতে পারি নাই। কেবল মাত্র সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, বেঙ্গল অলিম্পিকের বিচারক ও কলিকাতার প্রত্যেক সমিতির সেক্রেটারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদের দিক হইতে কোন্ ত্রুটী হয় নাই। প্রফুল্লকুমার ১০২ ডিগ্রী জর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়া ঐ দিবস জলে নামিতে বাধ্য হইল, তাহার কারণ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে হেদুয়ায় কি ভাবে অবতরণ করে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। অসুস্থতার জন্য আমি প্রফুল্লকুমারকে ঐ দিবস জলে নামা হইতে নিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু প্রফুল্লকুমার দমিবার পাত্র নহে। আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি প্রাণ থাকিতে রেকর্ড ভঙ্গ না করিয়া জল হইতে উঠিব না। আমি হলপ করিয়া বলিতেছি যে আমি ৫০ ঘণ্টা আপনার কোন সাহায্য লইব না। আপনি তৃতীয় দিন হেদুয়ায় আসিবেন। আমায় একটু পায়ের ধুলা দিয়া যান ইত্যাদি।" অনোন্যপায় হইয়া উহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জলে নামিতে আদেশ দিলাম। এই সাঁতারের তৃতীয় দিবসে প্রত্যুষে ৫ ঘটিকার সময় প্রফুল্লকুমারের ডিলিরিয়াম আরম্ভ হয়। উপায়ন্তর না দেখিয়া এবং কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া ৭২ ঘণ্টা ২ মিনিট কাল অতিক্রম করিলেই, আমি জল হইতে প্রফুল্ল কুমারকে উঠাইলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকার ইয়ং সাহেব আসিয়া আমাকে বলিলেন,—"পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড ৭৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট—রুথ্ লিজ্ নাম্নী এক জার্ম্মান বালিকা কর্ত্তৃক কৃত। পাছে তোমরা ভয় পাও, সেই কারণে ঐ রেকর্ড সম্বন্ধে কোন কথা উচ্চবাচ্য করি নাই। আমি গত রাত্রে বহু অনুসন্ধান করিয়া উক্ত রেকর্ড আনাইয়াছি ইত্যাদি" আমি ইয়ং সাহেবের একথার অর্থ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমি এই কটি কথা ইয়ং সাহেবকে বলিলাম—"সাহেব, যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন আর চারা নাই। তবে প্রফুল্লকুমার জীবিত আছে ও হেদুয়ার জলএখনও শুকায় নাই"। সর্ব্বত্রই এই রেকর্ড লইয়া একটা তুমুল গণ্ডোগোল চলিল। পরিশেষে মিঃ পঙ্কজ গুপ্ত এ্যাড্‌ভান্সের স্পোর্টিং এডিটর তাঁহার 'এ্যাডভান্স' পত্রিকায় একটি সারগর্ভ সমালোচনা করিয়া প্রমাণ করিলেন যে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড ৬৮ ঘণ্টা—আর্থার রিজো কর্ত্তৃক কৃত এবং ঐ রেকর্ড ইউরোপের সর্ব্বত্রই সরকারী ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এই সমালোচনার পর অনেকেরই সন্দেহ কাটিয়া গেল। সকলের সন্দেহ ঘুচাইবার জন্ম আমরা স্থির করিলাম যে ভারতবর্ষের বাহিরে যে কোন জায়গায় নূতন রেকর্ড স্থাপন করিতেই হইবে। বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে রেঙ্গুন চির বসন্তের দেশ, অতএব
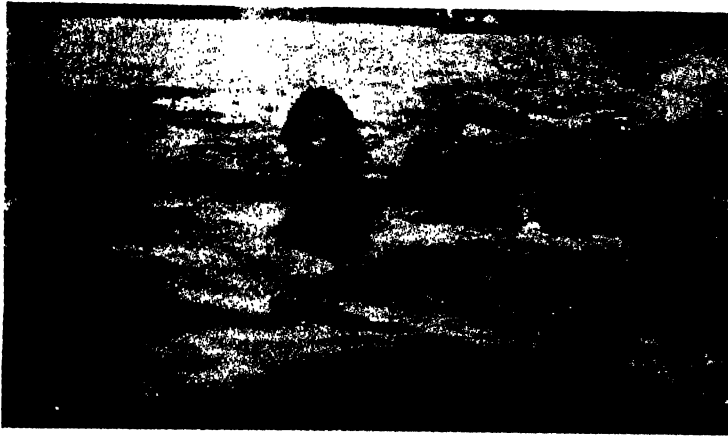
৭৫ ঘণ্টাব্যাপী অবিরাম সাঁতারের পরও অক্লান্ত

আমরা ঐ স্থানেই সাঁতার কাটিব। বহু অনুসন্ধানের পর প্রফুল্লকুমার গড়পার নিবাসী বরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট গিয়া রেঙ্গুনের নিয়োগীবাবুদের নামে একখানি পরিচয় পত্র লইয়া রবিবার ১৫ই অক্টোবর সকাল ৮ ঘটিকার সময় বি, আই, এস্ এন্ কোম্পানীর "এ্যারোণ্ডা" জাহাজে করিয়া উট্রাম ঘাট হইতে শুভযাত্রা করিল। পঞ্চম বর্ষীয় বালক রমেশ খাণ্ডেলওয়ালা ও বালিকা সাবিত্রী দেবী এবং কালীপদ রক্ষিত, ছনুলাল মুখার্জী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মণ্টু পাল, এই তিনজন জীবন-রক্ষক হিসাবে প্রফুল্ল কুমারের সহিত ঐ জাহাজে যাত্রা করিল। ইহারা সকলেই সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য এবং ভাল সাঁতারু। আমার এবং প্রফুল্লের সহোদর নরেন্দ্রের উহাদের সহিত রেঙ্গুন যাইবার কথা ছিল, কিন্তু নানা কার্য্য বশতঃ আমাদের উভয়ের যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

রবিবার ১৫ই অক্টোবর উট্রাম ঘাটের জেটিতে উহাদের বিদায় দিবার জন্ম বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। বিভিন্ন সমিতির সভ্যগণ উহাদের সকলকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া মুহুর্মুহু আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিয়া উটরাম ঘাটের জেটি মুখরিত করিতে লাগিলেন। জাহাজ ঠিক ৮ ঘটিকার সময় বন্দর ছাড়িল। সকলেই ডেকের উপর ঝুঁকিয়া নমস্কার ও প্রতি নমস্কার করিতে লাগিল। যতক্ষণ জাহাজখানি ভাগীরথীর বুকে ভাসিতে দেখা গেল, ততক্ষণ আমরা জেটির উপরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে জাহাজখানি লোকচক্ষুর অন্তরালে বিলীন হইয়া গেল।

মঙ্গলবার ১৭ই অক্টোবর বেলা প্রায় ১ ঘটিকার সময় জাহাজখানি ক্রকীং ষ্ট্রীট জেটিতে গিয়া ভিড়িল। পূর্ব্বেই জেটির উপরে প্রফুল্লকুমারকে দেখিবার জন্ম প্রায় এক হাজার ছাত্র সমবেত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রই বাঙালী। প্রফুল্লকুমার জাহাজ হইতে অবতরণ করিবামাত্রই ছাত্রের দল উহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিগণ, পুলিশের কর্ম্মচারীগণ এবং নিয়োগী পরিবারের সকলেই প্রফুল্লকুমারকে জেটির উপর অভিনন্দিত করিলেন।

পরদিবস ১৮ই অক্টোবর বুধবারে বেলা প্রায় ১০টার সময় প্রফুল্লকুমার নিয়োগী ষ্টেটের সুদক্ষ ম্যানেজার মিঃ গাঙ্গুলীকে সঙ্গে লইয়া রেঙ্গুনের মেয়র সাহেব মিঃ ভুগ্যালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল এবং সেখান হইতে পুলিস কমিশনার মিঃ হার্ডি, কর্পোরেশনের সেক্রেটারী মিঃ ক্যামারণ ও হাইকোর্টের বিচারক মিঃ মে-আবুর সহিত

কার্য্য সমাপ্তির পর

সাক্ষাৎ করিয়া সকলকেই এই সাঁতারের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। উহারা সকলেই আনন্দ চিত্তে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় রেঙ্গুন কর্পোরেশনের কাউন্সিল হলে মিঃ ভুগ্যালের সভাপতিত্বে একটি সভা হয় এবং ঐ সভায় সভ্যদিগের মধ্য হইতে একটি কার্য্যনির্ব্বাহ-সভা গঠিত হয়। নিম্নলিখিত

ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। রেঙ্গুন হাইকোর্টের বিচারকদ্বয় মিঃ মে-আবু, মিঃ সেন। কর্পোরেশনের তরফ হইতে মিঃ ডুগ্যাল, মিঃ ক্যামারঁ। পুলিশ কমিশনার মিঃ হার্ডি। ইউনিভার্সিটির তরফ হইতে—মিঃ ইউ সেট। ইয়োরোপীয়ান কোকাইন ক্লাবের তরফ হইতে, ক্লাবের সভাপতি মিঃ ই এল ওয়াটার্স ইত্যাদি। ঐ কার্য্যকারী সভা এই অবিরাম সন্তরণের বিচারক সময় রক্ষক ও ভলেন্টিয়ার নিযুক্ত করিল। প্রফুল্লকুমার ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাভঙ্গের পর প্রফুল্লকুমার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় রায় বাহাদুর হেমেন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি প্রফুল্ল ব্যতীত দলের সকলেরই তত্ত্বাবধানের ভার অত্যন্ত আনন্দচিত্তে গ্রহণ করিলেন। নিয়োগীবাবুরা প্রফুল্ল কুমারকে ছাড়িলেন না, অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কমিশনার রোডে থাকিতে হইল।

২২শে অক্টোবর রবিবার প্রত্যূষে ৬ ঘটিকার সময় প্রফুল্ল কুমার নিয়োগী বাবুদের বাটি হইতে নির্গত হইয়া দুর্গাবাড়ীতে পূজা অর্চ্চনা সমাপন করিয়া লেক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জীবন-রক্ষকগণ, রমেশ ও সাবিত্রী দেবী যথা সময়ে লেকে উপস্থিত ছিলেন। লেকের সম্মুখে একটি বৃহৎ তাঁবু খাটান হইয়াছিল। ঐস্থান হইতে সাঁতার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইত। প্রফুল্লকুমারকে দেখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই হাজার হাজার দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই উৎসুক নেত্রে দাঁড়াইয়া উচ্চেস্বরে প্রফুল্লকুমারের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লকুমার সাঁতারের পোষাক পরিয়া তৈল ও চর্ব্বি মর্দ্দন করিয়া, দর্শকবৃন্দের সম্মুখে আসিয়া সকলকেই অভিবাদন করিলেন। অবশেষে মিঃ ডুগ্যাল ও মিঃ মে-আবুর সহিত একত্রে ফটো তুলিয়া বেলা ৮টা ৬ মিনিটের সময়, রমেশ ও সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় অভিবাদন করিতে করিতে জলে অবতরণ করিলেন। দর্শকরাও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লকুমার লেকের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাঁতার কাটিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্তদিন কাটিয়া গেল। দিবসে তাঁহাকে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। রাত্রি ১১টার পর হইতে প্রফুল্লকুমার বৃহৎ মৎস্য, কচ্ছপ ও সর্পের দ্বারা ঘন ঘন আক্রান্ত হইতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এই নির্ম্মম আক্রমণের সংবাদ জীবন-রক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ—৭৮ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সাঁতারের পর—
রেঙ্গুনের মেয়র ডক্টর ডুগ্যালের সহিত করমর্দ্দন

তাঁহারা ইহার কী উপায় করিতে পারেন? সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। অবশেষে ২।৩ খানি স্যাম্পান (বর্ম্মা-দেশীয় ডিঙ্গী) আসিয়া উঁহার নিকটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কচ্ছপ তাড়াইতে লাগিল। হঠাৎ রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় প্রবল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে জল ঠাণ্ডা বরফ হইয়া গেল। প্রফুল্লকুমারকে এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া সারারাত্রি সাঁতার কাটিতে হইল।

পরদিবস প্রত্যূষে অর্থাৎ ২৩শে অক্টোবর রবিবার বেলা ৬ ঘটিকার সময় বৃষ্টি থামিল। প্রফুল্লকুমারের সমস্ত শরীর

ঠাণ্ডায় জমিয়া গেল। পাঁজরার ভিতর সূচিভেদের ন্যায় তীব্র যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। মুখের আকৃতি দেখিয়া জীবন-রক্ষক উঁহার শরীর ও জলের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রফুল্লকুমার বলিলেন যে ৫০ ঘণ্টা কাল পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। কারণ ঝড়ো হাওয়ার জন্য জল ক্রমশ ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। বেলা প্রায় ১২ টার সময় রৌদ্র দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জলও গরম হইতে লাগিল।

রেঙ্গুন ইউরোপীয়ান বোট্ ক্লাবে হাত ও পা বাঁধিয়া সন্তরণ কৌশল প্রদর্শন

প্রফুল্লকুমার মনের বল ফিরিয়া পাইলেন এবং নূতন উদ্যমে পুনরায় জোরের সহিত সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় এই সমাচার সমস্ত সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে প্রায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হইল। তখন মাত্র ৩৪ ঘণ্টা পূর্ণ হইয়াছে।

২৩শে অক্টোবর সোমবার প্রাতে ৪৮ ঘণ্টা পূর্ণ হইল। জন সাধারণ সকলেই উঁহাকে জল হইতে উঠাইতে উৎসুক। সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষেরা ঐ প্রস্তাবে নারাজ হইলেন। ৫০ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইবার পর যখন প্রফুল্লকুমারকে জল হইতে উঠাইবার কোন চিহ্ন দেখা গেল না তখন মহিলা দর্শকবৃন্দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা কর্তৃপক্ষের এই নিষ্ঠুর আচরণে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং অনেকেই কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিলেন। বেলা ৯ ঘটিকার সময় অনন্যোপায় হইয়া বর্ম্মিণীগণ দলে দলে প্যাগডায় (ধর্ম্মমন্দিরে) গিয়া প্রফুল্লকুমারের জীবনের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাই ঐ দিবস প্যাগডায় প্রায় ২০০০ টাকার ফুল বিক্রয় হইয়াছিল। ডাক্তার ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যদিগের মধ্যে উঁহাকে ত্রুত উঠাইবার জন্য মতভেদ হইল। অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই প্রফুল্লকুমারকে জল হইতে উঠাইতে পারিবেন না। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় প্রায় তিন লক্ষ লোক লেকের ধারে সমবেত হইয়াছিল। পথ ঘাট প্রায় সমস্তই বন্ধ। সহরের মধ্যে অনেক দোকান ইতিমধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘোড়ার গাড়ী, ট্যাক্সী, ঘরের মটর, রিক্স, বাস্ ট্রাম মোট কথা যত রকমের যান রেঙ্গুন সহরে আছে সবই লেক্ অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। রেঙ্গুনের প্রাচীন অধিবাসীদিগের নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহারা এইরূপ জনসমাগম পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই বা প্রাচীনতম-দিগের নিকট হইতেও কখন নাকি শুনেন নাই। ঐ দিবস সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে ৫০খানি স্যাম্পান পুষ্পমাল্যে ও আলোক-মালায় সুসজ্জিত হইয়া, নানাজাতীয় বাদ্য যন্ত্রে পরিপূর্ণ হইয়া ও নানাজাতির সুন্দরী মহিলাদিগকে বহন করিয়া প্রফুল্লকুমারকে উৎসাহিত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আসিল। অপরদিকে ২০খানি স্যাম্পান একত্র করিয়া তক্তার দ্বারায় একটি সুসজ্জিত মঞ্চ নির্ম্মাণ করিল। বর্ম্মী-সুন্দরীগণ এই মঞ্চের উপর পোয়ে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেহ কেহ আতসবাজী ও পটকা ফোটাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই জয়ধ্বনিসূচক শব্দ। বর্ম্মাদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা একসঙ্গে এই বিমল আনন্দ উপভোগ

করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লকুমার কিছুক্ষণের জন্য "আবু-হোসেন" হইয়াছিলেন—এটি প্রফুল্লকুমারের কথা উদ্ধৃত করিলাম। চতুর্দ্দিকেই উৎসব! বড় বড় সার্চ-লাইটে লেকের চারিদিক আলোকিত করিতেছে। যখন এই জলীয় উৎসব পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছিল তখন স্যাম্পানের আরোহীদের মধ্যে কে পূর্ব্বে নৃত্য করিবে বা বাজাইবে ইহা লইয়া একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। জলের মধ্যে এইরূপ বিবাদ বিসম্বাদ দেখিয়া প্রফুল্লকুমার স্বয়ং উহাদের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন—আর কোন গোলমাল হইল না। ঐ দিবস রাত্রি

রেঙ্গুন সেন্ট্রাল্ সুইমিং ক্লাব প্রাঙ্গনে বিভিন্ন ক্লাব কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা—
মধ্যস্থলে উপবিষ্ট (১) শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ, (২) তাঁহার পত্নী, (৩) শ্রীশান্তিপাল

৩ ঘটিকার পর প্রফুল্লকুমার ডিলিরিয়ামের আভাষ পাইয়া, অবিলম্বেই জীবন-রক্ষক ছন্নুলালকে ডাকিয়া শরীরের অবস্থার কথা বুঝাইয়া দিলেন। ছন্নুলাল তৎক্ষণাৎ বরফপূর্ণ একটি থলি আনিয়া উহার হস্তে দিলেন। প্রফুল্লকুমার ঐ বরফ পূর্ণ থলিটি একহাতে মাথায় ধরিয়া অপর হাতে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিলেন। দর্শকেরা এইরূপ অদ্ভুত সাঁতার কাটিবার ভঙ্গী দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও প্রফুল্লকুমারের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া যাহাতে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিতে পারেন তজ্জন্য উহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লকুমার এইরূপে ঘণ্টাখানিক সাঁতার কাটিবার পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। এদিকে ছন্নুলাল ১০।১২ হাত দূরে থাকিয়া নানারূপ খোসগল্প আরম্ভ করিয়া উহাকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দর্শক-বৃন্দেরা-ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া, এক-বুক জলে অবতরণ করিয়া সারারাত্রি প্রফুল্লকুমারকে নানাভাবে উৎসাহিত করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। ধন্য বর্ম্মাবাসী! আজ তাঁহাদেরই উৎসাহের জন্য প্রফুল্লকুমার এই নূতন রেকর্ড সংস্থাপন করিয়া বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। আজ আমরা আজীবন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। ধন্য জীবন-রক্ষকের দল! তোমরা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছ, বাস্তবিকই তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত!

২৫শে অক্টোবর মঙ্গলবার, প্রাতে ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট উত্তীর্ণ হইবার পর সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে প্রফুল্লকুমার ৭৫ ঘণ্টা সাঁতার কাটিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়া দিলেন। জার্ম্মান বালিকা রুথ্ লিজের ৭৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট সময় অতিক্রম করিবার পর ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ করিয়া সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে পৃথিবীর দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণের রেকর্ড ভঙ্গ হইয়াছে। এই সময়ে রয়টারের প্রতিনিধি আসিয়া প্রফুল্লকুমারকে জানাইল যে তিনি এইমাত্র সংবাদ পাইয়াছেন যে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড ৭৯ ঘণ্টা, ঐ রুথ্ লিজ কর্ত্তৃক কৃত—অবশ্য মিঃ পঙ্কজ গুপ্ত, বিলাতের ডেলি এক্সপ্রেস্ ও নিউজ অফ্ দি ওয়ার্লডের মতে এই রেকর্ড ইউরোপে গ্রাহ্য হয় নাই। প্রফুল্ল ঘোষ দমিবার পাত্র নহে। সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে আজ ৮০ ঘণ্টা সাঁতার দেখাইয়া বর্ম্মাবাসীদের চমৎকৃত করিবেন। এই সংবাদ চতুর্দ্দিকেই

রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। স্কুল, কলেজ, আফিস, দোকান, সমস্তই যুগপৎ বন্ধ হইয়া গেল। গৃহস্থেরা লতা পাতা ও আলোক মালায় স্ব স্ব গৃহ নিপুণতার সহিত সজ্জিত করিতে লাগিলেন। সহরময় একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এই অবিরাম সন্তরণ দেখিবার জন্ত বহুদূর দেশ হইতে বর্ম্মান ও বর্ম্মিণীগণ আসিয়াছিলেন। বেলা ৩ ঘটিকার সময় পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হইতেই সঙ্গে সঙ্গে নিম্নগামী স্রোতের বেগ বাড়িতে লাগিল এবং জল প্রথম রাত্রির মতন শীতল

দেশ-প্রত্যাগত বিজেতা—মাল্যভূষিত প্রফুল্লকুমার ও তাঁহার পত্নী রেঙ্গুন সহরে সহন সন্তরণে পৃথিবীর মধ্যে পরাকাষ্ঠা স্থাপনের পর কলিকাতায় পৌঁছিয়া মিঃ এইস্-কে হেলল্ এম্.পির সহিত করমর্দ্দন

হইতে লাগিল। ঠাণ্ডাবশতঃ প্রফুল্লকুমারের হৃদযন্ত্রে ঘন ঘন আঘাত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঈষৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ অবস্থায় ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট সাঁতার কাটিয়া পৃথিবীর নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়া জল হইতে উঠিবার জন্ত স্বয়ং ইঙ্গিত করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পাইবামাত্র প্রফুল্লকুমার দুই হাতে জোরের সহিত সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিলেন এবং কাহারও সাহায্য না লইয়া বরাবর পায়ে হাঁটিয়া ষ্ট্রেচারের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন বেলা ৪টা। প্রফুল্লকুমারের এই অসম্ভবপর কার্য্যকলাপ দেখিয়া রেঙ্গুনবাসী সকলে বিস্মিত, চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই একবাক্যে উঁহাকে জল-দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। এই চারিদিন সাঁতারের মধ্যে অনেকেই প্রফুল্লকুমারের ফটো লইয়া বহু অর্থ দিয়াছিলেন। এমন কি কুরুঙ্গী রিক্সওয়ালারা পর্য্যন্তও ২।৪ আনা পয়সা দিয়া ছবি ক্রয় করিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারা তাঁহাদের দেহ হইতে অলঙ্কারও পর্য্যন্ত খুলিয়া দিয়াছিলেন। বাস্তবিক এরূপ উৎসাহ কুত্রাপি দেখি নাই। এই সমস্ত অর্থ অধিকাংশই পর হস্তগত হইয়াছে। প্রফুল্লকুমার ঐ অর্থের ৮ং অংশও পান নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা সাঁতারের জন্ত ব্যয়িত হইয়াছে।

ষ্ট্রেচারে বসিবার পর মুহূর্ত্তেই মেয়র সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করিলেন ও শরীরের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রফুল্লকুমার মৃদুস্বরে কহিলেন যে তাহাকে যেন হাঁসপাতালে লইয়া না যাওয়া হয়। সেই মুহূর্ত্তে এ্যাম্বুলেন্সে উঠাইয়া বরাবর কমিশনার রোডে নিয়োগী বাবুদের বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। ৩ ঘণ্টার মধ্যে প্রফুল্লকুমার পুনরায় সুস্থ শরীর লাভ করিলেন। অবশ্য ডাক্তারেরা তাঁহাকে ঐদিন একেবার উঠিতে দেন নাই। প্রফুল্লকুমার বিছানায় শুইয়া সকলের সঙ্গে গল্পগুজবে সময় কাটাইতে লাগিলেন। রাত্রে লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের খাদ্য খাইয়াছিলেন। সাঁতার শেষ হইবার পর দিবস হইতে প্রত্যহ ৫।৫ হাজার লোক নিয়োগী বাবুদের বাটির সম্মুখে দর্শনের জন্ত

জড়ো হইত। প্রফুল্লকুমারের রাস্তায় বাহির হইবার উপায় ছিল না।

পরদিবস ২৯শে অক্টোবর বুধবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রফুল্লকুমার কর্পোরেশন আফিসে মেয়র সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে গমন করিলেন। অবিলম্বেই এই সংবাদ সহরময় ছড়াইয়া পড়িল যে ঘোষ আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে ১০।১২ হাজার লোক দর্শনের জন্য কর্পোরেশন আফিস্ পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। সকলেই ঘোষের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া সমস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রফুল্লকুমারের লোকালয়ে বা রাস্তাঘাটে পায়ে হাঁটিয়া নির্গত হওয়া তখন হইতে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সর্ব্বসাধারণের নিকট, বিশেষতঃ সন্তরণ সমিতির সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহাদের নিকট একটি প্রশ্ন করিতেছি, আশা করি তাঁহারা এই প্রশ্নের একটি সদুত্তর দিয়া আমাকে সুখী করিবেন। আমার প্রশ্ন এই যে, কলিকাতায় অবিরাম সাঁতারের সাঁতারুদের আমরা (জীবন-রক্ষকের দল) আবশ্যক মত স্বহস্তে সন্তরণকালে চর্ব্বি ও তৈল মর্দ্দন করিয়া দিই। ক্ষুধা পাইলে তাঁহাদের মুখে পানীয় ঢালিয়া দিই এবং শরীরের যন্ত্রণা হইলে এক হাতে সাঁতার কাটিয়া বা কখনও কখনও দাঁড় সাঁতার কাটিয়া দুই হাতে সাঁতারুর শরীর মালিশ করিয়া দিই। ডিলিরিয়াম হইলে জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া সাঁতারুর মাথায় বরফপূর্ণ থলি ধরিয়া থাকি। এখানে উপরোক্ত নিয়ম এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু রেঙ্গুনে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা বা কর্ত্তৃপক্ষেরা অন্যরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন। তাঁহারা জীবন-রক্ষককে সাঁতারুর দেহ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে অনুমতি দেন নাই। এমন কি স্পর্শ করিলে সাঁতার নাকচ করিয়া দিবেন বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। প্রফুল্লকুমারকে স্বহস্তে চর্ব্বি মাখিতে, চশমা পরিতে, দুগ্ধ পান করিতে এমন কি বরফের থলি পর্য্যন্তও মাথায় দিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত দ্রব্য সকল সাঁতারুর হস্তে পৌছাইয়া দিয়া জীবন রক্ষকদের ১০ হাত দূরে থাকিতে হইয়াছিল এবং বিচারকদিগের নিকট হাত দেখাইয়া প্রমাণ করিতেও হইয়াছিল যে সে সাঁতারুর দেহ স্পর্শ করে নাই। এখন আমরা কোন্ নিয়ম পালন করিব? এই অবিরাম সাঁতারের আজ পর্য্যন্ত কোন নিয়ম সৃষ্টি হয় নাই। এই পর্য্যন্ত মোটামুটি নিয়ম আছে যে সাঁতারু জলের উপর এক জায়গায় মৃতের ন্যায় ভাসিয়া থাকিতে পারিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই অবিরাম সাঁতার অলিম্পিক্ বা কোন ফেডারেসনের অধীনস্থ নয়।

শ্রীশান্তি পাল

* পৌষ সংখ্যা বিচিত্রায় যে শিবপুর নৌকাডুবির কথা উল্লেখ করিয়াছি, ঐ ঘটনায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জলনিমজ্জিত ব্যক্তিদিগকে জল হইতে উদ্ধারের জন্য বিলাতের রয়েল হিউম্যান সোসাইটির নিকট হইতে পদক ও প্রশংসা পত্র লাভ করিয়াছিলেন। ইং ১৯১৩ সালে, ১৩ই মে "কলিকাতা সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন"—ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে একটি সভা আহ্বান করিয়া, এই সৎসাহসের জন্য উঁহাদের প্রত্যেককেই একখানি করিয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। উদ্ধার কর্ত্তাদিগের নাম—চন্দ্রিষ্ট এ মিলদার, প্রবোধকুমার ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ গুপ্ত, সনৎকুমার হালদার, অপূর্ব্বরঞ্জন বড়ুয়া, মোহিনীরঞ্জন বড়ুয়া, প্রকৃতিকুমার ঘোষ।

সিনেমায় দেবগণ

শ্রীভোম্বলদাস বিরচিত

একদা মহর্ষি নারদ সিনেমা দেখিবার জন্য কলিকাতায় নামিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় তখন পৌরাণিক ছায়া-নাট্যের ধূম পড়িয়াছে। সারা সহর জুড়িয়া হৈহৈ রৈরৈ ব্যাপার। রাস্তাঘাট, অলিগলি তেত্রিশ কোটি দেবতার posterএ ঢাকিয়া গিয়াছে। বাড়ীগুলির যতদূর পর্য্যন্ত মই দিয়া নাগাল পাওয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত placard মারিয়া মুড়িয়া ফেলা হইয়াছে। দৈনিক পত্রিকাগুলিতে রোজ রোজ বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। ছ্যাকড়া গাড়ী এবং মোটর লরীতে বাজনা বসাইয়া সহরময় hand-bill বিলি করা হইতেছে। বিজ্ঞাপনের চোটে কলিকাতার নরনারী, বহ্ন্যুখ পতঙ্গের ন্যায়, Cinema House গুলির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন।

বিস্তর ধাকাধাকি এবং ঠেলাঠেলির পর মহর্ষি নারদ কোনমতে পৈত্রিক প্রাণটি রক্ষা করিয়া একখানা টিকেট কিনিলেন। তারপর এক প্যাকেট স্বদেশী সিগারেট, দুই পয়সার পান এবং চার ঠোঙা vitamin food অর্থাৎ চিনা বাদাম কিনিয়া লইয়া Cinema Houseএ প্রবেশ করিলেন।

সেই Houseএ যে ছায়া-নাট্য দেখান হইতেছিল, তাহার বিষয় ছিল খাণ্ডবানের অগ্নি ভক্ষণ। কয়েক দৃশ্যের পরেই নারদের প্রতিমূর্ত্তি পরদার উপর ভাসিয়া উঠিল। দেখা গেল, ছায়াচিত্রের নারদ ঘোড়ায় চড়িয়া বনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছেন। ঘোড়া দেখিয়া আসল নারদের প্রাণ ধড়ফড় করিতে লাগিল। তিনি জীবনে কোনদিন ঘোড়ার পিঠে চড়েন নাই। বরঞ্চ, ঘোড়া সম্বন্ধে তিনি "শত হস্তেন বাজিনঃ" এই শাস্ত্রবাক্যই চিরদিন পালন করিয়া আসিয়াছেন। ছায়া-চিত্রের নারদ যখন নিকটে আসিলেন তখন দেখা গেল, তাঁহার পরণে কাবুলী সালোয়ার, গায় সিল্কের পাঞ্জাবী, মাথায় bobbed hairএর মত চুল, তার উপরে গান্ধী-টুপি। পোষাক দেখিয়া মহর্ষি নারদ তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল যে ছায়া-নাট্যে তাঁহাকে clown সাজান হইয়াছে। তারপর ঘোড়া হইতে নামিয়া যখন ছায়াচিত্রের নারদ "গজল" গাইতে সুরু করিলেন, তখন মহর্ষি নারদ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি রাগে গর গর করিতে করিতে Cinema House হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মহর্ষি নারদ ভয়ানক চটিয়াছিলেন। মানুষ দেবতাকে সং সাজাইয়া তামাসা করিবে! দেবতার এত অপমান! এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন দেবতার দলকে মানুষের বিরুদ্ধে উস্কাইয়া দিয়া ঝগড়া বাধাইবেন।

রাস্তায় আসিয়া মহর্ষি নারদ তাঁহার ঢেঁকিতে চড়িলেন। ঢেঁকি বন্ বন্ করিয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। মেঘ হইতে মেঘান্তরে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

* * * *

স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের Drawing roomএ দেবতাগণ আড্ডা দিতেছিলেন। দেবতাদের কোন চিন্তাভাবনা নাই, বেশ আরামে দিন কাটান। Economic depression তাঁহাদিগকে মোটেই কাহিল করিতে পারে না। স্বর্গে খাওয়া থাকার সুবিধা অনেক। স্বর্গের সুধায় vitamin এর ভাগ এত বেশী যে, এক চামচ পান করিলেই সাতদিন আর কিছু খাইতে হয় না। একবার কষ্টে সৃষ্টে এক সেট্ পোষাক তৈয়ার করিতে পারিলেই একশ' বছর কাটিয়া

যায়। স্বর্গের সর্ব্বত্র free এবং compulsory education এর ব্যবস্থা থাকায়, মাসকাবারে স্কুল কলেজের মাহিনার জন্ত দেবতাগণকে কোন উদ্বেগ ভোগ করিতে হয় না। বলা বাহুল্য, স্বর্গে Life Insurance এর প্রচলন নাই কারণ দেবতাগণ অমর। সুতরাং premium যোগাড় করিবার জন্য দেবতাগণকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয় না। মর্ত্তের ন্যায় স্বর্গেও দেবতাগণের ভিন্ন ভিন্ন আফিস রহিয়াছে, তবে আফিসে কাজকর্ম্ম খুবই কম। শুধু যমরাজের আফিসে কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। যমরাজকে দিনরাত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাঁহার শ্বাস ফেলিবার সময় নাই। কলম ঘষিতে ঘষিতে তাঁহার Head clerk চিত্রগুপ্তের আঙ্গুলে কোস্কা পড়িয়া গিয়াছে। সাহায্যের জন্য তিনি পাঁচজন Assistant চাহিয়াছিলেন, কিন্তু খরচ বাড়িবে বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা নামঞ্জুর হইয়াছে।

সেদিন রবিবার, সুতরাং আড্ডা খুব জমিয়াছিল। একখানা ছোট টেবিলের চারিধারে বসিয়া ইন্দ্র, কৃষ্ণ, সচী, এবং রাধা Auction Bridge খেলিতেছিলেন। ইন্দ্রের partner রাধা এবং কৃষ্ণের partner শচী। স্বর্গে পরকীয়া প্রেমের জঞ্জাল নাই। দেবতাগণ নিজ নিজ স্ত্রী লইয়া এত ব্যস্ত যে, পরের স্ত্রীর দিকে তাকাইবার তাঁহাদের অবসর নাই। মর্ত্ত্যে থাকাকালে কৃষ্ণের একটু আধটু ঐ দোষ ছিল, কিন্তু স্বর্গে আসিয়া তিনি সম্পূর্ণ শোধরাইয়া গিয়াছেন। এক পাশে গজদন্ত-নির্ম্মিত cushion-আঁটা একটী চৌকির উপর দেবগুরু বৃহস্পতি এবং ব্রহ্মা দাবা খেলিতেছিলেন। আর কয়েকজন দেবতা নিকটে বসিয়া নিবিষ্ট মনে সেই খেলা দেখিতেছিলেন। পাশে সোণার আলবোলায় সুগন্ধযুক্ত তামাক পুড়িতেছিল। দেবগুরু মাঝে মাঝে তামাকে টান দিতেছিলেন এবং দাবার চাল দিতেছিলেন। অনতিদূরে আর একটী চৌকির উপর সূর্য্য, বরুণ, পবন ও বিশ্বকর্ম্মা পাশা খেলিতেছিলেন। খেলার আনুসঙ্গিক চেঁচামিচি সেখানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ঘরের একধারে পাশাপাশি দুইটী সোফায় কার্ত্তিক ও সময়বিভাগের কয়েকজন দেবতা বসিয়াছিলেন। প্রত্যেকের মুখে এক একটী cigar এবং তাঁহাদের চালচলন ও কথাবার্ত্তা তারিফি ধরণের। দৈত্যগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের ভয়ে দেবতাগণকে মস্ত এক Standing army রাখিতে হয়। মহাদেব ও দুর্গা ঘরের এক কোণে আর একটী সোফায় বসিয়াছিলেন। মহাদেব মর্ত্তে loin cloth পরিয়া চলাফেরা করেন বটে, কিন্তু দেবতাদের Societyতে বেশ সভ্যভব্য হইয়াই আসেন। দুর্গা এখন প্রৌঢ়া হইয়াছেন—যুদ্ধ করিবার তাঁহার আর ক্ষমতা নাই। তাহা ছাড়া, ক্ষ্যাপা স্বামীর উপর নজর রাখিবার জন্ত চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁহাকে মহাদেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হয়। Drawing roomএর পাশে একটী বারান্দায় একদল অপ্সর-অপ্সরা concert বাজাইতেছিলেন। স্বর্গের সেরা সুন্দরী কয়েকটি অপ্সরা Trayতে করিয়া সোমরসের বোতল ও পাত্র বারবার দেবতাদের সম্মুখে ধরিতেছিলেন। দেবতাগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত এক বা দুই peg সোমরস ঢালিয়া নিয়া পান করিতেছিলেন।

এমন সময় মহর্ষি নারদ ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং মহা চেঁচামেচি সুরু করিলেন। খেলা, কথাবার্ত্তা, কনসার্ট তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল। দেবতাগণ ব্যস্ত সমস্তভাবে উঠিয়া গিয়া নারদকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি, মহর্ষি? এত চটেছেন কেন?" নারদ দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—"চটব না? একশ'বার চটব। আপনারা এখানে বসে আমোদ করছেন,—ঐদিকে মানুষ আপনাদের বেইজ্জত করছে।" দেবতাগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কৃষ্ণ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মানুষ কি করেছে, মহর্ষি?" নারদ আরও চটিয়া বলিলেন—"করেছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। কলিকাতায় ছায়া-চিত্রে আপনাদের caricature করছে।" মহাবীর হনুমান সায় দিয়া বলিলেন—"মহর্ষির কথা খুবই সত্য। আমায় যা' করেছে, তা' অতি Scandalous। আমার ন্যাজে ন্যাকড়া জড়িয়ে, আগুন লাগিয়ে—"। রাগে, দুঃখে, অপমানে হনুমানের কণ্ঠরোধ হইল, তিনি কথা শেষ করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ সহজে চটেন না—তিনি স্মিতহাস্যে বলিলেন—"তা' করুক না। আমাদের কি আসে যায়?" নারদ হাত নাড়িয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—"আপনার ত

গণ্ডারের চামড়া, কিছুতেই বিঁধে না। খবর নিয়ে দেখুন—আপনার পেছনেই মানুষ বেশী লেগেছে। মর্ত্তে যে সব কেলেঙ্কারি করেছিলেন, সব বেফাঁস করে দিচ্ছে।" শুনিয়া লজ্জায় রাধিকার নাকমুখ লাল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ মাথা হেঁট করিলেন। মহাদেব এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"কি! মানুষের এত আস্পর্দ্ধা! দেবতার অপমান করবে? দাঁড়ান—আমি এখনি এই বেয়াদব জাতকে সাবাড় করছি।" মহাদেবের চোখে প্রলয়ের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। দেবতাগণ প্রমাদ গণিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি বিনীতভাবে বলিলেন—"একি উচিত হবে, মহাদেব? জন কয়েক লোক অপরাধ করেছে বলে সব মানুষ সাবাড় করবেন?" মহাদেবের রাগ যেমন খপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি আবার চট্ করিয়া পড়িয়া যায়। দেবগুরুর কথা শুনিয়া তিনি অনেকটা শান্ত হইলেন। চোখ দুটী উপরের দিকে তুলিয়া বলিলেন—"আপনি কি করতে বলেন?" বৃহস্পতি জবাব দিলেন—"কে ঠিক অপরাধী, তা' আগে ঠিক করুন। আমি বলি—সব খোঁজ খবর নেবার জন্ম একটী enquiry committee বসান।" কয়েকজন দেবতা ঘাড় নাড়িয়া বৃহস্পতির কথায় সায় দিলেন। মহাদেব বলিলেন—"বেশ, তাই হোক। কমিটি বসান—তাঁরা মর্ত্তে গিয়ে সব খোঁজ করে রিপোর্ট দেবেন। তারপর যা' হয় করা যাবে।"

অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে, Enquiry Committeeতে পাঁচজন সদস্য এবং একজন সম্পাদক থাকিবেন। কিন্তু কে কে সদস্য হইবেন, ইহা নিয়া ভয়ানক গোল বাঁধিল। স্বর্গের আরাম ছাড়িয়া কোন দেবতাই মর্ত্ত্যে যাইতে রাজি নন। ক্ষণেক পরে দেবরাজ বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গুরুদেব, এ কাজের ভার আপনাকেই নিতে হবে। আপনিই প্রস্তাব এনেছেন।" বৃহস্পতির মাথায় যেন বাজ পড়িল। তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে বলিলেন—"আমায় মাপ কর, বাবাজি। আমি পারব না। এই বুড়ো বয়সে মর্ত্ত্যে গিয়ে কি জাত খোয়াব?" দেবরাজ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"আরে রাম রাম। সে ভয় করবেন না। আমি সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষা সমিতিতে খবর পাঠাচ্ছি। তাঁরা আপনার জন্ম বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল ঠিক করে রাখ্‌বেন।" অনেক পীড়াপীড়ির পর বৃহস্পতি রাজি হইলেন। কার্ত্তিক military man—দুঃখকষ্ট, হাঙ্গামা অসুবিধা এ সবের তোয়াক্কা রাখেন না। অন্য দেবতাগণ মাথা পাতিতেছেন না দেখিয়া কার্ত্তিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কমিটিতে বসিতে রাজি হইলেন। দেবতাগণ ঘন ঘন করতালি দ্বারা তাঁহাদের আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা গুরুগম্ভীরস্বরে বলিলেন—"আমার মনে হয়, কমিটিতে কয়েকজন expert রাখা দরকার। আমি প্রস্তাব করি, আমাদের Dramatic Director ভরতমুনি, Engineer বিশ্বকর্ম্মা এবং music master হনুমানকে কমিটিতে দেওয়া হোক।" ব্রহ্মার কথার উপরে কিছু বলিবার কাহারও সাহস হইল না। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই তিন দেবতাকে রাজি হইতে হইল। সম্পাদকের কথা উঠিতেই অনেকে গণেশের নাম করিলেন। কারণ চারি হাতে তিনি এত তাড়াতাড়ি লিখিতে পারেন যে, তিনি থাকিলে Short hand writer এর দরকার হয় না। কিন্তু গণেশ কুঁড়ের সর্দ্দার, কোনপ্রকার হাঙ্গামায় যাইতে চান না। তিনি ভীষণভাবে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইতে লাগিলেন। অবশেষে মহাদেব ভ্রূকুটি দিয়া বলিলেন—"গণশা তোকেই যেতে হবে। বাড়ীতে থেকে কেবল খাবি আর ঘুমুবি। একটু দেশের কাজ করতে পারবি নে?" পিতার ধমকের চোটে গণেশ রাজি হইলেন।

স্বর্গে Communal representation নাই। কিন্তু নারী-প্রগতির ঢেউ সেখান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তরুণী দেবীদলের অধিনেত্রী ছিলেন, কুমারী সরস্বতী দেবী। তিনি দেবতাদের সঙ্গে সমান অধিকার লাভের জন্ম স্বর্গে মহা agitation সুরু করিয়াছিলেন। তিনি জোর করিয়া বলিলেন—"কমিটিতে আমাদের একজনকে নিতেই হবে।" দেবতাগণ মহা ফাঁপরে পড়িলেন। তরুণীদলের আবদার রক্ষা না করিলে পদে পদে নাস্তানাবুদ হইতে হইবে। অথচ, কমিটি হইতে কাহাকে বাদ দিয়া একজন দেবীকে নেওয়া যায়? অবশেষে chivalrous কার্ত্তিক এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"বেশ, আমিই সরে

যাচ্ছি। আমার জায়গায় সরস্বতীকে নেওয়া হোক।" চারিদিকে আবার ঘন ঘন করতালি পড়িতে লাগিল। সদস্য-গণের নামের লিষ্টে কার্ত্তিকের নাম কাটিয়া সরস্বতীর নাম লেখা হইল।

তারপর মালপত্র গুছাইবার ধুম পড়িয়া গেল। Suit-case, Attache-case, Hand-bag, Hold-all কিছুই বাদ পড়িল না। অবশেষে দুইটী বড় বড় পুষ্পক-রথে চড়িয়া Enquiry committeeর সদস্যগণ এবং সম্পাদক কলিকাতায় নামিয়া আসিলেন।

*　　*　　*　　*

কলিকাতায় আসিয়া মহাবীর হনুমান সহরতলীতে কদলীবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন একটী বাগানবাড়ীতে আস্তানা গাড়িলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি এবং ভরতমুনি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেলে আশ্রয় নিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সৌখিন লোক—যেখানে সেখানে থাকিতে পারেন না। তিনি Grand Hotelএ উঠিলেন। গণেশও সেই হোটেলে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখিয়া এত ভড়কাইয়া গেলেন যে, কিছুতেই সেখানে জায়গা দিতে রাজি হইলেন না। কুমারী সরস্বতী বিস্তর খোঁজাখুজি করিয়াও কলিকাতায় পছন্দ মত হোটেল পাইলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি ও গণেশ এক মাসের জন্য একটী বাড়ী ভাড়া করিলেন।

দুই দিন বিশ্রামের পর কমিটি preliminary enquiry সুরু করিলেন অর্থাৎ কোথায় এবং কাহারা ছায়াচিত্র তৈয়ার করেন, তাহার সন্ধান লইতে লাগিলেন। জানিতে পারিলেন যে, দেশের যত বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলের দল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের অনেকেই Film Co.তে Director হইয়া গিয়াছে। সেখানে লেখাপড়া না শিখিয়াই মহা পণ্ডিত হওয়া যায়। আজ যে cameraর বাক্স মাথায় বহিতেছে, কাল সে মস্ত বড় ফটোগ্রাফার হইয়া পড়িতেছে। দুই একবার জনতার দৃষ্টে মাথা গুজিয়া দিয়াই এক একজন Film star হইয়া পড়িতেছে। scenario এবং story লেখকগণ রামায়ণ এবং মহাভারত মন্থন করিয়া "হনুমানের লাঙ্গুল দহন" "রাবণের বস্ত্র হরণ" প্রভৃতি উপাদেয় ছায়ানাট্য রচনা করিতেছে। মোটের উপর, যাহার মাথা যত নিরেট তাহারই কদর তত বেশী। তাহা ছাড়া, চোরাবাজার হইতে পাঁচ টাকার কেনা Suit পরিয়া একবার এডেন হইতে ঘুরিয়া আসিয়া European experienceএর বুলি কপচাইতে পারিলে, তাহাকে আর পায় কে ?

Preliminary enquiry শেষ করিয়া কমিটির সদস্য-গণ Cinema House গুলিতে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। একদিন এক Houseএ গিয়া দেখিলেন, সেখানে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছায়ানাট্য দেখান হইতেছে। যিনি রাধিকা সাজিয়া-ছিলেন, তিনি একজন Film Star। তাহার চোখ দু'টী গর্ত্তে বসিয়া গিয়াছে। গাল দু'টী ভাঙ্গিয়া মুখখানা triangle এর মত দেখা যাইতেছে। পাঁচ পোঁচ পাউডারের নীচ হইতে আবলুস জিনি' রং ভাসিয়া উঠিতেছে। তাহার শরীরখানি এত কৃশ যে, দেখিলে মনে হয় যেন সম্প্রতি ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া উঠিয়াছেন। রাধিকার চেহারা দেখিয়া সরস্বতী অত্যন্ত shocked হইলেন, বলিলেন—"ব্যাটাদের কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই ? রাধিকার এই চেহারা করেছে ?" বিশ্বকর্ম্মা মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"দোষ কি হয়েছে ? ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির সঙ্গে ঠিক মিল রেখে চেহারাখানা করে তুলেছে।"

ছায়াচিত্রের রাধিকার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ঢাকা, পরণে বেনারসী সাড়ি, গায় ব্লাউজ, পায় নাগরাই জুতা। দেখিলে মেয়ে কলেজের তরুণী ছাত্রী বলিয়া ভ্রম হয়। Costume Director অনেক বিবেচনা করিয়া রাধিকার হাতে Ladies Hand bag তুলিয়া দেন নাই। রাধিকার শোবার ঘরে কৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে প্রেম করিতেছিলেন। ঘরখানি টেবিল, চেয়ার, সোফা প্রভৃতি আসবাবে সজ্জিত—দেওয়ালে দুইটী ছবি টাঙ্গানো। বৃদ্ধ বৃহস্পতির দৃষ্টি ক্ষীণ, চেহারা দুইটী চিনিতে না পারিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কাদের ছবি ?" গণেশ বলিলেন—"একটী রবিবাবুর, অন্যটি মহাত্মা গান্ধীর।" দেবতাগণ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভরতমুনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—"ওরা যে রাধাকৃষ্ণের contemporary তা' ত জানতুম না।"

ছায়াচিত্রের রাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে এত flirting সুরু করিলেন যে, সেই দৃশ্য দেখা দেবতাগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সরস্বতী ও ভরতমুনি চোখ বুজিয়া রহিলেন। হনুমান ও গণেশ কড়িকাঠ গুণিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি Puritan ধরণের লোক—তিনি অশ্লীল দেখিতে বা শুনিতে পারেন না। তিনি রাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"আপনারা ছায়াচিত্র দেখুন। আমি বাড়ী চল্লুম।" হনুমান শশব্যস্তে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"সে কি হয়, গুরুদেব? সবাইকে যে একসঙ্গে রিপোর্ট দিতে হবে।" সহকর্মীদের পীড়াপীড়িতে বৃহস্পতিকে পুনরায় বসিতে হইল। কিন্তু ক্ষণেক পরে কৃষ্ণ যখন বিলাতী ঢঙে রাধিকার চুমো খাইলেন, তখন আর বৃহস্পতি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গালিগালাজ করিতে করিতে House হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে Icelandএর একটা দৃশ্য পরদার উপরে ভাসিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড বরফের স্তূপ—তার উপরে বসিয়া কৃষ্ণ মুরলী বাজাইতেছিলেন। তাঁহার গা ঘেসিয়া রাধিকা অর্দ্ধশায়িতা অবস্থায় পড়িয়াছিলেন এবং তন্ময় হইয়া মুরলী-ধ্বনি শুনিতেছিলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া দেবতাগণ হতভম্ব হইয়া গেলেন। গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণ কি কখনো Icelandএ গিয়েছিলেন?" হনুমান মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—"আমার ত মনে পড়ে না।" গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে এই ছবি এল কোত্থেকে?" ভরতমুনি ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—"ওঃ, বুঝতে পেরেছি। Director ব্যাটা কোথায় Icelandএর ছবি পেয়েছিল। তার উপরেই রাধা ও কৃষ্ণকে Super-impose করে দিয়েছে।" মুরলী বাজান শেষ করিয়া কৃষ্ণ কথা বলিতে সুরু করিলেন। Director ছায়াচিত্রের কৃষ্ণকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, একটা কথা বলিয়া মনে মনে ১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত গুণিতে হইবে, তারপর আর একটা কথা বলিতে হইবে। সুতরাং কৃষ্ণ বলিলেন—"রাধে (১।২।৩।৪।৫), আমি (১।২।৩।৪।৫) তোমায় (১।২।৩।৪।৫) ভালবাসি।" কৃষ্ণের acting দর্শকগণের খুব মনে লাগিল—তাঁহারা ঘন ঘন করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ছায়ানাট্যটি গানে ভর্ত্তি ছিল। মিনিটে মিনিটে রাধিকার সখিগণ পান ও দোক্তা রঞ্জিত দন্তপাটি বিকশিত করিয়া গান গাহিতেছিলেন। গানের পদে ছিল—"হুঁ কালকে গেছি যমুনা তীরে।" সখিগণ গাহিলেন—হুঁকা লেকে গেছি যমুনা তীরে।" দেবতাগণ চমকিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ হুকা হাতে করিয়া যমুনা তীরে যাইতেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। গান শুনিয়া দর্শকগণের চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতেছিল। দেবতাগন হাসিবেন কিম্বা কাঁদিবেন, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। Back ground musicও অনেক গবেষণা করিয়া ঠিক করা হইয়াছিল। রাধা ও কৃষ্ণের যখন মিলন হইল, তখন funeral march এর বাজনা বাজিয়া উঠিল।

* * * *

এভাবে Enquiry Committeeর সদস্যগণ ও সম্পাদক দুই সপ্তাহ কাল ধরিয়া নানা Cinema Houseএ ঘুরিয়া দেখিলেন। তারপর স্বর্গে ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা তিন Volume রিপোর্ট বাহির করিলেন। রিপোর্টে কি লেখা হইয়াছিল, তাহা বিস্তারিতভাবে বলিবার আবশ্যক নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে, রিপোর্ট পড়িয়া দেবরাজ ইন্দ্র যমরাজকে হুকুম দিলেন—"এই সিনেমাওয়ালাদের জন্য Special নরক তৈরী করুন।"

পথিক

এম, এ, ওয়াহিদ

আমি পথ চলি। দিন যায়—রাত্তি আসে। আকাশে তারা ফোটে—চাঁদ হাসে। চাঁদের কলসী গড়িয়ে জোছনা-ধারায় আকাশ ভেসে যায়।

ভোরের বাতাসে পাখীরা জাগে। বনে বনে ফুল জাগে। পাখী গান গায়।—ফুল হাসে। আকাশের পথ পাখীর পাখাভরে দুলে উঠে। বনপথ কেঁদে ওঠে ঝরা ফুলের করুণ ব্যথায়।

সন্ধ্যায় দিকচক্রের কোণে মাটির ঘড়াটি নামিয়ে দিগন্তের বধূ তার আলতা ছোপান চরণ দুখানি নদীজলে ভাসিয়ে খেলা করে।

দিনের পাখী বাসায় ফিরে আসে। পথে পথে পথিকের চরণ অলস হয়ে আসে গৃহের মায়া মমতায়।

গ্রীষ্ম যায়। বর্ষা আসে। জ্যৈষ্ঠের ধূসর বনপথ নীপ-কেশরের ফুলভারে রঙিন হয়ে ওঠে।

আমি এদের কেউ নই।

আমি চলি—শুধু আমি চলি। পথ-অজগর তার বিরাট দেহের রজ্জুতে বেঁধে আজ আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। সামনে আমার আজ কোন সীমারেখা নেই—শুধু দিকবলয়ের বিরাট চক্ররেখা।

কাকে খুঁজি আমি—কার দেখা পেতে চাই। আকাশ-বিহঙ্গিনী রামধনুর পাখা ত আজও কেউ ধরতে পারেনি। তবু আমার মনের এই—বিরাট তৃষ্ণা কে দিল আমাকে।

আমি চলি—আমি চলি। চরণের তলে ঘটনা-ভরা পৃথিবী দোল খায়—আমি চলি—আমি চলি।

পথ আমার ঘর। দেবতাকে আমি মানিনে। তবু তারই মন্দিরে আমার সকল অন্তর লুটিয়ে পড়ে।

উৎসবের দিন। নরনারীর মেলা বসেছে। ভিড় ঠেলে পথ চলা যায় না।

মন যেন কেমন করে, পথের ধারে বসে পড়ি, একটা গাছের ছায়ায়।

আমার পাশে গাড়ীগুলি এসে দাঁড়ায়। উৎসুক দৃষ্টিতে চাই, আরোহীরা নেবে চলে যায়। আবার পথের পানে চেয়ে থাকি। কত জন মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে, খালি গাড়ী ভরে চলে যায়।

একখানা খালি গাড়ী এসে দাঁড়ায়। কয়টি মেয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে ওঠে। আমি চমকে উঠি। চোখ মুছে ভাল করে তাকাই, আমার চোখ ছল ছল ক'রে ওঠে। মনে মনে বলি—আমার জীবনের সোণার সন্ধ্যা কোন্ গৃহের ছায়াতলে লুকিয়ে রেখেছ তুমি?

আমার দিকে তার চোখ পড়ে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

গাড়ীর ভেতর থেকে ডাকে "বউ ওঠ," সে একটা নিশ্বাস ফেলে গাড়ীতে উঠে বসে।

গাড়ী চলে যায়। আমি একা। একা পথ চলি।

দাতা

শ্রীমতী মায়া গুপ্তা

কাছাকাছি দুই জমিদারে বেধে গেছে ঝগড়া, এক বটগাছ নিয়ে। সেটা আছে গড়পারে ঐ কাঠাখানেক জমির পরে।

দু'জনেই তরুণ জমিদার, তার ভিন্ন জাতি, একজন হলেন তরুণ, অপরটী তরুণী। কাজে কাজেই ঝগড়া মেটার উপায় নাই।

দুই দলেই বাড়ে লাঠালাঠি; খেয়াল কারো নাই! ক্রমশঃ দু'জনেরই মাথার রক্ত হ'তে লাগল ভীষণ তপ্ত।

শেষে তরুণ জমিদার মহা রেগে মেগে, দেখা করতে এলেন রাণীর সাথে। রাণী তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে গেলেন চলে, বলে দিলেন—"জমির মালিক সবার সাথেই, দেখা করেন নাকো—"

তরুণ জমিদার একটু মলিন হেসে লিখে দিলেন—"বটগাছটার সাথে আমি দান করলেম আরো কিছু তাঁকে, যিনি মুখ ফিরিয়ে চলে যান্ দুয়ারে তাঁর কাঙাল অতিথ্ দেখে।"

গর্ব্ব রাণীর কোথায় গেল চলে!

লেখেন তিনি—এমন সর্ব্বনেশে দাতা, তোমার মত রাখতে কভু পারবে না এই মস্ত জমিদারী, আমি লিখে দিতে পারি। তাই দিলাম গো আশ্রয় অযোগ্য এই জমিদারে!···

বল, "এ কার পরাজয়"?

শ্রীকান্তের—অভয়া

শ্রীসন্তোষকুমার বসু

দুর্গম হিমাদ্রি শিরে শুভ্রের মহিমা
রচিয়াছে আপনার অকলঙ্ক সীমা,
সেইমত তুমি। আপন দুঃখের সম্ভারে
নিজেরে করেছ মহনীয়। জীবন মাঝারে,
রচিয়াছ শুধু সত্যের পতাকাখানি,
কর নাই অসম্মান। আমি তাহা জানি॥
করুণার প্রবাহিনী অন্তস্তল তলে
সদা বহে। আপনার মর্য্যাদার বলে
নিয়াছ সম্মান সেথা, যে তোমারে জানে।
সত্যবুদ্ধি রুদ্ধ যার কাছে, অপমানে
অসম্মানে নত করে সত্যের কাহিনী
তা'রা কি বুঝিবে তব শুভ্র নব বাণী।

মুক্ত যার সত্য যেথা আপনার জ্ঞানে
তোমার অমৃত বার্ত্তা ঘোষিছে সেখানে॥

দিৎসা

শ্রীরসময় দাশ

আজি ভাবিতেছি বসি' বসন্তের প্রথম প্রভাতে,
কোন্ ছন্দে গাঁথি' আনি' ওগো বন্ধু, দিব তব হাতে
এ আমার অন্তরের আনন্দের অনুভূতিখানি,—
এ আমার মৌন ভীরু হৃদয়ের ভাষা হারা বাণী।

আজি মোর হিমসিক্ত কাননের চিত্ততল ভরি'
শ্যামল স্পন্দনখানি অকস্মাৎ ফিরিছে সঞ্চারি',
নগ্ন, শীর্ণ পুরাতন পত্রহীন তরুশাখা 'পর
সহসা উঠিল জাগি' জীবনের একি এ মর্ম্মর!

বনের অন্তরে মোর একখানি আকুল আহ্বান,
সকল ঐশ্বর্য্য তা'র নিঃশেষে করিতে চাহে দান!
তাই আজি শত শত সকরুণ পিককণ্ঠস্বরে
আনন্দের বাণীখানি মিশে যায় দূরে—দিগন্তরে!

পরিপূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণতারে করা সমর্পণ,—
এযে ব্যাকুলতা, বন্ধু, এর ভাষা নাহি জানে মন!

যাত্রী

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

আর যাই থাক্, এখানে টিকিট কেনবার হাঙ্গাম নেই, লঞ্চে গিয়ে স্থান দখল করে বস্‌লেই হ'ল, টিকিটওয়ালা নিজের থেকেই গরজ করে টিকিট দিয়ে যাবে। তা বলে বিনে টিকিটে যাবার কোন উপায় নেই, টিকিটওয়ালা সবাইকেই টিকিট করিয়ে নেবে, একজনও বাদ্ যাবার আশঙ্কা নেই; ভিড়ের দিন যদি নেহাতই দু' একজনের গরমিল হয়, তাহলে নামবার সময় টিকিটের দাম্‌টা আদায় করে নেওয়া হয়। বেচারাদেরও না দিয়ে নিস্তার নেই, এ ত আর রেল-ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম নয়, যে বুকিং অফিসের ভিতর দিয়ে রেলওয়ে অফিসার হয়ে চলে আস্‌লাম; লঞ্চ থেকে বের হবার একমাত্র পথ সিঁড়ি, কাজেই পালাবার পথ কোথা' ?

লটবহর বিশেষ কিছু সঙ্গে ছিলনা, একটা মডার্ণ সুটকেস্-ট্রাঙ্ক্ আর একখানি মোটা চাদর। স্লিপারের সিঁড়ির উপর দিয়ে পা' টিপে টিপে লঞ্চের মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সাম্‌নে দিকে চেয়ে দেখি সব বেঞ্চ ভর্ত্তি 'ন স্থানং তিলধারণম্'। লঞ্চখানিকে দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ ষাট্ হাত এবং প্রস্থে হাত দশ বার বলে আন্দাজ করা যেতে পারে। প্রস্থের পরিমাণ আবার সব জায়গায় সমান নয়, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়ে অগ্রভাগটি অন্তরীপ হয়ে আছে, কিন্তু পিছনের দিকটা গোলাকার।

লঞ্চের দু'পাশ দিয়ে লম্বালম্বিভাবে বেঞ্চি বসান। মাঝ্‌খান্‌টায় নীচের দিকে বয়লার ও কল-কারখানা। সাম্‌নের দিকের খানিকটা জায়গা ক্যানভাস্ দিয়ে ঘেরা, যদিও বাইরে থেকে প্রায় সবটা দেখা যায়—ওখানে একখানি বেতের ইজি চ্যায়ার ও দু'খানি কাঠের চ্যায়ার পাশাপাশি সাজান। এককোণে একটি কাঠের ফলকে লেখা, 1st and 2nd class। এই উর্দ্ধতন শ্রেণীর সাম্‌নেই সারেঙ্গ সাহেবের বস্‌বার স্থান—চারদিকে মোটা নারকেলের দড়ি ঘেরা বেড়া আছে। সারেঙ্-সাহেব একটি টুলের উপর উপবিষ্ট। একটা চক্রাকার হাতলওয়ালা লৌহবৃত্ত দুইজন লোক ধরে আছে। চক্রাকার বস্তুটির দু'পাশে দু'টি ঘড়ির মত চালনাজ্ঞা-যন্ত্র। কাঁটাটি 'stop' এর ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনের দিকের খানিকটা জায়গা তেলচিটে পুরু ক্যানভাসের পর্দ্দা দিয়ে একেবারে ঢাকা। জিজ্ঞেস্ করে জান্‌লাম, ওটা ভদ্র-মহিলাদের জন্যে। এই ভদ্রমহিলাদের কামরার ওপাশেই লঞ্চের খালাসীদের পাক্-সাক্, খাওয়া-দাওয়া ও বস-বাস করবার জায়গা। তারপর একটা ঢালু ছোট্ট ডেক্, খালাসীরা ওখানে জল তোলে, স্নান করে বা কাপড় কাচে।

সারেঙ-সাহেব হঠাৎ মাথার উপরে লম্বমান দড়িটা ধরে টান দিতেই উৎকট বাঁশীর সুরে হুইসেল্ বেজে উঠ্‌ল। হুইসেলের শব্দ হতেই হুড়মুড় করে কতগুলি লোক লঞ্চ থেকে বেরিয়ে পারে নাম্‌ল। আমি যেন একটু হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম, টে-রে-রে-রে-র‍্যান্ করে শব্দ হওয়া মাত্র চেয়ে দেখি চালনাজ্ঞা-যন্ত্রের কাটাটি 'stop' এর ঘর থেকে 'slow' এর ঘরে গিয়ে দাঁড়াল্। লঞ্চটি পিছনের দিকে সরতে আরম্ভ করল। আধমিনিট পরে আবার টে-রে-রে-রে-র‍্যান্ করে শব্দ হতেই কাটাটি 'Slow' এর ঘর থেকে সরে একেবারে 'Astern' এর ধারের 'Half' এর ঘরে গিয়ে দাঁড়াল।

এমন সময় খালাসীরা কাকে যেন ডাকাডাকি সুরু করে দিল; লঞ্চও থেমে গেল। ব্যাপার কি? ব্যাপার আর কিছুই নয়। টিকিটওয়ালা ভদ্রলোক হাট্ থেকে মাছ আন্‌তে গেছেন, এই এলেন বলে। লঞ্চটি যেখানে ভিড়ে, সেখান থেকে হাটের পথ' শ' সোয়াশ' গজ হতে পারে। সারেঙ্-সাহেব একবার উকি মেরে টিকিট-বাবুর টিকি দেখ্‌তে চাইলেন, কিন্তু দেখা পাওয়া গেল না। কি আর করা, লঞ্চটাকে ঘুরিয়ে আবার পারে ভিড়ান হল। এক গ্রাম্য

ভদ্রলোক সারেঙ-সাহেবের কাছে কাকুতি-মিনতি করতে আরম্ভ করল, দোহাই সারাংবাবু ইষ্টিমার ছাড়বেন্ না, আমি একবার ঐ নৌকোটায় গিয়ে দু' একটা টান্ দিয়ে আসি। 'সারংবাবুকে' সেকথা লক্ষ্য করতে দেখ্লাম না, কিন্তু ভদ্রলোক তামাক খেতে নেমে গেলেন।

পাড়া-গাঁ জায়গা, নদীটাও নিতান্ত ছোট, কিন্তু লঞ্চ চল্বার মত জল সর্ব্বদাই থাকে। লঞ্চ-সারভিস্ হল, পাড়া-গাঁ থেকে শহর, আবার শহর থেকে ফিরে পাড়া-গাঁ। লঞ্চটি কোন কোম্পানীর নয়; এক পয়সাওয়ালা কুণ্ডুর, ব্যবসা করবার জন্তে কিনেছেন। খরচ পুষিয়েও মাসে দেড়শ দু'শ টাকা থেকে যায় বলে, সারভিস্টি এ্যাদ্দিন চলে আছে। লঞ্চটি দু'বার যাওয়া-আসা করে। সকাল আট্টার সময় পাড়া-গাঁ'র ষ্টেশন ছেড়ে, এগারটার সময় শহরে পৌছে ও আবার বারটার সময় শহর থেকে ছেড়ে, তিনটার সময় গাঁয়ে পৌছে; তার পর আর একবার শহরে এসে যাত্রী নিয়ে সেই যে যায় আর ফিরে পরদিন বেলা এগারটায়।

টিকিট-বাবুর সাথে শহরের অনেক লোকের আলাপ আছে। তারা মাঝে মাঝে হাট্ থেকে সস্তাদরে মাছ কিনে আন্বার জন্তে তার কাছে পয়সা দেয়। সে-ও তাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারে না, অতদিনের পরিচয় একটা চক্ষু লজ্জাও ত আছে। টিকিটবাবুর নাম নীলমণি, কিন্তু তাকে নাম ধরে বড় একটা কেউ ডাকে না। কেউ কেউ 'মশায়'-ও বলে, আবার কেউ কেউ টিকিট-মশাইও বলে, কিন্তু খালাসীরা বাবু বলেই ডাকে। নীলমণির সাথে কুণ্ডুদের নাকি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, অন্ততঃ নীলমণি ত তাই বলে। কিন্তু লোকে বলে নীলমণি প্রোপ্রাইটর হরিধন কুণ্ডুর জাতি-ভা'য়ের শালীর পিস্তুত' বোনের ছেলে।

যাক্ শেষ পর্য্যন্ত টিকিটবাবু মাছ নিয়ে লঞ্চে উঠ্লেন। লঞ্চ ছেড়ে দিল। হাল ঘুরিয়ে ফুল মোসন দিতে না দিতেই, পার থেকে এক হিন্দুস্থানী দরোয়ান আবার ডাকাডাকি সুরু করল। দরোয়ান হাঁক্ দিয়ে বল্ল, জামাইবাবু আতে হৈ, উন্কো শহর যানে হোগা। সারেঙ সাহেব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি হাল ঘুরিয়ে আবার লঞ্চ থামিয়ে দিলেন।

জামাইবাবু নৌকো দিয়ে লঞ্চে এসে উঠ্লেন। খালাসীরা ও সারেঙ-সাহেব তাঁকে সেলাম জানাল। জামাইবাবু সেই ক্যানভাস্-ঘেরা 1st. & 2nd. classএর জায়গায় যেয়ে ইজিচ্যায়ারে হেলান দিয়ে বস্লেন। বলা বাহুল্য, জামাইবাবু হরিধন কুণ্ডুর একমাত্র মেয়ের জামাই।

আমার অসোয়াস্তি বোধ হ'ল, সারেঙ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, শালাবাবুর জন্তেও দাঁড়াতে হবে নাকি? সারেঙ সাহেব মুচ্কি হেসে বল্লেন, না, এবার সত্যি ছাড়তে হবে, কাচারীর প্যাসেঞ্জার রয়েচে, তাড়াতাড়ি পৌছে দিতে হবে ত।

সেই আগা-গোড়া তেলচিটে ক্যানভাসের পর্দ্দা দিয়ে ঘেরা যেয়ে কামরার দিকটায়, বেঞ্চিতে একজনের বস্বার মত জায়গা আছে, কিন্তু এক ভদ্রলোক ওখানে প্রকাণ্ড এক বোচ্কা বসিয়ে রেখেছেন। ভাবলাম, ব'লে ক'য়ে যদি বোচ্কাটা নামান যায় ভালই, নইলে জোর করে নামিয়েই বসে পড়তে হবে; ভদ্রলোকের চেহারা দেখে যা মনে হয়, তাতে তিনি কথা ছাড়া অন্ত কিছুর দ্বারা প্রতিবাদ করতে সমর্থ হবেন না। ভদ্রলোকের কাছে যেয়ে প্রস্তাবটি করতেই তিনি যেন শুনেও শুন্ছেন না ভাবটি দেখালেন। আমার অনুরোধ এড়াবার জন্তে তিনি অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি আস্তে বোচ্কাটি বেঞ্চির তলায় রেখে দিয়ে চুপ করে বসে পড়লাম, ভদ্রলোক টেরও পেলেন না। খানিকক্ষণ বাদে আপদ কেটে গেচে ভেবে তিনি পিছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে মুখখানা হাঁড়ির মত ক'রে বল্লেন, খুব ত জায়গা দখল করলেন, মশাই! বোচ্কাটা যে ওখানে রাখলেন আপনার একটু আক্কেল হল না? কালীবাড়ীর প্রসাদ রয়েচে ওতে, তা আবার যে সে কালী নয়, চাচুরতলার কালী, একেবারে কাঁচা-খেকো দেব্তা। কিন্তু চাচুরতলার কালীর নামেও আমাকে নড়তে না দেখে ভদ্রলোক হতাশ হলেন। কি আর করেন, বোচ্কাটা বেঞ্চির তলা থেকে টেনে বার করে যেয়ে কামরার ভিতরে দিয়ে বল্লেন, নাও গো, সাবধান ক'রে রেখো, দেখো কারু পায় টায় যেন না লাগে; একেবারে কাছে নিয়ে ব'সো কিন্তু। বেঞ্চিতে বসে ভদ্রলোক একবার ভাল ক'রে আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখ্লেন।

আঁকা-বাঁকা ছোট নদী, বেশী জোরে যাবার উপায় নেই, খানিকটা গিয়ে গিয়ে এক একটা বাঁক ঘুরতে হয়। নদীর দু'ধারে ধান ক্ষেত, সরষে ক্ষেত, কলাই ক্ষেত। অদূরেই গাঁ। ছোট ছেলের দল নদীর ধারে খেলতে এসেচে। গৃহস্থ-বধূরা সকাল সকাল নদীতে স্নান করে কলসী ভরে জল নিয়ে যাচ্ছে। এই শীত, তবুও দিব্যি আরামে যেন ভিজা কাপড় পরেই মাঠের পথ দিয়ে ছপ্ ছপ্ ক'রে চ'লেচে। আর এক জায়গায় গুড় জাল দেওয়া হচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা লোহার কড়াতে পর্য্যাপ্ত খেজুর রস ঢেলে দেওয়া হয়েচে। উনন ওটাকে বলা উচিত নয়, প্রকাণ্ড একটা গর্ত্ত তার চার দিক দিয়ে জাল দেওয়া হচ্ছে। পাশেই কয়েকজন কৃষক বসে, কেউ বা তামাক টান্‌ছে, কেউ বা গল্প করচে। নদীর উপরে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে একজন জাল ফেলবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে, যেই লঞ্চটি চলে যাবে অমনি জলের তাড়ায় কতক কতক মাছ ডাঙার দিকে ছুটচে, সেও অমনি ঝপ্ করে জাল ফেলে চট্ করে তুলে নেবে। একটা নেংটা ছেলে, নদীর একেবারে ধারে এসে লঞ্চটার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ পিছন থেকে একটা দুষ্টু ছেলে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল। জল অবশ্যি সেখানে বেশী ছিল না, তাই ছেলেটা একটা চুব্‌নি খেয়ে পারে উঠে পলায়নরত ছেলেটাকে ধরবার জন্যে পিছনে পিছনে ছুটল।

গায়ে হাওয়া লাগাবার জন্যে ফার্ষ্টক্লাসের কাছে এসে দাঁড়িয়েচি। পূর্ব্বেই বলা হয়েচে, ফার্ষ্টক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাস একই জায়গায়, তবে কিছুটা তফাৎ আছে। ইজি-চ্যায়ারটা হ'ল ফার্ষ্টক্লাস প্যাসেঞ্জারের জন্যে আর কাঠের চ্যায়ার দু'খানা সেকেণ্ডক্লাস প্যাসেঞ্জারদের। ইজিচ্যায়ারটাকে জামাইবাবু দখল করেচেন বলে আজকে আর ফার্ষ্টক্লাসের টিকিট বিক্রী হয়নি। যদিও ফার্ষ্টক্লাসের টিকিট কোনদিনই বিক্রী হয় না, তবু টিকিট-বাবু মনে করেছিলেন আজ্‌কের দিনটায় হয়ত হ'ত। সেকেণ্ডক্লাসের চ্যায়ার দু'খানার একখানিতে একজন আধা-ভদ্রলোক বসেচেন। তার আদব-কায়দা ও চেহারা দেখে দস্তুরমত ধারণা করা যায় যে, এই তার জীবনে প্রথম সেকেণ্ডক্লাসে বসা। সে কতকটা সেই হুমায়ুনের ভিস্তিওয়ালার মত কাণ্ড-কারখানা করছিল আর কি। পোষাক পরিচ্ছদেও তাকে বেশ মানিয়েছে; পায় একজোড়া পুরাণো ডার্বি সু, কিন্তু তাতে নূতন ফিতা লাগান। মোজাও আছে, লাল সাইকেল ষ্টকিং। পরণে আধ ইঞ্চি পরিমাণ লাল পেড়ে একখানি কাপড়, পরিষ্কারই বটে কিন্তু হাতে সাফ্ করা ব'লে মনে হ'ল। ডানদিকের হাঁটুর কাছ দিয়ে কোন কসের দাগ যেন স্পষ্ট হ'য়ে লেগে আছে। জায়গাটা আবার একটু ছেঁড়া ছেঁড়া, বোঝা গেল দাগ উঠাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করা হ'য়েচে, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয়নি। গায় একটী ফ্লানেলের পাঞ্জাবী তার উপর আবার গরম কোট। পাঞ্জাবীর ঝুল মোল্লাদের মত হাঁটু অবধি নামান, কিন্তু কোটটির ছাট কাট সব ঠিক আছে, কিন্তু বড্ড বেমানান হয়েচে, তার ডবল শরীরেও ওকোট খাপ্ খাবে না; বোধ হয় পুরাণ পোষাকের ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনেচে। তার উপরে আবার গলায় একটী মাফ্‌লার, তার মানে বরফের দার্জ্জিলিংও তাকে কাবু করতে পারবে না। চ্যায়ারের উপর সে স্থির হয়ে বসতে পারছিল না; একবার হেলান দিয়ে, আবার সোজা হ'য়ে, আবার গুঁজো হ'য়ে, কোনমতেই সোয়াস্তি নেই। তবু চ্যায়ার ছেড়ে উঠবার কোন সঙ্কল্প নেই, হয়ত ভাবে বেশী পয়সা দিয়ে সেকেণ্ডক্লাসে উঠে যদি সব সময়ই চ্যায়ারে ব'সে না গেলাম তাহলে আর পয়সা উসুল করা হ'ল কৈ? জামাইবাবু ইজিচ্যায়ারে দিব্যি হেলান দিয়ে অর্দ্ধশায়িত হয়েচেন। একজন খালাসী একটা গড়গড়া নিয়ে এসেচে, জামাই-বাবু ইসারায় তাকে নলের মুখটা এগিয়ে দিতে বল্‌লেন।

খানিকক্ষণ চলবার পর লঞ্চটি নদীর মাঝখানেই একবার থামল। জেলেদের একটা প্রকাণ্ড নৌকো এসে লঞ্চের গায় ভিড়ল। জামাই-বাবু পছন্দ ক'রে গোটাচারেক বড় মাছ কিন্‌লেন। খালাসীর দল্ সে সুযোগে জেলেদের কাছ থেকে কিছু ফাউ আদায় করল। জেলে-নৌকার দিকে সবাই ঝুঁকে পড়াতে লঞ্চটি কাৎ হয়ে পড়েছিল। সেকেণ্ড-ক্লাস বাবুর কিন্তু সে সব দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে ঠিক বসে আছে।

জায়গায় ফিরে এসে আবার বসলাম। ভদ্রলোক এবার আর আমার দিকে বিরক্তিকর চাহনি হানলে না, বরংচ একটু খাতির করতেই চাইলেন যেন। তিনি পান খেতে আরম্ভ করেচেন, ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে পানের লালা গড়িয়ে পড়চে। মাঝে মাঝে দোক্তার কৌটো থেকে দু'আঙুলের টিপ দিয়ে দোক্তা উঠিয়ে পিছন দিকে মাথাটা হেলিয়ে দোক্তাগুলো মুখে ফেলে দিচ্ছেন। আমাকে একবার ইষারা ক'রে পান-দোক্তা খেতে অনুরোধ জানালেন। 'আমি খাইনা' বলাতে তিনি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পানের লালাগুলো সব বেরিয়ে আসতে চাইল; একটা শব্দ উচ্চারণ করতে না করতেই একেবারে কাপড় চোপড় নষ্ট হবার সম্ভাবনা, কাজেই তিনি মুখ বুজে ঢোক গিলে লালাগুলো পেটের ভিতর রেখে দিলেন। তারপর বললেন, দেখুন মশায় পান খান আর না খান, একবার এই দোক্তাটা গালে পুরে দেখুন—উড়েদের দোক্তাকে পর্য্যন্ত হার মানিয়েচে। আমার 'ওয়াইফ্' যে—যার কাছে আমি বোচ্কাটা রেখে আসলাম উনিই আমার 'ওয়াইফ', উনিই এটা তৈরী করেচেন। রান্নাবান্নায়ও একেবারে অন্নপূর্ণা, তার রান্না খেয়ে ডিপ্‌টি মাজিষ্টর হরিমোহন বাবু পর্য্যন্ত প্রশংসা করেচেন। হরি-মোহন বাবু আবার আমারই জ্ঞাতি-ভাই কিনা, পরণে নেংটি দেখলে কি হবে, আত্মীয় স্বজন আমার সবাই এক একজন জগৎশেঠ।

হঠাৎ মেয়ে কামরার ভেতরে বেশ একটু সোরগোল সুরু হল। আমার পাশের ভদ্রলোক একেবারে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পর্দ্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। অন্যান্য মেয়েরাও যে সেখানে রয়েচেন সে জ্ঞানই তার ছিল না। তিনি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, কৈ গো, প্রসাদের বোচ্কাটা কৈ, দেখো শেষটায় ছোয়া'ছোয়ি ক'রে শ্রীক্ষেত্র বানিও না। বাইরে এসে একগাল হেসে বললেন, রেল-ষ্টীমারের যত কাণ্ড কারখানা মশাই, এ'তে আর জাত থাকে না। ব্যাপার হয়েচে কি, খালাসীচাচাদের মুর্গীর পাল মেয়েদের ওখানে কি ক'রে যেন ঢুকে পড়েচে। আচ্ছা বলুন দেখি মশাই, ব্যাটাদের আক্কেল কেমন, ব্রাহ্মণী-বিধবারা সব রয়েচেন, কালীবাড়ীর প্রসাদ রয়েচে, তার ভেতরে কিনা মুর্গী ঢুকে পড়!

আমি বললাম, তা আজকাল মুর্গীতে আর তেমন দোষ কি, অনেক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণও ওসব নিষিদ্ধ জিনিষ চল করে নিয়েচেন।

ভদ্রলোক কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, আরে সে ত সবই জানে, কিন্তু দশজনের সামনে ব্রাহ্মণত্বটাকে খাটো করতে যায় কেন?

ভদ্রলোকের যুক্তি অকাট্য কাজেই চুপ করে গেলাম। ইতিমধ্যে হুড়োহুড়ি করে অনেকগুলি লোক লঞ্চের কল-ঘরের দিকটায় জড় হয়েচে। কি একটা কল নাকি বিগ্‌ড়ে গিয়েচে, ওটা ঠিক করতে না পারলে লঞ্চের এক্ষুণি দম বন্ধ হবে; তাহলে আবার তাকে পুনর্জ্জীবিত করতে যে কত সময় লাগে তার ঠিক নেই। মোকদ্দমার লোকেরা সারেঙ-সাহেবকে ঘিরে ধরেচে। "খেলা পেয়েচ নাকি? মোকদ্দমা খারিজ হলে তোমাদের নামে ক্ষতিপূরণের মামলা আনব, বুঝ্‌চ সাহেব?" সারেঙের মুখ এতটুকু হয়ে গেল, বললে, আপনাদের ভয় নেই, এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

গোলমাল আর ভাল লাগছিল না, তাই নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। ওদিকে লোহালক্কড়ের ঠং ঠং শব্দ হচ্ছে, কল্ সারাই হল বলে। খানিকক্ষণ বাদে বাস্তবিকই কল ঠিক হল, লঞ্চটি আবার নির্ভয়ে চলতে আরম্ভ করল। এমন সময় পাশের ভদ্রলোক গা ঠেলে বল্লেন, কৈ মশাই ঠিকঠাক্ হয়ে নিন্, এই বাঁকটা ঘুরলেই ত ষ্টেশন। আমি বললাম, আমার আবার ঠিকঠাক্ কি, না আছে জিনিষের লটবহর, না আছে মানুষের লটবহর। ভিড় যতই হোক না কেন, সুটকেসটা বগলদাবা করে সুর সুর করে বেরিয়ে যাব।

—কিন্তু আমার একটু সাহায্য করতে হবে আপনাকে। প্রসাদের বোচ্কাটিকে আমি দু'হাতে উচু করে নেব, যাতে ছোয়াছানি না যায়, আর আপনি অনুগ্রহ করে আমার ওয়াইফকে নিয়ে পিছনে আসবেন।

শহর জায়গা, এখানে কিছু অসুবিধে নেই। একটা প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট, লঞ্চ ভিড়তেই ফ্ল্যাটের সাথে দিব্যি সিঁড়ি বেঁধে দেওয়া হল। যাত্রীরা নামতে সুরু করল।

সবাই আগে নামতে চায়, কাজেই বেশ একটু ঠেলাঠেলি

চল্‌তে লাগল। সেই পাশের ভদ্রলোক দু'হাতে বোচ্‌কাটাকে খুব উচু করে ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আমি তাঁর 'ওয়াইফকে' নিয়ে পিছনে আস্‌ছিলাম। ভদ্রলোকের হাত দু'টো উপরে থাকায় ঠেলাঠেলির চোটে একবার এদিকে একবার ওদিকে চল্‌তেছিলেন। ফ্ল্যাটের ভেতর পা' দেবেন, এমন সময় হঠাৎ ভদ্রলোক পেছন থেকে এমন একটা ধাক্কা খেলেন যে তার বোচ্‌কাটা ছিট্‌কে হাত দশেক দূরে গিয়ে পড়ল, আর নিজেও উবু হয়ে পড়ে গেলেন। এদিকে আমার পেছনে তাঁর 'ওয়াইফ্' এই ব্যাপার দেখে ওখানেই মরা-কান্না সুরু করে দিলেন।

অনেক কষ্টে ভদ্রলোককে তোলা হল। হাত পা' ফ্রাক্‌চার হয়নি বটে, কিন্তু চোট লেগেছিল খুব বেশী। কিন্তু ভদ্রলোক উঠেই পাগলের মত চীৎকার করে উঠ্‌লেন, আমার বোচ্‌কা, আমার বোচ্‌কা কই? ভদ্রলোকের স্ত্রী-ও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠ্‌লেন, এঁ্যা, আমার বোচ্‌কাও গেছে? ওগো আমার কি হবে গো, ওতে যে আমার যথাসব্বস্বি গো!

খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে বোচ্‌কাটাকে পাওয়া গেল, ফ্ল্যাটেরই একপাশে গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ছিটকে পড়াতে বচ্‌কাটা গিয়েছিল খুলে, আর তার ভেতরের জিনিষপত্রও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সবিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লাম বোচ্‌কাটাতে প্রসাদের নাম গন্ধও নেই, একটা খোলা বাক্সে কতগুলো ভারি ভারি গহনা আর দলিলের বাণ্ডিল এদিক ওদিকে পড়ে রয়েচে। ভদ্রলোক আঘাতের কথা ভুলে গিয়ে সব্যস্তে বোচ্‌কার ভেতর জিনিষগুলো কুড়িয়ে তুল্‌তে লাগ্‌লেন।

কিন্তু ভদ্রলোক ভদ্রই, কেননা রাস্তায় নেমে যাবার সময় ঠিকানা দিয়ে বল্‌লেন, কাল যাবেন অনুগ্রহ করে, আপনার নেমন্তন্ন।

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

কবিতার বই বুঝি মোর পেলে

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মোর কবিতার বইখানি বুঝি পেলে প্রীতি উপহার?
বিকাল বেলার আকাশের মতো রাঙা হ'ল মুখখানি;
মনের মানস লুকাতে চাহিলে মরমে সরম মানি,
বনহরিণীর ভীরুতায় চোখে মিনতির পারাবার।

গেটের দুধারে দুলিছে হয়ত' হাস্নুহানার ঝাড়,
সুরভি সুবাস ঢালিছে ঘরের টিপয়ের ফুলদানি;
ব্যাকুল বাতাস পুরাণো স্মৃতির দ্বারে দিল করহানি,
সহসা সুমুখে নামিল সাঁঝের কালো ছায়া ম্লানতার

এখানেও আজ অমনি আঁধার নামে ধীরে নদীপারে,
যমুনা তীরের বনানীর শ্রেণী আব্‌ছায়া হ'য়ে আসে;
বাসি দিবসের ইতিহাস বসে ভাবি জানালার ধারে,
আগেকার লেখা চিঠির তাড়াটি খোলা পড়ে ডানপাশে।

অতি অনুরাগে প্রতি চিঠিখানি বুকে দুখে চেপে ধরি,
দেখিতে দেখিতে ঘনাল কখন অবগাঢ় বিভাবরী॥

সুপ্তি ও জাগরণ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্-এ

নিদ্রার সোপান পরে সোনার নূপুর
বাজাইল স্বপনটী। সুষুপ্তি-চেতনা
ভরিল নৃত্যের রসে; কেহ জানিল না
কিসের সে লাস্যলীলা, কিসের সে সুর,
কিসের হিল্লোল লাগি' চিত্ত ভরপুর,
নিমীল-নয়নে মোর কিসের বেদনা,
অকস্মাৎ নেত্র প্রান্তে কেন অশ্রুকণা?
আঁধারে পরশ কার,—মধুর, মধুর?

সহসা ভাঙিল ঘুম, হেরিনু আকাশে
অগণিত জ্যোতিষ্কের অন্তহীন মালা,
প্রান্তে শুক্লা তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ ভাসে,
শিয়রে তখনও মোর ক্লান্ত দীপ জ্বালা;
বহিছে পশ্চিম বায়ু। ভরিল নয়ন;—
এবার আনন্দ নহে, ব্যথার বেদন।

গান্ধারী—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

যদি দখিণা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে
বাদল-ব্যাকুল বনে পাবে কি খুঁজিয়া তারে ?
যদি এ চাঁদিনী রাতে
নিদ্ নামে আঁখি-পাতে
প্রভাতে চাহিয়া চাঁদে ভাসিবে নয়ন-ধারে।
যে কথা কহিতে বাধে,
যে ব্যথা পরাণে কাঁদে,
আজি না কহিলে প্রিয়, কহিবে কবে সে কারে ?

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত
সুরসাগর

মা মা II পা পা পণদা -ণদা । -পা পাপ -মা পা I জ্ঞা -া -া -া । -া জ্ঞা -রা সা।
য দি দ খি ণা • • • • প • ব ন • • • • আ • সি

সরা -া -া -জ্ঞরা । -সা -ণ্‌া সা রা I মগা -া -া গা । মা -পমা মা মা।
য়া • • • • • • ফি রে গো • • দ্বা রে • য দি

পা পা পদা -ণর্সর্রা । -ণর্সা র্সা -মা পা I মজ্ঞা -া -া -া । -া -া জরা মজ্ঞা।
দ খি ণা • • • • • • প • ব ন • • • • • আ স

রসা -া সা রা । মগা -া -া গা I মা -গা -মা -া । -া -া পমা পা ।
ল • • ব্যা কু ল • • ব নে • • • • • বা য়

মজ্ঞা -রসা সা রা । মমা -া -া মপা I মপা -া -া -া । -া -া পা পা ।
ল • • ব্যা কু ল • • ব • নে • • • • • পা বে

পদা -পদা -মা মা । মপা -ধা পধা -ণা I ধণা -র্সা ণর্সা -র্রা । -ণর্সা -া র্সমা মা II
কি • • • • খুঁ জি • • গা • • তা • • রে • • • • • য দি

-া -া II মা পা ণদা -া । ণা ণা -র্সা র্সা I র্সর্রা -ণা র্সা -া । -া -া -া -া ।
য দি এ • • চা দি • মী রা • • তে • • • • •
যে ক থা • • ক হি • তে বা • • ধে • • •

র্সা -র্রা র্সর্রা -র্মজ্ঞা । জ্ঞা র্রা র্সা -া I র্সণা -া -ণর্সর্রা -ণর্সা । পদা -পা {পা দা ।
নি দ্ না • • • সে আঁ খি • পা • • • • • • • • তে • প্র ভা
যে ব্য. থা • • • প রা • ণে কাঁ • • • • • • • • দে • আ জি

মা -া -া মপা । মজ্ঞা -রসা -সরা সণ্ I সা -রা গা -মা । -া -া } পা দা ।
তে • • চা হি • • • রা চা • দে • • • ভা সি
বা • • ক হি • • • লে প্রি • য় • • • ক হি

র্সা -া -া র্সা । ণর্সা -র্রা -া র্রা I ণা -ধা -ণা -া । দা -পা পমা মা II II
যে • • ন য় • • • ন ধা • • • রে • য দি
যে • • ক বে • • • সে • কা • • • রে • য দি

এ গানটি হিন্দুস্থান কোম্পানীতে কুমার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় রেকর্ড করিয়াছেন।

বিতর্কিকা

১। নামের পদবী

শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় বিচিত্রার সম্পাদক মহাশয় বিচিত্রায় বিতর্কিকার স্থান দিয়ে সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের যে উপকার করেছেন—লিখে শেষ করা যায় না।

সম্পাদক মহাশয় নিজেই প্রথমে "তুই, তুমি ও আপনি" এই তিনটী শব্দ নিয়ে তাঁর বিতর্কিকার সুরু করেন। ক্রমান্বয়ে ২।৩ মাস ধরে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হলো—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে কোন্ শব্দটা বহাল রইল তা' ঠিক বোঝা গেল না।

"তুই, তুমি ও আপনি" এর মীমাংসার চেয়েও আমার মনে হয় মেয়েদের নামের পদবী নিয়ে আরও বেশী সমস্যার সৃষ্টি হ'য়েছে। অবশ্য ঐ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত খুব কম লোকই মুখ খুলেছেন।

দু'বছর আগে শ্রাবণ মাসের বিচিত্রাতে দেখেছিলুম শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন কবি রবীন্দ্রনাথকে ঐ বিষয়ে একটা চিঠি লিখেছিলেন এবং তা'র উত্তরে কবিবর বিচিত্রাতে "নামের পদবী" নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেন।

পুরুষ বন্ধুদের ডাক্‌বার সময়ে আমরা বলে থাকি সুরেন বাবু, উপেনবাবু বা একটু ঘনিষ্ঠ হ'লে সুরেন বা উপেন; কিন্তু যত গোল বাধে নারীবন্ধুদের সময়ে। মিস্ বা মিসেস শব্দটা কানে বড় বিশ্রী বাজে। শ্রীমতি রুবি বা শ্রীমতী ইলা ও খুব ভাল শোনায় না, অথবা শুধু রুবি দেবী বা ইলা দেবী ও কেমন কেমন ঠেকে। এ অবস্থায় একটা পাতানো সম্পর্ক ভিন্ন—যেমন "দিদি বা বৌদিদি"—সম্বোধনের আর অন্য কোন উপায় নাই। কোন ভীড়ের মধ্যে একটু দূর হ'তে কোন নারীবন্ধুকে ডাক্‌তে হলে ভীড় ঠেলে তাঁর কাছে গিয়ে "শুনছেন" ব'লে তাঁ'র মনোযোগ আকর্ষণ করা ব্যতীত আর কিছু কর্‌বার নাই।

কবি রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন—"মেয়েই হোক্ পুরুষই হোক্—পদবী মাত্রেই বর্জ্জন কর্‌বার আমি পক্ষপাতী" (বিচিত্রা শ্রাবণ ১৩৩৮ পৃঃ ৫)। তিনি আরও বলেছেন—"মোট কথা হচ্ছে এই—ব্যাঙাচী পরিণত বয়সে যেমন ল্যাজ খসিয়ে দেয় বাঙালীর নামও যদি তেমনি পদবী বর্জ্জন করে, আমার মতে তাতে নামের গাম্ভীর্য্য বাড়ে বই কমে না। বস্তুতঃ নামটা পরিচয়ের জন্য নয় ব্যক্তি নির্দ্দেশের জন্য।" (বিচিত্রা শ্রাবণ ১৩৩৮ পৃঃ ৫)

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বল্‌লে সকলে বুঝ্‌বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র বল্‌লে কোন লোকের বুঝ্‌তে বেগ পেতে হবে না—ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র কিন্তু রামা শ্যামার বেলায়ত ওরকম অনুমান খাটবে না। তা'দের নির্দ্দেশ কর্‌তে হ'লে একটা পদবী চাই-ই। তবে আমার জিজ্ঞাস্য হ'চ্ছে এই যে কোন মেয়ে বন্ধুকে সম্বোধন কর্‌তে হলে এক পারিবারিক সম্বোধন ছাড়া আর কি সম্বোধন চল্‌তে পারে। আশা করি বিচিত্রার অসংখ্য পাঠক পাঠিকার মধ্যে অন্ততঃ ২।৪ জনও এ বিষয়ে একটু মাথা ঘামাবেন্ এবং শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ও তাঁর ব্যক্তিগত মতামত বিচিত্রার মারফত জানাবেন। খুব বড় লেখক বা ভাবুকদের কাছে কিছু আশা করা বৃথা—তাঁরা সব বড় বড় ব্যাপারে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ঐ সব আলোচনায় বিশেষ লাভ আছে বলে' মনে হয় না"। সব সময়ে শুধু লাভ লোকসানের হিসেব দেখে চলাইত যুগধর্ম্মের কাজ নয়। একদিন শুধু মা, বোন, পিসী, দিদি নিয়েই সব গোল মিটে" এসেছে আজ যখন রুচির পরিবর্ত্তন সব দিকেই হচ্ছে, তখন এরও একটা আলোচনা চাই বইকি। আর এটা নিশ্চয়ই সত্য যে পুরুষদের সম্বোধন বা "তুই তুমি ও আপনি" এই বিষয়ের চেয়েও মেয়েদের সম্বোধন ব্যাপারটা বেশী acute হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। বাঙালীর জাতীয় পোষাক

শ্রীযুক্ত ফকির আহম্মদ

বিচিত্রার বিগত আশ্বিন সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তাফী মহাশয় বাঙালীর জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। দেশী ও বিদেশী উপাদানের সংমিশ্রণে বাঙালীর পোষাক আজ যে অন্যান্য জাতীর নিকট একটা কৌতুকের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে তজ্জন্য অনেক আক্ষেপ করিয়া তিনি বাঙালীকে ধুতি, পাঞ্জাবী, ও চাদর পরিধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তিনি বাঙালীকে ধুতি ও চাদর পরিধান করিতে বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু যুক্তি তর্কের দ্বারা ধুতি ও চাদর পরিবার ঔচিত্য ও উপকারিতা প্রদর্শন করেন নাই।

শ্রদ্ধেয় শ্রীউপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিচিত্রার কার্ত্তিক সংখ্যায় আমাদিগকে ধুতি ও চাদর পরিধান করিবার অসুবিধার কথাটা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁহার যুক্তি ও প্রমাণগুলি আমাদের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তবে উপেনবাবু ধুতি পরার যে সকল অসুবিধার কথা আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইল শুধু কোঁচা বিষয়ক, বোধ হয় কতকটা লজ্জাকর হইয়া পড়ে বলিয়া ন্যায়ের খাতিরে কাছা বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। বাস্তবিক ধুতি পরিহিত ভদ্রলোককে কাছা যেরূপ অর্দ্ধনগ্ন করিয়া রাখে ইহার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

তথাপি যাঁহারা ধুতি পরার বর্ত্তমান ফ্যাসন সংরক্ষণের পক্ষপাতী তাঁহারা বলিবেন,—উপেনবাবু বর্ণিত কোঁচার অসুবিধা হইতে ত অনায়াসেই রেহাই পাওয়া যাইতে পারে যদি ৪৪ ইঞ্চি বহরের ধুতি ছাড়িয়া দিয়া ২০ কি ২৪ ইঞ্চি বহরের ধুতি পরিতে আরম্ভ করা যায়।

তাহাতে রেলে, ট্রামে বা বাসে দৈবদুর্ব্বিপাকের আশঙ্কাও কম থাকিবে, দুহাতে বালতি লইয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিতেও কোন কষ্ট হইবে না, আর দাঁড়াইয়া মাথা নীচু করিয়া কোন কাজ করিতে হইলেও শরীরের দৈর্ঘ্যের সংকোচ বশতঃ কোচার অগ্রভাগ ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে থাকিবে না। ২৪ ইঞ্চি বহরের ধুতি পরিধান করিয়া একেবারে জানু পাতিয়া মাটীতে না বসিলে কোঁচার অগ্রভাগ ধুলায় গড়াগড়ি দিবার কোন সুবিধাই পাইবে না। তবে আমাদের মতে সভ্য সমাজ এরূপ "হাওয়ায়ে মলজ্" সাজিতে সম্মত হন কি না সন্দেহ রহিয়াছে।

ধুতি রক্ষণশীলদিগের অন্ত কেহ হয়ত বলিবেন মারাঠী মহিলাদিগের মত ধুতি পরিধান করিলেও ত কোঁচার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা মারাঠী ধরণের হইয়া যাইবে এই ভয়ে হয়ত খাঁটী জাতীয়তাবাদী "ধুতি-পরা-ভদ্রলোক"গণ রাজী হইবেন না।

ধুতির বর্ত্তমান অসুবিধা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপেনবাবু ধুতি পরিবার এক নূতন ফ্যাসান প্রবর্ত্তন করিবার ধারণা করিয়াছেন। তাহাকে হয়তঃ অনেকে এভাবে প্রতিবাদ করিবেন—উপেনবাবুর উপদেশ মত ধুতিকে ছয় বা সাত হাতে কমাইয়া কাছা দিয়া পরিতে হইলে ধুতির হাত দুই অংশ যে সম্মুখ ভাগে ঝুলিতে থাকিবে তাহা কি প্রকারে সামলান যাইবে? ইহাকে যদি কোঁচার আকারে ঝুলাইয়া রাখা হয় তবে বর্ত্তমান কোঁচা অপেক্ষা অধিকতর হালকা হইয়া যাইবে বলিয়া মৃদুমন্দ বাতাসেও আন্দোলিত হইতে থাকিবে। ট্রেণে বাসে বা ট্রামে আরো অনেক দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা। যদি উহার নিম্নভাগকে নাভির তলদেশে গুঁজিয়া দেওয়া হয় তবে সম্মুখের পর্দ্দা একেবারে ফাঁক হইয়া উরুর গোড়া পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে নগ্নতার দৃষ্টান্ত সন্ধান করিবার জন্য আর দূরে যাইতে হইবে না।

তবে ধুতিকে ছয় হাতে কমাইয়া মাদ্রাজী ধরণে পরা যাইতে পারে। নতুবা ছয়হাতি ধুতির দুইপ্রান্ত সেলাই করিয়া লুঙ্গির মতও পরা যাইতে পারে। তাহাতে আবার দুইটা প্রতিবন্ধক আসিয়া দাঁড়ায়। প্রথম প্রতিবন্ধক এই যে ব্রাহ্মণেরা হয়তঃ সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করিতে চাহিবেন না। আধুনিকতার দোহাই

দিয়া একান্ত সম্মত হইলেও ধুতি যে আবার ব্রহ্মদেশীয় লুঙ্গি লইয়া যায়! এদিকে ধুতি-বিলাসী জাতীয়দল বিজাতীয় উপাদান পোষাকে গ্রহণ করিতে নারাজ হইবেন। কেহ বা বলিবেন—এই ফ্যাসন শুধু ঘরের মধ্যেই চলিতে পারে। আফিস আদালত ও বাহিরের অন্যান্য কাজ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আমরা ত এখনো এই হালকা পোষাক;—লুঙ্গি পরিধান করিয়া থাকি।

মাদ্রাজীরা আর এক ফ্যাসনে ধুতি পরিয়া থাকেন। তাহাতে কোঁচার বালাই নাই। যে হেতু কোঁচাকেও কাছার মত পিছনে গুজিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। অনেকেই বলিবেন—এই ফ্যাসন গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ ইজ্জত রক্ষা করিয়া ধুতি পরিধান করার কায়দা যে আর পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বাঙলার হিন্দুদের সঙ্গে মাদ্রাজীদিগের সংস্রব রহিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কা বিজয় করিতে বাহির হন তখন মাদ্রাজী বানর সৈন্যই নাকি শ্রীরামকে সাহায্য করিয়াছিল। উপেনবাবু হয়তঃ ইহাতে সম্মত হইবেন। কারণ তিনি "আঙুলের দোষে হাত কাটিয়া ফেলিতে রাজি নহেন"।

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতিয়মান হইবে যে উপরোক্ত মাদ্রাজী ধরণে ধুতি পরিবার কোন সার্থকতা নাই। তাহাতে বাঙালীর কতকটা অর্থহানি ঘটে। দশহাতি ধুতিকে এরূপ প্যাঁচাইয়া প্যাঁচাইয়া, কোথাও ছড়াইয়া দিয়া কোথাও বা জমাট করিয়া দিয়া পরিধান করিবার অপকারিতাও কম নহে। হঠাৎ কখনো খুলিয়া পড়িয়া পায়ের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়া বিপদও ঘটাইতে পারে।

তদপেক্ষা পায়জামা পরা ঢের ভাল। দশহাতি ধুতিতে দুইটী পায়জামা হয়। পায়জামা পরিলে ধুতি পরা ভদ্রলোকের মত অর্দ্ধনগ্ন হইয়া থাকার ভয় থাকে না। কোঁচার বা কাছার বালাই ইহাতে নাই। পরিতে বেশ হালকা ও আরামদায়ক। কি কারণে জানি না, ধুতির আয়ুকাল হইতে পায়জামার আয়ুকাল ও বেশী। ধৌত করিতে অল্পমাত্র সাবান খরচ হয়। অল্প মাত্র জায়গায় শুকাইয়া লইতে পারা যায়। ইহার সঙ্গে কোটও বেশ খাটে; ওয়েষ্ট-কোট, পাঞ্জাবী চোগা ও চাপকানও বেশ খাটে। "কোটিংএর জন্য যে সকল সুতী কাপড় পাওয়া যায় সে-গুলি ব্যবহার করার সুযোগ" ও সব সময়েই পাওয়া যাইবে।

এই উপলক্ষে মুস্তাফী মহাশয়ের একটী কথা মনে পড়িল। তিনি বলিতেছেন "তাঁদের (মুসলমানদের) মধ্যে যাঁরা প্রকৃত কৃষ্টির মধ্যে মানুষ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালী ভাবটাই প্রধান দেখি। অর্থাৎ তাঁরা বাঙালীর পোষাক পরতে লজ্জা বোধ করেন না। অনেকে বোধ হয় তাঁদের মুসলমানত্বটাকে উচ্চৈঃস্বরে জাহির করার জন্যে বাইরের মুসলমানদের মত বেশ ভূষা করেন। তাঁদের বলি যে বাঙলা ভাষা যেমন বাঙালীর তেমনি বাঙালীর একটা জাতীয় সজ্জা আছে।"

মুস্তাফী মহাশয় কথা কয়টী নেহায়েৎ মুরব্বীর মতই বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতটা অসত্য এবং কতটা অযৌক্তিক। সর্ব্বপ্রথমে মুস্তাফী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি বাঙালী শব্দের অর্থে কি তিনি এখনো মুষ্টিমেয় হিন্দুকেই বুঝেন? যদি তাই হয় তবে আমরা নাচার। তবু জিজ্ঞাসা করিব—বাঙালীর সেই 'জাতীয় পোষাক'টা কি? আমরা ত জানি বাঙালী হিন্দুর পোষাক শুধু ধুতি আর চাদর। কেহবা বলেন ইতোপূর্ব্বে ছিল কটিবাস আর চাদর। আর পাঞ্জাবী ত পাঞ্জাবীদের তাহা মুস্তাফী মহাশয় সবিশেষ অবগত আছেন। যে সকল মুসলমান কৃষ্টির মধ্যে মানুষ তাঁদের কয়জনে ধুতি চাদর পরিয়া থাকেন। আমরা ত দেখিতে পাই তাঁদের অনেকেই হয়ত পায়জামা, আর আচকান, নতুবা পায়জামা আর কোট, নতুবা কোট পেন্টুলন পরিয়া থাকেন। শিক্ষিত মুসলমানের ধুতি পরা আর শিক্ষিত হিন্দুর লুঙ্গি পরা ইহা ত কতকটা সৌখিনতার অন্তর আবার। পায়জামা আর আচকান ইত্যাদি বিদেশী পোষাক পরিলে যদি শুধু মুসলমানের মুসলমানিত্বটা উচ্চৈঃস্বরে (?) জাহির হয় তবে 'কৃষ্টির মধ্যে মানুষ' হিন্দু যুবকরা কোট পেন্টুলন পরিয়া কি জাহির করিতে চাহেন? আর মুস্তাফী মহাশয় ধুতি পরিয়া বা ধুতি পরিতে উপদেশ দিয়া কী বা জাহির করিতে চাহেন? বলা বাহুল্য ধর্ম্মীয়

শাসন ও মজ্জাগত সভ্যতার অনুশাসনে মুসলমান যে অর্দ্ধনগ্নতা অবলম্বন করিতে পারেনা। মুস্তাফী মহাশয় কখনো কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন আইন ব্যবসায়ে ৮৭·৬ পার্সেণ্ট, ডাক্তারী ব্যবসায়ে ৭৯ পার্সেণ্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ৮৫·৫ পার্সেণ্ট, মেডিকেল স্কুলে ৮৬·২ পার্সেণ্ট হিন্দুর অধিকাংশ পায়জামা, পেণ্টুলন, হাফপেণ্টুলন কোট কলার, নেকটাই প্রভৃতি পরিয়া কি বাঙালীত্ব জাহির করিতে চাহেন?

পক্ষান্তরে বাঙালীর একটা জাতীয় পোষাক আছে বলিয়া মুস্তাফী মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন। দেখা যায় বাঙালীর সেই জাতীয় সজ্জাটী আজকালের জন্ত পঙ্গু। তাই শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু গৃহে যাহা পরিধান করেন তাহা পরিধান করিয়া বাহিরে যাইতে লজ্জাবোধ করেন।

অতএব উকিল মোক্তার ধরিয়াছেন পায়জামা কোট পেণ্টুলন, চোগা চাপকান, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, স্কুল কলেজের প্রফেসারগণ ধরিয়াছেন পেণ্টুলন, মাঠে খেলিবার সময় হাফ পেণ্টুলন, ভলাণ্টিয়ার ও বয়স্কাউট সাজিতে হাফ পেণ্টুলন,—যুদ্ধ করিতেও তাই। শুনা যায় Indianization of Army হইতেছে। তাহাতে কি ধুতির দশহাতি কি ছয়হাতি সংস্করণ চলিবে? তথাপি আমরা কিন্তু "সম্পূর্ণ বিলাতী পোষাক পরিতে একটু"-ও সপক্ষে নহি। কারণ নগরের অধিবাসীবৃন্দের জন্ত ইহা সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেও গ্রামে ইহা একেবারেই চলেনা। উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, মাঠে কাজ করিতে, রাস্তায় কাদা ভাঙিয়া চলিতে ইহা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

আমাদের মতে বাঙালীর আদর্শ জাতীয় সজ্জা হওয়া উচিত পায়জামা ও কোট। ধাবন, কুর্দ্দন, উল্লম্ফন ও যুদ্ধ ইত্যাদির জন্ত ইহারা খুবই উপযোগী। আর যাঁহারা ধুতির অসুবিধা এড়াইবার জন্ত পেণ্টুলন হাফ পেণ্টুলন ধরিয়াছেন বা ধরিতেছেন তাহারাও ইহাতে আরাম পাইবেন। হাটে মাঠে কাজ করিতে বাধা হইবে না। শতকরা ৫৬ জন বাঙালীত চক্ষের পলকে পায়জামা গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন, আর বাকী শতকরা ৪৪ জন যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৬১.৬ পার্সেণ্ট শিক্ষিত। ইহাদের অনেকেই পেণ্টুলন হাফ পেণ্টুলন পরিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণও কতকটা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা যদি (মুস্তাফী মহাশয়ের কথা অনুসারে) হিন্দুত্ব জাহির করিতে না চাহেন তবে বিনা বাক্যব্যয়ে পায়জামার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন।

শুনা যায় বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা স্থিরীকৃত হইতেছে। তবে এই সময়ে বাঙালীর জাতীয় পোষাকও স্থির করা কর্ত্তব্য। তবে এই উপলক্ষে ধুতির অসুবিধাটা বুঝাইয়া দিয়া উপেনবাবু সকলের ধন্তবাদার্হ হইয়াছেন। "বাঙালীর একটা জাতীয় পোষাক আছে" বলিয়া এখন আর ধুতি জড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। মুসলমানরাও অধীন ভারতে বাস করিয়া স্বাধীন দরবারী পোষাক চোগা চাপকানের স্বপ্ন দেখিলে চলিবে না। এতটা লম্বা পোষাক আজকালকার কর্ম্মবাহুল্যের দিনে চলে না। আমাদের মতে পায়জামা, সার্ট এবং কোটই বাঙালীর জাতীয় পোষাক হওয়া উচিত।

পাঞ্জাবী বাঙালীর যে রকম ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে ইহাকে বিজাতীয় বলিয়া বাদ দেওয়ার প্রয়োজনও দেখি না। পায়জামা ও কোটের সঙ্গে পাঞ্জাবী ও সার্ট দুই-ই মানায়। গরীব যাঁহারা, তাঁহারা সার্ট বা পাঞ্জাবীর উপর কোট গায়ে না দিয়াও চলিতে পারেন। কারণ পায়জামার সঙ্গে শুধু সার্ট বা পাঞ্জাবীও মানায়। ইহার উপর বিনা প্রয়োজনে চাদর গায়ে দিবার প্রয়োজন হয় না।

মুস্তাফী মহাশয় ও উপেনবাবু টুপীর কথাটা একেবারে বাদ দিয়াছেন। এখানে টুপী অর্থে আমরা গান্ধীটুপী, তুর্কী-টুপী, কামাল কেপ বা হেট্ কোনটার প্রতিই আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি না। আমরা বলিতে চাহি যে কোন প্রকারের একটা শিরস্ত্রাণ না হইলে সাজ সজ্জা অসম্পূর্ণ থাকে। বাঙলার মুষ্টিমেয় হিন্দু ছাড়া দুনিয়াতে বোধ হয় এমন কোন জাতি নাই যাঁহারা শিরস্ত্রাণ ধারণ করেন না।

জুতা সম্বন্ধে শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পায়জামা ও সার্টের সঙ্গে চটিজুতা ও সেণ্ডেল বেশ খাপ খায়। পায়জামা সার্ট ও কোটের সঙ্গে অন্তান্ত সর্ব্বপ্রকারের জুতাই চলে।

২ ক। বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বি-এ

গত কার্ত্তিক মাসের বিচিত্রায় বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত ও যুক্তিমূলক। তবে কোঁচা সম্বন্ধে আমি কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কোঁচা বর্জ্জন করিয়া অন্য কোন প্রকারে ধুতি পরিধান করিতে পারা যায় কিনা তাহাই বিবেচ্য; কিন্তু অন্য প্রকারে ধুতি পরিধান করা সম্ভবপর নয়, যেহেতু তাহা জাতীয় পোষাকের বহির্ভূত হইবে। পাঞ্জাবী বা গলা-আঁটা কোট কোঁচাবর্জ্জিত ধুতির সহিত পরিধান করিলে খুব সম্ভবতঃ অন্য জাতীয় লোকের মনে হাস্যরসের সঞ্চার হইতে পারে এবং কোঁচাহীন ধুতির সহিত পাঞ্জাবী কেমন দেখাইবে তাহাও ভাবিবার কথা। কোঁচাকে যদি মালকোঁচায় পরিবর্ত্তিত করা হয়, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ও সুবিধার দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় পোষাকের দিক দিয়া মোটেই নয়, কারণ মাড়োয়ারীরা মালকোঁচা দিয়া ধুতি পরিধান করে। আবার যদি কোঁচার বদলে ধুতির সেই অংশটা কোমরে প্যাঁচ দিয়া সযত্নে বাঁধা হয়, তাহা হইলেও জাতীয় পোষাক হিসাবে উহা বর্জ্জনীয়, কারণ বিহারীরা ঐরূপে ধুতি পরিধান করে। তবে কোঁচার নিম্ন প্রান্তটীও নাভি দেশে গুঁজিয়া রাখিলে কোঁচা সমস্যার কতকাংশ সমাধান হয় বটে, কিন্তু কোঁচা বর্জ্জন করা হয় না; অধিকন্তু পরিধানকারী অল্পবয়স্ক বা যুবক হইলেও তাহাকে প্রৌঢ় বলিয়া মনে হয়। তাহাতে smartness আসে না। কোঁচা একেবারে বর্জ্জন করিয়ে চার হাত কাপড়ে চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে ধুতি পরিধান করার সার্থকতা কি? হাঁটিবার সময় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

কোঁচাযুক্ত ধুতি বাঙ্গালীরাই পরিয়া থাকেন, ইহা অনেকেই স্বীকার করেন। অন্য দেশীয় কেহ কোঁচা দিয়া ধুতি পরিলে তাহাকে "বাঙ্গালী সেজেছে" বলা হয়; তাঁহারাও জানেন যে কোঁচাযুক্ত ধুতি পরিধান করা বাঙ্গালীদের এক চেটিয়া, উহা অনুকরণ করা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। অতএব এক্ষেত্রে কোঁচা বর্জ্জন করিয়া ধুতি পরিধান করা বাঙ্গালীর পোষাকের মধ্যে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

৩। আমাদের স্কুলে সংস্কৃতের অবশ্য শিক্ষণীয়তা

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

গত শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'র শ্রদ্ধেয় শ্রীসুশীলকুমার বসু মহাশয় আমাদের স্কুলে সংস্কৃতের অবশ্য শিক্ষণীয়তার বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

'বিচিত্রা'র বিতর্কিকায় পাঠকদের পক্ষ থেকে সুশীলবাবুর মন্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়েছিল এই মর্ম্মে যে সংস্কৃত জ্ঞান ছেলেদের দেশভাষা শিখবার পক্ষে উপকারী কারণ, ভারতীয় সব ভাষাই সংস্কৃতমূলক এবং এই কারণেই সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র কোন বিশেষ বাঙলা শব্দের অর্থ সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ছাত্র অপেক্ষা ভাল বুঝতে পারে।

গত পৌষের 'বিচিত্রা'র সুশীলবাবু উপরোক্ত মতটী খণ্ডন করেছেন এই বলে, যে সংস্কৃত জানা না জানার উপর ভালরূপে বাঙলা জানা বা লেখার শক্তি নির্ভর করে না। বাঙলা একটী স্বতন্ত্র ভাষা—, এর মূল সংস্কৃত হলেও শুধু বাঙলা আয়ত্ত করবার জন্য সংস্কৃতের অবশ্য শিক্ষণীয়তার তত বেশী প্রয়োজন নেই এ বিষয়ে আমি সুশীলবাবুর সঙ্গে একমত।

সংস্কৃতের অবশ্য শিক্ষণীয়তার আর একটী দাবী আছে সেটা এর classic দিক্। classical language হিসাবে এর অবশ্য শিক্ষণীয়তার দিকটা সুশীলবাবু প্রত্যাখান করেছেন মনীষী বারট্রাণ্ড রাসেলের লেখার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে। তিনি বলেছেন—ব্যবহারিক জীবনে বাল্যে অধীত গ্রীক্-ল্যাটীনের জ্ঞান তাঁর কোন কাজে আসে নাই। রাসেলের বহুপূর্ব্বে Spencerও এই কথার উল্লেখ করেছেন।

সুশীলবাবু, সংস্কৃত পরে ব্যবহারিক জীবনে কোন কাজে আসেনা বলে এর অবশ্য শিক্ষণীয়তার দিকটা প্রত্যাখান করলেও আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলুম না। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগা বা না লাগা নয়, এর লক্ষ্য মনের সম্যক্ স্ফূর্ত্তিসাধন ও চিত্ত-প্রকর্ষ (culture) অর্জ্জন। ব্যবহারিক দিক থেকে পাঠ্য নির্ব্বাচন করতে হলে শুধু সংস্কৃত কেন আরও অনেক বিষয় বাদ দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে,—উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সাধারণ ছেলেদের উচ্চতর গণিত এবং আরও অনেক বিষয় ভবিষ্যত জীবনে কোন কাজে আসে না, কিন্তু তাই বলে এগুলির অবশ্য শিক্ষণীয়তা অস্বীকার করা যায় না। classical language জাতির জীবন গঠনে অনেকখানি সহায়তা করে একথা সুধীব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভারতবর্ষের আয়তন ও জনসংখ্যা

ভারতবর্ষের মোট আয়তন ১,৮০৮,৬৭৯ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে ১,০৯৬,১৭১ বর্গ মাইল অর্থাৎ শতকরা ৬১ ভাগ বৃটীশ ভারত এবং ৭১২,৫০৮ বর্গ মাইল অর্থাৎ শতকরা ৩৯ ভাগ দেশীয় রাজ্য সমূহের অন্তর্গত।

১৯৩১ সালের গণনানুসারে ভারতবর্ষের মোট জন সংখ্যা ৩৫২,৮৩৭,৭৭৮। ইহার মধ্যে ব্রিটীস ভারতের (বর্ম্মাকে ধরিয়া) লোকসংখ্যা ২৭১৫২৬৯৩৩ অর্থাৎ শতকরা ৭৭ জন এবং দেশীয় রাজ্য সমূহের সংখ্যা ৮১,৩১০,৮৪৫ অর্থাৎ শতকরা ২৩ জন। এই জনসংখ্যার মধ্যে মোট পুরুষের সংখ্যা ১৮১,৮২৮,৯২৩ এবং স্ত্রীলোকের মোট সংখ্যা ১৭১,০০৮,৮৫৫। প্রতি ১০০০ জন পুরুষে ৯৪০ জন মাত্র স্ত্রীলোক।

১৯০১ হইতে স্ত্রীলোকের আনুপাতিক সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ না থাকায়, হিন্দুদের বৃদ্ধি বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হইয়াছে। সন্তান যোগ্য বয়সের হিন্দু বিধবার সংখ্যা ৮,৩১৩,৭৭৩। ইহাদের বাদ দিলে, বিবাহযোগ্য হিন্দুপুরুষ ও স্ত্রীলোকের আনুপাতিক সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষে মাত্র ৮৯৭ জন স্ত্রীলোক দাঁড়ায়।

মুসলমানদের মধ্যে প্রতি একহাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ৯০১ জন হইলেও, সন্তানযোগ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষে ১০২৬ জন। মুসলমানদের সংখ্যা অধিকতর দ্রুত গতিতে বাড়িবার ইহাই প্রধান কারণ। পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংখ্যার এই আনুপাতিক বৈষম্য হিন্দুদের পক্ষে ভাবিবার কথা।

ভারতবর্ষের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বৃদ্ধির সহিত অন্য কয়েকটি দেশের তুলনা

লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে বর্ত্তমানে সর্ব্ব-প্রথম। তিব্বৎ, মোঙ্গোলিয়া, চাইনিজ তুর্কীস্থান এবং মাঞ্চুরিয়া ধরিয়া সর্ব্বশেষ গণনানুসারে চীনের অধিবাসীর সংখ্যা ৩৪২,০০০,০০০ জন; রাশিয়ার ১৩৮০০০০০০, যুক্তরাজ্যের (আমেরিকা) ১৩৭,০০০,০০০, জাপানের ৮৪,০০০,০০০; জার্ম্মানির ৬৩০০০০০০ এবং যুক্তরাজ্যের ৪৪০০০০০০ জন।

ভারতবর্ষে প্রতি এক হাজার মাইলে ১৯৫, বেলজিয়ামে ৭০২, জার্ম্মানিতে ৩৪৮, তুর্কীতে ২০০, ইটালীতে ৩৫৮ জাপানে ৩২১ এবং ইংলণ্ড ও ওয়েল্সে ৬৮৫ জন লোক বাস করে। কোচিন ষ্টেটে কোন পল্লী অঞ্চলে প্রতিবর্গ মাইলে ৪০০০ জন লোক বাস করে। বাংলাদেশে প্রতিবর্গ মাইলে ৬৪৬ জন লোক বাস করে। সমগ্র ঢাকা বিভাগের অধিবাসীর গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৯৩৫। লোহাজঙ্গ থানায় প্রতি বর্গমাইলে অধিবাসীর সংখ্যা ৩,২২৮ জন।

গত দশ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ১০·৬ হারে এবং গত ৫০ বৎসরে শতকরা ৩৯ হারে বাড়িয়াছে। গত ৫০ বৎসরে প্রতিবর্গ মাইলে ১২ জন লোক বাড়িয়াছে। ইংলণ্ড ও ওয়েল্সে গত দশ বৎসরের বৃদ্ধির হার শতকরা ৫·৪ কিন্তু গতবৎসরের বৃদ্ধির হার ৫০·৮। গত সেন্সাসের পর হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শতকরা ১৬, সিংহলে শতকরা ১৮, জাভায় ২০। পৃথিবীর বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ১,৮৫০,০০০,০০০; ইহাদের এক পঞ্চমাংশ ভারতবাসী। সমগ্র বিটীস ভারতের মোট জনসংখ্যার এক ষষ্ঠাংশেরও উপর বাঙ্গালী।

ভারতবর্ষে জন্ম নিয়ন্ত্রণ

১৯৩১ সালের সেন্সাসের চীফ্ কমিশনার ডক্টর জে-এইচ-হাটন ভারতবর্ষে জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এশিয়ার জন্ম-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্ম সম্প্রতি লণ্ডনে যে বৈঠক বসিয়াছিল, সেখানেও কোন কোন বিশেষজ্ঞ দৃঢ়ভাবে ইহার উপযোগিতা সমর্থন করিয়াছেন। কলিকাতার মহিলা-সম্মিলনে এবং মাদ্রাজের অর্থনৈতিক সম্মিলনেও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল।

প্রতি বর্গ মাইলে ২৫০ জন কৃষিজীবির অন্নসংস্থান হইতে পারে বলিয়া ইউরোপে ধরা হয়। আমেরিকায় এই সংখ্যাকে আরও একটু বাড়াইয়া ধরা হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কোন কোন স্থানে প্রতি বর্গমাইলে ৪০০ জন কৃষিজীবি আছে।

কিন্তু, ভারতবর্ষের অনেকস্থানে বিশেষ করিয়া মালাবার উপকূলে ও বাংলার অধিবাসীদের ঘনত্ব ইহার চেয়ে অনেক বেশী হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমানের অকর্ষিত ভূমিতে শস্যোৎপাদন আরম্ভ হইলে, এবং উন্নততর প্রণালী অবলম্বিত হইলে, ভারতবর্ষের কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার দ্বারা আরও কিছু অধিক সংখ্যক লোক প্রতিপালিত হইতে পারিবে। কিন্তু যে সংখ্যা কোনও ক্রমে প্রতিপালিত হইতে পারে এবং যে সংখ্যা ভালভাবে প্রতি-পালিত হইতে পারে, এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক এবং শেষের অবস্থাটাই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফল কি হইতে পারে

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা, শিশু মৃত্যু, অকাল মৃত্যু, অসংখ্য ব্যাধি ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাড়িয়া চলিয়াছে। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে, শীঘ্রই ইহা সমস্যার আকারে দেখা দিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা অনেকেই করিতেছেন। আমাদের বর্ত্তমান দারিদ্র্য, রোগপ্রবণতা স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতির জন্যও অনেকে আমাদের বিপুল জন-সংখ্যাকে দায়ী করেন। পৃথিবীর উন্নত ও অগ্রবর্ত্তী অনেক দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি আরও দ্রুততর গতিতে হইয়াছে এবং তাহার ফলে পৃথিবীর জনবিরল এবং জনহীন ও দুর্ব্বল জাতি অধ্যুষিত দেশসমূহে সম্প্রসারিত হইয়াছে। অতীতের অনেক যুদ্ধবিগ্রহের ইহাই পরোক্ষ কারণ স্বরূপ হইয়াছে। জাপানের মাঞ্চুরিয়া গ্রাস এবং সমগ্র চীনে আধিপত্য লাভের চেষ্টার মূলে তাহার জনশক্তির চাপ রহিয়াছে।

কিন্তু, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যাকে বহন করিবার যে-সকল সুবিধা অন্যান্য দেশের আছে, ভারতবর্ষের তাহা নাই। এই জন্য সে সকল দেশের অধিবাসীরা ভারতবাসীদের ন্যায় দুর্দ্দশা গ্রস্ত হয় নাই। পৃথিবীর প্রবল জাতিগুলি নিজেদের নিখুঁত সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তিমত্তার এবং নীতিকুশলতার গুণে পৃথিবীর দুর্ব্বল ও অক্ষম ও অজ্ঞ জাতি সমূহের শ্রমশক্তি ও কর্ম্ম-ক্ষমতাকে নিজেদের ব্যবহারে লাগাইয়াছে এবং অন্যথা যাহা নানাপ্রকার বৈষম্য, অভাব প্রতিযোগিতার তীব্রতা এবং জীবন সংগ্রামের কঠোরতার আকারে দেখা দিত, পৃথিবীর বহুকোটি লোকের দুঃখের মূল্যে তাহাকে কতকটা নিবারণ করা গিয়াছে। কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই, কর্ম্মাভাব, খাদ্যাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি দেখা দিয়াছে এবং এই সকল অভাব দূর করা প্রত্যেক দেশের সরকারের পক্ষেই বিশেষ সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলেও, কোনও দেশের রাজ সরকারই এপর্য্যন্ত নিজ দেশের জনশক্তির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন নাই। বরং যেখানে ব্যক্তিগত অথবা সাধারণের চেষ্টায় এইরূপ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, সেখানে নিজদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, রাজসরকারকে উদ্বিগ্ন হইতে দেখা গিয়াছে। ফরাসী, জার্ম্মান, ইটালীয় রাজসরকার তাঁহাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন।

যদিও সকল দেশের লোকেরই স্বাস্থ্য, সম্পদ, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, তাহা হইলেও, ইহার একটা আন্তর্জাতিক দিক থাকায়, প্রয়োজনীয় হইলেও, নিয়ন্ত্রীকরণ সমস্যার ন্যায় জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং এদিকে হস্তক্ষেপ করা, কতকটা বিপজ্জনক হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মানুষের ধর্ম্ম ও অভ্যাসগত সংস্কারও অবশ্য ইহার পক্ষে কতকটা বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

পৃথিবীর বর্ত্তমান জনসংখ্যা প্রায় দুইশত কোটি। এই জনসংখ্যার বৃদ্ধি বৎসরে প্রায় তিন কোটি। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, পৃথিবী ৬০০ কোটি পর্য্যন্ত লোককে প্রতিপালন করিতে পারে। আগামী দুই শতাব্দীর মধ্যে এই সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে।

সংখ্যা অনেকাংশে শক্তি ও গুরুত্বের নিয়ামক। বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় যাঁহারা পশ্চাৎপদ হইবেন, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মধ্যে তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাত কমিয়া যাইবে, কাজেই, জগতে তাঁহাদের শক্তি ও গুরুত্বও কমিয়া যাইবে।

কোনও বিশেষ জাতি যদি তাঁহাদের সংখ্যাবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন তাহা হইলে সাময়িক ভাবে তাঁহাদের কোনও কোনও দিক দিয়া সুবিধা হইতে পারে; বেকারের সংখ্যা, খাদ্যাভাব প্রভৃতি কমিতে পারে। কিন্তু, কোনও বিশেষ দেশ বা জাতির গণ্ডীর মধ্যে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়িয়া গেলে এবং তাহার ফলে জগদ্ব্যাপী খাদ্যাভাব উপস্থিত হইলে, কোনও দেশই তাহার প্রভাব হইতে রক্ষা পাইবে না। এই দিনে সমগ্র জগতে যে তীব্র প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইবে তাহাতে মাত্র যোগ্যতম জাতিগুলিই রক্ষা পাইবে মাত্র। এ সময়ে সংখ্যার শক্তি কাজে লাগিতে পারে। এইরূপ উৎকট অবস্থার সৃষ্টি না হইলেও, সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সকল দেশকেই ভোগ করিতে হইবে অথচ কোনও জাতির বৃদ্ধি স্থগিত হইলে, সমগ্র পৃথিবীর জনসমষ্টির মধ্যে তাঁহাদের অনুপাত কমিয়া যাইবে। কাজেই, একথা অনেকটা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কোন দেশই সহসা নিরুদ্বেগে জনসংখ্যা কমাইবার কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না।

অন্যান্য দেশ যে সকল উপায়ে তাঁহাদের দ্রুত বর্দ্ধমান জনসংখ্যার পোষণে সমর্থ হইতেছেন, ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ হওয়ায়, আমাদের সে সকল সুযোগ নাই। কাজেই, আমাদের বিপুল জনসংখ্যা আমাদের শক্তি না বাড়াইয়া আমাদের দুর্ব্বলতা ও দুঃখ বাড়াইতেছে। কিন্তু, ইহার প্রতিকার করে আমাদের জন্মসংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করা উচিত কিনা, এবং তাহার ফলই বা কি হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক যদি বাড়িতে থাকে, অথচ, ভারতবর্ষের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে, পূর্ব্বে যে-সকল অসুবিধার কথা বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষকে তাহা ভোগ করিতে হইবে এবং অন্য কতকগুলি আভ্যন্তরীণ অসুবিধারও সৃষ্টি হইবে।

অবশ্য আমরা যেরূপ হীনস্বাস্থ্য হইয়া, খারাপ খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকি, আমাদের গড় আয়ুকাল ও কর্ম্মক্ষমতা যেরূপ কম, এরূপ থাকিলে, আমাদের সংখ্যার শক্তি কোন দিনই কাজে আসিতে পারিবে না। আমাদের মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু উভয় হারই অন্যান্য দেশের তুলনায় অবিশ্বাস্য বেশী এবং বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে সংখ্যাবৃদ্ধি যাহা হয়, তাহা এইপ্রকার অত্যন্ত অপব্যয়ের মধ্য দিয়াই হয়। আমাদের দেশের সাধারণ স্বাস্থ্যের যদি উন্নতি হয়, লোকের আয়ুকাল বাড়িয়া যায়, অকালমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের জন্মসংখ্যা কমিয়া গেলেও বৃদ্ধির হার সমান থাকিতে পারে অথবা বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাতে অপব্যয় অনেক কমিয়া যাইবে এবং নানাদিক দিয়া জাতি লাভবান হইবে। কাজেই, প্রয়োজন এবং সুবিধানুসারে বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রণ জাতির পক্ষে অবিমিশ্র লাভের ব্যাপার হইবে। কিন্তু, এইপ্রকার চেষ্টা যথোচিত ভাবে হইবার পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে জন্মহার কমাইবার চেষ্টায় নানাদিক দিয়া আমাদের ক্ষতি হইতে পারে। সমগ্র পৃথিবী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যেকথা বলা হইয়াছে, আমাদের দেশের সংখ্যাতীত সম্প্রদায় সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠিবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই, নিজেদের আনুপাতিক সংখ্যাহ্রাসকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন, এবং বাস্তবিকপক্ষে কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় বৃদ্ধিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, অথচ দেশের অন্যান্য বা অন্য কোনও কোনও সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি যদি অবাধগতিতে চলিতে থাকে, তাহা হইলে, যে-সকল সম্প্রদায় বৃদ্ধিরোধের চেষ্টা করিবেন তাঁহারা দুর্ব্বল হইবেন ও ঠকিবেন, অথচ, দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বাড়িতে থাকায়, জনসংখ্যা কম থাকিবার যে সুবিধা তাহাও তাঁহারা পাইবেন না।

এদিক দিয়া আরও একটা কথা আছে। সমাজের

উচ্চস্তর অপেক্ষা নিম্নস্তরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুততর। সাধারণ ভাবেই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের আনুপাতিক সংখ্যা এবং কতক পরিমাণে তাঁহাদের গুরুত্ব কমিতে থাকিবে। জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোনও প্রচেষ্টা আরম্ভ হইলে, তাহা প্রথমে এই শ্রেণীর মধ্যেই কার্য্য করিবে এবং তাঁহাদের অনুপাত আরও কমাইয়া ফেলিবে। এদিকে দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকিবে এবং দেশের লোকসংখ্যা বাড়িবার যে সকল অসুবিধা তাহা সকলকেই সমভাবে ভোগ করিতে হইবে। রাষ্ট্রে প্রাধান্য লাভের পক্ষেও সম্ভবতঃ সংখ্যার কিছু মূল্য থাকিবে। কাজেই, কোন সম্প্রদায়ের লোকই যে নিরুদ্বেগে বৃদ্ধিহ্রাসের চেষ্টা করিতে পারিবেন, এমন মনে হয় না।

তবে সুবিবেচিত এবং আংশিক নিয়ন্ত্রণের ফল বৃদ্ধির দিক দিয়াও হয়ত সুবিধাজনক হইতে পারে। বর্ত্তমানে, জন্মের হার অত্যধিক বেশী হইবার জন্য এবং সন্তানসংখ্যা বেশী হওয়ায় পারিবারিক দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইবার জন্য প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু অত্যন্ত বেশী হইতেছে। জন্ম ও মৃত্যু উভয় দিকের সংখ্যাই কমিয়া যদি বৃদ্ধির হার সমান থাকে বা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে সব দিক দিয়াই অবশ্য লাভের সম্ভাবনা থাকিবে।

কিন্তু, ভারতবর্ষের জনসংখ্যা এইরূপে বাড়িতে থাকিলে ভবিষ্যতে আমাদের অন্ন-সমস্যা অনেক কঠিনতর হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই অসুবিধার অবস্থার মধ্যে কিছু সান্ত্বনার কথা এই যে, এই সমস্যা শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নহে, ইহা সমগ্র জগতের। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা দেখা দিয়াছে এবং সেজন্য দুর্ব্বল জাতিগুলিকে শোষণ করিবার ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণতর হইতেছে। সম্ভবতঃ এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যখন প্রত্যেক দেশকেই সকল বিষয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে হইবে। পৃথিবীর সকল জাতিই এই সমস্যা সমাধানের জন্য যদি বৃদ্ধিরোধের পন্থাই অবলম্বন করেন, তবে, ভারতবাসীর পক্ষেও এই পন্থার অনুসরণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। বর্ত্তমানে এইপ্রকার চেষ্টার ফল সাধারণভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে এবং বিশেষভাবে কোনও কোনও শ্রেণীর পক্ষে ভাল না হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অন্যান্য দেশের চেয়ে একদিক দিয়া ভারতবর্ষের অবস্থা এবিষয়ে বরং একটু ভাল বলিতে হইবে। আমরা এখনও যত টাকার বিদেশী জিনিস ক্রয় করি, বিদেশীর নিকট তত টাকার জিনিস বিক্রয় করিতে পারি না। আমরা যে সকল জিনিস বিক্রয় করি তাহা প্রধানতঃ কাঁচা মাল এবং ক্রয় করি ব্যবহারোপযোগী প্রস্তুত (অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কাঁচা মাল হইতেই প্রস্তুত) জিনিস। ইহার জন্য যে অধিক মূল্য দিতে হয়, তাহা বিদেশীকে মজুরী স্বরূপই দিতে হয়। এই সকল জিনিস দেশে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে, অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে এবং অনেক লোকে কাজ পাইবে। আমাদের দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে বিদেশীদের হাতে, জিনিস প্রেরণের এবং আনয়নের জাহাজ বিদেশীর, রেলওয়ের সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য সকল প্রকার কলকব্জা আমরা বিদেশ হইতে কিনি, আমাদের খনিজ এবং কৃষিজাত সম্পদের অনেকাংশ এখনও বিদেশীর হাতে, সামরিক এবং অসামরিক অনেক কাজের জন্য বিদেশকে আমাদের অনেক টাকা দিতে হয়, আমাদের কৃষির অবস্থা এবং তাহা হইতে আয় অন্যান্য দেশের তুলনায় বিশেষ শোচনীয়, আমাদের মুদ্রানীতি ও বাণিজ্যনীতি, অনেকের মতে আমাদের স্বার্থের অনুকূল নহে। এই সকল জিনিষ সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে আসিলে এবং অনেকগুলির আশানুরূপ উন্নতি হইলে, আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা যে অনেক পরিমাণে ঘুচিবে এবং আরও অধিক সংখ্যক লোক খাদ্য ও কর্ম্মক্ষেত্র পাইতে পারিবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু, জনসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে, এসকল অবস্থা সত্ত্বেও এমন দিন আসিবে, যখন দেশের জনসংখ্যাকে পোষণ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু, ভারতবর্ষে এই সঙ্কটকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক দেশকে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যদি তাহাতে ইঁহারা অক্ষম হন, তাহা হইলে, পৃথিবী হইতে দুর্ব্বল এবং অক্ষম জাতিগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং মাত্র যোগ্যতম জাতিগুলি শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। সমগ্র পৃথিবীতেই এই যোগ্যতার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, সহসা সাহস করিয়া

কেহ অন্যপথ অবলম্বন করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষের পক্ষে আবার আভ্যন্তরীণ বাধাও রহিয়াছে।

আমাদের দেশীয় সাহিত্য ও ছাত্রদের অযোগ্যতা

বাংলা সাহিত্যে প্রচুর পড়িবার জিনিষ আছে বলিয়া এবং সেইজন্য বেশীর ভাগ ছেলে ইংরাজী না পড়িয়া বাংলা পড়ে বলিয়া, তাহাদের ইংরাজীর জ্ঞান কম হয়, এবং ইহাই তাহাদের অপকৃষ্টতার জন্য দায়ী, শিক্ষা সম্মিলনে কোনও বাঙ্গালী শিক্ষাবিশেষজ্ঞ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমাদের ঠিক বিপরীত কথাই মনে হয়। বাঙ্গালী ছেলেদের অনেকে বাংলা সাহিত্য পড়ে বলিয়া এবং তাহার মধ্য দিয়া দেশের ও বিদেশের মনীষিদের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে পারে বলিয়াই, বর্ত্তমানের নানাবিধ ত্রুটিযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতি সত্ত্বেও বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে চিন্তাশীল ও শিক্ষিত লোকের আজও অভাব হয় নাই। বাঙ্গালী ছেলেদের মাতৃভাষা প্রীতি এবং পড়িবার অভ্যাস আরও বাড়িয়া গেলে তাঁহারা যোগ্যতর হইয়া উঠিবেন। আমাদের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা দূর করিবার সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ও সহজ উপায় হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। ইংরাজী শিক্ষার বাহন হওয়াতেই ইংরাজী জ্ঞানকেই কেহ কেহ প্রতিকারের উপায় মনে করিতেছেন, নহিলে জাপানী বা জার্ম্মান ছেলেদের সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে সম্ভবতঃ কেহ সাহস করিবেন না যে তাঁহাদের ইংরাজী জ্ঞানের স্বল্পতা তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে অযোগ্য করিয়া তুলিতেছে।

এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে স্যাড্‌লার কমিশনের মতকে অনেকটা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহারা কিন্তু, মাতৃভাষা শিক্ষার অভাবকেই, ছেলেদের দুর্ব্বলতার জন্য দায়ী করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য বহু কথার মধ্যে তাঁহারা বলিয়াছেন, "The use of mother tongue in India as an instrument of mental training has long been neglected in the school system......The premature use of a foreign and half-understood medium...... tends to produce intellectual muddle.

[Sadller Commission Report]

বর্ত্তমানে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজীর সাহায্যে শিক্ষাদানের ফলে আমাদের শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বিদেশী ভাষা আমাদের চিন্তাশক্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহার জন্য জাতির মানসিক শক্তির অসম্ভব অপচয় হইতেছে। যত লোক ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করে, তাহাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকেই ইহা হইতে মনও চিন্তাশক্তি পুষ্ট করিবার মত জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে। যাহারা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞানে জাতির মুখোজ্জ্বল করিতে পারিত, ইংরাজী শিখিতে না পারায়, তাহাদের সকল সম্ভাবনাই নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ব্যতীত কোনও নূতন বিষয় শিখিবার সময় বিদেশী ভাষার কাঠিন্য বশতঃ বিষয়ের নূতনত্ব ও আকর্ষনী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ছেলেরা ইংরাজী পড়িলেও প্রায় সব সময়েই বাংলায় চিন্তা করে এবং সেজন্য অনেকখানি জটিলতার সৃষ্টি হয়। ইহা আমাদের কল্পনাশক্তি বিকাশকেও বিশেষরূপে বাধা দিতেছে। যে বয়সের ছেলেদের ভাষার খাতিরে যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা কখনও, তাহাদের কল্পনা শক্তিকে নাড়া দিতে পারে না। ১১।১২ বৎসরের ছেলেদের পশুপক্ষীর গল্প পড়িতে হয়, ইহাতে তাহারা কখনই আনন্দ পাইতে পারে না। অন্য দিক দিয়া যে-সকল পাঠ্যপুস্তক ইহাদের উপযোগী হইতে পারিত, ভাষা কঠিন হয় বলিয়া তাহা পড়ান সম্ভব হয় না। শিক্ষার এই অসামঞ্জস্য বরাবরই রহিয়া যায় এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু হয় না। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে, মনের যে উৎকর্ষ সহজেই সাধিত হইতে পারিত, এইরূপে তাহা ব্যাহত হয়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অবশ্য এই প্রকার অসুবিধা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিম্নতর হইলেও ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা উচ্চতর তাহা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির

উচ্চতম বিভাগের কার্য্যের ও সাফল্যের তুলনা করিলে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ভারতবর্ষের ২।১টি ধনী প্রদেশের পক্ষে টাকার সাহায্যে যে কৃত্রিম ব্যবস্থা চালান সম্ভব বাংলার পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

বাংলাস্কুলের ছাত্রদের অধিকতর যোগ্যতা

যে সকল বালক অধিক বয়স পর্য্যন্ত বাংলাস্কুলে পড়ে, তাহারা যে, শিক্ষা ও মানসিক শক্তিতে, ইংরাজী স্কুলের ছেলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেকথা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অনেক প্রধান ব্যক্তি এবং সমিতি লক্ষ্য করিয়াছেন। ১৮৮২ সালের কমিশন বাংলা সরকারের নিকট হইতে এইরূপ মত প্রাপ্ত হন যে, যাহারা vernacular scholarship লইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা ইংরাজী স্কলারসিপ প্রাপ্ত ছাত্রদের অপেক্ষা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অনেক অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। ১৯১৩ সালের গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া-রেজলিউসনে একথা উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে সকল ছাত্র দেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের মানসিক যোগ্যতা অসাধারণ। ১৯১৫ সালের ১৭ই মার্চ্চ Mr. R. Rayaningar এর Imperial Legislative Council-এ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশীয় ভাষা প্রবর্ত্তন সম্পর্কীয় প্রস্তাব আলোচনা কালে তৎকালীন শিক্ষাসদস্য Sir Hercourt Butler বলেন যে, অনেক যোগ্য শিক্ষা বিশেষজ্ঞের এবং তাহার নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে যে সকল বালকের শিক্ষা স্কুলের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাতৃভাষায় হইয়াছে, তাহারা, ইংরাজীতে যাহাদের শিক্ষা পরিচালিত হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিতে অনেক শ্রেষ্ঠ হয়। এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবুর একটি উক্তিও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। স্যাড্লার কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদান কালে তিনি বলিয়াছেন,

"My experience is that, at the age of 10 or 11, in the highest class of the vernacular school where I first received education, my fellow students and myself knew more of History, Geography Mathematics, Hygiene, sanitation and natural science combined, than any class fellows of 15, 16, 17, 18 or more knew when I was subsquently in the highest class of a high school preparing for the matriculation examination. Similar has been the experience of many others."

এসম্বন্ধে ১৩৩৭এর চৈত্র ও ৩৮ এর বৈশাখের বিচিত্রার "আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষার বাহন" শীর্ষক প্রবন্ধে (৩ পর্ব্বে বিভক্ত) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

কমন্স সভায় নারীহরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন

হিন্দুনারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বর্দ্ধিত সংখ্যায় তাঁহাদের অপহরণ নিবারণ করিবার জন্য ভারত সরকার কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন কমন্সসভায় মিঃ ডেভিড্ গ্রেণফেলের এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বাট্লার্ উত্তর করেন যে, বাংলায় এই অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে, সংবাদপত্রের এরূপ বিবৃতি সমূহের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, বঙ্গীয় সরকারের মতে, হিসাবের অঙ্ক হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না।

আমাদের মনে হয় এই অপরাধ সম্পর্কিত হিসাবের অঙ্ক এইজন্য প্রতি বৎসর বর্দ্ধিত হইতেছে না যে, বৃদ্ধির শেষ সীমায় ইহা অনেকদিন পূর্ব্বেই পৌছিয়াছে এবং এজন্য বিশেষ বিধি—অনেক পূর্ব্বেই অবলম্বিত হওয়া উচিত ছিল।

হিন্দু রাজনৈতিক সম্মিলন

কোন দেশেরই কোনও বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থ নাই; বাংলাদেশেও হিন্দু অথবা মুসলমানদের তাহা নাই। এই প্রকার কল্পিত স্বার্থের ভিত্তি মিথ্যা এবং এই প্রকার মনোভাব জাতীয় ঐক্য ও স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। বাঙালী হিন্দুরা (অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের ন্যায়) জাতীয়তা-বিরোধী সাম্প্রদায়িক স্বার্থ কখনও চাহেন নাই। কিন্তু, অন্যেরা যখন সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্য দল বাঁধিতে লাগিলেন এবং সেজন্য হিন্দুদের স্বার্থ নানাদিকে

ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল তখন হইতেই হিন্দুদের মনেও কতকটা সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিতে লাগিল। আমাদের আগামী রাষ্ট্রতন্ত্রের ভিত্তি ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক হওয়ায়, এবং তাহাতে হিন্দুদের সংখ্যা, শিক্ষা এবং অন্যান্য যোগ্যতার উপর দারুণ অবিচারের ব্যবস্থা হওয়ায়, হিন্দুদের মনে অনেকটা আত্মরক্ষা মূলক আতঙ্ক জাগিয়াছে এবং আলোচ্য রাজনৈতিক সম্মিলন অনেকটা তাহারই ফল।

কিন্তু, হিন্দুদের একথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই প্রকার প্রয়োজন নিতান্তই সাময়িক এবং বাধ্য হইয়াই তাঁহাদের এই অবাঞ্ছনীয় প্রয়োজনকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। কোনও প্রকারের সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁহাদের আদর্শ নহে, এবং পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাঁহাদিগকে অখণ্ড জাতীয়তার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের নিন্দা করিয়া এবং সর্ত্তহীন যুক্ত নির্ব্বাচন চাহিয়া হিন্দুরা—এই সম্মিলনেও জাতীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভাই পরমানন্দ এই সম্মিলনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই কার্য্য সম্পাদনে ভাই পরমানন্দের উপযুক্ততা সম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই। তিনি হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেরূপ অক্লান্ত-ভাবে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে, সেদিক দিয়া বিচার করিলে এই নির্ব্বাচন সমুচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু সম্পূর্ণ-ভাবে বাংলার ঘরোয়া ব্যাপারে বাঙ্গালীর নেতৃত্বের একটি বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বাংলায়ও যোগ্য লোকের অভাব ছিলনা এবং কোনও বাঙ্গালী সভাপতি হইলে, সম্মিলনের উদ্দিষ্ট কার্য্য সমূহের জন্য তিনি পরেও লাগিয়া থাকিতে পারিতেন।

যে-সকল ব্যাপার কোন স্থানীয় সমস্যামূলক নহে, যাহার মধ্যে কোনও দিক দিয়া সার্ব্বজনীনতা আছে এবং যাহা শুধুমাত্র শিক্ষামূলক, তাহার সম্পর্কে অবশ্য কোনও দেশ বা প্রদেশের গণ্ডী থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু, স্থানীয় নানা-সমস্যার সহিত যাহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, এমন ব্যাপার সমূহে বহুপ্রকারের গোলযোগ, দল ও স্বার্থগত বিরোধ থাকিয়া যায় এবং তাহা আশ্রয় করিয়া অনেক সময় অনেক কুৎসিত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কোন ভিন্নপ্রদেশবাসীর সমক্ষে এই সকল ব্যাপার ঘটা নিশ্চয়ই ভাল নহে। এদিক দিয়াও সভাপতি বাঙ্গালী হওয়া সঙ্গত হইত।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং পুণাচুক্তির মধ্যে কোন্ বিষয়টি প্রথম উত্থাপিত হইবে, ইহা লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে সভাপতি মহাশয় ভোট গ্রহণ করেন। কিন্তু, ভোট গণনার পর (সম্ভবতঃ তাহার ফল মনঃপূত না হওয়ায়) সভাপতি মহাশয় বলেন যে, অনেক বাহিরের লোক ঢুকিয়া পড়ায় সম্ভবতঃ ফল এরূপ হইয়াছে। সভাপতির এই উক্তির প্রতিবাদ করিতে যাইয়া একজন প্রতিনিধি সভাস্থলে লাঞ্ছিত হন। শৃঙ্খলা নষ্ট না করিয়া এবং ভদ্রতা রক্ষা করিয়া স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই থাকা উচিত, এমন কি তাহা সভাপতির ব্যক্তিগত মতবিরুদ্ধ কথা হইলেও।

এই সম্মিলনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য, হিন্দু-সমাজের উভয় প্রান্তের মধ্যে পুণাচুক্তি সম্বন্ধে একটি মিটমাট হইয়াছে। অনুন্নত জাতিদের শেষ তালিকা প্রকাশিত হইলে, উভয়দলের প্রতিনিধিদের মতানুসারে জনসংখ্যার অনুপাতে সদস্যসংখ্যা নির্দ্ধারিত হইবে, এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কাহারা অনুন্নত তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার ভার সরকারের উপর না থাকিয়া সাধারণের উপর থাকিলে এইপ্রকার মিটমাটের সুফল বোধ হয় বেশি করিয়া পাওয়া যাইত।

নারীরক্ষা ও শিক্ষা সম্মিলন অনুষ্ঠান দুইটি বিশেষ সফল হয় নাই। এ সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহ আশা করা যাইতে পারিত।

প্রাদেশিক ব্যাপারে প্রাদেশিক ভাষা

সর্ব্ববিধ প্রাদেশিক ব্যাপারে প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার সকল দিক দিয়া ন্যায় ও বিবেচনাসঙ্গত। বাংলাদেশের একমাত্র ভাষা বাংলা হওয়ায়, বাংলাদেশের সকল ব্যাপারে বাংলাভাষার ব্যবহার অন্যান্য অনেক প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার অপেক্ষা, অনেক অধিক সহজ এবং সুবিধার।

পূর্ব্বে যখন শুধুমাত্র ইংরাজী শিক্ষিতেরাই দেশের সকল

ব্যাপার চালাইতেন, এবং তাহার সহিত লোকের বিশেষ যোগ থাকিত না তখন প্রাদেশিক ব্যাপার সমূহেও ইংরাজীর ব্যবহার অশোভন হইলেও ততবেশী অসুবিধার কারণ হইত না। কিন্তু, বর্ত্তমানে দেশের সকল অংশের জনসাধারণ সকল কাজেই আগ্রহ দেখাইতেছেন ও যোগদান করিতেছেন, এবং আশা করা যাইতে পারে ক্রমে আরও অধিক সংখ্যায় করিবেন। ইহাদের অধিকাংশের অন্ততঃ কতকাংশের ইংরাজী না জানা, বিশেষতঃ ইংরাজীতে বিতর্ক চালাইবার ও বক্তৃতাদি করিবার মত জ্ঞান না থাকা সম্ভব। ইংরাজী জানা প্রধান ব্যক্তিরা প্রাদেশিক ব্যাপার সমূহেও কোনক্রমে যদি ইংরাজী বর্জ্জন করিতে না চান, তাহা হইলে অন্যদের প্রতি এবং কার্য্যতঃ দেশের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হয়।

হিন্দু সম্মিলনের বিষয়নির্ব্বাচনী বৈঠকের কাজকর্ম্ম ইংরাজীতেই চালান হইয়াছিল এবং তাহার ফলে অনেক প্রতিনিধি বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন এবং নিজেদের প্রতি এবং নিজ নিজ নির্ব্বাচক মণ্ডলীর প্রতি সুবিচার করিতে সক্ষম হন নাই। অন্যান্য সভায়ও এইরূপ হইয়া থাকে।

পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদ ও পাঁজিয়া (যশোহর) হিন্দু-সভার প্রতিনিধিগণের অবিরত বাধাপ্রদানের ফলে, শেষের দিকে ইংরাজী মিশ্রিত বাংলা (অর্থাৎ বাংলা ক্রিয়াপদ এবং মধ্যে মধ্যে বিভক্তি যোগে ইংরাজী) চলিয়াছিল। সুখের বিষয় ইংরাজী-অভিজ্ঞ দুইজন অবাঙ্গালী নেতা বাংলা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। সম্মিলনের বক্তৃতাদিতে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মূল প্রস্তাবাদিও বাংলাভাষায় রচিত হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন হইলে অর্থাৎ সরকার বা বাংলার বাহিরের লোককে জানাইবার প্রয়োজন হইলে, ইংরাজী অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ভূমিকম্প

গত ১৫ই জানুয়ারীর ভূমিকম্পে সমগ্র উত্তর বিহার, নেপাল প্রভৃতি স্থান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। মানুষের অনেক দিনের চেষ্টা, অনেক কালের কীর্ত্তি চক্ষের নিমিষে ধূলিসাৎ হইল! স্মরণযোগ্য কালের মধ্যে ভারতবর্ষে এত বড় বিপদ্‌পাত আর হয় নাই। এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ই হয়ত অনেক প্রাচীন সভ্যতার অবসান ঘটাইয়াছে।

মুঙ্গের, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, জামালপুর, মতিহারী প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসের যে ভয়াবহ সংবাদ এবং চিত্র নিত্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে; তাহা নিদারুণ এবং মর্ম্মান্তিক। পল্লী অঞ্চলের বিস্তৃত সংবাদ এখনও জানা যায় নাই; দুর্গত এবং দুঃস্থদিগকে এখনও আহার ও বাসস্থান দেওয়া যায় নাই, মৃতদের উদ্ধার করা যায় নাই; গৃহহারা স্বজনহারা শিশু নারী এবং বৃদ্ধেরাও উত্তর দেশের প্রচণ্ড শীত (পরে বৃষ্টিও দেখা দিয়াছে) ভোগ করিতেছেন। সমগ্র জাতির উপর ইহাঁদের দুঃখ ঘুচাইবার ভার।

আমাদের অনেক পাঠকের সহিত হয়ত আর সাক্ষাৎ হইবে না; আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হইয়া যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যা বিচিত্রা পাঠ করিয়াছিলেন, নূতন মাসের বিচিত্রা হয়ত তাঁহাদের কাহারও কাহারও মনে নূতন দুঃখ জাগাইবে। ইহাঁদের সকলের জন্য, সকল দুঃস্থ ভ্রাতা ভগিনীর জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখ এবং অকপট সমবেদনা জানাইতেছি।

সকল বিপদেই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয়। ইহা আমাদের সেবার শক্তিকে, ত্যাগের শক্তিকে, আত্মদানের শক্তিকে এবং বীরত্বকে উদ্বুদ্ধ করে। আশাকরি জাতিহিসাবে আমরা এই পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারিব। বাংলা বিহারের প্রতিবেশী। এবিষয়ে বাংলা তাহার কর্ত্তব্য ভালভাবেই সম্পন্ন করিতেছে। আমরা অবগত হইলাম, ভূমিকম্পের পরই, আর্ত্তদের সাহায্যের জন্য প্রথম বাঙ্গালীরাই অগ্রসর হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী ডাক্তারেরা অবিলম্বে পৃথক পৃথক ক্যাম্প করিয়া আহতদিগের প্রাথমিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বাংলার যে সকল সেবা-প্রতিষ্ঠান এখানে সেবাকার্য্য চালাইতেছেন এবং অর্থ সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যের এবং সাহায্যের আরও বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বিবরণ বাহির হওয়া উচিত। অন্যান্য প্রদেশের সেবা ও দানের সহিত বাংলার কার্য্যের তুলনামূলক আলোচনাও হওয়া উচিত।

আমাদের কানে এরূপ অভিযোগ আসিয়াছে যে, সাহায্য-

দানের সময় অনেকস্থলে বাঙ্গালীদিগকে কিছু কিছু উপেক্ষা করা হইতেছে। এরূপ অভিযোগ সত্য হইলে তাহা বিশেষ শোচনীয় এবং ক্ষোভের বিষয়। বিদেশে যে সকল বাঙ্গালী থাকেন, তাহারা শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক; সাহায্য পাইবার জন্য অন্যদের ন্যায় কোলাহল করিতে ইহাঁদের আত্মমর্য্যাদায় বাধিবে। ইঁহারা যাহাতে আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ পান, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল বাঙ্গালী এখানে সেবায় নিযুক্ত আছেন, এবিষয়ে তাঁহাদের যত্নবান হইবার দায়িত্ব আছে।

সরকার শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুর যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে মোট ৬০৪০ জন লোকের প্রাণনাশের উল্লেখ আছে। অন্য সকল বিবরণে এই সংখ্যা সহস্র সহস্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জওহরলালের ন্যায় আমাদেরও বিশ্বাস, প্রকৃত সংখ্যা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইতে পারে। এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় নিবারণ করিবার ক্ষমতা কোনও রাজসরকারের নাই; সরকারের কোনও অবহেলায়ও ইহা ঘটিতে পারে না, ভারত সরকারের বর্ত্তমানে এমন কোন শত্রু নাই, যাহারা এই দুর্ঘটনার ভীষণতা সম্যক বুঝিতে পারিলে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিবে। অথচ ধনপ্রাণ নাশের এবং বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় পুরাপুরি জানিতে পারিলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এবং বিদেশ হইতে অধিকতর পরিমাণে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কাজেই, আশা করা যাইতে পারে, এই বিষয়ক সংবাদ প্রকাশে সরকার ক্ষতির পরিমাণ কম করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিবেন না।

সাম্রাজ্যের বিপদে এবং প্রয়োজনে ভারতবর্ষ অনেকবার সাহায্য করিয়াছে। কাজেই, ভারতবর্ষ তাহার বিপদের সময় সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে সাহায্য পাইতে পারে।

১৯২৩ সালে জাপানে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছিল; তাহার প্রধান কারণ, টোকিও, ওসাকা প্রভৃতির অত্যন্ত জনবহুল নগর সমূহে অল্পস্থানে অনেক লোক মারা পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ (বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের তুলনায়,) এবং দুর্ঘটনার ভীষণতা ও ব্যাপকতা বোধ হয় তদপেক্ষা কম হয় নাই। কিন্তু, জাপান স্বাধীন দেশ। জাপান যত সহজে অন্যদেশের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিল, ভারতবর্ষ তাহা পাইবে না। তবে, জাপান ও অন্য কোন কোন দেশের নিকট হইতে প্রতিদানস্বরূপ কিছু পাইবার আশা করা অসঙ্গত হইবে না।

আমাদের যুবক সম্প্রদায় ও শ্রমসাধ্য সেবার কার্য্য

ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যের জন্য যুবকেরা কি প্রকারের কার্য্য করিতে চাহিতেছেন, সে সম্বন্ধে পাটনা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সার কোর্টনে টেরেল সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন আমাদের প্রত্যেক যুবকেরই তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। তিনি বলিতেছেন:—

"বিপন্নদের সাহায্যের জন্য যুবকদের নিকট হইতে—ইঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রেরাও আছেন—সেবা করিবার বহু প্রস্তাব আমি পাইয়াছি। কিন্তু, আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কি প্রকারের সাহায্য ইঁহারা করিতে পারেন এই কথা ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রায় সকল স্থান হইতেই এই উত্তর পাইয়াছি যে ইঁহারা চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারেন। এরূপ কার্য্যের প্রয়োজন নাই।...প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন হইতেছে, সেচ্ছাকৃত কঠোর শারীরিক শ্রমের। ফাউন্টেন পেন ও চাঁদার খাতা লইয়া যাহা করা যাইবে, কোদালী ও ঝুড়ি লইয়া তাহার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করা যাইবে। সুস্থকায় যুবকদের এই প্রকার কার্য্য করিতে অনিচ্ছা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। দেশরক্ষার জন্য সামরিক কার্য্য করিতে দেশের যুবকের একদিন ডাক পড়িতে পারে। তাহার জন্য জাতিকে সেবা করিবার প্রয়োজনীয় মনোভাব গড়িয়া তুলিতে উৎসাহ দিবার সর্ব্বপ্রথম সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।"

বাঙ্গালার যুবকদের মধ্যে হাল্কা মনোভাব, শ্রমবিমুখতা, কষ্টসাধ্য কার্য্যে অনিচ্ছা ও অসামর্থ্য আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। অন্যান্য প্রদেশের যুবকদের

মধ্যেও যে এই সকল দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছে, ইহা বিশেষ ক্ষোভের বিষয়।

ঠাকুর ও গান্ধী

আমাদের বড় লোকদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক সময় অযথা বড় হইতে পারে। তাহাতে তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার পরিচয় থাকিলেও, পৃথিবীর বাজারে তাহার দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হয় না। কাজেই এসম্বন্ধে যোগ্য বিদেশীদের উক্তির এদিক দিয়া বিশেষ মূল্য আছে। আশা করি জে-টি-সাণ্ডারল্যাণ্ডের নিম্নের উক্তিটি অনেক পাঠককেই আনন্দ দান করিবে।

"At a recent great banquet in the International House, New York, the question arose for discussion and an expression of judgment: Who are the two men to-day most widely known and honoured in all the world. The Chairman of the occasion, a professor in Columbia University, expressed the belief that there are two such men: who are they? Are they Americans? Not many answered "yes". Are they Englishmen? Most doubted. Are they French, or German, or Europeans of any nation? Few felt sure that they could answer in the affirmative. When the Chairman asked: Are they Tagore, the distinguished poet of India, and Mahatma Gandhi, India's great political leader and saint? The reply in the affirmative was almost unanimous.

মর্ম্ম: বর্ত্তমানে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত এবং সম্মানিত দুইজন লোক কে কে, এই প্রশ্ন নিউ ইয়র্কের আন্তর্জাতিক গৃহে সম্প্রতি একটি বড় ভোজ সভায় আলোচনা এবং বিচারের জন্য উত্থাপিত হইয়াছিল। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, এরূপ দুইজন লোক আছেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন; কিন্তু তাঁহারা কাহারা? তাঁহারা কি আমেরিকার লোক? অল্প লোকেই "হাঁ" বলিলেন। তাঁহারা কি ইংরেজ? অধিকাংশ লোকই সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা ফরাসী, জার্ম্মান অথবা অন্য কোনও ইউরোপীয় জাতির লোক নাকি? খুব অল্প লোকই ইহার উত্তরে "হাঁ" বলিবার মত জোর পাইলেন। কিন্তু সভাপতি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন: ইঁহারা কি, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ঠাকুর এবং ভারতের শক্তিশালী রাজনীতিক নেতা এবং সাধু পুরুষ মহাত্মা গান্ধী? তখন, প্রায় সকলেই একবাক্যে সম্মতি জানাইলেন।

সুশীলকুমার বসু

নানাকথা

বেঙ্গল ইমিউনিটি লিমিটেড

এই প্রতিষ্ঠানটি আজকাল বাংলার জাতীয় জীবনের একটি গৌরবময় সম্পদ, তাই এর প্রতি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা আমরা প্রয়োজন মনে করি।

মানুষের সব চেয়ে ভয়াবহ ও শক্তিশালী শত্রুই মানুষের দৃষ্টির বাইরে;—তা' হ'চ্ছে রোগের বীজাণু। দেহজীবির সহিত এই অদৃশ্য বীজাণুর চলেছে চিরন্তন সংগ্রাম। ভার্দুনের যুদ্ধক্ষেত্রে যতলোক নিহত হয়েছিল,—তার চেয়ে অনেক বেশি লোক নিত্য নিহত হ'চ্ছে এই অদৃশ্য শত্রুর অজ্ঞাত ও অতর্কিত আক্রমণে। মনুষ্যত্বের পক্ষ থেকে এই সংগ্রাম পরিচালনার ভার বৈজ্ঞানিকদিগের উপর,—তাঁদের পরীক্ষাগার থেকেই এই যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ হয়,—সেইখান থেকেই মানুষের আত্মরক্ষার আয়োজন,—জীবাণু-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। গত শতাব্দীর শেষের দিকে জীবাণু-বিজ্ঞানের আবিষ্কারে নিদান শাস্ত্রে ও চিকিৎসা-বিধানে হোলো নূতন যুগের সূচনা,—দেখা গেল,—যক্ষা, কুষ্ঠ, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি রোগের কবলে মানুষের জীবলীলা সম্বরণের মূলে রয়েছে জীবাণুর সংহার-নৃত্য। সেই থেকে শুধু ডিপ্‌থিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কারেই নয়, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগেও সেরাম ও ভ্যাক্‌সিন প্রয়োগের ব্যবস্থা হোলো। বেঙ্গল ইমিউনিটি হ'চ্ছে মানুষের আত্মরক্ষার জন্য এই রকম একটি দেশীয় অস্ত্রাগার।

এর প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে,—যখন মহাযুদ্ধের ফলে বিলাতী মাল আমদানীর পথ হ'য়েছিল রুদ্ধ। তখন একশো গুণ দাম দিয়েও একটাকা দামের সেরাম ও ভ্যাক্‌সিন সংগ্রহ করা দুরূহ হ'য়ে উঠেছিল। যা হোক সেই দুর্ঘটনার মধ্যেই আমাদের জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ মিলেছিল। ক্রমে কিন্তু বিদেশী প্রতিযোগিতা দেখা দিল,—সেই প্রতিযোগিতায় এই শিশু প্রতিষ্ঠানটির টিঁকে থাকাই দায় হ'য়ে উঠেছিল। তখন ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন রুড়কিতে,—ইণ্ডিয়ান মিলিটারী সার্ভিসে। তাঁকে অনুরোধ করা হোলো বেঙ্গল ইমিউনিটির ভার নেবার জন্য। নিজের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা, প্রতিভার দ্বারা, কর্ম্মক্ষমতার দ্বারা দেশের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা সেই সময়ে তাঁর অন্তরকে পীড়িত করছিল, তিনি সরকারী চাকুরির সুযোগ সুবিধা সব কিছুতে জলাঞ্জলি দিয়ে এই মহৎ পরিকল্পনাকে মৃতকল্প দশা থেকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

ক্যাপ্‌টেন দত্ত প্রথমেই বেঙ্গল-ইমিউনিটির ল্যাবরেটারী প্রিন্সেপ্‌ ষ্ট্রীট থেকে ১৫৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত করলেন—তার নীচে তলাটা হোলো আফিস্ এবং ওপরটা হোলো গবেষণাগার। ডাঃ দত্ত যে সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন (প্রতিষ্ঠার সাত বছর পরে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে) তখন তার সম্পত্তি বল্‌তে ছিল কতগুলি টেষ্ট্‌টিউব্ আর ভাঙা টেবিল চেয়ার, না ছিল মূলধন না ছিল কোনো অর্গানিজেশন্—য়্যাসেটের বদলে ছিল লায়েবিলিটি,—একবারে অচল অবস্থা বল্‌লেই চলে।

কিন্তু ডাঃ দত্তের হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল ইমিউনিটির অবস্থা ফিরল, প্রথম বছরেই তিনি সমস্ত দেনা মিটিয়ে দিয়ে ক্ষতির দশা থেকে কোম্পানিকে মুক্ত করলেন। দ্বিতীয় বছরে (১৯২৬) থেকেই তিনি ডিভিডেণ্ড্ দিতে সুরু করলেন। এবং তৃতীয় বছরেই তিনি ৫২০০০৲ হাজার টাকায় বরানগরের বাগান বাড়িটি কিন্‌লেন। এরপর ধর্ম্মতলায় কেবল মাত্র আফিস রইল—বেঙ্গল ইমিউনিটির সুবৃহৎ ও সুবিস্তীর্ণ কারখানা বরানগরে স্থানান্তরিত হোলো।

এই ল্যাবরেটারী এই জাতীয় কারখানার মধ্যে কেবল ভারতবর্ষে নয়, সারা প্রাচ্যদেশে একটা সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান।

জাপানের ডাক্তার শিগা, ডাঃ হাটা, সাংঘাইয়ের ডাঃ হিক্স্, কর্নেল্ বাকল, কর্নেল ম্যালোন্, মেজর খাজা মহিউদ্দীন, ডাঃ দেশমুখ প্রভৃতির মত বিশ্ববরণ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার ও চিকিৎসাবিদেরা লেবরেটারীর বিশেষ সুখ্যাতি করেছেন। সেরাম্, ভ্যাক্সিন্, ভিটামিন্ প্রডাক্ট ও কলোডিয়ান্ প্রস্তুতের নৈপুণ্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য সমস্ত পৃথিবীর চিকিৎসা জগতে এই ল্যাবরেটারী খ্যাতি লাভ করেছে। কেবল খ্যাতি নয় বিত্তও লাভ করেছে বিপুল। নিজস্ব বিভাগে বিলাতি

বেঙ্গল ইমিউনিটির অশ্বশালার একাংশ, এই সকল সুস্থকায় তেজস্বী অশ্ব হইতে সীরাম প্রস্তুত হয়।

জিনিসকে বেঙ্গল ইমিউনিটি বাজার থেকে হটিয়ে দিয়েছে, গত বছরে এর লাভ দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন লাখ টাকা। বেঙ্গল ইমিউনিটি এখন বাঙালীর গর্ব্ব বাংলার গৌরব।

ডাঃ জি, ভি, দেশমুখ এম্-ডি (লণ্ডন্) এফ্-আর্-সি এস্ (ইংলণ্ড) ১৯২৮এর নিখিল ভারতীয় মেডিক্যাল্ কন্‌ফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণে বেঙ্গল ইমিউনিটি সম্বন্ধে বলেছেন :—

"I was shown all the scientific stages of prepairing Vaccines and Sera and I must say that the methods are very scientific and accurate. They have very healthy and beautiful surroundings and what is more they keep a Biological farm of their own where they have their own horses and animals. I wish them every success. They are doing a great scientific and national work."

১৯২৭ সালে কলিকাতায় Far Eastern Association of Tropical medicinesএর যে সপ্তম অধিবেশন হয়েছিল সেই আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল্ কংগ্রেসের খোদ কমিটি বেঙ্গল ইমিউনিটি পরিদর্শনের জন্য ডেলিগেট্‌দের অনুরোধ জানান :—

"Formerly the profession in India had to depend on outside sources for its supplies of vaccines and anti-sera. Lately, however, successful beginnings have been made and

visitors may see what progress has been achieved in this direction by visits to the Bengal Immunity Laboratory."

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, গবেষণাবিদ ও চিকিৎসকেরা বেঙ্গল ইমিউনিটির কারখানা ও গবেষণাগার পর্য্যবেক্ষণ ক'রে বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। লীগ্ অব্ নেশনস্, সুইডেনের ষ্টেট্ সেরাম্ ইন্‌ষ্টিউট্ প্রভৃতি আন্তর্জ্জাতিক ও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ইমিউনিটি ও ইমিউনিটির প্রস্তুত সেরাম্ ভ্যাক্‌সিন ইত্যাদিকে স্বীকার করে' আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা দান করেছেন।

উপযুক্ত বৈজ্ঞানিকের দ্বারা নিজেদের গবেষণাগারে নানাবিধ গবেষণা ও আবিষ্কারের কাজ ত চলেই তা ছাড়াও বেঙ্গল ইমিউনিটি বহু অর্থব্যয়ে কলকাতা সায়ান্স্ কলেজে নিজেদের গবেষক নিযুক্ত রেখেছেন। এঁদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান যে সমৃদ্ধি লাভ করেছে তার দ্বারা দেশের কেবল ব্যাধিসঙ্কট থেকে পরিত্রাণই নয়, বিদেশের দরবারে ভারতের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি বাড়ল। এঁদের গবেষণা ও আবিষ্কারের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, কেবল এঁদের একজন গবেষণাকারের একটিমাত্র আবিষ্কার সমস্ত পৃথিবীতে কিরূপ স্বীকৃতি ও সমাদার লাভ করেছে, ব্রিটিশ মেডিক্যাল্ জার্নাল ৩৬৪৯ নং—১০০২।১০০৩ পৃষ্ঠা থেকে তার পরিচয় দেওয়া হোলো :—

At a meeting of the section of Surgery oft he Royal Society of Medicine on December 3rd, with Mr. C. H Fagge in the Chair, Professor G. E. Gask opened a discussion on surgery in diabetes.

* * * *

Dr. O. Leyton mentioned the recent experiments of Harendra Nath Mukherjee, who had found it possible to produce hypoglycæmia with phosphotungstate of Insulin given by mouth, and whose results he had been able to confirm at the London Hospital.

In surgical cases where injections were resented by the patient, this might offer a good method of controlling diabetes....

কেবল বিদেশেই নয়, স্বদেশেও বেঙ্গল ইমিউনিটি সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্বাধীন ও করদরাজ্যে বেঙ্গল ইমিউনিটির একছত্র আধিপত্য। সমস্ত বেসরকারী হাসপাতালে এবং ডাক্তারখানায় বেঙ্গল ইমিউনিটির জিনিস চলে—কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের সরকারী হাসপাতালেও। নিজেদের কার্য্যে বেঙ্গল ইমিউনিটি এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী—যাবতীয় বিদেশী সেরাম্ ও ভ্যাক্‌সিন্‌কে স্বদেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করেছে। বেঙ্গল্ ইমিউনিটির হেমোজেন্ বিলাতি হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে (রক্তবর্দ্ধক ঔষধ), হর্মোজেন্ বিলাতি হর্মোটিনের সঙ্গে, বাই-ফ্লোজিষ্টিন্ বিলাতি বাই প্রোজেষ্টাইনের সঙ্গে (নিউমোনিয়া, হাঁপানি ইত্যাদি রোগে বক্ষের বহি প্র'লেপ) ভিনোমল্‌ট্ ঔষধি সুরারূপে বিলাতি উইন্ কারনিস্ ম্যানোলার সঙ্গে দারুণ প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে। অসাধারণ গঠন-প্রতিভা, কর্ম্মনৈপুণ্য ও দূরদৃষ্টির বলে যিনি এই অসাধ্য সাধন ও অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন—যাঁর এই মহৎ কীর্ত্তিতে দেশে ও বিদেশে বাঙালী আপনাকে ও আপনার গৌরবকে লাভ করল, বেঙ্গল ইমিউনিটির প্রাণ-পুরুষ, জাতির যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি সেই ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

ডাক্তার শরৎচন্দ্র ঘোষ এম-ডি

আমরা শুনে সুখী হ'লাম যে সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লণ্ডনের New Health Society-র Honourary Corresponding Member নিযুক্ত হ'য়েছেন। ভারতীয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক কর্ত্তৃক এই সম্মানলাভ এই প্রথম। বিশেষতঃ New Health Society একটি এলোপ্যাথি চিকিৎসকদের সঙ্ঘ। তাঁদের পক্ষে একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসককে

এই সম্মান দেওয়াতে,—এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মধ্যে একটি মিলনসেতুর সূচনা হোলো। আমরা ডাক্তার ঘোষকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বিহারের ভূমিকম্প

গত ১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) বিহার প্রদেশে প্রকৃতির যে রুদ্রলীলা হয়ে গেল তাকে ভূমিকম্প বলতে মনে একটু বাধে। আমাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যে-সকল সাধারণ ভূমিকম্প দেখেচি তা মনে ক'রে ত নিশ্চয়ই,—এমন কি, ১৮৯৭ সালের আসাম এবং উত্তর বঙ্গের, এবং ১৯০৫ সালের কাঙড়া-ধরমশালার ভূমিকম্পের কথা মনে ক'রেও। জাপান স্পেন, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের ভীষণ ভূমিকম্পের কাহিনী আমরা শুধু পড়েইছি, তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। কিন্তু বিহারে সে-দিন যা হ'য়ে গেল তা আমাদের আশঙ্কা অভিজ্ঞতার অতীত,—ভূমিকম্পের গোত্রে তা পড়ে না,—পড়ে খণ্ডপ্রলয়ের গোত্রে। ধরিত্রীর সুনিশ্চিত ক্রোড়ে হাস্যকৌতুক ক্রিয়াকর্ম্ম সুখ দুঃখ চিরন্তন গতিতেই চলেছিল, অকস্মাৎ মাটির ভিতর গভীর আর্ত্তনাদ শোনা গেল—বসুন্ধরা উঠ্‌ল কেঁপে—কখনো উপরে-নীচে কখনো উত্তরে-দক্ষিণে কখনো পূর্ব্ব-পশ্চিমে কখনো বা চক্রপথে—ইঁট-পাথরের ঘরবাড়ি তাসের বাড়ির মত খ'সে পড়ল—ধরণীর কঠিন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে অসংখ্য গহ্বর ফাটল দেখা দিলে,—তার ভিতর থেকে প্রবলবেগে বালুকামিশ্রিত জল নির্গত হয়ে পথঘাট ক্ষেতখামার প্লাবিত করলে, ভূমিতলের সমতলতা গেল বদলে, কূপ পুষ্করিণী এবং অন্যান্য জলাশয় ধরণী-গর্ভোত্থিত বালুকারাশিতে গেল মজে, —দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিনিট তিনেকের মধ্যে যা ছিল প্রকৃতির এবং মানুষের গড়া রম্য উদ্যান তা মহাশ্মশানে পরিণত হ'ল! হাজার হাজার লোক আত্মীয়-পরিজন চোখের সামনে প্রাণত্যাগ করলে, কিন্তু বেঁচে যারা গেল, শুনেছি তাদের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল নির্গত হয় নি—সন্ত্রাসের উৎকটতায় সাধারণ অনুভূতি তখন এমনি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল!

বন্যা এবং ঝটিকা প্রভৃতির দ্বারা আমাদের দেশে মাঝে মাঝে বিস্তৃত পরিধি নিয়ে মানুষের বিপদ দেখা দিয়ে থাকে, কিন্তু এবারকার ভূমিকম্পে যা হয়ে গেল তার কাছে সে-সব নগণ্য। স্যার স্যামুয়েল হোর হাউস অফ্ কমন্সে জানিয়েছেন যে ভূমিকম্পে বিহারে ৬৫৮২ ব্যক্তির প্রাণনাশ হয়েছে, এবং যে আর্থিক ক্ষতি ঘটেছে তা পূরণ করতে অন্ততঃ পাঁচ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এ দুটি সংখ্যাই ত প্রাণে গভীর আতঙ্কের সঞ্চার করে, কিন্তু অনেকের মতে এক মুঙ্গের সহরেই দশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েচে। যারা কোনো প্রকারে বেঁচে গেছে তারা জীবন পেয়েছে বটে, কিন্তু জীবন ধারণের দুরূহ সমস্যায় তারে তারা বিহ্বল। বহুলোকের চিরজীবনের সঞ্চয় কয়েক মিনিটে ধ্বংস হয়েছে, গৃহসম্পত্তির আয়ে যারা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করছিল তারা সহসা কপর্দ্দকশূন্য দরিদ্র। কত কৃষকের উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র বালুকাবৃত মরুভূমিতে পরিণত হয়েচে। অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, অর্থাভাবে, জলকষ্টে, আসন্ন মহামারীর আশঙ্কায় মানুষের দুঃখ কষ্টের শেষ নেই। এই বিরাট বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে দেশ জাগ্রত হয়েচে সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও বিপুলভাবে অর্থ এবং অপরাপর সাহায্যের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয়। দেশের এই মহা দুর্দ্দিনে একটি ব্যক্তিরও অলস থাকা উচিত নয়, যথাশক্তি সকলেরই সাহায্যের কার্য্যে যোগদান করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের বাইরে ইংলণ্ড ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশেও সাহায্যের ব্যবস্থা আরম্ভ হয়েছে,—এ আত্মীয়তার কথা ভারতবর্ষ চিরকাল সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করবে।

ভূকম্পপীড়িত অঞ্চলের অধিবাসীগণ এখনও নূতন ভূমিকম্পের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এত প্রবল ভূকম্পের পর এখন কিছুদিন আর বেশি-রকম ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা কম। এখন যে মাঝে মাঝে মৃদু কম্পন অনুভূত হচ্ছে সে ভূপৃষ্ঠের স্ফীত অংশগুলি স্থায়ীভাবে বসে যাচ্ছে ব'লে,—সুতরাং ভয়ের বিশেষ কারণ নেই। তা ছাড়া ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই একটা কথা যে উঠেছিল যে, বিহার অঞ্চলে একটা আগ্নেয়গিরি উদ্ভব হবার অবস্থা আসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ছে, যার সূচনায় এই প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল, সে কথাটাও অমূলক ব'লে

বৈজ্ঞানিকেরা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তথাপি এখন কিছুদিন পর্য্যন্ত ভূকম্পপীড়িত অঞ্চলে নূতন পাকা বাসভবন নির্ম্মাণ করা কিম্বা বেমেরামত গৃহের সংস্কার করা উচিত হবে না,—কারণ ভূমিকম্পের ফলে দেশের ভূসমতার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়েচে তা এখন ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। বর্ষাকালে গণ্ডকাদি দুই একটি নদীর গতিরেখার পরিবর্ত্তন অসম্ভব নয়, এবং বিধ্বস্ত নগরীগুলির ভূসমতা যদি নেবে গিয়ে থাকে তা হ'লে বন্যার জলে সেগুলি স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হতেও পারে। সুতরাং সে-সকল সহরের পুনর্গঠন ঠিক বর্ত্তমান অবস্থানেই হবে কি-না তাও এখন অনিশ্চিত। পুনর্গঠন কি ভাবে হবে তাও একটি দুরূহ সমস্যা। বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য সে বিষয়ে গবেষণা করছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় এখন থেকে ও অঞ্চলে বাড়িগুলি যথাসম্ভব একতলা করা উচিত এবং গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ প্রধানত কাঠ, লোহা, অ্যাসবেষ্টস্ ইত্যাদি হওয়া উচিত। দ্বিতল ত্রিতল গৃহের সিঁড়িগুলি কাঠের করা একান্ত কর্ত্তব্য—কারণ এবারকার ভূমিকম্পে দেখা গিয়েছে গৃহের অন্যান্য অংশের চেয়ে সিঁড়িগুলিই আগে ভেঙ্গে পড়েছে।

এই ভূমিকম্পে বাঙলাদেশের সাহিত্যসেবীদের পক্ষে একটি বিশেষ মর্ম্মপীড়ার কারণ ঘটেছে। বাঙলার সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ভূমিকম্পের সময়ে তাঁর বাসস্থান মজঃফরপুরে ছিলেন। ভূমিকম্পে তিনি নিজে গুরুতরভাবে আহত হয়েচেন এবং তাঁর আদরের দশমবর্ষীয়া পৌত্রী অরুণা (রুণু) মৃত্যুমুখে পতিত হয়েচে। অনুরূপা দেবী শুধু বিচিত্রার লেখিকা নহেন, তিনি আমাদের পরমাত্মীয়া। * আমাদের লেখক স্নেহাস্পদ শ্রীমান অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রুণুর শোকসন্তপ্ত পিতা। আমরা রুণুর পিতামহ-পিতামহী এবং পিতামাতাকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করছেন। তিনি পাটনায় এসেছেন এবং আগামী ৩রা ফাল্গুন কলিকাতায় পৌঁছবেন। আগামী সংখ্যা বিচিত্রায় বিহারের রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত প্রভোতকুমার সেনগুপ্ত লিখিত ভূমিকম্পের বিষয়ে একটি বহু চিত্র সম্বলিতপ্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।

* পরলোকগতা রুণু বিচিত্রা সম্পাদকের ভ্রাতুষ্পুত্রী-কন্যা।

পরলোকে সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র

বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিন বেলা ২টা আন্দাজ মাননীয় সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র কে-সি-এস-আই, সি-আই-ই সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করেন। বাংলাদেশের উপর এই দুর্ঘটনা একেবারে বিনামেঘে বজ্রপাতেরই মত। সেদিন সকালবেলাতেও সার প্রভাস তাঁর অভ্যাসমত শারীরিক ব্যায়াম করেছিলেন,—পরে লাটবাহাদুরের বাড়ীতে মন্ত্রণা সংসদের অধিবেশনে যোগদান

মাননীয় স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র

করেছিলেন; তারপর তাঁর কার্য্যালয়ে এসে সেদিনকার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন সংক্রান্ত কিছু কাজ কর্ম্ম সেরে স্নানাহারের জন্য যখন বাড়ী এলেন তখন বেলা প্রায় একটা। অভ্যাস মত তৈলমর্দ্দন করে স্নান সমাপনান্তে গাত্র মার্জ্জনা করতে করতে সহসা সংজ্ঞাহীন হ'য়ে তাঁর ভৃত্যের অঙ্গে এলিয়ে পড়লেন; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চিকিৎসক এসে দেখলেন তাঁর প্রাণহীন দেহ।

সার প্রভাস ছিলেন কর্ম্মী পুরুষ; স্বপ্ন কখনো দেখ্তেন না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঃশেষে আপনাকে নিয়োগ করতেন,—সুদূরের মধ্যে কল্পনাকে বা আকাঙ্ক্ষাকে প্রসারিত করবার অবসর তাঁর ছিল না। তাই যা' হবার নয় তা' নিয়ে বৃথা ক্ষোভ করে কালক্ষেপ করতেন না, বর্ত্তমানের সত্যকে সহনীয় করে তোল্‌বার জন্য করতেন প্রাণপণ। অনন্ত কালপ্রবাহের ক্ষণিক মুহূর্ত্তগুলি আসে ও যায়, সকলেরই জীবনে, কিন্তু সার প্রভাসের একান্ত আত্মনিবেদনের পুরস্কার স্বরূপ রেখে যেত তাঁর অন্তরে কিছু চিরস্থায়ী সম্পদ। এরই ফলে মনুষ্য চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাঁর যেমনই গভীর, বাইরের জগতের তথ্যানুশীলনও ছিল তেমনই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ। এই তথ্য ও জ্ঞান-সমৃদ্ধ মনের পরিচয় তিনি দিয়েছেন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই,—ব্যক্তিগত জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার সরকার ও জনসাধারণ যা' হারাল,—তা সহজে আর কোথাও মিলবে না।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর স্নেহ-প্রবণতা ও অনুকম্পার পরিচয়, যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন,—তাঁরাই পেয়েছিলেন,—এমন কি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরাও। বুদ্ধির যে প্রখরতা ও তথ্য সংগ্রহের যে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা তাঁকে বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের শীর্ষস্থানে উন্নীত করেছিল, তার সুফল থেকে তিনি কাকেও বঞ্চিত করতেন না। বর্ত্তমান বাংলার স্বাস্থ্য ও অর্থসম্বন্ধীয় সমস্যাগুলি তিনি চিন্তা করতেন গভীর ভাবে,—আলোচনা করতেন সকলেরই সঙ্গে। সেই আলোচনার মধ্যে তাঁর স্থির বুদ্ধি-প্রধান দৃষ্টির ভিতর থেকে একটা গভীর দরদ-ভরা অন্তঃকরণের আভাস পাওয়া যেত।

তাঁর জীবনের সেই শেষ প্রভাতটি—কর্ম্ম কোলাহলে মুখরিত,—জানিনা,—কি বাণী নিয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। দিনের কর্ম্ম তখনো শেষ হয়নি। সম্মুখে সারা অপরাহ্নের কোলাহল ময় আহ্বান, পিছনে সারা সকালের প্রাপ্তি,—মাঝখানে শুধু উদাস মধ্যাহ্নের একটুখানি অবসর,—এরই মধ্যে কখনএল মরণের বাক্যহারা অস্ফুট ইঙ্গিত,—তিনি যেনপ্রস্তুতই ছিলেন,—নিমেষের মধ্যে চলে গেলেন এপার থেকে ওপারে। মরণের আহ্বানের বিরুদ্ধে জীবদেহির যে তীব্র প্রতিবাদ অভিব্যক্ত হয়' দীর্ঘকালব্যাপী যন্ত্রণার মধ্যে,—সে প্রতিবাদ তিনি করেন নি। তাঁর কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দীর কর্ম্মময় জীবনের যা' কিছু সৃষ্টি ছিল তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, তারই মাঝখানে তাঁর পূর্ণ দীপ্তিতে দণ্ডায়মান হ'য়েই তিনি যেন প্রতীক্ষা করেছিলেন,—একটি বিরল মুহূর্ত্তের জন্য,—যে মুহূর্ত্ত অনেকের জীবনেই আসে না, অর্থাৎ যখন বিশ্ব-সৃষ্টির সবচেয়ে বড় দুটি বিরুদ্ধ সত্য,—জীবন ও মরণ—একসাথে এসে মিলিত হয়। সার প্রভাসের পুণ্যবলে এই বিরলমুহূর্ত্তটি তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর স্রষ্টার নিকট আত্ম-নিবেদন করার জন্য। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকগত রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার

গত মাঘ মাস ভারতবর্ষের পক্ষে সত্যই একটি দুঃসময় গেছে। ১লা তারিখে এর সূত্রপাত হ'ল বিহারের সর্ব্ব-ধ্বংসকারী ভূমিকম্পে; তারপর একে একে ভারতবর্ষের তিনটি প্রদেশে তিনটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মৃত্যুর মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল। সুবিখ্যাত "হিন্দু" পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার ছিলেন এই জ্যোতিষ্কত্রয়ের অন্যতম। বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ মাদ্রাজে তিনি পরলোকগমন করেছেন। ভারতবর্ষের সাংবাদিক জগৎকে যদি সৌরজগতের সহিত তুলনা করা যায় তা হ'লে রঙ্গস্বামী ছিলেন সে জগতের সূর্য্য। তাঁর প্রজ্ঞা, বৈদগ্ধ্য এবং চিন্তাশীলতার উৎকর্ষ তাঁর সম্পাদিত পত্রকে মহিমান্বিত করেছিল। কর্ম্মের নিভৃত অন্তরালে নিজেকে অদৃশ্য রেখে তিনি কালি কলম কাগজের সহায়তায় যে কাজ করতেন, প্রচারপরায়ণ অনেক দেশনেতারই পক্ষে তেমন করা সম্ভবপর ছিল না। হাত পা নাড়া চোখে দেখা যায়, কিন্তু মস্তিষ্কের ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর নয়, সেই জন্যই বোধ হয় স্যর বেসিল ব্ল্যাকেটের মত ব্যক্তিও রঙ্গস্বামীকে "Brain of the Swaraj Party" আখ্যা প্রদান ক'রেছিলেন। মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে এমন একজন দেশনায়কের মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হ'ল তা অপরিমেয়। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় আমরা আমাদের গভীর দুঃখানুভূতি প্রকাশ করছি।

পরলোকগত মধুসূদন দাস

বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় কটকে উড়িষ্যার মহিমান্বিত জননায়ক মিঃ মধুসূদন দাস মহাশয়ের পরলোকগমন ঘটেছে। ১৮৪৮ সালের ২৮শে এপ্রিল মিঃ দাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। মধুসূদন চার বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন এবং 'বিহার ও উড়িষ্যা' স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়ার পর ১৯২১ সালে তিনি ঐ প্রদেশের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রীত্ব লাভ করেন—কিন্তু মন্ত্রীত্ব পদ সবেতন না হ'য়ে অবৈতনিক হওয়া উচিত তাঁর এই মতের সঙ্গে তৎকালীন গভর্ণর স্যর হেন্‌রী হুইলারের মতভেদ হওয়ায় দুই বৎসর পরে তিনি মন্ত্রীত্ব পদ ত্যাগ করেন। বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী উড়িষ্যায় যে সকল দেশহিতকর আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়েচে তার প্রত্যেকটিরই সঙ্গে মধুসূদন দাসের কোনো-না-কোনো প্রকারে যোগ ছিল। নব-উৎকলে বর্ত্তমানে যে দেশাত্মবোধ জন্মলাভ করে ক্রিয়াশীল হয়েচে তার জন্মদাতা যে মধুসূদন ছিলেন সে কথা অসংশয়ে বলা যেতে পারে। উড়িষ্যার লুপ্তপ্রায় চারুশিল্প এবং শ্রমশিল্পকে অসাধারণ পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ের দ্বারা পুনরুজ্জীবনের পথে প্রবর্ত্তিত ক'রে মধুসূদন উৎকলের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত ক'রে গেছেন তার জন্ম তাঁর স্বদেশবাসী বহুদিন তাঁকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। আমরা মধুসূদনের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

শরৎ-সম্বর্দ্ধনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ থেকে গত ২৩ জানুয়ারী শরৎচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। সেই সভার একটি কার্য্য-বিবরণী সম্পাদক মহাশয় আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্ম নিম্নে তা' উদ্ধৃত করা গেল—

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের বাঙ্গালা সাহিত্য সমিতির আহ্বানে সুপ্রসিদ্ধ কথা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় আশুতোষ হলে শুভাগমন করেন। সভার বহু পূর্ব্ব থেকেই আশুতোষ হলটী বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ ও ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। সমিতির পক্ষ থেকে অধ্যাপক রায় শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুরকে সভাপতির আসন গ্রহণ করবার প্রস্তাব সমর্থিত হবার পর সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বারিদবরণ চট্টোপাধ্যায় সভাপতিকে এবং সহ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস শরৎবাবুকে মাল্য ভূষিত করেন। সভাপতির অনুরোধে শরৎবাবু একটী নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী এবং ছাত্র ছাত্রীদের মুগ্ধ করেন, কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর পিতৃদেবের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি থেকে কিরূপ সাহিত্য বিষয়ে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তার একটী রেখা চিত্র সকলের সামনে ফুটিয়ে তোলেন এবং ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক কোন্ ধরণের হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেন। ডাক্তার হীরালাল হালদার ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক এম্, এন্, বসু শরৎবাবুর সম্পর্কে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা দেন। সমিতির পক্ষ থেকে "শরৎ-সম্বর্দ্ধনা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। সভাপতি ও শ্রোতৃমণ্ডলীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে কণ্ঠ-সঙ্গীতের সাথে সভার কাজ শেষ হয়। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় আকস্মিক ভূমিকম্পে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর আঘাত প্রাপ্তি ও তাঁহার আত্মীয়ার প্রাণহানির জন্ম সমবেদনা প্রকাশ করেন; এবং মুহূর্ত্তের জন্ম দাঁড়িয়ে সকলে তা' গ্রহণ করেন।

সাহিত্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বারিদবরণ চট্টোপাধ্যায়, সহসম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস ও সহ-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কল্যাণী চক্রবর্ত্তী এবং অপর সদস্যবৃন্দের পরিশ্রমে অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছিল। ডাঃ হীরালাল হালদার, ডাঃ প্রমথ বানার্জ্জি, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বিচিত্রা), ডাঃ সুশীল মিত্র (বিচিত্রা), অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী, অধ্যাপক এম্, এন্ বসু, শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী এবং ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলন

গত ৭ই জানুয়ারী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্ত ফরিদপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং তৎপরে মাসাবধিকাল প্রদর্শনীটি খোলা থাকে। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ জননেতা চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লালমিঞা) সাহেব একটি সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন এবং গত ২৭শে এবং ২৮শে জানুয়ারী উক্ত সম্মেলনের অধিবেশন হয়। মূল সভাপতির আসন অধিকার ক'রেছিলেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কাব্য, লোক-সাহিত্য ও সাহিত্য—এই তিনটি শাখার সভাপতিত্বের ভার পড়েছিল যথাক্রমে অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজি মোতাহার হোসেনের উপর। শরৎচন্দ্রের অভিভাষণ এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হুমায়ুন কবীর সাহেবের অভিভাষণ আমরা বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত করলাম। আরও দুয়েকটি প্রবন্ধের পরে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা রইল। অনুষ্ঠানের সূত্রপাতেই শরৎচন্দ্র তাঁর অভিভাষণে উৎসবের যে লঘু মধুর সুরটি জাগিয়ে তুলেছিলেন দুই দিবসব্যাপী নিরবসর কার্য্যাবলীকে তা শেষ পর্য্যন্ত সরস ক'রে রেখেছিল। গতানুগতিক প্রবন্ধ-পাঠ-সভার কঠোর নিয়ম পদ্ধতি থেকে মুক্তিলাভ ক'রে সকলে নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। প্রবন্ধ যে পড়া হয় নি তা নয়, কিন্তু সকল প্রবন্ধই পড়া হবে না এবং সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সকল অংশই পড়া হবে না, এই আশ্বাস পাওয়ার পর যা-কিছু পড়া হয়েছিল লোকে কান পেতে শুনেছিল।

ফরিদপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য

সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে ফরিদপুরে উপস্থিত হয়ে প্রদর্শনীর আকার এবং প্রকার দেখে আমরা শুধু আনন্দিতই

ফরিদপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য

ফরিদপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য

হইনি, বিস্মিতও হয়েছিলাম। কলিকাতা হ'তে দূরে একটি মফঃস্বল শহরে এমন একটি প্রদর্শনী আমরা দেখ্‌তে পাব,— যা মাত্র কতকগুলির বিপণির সমাবেশ নয়, যা সত্যই জনশিক্ষার কেন্দ্রস্থল এবং দেশের শ্রমশিল্প এবং চারুশিল্পজাত ঐশ্বর্য্য সম্ভারের পরিচয়ক্ষেত্র,—তা মনে করি নি। প্রদর্শনী এবং সম্মেলন উভয় অনুষ্ঠানেরই আশাতীত সাফল্যের জন্ম আমরা লালমিঞা সাহেবকে আমাদের সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। কত নিদ্রা-হীন রজনীর চিন্তায় এবং নিরবসর দিনের পরিশ্রমে এমন বিরাট একটি ব্যাপার গ'ড়ে তোলা যায় তা প্রত্যক্ষ-দর্শী ভিন্ন কেউ সহজে বুঝ্‌বে না। এখানে একটু কর্ত্তব্যের ক্রটি হয় যদি না এই সঙ্গে লালমিঞা সাহেবের সহকর্ম্মী সুফি মোতাহার হোসেনের উল্লেখ করি। এই সহৃদয় সেবা-পরায়ণ ছেলেটির কর্ম্মতৎপরতা সত্যই আমাদের মুগ্ধ করেছিল।

এই উপলক্ষে ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ এবং ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্রবৃন্দ শরৎচন্দ্রকে মান-পত্র প্রদান ক'রে সম্মানিত করেছিলেন।

নিখিল ভারত কৃষি শিল্প চারুকলা প্রদর্শনী

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়েচে। সন্তোষের রাজা অনারেবল স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী উদ্বোধন ক্রিয়ায় পৌরোহিত্য এবং প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। উদ্বোধন ক্রিয়ার পর প্রদর্শনীটি দেখবার যে-টুকু সময় আমাদের হয়েছিল তাতে মনে হ'ল ইদানীং বহুকাল কলিকাতায় এত বড় প্রদর্শনী হয় নি। স্বদেশজাত দ্রব্যাদির তালিকা এবং প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে যাতে জনসাধারণের জ্ঞান এবং শিক্ষা বর্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েচে বলে মনে হল। প্রদর্শনীর শ্রমশিল্প বিভাগে অনেক বিদেশীয় এবং ভারতীয় কলকারখানা এনে বসানো হয়েচে। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, কলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি নানা বিভাগের ভার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের উপর দেওয়া হয়েচে। বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মল গুহ কর্ত্তৃক গঠিত চিত্রশিল্প বিভাগটির অপূর্ব্ব সম্পদ দেখে আনন্দিত হলাম। পাঠাগার ও পত্রিকা বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈবাল দত্তের সহিত আলোচনা ক'রে বুঝলাম ঐ বিভাগটির দ্বারা পত্রিকা পরিচালন এবং সম্পাদকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হ'তে পারেন—যদি তাঁরা প্রদর্শনী সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেন। আমরা পরে এই প্রদর্শনীর সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত মন্তব্য প্রকাশিত করব, ইতিমধ্যে আমার প্রদর্শনীর সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ক্রটি স্বীকার

গত পৌষ সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত ডাঃ সুশীলচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক লিখিত "শান্তি-সমস্যা ও নিকোলাস্ রোরিক" নামক প্রবন্ধ এবং গত মাঘ সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত "প্রাচ্যের পরিচয়" নামক প্রবন্ধ গত হুগলী জেলার সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত হইয়াছিল, কিন্তু অনবধানতা বশতঃ ঐ দুটি প্রবন্ধের কোনটিতেই ফুট্‌নোটে সে কথার উল্লেখ করা হয় নি। সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কানাইবিহারী মুখোপাধ্যায় সে বিষয়ে অনুযোগ করেছেন। সাহিত্য সভায় পঠিত কোনো প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সে কথার উল্লেখ করা একান্ত কর্ত্তব্য বলে আমরা মনে করি। সুতরাং আমরা এবিষয়ে একসঙ্গে ক্রটি স্বীকার এবং ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বিশ্বকোষের নাম জানেন না এমন শিক্ষিত বাঙালী নেই বললেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী ভাষার পক্ষে Encyclopoedia Brit nnica যেমন অপরিহার্য্য এবং মূল্যবান গ্রন্থ, বাঙলা ভাষার পক্ষে বিশ্বকোষও ঠিক তাই। সন ১৩১৮ সালে ২২ খণ্ডে নগেন্দ্র বাবু বিশ্বকোষের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তারপর সুদীর্ঘ কাল অতি-বাহিত হয়েছে, এবং অবসরে নব নব গবেষণা এবং আবিষ্কারের ফলে জ্ঞানরাজ্যের ভাণ্ডার অভাবনীয় রূপে

সমৃদ্ধিবর্দ্ধিত করেছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালের সম্পূর্ণ উপযোগী করবার উদ্দেশ্যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বহু পরিশ্রমে বহু অর্থব্যয়ে এবং বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় ৩০ ভাগে একটি সংশোধিত পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছেন। আমরা এই সুবৃহৎ গ্রন্থের এতাবৎ-প্রকাশিত যে দুই সংখ্যা পেয়েছি তা দেখে এ কথা অসংশয়ে বলতে পারি যে গ্রন্থখানি বাংলা ভাষার অপরিমেয় কল্যাণ সাধন করবে। ২য় সংস্করণ বিশ্বকোষে প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও তাদের মত ও বিশ্বাস, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবরণ, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জ্যোতিষতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, গণিততত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, ইন্দ্রজাল, পাকবিদ্যা প্রভৃতির সার সংগ্রহ বর্ণমালা-ক্রমে বর্ণিত আছে। নাম লিখিয়ে যাঁরা এ গ্রন্থের গ্রাহক হ'তে চান তাঁরা মূল্যাদির জন্য ৯ নং বিশ্বকোষ লেন বাগবাজার কলিকাতায় বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে পত্র লিখতে পারেন।

লণ্ডনে বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত কিরণকুমার ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, বি-এল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরে এসে আলিপুরে মুন্সেফ নিযুক্ত হয়েছেন। লণ্ডনে ব্যারিষ্টারি পড়তে গিয়ে তিনি সেখানকার L. L. M. উপাধি লাভ করেছেন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই উচ্চ এবং দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হলেন। পরীক্ষায় Constitutional Law বিষয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পূর্ণ নম্বর লাভ করেন। পরীক্ষক মিঃ মরগ্যান কে-সি-র মতে এতাবৎ তিনি যত ছাত্রকে পরীক্ষা করেছেন তন্মধ্যে কিরণকুমারই শ্রেষ্ঠ এবং পরীক্ষাগত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সত্যই প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত কিরণকুমার ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য London Univesity Union, Law Society, Grey's Inn Debating Society, এবং অপরাপর সমিতিতে বাগ্মী ব'লে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। তিনি কলিকাতা স্কটিস্‌ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব কৃতী ছাত্র।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259 Upper Chitpore Road. and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.
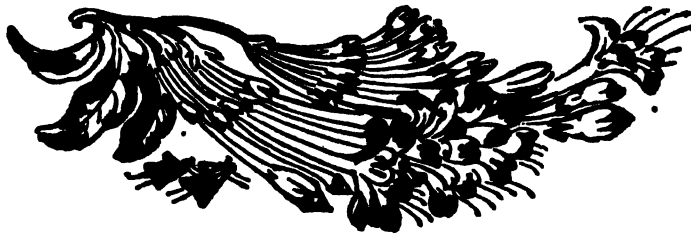
সারে হিল্‌স (Surrey Hills)

(একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস-এর প্রথম বাৎসরিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত)

শিল্পী—Capt. F. C. W. Fosbery
চিত্রাধিকারী মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুরের সৌজন্যে

সপ্তম বর্ষ, ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৪০ | ৩য় সংখ্যা

নন্দলাল বসু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্পিনোজা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁর তত্ত্ববিচারকে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় তবে তাঁর রচনা আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রথম বয়সেই সমাজ তাঁকে নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করেছে কিন্তু কঠিন দুঃখেও সত্যকে তিনি ত্যাগ করেননি। সমস্ত জীবন সামান্য কয় পয়সায় তাঁর দিন চল্‌ত; ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই তাঁকে মোটা অঙ্কের পেন্সন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, সর্ত্ত ছিল এই যে তাঁর একটি বই রাজার নামে উৎসর্গ করতে হবে। স্পিনোজা রাজি হলেন না। তাঁর কোনো বন্ধু মৃত্যুকালে আপন সম্পত্তি তাঁকে উইল করে দেন, সে সম্পত্তি তিনি গ্রহণ না করে দাতার ভাইকে দিয়ে দেন। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, আর তিনি যে মানুষ ছিলেন এ দুটোকে এক কোঠায় মিলিয়ে দেখলে তাঁর সত্য সাধনার যথার্থ স্বরূপটি পাওয়া যায়, বোঝা যায় কেবলমাত্র তার্কিক বুদ্ধি থেকে তার উদ্ভব নয়, তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাব থেকে তার উপলব্ধি ও প্রকাশ।

শিল্পকলায় রসসাহিত্যে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মানুষের রচনার সম্বন্ধ বোধ করি আরো ঘনিষ্ঠ। সব সময়ে তাদের একত্র করে দেখবার সুযোগ পাইনে। যদি পাওয়া যায় তবে তাদের কর্ম্মের অকৃত্রিম সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হোতে পারে। স্বভাব-কবিকে স্বভাবশিল্পীকে কেবল যে আমরা দেখি তাদের লেখায়, তাদের হাতের কাজে তা নয়, দেখা যায় তাদের ব্যবহারে তাদের দিনযাত্রায়, তাদের জীবনের প্রাত্যহিক ভাষায় ও ভঙ্গীতে।

চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর নাম আমাদের দেশের অনেকেরই জানা আছে। নিঃসন্দেহ আপন আপন রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত অভ্যাস অনুসারে তাঁর ছবির বিচার অনেকে অনেক রকম করে থাকেন। এরকম ক্ষেত্রে মতের ঐক্য কখনো সত্য হোতে পারে না, বস্তুত প্রতিকূলতাই

অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠতার প্রমাণরূপে দাঁড়ায়। কিন্তু নিকটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো করে জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি আঁকেন তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে।

নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীনে জাপানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধু এল্‌ম্‌হর্স্ট্। তিনি বলেছিলেন, নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন। তাঁর সেই কথাটি একেবারেই যথার্থ। নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর বিচার-শক্তি অন্তর্দর্শী। একদল লোক আছে আর্ট্‌কে যারা কৃত্রিম শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না পারলে দিশেহারা হয়ে যায়। এই রকম করে দেখা খোঁড়া মানুষের লাঠি ধরে চলার মতো, একটা বাঁধা বাহ্য আদর্শের উপর ভর দিয়ে নজির মিলিয়ে বিচার করা। এই রকমের যাচাই-প্রণালী ম্যুজিয়ম সাজানোর কাজে লাগে। যে জিনিষ মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত পরিচয়কে নিঃশেষে সংগ্রহ করা সহজ, তাই বিশেষ ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। কিন্তু যে আর্ট্ অতীত ইতিহাসের স্মৃতিভাণ্ডারের নিশ্চল পদার্থ নয়, সজীব বর্ত্তমানের সঙ্গে যার নাড়ীর সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে; সে চলছে, সে এগোচ্চে, তার সম্ভূতির শেষ হয় নি, তার সত্তার পাকা দলিলে অন্তিম স্বাক্ষর পড়ে নি। আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্যে শ্রেণীবিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরী করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নন, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ। তাকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেই জন্যই তাঁর সঙ্গ এডুকেশন। যারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছে তাদের আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি,—তাঁর এমন কোনো ছাত্র নেই এ কথা যে না অনুভব করেছে এবং স্বীকার না করে। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজের গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা আপন স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে। ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাহিরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না; সেই শক্তিকে তার নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কৃতকার্য্য হন যে হেতু তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি আছে।

কিছুদিন হোলো, বোম্বায়ে নন্দলাল তাঁর বর্ত্তমান ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী খুলেছিলেন। সকলেই জানেন, সেখানে একটি স্কুল অফ্ আর্টস্ আছে, এবং একথাও বোধ হয় অনেকের জানা আছে সেই স্কুলের অনুবর্ত্তীরা আমাদের এদিককার ছবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কোরে লেখালেখি কোরে আসছেন। তাঁদের নালিশ এই যে, আমাদের শিল্পসৃষ্টিতে আমরা একটা পুরাতন চালের ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছি, সে কেবল সস্তায় চোখ ভোলাবার ফন্দী, বাস্তব সংসারের প্রাণ-বৈচিত্র্য তার মধ্যে নেই। আমরা কাগজে পত্রে কোনো প্রতিবাদ করিনি,—ছবিগুলি দেখানো হোলো। এতদিন যা ব'লে তাঁরা বিদ্রূপ কোরে এসেছেন, প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রমাণ। দেখলেন বিচিত্র ছবি, তাতে বিচিত্র চিত্তের প্রকাশ, বিচিত্র হাতের ছাঁদে, তাতে না আছে সাবেক

কালের নকল না আছে আধুনিকের ; তা ছাড়া কোনো ছবিতেই চলতি বাজার দরের প্রতি লক্ষ্য মাত্র নেই।

যে নদীতে স্রোত অল্প সে জড়ো করে তোলে শৈবালদামের ব্যূহ, তার সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে যারা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা ক'রে তোলে। তাদের কর্ম্মে প্রশংসাযোগ্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে আর বাঁক ফেরে না, এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারি নকল আপনি করতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম্ম থেকে তার নিরন্তর নিজের চুরি চলে।

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমা বন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না আমি তা জানি। আপনার মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি। সর্ব্বত্রই এই বিদ্রোহ সৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত। যথার্থ সৃষ্টি বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্রলয় শক্তি কেবলি তার পথ তৈরি করতে থাকে। সৃষ্টিকার্য্যে জীবনী শক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ। কোনো একটা আড্ডায় পৌঁছে আর চলবেন না, কেবল কেদারায় বসে পা দোলাবেন, তাঁর ভাগ্যলিপিতে তা লেখে না। যদি তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবপর হোতো তাহোলে বাজারে তাঁর পসার জমে উঠত। যারা বাঁধা খরিদদার তাদের বিচারবুদ্ধি অচল শক্তিতে খুঁটিতে বাঁধা। তাদের দর-যাচাই প্রণালী অভ্যস্ত আদর্শ মিলিয়ে। সেই আদর্শের বাইরে নিজের রুচিকে ছাড়া দিতে তারা ভয় পায়, তাদের ভালো লাগার পরিমাণ জনশ্রুতির পরিমাণের অনুসারী। আর্টিস্টের কাজ সম্বন্ধে জন-সাধারণের ভালো লাগার অভ্যাস জমে উঠতে সময় লাগে। একবার জমে উঠলে সেই ধারার অনুবর্ত্তন করলে আর্টিস্টের আপদ থাকে না। কিন্তু যে আত্মবিদ্রোহী শিল্পী আপন তুলির অভ্যাসকে ক্ষণে ক্ষণে ভাঙতে থাকে আর যাই হোক্, হাটে বাজারে তাকে বারে বারে ঠকতে হবে। তা হোক্ বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো তো ভালো নয়। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল সেই নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন, তাতে তাঁর লোকসান যদি হয় তো হোক্। অমুক বই বা অমুক ছবি পর্য্যন্ত লেখক বা শিল্পীর উৎকর্ষের সীমা— বাজারে এমন জনরব মাঝে মাঝে ওঠে, অনেক সময়ে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে লোকের অভ্যস্ত বরাদ্দে বিঘ্ন ঘটেছে। সাধারণের অভ্যাসের বাঁধা জোগানদার হবার লোভ সামলাতে না পারলে সেই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর যাই হোক সেই পাপলোভের আশঙ্কা নন্দলালের একেবারেই নেই। তাঁর লেখনী নিজের অতীত কালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিণী। বিশ্বসৃষ্টির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই, তার অভিসার অন্তহীনের আহ্বানে।

আর্টিসটের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে তাঁর জীবনে। আমরা বারম্বার তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে। প্রথম দেখ্‌তে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা। বিষয়বুদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঙ্ক্ষার দৌড় থাকত, তা হোলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাঁচ্চাদাম-যাচাইয়ের পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিল্প সাধককদের তপস্যার সম্মুখে রজত নূপুরনিক্কণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ থেকে

রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তিবর দেন। সেই মুক্তিলোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই।

তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যের আর একটি লক্ষণ দেখা যায় সে তাঁর অবিচলিত ধৈর্য্য। বন্ধুর মুখের অন্যায় নিন্দাতেও তাঁর প্রসন্নতা ক্ষুণ্ণ হয় নি তার দৃষ্টান্ত দেখেছি। যারা তাঁকে জানে এমনতরো ঘটনায় তারাই দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু তিনি অতি সহজেই ক্ষমা করতে পেরেছেন। এতে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য্য সপ্রমাণ করে। তাঁর মন গরীব নয়। তাঁর সমব্যবসায়ীর কারো প্রতি ঈর্ষ্যার আভাস মাত্র তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায় নি। যাকে যার দেয় সেটা চুকিয়ে দিতে গেলে নিজের যশে কম পড়বার আশঙ্কা কোনোদিন তাঁকে ছোটো হোতে দেয় নি। নিজের সম্বন্ধে ও পরের সম্বন্ধে তিনি সত্য; নিজেকে ঠকান না ও পরকে বঞ্চিত করেন না। এর থেকে দেখতে পেয়েছি নিজের রচনায় যেমন, নিজের স্বভাবেও তিনি তেমনি শিল্পী, ক্ষুদ্রতার ত্রুটি স্বভাবতই কোথাও রাখতে চান না।

শিল্পী ও মানুষকে একত্র জড়িত করে আমি নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বুদ্ধি, হৃদয়, নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এ রকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায়। তাঁর ছাত্র, যারা তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্চে, তারা একথা অনুভব করে এবং তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে প্রত্যহ সংসারের ছোটো বড়ো নানা ব্যাপারে দেখতে পায় তারা তাঁর ঔদার্য্যে ও চিত্তের গভীরতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি জানাবার আকাঙ্ক্ষা আমার এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এ রকম প্রশংসার তিনি কোনো অপেক্ষা করেন না কিন্তু আমার নিজের মনে এর প্রেরণা অনুভব করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকম্প

শ্রীশিশির কুমার মিত্র, ডি-এস্‌সি

[বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক ডক্টর মিত্র খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক। কলিকাতা ইউনিভারসিটি কলেজ অব্‌ সায়েন্স-এ বেতার বিভাগে ইনি মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত এই প্রবন্ধটি বর্ত্তমানকালে সাধারণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডক্টর মিত্র এই প্রবন্ধে ভূমিকম্পের বৈজ্ঞানিক তথ্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিঃ সঃ]

ভূগর্ভে কোথাও একটা প্রচণ্ড ধাক্কার ফলেই যে পৃথিবীপৃষ্ঠে ভূমিকম্প অনুভূত হয় তা একরকম নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ভূমিকম্পের সময় কম্পনের ভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করলে মনে হয় যে ধাক্কার উৎপত্তিস্থল হতে এই কম্পন তরঙ্গের আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ভূতলে যেখানে এই ধাক্কার উৎপত্তি সেই জায়গাকে ভূকম্পের কেন্দ্র (centre বা focus) বলা হয়; আর পৃথিবীপৃষ্ঠে কেন্দ্রের ঠিক উপরের জায়গাকে অপ-কেন্দ্র (epicentre) বলা হয় (৪ নং চিত্র)। ভূমিকম্পের প্রকৃতিভেদে কেন্দ্র মাটীর নীচে এক দেড় মাইল হতে নয় দশ বা বিশ ত্রিশ মাইল পর্য্যন্তও হয়।

পৃথিবীপৃষ্ঠে ভূমিকম্প সব জায়গাতেই সমান ভাবে হয় না। কয়েকটা জায়গা বেশী ভূমিকম্পপ্রবণ। এই জায়গাগুলিকে ভূমিকম্প-বলয় (seismic belt) বলা হয়। এইরূপ দুইটা বলয় জানা আছে। একটা বলয় আল্‌স, ককেশাস্‌, হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর পাদদেশ দিয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠকে পূর্ব্ব পশ্চিমে বেষ্টন করে আছে। আর একটা বলয় ফিলিপাইন, জাপান ও আমেরিকার এ্যাণ্ডিজ পর্ব্বত মালার কাছে কাছে পৃথিবী-পৃষ্ঠকে উত্তর দক্ষিণে বেষ্টন করে আছে।

১নং চিত্র।

ভূপৃষ্ঠে পর্ব্বতশ্রেণী সৃষ্টি প্রকরণ। টেব্‌লের উপর একটা কম্বল পাতা আছে। কম্বলটা যেন পৃথিবী পৃষ্ঠের স্তরাবলী। কম্বলের উপর দুধার হতে চাপ দিলে কম্বলটা কুঁচকিয়ে যায়। পৃথিবীর অভ্যন্তর সঙ্কোচনের ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠে দুধার হতে এ রকম চাপ পড়ে। ফলে পৃথিবী-পৃষ্ঠ কুঁচকিয়ে পর্ব্বত সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীতে যত ভূকম্প হয় তার মধ্যে শতকরা ৫৩টি আল্‌স্‌-ককেশাস-হিমালয়-বলয়ে ও শতকরা ৩৮টি জাপান-এ্যাণ্ডিজ বলয়ের মধ্যে হয়। বাকি ৯টি অন্যান্য জায়গায় হয়।

ভূমিকম্পের প্রকৃতি ভেদ

ভূমিকম্প সাধারণতঃ দুরকমের হয়। প্রথম, আগ্নেয়গিরি-প্রসূত (volcanic)। এই কম্পের কেন্দ্র ভূতলে সাধারণতঃ

এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত ও ইহা আগ্নেয়গিরি সঙ্কুল জায়গাতেই বেশী হয়। আগ্নেয়গিরির মুখ হতে যে সব গলিত দ্রব্য বের হয় সে সব প্রথমে আগ্নেয়গিরির তলদেশে পৃথিবী পৃষ্ঠের স্তরের মধ্যে বা পাহাড়ের ফাটল বা গুহার মধ্যে প্রবেশ করে। সেই সময় গুহা বা ফাটল বিদীর্ণ হয়ে যায় ও তার জন্য মাটী কাঁপতে থাকে। আগ্নেয়গিরি-প্রসূত ভূমিকম্পের বেগ সময় সময় প্রচণ্ড হলেও তার বিস্তৃতি বেশী দূর নয়। গিরি পাদ হতে কয়েক মাইলের মধ্যেই এই ভূমিকম্পের বিস্তৃতি আবদ্ধ।

বরকে আবরণ করে পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে স্তরাবলী (crust) রয়েছে তার উপর চাপ ও টান পড়েছে। এই চাপ ও টানের ফলে যেখানে স্তর কমজোর সেখানে স্তর কুঁচকে গিয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠে এই কোঁচকান জায়গা গুলিই আজকাল পর্ব্বতশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। স্তর কুঁচকে কেমন ভাবে পর্ব্বত হয় তা ১নং চিত্রে দেখান হয়েছে। স্তরের উপর চাপ বা টানের আর একটা ফল হয় যে মাঝে মাঝে স্তর ভেঙ্গে তাতে ফাটল হয়। (২নং চিত্র) ফাটলের এক দিককার স্তর চাপের ফলে হয়ত ধ্বসে পড়ে যায়। স্তরে এইরূপ ফাটলের ইংরাজি নাম fault। রাণীগঞ্জে কয়লার খনির স্তরে এইরূপ বিস্তৃত ফাটল আছে। এক এক জায়গায় এক অংশ প্রায় ৯০০ ফিট ধ্বসে পড়েছে এরূপ দেখা যায়। উপরে পাহাড় সৃষ্টি ও স্তরে ফাটল ধরার কথা যা বল্লাম তা বহু যুগ বহু লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে হতে হচ্ছে ও এখনও এর একেবারে বিরাম হয় নাই। এখনও মাঝে মাঝে পৃথিবীপৃষ্ঠে পর্ব্বতশ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বা বিস্তৃতি লাভ করে ও মাঝে ফাটলের পাশে স্তর ধ্বসে পড়ে। এই স্তর ধ্বসে পড়াই ভূমিকম্পের কারণ বলে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। স্তর ভেঙ্গে পড়ার সময় ভূতলে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। এই ধাক্কা হতে পৃথিবীর কলেবরে যে তরঙ্গ হয় তাই যখন পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় তা আমাদের কাছে ভূকম্প রূপে প্রতীয়মান হয়।

২নং চিত্র।
পৃথিবীর স্তরে ফাটল। চাপের ফলে স্তর ভেঙ্গে গিয়ে এক দিককার স্তর ধ্বসে পড়েছে। কাটা স্তরের একাংশ ধ্বসে পড়াই ভূমিকম্পের প্রত্যক্ষ কারণ।

দ্বিতীয় 'প্রকার ভূমিকম্প—যার ফলে মানুষের ঘর বাড়ী ও আবাসস্থলের এত ক্ষতি হয় তার উৎপত্তি পৃথিবী পৃষ্ঠের (crust) স্তরে. অসামঞ্জস্য হতে (tectonic)। ভূতলে যে ধাক্কা হতে এই কম্পন অনুভূত হয় তা' মাটির অনেক নীচে অবস্থিত। ৪।৫ হতে ৯।১০ মাইল, বা কখনও কখনও আরও বেশী ২০।৩০ মাইল নীচে। এই ধাক্কার উৎপত্তি বা প্রত্যক্ষ কারণ সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ সংক্ষেপে বল্‌ছি।

পৃথিবী পূর্ব্বে গরম ছিল। গরম অবস্থা হ'তে এখন ঠাণ্ডা হয়েছে। এই ঠাণ্ডা হওয়ার দরুণ পৃথিবীর কলেবর হ্রাস পেয়েছে। আর এই হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কলে-

সাধারণের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে পর্ব্বতশ্রেণীর

সঙ্গে ভূকম্পের একটা সম্বন্ধ আছে। এ সংস্কার একেবারে অমূলক নয়। হিমালয়ের পাদদেশে ভূতলে পৃথিবীস্তরে বিস্তৃত দোষের অস্তিত্ব ভূতত্ত্ববিদদের অনেক দিন হতেই জানা আছে। সুতরাং হিমালয়ের পাদদেশে যে ভূকম্প মাঝে মাঝে হয় তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই।
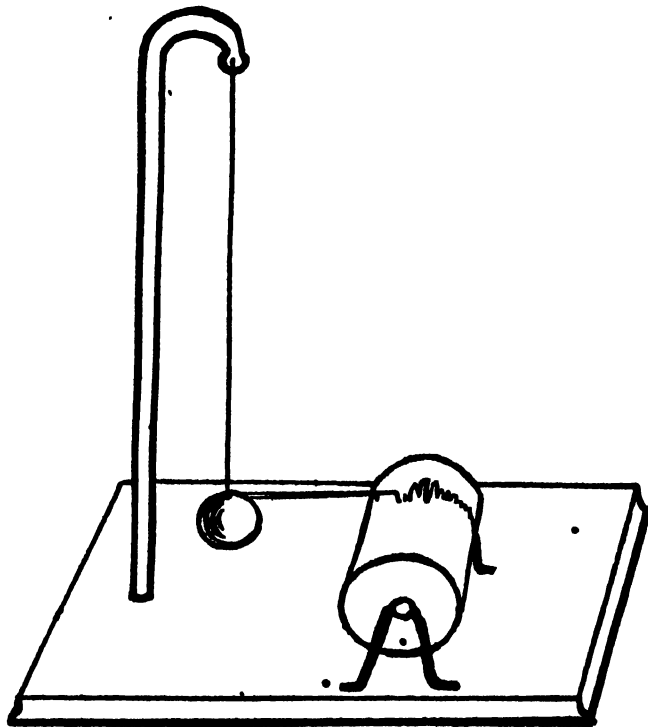
৩নং চিত্র।

ভূকম্প পরিমাপক যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী। যে টেব্‌লের উপর পেণ্ডুলাম ও ড্রাম রয়েছে তা' যেন পৃথিবী পৃষ্ঠ। টেব্‌লটাতে হঠাৎ ঝাঁকানি দিলে দেখা যায় যে পেণ্ডুলামে গোলকটা প্রায় স্থির রয়েছে ও টেব্‌লের ঝাঁকুনির অনুপাতে গোলকে লাগান পেন্সিল ড্রামের উপর রেখা সম্পাত করছে।

ভূমিকম্পের তরঙ্গ

ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে কিছু দূরে যাঁরা ভূমিকম্পের সময় মাটির দোলন লক্ষ্য করেছেন তাঁরা নিশ্চয় দেখেছেন যে কম্পের সময় দোলনটা একটানা একরকম ভাবে আসে না। প্রথমে একবার কম্পন হয়, সেটা থেমে যায়, তার পর আবার একটা কম্পন আসে, সেটাও থেমে গিয়ে কিছু পরে আবার বেশ দোলন সুরু হয়। গত ভূমিকম্পের সময় কলকাতাতেও সবাই এই রকম লক্ষ্য করেছেন। এই রকম থেমে থেমে পর পর কম্পন আসবার প্রথম কারণ কেন্দ্র হতে ঢেউ বিভিন্ন পথে আসে, সব ঢেউ একই সময় পৌছাতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ, ঢেউর প্রকৃতিভেদে তার গতির বেগও কম বেশী হয়। মাটির তলা দিয়ে ঢেউ কোন্ পথে চলে তা ৪ নং চিত্রে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কেন্দ্র থেকে ঢেউ চারি ধারে ছড়িয়ে পড়েছে। ঢেউ চলার পথগুলি লাইন দিয়ে এঁকে দেখান হয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠে চ বিন্দুতে প্রথম ঢেউ যে আসে তা মাটীর তলে পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়ে। এই ঢেউকে প-ঢেউ বলা হয়। প-ঢেউ চলার সময় মাটীর কণাগুলি ঢেউ চলার পথে আনাগোনা করে। বাতাসে শব্দের ঢেউ এই জাতীয়। প-ঢেউর পর মাটীর ভিতর দিয়েই দ্বিতীয় দফা আর একবার কম্পন আসে। এই কম্পনকে স-ঢেউ বলা হয়। স-ঢেউ চলার সময় মাটীর কণাগুলি ঢেউ চলার পথে তির্য্যকভাবে কাঁপতে থাকে। তার পর তৃতীয় দফা সর্ব্বশেষ ল-ঢেউ আসে। এই ঢেউ চলে পৃথিবীর পৃষ্ঠ দিয়ে। ইহার দোলনের পরিমাণ খুব বেশী। অনেক সময় ঘর বাড়ী এই দোলনে ভূমিসাৎ হয়। প-ঢেউ যখন আসে তখন বেশ বোঝা যায় যে মাটির নীচে হতে ধাক্কা আসছে। কেন্দ্রের কাছাকাছি এই ঢেউ-এর ধাক্কার শক্তি এত বেশী হয় যে মাটি ফেটে মাটির ভিতর হতে বালু, জল ইত্যাদি বাহির হয়। স-ঢেউও মাটির তল হতে এসে আঘাত দেয়। এর ফলে মনে হয় যে মাটির উপরে ঘর বাড়ী যেন পাক্ খাচ্ছে। ল-ঢেউএর দোলন মন্থর কিন্তু পরিমাণ বেশী। কেন্দ্র হতে পর্য্যবেক্ষণের স্থল যত দূরে, ঢেউ গুলির পর পর আসার সময়ের পার্থক্য তত

। ৫ নং চিত্রে ২০০০ মাইল দূরে অবস্থিত একটা জায়গার কাঁপুনি দেখান হয়েছে। দুই রকম ঢেউএর পৌঁছবার সময়ের পার্থক্য জানা থাকলে কেন্দ্র কত দূরে তা সহজেই হিসাব করা যায়।

ভূকম্প পরিমাপক যন্ত্র
(Seismograph)

মাটীর কাঁপুনির ভঙ্গী সুক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য ভূকম্পপরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠ

৫নং চিত্র।

ভূগর্ভে ভূমিকম্পের ঢেউ চলার পথ। মাটির তল দিয়ে ঢেউ রেখা-পথে এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে যে ধাক্কা দেয় তা কখন কখন এত প্রচণ্ড হয় যে পৃথিবী পৃষ্ঠ ভেদ করে মাটির ভিতর হতে বালু, কাদা ও জলরাশি বের হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠের কোনও জায়গা—যেমন চ-তে তিনরকম ঢেউ প, স, ল পর পর এসে পৌঁছায়।

যে ভঙ্গীতে কাঁপে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে কাগজে সঠিক ভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়।

গোড়ায় হয়ত মনে হতে পারে ভূমিকম্পের দোলনের সময় পৃথিবীপৃষ্ঠ কম্পপরিমাপক যন্ত্র সমেত একসঙ্গে কাঁপতে থাকবে—তা'হলে কাঁপুনিটা ধরা পড়বে কিসে? এমন একটা জিনিষ চাই যা ভূমিকম্পের সময় কাঁপবে না—তা'হলেই সেই স্থির জিনিষের সঙ্গে তুলনা করে কাঁপুনির পরিমাণ মাপা সম্ভব হবে। মাটী দোল খাবে অথচ তার উপরের অবস্থিত জিনিষ দোল খাবে না এমন জিনিষ তৈয়ার অসম্ভব নয়। ৩নং চিত্রে এই ধরণের জিনিষের সাহায্যে ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। একটা টেবলের উপর একটা দোলক (পেণ্ডুলাম) রয়েছে। দোলকের গোলা থেকে একটা পেন্সিল একটা ড্রামের উপর গিয়েছে। ড্রামে কাগজ জড়ান আছে। ঘড়িকলের ও স্ক্রুর সাহায্যে ড্রামটা পাক খাচ্ছে ও আস্তে আস্তে সেই সঙ্গে পাশে সরে যাচ্ছে। এখন যদি এই দোলক ও ড্রাম সুদ্ধ টেবিলটাকে একটু ঝাঁকানি দেওয়া যায় তা'হলে দেখা যাবে যে পেণ্ডুলামটা প্রায় স্থির থাকবে ও ঝাঁকানির দরুণ ঠিক ঝাঁকানির অনুপাতে ড্রামে জড়ান কাগজের উপর রেখাপাত হবে। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হতে হলে ঝাঁকানিটা এত তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার যে তার সময়টা পেণ্ডুলামের দোলবার সময়ের চাইতে যেন অনেক কম হয়। অর্থাৎ আমি যদি ২ সেকেণ্ডে একটা ঝাঁকানি দিই তা'হলে পেণ্ডুলামটার একটা পূর্ণ দোল খাওয়ার সময় অন্ততঃ বিশ সেকেণ্ড হওয়া উচিত। এর কম হলে পেণ্ডুলামটাও ঝাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে অল্প বিস্তর দোল খাবে। হিসাবে দেখা যায় যে ভূকম্পের দোলের অনুপাতে পেণ্ডুলামের দোল খাওয়ার সময় বেশী কর্ত্তে গেলে পেণ্ডুলামের সূতাকে খুব বেশী রকম লম্বা করতে হয়—প্রায় হাজার ফিট। এত লম্বা পেণ্ডুলাম তৈয়ার করা সম্ভব নয় বলে অন্য ধরণের পেণ্ডুলাম ব্যবহার করা হয়। এর লম্বা সামান্যই—কিন্তু দোল

খাওয়ার সময় খুব বেশী। ভূকম্পপরিমাপক যন্ত্রে আরও অনেক খুঁটি-নাটি বিষয় আছে যা এখানে বলা সম্ভবপর নহে। এখানে শুধু যন্ত্রটি কি প্রণালীতে কাজ করে তাই বোঝান গেল।

ভূমিকম্পের আদি কারণ

ভূমিকম্পের আদি কারণ জানতে হলে দূর অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। আগে ভূতত্ত্ববিদেরা মনে করতেন যে পৃথিবী অতীতে একসময় খুব গরম ছিল তারপর ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আধুনিক অবস্থায় এসেছে ও পৃথিবী পৃষ্ঠে জীব ও উদ্ভিদ জগত সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে পৃথিবী ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হবে ও তার

৫নং চিত্র।

ভূকম্প পরিমাপক যন্ত্রে অঙ্কিত কম্পনের ছবি। প, স, ও ল-ঢেউ পর পর এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন রকমের ঢেউ কতটা সময় পরে পরে এসে পৌঁছালে তা দেখে ভূমিকম্পের কেন্দ্র কত দূরে হিসাব করে বের করা হয়। ছবিতে প্রায় ২০০০ মাইল দূর হতে ভূমিকম্পের ঢেউ আসার দরুণ যন্ত্রের রেখাপাত দেখান হয়েছে।

উত্তাপ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবজগৎও লুপ্ত হয়ে যাবে। গরম, ও গরম হতে ঠাণ্ডা ও জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র একবার হবে— ও এর সময় হয়ত কয়েক লক্ষ বৎসর। এক কথায় পৃথিবী ধীরে ধীরে মরণের মুখে চলেছে। কিন্তু এখন ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের এ অনুমান পরিবর্তিত হয়েছে। এখন তাঁরা মনে করেন যে এই সৃষ্টি; স্থিতি ও লয় একবার নয় পৃথিবীতে ইতিপূর্ব্বে বহুবার হয়েছে ও ভবিষ্যতে বহুবার হবে। এক একবার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সময় প্রায় এক কোটী, দেড় কোটী বৎসর। এইরূপ ভাঙা গড়ার কারণ পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূগর্ভে তাপ সঞ্চয়। ভূতলে প্রায় ১০০ মাইল নীচে হতে গোটা পৃথিবীর অভ্যন্তর যে প্রস্তরজাতীয় পদার্থ বা শিলাতে (Magma) পূর্ণ তাতেই পৃথিবীর জীবনীশক্তি নিহিত আছে। এই শিলার রেডিওএ্যাক্টিভ শক্তি আছে। রেডিও-এ্যাকটিভ বস্তুর একটা গুণ এই যে তা হতে অনবরত তাপ বিকীরণ হয়। এই কারণে যদিও পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে আকাশে তাপের অপচয় হয়ে পৃথিবী শীতল হচ্ছে তবুও পৃথিবীর অভ্যন্তরে এই রেডিওএ্যাকটিভিটির গুণে অনবরত তাপ সঞ্চয় হচ্ছে। এই তাপসঞ্চয় বেশী হয় পৃথিবী পৃষ্ঠের ভূভাগে মহাদেশের তলে, কারণ সেখান হতে তাপের অপচয় খুব কম হয়। মহাসাগরের তলদেশে তাপসঞ্চয় কম হয় কারণ সাগরের জলরাশি সাগরতল হতে তাপ গ্রহণ কর্ত্তে পারে। এইরূপে বহু লক্ষ বৎসরের তাপ সঞ্চয়ের ফলে মহাদেশের নীচে শিলারাশি দ্রবীভূত হতে সুরু করে। দ্রব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রলয় আরম্ভ হয়, পৃথিবীপৃষ্ঠের চেহারা বদলাতে সুরু করে। সম্প্রসারণ শক্তির ফলে দ্রবীভূত শিলারাশি পৃথিবীপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে বাহিরে এসে পড়ে। দ্রব শিলাতে চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাটা হয়। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ দ্রব শিলার উপর দিয়ে পূর্ব্ব হতে পশ্চিম মুখে সরতে সুরু করে। যেখানে মহাদেশ ছিল সেখানে সাগর হয় যেখানে সাগর ছিল সেখানে মহাদেশ হয়। এই স্থানচ্যুতির ফলে গলিত শিলার উপর মহাসাগর আসে ও তাপক্ষয় বন্ধ হয় ও শিলারাশি আবার দৃঢ়ীভূত ও সঙ্কুচিত হয়। শিলারাশির সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীপৃষ্ঠের স্তরাবলী কুঞ্চিত হয়ে পর্ব্বতশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠ শত লক্ষাধিক বৎসরের জন্য তূষ্ণীভাব অবলম্বন করে। কাল-ক্রমে মহাদেশের তলে আবার তাপ সঞ্চয় হয় আবার

অভ্যন্তরস্থিত শিলা দ্রবীভূত হয় ও আবার প্রলয় সুরু। এইরকম এক একটা প্রলয় দুই কোটি আড়াই কোটি বৎসরে হয়। যখন ভূতলে খুব বেশী গভীর দেশেও শিলা তরলীভূত হয় তখন মহাপ্রলয় হয়। এক একটা মহাপ্রলয় প্রায় দশ বিশকোটী বৎসর বাদে-বাদে হয়।

আধুনিক মতে ভূমিকম্পের আদি কারণ তা'হলে এইরূপ দাঁড়ায়। শত লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে শেষ প্রলয়ের সময় ভূতলের শিলাময় অন্তঃস্থল (Magma) দ্রবীভূত হওয়ার ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠে যে মুহুর্মুহু ভূকম্পন সুরু হয়েছিল তার এখনও সম্পূর্ণ বিরাম হয় নাই। কালক্রমে দ্রব শিলারাশি দৃঢ়ীভূত হওয়াতে যদিচ সে কম্পনে তীব্রতা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, তবুও সেই কোটি বৎসর আগেকার প্রলয় নাচনের ক্ষীণতম রেশ পৃথিবীপৃষ্ঠের অধিবাসী আমরা এখনও মাঝে মাঝে ভূমিকম্পরূপে অনুভব করি।

শিশিরকুমার মিত্র

কল্পনা

শ্রীমমতা মিত্র

মন্দ ভাল নানা লোকের সাথে
নানান্ কাজে কাটে আমার দিন,
চিত্ত যখন মগ্ন বেদনাতে
ওষ্ঠে ফোটাই হাস্য রেখা ক্ষীণ।
গভীর রাতে একলা আঁধার ঘরে
ভাবনা তোমার হৃদয় আমার ভরে।

নিবিড় কালো নয়ন তারা দুটি
রয় গো চেয়ে যেন আমার পানে,
মনের ভাব ভাষায় উঠে ফুটি
ঝরিয়া পড়ে যুগল মোর কাণে।
তখন আমার শান্ত নীরব হিয়া
আবেগ ভরে উঠে গো উচ্ছসিয়া।

দেখি যে আমি তোমার দুটি হাত
খুঁজিয়া ফেরে আমার তনুখানি,
মুদিয়া ফেলি সরমে আঁখিপাত
বলিতে গিয়ে পাই নে খুঁজে বাণী।
অতল গভীর একটি নীরবতা
ডুবিয়ে দেয় সকল প্রাণের কথা।

"উইলো-উদ্যান প্রান্তে"—

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন করচৌধুরী, এম-এ,

(W. B. Yeats-এর Down by the Salley Gardens কবিতার অনুবাদ)

উইলো-উদ্যান প্রান্তে দেখা হোলো তোমায় আমার,
তুমি যেতেছিলে ধীরে, শুভ্রতনু, ললিত লীলায়।
কহিলে আমারে "সখা, নিও প্রেমে সহজ অন্তরে;
কেমনে ফুটিছে দেখ কিশলয় শাখাবৃন্ত'পরে!"
সেদিন অবোধ মন, মত্ত আশা, নবীন নয়ন,
শুনিনি তোমার কথা,—স্বপ্ন শুধু করেছি চয়ন।

দাঁড়াইনু দুজনায় নদীপারে উদাস প্রান্তরে,
তুষার-সুন্দর তব বাহুর্ বাঁধনে বাঁধি মোরে
কহিলে "দেখিয়ো প্রিয় জীবনেরে সহজ করিয়া,—
প্রাণের আবেগে শুধু নবতৃণ উঠে মঞ্জরিয়া।"
সেদিন নবীন প্রাণ, দীপ্ত আশা, বুঝিনি তোমায়,
আজি হিয়াপরে দেখি অশ্রুরাশি জমেছে হিয়ায়।

অভিজ্ঞান

[গত কার্ত্তিক সংখ্যার পর]

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৫

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের গালুডি ষ্টেশনের মাইল দশেক দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বৃহৎ শালবনের প্রান্তদেশে তিরোবিরা নামে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম আছে। গ্রামের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর অধিবাসীর মধ্যে ঘর পাঁচেক মুসলমান ও দুই ঘর হিন্দু গোয়ালা ভিন্ন বাকি সমস্তই কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতি। চক্রধরপুরের বনে লাক্ষা সংগ্রহ এবং সিংভূমের অভ্র ও লোহার খনিতে কুলিগিরি ছাড়া অর্থোপার্জ্জনের জন্যে এরা মাঝে মাঝে যে দু-চার রকমের উপায়ান্তর অবলম্বন ক'রে থাকে তার একটি নমুনা পীরনগর থেকে ঝাড়গ্রামের পথে সন্ধ্যা-হরণের দিন দেখা গেছে। অবশ্য সে ব্যাপারে পীরনগর অঞ্চলের বীরগণই প্রধান উদ্যোক্তা; কিন্তু পুলিশের দুরতিক্রম অন্বেষণ থেকে মাল এবং মানুষকে নিরাপদে রাখবার জন্যে সুদূরবাসী সহধর্ম্মীদের সহযোগিতার প্রয়োজনও তাদের কম নয়। সুতরাং সেদিনকার ডাকাতির দলপতি রঘু গয়লা পীরনগরের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী হ'লেও প্রায় মাসাবধিকাল সন্ধ্যা পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী তিরোবিরা গ্রামের একটি গৃহে অবরুদ্ধ আছে। রঘু বেয়ারারূপী এই রঘু গয়লাই ডাকাতির দিনে ঝাড়গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে জহরলালকে ডাকাতির সন্ধান দিয়েছিল, এবং প্রভুভক্ত ভৃত্যের অবয়ব ধারণ করে পুলিশকে সেদিন সমস্ত রাত এবং পরদিন বৈকাল পর্য্যন্ত অবিরত ভুল পথে প্রবর্ত্তিত ক'রে পরিশ্রান্ত ক'রে মেরেছিল।

তিরোবিরা গ্রামে যাদের গৃহে সন্ধ্যা বাস করছে তারা দু ভাই, গফুর ও মহবুব। ডাকাতির দিনে এরা দুজনেই দলে ছিল, এবং তিন দিন শুধু রাত্রিকালে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে বন বাদাড়, পর্ব্বত প্রান্তর অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যাকে তিরোবিরায় নিয়ে আসে। পুলিশের সন্দেহে যাতে না পড়ে সেজন্য রঘু সঙ্গে আসেনি, কিন্তু সন্ধ্যার দেহে যে সকল অলঙ্কার ছিল তার তালিকা এবং ওজন প্রস্তুত করাবার জন্য তার ভগ্নীপতি নিতাইকে দলের সঙ্গে পাঠিয়েছিল।

ঘটনার দিন সকালবেলা যখন রঘু নিতাইকে তার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয়ে গোপনে উপদেশ দিচ্ছিল তখন কৌতূহলী হয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা করেছিল, "ভাগ বাঁটুয়ার কিছু ঠিক হয়েছে রঘু?"

রঘু বলেছিল, "সে কথা আগে ঠিক না হ'লে, পরে কি আর হয় রে? পরে ঝগড়াই হয়। ঠিক হয়েচে।"

"কি ঠিক হয়েচে?"

"ঠিক হয়েচে আধা-আধি। আধা গহনা তারা পাবে, আধা পাব আমি।"

একটু নীরবে থেকে কি একটা কথা মনে মনে ভেবে নিতাই বলেছিল, "আর যারা খাটবে তাদের মেহনত-আনা কি দেবে তাও ঠিক হয়েচে নাকি?"

"তা-ও হয়েচে। গফুরদের এলাকার লোকেরা গফুরদের হিস্‌সা থেকে দু-আনা পাবে, আমিও আমার এলাকার লোকদের মধ্যে আমার হিস্‌সা থেকে দু-আনা বেঁটে দোবো।"

"আর মেয়েটার ভাগ কি রকম হবে রঘু?"

"মেয়েটার আবার ভাগাভাগি কি হবে?" সে আমার ভাগে থাকবে।"

"তোমার ভাগে থাকবে? কোথায় রাখবে তাকে? বাড়ীতে রাখলে ত পুলিশের হাতে ধরা পড়বে।"

নিতাইয়ের কথা শুনে রঘু হেসে উত্তর দিয়েছিল, সে

কি বাড়ির বউ যে বাড়িতে রাখ্‌ব? কিছুদিন বনে-বাদাড়ে আমার সঙ্গে থাক্‌বে, তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কলকাতায় বাগানবাড়িতে চড়া দামে বড় লোকের হাতে বেচে দোবো।"

"গফুরদের বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে আস্‌বে কবে?"

"মাস দুই ত' নয়। পুলিশের হল্লাস জুড়িয়ে গেলে তারপর তাকে বালুডির পাহাড়ে নিয়ে যাব। সেখানে পুলিশ ত' পুলিশ, চন্দোর-সুয্যি সেঁদোবার উপায় নেই।"

তিরোবিয়ায় পৌঁছে সন্ধ্যার অলঙ্কারের ফিরিস্তি এবং ওজন ক'রে নিয়ে পরদিন রাত্রেই নিতাই গ্রামে ফিরল। গালুডি হয়ে ট্রেনে ফিরে যাবারই তার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রেলে ষ্টেশনে ষ্টেশনে পুলিসের নজর থাক্‌তে পারে সেই আশঙ্কায় গফুর তাকে ট্রেনে যেতে না দিয়ে বনপথেই ফেরৎ পাঠালে,—সঙ্গে দিলে মহবুবকে অজানা পথের প্রান্ত পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবার জন্যে।

যে কয়েক দিন নিতাই সঙ্গে ছিল, মাত্র শাসনে রাখবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তার বেশি উৎপীড়ন সন্ধ্যার প্রতি কেউ করেনি। কিন্তু নিতাই চলে যাওয়ার পর মহবুবের দিক থেকে নির্য্যাতনের মাত্রা অল্প অল্প দিনে দিনে বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে কিছুকাল পরে যেদিন সে গভীর রাত্রে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার ঘরের দ্বার জবরদস্তি ক'রে খুলিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে অর্গল লাগিয়ে দিলে সেদিন গফুরেরও অসহ্য হ'ল। দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত ক'রে সে মহবুবকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল।

পাশের একটা ছোট জানলার পাল্লা ঈষৎ উন্মুক্ত ক'রে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে মহবুব বললে, "হল্লা করছিস্ কেন?"

গফুর বল্‌লে, "আমার কথা শোন্,—দোর খুলে বেরিয়ে আয়।"

গফুরের কথা শুনে মহবুব উচ্চ স্বরে হেসে উঠ্‌ল,—সে হাসি আর কিছুতেই থাম্‌তে চায় না। গফুর তার বড় ভাই, কিন্তু তখনকার মত সে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য ক'রে একটা বিকট সম্বোধন প্রয়োগ ক'রে সে একটা কুৎসিৎ রসিকতা করলে। তারপর জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সহসা একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল। সম্ভবতঃ সন্ধ্যার মনে সন্ত্রাস জাগিয়ে তোলবার অভিপ্রায়ে।

মহবুবের উদ্দেশ্যে একটা গালি বর্ষণ ক'রে গফুর গৃহাঙ্গণে তার পরিত্যক্ত খাটিয়ায় এসে শুয়ে পড়ল,—কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসে না। বর্ষণহীন মেঘময় শ্রাবণ দিনের ভাপ্‌সা গরম, তার উপর সন্ধ্যার ঘরে থেকে-থেকে চাপা কণ্ঠের আর্ত্তনাদ। কিছুক্ষণ শয্যায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রে মহবুবের উদ্দেশ্যে আবার একটা গালি পেড়ে গফুর খাটিয়াটা একটু দূরে নিয়ে গিয়ে শয়ন করল।

সকালে মহবুব যখন সন্ধ্যার ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখনো তার দুই চক্ষু রক্তাভ; খোঁয়াড়ির ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্ব অবস্থা, অপচীয়মান নেশার মৃদু আবেশে মন তখনো ঈষৎ প্রদীপ্ত।

গফুর মহবুবের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে, "কাজটা ভাল করছিস্ নে মহবুব।"

পিছন ফিরে থম্‌কে দাঁড়িয়ে মহবুব বল্‌লে, "কি মন্দ করছি শুনি?"

"সেটা তুই বুঝতে পারছিস্ নে?"

সজোরে মাথা নেড়ে মহবুব বল্‌লে, "না"।

গফুর বল্‌লে, "দেখ্ মহবুব, ইমান্ শুধু ভালো লোকের জন্যেই নয়, চোর ডাকাতকেও ইমান বাঁচিয়ে চল্‌তে হয় নইলে তাদের নিজেদেরই সর্ব্বনাশ। চোর ডাকাতেরা যদি নিজেদের মধ্যে ইমান্ রেখে না চল্‌ত তা হ'লে তাদের আর ক'রে খেতে হ'ত না, সকলকেই জেলখানায় ঘানি টান্‌তে হোত।

মহবুব অধীরভাবে তর্জ্জন ক'রে উঠে বল্‌লে, "বেশ, তাই যেন হোল, কিন্তু বেইমানিটা কি করলাম তাই খুলে বল্ না?"

বেইমানি নয়? এ কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম এই সর্ত্তে যে, মেয়েটা পড়বে শুধু রঘু গয়লার ভাগে। আর তুই কি ক'রে তার ওপর এ রকম জুলুম করছিস্?"

"জুলুম করছি, না, তার ভাল করছি? আমি ত' তাকে সাদী ক'রে জোরু বানাবো, কিন্তু রঘু কি করবে জানিস? তাকে কলকাতার বাজারে বিক্রী ক'রে পয়সা করবে। জুলুম ত' সে-ই করবে।"

"এ তুই কি ক'রে জান্‌লি?"

মহবুব বললে, "যাবার পথে নিতাই আমাকে ব'লে গিয়েছে। তা ছাড়া, দোস্‌রা আর কি হ'তে পারে বলত গফুর? মেয়েটার জাত আছে, না ইজ্জৎ আছে, না আর কিছু আছে যে, হিঁদুর ঘরে তার ঠাঁই হবে? এ কি মুসলিমের ঘরের কথা যে জাত মান্‌তে যেমন জানে, জাত দিতেও তেম্‌নি জানে?"

মহবুবের এ যুক্তি গফুরকে একটু দমিয়ে দিলে। এ কথা সত্যই অস্বীকার করা চলে না যে, যে-ব্যাপার ঘটে গেল তারপর শ্বশুর গৃহে অথবা পিতৃগৃহে সন্ধ্যার স্থান হওয়া কঠিন হবে। মনে মনে একটু-কি সে চিন্তা করলে, তারপর বললে, "আচ্ছা, রঘু এখানে এলে তখন যা হয় করা যাবে, কিন্তু সে যতদিন না আস্‌ছে সবুর ক'রে থাক্‌।"

মাথা নাড়া দিয়ে মহবুব বললে, কেন সবুর করতে যাব? রঘুর সঙ্গে এ কথার কি আছে যে, সে আসা পর্য্যন্ত সবুর করে থাকতে হবে! এ আমি ব'লে রাখ্‌ছি গফুর, এ মেয়ে আমার চাই-ই,—সে জন্যে যদি আমার জান্‌ দিতে হয় সোভি আচ্ছা!" ব'লে সদর্পে বড় বড় পা ফেলে সে প্রস্থান করলে।

সমস্ত দিনের কাজ সেরে মহবুব যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত্রি প্রায় আটটা। আট নয় মাইল দূরে জেয়োবার বনে সে গিয়েছিল লাক্ষা সংগ্রহের কাজে।

গফুর আজ কাজে যায়নি, সমস্ত দিনই বাড়ি আছে। এখন সে তার খাটিয়ায় শুয়ে আকাশ পাতাল অনেক কথাই মনে মনে চিন্তা করছিল। মনটা তার কিছু দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না, বিশেষতঃ গত রাত্রি থেকে একেবারেই না। বয়স তার চল্লিশ উত্তীর্ণ, মাথার বাঁ দিকে জুল্‌ফির উপরে একগোছা চুল সাদা হয়ে এসেছে, কিন্তু দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে শক্তি এবং সামর্থ্যের কোন হ্রাস হয়েচে ব'লে মনে হয় না, যৌবন তার সমস্ত সম্পদ প্রৌঢ়ত্বকে সমর্পণ করে দিয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা নূতন অজানা হাওয়া প্রবেশ করেছে যে, মন এখন স্থির হয়ে দাঁড়ায়, চিন্তা করে, এমন কি সময়ে সময়ে যেন বিগত জীবনের গতিধারাকে প্রতিবাদ করবারও উপক্রম করে। বিবাহ সে পর পর দুবার করেছিল, কিন্তু দুটি স্ত্রীই তাকে দাম্পত্য-জীবনের সুখ বেশি দিন ভোগ করতে দেয় নি, এমন কি ইহলোক পরিত্যাগ ক'রে পরলোকে প্রস্থানের পূর্ব্বে উক্ত দাম্পত্য-জীবনের কর্ত্তব্য মোচন স্বরূপ একটি সন্তানও স্বামীকে উপহার দিয়ে যায় নি। মানুষের ভাগ্য-লিপিতে পুত্রকলত্রের যেখানে স্থান, সেখানে গফুরের অশুভ গ্রহের দৃষ্টি। জীবনের প্রেরণাই বল আর তাড়নাই বল, কোনো খোঁটাতেই কোথাও সে বাঁধা ছিল না, কিন্তু তবুও একান্ত নিষ্ঠার সহিত সমস্ত সদসদ্‌ কার্য্য বরাবর ক'রে এসেছে। এখন সময়ে সময়ে মনে হয়, আর কেন!

মহবুব গফুরের চেয়ে বছর দশেকের ছোট। তার স্ত্রী কিছুদিন থেকে পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয়ে বাস করছে। মহবুবের দেহ এবং মন দুই-ই কঠিন। কার্য্য বিষয়ে সে ঘোরতর সাম্যবাদী, অর্থাৎ কার্য্যের মধ্যে শ্রেয় হেয় এমন কোনো শ্রেণীবিভাগ আছে ব'লে সে একেবারেই মনে করে না। তার মতে এমন কোনো কাজ নেই যার সংস্পর্শে মানুষ দেহে-মনে অশুচি হ'তে পারে। তবে একমাত্র সেই সকল কাজ আভিজাত্যের দাবী করতে পারে যেগুলি সমাধা করবার জন্য অত্যধিক মাত্রায় শক্তি এবং সাহসের প্রয়োজন হয়। কাজের মধ্যে জাত ব'লে যদি কিছু মান্‌তে হয় তা হ'লে মানুষের জীবন নেওয়া সকলের চেয়ে বড় জাতের কাজ, কারণ সে বিষয়ে কোনো রকম ত্রুটি ঘটলে নিজের জীবনও দিতে হতে পারে।

মহবুব গিয়েছিল পুকুরে মুখ-হাত-পা-ধুতে। সেই অবসরে গফুর তার শয্যা পরিত্যাগ ক'রে সন্ধ্যার ঘরের সামনে এসে দরজাটা একটু খুলে ধীরে ধীরে ডাকলে, "হামিদা।"

সন্ধ্যা তার নিজের নাম গফুরদের কাছে প্রকাশ করতে স্বীকৃত না হওয়ায় বেশি পীড়াপীড়ি না ক'রে গফুর বলেছিল, "আমি তোমার নাম দিলাম হামিদা। যতদিন আমাদের বাড়ী থাকবে আমরা তোমাকে হামিদা বলে ডাকব,—সাড়া দিয়ো।" কোনোবারেই সন্ধ্যা সে নামে সাড়া দেয় নি—এবারও দিল না।

গফুর বললে, "হামিদা, মহবুব বাড়ি এসেছে। জান

তো ওর অসাধ্য কোনো কাজই নেই। উঠে এসে কিছু খাও।”

ঘরের মেঝেতে সন্ধ্যা উপুড় হ'য়ে প'ড়ে ছিল, মাথা নেড়ে বললে, “না।”

“কিন্তু মহবুব ত' সহজে ছাড়বে না, সে একটা অনর্থ বাধিয়ে বস্‌বে।”

এ কথার সন্ধ্যা কোন উত্তর দিল না,—যেমন প'ড়ে ছিল তেমনিই প'ড়ে রইল। গফুর অনেকক্ষণ পীড়াপীড়ি করলে কিন্তু কোন ফল হ'ল না। অবশেষে পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে মহবুব সেখানে এসেই পড়ল। গফুরকে সন্ধ্যার ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, “কি হয়েছে ?”

গফুর বললে, “হামিদা সমস্তদিন কিছু খায় নি,—এমন কি জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করে নি। তাকে খাবার জন্যে বলছিলাম।”

“জোর ক'রে খাওয়াস নি কেন ?”

গফুর একটু হেসে বললে, “জোর ক'রে একটা এক বছরের বাচ্চাকে খাওয়ান যায় না, আর সতেরো আঠোরো বছরের একটা সমর্থ মেয়েকে জোর ক'রে খাওয়াবি ?”

“কেমন খাওয়ান যায় না আমি একবার দেখছি !” ব'লে বিকট স্বরে একটা হুঙ্কার দিয়ে মহবুব ছুটে তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে, তারপর প্রকাণ্ড একটা চক্‌চকে ছোরা নিয়ে সন্ধ্যার ঘরে দ্রুতবেগে প্রবেশ ক'রে পদাঘাতে তাকে চিৎ ক'রে দিয়ে ছোরাটা একেবারে বুকের উপরে ধ'রে বললে, শীগ্‌গির উঠে আয়, নইলে সমস্ত ছোরাটা তোর বুকের মধ্যে সেঁদিয়ে দোব !”

সন্ধ্যার সমস্ত শরীরের মধ্যে কোথাও একটু মৃদু স্পন্দন পর্য্যন্ত দেখা গেল না,—মহবুবের মুখে দৃষ্টিপাত ক'রে স্থির অবিচলিত কণ্ঠে সে বললে, “তাই দাও।”

গফুর দৌড়ে এসে মহবুবের হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে টেনে বাইরে একটু দূরে নিয়ে এসে বললে, “তুই কি পাগল হলি মহবুব ! যে মরবার জন্যে একেবারে পুরোপুরি তৈরী হয়েচে তাকে তুই ছোরা দিয়ে ভয় দেখাতে যাস ?—তোর এতখানা বয়স হোল, মরিয়া লোক কখনো চোখে দেখিস নি ? ও যে মরবার জন্যে মরিয়া হয়েচে রে !”

“তা' ব'লে না খেয়ে মরবে ?”

“তাই ব'লে ছোরা মেরে মারবি ?”

মারবে যে কত সে বুঝ্‌তে আর বাকি নেই ! ধপ্‌ ক'রে মহবুব ভূমির উপর ব'সে পড়ল। তার শরীরের সমস্ত স্নায়ু এবং পেশীগুলো অকস্মাৎ যেন ঢিলা হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে থাকবার মতও ক্ষমতা তার ছিল না। মানুষ যখন সহসা তার শক্তির সীমান্তে উপস্থিত হয়ে দেখে যে, সেইখানেই শেষ, আর এক ইঞ্চিও বাড়বার উপায় নেই, তখন তার এম্‌নি অবস্থাই হয়। ভয় দেখিয়ে যখন ভয় পাওয়ানো যায় না তখন সে নিজেই ভয় পেয়ে যায়। সেই জন্য বুদ্ধিমানেরা শেষ অস্ত্র সহজে ছাড়তে চায় না।

সন্ধ্যার উপর মহবুবের ক্রোধ আবার জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু সে ক্রোধের প্রকাশ যে কি ভাবে করবে তা ভেবে পেলে না। বুকের উপর ছোরা বসানো ব্যর্থ হ'লে মাথার উপর লাঠি ঘুরিয়েও লাভ নেই। সে গফুরের দিকে বিহ্বলভাবে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, “তা হ'লে যা হয় একটা উপায় কর্‌।”

“করছি তুই একটু আড়ালে যা।” ব'লে গফুর সন্ধ্যার ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

কিন্তু উপায় ত' সেদিন হ'লই না—অধিকন্তু তার পর দু'দিনেও হ'ল না। অথচ অবস্থা এরকম হয়ে এল যে, মৃত্যু যেন আসন্ন। হাত পা শীতল, চক্ষু মুদিত, নিঃশ্বাস এত ক্ষীণ যে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ না করলে বোঝাই যায় না যে পড়ছে, না বন্ধ হয়েচে। আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, উপরোধ, ভয়প্রদর্শন, বলপ্রকাশ সবই ব্যর্থ হয়েচে। কোনো ঔষধেই কিছুমাত্র ফল পাওয়া যায় নি। এখন একমাত্র উপায় হচ্চে পুলিশে খবর দেওয়া,—কিন্তু সে ত একরকম গর্দ্দান দেওয়ারই সামিল !

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর দুই ভাইয়ে ব'সে চিন্তায় আকুল হয়ে উঠেছে, এমন সময়ে হাঁস্‌তে হাস্‌তে প্রবেশ করলে বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবতী এবং তার পিছনে পিছনে একটী যুবক।

যুবতীকে দেখে গফুরের মুখ উজ্জল হয়ে উঠ্ল,—বল্লে "আমিনা, এলি না কি রে?—আয় বোন, আয়!"

মহবুবের মুখ কিন্তু কঠিন হয়ে উঠ্ল,—বল্লে, "খবর-টবর না দিয়ে হঠাৎ এ-রকম এসে পড়লি যে?" কথায় অপ্রসন্নতার সুর।

আমিনা হাস্তে হাস্তে বল্লে, "বা রে, বাপের বাড়ী আসব, ভাইয়ের বাড়ি আসব তা আবার খত লিখে খবর পাঠিয়ে আস্তে হবে না-কি?"

গফুর বল্লে, "না না বেশ করেছিস এসেছিস্। আমরা ভারি একটা ফ্যাসাদে পড়েছি—দেখি তুই যদি কোনো উপায় করতে পারিস।"

চিন্তিত-মুখে আমিনা বল্লে, "কি ফ্যাসাদ দাদা? মা ভাল আছে ত?"

গফুর বল্লে, "মার আর ভাল থাকা-থাকি কি? বাতে পঙ্গু হ'য়ে পাথরের মত প'ড়ে আছে।"

"ছোট বউ? তার ছেলে পিলে?"

"তারা সব মহবুবের শ্বশুর বাড়ি।"

তবে ফ্যাসাদ কিসের?"

গফুর বল্লে, "বল্‌ছি। ইয়াসিন ভাই, পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে এস, তোমাকেও সব কথা বলব।"

আমিনা গফুর এবং মহবুবের সহোদরা ভগ্নী, এবং ইয়াসিন তার স্বামী। মাইল দশেক দূরে একটা গ্রামে ইয়াসিনরা সম্পন্ন গৃহস্থ।

ইয়াসিন প্রস্থান করলে গফুরের সম্মুখে ব'সে প'ড়ে আমিনা বল্লে, "কি বল শুনি।"

গফুর সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা ব'লে বল্লে, "তুই একটু বিশেষ রকম চেষ্টা ক'রে দেখ যদি তাকে কিছু খাওয়াতে পারিস। একটু গরম দুধ খেলে এখনো বোধ হয় বাঁচে।"

আমিনা সব শুনে স্তব্ধ হ'য়ে একটু ব'সে রইল তারপর বল্লে, আমি এখনি চল্লাম,—কিন্তু এ সব ব্যাপার তোমরা ছেড়ে দাও দাদা!"

মহবুব বল্লে, 'তা হ'লে মরদের পোষাকও ছাড়তে হয়—ঘাগরা আর ওড়না পরতে হয়।"

আমিনা বল্লে, "ঘাগরা ওড়না না পরলে যদি এ সব ছাড়তে না পারো তা হ'লে ঘাগরা ওড়নাই পোরো।" ব'লে হাস্তে হাস্তে প্রস্থান করলে।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শীতের রাতে

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়

শীতের গভীর গহন-কুয়াসা-রাতি
ঘুমহারা মোরে বাহিরে আনিল টানি।
মন্দ হয়েছে সৃষ্টির মাতামাতি
বন্ধ-পুরীর নয়নে পড়েছে ছানি॥
সহরের শেষ,—নদী-কল্লোল কাঁদে।
উচ্ছল-তনু বন্দী তমসা-ফাঁদে॥
নাট্যপীঠের পালা হয়ে গেছে শেষ
মুখর-মঞ্চ হয়ে গেছে নির্জ্জন।
আলো নেই ;—আছে আলো-আঁধারের রেশ ;
শিথিল-স্মৃতির ক্রন্দসী কম্পন॥
চোখে জাগে শুধু তা'রি পশ্চাদ-পট।
ঘুমের মরণে স্বপনানন্দে মূক গঙ্গার তট॥
বন্দী জাহাজ বন্দরে শুয়ে নোঙর-নামানো-তরী।
জল-কল্লোলে কান পেতে শোনে গান করে জলপরী॥
দিনের নাবিক রাতের স্বপনে করিছে নৌবিহার।
কোন্ বন্দরে গৃহ অন্দরে ফেলিয়া এসেছে তা'র—
জ্যোৎস্না জড়ানো রাত্রির সহচরী।
ঘুমের মরণে জাগিছে জীবন প্রিয়ারে স্মরণ করি'॥
আলো নেই, মন বাঁধা পড়ে কালোচুলে।
চাপা-নিঃশ্বাসে বক্ষ উঠিছে দুলে'॥

জড়-জাহাজের সহসা বাজিল বাঁশী
স্বপনের মাঝে গুমরি' উঠিল কা'রা।
ঘরের মায়ায় কেঁদে ওঠে পরবাসী
রাত্তির মায়ায় কাঁপে ছল' ছল' তারা॥
ঘুমেল-জাহাজে ঘোলাটে চক্ষু জ্বলে।
দিক্ ভুলাবারে জলের আলেয়া চলে॥
পথের কুয়াসা, দুঃখের স্বপন ঘরে
ফ্যাকাশে-গ্যাসের আলোকে আঁধার ঘোলা।
ফুটপাতে শুয়ে কাঙ্গাল কাঁপিয়া মরে
শীত-বাস সব দোকানে রয়েছে তোলা॥

সুখ-শয্যায় ঘুমায় সওদাগর।
পথের পাথরে ধূসর ধুলায় জেগে আছে যাযাবর॥
কলকাতা নয়,—রূপকথা-রচা বিরাট ঘুমের পুরী।
মায়াবিনী ছায়া-নিশিথিনী করে সোনার কাঠিটি চুরী॥
পথের কিনারে পসারিণী নেই কেবা দেবে সন্ধান
নটী-নগরীর কণ্ঠ-কাকলী কেন হয়ে গেল ম্লান ?
কেন থেমে গেল সহসা নূপুর-ধ্বনি ?
কণ্ঠহারের বন্ধন-ছেঁড়া হারা'ল বক্ষমনি ?
লক্ষ-হীরার সজ্জা হারায়ে বুঝি
নগ্না-নগরী কাঁদিছে চক্ষু বুঁজি' ?

ঘন-শূন্যতা অন্তরে জাগে ভয়।
আলো-আঁধারীতে আমি বেঁচে আছি একা ?
প্রেত-নগরীর হিম-নিশ্বাস বয়।
কুহেলী-আড়ালে কঙ্কাল হ'ল দেখা॥
বস্তির ভূত হাসিছে অট্টহাসি
পাগল প্রেমিক গলায় লাগালো ফাঁসি॥
ক্ষুধাতুর ছেলে সারাদিন হাত পেতে'
রুদ্ধ হোটেল-দুয়ারের পাশে শুয়ে।
বিদ্যুত-দীপে বিলাসী উঠেছে মেতে'
আলোর পূজারী প্রদীপ নিভা'ল ফুঁয়ে॥
অন্তিম-রাতে মত্ত হয়েছে আশা—
আঁধারের মাঝে ঝলিবে হীরক, আলোকের
ভালোবাসা ?
বর্ণ-বিহীন-আকাশের তারা কুয়াসা দিয়াছে ঢাকি'।
নিষ্প্রভ গ্যাস্ মৃত্যু-মলিন-সহরের ঘোলা-আঁখি॥
গৃহের প্রাচীর ঘন আবছায়ে রচিয়াছে প্রান্তর।
গহন-রাত্তির মরণের পারে আছে অবিনশ্বর ;
তা'রি জাগ্রত-পরম-প্রণয় মাগি'
দুঃখ সুখের কলহের মাঝে ঘর বাঁধে বৈরাগী॥
আঁধারের পারে আলোকের বিস্ময়।
রাত্তির ধেয়ানে জাগেন জ্যোতির্ম্ময়॥

শ্যেভালিয়ে দুদ্রেনেক

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই দুদ্রেনেকের প্রভুভক্তি হ্রাস পাইতেছিল। তিনি এবার হোলকরকে পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধিয়ার কর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। শুনা যায় ইন্দোর যুদ্ধের পূর্ব্বেই আগষ্ট মাসে তিনি লকবা দাদার কর্ম্মগ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পতনোন্মুখ শক্তি অবলম্বন করা সমীচীন হইবে না মনে ভাবিয়া বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট যান নাই। কেহ কেহ বলেন যে ইন্দোর যুদ্ধের পরে তিনি সিন্ধিয়ার কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার অন্যমতে উক্ত যুদ্ধের পূর্ব্বেই তিনি হোলকরের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনা যায় স্বয়ং পেরঁ তাঁহাকে এক ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব এবং সেনাবিভাগের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। রামপুরায় কোটার রাজ-অভিভাবক বিখ্যাত সর্দ্দার জালিমসিংহের আশ্রয়ে তিনি নিজ পরিজনবর্গ এবং অর্থাদি রাখিতেন। নূতন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে তিনি উহাদের লইয়া যাইবার জন্য তথায় আসিলেন। দুদ্রেনেকের ইচ্ছা ছিল ব্রিগেডটীও সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু সিপাহীরা তাঁহার মত বিশ্বাসঘাতক ছিল না। তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া উত্তেজিত সৈনিকগণ শ্যামরাও নামক জনৈক সর্দ্দারের প্ররোচনায় তাঁহার আবাসবাটী আক্রমণ করিল। জালিমসিংহ কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে রক্ষা না করিলে সম্ভবতঃ উহাদের হস্তেই তাঁহার প্রাণ যাইত। হোলকর বিশ্বাসঘাতক সৈনিককে তাঁহার করে সমর্পণ করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু মহাপ্রাণ রাজপুত বীর ঘোর অকৃতজ্ঞ জানিয়াও তাঁহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে তাঁহার মধ্যস্থতায় এইরূপ রফা হইল যে দুদ্রেনেক ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যশোবন্তকে কিছু টাকা দিবেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে হোলকরও তাঁহাকে নিজ পরিবারবর্গ এবং সম্পত্তিসহ যথেচ্ছ গমনে অনুমতি দিবেন। প্লুমেও এই সময়ে শ্বশুরপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া হোলকরের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। ইঁহাদের আচরণে মর্ম্মাহত যশোবন্তের অতঃপর সমগ্র ফরাসী জাতির প্রতি ধিক্কার জন্মিল এবং তিনি আদেশ দিলেন যে ঐ দাগাবাজ জাতীয় কোন ব্যক্তিকে তিনি আর কর্ম্মদান করিবেন না।

দুদ্রেনেক আলিগড়ে গিয়া অতঃপর পেরঁর নিকট হইতে চতুর্থ ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব লাভ করিলেন। কিন্তু নূতন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাঁহাকে আর বেশীদিন থাকিতে হয় নাই। অনতিকাল মধ্যেই ইংরাজ ও মারাঠায় যুদ্ধ বাধিল। তাহার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি সম্পূর্ণ ভিন্নপথে প্রবাহিত হইল। হিন্দুস্থানে ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকদের লীলাখেলার অবসান হইল। কিন্তু সে কথা বলার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রখ্যাতনামা লর্ড ওয়েলেসলি তখন বৃটিশ ভারতের গভর্ণর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এদেশে ইংরাজ প্রাধান্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁহার শাসননীতির মূলমন্ত্র। তজ্জন্য তাঁহার বিখ্যাত "সাবসিডিয়ারী এলায়েন্স" নীতির উদ্ভব। মহিশূর-শার্দ্দূল টিপুসুলতানকে ধ্বংস এবং নিজামকে সামন্ত মধ্যে পরিণত করিয়া * তিনি মারাঠাজগতের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। সিন্ধিয়া হোলকর প্রমুখ রাজন্যবৃন্দ

* মহিশূর রাজ্যে ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক এবং জেনারেল রেমণ্ড প্রসঙ্গে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

যে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না একথা তিনি জানিতেন। কিন্তু পেশবার কথা স্বতন্ত্র। নামে মারাঠাচক্রের অধিনায়ক হইলেও বাস্তবে তখন তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। সিন্ধিয়াও হোলকর উভয়েই তাঁহার অপেক্ষা প্রবলতর, উভয়েই তাঁহাকে আয়ত্তে পাইতে সচেষ্ট। তাঁহাদের ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত। ওয়েলেসলি তাঁহাকে "অ্যালায়েন্সের" বন্ধনে বাঁধিয়া সমগ্র মারাঠাজাতিকে ইংরাজাধীন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাউন্টষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোন তখন পুণাদরবারে সহকারী রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার লিখিত রোজনামচা এবং পত্রাবলী হইতে জানা যায় যে বাজীরাওকে ইংরাজ কোম্পানী বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে তাঁহার আর মুক্তির অন্য পথ নাই। তজ্জন্য আবশ্যক মত তোষামোদ, ভীতিপ্রদর্শন, উৎকোচপ্রদান, গুপ্তমন্ত্রণা সকল প্রকার নীতিই অবলম্বিত হইতেছিল।*

বাজীরাও বরাবর "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্" এই কূটনীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন, কারণ প্রতিপক্ষের সহিত প্রকাশ্য বল-পরীক্ষার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। সিন্ধিয়ার সাহায্য লইয়া নানাকে চূর্ণ করিবার পর তিনি তাঁহার বিষদাঁত ভাঙ্গিবেন স্থির করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য নানার সহিত দ্বন্দ্বে বরাবর দৌলৎরাওয়ের পক্ষ গ্রহণ করিতেন। নানার দেহান্তের পর তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে দৌলৎরাওয়ের আশ্রিত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সিন্ধিয়া ও হোলকরের বিবাদ দর্শনে তিনি পরম উল্লসিত হইলেন। কোথায় উঁহাদের আত্মকলহ প্রশমিত করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষার্থ পেশবা যত্নবান হইবেন, তৎপরিবর্ত্তে তিনি মনোবাদ যাহাতে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহাতে সচেষ্ট হইলেন। সিন্ধিয়া পুণা পরিত্যাগ করিলে বাজীরাও মহানন্দে যাহারা তাঁহার অথবা তাঁহার পিতা রঘুনাথরাওয়ের শত্রুতা সাধন করিয়াছিল বলিয়া মনে করিতেন তাহাদের সকলকার প্রতি নিষ্ঠুর বৈরনির্য্যাতনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এই কার্য্য নিতান্ত মূঢ় অবিবেচকের মত হইয়াছিল। এই সুযোগে সকল পক্ষকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি আত্মশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারিতেন এবং সে স্থলে সিন্ধিয়া, হোলকর অথবা ইংরাজ কাহাকেও ভয় করিয়া চলিবার তাঁহার কারণ থাকিত না। কিন্তু এ সুযোগ তিনি হেলায় হারাইলেন। বাজীরাও কৃত অত্যাচার উৎপীড়নের দীর্ঘ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। যশোবন্তের ভ্রাতা বিঠোজী বা এতোজী তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সন্দেহে তিনি হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণবিনাশের আদেশ দিলেন এবং উক্ত নিষ্ঠুর দণ্ড যখন কার্য্যে পরিণত করা হইতেছিল তখন নিজ বাতায়ন হইতে অচঞ্চলচিত্তে সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন (১।৪।১৮০১)। এই কার্য্যের দ্বারা বাজীরাও নিজের অজ্ঞাতে সিন্ধিয়ার একটি পরম উপকার সাধন করিলেন। ভ্রাতৃশোকাতুর যশোবন্ত অতঃপর তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। অনুজের হত্যাকারীর সহিত তাঁহার আর মিটমাটের কোন পথ রহিল না। একারণ উজ্জয়িনী যুদ্ধে হোলকরের সাফল্যের সংবাদ পুণাতে আসিয়া পৌঁছিলে পেশবার আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না। কিন্তু ইন্দোর যুদ্ধের পর একদিকে যেমন তিনি হোলকর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন তেমনই অপরদিকে বুঝিলেন আবার তাঁহাকে সিন্ধিয়ার আয়ত্তাধীন হইতে হইবে। এজন্য যশোবন্তরাও যাহাতে একেবারে বিধ্বস্ত অথবা সিন্ধিয়ার বশীভূত হইয়া না পড়েন বাজীরাওয়ের তাহাই কাম্য হইল।

ইন্দোর যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া দৌলৎরাও যদি তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে হোলকর একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইতেন, সেরূপ অবস্থায় পরবর্ত্তী ইতিহাসের গতি অন্যপথে প্রবাহিত হইত বলিয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই লিখিয়া গিয়াছেন। ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দের প্রথম ইতিবৃত্ত লেখক পূর্ব্বোক্ত মেজর লুই কার্ডিনাও স্মিথ বলিয়াছেন যে সে ক্ষেত্রে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধ সংঘটিত হইত না; কিন্তু সিন্ধিয়া এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ আলস্যবশতঃ ছয়মাসকাল উদাসীন রহিলেন এবং হোলকরকে বিধ্বস্ত করিবার সুযোগ

* Sir. T. E. Colebrooke প্রণীত এলফিনষ্টোনের জীবন চরিতে তাঁহার রোজনামচা এবং পত্রসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। ওয়েলেসলির "Despatches"ও দ্রষ্টব্য।

হেলায় হারাইলেন। * গ্রান্টডফের মতে সিন্ধিয়ার এ ঔদাসীন্যের কারণ বুঝা শক্ত। পের'র আচরণে এই সময়ে তাঁহার প্রথম সন্দেহ জন্মে। কিন্তু লকবা দাদার মৃত্যু এবং বাইদিগের সহিত নিষ্পত্তি হওয়ার ফলে হিন্দুস্থান হইতে তাঁহার এমন কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না, যেজন্য হোলকরের সহিত যুদ্ধ পরিচালন অসম্ভব হইতে পারে। † সার জন ম্যালকমের মতে সিন্ধিয়া এবং হোলকরের এই বিরোধ কতকটা যেন সখের দ্বন্দ্ব; ইহাতে কোন পক্ষকেই আন্তরিকতার সহিত যুদ্ধ করিতে দেখা যায় না। ‡

যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সিন্ধিয়া যদি যশবন্তরাওকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেন তবে আর তাহার রক্ষা ছিল না। কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্ভব হইল না। প্রথমতঃ দৌলৎরাও নিজের সাফল্য অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিলেন; যশোবন্তের শক্তি একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নিকট হইতে আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। তদ্ভিন্ন ইংরাজরা যে পেশবাকে নিজেদের আয়ত্তাধীন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে সে কথাও তাঁহার অজানা ছিল না। সেজন্য পুণা দরবারের রাজনীতির প্রতি তাঁহাকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইতেছিল। হোলকরের সহিত এসময় প্রাণান্তসমরে লিপ্ত হইয়া মারাঠাশক্তি দুর্ব্বল করা তিনি সমীচীন বোধ করিলেন না। বরং তাঁহার নিকট হইতে আর ভয়ের কোন কারণ নাই, তাঁহার এ দুরবস্থায় সন্ধির প্রস্তাব করিলে নিশ্চয়ই তাহা উপেক্ষিত হইবে না বিবেচনা করিয়া দৌলৎরাও যশোবন্তকে অপ্রাপ্তব্যবহার খাণ্ডেরাওয়ের অভিভাবক বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন এবং নিজ শিবির হইতে কাশীরাওকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পেশবার পরামর্শে সিন্ধিয়ার আন্তরিকতায় আস্থাহীন হইয়াই হউক বা নিজ ভাগ্য পরিবর্ত্তনে দৃঢ় প্রত্যয় থাকার জন্যই হউক, হোলকর যে সকল অযৌক্তিক দাবী করিয়া বসিলেন তাহাতে সম্মত হওয়া দৌলৎরাওয়ের পক্ষে সম্ভব হইল না। যশোবন্তের সবই গিয়াছিল, তিনি সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠনোপজীবি দাঁড়াইয়াছিলেন, তথাপি এ অবস্থাতেও তাঁহার সৈন্যের অভাব হইল না। লুণ্ঠনের লোভে তাঁহার পতাকাতলে দলে দলে সৈনিক, এমন কি অনেকে সিন্ধিয়ার সেনাদল হইতে পলায়ন করিয়াও, আসিয়া জুটিতে লাগিল। তাহাদের বেতন দিবার আবশ্যকতা ছিল না, লুঠের অংশমাত্র পাইলেই উহারা পরিতৃপ্ত ছিল। ইহারাই ভারতেতিহাসে প্রসিদ্ধ পিণ্ডারী দস্যু। এ দারুণ দুর্দ্দিনেও যশোবন্ত নিজ পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতিতে শিক্ষিত ব্রিগেডগুলি বিনষ্ট হইতে দেন নাই। লুণ্ঠিত অর্থ হইতে বেতন দানে তিনি সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন। ডুড্রেনেক, প্লুমে ও গার্ডনারের ব্রিগেডত্রয়ের একণে কর্ণেল ভাইকার্স, মেজর আর্ম্ষ্ট্রং ও মেজর ডড (Dodd) নামক তিনজন সেনানী যথাক্রমে অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন। তদ্ভিন্ন মেজর হার্ডিঞ্জ নামক একজন সুদক্ষ সৈনিক দ্বারা তিনি আরও এক ব্রিগেড সৈন্য শিক্ষিত করিয়াছিলেন। এইরূপে ইন্দোর যুদ্ধের অল্পকাল পরেই যশোবন্ত যে সুধু নিজ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন তাহা নহে, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর হোলকর পুনরায় নবীন উদ্যমে শক্তি পরীক্ষায় অবতরণ করিলেন। এবার সুধু সিন্ধিয়ার নহে, পেশবার রাজ্যলুণ্ঠনেও তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। ফতেসিংহ নামক জনৈক সর্দ্দারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য দাক্ষিণাত্যে পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিজে রাজপুতনা ও মালব দেশে অভিযান করিলেন; মনে করিয়াছিলেন সিন্ধিয়ার সেনাদল তাঁহার অনুসরণ করিলে সেই সুযোগে তিনি আপন গোপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবেন। কিন্তু দৌলৎরাও এ চালে ভুলিলেন না, তিনি সামান্য একদল সৈন্যমাত্র হোলকরের অনুসরণে পাঠাইলেন। তাঁহার পরামর্শে বাজীরাও খান্দেশে অবস্থিত হোলকরের রাজ্যাংশ অধিকার করিয়া লইলেন। এ সংবাদে যশোবন্ত আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। পেশবার হস্ত হইতে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি নির্ম্মমভাবে সিন্ধিয়ার সমীপবর্ত্তী জনপদসমূহ উৎসন্ন করিয়া ফেলিলেন। ফতেসিংহ এবং সাহ আহ্মদ খাঁ নামক তাঁহার সেনানীদ্বয়ও পেশবার রাজ্য হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া

* A sketch etc. p. 16

† History of the Mahrattas.

‡ History of Central India and Malwa.

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর যশোবন্তরাও ঘোষণা করিলেন যে সিন্ধিয়ার অত্যাচারের প্রতিকারকামী হইয়া তিনি শীঘ্রই মারাঠারাজ্যের অধীশ্বর পেশবা মহারাজ সকাশে গমন করিবেন। বলাবাহুল্য পেশবাকে নিজ করায়ত্ত করাই যে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল সে কথা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না।

এ সংবাদে পুণায় ভীতির সঞ্চার হইল। পেশবা ইংরাজদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া পুনরায় সন্ধির কথা উত্থাপন করিলেন। তাঁহারাও ইহারই জন্ম প্রাণপাত করিতেছিলেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত পেশবা উঁহাদের সকল সর্ত্তে সম্মত হইতে পারেন নাই। নিজরাজ্য মধ্যে ইংরাজ সৈন্ত রাখিতে অথবা তাঁহাদের আশ্রিত নিজামের নিকট হইতে প্রাপ্য দাবীর নিষ্পত্তি জন্ম কোম্পানীর সালিসী মানিতে বাজীরাও কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। পেশবার সহিত ইংরাজদিগের সন্ধির প্রস্তাবে মারাঠা-জগতে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। যাহাতে এ সন্ধি না হয় তজ্জন্ম সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলা সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দৌলৎরাও প্রথমটায় হোলকরের নিকট হইতে ভয়ের কারণ নাই মনে করিয়া যুদ্ধে ঔদাসীন্ত দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিলে দেখিলেন যে যুদ্ধ করিবার মত তাঁহার সেনাবল নাই। তাঁহার স্বার্থপর সৈন্তাধ্যক্ষ পেরঁ পুনঃপুনঃ আদেশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে কোন সাহায্য করিলেন না। সুতরাং সামান্ত সেনাবল লইয়াই তাঁহাকে এক্ষণে বর্দ্ধিতপরাক্রম শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইল। যশোবন্তের পুণা অধিকারের চেষ্টার সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহাকে বাধা দিবার জন্ম কাপ্তেন ডজ (Dawes) এবং সদাশিবভাও ভাস্কর নামক তুইজন সেনানীকে পাঠাইলেন। ইঁহাদের নিকট প্রথম ব্রিগেডের চার এবং অম্বাজীর ব্রিগেডের ছয় সর্ব্বসমেত দশ ব্যাটালিয়ন পদাতিক এবং দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্ত ছিল কিন্তু কোন ব্যাটালিয়নেই সৈন্তসংখ্যা পূর্ণ ছিল না। নর্ম্মদা পার হইয়া সিন্ধিয়ার সৈন্তদল বুরহানপুরের পথে অগ্রসর হইল, কিন্তু বর্ষাপ্লাবিত তাপ্তী উত্তীর্ণ হইতে না পারায় তাঁহাদের বিলম্ব হইতে লাগিল। যশোবন্তরাও প্রথমটায় তাপ্তীর অপর তটে যুদ্ধদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু কি ভাবিয়া সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এ সংবাদে তথায় ঘোর আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্ম বাজীরাও সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা অবলম্বন করিলেন। যশোবন্ত যদি গোদাবরী পার হইবার চেষ্টা না করেন, তবে তিনি যাহা চাহেন জানাইলে পেশবা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টার ক্রটি করিবেন না, একথা তাঁহাকে জানান হইল। হোলকর যথেষ্ট সৌজন্ত সহকারে নিবেদন করিলেন, "আমার ভাই বিঠোজী আর নাই, তাহাকে ফিরিয়া পাইবার উপায়ও নাই। কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্র খাণ্ডেরাওকে মুক্তিদান এবং আমাদের পৈতৃক রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ দেওয়া হউক।" তদ্ভিন্ন বাজীরাওয়ের সহিত তিনি একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। পেশবা এসকল সর্ত্তে নিজ সম্মতি জানাইলেন এবং খাণ্ডেরাওকে মুক্তি দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিলেন, কিন্তু যশোবন্তের সহিত দেখা করিতে বা তাঁহাকে পুণায় আসিতে দিতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সাহস বাজীরাওয়ের ছিল না, তাহার কারণ বিঠলরাওয়ের অপমৃত্যু। তাঁহাকে করায়ত্ত করাই যে হোলকরের আন্তরিক অভিপ্রায় সে কথা বুঝিতে পেশবার দেরী হইল না। মুখে সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও গোপনে তিনি সদাশিব ভাস্করকে যথা সম্ভব শীঘ্র পুণায় আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন এবং খাণ্ডেরাওকে আসীরগড়ের সুদৃঢ় দুর্গমধ্যে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিলেন।

সন্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া যশোবন্তরাও এবার পুণা অধিকারে সচেষ্ট হইলেন। ৭ই অক্টোবর তারিখে ফতেসিংহ পেশবার সেনাদলকে বরামতী নামক স্থানে পরাজিত করিয়া তাহাদের তোপখানা অধিকার করিলেন। তুইদিন পরে হোলকর সসৈন্তে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং উভয়ে পুণা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের বাধা দিবার জন্ম বাজীরাও স্বীয় প্রধান প্রধান সর্দ্দারবৃন্দকে নিজ নিজ সেনাদলসহ সমবেত হইবার জন্ম আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সে আদেশ পালনে তৎপর হইল। এমন সময় দ্রুতপদে অগ্রপথে

হোলকরকে অতিক্রম করিয়া সদাশিবরাও এবং কাপ্তেন ডজ পুণায় আসিয়া দেখা দিলেন (১৫।১০।১৮০২)। তাহার অষ্টাহকাল পরে যশোবন্তও রাজধানীর অদূরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। এইবার উভয় সেনাদলে যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল তাহা ইতিহাসে "পুণাযুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ।

যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে সুচতুর যশোবন্ত মিত্রভেদ করিবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিলেন। ভীতিপ্রদর্শন অথবা তোষামোদে আসন্ন সময়ে পেশবাকে নিরপেক্ষ রাখিতে তিনি সচেষ্ট হইলেন। বাজীরাও যখন তাঁহার এভাবে সসৈন্যে মারাঠারাজধানীতে আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন এবং কালব্যত্যয় ব্যতিরেকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন তখন তিনি যথেষ্ট সৌজন্যসহকারে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে নিজ প্রভু পেশবা মহারাজের আদেশপালনে তিনি সদাই তৎপর, অবশ্য যদি মহারাজ সিন্ধিয়ার বশে না থাকেন। পেশবার নিকট সিন্ধিয়া ও হোলকর উভয়েই সমান; তাঁহার পক্ষে একজনের প্রতি অনুকূল ও অপরের প্রতি প্রতিকূল ভাবাপন্ন হওয়া অনুচিত উভয়ের মধ্যে শান্তি যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তজ্জন্য চেষ্টা করা তাঁহার কর্ত্তব্য, নিতান্তপক্ষে তাহা সম্ভব না হইলে উঁহাদের দ্বন্দ্বে অংশ মাত্র না লইয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকাই প্রভুর পক্ষে সমীচীন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সিন্ধিয়াই প্রকৃত রাজদ্রোহী, কারণ তিনি পেশবার আদেশ লঙ্ঘন করিতেছেন, খাণ্ডেরাওকে মুক্তি দিতেছেন না এবং বাজীরাওয়ের মধ্যস্থতায় বাধা দিবার অভিপ্রায়ে পুণায় সৈন্য পাঠাইয়াছেন। এই সকল কারণে দৌলৎরাওকে পেশবার বাধ্য হইতে তিনি শিক্ষা দিবেন সে কথাও যশোবন্ত বাজীরাওকে জানাইলেন। কিন্তু হোলকরের এ চাল ব্যর্থ হইল। পেশবার পক্ষে সিন্ধিয়ার সম্বন্ধ ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি জানিতেন যে এক্ষণে দৌলৎরাওকে পরিত্যাগ করার অর্থ যশোবন্তের আয়ত্বাধীন হওয়া। এই সকল আলোচনায় দুইদিন অতিবাহিত হইলে ২৫শে অক্টোবর রবিবার দিন উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন।

হোলকারের সমগ্র শিক্ষিত পদাতিকবাহিনী এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। ভাইকার্সে'র ছয়, আর্ম্‌ষ্ট্রং, হার্ডিজ ও ডড প্রত্যেকের অধীনে চার এবং অনৈক মারাঠাসর্দারের তিন, সর্ব্বসমেত ২১ ব্যাটালিয়ন পদাতিক, ৪০০০ রোহিলা-সৈনিক, ২৫০০০ অশ্বারোহী ও ১০০টি তোপ তাঁহার পক্ষে ছিল। ইহার তুলনায় সিন্ধিয়ার সেনাদল নিতান্ত নগণ্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডজের চার এবং অন্যান্যের অর্দ্ধশিক্ষিত সাত ব্যাটালিয়ন পদাতিক, ১০০০০ অশ্বারোহী ও ৮০টী কামান এবং পেশবার পক্ষে চারি ব্যাটালিয়ন সিপাহী ও ৪০০০ বার্গীসেনা যুদ্ধার্থ উপস্থিত ছিল। তন্মধ্যে বাজীরাওয়ের সৈন্যগণ সমরে অংশমাত্র গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালেই পলায়ন করিয়াছিল। অথচ সে সময় সিন্ধিয়ার হিন্দুস্থানে পের'র কাছে দুর্দ্ধর্ষ চার ব্রিগেড সৈন্য অবস্থিত ছিল! ইহার কিছুমাত্র যথাসময়ে পের' পাঠাইলে যুদ্ধের ফলাফল অন্যভাবে নিরূপিত হইত। এত কম সৈন্য লইয়া প্রবল শত্রুর সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে সদাশিবভাও প্রথমটায় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু কাপ্তেন ডজ তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। কেন্দ্রদেশে পদাতিক ও গোলন্দাজদল, বাম প্রান্তে অশ্বারোহী সেনা ও দক্ষিণ প্রান্তে পেশবার সৈন্যগণ সংস্থাপিত করিয়া তাঁহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সকাল সাড়ে নয়টার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চারি ঘণ্টা ব্যাপী তুমুল গোলাযুদ্ধের পর ডজ সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার বীর সিপাহীগণ দৃঢ়পদে সুশৃঙ্খল-ভাবে আগুয়ান হইল। তদ্দর্শনে হোলকর মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যগণকে উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়ার শিক্ষিত সিপাহীগণের সুতীব্র গুলিবৃষ্টিতে ফতেসিংহ পরিচালিত বার্গীসেনা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া প্রতিপক্ষের বার্গীদলও মহোল্লাসের সহিত প্রচণ্ডবিক্রমে তাহাদের উপর নিপতিত হইল। হোলকরের সৈন্যগণের আর রক্ষা রহিল না—দলে দলে বাহন ও আরোহী ধরাশায়ী হইতে লাগিল। ভাগ্যলক্ষ্মী সিন্ধিয়ার প্রতি প্রসন্ন হইবেন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু যশোবন্তের সাহসে ও বিক্রমে সকল দিক রক্ষা পাইল। তাঁহার রণকৌশলে পরাজয় বিজয়ে পরিণত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে এক উচ্চ টিলার উপর হইতে

নিজ পুত্র-মিত্রগণকে লইয়া তিনি যুদ্ধের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। নিজ সেনাদলকে পরাজিতপ্রায় ও পলায়নোদ্যত দেখিয়া তিনি স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে মহাবিক্রমে রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। মুক্ত কৃপাণ শূন্যে আস্ফালন করিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া তিনি তারস্বরে কহিলেন "যশোবন্তকে অনুসরণ করিবার এমন সুযোগ আর আসিবে না।" বলিতে বলিতে তিনি সবেগে শত্রুর অভিমুখে ছুটিলেন। নৃপতির এ বীরত্বে সৈনিকগণের বিলুপ্ত সাহস আবার ফিরিয়া আসিল। তাহারা পলায়ন চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। এদিকে পলাতকগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভাইকার্স ও হার্ডিঙ্গ নিজ নিজ ব্রিগেডসহ বিপক্ষের বার্গীসেনাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। হোলকরও নিজ সেনাদলকে সুসম্বদ্ধ করিয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের মতই তাহাদের উপর নিপতিত হইলেন। সে সম্মিলিত আক্রমণের বেগ রোধ করা সিন্ধিয়ার অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হইল না। তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই মহাজনবাক্যের অনুসরণে তৎপর হইল। অতঃপর যশোবন্তরাও ডজের সিপাহীগণকে আক্রমণ করিলেন। হোলকরকে তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ডজ তাঁহাকে যথাসাধ্য বাধা দিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু একে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অল্প, তাহার উপরে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবল শত্রু-বাহিনীর সহিত তুমুল সংঘর্ষের ফলে তাহারা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তথাপি তাহারা এ পর্য্যন্ত দি বইনের ব্রিগেডের নাম ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই। বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাহারা শত্রুর পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। চৌদ্দশত সিপাহীর মধ্যে প্রায় ছয়শত ব্যক্তি হতাহত হইল। চারিজন ইউরোপীয় সৈনিকের মধ্যে তিন জন নিহত হইলেন; ইঁহাদের নাম কাপ্তেন ডজ, কাপ্তেন ক্যাটস এবং এনসাইন ডগলাস। লেফটেনাণ্ট অনোস্তে ফরাসী আহত হইয়া শত্রুকরে ধৃত হইলেন। এই যুদ্ধে সিন্ধিয়ার প্রায় পাঁচ হাজারের উপর সৈন্য হতাহত অথবা বন্দী হইয়াছিল। প্রতিপক্ষের লোকক্ষয় ইহার তুলনায় কম হইলেও তাহাও নিতান্ত অল্প হয় নাই। শুধু আর্ম্‌ষ্ট্রঙের ব্রিগেডের চারিশত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। শত্রুর শিবিরের যাবতীয় দ্রব্য আর ৬৫টী তোপ হোলকরের হস্তগত হইল। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ইহার মধ্যে ২০টী কামান ডজের ছিল। অষ্টাদশবর্ষব্যাপী অবিশ্রাম যুদ্ধাভিযানের পর এই সর্ব্বপ্রথম দি বইনের বাহিনীর তোপ বিপক্ষের হাতে পড়িল।

যশোবন্তরাও এই যুদ্ধে সুন্দর সেনাপতিত্ব ও অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। বাস্তবিক পুণাযুদ্ধজয় তাঁহার সামরিক কৃতিত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। বিপক্ষের তোপখানা অধিকার কালে তিনি নিজ শরীরের তিন স্থানে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন। মেজর হার্ডিঙ্গ তাঁহার অদূরে ছিলেন। তিনি একটি গোলাঘাতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন। তখন যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। যশোবন্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট ছুটিলেন। হার্ডিঙ্গের জীবনপ্রদীপ ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইতেছিল। অন্তিমনিশ্বাসের সহিত তিনি হোলকরকে জানাইলেন যেন মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ পুণায় বৃটিশ রেসিডেন্সী সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার স্বদেশীয়গণ মধ্যে সমাহিত হয়। মুমূর্ষুর এ শেষ প্রার্থনা যশোবন্ত অপূর্ণ রাখেন নাই। *

---

* পুণাযুদ্ধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত উভয়পক্ষীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দ সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। কাপ্তেন ডজ সিন্ধিয়ার প্রথম ব্রিগেডের একজন অফিসার ছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার সৈনিকজীবন পরিত্যাগ করিয়া নীলের চাষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে লোকসান হওয়ায় সেনাবিভাগে পুনঃপ্রবেশ করেন। ইন্দোর যুদ্ধের পর ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চারি ব্যাটালিয়ন সিপাহীসহ তিনি হোলকরের অনুসরণে প্রেরিত হন। কয়েকমাস ধরিয়া খান্দেশমধ্যে নানা অভিযান ও কয়েকটা খণ্ডযুদ্ধে সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইলেও তিনি বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হোলকরের পুণাযাত্রা সংবাদে সদাশিবভাস্করের সহিত ডজ তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহাদের সৈন্যবল উক্ত কার্য্যের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী ছিল। ক্যাটস, ডজ, ডগলাস তিনজনেই জাতিতে ইংরাজ ছিলেন।

মেজর হার্ডিঙ্গও ইংরাজজাতীয় ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা নাই। অনুমান ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি হোলকরের কর্ম্মে প্রবেশ করেন এবং চারি ব্যাটালিয়ন সৈন্যসহ একটি ব্রিগেড গঠন করেন। পুণাযুদ্ধে

যুদ্ধক্ষেত্রে যশোবন্ত যে প্রকার সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন জয়লাভের পর তিনি অনুরূপ সংযম এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিতে অসমর্থ হন নাই। প্রথমেই তিনি বিজয়োন্মত্ত সৈনিকগণকে নগর লুণ্ঠনে নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করিলেন। কিন্তু লুণ্ঠনলোলুপ সৈন্যদের আদেশপালনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তিনি নিজ গোলন্দাজগণকে উহাদের প্রতি গোলাবর্ষণের আদেশ দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। পুণা অধিকার করিয়া তিনি পেশবার দরবারে ইংরাজ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ব্যারী ক্লোজকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিলেন এবং মধ্যস্থ থাকিয়া পেশবা ও সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধিস্থাপনা করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন। যুদ্ধ দেখিবার জন্য সেদিন সকালে বাজীরাও প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু রণস্থলের অদূরে আসিয়া গোলাগুলির শব্দে তাঁহার প্রাণে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইল এবং পুণায় ফিরিতে সাহস না হওয়ায় তিনি সে অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে আশ্রয় লইলেন। সেখান হইতে যুদ্ধে হোলকরের সাফল্য সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রে তিনি নিজ সাতসহস্র অনুচরসহ সিংহগড়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় দীর্ঘকাল তিষ্ঠিতে সাহস না হওয়ায় তিনি ইংরাজদিগের পোতারোহণে বেসিন বা বসই গমন করিলেন। যে জাতির সহিত এ যাবৎ সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্কভাবে চলা মারাঠারাষ্ট্রের মূলনীতি ছিল অতঃপর বাজীরাও রাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য তাহাদের আশ্রয় ভিখারী হইলেন। মহাদজী বা নানা বাঁচিয়া থাকিলে উহা কি সম্ভবপর হইত? নগররক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যশোবন্ত পেশবাকে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্যভার পুনর্গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বাজীরাও কোনমতেই পুণায় ফিরিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহাকে আনিবার জন্য বসই গিয়া স্বয়ং হোলকর বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন পেশবার গদি শূন্য হইয়াছে ঘোষণা করিয়া যশোবন্ত একজন নূতন পেশবা নিযুক্ত করিলেন। ইঁহার নাম অমৃতরাও, বাজীরাওয়ের জন্মের পূর্ব্বে রঘুনাথরাও ইঁহাকে দত্তক লইয়াছিলেন।

এবার বাজীরাও সত্যই ইংরাজের আশ্রিত হইয়া পড়িলেন। ৩১শে ডিসেম্বর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এক অশুভ মুহূর্ত্তে বেসিনের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তিনি ইংরাজদের চরণে স্বদেশের স্বাধীনতা ডালি দিলেন। সন্ধির সর্ত্ত এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল,—ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুণার গদীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং রাজ্যরক্ষার জন্য তথায় দশ সহস্র সৈন্য রাখিবেন; তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পেশবা বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ কোম্পানীকে সমর্পণ করিবেন। ইংরাজদের অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি অপর কোন নৃপতির সহিত সন্ধি-বিগ্রহে লিপ্ত হইবেন না অথবা ইংরাজের কোন ইউরোপীয়কে নিজ কর্ম্মে গ্রহণ করিবেন না। এইরূপে তুচ্ছস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এবং সঙ্কীর্ণ নীতির অনুসরণ করিয়া বাজীরাও ইংরাজের নিকট স্বদেশের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিলেন। কিন্তু এজন্য তিনি একা দায়ী নহেন। সিন্ধিয়া এবং হোলকর দুজনেই এ জন্য কতক পরিমাণে দায়ী।

প্রদর্শিত কৃতিত্ব হইতে এই তরুণবয়স্ক সৈনিকের সাহস ও বীরত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। মেজর স্মিথ তাঁহাকে 'সৎব্যক্তি এবং নির্ভীক সৈনিক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কর্ণেল ভাইকার্স জাতিতে ইউরেশীয় ছিলেন। প্রথমে তিনি সিন্ধিয়ার সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় ব্রিগেডে একজন লেফটেনাণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেজর পলম্যানের অধীনে রাজপুতানার জাহাজপুরের যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ইহার পর তিনি সিন্ধিয়ার বাহিনী পরিত্যাগ করিয়া হোলকরের কর্ম্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পক্ষ পরিবর্ত্তনের কারণ অজ্ঞাত। ডুড্রেনেকের পলায়নের পর তিনি তাঁহার ব্রিগেডের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন। ভাইকার্স পুণাযুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলে হোলকরের বৃটিশবংশীয় সৈনিকগণ সকলেই একবাক্যে স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইহাতে যশোবন্তরাওয়ের ক্রোধের অবধি রহিল না। তিনি শত্রুর সহিত ষড়যন্ত্র করা অপরাধে সকলকার প্রাণবধের আদেশ দিলেন। "নাহারমাখান" বা ব্যাঘ্র পর্ব্বত নামক স্থানে উক্ত আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল (মে ১৮০৪)। ভাইকার্স, মেজর ডড, মেজর রায়ান এবং চারিজন লেফটেনাণ্ট নিহত হইলেন। উঁহাদের ছিন্নমুণ্ড ভল্লাগ্রে বিদ্ধ করিয়া হোলকরের শিবিরের অদূরে রক্ষিত হইল এবং সকলকে জানান হইল যে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে ঐপ্রকার দণ্ডবিধান করা হইবে। শুধু মেজর আর্মষ্ট্রং কোন মতে বহু আয়াসে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোম্পানী তাঁহাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপে মাসিক ১২০০৲ টাকা পেন্সন দিয়াছিলেন।

সিন্ধিয়ার ন্যায় হোলকরও পেশবাকে করায়ত্ত করিয়া মারাঠা জগতে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার আশা মনোমধ্যে পোষণ করিতেন। এই জন্যই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বিবাদে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এইজন্যই তিনি পুণা অধিকার করিয়াছিলেন, এইজন্যই তিনি বাজীরাওকে রাজ্যভার পুনর্গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, এইজন্যই তিনি নূতন পেশবা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বেসিনের সন্ধির পর আর বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধাচরণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। মহারাষ্ট্র চক্রের অধিনায়ক হইবার আশা অতঃপর তিনি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজরাও এই সময় পাছে যশোবন্ত তাঁহাদের স্বার্থ সাধনে বাধা দেন এই ভয়ে তাঁহার সহিত সদ্ভাবরক্ষার সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার পর হোলকর পুণা পরিত্যাগ করিলেন। আর্থার ওয়েলেসলি (উত্তরকালের সুবিখ্যাত ডিউক অফ ওয়েলিংটন) পরিচালিত বৃটিশ সেনাদলের সাহায্যে বাজীরাও আবার নিজ গদীতে বসিলেন বটে, কিন্তু যে রত্ন তিনি হারাইলেন তাহা আর ফিরিয়া পাইলেন না।

বসইয়ের সন্ধির ফলে মারাঠা জগতে ভীতির সঞ্চার হইল। পেশবা কার্য্যে না হইলেও নামে মারাঠা চক্রের প্রধান। ওয়েলেসলি অপরাপর নৃপতিবর্গকে জ্ঞাপন করিলেন যে মুহূর্ত্তে তাঁহাদের অধিনায়ক কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন সেইক্ষণ হইতে তাঁহারা সকলেও ইংরাজের আশ্রিত মধ্যে পরিণত হইয়াছেন। উঁহারা যে বিনা বাধায় এ হীনতা মানিয়া লইবেন না তাহা গভর্ণর জেনারেল মহাশয়ের ভালরূপই জানা ছিল। সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই আনুসঙ্গিক যুদ্ধায়োজন করা হইতেছিল। ফলতঃ ইংরাজ ও মারাঠায় শক্তি পরীক্ষার দিন যে আসিয়াছে তাহা সকলেই বুঝিতেছিল।

এই সকল কারণে হিন্দুস্থান হইতে সৈন্য পাঠাইবার জন্য দৌলৎরাও আবার পের‌্যঁকে আদেশ দিলেন। এবার পের‌্যঁও বুঝিলেন আর সৈন্য না পাঠাইলে চলে না, নতুবা তাঁহার প্রতি সিন্ধিয়ার সন্দেহ হইবে। বোধ হয় এই কথা মনে ভাবিয়াই ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি দ্যুদ্রেনেকের চতুর্থ ব্রিগেড দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন। যথাকালে এই সাহায্য পাওয়া গেলে সম্ভবতঃ পুণাযুদ্ধে সিন্ধিয়াকে পরাজিত হইতে হইত না এবং সে ক্ষেত্রে বসইয়ের সন্ধিও হইত না।

প্রচলিত ইতিহাসে কথিত হইয়া থাকে যে বাজীরাওই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের কারণ। শীঘ্রই তিনি নিজ অবিমৃষ্যকারিতার ফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ইংরাজ কোম্পানীর অধীনতা পাশ হইতে মুক্তি পাইবার অভিপ্রায়ে সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলার সহিত ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। উঁহারাও তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর বাজিরাও বরাবরই ইংরাজের প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন। পনের বৎসর পরে তিনি পুনরায় ইংরাজের উচ্ছেদ কামনা করিয়া অপরাপর মারাঠা রাজন্যবৃন্দের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার দরবারস্থ ইংরাজ রেসিডেণ্ট এলফিনষ্টোন সাহেবকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তৃতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধের উদ্ভব। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি শত্রু করে আত্মসমর্পণ করিলে সদাশয় কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া বিঠুরে পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহার রাজ্য স্বাধিকারভুক্ত করিয়া বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সৃষ্টি করেন।

কিন্তু বাজিরাওয়ের আর যত দোষ থাক, তিনি ইংরাজদের সহিত কখনও শত্রুতা বা বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। তিনি নিজের প্রতি অবিচার করিয়াছেন, তাঁহার স্বজাতির প্রতি অবিচার করিয়াছেন, বুদ্ধির দোষে তিনি স্বরাজ্যে ইংরাজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছেন;—তাঁহাকে আমরা ভীরু, কাপুরুষ, অদূরদর্শী, স্বদেশ ও স্বজাতির শত্রু বলিয়া গালি দিতে পারি; কিন্তু ইংরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতক তিনি একেবারেই ছিলেন না। যাহাদের জন্য তিনি পুণার গদীতে পুনরারোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করা ত দূরের কথা, তিনি চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। ইংরাজের সদাশয়তায় তাঁহার দৃঢ় আস্থা ছিল। তাৎকালীন অনেক নিরপেক্ষ সম্রান্ত ইংরাজ একবাক্যে তাঁহার ইংরাজপ্রীতির ও ইংরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতার উল্লেখ

করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বাজিরাওকে ব্যক্তিগত ভাবে জানিতেন। তাঁহাকে ইংরাজের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন করায় যাঁহাদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ ছিল সুধু তাঁহারাই পেশবাকে ইংরাজ বিদ্বেষী বিশ্বাসঘাতক বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।*

ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইলে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা হোলকরকে তাঁহাদের সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। ইংরাজরাও তাঁহাকে নিরপেক্ষ রাখিবার জন্য বিধিমতে প্রয়াস পান। যশোবন্তরাও তখনও তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ইংরাজদিগের সহিত মারাঠা রাজন্যবৃন্দের বিরোধ দর্শনে তিনি পরম উল্লসিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যুদ্ধে একপক্ষ নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে এবং বিজেতৃগণও কতকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে; তখন তাহাদের পরাজিত করিয়া সমগ্র দেশে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। এই দুরভিসন্ধির বশীভূত হইয়া তিনি স্বজাতীয় নৃপতিবৃন্দের পক্ষে যোগ দিলেন না। সৈন্য সমাবেশ করিয়া উদাসীন দর্শকবৎ দূর হইতেই ঘটনাচক্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ওয়েলেসলি পূর্ব্ব হইতেই সিন্ধিয়ার বিদেশী সেনানায়কবর্গকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছিলেন। যুদ্ধ বাধিবামাত্র তিনি মারাঠাবাহিনীভুক্ত বৃটিশ জাতীয় সৈনিকগণকে স্বজাতি এবং স্বদেশের নৃপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নিষেধ করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন; তাহাতে জানান হইল যাহারা শত্রুসেনাদলে নিজ নিজ কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংরাজ কোম্পানীর আশ্রয় লইবে তাহাদিগকে সমপরিমাণ বেতনদানে কর্ম্মে গ্রহণ অথবা সমুচিত বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। ইংরাজেতর ইউরোপীয় সৈনিকগণকেও এ সুযোগ দেওয়া হইবে বলা হইল। এ অবস্থায় আর কি কেহ সিন্ধিয়ার বিপজ্জনক কার্য্যে নিরত থাকে? ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবর্গ নিজেদের সঞ্চিত অর্থ প্রধানতঃ কোম্পানীর কাগজে ও কলিকাতার ইংরাজী ব্যাঙ্কসমূহে গচ্ছিত রাখিত। ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিলে সারাজীবনের সঞ্চয় বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা ত ছিলই; তদ্ভিন্ন ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের নামে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের মধ্যে অনেকেরই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, কারণ তাহারা জানিত অপরাপর দেশীয় নৃপতি বা সর্দ্দারগণের সহিত যুদ্ধ এবং কোম্পানীর ফৌজের সহিত যুদ্ধ এক জিনিস হইবে না। এমন সময় লাট সাহেবের আশার বাণী তাহাদের মুক্তিপথের সন্ধান দিল। যাহারা ইংরাজের স্বজাতি নহে এমন ইউরোপীয় সৈনিকরাও এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ যাহারা এ যাবৎ জাতিপ্রীতিবশে বিচলিত হয় নাই তাহারাও আর স্থির থাকিতে পারিল না। দলে দলে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় সৈনিকগণ সেনাদল হইতে পলায়ন করিয়া ইংরাজের আশ্রয় লইয়া ভূতপূর্ব্ব প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিল না।

কথায় কথায় আমরা দুদ্রেনেককে ছাড়িয়া অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি। এবারে আবার তাঁহার কথা বলা হইবে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পেরঁ তাঁহাকে নিজ ব্রিগেডসহ দাক্ষিণাত্যে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর বেশীদিন তথায় থাকিতে হয় নাই, কারণ ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ আসন্নপ্রায় হইলে তাঁহাকে আবার হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তদনুসারে খান্দেশের অন্তর্গত জলগাঁও নামকস্থানে সিন্ধিয়ার শিবির হইতে ১৮ই জুলাই তারিখে তিনি যাত্রারম্ভ করিলেন। তাঁহার যে পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা বা প্রভুভক্তি বলিয়া কোন জিনিস ছিল না। প্রভুর কার্য্যসাধনে তাঁহার বিন্দুমাত্র

* সকল ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক জেমস মিল স্পষ্টই বলিয়াছেন যে লর্ড ওয়েলেসলির প্রচণ্ড রাজ্যলিপ্সা এবং সিন্ধিয়ার জন্য তিনি যে লৌহ নিগড় গড়িয়াছিলেন তাহা উক্ত মহারাষ্ট্রনায়কের কণ্ঠে ধারণে অসম্মতিই দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধের কারণ। তাঁহার বৃটিশ ভারতের ইতিহাসের ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৩০৬—৩১৩ দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য কৌতুহলী পাঠক পরলোকগত মেজর বামনদাস বসু মহাশয় বিরচিত "Rise of the Christian Power in India" গ্রন্থ দেখিতে পারেন। সমসাময়িক সরকারী কাগজপত্র, নায়কবৃন্দের লিখিত রোজনামচা, চিঠিপত্র, রিপোর্টাদি হইতে তিনি সুস্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন যে কোন প্রকারেই হউক মারাঠাশক্তি চূর্ণ করিতে ওয়েলেসলি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন; পক্ষান্তরে সিন্ধিয়া প্রমুখ মারাঠা রাজন্যবৃন্দ ইংরাজের সহিত যুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।

আগ্রহ দেখা গেল না। ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া মাত্র ২৩শে আগষ্ট তারিখে তিনি নর্ম্মদাতীরে হোসঙ্গাবাদে আসিয়া উপনীত হইলেন। রেলপথ নির্ম্মাণের পূর্ব্বেকার যুগে হিন্দুস্থান হইতে দাক্ষিণাত্যে যাইতে হইলে এইখানেই উভয় জনপদের সীমারেখা রূপে প্রবাহিত নর্ম্মদার সলিল-প্রবাহ উত্তীর্ণ হইতে হইত। হোসঙ্গাবাদে নর্ম্মদা পার হইয়া * ডুদ্রেনেকের দল হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিল এবং কিয়দ্দূরে আসিয়া যুদ্ধের সকল সংবাদ পাইল। শত্রু কর্ত্তৃক আলিগড় ও দিল্লী অধিকার, আগ্রাবরোধ, আসাইযুদ্ধে সিন্ধিয়ার ফৌজের পরাজয়, লাটসাহেবের ঘোষণাপত্র, ফিরিঙ্গি সৈনিকগণের বিশ্বাসঘাতকতা এসকল সংবাদে সিপাহীগণ স্তম্ভিত বজ্রাহতপ্রায় হইল। সিন্ধিয়ার অজেয়বাহিনী যে অত সহজে কোম্পানীর ফৌজের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে পারে একথা কেহ বিশ্বাস করিল না। ফিরিঙ্গি সেনানায়কবৃন্দ ফিরিঙ্গি কোম্পানীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের ধ্বংসসাধন করিয়াছে বলিয়া তাহাদের ধারণা জন্মিল। † এ অবস্থায় সিপাহীগণের নিজেদের অধিনায়কগণের প্রতি সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। ডুদ্রেনেকের সহিত আরও দুইজন ইউরোপীয় সৈনিক ছিলেন,—একজন আমাদের সুপরিচিত মেজর লুই স্মিথ, অপর ব্যক্তির নাম কাপ্তেন জোসেফ জেম্পিলৎ। ডুদ্রেনেকের মত ইনিও এককালে হোলকরের ফৌজে ছিলেন। ইঁহাদের মনে এ পর্য্যন্ত যেটুকু দ্বিধাভাব ছিল ওয়েলেসলির ঘোষণাপত্রের কথা জানিয়া তাহাও দূর হইল। তিনজনে দল ছাড়িয়া গোপনে পলায়ন করিলেন এবং মথুরায় গিয়া ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল ভাণ্ডলারের (Vandleur) করে আত্মসমর্পণ করিলেন। বলা বাহুল্য ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে আপ্যায়িত করিয়া নিজ নিজ ধনসম্পত্তিসহ যথেচ্ছগমনের অনুমতি দিলেন। নেতৃবর্গপরিত্যক্ত সিপাহীগণ অতঃপর ফতেপুরসিক্রিতে গমন করিল। সেখানে নানাস্থান হইতে ছত্রভঙ্গ সিন্ধিয়ার সেনাদল আসিয়া সমবেত হইতেছিল। লাসওয়ারীর সমরক্ষেত্রে নেতৃবিহীন দিবইন গঠিত সেনাদল ইংরাজের বিরুদ্ধে শেষ চেষ্টা করিয়া সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া নাম সর্ব্বস্বে পরিণত হইয়াছিল, তথাপি পৃষ্ঠপ্রদর্শন বা শত্রুর মার্জ্জনাভিক্ষা করে নাই, ডুদ্রেনেকের চতুর্থ ব্রিগেড তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডুদ্রেনেক যদি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না

---

* হোসঙ্গাবাদের সর্দ্দার মাঝির নাম ছিল বাগকিষণ। ঐ ব্যক্তি সেনাদলকে নদী পার করিয়া দিবার সময় সেনানায়কগণের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিত। তথায় তাহার বর্ত্তমান বংশধরের নিকট আজিও ঐ সকল সার্টিফিকেট সযত্নে রক্ষিত আছে। পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইটালীয়, ওলন্দাজ, ইংরাজী প্রভৃতি বহু বিভিন্ন ভাষায় সিন্ধিয়ার বহু ইউরোপীয় সৈনিকগণের লিখিত চিঠি উক্ত সংগ্রহ মধ্যে আছে। তন্মধ্যে কর্ণেল জেমস সেফার্ড, মেজর জন ব্রাউনরিগ, মেজর লুই ফার্ডিনাণ্ড স্মিথ এবং কাপ্তেন লুই ফ্রজিয়ন এই কয়জনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

† কথাটা বড় বেশী মিথ্যা নহে। সেনানীগণের বিশ্বাসঘাতকতাই সিন্ধিয়ার সৈনিকগণের পরাজয়ের প্রধান কারণ। মহাদজী দুর্দ্ধর্ষবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু উপযুক্ত দেশীয় অফিসর শ্রেণী সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সিপাহীগণের পরিচালনভার বিদেশী সামরিক কর্ম্মচারীগণের হস্তে ছিল। এক্ষণে উঁহারা শত্রু পক্ষে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিয়া সকল সন্ধান ব্যক্ত করিয়া দিল অথবা বাহ্যতঃ নিজ নিজ পদে থাকিলেও কার্য্যতঃ কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করিয়া তাহাদের পরাজয় ঘটাইল। কাপ্তেন লুকান (Lucan) নামক একজন বিশ্বাসঘাতক ইংরাজ-বৈদিক গুপ্তপথের সন্ধান দেওয়াতেই লর্ড লেকের পক্ষে আলিগড় অধিকার করা সম্ভবপর হইয়াছিল। আসাইয়ের যুদ্ধে পলম্যান মারাঠাবাহিনী পরিচালন করেন। তিনি যে সাধ্যমত চেষ্টা করেন নাই সে কথা ইংরাজ সেনাপতিগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তথাপি সিন্ধিয়ার সিপাহীগণ যে বীরত্ব ও পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার তুলনা হয় না। তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সার আর্থার ওয়েলেসলিকে কি কঠিন বেগ পাইতে এবং কি প্রকার ভীষণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা ঐতিহাসিক পাঠকমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। ইংরাজ লেখকগণ নিজেরাই বলিয়াছেন যে উপযুক্ত নেতৃবর্গ কর্ত্তৃক যদি উঁহারা পরিচালিত হইত তবে সম্ভবতঃ যুদ্ধের ফল অন্যভাবে লিখিত হইবার প্রয়োজন হইত। শুধু সেনানায়কগণের অভাবেই উঁহাদের পরাজিত হইতে হইয়াছিল, নতুবা শিক্ষাদীক্ষা বা অস্ত্রশস্ত্রের উৎকর্ষ কোন বিষয়েই তাহারা প্রতিপক্ষ অপেক্ষা হীন ছিল না। তদ্ভিন্ন একথাও এখানে বলা আবশ্যক যে মারাঠাযুদ্ধে লেক বা ওয়েলেসলি কোন উচ্চাঙ্গের সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই; বরং তাঁহারা যে প্রকার বিষম ভ্রম করিয়াছিলেন তাহার তুলনা হয় না বলিয়া অনেকে লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের সৌভাগ্যক্রমে সে ভ্রমের সদ্ব্যবহার করিবার মত লোক বিপক্ষ বাহিনীতে ছিল না।

হইতেন, যথাসম্ভব শীঘ্র হিন্দুস্থানে ফিরিয়া প্রভুর কার্য্যসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন তবে দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া লর্ডলেকের আর কোনমতে রক্ষা পাইবার উপায় থাকিত না।

এইরূপে শ্বেভালিয়ে ডুড্রেনেকের বিচিত্র কর্ম্মজীবনের অবসান হইল। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন সম্বন্ধে আর কোন কথা জানা যায় না। অপরাপর বহু শত্রু সেনাদলভুক্ত বিদেশী সৈনিকের মত তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন কর্ম্ম বা বৃত্তিলাভের অধিকারী বিবেচিত হন নাই। শত্রুজাতীয় বলিয়া কোন ফরাসী সৈনিককেই তাহা প্রদত্ত হয় নাই। তবে অপরাপর ফরাসীগণের মত ডুড্রেনেককেও ইউরোপে পাঠাইয়া না দিয়া গভর্ণমেণ্ট এদেশে বাস করিতে দিয়াছিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল।

সৈনিক হিসাবে ডুড্রেনেককে নিতান্ত দুর্ভাগা বলিতে হয়। তাঁহার জীবনে সাফল্যের লেশমাত্র দেখা যায় না। অবশ্য জীবনে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন তাহার কোনটিই তাঁহার ছিল না। মানসিক দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, অদম্য উৎসাহ, সাহস ও বীরত্ব, সমরনীতিজ্ঞান এ সকলের কোন নিদর্শন তাঁহার চরিত্রমধ্যে দেখা যায় না। বরং তৎপরিবর্ত্তে হীনতা, ভীরুতা, কৃতঘ্নতা, এবং নির্লজ্জ কাপুরুষতা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। আমীরখাঁর সহিত ব্যবহারে তিনি যে প্রকার লজ্জাহীন চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা স্মরণে ইউরোপীয় লেখককুল লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি কয়েকবার ভীষণভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেনাদল বিধ্বস্ত, অধস্তন সেনানীগণ নিহত হইলেও তিনি নিজে রণস্থলে আত্মগোপন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। যশোবন্ত এবং দৌলৎরাও উভয়ের প্রতি তিনি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ডুড্রেনেক সর্ব্বসমেত সাতবার প্রভু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সমরু ভিন্ন আর কাহাকেও তাঁহার সমকক্ষ দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র ভদ্রব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার পৈতৃক পদবী লক্ষ্য করিয়া কথাটা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সে হিসাবেও তিনিই একমাত্র ভদ্রব্যক্তি ছিলেন না। কারণ ভাগ্যান্বেষীদের দলে কাউণ্ট, ব্যারণ, শ্বেভালিয়ে প্রভৃতি ইউরোপীয় খেতাবধারীর অপ্রতুল ছিল না। চরিত্রের দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে বলা প্রয়োজন যে ডুড্রেনেক ভদ্রলোক ছিলেন না, বরং তাহার বিপরীত আখ্যায় তাঁহাকে অভিহিত করা উচিত। কমটন সত্যই বলিয়াছেন যে বিভিন্ন লেখকগণ তাঁহাকে যে প্রশংসারাজি দিয়া থাকেন তিনি তাহার একান্ত অনুপযুক্ত। পারীনগরীর জাতীয় গ্রন্থশালায় রক্ষিত একটি হস্তলিখিত পুস্তকের অজ্ঞাতনামা লেখক তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই সংক্ষেপে ডুড্রেনেকের চরিত্র সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইয়া যায়,—"ডুড্রেনেক ভারতবর্ষের কয়েকজন রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। ঐ দেশের সর্ব্বত্র তিনি ক্রূরকর্ম্মা দস্যুরূপে সুপরিচিত।"

ডুড্রেনেকের পরিবারবর্গ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা নাই। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে তাঁহার এক পুত্রের দীক্ষাকার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। পুণাসহরে ঘোড়পুরী নামক অঞ্চলে অবস্থিত পুরাতন খৃষ্টীয় সমাধিস্থানে মাদাম ডুড্রেনেকের কবর আছে। মনে হয় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্বেভালিয়ে যখন দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। উক্ত সমাধিক্ষেত্রে তাৎকালীন বহু ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের এবং তাঁহাদের পরিজনবৃন্দের কবর দেখা যায়। আগ্রার সেণ্টজন কবর স্থানে উইলিয়ম প্যাট্রিক ডুড্রেনেক (১৮২৫-৫৭) নামক জনৈক ফরাসীর সমাধি আছে। সিপাহী বিদ্রোহকালে আগ্রা দুর্গ মধ্যে ঐ ব্যক্তির দেহান্ত হইয়াছিল। ইহাকে শ্বেভালিয়ের পৌত্র বলিয়া মনে হয়। বোম্বাই নগরে ডুড্রেনেক বংশের অস্তিত্ব এখনও দেখা যায়। তথাকার Houghton-Butcher (Eastern) Ltd. নামক কোম্পানীর অফিসে N. B. Dudrenec নামা শ্বেভালিয়ের এক বংশধর কর্ম্মে নিযুক্ত আছে।

ডুড্রেনেকের জামাতা মেজর জ্যঁ প্লুমে সর্ব্বাংশে শ্বশুরের যোগ্য ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যশোবন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়। ঐ ঘটনার অনতিকাল পরেই শ্বশুর এবং জামাতা উভয়ে কাশীরাওয়ের পক্ষ পরিবর্ত্তন করিয়া যশোবন্তের আনুগত্য স্বীকার করেন। নর্ম্মদাতীরে সাৎবাসের যুদ্ধে মেজর ব্রাউনরিগকে আক্রমণ করিতে গিয়া প্লুমে পরাজিত ও বিতাড়িত এবং একমতে শত্রু করে ধৃত হইয়াছিলেন। ইহার অল্প পরেই ডুড্রেনেকও প্লুমে উভয়েই হোলকরকে পরিত্যাগ করেন। প্লুমে কিন্তু তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের মত সিন্ধিয়ার কর্ম্মে আর প্রবেশ করেন নাই। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া মরিশসদ্বীপে গমন করেন। মেজর স্মিথ প্লুমে সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"জাতিতে ফরাসী এবং ভদ্রলোক; মারাঠা সাম্রাজ্য মধ্যে এই দুইটি বস্তুর সমাবেশ খুব কম দেখা যায়।" কিন্তু তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে আমরা বলিতে বাধ্য যে এ ক্ষেত্রেও ঐ দুইটি দ্রব্যের সমাবেশ হয় নাই।

শ্রীঅমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'মালতী দি'

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

মালতীদির সঙ্গে আজ প্রায় পনেরো বিশ বছর পর দেখা—একেবারে অকস্মাৎ। বিশ্বনাথের গলি দিয়ে সকাল বেলা যাচ্ছিলাম কার্মাইকেল লাইব্রেরীতে খবরের কাগজ পড়তে। কিছুকাল থেকে খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করেছিলাম, কারণ পড়বার মত খবর কিছুই আর ছিল না। মহাত্মার উপবাসে আবার খবরের কাগজগুলো পড়বার মত হয়ে উঠেচে। যে-সব সত্য কথা বুঝতে পাঁচ সাত বছরের ছেলে মেয়ের এতটুকু কঠিন লাগে না, সেই সব কথা দেশের বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর গোঁড়া হিন্দুরা সারাজীবনের চেষ্টায় বুঝে উঠতে পারলেন না, একথা যতবার ভেবেচি ততবার আমার হাসিতে নাড়ীগুলো টনটনিয়ে উঠেচে। হিন্দীতে বলে 'আক্কেলের ওপর পাথর পড়া' যাকে, আমি যখন দেখি আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের বুদ্ধির ওপরও তেমনি ঘটনা ঘটেচে তখন···যাক্, আজ আবার হাসচি, নূতন মজা দেখে। মহাত্মা প্রাণ দেবেন পণ করেছেন শুনে নাকি অনেকের বুদ্ধির মৃতপ্রায় বীজ থেকে শুধু অঙ্কুর গজায় নি' দিন দুয়েকের মাঝেই সেই বুদ্ধির চারাগাছে নাকি ফল ধরা সুরু করেচে! তাজ্জব ব্যাপার নয় কি? যা হোক্ কাগজগুলো আবার পড়বার মত হয়েচে; অনেকের আবার সময় কাটবার উপায় হ'ল, ফেরিওয়ালাদের আবার দু পয়সা জুটবে, গঙ্গার ঘাটের অনেক আলোচনা আবার জেগে উঠবে। একটি সংবাদের ইসারায় আবার একটা ব্যবসা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

হাঁ্যা, সকালবেলা, বেশ একটু ভোরেই চলেছিলাম ওই গলি দিয়ে একটু অন্যমনস্কের মত। অকস্মাৎ সামনে দিয়ে একটা বিশ্বনাথের ষাড় প্রবল বেগে ছুটে আসচে, দেখলাম বললে ভুল হবে, অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করলাম আর অনুভব করলাম সমুখে একটি ভদ্রমহিলা ফুলেরসাজি কমণ্ডলু নিয়ে চলেচেন। অতটুকু অল্প সময়ের মাঝে মানুষ কি করে ভাবে, বিচার করে জানিনে অথচ এমনি ধারাই হয়ে থাকে। একটি সেকেণ্ড দেরী করলে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদে কালকের "আজ" কাগজখানা হৈচৈ করে বেড়াতো; যাক তা হ'লো না, আমি সেই মহিলাটিকে একেবারে টেনে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে এলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত বাক্‌স্ফূর্ত্তি হ'ল না আমারও, সেই মহিলাটিরও। সেই পথের মন্দির যাত্রীরা আর অন্যান্য পথিকেরা ভিড় করে এই সাংঘাতিক বাঁচার কথা নিয়ে কোলাহল সুরু করে দিলে। আমি তাড়াতাড়ি পালাবার চেষ্টায় মহিলাটির কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে একেবারে বিস্মিত হয়ে রইলাম। পনেরো বছরের বিস্মৃতি ঠেলে একখানি অতি পরিচিত চেনা মুখ আমাকে চিনি-চিনি করচে দেখে আমি সপ্রশ্ন কণ্ঠে বললাম, 'মালতী দি'? অপরিচিতার কণ্ঠস্বর ইতিপূর্ব্বের ঘটনার উত্তেজনা কাটিয়ে তখনো স্বাভাবিক হয়নি' কম্পিত কণ্ঠে উত্তর এলো, 'হাঁ্যা সুরেশ, আমি, তুমি এখানে কবে থেকে?' দেখলাম ভীড় তখন আবার কৌতূহলী হয়ে উঠচে, আমি বললাম 'চলো মালতী দি, বলচি'······

অতি সাধারণ, স্বাভাবিক ঘটনা, কী আশ্চর্য্যই লাগে এক একবার! সাধারণ স্বাভাবিক আর আশ্চর্য্যের মাঝে হয়ত বস্তুগত কোনো বিশেষ ভেদও নেই: মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থাই হয়ত আশ্চর্য্যকে সাধারণ করে, সাধারণকে আশ্চর্য্য ক'রে তোলে। পাঁচ বছর হ'ল কাশীতে রয়েচি, এই পথ দিয়ে আনাগোনা করেচি কত, আর মালতীদি রয়েচে দশ বছর, এই পথ দিয়ে নিত্য তার দেবদর্শনের জন্য যাতায়াত, অথচ একটি দিন দেখা হ'ল না। দেখা হ'ল আজ অকস্মাৎ। আজই হ'ল। কালকে হ'লে হয়ত মালতীদিকে আর কখনো দেখা দূরের কথা, মনে করবার সুযোগও আসত না! কারণ মালতীদি কাল ভোরের বেলা চলে-যাচ্চে বর্ম্মায়। আশ্চর্য্য, নয়?

কেন নয় বলতো? এর মাঝে অস্বাভাবিক, বুদ্ধির অতীত কিছু নেই, মালতীদি এতকাল ছিল, আমি যে পথ

দিয়ে গিয়েচি সেই পথ দিয়েই তারই সমুখ দিয়ে হয়ত গিয়েচি তবু তাকে লক্ষ্য করিনি' এর মাঝে আশ্চর্য্যের কি রয়েচে, কাল সে চলে গেলে দেখা হ'ত না, আজ ঘটনাচক্রে দেখা হ'ল, এতেই বা বিস্ময়ের কি রয়েচে, এই তো তোমার প্রশ্ন ?

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি তোমায়, বলতো, আকাশের পানে তাকিয়ে, এই সৃষ্টির কোনো কিছুর দিকে তাকিয়েই বা বিস্ময়ের কি থাকতে পারে ? গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্বের কথা ভেবে, তাদের আয়তনের কথা ভেবে তোমার বিস্ময় লাগে। কেন ? যদি একটা সামান্য ছোট 'বল' অসাধারণ না হয়, ওই তারাগোলকই বা অসাধারণ হবে কেন, আশ্চর্য্য হবে কেন ? প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে যেমন বলটি নয়, তেমনি তারাও নয় তো। যত বড়ই হোক তার ধারণা করা অসম্ভব নয় ; বড় আছে যখন তখন তার চেয়ে আরো বড়, আরো বড়'র চেয়ে আরো বড়ও আছে বা থাকতে পারে, অথচ এ নিয়ে তোমাদের তো বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। যা হ'তে পারে না তাকে তো কেউ আশ্চর্য্য বলে না, কারণ যা হ'তেই পারে না, মানুষ কোন কালেও তার সাক্ষাৎ পাবে না। আবার যা হয়ে থাকে তাকে মানুষ সাধারণ বলে তুচ্ছ করে। তবে আশ্চর্য্য বলে কাকে মানুষ ? যা হতে পারে, হয়েও থাকে, কিন্তু যার হওয়া সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশা নেই বললেই হয়, যার হওয়াতে আমি অভ্যস্ত হইনি' যা দেখলেও মন তাকে ধরতে গিয়ে যেন ধরতে পারচে না মনে করে, তাকেই আমরা আশ্চর্য্য ব'লে জানি। যদি তা না হ'ত, জগতের কোন বস্তুই আমাদের মনে বিস্ময়কর লাগত না।

সুতরাং মালতীদি'র সঙ্গে আজকের দেখাটি সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার ! পাটনা থাকার সময়কার জীবনের একটা অধ্যায় আজ অকস্মাৎ নতুন পড়া নভেলের একটি পরিচ্ছেদের মতই লাগচে। আমার দশ বছর বয়সের মান অভিমানের আবদার এবং কলহের সঙ্গে জড়িত পাশের বাড়ীর মালতীদি'! কেমন ক'রে সব একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম ! এখনো যে খুব বেশি কিছু মনে করতে পারচি তা নয়, তবু যেন স্বপ্নের মত কতকগুলো মায়াময় অথচ মধুর ছবি চোখের সামনে জেগে উঠচে, জ্যোৎস্নারাতের গভীর নিস্তব্ধতার নিমগ্ন মর্ম্মর শুভ্র নগরীর মত।

শৈশবের স্মৃতি তার এই কুহেলিকার জন্যই কি সুন্দর! ভোর বেলাকার সুন্দর স্বপ্নের মতই তাকে আমরা হারিয়ে ফেলি যৌবনের দিবালোকে : কিছুতেই তাকে মনের কাছে স্পষ্ট ক'রে তুলতে পারিনে অথচ স্মৃতির মধুমায়াটিও কিছুতেই মনকে ছাড়ে না ! তারপর দিনের কর্ম্মচাঞ্চল্যে সেই স্মৃতিকেও হারিয়ে ফেলি। আমিও দশ বছর বয়সের স্বপ্নটিকে হারিয়েই ফেলেছিলাম আজ অকস্মাৎ আশ্বিনের সুনীল প্রভাতে তাকে দেখতে পেলাম ! (হায়রে আগমনী, হায়রে বিজয়া দশমী !)

দুপুর বেলা মালতীদির ওখানে খাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। মালতীদির ছোট্ট ঘরখানিতে ব'সে আজ কত যে হারানো অনুভব মনের ওপর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল তার আর ইয়ত্তা নেই। তাইতো বলছিলাম আজকের দিনটি আমার জীবনে একটা আশ্চর্য্য দিন। এমন ক'টি দিনই বা জীবনের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করতে পেরেচি !

কলেজী বিদ্যার প্রভাবে, বর্ত্তমান যুগের Rationalism এর দৌরাত্ম্যে (দৌরাত্ম্য বই আর কি ! জীবনের কত স্বপ্ন, কত মধুর ভাবালুতাকে এ নষ্ট করেচে যার ক্ষতিপূরণ এ কোনো দিন করতে পারে কিনা সন্দেহ), রাশিয়ার ধর্ম্মবিদ্বেষী কমুনিজমের জ্বালায় মনে ধর্ম্মালুতার বাষ্পমাত্রও যে অবশিষ্ট আছে একথা বিশ্বাসও করিনি'। তবু এই সুনীল আশ্বিনের মায়াকে কাটিয়ে উঠতে পারিনি' আজও কি জানি কেন ! প্রতিদিন এই পুরাতন কালের কাশীতে সন্ধ্যা সকালে অগণিত মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজে, অগণিত যাত্রী পূজার সাজি নিয়ে পথ দিয়ে চলে। একদিন ছিল এই দৃশ্য এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসাপ্লুত হয়ে চিত্তকে শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র করেচে, কোন অজানিত অথচ নিবিড়ভাবে পরমাত্মীয় দেবতার পদতলে মাথা নত হয়েচে। আজ আর তা হয় না। দিনের পর দিন সকালে সন্ধ্যায় কাশীর আকাশ বাতাস পূজারতির রোলে ভ'রে যায়, যারা শুনবার তারা হয়ত শোনে কিন্তু আমার চিত্তে তাদের কোনো আবেদন আনে না। আমি গর্ব্বিত বিমুখতা নিয়ে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাম্যবাদ নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু আশ্বিন যখন নীল আকাশ নিয়ে, শেফালির সুগন্ধ নিয়ে, শিশির স্নিগ্ধ

তৃণাচ্ছন্ন প্রান্তর নিয়ে, দ্বিপ্রহরের শান্ত সুনিস্তব্ধ ধ্যান-গম্ভীর নীরবতা নিয়ে আসে, তখন আমার চিত্তাকাশ ভ'রে যায় কোন্ পূজারিণীর পূজারতির ঘণ্টাধ্বনিতে, ধূপের ধোঁয়ায় আর প্রাণের পরম উৎসর্গ ভরা প্রণামের আত্মনিবেদনে। গলি দিয়ে যেতে যেতে কোথা থেকে ঘণ্টার মৃদুধ্বনি আসে আর আমি সব ভুলে যাই: আত্মবিস্মৃত আমি যেন যাত্রা করি কোন্ মন্দির পথে। হয়ত এ সবই মিথ্যা মায়া তবু এর মত এতখানি শান্তি ঢালা আনন্দ কই modern যুগের কোনো স্বপন-পসারীই দিতে পারলে না তো!

আমি যখন গেলাম তখন মালতীদি পূজা করচে।

কোনো মানুষের সঙ্গে যখন আমরা পরিচয় করতে যাই বা পরিচিত হ'তে যাই তখন আলাপের পূর্ব্বে একটুখানি নিস্তব্ধতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কোনো মানুষকে তার নিজের ঘরে যখন আমরা দেখতে যাই তখন তাকে পাই তার নিজের পরিমণ্ডলের মাঝে। মাছকে মেছোহাটায় দেখায় আর তাকে নদীর জলে দেখায় যে কি পার্থক্য তা আমরা বুঝতে পারি না, কারণ আমরা শুধু হাটেই তাকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েচি। আজকাল মানুষকেও তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের মাঝখানে দেখার পথে নানা অন্তরায় দেখা দিয়েচে। মানুষ যে গৃহ রচনা ক'রে সেই গৃহরচনার মাঝে তার একটা নিজস্ব পরিচয় আছে। তার গৃহসজ্জায়, তার আসবাবের বৈশিষ্ট্যে তার ঘরের দেয়ালের চিত্রবিন্যাসের বৈচিত্র্যে, তার নানা উপকরণে, এমন কি তার ঘরের সজ্জাহীন অনাড়ম্বর বেশেও আছে গৃহস্বামীরই একটি বিশিষ্ট পরিচয়। আমি তাই মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে যেমন তার মনোপ্রকৃতির একটি আভাস, (কখনো সুস্পষ্ট কখনো বা অত্যন্ত আবছায়া,) পাই তেমনি তার গৃহের সজ্জায়ও পাই। তাই বলছিলাম গৃহপরিমণ্ডলের সেই পরিচয়টির সঙ্গে ব্যক্তিকে মিলিয়ে নেবার জন্য একটু নীরব অবসর পাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল আমরা সেই অবসরটুকু পাই নে। আলাপ পরিচয়টা রেস্তরাঁয় বসে করতে পেলেই আমরা বাঁচি। অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগে গৃহরচনায় আমাদের মন নেই: সেটা রাত্রিবাসের একটা সুবিধাজনক ব্যবস্থা মাত্র।

যাক্, মালতীদির ঘরে গিয়ে একটু নিস্তব্ধ হবার অবসর পেলাম।

আমার যখন দশবছর বয়স তখন মালতীদিকে ছেড়ে চলে আসি, তখন মালতীদির বয়স হবে চোদ্দ কি পনেরো। কতদিন এক সঙ্গে বসে কড়ি খেলেচি, কতদিন মালতীদির সঙ্গে পুকুরে দিয়েচি সাঁতার। সেই মালতীদির কবে বিবাহ হ'লো, কবে পতি বিয়োগ হ'ল, কবে বৈধব্যব্রত নিয়ে কাশী এল তা জানতেও পারিনি'। দশবছরের জগৎ অগোচরে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেছে। আজকের পঁচিশ বছরের জগতে সেই জগতের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। মালতীদির পনেরো বছরের জগৎও লুপ্ত হয়েচে আজ মালতীদির ত্রিশ বছরের জগৎখানি ফুটে উঠেচে তার ওই গৃহসজ্জায়, তার দেয়ালে টাঙানো রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিতে, তারই নীচে চৌকিতে সাজানো চন্দনপুষ্পচর্চ্চিত বাল গোপালের মূর্ত্তিতে, তারই পাশে রাখা শ্রীমদ্ভাগবতে আর দেয়ালের কাঁটায় ঝোলানো জপের মালায়! ওই তার জগতের সঙ্গে একদিন ছোট বেলায় একটু পরিচয় হয়েছিল বিধবা পিসীমার ঘরে আর বাড়ীর পাশে রাধামাধবের মন্দিরে। আজ এ জগৎকে ঠিক চিনতে পারি নে। কিন্তু মালতীদি যখন তার নীরব পূজা শেষ করে তার পূজাবেদীর সামনে প্রণাম করে উঠল তখন মনে মনে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল। মালতীদি'র অন্ধ বিশ্বাসের কথা মনে ক'রে নয়, হৃদয়াবেগের এই যে অযথা-অপচয় তার কথা ভেবে নয়: আমি—আমরা আধুনিক জগতের আধুনিক বিজ্ঞান-সংস্কৃত-মন যুবকেরা যে-স্বর্গ লোককে ধ্বংস করেচি, তারই জন্য!

মনে মনে জানি সেই জগতে ফিরে যাবার উপায় আর নেই। তবুও আজ মালতীদির পূজারত মূর্ত্তির পানে চেয়ে চেয়ে মন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে। একবার মনে হ'ল জিজ্ঞাসা করি, মালতীদি' কল্পনায় আমি আজ যার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম, সত্যি কি তোমার মনটি কল্পলোকের সেই আনন্দ ধারায় অভিসিঞ্চিত হয়েচে? আবার মনে হ'ল যাক্: ওকথা জেনে আমার দীর্ঘ নিশ্বাসের কোনো কূল কিনারাই হবে না।…

মালতীদি'র কোনো কিছুই তো জানা ছিল না।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতীত কাহিনীগুলো জেগে উঠল। সব কথা বলতে গেলে গল্প হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং সে সব কথা আজ থাক। যে কথাটি আজকের দিনে আমার কাছে অত্যন্ত ব্যথার কারণ শুধু সেই কথাটিই বলি।

ভাগ্য বল, কর্ম্মফল বল, যা বলতে হয় বল, কিন্তু একটি কথা না মেনে পারা যায় না। এক একটি মানুষ সংসারে যেন দুঃখ-দেবতার Target practiceএর লক্ষ্য হয়েই কাটায়। মালতীদি' যখন বলতে লাগল তার জীবনের কথা তখন এই কথাটাই মনে হতে লাগল বার বার।

খেতে খেতে হঠাৎ প্রথমটায় বলে ফেলেছিলাম, যাক্ মালতীদি, এতদিন পর জীবনে একটি দিদি পেলাম। ভাই ফোঁটা আসচে, সেদিন কিন্তু ফোঁটা দিতে হবে…

ব'লে মুখের দিকে চাইতেই বুঝলাম নিজের অজ্ঞাতসারে আমি একটা নিদারুণ ক্ষতে হাত দিয়েচি। চুপ করে রইলাম। মালতীদি' আপনাকে স্বল্পক্ষণের মাঝেই সম্বরণ ক'রে নিয়ে বললে, কিছু মনে করিস্নি' ভাই সুরেশ! সংসারে মা ছিলেন আর ছিল ওই ভাইটি··শ্বশুরকুলে ভাসুরের সংসারে স্থান করবার চেষ্টা করেছিলাম পারিনি'। তখন মা আর ভাইকে নিয়ে অবশেষে কাশীতে আসি। তারপর…

(তারপর যা তা তো চোখেই দেখচি।)

কিছুক্ষণ পর মালতীদি বললে, ভাই সুরেশ তোকে আজ কাছে পেয়ে মনে হচ্চে যেন বিনোদ আমার কতকাল পর দিদি ব'লে ডাকল! ভাইফোঁটার দিনে তোকে একটু কাছে পেলে হয়তো বড়ই শান্তি পেতাম। কিন্তু আমার অদৃষ্টে তা নেই সুরেশ। কালই আমাকে যেতে হবে ক'লকাতা, সেখান থেকে বর্ম্মা। ভাসুরের সংসারে একদিন এতটুকু স্থান পাইনি' পাছে কোনো দাবী করে বসি। আজ তাঁর সংসারে দাসীর প্রয়োজন হয়েচে। আমাকেও বাধ্য হয়েই যেতে হবে। আর তো দাঁড়াবার স্থান আমার কোথাও নেই। তবু ভাইফোঁটার দিন যেখানেই থাকি মনে মনে এইটুকু সান্ত্বনা পাব যে সংসারে এখনো আমাকে একটি ভাই দিদি ব'লে ডাকবার আছে। সেদিন কি মনে থাকবে সুরেশ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি'—যে-মালতীদি' আজ আমার তার অমৃত স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে দিলে সে চলেচে 'বন্দিনীর মতো নির্ম্মম সংসারের পায়ে নিজেকে বলি দিতে আমি তাকে দূরে থেকে স্মরণ করবো আর তাতেই মালতীদি' কৃতার্থ হবে?

কয়েক ঘণ্টা পরে হঠাৎ সঙ্কোচ ভাড়িয়ে বলে ফেললাম মালতীদি' তোমার যাওয়া হবে না; সেখানে তুমি যেতে পাবে না।'

'কোথায় থাকবো তা হ'লে?'

'এ কথার উত্তর আমি দিতে চাই'নে। কাল তুমি তৈরী থেকো। ওখানে তোমার যাওয়া হবে না।'

মালতীদির চোখে অশ্রু চিকচিক্ ক'রে উঠল ক্ষণিকের জন্য, তারপর শান্ত গম্ভীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সে বললে, সুরেশ, ভাই তোমার একথা কটি আমি কোনো দিন ভুলবো না। আজও তুমি সংসারে পা দাও নি' ভাই আমার কথাগুলো আজ তোমাকে বড় বাজবে জানি। তবু তোমায় বলচি সুরেশ বিধাতা আমার স্থান যখন রাখেন নি' তখন তুমি আমার জন্য স্থান করতে গেলে কেবলি আঘাতে জর্জ্জরিত হবে। আমি সেখানেই যাবো, ভাই। তাঁরই অমোঘ ইচ্ছা পূর্ণ হোক জীবনে, নিজের ইচ্ছাকে আমি আর লালন করবো না। তোমার কথা কটিই আমার অমূল্য সম্পদ্ হয়ে রইল। আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই যেন এমনি প্রাণটি তোমার চিরদিনই উদার থাকে।' আচ্ছা, কাল তা হ'লে আমার যাবার পূর্ব্বে, একবার যেন দেখতে পাই ভাই! ভগবানের কী যে ইচ্ছা জানি না। আজকের দিনে যে ভাই দিদি ডাকটি কানে শুনতে পেলাম এই আমার পরম সৌভাগ্য।'

মালতীদির সঙ্কল্প অটল, এ বুঝতে আর আমার বাকী নেই, তবু এই মধ্যরাত্রি আমার মনে শুধু বার বার এই জিজ্ঞাসাই জাগ্চে, মালতীদি যে-সংসারের কথা বললে সে-সংসার বস্তুটিই বা কি আর সেই সংসারের চেয়েও বড় কিছু, শক্তিশালী যদি কিছু থাকে তো সেটিই বা কি আর কোথায়ই বা তার দেখা পাওয়া যাবে!

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

দুর্গোৎসব-প্রতিমায় ত্রিশক্তি

(Physical, intellectual and moral)

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ

বাসন্তী-পূজা সমাগত; অতএব দুর্গাপূজা সম্বন্ধে দু-একটি কথা এখন অসাময়িক হইবে না।

দুর্গোৎসবের প্রতিমায় যে সকল দেবতার মূর্ত্তি আমরা দেখি, তন্মধ্যে দুর্গা-মূর্ত্তি সকলের মধ্যস্থ; দুর্গা-মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্ত্তি থাকে। * এই তিন দেবতাকে আমরা ত্রিশক্তি বলিতেছি। ইঁহাদের একত্র আরাধনাই ঐ উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়; কেন, তাহা বলিতেছি।

দেবী দুর্গা সিংহবাহনা, অসুরদলনী। সেজন্য প্রতিমায় অসুর ও সিংহ দেখি; অসুর নাগপাশবদ্ধ, সে জন্য সর্পও দেখি। কিন্তু কার্ত্তিক ও গণেশমূর্ত্তি প্রতিমায় কিজন্য তাহা বুঝি না। কার্ত্তিক গণেশ নাই, এমন প্রতিমাও আমরা দেখিয়াছি।

এমন হইতে পারে যে, ঐ ত্রিশক্তির মধ্যে দুর্গা হইতেছেন বাহুবলের প্রতীক আর লক্ষ্মী হইতেছেন ধর্ম্ম বা নৈতিক শক্তি (force) † এবং সরস্বতী জ্ঞান-শক্তির প্রতীক। এই তিন শক্তির একত্র সমাবেশ যে মানুষে, সেই-ই আদর্শ মানুষ। ইহাদের একটীর অভাবে তাহার পূর্ণতা হয় না। সর্ব্বাগ্রে মানুষের বাহুবল অর্থাৎ শারীরিক বলের প্রয়োজন—অন্য কথায়, সর্ব্বাগ্রে তাহার স্বাস্থ্যবান্ হওয়া আবশ্যক; নচেৎ চতুর্ব্বর্গের কোন বর্গই তাহার লাভ হয় না। "ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাণামারোগ্যংমূলমুত্তমম্", অথবা "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্" ইহাই হইতেছে আসল কথা; তাহার পরের কথা এই যে, স্বাস্থ্যবান্ বা বলবান্ হইলেই কি সব হইল? সিংহেরও বল আছে, তথাপি সে পশুমাত্র; তাই কেবল সিংহ-তুল্য বলশালী মানবও পশু। মানুষের মনুষ্যত্ব পাইতে হইলে তাহার আগে দরকার জ্ঞানের এবং কোমল হৃদ্বৃত্তিসকলের বিকাশ করা; এই জন্য প্রতিমায় দুর্গা-দেবীর পার্শ্বেই জ্ঞান ও কাব্যরসাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর স্থান। আবার বলশালী হইলাম, জ্ঞানী হইলাম, সরস-হৃদয় হইলাম, কিন্তু ফলে হইলাম হয়ত অবিশ্বাসী নাস্তিক, কি এমনি একটা-কিছু। 'থিওরী' শিখিলেই—পুঁথিগত বিদ্যালাভ হইলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না; 'থিওরী'কে অভ্যাসে বা 'প্র্যাক্‌টিশে' পরিণত করিতে হয়। এই কার্য্যে গুরুবাক্যে বা আপ্তবাক্যে প্রগাঢ় আস্থা থাকা চাই। তাই কথিত প্রতিমায় লক্ষ্মীরও দরকার। লক্ষ্মী ধন-ধান্য সম্পদাদির প্রদাত্রী হইলেও তাঁহার সে সব কিছু না—আসল জিনিস হইতেছে তাঁহার ধর্ম্মবল, নৈতিক বল, চরিত্রবল, যাহা এককথায় বহুসাধনা-লব্ধ যে পাতিব্রত্য তৎসম্বন্ধে তাঁহার পুরাণ-কল্পিত আদর্শ ভাব। এই সব লইয়াই লক্ষ্মীর লক্ষ্মীত্ব। কোন নারীর প্রশংসা করিতে হইলে, "অমুকের বউ যেন লক্ষ্মী", "অমুকের মেয়েটী যেন সতী-লক্ষ্মী", এইরূপ লক্ষ্মীর সহিত সে সব নারীদের তুলনা-সূচক কথা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা প্রায়ই ব্যবহার করিতেন; "মেয়েটী যেন দুর্গা—যেন সরস্বতী" এরূপ কথার প্রয়োগ কেহ করিতেন না। লক্ষ্মীর স্তবে আছে—

> ক্ষমস্ব ভগবত্যম্বে ক্ষমাশীলে পরাৎপরে।
> শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে চ কোপাদিপরিবর্জ্জিতে॥

ধর্ম্ম বা চরিত্রবল সম্বন্ধে "শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা", "কোপাদি-পরিবর্জ্জিতা" এ সকল অপেক্ষা আর বড় কথা কি বলা যাইতে পারে? তাই আমরা লক্ষ্মীকে এক কথায় সৌভাগ্যের দেবতা বলিয়া মনে করি। সেইজন্য প্রায় সকল প্রতিমায়

* কোথাও কোথাও (পূর্ব্ব-বঙ্গে) লক্ষ্মী ও সরস্বতীর স্থানে ক্রমান্বয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মূর্ত্তি থাকে শুনিয়াছি। ইহা কোন শাস্ত্র-সম্মত, জানি না। কোন কোন প্রতিমায় দেখিয়াছি, দুর্গা-মূর্ত্তি শঙ্কর-ক্রোড়ে উপবিষ্ট—অসুরও সিংহ সে সব প্রতিমায় থাকে না।

† শক্তিমানের Energy বলিলে বোধ হয় আরও ভাল হয়।

দেখি, দুর্গার দক্ষিণে তাঁহার স্থান আর সরস্বতীর স্থান, দুর্গার বামে। এটা যেন তুলনায় লক্ষ্মীকে অগ্রগণ্যতা (Precedence) দেওয়া। তবে আসলে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পৃথক বস্তু নহে; সেইজন্য সরস্বতী-পূজায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর একত্রে পূজারও বিধি আছে; তাই ঐ পূজার দিনকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়। ডামরকল্পেও দেখা যায়, দেবীদুর্গার (নামান্তর মহালক্ষ্মী) দক্ষিণে লক্ষ্মীর স্থান। যথা—

পদ্মমধ্যে লিখেচ্চক্রং ষট্‌কোণং চণ্ডিকাময়ম্।
ষট্‌কোণচক্রমধ্যস্থমাস্থং বীজত্রয়ং ন্যসেৎ।

তত্র মধ্যবীজে মহালক্ষ্মীঃ তদ্দক্ষিণে মহাকালী (যিনি প্রতিমায় লক্ষ্মীরূপিণী, সে কথা পরে বলিতেছি) বামে সরস্বতীঃ।

তবে এই পূজাকে কেবল দুর্গাপূজা বলি কেন? লক্ষ্মী বা সরস্বতীর পূজা বলি না কেন? কারণ সেই আমাদের আগের কথা; স্বাস্থ্যই—বাহুবলই—হইতেছে সর্ব্বপ্রধান, নতুবা লক্ষ্মী বা সরস্বতী কাহাকেও পাই না। তাই দুর্গামূর্ত্তিই প্রতিমার মধ্যগতা—কেন্দ্রস্থা (central figure) এবং মূল পূজা তাঁহারই। বাহুবলের পূজা বলিয়া দুর্গার চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজ অষ্টাদশভুজ, এমন কি সহস্র ভুজেরও কল্পনা করা হইয়াছে। আবার দুর্গাকে দিগ্‌ভুজাও বলা হয়—অর্থাৎ ইনি দশবাহু ক্রমান্বয়ে দশদিকে প্রসারিত করিয়া সকল দিকেরই রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করেন। শত্রু তাঁহার পদ-দলিত।

তাই পুরাকালে শত্রু জয় করিবার জন্য রাজারা এই বাহুবলের দেবীর পূজা করিতেন ইহা পুরাণাদিতে দেখি। যেমন সুরথ, রাবণ প্রভৃতি। শারদীয়া দুর্গাপূজা রাজা রামচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত বলিয়াও প্রবাদ আছে, কিন্তু তাহার পৌরাণিক ভিত্তি আমরা জানি না। সে সময়ের যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ ছিল—অধর্ম্ম যুদ্ধ সর্ব্বথা ঘৃণিত ছিল। তাই প্রতিমায় বাহুবলের প্রতীক দেবী দুর্গার সহিত ধর্ম্মস্বরূপিণী লক্ষ্মীকে দেখি। আর বুদ্ধি শিক্ষা কৌশল প্রভৃতি এখনকার মত তখনও যুদ্ধে অবশ্য দরকার হইত। তাই সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবী সরস্বতীও প্রতিমায় সংস্থিতা দেখি।

দুর্গাদেবীর বিসর্জ্জন-মন্ত্রে দেখি—

রাজ্যশূন্যং গৃহশূন্যং সর্ব্বশূন্যং দরিদ্রতা।
ত্বামৃতে ভগবত্যদ্যে কিং করোমি বদস্ব তৎ॥
দেবীপুরাণ।

এখানে স্পষ্ট "রাজ্যশূন্যং" কথা দেখিতেছি। পাঠক, আপনার বা আমার কি রাজ্য আছে যে, আমরা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীর পূজা করিব? এই মন্ত্র রাজন্যবর্গের পাঠ্য বটে। আবার পূজার মন্ত্রে ইহাও আছে—"সংগ্রামে ---- দেহি।" তবে এই পূজা নিশ্চয়ই এক সময়ে রাজারই করণীয় ছিল। কিন্তু সংগ্রামে জয় নির্ভর করে ভাল সেনাপতির—অর্থাৎ General বা Field-Marshal-এর উপর। তাই কি প্রতিমায় দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে দেখি? আবার সকল কার্য্যেই—যুদ্ধেও—সিদ্ধিলাভ হইতেছে চরম লক্ষ্য। যুদ্ধে সফল-কাম হইলেও হয়ত ঠিক সিদ্ধিলাভ যাহাকে বলে, সকল দিক দেখিলে সেটা সব সময়ে ঘটে না। তাই বুঝি সিদ্ধিদাতা গণেশ প্রতিমার অন্যতম দেবতা।

যাহা হউক, এসব অনুমানের কথা। আমরা এখন ত্রিশক্তি-রই কথা পুরাণ ও তন্ত্রের দিক হইতে বলিব। ঐ যে প্রতিমাস্থ লক্ষ্মী, উনি হইতেছেন "চণ্ডী"র প্রথম চরিত-কথিতা মধু-কৈটভ-বিঘাতিনী মহাকালী; যিনি তমোগুণা। দুর্গা হইতেছেন "চণ্ডী"র মধ্যম-চরিতোক্তা মহালক্ষ্মী; ইনি রজোগুণাত্মিকা মহিষমর্দ্দিনী। আর সরস্বতী হইতেছেন "চণ্ডী"র শেষচরিত-প্রখ্যাতা সত্ত্বগুণাত্মিকা শুম্ভাসুরঘ্নী মহাসরস্বতী। তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই তিন গুণের হইতেছেন ঐ তিন দেবী বা ত্রিশক্তি। "চণ্ডী"তে প্রত্যেক চরিত-পাঠের প্রথমেই ইঁহাদের প্রত্যেকের কথা নিম্ন-লিখিত রূপে পড়িতে হয়। যথা—

প্রথমচরিত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। মহাকালী দেবতা। নন্দাশক্তিঃ। রক্তদন্তিকাবীজম্। অগ্নিস্তত্ত্বম্। ঋগ্বেদস্বরূপম্। শ্রীমহাকালী প্রীত্যর্থং প্রথম চরিত্র জপে বিনিয়োগঃ॥

মধ্যমচরিত্রস্য বিষ্ণুঋষিঃ। উষ্ণিক্ ছন্দঃ। মহালক্ষ্মী দেবতা।

শাকম্ভরী শক্তিঃ। দুর্গাবীজম্। বায়ুস্তত্ত্বম্। যজুর্বেদস্বরূপম্। মহালক্ষ্মী প্রীত্যর্থং মধ্যম চরিত্র জপে বিনিয়োগঃ॥

উত্তমচরিত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ। অনষ্টুপচ্ছন্দঃ। মহাসরস্বতী দেবতা। ভীমা শক্তিঃ। ভ্রামরী বীজম্। সূর্য্যস্তত্ত্বম্। সামবেদস্বরূপম্। মহাসরস্বতী প্রীত্যর্থং উত্তমচরিত্র জপে বিনিয়োগঃ।

নবার্ণ জপবিধিতেও ঐ কথা—"মহাকালী-মহালক্ষ্মী মহাসরস্বত্যো দেবতাঃ ** শ্রীমহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

সপ্তশতী ন্যাসেও ঐরূপ আছে—

"প্রথমমধ্যমোত্তমচরিত্রাণাং ** শ্রীমহাকালী-মহালক্ষ্মী মহাসরস্বত্যো দেবতাঃ। ** শ্রীমহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী দেবতা প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

এখন প্রতিমাস্থা লক্ষ্মীকে আমরা সত্ত্বগুণা বলিয়াছি, আবার তাঁহাকে তমোরূপিনী মহাকালীও বলিলাম। গোল হইল বটে। আসল কথা হইতেছে পরমাপ্রকৃতি একই। তিনিই সৃষ্টির ব্যক্তাবস্থায় লক্ষ্মী আর অব্যক্তাবস্থায় মহাকালী। মধুকৈটভবধ প্রলয়ের শেষভাগে ও সৃষ্টির প্রাক্কালে ঘটিয়াছিল; তমোগুণেই প্রলয়; তাই তখন মহাকালীরই আধিপত্যকাল, আবার তাহার অনতিপরেই রজোগুণের ক্ষোভ হইয়া সৃষ্টির বিকাশ হওয়ায় লক্ষ্মীর অধিকারকালের প্রবর্ত্তন ঘটে। গুণ-ভেদে মহাকালীই উত্তরকালে† লক্ষ্মী বা রজোগুণী মহালক্ষ্মীরূপিনী হন। বাস্তবিক ত্রিশক্তি অর্থাৎ মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী—যথাক্রমে দুর্গোৎসব প্রতিমাস্থা লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতীর কোনও ভেদ নাই। লক্ষ্মীই মহালক্ষ্মী—যিনি মহিষমর্দ্দিনী আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। "চণ্ডী"র স্বনামধন্য টীকাকার নাগোজী ভট্ট লিখিয়াছেন,—"ইয়ং মহালক্ষ্মীঃ কূটস্থা প্রথমমধ্যমোত্তরচরিত্রত্রয়দেবতাসমষ্টিরূপা সকল দেবীমাহাত্ম্যে দেবতেতিবোধ্যম্ এষা শৈবী বৈষ্ণবী চ"। ইহাতে সকল গোল মিটিয়া যায়।

দুর্গা, লক্ষ্মী, ও সরস্বতী এই ত্রিশক্তিই যে অভেদ, তাহা আমরা আর একদিক হইতে দেখাইতেছি। দুর্গাপূজায় তিনটী ঘট-স্থাপনা করিতে হয়; স্থাপিত ঘটসকলের মধ্যের ঘটটী হইতেছে দুর্গার বা ঐ ত্রিশক্তির, অর্থাৎ দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আর পার্শ্বের দুইটী ঘটের একটী হইতেছে গণেশের ও অপরটী কার্ত্তিকের। ঐ ঘটদ্বয় তাঁহাদের স্ব স্ব মূর্ত্তির সম্মুখেই স্থাপিত করা হয়। প্রত্যেক মূর্ত্তির জন্য স্বতন্ত্র ঘটের প্রয়োজন, কিন্তু ঐ ত্রিশক্তির সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। কারণ যা হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐ ত্রিশক্তিই একবস্তু। তন্ত্র তাহাদিগের নিম্নলিখিত তিনটী নাম দিয়াছেন—

ইচ্ছাক্রিয়াস্তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।

বৈষ্ণবদেরও ঐ ভাবের কথা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন নাম।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করে মানি।

তন্ত্রের ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রের কথিতা ঐ তিন শক্তিকেই দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বলিয়া খুব বুঝা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের হ্লাদিনী শক্তি হইতেছেন শ্রীরাধা। আমরা এখানে লক্ষ্মীকে হ্লাদিনীশক্তি বলিয়া বুঝিলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। হ্লাদিনীর হ্লাদ্ ধাতু ও রমা শব্দের রম্ ধাতু একার্থবাচক বলা যাইতে পারে।*

† সৃষ্টি-ব্যাপারে আদি বা অন্ত বলিয়া কিছুই নাই। সৃষ্টি নিত্যবস্তু। তাই গীতায় ভগবান্ সংসারকে "অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার সৃষ্টি হইতেছে ভগবানের রূপ—অর্থাৎ ভগবান্ স্বয়ং বিশ্বরূপ; কাজেই জগৎ নিত্য—নতুবা ভগবানের নিত্যত্ব থাকে না। "চণ্ডী"তেও দেবীভগবতীকে "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ" বলা হইয়াছে। তাই, সংসার হইতেছে পরিবর্ত্তনশীল ভাবে নিত্য অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি-প্রলয়, সৃষ্টি-প্রলয়, ইহা হইতেছে জগতের ধারা। জগৎ ঐ প্রবাহরূপে নিত্য। এই প্রবাহের পূর্ব্বোত্তর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমরা এখানে "উত্তরকালে" কথাটি ব্যবহার করিয়াছি।

* ঘট-স্থাপনার সম্বন্ধে আর কিছু কথা অবান্তর ভাবের হইলেও আমি এখানে বলিতে চাই। দেখিতে পাই, প্রত্যেক দেবমূর্ত্তির নিমে তাঁহার ঘট স্থাপিত থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শিব-মূর্ত্তির ঘট স্থাপিত হয় না—শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দিরে ঘট দেখি না—অথচ বিনা ঘটেই তাঁহাদের পূজা হয়। অন্নপূর্ণা-প্রতিমা পূজায় দেবীর ঘট স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু শিবের হয় না। শিব-লিঙ্গের অবশ্য ঘট থাকে না; অনেক বাড়ীতে

"চণ্ডীর রহস্তে" (তন্ত্র) দেখা যায়, রজোগুণাত্মিকা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা দেবী ত্রিগুণময়ী—তাঁহাতে সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণও আছে। ঐ দুই গুণের স্বতন্ত্রভাবের বিশ্লেষণে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে আমরা পাই। ইহা অবতারী ও অবতার-তত্ত্বের মত; ঐ রহস্যমতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী হইতেছেন অবতার। বাস্তবিক উক্ত রহস্তে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দুর্গা হইতেই উদ্ভব বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ তিন শক্তিই যে এক Different angles of vision এর ফলমাত্র, তাহাও বুঝাইয়াছি। ইহাই হইতেছে শক্তির ত্রিতয়ত্ব বা Trinity।

দেবীমাহাত্ম্যের তিন চরিত্রের ঋষ্যাদিন্যাস, যাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তদনুসারে প্রথম চরিত্রের দেবতা হইতেছেন মহাকালী (যাঁহার লক্ষ্মী-মূর্ত্তি আমরা দেবী-প্রতিমায় দেখি—পূর্ব্বে বলিয়াছি) মধ্যম চরিত্রের দেবতা মহালক্ষ্মী (দেবীদুর্গা) এবং উত্তর চরিত্রের দেবতা মহা-সরস্বতী, যাঁহার সরস্বতী মূর্ত্তি প্রতিমায় থাকে। ঐ তিন চরিত্রের দেবতাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ক্রমানুসারে প্রতিমায় ঐ তিন দেবতামূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়; সুতরাং ত্রিশক্তির অন্যতম লক্ষ্মীমূর্ত্তি আদিভাগে, দুর্গামূর্ত্তি মধ্যে এবং সরস্বতী-মূর্ত্তি সর্ব্বশেষে থাকাই সঙ্গত। আদিভাগ বলিতে প্রতিমার সম্মুখে উপবিষ্ট পূজকের বামদিকের প্রথম দেবী-মূর্ত্তির স্থানকেই বুঝায়।

প্রতিমায় মহাকালীর স্থলে লক্ষ্মী-মূর্ত্তি কিরূপে স্থান পাইল তাহা বুঝি না। ডামরকল্পের যে শ্লোক আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দুর্গাদেবীর দক্ষিণে মহাকালীরই স্থান কথিত হইয়াছে—লক্ষ্মীর কোন উল্লেখ নাই। শুনিয়াছি কোথাও কোথাও নাকি দুর্গার মূর্ত্তি মহাকালীর বর্ণে—কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হয়।* সে স্থলে সে মূর্ত্তিকে বোধ হয় মহাকালীর মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে হয়, আর তার পার্শ্বস্থ দুই মূর্ত্তিকে মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী বলিয়া বুঝিতে হয়। ইহাতে কিন্তু দেবী-মাহাত্ম্যের পূর্ব্বোক্ত চরিতবর্ণিতা দেবতাদের ক্রম ঠিক থাকে না। পরন্তু দুর্গার কৃষ্ণবর্ণও একরূপ ধ্যানসিদ্ধ বটে। বৃহন্নন্দি-কেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাদেবীর ধ্যানে আছে যে, তিনি "অতসী পুষ্পবর্ণাভাং"; এই অতসী ফুল কৃষ্ণবর্ণেরও হয়। আবার শণ-পুষ্পকেও অতসী বলে; সে ফুলেরও রং কালো। কিন্তু কালিকা-পুরাণোক্ত ধ্যানে "তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং" বলিয়া দেবীর বর্ণের উল্লেখ আছে। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত-রূপ কৃষ্ণবর্ণের একবাক্যতা করা যায় না। তবে দেবী-দুর্গার বর্ণ এতদ্দেশে অধিকাংশ স্থলে পীত দেখা যায়। পীত অতসী ফুলও সচরাচর দেখা যায়; কিন্তু তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ত পীত নহে—সে বর্ণ বালার্কবর্ণ-সদৃশ—অনেকটা

দুর্গোৎসব-প্রতিমায় শিব ও রামের গঠিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি দেখি, তাঁহাদের পূজাও হয়, কিন্তু ঘট পাতা হয় না। শালগ্রাম শিলা ও শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি নহে, যন্ত্র; যন্ত্রের পূজায় ঘটের আবশ্যক হয় না। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি-পূজা হয়, শিবেরও উক্তানুরূপ মূর্ত্তি-পূজা হয়, তাঁহাদের ঘট থাকে না কেন?

আমার বোধ হয় হর-হরির (একই বস্তু) ঘটত্ব নাই। তিনি পরম-পুরুষ, কার্য্যক্ষেত্রে প্র তত্ত্ব বিকাশের জন্য অর্থাৎ বিশ্বের ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনকালে তিনি প্রকৃতির আশ্রয় হ'ন মাত্র। ঘট ঐ বিবর্ত্তনের ভাবব্যঞ্জক বোধ হয়—যেমন আমাদের দেহকে ঘট বলা হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ গাইয়াছেন, "ঘটের নাশকে মরণ বলে।" পরমাপ্রকৃতি ও পরম পুরুষ বা ব্রহ্ম একই বস্তু—তুরীয়; কিন্তু বিবর্ত্তনশীলা ঐ প্রকৃতি অবিদ্যাভাবাপন্না—তখন ব্রহ্মের ন্যায় নিরাকারা যে তিনি তাঁহারও ঘটত্ব (আকারাদি) আপনিই আসিয়া পড়ে। দেবী দুর্গাকে মহামায়া বলা হয়। "মহামায়া" মূলতঃ বিদ্যা ও অবিদ্যাভাবের ঐক্য; তাঁহাতে অবিদ্যাভাব আছে বলিয়া হয়ত তাঁহার পূজায় ঘটের দরকার হয়। কিন্তু তাঁহার শ্রীরাধা-মূর্ত্তিতে তাহার আবশ্যক হয় না। পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ।

তাই তাঁহার শ্রীরাধারও ঘট নাই। কারণ, শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ। অবিদ্যা ও বেদান্তের মায়া একই বস্তু, তবে "পঞ্চদশী"তে সত্ত্বগুণাত্মক প্রকৃতিকেও "মায়া" বলা হইয়াছে।

এই পাদটীকায় যাহা লিখিলাম, ইহা আমার অনুমান মাত্র। আমার এসব কথা ঠিক না হইতেও পারে।

* গত সনের শারদীয়া সংখ্যা "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত আমার লিখিত "দেবীদুর্গা" প্রবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দুর্গা-দেবীর কয়েকটি চিত্র দেওয়া হইয়াছিল; সে সকলের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের দশভুজার একখানি ছবি ছিল; এতদ্দেশীয় কোন পুরাতন চিত্রপট দেখিয়া ঐ ছবি করা হয়, একথা ঐ মাসিক পত্রেই লিখিত আছে।

শিউলি ফুলের বোঁটার রংএর মত। আর ঐ বর্ণের অতসী ফুলও আছে; সুতরাং এখানে "তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভাং" সহিত একবাক্যতার গোল ঘটে না।

যাঁহাকে আমরা লক্ষ্মী (নারায়ণের শক্তি) বলিয়া আসিতেছি, তিনিই মহালক্ষ্মী; আবার শিবানী-দুর্গাও মহালক্ষ্মী। তিনি "শৈবী বৈষ্ণবী চ" ইহা নাগোজি বলিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। লক্ষ্মীর প্রণাম-মন্ত্রে, স্তব-কবচ-গায়ত্র্যাদিতে তিনি মহালক্ষ্মী বলিয়াই উল্লিখিতা হইয়াছেন। ফলে দুর্গার সহিত তাঁহার প্রভেদ নাই। দশমহাবিদ্যারূপিনী দুর্গাই শেষ মহাবিদ্যা—মহালক্ষ্মী। এই মহালক্ষ্মীর ধ্যানের শেষে আছে, "ধ্যায়েৎ প্রিয়াং শার্ঙ্গিণঃ † অর্থাৎ ইহাতে তাঁহাকে হরিপ্রিয়া (নারায়ণী) বলা হইয়াছে। আর দুর্গা যেমন একদিকে শিবাণী, তেমনি অন্তভাবে—হরি-হরের একত্ব বশতঃ—তিনি নারায়ণীও বটেন। তাঁহার পূজা-মন্ত্রাদিতে এবং "চণ্ডী"তে, তিনি পুনঃ পুনঃ নারায়ণী বলিয়াই কথিতা হইয়াছেন।

† আবার উর্দ্ধতম হিমালয় পর্ব্বত হইতেছে দুর্গার উদ্ভব-স্থান। অন্যদিকে কোন্ অতল-স্পর্শ সমুদ্রগর্ভ হইতে—নিম্নতম স্থান হইতে—লক্ষ্মীর উদ্ভব। ইহাতে সহসা মনে হয় যেন এই দুই দেবী হইতেছেন দুই বিপরীত দিকের বা ভাবের। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। আমেরিকা আমাদের পায়ের নীচে আমরা বলিয়া থাকি; আমেরিকার লোকেরাও আমাদের দেশকে ঐরূপ ভাবে তাঁহাদের পায়ের নীচে থাকা মনে করেন। বাস্তবিক সৌর-জগতে ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণের উর্দ্ধ ও অধঃ বলিয়া কিছু আছে কি? সুতরাং ঐ দুই দেবী সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বৈপরীত্যভাব তথা-কথিত রকমের বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আঁখি

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

ঐ তো দুটি আঁখি
এত যে দেখি দেখেই তবু ভাবি
কত না দেখা বাকি!
বসন ভূষণ নূপুর বালা সাজে
সকল তনু লুকায় কোথা লাজে
ওর মাধুরী ওই রাখে ওর মাঝে
কোন্ গহনে ঢাকি,
একটুকু যা কোণায় কোণায় রাজে
অবাক হয়ে থাকি!
মর্ত্ত্যে যদি অমৃত কিছু রহে
আভাস তারি আমার চোখে ওতেই পড়ে ধরা
আর কিছুতে নহে।
সে দুটি চোখে চকিত চল চাওয়া
শীতের বনে আনে দখিন হাওয়া,
কত যে প্রাণ কত যে গান গাওয়া
মুকুলে ভরা শাখী,
দেখায় দূরে কুলায়পানে ধাওয়া
আকুলা কোন্ পাখী॥

মানবের শত্রু নারী

শ্রীসুবোধ বসু

দশ

আর মফঃস্বল নয়,—একদম কলিকাতা। কিন্তু সহরটা এমন কি করিয়া যে বদ্‌লাইয়া গেল তাই বিস্ময়ের কথা। এর জনতা, এর কোলাহল এবং অতি সজীব চঞ্চলতার সুরটা অরুণাংশুকে হঠাৎ পীড়া দিতে লাগিল। অন্ধকার আর ছায়া, একটা হয়ত বাদাম গাছ, একটু আলপনা-আঁকা জ্যোৎস্নার জন্য ওর মনটা তৃষিত হইয়া ওঠে। এমন কি ট্রামে চলিতেই হঠাৎ বা ঘুঘুর ডাক শুনিতে পায়, এবং এমন সব জংলাফুলের গন্ধ আসে যা কলিকাতায় কল্পনা করাও যায় না। আর তার সাথে একজনার কথা মনে পড়িয়া মনটা কেমন উদাস হইয়া ওঠে; একটু স্বপ্ন, একটু শিহরণ, নিদ্রাহীন রাতে চোখের একটু সজলতা!

অরুণাংশু ঠিক জানে এবার ঐ ছেলেটার সাথেই সুজাতার বিয়ে হইয়া যাইবে। সানাই এমন সব সুর তুলিবে যার সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় নাই। আলোর উৎসবে অন্ধকার পল্লীটা দীপ্ত হইয়া উঠিবে। আনন্দ কলরব শোনা যাইবে। সুজাতার বিবাহ-ধূমারুণ মুখটা স্পষ্ট দেখিতে পায় অরুণাংশু। তারপর আর কিছু নাই। একদিন হয়ত তারই জন্য সুজাতার মনে একটু স্নেহ-রঙিন ছোঁয়া লাগিয়াছিল,—নববধূর অবগুণ্ঠন তারও উপর যবনিকা টানিয়া দিবে। দুদিনের জন্য যদি একটু স্বপ্ন রচনা হইয়া থাকে কার বা মনে থাকিবে সে কথা। সুজাতার মনে যদি কখনো একটু রঙ লাগিয়া থাকে তাহা বিস্মরণের দিগন্তে লীন হইয়া যাইবে,—দিন শেষের অস্ত-সোনার মত। তখনোও সেই নিস্তব্ধ সহরটার সেই শান্ত পথটার বাদামগাছটা দাঁড়াইয়া থাকিবে, ঘুঘু ডাকিবে, ছায়া পড়িবে, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে চানাচুরঅলার কেরোসিনের বড় শিখাটা একটুক্ষণের জন্য চারদিক আলো করিয়া তুলিয়া পথের বাঁক ঘুরিলেই একদম ঢাকা পড়িয়া যাইবে।

অরুণাংশু ক্রমেই আনমনা হইয়া পড়িতেছে। এবং তার ফলে এমন সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করিয়া বসিতেছে যার বর্ণনা দিতে গেলে ওর মনের সত্যিকারের অনুভূতির গভীরতাকে হাল্কা করিয়া তোলা হয়। একটা বলিতে-না-পারা অস্বস্তি ও একটা উপায়হীন ব্যথায় ওর মন ভরা।

মাঝে মাঝে ওর মনে হয় চোখ মুখ বুজিয়া কাউকে একটা চিঠি লিখিয়া দেয়। কিন্তু রাত করিয়া যদি সে চিঠি লেখাও হয়, তবু দিনে আর সেটাকে ডাকে দেওয়া হয় না। দিনের বেলা মানুষ, অসহজ হইয়া ওঠে,—কবির জায়গায় সমালোচক আসিয়া আসন নেয়। একসময় যে-সব সাধুসন্ন্যাসীর আড্ডায় অরুণাংশু ঘুরিত সে সব পথেও আজকাল কেউ তাকে দেখে না। বৈরাগ্যের পথ হইতে সে ছিট্‌কাইয়া জীবনের পথে আসিয়া পড়িয়াছে। তার আর মায়াপাশ ছেদনের মন্ত্রের প্রয়োজন নাই। একটু কাঁদিতে পারিলেই যেন সমস্ত আত্মা পরম তৃপ্তিতে জুড়ায়।

অরুণাংশু অস্থায়ীভাবে এক কলেজে পড়াইতেছে। বাড়ি হইতে ঠিক করিয়া বইপত্র দেখিয়া যাওয়া দরকার। কিন্তু রাত্রে পড়িতে বসিলে যত রাজ্যের কল্পনা আসিয়া মাথায় ভীড় করে,—চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া ওঠে, মনের মধ্যে এমনি সব পাতা নড়িতে থাকে এবং এমনি সব প্রলাপ বকা সুরু হয় যে বইয়ের পাতা মুড়িয়া চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

অরুণাংশু অনেক সময় একা বসিয়া ভাবে, কেন এমন হয়। কিন্তু তার কোনো জবাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অপরিচয়ের অন্ধকারে একটা অজানা মেয়ে ছিল, হঠাৎ

একটুক্ষণের আলোয় তাকে দেখা গেল, তারপর আবার অন্ধকার। অথচ তারই ক্ষণিক পরিচয়ে মন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, কল্পনার আর শেষ নাই, এবং চোখে জল ভরিয়া ওঠে।

যতই দিন যায় অরুণাংশুর শুধু একটীমাত্র ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। জগতের কত সহস্র বৈচিত্র্য, কত সংখ্যাতীত সমস্যা কিছুই আর তার চোখে পড়ে না। জগতে শুধু এক সমস্যা, একটী চাওয়া, একটী মাত্র স্বপ্ন। আর কিছু নাই,—থাকিলেও তাহা একান্তই অবান্তর।

কিন্তু কল্পনা আর বেদনা ছাড়া আর কি যে করা যাইতে পারে তা অরুণাংশু ভাবিয়া পায় না। অরুণাংশু কবি হইলে কবিতা লিখিত। কিন্তু ওর মনে প্রকাশহীন ব্যাকুলতা ছাড়া আর কিছু নাই। তা ছাড়া বন্ধু বান্ধবের কাছেও একথা বলিতে ওর লজ্জা করে। আর বলিলেই কি তারা বুঝিবে,—হাসিবে কেবল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সময়ই অরুণাংশু বাড়ি ফিরিয়াছিল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে কিনা বাহিরে থাকিলে তা জানা যায় না। কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। জানলা দিয়া একখণ্ড জ্যোৎস্না আসিয়া ভিতরে এক গাল হাসি সুরু করিয়াছে।

অরুণাংশু নিঃশব্দে আসিয়া তার পাশে দাঁড়াইল। যেন এক তীর্থযাত্রী কোন্ এক পুণ্য সলিলের সমুখে আসিয়া শুব্ধ-সম্ভ্রমে নিশ্চুপ দাঁড়াইয়া আছে। কোনো ব্যাকুলতা নাই, কিন্তু মুগ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। এক মিনিট স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে অরুণাংশু নিজের হাতটা বাড়াইয়া দিল। তারপর আরো, আরো,—তার সমস্ত বাহু। তারপর সমস্ত দেহ,—তার সমস্ত মন। তার মন আর এখন বৈরাগ্যকঠিন নয়,—জীবনের মন্ত্রে সে সহজ হইয়া উঠিয়া সবার সঙ্গেই সুর মিলাইতে পারে। তার সব কিছুতেই আত্মহারা হইবার দিন আসিয়াছে। অনুভূতির তীব্রতায় সব মানুষই কবি হইয়া ওঠে।

কতক্ষণ যে অরুণাংশু এমনি আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিত কে জানে। সহসা রাস্তা হইতে ঢোল-ঢাকের বাজনা কানে আসিতে সে চমকিয়া উঠিল। উঠিয়া আসিয়া জানলা দিয়া চাহিয়া দেখে, একটা বিবাহের শোভাযাত্রা চলিয়াছে,—বাদ্য, আলো, দর্শক। তারপর ফুল-ঢাকা মোটরে বর আর কনে। অরুণাংশু হঠাৎ বারবার শিহরিয়া উঠিল। কে জানে এখান হইতে ছুশো মাইল দূরে মফঃস্বলের এক স্বপ্ন-ছাওয়া সহরের একটা অনতি-প্রশস্ত রাস্তা দিয়া কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সমুখে ঠিক এই সময়েই আর এক বর এবং আরেকটী অবগুণ্ঠিতা নম্র বধূ যাইতেছে কিনা। অসম্ভব কিছুই নয়,—আজ তো বিবাহেরই তারিখ দেখা যাইতেছে, হয়ত শুভদিনই হইবে।

ইজিচেয়ারটাতে গিয়া অরুণাংশু এলাইয়া পড়িল। অনেকদিন হয় সে বাড়ির চিঠি পায় না,—নইলে হয়ত বা খবর পাইত। যাক্, স্বপ্ন যা ছিল তাহাও আর বজায় রহিল না,—জাগরণের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

নিজেকে প্রবোধ দিবার অদ্ভুত পন্থা অরুণাংশুর। সে ভাবিতেছে, ঠিকই তো, একজনের না-পাওয়ার বেদনা পাইতেই হইত। স্বার্থপরের মত সে নিজের দুঃখটাই সব চাইতে বড় করিয়া দেখিতেছে কেন?

উপন্যাসে একজন নায়ক আর একজন তার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী সব সময়েই পাজী লোক হয়,—তার জন্য লোকের সহানুভূতিও হয় না। কিন্তু জীবনে সত্যই কি তা হয় নাকি? অরুণাংশুর আজ মনে হইতেছে জগতের বহু সাহিত্যিক কত লোকের উপরই যে অবিচার করিয়াছে তার ঠিক নাই। শুধু ব্যর্থ-প্রেমের বেদনা নয়, তাকে অপযশের কলঙ্ক দিয়া কত সহানুভূতিহীন পাঠকের কাছে তারা উপস্থিত করিয়াছে। এই হতভাগ্যদের অনেকেরই হয়ত আন্তরিকতা কম ছিল না, মনের বাসনায় তারা হয়ত উপায়হীন বেদনাতে কত ঘুম-হারা রাতে কাঁদিয়া কাটাইয়াছে, কিন্তু তাদের ব্যর্থ-সাধনার দাম কেউ দিল না। তাদের অখ্যাতি এক শতাব্দী আর এক শতাব্দীর কাছে পৌঁছাইয়া দিল।

চোখে হাত দিয়া এক সময় অরুণাংশু চমকাইয়া উঠিল,—এ কী, গাল বাহিয়া এত অশ্রু পড়িল কখন্?

বাঃ, কী সব ভাবিতেছে সে। আর সুজাতার যে বিয়ে হইয়া গেছে তাই বা সে ভাবিতে যায় কেন? নিশ্চয়ই

তবে জানা যাইত। আগের চিঠিতে সে জানিয়াছে সুজাতা এখনও ওখানেই আছে। কলেজ তো কবে খুলিয়াছে, তবু ওখানে কেন? ওর এখন আসিয়া পড়াই উচিত। কে জানে এখানে আসিলে কোনো দিন কোথাও দেখা হইয়া যাইবে কিনা! নিউ মার্কেট্, সিনেমার বাড়ি,—হ্যাঁ, অরুণাংশু এখন বিস্তর টকিজ্ শুনিতেছে,—কত জায়গাই তো দেখা হইতে পারে। তাছাড়া শুনিয়াছে প্রায় শনিবারই সুজাতা ওর দাদামশায়ের বাড়ি যায়। সে বাড়িটা কোন রাস্তায় অরুণাংশু তা জানে। কিন্তু এতই যখন সুজাতা দেরী করিতেছে, তখন কে জানে কি অনর্থ হইয়াছে। সুজাতার সম্বন্ধে রেণুর আরেকটু বেশী করিয়া লেখা উচিত,—কী বোকা মেয়ে,—ভাবে এ খবরটা বুঝি অরুণাংশুর কাছে একদম অবান্তর আর অ-দরকারী। তবে আশা করা যায় তেমন কিছু আর হয় নাই এর মধ্যে! কিন্তু যতই অরুণাংশু নিজেকে বোঝাক্, ওর নিতান্তই ভয় হইল। কে জানে হয়ত সত্যই আজ সুজাতার বিয়ে হইয়া গেল। সত্যই যদি তা হয়, তবে কী হইবে। ওরে, কী করিবে তবে সে? ধোৎ, মাথা গরম করিতেছে কেন মিথ্যেমিথ্যি। আজ হয়ত সারারাত আর ঘুম আসিবে না।

মাত্র দিন পনেরো হইল কলিকাতা আসিয়াছে। কিন্তু পরদিন ভোরবেলা উঠিয়াই সে ভাবিল,—ঈস্ মাকে অনেক-দিন দেখা হয় নাই। অর্থাৎ মাকে দেখিতে যাইবে সে একরকম ঠিকই করিয়াছে। তা হইলই বা পনেরো দিন,—মাকে মাঝে মাঝে যাইয়াই দেখিয়া আসা উচিত। এতদিন সে এতটা মাতৃভক্তি বোধ করে নাই, সেটা অবশ্য সত্যি কথা। কিন্তু ভুল শোধরান সবারই উচিত। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, মাকেই তো দেখিতে যাইতেছে সে। নইলে আবার কাকে!

বিস্তর দ্বিধা করিয়াও সন্ধ্যার পরেই অরুণাংশু ট্রেনে চাপিয়া বসিল। মা কি সামান্য নাকি? বিদ্যাসাগর সেই একবার মাতৃভক্তি দেখাইয়াছিল,—আর তারপরই অরুণাংশু দেখাইতেছে। ওকে সাঁতরাইয়া নদী পার হইতে হইল না বটে, কিন্তু জুতোর এক পাটী হারাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিজে সে পরদিন ঠিকঠিকই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া গেল। এবং জীবন-মরণ পণ করিয়া আবার সেই অশ্ব-আকর্ষিত কাঠের সিন্দুকে ঢুকিয়া পড়িল।

মা ভারী আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে নিশ্চয়ই। কিন্তু চিঠি লেখার মোটেই সময় ছিল না। তাছাড়া কী রকম চিঠি লেখা উচিত হইত তাও একটা ভাবনার কথা।

বাড়ি পৌছাইয়া গাড়ি বারান্দাটা পার হইয়া দেখে সমুখের দরজাটা তো বন্ধ। এত বেলায়ও ঘুম ভাঙিয়া ওঠে নাই নাকি কেউ। কুম্ভকর্ণের হাওয়া লাগিয়াছে নাকি গায়ে? মা তো খুব ভোরেই ওঠে। অরুণাংশু বুঝিল মা জাগিয়াছে নিশ্চয়ই। কাজও তার সুরু হইয়াছে। শুধু সমুখের দরজাটা এখনো খোলা হয় নাই।

দরজা ধাক্কাইয়া সে ডাকিল, মা, ওমা, খুলে দাওনা দরজাটা,—তোমার লক্ষ্মী ছেলে এসেছে।

ভিতরে একটা পদশব্দ। তারপরই বোঝা গেল দরজা খোলা হইতেছে। সহসা চীৎকার করিয়া মাকে ভ্যাংকাইয়া দিবে নাকি? যাক্, তার আর দরকার নাই, তাকে দেখিয়া অমনি মা কেমন যে চমকাইয়া উঠিবে তা আর বলা যায় না।

দরজাটি খুলিল। অরুণাংশু বলিতে গেল, মা। কিন্তু দীর্ঘ এক জোড়া গোঁফ দেখিয়া থাব্ড়াইয়া গেল। কোথায় মা,—বাড়ির মালি শিবশরণই দরজাটা খুলিয়া দিয়াছে। এ ঘরে তো চাকর-বাকররা শোয়না কখনো, ব্যাপার কী?

মা ঠাকুরুণ চলে যাবার সময় তোকে এঘরে থেকে জিনিষপত্র পাহারা দিতে বলে গেছেন? কোথায় চলে যাবার সময়রে? বাড়ি নেই নাকি মা। কেউ নেই? সবাই চলে গেছে? কোথায় গেছে তাই বল্‌না, গাধা কোথাকার,—মূর্খের মত হাস্‌ছে,—আমি জানব কি করে? কলকাতার থেকে এখানকার সব কিছু দেখা যায় নাকি? কলকাতায়? কবে গেছে? কাল রাত্তিরে?

অরুণাংশু ভাবিয়াই পাইল না কলিকাতায় যাইবার হঠাৎ কোন্ প্রয়োজন হইল। বিশেষতঃ কোন চিঠিই সে পায় নাই। তাছাড়া এই লোকটা ছাড়া চাকর বাকররা পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়াছে। অসুখ বিসুখ হয় নাই তো

কারুর। মালিটাকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল মোটেই কারুর অসুখ বিসুখ নয়। এবং মালিটার ইচ্ছা অসুখ বিসুখ শুধু মাত্র বাবুদের শত্রুদেরই এক চোটিয়া হোক্। অত্যন্ত রহস্য জনক মনে হইতেছে কাণ্ডকারখানা।

এমন অবস্থায় প্রসন্নবাবুর বাড়ি যাইবার অত্যন্ত সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। আর ব্যাপারটা প্রসন্নবাবু জানিলেই তাকে হয়ত ওখানেই আজ থাকিতে হইবে। হয়ত কেন, এটা নিশ্চয়। একটা সম্পূর্ণ দুপুর হয়ত কাটিবে ঐখানে,— হ্যা, ঐ বাড়িতে। কে জানে সুজাতা এখানেই আছে কিনা। তার থাকা অন্ততপক্ষে উচিত।

কিন্তু বাদামগাছটা পার হইতেই তার চোখে পড়িল ও-বাড়ির দরজা-জানলাও সব একদম বন্ধ। অরুণাংশু আগাইয়া গেল। দেখিল, বাহিরের দরজায় একটা বিরাট্ তালা সগর্ব্বে পাহারা দিতেছে। কী হইল,—বদলী হইয়া গেল নাকি প্রসন্নবাবু? সর্ব্বনাশ! কিন্তু দূর, তাই বা কেন হইবে। এক সপ্তাহ আগেও সে চিঠি পাইয়াছে,— তাতে প্রসন্নবাবুর বদলীর কোনো কথাই লেখা নাই। তা ছাড়া সেইদিন তো আসিল এখানে! কিন্তু এ-বাড়ি ও-বাড়ি দু-বাড়িরই হইল কি? সহরটায় প্লেগ লাগিল নাকি? কিম্বা আশেপাশে কোথাও একটা আগ্নেয়গিরি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বা। নইলে সবারই এমনতর সহরটা ছাড়িবার হেতু কি? মহাভারতে বকাসুরের দৌরাত্ম্যের কথা পড়িয়াছিল। কিন্তু মহাভারতের যুগ ফিরিয়া আসা সম্ভবপর মনে হয় না।

সুজাতাদের সেই বন্ধ বাড়িটার সমুখে অনেকক্ষণ অরুণাংশু অমনি হাঁটিয়া বেড়াইল। সমস্ত বাড়িটা যেন প্রায় ওর ব্যর্থ আশাকে ঠাট্টা করিতেছে। কিন্তু অরুণাংশুর তীর্থের মত মনে হইতেছে এখানটা,—অথচ তার আর কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না একটী কারণ ছাড়া। সেটী শুধু এই,—ওর কত নিদ্রাহীন রাতের স্মৃতি জড়াইয়া আছে এখানটায়।

কিন্তু শুধু স্মৃতি কপ্‌চাইয়া তো আর পেট ভরে না। ক্ষিধায় চোটে ক্রমেই অরুণাংশুর পেট আর্ত্তনাদ সুরু করিল। এর কাছে প্রেম-বেদনাও হার মানে, এমনি তার দাপটা। কিন্তু নিজেদের বাড়ি ফিরিবারও উপায় নাই। মালিটা বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা করিবে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। অরুণাংশু অত্যন্ত সজোরে তাকে মানা করিয়াছে। বলিয়াছিল, অন্য জায়গায় তার নিমন্ত্রণ আছে। হায় রে, নিমন্ত্রণ!

অগত্যা সন্ধ্যায় কলিকাতা—যাত্রী গাড়ি না আসা পর্য্যন্ত অরুণাংশুকে ডাক্-বাঙলায় কাটাইতে হইল। মিথ্যা পয়সা নষ্ট, সময় নষ্ট,—প্রসন্নবাবুরাও যদি থাকে এখানে! এদের কি সবারই এক সময় বেড়াতে যাইবার সময় পড়িল না কি?

কে জানে কোথায় আছে সুজাতা,—কে জানে? হয়ত তার বিয়ে হইয়া গেছে, হয়ত—যাক্! এই জীবনে আর কোন দিন তার সাথে দেখা হইবে কিনা তাই বা কে বলিতে পারে। যার আবির্ভাবের সুর মনে দোলা দেয় নাই, তার বিদায়ের পূরবী চোখে জল ঘনাইয়া তোলে!

এগারো

সারারাত অর্দ্ধ জাগরণ, মাঝে মাঝে ষ্টেশান্ ও চীৎকার, তারপর আকাশের এক কোণা লাল হইয়া প্রভাত, ও শীঘ্রই কলিকাতা। রাতে শুধুমাত্র ঘুমান গেল না বলিয়াই আক্ষেপ ছিল। কিন্তু যাত্রা-শেষে অরুণের মনে নানারকম ভাবনা দেখা দিল,—হঠাৎ মা বাবা সবার কলিকাতা চলিয়া আসিবার কারণ কি? বাড়ির পাহারায় যে লোকটা আছে সেটা বলিয়াছে মোটেই অসুখ নয়। কিন্তু গাঁজাখোর ব্যাটাদের বিশ্বাস কি,—যা তা একটা বলিয়া দিলেই হইল। কিন্তু কথার ফাঁকে ফাঁকেই লোকটা যখন হাসিতেছিল তখন অসুখ বিসুখ নাও হইতে পারে।

কিন্তু কিছুই বলা যায় না। মানুষের শরীর,—রোগে পড়িতে আর কতক্ষণ। বাস্-এ চাপিয়া বসিয়া ঘুম-আমিলিত চোখে অরুণাংশু ভাবিতে লাগিল। আচ্ছা, অসুখ যদি হয়, কার অসুখ? বাবার? মা'র হয়ত। হয়ত বা রেণুকার। যা রোগা মেয়েটা,—অমন রোগা হইলে কী করিয়া যে বাঁচা যায় এক সময় অরুণাংশুর সেটাই পরম বিস্ময়কর মনে হইত। বিচিত্র নয়,—হয়ত ওরই অসুখ। বেশী বোধ হয়, নইলে হঠাৎ আর একেবারে কলিকাতা চলিয়া আসিবে কেন!

বেণীটা যখন তখন সজোরে টানিয়া দেওয়ার সময় মনে হয় না, কিন্তু রেণুকার জন্ত মনে কতটা যে স্নেহ জমা আছে তা এই রকম সময় মনে হয়। ঠাট্টা করিয়াই হোক আর যা করিয়াই হোক, ওর বেণীটা বড় বেশী জোরে টানা হয়। ও কিছু বলে না বটে, কিন্তু ব্যথা পাওয়া স্বাভাবিক। এবার হইতে ঠিক অমনটা আর করিবেনা অরুণাংশু।

কিম্বা ওসব কিছু নাও হইতে পারে। কলিকাতায় তাদের যে বাড়ি তৈরী হইতেছিল সেটা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে প্রায়। কে জানে তারই গৃহপ্রবেশ করিতে আসিয়াছে কিনা সবাই। একটা ভারী মজার কথা মনে পড়িয়াছে,—মাথা খারাপ না হইলে এমন কল্পনা কারুর হয় না। হয়ত সুজাতারাও এই গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে মা বাবার অতিথি হইয়া আসিয়াছে। হা হা,—কী যে ভাবে আজগুবি সব তার ঠিক নাই।

বাস্‌টা ছুটিয়া চলে,—মনও। উত্তুরে হাওয়া আসে। সবুজ ময়দানটা চোখে পড়ে। কল্পনাটা যদি সত্য হইত! নিশ্চয়ই এটা কাল সারারাত্রি জাগার ফল,—মাথাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঐ তো একটা হাঁসপাতালের লাল উঁচু বাড়িটা দেখা যায়। কত রোগ, কত দুঃখ কত আর্ত্তনাদ ওখানে জমা আছে। নাঃ,—আর কিছু নয়; অসুখই হইয়াছে কারুর। হয়ত রেণুকার,—কী রোগা মেয়ে, অসুখ হইলেও বাঁচিবে তো! যারা পৃথিবীর সেরা, তাদেরই নাকি আগে মরণের ডাক আসে,—তারা, যারা শুধুমাত্র ক্ষণিকের জন্ত শাপগ্রস্থ হইয়া ধরণীতে আসিয়াছিল। নিশ্চয়ই রেণুকার কিছু হয় নাই,—এমন লক্ষ্মী মেয়ে রেণুকা। অরুণাংশু ওকে একটা ফাউন্টেন্ পেন্ কিনিয়া দিবে।

বাস্‌-ষ্টপ্ হইতে নামিয়া একটু হাঁটিলেই বাড়ি। ভিতরে ঢুকিতে ঢুকিতে এতক্ষণ পরে অরুণাংশুর খেয়াল হইল, ঠিক কথা, সাজাইয়া গুছাইয়া কি মাকে বলিতে হইবে তা ঠিক করা হয় নাই তো,—অপ্রস্তুত অবস্থায় যা-তা একটা জবাব দিয়া শেষে জব্দ না হইতে হয়। কোথায় গিয়াছিল অরুণাংশু? বন্ধুর বাড়িতে?—না টাটার লোহার কারখানা দেখিতে, না সুন্দরবন-যাত্রী ষ্টীমারে হাওয়া খাইতে? যে কোন্ একটা হইলেই হয়,—কিন্তু মুখ দিয়া যেন বাহির হইতে দেরী না হয়।

সিঁড়িতে পা দিতেই মা'র সাথে দেখা,—নীচে নামিতেছিলেন। অরুণাংশুকে দেখিয়াই তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন, কোথায় গিছ্‌লি তুই?

প্রশ্ন হইলেই তার একটা জবাব দেওয়া সবার আগেকার কর্ত্তব্য। অরুণাংশু কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব বোধ করিল না। প্রশ্নের জন্ত জবাব না দিয়া সে মার চেয়েও বেশী চেঁচাইয়া উঠিল, কার অসুখ?

অসুখ?

ওঃ। তবে, গৃহ-প্রবেশ করে?

গৃহ-প্রবেশ!

না হয়, হাওয়া খেতে মধুপুর কবে যাবে?

মধুপুর!

তবে,—তবে এমন হঠাৎ এসেচ কেন তোমরা এখানে?

চিঠি পাস্‌নি বুঝি?

নাঃ।

ও আমার পোড়াকপাল!

মা একটু হাসিলেন। কোথায় একটা সম্পূর্ণ জবাব দিবে না তার জায়গায় হাসি,—মা'র জ্বালাতনে আর পারা যায় না।

অরুণাংশু কহিল, শুধু হাসলেই জানা যায় বুঝি হঠাৎ কেন এসেচ?

মা কহিল, জানা যায় না বুঝি পাগলা।

নাও,—বোঝো। হাসিলে বুঝি জগতে আর কথা বোঝা যায়। তবে কথা সৃষ্টির আর দরকার ছিল কি। হাসিলেই তো হইত। তাছাড়া ক্রস্‌-ওয়ার্ড পাজল্ অরুণাংশু কখনোই মীমাংসা করিতে পারিত না। সে চটিয়া মটিয়া বলিতে যাইতেছিল, আহা বলোই না! কিন্তু তার আগেই মা প্রশ্ন করিলেন, তুই দুদিন ধরে কোথায় ছিলি বল তো?

অরুণাংশু কহিল, দুদিন?

পরশু রাতেই তো গিয়েছিলি চাকরটা বল্লে।

হ্যাঁ তা বটে।

কোথায়?

কোন্‌টা বলিবে অরুণাংশু? বন্ধুর বাড়ি, টাটার কারখানা, না সুন্দরবন-যাত্রী ষ্টীমার? কিন্তু তাড়াতাড়ি সব গুলাইয়া যায়। যেখানে একটা বলিলেই একটা সদুত্তর হয়, সেখানে একেবারে তিন তিনটাই গেল জড়াইয়া। অরুণাংশুর মুখ দিয়া তাড়াতাড়িতে বাহির হইয়া গেল, সুন্দরবনের ষ্টীমারে টাটানগর বন্ধুর বাড়িতে।

মা অবাক্ হইয়া কহিলেন, ষ্টীমারে টাটানগর?

অরুণাংশুর অবস্থা তো তখন কাহিল। সারিয়া সে কহিল, তা ষ্টীমারে যাওয়া যায় বৈকি। কিন্তু আমরা প্রথমটা,—বুঝলে মা,—সুন্দরবনের ষ্টীমারে একটু বেড়িয়ে, বুঝেচ শেষে টাটানগর।

মা কহিলেন, ওঃ।

এক মিনিট চুপ্। অরুণাংশু কি প্রশ্ন করিতে গেল, কিন্তু অগ্রসর হওয়া হইল না। মা মিটিমিটি হাসিতেছে। ব্যাপার কী? মুখে হয়তো বা গাড়ির কালি লাগিয়া বদনখানাকে খাসা দেখাইতেছে! কিন্তু এমন সময় মা কহিলেন, তোর বন্ধুবান্ধব কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে এবার শীগ্‌গির করে ক'রে ফেল,—আর তো এক হপ্তাও নেই।

বন্ধুদের নিমন্ত্রণ? সপ্তাহও নাই? অরুণাংশুর কাছে প্রথমটা এর অর্থই বোধগম্য হইল না। বোকার মত দুই তিন সেকেণ্ড বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া তারপর কহিল, কী?

মা কহিলেন, কী? কী আবার, বিয়ে।

অরুণাংশু বলে, বিয়ে? কার বিয়ে?

হাসিয়া মা কহিলেন, কার আবার,—তোর।

অরুণাংশু ঠিক শুনিতেছে তো? না এটাও ট্রেনে রাত্রি জাগার কুফল। কিন্তু একী কাণ্ড,—এ রকম কি সত্য হওয়া উচিত। চিঠি নাই, পত্র নাই, এ সম্বন্ধে অরুণাংশুর মতামত জিজ্ঞাসায় অপেক্ষা নাই,—বিয়ে বলিলেই হইল! আস্পর্দ্ধা দেখ,—বিয়ে করিবে নাকি অরুণাংশু কখনো,—হাঁ, অবশ্য একজনকে ছাড়া। কিন্তু কোন্ জগৎ হইতে মা বাবা কোন্ নোলক-পরাকে টানিতে যাইতেছে কে জানে। অবশ্য নিজের কাছে গোপন করিয়া আর লাভ নাই, অরুণাংশুর বুকটা দুরুদুরু করিতেছে। কাল তো সুজাতাদের বাড়িটা বন্ধ দেখিয়া আসিয়াছে সে। তার একটু আগের কল্পনাকেও ছাড়াইয়া উঠিবে নাকি বাস্তব? স্বর্গটা এমন দুলিতেছে কেন,—মর্ত্ত্যে আসিয়া ছোঁয়া লাগিবে বুঝি! জীবনে স্বপ্ন কি সত্য হইয়া উঠিয়াছে কোনোদিন? এই আকস্মিকতা প্রত্যেকটা শিরায় এম্‌নি শিহরণ তুলিয়াছে যে তার তুলনা নাই, উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অরুণাংশু চটিয়া যাওয়া আর আগ্রহ, এই দুয়ের মাঝামাঝির একটা সুরে কহিয়া উঠিল, অথচ আমাকে একবার না জিজ্ঞেস করে যার তার সাথে—

মা কহিলেন, তোর মত নিয়ে বিয়ে দিতে হলে চিরজন্ম এমনি আইবুড়োই থাক্‌তে হ'তো তোকে।

অরুণাংশু কহিল, কিন্তু—

মা কহিলেন, কিন্তু আবার কি। সুজাতার মত লক্ষ্মী মেয়ে আর পাওয়া যায় বুঝি? যা যা ফাজলামো করিস নে।

তবে সত্যি, সত্যি যে। এ কী স্বপ্ন, না যাদু, না কী এ। অরুণাংশু বিশ্বাস করিতে পারে না,—এতটা হওয়াও কি সম্ভব। তার তীব্র ব্যাকুলতা, তার নীরব চাওয়া তার গভীর রাতে কাঁদা এমনি করিয়া যে সার্থক হইয়া উঠিবে ভাবিতেই পারে নাই সে। আজ উঠুক একটা সুরের তুফান, আকাশের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্তে সাতটা রঙ্ ঝলমলাইয়া উঠুক, আজ নাচের দোলায় দুলিয়া উঠুক সকল সৃষ্টি চরাচর!

এখন অরুণাংশু শুধু জাগার স্বপ্ন দেখে। আর ছ'টা দিন, তারপর,—হ্যাঁ তারপর—। আর শুধু পাঁচ দিন, চারদিন, তিনদিন, দুদিন, একদিন মাত্র। এক একটা দিন তার শিরাগুলিকে এমনি করিয়া নাচাইয়া চলে যে আর বলা যায় না। জগতের এক অপরিচয়ের কোণায় এক নারী ছিল, আর সে ছিল আরেক অন্ধকারে, কোন্ মন্ত্রে দুজনের মিলনের লগ্ন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

বিয়ের দিন দুটো শুভলগ্ন আছে। মা অরুণাংশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কোনটায় বিবাহ তার মত।

অরুণাংশু মোটেই রাত জাগিতে পারে না,—শুধু এই রাত জাগিতে পারে না বলিয়াই আগের লগ্নে বিবাহে মত দেখায়,—আর কিছুর জন্ম নয় কিন্তু। কাজে কাজেই জোগাড় সেই রকমই হইতেছে।

রেণুকার জন্ম আর পারা যায় না,—কী যে ফাজিল হইয়া উঠিয়াছে তা বলার নয়। অত জোরে ওর বেণী আর টানিবে না বলিয়া একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু সব প্রতিজ্ঞাই রাখিতে হইবে বুঝি?

রূপকথালোকের রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছে,—গ্রাম, অরণ্য, তেপান্তরের মাঠ, তারপরই রাজকন্যার দেশ। এক জনহীন স্তব্ধ প্রাসাদে অবশেষে রাজপুত্রের যৌবন-স্বপ্নের দেখা মিলিল। রাজকন্যার মুখটা স্পষ্ট চোখে পড়িতেছে,—তার নাম? হাঁ, তার নামও মনে হয় বৈকি, তরু মর্ম্মরের সাথে যে নামটা শোনা যাইতেছে, নদী যে নামটী ধ্যান করিতেছে সে নামটী—সুজাতা।

তারপর সুদীর্ঘ সাতটা দিন সপ্তম দিনে আসিয়া শানাইতে সুর তুলিল। এবং কি যে সুর তুলিল তা অরুণাংশু ছাড়া আর কেউ বুঝিল না,—এমনি ওস্তাদি সঙ্গীত সেটা।

ভোরবেলায় অরুণাংশু যথারীতি খাইতে চাহিল। অথচ যে প্রস্তাবটা না করিলেই মা অন্যান্য দিন বেজায় শঙ্কিত হইয়া উঠিত আজ সে কথা শুনিয়াই তার বিস্ময়ের সীমা নাই। অথচ অরুণাংশু তার হেতুই বোঝে না। বলে, আঃ, আর দেরী ক'রোনা, পেটে আমার কী বিপ্লব সুরু হয়েছে বোঝো না বুঝি?

মা কহিলেন, দূর লোভী, আজ খেতে আছে বুঝি! কিছুতেই আজ খেতে দেবোনা,—আজ খেতে নেই।

অরুণাংশু বাদানুবাদ করে। কিন্তু মুস্কিল তো ঐ খানটায়ই। মা'রা মোটেই লজিক জানে না। লজিকের উপর সম্ভ্রমও নাই। সেদিন অরুণাংশু মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে পাত্র এবং পাত্রী দুজনের বাপ মাই যখন এক জায়গায় ছিল তখন আর কলিকাতায় আসিয়া বিবাহের কোন্ প্রয়োজন ছিল। তার জবাব হয় অত্যন্ত খামখেয়ালী, যথা, মেয়েদের নিজের বাড়ীতে বিবাহ আর অরুণাংশুদের এই সূত্রেই নতুন বাড়ীতে গৃহ প্রবেশ। অরুণাংশু কিন্তু সেই খানে বিবাহ হইলেই বেশী খুসী হইত। যেই রাস্তাটার বাঁক ফিরিলেই বাদামগাছ এবং তার পরই একটা হলুদে রঙের বাড়ীর একটা অংশ মস্ত বড় একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ দিয়া আড়াল করা সেই পথটাতে তার অদ্ভুত স্বপ্ন জড়াইয়া আছে।

মা যখন কিছুতেই আর খাইতে দিল না তখন অরুণাংশু বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় উপস্থিত হইল। তার পরই চড়িয়া বসিল সমুখের বাস্‌টায়। খাওয়ার উদ্দেশে নয়,—ইতিমধ্যে খাওয়ার কথাটাও ভুলিয়া গিয়াছিল। অভিপ্রায়,—একটা গোপন অভিপ্রায় আছে বৈকি? নিউ-মার্কেটের দোকানগুলি এতক্ষণ খুলিয়াছে নিশ্চয়। একশো টাকার নোটটা আবার হারাইয়া না যায় যেন।

একটা জিনিষ কেনা হইল, কিন্তু সেটা একজন ছাড়া বর্ত্তমানে আর কেউ জানিবে না। আর সেও জানিবে,—এখন নয়, সন্ধ্যার পরে,—রাতে। কে জানে সুজাতার এটা পছন্দ হইবে কিনা। হয়ত হইবে।

দোকানটা হইতে বাহির হইতেই বন্ধু অজয়ের সঙ্গে দেখা। সর্ব্বনাশ, অজয়ের কথা তো অরুণাংশু স্রেফ্ ভুলিয়া গিয়াছিল। নিমন্ত্রণের চিঠিও একটা দেওয়া হয় নাই ওকে। মাটি করিয়াছে,—তাড়াতাড়িতেও অজয়কে বাদ দেওয়ায় ওর লজ্জিত হওয়া উচিত।

অজয় চীৎকার করিয়া উঠিল, অরুণানন্দ স্বামী!

অরুণাংশু কহিল, চুপ্, একটা কলেজ হষ্টেল নয়।

অজয় ওর পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া কহিল, তারপর কি খবর,—এক যুগ হলো দেখা হয় না।

অরুণাংশু ঠিক করিল খবরটা একটু চাপিয়া রাখা উচিত। একটু পরে না হয় জানান যাইবে,—ওর উচ্ছ্বাসটা একটু কমুক, নইলে পিঠটার অবস্থা যা হইবে তা আর যাই হোক্ খুব লোভনীয় নয়।

অজয় আবার বলে, কি খবর তোর, বল না?

অরুণাংশু কহিল, খবর? নাঃ,—খবর নেই কিছু।

অজয় কহিল, চল্ না আমার সঙ্গে টিটাগড়ে,—দুপুরটা কাটিয়ে আসবি। দরকার আছে কিছু?

অরুণাংশু কহিল, কিছু নেই,—মোটেই কিছু নয়। কিন্তু একেবারে টিটাগড়?

ওঃ, তাতে কি হয়েছে। ইউ নো, আই হ্যাভ্ গট্ এ কার্। মোটরে যেতে আর কতক্ষণই বা লাগে।

চমৎকার প্রস্তাব। মা খাইতে দিল না, বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া এক পেট খাইয়া জব্দ করিবে মাকে। আর অজয় খাওয়ায় খুব ভাল। কিন্তু ব্যাপার হইতেছে, কাছাকাছি জায়গা তো নয়, একেবারে টিটাগড়!

অজয় কহিল, কিরে, ভয় পেয়ে গেলি না কি। চল্‌না,— যে সময় তোর ইচ্ছে মোটর করেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব,—পেট্রলের পয়সাও চাইব না।

অরুণাংশু কহিল, রাজী।

মোটরে চলিতে চলিতে অরুণাংশু ভাবিল এখনো ওকে বিয়ের কথা বলা হইবে না। খাইয়া দাইয়া দুপুরে আসিবার সময় ওকেও টানিয়া আনা যাইবে। এখন চুপ থাকিয়া গ্রামের শোভা দেখা যাক্।

অরুণাংশুর আর আক্ষেপ নাই। বিস্তর খাওয়া হইল। মার কাছে গিয়া সবিস্তারে ওর একটা বর্ণনা দিতে হইবে। দু-একটা পদ বাড়াইয়া বলিতেও আপত্তি নাই। যতটা বেশী খাওয়ার কথা বলিবে, মা ততটা বেশী জব্দ।

খাওয়ার পরে অজয় কহিল, দশ মিনিট আমি ঘুমিয়ে নিচ্ছি, তারপরই অ্যাট্ ইওর সার্ভিস্। খাওয়ার পরে দশ মিনিট না ঘুমোলে আমার চলে না।

অরুণাংশু কহিল, বেশ।

অজয় একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া পরক্ষণেই নাক ডাকাইতে লাগিল। অরুণাংশু খবরের কাগজটা চোখের সমুখে তুলিয়া আর একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়াছে। দশ মিনিট পরেই যাত্রা করিতে হইবে। বিয়ের আগে কী কী সব করিতে হয়,—এখানে আসা আজ ঠিক উচিত হয় নাই!

চমৎকার ইজিচেয়ারটা। দুপুরটায় সাড়াশব্দ নাই। খাওয়া হইয়াছে যথেষ্টের চাইতেও অনেক বেশী। শীঘ্রই অরুণাংশুর চোখ ঢুলিয়া আসিল। তারপরই চোখ বুজিয়াছে। এবং একটা শাঁখের শব্দে চম্‌কাইয়া চোখ মেলিয়া দেখে, একী সর্ব্বনাশ, পশ্চিমের আকাশে অস্তগত সূর্য্যের শেষ রঙের রেখাগুলি টানা, আর গাছের ধারে ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

অরুণাংশু লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। একী, এযে সন্ধ্যা আঁধার করিয়া আসিতেছে।

কী সর্ব্বনাশা ঘুমে পাইয়াছিল তাকে।

অজয় কহিল, কীরে, চমকিয়ে উঠ্‌লি কেন?

অরুণাংশু চীৎকার করিয়া কহিল, মোটর, শীগগির মোটর আন। আর একটি সেকেণ্ড দেরী নয়,—শীগগির।

চা না খেয়ে?

দুত্তোর চা,—ওরে আমার বিয়ে আজকে।

বিয়ে! তোর?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কথা নয়। পেট্রল আছে তো ভরা,— আলো আছে তো ঠিক।

ঘণ্টায় ক'মাইল পর্য্যন্ত চলতে পারে তোর গাড়িটা?

হুঁ হুঁ করিয়া মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে। পঁয়ত্রিশ, পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ,—আরো বেশী, ষাট্,—স্পীডোমিটারে অঙ্কটা লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িতেছে। একেবারে, 'কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী' ভাব অরুণাংশুর। মাকে জব্দ করিতে গিয়া এমন জব্দটাও তাকে হইতে হইতেছে।

এদিকে দুই বিয়ে বাড়ির লোকদের অবস্থা তো সঙ্গীন। অরুণাংশুর মার চিরকালই সন্দেহ ছিল তার ছেলের সংসারে আসক্তি কম। গৌতমকে তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়া যে পাশে আটকাইবার প্রয়াস ছিল অরুণাংশুর মায়ের মনের ইচ্ছাটাও ছিল অনেকটা সেই ধরণের। গৌতম বিবাহের পরে পালাইয়াছিল,—অরুণাংশু কি তার আগেই সংসার ছাড়িল না কি?

সে রাতে অরুণাংশুর বিবাহ হইল না এমন নয়। আগের লগ্নটা পার হইয়া গেলেও বেশী রাতে আর একটা ছিল। কিন্তু হায়, বিবাহের ইতিহাসে বিবাহের দিন বরকে এমনতর সবাই বকিবে এমন শোনা যায় নাই। কিন্তু অরুণাংশুর কিছুই সহজে হয় না। ও যতই বুঝাইতে চায় যে ওর দোষ এতে মোটেই ছিল না, ততই এরা সব অবুঝ হইয়া ওঠে। কিন্তু সব চেয়ে রক্ষার কথা আর একটা লগ্ন আছে।

বিয়ে বাড়িতে শানাই আবার জোর করিয়া উঠিল। আলো, কোলাহল, উলুধ্বনি, তারপর শুভদৃষ্টি। এ কী

সুজাতার মুখ, না স্বপ্ন একটা। এমন দুটী চোখের জগতে আর তুলনা নাই। এ কী যে দেখিল এবং কী যে না দেখিল অরুণাংশু তাহাই প্রায় ভাবিতে পারে না। প্রথম যৌবন-বিহ্বল রাতে যে স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল আজ এই শুক্লারজনীতে তাহা সত্য হইয়া উঠিল। স্বর্গ এতদিন পরে মর্ত্ত্যে ঠেকিল আসিয়া।

যাক্ বিয়ে হইয়া গেল।

কিন্তু কুসুমে যেমন কীট, চাঁদে যেমন কলঙ্ক এবং মাছে যেমন কাঁটা, তেমনি বিয়ের সঙ্গে আছে রঙ্গ-পরিহাস। চারদিকে ভীমরুলের মত একরাশ নারী তাকে ঘিরিয়া ধরিয়া ক্রমাগত কথার হুল ফুটাইতে লাগিল। কথা খুঁজিয়া না পাইলে অরুণাংশুর হাতটা নিশপিশ করিতে থাকে,—একটা ঠিক মত জবাব দেওয়ার চাইতে একখানা ঘুষি বসাইয়া দেওয়া ঢের সোজা। কিন্তু উপায় নাই কিছু,—মেয়েরা ঘুষি-অস্পৃশ্য! মেয়েদের এদিক দিয়া বেশ সুবিধা আছে।

বিয়ের বাড়ির ঝড় অনেকটা কাটানো গেছে। আজ কাল সময় পাইলেই অরুণাংশু পরিহাসের জবাব শানাইয়া রাখে,—কিছু উন্নতি হইয়াছে। এমন সময় একদিন ঠোঁট ঘুরাইয়া বাঁকা কটাক্ষ হানিয়া শ্রীমতী সুজাতা কহিল, কী—ই?

অরুণাংশু গম্ভীর হইয়া কহিল, কি।

'কি সন্ন্যেসী ঠাকুর, নারী মানবের কি হয়?

'শত্রু'।

ঈস্! তবে যে বড় আবার বিয়ে করা হলো।

অরুণাংশু গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া কহিল, শত্রুকে চোখে চোখে রাখা নিরাপদ,—স্বামী প্রস্তরানন্দ বলে গেছেন। বিবাহের বন্ধন দিয়ে বন্দী করে রেখে দিলুম।

'বটে,—কে বন্দী করে দেখাচ্চি' বলিয়া সহাস্যে সুজাত অগ্রসর হইল।

অরুণাংশু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, হায় স্বামী প্রস্তরানন্দ, হায় তার পুস্তক!

সমাপ্ত

শ্রীসুবোধ বসু

আমরা মানুষ

আশু চট্টোপাধ্যায়

আমরা মানুষ এই আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়,
শাপ-ভ্রষ্ট দেব নহি, দেবতার চেয়ে মোরা বড়
ভঙ্গুর মোদের দেহ, তবু দূর-দৃষ্টি মহত্তর,
মোরা বিধাতার সৃষ্ট, তবু মোরা বিধির বিস্ময়।
ক্ষণিকের জপমন্ত্রে গাহি মোরা জীবনের জয়,
পথের ধূলির 'পরে নিকুঞ্জ-কুসুম করি জড়ো
আমাদের কল্প-লোক দেবতার স্বর্গ হ'তে বড়,
মোদের নশ্বর প্রাণে জাগে দৃপ্ত সুচির নির্ভয়।

প্রখর মধ্যাহ্ন রৌদ্রে লভিয়াছি জীবনের স্বাদ
রাত্রির অঞ্চল ছায়ে হেরিয়াছি লাবণ্য মৃত্যুর
অশ্রুর গভীর ছন্দে পাইয়াছি পূর্ণের সাক্ষাৎ।
ভালবাসিয়াছি আর হইয়াছি বিরহে বিধুর
দেবতার চেয়ে তাই আমাদের মিলনের রাত
অনেক গভীরতর, তীব্রতায় অনেক মধুর।

পরম পরিহাস

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এ ব্রহ্মাণ্ডে একেলা একেলা
কেবা যেন করিতেছে খেলা
যুগ হ'তে যুগান্তরে ;
তুমি আমি রাম জন হ্যারি
তৃণ গুল্ম প্রজাপতি ডাইনোসোর ম্যামথ ঈগল
তারি ছায়া মায়া তার কেবল ইঙ্গিত।

এ ব্রহ্মাণ্ডে একেলা একেলা
কেবা যেন করিতেছে খেলা
যুগ হতে যুগান্তরে ;
তুমি আমি রাম জন্ হ্যারি
তৃণ গুল্ম প্রজাপতি ডাইনোসোর ম্যামথ ঈগল
তারি ছায়া মায়া তার কেবল ইঙ্গিত।

চোখে পড়ে সৃষ্টি মাঝে ভীম রুদ্রলীলা
নিষ্ঠুর আলোক মাঝে,
ক্রূর হিংস্র জীবনের গতি
কী আনন্দে ছুটে চলে নটরাজ-নৃত্য-তালে-তালে,
নাহি কোন অনুতাপ নাহি অশ্রু চোখে
গহন আনন্দে যেন প্রমত্ত জীবন :—
কী পুলকে মার্জ্জারেরা করে খেলা মূষিকেরে লয়ে,
শার্দ্দুলেরা দংষ্ট্রাঘাতে চেরে ছাগশিশু,
গভীর অরণ্যহ্রদে কী উল্লাসে হিংস্র পশুরাজ
মৃগকণ্ঠ-নালী চিরি পান করে শোণিতের ধারা,
কী উল্লাসে ইয়াগোয়া ওথেলোর করে সর্ব্বনাশ,
কী উল্লাসে দেখে তারা ভস্ম হ'য়ে যেতে
দুইটী প্রসূনসম প্রণয়-হৃদয় :—
কে কাহারে দেয় ব্যথা ? কে কাহারে করে উৎপীড়ন ?
আপনারে দুই করি' কে চির খেলিছে মৃত্যু-খেলা
ছিন্নমস্তা-সম কে যে আপনারে আপনিই করিছে হনন।

দিকে দিকে চোখে পড়ে করুণ কাহিনী
অশক্তের আত্ম-অপমান।
চাতক মেঘেরে ডাকে—দাও দাও দাও মোর পিপাসা
মিটায়ে,
দাবদগ্ধ পৃথ্বী ডাকে মেঘপানে চাহি—দাও মোর
হৃদয় জুড়ায়ে,
শীত ডাকে বসন্তেরে, নিদাঘ প্রাবৃটে ডাকে মিনতির
সুরে,
রিক্ত ডাকে পূর্ণ তারে,
মৃত্যু ডাকে প্রাণপণে প্রাণের সঞ্চয়ে।—
দিকে দিকে চোখে পড়ে করুণ কাহিনী—
অন্ধ খঞ্জ পথপাশে বসি'
ডাকিতেছে পথিকেরে—দাও দাও দাও দুটী কড়ি ;
ভিখারী দাঁড়ায়ে নত ধনীর দুয়ারে
কহিতেছে—দাও দাও দাও তব স্বর্ণ এক কণা ;

—দিকে দিকে অন্ধ খঞ্জ আতুরের অশক্তের দুর্ব্বল
আকুতি—
পথিকেরা ফেলি দেয় দুই এক কড়ি বুঝি অন্ধের ঝুলিতে,
গবাক্ষের পথে ধনী ছুঁড়ি দেয় ভিখারীরে স্বর্ণ এক কণা।
দিকে দিকে চোখে পড়ে করুণ কাহিনী
অশক্তের আত্ম-অপমান।
কে কাহারে ভিক্ষা দেয়? কে কাহারে করে অপমান?
আপনারে দুই করি' কে যেন মাতিছে মন-ভোলা
অন্নপূর্ণা কাছে আসি' শিব যেন চাহি নেয় অন্ন
একমুঠি।
এ ব্রহ্মাণ্ডে একেলা একেলা
কেবা যেন করিতেছে খেলা
যুগ হ'তে যুগান্তরে;
তুমি আমি রাম জন হ্যারি
তৃণ গুল্ম প্রজাপতি ডাইনোসোর ম্যামথ ঈগল
তারি ছায়া মায়া তার কেবল ইঙ্গিত।

কে যেন নটিনী নাচে দিকে দিকে আনন্দের উড়ায়ে
অঞ্চল,—
নৃত্যপরা সেই দুটী চরণের নূপুরের ধ্বনি
বাজে বুঝি ভ্রমর-গুঞ্জনে,
বাজে বুঝি পাখীর সঙ্গীতে,
রাজে বুঝি সাগরের তটিনীর কল ছল তানে
ফুলের সৌরভে আর আঁখির সঙ্গীতে আর ভুরুর
ভঙ্গিতে:—
কিশোরের কিশোরীর ভালবাসাবাসি
সৃষ্টি করি' আনন্দের লক্ষ লক্ষ পরম নিমেষ—
আনন্দ পুলকে সব ভেসে যায়
চারিটি আঁখির তারা ভেসে যায়
দুইটী প্রাণের ধারা ভেসে যায়
দুইটী হৃদয়-তল ভেসে যায়
কোন্ এক মধুময় সমাপ্তির চরম আবেশে!
কে কাহারে ভালবাসে? কে কাহারে দেয় অবদান?
আপনারে দুই করি' কে যেন খেলিছে মধুলীলা
অর্দ্ধ নারীশ্বর যেন আপনারি রতিরসে আপনি বিহ্বল।

এ সংসারে চোখে পড়ে কত মধু লীলা
স্নিগ্ধ আলোক মাঝে—
নবীন বসন্তে আর নবীন যৌবনে
কী আলো উজলি' ওঠে মাধবী বিতানে আর
জ্যোৎস্না ধারায়,
হাসি ফোটে আঁখির তারায়,
হাসি ফোটে অধরের কোণে,
হাসির তরঙ্গে যেন ভেসে যায় তণুর তটিনী

এ ব্রহ্মাণ্ডে একেলা একেলা
আত্ম-ভোলা কেবা যেন করিতেছে খেলা
যুগ হতে যুগান্তরে;
তুমি আমি রাম জন্ হ্যারি
তৃণ গুল্ম ডাইনোসোর ম্যামথ ঈগল
তারি ছায়া মায়া তার কেবল ইঙ্গিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সব প্রেম প্রেম নয়

শ্রীমতী ইলা দেবী

বম্বে মেল ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা বেজে উঠল। বিনয়বাবু বললেন, 'জিনিষগুলো সব ঠিক আছে ত?—আর একবার দেখে নাও শ্যামল। এস স্বাতী, এইবার আমরা নামি।

বিনয়বাবু মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামলেন, শ্যামলও সঙ্গে নেমে এল।

বিনয়বাবুর স্ত্রী ধরা গলায় বললেন, "সাবধানে থেক বাবা, ঠাণ্ডা লাগিও না।—যাচ্ছ নতুন দেশে।" তিনি চোখটা একবার মুছে নিলেন।

শ্যামলের ম্রিয়মাণ মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয়বাবু বললেন, "ভারী ছেলে মানুষ, অত depressed হবার কি আছে? কত নতুনত্বের মাঝখানে যাচ্ছ cheer up! চিঠি দিতে ভুলনা যেন, সর্ব্বদা খবর পাওয়া চাই।"

"হাঁ, নিশ্চয়—" শ্যামল তাড়াতাড়ি চোখ নামালে, ছলছলানিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বেশী পাছে। তীক্ষ্ণ বংশীধ্বনি ট্রেনের আসন্ন বিদায় জ্ঞাপন করলে। শ্যামল স্বাতীর দিকে চাইলে; স্বাতীর রাতের মত নিবিড়, নদীর মত গভীর দুই চোখ,—প্রভাত সূর্য্যের আলোর মাঝে মধ্যাহ্ন তেজের যে সম্ভাবনা সঞ্চিত, বদ্ধ কুঁড়ির মাঝে ফাগুনলাগা বনের যে স্বপ্ন শায়িত,—স্বাতীর চোখ তারই বার্ত্তা জানায়;—ও চোখ যেন বিপুল কোন্ অজানার মাঝে মগন হয়ে আছে। স্বাতীকে কিছুই বলতে হল না,—শ্যামলের কিছুই বলা হল না, সে উঠে পড়ল গাড়ীতে। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সে মাথা ঝুঁকিয়ে রুমাল ওড়াতে লাগল—তার দুই চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। বাড়ী ছেড়ে বেশী দূর কোথায় যায় নি, বেশী দিন কখন থাকে নি। বাপমায়ের স্নেহে সে নির্বিচারে মগ্ন রেখেছে নিজেকে, মায়ের আঁচলে বাহিরের জগৎটা তার কাছে আড়ালে থেকেছে। শ্যামল তার আহার বিহার হতে তার আদর্শ, তার মতামত তার ভালমন্দ সমস্ত কিছুর ভার তার বাপমার ওপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিল। শুধু সে পাঠ্য মুখস্থ করেছে আর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। যোগাযোগে আজ এতদূরে ছিটকে পড়া শ্যামলকে বিকল করে তুলেছিল অনেকখানি। শ্যামলের পিতা তার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে রেখেছিলেন। স্বাতীকে শ্যামলের ভাল লেগেছিল অবশ্য অনেকখানি,—স্বাতীর মত মেয়েকে ভাললাগা কঠিন কিছুই নয়। আর শ্যামলের পিতামাতা তাকে নির্ব্বাচন করেছেন, তাকে ভাললাগা ছাড়া গত্যন্তর যে থাকতে পারে এমন ধারণা তার ছিল না। বিচার বুদ্ধি যথেষ্ট থাকলেও সেটাকে কাজে লাগাবার সুযোগ শ্যামলের কখন ঘটেনি; জগতের বিভিন্ন চিন্তাধারাকে বিবেচনার সঙ্গে বিচার করে নিজের মতামত গড়ে তোলার অবসর তার মেলেনি। যা দেখে এসেছে এতদিন, যা শুনে এসেছে বরাবার সেইটাকেই অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছে, সেটাকেই নিজের মত ধরে নিয়ে জোরের সঙ্গে জাহির করে এসেছে।

ক্লান্ত মনে শ্যামল চর্ম্মাসনের ওপর শুয়ে পড়ল; বিচ্ছেদ কাতর মনটা তার ছেড়ে আসা গৃহের আশে পাশে ঘুরছিল,—ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় সুদূর পল্লীগ্রামে এতক্ষণে তাদের গৃহে ছেলেদের পাঠের কলরব জেগেছে, তার পিতার তাসের আড্ডা আজ হয়ত ভাল করে জমছে না—সবাই তার কথাই বলাবলি করছে। রান্নাঘর হতে তার মা কাকে যেন ডাকছেন—শ্যামল পাশ ফিরে শুল। আর স্বাতী—কী সুন্দর সে! ওদের ধরণ ধারণের সাথে শ্যামলদের গৃহের আচার ব্যবহার মেলে না, তবু ওদের বাড়ীর আদর যত্ন, বিনয়বাবুর অমায়িক ব্যবহার, স্বাতীর মায়ের সস্নেহ কথাবার্ত্তা ভোলা যায় না। নানাকথা ভাবতে ভাবতে কখন

সে ঘুমিয়ে পড়ল। ট্রেনের তীব্র আলোর ছুরী ম্লান জ্যোৎস্নাকে বিদীর্ণ করে দূরে দুরান্তরে এগিয়ে চলল।

স্বাতী তখন নিদ্রাহারা নয়নে বাতায়নে তাকিয়ে ছিল। চাঁদের আলোর আবেশে চারিদিকের কাঠিন্য যেন তরল হয়ে এসেছে ;—ঘুমন্ত রাত্রিকে জড়িয়ে রয়েছে একটা শান্তশীতল স্বপ্ন।

স্বাতী ভাবছিল শ্যামলের কথা। তার সঙ্গে শ্যামলের পরিচয় বহুদিনের নয়। স্বাতীর পিতা রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, বিলাতে ছিলেন তিনি অনেক কাল। শ্যামলদের মত সনাতনপন্থী পরিবার হতে ভাবী জামাতা নির্ব্বাচন করাটা তাঁর পক্ষে কিছু বিস্ময়ের হয়েছিল ; আর শ্যামলের পিতার মত লোকের স্বাতীকে পুত্রবধূ করাতে সম্মত হওয়া আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার। তিনি সম্মত হলেন বিনয়বাবুর অর্থের প্রাচুর্য্য দেখে। আর বিনয়বাবু আকৃষ্ট হলেন শ্যামলের বিদ্যার বহর দেখে,—কখন সে পরীক্ষায় প্রথম ছাড়া অন্য স্থান লাভ করে নি। তিনি তাকে বাড়ীতে এনে পত্নীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রী আরো মুগ্ধ হয়ে গেলেন,—কী নম্র ধীর—আজকালকার ছেলেগুলো যেন কী,—কাউকে সমীহ নেই, আর শ্যামল চোখ তুলে চেয়ে কথা বলতে জানে না, সবতাতেই সায় দেয়—এত শান্ত! বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে রইল, স্থির হল শ্যামল বিলাত হতে ফিরলে বিবাহ হবে। শ্যামলের পিতা চেয়েছিলেন বিয়ে দিয়ে পাঠাতে বিনয়বাবু সম্মত হলেন না, বললেন স্বাতীও পড়াশোনা করুক ততদিন। বিনয়বাবুর স্ত্রী শ্যামলকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে আনাতেন তাঁদের কাছে। যাবার আগে শ্যামল এক সময় বলেছিল, "তোমায় আমি এক মুহূর্ত্ত ভুলতে পারব না স্বাতী,—এত ভালবাসতে আমি কাউকে পারিনি কখন!" হাতের ওপর চিবুক রেখে শয্যায় হেলে বসে স্বাতী সেই কথাই ভাবছিল। শাড়ীর আঁচল মাটিতে লুটিয়ে গেছে, কবরী শিথিল হয়ে কাঁধের ওপর নেমে পড়েছে,—কেশের গন্ধ, কুসুমগন্ধ, প্রসাধন সামগ্রীর গন্ধ ঘরময় গুমরে রয়েছে,—কক্ষে আবছায়া অন্ধকার,—এক ঝলক চাঁদের আলো শুধু মুকুরে পড়ে জ্বলছে। অনেকদিনের তুচ্ছ কথা আজ অশ্রুহাসির দোলা দিয়ে যাচ্ছিল স্বাতীর মনে। শ্যামল লাজুক প্রকৃতির হলেও স্বাতীর কাছে মতামত প্রকাশে দ্বিধা ছিল না। স্বাতীর কাছে সে একদিন বলেছিল, "তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে এ দৈবের লেখা, এ হতেই হবে, তা না হলে তোমায় এত শিগগির এমন ভাল লাগল কি করে?"

স্বাতীকে হাসতে দেখে বললে, "হাসছ যে!—তোমরা ভাব সব কিছুকে অবিশ্বাস করলেই খুব modern হওয়া যায়, তা মোটেই নয়।" স্বাতীর শুধু মনে হত দৈবক্রমে যদি শ্যামলের অপর কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হত, তাকেও হয়ত শ্যামল ঠিক অমনি করেই বলত—'তা না হলে তোমার এত শিগ্‌গির এমন ভাল লাগল কি করে?"

স্বাতীর সঙ্গে তার মতামতের অনৈক্য নিয়ে তর্ক হত প্রায়ই। স্বাতীর ধারণাগুলোকে খুব ঝাঁজের সঙ্গে সমালোচনার পর শ্যামল বলত, "অবশ্য এতে personal কিছু নেই, তোমায় উদ্দেশ্য করে আমি কিছু বলিনি, কারণ তুমি জগতের অন্য সব মেয়ের ওপরে।"—যেন জগতের অন্য সব মেয়েকে শ্যামল পরখ করে দেখে নিয়েছে।

স্বাতী বললে, "ওরে বাসরে, অত উঁচুতে ওঠাবেন না—পড়ে যাবার ভয় পায়ে পায়ে তাতে।"

শ্যামল অসহিষ্ণু হয়ে বলত, "Cynic হওয়া বুঝি তোমাদের ফ্যাসান,—ওতে কিন্তু বাহাদুরির কিছু নেই।"

শ্যামল এখনো এত সরল; বান্ধবহীন বিদেশে কত বিব্রত বোধ করবে হয়ত।—বাহিরের পানে তাকিয়ে স্বাতী ভাবল এতক্ষণে কোথায় কত দূরে চলেছে সে,—কত ধূ ধূ মাঠ পেরিয়ে ঘুমন্ত গ্রাম ছাড়িয়ে—কতদূরে নদী চলেছে যেখানে এঁকে বেঁকে, চাঁদের ছায়া ভাসছে জলে, সিক্ত সিকতায় চকিত হরিণ দাঁড়িয়ে, জ্যোৎস্নালোকিত জনহীন প্রান্তরে ঝোপে ঝোপে যেখানে বুলবুলের নীড়, কুঁচের কাঁটালতা লতায় গুচ্ছ গুচ্ছ আরক্ত ফল, বেতসাকীর্ণ বিন্ধ্যবনভূমির মাঝে মাঝে গিরিবর্ত্ম,—স্বাতীর কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে আরো কত দূরে—স্বাতী যদি পারত তার কল্যাণঘন দৃষ্টিতে শ্যামলের সারা পথের সব রুক্ষতা মুছে নিত।

দুবছর পরে। শীতের রৌদ্র মধুর মধ্যাহ্ন। লাল শাড়ীর ওপর শুভ্র শালটা জড়িয়ে স্বাতী বই নিয়ে বারান্দার

এসে বসল পাঠে। শীতের হাওয়ায় তালের পাতায় কাপন লেগেছে, শিমুল গাছের সবুজের ফাঁকে ফাঁকে ঘননীল আকাশ উঁকি দেয়,—কঙ্করাকীর্ণ লাল মাটীতে সামান্য সবুজের ছোঁয়া, কয়েকটা গরু চরছে, একটা ঝুরিনামা বটের তলে একঝলক স্বচ্ছ জল। স্বাতী বইটার পাতা উল্‌টে যাচ্ছিল, কিন্তু পাঠে মন দিতে পারছিল না। এই আলোভরা দ্বিপ্রহরের উদাস সুর মনকে তার অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল বারবার।

শ্যামলের সংবাদ বহুদিন আসে নি। সে দিন মেল ডে, নিয়মানুযায়ী দরোয়ান গেছে চিঠি আনতে। প্রথম প্রথম শ্যামলের বিচ্ছেদ-কাতরতায় ভরা দীর্ঘ চিঠি নিয়মিত আসত স্বাতীর কাছে। তারপর কাতরতার উচ্ছ্বাসটা কিছু কমতে সুরু করল ক্রমে ক্রমে,—চিঠিতে থাকত শ্যামলের বন্ধু বান্ধবীদের ব্যাখ্যা, কি আশ্চর্য্য দেশটা, কি রকম অত্যাশ্চর্য্য লোকেরা, মেয়েরা কি রকম অতিথিপরায়ণ, কালা আদমীর যেখানে লাঠ্যোষধি প্রাপ্য সেখানে কেমন সদয় অমায়িক ব্যবহার—এই সব কথা। তার জামার নীচে গায়ের রংটা কালো না সাদা, এই নিয়ে ছোট মেয়েদের কি তর্কাতর্কি, তার জন্যে মন কেমন করে শুনে গতযৌবনা landlady তাকে 'Silly child' বলে গালে ঠোকা দিয়েছে, মুদীর দোকানের মেয়ের সঙ্গে সে একদিন tramp করতে বেরিয়েছিল, তাতে মুদী হলেও পিয়ানো বাজাতে পারে—এই সব নানা বৃত্তান্ত।—পড়ে কখন কখন স্বাতীর রক্ত ওষ্ঠ ঈষৎ ব্যঙ্গে বিভক্ত হয়ে যেত,—শ্যামলের আদর্শের সাথে এ সব রীতি নীতির বিশেষ সামঞ্জস্য না থাকলেও শ্যামলের উৎসাহের অভাব ত বর্ত্তমানে বোধ হচ্ছে না। ক্রমে তাও কমে এল,—সংক্ষিপ্ত দুচার লাইন চিঠি মাঝে মাঝে। তাকে এই ক্রম ক্ষীয়মান পত্রধারার উল্লেখ করলে তার ওজরের অভাব হত না,—পরীক্ষা, দেশ দেখা, বন্ধু-বান্ধব, বিশেষ করে বান্ধবী, কোন দিক সে সামলায়। স্বাতীও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, বেশী সময় পেত না লিখতে। এমনি করে ওদের পত্র বিনিময় থেমেই গেছল একরকম।

দরোয়ান ডাক নিয়ে এল, শ্যামলের চিঠি দুখানা রয়েছে সেদিন, একখানা স্বাতীর নামে, একখানা বিনয় বাবুকে।

বই রেখে স্বাতী চিঠি খুলল। শ্যামল লিখেছে,—"তোমায় একটা কথা বলব আজ, হয়ত সেটা কিছু রূঢ় শোনাবে, কিন্তু আমি লুকোচুরির পক্ষপাতী নই, তাই স্পষ্ট কথা গুলো বলতে বাধ্য হচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়াটা ভেবে দেখছি সম্ভব নয়। কেবল মাত্র বিয়ের কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গেছে বলে সব দিক না ভেবে এত বড় একটা বন্ধনকে মেনে নেওয়া যাবে না। তোমার সঙ্গে আমার যে অল্পদিনের মৌখিক আলাপ তাকে বিয়ের একটা অন্যতম কারণ বলা হাস্যকর। তোমার যে বয়স সে বয়সে এখানকার মেয়েরা খেলে বেড়ায় এ-দেশে। সব প্রেম যে প্রেম নয়—সে কথা আমি এদেশে এসে বুঝলাম। সত্যিকার প্রেম কত যে গভীর তা এখানে আমি ক্রমে ক্রমে বুঝছি. তোমায় আমার এ নীরস বাঁধন থেকে মুক্তি দেবার জন্যে তুমিও আমায় ভবিষ্যতে ধন্যবাদ দেবে। এখন যদি আমার ব্যবহার কর্কশ লাগে তাহলে সেই কথাটা মনে রেখ যে one has got to be cruel in order to be kind—"

তালের পাতায় পাতায় উতল হাওয়ার মর্ম্মরানি তখনো শেষ হয়নি, পায়েচলা পথে বোঝা হাতে মেয়ে চলেছে, বটের তলে জলের কূলে গরু নেমেছে জল খেতে,—একটা কপোতের একটানা কূজন শোনা যায় কোথা হতে। এই রৌদ্রমুখর দিনটার পানে দীপ্তনেত্রে চেয়ে স্বাতী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার কালো দুই চোখে আলো ঝলসাচ্ছে, লাল সাড়ী আলোয় আগুন বরণ দেখাচ্ছে,—শুভ্র শালের ওপর কৃষ্ণ বেণীর বক্ররেখা, রৌদ্র তেজেই বোধ হয় মুখ তার অমন রক্তাভ হয়ে উঠেছে। তার কানে বাজছিল শ্যামলের বিদায়বাণী—"তোমায় আমি এক মুহূর্ত্তও ভুলতে পারব না—"। আজ সে জগৎকে দেখেছে, নিজেকে চিনেছে, আজ সে আবিষ্কার করেছে সব প্রেম প্রেম নয়;—শ্যামলের খাঁটি ভারতীয় আদর্শ, তার সনাতন পত্নীর মতামত,—কোন তিমিরে তলিয়েছে সে সব আজ কে জানে!

পরীক্ষায় স্বাতী কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হল। সংবাদ পেয়ে সে বিনয়বাবুকে যেয়ে বললে সে আরো পড়তে চায়; বিলেতে যেয়ে পাঠ সাঙ্গ করে আসতে তার আন্তরিক ইচ্ছা। বিনয়বাবুর স্ত্রী আপত্তি করলেন অতদূর যাবার কি দরকার,

এখানে থেকেই ত পড়া চলতে পারে। বিনয়বাবুরও তাই মত, কিন্তু স্বাতীর আগ্রহে শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের সম্মতি দিতে হল।

শ্যামলের প্রত্যাখ্যানে বিনয়বাবু অপমান পেয়েছিলেন অত্যন্ত বেশী,—ক্ষোভের তাঁর শেষ ছিল না। কিন্তু স্বাতী সেটাকে কি ভাবে গ্রহণ করলে কিছুই বোঝা যায় না। সে একটা সহজ আত্মসম্মানের স্বচ্ছ আবরণের আড়ালে রাখে আপনাকে, যেখানে সব বিদ্রূপ অপমান ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। যারা অন্তরে সমস্ত বিক্ষোভকে সমাহিত করে নেয় বাইরে শান্ত হয়ে থাকতে পারে তারাই,—তাদের আঘাত হয় আন্তরিক। তাই স্বাতীকে বাহিরে অবিচলিত দেখলেও তার মনের অবস্থা সম্বন্ধে তার বাপমায়ের সন্দেহ ছিল অনেকখানি। তার প্রতি এ দারুণ উপেক্ষার জন্যে দায়ী ছিলেন তাঁরাই কতকটা, সে কথা তাঁদের আরো ক্ষুব্ধ করে তুলত। স্বাতীর ইচ্ছায় বাধা দেবার প্রবৃত্তি তাঁদের হল না।

ওদিকে শ্যামলের বাপ বৃদ্ধ ভদ্রলোক সংবাদ পেয়ে— তাঁর তাসের আড্ডা ছেড়ে লম্ফ ঝম্প লাগিয়ে দিলেন দস্তুর মত। শ্যামলকে তিনি ত্যাজ্য পুত্রই করেন কি বেশ গুছিয়ে মহাভারত রামায়ণের দৃষ্টান্ত দিয়ে মস্ত এক চিঠি লেখেন স্থির করতে না পেরে ঘন ঘন তামাক খেয়ে নিলেন পঁচিশ ছিলিম। শেষে একদিন কোমরে চাদর বেঁধে ছাতা হাতে বিনয়বাবুর বাড়ীই গিয়ে হাজির হলেন। বিনয়বাবুর অর্থ তাঁর হাতছাড়া হওয়ার দরুণ তাঁর যে দারুণ শোক বিনয়বাবু তাতে সহানুভূতি বিশেষ দেখালেন বলে মনে হল না। সুগভীর নৈরাশ্যে বিদায় নেবার কালে ভদ্রলোক ছাতাটি ফেলে চলে গেলেন ভুলে।

বিনয়বাবু স্বাতীকে বম্বে অবধি পৌঁছে দিয়ে এলেন। ট্রেনের দীর্ঘযাত্রা, বন্দরে কোলাহল ও ব্যস্ততা, জাহাজের নীরস কলরব স্বাতীর চিত্তকে বিরস করে দিলে। কর্কশধ্বনি করে জাহাজ ছাড়ল, অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে বিনয়বাবু গ্যাংওয়ে দিয়ে নেমে গেলেন, স্বাতী কূলের পানে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শ্যামল সুন্দর ভারতের তটরেখা ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হতে লাগল। বন্দরের কর্দ্দমাক্ত লাল জল ক্রমে ক্রমে গভীর নীলে পরিণত হল। স্বাতী হঠাৎ যেন আপনাকে অত্যন্ত অসহায়, একেবারে একা বোধ করলে। তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা মুহূর্ত্তের জন্যে শিথিল হয়ে— গাল বেয়ে—চোখের জলে ঝরে পড়ল। ফেনশীর্ষ তরঙ্গে আর ধূসর আকাশে দিগন্ত একাকার হয়ে গেছে। এই সীমাহীন সশব্দ শূন্যতা স্বাতীর সমস্ত অন্তরকে ব্যথিত করে তুললে। কতদূরে পড়ে রইল তার পরিচিত নীড়,—অজানা অচেনা পথে তার যাত্রা সুরু হল, এখানে পরিচিতের সহানুভূতি নেই, আত্মীয়ের মমতা নেই। সে কেবল নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল—

> "পুরাণো আবাস ছেড়ে যাই যবে
> মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে—
> নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
> সে কথা যে ভুলে যাই।"

"মাপ করবেন, আপনি কি বাংলা দেশ থেকে আসছেন?" নিজেকে সংবরণ করে স্বাতী ফিরে চেয়ে বললে—'হাঁ।'

একজন যুবা উজ্জ্বল নেত্রে তাকিয়ে ছিল, বললে, "বাংলার নদী আর বাংলার মেয়ে দেখলেই চেনা যায়— তারা জগতের আর সবের থেকে পৃথক। যাক্, বাঁচা গেল। এবারে বাঙালী ত বিশেষ কাউকে দেখছি না।"

আলাপ করার উৎসাহ স্বাতীর ছিল না। ডেক ষ্টুয়ার্ড এসে তাকে সবিনয়ে জানালে মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা পড়ে গেছে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাতী নিজের কক্ষে যেয়ে আশ্রয় নিলে।

বাড়ীর জন্যে স্বাতী যা ভেবেছিল তার চেয়ে দেখলে তার মন কেমন করছে আরো বেশী। কেবিনের সেই সরু বিছানা, টুটাংখামেনের কফিনের মত,—নতুন রংয়ের গন্ধ, দেয়ালে কাঠের ব্র্যাকেটে গলা টিপে ধরা জলের ফ্লাস্ক,—একটা সরু সুড়ঙ্গের মত জায়গায় শেষে ছোট্ট একটা পোর্টহোল দিয়ে খানিকটা আকাশ আর খানিকটা সমুদ্র দেখা যায়—মাথার ওপর গোলাকার একটা ছিদ্র হতে হু হু করে বাতাস এসে মুখে লাগে—এরই মাঝে মনে পড়ে দেশের আলোকোজ্জ্বল প্রতিটি দিন, কেমন এক একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তাদের স্মৃতি স্বাতীকে বিচলিত করে তোলে।

তবে একলা থেকে মন খারাপ করার সময় স্বাতী বিশেষ পেত না। রাহুল তাকে নানা কাজে ব্যস্ত রাখত বেশীর ভাগ। সে আসছে মহীশূর থেকে, তাদের বহু টাকার ব্যবসা সেখানে। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে এর পূর্ব্বেও তাকে আসতে হয়েছে বিলেতে। স্বাতীর নির্লিপ্ততাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাহুল তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিত, তার ক্রমাগত অনুরোধে বাধ্য হয়ে স্বাতীকে কেবিনের কোণ পরিত্যাগ করে জাহাজের সব খেলাধুলায় যোগ দিতে হত। ক্রমে জাহাজের জীবন যাত্রা তার ভালই লাগতে লাগল। টেনিস সে খেলতে পারত চমৎকার। দেখা গেল জাহাজের ডেক্‌টেনিসেও সে কম যায় না। অনেকগুলো প্রাইজও পেল খেলার প্রতিযোগিতায়। রাহুলের হাস্যমধুর মিশুক স্বভাব, সকলের সঙ্গে তার আলাপ। স্বাতীর শাসন-প্রখর দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে তাকে পরিমিত করে দিত সকলের সঙ্গে। রাহুলের বিমুক্ত হাস্যোচ্ছ্বাসের সংস্পর্শে স্বাতীর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যও শিথিল হয়ে পড়ত মাঝে মাঝে।

লণ্ডনে স্বাতীদের ভারতীয় বন্ধু ছিলেন কয়েকজন। কলেজে ভর্ত্তি হওয়া, গৃহ নির্ব্বাচন প্রভৃতিতে কিছু দিন গেল, তারপর স্বাতী পড়া শোনায় সম্পূর্ণ ভাবে মনোনিবেশ করলে। ক্রমে তার মনে হতে লাগল যেন কলকাতাতেই আছে, এখনি ইচ্ছা করলে টিকিট কেটে ট্রেণে চড়ে বাবা মার কাছে চলে যেতে পারে।

মে মাসের শেষ হয়ে এল। গ্রীষ্মদিনের দীর্ঘাবকাশে কলেজ বন্ধ। গোধূলি আলোর দিন কেটে গেছে—এবার এল দেশের মতই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আকাশ, দীপ্ত সূর্য্যের কিরণ। পপ্‌লারের ঋজুতা, সিলভার বার্চের শুভ্রতার মাঝ দিয়ে শীর্ণা নদী লক্‌গেট থেকে উচ্ছ্বসিত গতিতে নেমে চলেছে—মাঝে মাঝে দু একটা পুরাণো সেতু নদীর এপার ওপারে জুড়ে আছে—জলের ধারে উইলো গাছের নতশাখা তরুণীর কেশের মত ঝুঁকে পড়ে জলকে ছুঁয়েছে—যেন কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল নদীতে গিয়ে মিশেছে। চারিদিকে সবুজের জোয়ার এসেছে,—মাঠের পরে মাঠ সবুজ হয়ে আছে। সমান করে ছাঁটা সবুজ বেড়া, গৃহের গায়ে গায়ে সবুজ লতা, গাছ পাতার গায়ে শ্যামলতা; ঘাসে ঘাসে ডেজীর লাজাঞ্জলি,—ব্লুবেল্, বাটারকাপ্, ড্যানডেলিয়ন্—বাগানের সযত্ন রচিত অযত্নতায় গোছা গোছা ড্যাফোডিল্—এ্যাপল্ গাছের কালো কর্কশ দেহ মোমের মত সাদা নরম গোলাপি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে;—ইন্দ্রধনুর রংয়ের পেয়ালা যেন ভেঙে কুচি কুচি হয়ে এই সবুজের মাঝে রংয়ের প্রাচুর্য্যে ছড়িয়ে গেছে। বসন্তের উচ্ছ্বসিত বাণী সংখ্যাশূন্য ফুলে মুখর হয়ে ফুটে উঠেছে। টিউলিপ্ ফুটেছে যেন সোহাগ চুম্বনের মত, ডালিয়া আলো করে আছে আইভিলতায় ছাওয়া প্রাচীরের ধারে ধারে। তরল সোণার মত বসন্ত দিনের আলোর রঙ,—সূর্য্য অস্ত গেলেও দিবার অবসান হতে দেরী,—দিনগুলো যেন বসন্ত-বিহ্বল ধরার প্রেমে পড়েছে, কত বিলম্ব পর্য্যন্ত জড়িয়ে থাকে, যেতে চায় না।

এই বসন্তের রঙ মানুষের প্রাণেও লেগেছে। অদূরে যে লোকটা বাজনা বাজাবার ছলে ভিক্ষা করছে দাঁড়িয়ে, তার বাজনায় সুর বাজছে "Oh! To be in England, now that summer is here"—তা শুনে বিপুলবপু পুলিসম্যানের কর্ত্তব্যকঠোর দৃষ্টিও যেন কোমল হয়ে এসেছে।

ঘনঘাসের মাঝে পা ডুবিয়ে বসে স্বাতী পত্র লিখছে। ঘাসের মাঝে স্বচ্ছপক্ষ পতঙ্গের গুঞ্জন শোনা যায়, কয়েকটা সোয়ালো নিঃশব্দে আনাগোনা করছে, কাছের ঝোপ হতে একটা কোকিল বিশ্রামপূর্ব উচ্ছ্বাসে সহসা মুখর হয়ে অমনি নীরব হয়ে গেল। স্বাতী লিখছে বান্ধবীকে "—ঠিক এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে এখানে। সোনালি একটা স্নিগ্ধ আভা আকাশে,—ভারি সুন্দর এ। খাতাছেঁড়া পাতায় লিখছি তোকে, মনে করিস না কিছু। যে দুজন মেয়ের সঙ্গে আমি এখানে "সপ্তাহান্ত যাপনে" এসেছি, তারা নিমন্ত্রণে যাচ্ছে, আমি বেড়াতে চলে এলাম বলে ভারি রেগেছে। ওরা বলে ভারতীয় mentality আর রাশিয়ান mentalityর similarity খুব বেশী নাকি। কী আশ্চর্য্য সবুজের ছড়াছড়ি এখানটায় যদি দেখতিস। লণ্ডনের 'ধোঁয়ায় ধুসর' আকাশ দেখে 'বাসর গেহের' কথা মনে হয় না, মনে হয়—পালিয়ে বাঁচি কোথাও। এখানে এসে স্নিগ্ধ হল চোখ। এতদিন হয়ে গেল তবুও জায়গাটা ভাল লাগাতে পারলাম না, ধাতস্থ হল না। এদের এ ব্যস্ততা এখনো আমার

ধাঁধাঁ লাগায়—কেউ কি ধীরে সুস্থে হাঁটতে শেখেনি এখানে!—কোনমতে পেরিয়ে যাওয়া,—কোথায় যেতে চায়? কোথা হতে কাকে পেতে চায়? এরাই কি তা জানে? এগিয়ে চলা, এই ত নেশা, সে চলার শেষ যেখানেই হোক। পরিবর্ত্তনে প্রবল বিশ্বাস, সে বিশ্বাস হয়ত আমরাও করে থাকি, কিন্তু বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করার আগে ভাবি বসে পাঁচবার। এদের ভাবার অবসর নেই, প্রয়োজনও নেই।—প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য যেখানে সেখানে ঠকার খরচে জমার খাতায় টান পড়ে না। অপরিতৃপ্তি আমাদের চেয়ে এদের কম নেই, কিন্তু জগৎসভায় মুখরক্ষা করা এই হল প্রথম লক্ষ্য। Conviction নিয়ে কথা নয়, মুখরক্ষা আগে। হিপক্র্যাসি আর ডিপ্লম্যাসির মাঝে যে পার্থক্যের সীমানা সেটা হল একটা জটিল জিনিষ। তুই দেশটাকে জানতে চেয়েছিস—জানার আছে অনেক যদি তার আগেই জানার শক্তিকে না হারিয়ে বসিস। তুই আমার বন্ধুদের জানতে চেয়েছিস;—বন্ধু কথাটা যেমন গভীর—কাকে তার মাঝে টানি?—"

একজনের সদা-উন্মুখ বন্ধুতা আপনা হতে স্বাতীর মনে জেগে উঠল। লেখনী বন্ধ করে সে মুখ তুললে। হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে—এত দেরী হয়ে গেছে! অনেক খানি যেতে হবে তাকে। চিঠি পত্র চর্ম্মাধারে ভরে ব্যস্ত হয়ে সে উঠে পড়ল। মাঠ ছেড়ে পথে উঠল যেয়ে। কয়েকজন ছেলে পথে যাচ্ছিল, স্বাতীকে আসতে দেখে রাহুল তাদের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললে বা রে! আপনি এখানে কোথা হতে?"

তাকে দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে স্বাতী বললে, "আপনিই বা কবে এলেন এখানে।"

"কবে কি, এইমাত্র। আমরা tramping এ বরিয়েছি। কার মুখ দেখেছিলাম যাত্রারম্ভে, আপনার দেখা মিলল। আপনার হোটেলটা কোন্‌খানে?"

"হোটেল ত ভারি,—বড় গোছের farm houseএর মত, অবিশ্যি খড় পেতে শুতে দেয় না। অনেকটা দূরে এসে পড়েছি মনে হচ্ছে?"

রাহুল স্বাতীর সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে বললে, "আপনার নাম আজকাল সকলের মুখে,—জানেন আপনি বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু আপনার দেখাত মোটেই মেলে না আজকাল, পড়ার জন্যে আমাদের পরিহার করেছেন এই হচ্ছে আমাদের নালিশ।"

রাহুলের পরিত্যক্ত বন্ধুর দল চটে বললে "এই রে, রাহুলের মেডিইভ্যাল্ শিভালরি সুরু হল! ওর আশা ছেড়েই দাও"—তারা চলে গেল।

স্বাতী বললে, "অনেক দেরী হয়ে গেছে—এ বেড়াটার পাশ দিয়ে গেলে বোধ হয় শিগগির যাওয়া যায়। কিন্তু আপনার বন্ধুরা ত চলে গেলেন!"

"গেছে,—বাঁচা গেছে।"

অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে, শিশিরে ভিজে উঠেছে ঘাস। স্বাতী একবার হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিলে—বোধ হয় ঘাসের তলায় খরগোসের গর্ত্ত ছিল। রাহুল হাত বাড়িয়ে বললে, হাতটা ধরুন—এখানটায় বোধ হয় অনেকগুলো গর্ত্ত আছে।" তার উত্তপ্ত হাতের মাঝে স্বাতীর করপল্লব চেপে ধরে বললে, "উঃ কি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আপনার হাত।"

স্বাতী জবাব দিলে "My heart is worm though!" দুজনে নীরবে চলল। রাহুলের বাক্ প্রাচুর্য্য সহসা থেমে গেছল; স্বাতীর কথায় সে উন্মনা হয়ে গেছল। একবার স্বাতীর দিকে চাইলে,—কোয়াসার আড়ালে অগ্নিশিখার মত অন্ধকারে কিছু অস্পষ্ট দেখা যায় স্বাতীর ক্ষীণ ঋজু দেহ;—কী সে ভাবছে? কিসের চিন্তায় সে অমন মগ্ন হয়ে আছে?—তার চারিপাশের এই জাগ্রত জগৎ হতে সে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে কিসের ঘোরে।—কোন্ দৈত্যের রূপোর কাঠি তাকে এমন নিদ্রা-মগন করে রেখেছে—কোথায় মেলে সে সোনার কাঠি যাতে জাগে তার চিত্ত!

গৃহে পৌঁছে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে—স্বাতী বললে,—"ভাগ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আপনি না থাকলে মুস্কিল হত আজ।"

রাহুল হঠাৎ কিছু বলতে পারলে না, শুধু তার দুচোখের দৃষ্টিপ্রদীপ নীরব আরতি করে গেল স্বাতীকে। গৃহ হতে

দীপালোকের ধারা এসে পড়েছে স্বাতীর মুখের খানিকটায়, শীকর্ষ-ভরা কালো কেশের খানিকটায়, অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে আছে বাকিটা—জানা-অজানার সীমানায় দাঁড়িয়ে এই মেয়ে, এর মনের ঠিকানা মেলে কোন্ সাধনায়!······

মেফেয়ারে শ্রীমতী রিয়ারীর প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রভূত অর্থ, প্রচণ্ড সুনাম সুগৃহিণী বলে। তাঁর স্বামী হলেন লিবারল্ দলের পাণ্ডা, পার্লামেন্টের একটি স্তম্ভ। শ্রীমতী রিয়ারীর আতিথেয়তা সু-উন্নত রাজপরিবার হতে প্যারির খ্যাতনামা নর্ত্তকী পর্য্যন্ত কাউকে বাদ দেয় না। বিগত-যৌবন রৌদ্রদগ্ধ ব্যুরোক্র্যাট হতে অতি-আধুনিক সাহিত্যিক কেউ বঞ্চিত হয় না। তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতকে মিলিয়ে বাছাই করে তাঁর আলাপন কক্ষে বোঝাই করেন। এই অপূর্ব্ব চিড়িয়াখানার রচনা তাঁর চরম পরিতৃপ্তি জীবনে। স্বাতীর অভিনন্দনে সেদিন তাঁর গৃহে বৃহৎ উৎসব, স্বাতীর কৃতিত্বকে গৌরবান্বিত করতে। তার প্রবাস বাস শেষ হয়ে এল, এবার দেশে ফেরার বেলা। কক্ষে নানা জাতীয়ের সমাবেশ হয়েছে। এমনি ধারা উৎসব ওখানে লেগেই ছিল। একজন ইটালীয় মেয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে, তার কাছে কয়েকজনের মাঝে সোনালি-চুল এক যুবা মনোযোগ দিয়ে শুনছে—সে চিত্রকর। কয়েকজনের সঙ্গে এক রুষীয় কবির আলোচনা চলছে; কবির শেষতম কবিতার সমালোচনা কাগজে বেরিয়েছে, তর্ক তাই নিয়ে। এক প্রবীণ ফরাসী লেখক,—তীক্ষ্ণ নীল চোখ,—ছুঁচালো দাড়ি, মার্জারের মত গোঁফ,—ঘন ঘন shrug করছেন—তিনি বললেন,—"কিন্তু সুন্দরকে ইচ্ছে করে অসুন্দর করার কেন এত আগ্রহ? সমুদ্রে ফেণার বাহার দেখে যদি উপমা দিয়ে বলি—ঠিক যেন কুকুরের বমির মত, তাতে কি আমার খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হল, না ঐ ঘৃণিত জিনিষটিকে খুব সুন্দর করে তোলা হল?"

শক্ত সোজা চুলগুলো নাড়া দিয়ে কবি বললে, "বহু শতাব্দী ধরে তন্দ্রালস কবির দল বাস্তবের চারিপাশে অমনি করে মোহজাল রচনা করেছে,—উদ্দেশ্য আমাদের—জগৎকে সে মোহশৃঙ্খল হতে মুক্ত করা—"

মঁসিও shrug করলেন,—একজন ভারত প্রত্যাগত ইংরাজ অবজ্ঞামিশ্রিত করুণার সঙ্গে শুনছিলেন দাঁড়িয়ে,—বক্র হেসে বললেন—"Buddhism"

কয়েকজন ভারতীয় ছেলে নিজেদের মধ্যে জটলা করছিল। একজন তার কথার শেষাংশটা বাংলায় বলে উঠল—"কী বেহায়া বজ্জাত এই সব ছুঁড়িগুলো বাবা—"

রাহুল তাকে বললে, "কিন্তু আপনি তাদের সঙ্গে মিশতে বেশ মাত্রা ছাড়িয়ে যান দেখি, এখন বাংলাভাষার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে যত খুশী বাণ মারছেন?"

সে উত্তর দিলে—"সাধে কি দেশে ফিরতে ইচ্ছা হয় না,—এই এদেরই জন্যে। আপনারা এখনো শিশু—মিশব না কেন, দস্তুর মত মিশব।—ফূর্ত্তি পেলে ছাড়তে আছে নাকি—তবে ধরি মাছ না ছুঁই পানি—" সে অট্ট-হেসে উঠল।

স্বাতীকে সেদিকে দেখে তার হাসি হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। স্বাতীও তাকে দেখে চমকে উঠল।—শ্যামল আজ এখানে! কয়েক মুহূর্ত্ত দুজনেরই মুখে কথা এল না—নীরব হয়ে রইল।

কয়েক বছর পূর্ব্বের এক সন্ধ্যায় ওই দুই চোখের বিশ্বাস-গভীর বিদায় দৃষ্টি!—স্বাতীর বিস্ময়চকিত চাহনি শ্যামলের মনকে একটা নাড়া দিয়ে গেল। সে বললে,—"চিনতে পার স্বাতী?"

স্বাতী বল্লে; "হাঁ। আপনি এখনো দেশে ফেরেন নি?"

"না, আটকে পড়েছিলাম নানা রকমে। তোমার নাম শুনেছিলাম আমি অনেকবার, তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। তারপর কাগজে ছবি দেখে চিনলাম।"

"ও"।

"তুমি এখন কোথায় আছ? কতদিন থাকবে?"

"আপাততঃ দিন কয়েকের জন্যে গোল্ডার্স গ্রীনে একজন-দের বাড়ীতে আছি।" স্বাতী ঠিকানা বললে।

তাস খেলার টেবিলে একটা কলরব উঠল। স্বাতী সরে যেয়ে সেদিকে মন দিলে।

সেদিন উৎসবান্তে বাড়ী ফেরার সময় স্বাতীকে ওভার কোট পরাতে সাহায্য করে রাহুল বললে, "আপনি শ্যামল চৌধুরীকে আগে থেকে চিনতেন?"

স্বাতী বললে, "হ্যাঁ, যথেষ্ট।"

স্বাতীর সুরে কি বিদ্রূপ বেজেছিল?

রাহুল অন্যমনস্ক হয়ে গৃহে ফিরল।

কিছুদিন পরে সকাল বেলা,—বৃষ্টিচূর্ণভরা বাদল হাওয়া কাচের জানালায় ঝাপ্‌টা দিয়ে যাচ্ছে; বিবর্ণ পাণ্ডুর আকাশ, বাদলে বিমথিত দিনটা।

ডাকের চিঠি নিয়ে দাসী এল; স্বাতীকে বললে তার সাক্ষাৎ প্রত্যাশী একজন ভারতীয় ভদ্রলোক এসেছেন। অতিথিকে পৌঁছে দিতে বলে স্বাতী পত্র পাঠে মন দিলে।

দ্বার খুলে শ্যামল প্রবেশ করলে। তাকে দেখে স্বাতীর ধনুর মত বাঁকান ভ্রূ একবার কুঁচকে যেয়ে তখনি স্থির হয়ে গেল। সে বললে, "বসুন।"

শ্যামল বললে, "বিরক্ত করলাম স্বাতী, কিছু মনে কোরো না।"

"না বিরক্ত আর কি।"—চিঠিখানা খামে বন্ধ করে স্বাতী বললে, "কোন দরকার আছে?"

শ্যামল হঠাৎ কিছু বলতে পারলে না। একটু ভেবে নিয়ে বললে, "হাঁ দরকার বই কি।"—দ্বিধাভরে বললে, "আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি স্বাতী, যা বলেছিলাম তা ভুলে যেতে পারবে নাকি?" অনেক মেয়ের সংস্পর্শে এসে মানভঞ্জ বিষয়ে তার যে বেশ শিক্ষানবিশী হয়েছে তা বোঝা গেল।

স্বাতী সংক্ষেপে বললে, "আমার ক্ষমা করবার যদি কোন দরকার থাকে তা হলে তা করেইছি জানবেন। ভুলে যেতে হবে কোনটা?"

এমন নির্লিপ্ততাকে কি করে খসাবে শ্যামল তা বুঝে উঠতে পারলে না,—এমন ত এর আগে তার কখনো ঘটেনি। এখন কি হাঁটুগাড়ার সময় এসেছে, না চোখে একটু জল আনলে ভাল হয়? স্বাতীর প্রস্তর কঠোর মুখ দেখে তার ভরসা বেশী হল না। তবু বললে, "দেখ, ভুল সকলেরই হয়, আমি হয়ত একটা ভুল করেছিলাম, স্বীকার করছি,—আমার সেটা শুধরে নেবার সুযোগ দেওয়া উচিত তোমার।"

ভুল যে কোনটা শ্যামল তা বেশ বুঝে নিয়েছে। নেলী মেরী ফ্যানীর দল মুখে ডার্লিং বললেও পকেটের দিকেই দেয় বিশেষ নজর।

একটু নীরব থেকে স্বাতী বললে, "আপনার ভুল শোধরানটা আমার ওপর নির্ভর করছে নাকি? আমায় বিয়ে করতে রাজি না হওয়া আপনার দিকে যদি এখন ভুল দাঁড়িয়ে থাকে, আমার দিকে তা সত্যিই হয়েছে।"

এ ত সাংঘাতিক কথা! এবার সত্যিই শ্যামলের চোখে জল এল। সে বললে, ঠিক বুঝলাম না; কথায় অনর্থক প্যাঁচ দিলে অর্থটা আমাদের মত সাধারণ লোকের কাছে দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। দুদিন যদি আমার মনে মোহই লেগে থাকে,—বুদ্ধিটা গেছল ঘুলিয়ে, এখন ত দেখছি তোমার জন্যে আমার ভালবাসা কখন হারায় নি,—হয়ত একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল—বিশ্বাস কর!"—ভাবল কথাটা বোধ হয় একটু মুরব্বিয়ানার চালে হচ্ছে, স্বাতী যে মেয়ে, হয়ত তাতেই চটে উঠতে পারে,—তার চেয়ে আর একদিক দিয়ে তাকে অনুরোধ করা যাক্—এই ভেবে বললে, "তোমার বাবা মা আমার হাতেই ত তোমায় দিতে চেয়েছিলেন, আমার সে দাবী কি অগ্রাহ্য করবে? তখন তোমারও এতে সম্পূর্ণ মত ছিল এই ত আমি জানতাম।"

স্বাতীর ওষ্ঠপুটে ঈষৎ হাসি জাগল, বললে, "দাবী জন্মায় পরিচয়ের মাঝে,—সেটাই যখন মস্ত মিথ্যে হয়ে গেছে তখন গতায়ু দাবীর দেহটাকে এর মাঝে টেনে না আনাই ভাল। আর আমার মতের বদল যে আজও হয়নি এ বিশ্বাস আপনার হল কি করে"?

অতি অসম্ভব কথা! হাঁটুগড়াতেও ফল হবে না, চোখে জল আনলেও নয়। রাগ ত তার হবেই,—যাই সে করুক না কেন, বাগদত্তা বধূর কাছে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের দাবী কি অমনি খেলো কথা নাকি! 'সব প্রেম প্রেম নয়—' এ হল তার নিজের তরফের কথা, শোনায়ও ভাল, সে হল পুরুষ, পাঁচজনের সঙ্গে মিশেছে, পাঁচটা দেখেছে শুনেছে! কিন্তু স্বাতীর তরফ থেকে এমন ধরণের কথার ইঙ্গিতও একেবারে অসহ্য!

খানিক নির্ব্বাক থেকে শ্যামল সবিদ্রূপে বললে, "ও।

তা মতের বদলটা কি ওই রাহুলকে দেখে হয়েছে?" কথাটা বলেই তার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। স্বাতী হয়ত তার নেলী, মেরী, ফ্যানীর কথা শুনেছে—যদি তারই উল্লেখ করে আভাসে তার উত্তরে!

স্বাতীর মুখ রঞ্জিত হয়ে উঠল, বললে, "সে খবরে আপনার দরকার আছে বলে মনে হয় না।"

যাক্, বাঁচা গেল! তাহলে শোনেনি। নইলে কি আর বলতে ছাড়ত। যেতে ত হবেই, তবে তার আগে আচ্ছা করে একটু শুনিয়ে যেতে দোষটা কি।

সে বললে, "না আমার দরকার কিছু নেই, তবে জানিয়ে দিলাম যে ওর যতই টাকা থাক আর যাই থাক, তোমায় ও বিয়ে করবে এ আশা বিশেষ নেই। ও এর আগেও অনেক মেয়ের মাথা এ রকম ঘুরিয়েছে।"

"আপনার দরকার শেষ হয়ে থাকলে যেতে পারেন।" শ্যামল বললে, "হাঁ, আমাকে ত উপদ্রব বলেই মনে হবে এখন, কারো কিছু জানতে বাকি নেই—তুমি ভেবেছ তুমি ওকে ভুলিয়ে বড্ড গেঁথেছ,—সেটা মস্ত ভুল। তোমার শিকার ফসকাবে তা বলে দিচ্ছি!"

ঘণ্টাঘাতে দাসী এসে দাঁড়ালে স্বাতী বললে, "এঁকে বাইরে নিয়ে যাও।"

শ্যামল ব্যঙ্গ ভরে অভিবাদন করে চলে গেল। স্বাতী অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তার মুখের রক্তোচ্ছ্বাস একেবারে মিলিয়ে যেয়ে—অত্যন্ত শুভ্র হয়ে গেছে মুখ, বাদল দিনের সব আঁধার যেন দুই চোখে জমেছে এসে। প্রচণ্ড পরিহাসের মত শ্যামলের এই আগমন। ক'বছর পূর্ব্বে, আর একদিন, যেদিন স্বাতী শ্যামলের প্রত্যাখ্যান পত্র পেয়েছিল,—এমনি নির্দ্দয় বিদ্রূপের মত বেজেছিল সেদিনও। অদৃষ্ট তাকে বিদ্রূপ দিয়ে ব্যথা দিতে চায়, গৌরবে সে উপেক্ষা করবে এই ছিল পণ।

চক্রাবর্ত্তনে তার পুনরাভিনয় হল আজ। শ্যামল নূতন করে পুরাণো সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়; তাকে উত্তর দেবার অনেক ছিল; বলতে পারত, ওগো বন্ধু সব প্রেম প্রেম নয় সে কথা কি আজ ভুলেছ নিজে? শ্যামল বললে ভালবাসা তার ঘুমিয়ে পড়েছিল শুধু। উত্তর দিতে পারত—এমন নিদ্রাতুর প্রেমকে কেমন করে জাগিয়ে রাখবে নিশিদিন! কিন্তু বলতে হল না কিছুই। স্বাতীর অনুরাগ যেদিন নিঃশেষ হয়ে গেছে—অভিযোগও সেদিন হতে নিষ্প্রয়োজন। নিষ্ফলতার আক্রোশে শ্যামল আঘাত করতে চায় ফিরে,—তাকে অবজ্ঞায় অবহেলা করা যায়। কিন্তু বাহিরের কাছে স্বাতীর ব্যবহার কি অমনি বিপরীত দেখায়? স্বাতী রাহুলকে বিবাহ করার ফন্দিতে নানাভাবে তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় আছে—এই কি সকলে ভাবে? রাহুলও কি তাই মনে করে? অত্যন্ত বেদনায় এই চিন্তাটি স্বাতীকে আচ্ছন্ন করে দিলে। সকলের ধারণাকে অগ্রাহ্য করার নির্লিপ্ততা স্বাতীর আছে, কিন্তু রাহুলও যে তাকে এমন খেলো মনে করবে, ওখানটাতেই যত ব্যথা লাগে। অন্য সকলের সাথে রাহুলও শুনবে স্বাতীর নামে এই সব কথা,—অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখবে হয়ত স্বাতীকে,—কী অসহ্য! এ হতে সে বাঁচাবেই নিজেকে। এ সমস্ত হতে মুক্ত হয়ে যেতে হবে তাকে।

অনেকক্ষণ ভেবে স্বাতী মন স্থির করে নিলে।

রাহুল দক্ষিণ ফ্রান্সে গেছল কাজে কিছুদিনের জন্যে। ফিরে এসে শুনলে স্বাতী ভারতবর্ষে ফিরে গেছে। তার ফেরার কদিন আগে জাহাজ ছেড়ে গেছে। সংবাদটা যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত,—রাহুল শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। তাকে একবার আভাসেও বিদায় জানাবার কথা স্বাতীর মনে হল না। এতদিনের বন্ধুত্বে কি এটুকু দাবীও তার জন্মায় নি? এতই ঘৃণা!—রাহুল অস্থির হয়ে আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। স্বাতী ত এত সহজে তাকে পরিহার করে চলে গেল, সে কিন্তু তাকে ভুলবে কোন্ উপায়ে?—স্বাতীকে প্রথম যেদিন দেখে, সে কি ভোলবার? জাহাজের ডেক্এ স্বাতীর দাঁড়াবার ভঙ্গী; তনুদেহের প্রতিটি রেখা যেন একটি ছন্দের মাঝে সুন্দর হয়ে রূপ পেয়েছে। তার অশ্রুর আভাসলাগা আশ্চর্য্য দুই চোখ,—উদাস করে দিল রাহুলের চিত্তকে। কোন্ অশুভক্ষণে রাহুল দেখেছিল তাকে, যা অমৃত তা গরল হয়ে উঠল তার ভাগ্যে।

রাহুল বন্ধ জানালা দিয়ে বাহিরে বহুক্ষণ স্থির হয়ে চেয়ে রইল। অন্ধকারঘন আকাশ, ব্যথিত বায়ুর ব্যাকুল

সুর, আড়ষ্ট শীতল চারিদিক। একটি শীতল করস্পর্শের উত্তপ্ত স্মৃতি রাহুলের সমস্ত মনকে নেশার মত মাতিয়ে রাখল—বিনিদ্রনয়নে কাটল তার রাত।

পরদিন প্রাতরাশের সময় যখন রাহুল স্বাতীর চিঠি পেল,—সে তার বিপর্যাস্ত কেশের রাশিতে আঙুল ডুবিয়ে স্থির হয়ে বসে ছিল। পাত্রভরা কফি শীতল হচ্চিল। চিঠিখানা দেখে তার অন্যমনস্ক দৃষ্টি নিমেষে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

—সংক্ষিপ্ত চিঠি, স্বাতী মার্সেল হতে লিখছে "আসবার সময় আপনাকে জানিয়ে আসতে পারলাম না—এর অভদ্রতা ক্ষমা করবেন। কয়েকটা কারণে আমায় এমন হঠাৎ চলে আসতে হল। বিলেতে থাকার কালটা আমার জীবনের ধারায় একটা আনন্দস্মৃতির মত,—তার শেষটা এমন কটু হয়ে উঠবে ভাবিনি। পরচর্চ্চা জিনিষটা দেখছি বিধাতার আদিম রচনা, অক্ষুণ্ণ থাকবে সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত। শ্যামল চৌধুরীকে আপনি জানেন--তার কাছে শুনলাম আমি আপনাকে নানা রকমে ভুলিয়ে বিয়ে করবার চেষ্টায় আছি,—এই সকলে ভাবছে। অন্য লোক ইচ্ছে মত ভাবুক, কিন্তু আপনি আমার ব্যবহারের এমন সঙ্কীর্ণ কারণ দেখবেন না। আপনার সঙ্গে আমার কোন ব্যবহার বিসদৃশ দেখিয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু আপনি তার এমন ক্ষুদ্র অর্থ দেবেন না, এই অনুরোধ। আপনার সঙ্গে দেখা বোধ হয় আর কখন হবে না; আমার সম্বন্ধে এই ধারণাটাই থেকে যেত চিরদিন আপনার, তাই এ চিঠি না লিখে মুক্তি পেলাম না।"

চিঠিটা পড়ে রাহুল স্তম্ভিত হয়ে গেল। বটে,—এ সেই 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' শ্যামল চৌধুরীর কীর্ত্তি—স্বাতীর কথা এমন ভাবে লোকে ভাবতে পারে!—মিছে কথা। এ শুধু ঐ শ্যামল চৌধুরীর বিষবীজ রোপণের ফল।—যাকে ঘিরে রাহুলের অন্তরের সমস্ত সম্মানজ্ঞান আপনাকে ধন্য মনে করছে,—যার প্রতি শ্রদ্ধায় তার সমস্ত চিত্ত অবনত, যার সাহচর্য্য রাহুলের জীবনের একমাত্র সাধনার ধন,—তার সম্বন্ধে এমন কথা লোকে মুখেও আনতে পারে! স্বাতী তার কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করে চলে গেছে, রাহুলকে তার কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করতে হবে এবার। এই যে তাকে এড়িয়ে চলে যাওয়া এ শুধু স্বাতীর মত মেয়েরই সম্ভব, আত্মসম্ভ্রম যার অটুট অনুক্ষণ। এতদিন যে কথা সে প্রকাশ করে নি, চিত্ত যার রূপার কাঠির পরশে ছিল তন্দ্রামগ্ন, সে আজ নিবিড় বেদনায় সোনার কাঠিতে প্রকাশ করেছে সে কথা—তাই সে অন্য সবার হতে পৃথক করে দেখেছে রাহুলকে! ওগো হৃদয়ের দেবতা, তোমায় প্রণাম,—তুমি আজ এই ম্লানচ্ছায়া প্রভাতে এ কী গভীর আলোয় ভরে দিলে প্রাণ। 'আমার সম্বন্ধে এই ধারণাই থেকে যেত চিরদিন আপনার'—তাই এই চিঠি লেখা। কয়েকটি সামান্য কথার সূত্রে স্বাতী আজ যোগ স্থাপন করল দুজনার।

এখন তার ও স্বাতীর মাঝে বহু সহস্র যোজনের ব্যবধান, তবু সব বিঘ্নকে সহজে গ্রহণ করবে সে—জীবনে এ চরম মুহূর্ত্ত আর হয়ত আসবে না—জয় করে আনতে হবে তার প্রেয়সীকে।

করাচীর এয়ার মেলের এরোড্রোমে যে নিরীহ ভদ্রলোকটি সুটকেশ হাতে নামলেন তাঁর মুখ দেখে মনে যে গভীর উচ্ছ্বাস উদ্বেল হয়ে আছে তা বোঝবার উপায় ছিল না। দুদিন পরে বোম্বায়ের ব্যালার্ড পিয়ারে ভদ্রলোক যখন সদ্যপ্রত্যাগত জাহাজের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে—তখনো তাঁর সেই নিরীহ মূর্ত্তি। কিন্তু জাহাজ হতে জনৈকা তরুণীর অবতরণের পর যখন তিনি তাঁর সম্মুখীন হলেন তখন তাঁর মূর্ত্তি যে ঠিক তেমনি অচঞ্চল ছিল তা বলা চলে না।

শ্রীইলাদেবী

কবিতাপাঠ—২

(ভাব ও রূপ)

শ্রীনবেন্দু বসু এম্‌-এ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আছে যে ভাবের রূপের মধ্যে বিকাশই কাব্য বা অন্য শিল্পরচনার লক্ষ্য। সে প্রবন্ধে একথাও আছে যে কথার অর্থের সঙ্গে রস বা আবেগের যোগেই কাব্যের পরিচয়। অতএব আমাদের দেখতে হবে যে ভাবের আবেগের মধ্যে প্রকাশেই রূপের সৃষ্টি।

আবেগ হ'ল তাই যা হৃদয়কে চঞ্চল করে। অর্থাৎ আবেগসম্পন্ন যা কিছু তার উপলব্ধি হয় হৃদয়ের পথে। উপলব্ধির অন্য পথও আছে, যেমন বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানের পথে। হৃদয় পথে যখন উপলব্ধি ঘটে তখন আমরা ভাবকে এমন করে' পাই যেন তাকে টেনে নিয়ে অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলুম। তার প্রতি সেই রকম একটা আকর্ষণ অনুভব করি যেমন কোন মানুষ বা অন্য কোন বস্তুর প্রতি। সে আকর্ষণে একটা ব্যক্তিগত মোহ বা প্রেমের ভাব থাকে। যেন কথাটা শুধু অর্থ উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে না, তার একটা নিজস্বতা আছে আর সেটা যেন নিজে হ'তে এসে আমাদের মনে অনেকটা স্থান জুড়ে বসে। যেন একটা সজীব সত্তা প্রিয়সংস্পর্শের মতন মনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এই রকম যখন হয় তখন রচনার মধ্যে একটা স্পষ্টতা অনুভব করি; মনে হয় তার যেন একটা আকার আছে; যেন একটা রূপের আভাস অন্তরের মধ্যে ধূপছায়া রচনা করতে থাকে। গদ্য রচনা থেকে উদাহরণ দিয়ে কথাটাকে আর একটু বিশদ করবার চেষ্টা করি। প্রথমে মনে করা যাক এই কথাগুলি :—

"বর্ত্তমান ইউরোপ সুন্দরকে সত্যের চাইতে নীচে আসন দেয় না,—সে দেশে জ্ঞানীর চাইতে আর্টিষ্টের মান্য কম নয়। তারা সভ্যসমাজের দেহটাকে—অর্থাৎ দেশের রাস্তাঘাট, বাড়ী ঘর-দোর, মন্দির-প্রাসাদ, মানুষের আসন-বসন, সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি নিত্য নূতন করে', সুন্দর করে,' গড়ে' তোলবার চেষ্টা করেছে...ইউরোপ ছেড়ে এশিয়াতে এলে দেখতে পাই যে চীন ও জাপান রূপের এতই ভক্ত যে রূপের আরাধনাই সে দেশের প্রকৃত ধর্ম্ম বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। রূপের প্রতি এই পরা-প্রীতি বশতঃ চীন জাপানের লোকের হাতে গড়া এমন জিনিষ নেই যার রূপ নেই—তা সে ঘটিই হোক আর বাটীই হোক। যাঁরা তাদের হাতের কায দেখেছেন, তাঁরাই তাদের রূপ সৃষ্টির কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন।"

[শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—"রূপের কথা"]

এইবার এই কথাগুলি—

"আমাদের এই কোণ-ঠাসা দেশে যেদিন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় সেই দিন বাঙালী সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করে। এর পরিচয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য বুদ্ধি যে টি'ক্‌ল না, বাঙলার ঘরে বাইরে যে তা নানারূপে নানা আকারে ফুটলো না, তার কারণ চৈতন্যদেব যা দান করতে এসেছিলেন তা ষোল আনা গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল না...ভক্তির রস আমাদের বুকে ও মুখে গড়িয়েছে, আমাদের মনে ও হাতে তা জমেনি···রূপ-জ্ঞানেই মানুষের জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ স্থূল শরীরের বন্ধন হ'তে মুক্তি। রূপজ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করবে। রূপবিদ্বেষটা হ'চ্ছে আত্মার প্রতি দেহের বিদ্বেষ, আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিদ্রোহ। রূপের গুণে অবিশ্বাস করাটা নাস্তিকতার প্রথম-সূত্র।"

[শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—"রূপের কথা"]

উদ্ধৃত দুটি অংশের মধ্যে প্রকাশভঙ্গীর একটু প্রভেদ অনুভব করা যায়। প্রথমটি অনেকটা আমাদের দৈনিক

জীবনের সাধারণ প্রয়োজন সাধনের ভাষা। কাউকে কোন জাগতিক উদ্দেশ্যে কিছু জানাবার আছে তাই বলা, আর এমন ভাবে বলা যাতে সে স্পষ্ট কাটাছাঁটা অর্থ গ্রহণ করতে পারে, যাতে কথার দ্বিতীয় অর্থ না হয়। অর্থাৎ এখানে কথা বলা হয় কেবল জ্ঞানটুকু সঞ্চার করতে বা তথ্যটুকুই জানাতে। এ রচনায় কথার বিভিন্ন অর্থাংশগুলি নিশ্চলভাবে পর পর পাশাপাশি সংখ্যায় বহু হয়ে অবস্থান করছে মাত্র, আর সেইভাবে স্বকীয় স্থানীয় মূল্যটুকু মাত্র জানাচ্ছে। অপর পক্ষে দ্বিতীয় অংশটিতে কি দেখি? প্রথম বারে যেমন ইউরোপে, চীনজাপানে রূপ-চর্চ্চার কথা বলা হয়েছে এবারেও তেমনি বাঙলায় সে চর্চ্চার কি অবস্থা তাই বর্ণিত হয়েছে। কথার নির্ব্বাচন, ব্যবহার বা বিন্যাসেও কোন বিশেষ প্রভেদ ঘটান হয় নি। কিন্তু বর্ণনা পড়লেই মনে হয় যে এই স্থানটায় বলতে গিয়ে বক্তা অপেক্ষাকৃত বিচলিত হয়েছেন। তিনি যে শুধু একটা জ্ঞান মাত্র সঞ্চার করবার জন্যে কথা বলেছেন তা নয়; কথাটাকে একটু জোর দিয়ে বলতে চাইছেন, যাতে সেটা শুধু মাথার মধ্যেই না প্রবেশ করে, হৃদয়ের মধ্যেও গিয়ে বসে। বক্তৃতায় এটা সেই জায়গা যেখানে বক্তার স্বর অপেক্ষকৃত উঁচু হয়, শ্রোতা যখন একটু নড়ে' বসে। বলাটা এখানে ব্যক্তিগত ভাবে হয়েছে। 'কি বলা হয়েছে'র সঙ্গে কে বলেছে সেটাও যেন এখানে আত্মপ্রকাশ করে। লেখকের গলার স্বর যেন পাঠকের কানে বাজে। "কোণ-ঠাসা" কথাটিতে অনেকখানি গাত্রদাহ, ভক্তির রস গড়ান'র কথায় অনেকখানি বিদ্রূপ, রূপজ্ঞান হারান'র কথায় অনেকখানি আক্ষেপ আছে। অর্থাৎ প্রথমে উদ্ধৃত কথাগুলির তুলনায় দ্বিতীয়বারের কথাগুলি বলার রীতিতে ভাষাগত অর্থের অতিরিক্ত একটা বেগ বা আবেগ রয়েছে। আর এই আবেগ চাঞ্চল্যের ফলেই আমরা যদি দুটি অংশ কয়েকবার উচ্চারণ করে' পড়ি তো হয়ত অনুভব করতে পারবো যে প্রথমটির বেলায় যদি কথাগুলি কানে পর পর কথামাত্রই শুনিয়ে সেইখানে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে থাকে দ্বিতীয়টির বেলায় সেগুলি অনেকক্ষণ কানে গুঞ্জিত হ'তে থাকে, অনেকটা চোখে দেখা মতন স্পষ্ট বোধ হয়। যেন অতগুলি কথা নয়, অতগুলি উজ্জ্বল পাথরের নুড়ি একসঙ্গে নড়ে' উঠছে, আর একটা বিশেষ আকারে সাজিয়ে যাচ্ছে।

বর্ণনামূলক রচনা থেকে ভিন্ন ধরণের আর একটি উদাহরণ দিই:—

"খোয়াইয়ের স্থানে স্থানে যেখানে মাটী জমা সেখানে বেঁটে বেঁটে বুনো জাম বুনো খেজুর কোথাও বা ঘন কাশ লম্বা হয়ে উঠেছে। উপরে দূর মাঠে গোরু চরছে, সাঁওতালরা কোথাও করছে চাষ, কোথাও চলেছে পথহীন প্রান্তরে আর্ত্তস্বরে গোরুর গাড়ী, কিন্তু এই খোয়াইয়ের গহ্বরে জনপ্রাণী নেই। ছায়ায় রৌদ্রে বিচিত্র লাল কাঁকরের এই নিভৃত জগত, না দেয় ফল, না দেয় ফুল, না উৎপন্ন করে ফসল; এখানে না আছে কোন জীবজন্তুর বাসা; এখানে কেবল দেখি কোনো আর্টিষ্ট বিধাতার বিনা কারণে একখানা যেমন-তেমন ছবি আঁকবার সখ; উপরে মেঘহীন নীল আকাশ রৌদ্রে পাণ্ডুর আর নীচে লাল কাঁকরের রং পড়েছে মোটা তুলিতে নানা রকমের বাঁকা চোরা বন্ধুর রেখায়, সৃষ্টিকর্ত্তার ছেলেমানুষী ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই দেখা যায় না। বালকের খেলার সঙ্গেই এর রচনার ছন্দের মিল; এর পাহাড়, এর নদী, এর জলাশয়, এর গুহাগহ্বর সবই বালকের মনেরই পরিমাপে। এইখানে একলা আপন মনে আমার বেলা কেটেছে অনেকদিন, কেউ আমার কাযের হিসাব চায় নি, কারও কাছে আমার সময়ের জবাবদিহি ছিল না। এখন এ খোয়াইয়ের সে চেহারা নেই। বৎসরে বৎসরে রাস্তা মেরামতের মসলা এর উপর থেকে চেঁচে নিয়ে একে নগ্ন দরিদ্র করে' দিয়েছে, চলে' গেছে এর বৈচিত্র্য, এর স্বাভাবিক লাবণ্য।"

[শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা"—প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪০]

পাঠক লক্ষ্য করবেন ভাষার কোন আয়াস, বিন্যাস, ছটা কিছুই নেই কিন্তু লেখক খোয়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে আবেগান্বিত হয়েছেন তা বোঝা যায়। বর্ণনার মধ্যে কথার অর্থ যতটা, মনটা তার চেয়ে অনেক বেশী নির্দেশ পাচ্ছে, এমনভাবে তাতে দোলা লাগছে যেন অনুভূতিকে প্রসারিত

করে' একটি দীর্ঘ পথ খুলে যায়, তাতে থাকে অনেক মনোরম বাঁক, অনেক ছায়াঢাকা কোণ, এগিয়ে চলার কত হাতছানি। খোয়াইকে কবি স্নেহ করেছেন মানুষের মতন। ফলে তাঁর চোখে সে দেখা দিয়েছে একটা নির্দ্দিষ্টরূপে। ফলে, পাঠকের কাছেও বর্ণনা লাভ করেছে আকার আর ব্যক্তিত্ব।

ব্যাপার বা ঘটে তা এই। একখণ্ড কাগজের ওপর করাতে কাটা কিছু লোহার চূর্ণ যদি এলোমেলোভাবে পড়ে' থাকে ত সে পড়ে' থাকার ভঙ্গীতে কোন তাৎপর্য্য লক্ষ্য করি না। কণাগুলো যেন এখানে ওখানে অর্থহীন ভাবে পড়ে' আছে। চোখে দেখি কেবল একটা আকার বিহীন পরিধি আর সংখ্যার বাহুল্য। কিন্তু সেই কাগজখানি যদি একখণ্ড চুম্বক লোহার ওপর রেখে চূর্ণগুলি ফেলি তা'হ'লে তার আকর্ষণে চূর্ণগুলি এক বিজ্ঞানসম্মত আকৃতি বা নক্সায় সাজিয়ে যায়। তখন সেগুলিকে আর বিক্ষিপ্ত মনে হয় না; বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি ঘটে; যে অবান্তরতার কথা পূর্ব্বে বলেছি, সে রকম কোন অবান্তর অংশ চোখে পড়ে না, সব মিলে এক সম্মিলিত রূপ বা অঙ্গ রচিত হয়। বহু হয় এক—আমরা দেখি একটা অখণ্ড রূপ বা ছবির রেখাবিন্যাস। এই ধরণে যখন ভাবের রাজ্যে আবেগ যথেষ্ট ক্রিয়াবন্ত আর বেগবান হয় তখন তার বন্ধনী শক্তির প্রভাবে ভাব ও অর্থের সমস্ত বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গগুলি সামঞ্জস্যলাভ করে এবং একটি আঙ্গিক প্রভাবমাত্রে সমীকৃত হয়। অর্থের সমগ্রতার চেয়ে এই একক প্রভাবের তাৎপর্য্য বা সঞ্চারিণীশক্তি অনেক বেশী যেহেতু উপলব্ধির রাজ্যে সমান রসমূল্যের দুটি সত্তার মিলিত প্রভাব দ্বিগুণের বেশী হয়, একটার অন্যটার সঙ্গে আবেগের আদান প্রদানের ফলে। এই শক্তিবর্দ্ধন রূপের বা ভাবরেখার পারস্পরিক বিশিষ্ট বিন্যাসেরই ফল। ভাবের এই যে সামঞ্জস্যপূর্ণ একীভূত বাস্তব প্রভাব বা নির্দ্দিষ্ট আঙ্গিক বিন্যাস—এই শিল্প রচনার রূপ। অবশ্য এ চোখে দেখা রূপ নয়—এমন কি ছবিতে বা মূর্ত্তিতেও নয়—এর ক্রিয়া চেতনার ওপর, অনুভূতির ওপর, অন্তরের যদি কোন রসদৃষ্টি থাকে তার ওপর। সেই জন্যেই এক শিল্প-রূপের অন্য শিল্পরূপের সঙ্গে তুলনা দেওয়া চলে—তাজমহলকে তাই লোকে বলে একটি সনেট; সূর্য্যাস্তের ছবিতে শিল্পীর বর্ণপাতকে বলা যায় রঙের ঝঙ্কার; আর পূরবী রাগিনীকে কল্পনা করা যায় উদাসিনীর মত, রাগিণী বাহারকে আঁকা যায় নটীবেশে—এমন নির্দ্দেশ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সনেট-পঞ্চাশতে আছে।

আমরা এতক্ষণ শিল্পরূপের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করলুম। এছাড়া রূপের দুটি দিক আছে—পরিণতি আর প্রকারের দিক। ওপরের আলোচনা থেকেই তা প্রকাশ পায়। আবেগের সঞ্চারে যদি রূপের প্রতিষ্ঠা হয় তা হ'লে সে আবেগের পরিমাণের কম বেশীতে বা প্রকারভেদে রূপেও বৈচিত্র্য ঘটবে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টান্তে চুম্বকের আকৃতির তারতম্য অনুসারে (যেমন সোজা অশ্বক্ষুরাকৃতি বা দুটি সমান্তরাল) লৌহচূর্ণও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করিবে। আবেগের তারতম্য কিসে হয়—প্রথমতঃ ছন্দ, অলঙ্কার, কথা নির্ব্বাচন আর বিন্যাসের ফলে আবেগ আরো শক্তিমন্ত, ক্রিয়াশীল, আর স্পষ্ট হয়। তাতে রূপও আরো নির্দ্দিষ্ট আর স্পষ্ট আকার পায়। এটা হ'ল আবেগের পরিমাণ আর সেই সঙ্গে রূপের পরিণতির দিক। দ্বিতীয়তঃ আবেগের বিকাশ সব সময়ে অনাবিল আবেগ রূপেই না হয়ে নানারকম রস-কল্পনার মধ্যে দিয়ে হয়। তখন আবেগের সেই রসবেষ্টনী রূপের চারিদিকেও একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, যার প্রভা রূপের বিকাশকে একটা নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী আর ঔজ্জ্বল্য দেয় যেমন পটের চারিদিকে উজ্জ্বল অলঙ্করণ। এই হ'ল রূপের প্রকার ভেদের দিক। আবারও গদ্য থেকে রূপের এই দুটি দিকের উদাহরণ দিই।

প্রথমতঃ—

"আমাদের দেশের মোড়কে রঙ আছে, আমাদের দেহের মোড়কে নেই। প্রকৃতি বাংলাদেশকে যে কাপড় পরিয়েছেন তার রঙ সবুজ; আর বাঙালী নিজে যে কাপড় পরেছে তার রঙ আর যেখানেই পাওয়া যাক, ইন্দ্রধনুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা আপাদমস্তক রঙছুট বলেই অপর কারো নয়নাভিরাম নই······যাঁর বোম্বাই সহরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে তিনিই জানেন কলিকাতার

সঙ্গে সে সহরের প্রভেদটা কোথায় এবং কত জাজ্জ্বল্যমান। সে দেশে জনসাধারণ পথে ঘাটে সকাল সন্ধ্যে রঙের ঢেউ খেলিয়ে যায় এবং সে রঙের বৈচিত্র্যের আর সৌন্দর্য্যের আর অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের গায়ে জড়িয়ে আছে চিরগোধূলি।"

[শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—"রূপের কথা"]

এখানে আবেগের স্বরূপ অলঙ্কার আর ভাষাবিন্যাসের সাহায্যে আরো স্পষ্টতা আর উজ্জ্বলতা লাভ করে। বর্ণনা আরো ছবিল হয়। অর্থাৎ রূপের প্রকাশ এখানে আরো স্পষ্ট। দেহ বা দেশের মোড়ক, রঙের ঢেউ খেলান, গায়ে জড়ান গোধূলি, এ সকল কথা ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই।

দ্বিতীয়ত :—

"আমরা চারজনেই বারান্দায় গেলুম। গিয়ে আকাশের যে চেহারা দেখলুম তাতে আমার বুক চেপে ধরলে, গায়ে কাঁটা দিলে···মনে হ'ল যেন কে সমস্ত আকাশটিকে একখানি এক-রঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে, এবং সে রঙ কালোও নয়, ঘনও নয়; কেননা তার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ছাই রঙের কাঁচের ঢাকনির ভিতর থেকে যে রকম আলো দেখা যায়, সেই রকম আলো। আকাশ জোড়া এমন মলিন, এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনও দেখি নি। পৃথিবীর উপরে সে রাত্তিরে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। এ আলোর স্পর্শে পৃথিবী যেন অভিভূত, স্তম্ভিত, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। চারপাশে তাকিয়ে দেখি গাছপালা, বাড়ী ঘর-দোর সব যেন কোন আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় মরার মত দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই আলোয় সব যেন একটু হাসছে······প্রকৃতির এই দম আটকানো ভাব আমার কাছে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে অসহ্য হতে অসহ্যতর হয়ে উঠেছিল, অথচ আমি বাইরে থেকে চোখ তুলে নিতে পারছিলুম না; অবাক হয়ে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়েছিলুম, কেননা, এই মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য ছিল।"

[শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—"চারইয়ারী কথা"]

এখানে কোন বিশেষ দিনের বিশেষ আলো বক্তার অনুভূতিতে যে আবেগের সঞ্চার করেছে সে আবেগ ক্রমাগত পুষ্ট আর স্পষ্ট হচ্ছে নানা কল্পিত ব্যঞ্জনার মধ্যে। 'সেদিনের আলো দেখা গিয়েছে মরা মতন, মলিন মতন, ছাইরঙের একটানা মেঘের ঘেরাটোপের মধ্যে, শনির দৃষ্টির তলায়, প্রলয়ঙ্করীরূপে। ফলে, আকাশের চেহারা যেন বুক চেপে ধরে, দম আটকায়, গায়ে কাঁটা দেয়। কল্পনার এই যে খেয়াল ভাব আবেগকে বেষ্টন করে' রয়েছে, বর্ণনার রূপকেও সেটা কেবল জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে।

রূপের উপরোক্ত দিক সকল সম্বন্ধে পূর্ণতর আলোচনা মুখ্যতঃ কাব্য প্রসঙ্গে পরে করবো। এ প্রবন্ধে আমরা দেখলুম রূপের স্পষ্ট প্রকাশের পূর্ব্বে ভ্রূণ অবস্থায় স্থিতি কোথায়; আবেগের মধ্যে রূপের সম্ভাবনা বা বীজ কতটুকু নিহিত আছে এবং আছে যদি তো কেমন ভাবে। এই কারণেই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আগাগোড়া গদ্য দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়েছি। কেননা কাব্যে রূপের স্বরূপ একেবারেই লক্ষণ-যুক্ত আর সজ্জিত হয়ে প্রকাশ পায় বলে প্রথম ধারণার স্বচ্ছতার পক্ষে সেটা অন্তরায় হ'তে পারতো। এইজন্যেই গদ্যরচনার মধ্যেও বিশেষ করে' সাহিত্যগুরু প্রমথবাবুর লেখা থেকেই উদাহরণ সঙ্কলন করেছি কেননা তাঁর রচনাকে আমরা এই বলেই জানি যে সে কখন উচ্ছ্বসিত আবেগের প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে তরঙ্গ আঘাতে আর তার আপ্লুতির মধ্যে আমাদের অন্ধ করে' দেয় না বরং সে রচনার ভাব যেন একখানি কঠিন অথচ স্পন্দিত পাথরের মতন মনের ভিত্তিতে ধীরে যত্নে গেঁথে যায়। অতএব সেই অলঙ্কার স্বল্প রচনার মধ্যে ভাবের আদিম সংহত রূপের আভাস উপলব্ধি করবার সুবিধা হয়।

শ্রীনবেন্দু বসু

পিশাচী

শ্রীআশীষ গুপ্ত

পিশাচীর ফাঁসি হইয়া গেল।

স্বামী সম্বন্ধে হাজারকরা ন'শ নিরানব্বই জন নারীর যে মনোভাব, সুরূপারও তাহাই ছিল,—খুব একটা সুতীক্ষ্ণ তীব্র অন্তর্নিহিত কিছু নয়, জীবিত থাকিলে সুবিধার সীমা নাই, মৃত্যু হইলে নানাবিধ দুর্য্যোগ। কিন্তু জীবনসীমা করা থাকিলে সে সকল অসুবিধা কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইতে পারে, অতএব সুরূপাও অতি-সাধারণ নারীর ন্যায় ইনাইয়া বিনাইয়া স্বামীর নিকট অনুরোধ করিতে পারিত, তোমার অবর্ত্তমানে আমার কি গতি হ'বে সে কথাটা একবার ভেবে দেখো, তোমা হেন লোকের স্ত্রী আমি, সংস্থানটা যে তার উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক সেকথা ভুলো না যেন।

যদিও এসবের কিছুই সুরূপা করে নাই,—কিন্তু এমনটি স্বচ্ছন্দেই ঘটিতে পারিত। মোটের উপর এই সত্যটাই জানা দরকার যে স্বামীর মৃত্যু হইলে সুরূপা নানান্ ছাঁদে কাঁদিবে বটে, কিন্তু বিচ্ছেদ-বেদনায় তাহার কুসুম-কোমল হিয়া যে একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, ইহা অতিশয়োক্তি।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সুরূপার আচরণ একজন না-'অসামান্য'নারীর ন্যায় যথোচিত পরিমাণে নাটকীয় হইল না,—চোখের জল দুই চারি ফোঁটা পড়িল কি না পড়িল সে সম্বন্ধেও সকলের সন্দেহ রহিয়া গেল।

তাহারই এক মাস পরে সুরূপার ক্রোড়ে তাহার একমাত্র সন্তানের আবির্ভাব। পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া সে আত্মহারা হইয়া গেল, এ যেন বাঙালীর ছেলে চাকরী পাইয়াছে! কোন্ সোনার পালঙ্কে যে তাহার জন্ম শয্যা রচনা করিবে, কোন্ হীরামতির ঝালর দেওয়া পাখায় যে তাহাকে বাতাস করিবে, কোন্ দেববাঞ্ছিত অলঙ্কারে যে তাহাকে সজ্জিত করিবে একথা সুরূপা চিন্তা করিয়া পায় না। নিজের মনে সে টুটুর জন্ম সঙ্গীত রচনা করে, তাহাকে আদর করিবার যোগ্য ভাষার সন্ধানে সে মনের মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়ায়,—দিবারাত্র উল্লাসে আবেগে আদরে চুম্বনে সে একেবারে টুটুকে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে।

টুটু ছয় মাসেরটি হইয়াছে, প্রতি মুহূর্ত্তে ঘনিষ্ঠ মৃত্যুর বিশাল সম্ভাবনার মধ্যে সে তাহার জননীর ক্রোড়ে পালিত হইল! সুরূপা তাহাকে দোলনায় শোয়াইয়া, বুকে তুলিয়া দোল দিতে দিতে অহরহ সঙ্গীতের ছন্দে বলে, "সাত রাজার ধন মাণিক আমার, নীল আকাশের চন্দ্র আমার, শুক্তি-ভাঙা মুক্তো আমার, আমার খোকনমণি রে—"

নিজের মনেই হাসিয়া ছেলেকে শূন্যে তুলিয়া লোফালুফি করিতে করিতে আদর করে, "টুটু আমার, চাঁদ আমার, বাবা আমার—"

খাঁচার ভিতরকার ময়না পাখীটা শুনিয়া শুনিয়া তাই বলিতে শিখিয়াছে, "টুটু আমার, চাঁদ আমার, বাবা আমার—"

টুটুর বয়স যখন এক ঘণ্টা তখন সহসা তাহার মুখপানে চাহিয়া সুরূপার মনে হইল, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামী বলিয়াছিলেন, "জানো সুরূপা, আমার কেন জানি না কেবলই মনে হয় পরমায়ু আমার ফুরিয়ে এল, টুটুটাকে আমি দেখে যেতে পারব না।—"

শুনিয়া সুরূপার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, বেদনার্ত্ত ব্যস্ততায় স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া সে কহিল, "ছি ছি, অমন কথা বলতে নেই।"

তাহার এ আচরণের মধ্যে হয়ত গভীর কিছু নাও থাকিতে পারে। সে শুনিয়াছে, স্বামীর মুখে এরূপ কথা শুনিলে স্ত্রীর চোখ ছলছল করাই রীতি, তাহার এই নিয়ম পালন হয়ত সেই জন্যই,—কিন্তু এমনও হইতে পারে যে এই "হয়ত"গুলাই হয়ত সত্য নয়,—অতএব কিছুই জোর করিয়া

বলা চলে না। মোটের উপর শশাঙ্কের কথা শুনিয়া জল-ভরা চোখে সুরূপা বহুক্ষণ ধরিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল,—না দিল বক্তৃতা না করিল কোলাহল।

টুটুর দিকে তাকাইয়া আজ সুরূপার মনে পড়িল যে স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার সকল কথা ক্রমশঃ বড় হইতে হইতে আজ তাহাদের বৃহত্তম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। স্বামী একদিন হাসিয়া বলিয়াছিলেন, টুটু বড় হইলে তাহার বিবাহ দিতে হইবে এক অপরূপ সুন্দরী কন্যার সহিত, লক্ষ্মীর ন্যায় ঘর-আলোকরা তার রূপ, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ন্যায় তার চরণের ধ্বনি, বেদমন্ত্রের ন্যায় সে পবিত্র, কাব্যের ন্যায় সে আনন্দময়ী, কমলার ন্যায় সে কল্যাণী। অনাগত শিশুকে যে টুটু নামে অভিহিত করিতে হইবে, এ বুদ্ধিও শশাঙ্কেরই।

কি মনে করিয়া সুরূপার অধর কুঞ্চিত এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল—পৈশাচিক আগ্রহে তাহার চোখ দুইটা ছোট হইয়া আসিয়াছে,—শিশুকে অকরুণ হস্তে কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া সে কহিল, "সর্ব্বনেশে ছেলে! সর্ব্বনেশে ছেলে!—আবার বিয়ের সখ!—"

যেন বিবাহের প্রস্তাবটা একঘণ্টা বয়সের টুটু নিজেই করিয়াছে। দুর্দ্দমনীয় আগ্রহে সুরূপার হাতের আঙুলগুলা টুটুর নবনীত কোমল কণ্ঠের উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইতে থাকে! অকস্মাৎ কি মনে হওয়ায় সুরূপা শিহরিয়া হাত সরাইয়া লয়,—ও যেন নিশ্চিন্তচিত্তে জলে স্নান করিতে গিয়া সহসা হাঙর দেখিয়াছে!

সেইদিন হইতেই টুটু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বাঁচিয়াছে।

টুটুর মুখে "মা"ডাক যেন স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়াও ফোটে না। স্বর্গ আসিয়া সুরূপার চোখে আশ্রয় লইয়াছে, ওর নেত্র যেন অমিয়াবর্ষী। সেই নয়নের পানে চাহিয়া টুটু খিলখিল করিয়া হাসে, অতি ক্ষুদ্র তুলতুলে হাত দুখানি দিয়া মায়ের নাক মুখ আকর্ষণ করে,—হা করিয়া সুরূপার নাসিকা আস্বাদনের চেষ্টা করে। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দে সুরূপার দেহে কাঁটা দিয়া উঠে, সজোরে টুটুকে নিজের বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিতে থাকে, "ধন আমার, মাণিক আমার, সাগর-সেঁচা মুক্তো আমার—"

ময়নাটা এই সকল কথাই শিখিয়াছে।

টুটু কিন্তু ব্যথা পাইয়া কাঁদিয়া ওঠে,—ত্রস্ত শিহরণে সুরূপা টুটুকে দূরে সরাইয়া দেয়,—স্তম্ভিত আতঙ্কে তাহার ক্রন্দনস্ফুরিত কচি ঠোঁট দু'খানির পানে চাহিয়া থাকে। একান্ত লোলুপতায় তাহার হাত দুইখানা টুটুর কণ্ঠনালীর দিকে অগ্রসর হইয়া যায়।

—সহসা দক্ষিণ হস্তে সুরূপা টুটুর কণ্ঠদেশ পেষণ করিয়া ধরিল। টুটু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেই গভীর যন্ত্রণায় সুরূপার মুখ কালো হইয়া গেল, ত্বরিত গতিতে হাত সরাইয়া লইয়া সে ম্লান মুখে টুটুর গলায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। চোখের জলে সুরূপার বক্ষের বসন সিক্ত হইয়া গেল, বৃথাই সে বারংবার চোখ মুছিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, চাহিয়া দেখিল টুটুর সমস্ত দেহ নীলবর্ণ হইয়া গেছে, গলায় তাহার কালশিরার দাগ। পুত্রের দেহ বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সুরূপা উন্মত্তের ন্যায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

টুটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। ওর মুখের কথা একটু একটু করিয়া স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে,—সুরূপার কাছে স্বর্গলোকের সিংহদ্বার এইবার উন্মুক্ত হইয়া গেল বোধ হয়। স্বামীর জন্য সুরূপা আকুল হইয়া উঠিল,—এত আনন্দ ও আর নিজের মধ্যে ধারণ করিতে পারে না। অন্তরের নিভৃততম প্রহর্ষের কাহিনী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের ইতিহাস সে কাহার কাছে বিবৃত করিবে? এত গভীর উল্লাস এবং এমন নিবিড় বেদনাকে সে কেমন করিয়া একাকী বহন করিয়া বেড়াইবে?—টুটুর পানে চাহিয়া সুরূপা অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল।

টুটুর মুখে আধ আধ ভাষা ফুটিতেছে,—ওইটুকু শিশুর মধ্যে এত মাধুর্য্যও সঞ্চিত ছিল!

শশাঙ্কের কথা দিনে দিনেই বেশী করিয়া মনে পড়ে। তাহার চলাফেরা, কথা বলা, প্রতি দিবসের অজস্র খুঁটি-নাটিগুলির কোনটিকেই এখন আর কোন ছলে ভুলিয়া থাকিবার জো নাই। তাহার হাস্য পরিহাসের ধরণ, সাজ সজ্জার রীতি, সকলই ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া

উঠিল। কেমন করিয়া সকল ভুলিয়া সে সুরূপাকে ভালবাসিয়াছিল, কবে কোন মুহূর্ত্তে সে কি বলিয়াছিল, কবে সে অনাগত টুটুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন্ নন্দনকানন গঠন করিয়াছিল, কেমন করিয়া তাঁহার কল্পনা দিবারাত্র সোনার সূতায় জাল বুনিয়া চলিত, সে-সব কথা কি এখন ভুলিয়া থাকিবার?

হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া টুটু ডাকিল "ম্—মা"—

সুরূপা উৎকর্ণ হইয়া রহিল, এত স্পষ্ট করিয়া টুটু ইহার পূর্ব্বে তাহাকে কোনদিন ডাকে নাই। টুটু আবার ডাকিল, "ম্—মা"—

সুরূপা ছুটিয়া আসিয়া ছেলেকে বুকের 'পরে তুলিয়া লইয়া চুমায় চুমায় তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। ক্ষণপরে তাহাকে দোলনায় শোয়াইয়া দিয়া কি ভাবিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সুরূপার দিকে দুই হাত তুলিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া টুটু ডাকিল, "ম্—মা—"

এত ঠকামিও এইটুকু ছেলে জানে!

সুরূপার চোখের মায়াহীন কর্কশতার পানে চাহিয়া টুটু কাঁদিয়া ফেলিল।

ত্রস্তভাবে সুরূপা টুটুর ছোট্ট বালিশটা দিয়া তাহার নাক মুখ চাপিয়া ধরিল। বালিশের আড়াল হইতে টুটুর মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না,—কিন্তু একটু একটু চাপা কান্না শুনিতে পাওয়া যায় যেন,—ও যেন গোঙাইতেছে, টুটু বোধ হয় একটু নিশ্বাস লইতে চায়, ও সম্ভবতঃ সুরূপার মুখের পানে চাহিয়া কচি কচি হাত তুলিয়া হাসিমুখে "ম্—মা—" বলিয়া আহ্বান করিয়া আদর পাইতে চায়,—সুরূপার বুকের ভিতরটায় যেন আগুন লাগিয়া গেছে, শক্ত করিয়া বালিশ ধরিয়া সে ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল।—টুটুর ক্ষুদ্র দেহ কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া স্থির হইয়া গেল।

সন্তর্পণে বালিশ অপসারিত করিয়া সুরূপা দেখিল টুটু ঠিক পূর্ব্বেকার মতই হাসিতেছে যেন,—কেবল তাহার সমস্ত শরীর নীলাভ হইয়া গেছে, অতিরিক্ত চাপে নাকটা একটু বাঁকিয়া গেছে,—হয়ত মায়ের রঙ্গ দেখিয়া ঠোঁটের কোণে একটুখানি বিস্ময় হয়ত একটুখানি অভিমানের রেশ! সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সুরূপার চোখ দুইটা যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে চায়!

ময়নার খাঁচাটা দরজার নিকটেই ঝুলানো, পাখীটা চীৎকার করিয়া উঠিল, "টুটু আমার, চাঁদ আমার, বাবা আমার—"

বিহ্বলদৃষ্টিতে সুরূপা ময়নার দিকে তাকাইয়া রহিল।

পাখীটা আবার বলিল, "সাগর-সেঁচা মুক্তো আমার, আমার খোকন্‌ম—"

সুরূপা একেবারে বৈশাখী ঝঞ্ঝার ন্যায় অতর্কিতে আসিয়া পড়িল,—দাঁতে দাঁত ঘষিয়া ময়নার টুঁটি চাপিয়া ধরিল,—যে পথ দিয়া টুটু গিয়াছে, ময়নাও অন্তর্হিত হইল ঠিক সেই পথেই।

পুলিশের হাত হইতে কিছুতেই সুরূপাকে উদ্ধার করা গেল না। সে শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহের পাত্রী ছিল, তাঁহারা তাহাকে উন্মাদ প্রতিপন্ন করিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। অন্যান্য যাহারা এ কাহিনী শুনিল আতঙ্কে স্তম্ভিত হইয়া একবাক্যে কহিল, পিশাচী!

সুরূপা পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করিল, "আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আমার টুটুকে মেরেছি, কেন মেরেছি বলব না—"

দ্বিধার সহিত মনে মনে কহিল, "আমি নিজেই তা জানি কি?"

তৎসত্ত্বেও হয়ত সুরূপার চরমদণ্ড হইত না,—কিন্তু রায় প্রদানের সময় তাহার মুখের পূর্ণ পরিতৃপ্তির পানে চাহিয়া বিচারকের মন সহসা বিরূপ হইয়া উঠিল। অতএব সুরূপার বিচার সমাপ্ত হইল চরম আদেশে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের দিনকয়টা যেন এই নারীর বিবাহোৎসবের বাসর, এমনিতর উহার আনন্দ। সকলে বিস্মিত হইয়া গেল, শ্বশুর শাশুড়ী ভাঙা বুকে বিদায় লইলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রিতে কিন্তু কারাগৃহের হর্ম্ম্যতল সুরূপার অশ্রুজলে কেন যে সিক্ত হইয়া উঠিল কে জানে। সমস্ত রাত্রি আর সে নিজেকে শান্তি দিল না,—স্বর্গ মর্ত্ত্য, জল স্থল, দেবতা মানব, শশাঙ্ক টুটু সকলের নিকট ওর প্রার্থনা, সকলের নিকট ওর মার্জ্জনা ভিক্ষা, সকলের নিকট ও প্রসাদ যাচ্ঞা করে,—মনে মনে ও ময়নার কাছেও ক্ষমা চায়।

—প্রভাত হইল,—চোখ মুছিয়া কঠিন অচঞ্চল পদে সুরূপা ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিল।—পৃথিবীর কয়টা লোকই বা সংবাদ রাখিল যে ২০এ জানুয়ারী পিশাচীর ফাঁসি হইয়া গেছে!

শ্রীআশীষ গুপ্ত

উৎসব ও আনন্দ

অধ্যাপক কাজি মোতাহার হোসেন এম্‌-এ

সাধারণ দিনগুলির একঘেয়েমির মধ্যে উৎসবের দিনগুলি আনন্দ ও বৈচিত্র্য আনিয়া দেয়। আর সব দিনে মানুষের মন সচরাচর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ক্ষুদ্র স্বার্থে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎসব-দিনে মানুষ সবার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগ অনুভব করে; উৎসবের দিনে তাহার মনে হয়, সে একলা নয়, পৃথিবী-শুদ্ধ লোক তাহার আত্মীয়। তাই এত আনন্দ।

সব মানুষকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমাত্মীয়ের সহিত কোন না কোন সূত্রে উৎসবের যোগ থাকে। তাহাতেই ত সকলে একযোগে একই উৎসবে যোগ দিতে পারে। ব্যক্তিগত, সমাজগত ও ধর্ম্মগত যে সকল বৈষম্য আমরা কৃত্রিম উপায়ে গড়িয়া তুলিয়াছি, সে সমস্ত ভুলিয়া মনকে অন্তরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া যে বিমল আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই উৎসব-দিনের পরম সার্থকতা। হাজার হাজার লোকের আনন্দ দেখিলে স্বভাবতঃই সেই আনন্দে যোগ দিতে ইচ্ছা হয়—নতুবা চিত্তের দৈন্যই প্রকাশ পায়। উৎসবের দিনে সবার মনে অলক্ষ্যে এক ছন্দ বাজে। সেই ছন্দের ব্যাঘাত জন্মাইয়া ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক বা ধর্ম্মগত যে কোন কারণেই হউক, আনন্দ-মিলনের ক্ষেত্রে কলহ-বিদ্বেষের সূচনা করা নিতান্তই আসুরিক ব্যাপার; অতএব তাহা নিন্দনীয়। মানুষের মধ্যে সত্য দৃষ্টির যতই প্রসার হইবে উৎসবাদির বাহ্যরূপ ছাড়াইয়া তাহার অন্তর্নিহিত উৎসমূলের দিকে ততই অধিক দৃষ্টি পড়ায় লোকের আচরণ সুন্দর ও উদার হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপ চমৎকার প্রীতিবন্ধন যত শীঘ্র ঘটে ততই মঙ্গল। এই জন্য অন্ধভক্তির পরিবর্ত্তে জ্ঞানালোকিত ভক্তির চর্চ্চা করা আবশ্যক।

আমরা বহু সম্প্রদায়ের লোক কতকাল ধরিয়া পাশা-পাশি বাস করিতেছি; তথাপি পরস্পরের উৎসবাদির সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। প্রমাণ স্বরূপ, বড়দিন, ঈদলফেতর ও সরস্বতী পূজার অন্তর্নিহিত কল্পনা ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে শতকরা কয়েকজনের সম্যক্‌ জ্ঞান আছে, খতাইয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। আমরা সচরাচর শিক্ষা-প্রণালীর ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিজেদিগকে মুক্ত করিতে চাই। কিন্তু মূলতঃ পরস্পরের প্রতি অপ্রেমই এইরূপ ঔদাসিন্যের প্রধান কারণ। পারিপার্শ্বিক ব্যাপারাদির প্রতি কৌতূহল প্রকাশ করা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি; এজন্য স্বাস্থ্যবান শিশুর মধ্যে এর সমধিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রুগ্ন শিশু আপনার তাল সামলাইতেই ব্যস্ত, এজন্য তাহার স্বাভাবিক কৌতূহল-বৃত্তি চাপা পড়িয়া যায়। মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধেও তাহাই হয়। আমরা সচরাচর ক্ষুদ্রতর আত্ম-স্বার্থে এত অধিক ব্যাপৃত থাকি যে, নিখিল মানব সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া বারে বারে তাহার বিঘ্ন ঘটাই। পৃথিবীর অধিকাংশ অশান্তির ইহাই প্রধান কারণ। যাহা হউক, উৎসব আনন্দাদির ভিতর দিয়া আমরা পরস্পর অন্তরের যোগ-স্থাপন করিবার সুযোগ পাই। এই সুযোগ অবহেলা করিয়া হারাণ বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

উৎসব এক বৃহৎ সামাজিক প্রদর্শনীর কাজ করে। সকলে সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে আত্ম-পর ভুলিয়া, মিলনোন্মুখ প্রশান্ত মন লইয়া সমবেত হয়। পরস্পর সামাজিক মেলামেশায়, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলি যাহাতে প্রকাশ না পায় সেদিকে অবহিত হই, আর অন্যের স্বভাব বা আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতে উৎসুক হই। এই ভাবে উৎসব আমাদের সামাজিক রুচি-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার সহায়তা করে। যে সব উৎসবে নরনারী সকলেই একত্রে যোগ দিতে পারে,

সে সব স্থলে বেশ-ভূষার পারিপাট্য, ব্যবহারের শিষ্টতা প্রভৃতি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রতিযোগিতা হয়। ইহাতে কাহারও কাহারও পক্ষে প্রচুর আড়ম্বর প্রদর্শনের অবকাশ ঘটিতে পারে সত্য, কিন্তু মোটের উপর ইহা দ্বারা কলা-কৌশলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া সমাজ অধিকতর সভ্য-ভব্য হয়।

নারীগণ স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে পারে বলিয়া তাহাদের জড়তা দূরীভূত হইয়া আত্ম-নির্ভর-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; আর অভিজ্ঞতার ফলে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ হওয়ায় দেহ-শ্রীতেও তাহার ছাপ পড়ে। পুরুষেরাও মহিলাদের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাহাদের স্বাভাবিক উগ্রতা ও রুক্ষতা প্রশমিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর উৎসব-রীতির সাধারণ তারতম্য অনুসারে সেই সেই সম্প্রদায়ের নর-নারীর চরিত্রগত এই সকল বিশিষ্টতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

উৎসবের দিনে লোকে বাহ্য পরিচ্ছন্নতার প্রতি যেমন মনোযোগী হয়, তেমনি দান-ধ্যান, সর্ব্বজনে সমাদর ও সম্মান, বিশ্বের সহিত নিবিড় যোগানুভব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণ-রাজীতেও ভূষিত হয়। তাইতেই ত উৎসব এত মধুর ও আনন্দময় হয়! জাতীয় জীবনের কোন বিশিষ্ট গৌরবময় ঘটনা বা দেবতুল্য লোকদিগের মহৎ কীর্ত্তি অবলম্বন করিয়াই উৎসবের প্রচলন হইয়া থাকে। এই সব ঘটনা বা কীর্ত্তি যে কেবলই সুখস্মৃতি জাগাইয়া তুলিবে তাহা নয়, অনেক সময় মর্ম্মন্তুদ করুণ ঘটনা অবলম্বন করিয়াও উৎসবাদি হয়। মোটের উপর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত হওয়াতে উৎসবের দিনে আমরা জগৎকে অভিনব দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। গভীর আনন্দ বা শোকে সকলেই এক ভাবাপন্ন হয় বলিয়া সবার সহিত মিলন সহজ ও স্বাভাবিক হয়। নবশস্যলাভ ও ঋতুর প্রাকৃতিক শোভার সহিতও কোন কোন উৎসবের যোগ আছে। এ সব স্থলে অবশ্য ধর্ম্ম, সমাজ ও জাতিগত বিভেদের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এক দেশবাসী সকলেই ধর্ম্ম-সমাজ ও জাতি নির্ব্বিশেষে এই সব উৎসবে যোগ দিলে কতই সুখের হয়! উৎসবাদি ক্রমশঃ আরও পরিপূর্ণরূপে সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে বিকশিত করুক, এবং মানুষে মানুষে প্রীতিবন্ধন জাগাইয়া তুলিয়া জগৎকে সুন্দর ও শান্তিময় করুক এই কামনা করি।

কাজী মোতাহার হোসেন

কামনা রতি ও শরণাগতি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কহে কমল: "ওলো লতা!
আমি বুঝি না তোর কথা:
তুই পাস্ কী মধু
বিটপি-বঁধু ঢাকি'
রাখি' বক্ষে তোর—ফুটিতে শাখে না দিয়ে ফুল-আঁখি?"
লতা কহিল: "হে দোদুল!
তুমি অন্ধ-সমতুল:
শুধু গগন পানে
আত্মদানে' হায়,
ক্ষণ বিকাশে যাও ঝরিয়া—সখী মৃণালও মুরছায়।
"যদি বৃন্ত-চুমা-আশে
তারে বাঁধিতে বাহুপাশে:
সেই আলিঙ্গনে
দোঁহে জীবনে জেনো
হেসে উঠিতে দুলে মিলন-ব্রতে—সতীরে তাই মেনো।"
কহে মৃণাল: "লো ব্রততী!
তুমি সুরভিহীনা সতী:
আমি তোমার মত
চাহি না ব্রত সই!
মোরা রবিরে সঁপি' বাসনা—তার গন্ধ বুকে বই।"
হেসে তপন বলে "রস উথলে
কামনা হ'লে নাশ:
তাই মৃণাল ফলে পরাগ-দলে,
লতায় নাহি বাস।"

তর্পণ

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ

মুহ্যমান জাতি সবে অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে
জীবনের গতিপথে আলোকের পায় নি আভাষ
আচারের অভিমানে ব্যর্থতার ব্যথা নিরাশ্বাস
সন্দেহের অন্ধকার এনেছিল অন্তঃপুরদ্বারে,
জ্ঞানের মহিমাদীপ্ত ভাস্বর প্রতিভা শক্তি দিয়া
প্রাণহীন জাতিবক্ষে জীবনের করিলে সঞ্চার
ত্যাগী ভগীরথ নীত যৌবন তরঙ্গ দুর্নিবার
উদ্বেল করিয়াছিল তরুণের অনাবিল হিয়া।

উদাত্ত তোমার কণ্ঠে বেদমন্ত্র হ'ল উচ্চারিত—
বেদান্তের মর্ম্ম মাঝে তুমি দিলে নূতন সন্ধান
আপন বিস্মৃত জাতি করে নাই তোমার সম্মান
জাগ্রত জাতির বক্ষে তব ব্রত হবে উদ্‌যাপিত।
যৌবনের উদ্বোধনে অন্তর্দৃষ্টি তব জ্যোতিষ্মান
মূঢ় নরনারী বক্ষে করেছিল ব্যথা অনুভব
অশান্ত অন্তরে তব হৃদয়ের প্রচুর বৈভব
নূতন সমাজরাষ্ট্রে ঝঙ্কারিল জীবনের জ্ঞান।

নিবিড় সে ব্যথাসিন্ধু মন্থনের তীব্র হলাহল
আপন গৌরবে তুমি নীলকণ্ঠ করেছিলে পান
নব জাতি সৃষ্টি হেতু তোমার সে দিব্য অবদান
তরুণের স্বপ্নে আজও আনি দেয় জীবন উচ্ছল।
সন্ধিৎসু বিদ্যার্থী চিত্তে দুরান্তের অস্ফুট আহ্বান
যে জ্ঞানের বার্ত্তা বহি এনেছিল জীবন প্রভাতে
মধ্যাহ্নের বেদনার সুকঠিন অক্ষুণ্ণ আঘাতে
আঁধার জীবনে তব করিয়া তুলিল জ্যোতিষ্মান।

মায়ামুক্ত চিত্ত তব বেদব্রহ্মে করিল ধারণ
বহুধা বিভক্ত দেশে প্রচারিল নব সাম্যবাদ
উদার নির্ভীক কণ্ঠে অপসারি সব অবসাদ
করেছিলে পূতবক্ষে জীবনের মন্ত্র উচ্চারণ
সমাজের শবস্কন্ধ অশিবের প্রলয় নর্ত্তন
জয় যাত্রা গতি তব করিতে পারেনি প্রতিহত
কঠোর গ্লানিমা ভরা জীবনের সংস্কারশত
তব রথচক্র তলে চিরতরে হ'ল নিষ্পেষণ।

তব মহা প্রয়াণের দীর্ঘ শত বৎসরের পরে
নিপীড়িত কোটী আত্মা বিমথিত করুণ ক্রন্দনে
স্বামী বিবেকের জ্ঞানে মহাত্মার আত্মার তর্পণে
অসমাপ্ত ব্রত তব উদ্‌যাপিত হবে চিরতরে।

কোন্নগর 'পাঠচক্র' কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত রামমোহন শতবার্ষিকী সভা উপলক্ষে পঠিত

স্বপ্নাদেশ

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

১

মাল্‌সাদহের ভবনাথ আচার্য্য একদিন বাস্তুভিটা ছাড়িয়া, বুড়া-মা, গুটি দুই তিন ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও স্ত্রী সনাতনীকে সঙ্গে করিয়া বিক্রমপুরের এক দূরসম্পর্কীয় মাতুলের আশ্রয়ে আসিয়া উঠিল। মাতুল শশীকান্ত ছিল বিপত্নীক। কিন্তু পেটে সরস্বতীর 'আঁচড়' ছিল। গ্রামের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক না থাকায় শশীকান্তের বেশ একটু প্রভাব হয়। শশীকান্ত গ্রামবাসীদের দলীলদস্তাবেজ মুশাবিদা করিত, চিঠিপত্রাদি লিখিয়া দিত ;—তা' ছাড়া পাজি দেখিয়া দোল দুর্গোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশী অমাবস্যা ছোট বড় হরেক রকম পালাপার্ব্বণের দিনক্ষণ ঠিক ঠিক জ্ঞাপন করিত। এতগুলি কাজের বিনিময়ে, শশীকান্ত সকলের কাছে যাহা পাইত, তাহাতে সংসারের ভাবনা একটি দিনও তাহাকে ভাবিতে হয় নাই। সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল ত'ার উপরি পাওনা।

ভবনাথ ছিল পাঠশালার পণ্ডিত। সংসার না চলিলেও সে চলিয়া আসিতেছিল ঠিকই। মাল্‌সাদহের জীর্ণ-পাঠশালাটি তাহারই চেষ্টায় কোন রকমে টিকিয়া আছে। গ্রামের তিনটি ছেলে তাহার হাতে সসম্মানে পাশ করিয়া আজ বছর দুই যাবৎ শিবনগরের হাই ইস্কুলে পড়িতেছে। উহারা পাশ করিয়া গ্রামে ফিরিলে পাঠশালাটির একদিন উন্নতি হইলেও হইতে পারে। ভবনাথ খাটিতে কসুর করিত না। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবিরাম বকিত। মাসের শেষে ছেলেদের কাছ হইতে যৎকিঞ্চিৎ আর সরকারী সাহায্য স্বরূপ চারিটি টাকা মায়ের হাতে দিয়া সে নিশ্চিন্ত। ভবনাথের ইচ্ছা কোনদিন সে বিবাহ করিবে না। পল্লীর নিভৃত কোনটুকুকে আশ্রয় করিয়া সংসারের দিনগুলি কোনক্রমে কাটাইয়া দেবে। হয়ত তেমনি করিয়াই কাটাইত। কিন্তু মায়ের কথা ভবনাথ ঠেলিতে পারিল না। বুড়া মা,—সংসারে আসিয়া বৌর মুখ বেচারী দেখিতে পাইলনা। ইহার চেয়ে আর কি দুঃখ থাকিতে পারে? ভবনাথ একদিন বিবাহ করিল। সনাতনী আসিয়া ঘর আলো করিল। তারপর কয়টি বছরের মধ্যে তিন-চারিটি ছেলে মেয়েয় ভবনাথের ছোট্ট সংসারটি মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিমধ্যে ভবনাথের মা হেমবরণী বধূর কাছে তাহার বিক্রমপুরের ভাইটির কিছু পরিচয় দিয়াছিল। দশহরার সময় হেমবরণী কয়েকবার গঙ্গাস্নানে গিয়া ভাইএর বাড়ী থাকিয়া আসিয়াছে। ভাইএর মত সম্পন্ন লোক কাছাকাছি পাঁচখানি গ্রামে দুর্লভ। ভাইএর জমাজমি, নগদ টাকার ইয়ত্তা নাই। কেবল, একটি দুঃখ, ভাই বিরাগী—আজ পর্য্যন্ত সংসার চিনিলনা।

সনাতনী জিজ্ঞাসা করিল,—তিনি বিয়ে করেননি কেন মা?

—তা কি ক'রে বল্‌ব মা, কর্‌লে কি আজ এই হাল?

সনাতনী বলিল,—বুড়ো বয়সে ত 'তেনা'র তা'লে খুবই কষ্ট, সময়ে দুটো ভাতজল করার লোক নেই।

—কেমন করে থাকবে বল? সে হতচ্ছাড়া গাঁয়ে কি একঘর বামুনের বাস আছে! মুখে একটু জল দেবার লোক নেই মা। আমি গেলে বেচারা একটু নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচে। ছাড়্‌তে চায় না মা,—বলে এলি দিদি—মাস দুয়েক থেকেই যা! ম'রে গেলে ত আর আস্‌বিনি—!

তারপর গত বৎসর মাল্‌সাদহের বাস উঠাইয়া বিক্রমপুরে সবশুদ্ধ চলিয়া আসার জন্য শশীকান্ত তাহাকে কিরূপ ধরিয়া বসিয়াছিল,—হেমবরণী তাহা বলিতে বাদ রাখিল না!

সনাতনী সব শুনিল। সংসারের তিন চারিটি ছেলে-

মেয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অভাবের যে মেঘখানি দিন দিন ঘনাইয়া উঠিতেছিল,—সনাতনী তাহা স্পষ্ট চক্ষেই দেখিতে পাইল। পাঠশালার মাসিক পাঁচ-ছয়টি টাকায় একটি মানুষের কুলায় না;—এতগুলি প্রাণীর সংস্থান হইবে কিরূপে? সনাতনী শাশুড়ী ঠাকুরাণীর শেষ কথাগুলি বার বার করিয়া চিন্তা করিল!

অতঃপর একদিন নিরীহ ভবনাথের মাথা টলাইতে সনাতনীকে বিশেষ কষ্ট করিতে হইল না। বুড়া শশীকান্তের অবিদ্যমানে তাহার সমুদয় সম্পত্তি মুঠার ভিতর পাইতে হইলে এখানে বসিয়া যে মাষ্টারী করিলে চলিবে না, এ কথার সারত্ব সনাতনী ভবনাথকে চ'খে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। ভবনাথ কথাটি বার বার করিয়া চিন্তা করিল। তারপর বলিল,—কথাটা মন্দ নয় সনু, কিন্তু—

—এতে আর কিন্তু কি আছে, ভিটের মায়ায় ভুলে থাক্‌লে লোক্‌সান্‌টা কতখানি, তা' বেশ ক'রে বুঝে দেখো বাপু—

ভবনাথ সনাতনীর মুখের দিকে চাহিল। তারপর একটি ঢোক গিলিয়া বলিল, তা'তো দেখ্‌তে পাচ্ছি সনু, কিন্তু আমার পাঠশালাটা—

ইহার উত্তরে সনাতনী তা'র চ'খ দুটীকে ঝাঁঝালো করিয়া ভবনাথের মুখের উপর যে কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়াছিল,—তাহা আর খুলিয়া বলার প্রয়োজন নাই। পরদিন দেখা গেল, বাস্তুভিটা ছাড়িয়া বিক্রমপুরে যাইবার জন্য ভবনাথ প্রসন্নমুখে জিনিষপত্র গোছগাছ করিতেছে।

২

সংসার সমেত ভাগিনেয়ের আবির্ভাব দেখিয়া শশীকান্ত বাহিরে কিন্তু খুসিই হইল। বলিল,—তোমরা এসে আমার শূন্য ঘর আলো কর্‌লে বাবা; ভাবছিলাম আমাকেই বা এখান থেকে একদিন মাল্‌সাদহে যেতে হয়, তা' দেখ্‌ছি, মা মুখ তুলেছেন। এখন তাঁর ইচ্ছেয় এ ক'টা দিন কেটে গেলে বাঁচি;—

মায়ের ইচ্ছায় দিন কাটিতে লাগিল। এতদিন বাহিরের দুটি চক্ষু দিয়া শশীকান্ত সংসার দেখিতেছিল, এবার ভিতরের চক্ষুটিও তাহার ফুটিয়া গেল। সেটি দিয়া ভবিষ্যতের দিনগুলি দেখিয়া লইতে শশীকান্তের বিলম্ব ঘটিল না!

উলুখড়ের ছাউনি করা দুখানি ঘর,—একখানি বাসের আর একখানি পাকের জন্য ব্যবহৃত। সম্মুখে কাঠা তিনেক জায়গা। শশীকান্ত আগে তাহাতে তামাক লাগাইত! ইদানীং বছর কয়েক হইতে জায়গাটুকু পড়িয়া আছে। একদিন দেখা গেল, শশীকান্ত 'মুনিষ' দিয়া তাহার উপর বাঁশের খুঁটি পুঁতিতেছে।

ভবনাথ বলিল—ওখানে কি হবে মামা?

—ঘর, আর একখানা বাসের ঘর না হ'লে ত চল্‌ছে না বাবাজী; বেশী বড় নয়, ছোট্ট ক'রে একখান চৌরী—

চৌরী একদিন খাড়া হইল, কিন্তু ছোট নয়, বেশ বড় আকারেই। তারপর একদিন রাত্রিবেলায় বাক্স পেঁট্‌রা হইতে আরম্ভ করিয়া তৈজসপত্র, মায় হুঁকার কলিকাটি পর্য্যন্ত শশীকান্ত এক এক করিয়া নিজের হাতে বহিয়া লইয়া চৌরীতে উঠিল!

ভবনাথ প্রশ্ন করার পূর্ব্বেই শশীকান্ত হাসিয়া বলিল—এটুকু করার দরকারটা বোধ করি বুঝ্‌তে পারোনি বাবাজী—

সনাতনী ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়াছিল। একটু হাসিয়া বলিল—পেরেছি মামা—

কিন্তু শশীকান্ত বুদ্ধিমান। বউ'মা পাছে মুখ ফসকিয়া আরও কিছু বলিয়া ফেলে, অম্‌নি চুপি চুপি বলিল—গাঁটা বড় খারাপ হয়েছে বউ মা, রাতে ঘুমিয়ে সোয়াস্তি নেই। তোমরা ত ছেলে মানুষ, কখন কি হয় কে জানে। বরঞ্চ আমার কাছে,—তারপর একটু হাসিয়া বলিল—সাবধানের মার নেই, কি বল বাবাজী—

ভবনাথ গলিয়া গেল। বলিল, ঠিক মামা।

কিন্তু সনাতনী সেখান হইতে পাশ কাটাইল। নিজের জিনিসপত্র টাকাকড়ি প্রথমেই ভাগিনেয়ের হাতে তুলিয়া দেওয়ার বিপদ যে কতখানি শশীকান্তের মত পাকা মাথার সেটুকু ধারণা করা কঠিন নয়।

সনাতনী মনে মনে হাসিল।

পল্লীগ্রাম,—জিনিষ পত্রের অভাব নাই। তার উপর শশীকান্তের প্রভাব। মাছ-শাক-তরি-তরকারী অপর্য্যাপ্ত

আসিতে লাগিল। শশীকান্ত দু'টি রাঁধা ভাতের মুখ দেখিল।

কিন্তু মুস্কিল হইল ভবনাথের। মালসাদহের পাঠশালে দশটি বছর সে ছেলে ঠ্যাঙাইয়া কাটাইয়াছে। ছুটির দিনে কাজ না থাকিলে ভবনাথ ছাত্রদের জন্ম বেত কাটিত। কালকিসিন্দা ও আস্‌স্তাওড়ার ছিপ্‌ছিপে বেতগুলির বাণ্ডিল বাঁধিয়া ঘরের বাতায় সে টাঙাইয়া রাখিত। পরদিন পাঠশালে আসার সময় গোটা বাণ্ডিলটা ভবনাথ সঙ্গে লইতে ভুলিত না। মাতুল-গৃহে পদার্পণ করিয়া ভবনাথ দিনকয়েক ধরিয়া সারা গ্রামখানির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল। ছোট্ট গ্রাম। লোকের বাস একশত ঘরের অধিক নয়। পথের দু পাশে কালকিসিন্দা ও ভাঁট বন। মাঝে মাঝে পথের উপর বাঁশের গাছ নুইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বদিকের লম্বা সড়কটি নলডাঙ্গার রেল ষ্টেশানে পৌঁছিয়াছে। পশ্চিম দিকে গাঁয়ের কোল ঘেঁষিয়া নদী। নদীর এককালে তোড় ছিল,—এখন সমস্ত জলটুকু টোপা পানায় আচ্ছন্ন। নদীর অবস্থা যেমনই হউক, পাড়ের মাঠটি বেশ সুন্দর। সকাল সন্ধ্যায় বেড়াইতে আসিয়া ভবনাথ একদিন মৎস্য শীকারের উপায় বাতলাইয়া ফেলিল। আপাততঃ সময়টা ইহাতে মন্দ কাটিবে না।

দিন কয়েকের পরের কথা,—

দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়ার পর ভবনাথ সে দিন ছিপ চাঁচিতেছে। উঠানের উপর হইতে একগুচ্ছ বাসন মাজিয়া সিক্তবস্ত্রে সনাতনী ঘরে উঠিল। কিছুক্ষণ পরে একখানি শাড়ী পরিয়া তাম্বুলের রাগে ঠোঁট বাড়াইয়া সনাতনী বারান্দার উপর মাদুর বিছাইল। নিস্তব্ধ দুপুর,—বেলা পড়িয়া আসিতে দেরী নাই। মাঝে মাঝে একটি শঙ্কচিল শজিনা গাছের ডালে বসিয়া রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতেছে। উঠানের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সনাতনী দেখিল, ভবনাথ তৈয়ারী ছিপ্‌খানি ঠিক হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করার জন্ম সশব্দে বার বার উঠাইতেছে আর নামাইতেছে।

সনাতনী হাসিয়া বলিল,—কি মাছ পড়ল গো।

ভবনাথ একবার আড় চ'খে সনাতনীর দিকে চাহিল, তারপর বলিল,—দেখে যাও কি পড়েছে,—কেন, তোমার বুঝি বিশ্বাস হল না—

—তা আমি বলেছি? তুমি যে ভাল শিকারী, তাতো সবাই জানে বাপু।—সনাতনী হাসিয়া উঠিল।

ঠাট্টা দেখিয়া ভবনাথ চটিয়া গেল। বলিল,—দেখে নিও ক'টা মেরে ফিরি আজ; সন্ধ্যের আগে ফিরৃচিনে ক—,

স্বামীর বিক্রম দেখিয়া সনাতনী ফের হাসিল। ঘাড় দুলাইয়া বলিল—আচ্ছা, হার মান্‌লাম। এখন একবার কাছে এসে শোন দেখি,—

ছিপ হাতে প্রস্থানোদ্যত ভবনাথ একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তারপর উঠান দিয়া ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে সনাতনীর মুখের দিকে চাহিল।

—কদিন থেকে বল্‌ব বল্‌ব কর্‌ছি, বলা হয়নি;—সনাতনী উঠিয়া বসিয়া গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিল,—কথাটা কি জান, এখানে এসে খেয়ে দেয়ে তোমার মাছ ধ'রে কাটালে চল্‌বে না। শুনেছি, তোমার মামার ভুঁইক্ষেত টাকাকড়ি বিস্তর। লোকের কাছেও ঢের টাকা প'ড়ে আছে। বুড়ো চাপা কিনা, আমাদের কাছে কিছু ভাঙে না। এ বেলা থাক্‌তে থাক্‌তে বেশ ক'রে দেখে শুনে নাও। নইলে বলা ত যায় না—

ভবনাথ বলিল,—মামার ত আর অন্য কেউ নেই—

—নাই বা থাক্‌ল, তোমাকেই যে দিয়ে যাবে, এমনই বা কি বাপু? কলিতে সবই ত ঘট্‌চে। বাপে পুতে মিল নেই, দেখ্‌ছ ত?

ভবনাথ চুপ করিয়া রহিল।

সনাতনী বলিল,—বুড়োর একটু কাছ লাগা হ'য়ে থেকো বাপু! দেখ্‌চ না, জিনিষ পত্রগুলো এঘরে রেখে বিশ্বাস হ'ল না, নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে যখের মত গেড়ে বসেছে। আর এক কথা, দলীল দস্তাবেদগুলো এ বেলা লিখ্‌তে পড়্‌তে শিখে নাও, বুড়োর ওতে আর নেহাৎ কম হয় না। তুমি ত এসবের দিক দিয়েই হাঁট না, কাল বুড়ো যদি তাড়িয়ে দেয় তখন—

ভবনাথ এসব কথা একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিল। বিক্রমপুরে আসা অবধি নিজের সম্বন্ধে একটি দিনও সে ভাবে নাই। শুধু এইটুকু জানে, তাহারা যখন এখানে আসিয়াছে, তখন আর খাটিয়া হইতে হইবে না।

কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে ভবনাথ উঠিয়া গেল।

পরের দিন। সন্ধ্যার বড় দেরী নাই। শশীকান্ত চৌরীর দাওয়ায় বসিয়া চ'খে চশমা আঁটিয়া একখানি পুরাতন খাতার পাতা উল্‌টাইতেছে। সম্মুখে একটি রঙ্‌-চটা তোরঙ্গ। ভবনাথ কাছে আসিতেই শশীকান্ত তাড়াতাড়ি খাতাখানি তোরঙ্গের মধ্যে পুরিল!

—সন্ধ্যা না হ'তেই চ'খে ঝাপ্‌সা দেখি বাবাজী, চশ্‌মাতেও আর নজর চলে না,—বলিতে বলিতে তোরঙ্গটি দুহাতে ধরিয়া শশীকান্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই তোরঙ্গটী বহুদিনের কাগজপত্র চেক চিঠি দলীল-দস্তবিদে ভর্ত্তি, ভবনাথ তাহা জানিত। তবু শশীকান্ত তাহার সম্মুখে কোনদিন উহা বাহির করিত না।

ঘরের ভিতর তোরঙ্গ রাখিয়া খুক্‌ খুক্‌ করিয়া কাশিতে কাশিতে শশীকান্ত দাওয়ায় আসিয়া জলচৌকির উপর বসিল।

—আজ দুপুর থেকে মাথাটা বড় ধ'রেছে ভব, কি জানি আবার জ্বর না ক'রে বসি। সময়টা ভালোয় ভালোয় বেশ একরকম কাট্‌ছিল, আজ চান্‌ ক'রেই এম্‌নি হ'ল। একছিলিম সাজো ত বাবাজী। ঐ দেখ চোঙার ভেতর তামাক—অঙ্গুলী নির্দ্দেশে ঘরের খুঁটির গায়ে লম্বমান বাঁশের চোঙাটি শশীকান্ত দেখাইয়া দিল।

ভবনাথ উঠিয়া চোঙা পাড়িল। খুঁটির গায়ে হেলান দেওয়া হুঁকা হইতে কলিকা লইয়া হাতের তালুতে বার চার পাঁচ ঠুকিয়া দগ্ধাবশিষ্ট তামাক ও টিকারিটি বাহির করিল। পরে, চোঙার তামাক খানিকটা বেশ করিয়া সাজিয়া ভবনাথ কলিকা সমেত হুঁকাটি জল চৌকির গায়ে ঠেস্‌ দিয়া রাখিল।

শশীকান্ত চক্‌মকির আগুনে শোলা ধরাইতেছিল। ভবনাথ বার কয়েক মাথা চুলকাইয়া লইয়া বলিল,—একটা কথা বল্‌ছিলাম, মামা—

—কথা, কি কথা বাবাজী,—শশীকান্তের হুঁকা তখন মুখে উঠিয়াছে।

—এখানে এসে ত চুপ ক'রে বসেই আছি, বল্‌ছিলাম কি একটা কিছু কাজ কর্ম্ম পেলে ভাল হ'ত; তোমার সময় অসময়—

কিন্তু কথায় বাধা পড়িল। চৌরীর বেড়ার পাশে গ্রামের পরেশ ঘোষ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

—আরে পর্‌শা যে, কি মনে ক'রে—ভাল আছিস্‌ ত রে—

পরেশ দাওয়ার দিকে আগাইতে আগাইতে বলিল,—আর ভাল দা' ঠাকুর, এবার কি 'মেলোয়ারী'ই যে লেগেছে গো; ভুগে ভুগে সারা হ'লাম। পথ্য আজ সাত সাত্‌টা দিন পড়ে'। চ'খ মুখ তুল্‌ছে না। পয়সা যে ক'টা ছিল একদিনে ফুরিয়ে গেল। এখন দা' ঠাকুরের 'পিত্যেশা'য় ;—একটি ঢোক গিলিয়া বলিল,—এই দেখ, নিয়েই এসেছি সঙ্গে ক'রে—

কাপড়ের খুঁট হইতে ভরিখানেকের একগাছি সোণার বালা বাহির করিয়া পরেশ বলিল—যা, ভাল বোঝ তাই কর বাবা, নইলে ত' আর—

তামাকের ধোঁয়ায় দাওয়াটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। বালা গাছ্‌টার দিকে একদৃষ্টে শশীকান্ত চাহিয়াছিল। ইহার অপর গাছটি চারি মাস পূর্ব্বে তাহার কাছে বাঁধা পড়িয়াছে। সেটির কথা পরেশ উত্থাপন করিল না দেখিয়া—শশীকান্ত মনে মনে খুসিই হইল।

কিন্তু ভবনাথ তখন কাছেই বসিয়া! টাকাকড়ি লেন-দেন সম্বন্ধে শশীকান্ত তাহাকে যথাসম্ভব গোপন করিত। আজও এ বিষয়ে সে সচেতন হইল।

—ঐ দেখ, লক্ষীছাড়া গরু এবার খুঁটিটা শুদ্ধু উপ্‌ড়ে ফেলেছে গো। সীম গাছ ক'টা সাব্‌ড়ে দিল। ওরে ও পরশা বাঁধ্‌ বাঁধ্‌ ওরে—

শশীকান্ত চীৎকার করিয়া উঠিল।

পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। ভবনাথও ওঠার উপক্রম করিতেছিল, শশীকান্তের নিষেধ শুনিয়া আর উঠিল না।

পরেশের সাড়া পাইয়া বলিষ্ঠ গাভী ততক্ষণে দড়ায় বাঁধা খুঁটিশুদ্ধ প্রথমে পথ তারপর পথ ছাড়িয়া বাঁ দিকের বাঁশবন আশ্রয় করিয়াছে।

পরেশ নিরুপায় হইয়া পিছনে পিছনে ছুটিল। শশীকান্ত দাওয়া হইতে জোরে জোরে বলিল,—তাড়াস্‌নে, ও পরশা, আস্তে আস্তে যা, নইলে ধ'রে পারিনে, ওরে—

পরেশ তখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সনাতনী আসিয়া আলো রাখিয়া গেল। শশীকান্ত ভ্রূকুটি করিয়া বলিল,—টাকা,—টাকা যেন গাছের ফল। একটা পয়সার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, ব্যাটা গোয়াল এসেচে টাকা নিতে :—হুঁ, কথাটা তুমি কি বল্‌ছিলে বাবাজী,—

ভবনাথ বলিল,—বল্‌ছিলাম আর কি,—তোমার কাজকর্ম্মগুলো এই বেলা আমাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে ভাল হ'ত। তোমার সময় অসময়ের কথা বলা ত যায় না মামা,—

শশীকান্ত মুহূর্ত্তকয়েক কি চিন্তা করিল। তারপর একটু হাসিয়া বলিল,—কাজ কর্ম্ম আমার আর কি আছে বাবাজী! আগে কেউ এক আধখানা দলিল টলিল নিয়ে এলে লিখে দিতাম বটে, তা'তে দুই এক আনা ক'রে পাওনা হ'ত; এখন ত ও পাট্ তুলেই দিয়েছি। তা' এ শিখে আর কি করবা বাবাজী ;—

বাবাজী এবার মুস্কিলে পড়িল। বলিল,—তোমার বন্ধকী কারবারটা এর চেয়ে মন্দ নয় মামা, ওটা কি রকম সুদে চল্‌ছে।

—বন্ধকী আর কোথায় আমার, সামান্য ঐ বিঘে পাঁচেক জমির উপরেই ত নির্ভর। কেউ দায়ে প'ড়ে এলে আগে এক আধ টাকা দিতাম বটে। ঘড়াটা ঘটিটা রাখ্‌তামও। ফাঁকি দিয়ে খেতে পারলে ত কেউ ছাড়ে না বাবাজী! আর এখন ত এ সবের দিক দিয়েই হাঁটিনি।—শশীকান্ত একটি হাই তুলিল! তারপর বলিল,—তা' বন্ধকী কারবারটা নেহাৎ মন্দ নয় বাবাজী, কিন্তু ভাঁড়ে থাকলে ত। সে গুড়ে যখন বালি তখন ত কোন কথাই নেই। সাধে কি আর গাঁ ছাড়্‌তে চেয়েছিলাম বাবাজী,—শশীকান্ত ভবনাথের মুখের পানে চাহিল।

ভবনাথ আর কিছু উত্থাপন করিল না। মনে মনে ভাবিল, এ ভালোই হইল। ভবিষ্যতে নিজের জন্য কোনদিন তাহাকে মাথা ঘামাইতে হইবে না। কিন্তু সনাতনাই যে তাহাকে প্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। সে ত তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেবে না।

কিছুক্ষণ পরে ভবনাথ বলিল,—একটা মতলব ঠিক ক'রেছি মামা; কর্‌লে কি হয় বল্‌তে পারিনে—

—কি বাবাজী,—শশীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল!

—বল্‌ছিলাম, এখানে ত একটা পাঠশালা নেই। ছেলে পিলেগুলো লেখাপড়া না শিখে শুধু শুধু ঘুরে বেড়ায়, গাঁয়ে একটা পাঠশালা খুল্‌লে কেমন হয়?

শশীকান্ত মত্‌লব শুনিয়া 'চাই' হইয়া উঠিল। বলিল—ঠিক, ঠিক ব'লেছ বাবাজী। কথাটা আমিও একদিন ভেবেছিলাম। গাঁয়ে তিরিশটা ছেলের অভাব হবে না বাবাজী। চুপ ক'রে ব'সে না থেকে,...আর পেটে গুণ থাকলে জাহির হ'তে বিলম্ব হবে না বাবাজী,—এও তোমাকে ব'লে রাখ্‌ছি!

শশীকান্তের উৎসাহ দেখিয়া ভবনাথ বিস্মিত হইল। একটুখানি সে চিন্তা করিয়া বলিল,—তা' হ'লে একটা ঘর ত চাই—

শশীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল,—কিচ্ছু তোমাকে ভাব্‌তে হবে না বাবাজী, সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি আমি। রাত না হ'তে হ'তে মধুর মার কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি। মাথাটা বড্ড ধ'রেছে বাবাজী,—কি জানি, আবার জ্বর না ক'রে বসি—

বলিষ্ঠ গাভীর দড়ি ধরিয়া পরেশ ঘোষ এই সময়ে প্রাঙ্গণে আসিয়া ঢুকিল!

—রাতে আজ কিছু খেও না মামা—

শশীকান্ত সে কথায় কান না দিয়া বলিল,—ঐ বাব্‌লার খুঁটিতে ওটাকে বাঁধ পরশা, বেশ ভাল ক'রে বাঁধিস্,—ত'রপর ভবনাথের দিকে চাহিয়া বলিল,—হুঁ, খাওয়ার কথা বলছ বাবাজী, দেখি মধুর মার ওষুধটা যদি সঙ্গে সঙ্গে ধ'রে যায়, তা'হলে না হয় দু'খান গরম গরম,...বৌমাকে তাই বলগে বাবাজী,—আমি ততক্ষণ,—লণ্ঠন হাতে শশীকান্ত দাওয়া হইতে নামিতে লাগিল।

উৎফুল্ল মুখে ভবনাথ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, শশীকান্ত ফের দাওয়ায় উঠিল। নিভন্ত কলিকাটি হুঁকা হইতে নামাইতে নামাইতে ডাকিল,—ও, পরশা

—যাই দা' ঠাকুর।

৩

গ্রামের অশথ-তলায় যে বারোয়ারী পূজার ঘরখানি বছর পাঁচেক ধরিয়া অশ্রান্ত জলে ভিজিয়া রোদে পুড়িয়া কোন রকমে টিকিয়াছিল—একদিন দেখা গেল, তাহার মেঝের উপর খেজুর পাটি বিছাইয়া গোটা কয়েক জীর্ণ-শীর্ণ ছেলে হাতে এক একখানি বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় লইয়া একবার বইএর দিকে আর একবার ভবনাথের মুখের দিকে টুক্ টুক্ করিয়া চাহিতেছে।

পথের উপর অনেকগুলি লোক জড় হইয়া এই বিচিত্র দৃশ্যটি একদৃষ্টে উপভোগ করিতেছিল। জন্মাবধি বিক্রমপুরের ত্রিসীমানায় মূর্ত্তিমান পণ্ডিত-শুদ্ধ এতগুলি প্রাণীর কোনদিন তাহারা সমাবেশ দেখে নাই। তাহাদের ধারণা ছিল, সহর হইতে একান্তদূরে অবস্থিত এই গ্রামখানির মধ্যে মা সরস্বতী কোনদিন পথ ভুলিয়াও পা দিবেন না।

ভবনাথ একখানি টুলের উপর বসিয়াছিল। চালের ছিদ্রপথ দিয়া বাহিরের আকাশ দেখা যাইতেছে। দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট আগাছা!

একটি কবুতরের পাখা দিয়া কান চুলকাইতে চুলকাইতে ভবনাথ বলিল—কাল ইস্কুল বসার আগে তোরা এসে এইগুলো সব সাফ্ ক'রে ফেল্‌বি, বুঝেচিস?

একটি বয়স্ক ছেলে সাহসে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আমি একাই পারবো পণ্ডিত মশায়!

পিছনের দিকে মাদুরে বসিয়া একটি ছেলে নূতন বর্ণপরিচয়ের পাতা ছিঁড়িতেছিল;—সে ফস্ করিয়া বলিল,—না পণ্ডিত ম'শায়, হারানে পার্‌বেনা।

ভবনাথ রুখিয়া উঠিল,—তুই জান্‌লি কি ক'রে পার্‌বেনা।

—ওযে ছোট, নাগাল পাবে কি ক'রে, আমার দাদাকে বলনা তা'র চেয়ে, ঐ দেখ দাঁড়িয়ে—

পথের উপর একটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভুজা খাইতেছিল। ভবনাথের দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িতেই, ছেলেটি একটু সরিয়া আসিয়া বলিল,—বলেন ত কাল আমি বেশ ক'রে কেটে দিই পণ্ডিত ম'শায়—

ভবনাথ হাসিয়া বলিল,—দিও দেখি।

—আচ্ছা, ছেলেটি ভুজা খাইতে খাইতে চলিয়া গেল।

পরদিন সত্যসত্যই ঘরখানি 'পদে' আসিল। দেয়াল-গুলিতে আগাছার চারা ত দূরের কথা,—চটা ফুটার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কাদা দিয়া লেপিয়া মুছিয়া সমান করা হইয়াছে। বহুদিন পড়িয়া থাকার জন্য মেঝেতে গর্ত্ত করিয়া মূষিককুল নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছিল। গর্ত্তগুলিরও আর অস্তিত্ব নাই।

ভবনাথ পূর্ণোদ্যমে পড়াইতে লাগিল। পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা কয়েক মাসের মধ্যে হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিল। পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের মধ্যেও ভবনাথের নাম ছুটিয়া গেল।

অশথ গাছের তলে ছোট্ট একটি বাঁশের মাচা। গ্রামের লোক সকাল সন্ধ্যায় সেখানে বসিয়া গল্প করে। দ্বিপ্রহরে পড়াইতে পড়াইতে ভবনাথ কোন কোন দিন মাচায় আসিয়া চুপ করিয়া বসে। ছেলেদের কলরবের মধ্যে তাহার দুইটি চক্ষু এক সময়ে গ্রামের নদী, পথ ও দিগন্তলীন আকাশপটে আসিয়া নিবদ্ধ হয়। হঠাৎ, এক সময়ে মনে পড়ে তা'র—মাল্‌সাদহের কথা।—চ'খের উপর ছবির মত ফুটিয়া ওঠে—সেখানকার গ্রাম্য পাঠশালাটি। ঘোষালদের আম বাগানের পাশে—শিশুগাছের তলে—ভাঙা ইটের ঘরের কোণে জীর্ণ চেয়ারের উপর নিঃশব্দে সে বসিয়া আছে। ছেলেদের বিচিত্র চীৎকারে ছোট্ট ঘরখানি মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছে। ভবনাথের ভ্রূক্ষেপ নাই।···এই ছেলেরা একদিন তাহার হাতে পাশ করিল,—মানুষ হইয়া গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিল। আর ভবনাথ,—ভবনাথ প্রতিদিন একই নিয়মে ইস্কুলে আসিতেছে। স্বল্প বেতন—দারিদ্র্য চিহ্নিত বেশ—ইহার ভিতর দিয়াই তাহার জীবন কাটিল,—বেশী আর কিছু চাহিল না। ভবনাথের মনে হইল, তাহার জন্মভূমির পাঠশালাটি আজিকার স্তব্ধ দুপুরে বিক্রমপুরে আসিয়া তাহারই কাছে ধরা দিয়াছে,—সেখানকার গাছপালা, নদী মাঠ, ছেলের দল তাহাকে ঘিরিয়া একই সাথে কথা কহিতেছে।

ছেলেদের গোলমালটা তীব্রভাবে কানে আসিতেই ভবনাথ সেদিন উঠিয়া দাঁড়াইল। পথের উপর অশথের স্নিগ্ধ-ছায়ায় বসিয়া বসিয়া কয়েক জন গল্প করিতেছিল।

ভবনাথ ইস্কুল ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেই একটি লোক তাহাকে বাধা দিল ;—আমাদের একটা নালিশ ছিল পণ্ডিত ম'শায়।

ভবনাথ থামিয়া বলিল,—নালিশ ? আমার কাছে—

—আপনার কাছেই,—তারপর লোকটি একটু সরিয়া আসিয়া বলিল,—আপনার খুব সুখ্যাতি রটেচে পণ্ডিত ম'শায়। আপনি আমায় গাঁয়ের বড্ড 'উপগার' হল। আমাদের একটু পড়াতে পার না পণ্ডিত ম'শায়। সন্ধ্যের পর ত আমরা ব'সেই থাকি। খানতিনেক বই পড়লে, আমরা চিঠিটা চাপটুটা—লোকটি হাসিয়া ভবনাথের মুখের দিকে চাহিল।

ভবনাথ বুঝিল,—ইহাই তাহাদের নালিশ।

একটুখানি সে চিন্তা করিয়া বলিল,—তোমরা যদি পড়, কেন পারব না পড়াতে। রাত্তিরে ত আমারও কোন কাজ নেই!

লোকগুলির মধ্যে কেহ কেহ যুবক,—দুই একজন আবার প্রৌঢ়! একটি বৃদ্ধ একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল,—তাহার মাথার চুলগুলি শাদা হইয়া উঠিয়াছে! লোকটি বলিল,—বাঁচালে বাবা, আজ থেকেই ওরা পড়বে তোমার কাছে,—আর ঐ সঙ্গে আমিও বাবাজী ;—লোকটি থামিল! তারপর সরিয়া আসিয়া বলিল,—মুরুখ্যু লোকের বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল বাবা,—চ'খ থাকতে অন্ধ ;—দেখচ না বাবা,—একখানা চিঠি লিখতে হ'লে পরের দোরে ধন্না দিতে হয়। এই ত সেদিন, জানলে বাবাজী,—দাখ লেটা হাতে ক'রে শশীর কাছে তিন তিন বার হাঁটলাম। দেখে দিলেই ত মিটে যায়, তা বলে কিনা এখন সময় নেই—সন্ধ্যেয় এস। তারপর জানলে বাবাজী,—বৃদ্ধ আরও কি কথা বলিতে গিয়া আর বলিল না। চুপ করিয়া ভবনাথের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ভবনাথ বুঝিল সবই। তাহার বার বার করিয়া মনে হইল,—লোকগুলি বড় শান্ত ও সরল। আশ্চর্য্য এই,—শিশুজীবনে একদিন ইহাদের শিক্ষার যে প্রেরণা ছিল, অথচ সুযোগের অভাবেই যাহা সার্থক হয় নাই,—আজ আবার তা'দের মধ্যে সেই প্রেরণাটুকু ফিরিয়া আসিয়াছে।

একটি ছেলে এই সময়ে ইস্কুল ঘর হইতে গুলির মত ছুটিয়া আসিয়া ভবনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

—কি হ'লরে পুণ্য।

—বিষ্টা আমার হাত কামড়ে দিয়েচে পণ্ডিত মশায়, আর এই দেখুন—বলিয়া পুণ্যচরণ গায়ের মসীকৃষ্ণ উত্তরীয়খানি খুলিয়া পিছন ফিরিয়া কাঁদ কাঁদ সুরে বলিল,—দেখুন কি ক'রেছে।

—কি ক'রেছে রে ?

—বিচুটি দিয়েচে।

জলবিচুটির স্পর্শে পুণ্যচরণের পিঠের খানিকটা স্থান দাগড়া হইয়া উঠিয়াছিল। ভবনাথ তাহা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিল। বলিল,—চল। তারপর গ্রাম্য লোকগুলির দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে ইস্কুল ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

৪

দেখিতে দেখিতে পাঁচটি বৎসর উত্তীর্ণ হয়,—মালদহে ভবনাথের দিনগুলি যেমন করিয়া কাটিত, এখানেও ঠিক তেমনি করিয়াই কাটিতেছে। পরিশ্রম একটু বাড়িয়াছে বটে—কিন্তু ভবনাথের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। কোন কোন দিন পাঠশালা হইতে ফিরিতে তাহার সন্ধ্যা হয়। হাতমুখ ধুইয়া একটু জিরাইয়া কালিপড়া লণ্ঠনের আলোটি হাতে লইয়া ভবনাথ আবার বাহির হইয়া পড়ে। গ্রামের বয়স্ক শিক্ষার্থীরা তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

বর্ষাকাল। সারাদিন থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সন্ধ্যার আগে কাঁথার কোপড় মাথায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে ভবনাথ ঘরে ফিরিল।

দাওয়ায় বসিয়া সনাতনী সন্ধ্যা দীপটি মুছিতেছিল। ভবনাথ মুখহাত ধুইয়া একটু জলখাবার খাইয়া সুস্থ হইলে, সনাতনী সন্ধ্যা দেখাইয়া আসিয়া বলিল,—মামা তোমাকে ডেকেচে একবার, শুনে এস দেখি।

—আমাকে ?

—হাঁ গো হাঁ।

—কি জন্যে বলতে পার ?

—তা' কি ক'রে বলব ?

ভবনাথ একটু চিন্তা করিল। তারপর বলিল,—আলোটা দাও, শুনে একেবারে পড়াতে যাব।

সনাতনী ভুরু কুঁচ্‌কিয়া বলিল—এই বিষ্টিতে?

ভবনাথ হাসিয়া উঠিল,—কোন দিন কি শুধু শুধু কামাই করতে দেখেচ? আর বিষ্টি ত এখনই থেমে যাবে!

সনাতনী আর কোন কথা বলিল না। লণ্ঠনের কাঁচ মুছিয়া আলো জ্বালিতে বসিল।

—সকাল সকাল এস বাপু, ভাত নিয়ে যেন ব'সে থাক্‌তে না হয়,—আর মামার কথাটা শুনে যেও বুঝেচ?

—আলো হাতে নিঃশব্দে ভবনাথ নামিয়া গেল। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা। টিপ্‌টিপে বৃষ্টির সহিত গভীর অন্ধকার যোগ দিয়াছে। কত দুর্য্যোগময় রাত্রি—এই লোকটির চ'খের সম্মুখে নামিয়া আসে,—আবার নিঃশব্দে পার হয়। ভবনাথের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সনাতনী জানে, এই লোকটি নির্ব্বোধ,—শুধু তাহাই নয়। মাথাতেও তা'র বেশ একটু 'ছিট্' আছে।

শশীকান্ত চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বলিল,—এস বাবা, এবার কি বর্ষাই যে আরম্ভ হ'ল; জন্মে কখনও এমন বর্ষা দেখিনি।

ভবনাথ আলো রাখিয়া বসিল।

—শরীরটা তোমার আজ খারাপ দেখ্‌চিনে বাবাজী?—একটু কুঞ্চিত দৃষ্টিতে শশীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল।

ভবনাথ উত্তর দিল,—না শরীর ত আমার বেশ ভালই আছে মামা!

—আছে, বাঁচ্‌লাম বাবাজী—একটু থামিয়া বলিল,—কিন্তু খারাপ একটু হ'য়েচে বাবাজী। যে খাটুনী খাট, সকাল সন্ধ্যা একটু ত তোমার বিশ্রাম নেই! তবু যদি একবার নাম কর্‌ত বাবাজীর। ছোটলোক আর বলি কা'কে,—

শশীকান্ত ভাগিনেয়ের মুখের দিকে চাহিল।

ভবনাথ প্রশ্ন করিল—কেন কি হ'য়েচে?

—হ'য়েচে বৈ কি বাবাজী, না হ'লেই কি ডেকেচি তোমাকে,—শশীকান্ত বার কয়েক খুক্ খুক্ করিয়া কাসিল। তার'পর বলিল,—ঐ যে ব্যাটা নকড়ি,—পাজির পা ঝাড়া বই আর কি! সেদিন এসে বল্‌লে কি, পণ্ডিত ত পড়াতে আসে না,—আসে গল্প করতে। ছোটলোক—একেবারে ছোটলোক বাবাজী! তুমি ও সব ছেড়ে দাও দেখি;—

ভবনাথ আশ্চর্য্য হইল। পড়াইতে বসিয়া কোনদিন কাহারও সহিত সে গল্প করে নাই। দিনের পর দিন সবাইকে সমান উৎসাহে সে পড়াইয়া আসিতেছে। এতটুকু বিরক্তি নাই,—শৈথিল্য নাই। আর নকড়ি,—নকড়ি তাহার নিন্দা করিবে? স্বপ্নেও তা' মনে হয় না। ভবনাথ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে শশীকান্ত বলিল,—আমার কাজকর্ম্মগুলো দেখে দিতে বোধ হয় আপত্তি নেই বাবাজীর?

ভবনাথ সবিস্ময়ে মাতুলের মুখের পানে চাহিল।

শশীকান্ত একটু হাসিয়া বলিল,—বুড়ো হ'য়েচি কিনা, তাই একথা বল্‌চি বাবাজীকে! বেশী নয়, দু'চার দিনেই হ'য়ে যাবে! বিষ্টিটা আবার জোরে নাম্‌ল বাবাজী!

ভবনাথ নিশ্চল। শশীকান্তের কথাগুলি আজ তা'র কাছে খুব সহজ হইয়াছিল। মনে মনে একটু হাসিয়া ভবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

—এই বিষ্টিতে আবার কোথায় বেরুচ্ছ বাবাজী?

—পড়াতে।

—তা' হ'লে কথাটা যা বল্‌লাম—

ভিজিতে ভিজিতে ভবনাথ তখন পথের উপর নামিয়া আসিয়াছে! মাতুলের কথাটা তা'র কানে আসিয়া পৌঁছিল না!

৫

ছেলেরা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কাজে মন দিয়াছে। বনজঙ্গলে গ্রামখানি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এখন, কচিৎ জঙ্গল চ'খে পড়ে। ম্যালেরিয়াও কমিয়া গেছে। গ্রামের লোকগুলি বেশ স্বাস্থ্যবান ও সজীব।

এই লোকগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভবনাথের মনটা নিবিড় আনন্দে পূর্ণ হয়।

হঠাৎ ইহারই মধ্যে একদিন এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

ফাগুন মাস। আকাশে মেঘের ছায়াটি নাই। সূর্য্যের

উজ্জ্বল রশ্মি গ্রামের আকাশে বাতাসে বিকীর্ণ হইয়া বেশ একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছিল। সরস্বতী পূজার কয়েক দিন মাত্র বাকী।

সকাল বেলায় ভবনাথ চৌরী ঘরের পাশ কাটাইয়া পাড়ার ভিতর বাহির হইতেছিল,—শশীকান্ত ডাকিল—বাবাজী,

ভবনাথ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

—ডাকৃচো মামা?

—হুঁ, একটা কথা আছে।

ভবনাথের যাওয়া হইল না। ধীরে ধীরে ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল।

শশীকান্তের পরিধানে পট্টবস্ত্র, ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা! মুখখানি বিষণ্ণ;—সে মুখে কখনও যে হাসি ফুটিত,—দেখিলে তাহা মনে হয় না। একটি ভয়াবহ ছায়া সেই মুখের উপর নামিয়া আসিয়াছে।

পঞ্জিকার পাতা খুলিয়া শশীকান্ত কি বোধ করি দেখিতেছিল। বলিল—আমি ত পরশুই যাওয়া ঠিক কর্‌চি বাবাজী; দিনটা ভাল আছে কিনা!

ভবনাথ বিস্মিতকণ্ঠে শুধাইল,—কোথায় যাচ্ছো মামা?

—কোথায়,—তোমাদের তাও বুঝি বলিনি বাবাজী,—বলিয়া শশীকান্ত সভয়ে যাহা বিবৃত করিল, তাহা এই:—

গভীর রাত্রিতে পর পর তিন দিন আসিয়া কামাখ্যা দেবী তাহাকে স্বপ্নযোগে দেখা দিয়াছেন। এ মা আর কেউ নয়,—লোলজিহ্ব নৃমুণ্ডমালিনী কালী। এ সংসারের অকল্যাণ মায়ের দৃষ্টি এড়ায় নাই। মা বহুদিন ক্ষমা করিয়াছেন,—আর করিলেন না। মায়ের আদেশ সাতদিনের মধ্যে এখানকার ভিটা না ছাড়িলে—শেষ কথাগুলি শশীকান্ত আর মুখ ফুটিয়া উচ্চারণ করিলনা। মায়ের উদ্দেশে দুই হস্ত কপালে স্পর্শ করিয়া বলিল—মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, মা এ পাপের কি 'প্রাশ্চিত্তি' নেই? মা বল্‌লেন,—না কিছুতেই নেই। এ গাঁয়ে সরস্বতীর প্রবেশ নেই, তোরা তাকে ঢুকতে দিয়েছিস! ছোটলোকদের মাথায় তুলেচিস্। আমি শুন্‌বনা। তাও বল্‌লাম—মা, আমার ভাগ্‌নেকে এ থেকে নিবৃত্ত কর্‌ব। সে ছেলে মানুষ, আর কোন দিন—মা শুন্‌লেন না। আমি তখনই তোমাকে নিষেধ ক'রেছিলাম বাবাজী,—শশীকান্তের চক্ষুদ্বয় শুকাইয়া আসিল।

—আজ আর কাল,—এই দুটো দিনের মধ্যে সব ঠিক্ ঠাক্ ক'রে নাও বাবাজী,—আমারও কেমন কপাল।

ভবনাথ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

শশীকান্ত বলিতে লাগিল,—তা'রপর জিজ্ঞেসা কর্‌লাম, মা এ অধমকে কোথায় যেতে আদেশ করেন। মা বল্‌লেন, যেখানে খুশী সেখানে, কিন্তু এখানে আর থাকা চল্‌বেনা তোদের। একথা, এখনও কাউকে বলিনি বাবাজী—

ভবনাথের বক্ষঃস্থল হইতে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইল।

—তোমাদের ত আশ্রয়ই আছে বাবাজী, উঠ্‌তেই যেটুকু দেরী। কিন্তু ত্রিসংসারে আমার কে আছে বল দেখি। বুড়ো মানুষ,—শেষকালে এ দুর্গতিও ছিল,—মা গো,—শশীকান্তের চক্ষুপ্রান্তে জলধারা!

—অনেক ভেবে ঠিক করেছি, মা কামাখ্যা যেখানে আছেন সেখানে গিয়ে হাজির হব। বেটীর চরণতলে একেবারে ধন্না দিয়ে পড়্‌ব। দিদিকে সব কথা বুঝিয়ে বলগে বাবাজী। আমি এ দুটো দিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা ক'রে নিই;—শশীকান্ত ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল!

পরদিন সকাল বেলায় সনাতনী চীৎকার করিয়া উঠিল—ওমা কি হবে গো,

ভবনাথ বলিল,—কি হ'য়েচে?

—কি হয়েচে? দেখদিকি পটির গায়ে হাত দিয়ে! ওগো কি হবে গো—সনাতনীর চীৎকার থামিল না!

পটেশ্বরী ভবনাথের কনিষ্ঠকন্যা! ভবনাথ তাড়াতাড়ি তাহার গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিল—কিচ্ছু হয়নি, এটুকু গরম ত রোজই থাকে।

—থাকে বৈকি, আমি বুঝি আর জানিনা?

—তুমিও এ সব বিশ্বাস কর সনু? ভবনাথ কথাটিকে করুণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

সনাতনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—করিনি,—নিশ্চয়ই করি। মিথ্যে ব'লে মামার লাভ কি শুনি? তারপর গলাটা ভারী করিয়া বলিল,—কাজ নেই বাপু আমাদের

বিষয় সম্পত্তিতে। কাল আগে আমাদের রেখে দিয়ে এস।

হেমবরণী উঠানে দাঁড়াইয়া রোদ পোহাইতেছিল। একটু একটু করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল,—ভোর বেলাতে আমিও আজ দেখ্‌লাম ভব! চ'খে একটু কাক নিদ্রে এসেচে, এমন সময়, বল্‌তে গাটা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে বাবা,—একটু থামিয়া হেমবরণী যে কথাগুলি উচ্চারণ করিল, তাহা শুনিয়া সনাতনীর আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল!

—শুন্‌লে ত?

ভবনাথ নিরুত্তর! একটি কথাও এদের মুখের সম্মুখে সে আজ উচ্চারণ করিতে পারিল না। রাগে দুঃখে কোন রকমে সে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

পরদিন প্রত্যুষে হটর, হটর, শব্দে একখানি গরুর গাড়ি মাল্‌সাদহের পথে সত্য সুত্যই যাত্রা করিল। গাড়ীর আশে পাশে গাঁ-শুদ্ধ লোক। ছই‌এর ভিতর হইতে একটি লোক বাহিরের পানে চাহিয়াছিল,—সে ভবনাথ। ভবনাথের গণ্ডদ্বয় চ'খের জলে ভিজিয়া গিয়াছে।

তখন চৌরী ঘরের দাওয়ায় বসিয়া শশীকান্ত রাম-প্রসাদী গাহিতেছিল :—

তাই কালোরূপ ভালবাসি—
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেম্‌নি নাচাও তেমনি নাচি।

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

বিরহে

শ্রীকালিপদ সিংহ এম্‌-এ, বি-এল্‌

গভীর সে রজনীর শ্রান্ত অবসানে,
কহিনু তোমারে সখি অন্তরের বাণী,
ছিলে মগ্ন তুমি তবে আপন ধেয়ানে,
না শুনিলে সকরুণ মোর গান খানি॥

প্রভাতে সলজ্জ তুমি চলে গেলে দূরে।
হতাশ এ হিয়া মোর উঠিল কাঁদিয়া,
অভিমান ব্যথাহত সকরুণ সুরে,
কাঁদিল বাঁশরী কত বৃথা গুঞ্জরিয়া॥

কর্ম্মক্লান্ত দিবসের বিদায় বেলায়,
মনক্ষুণ্ণ আসিলাম দূর দূরান্তরে,
পশ্চাতের দীর্ঘ পথ ডাকিছে আমায়,
ফিরায়ে লইতে মোরে তোমার মন্দিরে॥

সম্মুখের দীর্ঘ নিশা গম্ভীর উদাস,
বিরহ শয়নে মোরে চাহে আবরিতে।
বক্ষ হ'তে বাহিরিয়া নীরব নিঃশ্বাস,
ডাকে মোরে মৌন মূক শান্ত সমাধিতে॥

নিভে গেছে মিলনের উচ্ছ্বসিত রোল,
নিভে গেছে উৎসবের প্রজ্জ্বলিত বাতি।
থেমে গেছে হৃদয়ের আনন্দ হিল্লোল!
আছে শুধু বিরহের দীর্ঘ এক রাতি॥

মাঝে মাঝে শুধু এক সুপ্ত স্মৃতি রেখা,
বিরহের অন্ধকারে যায় চমকিয়া,
বিদায়ের ভাষাহীন বেদনায় মাখা—
অন্তরের প্রতি প্রান্ত উঠে শিহরিয়া॥

জানিনা তোমার মনে মোর কোনো কথা—
জাগে কিগো সঙ্গীহীন বিজন শয়নে।
জানি না তোমার বুকে মৌন কোন ব্যথা,
বৃথা কেঁদে মরে কিগো মূক গুঞ্জরণে॥

যদি জাগে মোর বাণী তোমার অন্তরে,
তারে স্থান দিও সখি তোমারি সঙ্গীতে।
থাকিব বাঁচিয়া, যদি আসে মোর দ্বারে,
তারি সুর বরষার আর্দ্র রজনীতে॥

শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষের কৃতিত্ব

রেঙ্গুন রয়েল লেকে দীর্ঘকাল ব্যাপী সন্তরণ

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার

শ্রীশান্তি পাল

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

প্রফুল্লকুমার যে সময় রেঙ্গুন রয়েল লেকে সাঁতার দিতেছিল সে সময় আমি কলিকাতায়। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান মণ্টু পালের নিকট হইতে উহাদের দৈনন্দিন কার্য্য-বিবরণী সম্বন্ধে একখানি করিয়া তার পাইতাম। বৃহস্পতিবার ২রা ডিসেম্বর প্রফুল্লকুমারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাইলাম যে অবিলম্বেই আমাকে ও নরেন্দ্রকে "ওয়াটার পোলো" খেলয়াড়ের দলবল লইয়া রেঙ্গুন যাইতে হইবে। সমুদ্র যাত্রার কথায় মন নাচিয়া উঠিল। সেই রাত্রেই প্রফুল্লকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্র ও ক্লাবের সেক্রেটারী মিঃ চৈতন্য বড়াল মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্লাবের সহকারী সভাপতি মিঃ এন্ এন্ ভোঁস মহাশয়কে টেলিফোনে এই আনন্দ সংবাদ জানাইলাম। তিনিও সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদিগকে রেঙ্গুন যাত্রার অনুমতি দিলেন। খেলোয়াড় হিসাবে গোঁসাই, হরিনারায়ণ ও বিভূতি সঙ্গে যাইবে স্থির হইল। বধূমাতা,—প্রফুল্লকুমারের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতি কমলাবালা-ও ধরিয়া বসিলেন যে তিনিও আমাদিগের সহিত রেঙ্গুন যাত্রা করিবেন। বিপদে পড়িলাম। একে জলপথ, তাহে ডেক্ যাত্রী! পথের কষ্টের কথা তাঁহাকে বুঝাইলাম, কিন্তু নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। পরিশেষে "আচ্ছা দেখা যাবে" বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম। সেই সময় বধূমাতা আমাদের ৫১নং সিমলা ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আমার ভগ্নীর সহিত বাস করিতেছিলেন। রবিবার ৫ই ডিসেম্বর যাত্রার দিন ধার্য্য হইল। সকলের

প্রফুল্লকুমার ঘোষ—৭৫ ঘণ্টা সন্তরণের পর পা ছড়াইয়া ভাসমান

সহিত পরামর্শের পর স্থির হইল যে আমাদেরই বাটী হইতে যাত্রা করা হইবে। প্রফুল্লকুমার তাহার দলবল সহ পূর্ব্বে আমাদেরই বাটি হইতে শুভযাত্রা করিয়াছিল। শনিবার রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত কতক্ষণে ভোর হইবে! রাত্রি ৪ ঘটিকা হইতে একবার ঘর, একবার

প্রফুল্লকুমার ঘোষ—সাঁতার কাটিতে কাটিতে দুগ্ধ পান

বারান্দা ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম—ঐ বুঝি কে এল! ঐ বুঝি কে ডাকে !!

প্রত্যুষে ছয় ঘটিকার সময় একে একে সকলেই আমার বাটীতে পূর্ব্বের কথা মত আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা সাত ঘটিকার সময় সানন্দ চিত্তে শুভযাত্রা করিলাম। উট্রাম ঘাটের বুকিং আফিস হইতে ছয়খানি ডেকের টিকিট ক্রয় করিয়া, বন্ধু এবং বান্ধবীদের নিকট বিদায় লইয়া, বরাবর জাহাজে গিয়া উঠিলাম। বেলা আট ঘটিকার সময় "এরণ্ডা" বন্দর ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে এরণ্ডা এই বিরাট কলিকাতা নগরীকে পিছনে ফেলিয়া সগর্ব্বে ভাগীরথী বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সম্মুখে ছুটিয়া চলিল।

জাহাজে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। আমরা ডেকের যে দিকটা থাকিবার জন্ম ইচ্ছা করিয়াছিলাম সেই দিকে যাত্রীর আধিক্য বশতঃ নরেন ও গোঁসাই তৎক্ষণাৎ জাহাজের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের থাকিবার জন্ম একটা সুবন্দোবস্ত করাইয়া লইল। আমাদের পরিচয় পাইবা মাত্র ঐ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া জাহাজের পিছন দিকে একটি পরিষ্কার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া চেন দিয়া বাঁধিয়া দিলেন,—যাহাতে অন্য কোন ডেকযাত্রী তথায় না প্রবেশ করিতে পারে। আমরা স্ব স্ব মালপত্র গুছাইয়া লইয়া ঐ চেন্ বেষ্টিত স্থানের মধ্যে শয্যা পাতিয়া ফেলিলাম। আমাদের মধ্যে সকলেরই এই প্রথম সমুদ্র যাত্রা। সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া কবি সত্যেন দত্তের রচিত—"এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক' তুমি, শান্তি রবি চড়ুকু যুগল—হুল্লড়েরি ভূমি"—গানখানি এক সঙ্গে ধরিলেন। আমি জাহাজের ডেকের উপর জাপানী নৌ সেনাপতি "এ্যাড্‌মিরাল" টোগোর ন্যায় বীরদর্পে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া নিজেদের ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। মনে পড়িল একদিন এই বাঙালী জাতি তরঙ্গ সঙ্কুল অসীম সমুদ্র বক্ষে জাহাজে করিয়া বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত জল তোলপাড় করিয়াছিল।

বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময়—ভাগীরথীর মোহানা পার হইয়া বিক্ষুব্ধ সাগর বক্ষে জাহাজখানি গিয়া পড়িল। সামুদ্রিক পক্ষীরা এতক্ষণ জাহাজের পিছনে পিছনে চক্রোৎ-

ক্ষিপ্ত-জলরাশির মধ্যে মৎস্য ধরিবার লোভে উড়িয়া আসিতেছিল; তাহারাও এইবার তীরাভিমুখে প্রস্থান করিল। জাহাজের খালাসীর নিকট শুনিলাম যে ঐ সামুদ্রিক পক্ষীর ঝাঁকে বেলাভূমি হইতে ৩০।৪০ মাইল পর্য্যন্ত মৎস্য সংগ্রহের জন্য জাহাজের পিছু পিছু আসিয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝিলাম যে আমাদের জাহাজখানিও তীর হইতে ৩০।৪০ মাইল দূরে আসিয়াছে। এইবার ক্রমশঃ ঘোলাজল রূপান্তরিত হইয়া সবুজ জলে পরিণত হইল। মধ্যে মধ্যে ২।১টি কালো জলের ফালিও দেখা দিল। খালাসীকে ঐ স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিল যে, গঙ্গাসাগর পার হইয়াছে। আমাদের সকলের মন আনন্দে দুলিয়া উঠিল, এবং সেই সঙ্গে জাহাজখানিও বেশ দুলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার বুঝিলাম যে আমাদের সামুদ্রিক জ্বর ধরিয়াছে। হরিনারায়ণ কাল বিলম্ব না করিয়া বমি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি উহার ঐরূপ আচরণ দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বধূমাতা ও নরেন আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া "গুরুদেব, এ কি হইল, এ কি হইল!" বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিল না যে উপস্থিত ব্যাপারে গুরু-শিষ্যের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই!

রাত্রি দশটার সময় নরেন আমাদের আহারের জন্য ভাত ও মাংস লইয়া আসিল। পর দিবস প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলাম যে সকলের খাদ্য সমভাবে শয্যার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। রাত্রে কেহ আহার স্পর্শও করে নাই। কোন রকমে গাত্রোত্থান করিয়া মদ্যপায়ীর ন্যায় টলিতে টলিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলাম। বেলা চারটার সময় জাহাজের একটি বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারের সহিত আলাপ হইল। তিনি আমার দুরবস্থা দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া আমার জন্য কিঞ্চিৎ চাটনী প্রস্তুত করাইয়া আনিলেন। আমি সেই উপাদেয় চাটনীর কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া কতকটা সুস্থ হইলাম। ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটিকে বলিলাম যে মহাশয় আপনারা তো বেশ আছেন। আপনাদের মাথা-ও ঘুরে না, দেহ-ও ঘোলায় না বা পা-ও টলে না। তিনি উত্তরে বলিলেন আপনাদের এই প্রথম সমুদ্র যাত্রা সেইজন্য এইরূপ কষ্ট হইতেছে। আমি বলিলাম যে মহাশয় পুরীতে সমুদ্রে যথেষ্ট সাঁতার কাটিয়াছি। বৃহৎ বৃহৎ তুফানের সহিত জলের মধ্যে থাকিয়া অকাতরে অক্লান্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু এ আমার কি হইল! ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটির মুখে শুনিলাম যে, রাত্রি বারোটা হইতে একটার মধ্যে জাহাজ— "মারটাবান" উপসাগরে পড়িলে দুলুনি বন্ধ হইবে এবং আমরাও কতকটা সুস্থ হইতে পারিব। শুনিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় শয্যা আশ্রয় করিলাম।

হঠাৎ দূরে আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখি, একখণ্ড কালো মেঘ আকাশের এক প্রান্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই কালো মেঘ পূর্ব্বাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া যাত্রীর প্রাণে একটা উৎকট ভীতির সৃষ্টি করিল। আকাশ কালো, সমুদ্রের জলও কালো! দেখিতে দেখিতে প্রবল বেগে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। খালাসীরা সত্বর ডেকের পর্দ্দা ফেলিয়া দিল। জাহাজখানি নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ডেকের উপর জল উঠিতেই বধূমাতা শঙ্কিত চিত্তে আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমি বধূমাতাকে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "কোন ভয় নাই যদি জাহাজ মাঝ সমুদ্রে ডুবিও হয়, অন্ততঃ আপনাকে যে-কোন প্রকারেই হউক রক্ষা করা হইবে, অতএব আপনি নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগে শয়ন করিয়া থাকুন।

আমাদের দলের মধ্যে একমাত্র গোঁসাই সামুদ্রিক-জ্বরের দ্বারায় আক্রান্ত হয় নাই। সে সর্ব্বদাই আনন্দে আছে। কখনও সহযাত্রীদিগের সহিত কলহ করিতেছে, কখনও বা তাঁহাদের ফল ফুলারি চুরি করিয়া আনিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিতেছে এবং কখনও কখনও অন্যান্য সহযাত্রীদিগকেও খাওয়াইতেছে। এক ভদ্রলোক তাঁহার ক্যাম্পখাট রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে গোঁসাই সেই খাটিয়াটি সেই স্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া নিজের শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে দিব্য আরামে শয়ন করিয়া আছে। তাহার বালসুলভ দুষ্টামিতে যাত্রীগণ উদ্ব্যস্ত! গোঁসাইয়ের বিরুদ্ধে যাত্রীগণের নালিশ শুনিতে শুনিতে আমি অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে জোর করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া রাখিলাম।

বসন্তের আগমনী

(একাডেমি অফ্ ফাইন্ আর্ট্স্-এর
প্রথম বাৎসরিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত)

শিল্পী—শ্রীযজ্ঞেশ্বর সাহা

রাত্রি বারোটার সময় জলীয় আলোক দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে ডেকের উপর বসিয়া আছি, এমন সময়ে ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটি আসিলেন এবং দূরে জলের উপর একটি আলো দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ বেসিন লাইট হাউস। ইহা সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। জাহাজের পরিচালককে সতর্কিত করিতেছে।" যদিও তখন জাহাজের দুল্‌কি একেবারে বন্ধ হইয়াছে তথাপি আমার ভাল নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল না।

প্রফুল্লকুমার ঘোষ—সাঁতার শেষে সবেগে ধাবন

পরদিবস বেলা বারোটার সময় নদীর মোহনায় আসিয়া পৌছিলাম। মোহনায় জাহাজখানি আসিয়া পৌছিলেই আমরা ডেক হইতে দূরে স্বর্ণময়ী বর্ম্মার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সোয়াড্যাগন প্যাগোডার স্বর্ণচূড়া দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলাম! মনে হইল যেন সেই স্বর্ণচূড়া সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে করিতে বলিতেছে, "হে আগন্তুকগণ, ত্বরায় আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর। আমরা বীরের পূজা করিতে কার্পণ্য করি না। আমরা এখনও আমাদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিই নাই। আমরা অল্পদিন মাত্র পরাধীন হইয়াছি।

বেলা প্রায় ২টা ৩০ মিনিটের সময় "এরণ্ডা" ক্রকীং ষ্ট্রীট জেটিতে আসিয়া ভিড়িল। জাহাজ ভিড়িতেই দেখিলাম যে, প্রফুল্লকুমার তাহার দলবল লইয়া পূর্ব্ব হইতেই আমাদের জন্য জেটিতে অপেক্ষা করিতেছে। অবতরণ করিতেই প্রফুল্লকুমার তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল। জেটির নিম্নে ডাঃ চিট্টিং (ব্যায়ামবীর) ও অন্যান্য স্থানীয় ভদ্রলোক সকলেই আমাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এই সাদর সম্ভাষণ শেষ হইলেই, আমরা মোটরে করিয়া ৪৯ ষ্ট্রীটস্থ "ডায়মণ্ড হাউস" অভিমুখে রওনা হইলাম। বধূমাতা প্রফুল্লকুমারের সহিত কমিসনার রোডে নিয়োগী বাবুদের বাটীতে গিয়া উঠিলেন। ডায়মণ্ড হাউসে পৌছিয়া দেখিলাম, বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ, ফটোগ্রাফার ও স্থানীয় বহু ভদ্রলোক তথায় আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় সমবেত হইয়াছেন। সহরে প্রবল গুজব রটিয়াছে যে, প্রফুল্লকুমারের সন্তরণ-গুরু, (এই প্রবন্ধ লেখক) অদ্য "এরণ্ডায়" রেঙ্গুনে আসিয়াছেন; তিনি চারদিন অগ্নিমধ্যে থাকিয়া তাঁহার অলৌকিক যোগশক্তি প্রদর্শন করিয়া রেঙ্গুনবাসীকে চমৎকৃত করিবেন। এই উক্তির যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য লোকেদের আগ্রহের অন্ত নাই! এই গুজবের ভিত্তিহীনতা স্থাপিত করিতে বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। আলাপ পরিচয়ের পর অভ্যাগতেরা প্রস্থান করিলে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য

বিশ্রাম লইলাম। অপরাহ্নে ফটো তুলিবার পর সংবাদপত্রে রিপোর্ট দিয়া মোটরে করিয়া সহর পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলাম। দুই দিবস আমাদিগের কোন কার্য্য না থাকায় সেই অবসরে সহরের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিদর্শন করিতে ও স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম।

আমি যে দিন রেঙ্গুনে গিয়া পৌছিয়াছিলাম সেই দিন প্রত্যুষে প্রফুল্লকুমার মিয়ংমিয়া হইতে সাঁতার প্রদর্শন করিয়া পুনরায় রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। সন্তরণ প্রদর্শনের জন্য মিয়ংমিয়াতে কয়েক ঘণ্টা সমস্ত বিদ্যালয় ও দোকান-পাট প্রফুল্লকুমারের সম্মানের জন্য বন্ধ হইয়াছিল। মিয়ংমিয়ার ডেপুটি কমিশনার সাহেব প্রফুল্লকুমারকে জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত মুদ্রাপূর্ণ একটি থলি পুরস্কার দিয়াছিলেন।

রেঙ্গুন সহরের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসার তরফ হইতে আমরা পৃথক নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। দৈনিক তালিকা অনুযায়ী ৬টি হইতে ৮টি পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। সময়াভাবে এবং গৃহে ফিরিবার প্রবল বাসনায় পিগু, মৌল্‌মিন্‌, বেসিন, মাণ্ডালে ও অন্যান্য সহরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সক্ষম হই নাই। তাঁহাদের নিকট পুনর্ব্বার আসিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি।

গত ৩০শে অক্টোবর, রেঙ্গুনে সর্ব্বজাতি প্রতিনিধিমূলক একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ ইউ পুর সভাপতিত্বে বেঙ্গল একাডেমিতে এক বিরাট জনসভা হয়। এই সভা প্রফুল্লকুমারকে বিশেষভাবে সম্মানিত ও অভিনন্দিত করিয়াছিল।

রেঙ্গুন কর্পোরেশনের সদস্য মিঃ এস্ উজাম নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন—"রেঙ্গুন কর্পোরেশন অদ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষকে তাঁহার এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দিত করিতেছে। তিনি আজ অবিরাম সন্তরণে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।" এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ প্রফুল্লকুমারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই স্থানে একত্রে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ বাগলে (এম্ এল সি) বলেন—"মিঃ ঘোষ যদি অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন এবং সন্তরণে এইরূপ কৌশল দেখাইতেন, তবে তাঁহার নাম, যশ এবং সম্বর্দ্ধনা অন্যপ্রকার হইত।"

মিঃ কিয়া মাইগু (এম্ এল্ এ) বলেন—"মিঃ ঘোষের কৃতিত্ব আশ্চর্য্যজনক শীঘ্র কেহ আর তাঁহার ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হইবে না।"

ডাঃ বাম্ (এম্ এল্ সি) বলিয়াছেন—"এইরূপ অনুষ্ঠানে রেঙ্গুনে কোন দিন এইরূপ ঔৎসুক্য দেখা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয় না।"

ডাঃ পিম্ মাং বলিয়াছেন—"দৈহিক শক্তিতে দুর্ব্বল বলিয়া যে জাতি পরিচিত, তাহাদের দলভুক্ত মিঃ ঘোষ যে সন্তরণে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড অতিক্রম করিয়াছেন ইহা অতিশয় প্রশংসনীয়।"

প্রফুল্লকুমার রেঙ্গুনে বিভিন্ন পুরুষ এবং নারী সম্প্রদায় হইতে যে সকল "মানপত্র" পাইয়াছিল তাহার একখানি বিচিত্রার পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। আশা করি এই মানপত্র তাঁহাদের নিকট আদৃত হইবে।

বাঙ্গালী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত—"হে জগৎবরণ্য সন্তরণ-বীর, তুমি সন্তরণ ক্রীড়ায় যে অমানুষিক শক্তি ও অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছ, তাহা জগতে অতুলনীয়। অপরিসীম শ্রমসাধ্য অদ্ভুত সন্তরণ দক্ষতায় তুমি বিশ্বের শক্তির দরবারে স্বীয় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছ। আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী তোমার কৃতিত্বে, তোমার শ্রেষ্ঠত্বে, তোমার বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত।

বিজয়ী বীর, তুমি বীরত্বের সাধনায় বাঙ্গালীকে বীরের আসনে বসাইয়াছ। বাঙ্গালীর নিরুদ্ধ শক্তির উৎসমুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া তার জাতীয় জীবনে একটি বিশিষ্ট বীর্য্যবত্তার প্রেরণা আনিয়া দিয়াছ। তার আত্মবোধশক্তির একদিক উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়াছ।

বাঙ্গালা মায়ের সুসন্তান, তোমার অতুল বীরত্বের শ্রেষ্ঠ

বিকাশ এই প্রবাসে আমাদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাতে আমরা অশেষ ধন্য হইয়াছি।

জাতির সম্পদ, তুমি বিদেশে যাইতেছ। প্রবাসী বাঙ্গালীর শুভেচ্ছা তোমার জয়যাত্রার পথে তোমায় বর্ম্মের ন্যায় ঘিরিয়া রাখিবে। দিকে দিকে তোমার কীর্ত্তিগাথা ছড়াইয়া পড়ুক, তোমার বিশিষ্ট সাধন ক্ষেত্রে বিশ্বজয়ী হইয়া বাঙ্গলা মায়ের শ্যামল কোলে তুমি সুস্থ দেহে সবল চিত্তে ফিরিয়া এস, ইহাই শ্রীভগবানের মঙ্গলময় চরণে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।"

অনেকেরই ধারণা আছে যে কলিকাতার ব্যায়ামবীর দলের সহিত প্রফুল্লকুমারের আর্থিক ব্যাপার লইয়া একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। প্রফুল্লকুমারের যে কথাগুলি "এক্সএল্‌সিয়রের" সভায় পঠিত হইয়াছিল তাহার বঙ্গানুবাদ এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"আজ আমি দ্বিতীয়বার রেঙ্গুন সহরের এই বিপুল দর্শকবৃন্দের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছি। সন্তরণ কালে আপনারা আমাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তজ্জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, আমি আজ সন্তরণ সম্বন্ধে ২।১টি কথা আপনাদের বলিতে ইচ্ছা করি। সাঁতার যে কেবলমাত্র স্বাস্থ্যপূর্ণ আনন্দদায়ক ক্রীড়া বিশেষ তাহা নহে। ইহার যথেষ্ট উপকারিতা ও আবশ্যকতা আছে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহা সকলেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। আজ আমি সানন্দ চিত্তে আমার ভ্রাতা ব্যায়ামবীরদিগকে আপনাদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছি। ইঁহারা সকলেই কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশীয়। যদিও উঁহাদের দল ও আমাদের দল, সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এক প্রাণ ও মন। অদ্যকার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ মিঃ বিষ্ণু ঘোষের ব্যায়াম শিক্ষালয়ের উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হইবে। আমি আরও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত শান্তি পাল যিনি আমাকে এতাবৎ-কাল বিবিধ সন্তরণ কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন তিনি আজ এ স্থলে উপস্থিত হইয়া আমাকে উৎসাহিত, অনুপ্রেরিত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন। আপনাদের এই সাদর অভ্যর্থনার জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।" এক্ষণে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন যে আমাদের মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্য হয় নাই এবং আমিও কলিকাতা হইতে এই ৯০০ মাইল দূরে তুচ্ছ বিবাদের জন্য যাই নাই।

মোট কথা রেঙ্গুন সহরে আমরা যেরূপ সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছি তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। মনে পড়ে একদিবস অপরাহ্নে প্রফুল্ল ও আমি সোয়াডাগণ প্যাগোডায় গৌতম দর্শনের জন্য গিয়া অসংখ্য বর্ম্মিণী সুন্দরী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিলাম। এই সকল সুন্দরীগণ লোক পরম্পরায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে সেদিন ঘোষ প্যাগোডায় আসিবে। সকলেই ঘোষের সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত। উহাদের অনেকেরই মনের ধারণা যে ঘোষ গৌতমের অংশবিশেষ। আমরা সকলেরই সৌজন্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে আকারে ইঙ্গিতে কোন প্রকারে বুঝাইয়া দিলাম যে আমরা তাঁহাদেরই মত সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। অন্যদিন সেণ্ট এ্যাণ্টনীর সান্ধ্য-সভা শেষ করিয়া ফাদারের একান্ত অনুরোধে "ফ্যান্সী-ফেয়ার" পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত যাইলাম। মনে পড়ে সে স্থানেও এমন কোন "ষ্টল" ছিল না যাহা হইতে প্রফুল্লকুমারকে স্বেচ্ছায় একটি করিয়া উপহার দেওয়া হয় নাই। জামাল সাহেব ও বিচারপতি সেন সাহেবের বাটীতে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিলাম। শেষোক্ত স্থানে প্রফুল্লকুমারের সাঁতারের কৌশলও প্রদর্শিত হইয়াছিল। রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সে স্থানেও সন্তরণ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং ইউনিভার্সিটি ছাত্রবৃন্দকে সাঁতারের আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বুঝাইতে চেষ্টাও করিয়াছিলাম। কোকাইন ক্লাবের কয়েকজন খেলয়াড়ের হঠাৎ অসুখের জন্য ওয়াটার-পোলো খেলার আয়োজন বন্ধ হইয়াছিল; সেই কারণে আমি প্রফুল্ল, নরেন্দ্র, ছনুলাল ও বধুমাতা ব্যতীত সকলেই আমাদের পূর্ব্বে কলিকাতায় ফিরিয়াছিল। আমরা আরও দুই সপ্তাহ রহিলাম।

রেঙ্গুনে তিনটি বৃহৎ হ্রদ আছে। রয়েল, কোকাইন ও লগা। শেষোক্ত হ্রদের জল সহরের পানীয় হিসাবে ব্যবহার

হয়। ইহা ছাড়া সহরের মধ্যে কতকগুলি পুষ্করিণীও আছে। রেঙ্গুনবাসীদিগের এইরূপ সন্তরণে উৎসাহ দেখিয়া আমি ঐ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা অনেক স্থলে বলিয়াছিলাম। অনেকেই আমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত হ্রদে বা পুষ্করিণীতে সন্তরণ শিক্ষার সমিতি স্থাপন করিয়া এই উপেক্ষিত স্বাস্থ্যপূর্ণ জল-ক্রীড়া রেঙ্গুনবাসীদিগের মধ্যে প্রচার করিবেন। কার্য্যে পরিণত হইলেই আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিব।

রেঙ্গুনে নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রফুল্লকুমারের হস্তগত হইয়াছে—

স্বর্ণপদক—৩০
রৌপ্যপদক—৫
কাপ (বড়)—৫
কাপ ছোট—৪
আংটী—১
স্বর্ণশাঁখা—১ জোড়া
সিগারেট কেস্ (রৌপ্য) ১
নগদ মুদ্রা—৮০০০৲

ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রফুল্লকুমার কর্ত্তৃক অবিরাম সন্তরণের তালিকা—

১৯২৯	কলিকাতা	২৮ ঘণ্টা
„	বর্দ্ধমান	১২ „
১৯৩০	বিষ্ণুপুর	১০ „
„	বাঁকুড়া	১৫ „
„	মৈমনসিং	১২ „
„	কলিকাতা	৬৭ „ ১০ মিঃ
১৯৩১	আন্দুল	৫ ঘণ্টা
„	কাল্না	৫ „
„	সালখিয়া	৫ „
„	দমদম	৫ „
১৯৩২	কলিকাতা	৬৬ „ ৪৮ মিঃ
„	চট্টগ্রাম	১২ „
„	খড়্গপুর	২৪ „
„	মেদিনীপুর	২৪ „
„	খড়্গপুর	৫ „
„	তম্লুক	২৪ „
„	মহিষাদল	২৪ „
„	বাঁকুড়া	২৪ „
„	উলুবেড়িয়া	২৪ „
„	মেদিনীপুর	৫ „
„	পুরুলিয়া	২৫ „
১৯৩৩	বেহালা	২৪ „
„	রাণাঘাট	২৬ „
„	কৃষ্ণনগর	২৪ „
„	উলুবেড়িয়া	৩০ „
„	চুঁচড়া	২৫ „
„	কটক	২৫ „
„	কলিকাতা	৭২ „ ১৮ মিঃ
„	রেঙ্গুন	৭৯ „ ২৪ মিঃ

১৯৩০ সালে কলিকাতায় ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট সাঁতার কাটিয়া আর্থার রিজো কর্ত্তৃক কৃত পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া প্রফুল্লকুমার কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিল।

শান্তি পাল

বিতর্কিকা

বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্তি প্রয়োগ

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

একথা খুবই সত্যি যে, পঞ্চাশ বছর আগে বংলাভাষার যে অবস্থা ছিল, আজ তার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হ'য়েছে। জাতীয় কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেরও ক্রমবিকাশ ঘটছে। পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাভাষাকে অন্যান্য জাতি ত দূরের কথা ইংরেজী শিক্ষিত বাংলাভাষাভাষীরাও পর্য্যন্ত বড় একটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না। কিন্তু আজ সেই মাতৃভাষার দুকূল-ভাঙা বন্যায় বাংলার মাঠ-ঘাট ঘর-বাড়ী সব প্লাবিত হ'য়েছে। যেদিন (১৯১৩ খৃষ্টাব্দে) বাংলা সাহিত্যের গুরু কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় কাব্য রচনা ক'রে 'নোবল' প্রাইজ পেলেন, সেদিন শুধু বাঙালী নয় সমস্ত জাতিই বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেছিল। আজ বিশ্বের দরবারেও বাংলা ভাষা একটা সম্মানের আসন অধিকার করে আছে।

কিন্তু বাংলাভাষার এই ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রমবিকাশের ধারাকে চিনতে হবে। কোন্ পথে চললে বাংলাভাষা আরও উন্নতিশিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হবে, কোন্ নীতি অবলম্বন করলে বাংলাভাষা আরও ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে, তা প্রত্যেক ভাষাবিশেষজ্ঞ ও সাহিত্য-সেবকের বিশেষ বিচার বিশ্লেষণ ক'রে দেখা দরকার। এখন কথা উঠছে, বাংলাভাষায় দ্বিরুক্তি প্রয়োগ নিয়ে—একার্থ বোধক দুই শব্দের ব্যবহার। যেমন 'ভয়' ও 'ডর' উভয় শব্দের অর্থ এক, কিন্তু সময়বিশেষে এর একটিকে মাত্র ব্যবহার না ক'রে একসঙ্গে দুইটিরই প্রয়োগ।

আজ এ প্রসঙ্গ তোলবার আবশ্যকতা আছে। কেননা এ বিষয় নিয়ে, লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, একটা মতভেদ চলছে। এ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে এর পক্ষে কোনো কোনো সাহিত্যিকের সমর্থন পেয়েছি, আবার কোনো কোনও সাহিত্যিকের কাছ থেকে এর বিরুদ্ধ অভিমতও জানতে পেরেছি। আমার পরিচিত একটী ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র একবার তার রচনার খাতায় লিখেছিল—"জগতে যাঁহারা নম্র ও বিনয়ী তাঁহারাই প্রকৃত মহৎ।" রচনার পরীক্ষক 'কাব্যতীর্থ'ধারী পণ্ডিত মশায় এক সঙ্গে 'নম্র' ও 'বিনয়ী'র প্রয়োগ দেখে ছাত্রের প্রতি অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হন এবং ভবিষ্যত উন্নতি চাইলে আর কখনো ওরকম করতে নিষেধ করেন।

কিন্তু এই দ্বিরুক্তি প্রয়োগ বাংলাভাষায় অল্পবিস্তর চ'লে আসছে দেখতে পাচ্ছি। প্রথমতঃ গদ্য-সাহিত্যের কথাই বলি। যে 'নম্র' ও 'বিনয়ী'র একত্র প্রয়োগের জন্য পূর্ব্বোক্ত ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্রটি তার পণ্ডিতমশায়ের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হ'য়েছিল, ঠিক সেই প্রয়োগটিই সেই ম্যাট্রিকুলেশনের বাংলা কোর্সের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনীপ্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' 'Folk Literature of Bengal' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন ডি-লিট মহোদয় লিখিয়াছেন—

"আমরা অনেক **নম্র ও বিনয়ী** লোকের সন্ধান জানি, যাঁহাদের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসিটি লাগিয়া আছে" ইত্যাদি। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দ্বিরুক্তিপ্রয়োগ ত' দূরের কথা, তারও অতিরিক্ত করেছেন।

"করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত **সমস্ত বিশ্বজগৎময়** ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে।"—'পাঠ সঞ্চয়'। বর্ত্তমান যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী

ঔপন্যাসিক শরচ্চন্দ্রের রচনা খুঁজলেও তা মিলবে।'

"মনে হয় সমস্ত প্রজ্জ্বলিত নভস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহ ঝরিতেছে ইহার **অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই** সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।"

অন্যান্য সাহিত্যিকের, বিশেষতঃ আধুনিক লেখকগণের রচনাতে এরূপ প্রয়োগের আদৌ অভাব নেই। বাহুল্য ভয়ে অধিক উদ্ধৃত করলাম না।

তারপর পদ্যসাহিত্যের কথা ধরছি। গদ্যসাহিত্যের চেয়ে পদ্য-সাহিত্যে আরও অধিক পরিমাণে দ্বিরুক্তি প্রয়োগ চ'লে আসছে। ছন্দমিল, শ্রুতিমাধুরী, ভাবসম্পদ বা প্রকাশ ভঙ্গীর কৌশলের জন্য তার এত অধিক ব্যবহার যে, তার দৃষ্টান্ত না দিলেও চলে। তবু আমরা এখানে একটীমাত্র উদ্ধৃত করছি।

"**বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা,**—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়োই দরিদ্র শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।"

—রবীন্দ্রনাথ

পদ্যসাহিত্যে 'সর্ব্বস্বধন', 'স্বরূপ আপন' 'ব্যথাবেদন' প্রভৃতি প্রয়োগ প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠছে, বাংলাভাষায় এরূপ দ্বিরুক্তি প্রয়োগ ভাল কি মন্দ। মতভেদের দ্বন্দ্ব না থেকে এর একটা চূড়ন্ত মীমাংসা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই সেই আলোচনায় এখন নামছি। নানা দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা ক'রে আমি এর সমর্থন করি। কেন করি, তা এখানে জানাচ্ছি।

অনেক সময় কোনো ভাব প্রকাশে একটিমাত্র উক্তিই যথেষ্ট হয় না, তার ওজন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একার্থ-বোধক বা প্রায় সমার্থবোধক দুইটি শব্দ সেখানে প্রয়োগ করলে তার ওজন বেড়ে যায় এবং ভাবের ব্যঞ্জনাও উজ্জ্বলতর হয়। বিশেষতঃ কোনো বিশেষ বিষয়ের প্রতি জোর দিতে গেলে সেখানে দ্বিরুক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা গভীরভাবেই উপলব্ধি হয়। যেমন, "আঁধার রাত্রি—প্রকৃতি নীরব" এর চেয়ে "তমিস্র আঁধার রাত্রি—প্রকৃতি নীরব, নিঝুম" আমার মনে হয়, লোকের মন অধিকতর স্পর্শ করে। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাব অন্যভাবে প্রকাশ না ক'রে একই শব্দের দুইবার প্রয়োগের দ্বারা প্রকাশ করলে অধিকতর পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। যেমন, "যুগ যুগ ধরিয়া জাতিকে এ কলঙ্ক-পশরা মাথায় বহিয়া মরিতে হইবে।"

কাব্যে বা কবিতায় দ্বিরুক্তি প্রয়োগ একরূপ প্রায় অপরিহার্য্য। ছন্দমিল, শ্রুতিমাধুরী, ভাবসম্পদ বা প্রকাশ-ভঙ্গীর কৌশলের জন্যও দ্বিরুক্তি প্রয়োগের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। কবিতার রাজ্য থেকে 'সর্ব্বস্ব ধন', 'স্বরূপ আপন', 'ব্যথাবেদন' প্রভৃতিকে নির্ব্বাসন দেওয়া কখনো সম্ভব নহে। কাব্যের কনকতক্তে মহোচ্চ আসনেই তারা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং মনে হয় থাকা মঙ্গলও। কাব্যের রূপ ও রসের খাতিরে এদের যতই অপরাধ (?) হোক না কেন, হাসি-মুখেই তা মার্জ্জনা করতে হবে।

বাংলাসাহিত্যে যদি চলিত ভাষার স্থান থাকে, তবে দ্বিরুক্তি প্রয়োগের খুবই আবশ্যকতা আছে। বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকার কথোপকথনে দ্বিরুক্তি প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য্য। তা কোনো মতে উপেক্ষা করা চলে না।

হয়ত কথা উঠবে, এতে ব্যাকরণকে ক্ষুণ্ণ করা হবে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, সাহিত্য পথপ্রদর্শক—ব্যাকরণ তার অনুগামী মাত্র। সাহিত্য পথ দেখাবে আর ব্যাকরণ সেই পথ দেখে চলবে। সাহিত্যের কর্ত্তৃত্বই তাকে মাথা পেতে নিতে হবে। বিশেষতঃ যে কর্ত্তৃত্বপালনে লাভ ছাড়া লোকসান নেই, সেই কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করলে তা শুধু নির্ব্বুদ্ধিতা নয়, অধিকন্তু অপরাধও বটে। তা ছাড়া ব্যাকরণ নিজেও এর প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারেনি। একার্থ-বোধক বা প্রায় সমার্থবোধক যুগ্ম শব্দের প্রবেশের জন্য তাকে দ্বার খুলে দিতে হয়েছে। 'মানমর্যাদা', 'লজ্জাসরম্', 'আমোদ প্রমোদ' প্রভৃতিকে সসম্মানে তার ঘরের আঙিনায় স্থান দিতে হ'য়েছে। সুতরাং দ্বিরুক্তি প্রয়োগের দাবী অসঙ্গত ব'লে আমি মনে করি না।

ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যেও এরূপ দ্বিরুক্তি প্রয়োগের স্থান আছে। অবশ্য আমি এমন কথা বলছি না, যেহেতু ইংরেজী সাহিত্যে দ্বিরুক্তি প্রয়োগ আছে, অতএব বাংলা-সাহিত্যেও তা চালাতেই হবে। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্চে এই যে, যখন অন্যান্য ভাষা এটাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে,

তখন প্রয়োজন ও উপযোগীতা সত্ত্বেও আমাদের মেনে নিতে আপত্তি কি?

তবে অনর্থক দ্বিরুক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতী আমি নই। যেখানে একটি শব্দের ব্যবহারেই ভাব পরিস্ফুট হয়, সেখানে মিছামিছি দ্বিরুক্তি প্রয়োগ ক'রে রচনাকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলা আদৌ সমীচীন নয় মনে করি। তাতে রচনার মূল্য না বেড়ে তার সৌন্দর্য্যই হানি হয়। যেখানে রচনার মূল্য বাড়ে, আমার মতে সেইখানেই দ্বিরুক্তি প্রয়োগ হওয়া উচিত।

আমাদের জাতীয় পোষাক

শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক

গত আশ্বিন মাসের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মুস্তাফী এবং কার্ত্তিক মাসের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে আলোচনা পড়লাম। তাদেরকে ধন্যবাদ। ভবিষ্য পৃথিবীর যে মহান্ বাঙ্গালী জাতি শৈশবের খেলাঘরে এখনও তার দিন কাটাচ্ছে এই রকম প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা তার মানুষ হয়ে বেড়ে উঠার পক্ষে সাহায্য করবে। আজকের এই শুভ আত্মসচেতনার প্রভাতকালে পরম আকাঙ্ক্ষিত মধ্যাহ্নোজ্জ্বল আমাদের ভবিষ্যতের জন্য যতটা প্রস্তুত হয়ে থাকা যায় ততই ভাল।

মুস্তাফী মহাশয় বলছেন ধুতির সঙ্গে সার্ট বা কোট মিশ খায় না, গাঙ্গুলী মহাশয় বলছেন কোটও ধুতির সঙ্গে শোভন হয় যদি তা অতিমাত্রায় খাটো না হয় এবং গলা আটা হয়। কেন যে ধুতি এবং সার্ট কোটের সংযোগের শোভনত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে একটু তলিয়ে আলোচনা কর্ত্তে চাই। ধুতি জিনিষটা হল flowing, এলোমেলো, জলের মত একটা নির্দ্দিষ্ট আকারহীন। কাজেই তার সঙ্গে প্লেট করা হাতা কলারওয়ালা ডবল ব্রেষ্টেড সার্টের মত একটা তীক্ষ্ণ আকার নেওয়া সার্ট বা কড়া ইস্ত্রি করা স্মার্ট কোট মিশ খেতে পারে না। নমনীয় ধুতি এবং উগ্র সার্টকোটের একত্র সমাবেশ কাজেই একটু দৃষ্টি আর রুচিসম্পন্ন লোকের চোখে না লেগে যায় না। সুদূরতম অতীতের স্মৃতি ও মায়াজড়িত ধুতিকে আমরা বোধ হয় কোন দিনই ত্যাগ করতে পারবো না এবং যে চাকচিক্যময় দিন পড়েছে সার্টকোটকে একেবারে বর্জ্জন করলেও চলবে বলে মনে হয় না। কাজেই শ্রেষ্ঠ পথ হবে দুটোরই বিশেষত্বকে একটু কমিয়ে একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থায় তাদের টেনে আনা। ধুতিকে একটু স্মার্ট করতে হবে এবং কমাতে হবে সার্টকোটের ইস্ত্রি এবং কাটের উগ্রতাকে। নরম হাতাকলারওয়ালা যে ধরনের সার্ট আজকাল সবাই ব্যবহার কর্চ্ছে ধুতির সঙ্গে তা খুব বেশী বেমানান হয় না, কারণ ওসার্টে ধুতির নমনীয়তার অভাব নেই। গাঙ্গুলী মহাশয় যে প্রকার গলা আটা ঢিলে কোটের ব্যবস্থা করেছেন ধুতির সঙ্গে তা-ও খুব বেশী অশোভন হবে না। এ ধরণের সার্ট কোট দুইই ধুতির সঙ্গে চলতে পারে বলে আমার মনে হয়। গলাখোলা কোটকেও আমরা বর্জ্জন না করে চলতে পারি। সালোয়ারের মত করে কাপড় পরবার যে রেওয়াজ আজকাল চলছে তা বেশ স্মার্ট এবং গলাখোলা কোটের সঙ্গে মিশ খেতে তার কোনখানেই বাধা নেই। এ দুয়ের সংমিশ্রণের যে পোষাক তা-ই আমাদের গ্রহণ কর্ত্তে হবে, বিশেষতঃ যুবকদের; অফিসে, রেল ভ্রমণে, খেলায়, হাটবাজারে, শিকারে সর্ব্বত্র। বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ক্ষুন্ন হবে আশঙ্কা করে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা হয়ত এ ধরণের স্মার্ট আঁটসাট পোষাক পছন্দ করবেন না। তাঁদের জন্য গাঙ্গুলী মহাশয়ের ব্যবস্থামত একটু ঢিলে গলা আটা অনতি খাটো কোটই সর্ব্বোত্তম হবে বলে মনে হয়। সঙ্গে কোঁচার নিম্নপ্রান্ত নাভিতে গোঁজা ধুতি।

অতঃপর গাঙ্গুলি মহাশয় ধুতির কোঁচা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তার মতে কোঁচা বস্তুটি বাঙালীর পুরুষ বেশের কলঙ্ক। এমন একটা নিরর্থক পদার্থ এতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ বেশের মধ্যে বিলম্বিত হয়ে বিরাজ করছে এ সত্যই পরিতাপের কথা। দশ হাত কাপড়ের মধ্যে পাঁচহাত পরিধান করে বাকি পাঁচ হাত কুঁচিয়ে নাভিপ্রদেশে গুঁজে রেখে

দিলাম, এর কোন অর্থ নেই। যদি কোন অর্থ থাকে ত সে একমাত্র প্রসাধনের। কিন্তু পুরুষের কর্ম্মব্যগ্র জীবনের সচলতার মধ্যে তার বেশে এই পাঁচহাতী দোলায়মান প্রসাধনের স্থান থাকা সত্যই উচিত নয়। এমন একটি একান্ত অপুরুষোচিত বস্তু নারীবেশের মধ্যেও নেই।"

কোঁচার বিরুদ্ধে এ অত্যন্ত কঠোর অপ্রিয় সত্য আলোচনা। তাঁর প্রত্যেকটি অভিযোগ অস্বীকার যেতে আমাদের কোন পথই নেই। কিন্তু তিনি এ সমস্যার যা সমাধান করেছেন যুবকেরা তা গ্রহণ করতে পারবে না। কোঁচার নিম্ন প্রান্তটি নাভিদেশে গুঁজে পথে বের হওয়া, তরুণদের কাছে অত্যন্ত হাস্যকর ঠেকবে। সত্যিই পুরুষ-জীবনের কর্ম্মব্যগ্র সচলতায় কোঁচার মত একটি ফুলবাবু-জনোচিত নিরর্থক দোলায়মান প্রসাধনের স্থান থাকতে পারে না। পশ্চিমাদের মত পাকিয়ে আঁটসাঁট করে ধুতি পরলে একটি কার্য্যতৎপরতার ভাব তাতে আসে বটে কিন্তু আবার ওরকম করে কোন বাঙালীই কাপড় পরতে চাইবে না। এবং শোভন সুন্দর পাঞ্জাবীর সঙ্গে তা অত্যন্ত বিসদৃশ দেখাবে, আমাদের চোখে। কোঁচার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ গাঙ্গুলিমহাশয় তুলেছেন তার প্রত্যেকটিই অকাট সত্য বটে কিন্তু এ-ও আবার সত্যি যে কোঁচার যে শ্রী এবং শোভনতা আছে তাকে বিসর্জ্জন দিলে অন্য কোন রকমেই তার ক্ষতিপূরণ হবে না। বাইরের কর্ম্মব্যগ্র জীবনে ছেলেদের জন্য থাক্ শালোয়ারী ধরনের কাপড় এবং হাফ্ সার্টের পরে গলাখোলা কোট, নাভিদেশে কোঁচার নিম্নপ্রান্ত গোঁজা ধুতির পরে গলাআঁটা ঢিলে অনতিখাটো কোট থাক প্রৌঢ় এবং বুড়োদের জন্য। কিন্তু সভাসমিতি, নিমন্ত্রণ রক্ষায় মজলিশ, বৈঠকখানায় সকোঁচধুতির সঙ্গে শুভ্র সুন্দর পাঞ্জাবী অত্যন্ত শোভন। এমন একটি সুন্দর সংমিশ্রণ এবং যেটিই আমাদের একমাত্র জাতীয় পোষাক তা একেবারে বিসর্জ্জন দিলে লাভবান হবার আমাদের কোন সম্ভাবনা নেই। আর এ দু'রকম পোষাকে আমাদের জাতীয় পোষাকের দৈন্যও কিছুটা ঘুচবে। খেতে, বসতে, শুতে, অফিসে, মজলিসে সর্ব্বত্র যে আমাদের একই রকমের পোষাক, রুচিসম্পন্ন মনের পক্ষে তা একান্ত বেদনাদায়ক।

কোঁচার বিরুদ্ধে গাঙ্গুলীমহাশয়ের অন্য রকমের আরও একটা অভিযোগ আছে। ট্রামে, বাসে এবং রেলগাড়ীতে ওঠবার সময় জুতা কোঁচা সিড়ি সংযোগে বিপদের আশঙ্কা সেটা। কর্ম্মব্যস্ত জীবনে যেখানে সময়ের সঙ্গে আমাদের পাল্লা দিতে হয় সেখানে ওরকম ঘটা খুবই সম্ভব। কিন্তু সামাজিক জীবনের অনতিব্যস্ত চলাফেরায় কোঁচার দিকে মনোযোগ রেখে চলা অসম্ভব কিছু নয়।

একান্ত অনাবশ্যক বলে চাদরকে বাতিল করে দিতে গাঙ্গুলিমহাশয় উপদেশ দিয়েছেন। চাদরটা যে অনেকটা অনাবশ্যক তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বলেই তাকে পোষাকের ক্ষেত্র থেকে ছেটে ফেলে দিতে হবে এ-ও খুব বেশী ঠিক্ নয়। ইউরোপীয়দের একান্ত স্মার্ট পোষাকেও অপ্রয়োজনীয় জিনিষের স্থান আছে। জিনিষটার শোভনীয়তাও দেখতে হবে। দেখতে হবে পোষাকটির সমষ্টিগত দৃশ্যের শোভনতা এবং শ্রীর জন্য অনাবশ্যক জিনিষটা অনেক কিছু সাহায্য করছে কিনা! টাই বাঁধতে কিছু সময় লাগে, অনাবশ্যকও, কিন্তু ওটার নির্ব্বাসনের কথা কেউ বলেন না। আমার মনে হয় সামাজিক জীবনের পোষাকে পাঞ্জাবীর উপর একখানা সুশুভ্র চাদর একটু গাম্ভীর্য্য, একটু আড়ম্বর এবং একটু পরিপূর্ণ শ্রীর আমেজ এনে দিতে চমৎকার সাহায্য করে, বয়সের অনুকূল বলে প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের পক্ষে অন্ততঃ যা একান্ত আকাঙ্ক্ষনীয় বলে মনে হয়। সামাজিক জীবনের পোষাকে কাজেই চাদরকে পরিত্যাগ করবার খুব কী এমন আবশ্যক আছে! বিশেষতঃ শীতের সময় যখন ওই জাতীয় একটি জিনিষ ব্যবহার আমাদের করতেই হয়।

এই সঙ্গে পোষাকের ক্ষেত্রে জুতা নিয়ে একটু আলোচনা করলে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হয়ত, যে কোন পোষাকে যে কোন জুতা আমরা পরে থাকি। পোষাকের সমষ্টিগত শ্রীতে জুতারও যে একটা স্থান আছে এ আমাদের মনেই হয় না। শালোয়ারী ধরণে কাপড় পরে গলাখোলা কোট গায়ে দিয়ে অসঙ্কোচে আমরা পম্পসু বা শ্লিপার পরে থাকি। আবার পাঞ্জাবীর সঙ্গে অক্স্ফোর্ড বা অন্যবিধ 'সু-' ব্যবহার করতেও আমরা ইতস্ততঃ করি না। পোষাকের

সঙ্গে জুতার একটি সামঞ্জস্য বিধান করে চলা উচিত।

আরও একটি জিনিষের উল্লেখ আমি করতে চাই, সেটী বহির্বাস সম্বন্ধে নয় বটে কিন্তু একেবারে অপ্রয়োজনীয়ও নয়। আণ্ডারওয়ার আমাদের সকলেরই ব্যবহার করা উচিত। গ্রীষ্মকালে যখন জোর হাওয়া বইতে থাকে তখন বাতাসের বিরুদ্ধে চলতে গেলে কোঁচাটী উৰ্দ্ধমুখ হয়ে পতকারূপে উড়তে থাকে এবং উরুমূল পর্য্যন্ত সমস্ত নগ্ন পা'টি লোকচক্ষুর সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে। এ দৃশ্য অত্যন্ত লজ্জাকর। এ ছাড়াও একটু ক্ষিপ্র কাজকর্ম্ম বা চলাফেরায় পরিধানের ধুতি বিস্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকে পদে পদে। আণ্ডারওয়ার পরা থাকলে এ আশঙ্কা আর থাকে না। কাপড়ের মত একটা ঢিলেঢালা জিনিষ পরিধান করলে আণ্ডারওয়ার পরাটা একান্তই আবশ্যক বলে মনে হয়। মেয়েদের মধ্যেও জিনিষটার অধিকতর প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এবার শিরস্ত্রাণ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে বিতর্কিকায় আমার বক্তব্য শেষ করবো। পৃথিবীতে একমাত্র বাঙ্গালী জাতিরই বোধ হয় মস্তকে কোন আচ্ছাদন নেই। গরম দেশে ইহাই স্বাভাবিক মনে করে নির্ব্বিকার থাকাই আমাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আজমীড়, মেবার, কাশী, কানপুর বাংলার চেয়ে শীতলতর দেশ নয়। ওসব অঞ্চলের 'লু'-ওড়া দুঃসহ গরমের সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রীষ্ম অনেক কম নির্য্যাতনকারী বলতেই হবে। কাজেই ওসব দেশে পাগড়ী বা ওই জাতীয় শিরস্ত্রাণ পোষাকের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হতে পারলে আমাদের ব্যাপারেই বা গরমের ওজর খাটবে কেন? শুধু তাই নয়, শিরস্ত্রাণ পোষাকে একটি সমগ্রতা বা সম্পূর্ণতার ভাব এনে দেয়। শিরস্ত্রাণহীন পোষাক চূড়াহীন মন্দিরের মত, গম্বুজহীন মসজিদের মত কেমন একটু ফাঁকা ফাঁকা অসম্পূর্ণ মনে হয়। একদা গান্ধীটুপির রেওয়াজ উঠেছিল বটে কিন্তু আজ আর তা নেই। ফেজের ধরণে 'রৈবিক' টুপি চলতে পারে কি না এ সম্বন্ধে আগ্রহশীল যারা তারা আলোচনা করলে সুখী হব। মোটকথা সর্ব্বজনগ্রাহ্য একটি শিরস্ত্রাণ উদ্ভাবন করলে মন্দ হবে না। আমাদের মেয়েদের মাথায়ও আলাদা কোন মস্তকাবরণ নেই বটে, কিন্তু তাদের ঘোমটা সে উদ্দেশ্য আধাআধি পূরণ করে।

পরাধীন বলে ইউরোপীয় পোষাক অন্যান্য স্বাধীন প্রাচ্য-জাতিদের মত জাতীয় পোষাক করে নিতে গেলে আমাদের আত্মসম্মানে একটু লাগবে হয়ত। তারপর ওদের 'ট্রাউজারের'ও একটি বিশ্রী কদর্য্যতা আছে। এ দুয়ের সমাধান হলে অন্তত বাইরের কর্ম্মব্যগ্র জীবনের পোষাকস্বরূপ ইউরোপীয় পোষাক গ্রহণ করলে ভালই হবে মনে হয়।

বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক

শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিচিত্রার মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, 'বিতর্কিকায়' বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে যে আলোচনা আহ্বান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। তবে বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ হইতেছে এবং ইহা হওয়াও স্বাভাবিক। পৌষ সংখ্যার বিচিত্রায় মৌলবী আহ্‌বাব চৌধুরী, বিদ্যাবিনোদ, বি-এ মহাশয় পাগড়ী আচকান এবং পায়জামাকেই বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক করা উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতের পোষকতার জন্য তিনি রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র

নাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির নজীর দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে পাগড়ী, আচকান এবং পায়জামার চেয়ে ধুতি এবং পাঞ্জাবীই বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর পক্ষে সুবিধাজনক এবং সুষ্ঠু পোষাক এবং ইহাই বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক হওয়া উচিত।

পায়জামা আচকান প্রভৃতি মুসলমান রাজত্বের সময় বাঙ্গালী সমাজে প্রবেশ করে। দেশের শাসনদণ্ড যখন যে জাতির হস্তে ন্যস্ত থাকে তখন সেই জাতির পোষাককেই দেশের আপামর সাধারণ অনুকরণ করিতে থাকে। এখন যেমন ইউরোপীয় প্যাণ্ট-কোটকে দেশবাসী অনেকেই অনুকরণ করিতেছে। পাগড়ী পায়জামা প্রভৃতি কখনই বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক ছিল না। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে বিদেশে তাহা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর একমাত্র নিজস্ব জাতীয় পোষাক হিসাবে নহে; ইউরোপীয় পোষাকের প্রতিবাদের প্রতীক্ রূপেই তাঁহারা উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন। যে সময় দেশ ইউরোপীয় ধর্ম্ম, ভাষা, ভাব এমন কি পোষাক পর্য্যন্ত অন্ধ অনুকরণ করিয়া আপনাদের নিজস্ব কৃষ্টি ভুলিতেছিল সেই সময় দেশকে অন্ধ অনুকরণ হইতে রক্ষা করিতে পাগড়ী এবং আচকানের দরকার পড়িয়াছিল। বিদেশে যে তাঁহারা ধুতি চাদর ব্যবহার করেন নাই তাহার কারণ এই যে মুসলমান যুগে পাগড়ী, আচকান ও পায়জামাই দরকারী পোষাক ছিল। ইউরোপীয় মোহ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার মানসে ইউরোপীয় পোষাকের প্রতিবাদ স্বরূপ যখন তাঁহারা একটা এতদ্দেশীয় পোষাকের আশ্রয় খুঁজিতেছিলেন তখন সুবিধাজনক একটা কিছু না পাইয়া যাহা বাদশাহী আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল তাহাকেই বরণ করিয়া লইলেন। ধুতি চাদর তখন পর্য্যন্ত এখনকার মত শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। আর বিশেষতঃ যাঁহারা প্রাচীন ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাঁহারা পায়জামা আচকানকেই প্রথম স্থান দিতেন। কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবীর পক্ষে এখন প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হইয়াছে। পায়জামা আচকানের দিন চলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশ নদ, নদী, নালা, বিল, খাল পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ। এখানে পদে পদে নদী নালা হাঁটিয়া পার হইতে হয়। পায়জামাধারীদের জল পার হইতে কিরূপ বেগ পাইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'দ্বীপময় ভারতে' তাহার নমুনা দিয়াছেন। সে স্থলে পায়জামাধারীকে দ্বিতীয় বস্ত্র সঙ্গে নিতে হইবে নতুবা দিগম্বর সাজিতে হইবে। পায়জামা বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক নহে, ইহা তাহার পক্ষে বিজাতীয় পোষাক।

সম্পাদক মহাশয় কোঁচাকে পুরুষত্বের কলঙ্ক বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু শুধু পুরুষত্ব দেখিলে চলিবে কেন? শালীনতাটুকুর দামটুকু ভুলিলে চলিবে না। কোঁচাতে ইহা বাড়ে বই কমে না। তিনি বলিতে পারেন পুরুষের পোষাকের আবার শালীনতা কেন? শুধু পুরুষত্বব্যঞ্জক পোষাকই যদি ভাবিতে হইত তবে ইউরোপীয় পোষাকে খালি কাঠখোট্টা এবং পুরুষত্বব্যঞ্জক হাফ্ প্যাণ্টই চলিত। ট্রাউজার কেহ ব্যবহার করিত না।

তিনি বলিয়াছেন কোঁচাধারীকে সর্ব্বদাই কোঁচার জন্য বিব্রত থাকিতে হয়। ইহা আংশিক সত্য। কাজের সময় অথবা সিঁড়িতে উঠিবার সময় যদিও ইহা কিছু বাধা প্রদান করে তবুও তাহা সামলান অসম্ভব নহে। কাজের সময় মালকোচা মারিয়া কাজ করিলে কাজ মোটেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এবং কোচাকে পিছনে ফিরাইয়া মালকোচা করিয়া নিতে মুস্কিল কিছুই নাই। যাহারা পুরা আস্তিনের সার্ট ব্যবহার করেন কাজের সময় তাঁহারা যেমন আস্তিন গুটাইয়া কাজ করেন এবং তাহাতে তাঁহাদের কাজ মোটেই আটকায় না সেরূপ কাজের সময় মালকোচা মারিয়া কোঁচা সামলান চলে। এসব বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমার মনে হয় ধুতি পাঞ্জাবীই বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক হওয়া উচিত। এই সঙ্গে ধুতি পাঞ্জাবীকেই দরবারী পোষাক করার কথা ভুলিলে চলিবে না। দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা দরকার। নতুবা বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাকের দুর্ব্বলতা চিরদিনই থাকিয়া যাইবে।

বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক

শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

গত কয়েক মাস ধরে বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক কি হওয়া উচিত তাই নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বিতর্কিকাতে প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে কিন্তু সকলেই একটা কথা ভুলে গেছেন যে, এই পৃথিবীর কোনও সভ্য জাতির মধ্যেই একই পোষাকে সব রকম কাজ কর্‌বার রীতি নেই। সব দেশেই অন্ততঃ দু' রকমের পোষাক প্রচলিত আছে।

(১) সাধারণ দৈনন্দিন জীবন যাপন করবার এবং কায়িক পরিশ্রমসাধ্য কাজ কর্ব্বার উপযুক্ত পোষাক।

(২) বিশেষ উপলক্ষ্যে পরবার পোষাক, যাকে ইংরাজরা বলে Dress suit। উদাহরণ স্বরূপ ইংলণ্ডের ব্যবস্থা দেখুন। যাদের শ্রমসাধ্য কাজ কর্ত্তে হয়, অথবা (out-door life) উন্মুক্ত স্থানে কাজ কর্ত্তে হয়, তারা প্রায়ই হাফ্ প্যাণ্ট অথবা ঐ রকম "ছাঁটা ছোঁটা কোর্ত্তা" এঁটে থাকেন। আবার বিবাহ সভায় অথবা ডিনার পার্টিতে Tail Coat এরই একাধিপত্য দেখতে পাওয়া যায়। Tail Coatএর অনাবশ্যক লম্বা লাঙ্গুলের সম্বন্ধে কেহই এ পর্য্যন্ত এই বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন নাই যে মাঠে কোদাল পাড়িবার সময় Tail Coat পরিয়া কাজ করা অসুবিধাজনক, অতএব Tail Coat পরা রহিত করা হোক।

বস্তুতঃ পোষাকের উদ্দেশ্য মাত্র আমাদের শরীরকে শীতাতপ হ'তে রক্ষা করতেই সীমাবদ্ধ নয়, সভ্য সমাজে পোষাকের আরও একটা সার্থকতা আছে, সেটা হচ্ছে লোক চক্ষু থেকে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকে যতদূর সম্ভব গোপনে রাখা।

যাঁহারা সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ, তাঁদের কাছে flowing dress এর চিরকালই সম্মান আছে এবং থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সকল দেশেই Royal robes রাজপোষাক এখনও বেশ বাহুল্য সম্পন্ন। বিদ্বৎ-মণ্ডলীর বেশও সেই বাহুল্যময় wig and gown। রোমান টোগাও (Toga) বোধ হয় সেই জন্যই ব্যবহৃত হ'ত। আর এইখানেই চাদর এবং কোঁচার সার্থকতা।

কোঁচা এবং চাদর পরিত্যাগ করে আমাদের বেশের বাহুল্য থাকে না এবং কতক ব্যয় সংক্ষেপও হয় বটে, কিন্তু কতটা আব্রু রক্ষা হয় এবং ইজ্জৎ বজায় থাকে সেটা ভেবে দেখা উচিত। অবশ্য কোঁচা দুলিয়ে চাদর জড়িয়ে কাঠ কাটাও যায় না কিংবা টেলিগ্রাফের পোষ্টে চ'ড়ে তার মেরামত করাও যায় না।

এই জন্যই আমার মতে বাঙ্গালীর দুই রকম পোষাক হওয়া উচিত।

(১) উৎসবের বেশ—ধুতি (মালকোঁচা) পাঞ্জাবী এবং চাদর।

(২) পরিশ্রমসাধ্য কাজের উপযোগী বেশ—আট হাত ধুতি এবং নিমা।

এতে দু'রকম বেশের মধ্যেই সামঞ্জস্য থাকে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যও রক্ষা হয়। অবশ্য যাঁদের কায়িক পরিশ্রম কর্ত্তে হয় না, যথা—জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি intelligent class, তাঁদের পক্ষে প্রথমোক্ত পোষাকই যথেষ্ট।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, যে সমস্ত মুসলমান ভাই সাহেবগণ এই বিতর্কে যোগ দিয়েছেন তাঁদের আচকান পায়জামা, অপারক পক্ষে পায়জামার প্রচলন কর্ব্বার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত ফকির আহম্মদ সাহেব বলেছেন, "বাঙালী বলিতে কি এখনও মুষ্টিমেয় হিন্দুকেই বোঝেন?" না, তা বুঝি না; তবে এটাও ভুলতে পারি না যে বাঙালী জাতটা এদেশের মুসলমান আক্রমণের ও আগে থেকে বর্ত্তমান আছে; এবং সেই সুদূর অতীত কাল থেকে বাঙালীর বুদ্ধিমত্তা এবং সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত যে সংস্কৃতি সেইটিই বাঙালী জাতির বিশেষত্ব।

মুসলমান আক্রমণের সময় বহু বাঙালী ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন বলিয়া বস্তুতঃ তাঁরা ত' আর পারস্য আরব অথবা ইস্তাম্বুল থেকে এদেশে আসেন নাই।

যে মুষ্টিমেয় ক'জন মুসলমান বিদেশ থেকে এসেছিল, আহম্মদ সাহেবের লিখিত ঐ ৫৬·৪% এর ক'জন যে তাঁদের বংশধর তাও সকলেই জানেন। কোজেই তাঁদের আরবী অথবা পারস্ত দেশীয় আচ্‌কান এবং পায়জামার প্রতি এই অহেতুকী প্রীতি সুন্দরও নয়, স্বাভাবিকও নয়।

বাঙ্গালীর পক্ষে বিলাতী কোট পেণ্টালুন প'রে বুক ফুলিয়ে বেড়ান যেমন লজ্জাকর, আরবী এবং পারস্ত দেশীয় আচ্‌কান পায়জামা পরাও তথৈবচ। বাঙ্গালী আগে বাঙ্গালী, তারপর হিন্দু অথবা মুসলমান, কিংবা খ্রীষ্টান কি বৌদ্ধ। একটা জাতির (culture) সংস্কৃতিই সেই জাতি; সেইটা বজায় থাকলে তবে জাতি রইল। তা না হলে individual members দের কোনও সত্তাই নেই।

তুই, তুমি, আপনি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তুই, তুমি, আপনি নিয়ে বিচিত্রায় যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, এবং নানাদিক দিয়ে বিষয়টীকে ভাবাও হয়েছে। সম্বোধনের বাহুল্যের দিক দিয়ে আমি পাঠকদের আর একবার বিষয়টাকে ভাবতে অনুরোধ করি। সম্বোধনের বাহুল্য একটা লৌকিকতার সৃষ্টি করে, সেইজন্তেই এটা কমান খুবই দরকার। কারণ এই বাহুল্যজনিত লৌকিকতার জন্তে অনেক সময় আমাদের একটু বিব্রত হয়ে পড়্‌তে হয়। হয়ত কারুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হওয়ার পরই তাকে যে রকম ভাবে সম্বোধন করতে মন চায়, সম্বোধনের লৌকিকতার জন্তে সব সময় সেটা করা যায় না, ফলে আলাপটা প্রথম থেকেই একটু অস্বাভাবিক হয়ে যায়।

তুমি কথাটা খুব প্রশস্ত। সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে মানুষ যত কিছু ভাব প্রকাশ করতে চায়, তার সব কিছুই এর মধ্যে নিহিত আছে। যাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সাধারণ রকমের তাদের তুমি সম্বোধন করাটা আমরা শুধু যথার্থ নয় যথেষ্টও মনে করি; যেমন বাপ মা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদিকে। এঁদের তুমি সম্বোধন করে আমরা সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে যা কিছু প্রকাশ করতে চাই তার কিছুই অপূর্ণ থাকে না। তাছাড়া নিজের অসীম প্রেমাস্পদকেও লোকে তুমি বলে সম্বোধন করেই তৃপ্তি পায় সবচেয়ে বেশী, কারণ ভাবরাজ্যেও এর প্রভাব অপ্রতিহত।

এ তো গেল সাধারণ সম্বন্ধের কথা; কিন্তু যাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একটু অসাধারণ রকমের তাঁদেরও আমরা তুমি বলে সম্বোধন করতেই চাই বেশী। যেমন, নিজের গুরুকে যদিও সকলের সামনে আপনি বলে সম্বোধন করতে বাধ্য হই কিন্তু মনের নিভৃতে যখন তাঁকে ডাকি তখন আপনির কথা মনেও আসেনা, তখন ডাকি তুমি বলেই। আবার নিজের অতি বড় শত্রুকেও যখন মনে মনে তাড়না করি তখনও তুমিই বলি, যেমন—"দাঁড়াও এইবার তোমায় দেখছি।" কোন দেশকে বা জাতিকে তুমিই বলা হয়। এই থেকেই বোঝা যায় যে সব ক্ষেত্রেই আমাদের মন থেকে তুমি সম্বোধনটাই বেরিয়ে আস্‌তে চায়, সবক্ষেত্রেই মন আসলে চায় তুমি বল্‌তে, কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে সবক্ষেত্রে সেটা চলেনা, অনেক ক্ষেত্রে সম্বোধনের বাহুল্যজনিত লৌকিকতা বাধা দেয়; তাই লোকের আড়ালে যেখানে নিজের পূর্ণ স্বাধীনতা সেখানে একমাত্র স্বাভাবিক সম্বোধন তুমিই বেরিয়ে আসে। এটা Psychology-সম্মত কথা।

যদি বাংলা সাহিত্যে সম্বোধনের অনাবশ্যক বাহুল্য আপনি, তুই, এগুলো তুলে দিলে ভাষার দৈন্য আসবে বলে ভয় করা হয়, তবে সে ভয় হবে অমূলক। কারণ যেসব সাহিত্যে সম্বোধন আছে প্রধানতঃ একটি, যেমন ইংরেজি সাহিত্যে, সে সব সাহিত্যে আমরা সম্বোধনের অবাহুল্যের জন্তে কোনরকম অপূর্ণতা লক্ষ্য করি না। আর তাছাড়া ভাবের দিক দিয়ে ইংরেজি সাহিত্য যে খুবই পুষ্ট এ অস্বীকার করা যায় না।

এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গত আষাঢ় মাসে যখন শ্রদ্ধেয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ

দার্জ্জিলিংএ ছিলেন তখন আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। চিঠিতে প্রথমে সম্বোধন আপনি দিয়েই সুরু করেছিলাম, পরে দেখ্‌লাম যে আমার মনের যত সব ভাব শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়ে প্রকাশ কর্‌তে চাই তার বেশীর ভাগই অপ্রকাশিত রয়ে যায়। তিনি আমার পূজ্য, শ্রদ্ধেয় এবং ভালবাসার পাত্র; তাঁকে ওরকম অন্তরের ভাবশূন্য লৌকিকতা পূর্ণ চিঠি পাঠাতে আমার মন সরল না। তখন আমি তুমি সম্বোধন দিয়েই চিঠি লিখলাম। সে চিঠির উত্তরে তিনি বেশী কিছু লিখ্‌তে পারেন নি, কারণ তখন তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তা সত্ত্বেও যেটুকু লিখেছিলেন তাতে আমার প্রতি তাঁর তুমি লেখার জন্যে অসন্তুষ্টির ভাব কিছুই প্রকাশ পায়নি, এবং তিনি বোধ হয় আমার সম্বোধন গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এবিষয়ে তাঁর সঠিক মতামত আমি কিছুই জানিনা, এবং সে বিষয়ে কিছু বল্‌তেও সাহসী নই।

অবশেষে আমার মনে হয় যে তুমি সম্বোধনটা দূরকে নিকট করে; এই জন্যেই আজ যদি বাংলা ভাষা থেকে তুই, আপনি, তুলে দিয়ে শুধু তুমি রাখা যায় তবে বোধ হয় বাঙ্গালীজাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির ভাব অনেক বেড়ে যাবে; কারণ আমরা দেখি যে লৌকিকতার মূর্ত্তিমান আপনি সম্বোধনটি অনেক স্থলে একটা প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ হয়ে পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রাখে। এটা জাতীয় লাভ ক্ষতির দিক থেকে একটা বড় ছোট কথা নয়। এতে সুধীগণের দৃষ্টি ভিক্ষা করি।

স্বীকার করি যে এতদিনের সংস্কারের জন্যে প্রথমে তুমি বলাটা অনেক ক্ষেত্রে বাধ বাধ ঠেকবেই, কিন্তু যদি এই সামান্য বাধার জন্যে একটা এতবড় ব্যাপারে বিফল হয়ে বসে থাক্‌তে হয় তবে আমাদের গোঁড়ামির জন্যে লজ্জিত হওয়া উচিত।

কাঙাল

কুমারী অমিতা রায়

ভাষার কাঙাল, কেমন করে'
গাইব তব জয়?
আনন্দেতে চোখে শুধুই
অশ্রুধারা বয়!

অন্ধ আবেগ ভাবের রথে
বেড়ায় বিপুল খুসীর পথে!
গন্ধ ফেরে মুগ্ধ মনের
পুষ্পবনময়!

অঙ্গে তবু, হের প্রীতির
শিল্প চাতুরী,
মোহন তব জয়শ্রীময়
মৌন মাধুরী!

কণ্ঠ আমার নীরব করা!
হৃদয় কাণায় কাণায় ভরা!
ভাষার কূলে আনন্দ মোর
পাই না পরিচয়
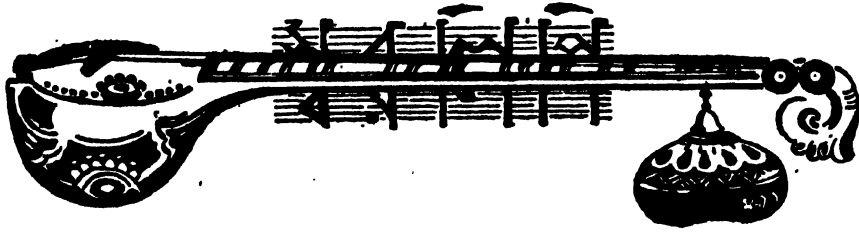
ঘুচাও ঘুচাও তব ঘন আবরণ,
করে নব মধুমাস ফুলসাজ বিতরণ,
মেল গো নয়ন!
শীত পরশনে কেন
হানিছ বেদনা হেন,
হের সচকিত কুসুমের লাজ শিহরণ।
মেল গো নয়ন!
মধুপ বিচরে তাই আজি
দ্বিধা ভরে,
ফুলের গোপন ব্যথা প্রাণে গুঞ্জরে!
ফুটেছিল যে মাধবী
মধু সুরভী গরবী
হের আনত নয়নে তার ধারা নিবারণ,
মেল গো নয়ন!

কথা ও সুর—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর　　　　স্বরলিপি—রবীন্দ্রমোহন বসু

II না র্সা -া । -র্সা -ণা । -ধা -পা I পা ধা -র্জ্ঞা । জ্ঞর্রা -া । র্সা -া I
ঘু চা ০ ০ ০ ০ ও ঘু চা ও ত ০ ব ০

I পা পা -ধা । না -া । না -া I র্সা -া -া । -া -া । মা মা I
ঘ ন ০ আ ০ ব ০ র ০ ০ ০ ণ্ ক রে

I মা পা পা । পা -া । পা -া I পা -ণা ণধা । পা -ধা । ধপা -া I
ন ব ম ধু ০ মা স্ ফু ০ ল সা ০ জ ০

I মা -গা পা । পমা -া । জ্ঞা -রা I সা রা -জ্ঞা । জ্ঞা -া । রা -সা I
বি • ত র • • ণ্‌ মে ন • / গো • • •

I সা রা -পা । পমা -া । জ্ঞা -রা I সা রা জ্ঞা । সরা -া । সা -া II
মে ন • গো • • • মে ন গো ন • র ন্‌

-া -া II { র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা । র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞা র্রা I র্জ্ঞা -া -র্রা । মর্জ্ঞা -া । -া -া I
শী ত প র • শ নে কে • • ন • • •

I র্রা র্মা র্জ্ঞা । র্রা র্রা । র্সা -না I র্সা -র্জ্ঞা -র্রা । র্সা -া । (-া -া) } I
হা নি ছ বে দ না • হে • • ম • • •

র্সা র্সা I না র্রা র্সা । র্সা -া । ণা ধা I র্সণা -া -ধা । পা -া । -া -া I
হে র স চ কি ত • কু সু মে • • র • • •

I পা -ধা পা । মা -পা । পণা -ধা I পা -া-ণা । ণা -ধা । ণা -া I
লা • • জ শি • হ • র • ণ হে • র •

I ধা র্সা ণা । ণা -া । ণা ধা I পা -ণা -ধা । পা -া । -া -া I
স চ কি ত • কু সু মে • • র • • •

I পা -ধা পা । মা -পা । পনা -ণধা I পা -া -া । -া -া । -া -া I
লা • জ শি • হ • র • • • • • ণ

I সা সা -রা । জ্ঞা -া । -রা -সা I সা রা -পা । পমা -া । জ্ঞা -রা I
মে ন • গো • • • মে ন • গো • • •

I সা রা জ্ঞা । সরা -া । সা -া I
মে ন গো ন • ন্‌ •

I { সা গা গা । গা গা । গা -া I গমা -া -া । মা -গা । পমা -া I
ম ধু প • বি চ রে • ভা • ই আঁ • খি •

I জ্ঞা -জ্ঞা -া । জ্ঞা -রা । জ্ঞা -া I জ্ঞা পা পা । মা -া । জ্ঞা রা I
বি থা • ভ • রে • হু লে র গো • প ন

I সা -জ্ঞা -জ্ঞরা । সা -া । রা -ন্‌া I ন্‌া সা -রা । সা -মা । মজ্ঞা -রা I
ঝ ॰ ॰ ঝ ॰ ॰ ॰ প্রা ণে ॰ গু ন্‌ জ ॰

I সা -া -া । -া -া । -া -া}
রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা -া । জ্ঞা র্রা I জ্ঞা -া -রা । জ্ঞা -া । -া -া I
ফু টে ছি ল ॰ যে মা ধ ॰ ॰ বী ॰ ॰ ॰

I রা মা জ্ঞা । জ্ঞা -া । র্রা র্সা I র্সর্রা -া -না । সা -া । র্সা র্সা I
ম ধু সু র ॰ ভি প র ॰ ॰ বী ॰ হে র

I না রা র্সা । ণা ধা । সনা -ধা I পা -ণা -ণধা । পা -া । -া -া
আ ন ত ন য় নে ॰ তা ॰ ॰ র ॰ ॰ ॰

I পা -ধা পা । মা -পা । পণা -ণধা I পা -া ণা । ণা -ধা । ণা -া I
ধা ॰ রা নি ॰ ঝ ॰ র ॰ ণ্‌ হে ॰ র ॰

I ধা র্সা ণা । ণা ধা । র্সণা ধা I পা -ণা -ণধা । পা -া । -া -া I
আ ন ত ন য় নে ॰ তা ॰ ॰ র ॰ ॰ ॰

I পা -ধা ধমা । মা -পা । পণা ণধা I পা -া -া । -া -া । -া -া I
ধা ॰ রা নি ॰ ঝ ॰ র ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ণ্‌

I সা সা -রা । জ্ঞা -া । -রা -সা I সা রা -পা । মজ্ঞা -া । -রা -সা I
যে ন ॰ গো ॰ ॰ ॰ যে ন ॰ গো ॰ ॰ ॰

I সা রা জ্ঞা । সরা -া । সা -া II II
যে ন গো ম ॰ র ম্‌

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বাঙ্গালী ছাত্রদের অযোগ্যতা

নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সমূহে বাঙ্গালী ছাত্রদের আপেক্ষিক অসাফল্য কিছুদিন হইতে জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এসম্পর্কে কাউন্সিলে প্রশ্নাদি উত্থাপিত হওয়ায়, এবং সংবাদ পত্রাদিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধারাবাহিক আলোচনা চলায়, সরকারেরও মনযোগ এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। গত শিক্ষা সম্মিলনেও এসম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। শিক্ষা সম্মিলনের অসমাপ্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য এবং তাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্য সরকারের শিক্ষাবিভাগ একটি শিক্ষা সমিতি গঠন করিতেছেন। এই সমিতিতে বাংলার উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যেরা থাকিবেন এবং ইঁহারা বাঙ্গালী ছাত্রদের অসাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করিবেন।

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালীরাই প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেই জন্যই বড় বড় চাকরিগুলি অনেকটা তাঁহাদের একচেটিয়া ছিল ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে প্রতিযোগিতার তীব্রতা অনেক কম ছিল। কিন্তু, বর্ত্তমানে সকল প্রদেশেই শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছে এবং নিখিল ভারতীয় ব্যাপার সমূহে সকল প্রদেশেই এখন তাঁহাদের নিজস্ব স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ হওয়ায় বাঙ্গালীদের পূর্ব্ব প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকা আর সম্ভব নহে। কোনও অন্যায় সুবিধা বা প্রাধান্য না থাকিবার জন্য কোন বাঙ্গালী অবশ্য দুঃখিত হইবেন না। কিন্তু, বাঙ্গালীরা তাঁহাদের সংখ্যা বা শিক্ষার অনুপাতে তাঁহাদের প্রাপ্য উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতে যদি ধারাবাহিকভাবে অক্ষম হইতে থাকেন, তবে, প্রত্যেক বাঙ্গালীর পক্ষেই তাহা বিশেষ ভাবিবার বিষয় হইয়া পড়ে।

সমগ্র ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার এক সপ্তমাংশ বাঙ্গালী; শুধু ব্রিটিশ ভারতের কথা ধরিলে প্রতি ১১ জন ভারতবাসীর মধ্যে ২ জন বাঙ্গালী। এই হিসাব অনুসারে নিখিল ভারতীয় ব্যাপার সমূহে এবং চাকুরি, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রভৃতিতেও বাঙ্গালীদের সংখ্যা এক পঞ্চমাংশের কম হওয়া উচিত নহে। কিন্তু, বাঙ্গালীদের প্রাপ্য আরও একটু বেশী হওয়া অন্যায় নহে। এখনও সকল প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার সমভাবে হয় নাই এবং নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় কোন কোন প্রদেশ এখনও পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এই সকল প্রদেশের যাহা পাওয়া উচিত, তাহার কিছু কিছু অন্য কোন কোন প্রদেশের লোকের ভাগে পড়িতেছে। সকল প্রদেশের লোকেই যাহাতে নিজেদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য পাইতে পারেন, প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তি তাহা চাহিবেন। কিন্তু, বাঙ্গালীরা কোন প্রদেশ অপেক্ষাই যদি পশ্চাদ্বর্ত্তী না হন, তাহা হইলে এই বাড়তি অংশেরও কিছু কিছু তাঁহাদের পাওয়া উচিত হইবে। বাঙ্গালীরা প্রকৃত পক্ষে পিছাইয়া পড়িতেছেন কিনা; তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, সমগ্র ভারতের শিক্ষিত লোকের মোট সংখ্যার মধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা কত, তাহা স্থির করা প্রয়োজন। কারণ নিখিল ভারতীয় ব্যাপার সমূহে যাঁহারা যোগদান করেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত। দেশের মোট শিক্ষিত লোকদের অনুপাতে ইঁহাদের স্থান যেখানে গিয়া দাঁড়ায়, শিক্ষিত বাঙ্গালীদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রভৃতিতে কৃতী বাঙ্গালীদের সংখ্যা যদি তদপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীরা যে নিশ্চিত পিছাইয়া পড়িতেছেন, তাহা বুঝিতে হইবে। তদ্ব্যতীত অন্য কোন কোন প্রদেশের শিক্ষিত লোকদের অনেকে ব্যবসা প্রভৃতি লাভজনক কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু, বাঙ্গালী শিক্ষিত

লোকদের মধ্যে সকলেই অন্ততঃ অধিকাংশই চাকরির উমেদার। চাকরি অথবা অন্য কোন জীবিকার অভাবে বাধ্য হইয়া যাঁহারা ছোটখাটো কোন ব্যবসা বা শ্রমশিল্পে নিযুক্ত হন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাও চাকরির উমেদার। এজন্যও চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে যোগ্য বাঙ্গালীর অনুপাতিক সংখ্যা বেশী হওয়া সঙ্গত। এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া একথা নিরাপদে বলা যায় যে, চাকরির প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ বাঙ্গালীদের সংখ্যা মোট সংখ্যার এক চতুর্থাংশ হইলে বাঙ্গালীরা হটিতেছেন না, একথা মনে করা যাইতে পারে।

কিন্তু, প্রকৃত অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। ১৯২৮-৩৩ পর্য্যন্ত ৬ বৎসরে সিভিলসার্ভিস এ ৮০ জন গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু, ৮৪ জন বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৩ জন চাকরি পাইয়াছেন। এঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে ১৯৩০ ও ৩১এ ২০ জন চাকরি পাইয়াছেন; ৫৩ জন বাঙ্গালী পরীক্ষার্থী মধ্যে মাত্র ১ জন গৃহীত হইয়াছেন। অন্যান্য সকল বিভাগেরই এই ইতিহাস। সহসা ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ছাত্রদের প্রতিভা বা বুদ্ধির হ্রাস ঘটিয়াছে তাহা মনে করা যাইতে পারে না। বাঙ্গালী ছাত্রদের এই আপেক্ষিক অযোগ্যতার জন্য, বাঙ্গালার শিক্ষাপদ্ধতি, আমাদের দারিদ্র্য, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি দায়ী হইতে পারে। বাংলার ক্রমবর্দ্ধিত রোগের প্রাদুর্ভাব বাঙ্গালীদের উদ্যম শ্রমের ক্ষমতা অনেক কমাইয়া ফেলিয়াছে। প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের পথে ইহাও যথেষ্ট বাধা উৎপাদন করিতেছে। প্রকৃত তথ্যে উপনীত হইতে হইলে, এবং প্রতিকারের সত্য ব্যবস্থা করিতে হইলে, উপরিউক্ত কারণ সমূহের মধ্যে, অথবা অন্য কোনও কারণ থাকিলে, তাহার মধ্যে আলোচ্য অবস্থার জন্য কোন্‌টি কতটুকু দায়ী তাহা নির্ণয়ের প্রয়োজন হইবে, এবং আমরা আশা করি শিক্ষাসমিতি সকল দোষ বেচারী স্কুলগুলির ঘাড়ে না চাপাইয়া প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে যত্নবান হইবেন।

বর্ত্তমান দুরবস্থায় পতিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সর্ব্বক্ষেত্রেই বাঙ্গালীদের অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল। এজন্য অন্যান্য প্রদেশবাসীদের মনে বাঙ্গালীদের পরে কিছু বিদ্বেষ এবং ঈর্ষার ভাব আসিয়াছে। রাষ্ট্রনীতিক নানাবিধ কারণে বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতি উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশেষ সন্তুষ্ট নহেন। একারণেও কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের কিছু ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নহে। এরূপ কারণে আপাত দৃষ্টিতে কোথায়ও বাঙ্গালীরা অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও এবং তাহাতে স্বার্থহানির কারণ থাকিলেও, প্রকৃত আশঙ্কার কারণ নাই।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে বিশেষ ধরণের জ্ঞান বা শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা লাভ করিবার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা যদি অন্য কোন কোন প্রদেশে থাকে, এবং সেজন্য সে সকল স্থানের ছাত্রেরা অধিকতর যোগ্যতা প্রদর্শনে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও প্রকৃত আশঙ্কার কারণ নাই। এই ক্রটির সংশোধন করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে।

এ সকল কারণ ব্যতীত যদি প্রতিভাবান্ বাঙ্গালী ছাত্রদের চাকরি অপেক্ষা অধিকতর বিদ্যালাভ বা অন্যান্য দিকে ঝোঁক বাড়িয়া থাকে তাহা হইলেও, এরূপ হইতে পারে।

বাঙ্গালী সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থা

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে, যাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষার সংস্কার ছিল, অবস্থাপন্ন এমন লোকেরাই মাত্র শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। শিক্ষার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম থাকায়, সাধারণতঃ প্রতিভাবান্ ছাত্রেরাই উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেন। স্কুল কলেজের সংখ্যা কম থাকায় সম্ভবতঃ সেগুলির অধ্যাপনার আদর্শ উৎকৃষ্টতর ছিল। মোট ছাত্র সংখ্যা কম থাকায়, বিশেষ প্রতিভাবান্ ছাত্রেরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিআকর্ষণে সক্ষম হইতেন, এবং তাহার ফলে মানসিক শক্তি অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁহাদের ঘটিত।

পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে শিক্ষা অনেক বিস্তার লাভ করিয়াছে। অনেক স্কুল কলেজ সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায়, তাহার অনেকগুলির অধ্যাপনার আদর্শ কিছু নামিয়া যাওয়া স্বাভাবিক; খারাপ এবং ভাল সকল শ্রেণীর ছাত্র স্কুল কলেজে ভিড় করায়, শুধু বাছাই করা ভাল ছেলেদের মধ্যে পূর্ব্বে শিক্ষালাভের এবং প্রতিযোগিতার যে সুযোগ ছিল, বর্ত্তমানে

তাহা হ্রাস পাইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালী ছাত্রদের আপেক্ষিক অপারদর্শিতার মূলে এই কারণ কতকটা থাকিতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক প্রদেশে এখনও বাংলার প্রথম আমলের অবস্থা রহিয়াছে।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম দিকে দেশে কোন প্রকার রাষ্ট্রনীতিক চাঞ্চল্য ছিল না। শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে ছাত্রেরা সকল শক্তি বিদ্যাচর্চ্চার দিকে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে দেশ নানাপ্রকার উত্তেজনা ও পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। ইহাতে ছাত্রদের অধ্যয়ন-নিষ্ঠা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইতে পারে। অন্যান্য প্রদেশেও অবশ্য রাজনীতিক চাঞ্চল্য আছে। কিন্তু, অন্যান্য সকল প্রদেশেই জন সাধারণের একাংশের সহিত ইহার যোগ আছে। বিশেষ ২।১টি স্থান ব্যতীত বাংলাদেশে এই আন্দোলন প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ভাবপ্রবণ বলিয়া বাংলার ছাত্রেরা এই সকল আন্দোলনের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হন। গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলার ছাত্রদের মধ্যে যে প্রকার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, অন্য কোথাও তদ্রূপ হয় নাই।

বাংলা ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশের যুবকদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ব্যাপ্তি লাভ করে নাই। যাঁহারা ইহার নিন্দনীয় এবং হানিকর প্রভাবের অধীন হইয়াছেন, তাঁহাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান লোক থাকা অসম্ভব নহে।

এই সম্পর্কে সন্দেহক্রমে ধৃত হইয়া বহু ছাত্র আটক আছেন। সাধারণতঃ সচ্চরিত্র, বলিষ্ঠ প্রকৃতির, ভালছেলেদের উপরই সন্দেহ পতিত হয়। এই প্রকারের বিঘ্ন না ঘটিলে উত্তর জীবনে, ইঁহাদের অনেকেই নিঃসন্দেহ সবিশেষ গৌরব এবং সাফল্যের অধিকারী হইতে পারিতেন। সন্ত্রাসবাদ এবং তাহার আনুসঙ্গিক দুর্গতি আমাদের জাতীয় জীবনে নিতান্ত দুর্দ্দৈবের মত উপস্থিত হইয়াছে এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকে বিশেষ বাধাগ্রস্ত করিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের জাতীয়জীবন এই সকল বিঘ্ন হইতে মুক্ত ছিল।

আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার মূলে আমাদের দারিদ্র্যের প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে যে আর্থিক সঙ্গতি ছিল, বর্ত্তমানে নানাকারণে তাহা নিতান্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল পরিবার হইতে বাঙ্গালী ছাত্রেরা সাধারণত আসিয়া থাকেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের অভাব এত তীব্র যে তাহা সাধারণের ধারণার অতীত। যে সকল ছাত্রের পিতামাতা বা অভিভাবকেরা এই প্রকার অভাব ভোগ করেন, সে সকল ছাত্রের মনের উপর একটা চাপ থাকে। তাঁহারা নিশ্চিন্তচিত্তে সকল শক্তি দিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে কখনই পারেন না। অনেক স্থলে বিশেষ যোগ্য ছাত্রেরা দারিদ্র্যের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন না বা তাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন না, এবং অপেক্ষাকৃত অযোগ্য অর্থশালী ছাত্রেরা এই সুযোগ গ্রহণ করেন। ইহাতে বাঙ্গালীদের যোগ্যতার ঠিক পরীক্ষা হয় না।

অধিকাংশ বাঙ্গালী ছাত্র, ইঁহাদের সংখ্যা অন্তত শতকরা ৯০ হইবে, উপযুক্ত পুস্তকাদির সংস্থান করিতে পারেন না। যাঁহারা পাঠ্য পুস্তকেরই সংস্থান করিতে পারেন না, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পুস্তক যে তাঁহারা কিনিতে পারিবেন, তাহা নিতান্তই দুরাশা মাত্র। কিন্তু, পূর্ব্বকালের বাঙ্গালী বিদ্যার্থীদের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের ছিল। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও ইঁহাদের অবস্থা এতটা শোচনীয় ছিল না।

ইংরাজী শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া যাঁহারা পূর্ব্ব শতাব্দীতে বাঙ্গালীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিলেন। হিন্দুরা প্রধানতঃ দেশের যে সকল অংশে বাস করেন, তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে ইঁহাদের উদ্যম ও শ্রমের সামর্থ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহাও আমাদের বর্ত্তমান অসাফল্যের আংশিক কারণ হইতে পারে।

চাকরি পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া অনেক ভাল ছেলে প্রথম হইতেই এই আশা ত্যাগ করিয়া অধিকতর বিদ্যালাভের জন্য অধ্যয়ন করেন, কেহ কেহ সাধারণ ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী হইবার চেষ্টা করেন এবং কেহ কেহ বা বিশেষ বিশেষ বিষয় অধ্যয়ন করিবার জন্য বিদেশগমন করেন।

কিন্তু, পূর্ব্বকালের বাঙ্গালী ছাত্রেরা বাংলা বা বাংলার বাহিরে চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতেন এবং সেই সকল চাকরির জন্য যে প্রকারের বিশেষ বিদ্যা বা শিক্ষার প্রয়োজন হইত, নিশ্চিন্ত মনে তাহা আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

এ সকল কারণ সত্ত্বেও বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তিত জীবনযাত্রার মধ্যে যাহাতে প্রতিযোগিতায় অন্যান্য প্রদেশবাসীদের দ্বারা আমরা পরাজিত না হই, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মুসলমান জগতে বাংলার স্থান

বাংলা কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যদিগের দ্বারা প্রদত্ত জলযোগ বৈঠকে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া মাননীয় আগাখাঁ, মুসলমান জগতে বাংলার অদ্বিতীয় স্থান সম্বন্ধে এবং বাংলাভাষার মধ্য দিয়া মুসলমান সংস্কৃতি ও ধর্ম্মপ্রচারের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী মুসলমান মাত্রেরই ভাবিয়া দেখিবার কথা।

মুসলমান জগৎ ও ভারতবর্ষে বাংলার অদ্বিতীয় স্থান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :

"শুধু ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের জন্য নয়, বাঙ্গালীদের বহুমুখী প্রতিভার জন্যই বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে বাংলা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইবে। অনুরূপ ভাবেই, সমগ্রজগতের মধ্যে বাংলা সর্ব্বপ্রধান মুস্‌লিম দেশ। বিশেষ বিবেচনা সহকারেই আমি জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মুস্‌লিম দেশ বলিয়াছি। পৃথিবীতে এমন অন্য কোন দেশ নাই, যেখানে পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় স্বল্পায়তন ভূখণ্ডের মধ্যে ঘন সন্নিবিষ্ট এত বৃহৎ মুস্‌লিম্ জনসংঘ দেখা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ পারস্য, আফগানীস্থান, আরব এবং মিশর অপেক্ষাও অধিকতর সত্যরূপে মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রয় স্থল"।

বাঙ্গালী মুসলমান, বিশেষ করিয়া প্রাচীন পন্থীদের অনেকের মনে নিজেদের মাতৃভূমি সম্বন্ধে গৌরববোধ নাই। ভারতের বহির্ভূত অন্যান্য দেশের এবং বঙ্গেতর ভারতীয় প্রদেশ সমূহের মুসলমানদিগের সহিত তাঁহাদের রক্ত এবং ভাষার সম্বন্ধ আছে, এই কথা অনেকেই গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, সমগ্র মুসলমান জগতে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের এবং তাঁহাদের ভাষা বলিয়া বাংলাভাষার বিশিষ্ট স্থান থাকা উচিত ছিল। পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে অধিক সংখ্যক মুসলমান বাস করেন এবং অন্য যে কোন ভাষা অপেক্ষা বাংলাভাষা অধিক সংখ্যক মুসলমান মাতৃভাষা স্বরূপে ব্যবহার করেন। সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে প্রতি ২০ জনে ৩জন মুসলমান বাঙ্গালী এবং সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রতি ৫ জনে ২ জন মুসলমান বাঙ্গালী। নিজেদের ভাষা এবং দেশ সম্বন্ধে গৌরববোধ আরও দৃঢ় ভাবে মুদ্রিত হইলে, সমগ্র মুসলিম জগতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইবে এবং তাঁহাদের আত্মোন্নতির পথও অধিকতর সুগম হইবে।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদিগের মনোভাব কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :

"আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে কোন দায়িত্বসম্পন্ন মুসলমানই অন্য কোন সম্প্রদায়কে কোন-ঠাসা করিয়া নিজেদের সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিতে চান না। আমরা অন্যান্য ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালীদিগের (তাঁহারা যে সম্প্রদায়েরই লোক হউন না কেন) বিশাল সভ্যতাকে সম্মান করি।"

বাংলাভাষা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,

"হে আমার বাংলার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ, একটি প্রশ্ন বিশেষ ভাবে আমার মনে উদয় হইয়াছে, এবং সমস্যাটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের জন্য আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। বাংলা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ভাষাগুলির অন্যতম; ইহাতে মানুষের উচ্চতম ও মহত্তম ভাব ও আকাঙ্ক্ষা সমূহের প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উপযুক্তইসলামীয় পুস্তকসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিবার সবিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। ....মুসলমান হিসাবে এই প্রদেশে আমাদের তিনটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংলাভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় আমাদের ধর্ম্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ।"

প্রাচীনপন্থী যে সকল বাঙ্গালী মুসলমান এখনও উর্দ্দুর স্বপ্নে বিভোর আছেন, মুসলমান ধর্ম্মজগতের একজন বিশিষ্ট নেতার এই উক্তিতে তাঁহাদের ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিলেই, তবে ইহা সার্থক হইবে।

ভারতীয় সেনাদলে বাঙ্গালী পল্টনের ব্যবস্থা

ভারতীয় সেনা বাহিনীর অংশস্বরূপে একটি স্থায়ী বাঙ্গালী পল্টন গঠনের জন্য ভারতসরকার ও ব্রিটিশ সরকারের নিকট অনুরোধজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব রায় বাহাদুর কেশব চন্দ্র ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইয়াছে। অনুরূপ একটি প্রস্তাব কাউন্সিল-অব-ষ্টেটের আগামী অধিবেশনে উত্থাপন করিবার জন্য মাননীয় জগদীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি নোটিস্ দিয়াছেন।

বাঙ্গালীদের সেনাদলে গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

ভারতবর্ষকে সামরিক ও অসামরিক বিভাগে খণ্ডিত করায়, আমাদের জাতীয় সংহতির পথে এক বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে এবং দেশের অভ্যন্তরে পরস্পর বিরোধী কৃত্রিম স্বার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল জাতিকে বর্ত্তমানে সমর বিভাগে গ্রহণ করা হয় না, অবিলম্বে তাহাদিগকে সেই অধিকার প্রদান করিলে, এবং যাহাতে এই সকল জাতির মধ্যে সামরিক শিক্ষাগ্রহণের ও সেনাদলে ভর্ত্তি হইবার আগ্রহ জন্মে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই অন্যায়ের প্রতিকার হইতে পারে।

নিজেদের দেশের সকল কাজ করিতে পারিবার নৈতিক অধিকার সকল জাতিরই আছে; বাঙ্গালীদেরও আছে।

আত্মরক্ষা বা জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার মত যোগ্যতা বাঙ্গালীদের নাই, একথা উপযুক্ত পরীক্ষা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী মানিয়া লইতে রাজী হইবেন না। একথা মনে রাখা দরকার যে সীমান্তের পাঠানেরা, গুর্খারা অথবা রাজপুত এবং শিখেরা যে অর্থে সামরিক জাতি, পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি সে অর্থে সামরিক নহে।

বাঙ্গালীদের চরিত্রে প্রকৃতপক্ষে যদি এমন কোন ত্রুটি থাকে, যাহার জন্য তাঁহারা উৎকৃষ্ট সৈনিক হইতে পারিতেছেন না, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত সুযোগ, শিক্ষা প্রভৃতি দিয়া যাহাতে তাঁহারা উপযুক্ত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে সরকারের কর্ত্তব্য। কারণ জাতীয় চরিত্রের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি এবং দুর্ব্বলতা দূর করা সকল রাজসরকারেরই প্রধান লক্ষ্য না হওয়া অন্যায়।

বাঙ্গালীদের শারীরিক দুর্ব্বলতাকে অনেকে একটা বাধা বলিয়া মনে করেন; কিন্তু, বর্ত্তমানের যুদ্ধবিগ্রহাদিতে শারীরিক বলের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তদ্ব্যতীত বাঙ্গালীদের শারীরিক দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা হয়ত প্রকৃত সত্য হইতে একটু অতিরঞ্জিত হইবে। ছাত্রমঙ্গল সমিতি বহুসংখ্যক ছাত্রের যে সকল মাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গালী ছাত্রদের গড় দৈহিক উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চির উপর দেখা গিয়াছে। ইংরেজ, জার্ম্মাণ প্রভৃতি কয়েকটি জাতি ব্যতীত ইউরোপের অধিকাংশ জাতির দৈহিক উচ্চতা এতদপেক্ষা অধিক নহে।

গুর্খা, চীনা, জাপানী প্রভৃতি মোঙ্গলীয় জাতির লোক-দিগের উচ্চতা ইহাপেক্ষা কম। এই সকল জাতির মধ্যে অনেক জাতির ভাল সৈনিক বলিয়া খ্যাতি আছে।

শক্তি ও কষ্ট সহিষ্ণুতার কথা ধরিলে, বাংলার পল্লীঅঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে যে কোনও শক্তিশালী ও কষ্টসহিষ্ণু জাতির সমকক্ষ লোক পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গালীদিগকে সেনাবিভাগে গ্রহণ করা হইলে এবং বাংলার সশস্ত্র ও নিরস্ত্র পুলিশবাহিনীর লোক বাংলা হইতে সংগৃহীত হইলে, বাংলার অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যের বেকার সমস্যা কতক পরিমাণে দূরীভূত হইত।

পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যের ছাত্র

বিখ্যাত লেখক, ভারত বন্ধু শ্রীযুক্ত জে-টি-সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রাচ্য দেশীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"প্রাচ্যদেশ, বিশেষ করিয়া চীন, জাপান এবং ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র বহু বর্ষ ধরিয়া আমাদের প্রতীচ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নের জন্য আসিতেছে। আমাদের ছাত্রদের তুলনায় তাহাদের মানসিক ক্ষমতা, মার্জ্জনা এবং নৈতিক চরিত্র কি প্রকারের? যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই

সকল প্রাচ্য দেশীয় ছাত্রেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় থাকিতেন বা থাকেন, সে সকল স্থানে বিশেষ কষ্ট করিয়া আমি বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি। যে সকল অধ্যাপকের সহিত এই সকল ছাত্রদের সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে এমন একজনও দেখি নাই যিনি খুব স্পষ্টরূপে বলেন নাই যে, সমগ্রভাবে বিচার করিলে, ইহারা বিন্দুমাত্র নিকৃষ্ট নহে; ইহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্টেরা ঠিক আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্টদের সমান; এবং তাহাদের সাধারণ লোকেরা আমাদের সাধারণ লোকের ন্যায়ই উৎকৃষ্ট; সাধারণতঃ তাহারা অধিক পরিশ্রম করে এবং যে সকল অলস প্রকৃতির ছাত্রেরা কর্ত্তব্যে অবহেলা করে, ইহাদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা কম; চরিত্রে, উৎকর্ষে, মার্জ্জনায় এবং নৈতিক গুণাবলীতে ইহারা সহজেই সাধারণ আমেরিকানের সমকক্ষ হইবে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে।"

[ভাষান্তরিত]

বাংলা মুদ্রণের অসুবিধা

বাংলা অক্ষরের সংখ্যাধিক্যের জন্য বাংলা মুদ্রণ প্রণালীকে সম্পূর্ণ আধুনিক পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। এই অক্ষরের সংখ্যাধিক্যের জন্য সহজে চালাইবার মত ভাল টাইপ-রাইটার হইতে পারে নাই এবং এই জন্যই লাইনোটাইপে বাংলা মুদ্রণের ব্যবস্থা এতদিন করা যায় নাই। লাইনোটাইপে বাংলা ছাপা গেলে, মুদ্রণকার্য্য অনেক দ্রুত এবং সহজ হইতে পারিত ও তাহার ফলে বাংলা দৈনিক পত্রিকাগুলির অনেক অসুবিধা দূর হইত।

আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত এস্, সি, মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বাংলা লাইনো টাইপ যন্ত্রের একটী পরিকল্পনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মজুমদারের ২০ বৎসরের পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার ফল এই পরিকল্পনাটি লণ্ডনের লাইনোটাইপ মেশিনারি লিমিটেড্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পিত যন্ত্রটির খুঁটিনাটিগুলি সম্পূর্ণ করিবার জন্য কলিকাতা লাইনোটাইপ কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এ,জে,মে এবং নিউইয়র্কের মার্জ্জেনথেলার লাইনোটাইপ কোম্পানির শ্রীযুক্ত এইচ, গোল্ডিন সহযোগিতা করিতেছেন। এই বৎসরের শেষের দিকে সম্পূর্ণ যন্ত্রটি প্রস্তুত হইবে এবং আশা করা যাইতেছে যে, ইহা বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা করিবে। কার্য্যের সুবিধার জন্য বাংলা অক্ষরের সংখ্যা কমাইয়া চিহ্নাদি সমেত ৬০০ শতের স্থানে মাত্র ১৭৪ টিতে পরিণত করা হইয়াছে।

এই যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তাদিগের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়া যদি যন্ত্রটী কার্য্যকরী হয়, তবে, বাঙ্গালী মাত্রেই চিরদিন তাঁহাদের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিবে।

এই প্রসঙ্গে গত সংখ্যা 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুধীর মিত্রের "বাংলা ভাষার বানান ও মুদ্রণ" শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বাংলাভাষার বানান সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রনিধান যোগ্য। আমাদের বর্ত্তমান বানান পদ্ধতি এত ত্রুটিযুক্ত যে, এমন লোক খুবই কম দেখা যাইবে যাঁহারা বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও অভিধানের সাহায্য ব্যতীত বানান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। যাহা আয়ত্ত করা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই দুঃসাধ্য পুঁথিপত্রে তাহার প্রচলন থাকিয়া লাভ কি? বরং বানান সরলীকৃত হইলে, বাংলা শিক্ষার্থীদের অনেক সুবিধা হইবে এবং মুদ্রণ সমস্যার অনেকটা সমাধান আপনা হইতেই হইয়া যাইবে।

পুরাতনের সহিত যোগ ছিন্ন না করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইলে, তাহা নিঃসন্দেহ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, সুবিধা ও সহজসাধ্যতার জন্য প্রয়োজন হইলে সম্পূর্ণ নূতন পথে যাত্রা করিবার দৃষ্টান্ত, কোন জাতির ইতিহাসেই বিরল নহে।

হিন্দু সমাজ ও অনুন্নত সম্প্রদায়

সমগ্র হিন্দু সমাজের সহিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুদের ভাগ্য যে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, সে কথা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। বর্ণ হিন্দুদের সহিত বিরুদ্ধতায় বা স্বার্থের সংঘাতে নহে, কিন্তু, তাঁহাদের সহিত মিলনে এবং স্বার্থের সামঞ্জস্যেই অনুন্নতদের এবং সমগ্র হিন্দু সমাজের কল্যাণ নিহিত। উন্নত এবং অনুন্নত সকল হিন্দুই বর্ত্তমান বৈষম্য-মূলক সমাজ ব্যবস্থার ইচ্ছাহীন যন্ত্রস্বরূপে কাজ করিতেছেন।

এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য হিন্দুদের মধ্যে যে আগ্রহ এবং ইচ্ছা জাগিয়াছে, পূর্ণভাবে কাজ করিবার জন্য তাহার যুক্তিসঙ্গত সময়ের প্রয়োজন হইবে। এই বৈষম্যের ভিত্তি আংশিকভাবে অর্থনৈতিক হওয়ায়, সময় হয়ত আরও বেশী লাগিবে। ইহার জন্য একদিকে যেমন সংস্কারেচ্ছু বর্ণ হিন্দুদিগকে আপাত বিফলতায় নিরাশ না হইয়া অধিকতর তৎপরতা ও উৎসাহের সহিত তাঁহাদের আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তে ও প্রতিবিধানে যত্নবান হইতে হইবে, অন্যদিকে অনুন্নত হিন্দুদিগকে বর্ণ হিন্দুদের কর্ত্তব্য সাধনে সহায়তা করিতে হইবে এবং ধৈর্য্যের সহিত মৈত্রীর ভাব লইয়া সুদিনের অপেক্ষা করিতে হইবে।

আসামের অনুন্নত সম্প্রদায়-সম্মিলনের উদ্বোধন কালে, আসামের গভর্ণর মাননীয় মাইকেল কীন্ এই সম্মিলনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

"......কিন্তু, আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে রোম নগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। এখনও দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হইবে।.........আপনাদিগকে অংশত আপনাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং অংশত সেই সকল সংখ্যাতীত বর্ণহিন্দুর উপর নির্ভর করিতে হইবে, যাঁহারা আপনাদের দাবীকে সমর্থন করেন। বর্ণহিন্দুদের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের ফলে, হিন্দুসমাজের মধ্যেই এই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তন আমাদের চোখের সম্মুখেই ঘটিতেছে, কাজেই, বর্ণ হিন্দুদের সহিত বাদ বিসম্বাদে রত হওয়া কখনই আপনাদের নীতি হওয়া উচিত নহে। আপনাদের বন্ধুদের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে এবং আপনাদের আদর্শকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে তাহা আক্রমণমূলক না হইয়া অথবা অন্যায় জেদের রূপ না নিয়া, বন্ধুত্ব এবং সদ্ভাবের মধ্য দিয়া প্রকৃত হিন্দুভাবের সহিত খাপ খাইতে পারে এবং আপনাদের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। হিন্দু সমাজের মধ্যেই আপনাদের প্রকৃত স্থান এবং আপনাদের মনে রাখিতে হইবে যে যুদ্ধ জয়ের পরও এই অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।"

[ভাবান্তরিত]

দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

ইণ্টার মিডিয়েড পর্য্যন্ত ইতিহাস, ন্যায়, অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃত, প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনার জন্য হিন্দি ব্যবহারের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সাহস, সুবিবেচনা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই সকল বিষয় কলেজে পড়াইবার মত পাঠ্যপুস্তক হিন্দীভাষায় না থাকায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রণয়নের জন্য একটি বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছেন। এই বোর্ডের কার্য্যের সুবিধার জন্য শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিরলা পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। অনেকগুলি পুস্তক ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরীক্ষা সফল হইলে, অন্যান্য বিষয় সমূহও হিন্দীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

প্রগতিমূলক কার্য্যে এবং চিন্তায় বাংলা একদিন সমগ্র ভারতের আদর্শস্থানীয় ছিল। বর্ত্তমানে, বাংলার সে গৌরব অবশ্য আর নাই। তাহা হইলেও, কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন বাংলা না হওয়ায়, বাঙ্গালীদের বিশেষ দায়িত্ব নাই। বাঙ্গালীদের একটি প্রতিপত্তিশালী দল, বাংলা প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধতা বরাবর করিয়া আসিলেও, বাংলার অনেক মনীষি এবং শিক্ষাভিজ্ঞ ব্যক্তি অনেক দিন পূর্ব্বেই ইহার উপযোগিতার কথা বুঝিয়াছিলেন। স্যাড্‌লার কমিশনের নিকট যাঁহারা সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি প্রবল দল, শিক্ষার বাহন স্বরূপে বাংলা প্রবর্ত্তনের পক্ষে অনেক যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছিলেন। উক্ত কমিশনও তাঁহাদের মন্তব্যে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত প্রধানতঃ বাংলা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছেন।

ইহার পর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে এবং এই চেষ্টা শিক্ষা সম্পর্কিত, চিন্তাশীল সকল বাঙ্গালীর সমর্থন লাভ করিয়াছে। নিখিল বঙ্গীয় এবং অন্যান্য শিক্ষক সম্মিলন এ বিষয়ে একাধিকবার তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বাংলাকেই প্রধানতঃ শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সরকারের অনুমোদনের জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিয়া আছেন। সরকারের মতের উপর

নির্ভর করিতে না হইলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেন। অবশ্য শুধুমাত্র প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বাংলা প্রবর্ত্তিত হইলে যে আমাদের প্রয়োজন মিটিতে পারিত, তাহা নহে। তবুও, ইহাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটির আরম্ভ হইতে পারিত এবং তাহার ফলে, ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত হইতে পারিত।

এই প্রসঙ্গে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নামোল্লেখ না করিলে অন্যায় করা হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ই শিক্ষার সর্ব্ব বিভাগে উর্দ্দুর মধ্যবর্ত্তিতায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং আমাদের দেশীয় ভাষাগুলিরও যে শিক্ষাদান কার্য্যে উপযুক্ততা আছে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উপাধি বিতরণী সভায় বক্তৃতাকালে নবাব মাধি ইয়ার জাং বাহাদুর বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ব্যবস্থায় আমাদের নিজেদের ভাষার জন্য নিকৃষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং তাহার জন্যই আমাদের চিন্তায় ও কার্য্যে মৌলিকতার অভাব লক্ষিত হইত। আমাদের ভাষা যে কতকটা নিকৃষ্ট ধরণের, ইহার যে জ্ঞানের বাহন বা ভাণ্ডার হইবার উপযুক্ততা নাই, এই মনোভাবই আমাদের সর্ব্বপ্রকার মৌলিক চিন্তা ও কার্য্যের পক্ষে অন্তরায় হইয়াছে। আমাদের ভাষার নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে যে মিথ্যা ধারণা সমগ্র শতাব্দীকাল ধরিয়া বিনা প্রতিবাদে চলিয়া গিয়াছে, তাহা এখন ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং বিরুদ্ধবাদীরা ও নৈরাশ্যবাদীরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, অতি সহজে হিন্দুস্থানী আধুনিক প্রয়োজনের অনুরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সংক্ষেপতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিফলতা সম্বন্ধে সকল ভবিষ্যদ্বাণী শীঘ্রই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মাত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই শিক্ষাদানের যোগ্যতা আছে তাহা নহে; ইহার শিক্ষামান যে অন্যান্য সমশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম নহে, তাহা প্রদর্শন করিয়া ইহা কতিপয় ভারতীয় এবং ব্রিটীশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

উর্দ্দু এবং হিন্দীর পক্ষে যাহা সম্ভব হইতেছে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী বাংলার পক্ষে তাহা না হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

হিন্দীপুস্তক প্রণয়নের জন্য শ্রীযুক্ত বিরলার ৫০ হাজার টাকা দান, তাঁহার মাতৃভাষাপ্রীতি ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচায়ক। হিন্দীভাষা প্রচারের ও তাহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য হিন্দীভাষীদের উদ্যম ও বদান্যতা নূতন নহে। তাহা হইলেও শ্রীযুক্ত বিরলার দান হিন্দীভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীদের দানের পরিমাণ কম নহে; কিন্তু বাংলায় পুস্তকাদি অনুবাদ বা প্রণয়নের জন্য কেহ কোন মোটা টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে, মাতৃভাষার উন্নতির জন্য টাকা দিতে পারেন, এমন লোক বাঙ্গালীদের মধ্যেও হয়ত পাওয়া যাইবে।

অন্যান্য প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার

শুধু বাংলা নহে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্ত্রীশিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে এবং তাহার ফলে নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তনও অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৩ সালের মহিলা গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা ১৯৩২ সালের দ্বিগুণ হইয়াছে। শিক্ষার অন্যান্য নানা বিভাগেও কৃতী ছাত্রীদের সংখ্যা এইরূপ বাড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু, আসামের ডিরেক্টর-অব্-পাবলিক্-ইন্‌সট্রাক্‌সন্ মিঃ ডি-ই-রবার্টস্, ১৯৩২-৩৩ এর বার্ষিক রিপোর্টে এই প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে কৌতূহলোদ্দীপক।

সমগ্র প্রদেশেই স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। রক্ষণশীলতা, প্রাচীন প্রথা এবং কুসংস্কার ক্রমবর্দ্ধমান দ্রুত গতিতে সর্ব্বত্রই পরাজিত হইতেছে। প্রগতির পথে একমাত্র বিঘ্ন অর্থের অভাব। প্রদেশের সকল অংশেই বালক এবং বালিকাদের উভয় প্রকার স্কুলেই বালিকারা ভিড় করিতেছে।

দশ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে আমি দুঃসাহসে ভর করিয়া

কটন কলেজে সর্ব্ব প্রথম একটি ছাত্রীকে ভর্ত্তি করি। জন সাধারণের মধ্য হইতে গোঁড়ার দল ইহার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি করেন; শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, স্ত্রীলোকদের নিকট বক্তৃতা দেওয়া তাঁহাদের একেবারে অসম্ভব না হইলেও, ইহাতে তাঁহারা বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িবেন। শেষ পর্য্যন্ত ছাত্রীটিকে বৃত্তি দিয়া কলিকাতার একটি কলেজে স্থানান্তরিত করিতে হয়।

আর গত বৎসর এই কটন কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবে ছাত্রীদেরও অংশ ছিল। মুরারি চাঁদ কলেজেও সামাজিক সম্মিলন প্রভৃতিতে ছাত্রীরা যোগ দিয়া থাকেন। পরিবর্ত্তন কতটা হইয়াছে, ইহাদ্বারা তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। বালিকা বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং সমগ্র প্রদেশেই ছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। শুধু প্রাথমিক বিভাগ ব্যতীত অন্য সকল বিভাগেই এই বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে (১ম ও ২য় শ্রেণী), এই বৃদ্ধির অনুপাত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ভর্ত্তির সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, সহশিক্ষা ক্রমেই জনপ্রিয় হইতেছে। ডাঃ গুপ্তের অনুমান অনুসারে, সুরমা উপত্যকায় প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয়গুলিতে (বালকদের) ছাত্রীদের ভর্ত্তির সংখ্যা ঐ শ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয়গুলির ভর্ত্তির সংখ্যার তিনগুণ।

বিভিন্ন প্রদেশের জন্য পৃথক পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়

কোন জাতির মানসিক যোগ্যতা, মনোবৃত্তি, চরিত্র, নৈপুণ্য, উদ্যম কর্ম্মশক্তি, এক কথায় তাহার সংস্কৃতি এবং সমগ্র ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তাহার শিক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষণীয় বিষয় এবং জাতীয় সাহিত্যের উপর? মূলতঃ অর্থনীতির উপর সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও, জাতির অর্থনীতি এবং তাহার আর্থিক সঙ্গতি ও পরোক্ষভাবে শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। এইজন্য প্রত্যেক জাতিরই শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন; এই শিক্ষা-দ্বারা যাহাতে জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইতে পারে, জাতির বিশিষ্ট মানসিক গুণগুলি উপযুক্ত সুযোগ পাইতে পারে, জাতিগত চারিত্রিক ত্রুটিসমূহ সংশোধিত হইতে পারে, স্থানীয় বিশেষ অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখিয়া, শিক্ষার পদ্ধতি বিষয় এবং সময় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষানীতির পরিচালন, জাতীয় উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কৃষ্টিগত, অবস্থাগত, প্রকৃতি ও চরিত্র গত এবং সর্ব্বোপরি স্বার্থগত মিল থাকিলেও বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাষা এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থার অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। মানুষের উপর ভাষার প্রভাব অসামান্য। মানুষের প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসে, জাতির ভাষান্তর গ্রহণের দৃষ্টান্ত থাকিলেও, কোন ক্ষেত্রেই তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটে নাই। কোন জাতিকে উন্নত, শিক্ষিত ও যোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে, তাহার মাতৃভাষার সাহায্যেই মাত্র তাহা সম্ভব হইতে পারে। এইজন্য সংখ্যাবহুল প্রত্যেক ভাষাভাষীর জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় থাকা উচিত। এই জন্য ন্যূনপক্ষে একথা বলা যাইতে পারে যে, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের জন্যই পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৃথক শিক্ষানীতির ব্যবস্থা অন্য কোনও প্রকার পৃথক ব্যবস্থা অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে। প্রত্যেক প্রদেশের কথা এই জন্য বলিলাম যে, ভাষানুযায়ী প্রদেশ বিভাগের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই এবং এই নীতির অনুসরণ করিতে সরকারও প্রতিশ্রুত, যদিও অনেক ক্ষেত্রে এই নীতির প্রবর্ত্তন করা হয় নাই বা করা সম্ভব হয় নাই। যে সকল প্রদেশে একাধিক ভাষার প্রচলন আছে, সেখানে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়েরও আবশ্যকতা থাকিতে পারে। ১৯২৭ সালে নিযুক্ত বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার সমিতি উক্ত প্রদেশের সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক এই চারিটি অংশে ভাষা ও কৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত চারিটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। বাংলার সীমান্ত সন্নিহিত বাংলাভাষী যে সকল অঞ্চলকে বিহার উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সে সকল অঞ্চলের অধিবাসীদিগের এবং বিহার উড়িষ্যায় স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন এমন বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর ভাষা,

শিক্ষা ও কৃষ্টিকে রক্ষা এবং পুষ্ট করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায়, ইঁহাদের পক্ষে জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল দিকে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের অসুবিধা হইতেছে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে, নানা শ্রেণীর লোক এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, ইহা সম্ভব হইতে পারে।

বিভিন্ন আদর্শকে রূপ দিবার জন্য, এবং বিশেষ কোন বিদ্যা বা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার জন্যও বিশেষ বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইতে পারে। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিগড় মুস্‌লিম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রকার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত; বাঙলার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলেও অনুরূপ প্রেরণা রহিয়াছে।

এই প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা যথেষ্ট থাকিলেও, প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের এবং জাতির উন্নতির পক্ষে তাহা অপরিহার্য্যও বটে। ইহা না হইলে ভাষানুযায়ী প্রদেশ বিভাগের সুফল এবং সুবিধা সমূহ বহুল পরিমানে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

ভাষা এবং সংস্কৃতির দিক দিয়া উড়িষ্যা ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট অংশ। এই জন্যই ইহাকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করিবার প্রস্তাব ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই জনমতের সমর্থন পাইয়াছে এবং শেষপর্য্যন্ত সরকারও এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, নবগঠিত উড়িষ্যা প্রদেশ স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় পাইবেন না। স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উড়িষ্যার প্রবল জনমত উড়িষ্যা-এড্‌মিনেস্‌ট্রেসন কমিটিও লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু, তাঁহাদের মতে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সামর্থ্য না হওয়া পর্য্যন্ত উড়িষ্যা সতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় পাইতে পারিবেন না।

কিন্তু, শ্রীযুক্ত বি-এন্-দাশ মনে করেন, বার্ষিক মাত্র ১৭ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি পরীক্ষা গ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। অবশ্য উচ্চতম জ্ঞানলাভের কেন্দ্রস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু, বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষা এবং শিক্ষানিয়ন্ত্রণ এই উভয় ব্যাপারেই অন্য প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। কিন্তু, উচ্চতম শিক্ষা অপেক্ষা মধ্য এবং উচ্চশিক্ষাই জাতির জীবনকে অধিকতর প্রভাবিত করে। কাজেই, প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ইহার নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃত্ব থাকিলে, অনেকাংশেই নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফল পাওয়া যাইবে। স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের অর্থই বর্দ্ধিত ব্যয়ভার। যে সকল কারণে এই বর্দ্ধিত ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ বাঞ্ছনীয় এবং যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে—স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তাকে তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলা অন্যায় নহে।

আসামেও স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু দিন হইতে আন্দোলন চলিতেছে। আসামেও মোট অধিবাসীর অর্দ্ধেক বাঙ্গালী বলিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা তাঁহাদের প্রয়োজন অনেকটা মিটিতেছিল। কিন্তু, তাহা হইলেও, আসামের ৪০ লক্ষ অধিবাসীর ভাষা বাংলা নহে। ভাষার ও জাতীর দিক দিয়া ইঁহারাও আবার অনেকগুলি দলে বিভক্ত। ইঁহাদের শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দান করিতে হইলে, যে সতর্কদৃষ্টি ও যে সকল বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বহুবিভাগযুক্ত অতিবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উপর তাহার জন্য নির্ভর করা যায় না।

মহারাষ্ট্রীয়েরাও তাঁহাদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় চাহিতেছেন। ভারতের অতীত ইতিহাসে তাঁহাদের বিশিষ্ট স্থান আছে। আধুনিক ভারতে জাতীয় জীবনগঠনেও তাঁহাদের দান সামান্য নহে। তাঁহারা একটা বলিষ্ঠ ভাষা, সমৃদ্ধ সাহিত্য, বিশিষ্ট সংস্কৃতির অধিকারী। এসকলের প্রতি সুবিচার করিতে হইলে, স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে।

ভারতের প্রধান ভাষাভাষী জাতিগুলির জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রত্যেক সতন্ত্র ভাষাভাষী জাতীর জন্য পৃথক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, প্রচুর অর্থের আবশ্যক হইবে। আমাদের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের ব্যয়ের বরাদ্দে শিক্ষার আনুপাতিক গুরুত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় অবশ্য এই প্রশ্ন এত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

সুশীলকুমার বসু

ভূমিকম্পে উত্তর বিহার

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত

[বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত উত্তর বিহারে এ্যাসিস্‌টেণ্ট্‌ কমিশনার অফ্‌ ইন্‌কাম্‌ ট্যাক্‌স্‌ পদে নিযুক্ত আছেন, সুতরাং তাঁকে একাধিক জেলায় টুর করে বেড়াতে হয়। এজন্য উত্তর বিহারে গত ভূমিকম্পে যে প্রলয়-কাণ্ড ঘটেছিল তা স্বচক্ষে দেখ্‌বার এবং সে বিষয়ে ছবি নেবার তিনি বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সুলিখিত প্রবন্ধটীর বিবরণ পাঠ করে এবং ছবিগুলি দেখে উক্ত ভূমিকম্পের ধ্বংস-লীলার কতকটা অনুমান করা সম্ভবপর হবে। বিঃ সঃ]

বিগত ১৫ই জানুয়ারী ১লা মাঘ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐদিনে যে ভীষণ ভূমিকম্প ভারতবর্ষকে বিশেষ নেপাল ও বিহার প্রদেশকে আলোড়িত করিয়া দিল তাহা পৃথিবীতে একটি বৃহত্তম ভূকম্প। সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে জগতের ইতিহাসে ইহার সমতুল্য কম্পনের উদাহরণ অতি বিরল। এই প্রলয় ব্যাপার যে ভৌগলিক পরিধিতে সংঘটিত হয় তাহা অতি সুবিস্তৃত এবং একটি কম্পনে এমন বিশাল ধ্বংসলীলা ভারতের ইতিহাসে অন্য কোন ভূমিকম্পে সম্পন্ন হয় নাই। এই প্রকম্পে অকস্মাৎ শত শত গৃহ ধূলিসাৎ হইয়াছে, অসংখ্য লোকের ধনসম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে, কত সহস্র লোকের অতি ভীষণ ও বীভৎস মৃত্যু হইয়াছে, বহু যোজনব্যাপী চাষের ভূমি ভূনিঃসৃত জল ও বালুরাশিতে অনুর্ব্বর ও বিনষ্ট হইয়াছে, ভূপৃষ্ঠের সমতার পরিবর্ত্তন হইয়া বহু সহস্র কূপ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশুষ্ক ও বালুপূর্ণ হইয়াছে, বহু সেতু রাজপথ ও রেলপথ বিনষ্ট হইয়াছে। এই সুবিশাল ধ্বংস-কাহিনীর বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, স্বচক্ষে না দেখিলে যথাযথ ধারণা করা যায় না।

রায় বাহাদুর কৃষ্ণদেও নারায়ণ মাহ্‌তা মহাশয়ের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ

আমার সরকারী কর্ম্মকেন্দ্র মজঃফরপুর এবং কর্ম্মোপলক্ষ্যে আমাকে উত্তর বিহার পরিভ্রমণ করিতে হয়। আজ মজঃফরপুর সহরের ধ্বংসস্তূপে পরিবেষ্টিত হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতেছি। চারিদিকে ভূমিসাৎ গৃহের ইট

কাঠ লোহার জঞ্জাল ও চূর্ণবিচূর্ণ গৃহ সামগ্রীর মধ্যে গৃহহারা শোকার্ত্ত ত্রস্ত নিঃসম্বল হতবুদ্ধি নরনারী দিন যাপন করিতেছে এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য প্রতিদিন দেখিতেছি। এই নগরবাসীদের আমিও অন্যতম। আমার দ্বিতল বাসাবাটী ভূমিসাৎ হইয়াছে, তবে বিধাতার অনিরূপেয় বিধানে প্রাণপ্রিয় পরিজনবর্গকে ফিরিয়া পাইয়াছি, তাই মনে কোনো খেদ নাই। যখন দেখি চারিদিকে পথপ্রবাসী নিরাশ্রয় মৃত্যু শোককাতর আহত নিঃস্ব নরনারীদের দুঃখযন্ত্রণার দৃশ্য তখন "ভগবানের দয়াতে আমরা বাঁচিয়াছি" এই কথা বলিবার ইচ্ছা হয় না। এই ভূকম্পে আজ যাঁহারা দুঃস্থ শোকার্ত্ত বিশেষভাবে তাহারাই দুঃখভোগের যোগ্য আর অপরেরা বিধাতার করুণায় অনাহত ও জীবিত রহিল একথা বলিবার ভরসা ও অধিকার নাই।

ভূমিকম্পে জমির ফাটল—মজঃফরপুর সহর
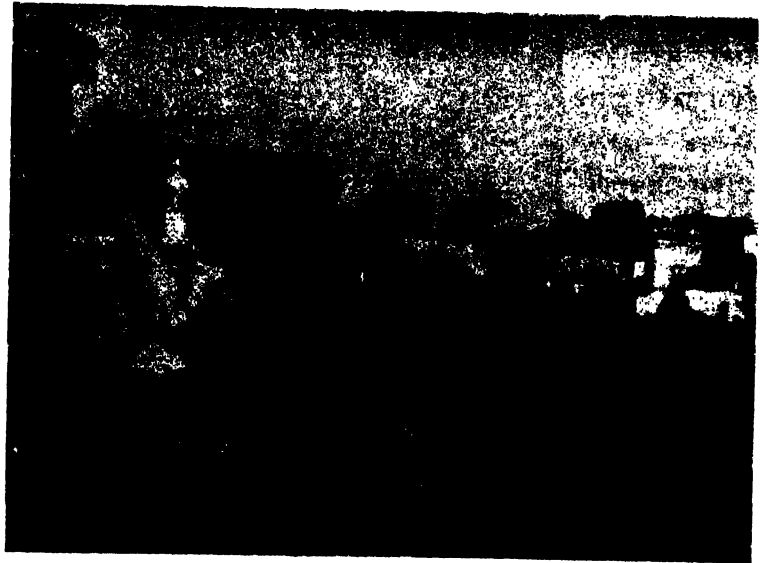
স্থূলদৃষ্টিতে এই মৃত্যু ও ক্ষতি আমাদের কাছে অতি ভীষণ ও শোকাবহ বোধ হইতেছে। কিন্তু ভক্ত বিশ্বাসী বলেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তার কোনো মঙ্গলময় বিধান এই দুর্ঘটনার অন্তরালে নিহিত আছে যাহা আমাদের অজ্ঞেয়, কারণ কোনো মানবজীবনই তাঁহার রোষ ও অবজ্ঞায় পরিসমাপ্তি লাভ করে না। এই ভূকম্পে জগদীশ্বরের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের মহিমা জলন্ত সাক্ষ্যরূপে মানবের নিকট প্রকটিত হইল। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন ইহা প্রকৃতির খেয়াল নহে, প্রাকৃতিক নিয়মে এই ভূমিকম্পের উদ্ভব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কম্পনপীড়িত দুঃস্থ মানব শান্তি পায় কোথায়? প্রকৃতির এই লীলাবৈচিত্র্যের অন্তরালে এই আকস্মিক পটপরিবর্ত্তনের পশ্চাতে যে শিবশঙ্করের ডমরু বাজিল, আমরা তাঁহার চরণে প্রণত হইব, তিনি আমাদের বিপদভয়ার্ণবের কর্ণধার হউন।

মজঃফরপুরের ধ্বংসের দৃশ্য—জুমা মসজিদের ভগ্নাবশেষ ও বাবু রামবাহাদের বাড়ী। ছাদের উপর আসবাব পত্র বিক্ষিপ্ত

এই নৈসর্গিক ঘটনার দ্বারা কেন বহুলোকের মৃত্যু ও ক্ষতি সংঘটিত হইল, তাহার মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। তাই রুদ্র দেবতাকে প্রণাম জানাইয়া এই দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে হইবে।

রথচক্রে ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্ব্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্দ্রে কি ঘোষিলে, বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম
জয় তব জয়।
(রবীন্দ্রনাথ) *

মর্ত্ত্যবাসী মানব কত ক্ষুদ্র অসহায় তাহা উপলব্ধি করিবার আজ অবকাশ হইল। তিন মিনিটের প্রচণ্ড আন্দোলনে তাহার সকল কীর্ত্তিকলাপ ঐশ্বর্য্যসম্ভার ধূলিসাৎ হইল, সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইল। অকস্মাৎ লোকালয় হাহাকার আর্ত্তনাদে অনিশ্চিত ত্রাসে পূর্ণ হইল। রুদ্রের রথচক্রের বিকম্পনে ধনী নির্ধন ত্রাসবিজড়িত চিত্তে নীলাকাশের চন্দ্রাতপের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল।

* "বর্ষশেষ—১৩০৫"

আমি ১লা মাঘ ভূমিকম্পের দিন সপরিবারে দ্বারভাঙ্গায় ছিলাম। সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই

ভূমিকম্পে জমির ফাটল—ইহা গণ্ডকের তীরবর্ত্তী সিকন্দরপুরের মাঠের দৃশ্য—মজঃফরপুর সহর

মজঃফরপুরে একটি ভাঙা বাড়ী—অধিকাংশ দ্বিতল বাড়ীরই এই দুর্দ্দশা, ফাটলগুলি দ্রষ্টব্য, এই ফাটল সব বাড়ীকে বাসের অযোগ্য করিয়াছে

সার্কিট-বাংলায় অবস্থান করিতেছিলাম, পরিবার ছিল মজঃফরপুর। কিন্তু সকলকে বাঁচিতে হইবে, করুণাময় ঈশ্বরের এই ইচ্ছা ছিল তাই ঘটনার দুই দিন পূর্ব্বে হঠাৎ অপরাহ্নে মোটর যোগে মজঃফরপুর ফিরি এবং পরদিন সকালে সপরিবারে দ্বারভাঙ্গায় যাই। মজঃফরপুরে আমাদের দ্বিতল গৃহের নীচের তলায় আমার অফিস এবং উপরে বাসস্থান ছিল। ভূমিকম্পে এই গৃহ ধূলিসাৎ হইয়াছে, সেখানে থাকিলে কাহাকেও বাঁচিতে হইত না একথা নিঃসন্দেহ। বিধাতার অদৃশ্য বিধানে এই অদ্ভুত ঘটনাসংযোগ হইল, তাঁহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম জানাই। তিনি যে নরনারীকে এই প্রলয়লীলার

মধ্যে বাঁচিবার সুযোগ দিলেন তাহাদের প্রাণের নবজাগরণ হোক্।

পুরাণী বাজারের ধ্বংসলীলার একটি ভয়াবহ দৃশ্য—রিলিফ্ কর্ম্মীগণ মৃতদেহ বাহির করিতেছেন।

বেলা ২-১৬ মিনিটের সময়ে যখন ভূমিকম্প হয় তখন আমি লাহেরিয়া কাছারীতে একটি আপীল শুনিতেছিলাম। পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ জয়সওয়াল তর্ক করিতেছিলেন। হঠাৎ উপরের ছাদে ভীষণ কড়কড় শব্দ হইল, পায়ের নীচের মেঝে কাঁপিতে লাগিল, কিছু একটা ব্যাপার ঘটিতেছে বুঝিয়া আমরা বাহিরে ছুটিলাম। বাহিরে আসিয়া বুঝিলাম ভূমিকম্প হইতেছে। সে সময়ে প্রচণ্ড নির্ঘোষে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। অমনি পায়ের নীচের পৃথিবী বিরাট্‌ভাবে দোলায়মান হইল, এতজোর কম্পন সুরু হইল যে দাঁড়াইতে না পারিয়া আমরা বসিয়া পড়িলাম। কাছারীর চারিদিকে কলকোলাহল, অদূরে দেওয়ানী আদালতের দ্বিতল গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, চারিদিকে ভীত চকিত বিমূঢ় মানুষ ছুটিতে লাগিল। রুদ্রের একটী তাণ্ডব নৃত্য! তখন কল্পনাও করি নাই যে সহরগুলি শ্মশানে পরিবর্ত্তিত হইল।

কম্পন কিছু প্রশমিত হইলে ভগ্ন-স্তূপের মধ্য হইতে মোটরের চাবি খুঁজিয়া মোটরযোগে সার্কিট হাউসে ছুটিলাম। বাংলার প্রাঙ্গণের প্রবেশ পথে ফটক ভাঙ্গিয়া গেছে, সেখানে মোটর রাখিয়া বাংলার দিকে ছুটিলাম, দেখি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-মাতা সকলেই রক্ষা পাইয়াছেন। সকলে দাঁড়াইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছি, হঠাৎ দেখি দলে দলে লোক পাগলের মত পাশের রাস্তা দিয়া রেললাইনের দিকে ছুটিতেছে। আমাদের দেখিয়া তাহারা চেঁচাইতে লাগিল, "ভাগিয়ে, ভাগিয়ে!" নূতন কি আপদ ঘটিল বুঝিতে না পারিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখি মাটি ফাটিতেছে এবং অসংখ্য ফাটল দিয়া অতল ভূগর্ভের জল

একটি বনেদি জমিদারের বাড়ীর ভগ্নগৃহ—এখানে প্রাণহানি হইয়াছে—মজঃফরপুর

একটি জমিদারের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ—মজঃফরপুর

দারভাঙ্গা মহারাজার ভগ্ন আনন্দবাগ প্রাসাদ

প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, জলধারার সঙ্গে বালিরাশি নিঃসৃত হইতেছে। তখন আমরা প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিলাম। কোথায় যাই, কী করি? অদূরে রেলের লাইন, ছুটিতে ছুটিতে সেখানে গেলাম, জায়গাটি উচ্চভূমিতে অবস্থিত। সকলের মুখ বিবর্ণ। তখন ভূমিকম্প থামিয়াছে, কিন্তু রেল লাইনের পার্শ্বস্থ পতিত জমি ক্রমে ক্রমে ফাটিতে লাগিল এবং চারিদিকে জলরাশির স্রোত বহিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল ধরিত্রী বুঝি দ্বিধা হইবেন এবং আমরা কে

দ্বারভাঙ্গার ভগ্ন দেওয়ানী আদালত গৃহ

দ্বারভাঙ্গার ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসারের বাড়ী—এই বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী, তিনটি শিশু ও ভ্রাতার দুই শিশুর মৃত্যু হয়।

রেলের গুমটির কাছে সকলে জড়সড় ভাবে বসিয়া পড়িলাম।

সহর হইতে দলে দলে লোক সেখানে আশ্রয় লইল; চারিদিকে আর্ত্তনাদ কোলাহল। অনিশ্চিত আশঙ্কায় কোথায় তলাইয়া যাইব। এ অবস্থায় কোথাও যাইবার ভরসা নাই, 'যদি মরি তো একসঙ্গে মরিব' এই ভাবিয়া সকলে একত্রে বসিয়া রহিলাম। আধঘণ্টা পরে জল স্রোত বন্ধ হইল, সাহসে ভর দিয়া আমরা বাংলায় ফিরিলাম।

দ্বারভাঙ্গা সহর—ভগ্নগৃহ ও তৎপার্শ্বে গৃহ-হারাদের আশ্রয় ;
কম্পনের প্রথম কয়েকদিন বহুসহস্র লোক শীতে কষ্ট পাইয়াছে।

দ্বারভাঙ্গা বাজারের প্রবেশ পথ—ভাঙা বাড়ীর দৃশ্য,
যে গৃহের ইটকাট খসে নাই, তাহা বিষমভাবে ফাটিয়াছে।

বাংলার অনেক ঘর ফাটিয়াছে ও ভাঙ্গিয়াছে, সুতরাং মুক্ত প্রাঙ্গণে বাংলা হইতে কিছু দূরে একটুকু শুষ্ক ভূখণ্ডে আশ্রয় লইলাম। আমাদের মাঠের জীবনযাত্রার এই প্রারম্ভ।

বীভৎস দৃশ্য। তাঁহার দ্বিতল গৃহ ধূলিসাৎ। তাঁহার পত্নী, কোলের শিশু, দুই কন্যা এবং ভ্রাতার দুই শিশু ভূপতিত ভগ্ন দালানের নিষ্পেষণে নিহত হইয়াছে,

দ্বারভাঙ্গা বাজার--দ্বারভাঙ্গার বহু বিপণিগৃহ ধূলিসাৎ হইয়াছে ও সঙ্কীর্ণ পথে বহুলোকের বীভৎস মৃত্যু হইয়াছে।

দোকানদারের দুর্দ্দশা—কম্পনের পর পথের উপরে বহুক্লেশে সে দোকান চালাইতেছে।
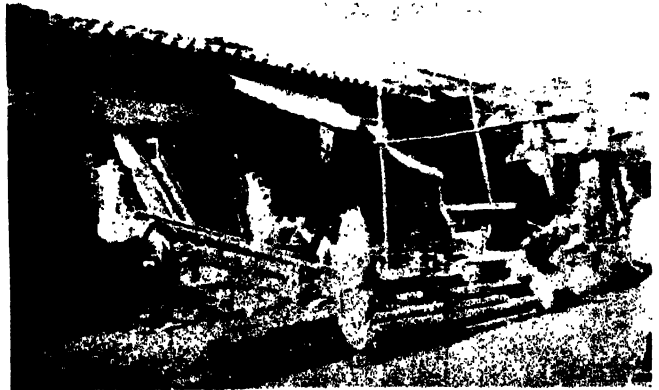
পরিবারবর্গকে রাখিয়া সহরের দিকে বন্ধুবান্ধবদের খোঁজে বাহির হইলাম। চারিদিকে যে ধ্বংস দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। হা ভগবান্ একী হইল? আমাদের বিভাগের স্থানীয় ইনকাম ট্যাক্স অফিসার কামেশ্বর প্রসাদের বাড়ী নিকটেই। সেখানে গিয়া দেখি

ভ্রাতৃজায়া সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছেন। পত্নীকে ইটের স্তূপ হইতে বাহির করা হইয়াছে, তাঁহার মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত, স্বামী পার্শ্বে শোকাকুল ও হতবুদ্ধি হইয়া উপবিষ্ট। অন্য মৃতদেহগুলি তখনও উদ্ধার করা যায় নাই। স্ত্রীর হাত ধরিয়া কামেশ্বরবাবু নীচে নামিয়া যখন মুক্ত

আঙিনায় আসিয়াছেন তখন পশ্চাৎবর্ত্তিনী পত্নী পিছাইয়া যান অমনি ভাঙা দালানের নির্দ্দয় জগদ্দল বোঝা তাঁহাকে স্বামীর নিকট হইতে ইহজন্মের মত ছিনাইয়া লয়।

সামান্য না। কত পরিবার প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, কোথাও পরিবারের কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার নিঃসহায় স্বজনবর্গ বাঁচিয়া আছে।
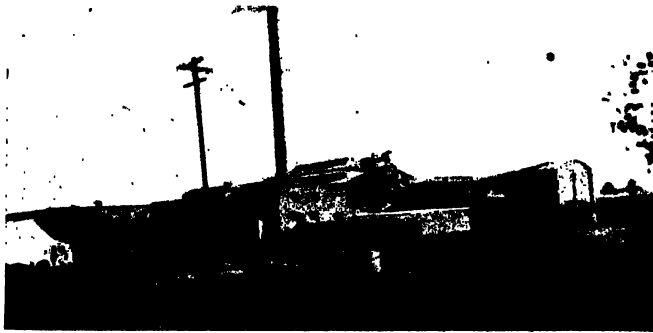
মোতিপুর চিনির কারখানা (মজঃফরপুর জিলা)-এই নবগঠিত সুবৃহৎ কারখানা বিনষ্ট হয় নাই।

ইক্ষু-বোঝাই গরুর গাড়ীর সারি—এই ইক্ষু মোতিপুর চিনির কলে যাইতেছে। ভূমিকম্পে বহু কারখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চাষীদের ইক্ষুর সদ্ব্যবহারের জন্য সরকার Crusher-এর ব্যবস্থা করিতেছেন।

এই মর্ম্মান্তিক বজ্রাঘাতসম মৃত্যু অতি শোচনীয়। সেদিনকার সেই করুণ দৃশ্য কখনও ভুলিবার নয়।

এমন একই দালানে বহুলোকের মৃত্যুর কাহিনী কত যে শুনিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। ভূমিকম্পে এইভাবে কত পিতা সন্তানহারা, কত স্বামী বিপত্নীক, কত স্ত্রী স্বামিহারা হইয়াছে, কত সন্তান অনাথ হইয়াছে তাহা বলা যায়

কামেশ্বর প্রসাদের পত্নীর দাহের ব্যবস্থা করিয়া এবং তাঁহাকে ভ্রাতার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া বাংলার মাঠে ফিরিলাম। বাংলা হইতে দুটি খাট আনিলাম। তাহাতে মশারী খাটাইয়া চতুর্দ্দিকে কম্বল ও কাপড়ে ঘিরিলাম। শুধু এই খাটের আশ্রয়ে খোলামাঠে তিনটি শিশু, স্ত্রী ও মাকে লইয়া শীতে রাত্রিযাপন করিলাম।

সকালে সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইব না। উত্তরকূটের ভৈরব-পন্থীদের সেই প্রলয় রজনীর গুরুগম্ভীর গান যা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছিলাম তাহা মনে পড়িল—

"জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর
জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।

* * * *

তিমিরহৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ
মরু-শ্মশান-সঞ্চর
শঙ্কর শঙ্কর!"

রাত্রি নিরাপদে কাটিল, ক্রমে ভোর হইল। বিভীষিকা-পূর্ণ রজনীর অবসানে মন আশা আনন্দে পূর্ণ হইল। সেই স্মরণীয় প্রভাতে সূর্য্যালোকের অরুণাভাসে রবীন্দ্রনাথের অচলায়তনের শেষ দৃশ্য মনে পড়িল। মানুষের স্বরচিত কৃত্রিম অচলায়তনের দ্বার ভাঙিয়া যেন গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি আর কোনো ব্যবধান রাখিলেন না। একদা আয়তনবাসীরা ইঁটকাঠের পুরীতে বিধি নিষেধের প্রাচীরে

চাকিয়াতে চম্পারণ সুগার কোং লিঃ-এর ভগ্ন চিনির কারখানা
(চম্পারণ জিলা)

আজ সন্ধ্যায় গোটা সহর আকাশের নীচে আশ্রয় লইয়াছে। এ এক অদ্ভুত অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। বিষম শীত উপেক্ষা করিয়া সেই বিভীষিকাপূর্ণ রাত্রিতে সকলে যে যতটুকু আবরণ সংগ্রহ করিয়াছে তাহারই আশ্রয়ে এবং তাহার অভাবে রিক্তভাবে রাত্রিযাপন করিল। বহুশত লোক শুধু খোলা মাঠে অসহ্য শীতভোগ করিয়া পড়িয়া রহিল বা জাগিয়া কাটাইল। সারারাত্রি কাহারো প্রায় ঘুম হইল না। সাত আটবার ভূমিকম্প হইল। প্রতি কম্পনে সকলে বাহিরে ছুটিয়া আসিলাম, কি জানি কোথায় জমি ফাটিবে, এই উন্মুক্ত স্থানেও রাত্রের অন্ধকারে সেই আশঙ্কায় ত্রস্ত হইলাম। রাত্রির আকাশ আর্ত্তমানবের চীৎকারে ও মুসলমানদের প্রার্থনা রবে মুখরিত হইল। মনে হইল প্রলয় নিশা বুঝি আসন্ন,*

ইক্ষু-বোঝাই গরুর গাড়ী—উত্তর বিহারে বহু চিনির কারখানা ভূমিকম্পে ভাঙিয়া যাওয়ায় চাষীদের দুর্দ্দশা হইয়াছে। সরকার ছোট ছোট Crusher-এর ব্যবস্থা করিতেছেন।

* 'মুক্তধারা' নাটক—এটি রবীন্দ্রনাথ পৌষ সংক্রান্তিতে লেখেন এবং নাটকের প্রলয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল উত্তরকূটে। ১লা মাঘের উত্তর বিহারের ভূমিকম্পের সহিত কিছু মিল পাওয়া যায়।

আপনাদের বিষম নির্ব্বাসনে আবদ্ধ করিয়াছিল। আকাশ-বাতাস-আলোকের প্রবেশপথ রুদ্ধ হইয়াছিল, রুদ্র আসিয়া নির্দ্দয়ভাবে তাহা ভাঙিয়া দেন। রুদ্রের সেই আগমনীর সুরটি যেন এই নির্ম্মল প্রভাতে ভাঙা নগরীতে বাজিয়া উঠিল,

মুক্ত প্রাঙ্গণে শুধু পালঙ্কের আবরণের আশ্রয়ে দুই রাত্রি কাটিল। তৃতীয় দিন বাংলার সতরঞ্চি ও বাঁশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র আশ্রয়স্থল রচিত হইল। তাহাতেই সপরিবারে প্রায় দশদিন বাস করিলাম। পরে পথঘাট ও
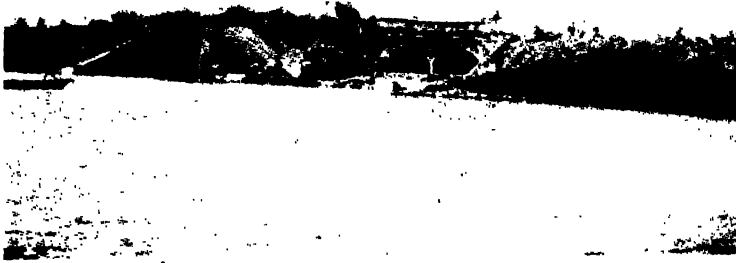
মেহসীর ভগ্ন সেতু (চম্পারাণ জিলা)—মজঃফরপুর হইতে ১৬ মাইল দূরে, ভূমিকম্পে এই সেতু ভাঙিয়াছে।

ব্যবসা পূর্ব্ববৎ—দর্জ্জির কাজ (মজঃফরপুর)

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ম্ময়
তোমারি হউক জয়!
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়!

সেতুর সংস্কার হইলে সমস্তিপুরের পথ দিয়া মজঃফরপুরে ফিরি।

ভূমিকম্পে দ্বারভাঙ্গায় শত শত গৃহ ধূলিসাৎ হইয়াছে এবং বহুলোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। বড় বাজার ও কাটকি বাজারের

সঙ্কীর্ণ গলিতে বহু দোকানপাট ও বাসগৃহ ছিল, সেখানে ধ্বংস ও প্রাণহানি অতি ভীষণ হইয়াছে। সেদিনকার ঈদের বাজারে বহু খরিদদারের সমাগম হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে নিষ্পেষিত হইয়াছে। মহারাজাধিরাজের ভাবে বিদীর্ণ হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী নরগওনা প্রাসাদ বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজের অতি প্রিয় বাসগৃহ ছিল। এই প্রাসাদের একটি অংশ ছাড়া সবটি ধ্বংসীভূত হইয়াছে। মতিমহল প্রাসাদেরও সেই দশা। দ্বারভাঙ্গা হইতে ২০ মাইল দূরে

লেখকের শিবির—লাহেরিয়াসরাই (দ্বারভাঙ্গা) সার্কিট হাউসের প্রাঙ্গণে লেখকের আশ্রয়স্থল—ভূমিকম্পের পর।

"ফিরে চল্ মাটির টানে"—খড়ের ঘর তৈয়ারী, মজঃফরপুরের বাঙালীদের ওরিয়েন্ট ক্লাবের প্রাঙ্গণে কল্যাণব্রত সঙ্ঘের কুটীর নির্ম্মাণের দৃশ্য।

বৃহৎ দ্বিতল অতিথিশালা ও অন্য একটি পুরাতন প্রাসাদ ব্যতীত প্রায় সকল সুবৃহৎ প্রাসাদ বিনষ্ট হইয়াছে। দ্বারবঙ্গাধিপ ভারতের সমৃদ্ধিশালী রাজন্যবর্গের অন্যতম। দ্বারভাঙ্গার তাঁহার বিরাট আনন্দবাগ প্রাসাদ সাংঘাতিক রাজনগরে ভূতপূর্ব্ব মহারাজাধিরাজ প্রায় এক কোটি টাকা অর্থে একটি সুবিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, তাহা দ্বারভাঙ্গা-রাজের গৌরব ছিল। এই প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। মহারাজার মজঃফরপুরের দুই প্রাসাদও ধূলিসাৎ

হইয়াছে। তাঁহার আরো বহু গৃহ, কারখানা, হাসপাতাল, ইত্যাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বসমেত তিন কোটি টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

বিনষ্ট হইয়াছে এবং প্রায় সকল সরকারী বাড়ী বিদীর্ণ ও ভূপতিত হইয়াছে। হাসপাতালের ডেপুটী সুপারিণ্টেডেণ্ট রায় সাহেব ডাঃ সুধীরকুমার সেনের ১৫ বছরের কন্যার
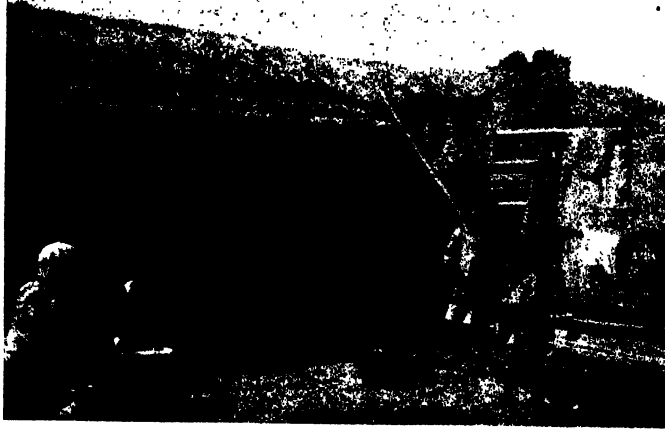
আশ্রয়হীনের পর্ণকুটীর—কল্যাণব্রত সঙ্ঘের নির্ম্মিত কুটীরে একটি বাঙালী মহিলা রন্ধন কার্য্যরতা।

কল্যাণব্রত সঙ্ঘের কুটীর শ্রেণীতে বাঙালী পরিবার গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃতা।

দ্বারভাঙ্গা জেলার সরকারী কেন্দ্র (Head Quarters) লাহেরিয়া সরাই। ইহা দ্বারভাঙ্গা হইতে তিন মাইল দূরে। দ্বারভাঙ্গা ও লাহেরিয়া সরাইকে একত্রভাবে একটি সহর গণ্য করা যাইতে পারে। লাহেরিয়া সরাইতে প্রকাণ্ড দ্বিতল হাসপাতাল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসীভূত হইয়াছে, বহু বাঙালী ও বিহারী উকীলের বাড়ী ধূলিসাৎ হইয়াছে, দেওয়ানী আদালতের দ্বিতল গৃহ আংশিক

শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দ্বিতলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠে ব্যাপৃতা ছিলেন উপরের ছাদ ভাঙ্গিয়া তাঁহার প্রাণান্ত হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গায় রাজহাসপাতাল ও অধুনা-নির্ম্মিত মেডিকাল স্কুল বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ভূমিকম্পের পর দ্বারভাঙ্গা জিলার রাজপথ ও রেলপথ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হওয়াতে আমরা সহরবাসী বহির্জ্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম। দলে দলে লোক বহু ক্লেশে পদব্রজে বা

সাইকেলে যাতায়াত করিতে লাগিল। বিপদের সময়ে শারীরিক ও মানসিক অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হয় তাহার প্রমাণ এই দুর্ঘটনায় পাওয়া গিয়াছে। প্রতিদিন বহুলোক ৬০।৭০।৮০ মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া বা সাইকেলে পাড়ি দিয়াছে,— আত্মীয়স্বজনের উদ্দেশ্যে, অনিশ্চিত আশঙ্কায়। আহার নিদ্রা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া সরকারী বেসরকারী সকলে আর্ত্তত্রাণের জন্ত প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছে। মজঃফরপুরের কথা জানি, কয়েকটি যুবক দিবারাত্রি মৃতদেহ শ্মশানে বহন করিয়াছে, যখন শক্তিতে কুলায় নাই তখন গোযানে আহরণ করিয়াছে। ধ্বংসস্তূপ অপসরণ করিয়া আহতদের উদ্ধার করিতে এমনি অনেকে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে।

পর্ণকুটীর শ্রেণী—সম্মুখে fire bucket-এর সারি, সহরের একটি বিষম সমস্তার নিদর্শন। সহরে অগ্নিকাণ্ড এখনই আরম্ভ হইয়াছে (মজঃফরপুর)

পর্ণকুটীর ও শিবির—ভূমিকম্পন-ত্রস্ত লোকের আশ্রয়। মজঃফরপুর এখন "City of huts and tents"। সরকার ও অন্ত কর্ম্মীদের পক্ষ হইতে ইহার বহু সরবরাহ হইয়াছে।

১৭ তারিখে দ্বারভাঙ্গায় দুটি বিমানপোত আকাশপথে দৃষ্টিগোচর হওয়াতে দুঃস্থ সহরবাসীদের মনে আশার সঞ্চার হইল। মনে হইল মানুষ নিতান্ত প্রকৃতির খেয়ালের ক্রীড়নক নয়, প্রলয়নৃত্যশীল জড় প্রকৃতিকে তুচ্ছ করিয়া আকাশে তাহার বিজয়রথ উড্ডীন হয়! বাহিরের জগতে আমাদের এই কম্পনের সংবাদ পৌছিয়াছে অনুমান করিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলাম। একটি সরকারী বিমানপোত আকাশ হইতে ধ্বংস ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিয়া গেল, অন্যটি কলিকাতা হইতে মহারাজাধিরাজের প্রেরিত, দ্বারভাঙ্গায় পোলো-মাঠে অবতরণ করিল।

পরদিন সকালে হঠাৎ খবর আসিল যে বিমানপোতটি কলিকাতা অভিমুখে ফিরিতেছে। প্রলয়কাহিনী শুনিয়া মহারাজাধিরাজ কলিকাতা হইতে এয়ারোপ্লেনটিতে একটি

কর্ম্মচারীকে পাঠান, তিনি সংবাদ লইয়া ফিরিতেছেন। তাড়াতাড়ি আমরা সকলে মিলিয়া আত্মীয়স্বজনকে ও আমার কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম। পত্রগুলি লইয়া

আর্ত্তনাদের অন্নবস্ত্র বিতরণ (মজঃফরপুর)

মোটরে দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদে পৌছাইয়া দেখি আকাশ-যান propeller ভাঙ্গিয়া মাঠে অচল অবস্থায় আছে। রাজের ৫ খানি মোটর কোদাল লইয়া পথ-সংস্কার করিয়া সিমারিয়া. ঘাট পর্য্যন্ত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সেখান হইতে কলিকাতায় ট্রেনে যাইবে। বহু ডাক সঙ্গে চলিয়াছে। তৎসঙ্গে আমাদের চিঠিগুলিও দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এইগুলি কলিকাতায় পরদিন ডাকঘরে ছাড়া হয় এবং আমাদের কুশলবার্ত্তা সর্ব্বপ্রথম ডাক মারফৎ ২০ তারিখে সকলের নিকট পৌছে।

ভূমিকম্পের ফলে বার্ত্তাবহনের সকল পথ বন্ধ হওয়াতে বিষম উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। মানুষের বহুবর্ষরচিত পথচলাচলের'ও বার্ত্তাবহনের বিরাট সুব্যবস্থা এই ক্ষণিক আন্দোলনে ছিন্ন ভিন্ন উৎক্ষিপ্ত হইয়া গেল। কম্পনপীড়িত স্থানগুলির নৈঃশব্দ্যে বহির্জগত শঙ্কান্বিত হইল। এমন সময়ে বিমানপোতগুলি এই বিধ্বস্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া সঠিক সংবাদ প্রকাশিত করিল, সংবাদ পত্রে এই বিবরণ পড়িয়া সকলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। প্রথমে মুঙ্গের জামালপুরের খবর সকলে অবগত হয় কারণ এ অঞ্চলে রেলপথ বিনষ্ট হয় নাই। কিন্তু উত্তরবিহারের দুঃসংবাদ প্রথম ১৭ তারিখের Statesman-এ প্রকাশিত হইল। ১৫ তারিখে ভূমিকম্প হয়। ১৬ তারিখে Indian Air Pageant এর Capt. Dalton মজঃফরপুর—বেটিয়া অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া সেদিন সন্ধ্যায় পাটনার লাট সাহেবের প্রাসাদ হইতে কলিকাতায় ফোন করিয়া কম্পনের বিবরণ প্রেরণ করেন। ১৭ তারিখে কলিকাতায় হৈ হৈ ব্যাপার Statesman এর শিরোনামা বাহির হইল--Dead bodies strewn over streets of Mozaffarpore।" এই সংবাদ ১৮ তারিখে মফঃস্বলে পৌছাইল। ১৭ তারিখ হইতে এতদিন সরকারী বিমানপোত বিধ্বস্ত উত্তরবিহার পরিদর্শন আরম্ভ করে। ঐ দিন ডাল্টন সাহেব পুনর্ব্বার বেটিয়াতে পুলিশের D. I. G. কে লইয়া যান। দ্বারভাঙ্গায় ১৭ তারিখে বিহার-সরকারেরই আকাশ-যান আসিয়াছিল, ডাল্টন সাহেব ঐ অঞ্চলে যান নাই। ১৮ তারিখে বিহারের লাট সাহেব আকাশপথে মজঃফরপুরে যান এবং সেখান হইতে উত্তরবিহার পরিদর্শন

আশ্রয়প্রাপ্ত পরিবারের ঘরকরণা—মজঃফরপুর।

করেন। দ্বারভাঙ্গায় প্রতিদিন আকাশযানে সরবকারী ডাক ও খবরের কাগজ কালেক্টার সাহেবের উদ্দেশ্যে ফেলা হইত। ইহাতে সহরবাসীগণ সরকারী ব্যবস্থার বিষয়ে আশ্বস্ত হন এবং বাহিরের সহিত যোগ স্থাপিত হয়। ডান্টন সাহেবের Statesman-এর ভূকম্পবিবরণ কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও মেডিকেল স্কুল কর্ত্তৃপক্ষগণ গ্রহণ করেন। এই স্কুলটি না থাকিলে আহতদের যে কি দুর্দ্দশা হইত তাহা বলা যায় না। রেলপথ নষ্ট হওয়াতে বেসরকারী medical relief বহু বিলম্বে পৌছে। খেলার প্রকাণ্ড মাঠে ক্যাম্প হাসপাতাল-গুলি অতি সত্বর নির্ম্মিত হয় এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা

পর্ণকুটীরে আশ্রিতের ঘরকরণা—মারওয়ারী রিলিফ্ সোসাইটীর নির্ম্মিত কুটির
(মজঃফরপুর)

"গুরু নানক লাঙ্গার"—মজঃফরপুর কর্ম্মী ও আর্ত্তদের জন্য শিখদের রন্ধন-সত্র, এখানে সকলের আহারের জন্য দ্বার মুক্ত।

তাহাতে সুফল হইল। অতি সত্বর ঘটনাস্থলে সহায়কদল ও দুঃস্থদের আত্মীয়স্বজন আসিতে লাগিলেন।

সরকার পক্ষ হইতে দ্বারভাঙ্গায় ভূমিকম্পের দিন হইতে অতি সত্বর আর্ত্তত্রাণের কাজ আরম্ভ হয়। এখানে আহত-দের শুশ্রূষার ভার সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় সরকারী হাসপাতাল ও করা হয়। স্কুলের ছাত্রগণ শুশ্রূষায় যোগদান করে। পথ-ঘাট মেরামত, বাজারদর সংরক্ষণ, সম্পত্তিরক্ষা ও পনিষ্কাসন প্রভৃতি বিষয়ে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত

নারী-হরণ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দেব

তখন-পূজার ছুটি। পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে মেসের কয়জন আমরা বাড়ী যাই নাই। রাত্রির আহার সারিয়া পুরা দমে মজলিস চলিয়াছে। পাশেই প্রকাণ্ড একখানা তেতলা বাড়ি উঠিতেছিল। মজুরদের হট্টগোল, রাজমিস্ত্রির সারি গান সব তখন থামিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়ী কিম্বা লোক চলাচল দুই-ই প্রায় বন্ধ। কলুটোলার কোলাহলমুখর পথখানি শ্রান্তিতে গা এলাইয়া গ্যাসের আলোকে ঝিমাইতেছে।

কোলের উপর খবরের কাগজ মেলিয়া পটলা বলিল,—"নাঃ, আর পারা যায় না। কাগজ খুল্লেই এক খবর—নারী-হরণ—নারী-নির্য্যাতন! বাঙলা দেশের মেয়েরা যেন টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটির সামিল। টাকা-পয়সা না-হয় বাক্স-বন্দি করে রাখা যায় কিন্তু মেয়েদের তো আর চব্বিশ ঘণ্টা কুলুপ এঁটে ঘরে রাখা চলে না!"

উনিশ শ' একুশ সালে অসহযোগ করিয়া অপূর্ব্ব কলেজ ছাড়িয়াছিল। এমন কি উপরি-উপরি তিন দিন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস্‌এর ফটকে সটান শুইয়া পড়িয়া পরীক্ষার্থীদের পথও আটকাইয়াছিল। শেষে অবশ্য কলেজে ঢুকিয়াছে; পরীক্ষাও পাশ দিয়াছে। বর্ত্তমানে গ্রীষ্মে আদ্দির পাঞ্জাবী, শীতে ব্লেজার কোট পরে বটে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-নীতিতে নিষ্ঠা অটুট রাখিয়াছে। কিছুকাল যাবৎ ধরপাকড়ের হিড়িকে 'পতিতপাবন সমিতিতে' নাম লিখাইয়াছিল। অপূর্ব্ব বলিল,—"হবেই তো! পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া ও সব evils দেশ থেকে দূর হবে না। ভারতবর্ষের পুরুষরা মেয়েদের ঠুনকো কাঁচ করে রেখেছে,—ছুঁয়েছ কি ভেঙেছে! যতদিন আত্ম-নিয়ন্ত্রণে পুরুষ এবং নারী সমান অধিকার না পাবে, ততদিন এর radical cure নেই জেনো। নারী যেদিন নিজ অধিকার বুঝে নেবে, আপনাকে assert করতে শিখবে, সে-দিন পুরুষের অনুকম্পামিশ্রিত সাহায্যের আশায় বসে থাকবে না। সে-দিন কিন্তু বেশী দূর নয়! এখনই পিকেটিংয়ে মেয়েরা বেরুচ্ছে, গোরা-সার্জ্জেণ্টের মুখোমুখী হতে নেতিয়ে পড়ছে না। 'আসিবে সে-দিন আসিবে' যেদিন

'আপনার মান রাখিতে জননি!
আপনি কৃপাণ ধর গো!—"

উৎসাহের চোটে অপূর্ব্ব আসন ছাড়িয়া উঠিতেছিল। বোধ হয়, অকস্মাৎ মনে পড়িল যে মেসটি শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হইতে দূরে, তাই বসিয়া পড়িল।

বিনয় 'মহিলা-সঙ্কট-সংহার-সঙ্ঘের' অবৈতনিক সহকারী সম্পাদকত্বের উমেদার। এই বিষয় নিয়া সে খবরের কাগজে লেখা-লেখি করিয়াছে—মফঃস্বলে প্রচার কার্য্য করিতে গিয়া ক্রমাগত পাঁচদিন মেসের ডাল-ঝোল ডাঁটা চচ্চড়ির পরিবর্ত্তে ষ্টীমারে শুধু ব্রেকফাষ্ট খাইয়া কাটাইয়াছে। অপূর্ব্বর কথার খেই ধরিয়া বলিল,—"সবই বুঝলুম, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা তো আর শীগ্‌গির মিলছে না। তার আগেই এর একটা বিহিত না করলে চলছে না। শুধু অসহযোগে কাজ হবে না। এই নিয়ে আইন-আদালতের আশ্রয় নিতে হবে, কাউন্সিল এসেম্ব্লিতে special legislation করান দরকার। দেশের লোককে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন, সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলা চাই। একের বিপদে অন্যের অনুভূতির শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে। রামের মেয়ে চুরি যাচ্ছে, শ্যাম হয়ত হাঁ করে দেখছে, বড়জোর তাকে একঘরে করবার জন্ত জট পাকাচ্ছে! এই তো তোমার সমাজের অবস্থা!"

"আরে, আইন-আদালত বহুদিন ধরেই চলছে। ষ্যাটাদের যে শাস্তি না হচ্ছে, এমন নয়। কিন্তু ভণ্ডামী যে

দিন দিন বেড়েই চল্ল।—না ভাই, এর প্রতিকার আইন-আদালতে নয়। কাউন্সিল-এসেম্‌ব্লিতেও নয়—প্রতিকার নিজ নিজ হাতে! বাঙ্গালী-হিন্দু যে-দিন শরীর-চর্চ্চা ছেড়েছে, লাঠি রেখে ছড়ি হাতে নিয়েছে, সেই দিন থেকেই এই পাপের সুরু। বাঙ্গালী যুবকদের পানেই তাকিয়ে দেখ না, মাথায় লম্বা চুল রেখে উপরমুখো আঁচড়াবে, পথ চলবে হেলে-দুলে এই ভাঙ্গে তো ঐ ভাঙ্গে, পায়ে দেবে জরির কাজ-করা পাতলা নাগরাই, হাসবে দেঁতো হাসি, কথা কইবে নাকি সুরে, গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে মুখে ঘষবে ভেন্‌জুষা! মেয়েদের ছেড়ে বাঙ্গালী ছোক্‌রা বাবুদেরই যে কেন হরণ করে নিয়ে যায় না, সে-ই এক আশ্চর্য্য!"—পটল 'হনুমান ব্যায়ামশালায়' রীতিমত শরীর-চর্চ্চা করে। দিনে পাঁচ সাতবার আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত পা ভাঁজিয়া লক্ষ্য করে muscle গুলি ঠিক ঠিক উঠা-পড়া করে কি-না। বিশেষতঃ সুকুমারের উপর ছিল তার জাতক্রোধ, তাই শেষের কথাগুলি তাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল।

সুকুমার নিভাজ তরুণ। এম, এতে Experimental Psychology পড়িতেছিল। সংস্কৃতেই বল, আর ইংরাজীতেই বল, কোন ভাষাতেই তাকে হটান শক্ত। তবে Continental literature এ আমাদের মধ্যে তাকে অথরিটি বলিয়াই গণ্য করা হইত। তার গবেষণা শক্তি ছিল সত্যই বিস্ময়কর!

কড়িকাঠের পানে চশমাশুদ্ধ চোখ তুলিয়া সুকুমার কহিল,—"যা-ই বল তোমরা, আমার কিন্তু মনে হয় ইহার মূলে Sex-Complex। যতদিন পর্য্যন্ত নারীহরণের সাইকোলজি ধরতে না পেরেছ, অন্ধকারেই ঘুরে মরতে হবে। ফ্রয়েড, হ্যাভলক ইলিস্—সকলেই এক বাক্যে বলেছেন—"

পটলা এক লাফে আগাইয়া গিয়া সুকুমারের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল,—"রেখে দাও তোমার ফ্রয়েড! ফ্রয়েড পড়েছ শুধু তোমরা বাঙ্গলার তরুণরাই! কথায় কথায় ফ্রয়েড আর হ্যাভলক্ ইলিস! কিন্তু ফ্রয়েড আর হ্যাভলক্ ইলিসের দেশে অমন রাত পোহাতেই মেয়ে-চুরির খবর বেরোয় না—সে-সব দেশে সত্যিকার তরুণ আছে! ও সব কিছু নয় হে, কিছু নয়! এর একমাত্র ওষুধ,—লাঠি, লাঠি—মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি।"

সুকুমার কহিল,—"সে-সব দেশে মেয়ে-চুরি হয় না, তোমায় কে বল্লে? তবে Communalism যে-দেশ বিষিয়ে তুলেছে, সে-দেশের মত নারী-হরণ নিয়ে অত হৈ চৈ বাধে না। তোমার দেশেই চেয়ে দেখ না। Commnualism-এর আগে যখন রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল, তখন দেশ জুড়ে অমন হুলস্থূল পড়ে নি।"

অপূর্ব্ব আর সহিতে পারিল না।—"থাম, বলছি সুকুমার। মুখ পচে পড়বে। যে-দেশে—

'সীতা সাধ্বী দময়ন্তী ভারত-ললনা
কোথা পাবে তাদের তুলনা!'

সে-ই দেশের মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধার উপর ইঙ্গিত করতে তোমার বাধে না?—রাবণের সীতাহরণ নিয়ে গোটা রামায়ণ গড়ে উঠল। রাক্ষস বংশ সমূলে ধ্বংস হ'ল। আর তুমি বলছ, হৈ চৈ হয় নি! হ্যাঁ, তবে agitation-এর ধারা ঠিক এমনটি ছিল না। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে যে সেকালে দেশ বলতে পাহাড়-পর্ব্বত-জল-মাটিই বুঝাতো। Nationalism তখন ছিল না, Theory of State-এর জন্মই হয় নি, Federation দিয়ে হিমালয় থেকে কুমারিকা অবধি এক অখণ্ড ভারত গড়ে তুলবার—"

শ্রীচরণ এতক্ষণ এককোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। প্রাচীন সমাজের প্রতি কটাক্ষ তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিছুদিন ধরিয়া 'চতুর্ব্বর্ণ পুনাস্তক-সোসাইটিতে' সে আনাগোনা করিতেছিল। ভিতরে উত্তেজনা আসিলেও বাহিরে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়াই শ্রীচরণ বলিল,—"যা জানো না, তা-নিয়ে তর্ক করো না। প্রাচীন সমাজের তোমরা বোঝ কি? রাবণ ছুঁয়েছিল বলে সীতাকে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে নিতে হয়েছিল, তবে-না শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে গ্রহণ করেন। তাও শেষ পর্য্যন্ত সমাজকে এঁটে উঠতে পারেন নি। সীতাকে নির্ব্বাসন দিতে হয়েছিল। হিন্দু-সমাজ অচলায়তন নয়—রক্তবীজ। কোথাও খোঁচা মেরেছ কি হাজার বীর ঢাল তলোয়ার নিয়ে খাড়া!"

সুকুমার বলিল,—"ওসব sentimentalism রেখে

দাও। শাস্ত্রই বল, আর পুরাণই বল—সকলের মূলেই Sexology। 'যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্' না হলে বাল্মিকীর কলম ছুটত না। এই ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখই আদি কাব্য। কালিদাস এই জন্যই বলেছেন—'শ্লোকত্বমাপদ্যতে যস্য শোকঃ'। Natureকে ignore করে, Instinctকে উপেক্ষা করে যা করতে যাবে, তা-ই হবে abnormal, কোনো কিছুকেই fetish না করে অল্ডাস্ হাক্সলির মতে সব জিনিষের মূল্যের এমন একটা standard নেও, যা হবে timeless, uncontingent on circumstances, as nearly absolute."

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, ফ্রয়েড এবং মহাত্মা গান্ধীতে মিলিয়া যখন হাতাহাতির উপক্রম, ঠিক এমন সময় পটলা ঠোঁটে আঙুল ঠেকাইয়া চুপ করিতে সকলকে ইঙ্গিত করিল। নিজে ভুরু কুঞ্চিত করিয়া, কান পাতিয়া কি শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তে সব তর্ক-বিতর্ক থামিয়া গেল। ঘরে আলপিনটি পড়িলে তারও শব্দ শুনা যায়! তাই তো, এ-যে নারী কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ! পাশেই যে তেতলা বাড়ী তৈরী হইতেছিল তার ভিতর হইতেই মেয়েলী গলায় বার বার তীব্র আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল। দালানে প্রতিহত হওয়ায় কথাগুলি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল না। কিন্তু মেয়েটি যে বিপদে পড়িয়া সাহায্যের প্রত্যাশায় সকরুণ আহ্বান করিতেছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না—সত্য সত্যই পালে আসিয়া বাঘ পড়িল কি?

রাত তখন প্রায় বারোটা। আশে-পাশে যা-ও বা দুই একটা মেস্ ছিল, পূজার ছুটিতে তার সব গুলিই খালি পড়িয়াছে। স্থান এবং কাল দুই-ই দুর্ব্বৃত্তদের পাপের উপযোগী!

কিন্তু আর বিলম্ব করা চলে না। প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদ ঘনীভূত হইবার আশঙ্কা। যে যাহা হাতের কাছে পাইলাম—মশারি টাঙ্গাইবার খুঁটি, ডাম্বেল, পেরেক ঠুকিবার হাতুড়ি—তাহা লইয়াই পাশের বাড়ির শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম।—চুণকামের জন্য আগাগোড়া বাঁশের আড়বাঁধা প্রকাণ্ড বাড়িটা অন্ধকারে হাড়-বাহির-করা দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে—যেন মূর্ত্তিমান স্পিরিচুয়েলিজম্। এখানে-সেখানে ইঁট, বালি, চুণ স্তূপীকৃত হইয়া আছে। কোথাও সদ্য সিমেন্ট-করা মেঝে চট পাতিয়া জল ঢালিয়া রাখা হইয়াছে—দেখিয়া মনে হয়, ক্ষতের উপর জলপটি।

আমরা হল্লা করিতে করিতে সদর দরজায় পৌঁছিয়া টর্চ্চের আলো ফেলিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি বাহির করিলাম। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতে না দিতে শুনি দোতলায় অনেক লোকের পায়ের ধুপ্-ধাপ্ শব্দ—লোকগুলি নিশ্চয়ই ঘর ছাড়িয়া পলাইতেছে। পটলা মস্ত বড় একটা লোহার ডাণ্ডা কুড়াইয়া লইয়া মাথার উপর ঘুরাইতে ঘুরাইতে 'কোন্ হ্যায়, কোন্ হ্যায়' বলিয়া তিন লাফে সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়া পৌঁছিল। আমরাও তার পিছু-পিছু অগ্রসর হইলাম। দোতলায় হল ঘরের সামনে গিয়া দেখি, মেঝের উপর খান দুই তিন ছেঁড়া চট পাতা,—একটা হ্যারিকেন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। কে যেন লণ্ঠনটি নিভাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাড়াহুড়ায় কাজ শেষ করিয়া যাইতে পারে নাই। মাঝে মাঝে তামাকের ছাই।—গাঁজার কল্কে জড়াইবার নোংরা ভিজা ন্যাক্‌ড়া দু'একখানা পড়িয়া আছে। চটের পাশেই তেল-মাখানো মোটা নাগরাই এক পাটি। দেয়াল ঠেস দিয়া একটা বাঁশের লাঠিও পড়িয়া আছে।

সংখ্যায় দুর্ব্বৃত্তেরা অনেকগুলি ছিল। কিন্তু এখনও বাড়ি ছাড়িয়া পলাইতে পারে নাই। কারণ সদর দরজা দিয়া আমরাই বাড়ি ঢুকিলাম। নিশ্চয়ই কোনো ঘরে লুকাইয়া আছে। বড় জোর তেতলা কিম্বা ছাদে গিয়াছে। কিন্তু মেয়েটি কোথায়? কোনো সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। জোরে ধরিয়া অন্যত্র সরাইলেও তো একটা শব্দ শুনা যাইত। তবে কি গুণ্ডারা মুখে কাপড় গুঁজিয়া তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিল! বাড়ির চারদিকে বাঁশের আড়বাঁধা। হঠাৎ আমাদের মনে হইল যে গুণ্ডারা আড় বাহিয়া নীচেও নামিতে পারে।

পটলা বলিল,—"শীগ্‌গীর চার ভাগ হয়ে চার দেয়ালের কাছে ছুটে যাও। দেখ, মই বেয়ে কেউ নীচে নামল কি না?"

কাল বিলম্ব না করিয়া আমরা এক এক দেয়ালের দিকে ছুটিলাম। পটলা আমার আগে আগে যাইতেছিল। দক্ষিণ দেয়ালের কাছে ছোট একটি কামরার নিকট আসিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাই ত, ঘরের ভিতর যেন একটা লোক

নড়াচড়া করিতেছে। টর্চ্চের আলো ঘরের ভিতর ফেলায় যাহা দেখিলাম, তাহাতে চমকিয়া আমি দুই হাত সরিয়া গেলাম।—প্রকাণ্ড জোয়ান একটি হিন্দুস্থানীর মুখে-চোখে কালি, সিঁদুর, খড়িমাটি—নানা রং চং মাখা! গায়ে আলপাল্লা গোছের লম্বা কুর্ত্তি – হাতে লাঠি। লোকটা ভোল ফিরাইবার জন্য নিশ্চয়ই ছাই-কালি মাখিয়াছে। হাতে ডাণ্ডা দেখাইয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া পটলা বলিল,—"শীগ্‌গির ঘর থেকে বেরিয়ে আয় বলছি; নইলে এই ডাণ্ডার ঘায়ে মাথা গুঁড়ো করে দেব।" পটলার গর্জ্জনে লোকটা থ হইয়া যেখানে ছিল, সেইখানেই হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমাদিগকে আক্রমণের কোনো চেষ্টাই করিল না। পটলা এক লাফে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ঘাড় ধরিয়া লোকটাকে বাহিরে টানিয়া আনিল।

—"কসুর মাফ কীজিয়ে হুজুর, আউর কভি এ্যায়সা নেহী করেঙ্গে।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে গুণ্ডার পিঠে ডাণ্ডার ঘা বসাইয়া পটলা উত্তর করিল,—"এই মাফ করছি। আগে বল্ মেয়েটি কোথায়?"

"ইঁহা কোই আওরৎ নেহী হ্যায়।"

"ব্যাটা বদ্‌মায়েস!—এর উপর আবার মিথ্যে কথা। আওরৎ হ্যায় কি নেহী হ্যায় এখনি টের পাওয়াচ্ছি।" এই বলিয়া পটলা ডাণ্ডাটি আবার উঁচাইল।

এমন সময় পশ্চিম দেয়ালের কাছ হইতে অপূর্ব্বর গলার আওয়াজ শোনা গেল,—"বেরিয়ে এস মা, কোনো ভয় নেই। আমরা তোমার ছেলেরা সব এসে পড়েছি। তুমি ঘর থেকে অসঙ্কোচে এখানে আসতে পার।"

"তবে না আওরৎ নেহী হ্যায়?—পাজি, রাস্কেল—" বলিয়াই পটলা বাঁ হাতে ঠাস করিয়া গুণ্ডার গালে এক চড় বসাইয়া দিল।

"হুজুর, হাম্‌নে ঠিক কহা—"

পটলা তাহাকে কথা শেষ করিতে দিল না। ডান হাতের কনুই দিয়া লোকটার পিঠে দমাদম্ ঘা দিতে দিতে বলিল,—"এই যে ঠিক কহাচ্ছি!—অপূর্ব্ব, তুই মেয়েটাকে নিয়ে আয় না!"

অপূর্ব্ব কহিল,—"কি করে নিয়ে আসি? উনি যে ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না।"

পটলা তখন গুণ্ডাটাকে লাথি মারিতে মারিতে অপূর্ব্বদের দেয়ালের নিকট গড়াইয়া লইয়া চলিল। মেয়েলোকসহ গুণ্ডা ধরা পড়িয়াছে বুঝিয়া আমাদের আর সব এক জায়গায় আসিয়া জড়ো হইল।

অপূর্ব্ব কহিল,—"এই করেই দেশটা রসাতলে গেল। চরম বিপদ, এখনও মেয়েদের লজ্জা, সঙ্কোচ—"

বিনয় বলিল,—"আমিই না হয় মেয়েটিকে ঘর থেকে নিয়ে আসছি—।" ঘরে প্রবেশ করিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়াই বিনয় চীৎকার করিয়া উঠিল,—"শীগ্‌গির আলো দেখাও!" টর্চ্চের বোতাম টিপিয়া এক সঙ্গে সকলে ঘরে ঢুকিয়া দেখি, মেয়েলী ছাঁদে কাপড়-পরা একটি হিন্দুস্থানী যুবক! মুখে গোঁফের রেখা—কিন্তু তার উপর এক পোঁচ ময়দা। আমাদের সাজ-সজ্জা দেখিয়া যুবকটি পায়ে পড়িয়া ভাঙ্গা হিন্দীতে যাহা বলিল তাহার সার মর্ম্ম এই দাঁড়ায় যে, এই 'দফে' তাহাকে মাফ করিতে হইবে। সে যখন 'জান্‌কীমাঈর' অভিনয় ধীরে ধীরে করিতেছিল তখন সীতা-হরণ দেখিয়া 'বুঢ্‌ঢে' তেওয়ারী কাঁদিতে কাঁদিতে বলে—'ভেইয়া, জোর্‌সে রুও, নহী তো জটায়ুজী ক্যায়সে পাত্তা পাওয়েঙ্গে।' এই জন্যই জটায়ুকে শুনাইবার জন্য সীতা জোরে ক্রন্দন সুরু করিয়াছিল।

এমন সময় আরো ছয়-সাত জন হিন্দুস্থানী দরোয়ান গোছের লোক তেতলা হইতে নামিয়া ভয়ে ভয়ে আমাদের নিকটবর্ত্তী হইল। তাহাদের আগে আগে আমাদের খুবই পরিচিত, কলেজের বৃদ্ধ দরোয়ান তেওয়ারী। তেওয়ারী আমাদের কাছে আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল,—"ইস্ দফে হাম্‌লোগোকে ছোড় দীজিয়ে। আপ্‌লোগোকী পরীক্ষাকী বাৎ হামে ইয়াদ নহী থী। হাম্‌লোগ হিন্দুস্থানী ভাই মিল্ কর্ রামলীলা খেল রহেথে। নন্দলালনে রাবণকা পার্ট লিয়া থা। ইসি লিয়ে মুঁমে লাল আউর কালা রং লাগায়া হ্যায়। রামদীন জান্‌কীমাঈকা অভিনয় বহুৎ আচ্ছা খেল্‌তা থা। রাবণকে পকড়্‌তেহি উস্‌নে ধীরে ধীরে রুণা সুরু কিয়া। আপ্‌হি বাতাইয়ে, ইস্ বখৎ জান্‌কীমাঈকে

ধীরে ধীরে রুণেসে জটায়ুজী ভালা ক্যায়সা সুন্ সকৃতা হ্যায়!"

আমাদের কাহারও মুখে রা নাই। রাবণ ধীরে ধীরে গা ঝাড়িয়া মেঝে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাঁচা চুণ-সুর্‌কিতে রাবণজীর চেহারার জলুষ বাড়িয়া গিয়াছিল। পটলার হাতে সীতাহরণের সদ্য ফললাভ করিয়া রামলীলার মাহাত্ম্যে নিশ্চয়ই তার আর কোনো সন্দেহ ছিল না।

সঙ্গীদের প্রবোধ দিয়া বৃদ্ধ তেওয়ারী বলিল,—"তুম্ লোক কোই আফ্‌শোষ মৎ করো। পাপ আউর পুণ্যকা এহি তরীকা হ্যায়। নকলী সীতাকে দেহমে হাত দেনে পর যব্ কি নন্দলালকী য়হ্ দশা হোই, ত অসলি সীতাকে লিয়ে এক লঙ্কাকাণ্ড্ কা হো যানেসে মহাত্মা তুলসীদাস্‌নে এক অকছর্‌ভি শায়েদ ভুল নেহি লিখা। য়হা শ্রীরামচন্দ্রজীকি এক মাত্র মহিমা হ্যায়। জয় সীতারাম, জয় সীতারাম!"—কথা বলিতে বলিতে তেওয়ারী ও তাহার সাথীরা বার বার প্রণাম করিল।

এই দলের মধ্যে কিন্তু জটায়ুকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সীতা-হরণের সংবাদ ইতিমধ্যেই যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে বুঝিয়া ডানা দুইটি আস্ত রাখিয়াই তিনি বোধ হয় বাহিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দেব

বিকাশ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দে

সহসা হৃদয়তল কা'র তরে দিল আজ সাড়া।
কা'রে দিল দোল?
উন্মত্ত, অশ্রান্তরোলে চতুর্দ্দিক বাধা-বন্ধ-হারা
আপনি বিভোল!
কিশোর-পল্লব 'পরে মঞ্জরীর সুরভি বিকাশ,
হৃদয়ের তৃণাস্তরে শ্যামঘন দুর্ব্বাদল রাশ,
হেমন্তে শিশিরসিক্ত প্রভাতের সজল নয়ন
কপোল রক্তিম,
উদ্বেল সমুদ্রতটে মঞ্জরিল বন-উপবন
অপূর্ব্ব অসীম।

চক্ষে সুন্দরের স্বপ্ন, কণ্ঠে তা'র মিলনের সুর—
নীরব মূর্চ্ছনা,
অবোধ্য মুখর বাণী অকস্মাৎ সুন্দর মধুর
সুর উৎসবে লীনা।
প্রথম অরুণ রাগে বিকশিল শুভ্র পদ্মদল
পরশ উন্মুখ প্রাণে, ভাবমুগ্ধ পদ্মপত্রতল—
ছলনা করিতে চাহে হৃদয়েরে হানে কশাঘাত
জর্জ্জরিত করি—
অজ্ঞাতে পল্লব মেলে শুষ্কশীর্ণ বনানীর পাত
আপনা শিহরি'।

কোমল কলিকা তব অরুণের দরশে বিভোল
পুষ্প রূপ ধরি'
ফুটিল বসন্ত-প্রাতে, মলয়ার পরশ-হিল্লোল
লাগাল মাধুরী।
হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী ঝঙ্কারিছে পুলক পরম
প্রথম পুষ্পিত তনু, অনাঘ্রাত সলজ্জ সরম,
আপনার দেহভারে আপনি বিব্রত আত্মহারা—
গোপন গম্ভীর।
মর্ম্মে মর্ম্মে ছন্দ বাজে পদক্ষেপে যৌবনের সাড়া—
অশ্রান্ত অস্থির।

তরুণ অরুণ প্রাণ পূজা করে ধূপদীপ জ্বালি'
মিলন-দেউলে,
গোপন বেদনা তা'র নিশ্বাসিয়া উঠিতেছে খালি
হৃদয়ের তলে!
অর্ঘ্যডালা হাতে করি, দাঁড়াইয়া মিলনের দ্বারে
অসীম প্রণয় তা'র ফেনিয়া উচ্ছলে বারে বারে
হৃদয়ের সব কথা রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ বাসে
প্রকাশিছে ভাব,
বিশ্বসৌন্দর্য্যের ডালা ধরণী দিয়াছে তা'র হাসে
যৌবন-বিকাশ।

সত্যমিথ্যা

শ্রীবিভু কীর্ত্তি এম্, এ,

সত্যি কথা বলতে পারি সইতে যদি পারো ;
—সত্যি কথা সয়না কারো কারো ;
তোমার বলে নয়
এমনি তরই হচ্ছে বিশ্বময়,
এমনিতরই হবে।
সত্য যখন মরবে বুকে মিথ্যা মুখে রবে
বিপুল গর্ব্বভরে
হোক না সে দীন অন্তরে অন্তরে।

ভেবেছিলাম কবে
আমি তোমার সঙ্গী হব সত্যের গৌরবে,
জীবন-পথে সেই হবে মোর মহত্তম মহৎ পরিচয়।
সেই রবে সঞ্চয়
পরমতম দুখের রাতে যখন আমি একা,
পশ্চিমেরি প্রান্তটীতে অস্তরাগ রেখা
বিষাদ ঘন মেঘে
সারাটী রাত একলা জেগে জেগে
চেয়ে দেখি আঁধার বনতল
নয়ন কোণে অশ্রু ছল ছল।

আমি তখন রব কি নাই রব
কেমন করে কব— ?
তুমি তখন রবে কি নাই রবে
দুখের রাত্রি গভীর হবে যবে

কিছুই নাহি জানি ;
স্রোতের প্রবাহিনী
আপন মনে পাহাড় হতে নামে
কোথায় গিয়ে থামে
কে পায় দিশা তার—
দৃষ্টি সীমার পরপারে কেবল অন্ধকার।

মনে করো আমিই পড়ে আছি
দুখের রাতে বাঁচি
অন্ধকারে একা,
সম্মুখে মোর গগন ছেয়ে স্তব্ধ বনরেখা
গভীর হ'য়ে আছে।
তুমি তখন নেইক আমার কাছে
তখন যদি তারারা কয় ডাকি—
"এই ত তোমার জীবন-যোড়া ফাঁকি,
এই ত তোমার সব
মিথ্যা কলরব !
কি পেয়েছ কি চেয়েছ কি দিয়েছ কাকে ?
জীবন শাখে শাখে
ধুলি ধুসর ব্যর্থ পাতা জীর্ণ ফুলের দল
এই জীবনের শেষের ফসল—এই তব সম্বল ?"
ব্যঙ্গভরে হাসে যদি বলবো তাদের কি যে—
মনে মনে জানছি যখন কিছুই পারিনি যে।

ভেবেছিলাম কবে
আমি তোমার সঙ্গী হব সত্যের গৌরবে
সে কথা আজ ভাগ্যে তবু কেউ রাখেনি মনে
এমনি অকারণে
আমার বুকে মাঝে মাঝে সেই কথাটী বাজে
নিজের মুখে চাইতে মরি লাজে।
সে মোর লজ্জা সে মোর অপমান
হয়তো একাই জানেন ভগবান।

যে কথাটী রাখবো বলে রাখতে পারি নাই
ভেঙেছি মোর প্রথম প্রতিজ্ঞাই
তোমার কাছে নয় তা জানি জানি
তুমি কভু বুঝবে না মোর হিয়ার দুঃখখানি
যিনি আমার সবই জানেন—যিনি
গভীর রাতে প্রতিহিয়ার দুখের পথটী চিনি
আসেন কাছে সরে
দেখেন তিনি অন্তরে অন্তরে
অতল তলে থাকি
কি পারিনি কি করিনি কি দিয়েছি ফাঁকি।
কাহার কাছে কত
কি পেয়েছি—ফিরে দেওয়া হয়নি হিসাব মত!

পেয়েছিলাম—ফিরে দেওয়া হয়নি কেন জানো?
বলতে পারি সত্যে যদি সত্য বলে মানো।

আপনি তুমি মোরে
সারা জীবন রাখলে ঘুমের ঘোরে
ইচ্ছা করে পঙ্কে নিলে টানি
ভোলালে মোর গুরুর দেওয়া বাণী
ইচ্ছা করে করলে তুমি হত
আমার মনের পূজার ঘরে আসতো যেতো যত
ভাবরূপের ছায়া
লোকে যেমন ছেলে ভোলায় তেমনি করে দিলে
ঘরের মায়া
সেই যেন মোর সব!
পূজা আমার ভুলে গেলাম—রইল শঙ্খরব,
আলোর ফানুষ রইল ঝুলে নভতলের বুকে
মন্ত্রটুকু রইল আমার মুখে
বিড়ম্বনার মত,
পূজাবেদীর তলে আমার শূন্য শেজ যত
দীপের শিখা রইল তারা ভুলি—
ভুলে গেল আকাশ পানে বাড়াতে অঙ্গুলি
যেথায় আসন তাঁর—
পূজার ঘরে রইল অন্ধকার।
তোমার কাছে শিখেছি মোর প্রথম প্রতারণা
—হারিয়েছি মোর প্রথম আলোর কণা—
তারপরেতে দিনের পরে দিন
কত ভাবেই বেড়েছে মোর ঋণ

কোথায় গেছি চলে !
তুমি তোমার পুতুল খেলার ছলে
সে সব কিছুই দেখলে না'ক ফিরে
দেবতা মোর ছেড়ে গেলেন ভ্রষ্ট এ মন্দিরে !
ভালোই হল সব !

এ জীবনে হল না আর তাঁহার মহোৎসব !
এখন বুঝি এই হয়েছে ভালো
এই যে তুমি আলো

হাসি খেলার বাসর ঘরে স্ফটিক দীপাধার,
এই যে আমি দিয়েছি মোর আত্ম উপহার
সে উৎসবের মূলে
নিত্যকালের চাওয়া পাওয়া সব গিয়েছি ভুলে—
এই হয়েছে ঠিক—
সত্য যখন গেছেই চলে, মিথ্যা বুঝে নিক—
পাওনা দেনা তার—
এম্‌নি ত সংসার !

শ্রীবিভু কীর্ত্তি

রেখা

এম, এ, ওয়াহিদ্

স্বামীর সংসার করি। খাই, দাই, হাসি, খেলি বেড়াই ঘুমুই। যেমন অন্য সব মেয়েরা করে।

সবাই প্রশংসা করে খুব ভাল বউ। তবে একটু অন্য-মনস্ক।

স্বামী খুব ধনী, শিক্ষিত সুপুরুষ। ঠিক্ নারীর যা কাম্য।

স্বামীর ভালবাসা খুব পাই। আমিও প্রাণপণ চেষ্টা করে ভালবাসি। মনে মনে ভাবি এইত আমার কাজ। ওরই পায়ের তলায় আমার চেস্ত।

সব সময় নিজেকে কাজের ভেতর ডুবিয়ে রাখতে চাই। কাজ ছাড়া থাকা যায় না। কাজ করতে করতে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি।

হঠাৎ চমকে উঠে ভাবি। এ কি! পথের চোরা কাঁটার মত। থেকে থেকে বেঁধে আবার খুজে পাই না। এমনি দিন চলে যায়।

সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোককে ঢেকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আকাশের বুকের উপর একটা মেঘের পরদা টানা পড়ে। ঝড় জল এক সাথে মিসে আসে।

জানলা খুলে আকাশের পানে চেয়ে থাকি। মনে পড়ে এমনি ঝড় বাদলে মেসানো একটা রাতে—সে এসে ছিল ঐ আকাশের টানা বিদ্যুতের মত। ক্ষণিকের জন্য—।

স্বামী এসে পিঠে হাত দেয়, ফিরে তার পানে তাকাই। সে হাতের ভেতর একটা গোলাপের তোড়া গুঁজে দেয়।

আনন্দে তার দিকে ঘুরে বসি। তোড়াটা মুখের কাছে তুলে ধরি।

হাতের চুড়ীটার উপর নজর পড়ে। তার দিক্ পানে চেয়ে থাকি। মনে হয়, স্বর্ণকার যেমন এই সোনার বুক কেটে লতা পাতা আঁকে, বিধাতাও তেম্নি মানুষের সুন্দর বুক খানা কেটে কত কি লেখে!

স্বামী কোলের মধ্যে টেনে নেয়। গাল টিপে দিয়ে বলে—নাহার তুমি কি ভাবছ?

বলি ওই ঝড় বৃষ্টির কথা। কত দুঃখিকে ও কষ্ট দিতে এসেছে।

আবার কত অফুরন্ত কথা, কত হাসি।

পুস্তক পরিচয়

ধান ক্ষেত—কবিতা পুস্তক। এন্টিক কাগজে ডিমাই ৯৬ পৃষ্ঠা। দাম এক টাকা। প্রকাশক, এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীর ভাষা, পল্লীর ভাব বোধ হয় কবি জসীমউদ্দীন যতটা আয়ত্ত করিয়াছেন, বাঙলার অন্য কোন কবি ততটা করেন নাই। ইহার লেখার প্রতিছত্রে পল্লীমায়ের সোহাগের নানাচিত্র চক্ষের সম্মুখে ধরা দেয়,—পরিত্যক্ত পল্লীর দৃশ্য ইনি যেখানে যেখানে আঁকিয়াছেন, সেইখানেই গোধূলি বেলার করুণ সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে; পল্লীর খাল, বিল, দাড়িম গাছ, রথযাত্রা—এ সমস্ত প্রসঙ্গে কবি অজস্র রস ও কবিত্বের উৎসের সন্ধান দিয়াছেন। তাহার রচিত 'ধান-খেত' পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মেঠো হাওয়ার উদ্দাম গতি ও পাকা ধানের সুমিষ্ট গন্ধ যেন অনুভব করিতে থাকি।

কখনও কখনও কবি মাঠ ছাড়িয়া পাঠককে একেবারে গাঁয়ের মধ্যে লইয়া যান। তখন আমরা দেখিতে থাকি—

কেউ ব'সে ব'সে বাখারী চাঁচিছে, কেউ পাকাইছে রসি
কেউবা নতুন দোয়াড়ীর গায়ে চাকা বাঁধে কসি কসি।
কেউ তুলিতেছে বাঁশের লাঠিতে চিকণ করিয়া ফুল-
কেউবা গড়িছে সারিন্দা এক কাঠ কেটে নির্ভুল।

অথবা

ছোট গাঁওখানি—ছোট নদী চলে তারি একপাশ দিয়া,
কালোজল তার মাজিয়াছে কেবা কাকের চক্ষু নিয়া।
ঘাটের কেনারে আছে বাঁধা তরী
পারের খবর টানাটানি করি
বিনা সুতী মালা গাঁথিছে নিতুই এপার ওপার দিয়া
বাঁকা ফাঁদ পেতে টানিয়া আনিছে দুইটি তটের হিয়া।

নিত্যদৃষ্ট একান্ত পরিচিত অতি সাধারণ জিনিষের মধ্যে যিনি এরূপ রসের সন্ধান দিতে পারেন, তিনি ভারতীর আপন জন, এই সাধনার মূল্য খুব বেশী।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

অষ্টাদশী—জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত এবং লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, —মূল্য পাঁচ আনা।

আঠারোটি কবিতার সমষ্টি—আঠারো অক্ষরের এবং আঠারো লাইনের কবিতা—নাম অষ্টাদশী। নাম এবং আকারে বইখানি বিশেষত্বপূর্ণ—গোড়ায় প্রেমেন্দ্রের ভূমিকা সেই বিশেষত্বকে আরো বাড়িয়েচে—কেননা প্রেমেন্দ্রের লিখিত ভূমিকা আর কোথাও দেখেচি ব'লে স্মরণ হয় না।

কবিতাগুলি প্রেমের—তরুণ কবি কখনো মানসী প্রিয়ার সঙ্গে মিলনের, কখনো বিরহের উপলব্ধি কবিতার আকারে ব্যক্ত করেচেন। অভিজ্ঞতা নিজস্ব—সুতরাং বর্ণনার মধ্যে কোথাও আড়ষ্টতা কিম্বা faltering নেই। কবি শরীরী প্রেম থেকে সুরু ক'রে অশরীরী প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েচেন, তার পরিচয় নীচের চার লাইনে পাওয়া যায়:—

"তারপর—ধরণীর নবতর সৃষ্টির সময়,
যেদিন পুরাণো সবি মৃত্যু মাঝে মিথ্যা হয়ে যাবে,
সেদিন মোদের প্রেম সত্য হবে নব আবির্ভাবে,
হয় ত আমরা নাই—তবু প্রেম রহিবে অক্ষয়।"

দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বকীয়তা থাকার ফলে কবিতাগুলির একঘেয়েমি দোষ নেই। আঠারো লাইনের সনেটও সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে নতুন।

আমাদের দেশে লাইব্রেরী ইত্যাদিতে দেখেচি কবিতার বই সাধারণতঃ কেনা হয় না—সদস্যেরা কবিতার বই পড়েন না ব'লে। মাত্র পাঁচ আনার পয়সা দাম করায় আশা করি এ বইখানি বিক্রি হইতে বাধা পাবে না।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

পাষাণ পুরী—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত— আর্য্য পাবলিশিং কোং, কলিকাতা—মূল্য দেড় টাকা।

পাষাণ প্রাচীরের বাহিরে যাহারা অবস্থান করে এবং ভিতরে যাহারা বন্দী তাহাদের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য যে

কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করা শক্ত,—কেবল এইটুকুই বলিতে পারি বাহিরের লোকেরা ভাগ্যবান ভিতরের জনসঙ্ঘ দুর্ভাগা। হয়ত ন্যায়বিচার প্রপীড়িত এই হতভাগ্য লোকগুলির মধ্যেই সত্যকার মানুষ ছিল, কিন্তু ভাগ্যবানদের সুখ সুবিধার প্রয়োজনে তাহাদিগকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইয়াছে। সেইজন্যই পাষাণপুরীর কল্পনা ভ্রমাত্মকে, ইহার ধারণা জরাজীর্ণ। বিচারের নামে পৃথিবীতে নিত্যনিয়ত যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহার পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক, মানুষকে সংশোধন করিবার পদ্ধতি এ নয়। "পাষাণ পুরী" পুস্তকে এই কথাটিই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অথচ লেখার গুণে গ্রন্থের শেষাংশে এক স্থান ব্যতীত কোথাও প্রচারকের মূর্ত্তি চোখে পড়িল না এবং এই সুলিখিত পুস্তকখানির কেবলমাত্র সেই স্থলেই রসভঙ্গের পরিচয় পাওয়া গেল। লেখক যাহা বলিতেছেন তাহা যে তিনি জানেন এবং ভালো করিয়াই জানেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার সমবেদনা যে কত প্রচুর তাহাও এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে সুপরিস্ফুট। এত সহানুভূতি সত্ত্বেও "পাষাণ পুরী"কে সাহিত্য পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁহার অঙ্কিত প্রতি চরিত্রটি সজীব, তাঁহার বলিবার ভঙ্গী অভিনব, ভাষা উজ্জ্বল। পরিশেষে, বইখানি ভালো লাগিয়াছে বলিয়াই কোন কোনও পরিচ্ছেদ এবং অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে তাহার মধ্যে অনাবশ্যক নাটকীয়তার প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। কয়েকটি অনুপেক্ষণীয় ছাপার ভুলও পুস্তকের সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছে।

শ্রীআশীষ গুপ্ত

মুসাফির—(কবিতার বই) লেখক শ্রীদিলীপকুমার দাশগুপ্ত। প্রকাশক লেখ্য-বাসর, ৩৮।১, ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বইখানির ছাপা, মলাট...ইত্যাদি মন্দ নহে, তবে বইয়ের মধ্যে কবির ফটো দেওয়া সুরুচির পরিচয় হয় নাই। মলাটে...প্রকাশকের তরফ হইতে বলা হইয়াছে, "ইহার বৈশিষ্ট যে লিখন-ভঙ্গী সাবলীল ছন্দোবদ্ধ ও নির্ভিকতার পরিচায়ক। স্থানে স্থানে অর্থহীনরূপেও একটা সহজ গতির প্রবর্ত্তক তাই ইহার সৃষ্টির সাথে ভাবী সাহিত্যিক ও কবির আসন অক্ষুণ্ণ অম্লান অথচ বৈচিত্রময় হইবে জানিয়াই 'লেখ্য-বাসর' ইহার লেখাই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত করিয়াছে।" কবির বয়স অল্প;—আশা করি হাত পাকিবার সঙ্গে সঙ্গে "অর্থহীনতা" দূর হইয়া সুস্পষ্ট অর্থ দেখা দিবে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

রাজা গণেশ—(ঐতিহাসিক নাটক) লেখক শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক শ্রীবিমলেন্দুকুমার মৈত্র, বিজয়া সাহিত্য মন্দির কাশীধাম ও রাজসাহী।

বাংলা নাট্য সাহিত্য নানাকারণে ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই, রঙ্গমঞ্চে ভাল নাটকের চাহিদাও নাই। তাহার কারণ সাধারণ দর্শকেরা সূক্ষ্ম এবং মার্জ্জিত রস গ্রহণ করিতে এখনো সক্ষম হন নাই। লেখকগণকেও অনেক সময় দর্শকের প্রশংসাসূচক করতালি লাভের জন্য 'খেলোমি' ও 'ন্যাকামিকে বীরত্ব ও রসের নামে চালাইতে হয়—এবং হাস্যরসের অবতারণা করিতে গিয়া 'ভাঁড়ামি'র আশ্রয় লইতে হয়। আলোচ্য নাটকখানিতেও এই সকল ত্রুটি দেখা গেল।

ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ঘটনা হইতে চরিত্র লইয়া নাটক রচনার রীতি বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রারম্ভ হইতে চলিয়া আসিতেছে। লেখক যে বাংলার ঐতিহাসিক উপাদানকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ইহা প্রশংসার বিষয়। নাটকের আরম্ভটা ভালই হইয়াছে কিন্তু পরে যাইয়া অনেক স্থলে জমাট ভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অল্প পরিসরের ভিতর ঘটনার গতি এরূপ সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে তাহা নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া মনে হয়।

"আমার বক্ষস্থলকে কিছুমাত্র স্ফীত কর্‌ছে না", "যাঁদের স্তনের দুধে এদের শরীরের রক্তরাশি গড়ে উঠেছে" প্রভৃতি অনেক কথা বাংলা 'ইডিয়মের' অনুবর্ত্তী হয় নাই বলিয়া মনে হইল।

বাংলার অতীত বীরত্বের কাহিনী বর্ত্তমান বাঙালীদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার প্রয়োজন আছে—এইজন্য, ত্রুটি সত্ত্বেও, নাটকখানির জনপ্রিয়তা আমরা কামনা করি।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

নারী হরণের প্রতিকার—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ছহানিয়া গ্রাম, ছয়ারা বাজার পোঃ আঃ, শ্রীহট্ট জেলা হইতে প্রকাশিত।

বাংলায় নারী হরণের অত্যন্ত সংখ্যাধিক্য বাঙালীর পক্ষে গভীর লজ্জার কথা হইয়া পড়িয়াছে, এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা কি করিয়া করা যায় তাহা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ইহার প্রতিকারের অনেক কার্য্যকরী পরামর্শ গ্রন্থকার দিয়াছেন। সাহস এবং বীরত্বের দ্বারা দুর্বৃত্তদের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে ইহার বহু দৃষ্টান্ত দিয়া লেখক পাঠকদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছেন। লেখকের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তকখানির বহুল প্রচারে বাঙালীরা বিশেষ লাভবান হইবেন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভোরের সানাই—আজিজুল হাকিম প্রণীত। ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এই কবিতার বইখানি আমি মন দিয়া পড়িয়াছি ও পড়িয়া আমার বেশ ভালো লাগিয়াছে। বাহিরে যেমন সুন্দর পরিপাটী বাঁধাই, ভিতরেও তেমনি সব সুন্দর সুমধুর কবিতা। পুস্তকের অন্তর্গত "আশীর্ব্বাণী" অংশে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "তোমার কবিতা আমার ভালো লেগেছে," প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দবাবু বলিয়াছেন "বাস্তবিকই আমি মুগ্ধ হইয়াছি"; নজরুল ইস্‌লাম বলিয়াছেন, "ছন্দ ও ভাষা দুই ঘোড়াকেই তুমি বেশ আয়ত্ত করেছ"; চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন "কবিতাগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে; কবির ভাষার উপর দখল জন্মেছে।" অবশ্য আমার ভালো লাগাটা এই সকল সাহিত্যিকদের ভালো লাগার জন্য নহে। সত্যিই কবিতাগুলি পড়িয়া আমার ভালো লাগিয়াছে। নূতন লেখকের নূতন উদ্যম হইলেও কবিতাগুলির মধ্যে আছে সত্যিকারের প্রাণের স্পর্শ কল্পনাকাতর অনুভূতির সুস্নিগ্ধ আমেজ, অনির্ব্বাণ স্বপ্নলোকের অপূর্ব্ব ছায়াপাত, অকৃপণ আত্মপ্রকাশের সাবলীল সহজ প্রচেষ্টা, আর আছে তরুণ কবির ব্যর্থ প্রণয়ের ভাবালুতা ও ভাবের লীলাবিলাস। সুদূরিকা, পথিকবন্ধু, ক্ষণিকা, মায়াবিনী কবিতাগুলির মধ্যে প্রেমসমাহিত ও প্রণয়ব্যর্থ চিত্তের যে ছায়াপাত পাই তা সত্যিকারের কাব্যোচ্ছ্বাস। 'মায়াবিনী' কবিতাটী পড়িলেই বোঝা যায় লেখক লিখিতে বসিয়া মনকে কেমন অপ্রতিহত অবারিত গতিতে ছাড়িয়া দিতে পারেন।

ওগো মায়াবিনি,—
এ অনন্ত ধরাতলে আমি একা শুধু
সব চেয়ে বেশী ক'রে চিনি তোমা চিনি ॥
মোর চেয়ে বেশী ক'রে ওই মুখ ওই সে নয়ন
কোন দিন কেহ সখি ক'রে নি লোকন।
মোর চোখে তুমি প্রিয়া কত যে সুন্দর
অন্যে কি বুঝিবে তাহা? এযে গো স্বপন!
তোমা হেরি' অন্তরের উন্মুক্ত প্রান্তরে
এ জীবন ভ'রে
কত আশা-বীজ আমি করেছি বপন।...
কেন এলে তুমি, মোর জীবনের পথে—
তব স্বর্ণ রথে?
আজিকে জিজ্ঞাসি তোমা বলতো পাষাণী,
অন্যে সবে ভুলি, কেন তোমারে ভুলি নি।
তোমারে ভুলিনি শুধু ওগো সুদূরিকা,
আজো অঙ্গে প্রতি অঙ্গে তব স্পর্শ শিখা।
সকাল সন্ধ্যার বায়ে আজো কাঁপি মরে
ওই মুখ ওই বুক ও অধর পরশন তরে
চুম্বন-পিয়াসী ওষ্ঠ মোর।
নিশি জাগি তোমার চাহনি আঁকি তারায় তারায়,
বাহুর স্বপন মম শিথানে হারায়
তোমারে জড়াতে গিয়া,
ওগো নিঠুরিয়া
ও তনু তনিমা
ওই মুখ ওই চোখ ওই তব কপোল শোণিকা

ছন্দের ও সুরের ত্রুটী থাকিলেও কবিতাগুলি শ্রীহীন নয়। প্রেমময়ী প্রাণময়ী নারী যখন নিঠুরা হইয়া ওঠে তখনি জীবনলোক হইয়া ওঠে স্বপ্নলোক, সামান্য হইয়া ওঠে

অসামান্ত, মনের সঙ্কীর্ণতা তখন সুরের পরিব্যাপ্তিতে ছড়াইয়া পড়ে। ভাবকে অপ্রতিহত গতিতে ছুড়িয়া দিলেও তাহার উপর সংযম রাখা আবশ্যক, নচেৎ কবিতা হইয়া ওঠে অশ্লীল, ভাব হইয়া ওঠে পঙ্গু ব্যর্থ ও শ্রীহীন।

তারপর দু'জনেই আত্মহারা দু'জনার তরে
কালসিন্ধু তরঙ্গের পরে।
মোহমত্ত দু'জনার দৌরাত্ম্যের নিশ্চেষ্ট উত্তমে
শক্তির অমৃতখনি ছিল গুপ্ত মোর আত্মসংযমে,
নষ্ট হ'ল ক্রমে তাহা ; দু'জনারে পাইল সয়তান ;
আমি হাসি' হেরি তা বিস্ফুরিত নয়নের বাণ,
কাম-মুহ্যমান।
স্বাস্থ্যহারা পঙ্গু মোরে করি সর্ব্ব-পর
হ'ল মনান্তর।

যেমন প্রকৃতিরাজ্যে তেমনি জীবন ক্ষেত্রে—শুধু প্রাণের লীলা হইলে চলে না, চাই তার সঙ্গে নিষ্ঠা ধর্ম্ম ও আচার, তাহা না হইলে আত্মপরতা হইয়া ওঠে আত্ম-তাড়না। কাব্যজগতেও তাই ; ভাব কবিতার প্রাণ, ভাষার সংযম তার নিষ্ঠা, কথা তার অলঙ্কার, রুচিজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধ তার আত্মসম্পদ। তাই কীটস্ গাহিয়াছিলেন' A thing of beauty is a joy for ever ; যাহা নির্লজ্জ অনাবৃত, বাধাবন্ধহীন, বিধিনিষেধমুক্ত তাহা কখনো সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে ; কাব্যজগতে তাহা অশ্লীল।

এই সকল ত্রুটী তরুণ লেখকের অবশ্যম্ভাবী। আশা করি ভবিষ্যতে লেখকের হাতে বাস্তবের রূঢ় ছবি সংযমের শালীন স্পর্শে নমনীয় ও কমনীয় হইয়া উঠিবে। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে, ভাবের মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে, কথার মধ্যে প্রাণ আছে, অনুপ্রেরণার মধ্যে সহানুভূতির সমারোহ আছে। যাঁহারা রস-পিয়াসী, সত্যিকারের প্রতিভা-অনুসন্ধানী, কাব্যপ্রিয় তাঁহারা এই কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

দাত্রী : হাসিরাশি দেবী ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতী জি, এম, পাবলিশিং হাউস্ ২১নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা দাম দুই টাকা।

দুইজন লেখিকার লেখা উপন্যাস। দুই জনের আলাদা রচনা স্পষ্ট ধরা যায়। প্রথম একাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত লেখা নীরস,—ঘটনাগুলি বুঝিয়া গেলেও মনে কোনও ছবি ফুটিয়া ওঠে না। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের ব্যর্থ অনুকরণ বড় পীড়া দেয়,—এমন কি কথোপকথনের ভঙ্গী দু-এক জায়গায় হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু দ্বাদশ পরিচ্ছেদ-হইতে বইয়ের ভঙ্গী বদল হইয়াছে, এবং তারপর বাকী সবটা বেশ ভাল। সাবিত্রীর চরিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে,—যদিও কোথাও কোথাও তাতে পল্লীসমাজের রমার ছাপ আসে। কিন্তু তাহা দোষাবহ মনে হয় না। প্রকাশকের দুটী কথা হইতে জানা যায় যে বইয়ের চরিত্রগুলি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় বলিয়াই পরের দিকটা লেখা হইয়াছিল। কিন্তু তবু বইটা পড়িয়া মনে হয় একটু বেশি তাড়াতাড়ি শেষ করা হইয়াছে। সুমিত্রার বিদ্রোহের পরিণতিটা (আত্মহত্যা) কারুণ্য উদ্রেকের জন্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু সহসা তার পতিভক্তি ফিরিয়া আসাটা খাপছাড়া মনে হয়। এসব সত্ত্বেও প্রভাবতী দেবীর লেখা অংশ বেশ উপভোগ্য।

শ্রীসুবোধ বসু

চার্ব্বাক : নাট্য-কাব্য। শ্রীমতিলাল দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস, বালিখোলা-খালিস্পুর পোঃ খুলনা মূল্য আট আনা।

এই নাট্য-কাব্যে নিরীশ্বরবাদী চার্ব্বাকের চরিত্র চিত্রণ করা হইয়াছে। চার্ব্বাকের যুক্তিবাদ বর্ত্তমান শতাব্দীর মানুষের মনকে দোলা দেয়। চার্ব্বাকের নির্ভীকতা ও যুক্তিতে নিষ্ঠা এই পুস্তকে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। সহজ ও সুন্দর অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বইটীর মলাটের পারিপাট্যের অভাব ও কাগজের দীনতা সত্ত্বেও ইহা একান্ত সুখপাঠ্য।

শ্রীসুবোধ বসু

অর্চ্চনা : শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীকেশবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শোলনা—বরিশাল। মূল্য তিন আনা।

গ্রন্থকারের প্রথম প্রচেষ্টা। অধিকাংশই কণিকা শ্রেণীর কবিতা।

শ্রীসুবোধ বসু

নানা কথা

নিখিল ভারত কৃষি শিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনী

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিডন্ স্কোয়ারে যে কৃষি, শিল্প ও চারুকলা-প্রদর্শনী খোলা হ'য়েছে, তার বিভিন্ন বিভাগ ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের কর্ত্তব্য মনে করি। আমরা প্রায়ই প্রদর্শনীতে গিয়ে অপরাহ্ণের কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসি, এবং কোনোদিনই মনে হয় না,—প্রদর্শনীটা দেখা হোলো, এখানে আর আস্‌বার প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে প্রস্তুত নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও শিল্প দ্রব্যের সম্ভার দেখ্‌লে মন প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে, যদিচ একথা বিস্মৃত হ'লে চল্‌বে না, যে এসব দিকে অনেকখানি পথ এখনো আমাদের অনধিকৃত রয়েছে।

আমরা দেখে সুখী হ'লাম, যে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা কুটির-শিল্প ও যন্ত্র-শিল্প দুদিকেই তাঁদের দৃষ্টি দিয়েছেন। কুটির শিল্পের পুনরুদ্ধার দেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন; অল্প মূলধনের অধিকারী অনেক যুবকের জীবিকার সংস্থান কুটির-শিল্পের দ্বারা সম্ভব, এবং তার ফলে দেশের বেকার-সমস্যার সমাধান কিয়দংশে হ'তে পারে। অপরপক্ষে যন্ত্র-শিল্পও অবজ্ঞের নয়,—যতই-না-কেন সারা বিশ্বব্যাপী বেকার-সমস্যার জন্য যন্ত্রকে দায়ী করা যা'ক। যন্ত্রের আমদানি করে বিজ্ঞান জগৎকে ও মানুষকে,—মানুষের জীবন-যাত্রার প্রণালীকে ও জীবনের পরিপ্রেক্ষণাকে এমনভাবে আমূল বদ্‌লিয়ে দিয়েছে যে এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারলে কোনো জাতিরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। যন্ত্রকে যতই গালি পাড়ি না কেন, তার প্রদত্ত সুখ-সুবিধাগুলোও নিতে ছাড়ি নে। এ কথা ঠিক, যন্ত্র এসেছে যখন, তখন যাবার জন্য আসে নি,—একটা মৌরসী বন্দোবস্ত করে নিয়েই এসেছে। অতএব প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা যন্ত্রের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন। এই সম্পর্কে প্রদর্শনীর শ্রম-বিভাগের কর্ম্ম-সচিব ডাক্তার শ্রীযুক্ত কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

কৃষি-বিভাগ ও স্বাস্থ্য-বিভাগের আয়োজন চমৎকার হ'য়েছে। কৃষি-বিভাগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে জাত নানাবিধ শস্যের নমুনা আমদানি করা হ'য়েছে,—এবং সুখের বিষয় কৃষি-বিভাগের আয়োজনে বাঙ্‌লার রাজ-সরকারের যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছে। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত এন্-সি-চৌধুরী বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। স্বাস্থ্য-বিভাগের আয়োজন করেছেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র। ভারতবর্ষের যেখানে যা-কিছু মানব-জীবন-রক্ষা-প্রণালীর আবিষ্কার ও উদ্ভব হ'য়েছে,—সে-সমস্তই দেখানোর ও ব্যাখ্যা করার যে ব্যবস্থা হ'য়েছে তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শিক্ষোপযোগী।

চিত্র-শিল্প বিভাগে ক্লান্ত দর্শকের নয়ন ও মনোরঞ্জনের যে আয়োজন আছে,—তার শতমুখে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। এর জন্য শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মল গুহ সৌন্দর্য্য-পিপাসু দর্শকবৃন্দের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কম-বেশি প্রায় পাঁচশ' চিত্র দেখলাম। আমাদের চিত্র-শিল্পের যে দ্রুত উন্নতি হ'চ্চে তার বেশ পরিচয় পাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, নির্ম্মল গুহ, বিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিরঞ্জন সাহা, অসিত রায়, যামিনী রায়, রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মণীন্দ্র গুপ্ত, কালিদাস কর, শ্রীধর মহাপাত্র, শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরী, যমুনা বসু, প্রতিভা চৌধুরী, সুধা দাশগুপ্ত, অনুকণা দাশগুপ্ত প্রভৃতি,—আরো অনেকের (সকলের নাম করা এখানে সম্ভব হোলো না)

তুলিকায় রেখা ও রঙের সমাবেশে মানব-জীবন ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে সমস্ত বিচিত্র আলেখ্য অঙ্কিত হ'য়েছে,—তা দেখ্‌তে আরম্ভ করলে এমনই মুগ্ধ হতে হয়, যে কয়েক ঘণ্টা সময় কেটে যায় বিনা-অনুভবেই। সে-সব চিত্রের এমন কি সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও এখানে সম্ভবপর নয়। "বিচিত্রা"র পাঠক-পাঠিকারা বিচিত্রার চিত্রশালায় এই সব চিত্রশিল্পীর ও তাঁদের চিত্রের কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছেন।

পাঠাগার ও পত্রিকা-বিভাগ এই প্রদর্শনীর একটি বিশেষত্ব। এই বিভাগে বিশেষ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ভারত-বর্ষের সমস্ত প্রদেশ সায় বর্ম্মা ও সিংহল থেকে প্রকাশিত সকল রকমের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা সংগ্রহ করা হ'য়েছে। উদ্দেশ্য,—কেমন করে সকলের অলক্ষ্যে সাময়িক সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নানা বিষয়ে জনমতের সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তন হ'চ্চে,—নিত্য-গতিশীল জাতীয় মনের ধারা কেমন করে একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'চ্চে,—তারই দিকে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই উদ্দেশ্যে পুরুষ ও মহিলাদের পাঠের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে। সাময়িক পত্রিকাগুলি যে জাতীয় উন্নতির বেগকে অনেকখানি গতিদান করে, এবং সে-জন্য জাতীয় উন্নতির জন্য সাময়িক পত্রিকাগুলির উন্নতির ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন,—এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার এই প্রচেষ্টা যেমনই নূতন,—তেমনই প্রশংসনীয়। এই বিভাগের কর্ম্ম-সচিব শ্রীমান্ শৈবাল দত্ত একজন তরুণ ছাত্র। তাঁর উদ্যম, অধ্যবসায়, শিক্ষা ও চিত্তের উৎকর্ষের প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। তিনি জীবনের সর্ব্বকর্ম্মে জয়লাভ করুন,—আমরা এই কামনা করি।

আমোদ-প্রমোদ বিভাগের আয়োজনও এমনভাবে করা হ'য়েছে,—যাতে নির্দ্দোষ আমোদের সঙ্গে সঙ্গে লোক-শিক্ষাও হয়। এক কথায় এই প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করেছেন যাঁরা,—তাঁরা দেশের ও দেশের অধিবাসীদের কল্যাণ সম্বন্ধে গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে চিন্তা করেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা যে সার্থক হ'বে সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের দলে দলে এবং বারে বারে এই প্রদর্শনীতে যাবার জন্য অনুরোধ করি।

বাঙলার বিশুষ্ক নদ-নদীর পুনরুদ্ধার

বাঙলা দেশ যে এক সময়ে নদীমাতৃক দেশ ব'লে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল, প্রধানত তার দুটো কারণ নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমত, দেশে নদীর সংখ্যাধিক্য এবং অনুকূল অবস্থান বশত কৃষিকার্য্যের জন্য নদীর জলই ছিল যথেষ্ট,—খাল কেটে দিকে দিকে জল টেনে নিয়ে যাবার তেমন প্রয়োজন ছিল না; এবং দ্বিতীয়ত, সমস্ত ভূখণ্ডের জল নিকাশ ঐ নদী গুলির দ্বারা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অতি সহজ ভাবে সম্পন্ন হ'ত ব'লে বর্ষার জল দেশকে ধৌত করে পরিষ্কৃতই করত,—এখনকার মত স্থানে স্থানে আটকে গিয়ে দেশের আবহাওয়াকে দূষিত করত না। এখন কিন্তু সে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ১৭৮৭ সালের প্রবল বন্যার ফলে ত্রিস্রোতা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি কয়েকটা নদীর গতিপথ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই পরিবর্ত্তন প্রথম আরম্ভ হয়; তার পর ক্রমশঃ বন্যা প্রভৃতি নানা কারণে পলি প'ড়ে প'ড়ে অনেক নদী ম'জে গেছে, অথবা ম'জে আস্‌ছে। তার ফলে দেশে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি এবং স্থিতি হয়েচে। ১৭৮৭ সালের পূর্ব্বে যেমন ছিল, কতকটা সেই ভাবে দেশের নদী এবং জলপথগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে দেশের জলসেচনের এবং জল নিকাশের অবস্থার উন্নতি হবে না এবং ফলে দেশ উত্তরোত্তর অধিকতর অনুর্ব্বর এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠ্‌বে। কি ক'রে এই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে তা নির্ণয় করবার জন্যে ঈজিপ্ট থেকে বিশ্ববিখ্যাত ইরিগেশন্ এক্সপার্ট স্যর উইলিয়ম বেণ্টলীকে (এখন পরলোকগত) আনান হয়, এবং তিনি বাঙলা দেশের নদ-নদীর অবস্থা পরীক্ষণ করে দেশের জল-সঙ্কট মোচন করবার জন্য একটি উপায় (Scheme) উদ্ভাবন করেন। উপায়টি কার্য্যে পরিণত করবার এষ্টিমেট হয় পাঁচ কোটি টাকা। উপায়টীর সাফল্যের বিষয়ে স্যর উইলিয়াম বেণ্ট্‌লী প্রতিশ্রুতি দান করলেও গভর্ণমেণ্ট কিন্তু সে বিষয়ে আস্থাবান হ'তে পারেন নি এবং শেষ পর্য্যন্ত স্যর উইলিয়মের প্রস্তাবটি

পরিত্যক্ত হয়। তারপর দীর্ঘকাল এ বিষয়ে বিশেষ কিছু কার্য্যকলাপ হয় নি। সম্প্রতি বেঙ্গল লেজিস্লেটীভ্ কাউন্সিলের অধিবেশনে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু অবজ্ঞাত বিষয়টির পুনরুত্থান ক'রে প্রস্তাব করেন যে, পাঁচ কোটি টাকার একটি ঋণ খাড়া ক'রে স্যর উইলিয়ম বেণ্ট্‌লীর উপায়টি কার্য্যে পরিণত করা হো'ক। দুঃখের বিষয় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নি।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে গবর্ণমেণ্টের নিজ তহবিল থেকে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভবপর নয় তা নিশ্চয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করলে এই টাকার ঋণ তুলতে পারেন তা-ও নিঃসন্দেহ। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, এত বড় একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য পাঁচ কোটি টাকা যথেষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ হবে না,—কিন্তু তা হ'লে গবর্ণমেণ্ট্ পক্ষ থেকে একটা এষ্টিমেট্ প্রস্তুত ক'রে প্রয়োজনীয় অর্থের যথার্থ তায়দাদ নির্ণয় করা এবং সেই অর্থের ঋণ তোলা উচিত। বিগত ১৯৩১ সালের ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় যে সম্পত্তি নাশ হয়েছিল তার মূল্য ৮ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকা! সুতরাং, যে উপায় অবলম্বন করলে এমন-সব বন্যার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে, দেশের জল-সেচন সহজ হবে এবং ম্যালেরিয়াদি রোগ থেকে দেশ মুক্ত হবে, তার জন্য পাঁচ কোটির অধিক টাকা ব্যয় করতে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নয়। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট্ এই অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়টিতে অবিলম্বে মনঃসংযোগ ক'রে এ বিষয়ের প্রতিকার করতে যত্নবান হবেন। 'A stitch in time saves nine'—এই নীতিবাক্যটি অবহেলা করার ফলে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েচে এখনি তার মূলোচ্ছেদ না করলে তার কলেবর দিনে দিনে বর্দ্ধিতই হবে।

বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক নারীরক্ষা সম্মিলনী

বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে নারী-নির্য্যাতন এমনই অসম্ভব আকার ধারণ করেছে,—যে এর প্রতিকারের জন্য সমস্ত জাতির একটা সম্মিলিত শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। সেই কারণে আমরা শুনে সুখী হ'লাম যে আগামী ইষ্টারের ছুটিতে কলিকাতায় "বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক নারীরক্ষা সম্মিলনী" নামে একটি বিরাট সভার আয়োজন করা হ'য়েছে। উদ্দেশ্য, দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই দুর্নীতি নিবারণের জন্য নিযুক্ত আছে, তাদের মধ্যে একটা যোগস্থাপন ও তাদের সকলের একযোগে কার্য্য করার কোনো প্রণালীর উদ্ভাবন ও অবলম্বন।

এই সম্মিলনীর সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন,—শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী,—কর্ম্ম-সচিব শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও-জি-এ; ও-এস্-এম্ (লণ্ডন) এবং কোষাধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়।

সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে নারীরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট আমরা এই অনুরোধ জানাচ্ছি, যে তাঁরা যেন অবিলম্বে নিজ নিজ প্রতিনিধিগণের নাম এবং প্রতিনিধির দেয় চাঁদা ১৲ সম্মিলনীর কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট ১৩নং আপার সার্কুলার রোড,—এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। এবং যাঁরা সম্মিলনীতে কোনো প্রস্তাব পেশ করতে ইচ্ছা করেন,—তাঁরা যেন ঐ প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপি সম্মিলনীর কর্ম্ম-সচিব শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট উক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের দেয় চাঁদা ২৲। আমরা আমাদের পাঠকপাঠিকাগণকে অভ্যর্থনা সমিতিতে যোগদান করতে অনুরোধ করি।

স্বামী শিবানন্দ

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় সময় বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী শিবানন্দজীর দেহাবসান হয়েছে। তাঁর তিরোধানে দেশের ও বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনের অশেষ ক্ষতি হলো। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হোয়েছিল আশিরও বেশি। তিনি ছিলেন পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে প্রাচীনতম,—স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষাও কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ।

স্বামী শিবানন্দের প্রাগ্-দীক্ষা কালের নাম ছিল তারকনাথ ঘোষাল। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারাসতের

বিখ্যাত ঘোষাল পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশবেই তাঁর ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। অল্প বয়সেই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের অনুপ্রাণনায় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি কাটিয়ে দিতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একজন বন্ধুর নিকট তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমাধি-অবস্থা সম্বন্ধে অনেক অপূর্ব্ব গল্প শুনে তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা মনের মধ্যে পোষণ করেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে দীক্ষালাভের সুযোগ হয়েছিল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ থেকে তাঁর মন ক্রমশঃই দূরে সরে আস্‌ছিল।

পরমহংসদেবের দীক্ষায় স্বামী শিবানন্দের মন অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হ'য়ে উঠল। প্রথম দর্শনেই পরমহংসদেব তাঁর ধর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিবাহ করা সত্ত্বেও সংসারের প্রতি আর তাঁর কোনো আকর্ষণই রইল না, ঠিক এমনি সময়ে স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায় তাঁর সংসারত্যাগের পথ সুগম হল।

১৯২২ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর তিরোধানের পর হ'তে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তিনিই ছিলেন কর্ণধার। আমরা তাঁর শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর নিদারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলন

তালতলা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের অনুরোধে নিম্নলিখিত আবেদনটি পাঠকবর্গের নিকট পেশ করা গেল—

"আগামী গুড-ফ্রাইডের অবকাশে (২৯শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা হইতে) তালতলা পাব্‌লিক্ লাইব্রেরীর উদ্যোগে কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার মহাশয় এই সম্মিলনের মূল সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শাখা সভাপতিগণের নাম নিম্নে বিজ্ঞাপিত হইল।

(ক) সাহিত্য-শাখা—সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে।

(খ) বিজ্ঞান-শাখা—সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র।

(গ) বৃহত্তর বঙ্গ শাখা—সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(ঘ) ইতিহাস শাখা—সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন।

(ঙ) বাংলা ভাষা ও মুস্‌লিম সাহিত্য-শাখা—সভাপতি শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর।

(চ) ধনবিজ্ঞান শাখা—সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার।

(ছ) চারুকলা ও লোকসাহিত্য শাখা—সভাপতি শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন।

(জ) শিশু সাহিত্য ও মহিলা শাখা—সভানেত্রী শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক।

(ঝ) গ্রন্থাগার আন্দোলন শাখা—সভাপতি শ্রীযুক্ত কে, এম, আশাদুল্লা।

সকল সাহিত্যিক মহোদয়গণের উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নয়। আমরা সকল সাহিত্যিককেই এই সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। আশা করি, সুধীবৃন্দ বিভিন্ন শাখার প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া সম্মিলনের পূর্ণতা সাধনে আমাদের সাহায্য করিবেন।

প্রবন্ধাদি তালতলা পাব্‌লিক্ লাইব্রেরীর সম্পাদকের নামে ২০শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

তালতলা পাব্‌লিক লাইব্রেরী মন্দিরে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ৮৷৷ ঘটিকার মধ্যে শুভাগমন করিলে, সাহিত্য সম্মিলনের সকল তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের ন্যূনপক্ষে দুই টাকা চাঁদা ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহারা অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা দুই টাকা চাঁদা তালতলা পাব্‌লিক্ লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট ১৫ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।"

১২ নং নিয়োগী পুকুর লেন,
তালতলা, কলিকাতা
১লা মার্চ্চ, ১৯৩৪।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র নিয়োগী,
সম্পাদক,
তালতলা পাব্‌লিক লাইব্রেরী।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওর্যান্সের সিলভার জুবিলী

বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার, কলিকাতা টাউন হলে সমারোহের সহিত হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওর্যান্স সোসাইটির সিলভার জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই উৎসবে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। সোসাইটির পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে এই উৎসবের ব্যবস্থা। সম্পূর্ণ বাঙালী কর্তৃক পরিচালিত বাঙলার এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য-উৎসবে যোগদান ক'রে আমরা সেদিন সগর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেছিলাম। ব্যবসা-জগতে বাঙালীর স্থান অবনত, কিন্তু 'হিন্দুস্থান' বাঙালীর সেই অবনত আসনকে অনেকখানি
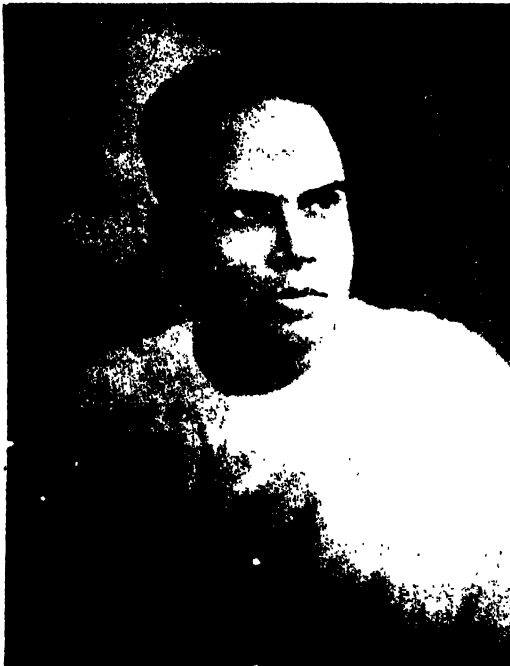
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

উর্দ্ধে তুলে দিয়েছেন। সোসাইটির জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের মত উপযুক্ত বাঙালীর নেতৃত্বে যে-কোনো কারবার যে সাফল্যের শীর্ষদেশে উপনীত হ'তে পারে, এ বিশ্বাস আমাদের হয়েচে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রতিষ্ঠানটির কল্যান কামনা করি,—এবং অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন যে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন সেজন্য তাঁকে অভিনন্দিত করি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণে এই প্রতিষ্ঠানটীর জন্ম-ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যে কাহিনীটুকু বলেছিলেন তা কৌতূহলোদ্দীপক এবং তৃপ্তিপ্রদ। বর্ত্তমানের এই বিশাল মহীরুহের বীজ রোপনের দিনে কবি স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ এবং জলসেচন করেছিলেন এবং পরে কোনোদিনই তাকে স্নেহ এবং সহানুভূতির বর্ষণ থেকে বঞ্চিত করেন নি।

কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়

কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় কলিকাতার সুবিখ্যাত এস্রার বাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশ বর্ষীয়া পৌত্রী। পিতামহের শিক্ষায় এবং যত্নে এই অল্প বয়সেই ইনি কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীতে এমন পারদর্শিতা লাভ করেছেন যে, শুধু বাঙলা দেশেই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের সঙ্গীত জগতে ইনি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এলাহাবাদ, কানপুর, মথুরা, আগ্রা প্রভৃতি বহু স্থানের সঙ্গীত-কন্‌ফারেন্সে, এবং স্বতন্ত্র ভাবে বহু সঙ্গীতজ্ঞের দ্বারা ইনি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকে পুরস্কৃত হয়েছেন, তন্মধ্যে কলিকাতার মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্ল্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্নৌ সঙ্গীত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ রতন ঝঙ্কর এবং মথুরার গায়কচূড়ামণি শ্রীযুক্ত চন্দন চৌবের নামোল্লেখই যথেষ্ট। চৌবেজিকে গান অথবা যন্ত্রসঙ্গীত শুনিয়ে সন্তুষ্ট করা কঠিন ব্যাপার, এবং ততোধিক কঠিন তাঁর নিকট থেকে উক্ত উপায়ে পদক অর্জ্জন করা। সে সৌভাগ্য অধিক সঙ্গীতজ্ঞের অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত ঘটে নি। কুমারী বীণাপাণির পক্ষে এ কম গৌরবের কথা নয়।

হারমোনিয়ম বাদনে কুমারী বীণাপাণির দক্ষতা আশ্চর্য্যজনক। ওস্তাদমহলে হারমোনিয়ম সাধারণত অবজ্ঞাত যন্ত্র,—কিন্তু কুমারী বীণাপাণির হস্তে হারমোনিয়ম

ওস্তাদগণকেও মুগ্ধ করে। খেয়ালাদি উচ্চ-শ্রেণীর কণ্ঠ-সঙ্গীতেও বীণাপাণির অধিকার অসামান্য। সাধনা বজায় রেখে চল্‌লে কালে সঙ্গীতবিদ্যায় ইনি শীর্ষস্তর অধিকার করবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সম্মুখে কৌমার্য্যের সীমান্ত-রেখা বর্ত্তমান, তার ওপারে কি আছে তা অনিশ্চিত।

কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়

পিতৃকুলের অনুকূল আবহাওয়ায় সঙ্গীতের যে ব্রততী পত্রে-পুষ্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, শ্বশুরকুলের খর রৌদ্রে তা শুকিয়ে গেছে এমন ঘটনা বিরল নয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি বীণাপাণির ক্ষেত্রে যেন সেরূপ ক্ষোভের কারণ কখনো উপস্থিত না হয়।

শ্রীমতী জাহান্ আরা বেগম চৌধুরীঃ শিল্প-প্রতিভা

বিগত ফরিদপুর প্রদর্শনীতে শিল্প বিভাগের প্রতিযোগিতা শ্রীমতী জাহান্ আরা বেগম চৌধুরী চারটী স্বতন্ত্র বিষ

শ্রীমতী জাহান্ আরা বেগম চৌধুরী

শ্রীমতী জাহান্ আরা বেগম চৌধুরীর শিল্পকার্য্য

(Embroidery, Stencil, Cross work, Bead work) প্রথমস্থান অধিকার করে চারটি পদক লাভ করেছেন। অধিকন্তু তিনি একটি বিশেষ পদকও পেয়েছেন। এরূপ অসাধারণ সাফল্য প্রতিভার পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই। আমরা এখানে শ্রীমতী জাহান্ আরা রচিত তিনটি শিল্পকার্য্যের প্রতিলিপি দিলাম—তা, থেকে পাঠকগণ শিল্প সৌষ্ঠবের মাত্রা বুঝতে পারবেন।

শ্রীমতী জাহান আরা বেগম চৌধুরীর শিল্পকার্য্য

শ্রীমতী জাহান্ আরা বেগম চৌধুরীর শিল্পকার্য্য

সাঁতার

সাঁতার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শান্তি পালের যে প্রবন্ধগুলি আমরা প্রকাশ করেছি, তাহাতে প্রকাশিত একটি কথার প্রতিবাদ করেছেন "ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশনে"র সভ্য শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। প্রতিবাদটি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এইখানে মুদ্রিত করে দেওয়া গেল :—

মাননীয় "বিচিত্রা" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মাঘ মাসের "বিচিত্রায়" সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য শ্রীযুক্ত শান্তি পাল যে 'সাঁতার' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পড়িলাম। প্রবন্ধটির শেষভাগে তিনি লিখিয়াছেন "কলিকাতায় মহিলাদিগের সাঁতার দিবার কোনই ব্যবস্থা নাই।" সেই কারণে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে হেদুয়া পুষ্করিণীতেই "ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশন" কিছুদিন হইল তাঁহাদের মহিলা-বিভাগ খুলিয়াছেন এবং পুষ্করিণীর চারিধারে পর্দ্দা টানাইয়া আবরুর ব্যবস্থাও করিয়াছেন। কতিপয় সুযোগ্য শিক্ষয়িত্রীও তাঁহারা রাখিয়াছেন। সেখানে প্রাতঃকালে (যতক্ষণ পার্কটি মহিলাদের জন্য রিজার্ভ থাকে) বহু ভদ্রমহিলা নিয়মিতভাবে সন্তরণ শিক্ষা করেন। "ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েসন" যখন মহিলা বিভাগ খুলেন তখন কতিপয় ব্যক্তি রীতিমত বাধা প্রদান করা সত্ত্বেও যে "ন্যাশানাল ক্লাব" তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন ও মহিলাদিগের একটি অভাব মোচন করিয়াছেন ইহাই আনন্দের বিষয়। বোধ হয় এ কথা শ্রীযুক্ত শান্তিবাবুও পর সংখ্যায় প্রকাশ করিবেন। ইতি—শ্রীসৌরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259 Upper Chitpore Road. and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

পাকশালা

বৈশাখ, ১৩৪১

শিল্পী—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

সপ্তম বর্ষ, ২য় খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৪১ | ৪র্থ সংখ্যা

একাকী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এলো সন্ধ্যা তিমির বিস্তারি' ;
দেবদারু সারি সারি
দোলে ক্ষণে ক্ষণে
ফাল্গুনের ক্ষুব্ধ সমীরণে।
স্তব্ধতার বক্ষোমাঝে পল্লবমর্ম্মর
জাগায় অস্ফুট মন্ত্রস্বর।
মনে হয় অনাদি সৃষ্টির পরপারে
আপনি কে আপনারে
শুধাইছে ভাষাহীন প্রশ্ন নিরন্তর ;
অসংখ্য নক্ষত্র নিরুত্তর।
অসীমের অদৃশ্য গুহায় কোন্‌খানে
নিরুদ্দেশ পানে
লক্ষ্যহীন কালস্রোত চলে।
আমি মগ্ন হয়ে আছি সুগম্ভীর নৈঃশব্দ্যের তলে॥

ভাবি মনে মনে,
এতদিন সঙ্গ যারা দিয়েছিল আমার জীবনে
নিল তারা কতটুকু স্থান ?
আমার গভীরতম প্রাণ ;

আমার সুদূরতম আশা আকাঙ্ক্ষার
গোপন ধ্যানের অধিকার ;

ব্যর্থ ও সার্থক কামনায়
আলোয় ছায়ায়
রচিলাম যে স্বপ্ন ভুবন ;

যে আমার লীলা-নিকেতন
এক প্রান্ত ব্যাপ্ত যার অসমাপ্ত অরূপ সাধনে,
অন্য প্রান্ত কর্ম্মের বাঁধনে ;

যে অভাবনীয়,
অলক্ষিত উৎস হতে যে অমিয়
জীবনের ভোজে
চেতনারে ভরেছে সহজে ;

যে ভালোবাসার ব্যথা রহি রহি
আনিয়া দিয়েছে বহি
শ্রুত বা অশ্রুত সুর উৎকণ্ঠিত চিতে
গীতে বা অগীতে ;

কতটুকু তাহাদের জানা আছে
এলো যারা কাছে ;

ব্যক্ত অব্যক্তের সৃষ্টি এ মোর সংসারে
আসে যায় একধারে,
বিরহ দিগন্তে পায় লয়,
নিয়ে যায় লেশমাত্র পরিচয় ।

আপনার মাঝে এই বহুব্যাপী অজানারে ঢাকি'
স্তব্ধ আমি রয়েছি একাকী ॥

যেন ছায়া-ঘন বট
জুড়ে আছে জনশূন্য নদীতট,
কোণে কোণে, প্রশাখার কোলে কোলে
পাখী কভু বাসা বাঁধে, বাসা ফেলে কভু যায় চোলে।
সম্মুখে স্রোতের ধারা আসে আর যায়
জোয়ার ভাঁটায় ;
অসংখ্য শাখার জালে, নিবিড় পল্লবপুঞ্জ মাঝে
রাত্রিদিন অকারণে অন্তহীন প্রতীক্ষা বিরাজে ॥

২ এপ্রেল ১৯৩৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৬

পরদিনের কথা।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। সকাল থেকে মাঝে মাঝে লঘু মেঘের হাল্‌কা বর্ষণ হয়ে গেছে,—অপরাহ্ণের দিকে আকাশ নির্ম্মল, বায়ুতে মৃদু শৈত্যের স্পর্শ। আমিনা গফুরের অনুমতি নিয়ে সন্ধ্যাকে তার কারাকক্ষ থেকে বার ক'রে বাড়ির পিছন দিকে একটা ঝোপের আড়ালে এনে বসেছে। ভিরোবিয়ায় এসে পর্য্যন্ত সন্ধ্যার এই প্রথম মুক্ত বায়ু সেবন করবার জন্য বাইরে এসে বসা। গফুর বারম্বার আমিনাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছে যে সন্ধ্যা যেন কোনো গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে না পড়ে,—আর একান্তই যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে ত' তার দূরসম্পর্কীয়া ননদ ব'লে যেন পরিচয় দেয়—দুদিনের জন্য ভিরোবিয়ায় বেড়াতে এসেছে।

সন্ধ্যাকে লক্ষ্য ক'রে গফুর বলেছিল, "আমি তোমাকে ভাল মেয়ে ব'লেই জানি হামিদা, কিন্তু তবু তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে, হঠাৎ যদি কোনো লোকজনের সামনে পড় ত' চেঁচামেচি ক'রে ছেলেমানুষী কোরো না। তা'তে কোনো ফল হবে না, রাতের মধ্যে আমি তোমাকে মহবুবের হাতে একেবারে ছেড়ে দোবো—তারপর সে তোমাকে বনের মধ্যেই নিয়ে যাক্ বা আর কোথাও লুকিয়েই রাখুক। চেঁচামেচি ক'রলে ফল হবে না কেন বলছি জানো? আমাদের এ গাঁয়ে যে কয়েকজন লোক বাস করে সব এক বাড়ির মতো,—সকলেরই এক পেশা, এক পরামর্শ। কেউ কারোর শত্রুতা করবে, সে উপায় নেই।"

অন্যদিকে দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা মৃদুস্বরে উত্তর দিয়েছিল, "আমি ত' বাইরে যেতে চাচ্ছিনে।"

"চাচ্ছনা, কিন্তু যাচ্ছ ত? সেই জন্যে হুঁসিয়ার ক'রে দিলাম।"

উত্তরে আমিনা ব'লেছিল, "তুমি মিছে ভয় করছ ভাই-জান, হামিদা ভারি ভাল মেয়ে।"

গফুর হেসে উত্তর দিয়েছিল, "আমিই কি হামিদাকে দুষ্টু বলছি। বাঘের মুখ থেকে হঠাৎ ছাড়ান পেলে হরিণ তড়বড়িয়ে পালিয়েই থাকে,—তাই ব'লে কি তাকে দুষ্টু বলবি আমিনা। আচ্ছা তোরা যা, একটু ফাঁকে গিয়ে বোস,—আমি এখানে আছি, কোনো ভয় নেই।"

দূরে তালবনের পাশে ঘন নীলবর্ণের গিরিশ্রেণী দেখা যাচ্ছিল,—সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সহসা সন্ধ্যার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে এল। তারপর ধীরে ধীরে টপ্ টপ্ ক'রে দু-চার ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে মাটিতে পড়ল।

ব্যস্ত হয়ে আমিনা বল্‌লে, "তুমি কাঁদচো হামিদা? কাঁদচো কেন তুমি?"

তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কেন তুমি আমাকে অমন ক'রে কাল বাঁচালে আমিনা? কাল যদি আমাকে না বাঁচাতে তা হ'লে আজ ত' এতক্ষণে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম।"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে আমিনা বল্‌লে, "নিশ্চিন্তই যে হ'তে তা কি ক'রে বলছ হামিদা? তোমাদের হিন্দুদের শাস্তরে বলে আত্মহত্যা মহাপাপ। পাপীরা মারা গেলে কোথায় যায় তা জানো ত?"

"জানি, নরকে। কিন্তু সে কি এর চেয়েও খারাপ?"

"কিন্তু এখানেই যে চিরকাল তুমি থাকবে তা কেমন ক'রে জানলে?"

সন্ধ্যা আমিনার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সজোরে তার দু-হাত চেপে ধরলে,—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "এখান থেকে আমি উদ্ধার হব আমিনা? বল, বল, সত্যি ক'রে বল,—হবো?"

"খোদাতালার মর্জ্জি হ'লে হ'তে পারো।"

এবার দুই হাত দিয়ে সন্ধ্যা আমিনার দেহ জড়িয়ে ধরলে,—বললে, "কে আমাকে উদ্ধার করবে ভাই? তুমি?"

সন্ধ্যার আকুলতা দেখে আমিনার চক্ষু সজল হ'য়ে উঠল, মুখে কিন্তু মৃদু হাসিও দেখা দিলে,—বললে, "আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমি তোমাকে কি ক'রে উদ্ধার করবো হামিদা?"

প্রবল ভাবে মাথা নাড়া দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "না আমিনা, তুমি সামান্য মেয়েমানুষ নও—একমাত্র তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পার! তোমার দাদারা ত' দস্যু,—জানোয়ারের মতো;—তাদের কাছ থেকে কখনো দয়া প্রত্যাশা করতে পারি নে।"

কপট কোপ প্রকাশ ক'রে আমিনা বললে, "বেশ মেয়ে ত' তুমি?—আমার দাদাদের দস্যু জানোয়ার ব'লে গালি দেবে আর আমার কাছ থেকে দয়া প্রত্যাশা করবে?" তারপর সহসা কণ্ঠস্বর কোমল ক'রে নিয়ে বললে, "মহবুবের কথা তুমি যাই বলতে চাও বল, কিন্তু গফুর ত' একেবারে নির্দ্দয় নয় হামিদা?"

তা যে নয়, সে কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। নিমেষের মধ্যে গত মাস খানেকের ঘটনাবলী মনে মনে ভেবে নিয়ে সন্ধ্যা দেখলে গফুর তার প্রতি মাঝে মাঝে সদয় ব্যবহারও করেছে। মহবুবের উৎপীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করবার অভিপ্রায়ে মহবুবের সঙ্গে সে বচসা করেছে, অনশন-জনিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে বলপ্রয়োগ না ক'রে সুমিষ্ট বচনেই তাকে আহার করাতে চেষ্টা করেছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত আমিনার নির্ব্বন্ধে সে যে আহার করতে বাধ্য হয়েছিল তার মূলে যে তারই পোষকতা বর্ত্তমান ছিল সে কথা জানতেও সন্ধ্যার বাকি নেই। মাঝে মাঝে গফুর প্রয়োজনের অনুরোধে বজ্রনাদ করেছে বটে, কিন্তু তাই ব'লে বজ্রপাত করেনি।

অনুতপ্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "আমাকে মাপ করো আমিনা, গফুরের বিষয়ে আমার ও কথা বলা অন্যায় হয়েচে।" তারপর হঠাৎ মনের মধ্যে একটা কথা উদয় হ'তে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা আমিনা, কখনো যদি তেমন দরকার হয়ত গফুরকে আমার কি ব'লে ডাকা উচিত?"

একটু ভেবে আমিনা বললে, "গফুর ব'লেই ডাকতে পারো; আর, বয়সের জন্যে কিম্বা অন্য কোনো কারণে বুড়ো মানুষকে যদি একটু খাতির করতে ইচ্ছে হয় তা হ'লে গফুর মিঞা ব'লে ডেকো।"

"গফুর মিঞা? মিঞা মানে কি?"

"তোমাদের যেমন বাবু, আমাদের তেমনি মিঞা।"

"মিঞা কথাটা সন্ধ্যার একেবারে অপরিচিত না হ'লেও তার যথার্থ প্রয়োগ সে জানত না। আমিনার মুখ থেকে শোনবার পর বার পাঁচ-সাত মনে মনে আবৃত্তি ক'রে রাখলে।

আমিনা বললে, "হামিদা, আমার একটি অনুরোধ রাখবে ভাই?"

"কি বল?"

"তোমার নাম আমাকে বলবে?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, বললে, "কি হবে ভাই আমার নাম জেনে? সে মানুষও আমি এখন নই, সে নামেও আর দরকার নেই। এখন আমার হামিদা নামই ভাল।"

"কিন্তু হামিদা ত আর তোমার আসল নাম নয়—জোর ক'রে দেওয়া নাম। তোমার আসল নাম তুমি আর-কাউকে না বলতে চাও—শুধু আমাকে বল। আমি শপথ ক'রে বলছি, কাউকে আমি তোমার সে নাম বলব না। কাল থেকে যতবারই তোমাকে হামিদা ব'লে ডাকছি মনে ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছি নে।"

"তৃপ্তি পাচ্ছনা? কেন, আমি ত' হামিদা ব'লে ডাকলেই সাড়া দিচ্ছি?"

স্মিতমুখে আমিনা বললে, "তা দেবে না কেন। এই ধর, আমার নাম ত' আমিনা, কিন্তু আমার আসল নাম জানতে না পেরে তুমি যদি আমাকে যশোদা ব'লে ডাকতে

তা হ'লে আমিও হয়ত সাড়া দিতুম, কিন্তু তাই ব'লে আমাকে যশোদা ব'লে ডেকে তুমি কি পুরোপুরি তৃপ্তি পেতে? তা'ছাড়া হামিদা, তোমার আসল নাম বল্‌তে ভয়ের ত' কোনো কারণ নেই। আমরা ত' আর তোমার নাম টের পেলে পুলিশে গিয়ে লিখিয়ে দিয়ে আসছিনে। বরং সে ভয় আমাদেরই আছে যে তুমি কোনোদিন ছাড়া পেলে আমাদের নাম পুলিশে লিখিয়ে দিতেও পারো। অথচ আমরা ত' তোমার কাছে আমাদের আসল নাম লুকোচ্ছি নে।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ পুনরায় আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। ম্লান হাসি হেসে সে বল্‌লে, "ভয়-টয় কিছু নয় আমিনা, তোমাকে এখনি বল্‌লাম ত' ভাই, মনে হয়, যখন আগেকার জীবনে আর আমার অধিকার নেই, তখন আগেকার নামেও নেই। তোমাদের এই জেলখানায় আমাকে সে নামে তুমি নাই ডাক্‌লে ভাই!" কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যার দুই চক্ষু থেকে টপ্ টপ্ করে পুনরায় কয়েক ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ল।

সন্ধ্যার পিঠের উপর সযত্নে একটি হাত রেখে আমিনা বল্‌লে, "কষ্ট যদি হয়, থাক্ ব'লে কাজ নেই।"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে সন্ধ্যা বল্‌লে, "বল্‌ছি। আমার নাম সন্ধ্যা।"

আমিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; সহাস্য মুখে বল্‌লে, "সন্ধ্যা? চমৎকার নাম ত'! ও মা, যেমন স্বভাব, তেম্‌নি নাম!"

আমিনাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা নয় ভাই, যেমন অদৃষ্ট তেম্‌নি নাম।"

এ কথাও সত্য। আমিনার দুই চক্ষু সজল হয়ে এল, কণ্ঠ এল রুদ্ধ হয়ে। সেও দুই হাতে সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধ'রে নীরবে ব'সে রইল। দূরে গিরিমালা এবং তালবন ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় ধূসর হ'য়ে আসছিল; একদল গো-মহিষ অন্য গ্রাম থেকে এ অঞ্চলে চর্‌তে এসেছিল, গলায় বাঁধা ঘণ্টায় সন্ধ্যার আগমনী বাজিয়ে তারা ফিরে চলেছিল গৃহাভিমুখে, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলেছিল দুটি ভীল বালক মিহি সুরের বাঁশি বাজিয়ে। বহুক্ষণ কেটে গেল,—বেদনা-সমবেদনার যুক্ত ক্রিয়ায় সম্মিলিত দুইটি নারী ভাষা হারিয়ে পরস্পর বাহুবদ্ধ হ'য়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

মৌন ভঙ্গ করলে সন্ধ্যা। আমিনার বাহুবন্ধন থেকে সহসা নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তার মুখের উপর অবিচল দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "আমিনা, একটা কথার সত্যি উত্তর দেবে?"

"দেবো,—কি কথা বল?"

"তুমি আমাকে ভালবেসেছ,—না?"

সন্ধ্যার কথা শুনে আমিনা যেন ধপ্ ক'রে আকাশ থেকে পড়ল;—সবিস্ময়ে ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লে, "শোন কথা! দেখা ত মোটে কাল থেকে, এর মধ্যে আবার ভাল বাস্‌লাম কখন্?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল,—অধীর কণ্ঠে বল্‌লে, "বাস নি? সত্যি বলছ, বাস নি?"

"রোসো, একটু ভেবে দেখি।" ব'লে ক্ষণকাল মনে মনে কি যেন তলিয়ে দেখে আমিনা বল্‌লে, "তোমার দুরবস্থা দেখে মনের মধ্যে একটু দয়া হয়েচে বটে,—কিন্তু ভালবাসা?—কই, না!"

সন্ধ্যার চোখ মুখ কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। সবলে মাথা নেড়ে সে বল্‌লে, "দয়া নয়, দয়া নয়! সে যদি হ'য়ে থাকে ত' তোমাদের ঐ গফুর মিঞার হয়েচে!" তারপর সহসা আমিনার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার বক্ষের মধ্যে মুখ ঘস্‌তে ঘস্‌তে বল্‌লে, "আমাকে শুধু দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবে না আমিনা, কখনই পারবে না; ভালবেসে হয় ত পারবে!"

আমিনা দুহাতে সন্ধ্যার মুখ তুলে ধ'রে বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হ'লে না হয় ভালবাসাই যাবে। এখন চল, তোমাকে ঘরে পুরে তালা দিই,—মহবুব কখন্ এসে পড়ে কিছু বলা যায় না ত!" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "বেসেছি সন্ধ্যা! খোদা-কসম তোমাকে ভাল বেসেছি!"

•

রাত্রে যখন মহবুব কাজ থেকে ফিরল তখন নটা বেজে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে সে এসে দেখলে আমিনা তার

জন্য আহার্য্য সাজিয়ে ব'সে রয়েছে। টপ্ ক'রে খাবারের সামনে ব'সে প'ড়ে বল্‌লে, "এ-সব খাবার তুই রেঁধেছিস না-কি রে আমিনা?"

আমিনা বল্‌লে, "আমি দু'দিনের জন্যে এসে তোমাদের ব্যবস্থায় গোল বাধাব কেন? রহিমের মা খাবার দিয়ে গেছে—আমি শুধু বেড়ে দিয়েছি।"

আর বাক্যব্যয় না ক'রে মহবুব আহারে নিবিষ্ট হ'ল। প্রথমে সে ক্ষুধার্ত্ত পশুর মতো এক রাশ খাদ্য উদরসাৎ করলে, তারপর জঠরাগ্নি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লে আমিনার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন হালচাল আমিনা?"

"কিসের হালচাল?"

মহবুবের কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে উঠ্‌ল,—"কিসের আবার? হামিদার।"

সহজভাবে আমিনা বল্‌লে, "হামিদার আবার হালচাল কি?—যেমন আমরা রেখেচি তেমনই আছে। খাওয়া-দাওয়া করেছে—।"

"সে কথা জিজ্ঞেস করছিনে,—পোষ-টোষ মান্‌লে কি-না তাই জিজ্ঞেস করছি।"

আমিনার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিলে,—বল্‌লে, "তোমার বয়স হ'ল কিন্তু বুদ্ধি হলো না মহবুব ভাই, কি যে বলো তার ঠিক নেই!"

মহবুব গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—"চুপ কর্, চুপ কর্। ভারি কাজিল হয়েছিস্! ছেলেবেলায় শ্বশুরের কাছে ছাই পাঁস কি দুখানা বই পড়েছিলি, তাই তোর বুদ্ধির শেষ নেই—আর আমরা সব মুখ্‌খু!"

আমিনা পূর্ব্বের মতই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "মুখ্‌খু ত নও, কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো কথা বলনা কেন? আচ্ছা, একটা জঙ্গলের জানোয়ারকে পোষ মানাতে কত দিন লেগে যায়, আর একটা মেয়েমানুষ একদিনে পোষ মানবে?"

মহবুব গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল, "তা ব'লে পাঁচ দিনের বেশী আমি সবুর মানবো না তা ব'লে রাখ্‌ছি। তার মধ্যে তোর চিড়িয়া পোষ মান্‌লে ত ভাল, নইলে তার আমি সুরুয়া ক'রে তবে ছাড়বো!"

আমিনা হাসিমুখে বল্‌লে, "একবার ত' সুরুয়া করতে গিয়েছিলে,—পেরেছিলে কি? ওই ত' তোমাকে কাবাব ক'রে ছেড়েছিল। আমি যদি হঠাৎ না আস্‌তাম, এতদিন পুলিশের হাতে পড়তে।" তারপর সহসা মুখ গম্ভীর ক'রে গাঢ় স্বরে বল্‌লে, 'না, না, ভাইজান, ছেলেমানুষি কোরোনা। তুমি হামিদাকে চেনোনা—ও একেবারে কেউটে সাপের জাত—সব ভাল মেয়েই তাই—ওকে ভয় দেখিয়ে তুমি বশে আন্‌তে পারবে না। তুমি ওকে যদি সাদি করতে চাও,—বেশ ত ওকে খুসি করো, রাজি করো, আমার কোন ওজোর নেই। কিন্তু জুলুম ক'রে তুমি ওকে পাবে না।"

মনে মনে আমিনার মুণ্ডপাত ক'রে মহবুব বাকি আহারটা শেষ করলে। তারপর অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "গফুরকে দেখ্‌চিনে যে? গফুর কোথায় গেল?"

"তার তবিয়ৎ ভাল নেই, ঘরের ভিতর শুয়েচে।"

"হামিদার ঘরের চাবি কার কাছে?"

"আমার কাছে।"

বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়ে মহবুব বল্‌লে, "কই, দে আমাকে।"

আমিনা ঈষৎ দৃঢ় স্বরে বল্‌লে, "চাবি নিয়ে এখন তুমি কি করবে?"

মহবুব উষ্ণ হয়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "সে কৈফিয়ৎও তোকে দিতে হবে না-কি?"

"কৈফিয়ৎ আবার কি? এম্‌নি জিজ্ঞেস করছি।"

"হামিদাকে রাজি করব।"

সজোরে মাথা নেড়ে আমিনা বল্‌লে, "কখ্‌খনো না। তুমি হামিদাকে রাজি করবে, আর আমি সমস্ত রাত সেখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবো, তা কিছুতে পারব না। দেখ, ভাইজান, সমস্ত দিন খেটেখুটে এসে এখন সারা রাত আরামে শুয়ে ঘুমোও গে। শরীরটাকে বজায় রাখ্‌তে হবে ত? কাল সমস্ত রাত হামিদাকে নিয়ে কেটেছে, আমার নিজের শরীরও ভাল নেই—আমি আজ সমস্ত রাত ঘুমোতে চাই।"

"তুই ঘুমোগে, মরগে, যা ইচ্ছে হয় করগে। কিন্তু পাহারা দিবি কেন শুনি?"

সহাস্যমুখে আমিনা বললে, "শোন কথা! বাঘ বাবে হরিণকে রাজি করতে আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবো?—পাহারা দোবো না?"

মহবুব তার ডান পা'টা সজোরে মাটিতে ঠুকে একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল। বললে, "খালি-পেটে বাড়ী ফিরেচি ব'লে তোর ভারি সাহস হয়েচে দেখ্‌চি! চললুম খেয়ে আসতে। আগে তোকে খুন করে তারপর তালা ভেঙে হামিদাকে খুন করব!"

আমিনা আবার হাসতে লাগ্‌ল। বললে, "বেশ ত' আমিও চললাম হামিদার ঘরের দরজার সামনে শুতে। তুমি এসে দেখ্‌বে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমি ঘুমিয়ে আছি। দেখি, কত বড় মুরোদ তোমার, কেমন তুমি আমাদের খুন কর! কেন, মহবুব ভাই, খালি পেটে বোনের উপর তোমার ছোরা চলে না না-কি?" ব'লে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

আমিনার মুখের সম্মুখে ডান হাতের বদ্ধ-মুষ্টি একবার কম্পিত ক'রে বিড়-বিড় ক'রে কি বলতে বলতে মহবুব প্রস্থান করলে, আর পর হাত মুখ ধুয়ে একটা বড় লাঠি কাঁধে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

আমিনাও তাড়াতাড়ি আহার সমাপন ক'রে সন্ধ্যার ঘরের সামনে একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। একবার ভাবলে সন্ধ্যাকে ডেকে একটু তার সাড়া নেয়, কিন্তু ঘর একেবারে নিঃশব্দ, নিশ্চয়ই সে ঘুমিয়ে পড়েচে মনে ভেবে আর তাকে বিরক্ত করলে না।

সন্ধ্যা কিন্তু তখনো ঘুমোয় নি; স্তব্ধ হয়ে ঘরের মেঝের ব'সে একটি গবাক্ষের দিকে চেয়ে ছিল। তার অন্ধকার কক্ষের সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে বহির্জগতের সামান্য একটি অংশ দেখা যাচ্ছিল—একখণ্ড আকাশ, এবং তার মধ্যে জ্যোৎস্নাকিরণে মৃদু হিল্লোলিত কয়েক গাছি তরুশির। গবাক্ষটি উচ্চে অবস্থিত, সুতরাং পাশে ব'সে বাহিরের দৃশ্য অবলোকন করবার সুবিধা ছিল না, ঘরের মেঝের ব'সে যতটুকু দেখা যায় নির্নিমেষ নেত্রে সন্ধ্যা তাই দেখ্‌ছিল। তার মনের ভিতরকার অবস্থাও আজ কতকটা সেই ধরণের। সেখানেও আজ অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটি আলোকের রেখা নিবিড় অন্ধকার রাশির মধ্যে আশা জাগিয়ে তুলেছে। যেখানে ছিল শুধু অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্য্যাতিত মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা—যা' থেকে উদ্ধারের মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না—সেখানে আমিনা এনেছে মুক্তির কল্পনা! স্পষ্ট ক'রে সে কিছু বলেনি, কোন অঙ্গীকার করেনি, তবু মনে হয় সে তাকে উদ্ধার করবে, কেন না সে তাকে ভালবেসেছে!

জীবন-ধারার একটা অতি আকস্মিক প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনে হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, পূর্ব্ব জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনায় আজ আবার তারা ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌ল। আবার নূতন ক'রে নূতন ভাবে মনে পড়ল বাপ-মাকে, মনে পড়ল ভাই-বোনকে, মনে পড়ল শ্বশুর-শাশুড়ীকে। তারপর যাকে মনে পড়ল তার কথা মনে করতে তার অঙ্গ বিকল হয়ে এল, চক্ষে বইল অশ্রুর ধারা। তার বিরহ-পীড়িত চিত্ত বলতে লাগ্‌ল—ওগো, তুমি অত অল্প সময়ের মধ্যে এত যাকে ভালবেসেছিলে তাকে হারিয়ে কি ক'রে দিনাতিপাত করছ? ঘুরে বেড়াচ্ছ কি 'সন্ধ্যা সন্ধ্যা' ক'রে বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, নদীর তীরে-তীরে? রাত্রি কাটছে কি জেগে জেগে তার কথা স্মরণ ক'রে? দিন কাটছে কি সে অভাগিনীর ব্যাকুল প্রতীক্ষায়, আকুল অন্বেষণে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে নিবিড়তরভাবে সেটা চিন্তা করবার অভিপ্রায়ে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল। চিন্তাবিলাসে সে তখন আত্মহারা! মনে হ'ল সে যেন মুক্তিলাভ ক'রে কলিকাতায় উপস্থিত হয়েচে, সমস্ত দিন কাটল বাইরে বাইরে আকুল প্রতীক্ষায়, রাত্রে প্রিয়লালের সহিত দেখা! ঘরে প্রবেশ করতেই দুটি উত্তপ্ত-ব্যাকুল বাহুর মধ্যে সহসা বন্দী! উঃ অত উগ্র উল্লাসের প্রকোপ সহ্য হবে কি? দু'হাত দিয়ে সন্ধ্যা তার দ্রুত-স্পন্দিত বুকটা সজোরে টিপে ধরলে।

তারপর সহসা কোন্ একমুহূর্ত্তে অতর্কিতে নিদ্রা এসে জাগ্রৎ স্বপ্নকে টেনে নিয়ে গেল স্বপ্নেরই বাস্তব জগতে।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২০

দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা হঠাৎ চলে গেলেন কেন? আমার এসে পড়াটাই কি কারণ নাকি?

বিপ্রদাস বলিল, না। ওঁর বাবা টেলিগ্রাম করেছেন মাসির বাড়ীতে গিয়ে থাকতে যতদিন না বোম্বায়ে ফিরে যাওয়া ঘটে।

—কিন্তু হঠাৎ মাসি বেরুলো কোথা থেকে? বন্দনা আমার সঙ্গে ত প্রায় কথাই কইলেন না, সর্ব্বক্ষণ আড়ালে আড়ালে রইলেন, তারপর সকাল না হতে হতেই দেখচি সরে পড়লেন। একটা নমস্কার করে গেলেন সত্যি কিন্তু সে-ও মুখ ফিরিয়ে। আমার বিরুদ্ধে হলো কি তাঁর?

প্রশ্নের জবাবটা বিপ্রদাস এড়াইয়া গেল এবং মাসির ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাইয়া কহিল, আমার অসুখে ভয় পেয়ে এই মাসির বাড়ী থেকেই অনুদি ওকে ডেকে এনেছিলেন আমার শুশ্রূষা করতে। যথেষ্ট করেচে। ওর কাছে তোদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

দ্বিজদাস কহিল, উচিত নয় বলিনে, কিন্তু আপনাকে সেবা করতে পাওয়াটাও ত একটা ভাগ্য। সে মূল্যটা যদি উনিও অনুভব করতে পেরে থাকেন ও কৃতজ্ঞতা ওঁর কাছেও আমাদের পাওনা আছে।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, তুই ভারি নরাধম।

দ্বিজদাস বলিল, নরাধম কিন্তু নির্ব্বোধ নই। আমার কথা যাক্। কিন্তু এই সেবা করার কথাটা মায়ের কানে গেলে উনি চিরকাল আমাদের মাকেই কিনে রাখবেন। সেই কি সোজা সম্পদ?

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিল, কহিল, মাকে এতকাল পরে তুই চিনতে পেরেচিস-বল্?

দ্বিজদাস বলিল, যদি পেরেও থাকি সে আপনিই জানুন। আমি মায়ের কুপুত্র, আমি কুলাঙ্গার তাঁর কাছে এই পরিচয়ই আমার থাক্। একে আর নড়িয়ে কাজ নেই দাদা।

—কিন্তু কেন? মা তোকে বিশ্বাস করতে পারেন, তোকে ভালো বন্ধে ভাবতে পারেন একি তুই সত্যিই চাসনে? এ অভিমানে লাভ কি বল্‌তো?

—লাভ কি জানিনে কিন্তু লোভ বিশেষ নেই। আমি আপনার পেয়েছি স্নেহ, পেয়েছি বৌদিদির ভালোবাসা, এই আমার সাতরাজার ধন, সাতজন্ম দু'হাতে বিলিয়েও শেষ করতে পারবোনা। কিন্তু

বলিয়া ফেলিয়াই তাহার চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। হৃদয়ের এই সকল আবেগ-উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে সে চিরদিন পরাঙ্মুখ,—চিরদিন নিঃস্পৃহতার আবরণে ঢাকা দিয়া বেড়ানোই তাহার প্রকৃতি,—মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া বলিল, কিন্তু এ সব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেটা প্রয়োজন সে হচ্চে এই যে আমার চোখে বন্দনার চলে যাওয়ার ভাবটা দেখালো যেন রাগের মতো। এর মানেটা বলে দিন।

—মানেটা বোধ হয় এই যে তুই যখন এসে পড়েচিস তখন ওর আর দরকার নেই। এখন থেকে সেবা শুশ্রূষার ভার তোর উপর। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিতে লাগিল।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি ঠাট্টা করচেন বটে, কিন্তু আমি বলচি, এই সব ইংরিজি-নবিশ মেয়েগুলো এই দম্ভতেই একদিন মরবে। আপনাকে রোগে সেবা করবার দিন যেননা কখনো আসে, কিন্তু এলে প্রমাণ হতে দেরি হবেনা যে দাদার সেবায় দ্বিজুকে হারানো দশটা বন্দনার সাধ্যে কুলোবে না। এ কথা তাকে জানিয়ে দেবেন।

স্নেহ-হাস্যে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আচ্ছা জানাবো কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে। তবে, সে পরীক্ষার প্রয়োজন দাদার কাছে নেই,—আছে শুধু একজনের কাছে সে মা। বোঝা-পড়া তোদের একটা হওয়া দরকার,—বুঝ্‌লি রে দ্বিজু?

দ্বিজদাস বলিল, না দাদা বুঝলাম না। কিন্তু মা যখন, তখন বেঁচে থাকলে বোঝা-পড়া একদিন হবেই, কিন্তু এখুনি প্রয়োজনটা কিসের এলো এইটেই ভেবে পাচ্চিনে। এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, আমার কপালে সবই হলো উল্টো। বাবা জন্ম দিলেন কিন্তু দিয়ে গেলেন না কাণা-কড়ির সম্পত্তি—সে দিলেন আপনি। মা গর্ভে ধারণ করলেন কিন্তু পালন করলেন অন্নদা দিদি, আর সমস্ত ভার বয়ে মানুষ করে তুললেন বৌদিদি,—দুজনেই পরের ঘর থেকে এসে। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ এবং স্বর্গাদপি গরীয়সী—এই দুটো শ্লোক আউড়ে মনকে আর কত চাঙ্গা রাখবো দাদা, আপনিই বলুন?

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের মামলা নিয়ে আর ওকালতি করবোনা সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে যে-ধারণা তোর আছে সে ভুল। অর্দ্ধেক বিষয়ের সত্যিই তুই মালিক।

দ্বিজদাস বলিল, হ'তে পারে সত্যি, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে ঘরে দোর দিয়ে তাঁর উইল খানা কি আপনি পুড়িয়ে ফেলেন নি?

—কে বললে তোকে?

—এতকাল যিনি আমাকে সকল দিক দিয়ে রক্ষে করে এসেছেন এ তাঁর মুখেই শোনা।

—তা হ'তে পারে, কিন্তু তোর বৌদিদি ত সে উইল পড়ে দেখেন নি। এমন ত হতে পারে বাবা তোকেই সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন বলে রাগ করে আমিংতা পুড়িয়েছি। অসম্ভব ত নয়।

শুনিয়া কৌতুকের হাসিতে দ্বিজদাস প্রথমটা খুব হাসিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আপনি যে কখনো মিথ্যে বলেন না? দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যেটা নোট করে গিয়েছিলেন বেদব্যাস, আর কলিতে আপনারটা নোট করে রাখবে দ্বিজদাস। দুই-ই হবে সমান। যাহোক এটা বোঝা গেল বিপাকে পড়লে সবই সম্ভব হয়। আর পাপ বাড়াবেন না, বলুন এখন থেকে কি আমাকে করতে হবে।

—আমাদের কারবার বিষয়-আশয় সমস্ত দেখতে হবে।

—কিন্তু কেন? কিসের জন্যে এত ভার আমি বইতে যাবো আমাকে বুঝিয়ে দিন। আপনি একা পারচেন না নাকি? অসম্ভব। আমি নিষ্কর্ম্মা অপদার্থ হয়ে যাচ্চি? না যাচ্চিনে। তবু মা জিজ্ঞেসা করলে তাঁকে জানিয়ে দেবেন পদার্থের আমার দরকার নেই অপদার্থ হয়ে আমি দিন কাটিয়ে দেবো তাঁকে ভাবতে হবে না। আপনি থাকতে টাকা কড়ি বিষয়-সম্পত্তির বোঝা আমি বইব না। শেষে কি আপনার মতো ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠবো নাকি? লোকে বলবে ওর শিরের মধ্যে দিয়ে রক্ত বয় না, বয় শুধু টাকার স্রোত। কিন্তু বলিতে বলিতেই লক্ষ্য করিল বিপ্রদাস অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছে তাহার কথায় কান নাই। এমন সচরাচর হয় না,—এ স্বভাব বিপ্রদাসের নয়, একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, দাদা, সত্যিই কি চান আমি বিষয়-কর্ম্ম দেখি, যা আমার চিরদিনের স্বপ্ন সেই স্বদেশ সেবায় জলাঞ্জলি দিই?

বিপ্রদাস তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, জলাঞ্জলি দিবি এমন কথাও তোকে কোন দিনই বলিনে দ্বিজু। যা তোর স্বপ্ন সে তোর থাক,—চিরদিন থাক,—তবু বলি সংসারের ভার তুই নে।

—কিন্তু কেন বলুন? কারণ না জানলে আমি কিছুতেই এ কথা মানবো না।

বিপ্রদাস এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, এর কারণ ত খুবই স্পষ্ট দ্বিজু। আজ আমি আছি কিন্তু এমন ত ঘটতে পারে আর আমি নেই।

দ্বিজদাস জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, না ঘটতে পারে না। আপনি নেই,—কোথাও নেই এ আমি ভাবতে পারি নে।

তাহার বিশ্বাসের প্রবলতা বিপ্রদাসকে আঘাত করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, সংসারে সবই ঘটে, রে, এমন কি অসম্ভবও। এই কথাটা ভাবতে যারা ভয় পায় তারা নিজেদের ঠকায়। আবার এমনও হতে পারে আমি ক্লান্ত, আমার ছুটির দরকার,—তবু দিবিনে তুই?

—না দাদা, পারবো না দিতে। তার চেয়ে ঢের সহজ আপনার আদেশ পালন করা। বলুন, কবে থেকে আমাকে কি করতে হবে।

—আজ থেকে এ সংসারের সব ভার নিতে হবে।

—আজ থেকেই? এতই তাড়াতাড়ি? বেশ তাই হবে। আপনার অবাধ্য হবো না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল কিন্তু শুনিতে পাইল দাদার কথা—তোকে বলতে হবে না রে, আমি জানি আমার অবাধ্য তুই নয়।

দ্বিজদাসের কাজ সুরু হইয়া গেল। সে অলস, অকর্ম্মণ্য উদাসীন এই ছিল সকলের চিরদিনের অভিযোগ কিন্তু দাদার আদেশে মায়ের ব্রত প্রতিষ্ঠার সুবৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার সর্ব্ব প্রকার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল যখন একাকী তাহার পরে তখন এ দুর্নাম অপ্রমাণ করিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না। এই অনভ্যস্ত গুরুভার সে যে এত স্বচ্ছন্দে বহন করিবে এতখানি আশা বিপ্রদাস করে নাই কিন্তু তাহার নিরলস, সুশৃঙ্খল কর্ম্মপটুতায় সে যেন একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। যাহা কিনিয়া পাঠাইবার তাহা গাড়ী বোঝাই করিয়া দ্বিজদাস বাড়ী পাঠাইল, যাহা লইবার তাহা সঙ্গে রাখিল,

আত্মীয় কুটুম্বগণকে একত্র করিয়া যথাযোগ্য সমাদরে রওনা করিয়া দিল, এখানকার সকল কার্য্য সমাধা করিয়া আজ গৃহে ফিরিবার দিন সে দাদার শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে বসিয়া বন্দনা। সেই যাবার দিন হইতে আর সে আসে নাই, তাহার কথা কাজের ভিড়ে দ্বিজদাস ভুলিয়া ছিল—আজ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে সে আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ না করিয়া শুধু একটা মামুলি নমস্কারে শিষ্টাচার সারিয়া লইয়া বলিল, দাদা আজ রাত্রির গাড়ীতে আমি বাড়ী যাচ্চি, সঙ্গে যাচ্চেন অক্ষয় বাবু তাঁর স্ত্রী ও কন্যা মৈত্রেয়ী। আপনার কলেজের ছাত্ররা বোধ করি কাল পরশু যাবে,—তাদের ভাড়া দিয়ে গেলুম। অনুদিকে কি আপনিই সঙ্গে নিয়ে যাবেন? কিন্তু দিন তিন চারের বেশি বিলম্ব করবেন না যেন।

—আমাকে কি যেতেই হবে?

—হাঁ। না যান তো একজোড়া খড়ম কিনে দিন নিয়ে গিয়ে ভরতের মতো সিংহাসনে বসাবো।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ফাজিলের অগ্রগণ্য হয়েছিস্ তুই। কিন্তু আশ্চর্য্য করলি অক্ষয়বাবুর কথায়। তিনি যাবেন কি কোরে? তাঁর তো ছুটি নেই—কাজ কামাই হবে যে?

দ্বিজদাস বলিল, তা হবে; কিন্তু লোকসান নেই—ওদিকে তার চেয়েও ঢের বড় কাজ হবে বড় ঘরে মেয়ে দিতে পারাটা। টাকা-ওয়ালা জামাই ভবিষ্যতের অনেক ভরসা,—কলেজের বাঁধা মাইনের অনেক বেশি।

বিপ্রদাস রাগিয়া বলিল, তোর কথাগুলো যেমন রূঢ় তেমনি কর্কশ। মানুষের সম্মান রেখে কথা কইতে জানিসনে?

দ্বিজদাস বলিল, জানি কিনা বৌদিদিকে জিজ্ঞেসা করে দেখবেন। সৌজন্যের বাজে অপব্যয় করিনে শুধু এই আমার দোষ।

শুনিয়া বিপ্রদাস না হাসিয়া পারিল না, বলিল তোর একটি সাক্ষী শুধু বৌদিদি। যেমন মাতালের সাক্ষী শুঁড়ী।

দ্বিজদাস কহিল, তা হোক, কিন্তু আপনার কথাটাও ঠিক মধু-মাখা হচ্চে না দাদা। কারণ আমিও মাতাল নই, তিনিও মদের যোগান দেন না। দেন অমৃত, দেন গোপনে বহুলোকের অন্ন যা অনেক বড় লোকে পারে না।

বিপ্রদাস কহিল, তাদের পেরেও কাজ নেই। আদর দিয়ে দেওরকে জন্তু করে তোলা ছাড়া বড় লোকদের অন্য কাজ আছে।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়া হাসিতে লাগিল, দ্বিজদাস সেটা লক্ষ্য করিয়া বলিল, এ নিয়ে আর তর্ক করবো না দাদা। বউদিদি আপনার নেই,—বাঙালীর সংসারে তাঁর স্নেহ যে কি সে আপনি কোনদিন জানেন না। অন্ধকে আলো বোঝানোর চেষ্টায় ফল নেই। একটু হাসিয়া বলিল, বন্দনা আড়ালে হাসচেন, কিন্তু মাসির বাড়ীর বদলে দিন কতক আমাদের বাড়ীতে কাটিয়ে এলে হয়ত আমার কথাটা বুঝতেন। কিন্তু থাকগে এসব আলোচনা। আপনি কবে বাড়ী যাচ্চেন বলুন?

—আমি বড় ক্লান্ত দ্বিজু, মাকে বুঝিয়ে বলতে পারবিনে?

বিপ্রদাসের এমন নির্জ্জীব নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর সে কখনো শোনে নাই, চমকিয়া চাহিয়া দেখিল ক্ষীণ হাসিটুকু তখনো ওষ্ঠপ্রান্তে লাগিয়া আছে—কিন্তু এ যেন তাহার দাদা নয় আর কেহ—বিস্ময় ও ব্যথায় অভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, অসুখ কি এখনো সারে নি দাদা?

—না, সেরে গেছে।

—তবু মায়ের কাজে বাড়ী যেতে পারলেন না এ কথা মাকে বোঝাবো কি করে? ভয় পেয়ে তিনি চলে আসবেন, তাঁর সমস্ত আয়োজন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, তুই আমাকে কবে যেতে বলিস্?

দ্বিজদাস বলিল, আজ, কাল, পরশু—যবে হোক্। আমাকে অনুমতি দিন আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, বেশ তাই হবে। আমি নিজেই যেতে পারবো, তোকে ফিরে আসতে হবে না।

দ্বিজদাস চলিয়া গেলে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি হলো মুখুয্যে মশাই, বাড়ী যেতে আপত্তি করলেন কিসের জন্যে?

বিপ্রদাস কহিল, কারণটা ত নিজের কানেই শুনলে?

—শুনলুম, কিন্তু ও-জবাব পরের জন্যে, আমার জন্যে নয়। বলুন কিসের জন্যে বাড়ী যেতে চান্‌না। আপনাকে বলতেই হবে।

—আমি ক্লান্ত।

—না।

—না কেন? ক্লান্তিতে সকলেরই দাবী আছে নেই কি শুধু আমার?

—আপনারও আছে, কিন্তু সে দাবী সত্যিকার হলে সকলের আগে বুঝতে পারতুম আমি। আর সকলের চোখকেই ঠকাতে পারবেন, পারবেন না ঠকাতে শুধু আমার চোখকে। যাবার সময় মেজদিকে চিঠি লিখে যাবো আপনার রোগ ধরবার কখনো দরকার হলে যেন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান।

—মেজদি নিজে পারবেন না রোগ ধরতে, তুমি দেবে ধ'রে।—এ কথা শুন্‌লে কিন্তু তিনি খুসী হবেন না।

বন্দনা বলিল, খুসি হবেন না সত্যি কিন্তু কৃতজ্ঞ হবেন। আমার মেজদি হ'লেন সে-যুগের মানুষ, স্বামী তাঁকে খুঁজে-বেছে নিতে হয়নি, ভগবান দিয়েছিলেন আশীর্ব্বাদের মতো অঞ্জলি পূর্ণ করে। তখন থেকে সুস্থ সবল মানুষটিকে নিয়েই তাঁর কারবার। কিন্তু সে মানুষেরও যে হঠাৎ একদিন মন ভাঙতে পারে এ খবর তিনি জানবেন কি করে?

বিপ্রদাস কথা না কহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল।

বন্দনা বলিল, আপনি হাসলেন যে বড়ো?

বিপ্রদাস বলিল, হাসি আপনি আসে বন্দনা। স্বামী খুঁজে-বেছে নেবার অভিযানে আজ পর্য্যন্ত যাদের তুমি দেখতে পেয়েছো তাদের বাইরে যে কেউ আছে এ তোমরা ভাবতে পারো না। সংসারে সাধারণ নিয়মটাই শুধু মানো, স্বীকার করতে চাও না তার ব্যতিক্রমটাকে। অথচ এই ব্যতিক্রমটার জোরেই টিকে আছে ধর্ম্ম, টিকে আছে পুণ্য, আছে কাব্য-সাহিত্য, আছে অবিচলিত শ্রদ্ধা বিশ্বাস। এ না থাকলে পৃথিবীটা যেতো একেবারে মরুভূমি হয়ে। এই সত্যটাই আজও জানো না।

বন্দনা বিদ্রূপের সুরে বলিল, এই ব্যতিক্রমটা বুঝি আপনি নিজে মুখুয্যে মশাই? কিন্তু সেদিন যে বললেন আমাকেও আপনি ভালোবাসেন?

—সে আজও বলি। কিন্তু ভালোবাসার একটিমাত্র পথই তোমাদের চোখে পড়ে আর সব থাকে বন্ধ, তাই সেদিনের কথাগুলো আমার তুমি বুঝতে পারোনি। একবার দেখে এসোগে দ্বিজু আর তার বৌদিদিকে। দৃষ্টি অন্ধ না হ'লে দেখতে পাবে কি করে শ্রদ্ধা গিয়ে মিশেছে ভালোবাসার সঙ্গে। রহস্য-কৌতুকে, আদরে-আহ্লাদে নিবিড় ঘনিষ্টতায় সে শুধু তার বৌদিদি নয়, সে তার বন্ধু সে তার মা। সেই সম্বন্ধ ত তোমার আমারও,—ঠিক তেমনি কোরেই কেন আমাকে তুমি নিতে পারলে না বন্দনা।

তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল গভীর স্নেহের সঙ্গে মিশিয়া তিরস্কারের সুর, বন্দনাকে তাহা কঠিন আঘাত করিল। কিছুক্ষণ নীরবে অধোমুখে থাকিয়া সহসা চোখ তুলিয়া বলিল, আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম মুখুয্যে মশাই। আমার মেজদিদিকে যদি আপনি সত্যই ভালোবাসতেন দুঃখ আমার ছিল না কিন্তু তা আপনি বাসেন না। আপনি পালন করেন শুধু ধর্ম্ম, মেনে চলেন শুধু কর্ত্তব্য। কঠিন আপনার প্রকৃতি,—কাউকে ভালোবাসতে জানে না। যত ঢেকেই রাখুন এ সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আজ আমার ভুলও ভাঙলো। শূন্যের মধ্যে হাত বাড়িয়ে মানুষ খুঁজতে আর না যাই, আজ আমাকে এই আশীর্ব্বাদ আপনি করুন।

বিপ্রদাস সহাস্যে হাত বাড়াইয়া বলিল,—করলুম তোমাকে সেই আশীর্ব্বাদ। আজ থেকে মানুষ খোঁজা যেন তোমার শেষ হয়, যে তোমার চিরদিনের তাকে যেন তিনিই তোমাকে দান করেন।

কথাটাকে অপমানকর পরিহাস মনে করিয়া বন্দনা রাগিয়া বলিল, আপনি ভুল করচেন মুখুয্যে মশাই, মানুষ খুঁজে বেড়ানোই আমার পেষা নয়। তারা আলাদা। কিন্তু হঠাৎ আজ কেন এসেচি এখনো সেই কথাটা আপনাকে বলা হয়নি। এদিক দিয়ে সত্যিই আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙে গেছে। এখানে আপনাদের সংস্রবে এসে ভেবেছিলুম এই সব আচার বিচার বুঝি আমি সত্যিই ভালোবাসি, খাওয়া-ছোঁয়ার নিয়ম মেনে চলা ফুল তোলা চন্দন ঘষা পূজোর সাজ-গোছ করা—আরও কত কি খুঁটি-নাটি,—মনে করতুম এ সব বুঝি সত্যিই ভালো—সত্যিই মানুষকে বুঝি পবিত্র ক'রে তোলে, কিন্তু এবার মাসিমার বাড়ীতে গিয়ে এ মূঢ়তা ঘুচেছে। দিন কয়েক কি পাগলামিই না ক'রেছিলুম মুখুয্যে মশাই। যেন সত্যিই এ সব বিশ্বাস করি, যেন আমাদের শিক্ষায়, সংস্কারে সত্যিই কোথাও এর থেকে প্রভেদ নেই! এই বলিয়া সে জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিয়াছিল কথাটা হয়ত বিপ্রদাসকে ভারি আঘাত করিবে কিন্তু দেখিতে পাইল একেবারেই না। তাহার ছদ্ম হাসিতে সে প্রসন্ন হাসি যোগ করিয়া বলিল, আমি জানতুম বন্দনা। তোমার কি মনে নেই আমি সতর্ক ক'রে একদিন তোমাকে বলেছিলুম এ সব তোমার জন্যে নয় বন্দনা, এসব করতে তুমি যেয়োনা। সেই মূঢ়তা ঘুচেছে জেনে আমি খুসিই হলুম। মনে করেছিলে শুনে বুঝি বড় কষ্ট পাবো কিন্তু তা নয়। যার যা স্বাভাবিক নয় তা না করলে আমি দুঃখ বোধ করিনে বন্দনা। তোমার ত মনে আছে আমি কিসের ধ্যান করি তুমি জানতে চাইলে আমি চুপ করেছিলুম। বলতে বাধা ছিল বলে নয়, অকারণ বলে। কিন্তু এ সব কথাবার্ত্তা এখন থাক। তোমার বোম্বায়ে ফিরে যাবার কি কোন দিনস্থির হলো?

অভিমানে বন্দনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বিপ্রদাসের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলিল, না।

—সেদিন তোমার মাসির ভাই-পো অশোকের কথা বলেছিলে। বলেছিলে ছেলেটিকে তোমার ভালই লেগেছে। এ কয় দিনে তার সম্বন্ধে আর কিছু কি জানতে পারলে?

—না।

—তোমাদের বিয়েই যদি হয় আমি আশীর্ব্বাদ করবো, কিন্তু মাসির তাড়ায় যেন কিছু করে বোসোনা। তাঁর তাগাদাকে একটু সামলে চোলো।

বন্দনার চোখে জল আসিয়া পড়িল কিন্তু মুখ নীচু করিয়া সামলাইয়া ফেলিল, বলিল, আচ্ছা।

বিপ্রদাস বলিল, আমি পরশু বাড়ী যাব। দু তিন দিনের বেশি থাকতে পারবো না। ফিরে আসার পরেও যদি কলিকাতায় থাকো একবার এসো।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়াই ছিল মাথা নাড়িয়া কি একটা জবাব দিল তাহার স্পষ্ট অর্থ বুঝা গেল না।

বিপ্রদাস কহিল, শুনলে ত আমার ছুটি মুঞ্জুর হলো, এখন থেকে সব ভার দ্বিজুর। সংসারের ঘানিতে বাবা আমাকে ছেলেবেলাতেই জুড়ে দিয়েছিলেন কখনো অবকাশ পাইনি কোথাও যাবার। আজ মনে হচ্চে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচবো।

এবার বন্দনা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি নিশ্বাস ফেলার এতই দরকার হ'য়েছে মুখুয্যে মশাই? সত্যিই কি আজ আপনি এত শ্রান্ত?

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গেল, বলিল, ভালো কথা বন্দনা আমার অসুখে তোমার সেবার উল্লেখ করে বলছিলুম তোমার কাছে তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এর অর্দ্ধেক তারা কেউ পারতো না। সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেও তোমাকে বলতে বলেছে, যদি সে সময় কখনো আসে দাদার সেবায় তার সমকক্ষ হওয়া দশটা বন্দনারও সাধ্যে কুলোবে না।

বন্দনা বলিল, তাঁকেও বলবেন সর্ত্ত আমি স্বীকার করে নিলুম। কিন্তু পরীক্ষার দিন যদি কখনো আসে তখন যেন তাঁর দেখা মেলে।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিল, দেখা মিলবে বন্দনা, সে পিছোবার লোক নয়। তাকে তুমি জানো না।

—জানি মুখুয্যে মশাই। ভালো করেই জানি আপনার কাজে তাঁর প্রতিযোগিতা করা সত্যিই বন্দনার শক্তিতে কুলোবে না।

ভ্রাতৃগর্ব্বে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, জানো বন্দনা দ্বিজু আমার সাধু লোক।

—আপনার চেয়েও নাকি?

—হঁা আমার চেয়েও। এই বলিয়া বিপ্রদাস এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু সে বলছিল তুমি নাকি তার উপর রাগ করে আছো। কথা কওনি কেন?

—কথা কইবার দরকার হয়নি মুখুয্যে মশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তবেই ত দেখচি তুমি সত্যই রাগ করে আছো। কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলি বন্দনা, দ্বিজুর ব্যবহারটা রুক্ষ, কথাগুলোও সর্ব্বদা বড় মোলায়েম হয়না কিন্তু তার এই কর্কশ আচরণটা ঘুচিয়ে যদি কখনো তার দেখা পাও দেখবে এমন মধুর লোক আর নেই। কথাটা আমার বিশ্বাস কোরো এমন নির্ভর করবার মানুষও তুমি সহজে খুঁজে পাবে না।

বন্দনা আর একদিকে চাহিয়া রহিল উত্তর দিল না। হঠাৎ এক সময়ে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে মুখুয্যে মশাই—আমি যাই। যদি থাকতে পারি আপনি ফিরে এলে দেখা করবো। যদি না পারি এই আমার শেষ নমস্কার রইলো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল। একটা কথা বলারও সে বিপ্রদাসকে অবকাশ দিল না।

বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ির মুখে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল দ্বিজদাস দাঁড়াইয়া হাত যোড় করিয়া।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ আবার কি?

—একটা মিনতি আছে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে আমাদের দেশের বাড়ীতে একবার যেতে হবে।

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে? এর হেতু?

দ্বিজদাস কহিল, বলবো বলেই দাঁড়িয়ে আছি। একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন আজ আবার সেই দয়া আপনাকে করতে হবে।

বন্দনা একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিল, তারপরে বলিল কিন্তু আমাকে যাবার নিমন্ত্রণ করচে কে? মা, দাদা, না আপনি নিজে?

—আমি নিজেই করচি।

—কিন্তু আপনি ত ও-বাড়ীতে তৃতীয় পক্ষ, ডাকবার আপনার অধিকার কি?

দ্বিজদাস বলিল, আর কোন অধিকার না থাক আমার বাঁচার অধিকার আছে। সেই অধিকারে এই আবেদন উপস্থিত করলুম। বলুন মঞ্জুর করলেন? একান্ত প্রয়োজন না হলে কোন প্রার্থনাই আমি কারো কাছে করিনে।

বন্দনা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যদিকে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, আচ্ছা তাই যাবো কিন্তু আমার মান-অপমানের ভার রইলো আপনার উপর।

দ্বিজদাস সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে কহিল, আমার সাধ্য সামান্য, তবু নিলুম সেই ভার।

বন্দনা বলিল, বিপদের সময়ে এ কথা ভুলবেননা যেন।

—না ভুলবোনা।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

সাগর দোলায় ঢেউ

শ্রীনবগোপাল দাস আই-সি-এস্

*

* *

দূরে ডাঙার অস্তায়মান রেখাটুকু পর্য্যন্ত যখন সমুদ্রের কল্লোলের সাথে মিশে গেল তখন মোহিত ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ষ্টীমারের রেলিংটা ছেড়ে ডেকের ভিতরে তার চেয়ারটির খোঁজে গেল।

সমুদ্রের সাথে পরিচয় তার এই প্রথম—দেশের মাটির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার প্রয়োজনও এর আগে হয়নি। এই যে যাত্রা সুরু হ'লো এর শেষ কবে হবে?……বারবার মোহিতের মনে শুধু এই কথাটিই জাগছিল।

ডেক্ তখন যাত্রীদের ভীড়ে ভরে গেছে। সেকেণ্ড ক্লাশের ডেক—খুব বড়োও নয়। মোহিত কিছুতেই তার ক্যাবিন নম্বরের অনুযায়ী চেয়ারটি খুঁজে পাচ্ছিল না।

তাকে অমন ক'রে তাকাতে দেখে একটি ছেলে ইংরেজীতে বলে উঠলো, আপনি কি আপনার চেয়ারটি খুঁজছেন?

মোহিত একটু লজ্জায়, একটু কৃতজ্ঞভাবে বল্লে, হ্যাঁ, আমার নম্বর হচ্ছে ৪৭৬ ··এদিকে কোথাও হ'বে হয়ত···

ছেলেটি হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে রোদ উপভোগ কর্‌ছিল। একটুখানি উঠে বসে পিছনকার চেয়ারের উপরের কার্ডটার দিকে তাকিয়ে বল্লে, আমারই অন্যায় হয়ে গেছে—আপনার চেয়ারটি যে আমিই অধিকার ক'রে বসে আছি! ···মুখে তার একটু অপ্রস্তুতভাব।

মোহিত তাকে উঠ্‌তে দেখে একটুখানি লজ্জিত বোধ কর্‌লে। আহা, বেচারী দিব্যি আরামে শুয়ে সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্যরশ্মির খেলা দেখছিল; তাকে বেদখল কর্‌তে তার যেন বেশ খানিকটা দ্বিধা বোধ হচ্ছিল।

ছেলেটি কিন্তু খুবই সপ্রতিভ। সে এক মুহূর্ত্তে মোহিতের মনের দ্বন্দ্ব বুঝে নিয়ে বল্‌লে, আপনি বসুন, আমি আপনার পায়ের কাছে এই পা'দানটার উপর বস্‌ব—আপনার আপত্তি হবে না ত?

আপত্তি?—সমস্যার এমন একটা সহজ অথচ সুষ্ঠু সমাধান হয়ে গেল বলে মোহিত ছেলেটির কাছে ভয়ানকভাবে কৃতজ্ঞ বোধ কর্‌ছিল। সে হেসে জবাব দিলে, মোটেই নয়—আপনার সাথে গল্প কর্‌তে পার্‌লে সময়টা কাট্‌বে ভাল!

—তাহ'লে পরিচয় সুরু হোক্, কি বলেন?

মোহিত স্মিতমুখে ঘাড় নাড়লে।

—আমার নাম হচ্ছে যোশী···বম্বের লোক তা বোধ হয় নাম থেকেই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন।· দেশে এসেছিলাম গরমের ছুটিটাতে বেড়াতে, আবার ফিরে চলেছি।

মোহিত একটু সম্ভ্রমভরা চোখে যোশীর দিকে তাকালে। সে যে দেশের মণিমুক্তা সংগ্রহ কর্‌তে যাচ্ছে যোশীর কাছে তা' একেবারে পুরাতন!···গল্প শুন্‌বার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল।

বল্‌লে, আমার নাম মোহিত সেন। আমি অবশ্যি এই প্রথম যাচ্ছি বিলেতে—দেশটা সম্বন্ধে ধারণা আমার কিছুই নেই, দু'তিনটে ভ্রমণকাহিনী পড়ে আমার কল্পনাটাও যেন অনেকখানি গুলিয়ে গেছে! ... আপনার সাথে আলাপ হ'য়ে বেশ ভালোই হ'লো—অনেক কিছু শোনা যাবে!

যোশী হেসে বল্‌লে, কিন্তু আমার কথাগুলো আপনার কল্পনাকে হয়ত একটুও সাহায্য করবে না, অথচ বাস্তব যা' তার ছবিও হয়ত আমি ঠিক ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌ব না। ···কাজেই এসব নিয়ে গল্প না করাই ভালো!

মোহিত বুঝ্‌লে যোশী তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। তার এই ভদ্র প্রত্যাখ্যান মোহিতের কাছে যেন বড্ড গর্ব্বোদ্ধত বলে ঠেক্‌ল। সে মর্ম্মাহত হয়ে চুপ করে রইল।

যোশী তার নীরবতা লক্ষ্য ক'রে তাকে প্রশ্ন করলে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন—লণ্ডন না কেম্ব্রিজ?

মোহিত সংক্ষেপে জবাব দিলে, কেম্ব্রিজ—

যোশী উৎসাহসূচকস্বরে বললে, আপনি ভয়ানক ভাগ্যবান্ যা'হোক—কেম্ব্রিজে সিট পেয়েছেন!—আমি ত দু'বছর চেষ্টা করেও সেখানে সীট পেলুম না!—আমার না আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণাঙ্কিত ছাপ, না আছে আভিজাত্যের গৌরব—

মোহিত বল্‌লে, আমি আমার প্রোফেসারদের অনুগ্রহেই সীট পেয়েছি বল্‌তে হবে!—আপনি কি লণ্ডনেই পড়ছেন?

—হ্যাঁ, বছর দুই হ'লো, আস্‌ছে জুনেই পরীক্ষাও দিতে হবে—সেই কথা মনে হ'লেই গায়ে জ্বর আসে!

মোহিত কিছু বল্‌লে না।

যোশী বস্‌তে লাগলে, লণ্ডনে বসে কি আর পড়াশুনা চলে? সেখানে চিত্তবিক্ষেপকারী জিনিষের অভাব ত' নেই—সীনেমা, থিয়েটার আর week-end পার্টি ত লেগেই আছে, তার ওপর বন্ধুদের আব্‌দার শুন্‌তে শুন্‌তেই সময় আর উৎসাহ চলে যায়!—আপনি কেম্ব্রিজে গিয়ে ভালোই করেছেন, তবু কটা মাস একটু মন দিয়ে পড়াশুনা করতে পার্‌বেন।

মোহিত যোশীর কথার তাৎপর্য্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পার্‌ছিল না। সে বিস্মিতভাবে বল্‌লে, কিন্তু লণ্ডনে থেকে ত কত ছেলে পড়াশুনা করছে, নয় কি?

একটুখানি মুচকি হেসে তাচ্ছিল্যের সুরে যোশী জবাব দিলে, যারা করছে তারা একেবারে গ্রন্থকীট—জীবনে পড়া ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না!—লাইফ্‌ ব'লে যে মস্ত বড় জগৎ পড়াশুনার গণ্ডীর বাইরেও পড়ে রয়েছে তার খবর কি তারা রাখে? —আপনার কাছে আজ এসব কথা ভয়ানকভাবে বেসুরো ঠেক্‌ছে, কিন্তু আপনিও মাস ছয়েক পরে আমার সাথে একমত হবেন, অবশ্য যদি গ্রন্থকীটদের দলে না ভিড়ে যান!

মোহিত দু'একজন বন্ধুর কাছে এই বিশাল "জগৎ"টার কথা একটু-আধটু শুনেছিল, মনে মনে খানিকটা কল্পনাও করে নিয়েছিল সে, আর খুব দৃঢ়ভাবে মনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে এই "জগৎ"এর ঘূর্ণিপাকে সে পড়বে না, পড়লেও হাবুডুবু খাবে না। ...কাজেই যোশীর কথায় সে একটুখানি সন্দিগ্ধ-হাসি হাস্‌লে মাত্র।

চায়ের ঘণ্টা পড়ল। সমুদ্রের দোলানি তখনও বিশেষ আরম্ভ হয়নি', যাত্রীরা বেশ সুস্থভাবেই চায়ের টেবিলে এসে বস্‌লে।

ডেকের উপরই চায়ের টেবিলগুলো সাজানো হয়েছিল; আর যাত্রার সুরু বলেই বোধ হয় অর্কেষ্ট্রা বাজছিল যেন...

যোশী আর মোহিত ঠিক্ রেলিঙএর ধারে একটি টেবিল অধিকার করে বস্‌লে। যোশী তখনও বেশ বিজ্ঞতামাখা-সুরে একটু মুরুব্বিয়ানার ভাবে মোহিতের সাথে গল্প করছিল, আর মোহিত তার প্রথম কৌতূহল, অজ্ঞতা এবং অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে সেসব শুন্‌ছিল।

সমুদ্রের জলের উচ্ছ্বাস এসে জাহাজের গায়ে লাগছিল আর জাহাজটি মাঝে মাঝে একটু দুলে উঠ্‌ছিল। এই নতুন অনুভূতিটুকু মোহিতের কাছে কিন্তু খুবই প্রীতিকর বলে মনে হচ্ছিল—শীকরকণার শীতল স্পর্শ তাকে তার মায়ের স্নেহস্পর্শের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

মায়ের কথা মনের কোণে ভেসে উঠতেই তার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখ মুছলে। যোশী একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হল?

নিজের ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় একটু লজ্জিত হয়ে মোহিত জবাব দিলে, কিছু নয়। ...হঠাৎ কী জানি কেন চোখ দিয়ে জল এসে পড়ল!

যোশী সহানুভূতিভরা স্বরে বল্‌লে, বাড়ীর কথা মনে হচ্ছে বুঝি?

ছুরী দিয়ে টোষ্টের উপর মাখন মাখাতে মাখাতে মোহিত জবাব দিলে, হ্যাঁ।

—তুমি বুঝি এর আগে বেশীদিন বাড়ীছাড়া হওনি'?

—না, বাড়ীতেই থেকে আমি পড়তুম কি না!

যোশী তার অন্যমনস্ক ভাবটা দূর করে দেবার প্রয়াস করে বল্‌লে, অর্কেষ্ট্রায় কী বাজাচ্ছে জানো ?

—না...আমি ত এর আগে ইংরেজী গান বিশেষ শুনিনি'...

—ওরা Blue Danube বাজাচ্ছে।...শোন, কী সুন্দর ওর সঙ্গীত ঝঙ্কার···সুরের মূর্চ্ছনার মধ্যে যেন ড্যানিয়ুব্‌এর নীল জলের স্বচ্ছ প্রবাহ ভেসে আস্‌ছে !

মোহিত মন দিয়ে সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপভোগ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে। ভায়োলিনের মধুর তালে তালে ড্যানিয়ুব্‌এর চঞ্চল অথচ নির্ম্মল স্রোতের কল্লোল যেন শোনা যাচ্ছিল। যদিও তার অনভ্যস্ত কানে সঙ্গীতের সব পদগুলো ঠিক ফুটে উঠ্‌ছিল না তবু তার মাদকতা তার মনকে আবিষ্ট ক'রে তুল্‌ছিল। আর তার মনে আস্‌ছিল বাংলা একটা গানের সুর—যেন কেউ "গ্রামছাড়া ঐ পথিক···" বাজাচ্ছে···

চায়ের পেয়ালা শেষ কর্‌তে কর্‌তে যোশী বল্‌লে, তুমি আমার উপর রাগ কর নাই ত মোহিত ?

মোহিত বিস্ময়পূর্ণচোখে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, না—রাগ কর্‌ব কেন ?

যোশী বল্‌লে, একটু আগেই তুমি বিলেতের গল্প শুন্‌তে চেয়েছিলে, আমি তার কিছুই বলিনি' ব'লে !

মোহিত যোশীর কথার আন্তরিকতায় আর্দ্র হয়ে বল্‌লে, কী ছেলেমানুষ তুমি, যোশী···এর জন্য আমি রাগ কর্‌তে যাব কেন ? তুমি ঠিকই বলেছ হয়ত, আমার কল্পনাকে বাস্তবের নগ্নতা দিয়ে এত শীগ্‌গীরই ভেঙে দিতে চাওনি'... সে ত' তোমার সহানুভূতির পরিচায়ক, বন্ধু···

যোশী হেসে বল্‌লে, ঠিক সহানুভূতির ভাব থেকে যে আমি তোমাকে বল্‌তে চাইনি' তা' নয় !...চোখের সামনে ওদেশের কতগুলো জিনিব দেখে আমার শ্রদ্ধা অনেকখানি কমে গিয়েছে বলেই আমি সে সব আঙুল দিয়ে তোমাকে দেখাতে চাইনি'। কল্পনার চোখে যদি তুমি দেখ তাহ'লে যা' সাধারণ তা'ও সুন্দর এবং মধুর বলে ঠেক্‌বে...শুধু শুধু এই কল্পনার অনুভূতিকে নষ্ট ক'রে ত লাভ নেই !

মোহিত একটু হেসে বল্‌লে, একেই ত সাধুভাষায় বলে, সহানুভূতি...

যোশী আনমনাভাবে বল্‌লে, হবে ··

তখনও সন্ধ্যা হয়নি'। সমুদ্রের দোলানি একটু একটু আরম্ভ হয়েছে···দুটি ছোট্ট ছেলে রেলিংএর কাছে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি-সূচক মুখভঙ্গী করছিল, আর একটি মহিলা, হয়ত বা তাদের মা হবেন, কাছে রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মুখের ভাব থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে অনতিকাল-বিলম্বে তিনিও আক্রান্ত হয়ে পড়্‌বেন্।

যোশী এই দৃশ্য থেকে চোখ এড়িয়ে নিয়ে মোহিতকে বল্‌লে, এখানকার বাতাসটা বড্ড বদ্ধ হয়ে গেছে যেন। চলো ফার্ষ্টক্লাশের ডেকে একটু বেড়িয়ে আসি।

মোহিত একটু সঙ্কুচিতভাবে বল্‌লে, আমাদের কোনরকম প্রশ্ন কর্‌বে না ত ?

হেসে যোশী বল্‌লে, পাগল নাকি !···আমরা ত' আর সেখানে আস্তানা গাড়্‌তে যাচ্ছি না—সেখানে যাচ্ছি শুধু দু'একজন বন্ধুবান্ধবের খোঁজ কর্‌তে।

—তোমার জানাশুনো কেউ আছে নাকি ?

—ঠিক জানিনে, তবে শ দুই যাত্রীর মধ্যে কি দু'একজন মিল্‌বে না ?...না হয় যেচে ভাব ক'রে নেব...

মোহিত একটু শ্রদ্ধাভরে যোশীর দিকে তাকালে। তার সাহসিকতা, তার খোলাখুলি উক্তির কাছে তার মনের নতি জানালে।

এদিক ওদিক ঘুরে মোহিত আর যোশী ফার্ষ্টক্লাশের প্রশস্ত ডেকের উপর গিয়ে হাজির। ডেকের উপর সবাই হয় শুয়ে আছে, নয় পায়চারী কর্‌ছে। স্বাস্থ্যকামীর দল একটি সন্ধ্যাও কামাই কর্‌তে রাজী নয়, তারা খাকী শার্টস্ এবং মোজা পরে বীরবিক্রমে ডেকের উপর পরিক্রমণ কর্‌ছে ; কাহারও মুখে পাইপ্, কাহারও হাতে বেতের rattan.

যোশী একটু হেসে বল্‌লে, এই যে সব বীরপুরুষদের দেখ্‌ছ এরাই জাহাজের সজীবতা বজায় রাখে। এঁদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখ্‌লে মনে হয় নেপোলিয়নও বোধ হয় এদের কাছে হাঁটু গেড়ে নিজের অক্ষমতা এবং দৈন্য জানাতেন !

মোহিত একটু হাস্‌লে।

যোশী বললে, ঐ যে বিসমার্কের মত শাদা গোঁফওয়ালা বুড়োটাকে দেখছ ও বোধ হয় একটা কর্ণেল গোছের কিছু হবে। আমি শপথ করে বলতে পারি বুড়ো অন্ততঃ একশ'টিবার জাহাজের এমাথা থেকে ওমাথা পর্য্যন্ত পায়চারী করতে না পারলে শান্তি পাবে না......তার এই পাদচারণের সমাপ্তি হবে দু'পেগ হুইস্কী এবং সোডায়!

মদের নাম উল্লেখ হ'তেই মোহিত ভয়ানক বিতৃষ্ণায় বলে উঠলে, এরা কি সবাই মদের পিপে?

যোশী হেসে বললে, এই সব ভবঘুরে সৈনিকদলই হচ্ছে এ বিষয়ে সব চেয়ে বড় ওস্তাদ্! কিন্তু এদের বাদ দিলেও তুমি এমন একটি লোক বার করতে পারবে না যিনি এই স্বচ্ছ তরল পদার্থটির মধুতে মোহিত নন্!

মোহিত একটু তীব্রস্বরে বললে, অথচ এরাই আবার সভ্যতার শ্রেষ্ঠতার দাবী করে।

যোশী মোহিতের এই রাগে একটু আমোদ বোধ করে বললে, এতে সভ্যতার আদর্শের কী ক্ষতি হল মোহিত?... তুমি যেটাকে এত বিতৃষ্ণার চোখে দেখছ সেটা যে এদের কাছে নিতান্ত সাধারণ একটা পানীয়!...এদের মাপকাঠি দিয়ে এদের বিচার ক'রো!

তবু প্রতিবাদের সুরে মোহিত বললে, কিন্তু সত্যের একটা মাপকাঠি আছে ত! মদ খাওয়াটাকে আমি মোটেই কোন নীতিসম্মত বলে মানতে পারি না!

যোশী এর জবাব অনায়াসেই দিতে পারত, কিন্তু মোহিতের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে একটা রূঢ় আঘাত দেবার ইচ্ছা তার ছিল না।

মোহিত পাদচারিণী একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, আর ওদের মেয়েদের এই পোষাকটা আমার মোটেই বরদাস্ত হয় না...এর মধ্যে না আছে শ্রী, না আছে হ্রী; এ যেন একটা বিরাট্ নগ্নতাকে জোর ক'রে গর্ব্বভরে লোকের চোখের সামনে তুলে দেওয়া হচ্ছে!

এবার যোশী প্রতিবাদ করলে, বললে, তোমার এই অতিশয়োক্তি আমি মোটেই মানতে রাজী নই, মোহিত। তোমার নতুন চোখে অনভ্যস্ত জিনিষটা হয়ত একটু দৃষ্টি-কটু দেখাতে পারে, কিন্তু তাই বলে এদের পোষাককে শ্রী বা হ্রীহীন বলতে আমি রাজী নই। এদের সাধারণ মেয়েরা বেশভূষার মধ্যে সৌন্দর্য্যের যা কাল্চার জানে আমাদের গরীব সংস্কারভরা দেশে অনেক বড় বড় লোকেরাও তা' জানে না!

মোহিত একটুও না হঠে বললে, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের শাড়ীর মত সুন্দর ও কোমল আর কিছু আছে কি যোশী?

যোশী বললে, এরকম তুলনামূলক সমালোচনা বড্ড অন্যায়, মোহিত। আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে শাড়ীটি মেয়েদের অঙ্গে যেমন মানায় এদের জীবনযাত্রার মধ্যে এদের স্কার্ট, ফ্রক বা গাউনও তেম্নি মানায়...

মোহিত এর কোন জবাব দিতে না পেরে চুপ করে রইলো।

রেলিংএর উপর ঝুঁকে দুজনে সমুদ্রের উপর সূর্য্যাস্তের শোভা দেখছিল। যেন লাল একটা অগ্নিগোলক ধীরে ধীরে সমুদ্রের শীতল জলের স্পর্শ পাবার লোভে তার মধ্যে মিশে গেল, আর তার চারিদিকে মেঘের কোলে পথটা আবীর-রাঙা হয়ে রইল।

মুগ্ধনেত্রে মোহিত এই অপূর্ব্ব দৃশ্যটি দেখছিল, হঠাৎ কানের কাছে একটি সম্বোধনের স্বরে সে স্বপ্নোত্থিতের মত ফিরে তাকালে।

—হ্যালো, যোশী...

দেখলে, সুন্দরী একটি মেয়ে চাঁপা রঙ্এর একটি ফ্রক্ পরে যোশীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে...মুখে তার মৃদু হাসি।

যোশী আচম্কা এই সম্ভাষণে একটুখানি বিস্মিত হয়ে পেছন ফিরে তাকালে। তারপর পরিচিত সুরে হাসিমুখে বললে, হ্যালো, মিস্ রজার্স...তুমিও কি অবশেষে এই জাহাজেই চলেছ?

হেসে মিস্ রজার্স জবাব দিলে, তাইত' দেখছি... এখন জাহাজ না ডুবলেই বাঁচি!

যোশী উচ্চহাসির কল্লোলে কোয়্-ডেক্টা মুখরিত করে বললে, তাহ'লে এমি জন্সনের মত উড়ে পালালে না কেন?

তেমনি হাসিমুখে মিস্ রজার্স জবাব দিলে, পাখাও ত' ভেজে যেতে পারত!

যোশী তখন মোহিতকে এগিয়ে দিয়ে মিস্ রজার্স'এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে, এটি আমার কয়েক ঘণ্টার বন্ধু, মিস্ রজার্স, কাজেই লম্বা সার্টিফিকেট দিতে ভরসা হচ্ছে না:...তবে ইনি এখনও বিদেশের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা, একটা তীব্রতার ভাব কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি।

মোহিত যোশীর এই গায়েপড়া গোছের বক্তৃতায় একটু বিরক্তি বোধ করছিল। সে কোন কথা না বলে চুপ করে রইলো।

মিস্ রজার্স অভিবাদনসূচক একটা ভঙ্গী ক'রে জিজ্ঞেস্ করলে, আপনি বুঝি এই প্রথম দেশছাড়া?

মোহিত সংক্ষেপে জবাব দিলে, হ্যাঁ।...কী-জানি-কেন মিস্ রজার্স আর যোশীর উচ্চহাসি আর কৌতুক তার চোখে কেমন যেন ঠেক্‌ছিল।

মেয়েটি নাছোড়বান্দা। আবার প্রশ্ন করলে, আপনার নিশ্চয়ই ভয়ানক মন খারাপ লাগ্‌ছে, নয় কি?

মোহিত অনন্যোপায় হয়ে উত্তর দিলে, একটু-আধটু লাগ্‌ছে বৈকি।

সহানুভূতির সুরে মিস্ রজার্স বললে, দুদিন ওরকম লাগ্‌বে, তারপর সেরে যাবে!...তা' ছাড়া সমুদ্রের হাওয়ার গুণ যাবে কোথায়?

মোহিত এর কোন জবাব দিলে না।

যোশী চুপ করে এদের কথোপকথন শুনছিল। সে প্রতিবাদের সুরে বললে, আমার সরল বন্ধুটির কাছে সমুদ্রের হাওয়ার গুণব্যাখ্যান করতে হবে না এখন! তোমরা মেয়েরা হচ্ছ শয়তানের প্রতীক, কাউকে দেখ্‌লেই তোমাদের স্বভাবগত বৃত্তিগুলো জেগে ওঠে, তাকে তোমাদের ফিলসফির মধ্যে টেনে আন্‌তে না পারলে তোমাদের তৃপ্তি হয় না।

মিস্ রজার্স বললে, এ তোমার বড্ড অন্যায়, যোশী। আমাদের ফিলসফি খুবই সহজ এবং ঋজু। তোমরা পুরুষেরাই সব জিনিষের একটা বঙ্কিম ব্যাখ্যা করে সাধারণতঃ প্রমাণ করতে চাও যে তোমরা যা করো তার পেছনে থাকে একটা মহানুভবতা, একটা গভীর অনুবেদনা। কিন্তু ওরকম কৃত্রিমতার মুখোস পরে তা নিয়ে দার্ঢ্য প্রকাশ করতে আমাদের সুরুচিতে বাধে।

মোহিত একমনে এদের আলোচনা শুনছিল। মিস রজার্স'এর হাস্যচপল লীলাভঙ্গী তার কাছে প্রীতিকর না ঠেকলেও তার কথাগুলো শুনে তার মন বেশ একটু আকৃষ্ট হয়ে উঠছিল। কিন্তু এসব মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা তার জুরিসডিক্‌শনের বাইরে, কাজেই নীরব শ্রোতা হয়েই সে আনন্দ পাচ্ছিল বেশী।

যোশী মিস্ রজার্স'এর শ্লেষসূচক সুরে একটু অস্বস্তি করছি বোধ করে বললে, কিন্তু তোমার এরকম একতরফা বিচার কি উচিত হচ্ছে মিস্ রজার্স?

মিস্ রজার্স একটু হেসে জবাব দিলে, একতরফা বিচার না যোশী একটুখানি ওকালতী করছি মাত্র। তোমাদের কৃত্রিমতারও ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় সময় সময় এবং ব্যতিক্রম আছে বলেই তোমরা যে নকল সেটা জোর-গলায় বলতে পারি।

যোশী চুপ করে রইলে।

মিস্ রজার্স এবার মোহিতের মৌনতা ভাঙ্‌বার উদ্দেশ্যে তাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলে, আপনি নিশ্চয়ই এসব তর্ক শুনে মনে মনে হাসছেন, না?

মোহিত এর কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে লজ্জাবিনম্রসুরে বললে, আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম তাই এসব মনস্তত্ত্বের সমস্যা সমাধান করবার মত আস্পর্দ্ধা আমার মনের কোণে স্থানই পায় না।

মুখে সুন্দর একটি হাসি ফুটিয়ে মিস্ রজার্স বললে, আপনি দেখছি ভয়ানক সীরিয়স লোক! আমরাই বা কী আর জানি? শুধু তর্কের খাতিরে, গল্প করবার অজুহাতে আর সময় কাটাবার অছিলায় এসব দার্শনিক আলোচনা পেড়ে বসি, নয় কী যোশী?

যোশী সায় দিয়ে বললে, সত্যি। তারপর মোহিতের দিকে তাকিয়ে বললে, ওদেশে গিয়ে তুমি দেখবে, মোহিত, কলেজের কমনরুমটা হচ্ছে এ সব গভীর দার্শনিক আলো-

চনার একটা প্রকাণ্ড আড্ডা। ছেলে মেয়েরা যে কী গভীর উৎসাহ নিয়ে নব্য জার্ম্মাণীর সমস্যা বা রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করতে থাকে তা দেখে তুমি সত্যি অবাক হয়ে যাবে—তোমার মনে হবে যেন সমস্ত জার্ম্মাণী বা রুশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কমনরুমের ঐ গবেষণাটুকুর ফলাফলের ওপর।

মিস রজার্স তার হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকালে, তারপর বললে, আমায় এখন নড়তে হচ্ছে… সময়মত পোষাক পরে যদি তৈরী না হয়ে নেই তা হলে অভিভাবিকাটীর কান্নার সুরে আমি পাগল হয়ে যাব।

যোশী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, তুমি আবার অভিভাবিকার সাথে এসেছ নাকি? অবাক করলে যা হোক?…

একটুখানি রাঙা হয়ে বললে, আমার স্বাধীন ইচ্ছামত কাজ করবার অবসর এখনও পাইনি, তাই এসব অত্যাচার সহ্য করতেই হয়। আমার বাবাটি তোমাদের দেশের উপর কী হাড়ে হাড়ে চটা তা তো জান না। ভাবেন তোমরা সবাই বুঝি জংলী দেশের মানুষ তাই আমাকে একা ছেড়ে দিয়ে তিনি মনের স্বস্তি হারিয়ে বসেন।

মোহিত মিস রজার্স-এর এই কথাটিতে ভয়ানক ভাবে রুষ্ট হয়ে বললে, আপনি তাহলে আমাদের মত জংলীদের সাথে কথাবার্ত্তা কয়ে আপনার অপমানের বোঝা না বাড়ালেই পারেন।

মিস রজার্স একটু আহতস্বরে বললে, আপনাদের মহত্ত্ব আর উদারতার মর্য্যাদা যদি আমি না বুঝতাম তা হলে কী যেচে আপনাদের সাথে আলাপ করবার জন্য এত উন্মুখ হতাম মিঃ সেন?

ব'লে আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে ক্ষুদ্র একটি অভিবাদন করে সে দ্রুতগতিতে চলে গেল।

যোশী তার গতিশীল মূর্ত্তিটির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, তুমি মিস রজার্সকে ভয়ানক চটিয়ে দিলে, মোহিত।

তাচ্ছল্যভরাকণ্ঠে মোহিত জবাব দিলে, বেশ করেছি। ওরকম দেমাকভরা কথা আমার মোটেই সহ্য হয় না।

তারপর যোশীর উপর যেন প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যেই একটু তীব্রস্বরে বললে, তুমি ওদেশের আদবকায়দা ভাল ভাবে জান, যোশী, ওদের মিষ্টি হাসি, লীলায়িত ভঙ্গী আর মিহিসুর তোমার কাছে উর্ব্বশীতিলোত্তমাসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার চোখে ওদের হাসির পেছনে লুকানো অহমিকার নগ্নতাটাই বাজে বেশী।

যোশী একটু হেসে মোহিতের পিঠ চাপড়ে বললে, তুমি আজ যে মন্তব্য প্রকাশ করলে, মোহিত, এর জন্যে দুদিন পরে নিজেই অনুতাপ বোধ করবে, কাজেই এসম্বন্ধে বেশী আর কিছু বলব না। তবে এটুকু বলতেই হবে যে তুমি মিস রজার্সকে মোটেই চেননি। যেদিন চিনতে পারবে সেদিন দেখবে ওর মিষ্টি হাসি লীলায়িত ভঙ্গী আর মিহিসুরের পেছনে শুধু অহমিকাই লুকিয়ে নেই, তার পেছনে একটা সরল উদার মনও উঁকিঝুঁকি মারছে।

মোহিত এর কোন জবাব দিলে না, শুধু একটুখানি অবিশ্বাসের হাসি হাসলে।

তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। যোশী আর মোহিত ডিনারের জন্য তৈরী হবার উদ্দেশ্যে তাদের নিজেদের ক্যাবিন অভিমুখে যাত্রা করলে।

সারাটি দিন মোহিত তার ঘরের ভেতর যায়নি। যোশীর সাথে পরিচয় হবার পর থেকে তার সময়টা যে কখন কী ভাবে কেটে গেছে সে নিজেই বুঝতে পারেনি। জাহাজের দোলানীর সাথে নিজের দেহটার ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে সে অপ্রশস্ত corridor দিয়ে যখন নিজের কামরায় ঢুকল তখন সেখানকার বদ্ধ হাওয়ায় তার মেজাজের তীব্রতা আরও বেড়ে উঠল।

ঘরে ঢুকে সুইচটা জ্বালতেই দেখলে তার সহযাত্রী একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক নীচের ব্যার্থ এ শুয়ে আছে।

আলোটা চোখে পড়ায় সে একটু পাশ ফিরে তাকিয়ে বললে, গুড ইভনিং…

মোহিত বললে, গুড ইভনিং—আপনি কী ভয়ানক কাতর বোধ করছেন?

ছেলেটী—তার নাম চিদম্বরম্—একটুখানি মলিন হেসে

বললে, আর বলবেন না, যাত্রার সুরুতেই যা আরম্ভ হল তাতে আর ভরসা হচ্ছে না।

মোহিত তার শিয়রের কাছে বসে একটু আর্দ্রস্বরে বললে, এ কালই সেরে যাবে আপনার। যা কিছু দুর্ভোগ আগে শেষ হয়ে গেলেই ত ভালো!...তারপর দিব্যি চাঙা হয়ে বসে সমুদ্রের হাওয়া খেতে পাবেন।

কাতরভাবে চিদম্বরম্ বললে, দুর্ভোগের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত উপভোগের ক্ষমতাটুকু বেঁচে থাকলেই নিয়তিকে ধন্যবাদ দেব···

মোহিত একটু হেসে তার চুল কটা ঠিক করে নিলে তারপর চিদম্বরমকে আর একবার গোটাকয়েক সান্ত্বনাসূচক কথা ব'লে সুইচ্ টা টিপে বার হয়ে গেল।

* *

*

ভোরবেলা মোহিতের যখন ঘুম ভাঙ্ল তখনও বেশ ক'রে ফর্সা হয়নি। পোর্টহোল্টা খোলা ছিল, আর তার ভিতর দিয়ে সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছ্বাস চঞ্চল কিশোরীর মত ঢুক্বার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার ছোট দুটি হাতে কিছুতেই নাগাল পাচ্ছিল না। মোহিত বিছানার উপর উঠে বসে পোর্ট্হোল্টার মধ্য দিয়ে সমুদ্রের জলটা একবার দেখ্বার চেষ্টা করলে।

চোখ তার তখনও ঘুমে ভারাক্রান্ত। খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ যখন আবার ঘুমের আবেশে মুদে এলো তখন সে বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুম যখন আবার ভাঙ্ল তখন অনেকখানি বেলা হয়ে গেছে। সূর্য্যোদয় দেখ্বার তার ইচ্ছা ছিল বেজায়, সেটা নিজের কুঁড়েমির জন্য এমনিভাবে মাটি হয়ে গেল! সে কোন ক্রমেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না। ধড়মড়িয়ে উঠে সিঁড়ি বেয়ে সে মেজেতে নাম্লো।

চিদম্বরম্ তখন অঘোরে ঘুমুচ্চে—তার মুখে শ্রান্তির রেখা। মোহিত কোন-রকমে ড্রেসিংগাউনটা গায়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেল।

পিছনের ডেকে তখন লোকের ভীড় জমে গেছে। সূর্য্যের নীলিমা কখন আকাশে মিশে গেছে, তার কিরণের প্রখরতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে!···ছোট ছোট groupএ যাত্রীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল।

যোশী ছায়ার নীচে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। মোহিতকে উঠে আসতে দেখে বললে, এতক্ষণে বুঝি তোমার সূর্য্যোদয় দেখ্বার সময় হ'লো!

মোহিত লজ্জিতভাবে বললে, আমি উঠেছিলাম অনেক আগেই, আবার হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলার ঘুমটা এত মিষ্টি লাগে!

যোশী বললে, একটা জিনিষ miss করলে কিন্তু!

—কী?

—মিস্ রজার্স তার আধঘুমন্ত চোখ আর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলো চুল নিয়ে সূর্য্যোদয় দেখতে এখানে এসেছিল, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে!

মোহিত একটা বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করলে।

যোশী সেটা উপেক্ষা করে হাস্তে হাস্তে বললে, শুধু তাই নয়, তোমার খোঁজ করছিল!

মোহিত বিশ্বাস না করে বললে, কেন?

—কেন আমি কী ক'রে বলব? মেয়েদের অন্তর-রহস্য বোঝ্বার মত ক্ষমতা ত' আমার নেই!···কালকে এমন খোঁচা দিলে তুমি, অথচ আজ ভোর বেলা প্রথম প্রশ্নটি আমাকে 'তোমার সেই বন্ধুটি কোথায়?'

মোহিত এবার একটু হেসে বললে, তোমার মন বড্ড খারাপ যোশী, সাধারণ ভদ্রতাসূচক একটা প্রশ্নের মধ্যে তুমি গভীর অর্থ খুঁজবার চেষ্টা করছ!

কাঁধটা বিচিত্রভঙ্গীতে নাড়িয়ে যোশী জবাব দিলে, গভীর অর্থ খুঁজ্বার চেষ্টা করতুম না যদি তার পরই দ্বিতীয় প্রশ্নটি না হত, 'উনি কি আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছেন?'

মোহিত একটু কুপিত হয়ে বললে, তাঁকে বলো তিনি এমন কিছু রাশভারি লোক নন্ যে তাঁকে নিয়ে সারাদিন আমার মাথাব্যথা হবে!

যোশী মোহিতের কথায় অশ্চর্য্যান্বিত ও রুষ্ট হয়ে বললে, ও রকম বর্ব্বরের মত ব্যবহার করলে তুমি নিশ্চয়ই পরে অনুতপ্ত হবে মোহিত!

এবার একটু শান্ত হয়ে মোহিত জবাব দিলে, কিন্তু আমাকে নিয়ে এরকম মাথা ব্যথা কেন তাঁর?

—কেন তা' যদি জানতে পারতুম তা হ'লে এমনি অলস-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতুম? তা হ'লে এতক্ষণে যবনিকা ভেদ করে নেপথ্যের দৃশ্যটিকে সম্মুখে টেনে নিয়ে আসতুম!

যোশীর রূপকভরা কথা শুনে মোহিত আর হাসি চেপে রাখতে পারলে না। বললে, বিলেত প্রবাসের ফলে বুঝি তোমার কল্পনা-শক্তি এমন অদ্ভুতভাবে বেড়ে উঠেছে?

তার কল্পনাশক্তি বেড়েছে কি কমেছে সেটা সে যেন নিজেই বুঝতে পারছে না, এমনি একটা ভঙ্গীতে মাথাটি আন্দোলন করে যোশী জবাব দিলে, এ ত কল্পনাশক্তির খেয়াল নয়, মোহিত, এ যে ভয়ানক সত্যি কথা!···হেসো না মোহিত, আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে যে মিস্ রজার্স তোমাকে একটুখানি পছন্দ করতে আরম্ভ করেছেন! অবশ্য, এর মধ্যে বিস্মিত হবার কিছুই নেই!

মোহিত যোশীর মুখের গভীরতা হাসির এক ঝলকে উড়িয়ে দিয়ে বললে, তোমার এই গবেষণার জন্য তোমাকে নোবেল প্রাইজ আমি দিতুম যোশী, কিন্তু আপাততঃ খিদেয় নাড়ী চুঁইয়ে যাচ্ছে, কাজেই আমি প্রস্তাব করছি এখন বাস্তব জগতে ফিরে এসে ব্রেক্‌ফাষ্ট খাবার বন্দোবস্ত করা যাক্।

ব্রেক্‌ফাষ্ট সেরে মোহিত আর যোশী যখন আবার ডেকের উপর এসে বসলে তখন হাট বসে গেছে। সমুদ্র অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে—দোলানিটা নাড়ীভুঁড়িকে কোন রকম পীড়া না দিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে আরম্ভ করেছে।

চিদম্বরম্ উঠে বসেছিল; মোহিত আসতেই সে হাত নেড়ে তাকে ডাকলে। মোহিত যোশীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চিদম্বরম্-এর কাছে এগিয়ে গেল।

চিদম্বরম্ তাকে পাশের ডেক্‌চেয়ারটায় বসতে বলে তার কানের কাছে মুখটা নিয়ে এসে খুব চুপি চুপি বললে, আপনার সাহায্য একটু দরকার মিঃ সেন, একটু আগে একজন স্প্যানিয়ার্ড পাদ্রি ভয়ানকভাবে তর্ক আরম্ভ করেছিলেন খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য নিয়ে; এই মাত্র নীচে তাঁর ক্যাবিনে চলে গেছেন কী একটা বই আনতে···আমি ওঁ' ওঁর সাথে এঁটে উঠতে পারছি না···আপনি বসুন এখানে, এলেন ব'লে।

মোহিত ত' এই চায়! সে ভয়ানক উৎসাহের সুরে বললে, ওর ধর্ম্মান্ধতা যদি খানিকটা ঘোচাতে পারি তা হ'লে আমি ভয়ানক আনন্দ করব, মিঃ চিদম্বরম্।

তৎক্ষণে তাঁর আভূমি বেশভূষা লুটাতে লুটাতে ফাদার মাদারিয়াগা একখানা বই হাতে ক'রে হাজির। যেন মস্ত বড় একটা জেহাদ্‌এ নামছেন এমনি সুরে হাতের বইখানা চিদম্বরম্‌এর চোখের সামনে ধরে বললেন, এই দেখুন····

চিদম্বরম্ নিতান্ত অসহায় শিশুর মত মোহিতের দিকে তাকালে। মোহিত বললে, আমি দেখতে পারি কি?

চশমার ফাঁক দিয়ে মোহিতের দিকে একটিবার তাকিয়ে অবজ্ঞার সুরে ফাদার জবাব দিলেন, সমস্ত পৃথিবীর সামনে আমি এই সত্য প্রচার করতে পারি জোর গলায়···

মোহিত একটু হেসে বললে, আমি সেই পৃথিবীরই এক কোণে আছি বলে আমার ধারণা!

বইটা হচ্ছে এক পাদ্রীর লেখা, তার প্রথম সংস্করণ হবে অন্ততঃ বছর কুড়ি আগে। বইখানার কাটতি এমন যে তারপর প্রত্যেক এক বছর দু'বছর অন্তর নতুন মুদ্রণ হয়েছে, এবং সংশোধন বা পরিবর্ত্তন না করাতেও তার পাঠকপাঠিকার সংখ্যা কমেনি।

মোহিত ফাদারের নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করলে, দেখলাম···এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে কী?

জোর গলায় ফাদার মাদারিয়াগা বললেন, প্রমাণ হচ্ছে এই যে তোমাদের দেশে যে এমনি ধারা বাল্যবিবাহ আর আর শিশুমৃত্যু চলছে তার মূলে হচ্ছে তোমাদের ধর্ম্মনীতির অন্ধতা। তোমরা একটা স্থবির নীতিহীন—শুধু নীতিহীন কেন, দুর্নীতি প্রশ্রয়ক—dogmaয় ডুবে আছ বলেই আজ তোমাদের এমন দুর্দ্দশা!

ব্যঙ্গভরা সুরে মোহিত প্রশ্ন করলে, তা হ'লে আপনি কি বলতে চান যে আমাদের এই দুর্নীতিপ্রশ্রয়ক ধর্ম্মটা ছেড়ে দিয়ে আপনাদের সুনীতি এবং সুরুচিসম্পন্ন

ধর্ম্মটা মেনে নিলেই আমাদের সব দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হবে?

জোর গলায় ফাদার বল্‌লেন, নিশ্চয়ই হবে!···তবে এর মধ্যেও একটা "কিন্তু" আছে···শুধু খৃষ্টধর্ম্ম বল্‌লে ভুল করা হবে, হ'তে হবে রোম্যান ক্যাথলিক, যার প্রাচীনতা এবং সত্যতায় আজ পর্য্যন্ত কেউ সন্দেহ করেনি' এবং যার প্রতীক হয়ে রয়েছেন আমাদের পোপ্···তোমাদের দেশে খৃষ্টধর্ম্মের আলোক যে ভালোভাবে পৌঁছায় নি' তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে রোম্যান্ ক্যাথলিক্ প্রচারকরা উপযুক্ত সাহায্য বা সুবিধা পান্‌নি' সেখানে। নইলে আজ পোপের সিংহাসন অধিষ্ঠিত হ'ত দিল্লীতে!

মোহিত ইতিহাসের ছাত্র, সে একটুখানি ব্যঙ্গভরে বল্‌লে, Inquisitionটা হিন্দুস্থানে খাটাতে না পেরে বুঝি মনে আফ্‌শোষ হচ্ছে?

ছেলেটির তরলতায় রুষ্ট হয়ে ফাদার বল্‌লেন, যাদের বিশ্বাসের অভাব তাদের কাছে সত্য প্রচার করাটা বাতুলতা মাত্র!

মোহিত তেম্‌নি সুরে জবাব দিলে, আপনি বুঝি শুধু বিশ্বাসীদের নিয়েই একটা চার্চ্চ গড়ে তুল্‌তে চান, ফাদার?... সে মন্দ হবেনা কিন্তু!

ফাদার মাদারিয়াগা এবার চিদম্বরম্‌এর তাকিয়ে বল্‌লেন, আমার আলোচনা হচ্ছিল তোমার সাথে, এর সাথে নয়...

পাছে আবার তাকে তর্কের গোলকধাঁধায় পড়ে বিব্রত হ'তে হয় এই ভয়ে চিদম্বরম্ তাড়াতাড়ি বল্‌লে, হ্যাঁ, কিন্তু এ আমার বহুদিনের পুরাণো বন্ধু এবং এর চিন্তাধারা আর মতিগতি সব আমারই মত!...আমার শরীরটা তত ভালো নেই বলে এ আমাদের কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়েছে।

গম্ভীরভাবে "অবিশ্বাসীদের সাথে আলোচনা যে করে সে মূর্খ" এই মন্তব্য প্রকাশ করে ফাদার মাদারিয়াগা সেখান থেকে উঠে গেলেন।

চিদম্বরম্ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নেত্রে মোহিতের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, আপনি আজ আমাকে এই ধর্ম্মপাগলের হাত থেকে মুক্ত করে যা' উপকার কর্‌লেন তা' আমি ভুল্‌বনা, মিঃ সেন···

মোহিত হেসে জবাব দিলে, আনন্দটা হ'ল আমার, মিঃ চিদম্বরম্, এবং তার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনি··· কাজেই ধন্যবাদ যদি কারও প্রাপ্য থাকে তাহ'লে সে আপনারই।

ব'লে সে উঠে দাঁড়ালে।

যোশী তখন সেকেণ্ডক্লাশ ডেক্ থেকে চলে গেছে। কোথায় গেল?···বুঝি বা সে মিস্ রজার্স্‌এর সাথে গল্প কর্‌তে গিয়েছে। কী জানি কেন তার মনে হচ্ছিল যোশীর হাসিখুসীভাব আর কৌতুকমেশানো কথাবার্ত্তার পেছনে আর একটি মানুষ লুকিয়ে আছে—সেটা হচ্ছে প্রেমিকের মানুষ! মিশ্ রজার্স্‌কে যোশীর ভালো লাগে এ বিষয়ে তার কোনই সংশয়ই ছিল না।

ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের বিশাল প্রসারতার মাঝে এসে দেখে সেখানে ফাদার মাদারিয়াগা জাতীয় কোন উৎসাহী কারও ধর্ম্মপিপাসা উদ্রেক করবার চেষ্টা করছেন না। শিথিল অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সবাই ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে—জাহাজের চাকার ঘর্ষণ আর জলের উচ্ছ্বাস এই দুটো মিলে একঘেয়ে একটা সুরের সৃষ্টি কর্‌ছে।

মোহিতের উৎসুক চোখ দুটো যোশীকে খুঁজছিল। খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে এমন সময় একটি মেয়ের মৃদু হাসির ছটা তার মুখের উপর এসে পড়ায় সে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠ্‌ল।

ঘাড়টা একটুখানি ফিরিয়ে দেখ্‌লে মিস্ রজার্স্ একটা ছবিওয়ালা ম্যাগাজিনের ফাঁক দিয়ে অভিবাদন সূচক হাসি হাস্‌ছে। তার পাশে একটী বর্ষীয়সী ক্ষীণকায়া মহিলা খুব গম্ভীর ভাবে পশমের কী-একটা বুন্‌ছে।

মুহূর্ত্তের জন্য মোহিতের মুখচোখ রাঙা হয়ে গেল। তারপর সে কোন প্রকার শিষ্টাচার না করেই জোরে জোরে পা ফেলে সম্মুখে এগিয়ে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে দেখে যোশী ফার্ষ্টক্লাশ স্পোর্টস্ ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখ্‌ছে। ক্রীড়াশীলা ছেলেমেয়ের হাসি আর কলরব মিশে একটা অদ্ভুত স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিল।

মোহিতকে দেখে যোশী বললে, ফাদারের সাথে ধর্ম্মালাপ শেষ হলো?

মোহিত হেসে বললে, আর ব'লো না ভাই, এম্‌নি ছাঁচেঢালা ধর্ম্ম, তা নিয়ে আবার বাগাড়ম্বর করতে আসে!··· আমার মন ত এদের উপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠ্‌ছে ধীরে ধীরে!

যোশী বললে, ফাদারকে দিয়ে তুমি সমস্ত ইউরোপকে বিচার করতে যেয়ো না, মোহিত!···আমাদের দেশের পুরুতদের দিয়ে যদি আমাদের ধর্ম্মকে কেউ বিচার করতে চায় তা'হলে সেটাকে তুমি মানবে?

মোহিত এবার যোশীর উক্তির সত্যতা স্বীকার করলে। বললে, আমি ইউরোপকে বিচার করছিনা যোশী···আমি শুধু ভাবছি যে এদের মত শিক্ষিত লোকও দেখ্‌তে পায় না যে যে-ধর্ম্ম সজীব মনের তত্ত্বের সাথে না মেলে তার দাম অকিঞ্চিৎকর, তা' কুশ্রী···

যোশী কথার ধারাটা উল্‌টে নিয়ে বললে, মিস্ রজার্সকে দেখ্‌লে?

অপ্রসন্নস্বরে মোহিত বললে, দেখ্‌লুম। আমাকে দেখে তাঁর ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে ছোট্ট একটা হাসি হাস্‌লেন। ওজন করা হাসির ফাঁক দিয়ে তাঁর ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো ঝলক্ দিয়ে উঠ্‌ল, আমার মনে জাগ্‌ল সেই টুথ্‌পেষ্টএর বিজ্ঞাপনের ছবিটা!

মোহিতের পিঠে একটা চাপড় মেরে যোশী বললে, তুমি কিন্তু ভয়ানক দুষ্ট হয়ে উঠ্‌ছ, মোহিত···ভদ্র মেয়েদের সম্বন্ধে এরকম যা' তা' মন্তব্য প্রকাশ করা কিন্তু তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না।

একটুও না দমে মোহিত বললে, ম্যাগাজিনের পাতায় ফাঁক দিয়ে বুড়ি অভিভাবিকার চোখ এড়িয়ে ওরকম ফিক্ ক'রে একটি হাসি যদি আমার বিজ্ঞাপনের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় তাহ'লে সে কি আমার মনের দোষ?

যোশী এবার মোহিতকে বাধা দিয়ে বললে, যথেষ্ট হয়েছে ···তোমার মনের যা ছবি আমি দেখ্‌ছি তাতে অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাক্···সত্যি বলছি, মোহিত, মেয়েটী বড় ভালো —ওকে আমি ছয় সাত মাস ধরে দেখ্‌ছি ত।

—কোথায়? লণ্ডনে?

—হ্যাঁ লণ্ডনে। ওর পুরো নাম হচ্ছে শীলা রজার্স··· ভারী মিষ্টি নামটী, না?

—হবে...

—তুমি ভয়ানক cynical; জানো আমি নামটী দেখেই ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছিলুম আর কি!

—পড়্‌লে না কেন?

হেসে যোশী জবাব দিলে, ভালো ভাবে পড়্‌তে হ'লে দুদিকেরই টান থাকা চাই যে—প্রেম হচ্ছে চুম্বকের মত আকর্ষণ বিকর্ষণের সাথী···

মোহিত যোশীর প্রেমের সংজ্ঞায় না হেসে থাক্‌তে পারলে না। বললে, তোমার কথাটী ভয়ানক মূল্যবান, ভাই···মনের খাতায় শাদা কালীতে আমি নোট্ করে রাখ্‌ছি।

তার উপহাসটা গায়ে না মেখে যোশী বললে, কিংস্ কলেজে ও পড়ে। আমার পাশেই বসেছিল। একটা কাগজে আমাদের সব নাম লিখ্‌তে হয়—ও লিখ্‌লে, তার পরই আমার হাতে দিলে। আমি দেখ্‌লুম লেখা আছে, শীলা রজার্স। আমার নাম দস্তখত শেষ করেই মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করলুম, তুমি কি হিন্দুস্থানে জন্মেছিলে?···অবাক্ হয়ে সে জবাব দিলে, না···। তারপর আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু সে দেশটা দেখ্‌বার ইচ্ছে আমার খুবই আছে!···আমি ভাব্‌লুম এটা বুঝি একটা ইঙ্গিত, ভয়ানক উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লুম। তখন ত' প্রোফেসার এসে পড়্‌লেন, তাই আলাপ আর বেশী এগোল না।···ক্লাশ শেষ হবার পর শীলার পেছনে পেছনে ছুটলুম, চায়ে নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত করলুম, কিন্তু কী ভয়ানক reserve মেয়েটার! হাসি খুসী ঠাট্টাতে সে অনেক ফ্লার্টকেও হারিয়ে দিতে পারে, তবু শীলতার সীমারেখার বাইরে ওকে কিছুতেই আনা যায় না।

মোহিত যোশীর গল্পে একটুখানি interested বোধ করছিল, প্রশ্ন করলে, লণ্ডনে কি শীলতার সীমারেখার বাইরে অনেকেই আসতে রাজী তা হ'লে?

—সেটা নির্ভর করে শীলতার সংজ্ঞার উপরে। আমাদের দেশের অভিধানে যাকে শীলতা বলে তা নিয়ে ত ওদের বিচার করা চলে না। ওরা যাকে শীলতা বলে

তার দাম কম নয়, মোহিত!...তার বাইরেও অনেকে আসে, কিন্তু সে হচ্ছে এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মেয়েরা।...কলেজ যারা আসে তারা ভদ্র, শিক্ষিত—তারা ভয়ানক ভাবে elusive, ছেলেদের সাথে সেক্স নিয়ে কত তুমুল আলোচনা করে চলেছে, কিন্তু তাদের মনের মধ্যে কোন আলোড়ন বা চঞ্চলতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না তা' বাইরে থেকে বুঝ্‌বার জোটি পর্য্যন্ত নেই!

—তুমি শীলাকে, মিস্ রজার্স'কে, এই দলের মধ্যে ফেল্‌তে চাও।

—হ্যাঁ, এবং এর খুবই উঁচু স্তরে। মিস্ রজার্স'এর সাথে আমার কত গল্পগুজব হয়েছে, কিন্তু আমাকে তার প্রথম নামটি ধরে ডাক্‌বার সুযোগ একটিবারও দেয়নি। একদিন আমি এই নিয়ে বলেছিলুম, এত বড় গালভরা "মিস্ রজার্স" বলার চেয়ে শুধু "শীলা" বললে লোকের কষ্টের লাঘব হবে। তাতে উত্তর পেয়েছিলুম, জগৎ শুদ্ধ লোকের কষ্টের লাঘব কর্‌তে হ'লে যে আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাব! অথচ আমার নামের আগে "মিঃ" টা পছন্দ করে না বলে "যোশী" এই ডাকটুকু আদায় করে নিয়েছে!

মোহিত হেসে বল্‌লে, একতরফা বিচার ত হ'তে পারে না, যোশী...বাকীটাও আসবে শীগ্‌গীরই!

দুঃখসূচক একটা অস্ফুট শব্দ করে যোশী বল্‌লে, এ ত' আর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নয় যে যতই টান মার্‌বে ততই অফুরাণ হয়ে বেরিয়ে আস্‌বে।

উপমাটিতে ভয়ানক খুসী হয়ে মোহিত বল্‌লে, নামটা দিয়েছ ভালোই...তা' তুমি বুঝি অর্জ্জুনের সাথে ডুয়েল লড়্‌তে চাও?

—অর্জ্জুন থাক্‌লে ত লড়্‌ব!...এ পর্য্যন্ত কাউকে ও মন দিয়েছে বলে ত আমার বোধ হয় না!...তোমার দিকে একটু ঝুঁকছে বলে মনে হচ্ছে, তুমি এবার হাত গুটিয়ে নাও, আমি তোমায় দু'চারটে মন্তর শিখিয়ে দিচ্ছি।

যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে এম্‌নি সুরে মোহিত বল্‌লে, দরকার নেই যোশী, তোমার সাথে ডুয়েল লড়্‌তে হ'লে আমার এই মাছ ভাত খেকো শরীরটা চুরমার হয়ে যাবে একটি আঘাতেই!...তার চেয়ে বসে বসে সমুদ্রের শোভা দেখা অনেক ভালো।

যোশী বল্‌লে, কিন্তু তুমি ভুল বুঝছ, মোহিত! তোমাকে যদি মিস্ রজার্স' বরণ করে নেয় তাহলে আমি একটুও ঈর্ষ্যান্বিত হব না, আমার বরং আনন্দ হবে এই দেখে যে আমারই একজন বন্ধু এই গর্ব্বিতা মেয়েটীকে মাটিতে লুটিয়েছে।

কথা হচ্ছিল দুজনের ইংরেজীতে। মিস্ রজার্স'কে নিয়ে আলোচনা কর্‌তে দুজনে যখন মশগুল তখন হঠাৎ কানের কাছে মেয়েলি সুর একটি এসে বাজ্‌ল, সুপ্রভাত মিঃ সেন...

মোহিত চম্‌কে পেছন ফিরে দাঁড়ালে। যোশীও একটু লজ্জিত ভাবে তাকালে। ছিঃ ছিঃ মিস্ রজার্স' বুঝিবা তাদের কথাগুলো শুনেছেন এবং মনে মনে না জানি কী ভীষণ ভাবে হেসেছেন!

মিস্ রজার্স'এর সম্ভাষণের মধ্যে কিন্তু তার কোনই পরিচয় পাওয়া গেল না। হাসি মুখে মোহিতের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, আপনি আজ অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়েছিলেন বুঝি?

কথাটা খুবই সাধারণ—শুধু একটা কথোপকথনের অবতারণা কর্‌বারই চেষ্টা। তবু মোহিত একটু ঝাঁঝের সহিত জবাব দিলে, ছোট্ট ছেলের মত ভোর বেলায় উঠেই আকাশের লালিমা দেখ্‌বার জন্ম পাগল হওয়াটা আমি সুধীজনোচিত মনে করি না মিস্ রজার্স'!...মিস্ রজার্স' ত' অবাক্। তবু আবার হেসে প্রশ্ন কর্‌লে, আপনার কালকের রাগটা বুঝি এখনও পড়েনি?

মোহিত কোন জবাব দিলে না। যোশী মোহিতের হয়ে বল্‌লে, রোদ যেরকম বাড়্‌ছে তাতে আমার বন্ধুটির রাগ কম্‌বার ত কোনই সম্ভাবনা দেখ্‌ছিনা, মিস্ রজার্স'...

মিস্ রজার্স' একটু অনুতপ্ত সুরে বললে, আসলে কিন্তু অন্যায়টা হয়েছিল আমারই যোশী। বাবা যে ভাষা ব্যবহার করেন সেটা আমার মুখে আনাই উচিত হয় নি। আমাকে কী এর জন্ম ক্ষমা করতে পারবেন না মিঃ সেন।

মোহিত মিস রজার্স'এর কথায় একটু বিব্রত হয়ে বললে, আমি ঠিক রাগ করি নি মিস্ রজার্স', আমার তরুণ মনের সবুজের উপর একটুখানি কালোছায়া এসে পড়েছিল মাত্র।

মোহিতকে দেখে যোশী বললে, ফাদারের সাথে ধর্ম্মালাপ শেষ হলো?

মোহিত হেসে বললে, আর ব'লো না ভাই, এমনি ছাঁচেঢালা ধর্ম্ম, তা নিয়ে আবার বাগাড়ম্বর করতে আসে!··· আমার মন ত এদের উপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে ধীরে ধীরে!

যোশী বললে, ফাদারকে দিয়ে তুমি সমস্ত ইউরোপকে বিচার করতে যেয়ো না, মোহিত!···আমাদের দেশের পুরুতদের দিয়ে যদি আমাদের ধর্ম্মকে কেউ বিচার করতে চায় তা'হলে সেটাকে তুমি মানবে?

মোহিত এবার যোশীর উক্তির সত্যতা স্বীকার করলে। বললে, আমি ইউরোপকে বিচার করছিনা যোশী···আমি শুধু ভাবছি যে এদের মত শিক্ষিত লোকও দেখতে পায় না যে যে-ধর্ম্ম সজীব মনের তত্ত্বের সাথে না মেলে তার দাম অকিঞ্চিৎকর, তা' কুশ্রী···

যোশী কথার ধারাটা উলটে নিয়ে বললে, মিস্ রজার্সকে দেখলে?

অপ্রসন্নস্বরে মোহিত বললে, দেখলুম। আমাকে দেখে তাঁর ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে ছোট্ট একটা হাসি হাসলেন। ওজন করা হাসির ফাঁক দিয়ে তাঁর ঝকঝকে দাঁতগুলো ঝলক দিয়ে উঠল, আমার মনে জাগল সেই টুথপেষ্টএর বিজ্ঞাপনের ছবিটা!

মোহিতের পিঠে একটা চাপড় মেরে যোশী বললে, তুমি কিন্তু ভয়ানক দুষ্ট হয়ে উঠছ, মোহিত···ভদ্র মেয়েদের সম্বন্ধে এরকম যা' তা' মন্তব্য প্রকাশ করা কিন্তু তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না।

একটুও না দমে মোহিত বললে, ম্যাগাজিনের পাতার ফাঁক দিয়ে বুড়ি অভিভাবিকার চোখ এড়িয়ে ওরকম ফিক্ ক'রে একটি হাসি যদি আমার বিজ্ঞাপনের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় তাহ'লে সে কি আমার মনের দোষ?

যোশী এবার মোহিতকে বাধা দিয়ে বললে, যথেষ্ট হয়েছে ···তোমার মনের যা সুবি আমি দেখছি তাতে অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাক্···সত্যি বলছি, মোহিত, মেয়েটী বড় ভালো —ওকে আমি ছয় সাত মাস ধরে দেখছি ত।

—কোথায়? লণ্ডনে?

—হাঁ লণ্ডনে। ওর পুরো নাম হচ্ছে শীলা রজার্স··· ভারী মিষ্টি নামটী, না?

—হবে...

—তুমি ভয়ানক cynical; জানো আমি নামটী দেখেই ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছিলুম আর কি!

—পড়লে না কেন?

হেসে যোশী জবাব দিলে, ভালো ভাবে পড়তে হ'লে দুদিকেরই টান থাকা চাই যে—প্রেম হচ্ছে চুম্বকের মত আকর্ষণ বিকর্ষণের সাথী···

মোহিত যোশীর প্রেমের সংজ্ঞায় না হেসে থাকতে পারলে না। বললে, তোমার কথাটী ভয়ানক মূল্যবান, ভাই···মনের খাতায় শাদা কালীতে আমি নোট্ করে রাখছি।

তার উপহাসটা গায়ে না মেখে যোশী বললে, কিংস্ কলেজে ও পড়ে। আমার পাশেই বসেছিল। একটা কাগজে আমাদের সব নাম লিখতে হয়—ও লিখলে, তার পরই আমার হাতে দিলে। আমি দেখলুম লেখা আছে, শীলা রজার্স। আমার নাম দস্তখত শেষ করেই মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করলুম, তুমি কি হিন্দুস্থানে জন্মেছিলে?···অবাক্ হয়ে সে জবাব দিলে, না···। তারপর আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু সে দেশটা দেখবার ইচ্ছে আমার খুবই আছে!···আমি ভাবলুম এটা বুঝি একটা ইঙ্গিত, ভয়ানক উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। তখন ত' প্রোফেসার এসে পড়লেন, তাই আলাপ আর বেশী এগোল না।···ক্লাশ শেষ হবার পর শীলার পেছনে পেছনে ছুটলুম, চায়ে নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত করলুম, কিন্তু কী ভয়ানক reserve মেয়েটার! হাসি খুশী ঠাট্টাতে সে অনেক ফ্লার্টকেও হারিয়ে দিতে পারে, তবু শীলতার সীমারেখার বাইরে ওকে কিছুতেই আনা যায় না।

মোহিত যোশীর গল্পে একটুখানি interested বোধ করছিল, প্রশ্ন করলে, লণ্ডনে কি শীলতার সীমারেখার বাইরে অনেকেই আসতে রাজী তা হ'লে?

—সেটা নির্ভর করে শীলতার সংজ্ঞার উপরে। আমাদের দেশের অভিধানে যাকে শীলতা বলে তা নিয়ে ত ওদের বিচার করা চলে না। ওরা যাকে শীলতা বলে

তার দাম কম নয়, মোহিত !···তার বাইরেও অনেকে আসে, কিন্তু সে হচ্ছে এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মেয়েরা।···কলেজে যারা আসে তারা ভদ্র, শিক্ষিত—তারা ভয়ানক ভাবে elusive, ছেলেদের সাথে সেক্স নিয়ে কত তুমুল আলোচনা করে চলেছে, কিন্তু তাদের মনের মধ্যে কোন আলোড়ন বা চঞ্চলতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না তা' বাইরে থেকে বুঝ্‌বার জোটি পর্য্যন্ত নেই !

—তুমি শীলাকে, মিস্‌ রজার্স'কে, এই দলের মধ্যে ফেলতে চাও।

—হ্যাঁ, এবং এর খুবই উঁচু স্তরে। মিস্‌ রজার্স'এর সাথে আমার কত গল্পগুজব হয়েছে, কিন্তু আমাকে তার প্রথম নামটি ধরে ডাক্‌বার সুযোগ একটিবারও দেয়নি। একদিন আমি এই নিয়ে বলেছিলুম, এত বড় গালভরা "মিস্‌ রজার্স" বলার চেয়ে শুধু "শীলা" বললে লোকের কষ্টের লাঘব হবে। তাতে উত্তর পেয়েছিলুম, জগৎ শুদ্ধ লোকের কষ্টের লাঘব করতে হ'লে যে আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাব! অথচ আমার নামের আগে "মিঃ" টা পছন্দ করে না বলে "যোশী" এই ডাকটুকু আদায় করে নিয়েছে !

মোহিত হেসে বল্‌লে, একতরফা বিচার ত হ'তে পারে না, যোশী···বাকীটাও আসবে শীগ্‌গীরই !

দুঃখসূচক একটী অস্ফুট শব্দ করে যোশী বললে, এ ত' আর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নয় যে যতই টান মার্‌বে ততই অফুরাণ হয়ে বেরিয়ে আস্‌বে।

উপমাটিতে ভয়ানক খুসী হয়ে মোহিত বল্‌লে, নামটা দিয়েছ ভালোই···তা' তুমি বুঝি অর্জ্জুনের সাথে ডুয়েল লড়্‌তে চাও ?

—অর্জ্জুন থাক্‌লে ত লড়্‌ব !···এ পর্য্যন্ত কাউকে ও মন দিয়েছে বলে ত আমার বোধ হয় না !···তোমার দিকে একটু ঝুঁকছে বলে মনে হচ্ছে, তুমি এবার হাত গুটিয়ে নাও, আমি তোমায় দু'চারটে মন্তর শিখিয়ে দিচ্ছি।

যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে এম্‌নি সুরে মোহিত বল্‌লে, দরকার নেই যোশী, তোমার সাথে ডুয়েল লড়্‌তে হ'লে আমার এই মাছ ভাত খেকো শরীরটা চুরমার হয়ে যাবে একটি আঘাতেই!···তার চেয়ে বসে বসে সমুদ্রের শোভা দেখা অনেক ভালো।

যোশী বল্‌লে, কিন্তু তুমি ভুল বুঝছ, মোহিত! তোমাকে যদি মিস্‌ রজার্স' বরণ করে নেয় তাহলে আমি একটুও ঈর্ষ্যান্বিত হব না, আমার বরং আনন্দ হবে এই দেখে যে আমারই একজন বন্ধু এই গর্ব্বিতা মেয়েটাকে মাটিতে লুটিয়েছে।

কথা হচ্ছিল দুজনের ইংরেজীতে। মিস্‌ রজার্স'কে নিয়ে আলোচনা করতে দুজনে যখন মশগুল তখন হঠাৎ কানের কাছে মেয়েলি সুর একটি এসে বাজ্‌ল, সুপ্রভাত মিঃ সেন···

মোহিত চম্‌কে পেছন ফিরে দাঁড়ালে। যোশীও একটু লজ্জিত ভাবে তাকালে। ছিঃ ছিঃ মিস্‌ রজার্স' বুঝি বা তাদের কথাগুলো শুনেছেন এবং মনে মনে না জানি কী ভীষণ ভাবে হেসেছেন!

মিস্‌ রজার্স'এর সম্ভাষণের মধ্যে কিন্তু তার কোনই পরিচয় পাওয়া গেল না। হাসি মুখে মোহিতের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, আপনি আজ অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়েছিলেন বুঝি ?

কথাটা খুবই সাধারণ—শুধু একটা কথোপকথনের অবতারণা করবারই চেষ্টা। তবু মোহিত একটু ঝাঁঝের সহিত জবাব দিলে, ছোট্ট ছেলের মত ভোর বেলায় উঠেই আকাশের লালিমা দেখ্‌বার জন্য পাগল হওয়াটা আমি সুধীজনোচিত মনে করি না মিস্‌ রজার্স'!···মিস্‌ রজার্স' ত' অবাক্‌। তবু আবার হেসে প্রশ্ন করলে, আপনার কালকের রাগটা বুঝি এখনও পড়েনি ?

মোহিত কোন জবাব দিলে না। যোশী মোহিতের হয়ে বল্‌লে, রোদ যেরকম বাড়্‌ছে তাতে আমার বন্ধুটির রাগ কম্‌বার ত কোনই সম্ভাবনা দেখ্‌ছিনা, মিস্‌ রজার্স'···

মিস্‌ রজার্স' একটু অনুতপ্ত সুরে বললে, আসলে কিন্তু অন্যায়টা হয়েছিল আমারই যোশী। বাবা যে ভাষা ব্যবহার করেন সেটা আমার মুখে আনাই উচিত হয় নি। আমাকে কী এর জন্য ক্ষমা করতে পারবেন না মিঃ সেন ?

মোহিত মিস রজার্স'এর কথায় একটু বিব্রত হয়ে বললে, আমি ঠিক রাগ করি নি মিস্‌ রজার্স', আমার তরুণ মনের সবুজের উপর একটুখানি কালোছায়া এসে পড়েছিল মাত্র।

যা হোক, আমার মনের সব গ্লানি এখন কেটে গেছে।

মিস রজার্স ভয়ানক ভাবে খুসী হয়ে মোহিতের হাতটি ধরে বললে, তাহলে আমরা এখন বন্ধু কেমন?

মোহিত মিস রজার্স'এর করস্পর্শে সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ল। স্বাধীন দেশের আদবকায়দা আবহাওয়ার সাথে সে তখনও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, তাই লীলা রজার্স'এর আবেগ ভরা আহ্বানের সে কোন উপযুক্ত উত্তর দিতে পারলে না, একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

মিস রজার্স চকিতের মধ্যে মোহিতের মনের বিতৃষ্ণাটুকু বুঝে নিয়েছিল। সে নিজের এই প্রগলভতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললে, অবিশ্যি আপনি যদি এখনও রাগ করে থাকেন তাহলে আমার বলবার কিছুই নেই।

মোহিত শশব্যস্তে বলে উঠ্‌ল, না, না, আমি রাগ করিনি এখন, তবে···

যোশী এতক্ষণ চুপ করে এদের কলহ লীলা দেখছিল। সে মোহিতের কথাটুকু পূর্ণ করে বললে, তবে বন্ধুত্ব মানে যদি এরকম প্রগলভতা হয় তাহলে মোহিতের আপত্তি আছে।

মোহিত ভয়ানক ভাবে অপ্রস্তুত হয়ে মুখচোরার মত বললে, না, না, আমি তা বল্‌তে যাচ্ছিলুম না। আমি বলছিলুম এই যে "আমরা বন্ধু হব" এ রকম গৌরচন্দ্রিকা করবার ত কোনো দরকার নাই! আমাদের মধ্যে বন্ধুতা যদি সত্যই গ'ড়ে উঠবার হয় তা হ'লে তা উঠ্‌বেই, তার জন্যে কোনো রকম আয়োজন করবার দরকার হবে না।

মিস্ রজার্স বললে, তা' মানি। কিন্তু তার আগে কৃত্রিম ব্যবধানগুলো দূর করে দেওয়া উচিত নয় কি?...ভুল বোঝার সম্ভাবনা ত' আছে, শুধু আছে কেন, হয়েছেও— তাই সে সব হওয়ার সুযোগ আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া দরকার নয় কী?

মোহিত এর উত্তরে কী বল্‌বে খুঁজে পাচ্ছিল না। যোশী তার হয়ে জবাব দিলে, সব খোলাখুলি ত' এখন হয়ে গেছে, লাইন্ ক্লিয়ার্, সিগ্‌নেল্ ডাউন···এখন বন্ধুত্বের রকেট্ চালিয়ে দাও···দেখ কোথায় গিয়ে ঠেকে!

মিস্ রজার্স একটু তর্জ্জন করে বল্‌লে, তুমি ভয়ানক উদ্ধত ছেলে, যোশী...আরেকটু হলেই আমি তোমার সাথে আড়ি কর্‌তুম, কিন্তু তাহ'লে মিঃ সেন দুঃখিত হবেন বলে আজও সেটা মুলতুবী রাখ্‌লুম।

যোশী একটুখানি কুর্ণিশ করার ভঙ্গীতে বল্‌লে, ধন্যবাদ, মাদামোয়াসেল···

সেদিন বিকালবেলা চা খাবার পর মোহিত চুপ করে বসে Sherlock Holmes-এর গল্প পড়্‌ছিল আর মনে মনে হাস্‌ছিল। যোশী গিয়েছিল জাহাজের কাপ্তেনের সাথে ভাব কর্‌তে আর জাহাজখানা আরব সাগরের কোন্ জল-রেখা বিদীর্ণ করে অগ্রসর হচ্ছে এই অমূল্য তথ্য সংগ্রহ কর্‌তে। চিদম্বরম্ অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, আর কাদার মাদারিয়াগা বোধ হয় শীকারের উদ্দেশে ঘুরছিলেন এদিক ওদিক কোথাও।

খানিকক্ষণ পরে শ্রান্তিবোধ করায় মোহিত বইটা মুড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর কী করা যায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মনে হ'ল একবার মিস্ রজার্স-এর সাথে খানিকটা গল্প করে আসা যায়। সকালবেলার আলোচনার পর তার মনের মেঘ অনেকখানি কেটে গিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে এই তরলভাষী হাস্যবিলাসনিপুণা মেয়েটির প্রতি তার বিতৃষ্ণা কমে আস্‌ছিল।

ফার্ষ্ট ক্লাস ডেকে এসে দেখে মিস্ রজার্স-এর প্রিয় স্থানটিতে কেউ নেই—দুটো চেয়ারই খালি। একটুখানি হতাশ হয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু কী মনে ক'রে পাশেই স্মোকিং-রুমে সে ঢুকল। দেখ্‌লে এক কোণে একটি টেবিল অধিকার করে মিস্ রজার্স একমনে কী লিখ্‌ছে।

লেখার সময় বিরক্ত করা উচিত নয় এই ভেবে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় আহ্বান শুনতে পেলে, মিঃ সেন···

বিস্ময়ের সহিত মোহিত অনুভব করলে যে, মিস রজার্স-এর এই ডাকে তার মনের মধ্যে পুলকের একটা ঢেউ খেলে গেল। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল।

মিস্ রজার্স হেসে জিজ্ঞেস্ করলে, বন্ধুর খোঁজে এসেছিলেন বুঝি ?

ফস্ করে মিথ্যা কথাটা মোহিতের মুখ দিয়ে বাহির হল না।—সে একটু ইতস্ততঃ করে বললে, না, এই আপনারই খোঁজে এসেছিলুম···

মিস্ রজার্স-এর মুখ আভায় দীপ্ত হয়ে উঠ্ল। বললে ঠাট্টা করছেন না ত ?

—না, সত্যি...

—তাহ'লে বসুন···

মোহিত পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্লে। মিস্ রজার্স তার সামনের কাগজপত্রগুলো গুছাতে গুছাতে মোহিতের সেদিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললে, এগুলো আমার অবসর সময়ের ছেলেখেলা, মিঃ সেন। যখন কিছু করবার থাকে না আর শরীর আলস্যে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন এই কাগজগুলোর উপর আঁচড় কাটি...আমার বন্ধুরা অবশ্য এর মস্ত একটা গালভরা নাম দেন, বলেন এ নাকি আমার ডায়েরী···

মোহিত মিস্ রজার্স-এর কথার ভঙ্গী আর ছন্দ বেশ উপভোগ করছিল। মেয়েটির ব্রীড়ার অভাব থাকতে পারে, কিন্তু তার ব্রীড়াহীনতার মধ্যে একটা লীলায়িত স্বাচ্ছন্দ্য আছে যাকে উপেক্ষা করা চলে না।

বললে, ডায়েরী লেখা ত খুবই ভালো জিনিষ, মিস্ রজার্স···

একটু তাচ্ছিল্যের সুরে মিস্ রজার্স বললে, ছাই ভালো!···আমার ডায়েরী ত' আর আসল ডায়েরী নয়, এ হচ্ছে এলোমেলো কতকগুলো কথা বা ভাবের সমষ্টি...

মোহিত হেসে বললে, ঐখানেই ত ডায়েরীর যথার্থ মর্য্যাদা! যদি কাঠখোট্টা কতকগুলো ঘটনার সমাবেশ হ'লেই ডায়েরী হত তাহ'লে জগতে বড় বড় চিন্তাশীলদের ডায়েরী আজ বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবে যেত!

ডায়েরীর কথাটা উল্টিয়ে নিয়ে মিস্ রজার্স প্রশ্ন করলে, আচ্ছা মিঃ সেন, আপনাকে যদি গুটিকয়েক প্রশ্ন করি তাহ'লে রাগ করবেন কি ?

—না, রাগ করব কেন ?

—তাহ'লে প্রথম প্রশ্ন করছি এই, আপনি আমাদের দেশের উপর ভয়ানকভাবে চটা, নয় কি ?

—চটা ঠিক বললে ভুল করা হবে, তবে আপনাদের সভ্যতার অনেকগুলো আচরণই আমার কাছে ভয়ানকভাবে মেকী ঠেকে। তাই যখন দেখি সে সব মেকী জিনিষ নিয়ে লোকে গর্ব্ব করছে তখন আমার প্রতিবাদের স্পৃহা জেগে ওঠে!

খুব শান্ত অথচ গভীরভাবে মিস্ রজার্স প্রশ্ন করলে, এ আপনার অন্যায় নয় কি ?

—অন্যায় কিসে ?

—আপনি আমাদের দেশের কীই বা দেখেছেন বা শুনেছেন! যা' কিছু আপনার অভিজ্ঞতা তা' পুঁথিপড়া, হয়ত বা একটা বিশিষ্ট মতবাদের পোষক এক শ্রেণীর পুঁথি তা'!···আপনি আগে থেকেই এ রকম সংস্কারান্ধ মন নিয়ে একটা দেশে যাচ্ছেন, এ কি আপনার শিক্ষা বা জ্ঞানের সহায়তা করবে ?

মোহিত জবাব দিলে, আমি সঙ্কীর্ণতা নিয়ে যাচ্ছি না, মিস্ রজার্স···আমার মধ্যে অন্ধভক্তির ছায়া নেই এইটুকুই আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।

হেসে মিস্ রজার্স বললে, তা' যদি হয়ে থাকে তাহ'লে আমার ঝগড়া করবার কিছু নেই—কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনি আপনার গলদ কোথায় ঠিক বুঝ্তে পারছেন না।··· আপনি যাকে অন্ধভক্তির অভাব বলছেন তাকে আমি বলব অতি স্থূলতম রকমের একটা গোঁড়ামি।···আমায় মাপ করবেন, মিঃ সেন, কিন্তু মিস্ মেয়ো যদি তাঁর বই সংবন্ধে বলেন যে তিনি যা' বলেছেন তা' শুধু 'অন্ধভক্তির ছায়া তাঁর উপর পড়ে নি' এর পরিচায়ক, তাহ'লে আপনার রক্ত কি গরম হয়ে উঠবে না ?

মোহিত এবার বলে উঠ্ল, আপনি কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন, মিস্ রজার্স ? মিস্ মেয়োর সেই পঙ্কিল আবর্জ্জনাময় গালিগালাজের কি তুলনা হয় কখনও ?

—মেনে নিলুম না হয় আপনার কথা। কিন্তু বাইরে থেকে আপনার এই অনভিজ্ঞ মন থেকে উৎসারিত কথা শুনে যদি সাধারণ লোকে—আমাদের দেশের লোকে—

আপনাকে সঙ্কীর্ণমনা ভাবে তাহ'লে তাদের কি অন্যায় হবে?'

অন্য সময় হ'লে হয়ত মোহিত এর তীক্ষ্ণ একটা জবাব দিত, কিন্তু আজ তার মুখ দিয়ে সেরকম কোন কথা বেরুল না। সে একটুখানি চিন্তিতস্বরে বললে, এটা অবশ্যি আমি ভেবে দেখি নি', মিস্ রজার্স'...

হেসে 'মিস্ রজার্স' বললে, আচ্ছা, আমার প্রথম প্রশ্নটির সমাধান ত একরকম হ'ল। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি করছি...আপনাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার মত কি?

মুহূর্ত্তের জন্য মোহিতের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, তারপর শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললে, মাপ করবেন, ওটা হচ্ছে আমাদের গভীর অনুবেদনার বস্তু, তা নিয়ে আমি এখানে মতামত প্রকাশ করতে চাইনে'!

মলিন হাসি হেসে মিস্ রজার্স বললে, আমার গায়ের রং আর নাড়ীর রক্ত বোধ হয় আপনার স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দিচ্ছে!...কিন্তু আপনাকে বলছি, যতই অপ্রিয় হোক্ না কেন, আমি একটুও অসন্তুষ্ট হব না!...আর একটি কথা ভুলে যাবেন না, আমি স্বাধীন দেশেরই মেয়ে, স্বাতন্ত্র্য এবং সাম্যের মর্য্যাদা কী তা' আমার কাছে অজ্ঞাত নেই।

মোহিত আগেরই মত শান্তভাবে বললে, আজ থাক, আর একদিন বলব।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।...অস্তায়মান সূর্য্যের লাল রশ্মি স্মোকিং-রুমের জানলা দিয়ে শীলা রজার্স-এর মুখের উপর এসে পড়েছিল, আর তার মুখ চোখ এক অপূর্ব্ব আলোকে প্রতিভাত হয়ে উঠছিল। মোহিত একটুখানি মুগ্ধভাবে তার দিকে ক্ষণেকের জন্য তাকিয়ে ছিল, তার পর হঠাৎ যেন-ভয়ানক-একটা অন্যায় করেছে এম্‌নি একটা ভঙ্গীতে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিলে।

শীলা রজার্স স্তব্ধভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সূর্য্যের লালিমা দেখে বোধ হচ্ছিল যেন তার মনের কুঞ্জেও আবীর লেগেছে...ছোট্ট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়াল।

মোহিতও সাথে সাথে উঠে পড়ল। শীলা একটুখানি হেসে বললে, আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করলাম, আশা করি কিছু মনে করবেন না।

মোহিত একটুখানি মৃদুহাসি হাসলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবগোপাল দাস
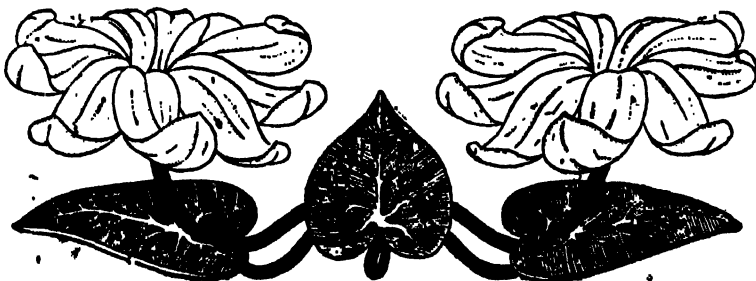
শিল্প ও জীবন

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শিল্পকলা জীবনের অভিব্যক্তি, পুষ্পিত বিকাশ। জীবন থেকে জীবনের শিরোমণি হয়ে ফুটে উঠেছে শিল্প। জীবন শিল্পকে জন্ম দিয়েছে, এই একদিকে—কিন্তু অন্যদিকে শিল্পও আবার জীবনকে জন্ম দিতেছে, জীবনের বিকাশে সহায়তা করে চলেছে, জীবনের মধ্যে পরিবর্ত্তনের পুনর্গঠনের সম্ভাবনা এনেছে। *

তবে অনেকে হয়ত কথাটা স্বীকার করতে চাইবেন না। তাঁরা বলবেন শিল্প ও জীবনকে যতদূর সম্ভব আলাদা করে, পরস্পরের অস্পৃশ্য করে রাখাই যুক্তিযুক্ত। উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল বড় জোর যেন সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ—অর্থাৎ একান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই উভয়ের পক্ষে মঙ্গল—পরস্পরের সামীপ্যের প্রভাবের ফলে প্রকৃতি হারায় তার সাম্য, হয়ে পড়ে চঞ্চল পঙ্কিল,—আর পুরুষেও এসে দেখা দেয় অজ্ঞান্ সম্মোহ। অন্য কথায় চারুশিল্প সুন্দর (beautiful) না হয়ে, হয়ে পড়ে লাভের ব্যবহারের জিনিষ (useful)—অহেতুক আনন্দের বস্তু না হয়ে, হয়ে পড়ে উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়মাত্র, সে উদ্দেশ্য যতই সাধু হোক না কেন; শিল্পী রসিক না হয়ে, হয়ে পড়েন প্রচারক। শিল্পকে জীবনের সাথে জুড়ে দিয়ে, জীবনের সেবক, তল্পীদার করে তোলবার প্রচেষ্টাকেই La Trahison des clercs (বাণী-সেবকদের বিশ্বাসঘাতকতা) নাম দিয়ে Julien Benda এই কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী সাহিত্যমহলে বিষম সোরগোল তুলেছিলেন। আর আজকালকার রুশের সমস্ত সোভিয়েট সাহিত্যের শিল্পকলার বিরুদ্ধে এই অভিযোগই আনা হয়েছে। তা ছাড়া, জীবনের সাথে শিল্পকে জড়িয়ে মিশিয়ে ফেললে যে কেবল শিল্পের মুণ্ডপাত হয় তা নয়, জীবনও তাতে হয়ে পড়তে পারে খঞ্জ পঙ্গু, দুর্ব্বল অক্ষম। এই আশঙ্কার জন্যই যাঁরা সাহিত্যিক মন দিয়ে জগৎকে সংস্কার করবার বা গড়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁদের কাজে অনেকে সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিতে পারে না। †
তবে একথাও বলা হয় কবি-রাজ্য কবিদের স্বপ্ন, মানসিক বিলাসই বেশীর ভাগ—বাস্তবে সত্যসত্যই তার সাথে সাক্ষাতের আশঙ্কা বা ভরসা খুব কম।

জীবন ও শিল্প হ'ল দুটি বিভিন্ন স্তরের বা ক্ষেত্রের জিনিষ। পারতপক্ষে স্বীকার করা যেতে পারে তারা যেন দুটি সমান্তরাল রেখা, পাশে পাশে চলেছে বরাবর, কিন্তু কোথাও পরস্পরকে স্পর্শ করে না, এতটুকুও মিলে যায় না—এক বোধহয় পরিশেষে অনন্তের মধ্যে গিয়ে ছাড়া। শিল্পের উৎপত্তি জীবন থেকে নয়, জীবনের প্রেরণাও সাহিত্যের মধ্যে নয়। উভয়ের জন্ম আলাদা, লক্ষ্য আলাদা, ধর্ম্মকর্ম্ম আলাদা।

শিল্প ও জীবনে এই দ্বৈধ বৈপরীত্য যদি থেকেই থাকে, তবে তার কারণ ও-দুটিকে তাদের সত্যকার স্বরূপে না দেখে, দেখা হয়েছে ওদের একটা সঙ্কীর্ণতর বাহ্যতর রূপে। জীবনকে মূলতঃ প্রধানতঃ ধরা হয় প্রাকৃত (অর্থাৎ পাশব) বৃত্তির অদম্য লীলাখেলা হিসাবে, যাকে ব্যর্থভাবে অসহায় ভাবে নিয়ন্ত্রিত বশীভূত করে রাখবার চেষ্টা হয়েছে কতকগুলি

* ফরাসীরা বলে থাকেন বালজাকের সমাজ—বিশেষতঃ তাঁর Femme de Trente ans (ত্রিশ বছরের মেয়ে) ফরাসী দেশে বাস্তবিক দেখা দিয়েছে বালজাকের পরে। ঐ ফরাসীদেশেই আর একজন বা এক সম্প্রদায় শিল্পীর সম্বন্ধে কথা আছে যাঁরা মেয়েদের আঙুল এক বিশেষ গড়ন দিয়ে আঁকতেন—পরবর্ত্তী যুগে দেখা গেল সত্যসত্যই অনেক মেয়ের আঙুল ঐ রকম গড়ন পেয়েছে।

† বিগত মাঘ মাসে ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

* এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে কিছু বাধা পেয়েছিলেন।

রীতিনীতি, মনগড়া বিধিব্যবস্থার সহায়ে। আর শিল্পকেও মোটের উপর বিবেচনা করা হয় কেবল চিত্তবিনোদনের সামগ্রী, জীবনের রূঢ়তা তিক্ততা হতে ক্ষণকালের মুক্তি, আরাম—কল্পনার, খোসখেয়ালের, স্বপ্নবিলাসের লাস্ত—একেবারেই অহেতুক আনন্দের উচ্ছ্বাস, একান্ত অপ্রয়োজনের অব্যবহার্য্যের অতিরিক্ততা। কিন্তু জীবনকে ও শিল্পকে এভাবে কোথাও কোথাও বা সচরাচর দেখা হলেও তা সত্য দেখা কি পূর্ণ দেখা নয়; উভয়ের মধ্যে যে কেবল অন্যোন্যাভাবেরই সম্বন্ধ থাকতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা কিছু নাই।

শিল্প ও জীবন যদি পরস্পরকে স্পর্শ না করেই বরাবর চলতে থাকে—তাদের মিলবার মিশবার সম্ভাবনা এক যদি থাকে কেবল অনন্তের মধ্যে, তবে ত সমস্যাটি সমাধানের ইঙ্গিত স্পষ্ট রয়েছে ঐখানেই—শিল্পকে অনন্তের চেতনায় উন্নীত করে ধরতে হবে, জীবনকেও গড়তে হবে ঐ অনন্তেরই অনুপ্রেরণায়।

শিল্প সম্বন্ধে কথাটি হয়ত একান্ত অভিনব বা অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ শিল্পের স্বরূপই বলা হয়ে থাকে একটা কিছু আনন্ত্যের অভিব্যক্তি—অন্ততঃ অধিকাংশ শিল্পীশ্রেষ্ঠেরাই একথা বলে থাকেন। জীবনের সাথে শিল্পের বিরোধও ঠিক এই দিক দিয়ে—কারণ, জীবনের কারবার হল ক্ষুদ্রকে খণ্ডকে সসীমকে নিয়ে আর ক্ষুদ্র খণ্ড সসীমভাবে। সব কবিরাই চেয়েছেন জীবনের এই গণ্ডী ভেঙ্গে, এই বাহ্যতা ছিঁড়ে একটা কিছু গভীরতর বৃহত্তর বস্তুকে আবিষ্কার করতে, প্রকট করতে। তথাকথিত অতি আধুনিকেরাও ক্ষুদ্রকে বাহ্যকে তুচ্ছকে নিয়ে যতই ব্যস্ত থাকুন না, তাঁদেরও সৃষ্টি শিল্পরসে অমৃতায়িত হয়ে উঠেছে তখনই—তাঁরাও অনেকে একথা স্বীকার করেন—যখন তার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে একটা কিছু আনন্ত্যের দ্যোতনা, একান্ত ইন্দ্রিয়-পরিচ্ছিন্ন নয় এমন কোন চেতনার বা শক্তির বা সত্তার ইঙ্গিত। আর জীবনকেও কেবল লোকায়ত-জীবন করে রাখাই সর্ব্বত্র একমাত্র কর্ত্তব্য ও সম্ভাব্য বলে বিবেচিত হয় নাই। জীবনকেও সেই আনন্ত্যের সুরে ও ছাঁদে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টাই হল আধ্যাত্ম-সাধনার নিগূঢ় মর্ম্ম। নীতির সদাচারের সাময়িক সঙ্কীর্ণ শৃঙ্খলা নয়, কিন্তু পরম মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বিধৃত দিব্য ছন্দই অধ্যাত্মের লক্ষ্য।

কবি হিসাবে যিনি মহান শ্রেষ্ঠ, জীবনের ক্ষেত্রে তাঁকে দেখি অতি সাধারণ, এমন কি সাধারণেরও নীচে হয়ত। অবশ্য জীবনে তুচ্ছ হলেও, শিল্পীর শিল্পমহত্ত্ব তাতে কিছু খর্ব্ব হয় না—শিল্পীর জীবনকে ভুলে দেখা উচিত কেবল তাঁর শিল্পকে। কথাটি ঠিক—কিন্তু এতে শিল্পীর অন্তরাত্মার একটি রহস্যকে, শিল্পসৃষ্টির একটি পূর্ণতর অভিব্যক্তির সম্ভাবনাকে আমরা অবহেলা করি।

শিল্পী তাঁর শিল্পের মধ্যে যে সত্যের সুন্দরের সন্ধান পেয়ে থাকেন অর্থাৎ যে চেতনার বলে তিনি রূপদ্রষ্টা ও রূপস্রষ্টা, তাকে শুধু ক্ষণিকের নয় কিন্তু সর্ব্বদার, স্বপ্নের কল্পনার ভাবের নয় কিন্তু জাগ্রতের, চঞ্চল নয় কিন্তু স্থির, ব্যতিক্রম নয় কিন্তু স্বাভাবিক করে তোলাই হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। জীবনকে গঠিত শাসিত করবার জন্য, সার্থক করবার জন্য যে সকল রীতিনীতি বিধিব্যবস্থা সাধারণতঃ আশ্রয় করে চলা হয় দেখি, শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রায়ই তা যথেষ্ট উদার গভীর বা সমুচ্চ বলে বোধ হয় না—বরং মনে হয় জীবনের বৃহত্তর নিবিড়তম অভিব্যক্তির পক্ষে অন্তরায়। সেই জন্যই অনেক শিল্পী, যাঁদের চেতনা একটা লোকোত্তর সত্যের সুন্দরের প্রভাবে পরিপ্লুত, একটা বৃহৎ মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্যে লীলায়িত, তাঁরা জীবনের পরিচিত শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলেন, তাঁদের প্রাণ সাধারণ সর্ব্বজনসম্মত ছাঁচের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। বহু কবি শিল্পীরাই জীবনের স্বাভাবিক কাঠামকে ভেঙেছেন বা ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন—তাঁদের সৌন্দর্য্যরচনার মধ্যেও তাঁদের এই প্রয়াসের ও আকূতির দোল ফুটে উঠেছে; কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে নূতন চেতনার অনুরূপ নূতন ছাঁচ গড়বার প্রতিষ্ঠা করবার কৌশল বা সাধনা তাঁরা আয়ত্ত করেন নাই। আবার অবশ্য এমন শিল্পীও আছেন যাঁরা শিল্পের দিক হতে লোকোত্তর দ্রষ্টা স্রষ্টা হয়েও অন্যদিকে—বাস্তবে কর্ম্মায়তনে—সাধারণ নৈমিত্তিকতার গড্ডালিকা প্রবাহে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন, তার বিধিব্যবস্থা সব মেনে নিয়ে চলেছেন—যেমন; শেকসপীয়র স্বয়ং।

অন্তরে লোকোত্তর শিল্পদৃষ্টি, বাহিরে স্থূল প্রাকৃত-দৃষ্টি—শিল্পীর এই দুটি দিক কোনরকমে না মিশে একেবারে পৃথক হয়ে থাকতে পারে। শিল্পী যখন সৃষ্টি করেন তখন একটা একান্ত অন্তর্মুখী সমাধির অবস্থায় তাঁর অন্য সত্তাটি সম্পূর্ণ ভুলে হারিয়ে ফেলতে পারেন; আবার সহজ জীবনে যখন ফিরে আসেন তখন তাঁর কবিসত্তাকে তাকের উপর তুলে রাখতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় এরকম সম্ভব হয় না—ঐ দুটি দিকের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হতে থাকে, এবং ওদের মধ্যে যদি একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয়, তবে সংঘর্ষ ঘটে। তার ফলে জীবনে যে কেবল ব্যর্থতা আসে তা নয়, শিল্পশক্তিও অনেক সময় ক্ষুণ্ণ খর্ব্ব হয়ে পড়ে।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যে এই রকম একটা কিছু ঘটেছিল বলে কেউ কেউ নির্দ্দেশ করে থাকেন। অবশ্য ব্রাউনিং যে অপরাধের উল্লেখ করেছেন—একমুঠি সোনার জন্যে আমাদের দিশারী আমাদেকে ছেড়ে গেলেন—সেটি স্থূল কথা; পদ অর্থ মান সম্ভ্রম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভনে যদি কবির পদস্খলন হয়ে থাকে, তবে সেটি একটি সূক্ষ্মতর অধঃপতনের প্রতীক। কবি তাঁর কবিচেতনায় পেয়েছেন যে উপলব্ধি, যে সত্যের সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ স্পর্শ, শিল্প-হিসাবেও তার সম্যক প্রকাশের রূপায়নের জন্য অনেক সময়ে দেখা যায় কেবল বাঙমানসের সাড়া ও সাহচর্য্যই যথেষ্ট নয়—প্রয়োজন হয় প্রাণের শারীরচেতনার পর্য্যন্ত অনুমতি ও সহযোগ, আর প্রাণ এবং শরীর নিয়েই ত জীবন। অন্য কথায়, সমগ্র জীবনটি যখন কোন না কোন রকমে মূল শিল্পীচেতনায় অনুপ্রাণিত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখনই শিল্পটির সম্যক স্ফুরণ সম্ভব। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিদৃষ্টি যখন তাঁর জীবনধারায় উন্মুক্ত পথ না পেয়ে কঠিন প্রতিবন্ধকে ব্যাহত প্রতিহত হয়ে পড়ল—তাঁর মনের প্রাণের দেহের সঙ্কীর্ণতা সংস্কার অসাড়তা যখন তাঁর ঊর্দ্ধতর চেতনাকে প্রত্যাখ্যান করে চলল তখনই তাঁর কাব্য-অনুপ্রেরণার উৎসও বিশুষ্ক হয়ে এল। কেবল ওয়ার্ডসওয়ার্থ কেন, আমার মনে হয় অনেক শিল্পীই, যাঁদের সম্বন্ধে বলা হয় তাঁরা could not speak out—তাঁদের মুখ ফুটল না—এই এক কারণে ব্যর্থকাম হয়েছেন।

জগৎকে জীবনকে একটা উত্তর চেতনার মধ্যে রূপান্তরিত করে দেখা সকল শিল্পীরই সহজাত অবশ্যম্ভাবী বৃত্তি বলে মনে হয়। এই আদর্শপরায়ণতাই শিল্পীকে কখন দৃশ্যমান স্থূলের রূঢ়তা কণিকতা ছাড়িয়ে unheard melodies, Elysian fields, magic casements প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিয়েছে—কখন বা এই জগৎটিকে ভেঙ্গে চুরে প্রাণের মত করে গড়বার প্রেরণা দিয়েছে কিংবা এ সকল চেষ্টা নিরর্থক ভেবে একে শুধু কষ্ট করে সহ্য করে যেতে বলেছে—in this harsh world draw thy breath in pain—অথবা এরই মধ্যে ডুবে গিয়ে এরই থেকে একটা কিছু তীব্র অসাধারণ আনন্দ আবিষ্কার করতে উদ্‌যুক্ত করেছে। এই আদর্শ-পরায়ণতাই যে শিল্পীর কেবল বিষয়বস্তুর ব্যাপার, শিল্পীর শিল্পরচনার তারতম্য ওদিক দিয়ে হয় না—এমন কথা বলা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ এই আদর্শপরায়ণতাই শিল্পীকে দিয়েছে তাঁর ছন্দের দোল, তাঁর রূপায়নে প্রাণাবেগ। এই আদর্শপরায়ণতারই অন্য নাম কবি-দৃষ্টি।

শিল্পীকে যতখানি মনে করা হয় অথবা শিল্পী নিজেই যতখানি মনে করেন যে জীবনলীলায় তিনি রয়েছেন কেবল সাক্ষীগোপালের মত, তাঁর একান্তবাসে সমাহিত, বাস্তবিক পক্ষে ততখানি তিনি তা নন। হাতে হাতিয়ারে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে আর পাঁচ জনার মত নেমে না যেতে পারেন, কিন্তু যে-সকল শক্তি বা বৃত্তি জীবনকে কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করে, তাদের সাথে তাঁর রয়েছে একটা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ, এবং এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, এই নিভৃত সহজ সংযোগ রয়েছে বলেই তিনি হতে পেরেছেন কবি—দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। শুধু শিল্পী হিসাবে অর্থাৎ জীবনের ভাব নিয়ে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা না হয়ে, জীবনের বস্তু নিয়েও দ্রষ্টা ও স্রষ্টা হয়ে ওঠা আর একটি ধাপের অপেক্ষা মাত্র।

জীবনের সাথে শিল্পের যে কতখানি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তার কিছু পরিচয় পাই ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনায়। যখনই দেখি জীবনে নূতন জোয়ার দেখা দিয়েছে, প্রাণে ফুটে উঠেছে নূতন সামর্থ্য, কর্ম্মায়তন যখন সমৃদ্ধ, তখনই কি দেখা দেয় নাই যাকে বলা হয় শিল্পের স্বর্ণ যুগ?

প্রাচীন গ্রীসে পেরিক্লীস্‌র যুগ, রোমে অগস্তের যুগ—রেণাসেন্সের ইতালীতে দশম লেও'র যুগ, ইংলণ্ডে এলিজাবাথের যুগ, ফরাসীদেশে চতুর্দ্দশ লুই'র যুগ—ভারতে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের যুগ প্রভৃতি কি একই সত্যের প্রমাণ নয়? আর আমাদের এই অভিশপ্ত (?) বর্ত্তমান যুগেও শিল্পজগতে দেখছি যে বিপুল বহু প্রয়াস, নূতনের অভিনবের বিচিত্রের আবিষ্কার-অভিযান, তারও মূলে নাই কি জীবনেরই ক্রমবর্দ্ধমান আবেগ আকাঙ্ক্ষা আশাভরসা?

জীবনপ্রবাহে তরঙ্গমালায় উতলে কেবল নয় পরন্তু নিতলেও যে শিল্পীর আবির্ভাব কোথাও কখন হয় না, তা নয়—তবে সেটা ব্যতিক্রম মাত্র। বেওশিয়া'র (Boeotia) মত দেশে পিন্দার, আর মধ্যযুগের একেবারে মধ্যভাগে দান্তে—দেখায় যেন নিবিড় আঁধারের কোলে বিজলী-চমক; কিন্তু এ হ'ল ব্যক্তিগত প্রতিভার কথা—দুই একটি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় শিল্পীজ্যোতিষ্ক, ধূমকেতুর মত, এভাবে অপ্রত্যাশিত দেশে ও কালে প্রকট হতে পারে, কিন্তু তাঁরা যেন মানবচেতনার ক্রমবিকাশের যে প্রধান কক্ষা তার কিছু বাইরে—(কতকটা হয়ত intervention বা আকস্মিক অবতরণের মত, ঐ বিকাশেরই কাজ এগিয়ে দেবার জন্য)।

জীবনের সাধক হলে যে শিল্পসাধনায় এসে পড়বে খাদ মিশ্রণ অধঃপতন, এমন আশঙ্কা অমূলক। বরঞ্চ তাতেই শিল্প হয়ে উঠতে পারে মহত্তর—শিল্প-হিসাবেও সত্যতর সুন্দরতর। যখন গীতাকারের মুখে শুনি

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্

কিংবা উপনিষদ ঋষির

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি—

তখন তা'তে কেবল অধ্যাত্ম-গৌরব নয়, কবিত্বেরও পাই চরমোৎকর্ষ।

জীবন-সাধক অর্থই ত এই তিনি তাঁর সমস্তখানি, তাঁর দেহ প্রাণমন দিয়ে এক পরম সত্যকে সৌন্দর্য্যকে ব্যক্ত করতে প্রয়াসী—সত্যের সৌন্দর্য্যের নিবিড়তম রহস্যকে তিনিই পূর্ণতরভাবে অধিগত করেছেন। সুতরাং তিনি যদি বিশেষ শিল্পসৃষ্টিতে ব্রতী হন, তাঁর উপলব্ধি বা চেতনা যদি বাঙ্ময়, ধ্বনিময়, বর্ণরেখাময় হয়ে উঠতে চায়, তবে তাঁরই হাতে শিল্প লাভ করে না কি তার পরাকাষ্ঠা?

আধুনিকতার, অতি-আধুনিকতার প্রধান দুর্ব্বলতাই এইখানে যে মানুষের একটা সঙ্কীর্ণ অংশ, বাহ্যবৃত্তি দিয়ে শিল্পসৃষ্টি করতে সে চেয়েছে—প্রধানতঃ তার মগজ, তার স্নায়ব অনুসন্ধিৎসা দিয়ে। সকল শিল্পই অবশ্য মানস সৃষ্টি—কিন্তু শিল্পীশ্রেষ্ঠদের মধ্যে দেখি তাঁদের মানস (সৃষ্টিকালে অন্ততঃ) তাঁদের জীবনের সমগ্রতাকে আপনার মধ্যে যেন তুলে নিয়েছে। আধুনিকের মানসসৃষ্টি কেবলই, একান্তই মানস—মানুষের আর সব অংশকে নিজের বাহিরে রেখে, দূরে থেকে শুধু দেখেছে পরীক্ষা করেছে। তাই আধুনিকতার মধ্যে দুর্লভ সামর্থ্য, সজীবতা, সত্যের একটা মৌলিক মহিমা।

ভবিষ্যতের শিল্পীকে প্রথমে ফিরে যেতে হবে চেতনার সমগ্রতার মধ্যে, সমস্ত আধার দিয়ে উপলব্ধ সত্যের সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হবে শিল্প। প্রাচীন শিল্পীতে এই সমগ্রতা ছিল ভাবগত, অন্তরাত্মার একটি একাগ্রতার ফল। কিন্তু এই সমগ্রতা যদি হয় বস্তুগত অর্থাৎ মানুষ হিসাবে আধারে জীবনে শিল্পীর সত্য যদি মূর্ত্ত হয়ে উঠে, তবে তাতে শিল্পও পাবে এক অভিনব মাহাত্ম্য। কেবল কাগজে কলমে নয়, সেই সাথে ক্রিয়া কর্ম্মেও শিল্পী তাঁর শিল্পপ্রেরণাকে মূর্ত্ত করে চলতে পারেন—ভবিষ্যৎযুগের শিল্পীর পথই হবে তাই। শিল্প হিসাবে শিল্পীর পথ এক, জীবন-সাধক হিসাবে পথ তাঁর আলাদা—এ ব্যবস্থার মূল্য তখন আর থাকবে না। কারণ, শিল্পীর শিল্প হবে তাঁর জীবনসাধনার অভিব্যক্তি—যে সত্যকে সুন্দরকে জীবন চায় শরীরী করতে তারই এক একটা প্রতিরূপ গড়ে তুলতে বিভিন্ন শিল্পের বিভিন্ন কাঠামো। তা ছাড়া, এখনও—চিরকালই কি শিল্পী তাঁর জীবনের সাধনাকে, অর্থাৎ জীবনের গভীরতম উপলব্ধিকে, আকৃতিকেই রূপ দিয়ে চলছেন না?

তবে ভবিষ্যতের শিল্পী এই জীবন সাধনা সজ্ঞানে ত করবেনই, তাঁর লক্ষ্যও হবে চরম পরম সাধ্য একটা কিছু—পূর্ব্বে আমরা যে বলেছি, আনন্ত্যের মহিমা। এখনকার শিল্পীর মধ্যে রয়েছে যে দ্বৈধ বা আত্মবিরোধ, তার

পরিবর্ত্তে শিল্পী আপনাতে পাবেন অখণ্ড ঐক্য, তাঁর প্রকৃতি দ্বিচারিণী না হয়ে, হয়ে দাঁড়াবে অচ্ছিন্না একনিষ্ঠা অনন্তভাজা।

তাতে শিল্পকে হয়ত পুরাতনের অনেক রস ও রূপ বর্জ্জন করে, অতিক্রম করে চলে যেতে হবে—কিন্তু বিবর্ত্তনের ক্রমোন্নতির নিয়মই তাই। ভবিষ্যতের শিল্পী অতীতের প্রাকৃত বৃত্তি নিয়ে যদি না'ই আর লিখতে পারেন—

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus...
Da mihi basia mille deinde centum,
Deinde—* (Catullus)

কিংবা,

I fear thy kisses, gentle maiden,
Thou needest not fear mine— (Shelley)

তাতে তাঁর শিল্পশক্তি কিছু খর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে না। তাঁর চেতনা যদি পেয়ে থাকে জীবনের উর্দ্ধতর, বৃহত্তর, গভীরতর গতি ও বৃত্তি, তাঁর শিল্পেও ধরা দিবে লোকোত্তর চলন ও বলন।

কবির আদি অর্থ ছিল ঋষি। এই দুয়ের মধ্যে ভেদ ক্রমেই বেড়ে চলে এসেছে। কিন্তু এখন কবিকে আবার ফিরে আর্ষ চেতনায় উঠতে হবে নব যুগের নব সৃষ্টির জন্য। জীবনের সাধনায় যে ঋষি—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মভূত—শিল্পের রচনায় তিনিই হবেন পরম কবি।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

* "এস প্রিয়ে, আমরা বেঁচে থাকি শুধু তুমি আমাকে ভালবাসবে, আমি তোমাকে ভালবাসব বলে। দাও আমাকে সহস্র চুম্বন, দাও আরও শত, আরও…

স্পর্শমণি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নীল আকাশের নিটোল গায়ে তারার কুসুম যেথায় রাজে,
নীল সাগরের অতল জলে মুক্তা ধবল দ্বীপের মাঝে,
তুষার-গলা অভ্রভেদী পাহাড়তলীর ঝর্ণা পরে,
কুজ্ঝটিকার তিমির ভেদি সোণার কিরণ যেথায় ঝরে,
বেড়াও সেথায় বন্ধু আমার নিত্য নূতন কাব্য গেঁথে,
তোমার পায়ের পরাগ পেয়ে বিশ্বভুবন উঠ্‌ছে মেতে।

অচীন্ পাখীর রজতপাখায় ঝিলিক্ লাগাও কল্পলোকে,
সুষমা লাগাও স্বপন ছুঁয়ে ঘুমিয়ে-থাকা পরীর চোখে;
বৈতরণীর তপ্তনীরে স্নেহের খেয়া ভাসিয়ে দিয়ে,
পার ক'র যে শেষবেলাতে পায়ের কড়ি নাইক নিয়ে।
যাত্রীগণের হতাশ মনে নবীন আশার জাগাও সুর,
পিছন পানে কাঁদ্‌ছে যারা তাদের নিরাশ কর্‌ছো দূর।

গ্রহদলের নৃত্য তালে তোমার বাঁশীর মোহন ধ্বনি,
বাজ্‌ছে যে গো রাত্রিদিবস মুগ্ধ রহে করাল-ফণি।
ঊষার ভালে দিচ্ছ সিঁদুর, রাতের গলায় চন্দ্রহার,
রবির রথের তুরগ চালাও ঘুচিয়ে ধরার অন্ধকার।
ঝড়ের সাথে মাত্‌ছো তুমি সরিৎপতির বার্‌নাতে
তোমার রূপের পাই যে আভাস তড়িৎবধূর আর্‌নাতে।

সরিৎবুকে জ্বালাও আগুন, জলের ভিতর রাখ্‌ছো বারি,
পুষ্পদলে পাই যে তোমার হৃদ্‌জুড়ানো সুধার ঝারি,
তরুর সনে লতার বাঁধন দিচ্ছ মিলন রাখীর ডোরে,
আমার প্রেমের প্রকাশ কর তোমার প্রেমের পরশ করে,
ছাপিয়ে আমার পরাণখানি পড়ুক তোমার শান্তিজল,
সকল জ্বালা জুড়াও সখা পাই যেন গো পরম বল।

বিচার

শ্রীমতী হেমবালা বসু

১

ফুলজান বিবি বিধবা হইয়া যখন বারো বছরের ছেলে মাণিককে লইয়া বাপের বাড়ী আসিল, রহিম তখন বুঝিতে পারে নাই যে সেজন্যে তাহাকে অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে; তার গৃহ শূন্য, বাড়ীতে আর কেহ ছিল না; সেই শূন্য গৃহ পূর্ণ করিয়া মেয়েটি যখন ছেলে নিয়া রহিল, এই শোকের ভিতরেও রহিম একটু স্বস্তি অনুভব করিল; তবু ও সে একবার বলিল, 'আর কি সেখানে যাবি না জান? স্বামীর ঘর ছেড়ে দেওয়া উচিত হ'বে কি মা? সেখানকার ক্ষেত খামার, কুঁড়ে খানার মালেক তো এই মাণিক!'

ফুলজানি উত্তর দিল, 'না বাবা, আর সেখানে যাব না; সে সব ক্ষেত খামার কবে সরিকরা দখল করেছে, তার জন্যে দাঙ্গা করতে ইচ্ছে করে না আর; তোমার সেবা আর মাণিককে মানুষ করা এখন এই তো আমার কাজ বাবা! নসীবে থাকলে মাণিক অমন কত জমি করতে পারবে, তার জন্যে ভাবি না। খোদা ওকে জীইয়ে রাখুন!'

রহিমের অবস্থা মন্দ ছিল না, মেয়ে ও নাতিটির মুখ চাহিয়া সে দ্বিগুণ উৎসাহে চাষ করিতে লাগিল। ফুলিও ফসল ঝাড়া তোলা, রান্না-বাড়া প্রভৃতি সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকিয়া স্বামী শোক ভুলিতে সচেষ্ট হইল; সে পড়শীদের বাড়ী যায় না, কারো সঙ্গে কথা বলিতেও চায় না। পাড়ার মহম্মদ মইজুদ্দিন প্রভৃতি যুবকেরা ফুলির এই নীরবতা পছন্দ করিল না, তার শোক নিবারণের জন্যেও তাহারা বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িল; পথে, ঘাটে দাঁড়াইয়া তারা ফুলির সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল, ফুলি যে তা'দের একজনকে নিকা করিলে মনের সুখে থাকিতে পারে, ইহাও জানাইতে কসুর করিল না; ফলে ফুলজানির ঘাটে পথে যাওয়া বা পিতার অনুপস্থিতির সময় বাড়ীতে একলা থাকা মুস্কিল হইয়া উঠিল; যেদিন সে সারা রাত ঘরের পেছনে শিসের শব্দ ও গান শুনিতে পাইল, তার পর দিনই পিতাকে বলিল, 'এখানে থাকা আমার হ'বে না বাজান, যে জন্যে মীরপুর ছেড়ে এসেছি, এখানেও তাই—চল, আমরা আর কোথাও যাই!'

বৃদ্ধ রহিম সবই বুঝিত, কিন্তু একলা প্রাণী এতগুলি কুলোকের সঙ্গে বিবাদ করিতে সাহস পাইত না; নিরুপায়ের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে মেয়ের কথার জবাব দিল, 'বাড়ী ঘর ছেড়ে কোথায় যাব মা? দেখি, জমিদারকে ব'লে কোনো সুরাহা হয় কি না; ঈশেনবাবু থাকলে তো কথাই ছিল না, আমার ওই লাঠি তাঁর অনেক কাজে লেগেছে। রতনবাবু যে আমায় চেনেন না, এই হয়েছে মুস্কিল!'

'না বাপজান, তুমি এসব কথা জমিদারকে বলতে যেও না—ছি, ভাবতেও আমার সরম লাগে! তার চেয়ে চল, এ গাঁ ছেড়ে হিন্দু পাড়ার সামনে কোথাও থাকি গে; তারা তো আমোদের ছোঁবেও না, সেই বেশ হ'বে।'

'বিপদে আপদে সেখানে কে আমাদের দেখবে মা?' কাতর প্রশ্নের উত্তরে কন্যা বলিল, 'খোদা দেখবেন, আর কেউ দেখবার নেই! বাবা, তুমি সেই ব্যবস্থাই কর।'

বৃদ্ধ পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বাজিতপুরে জমিদারের কাছারী বাড়ীতে উপস্থিত হইল; সে এখানে অনেকবার আসিয়াছে, ঈশানবাবুর মৃত্যুর পরে আর এদিক মাড়ায় নাই; তখন এই বাবুরা সব পাঠের জন্যে বিদেশে থাকিতেন, রহিম ইঁহাদের পরিচিতও নহে। যাঁর জন্যে সে জীবন দিতেও পারিত, যিনি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, আজ তিনি কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে রহিম শুষ্ক মুখে নবীন জমিদারকে সেলাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল; রতন রায় কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'কে তুমি?'

'আমি রহিম শেখ,হুজুর, আপনার তাঁবেদার।'

'তুমি কি চাও?'

'বাবু আমি আর কাদেরপুরে বাস করতে পারছি না, জান হাররাণ হয়ে উঠেছে। আপনি যদি মেহেরবাণী ক'রে বাজিতপুরে পুকুরের ধারের ঐ জায়গাটা আমায় বাস করতে দেন, তবে আমি সেখানকার জায়গা জমি বিক্রী ক'রে এইখানেই চলে আসি।'

বিস্মিত রতন রায় দেওয়ানের পানে চাহিলেন; তিনি বলিলেন, 'লোকটা বয়েসকালে বাবুর লাঠিয়াল ছিল, অনেক উপকার করেছে; কিন্তু ও যে মোছলমান বাবু!'

রতন রায় বলিলেন, 'তুমি ওখানে থাকতে পার, কিন্তু পুকুরের জল তো ব্যবহার করতে পারবে না, গাঁয়ের হিন্দুরা তা'তে আপত্তি করবেন।'

'বাবুজি, ঐ পুকুরের জলে আমাদের দরকার নেই। আমরা মোটে তিন জন লোক। আমি, আমার মেয়ে আর ছোট একটি ছেলে: খালের জলেই আমাদের যথেষ্ট হ'বে; দরকার হয় তো পেছনের ডোবাটা কাটিয়ে একটু গভীর ক'রে নেব, কাজ চলে যাবে। অনেক ক্ষতি স্বীকার ক'রেও এখানে আসতে চাচ্ছি, একটু শান্তির জন্যে বাবু; যে রকম ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, একটা খুন জখম না করতে হয়! জোয়ানকালে অনেক জান নিয়েছি, এখন আর কারো মাথায় লাঠি তুলতে হাত ওঠে না হুজুর!'

'আচ্ছা তাই এস; গাঁয়ের এক পাশে থাকবে, এতে আর কার কি ক্ষতি হবে। ওকি, এখনি উঠছো কেন রহিম, বসো; অনেক দূর থেকে এসেছ, একটু জল খেয়ে যাও!'

'না বাবু, মাপ করবেন, এ বাড়ীতে আমি অনেক খেয়েছি! এখন আর দেরী করতে পারব না, মেয়েটাকে একলা ফেলে এসেছি; সেলাম বাবুজী!' তাঁহাকে আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া রহিম আবার বলিল, 'আজ আমাদের বড় শান্তি দিলেন বাবু, খোদা আপনার ভালো করবেন!' রতনরায় হাসিয়া বলিলেন, 'খোদা আমার ভালো করেন নি রহিম, যাক তুমি যাও!'

রহিমের সহিত দেওয়ানও কাছারীর বাহিরে আসিলেন ও একটু দূরে গিয়া তাহাকে বলিলেন, 'কেন তুই বাবুর সঙ্গে অত কথা কইতে গেলি? বাবুর ছেলেটি এবারে পাশ দিয়েই মারা গেল! শোন্ রহিম, বাবু খুবই ভালো মানুষ, যে যা চায় দিয়ে দেন, কিছু তলিয়ে দেখেন না; কিন্তু তোর তো বুঝতে হয়; তুই এখানে এলে গাঁয়ের সবাই বিরক্ত হয়ে বাবুকে যা তা বলবে, তার চেয়ে যেখানে আছিস থাক্; আমি পাইক পাঠিয়ে তোদের পাড়ার সবাইকে শাসিয়ে দেব, বুঝলি?'

'না দেওয়ানজী, তা'তে কিছু হ'বে না; পাইকের কথায় বুঝ মানবে, ওরা সে পাত্তর নয়! আপনি দেখবেন আমার জন্যে কারু কিছু অসুবিধে হবে না। চাঁড়াল পাড়ায় ঐ জঙ্গলটা সাফ ক'রে নিয়ে গাছের আড়ালে ঘর বাঁধব, পরের জমিতে জন খেটে খাব, তবু আর সেখানে থাকব না!'

'মর্ ব্যাটা! যখন ভালো বুঝ নিলি না, তোর বরাতে অনেক দুঃখু আছে!' বলিয়া দেওয়ানজী অপ্রসন্ন মুখে কাছারীতে ফিরিয়া চলিলেন।

২

এক মাস হইল রহিম বাজিতপুরে আসিয়াছে, নূতন বাড়ী প্রস্তুত ও পরিষ্কার করিয়া এইবারে তাহারা একটু স্থির হইতে পারিয়াছে। ফুলজানি রহিমকে বলিয়া বাড়ীতে একটা কুয়া কাটাইয়াছে, জলের জন্যে সে খালের ধারেও যায় না। সামনেই চাঁড়াল পাড়া, সর্দাররা সবিস্ময়ে একবার এই নূতন বাড়ীটির দিকে চাহিয়া দেখিল, তার পরেই যথা সম্ভব দূরে সরিয়া গেল; তাদের বাড়ীর মেয়েরা বলিতে লাগিল, 'ও মা, ওরা মোছলমান! আমরা ভেবেছিনুম হিন্দু বুঝি; মাগো, জমিদারবাবুর যা কাণ্ড, বাজিতপুরেও মোছলমান বসালে, হিন্দুর পাড়া আর রইল না কো! ওরে জগা, দেখিস ঐ ছোঁড়াটাকে ছুঁয়ে এসে ঘর দোর যেন একসা ক'রে দিসনে; ওর কাছ থেকে তোরা একটু তফাতে হয়ে থাকিস।'

ফুলজানি এখানে আসিয়া যেন শান্তি পাইল, রহিমের তো মেয়ের সুখেই সুখ; সে কর্ম্মঠ লোক, কয়েকটা জমির বন্দোবস্ত করিয়া ভাগে চাষ করিতে লাগিল। বেলা শেষে শ্রান্ত রহিম যখন ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ফুলির সঙ্গে গল্প করিত, তাহার হাসি মুখ ও নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া তার এত

ভালো লাগিত যে পূর্ব্বপুরুষের ভিটে ছাড়ার কষ্টও সে ভুলিয়া যাইত।

কেবল মাণিক এখানে কোন সুবিধাই পাইল না; পাড়ার ছেলেরা তার পানে এমন ভাবে চাহিয়া থাকে, যেন তাহারা একটা নূতন জানোয়ার দেখিতেছে। কাহারও কাছে গেলেই সে শোনে, 'ওরে সরে আয়, তোকে ছুঁয়ে দেবে!' সাথীর অভাবে তাহার খেলাধুলা বন্ধ হইয়া গেল; নির্জ্জন বাড়ীটিতে গরু চরাইয়া ও পাখীর গান শুনিয়া দিন আর কাটে না। আম্মাজানকে বলিলে সে তাহাকে বই পড়িতে বলে, তাহাও মন চায় না! ক্রমে সে মরিয়া হইয়া উঠিল; কেন, সে কি মানুষ নয় যে কাহাকেও ছুঁইতে পারিবে না? পাঠশালার নফর গোপাল তো তা'কে ছোঁয়, তা'দের জাতি যায় না, তবে কেষ্ট কানাইদের জাতি যাইবে কেন? না, সে এখন হইতে সকলকেই ছুঁইয়া দিবে, ওসব কথা শুনিয়া একপাশে সরিয়া থাকিবে না! সেদিন তাহার গরু মাধব সর্দ্দারের বাড়ী ছুটিয়া গিয়াছিল; সে আনিতে গেলে বাড়ীর মেয়েরা বলিল, 'তুই ওইখেনে দাঁড়া, আমরা গরু বার ক'রে দিচ্ছি; নিকোনো উঠোন মাড়াস নি কো!' মাণিক মুখ লাল করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল; স্ত্রীলোকটি গরুটাকে তাড়া দিতে দিতে বলিল, 'মুখে আগুন, মোছলমানের গরুও কি তেমনি? এবাগে তাড়ালে ওবাগে যায়, কিছুতেই বাড়ী থেকে বেরুতে চায় না!'

আল্লা, অনবরত মাণিক এসব কি শুনিতেছে, এত অপমান, এই ঘৃণা সে কেমন করিয়া সহিবে!

তারপরেই পাড়ায় রক্ষাকালীর পূজা হইল। মাণিক পুকুর পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখিল, মাথায় ফলের ঝুড়ি, চা'লের থালা লইয়া ছেলে মেয়ে বুড়ো মেলা লোক বাজনা বাজাইয়া কোথায় যাইতেছে; তাহারা নিকটে আসিয়া কহিল, 'ওরে মাণকে, সরে যা; আমরা মায়ের পুজো দিতে যাচ্ছি, পথ দে!' মাণিক গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; একটি স্ত্রীলোক বলিল, 'ওরে শুনচিস, সরে দাঁড়া!' মাণিক মুখ তুলিয়া বলিল, 'কেন সরে দাঁড়াব? তোমরাও মানুষ, আমিও মানুষ; আমায় ছুঁলে তোমাদের কক্ষনো জাত যাবে না!' জগা বলিল, 'তুই যে মোছলমান রে, তোকে ছুঁলে জাত না যাক, মায়ের পুজো দেওয়া যাবে না; সেদিন গুরুমশায় তোকে বলেন নি, এই মাণকে, তুই একটু ওধারে গিয়ে বোস বাবা, কাউকে যেন ছুঁয়ে দিস নি; তবে?' স্ত্রীলোকটি বলিল, 'মাণিক, লক্ষ্মিটি, একটু সরে দাঁড়াও তো! আমরা সব নেয়ে ধুয়ে পুজো দিতে যাচ্ছি, পাড়ায় মায়ের অনুগ্রহ হ'তে লেগেচে, তুমি যেন ছুঁয়ে সব পণ্ড ক'রে দিও না।'

মাণিকের কি মনে হইল, সে জগাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'আজ তোদের সব্বাইকে ছুঁয়ে দেব রে, আমি ছুঁলে যদি মায়ের পুজো না হয় তো হবে না!' জগাও তাহাকে ধরিয়া পথ হইতে সরাইয়া লইয়া বলিল, 'তোমরা সব চলে যাও, আমি এটাকে আটকে রাখছি; এর পরে নেয়ে তখন যাব।' তাহারা মোছলমানের 'নিকুচি' করিতে করিতে চলিয়া গেল। জগা মাণিককে ঘা কতক মারিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার প্রতিফল দিল, পরে তাহারা কয়েক জনে মিলিয়া এই অপরাধের বিচারের জন্তে মাণিককে জমিদার বাড়ীতে লইয়া চলিল; 'মাতব্বর' ও পূজা দিতে না গিয়া তাহাদের সঙ্গ লইল, এই মোছলমান ছোঁড়াটা যাহাতে বেশী সাজা পায়, তাহাতো করিতে হইবে।

দ্বিপ্রহরে রহিম সেখ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিল। আজ আর মাণিক তাহার ভাত লইয়া মাঠে যায় নাই, কি হইল? সে আসিবামাত্র ফুলজানি কাঁদিয়া বলিল, 'বাপজান, এখানে এসে আর এক মুস্কিলে পড়া গেছে, কেউ আমাদের ছুঁতে চায় না! ছেলেটা কা'কে ছুঁয়ে দিয়েছে ব'লে তাকে মারতে মারতে ওরা সব কাছারীতে নিয়ে গেছে।'

রহিম উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল; কাছারী বাড়ীর সামনে জগারা মাণিককে লইয়া একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, রতন বাবু তখনও আসেন নাই। রহিম সেখ আসিয়া দেখিল, কেহ মাণিকের কাণ মলিয়া দিতেছে, কেহ বা বলিতেছে, 'আর কখনো আমাদের ছুঁয়ে দিবি, তা'হলে তোদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেব, জানিস? তোর জন্তেই আজ আমার পুজো দেখা হলোনা!'

রহিম জগার নিকটে গিয়া বলিল, 'বাপজান, একে ছেড়ে দাও; বাচ্চা লোক, বুঝতে পারে নি, কসুর করে ফেলেছে; আর কখনো করবে না।'

জগা বলিল, 'বুড়া, এ কসুরের মাফ নেই! আমাদের পুজোর জিনিস ছুঁয়ে দিয়েছে, এর শাস্তি ওকে পেতেই হবে।'

ধীরে ধীরে রহিম সেইখানে বসিয়া পড়িল, তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। রতন রায় কাছারী যাইবার মুখে সেই গাছতলায় আসিয়া বলিলেন, 'এখানে তোরা কি করছিস রে, একি, এমন জোরে একে ধরে রেখেছিস যে?'

জগা যোড় হাত করিয়া বলিল, 'বাবু, এই মাণকেটা রহিম সেখের নাতি; সেই আপনি যাঁকে আমাদের ডোবার ধারে বসিয়েছেন; এর জ্বালায় আমরা অস্থির হয়ে উঠেছি হুজুর! পুজো পার্ব্বণ সব বন্ধ হ'বার যোগাড় হয়েছে; ছেলেটা কারু কথা শোনে না, সবাইকেই ছুঁয়ে দেয়, বুঝুন কি বিপদ!'

রতন রায় বলিলেন, 'তোমায় যদি কেউ সব সময় ছুঁওনা ছুঁওনা বলে, তবে তোমার কেমন বোধ হয় জগা?'

জগা ম্লান হাসিয়া বলিল, 'সে তো বলেনই হুজুর আপনারা! তা আমরা কখনো আপনাদের ছুঁতে যাইও না, যেমন চাঁড়ালের ঘরে জন্মেছি, তেমনি আলগোছ হয়েই থাকি; কিন্তু এই মোছলমান বেটার আস্পর্দ্ধা কত, আমাদের পুজোর জিনিস নষ্ট ক'রে দিতে চায়!'

রতন রায় বলিলেন, 'আহা ওযে বালক! সব সময় ছুঁওনা ছুঁওনা ব'লে ওকে বোধ হচ্ছে পাগল ক'রে তুলেছিলে তোমরা, ছোকরা তাই ক্ষেপে গেছে; তাই নয় কি, মাণিক?'

মাণিক মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর দিল না। রতন রায় জগাকে কহিলেন, 'একে ছেড়ে দাও জগা, এবারের মত মাপ করলুম; রহিম, নাতিকে একটু শাসন করে দিও, আর যেন আমার এরকম নালিশ শুনতে না হয়!'

কৃতজ্ঞতায় রহিমের বুক ভরিয়া গেল; মাণিক ছাড়া পাইয়া নিকটে গেলে সে তাহাকে বলিল, 'বাবুকে সেলাম কর্ বেটা, ওঁর দয়ায় বেঁচে গেলি; আমার তো ভাবনায় কলিজা শুকিয়ে উঠেছিল, এমন গোস্তাকী আর করিস্ নে!'

জগা বলিয়া বলিয়া উঠিল, 'একি করলেন হুজুর? নিদেন দু'চার ঘা বেতের হুকুম দিন! মোছলমানকে অত আস্কারা দেবেন না বাবু, তা'হলে হিন্দুয়ানী রাখতে পারবেন না; একেই তো বাঙ্গালা দেশ মোছোলমানে ভরে উঠেছে!'

'ঠিক বলেছ, বাঙলা দেশ মোছলমানে ভরে উঠেছে! কিন্তু বিচারের নামে অবিচার তো করতে পারব না। এইটুকু ছেলে, এর দোষ একবার মাপ করাই উচিত; যাও ছোকরা, দাদুর সঙ্গে বাড়ী যাও, আর কখনো এমন কাজ করো না' বলিয়া রতন রায় চলিয়া গেলেন; রহিম'ও মাণিক তাঁহাকে যে আভূমি নত হইয়া সেলাম করিল, তিনি তাহা চাহিয়াও দেখিলেন না।

রহিম ব্যথিত স্বরে জগাকে বলিল, 'মোছলমান কি মানুষ নয় বাপজান? মানুষকে এত ঘেন্না করা কি মানুষের কাজ?'

জগা হাসিয়া বলিল, 'তোরা আবার মানুষ না কি রে? ঠ্যাঙানীর চোটে চাঁড়ালরা তোদের সায়েস্তা করে রেখেছে; নইলে চুরি, বদমাইসী, বাটপাড়ি—হেন কাজ নেই যা তোরা করতে না পারিস্! সেই জন্তেই তোদের আমরা অত ঘেন্না করি, শুধু মোছোলমান বলেই নয়!'

আর কথা না বাড়াইয়া রহিম মাণিকের হাত ধরিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল; তাহারা ঘরের দাওয়ায় উঠিতেই ফুলজান ছুটিয়া আসিল, পিতার সঙ্গে পুত্রকেও দেখিয়া তাহার বিষন্ন মুখ প্রফুল্ল হইল; এক বদনা জল বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া আনিল। রহিম হাত মুখ ধুইয়া আসিলে হুকাটা তাহার হাতে দিয়া ফুলি কাছে বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল; সে একটু সুস্থ হইলে এক সানকী চিঁড়া গুড় আনিয়া ফুলজান বলিল, 'বাপজান, এই নাস্তাটুকুন খেয়ে ফেল, এতটা বেলা তোমার পেটে আজ কিছুই পড়ে নি। মাণকেকে খেতে দিও না বলছি, ওর জন্তেই তোমার এত হায়রান হ'তে হলো। আমি যাই, চট্ করে রান্না সেরে ফেলি গে।'

'এখনো রান্না চড়াস নি যা?' বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ফুলজান হাসিয়া বলিল, 'চড়িয়েছিলুম বাজান, মাণকেকে সর্দ্দাররা মারতে মারতে নিয়ে গেল দেখে নাবিয়ে ফেলে রেখেছি; আর যে আবার খানা পিনা করবো, সে কি বুঝেছি? চাঁড়ালদের কথা শুনে বাবু কি বললেন বাপজান

বল না শুনে যাই ; ওরা যে ক'রে ধরে নিয়ে গেল, মাণকে যে আর ছাড়ান পাবে, তা ভাবতেও পারিনি !'

'বাবু বড় ভালো মাজান ! ঈশেন বাবুর ছেলে তো, ভালো হ'বেন না ? সর্দারদের কোন কথাই তিনি কাণে তোলেন নি, মাণকেকে তক্ষুনি একেবারে বেকসুর খালাস দিয়ে দিলেন।' পিতার কথা শুনিয়া ফুলজানের চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া গেল, সে উদ্দেশে রতন রায়কে সেলাম করিয়া কহিল, 'যিনি গরীবের ভালো করেন, খোদাতালা তাঁর ভালো করবেনই বাপজান ! এই সুবিচারের জন্যে খোদার দোয়া নিশ্চয় তিনি পাবেন।'

৩

ফুলজানের মত দেশের সকলেই রতন রায়ের সুবিচারের সুখ্যাতি করিত। স্ত্রীলোকেরাও তাঁহার কাছে আসিয়া অভাব অভিযোগ জানাইতে দ্বিধা করিত না ; তিনি তখনই তাহার প্রতিকার করিতেন দেখিয়া প্রজারা নারীর উপরে অত্যাচার করিতে সাহস পাইত না। রতন রায়ের সুশাসনে বাজিতপুরের লোকেরা শান্তিতে বাস করিত, কিন্তু তাঁহার নিজের জীবন ছিল শান্তিহীন ; একমাত্র সন্তান মণি রায়ের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাঁহার মাতা ও পত্নীর মনোমালিন্যের ফলে বাড়ীতেও বড় অশান্তি হইত।

বাজিতপুরের চৌধুরী বাড়ী দেখিলে রাজবাড়ী বলিয়া মনে হয় ; বড় দীঘির পাড়ে পুষ্পোদ্যান পরিবেষ্টিত সেই সুন্দর অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে পাইক ও বরকন্দাজরা পাহারা দিতেছে, তাঁহাদের ঠাকুর বাড়ী ও অতিথিশালাতে বহু লোক প্রতিপালিত হইতেছে ; ইহা ছাড়া দুঃস্থ প্রজা ও ব্রাহ্মণগণের সাহায্যের নানা রূপ সুব্যবস্থা আছে।

জমীদারীর কাজের জন্ম রতন রায় কাছারীতেই প্রায় থাকিতেন, বাড়ীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিতেন মধ্যম রজত রায় ; তাঁহার পত্নী কল্যাণী ও সংসারের সমস্ত ভার লইয়া দিদি ও শ্বশ্রূ-মাতাকে শান্তি দিতে চাহিত, কিন্তু তাঁহারা যে কোথা হইতে গোলোযোগের সূত্র বাহির করিতেন, কেহই বুঝিতে পারিত না।

সে দিন কিন্তু সেরূপ কিছুই হইল না ; চৌধুরাণী আহারান্তে নিজের ঘরে গিয়াছেন, বড় বধূ সুজাতাও তাহার দ্বিতলের সুপ্রশস্ত শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া কল্যাণী হাসি মুখে বিশ্রাম করিতে গেল ; খাটের উপরে রজত রায় লম্বশাটপটাবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'তোমাদের খেতে এত দেরী হয় কেন, বেলা যে তিনটে বাজে। চট ক'রে কয়েকটা পান সেজে দাও তো, আমায় এখুনি ভিন গাঁয়ে যেতে হবে ; পানও সেজে রাখ নি যে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

খাটের নীচে হইতে পানের বাটা বাহির করিয়া কল্যাণী পান সাজিতে বসিল, রজত রায় তাহার দীর্ঘ চুলের গোছা হাতে তুলিয়া নিয়া আস্তে আস্তে টানিতে লাগিলেন ; কল্যাণী হাসিয়া বলিল, 'উঃ, আমার লাগে না বুঝি। নাও, তোমায় আজ অনেক গুলো পান সেজে দিলুম, যত খুসী খাও!'

রজত রায় হাত পাতিয়া বলিলেন, 'দাও, পানে আমার অরুচি নেই ; তা হঠাৎ যে এতটা উদার হয়ে গেলে, এর কি কারণ ?'

'আজ আর বাড়ীতে কিচ্ছু হয় নি। মণি মারা গিয়ে অবধি তোমাদের বাড়ীটি যা হয়েছে—হয় কান্না, নয় তো ঝগড়া, একটা কিছু অশান্তি লেগেই রয়েছে ; আজকের দিনটা শান্তিতে গেলো দেখে মনটাও বেশ ভালো লাগছে ; তাই কি আর করি, তোমাকেই দুটো পান বেশী ক'রে দিয়ে দিলুম!'

'তবে ও পান দুটো এখন রেখে দাও, রাত্তিরে দিও ; এখনও অর্দ্ধেক দিন পড়ে রয়েছে যে, এর ভেতরে কত কিছুই হতে পারে।'

'না না, আজ আর কিছু হবে না,' কল্যাণী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'দিদির সঙ্গে আর তো আর দেখা হবে না, ঝগড়া হবে কি ক'রে ?'

'তোমার সঙ্গে তো দেখা হবে, তা' হলেই হলো।'

'ইস, আমার সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হতে পারে, আমি মার কথার জবাবও দিই না।'

'কিন্তু আমার কথার তো—বলিয়াই রজত রায় থামিলেন।

তিনি দেখিতে পাইলেন, সুজাতা তাঁহার ঘরের দিকে আসিতেছে। দ্বারের নিকটে আসিয়া সুজাতা ডাকিল, 'কল্যাণী, একটা কথা শুনে যা।'

মাথায় আঁচলখানা তুলিয়া দিয়া কল্যাণী বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কথা দিদি?'

'ভাই, আমি বিনোদ ঠাকুরপোর বাড়ী চললুম; সইয়ের ছেলেটি শুনলুম এই একটু আগে মারা গেছে! কি যে করছে সই, দেখি গে যাই; বিকেলের কাজ তুই দেখে শুনে করিস, কোন গোল হয় না যেন!'

'দিদি, তুমি যদি মাকে না বলে যাও, তবেই গোল হবে, তিনি জানতে পারলে রেগে যাবেন; তাঁকে বলেই কেন যাও না?'

'হাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার যে ভাব, বললে কি আর যেতে পারবো? যাই কল্যাণী, আমার বাড়ী ফিরতে একটু রাত হতেও পারে।' বলিয়া সুজাতা নীচে নামিয়া গেল।

ঘরে আসিয়া কল্যাণী স্বামীকে অনুযোগ করিল, 'দিদি তো চলে গেল, তুমি একটি বার মানাও করলে না—তারপরে?

রজত উঠিয়া বলিলেন, 'তারপর আর কি, আমিও চললুম, রবি রইল, আজকের গোল সেই মেটাবে।'

'ঠাকুরপো বুঝি ওসব পারে? সে তো এই সবে কলকাতা থেকে এসেছে।'

'তবে তুমিই আমার হয়ে আজকের গোলটা মিটিয়ে দিও।' বলিয়া রজত রায় প্রস্থান করিলেন।

কাছারীর পাশেই পথ; গ্রীষ্মকাল, রোদে চারিদিক যেন জ্বলিয়া যাইতেছে। কর্ম্মে ব্যস্ত রতন রায় মুখ তুলিতেই দেখিলেন, সুজাতা সেই রৌদ্রতপ্ত পথ দিয়া ঝি'র সঙ্গে কোথায় যাইতেছে; রতন রায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, সে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইলে তিনি কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

বিনোদ রায় [illegible] রায়ের খুল্লতাত ভ্রাতা; বিষয় সংক্রান্ত বিবাদের ফলে ইঁহারা দূরে দূরে বাড়ী করিয়া বেশ তফাত হইয়াই ছিলেন, কিন্তু বধূরা সেরূপ থাকিতে চাহিল না। সুজাতা ও লীলা এক গ্রামের মেয়ে, ছেলে বেলায় সই পাতাইয়াছিল। বাজিতপুরের দুই জমিদারের সহিত এই সখী দুইটির পরিণয় হওয়াতে আবার গোল বাধিল। তাহাদের সখিত্বের সঙ্গে ইঁহাদের বিরক্তিও যে বাড়িতেছে, বুঝিয়াও তাহারা নিবৃত্ত হইল না। লীলাকে দেখিয়া চৌধুরাণী মুখ ফিরাইলেও সে আবার আসে—সুজাতারও যখন তখন তাহার কাছে যাওয়া চাই। চৌধুরাণী সহজে বধূর সহিত বিবাদ করেন নাই—অশেষ প্রকারে জমিদার বাড়ীর নিয়ম কানুন এই ছোট লোকের মেয়েটাকে শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সুজাতা এসব কথা একেবারেই শোনে না। জ্ঞাতি যে কত বড় শত্রু, বিশেষ বিনোদ রায়রা, যে তাঁহাদের অনিষ্ট ভিন্ন আর কিছুই করে না—বহু উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিলেও সে তাহা বোঝে না; চৌধুরী বাড়ীর বধূদের যে পায়ে-হাঁটিয়া কোথাও যাইতে নাই—বিবাহের পরে তাহারা যেমন চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া মহা সমারোহে প্রাসাদে প্রবেশ করে, মৃত্যুর পরেও তেমনি সমারোহে চারি বেহারার স্কন্ধে চাপিয়া প্রাসাদের বাহিরে যায়, এই সনাতন নিয়ম সুজাতা মানিতে চাহে না। বিনোদ রায়ের জমিদারী ইঁহাদের চেয়ে তো কম নয়, সুজাতা সেখানে গেলে ইনি কেন রাগ করেন, লীলা আসিলে তাহার শাশুড়ী কিছুই তো বলেন না, এইসব প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তোলে।

বিনোদ রায়ের প্রাসাদের নিকটে গিয়া সুজাতা থমকিয়া দাঁড়াইল; সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটা আজ একেবারে নিঝুম, এইমাত্র সেখান হইতে যে চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছে, বাড়ীটাও যেন সেই রাজা রায়ের শোকে ম্লান গম্ভীর হইয়া রহিয়াছে! অন্দরে প্রবেশ করিয়া সুজাতা পরিচারিকাকে কহিল, 'ঝি, তুই বাড়ী চলে যা; আমার যেতে অনেক দেরী হ'বে, ততক্ষণ বসে থেকে তুই কি করবি?'

লীলার ঘরের সম্মুখে কয়েক জন স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, সুজাতাকে দেখিয়া তাহারা সরিয়া গেল। সেই সুবৃহৎ কক্ষে, শ্বেত পাথরের মেজের উপরে শোকার্ত্তা অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা লীলা শ্বেত কমলের মত পড়িয়াছিল, ত্বরিত পদে সুজাতা নিকটে গিয়া ডাকিল 'সই!'

লীলা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'এসেছিস সই, বোস্!'

বলিয়া সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ভাই, মন যে জ্বলে পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে, কি করি বল্!'

সুজাতা কি বলিবে, পুত্রশোকের যাতনা সে ভাল রূপেই জানে; ইহার সান্ত্বনা সে খুঁজিয়া পাইল না। একটি দৃশ্য তখন তাহার মনেও ফুটিয়া উঠিল, মণি রায় যখন পরলোকের পথে যাত্রা করিয়াছিল—তাহার কত আরাধনার ধন সে! লীলার তবু একটু চেতনা আছে, সুজাতার সেদিন তাহাও ছিল না!

অসহ্য যাতনায় লীলা কখনও শরাহতা হরিণীর মত মেজেয় লুটাইয়া পড়িতেছে, কখনও বা উঠিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে, 'মণি আর রাজু এইবারে সত্যিকারের ভাই হয়ে স্বর্গে গিয়ে রইল দিদি, সেখানে তো হিংসে দ্বেষ নেই—এতটুকু জমির জন্যে ভাই সেখানে ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ করে না!'

লীলার হাতখানি ধরিয়া সুজাতা নীরবে চোখের জল ফেলিতে লাগিল; কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া লীলা আবার করুণ স্বরে কহিল, 'রাজু ভাত খেতে চেয়েছিল সই, বললে, আমায় দু'টি ভাত দাও না মা, খেতে পেলেই আমি ভাল হ'ব। ডাক্তাররা তাও দিতে দিলে না। আহা সই, সে যখন বাঁচবেই না—যা খেতে চাইলে দিলেই হতো; রাজুকে আমার না খাইয়ে মেরে ফেললে, ওরা কি নিষ্ঠুর ভাই! একে রোগের যাতনা, তার ওপরে খিদের জ্বালা, বাছা আমার কত কষ্ট পেয়েই চলে গেল! সে কি আর ভাত খেতে পাবে না দিদি? আমি যদি জানতে পারি, সে আমার ভালো আছে, ভাত খেয়ে প্রাণটা তার ঠাণ্ডা হয়েছে, তা হ'লেও বুকটা জুড়োয়!'

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুজাতা একভাবে বসিয়া এই সদ্য পুত্রশোকাতুরার শোকের কাহিনী শুনিতেছে, আর কিছুই তাহার মনে নাই। লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে নিঝুম হইয়া পড়িয়াছিল, সহসা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'ওই শোন্, সে বলছে, মাগো, আমায় তুমি দু'টি ভাত খেতেও দিলে না! শুনতে পাচ্ছিস সই? রাজু, এখানেই রয়েছে—আর কোথাও যায়নি; আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না!'

পরিচারিকা দ্বারের নিকট হইতে ডাকিল, 'বাড়ী চল গো বউমা, রাত হয়ে গেছে যে!' শুনিয়া সুজাতার হুঁস হইল; সখীর অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি সযত্নে মুছাইয়া দিয়া সে কাতর কণ্ঠে কহিল, 'সই, এইবারে যাই, রাত হয়ে গেছে!'

'যাবি?' বলিয়া মুহ্যমানা লীলা ফিরিয়া চাহিল; সুজাতা শুষ্ক মুখে বলিল, 'হাঁা ভাই, এখন যেতে হবে! নইলে রক্ষে থাকবে না আমার—জানিস তো সব।'

সজল নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া লীলা তখন কি ভাবিতেছিল, তাহার কথা শুনিতেও পাইল না। ভাবিতে ভাবিতে লীলা সহসা উঠিয়া বসিল, সুজাতার হাত দুইটি ধরিয়া সে মিনতি করিয়া কহিল, 'আজ তোকে একটা কথা বলব, শুনবি সই?'

'কি কথা ভাই?' সুজাতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল।

'সই, ছেলে বেলায় পুতুল হারিয়ে আমি যখন কাঁদতুম, তুই কেমন সেই পুতুলটি এনে দিয়ে আমায় শান্ত করতিস! আজ কি আর তা পারবি না? রাজু এইখানেই কোথা লুকিয়ে রয়েছে—যা তো ভাই, তাকেও খুঁজে নিয়ে আয়!'

লীলার কথা শুনিয়া সুজাতা কাঁদিয়া ফেলিল, তার সেই হাস্যময়ী সখী আজ শোকে আত্মহারা! কি করুণ, মিনতি ভরা তার সজল চোখ দুইটীর দৃষ্টি, কত আশায় সে তাহার পানে চাহিয়া আছে—বেদনায় অমন মুখখানিও একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে! সম দুঃখিনীর মত সেই অতি মলিন মুখের পানে চাহিয়া সুজাতা সনিঃশ্বাসে বলিল, 'তা যদি পারতুম! রাজু তো তোর পুতুল নয় দিদি, যে খুঁজে এনে দেব, সে যে ভগবানের জিনিস; বড় দুঃখে একদিন তা'কে পেয়েছিলি, বড় দুঃখেই আজকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছিস! যাঁর জিনিস তিনিই নিয়েছেন বলে, মনকে বুঝিয়ে শান্ত কর্ সই!'

ঘড়িতে ন'টা বাজিয়া গেল; সুজাতার ইচ্ছা হইতেছিল, আজ লীলার কাছেই থাকে; কাল সকালে ইহাকে একটু জল খাওয়াইয়া তবে বাড়ী যায়; কিন্তু বাড়ীতে বলিয়া আসে নাই, এখানে সারা রাত থাকিলে যদি আবার গোল হয় ভাবিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে উঠিয়া পড়িল।

৪

চৌধুরাণী নীচে বসিয়া রবি রায়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন, বাড়ী আসিয়াই সুজাতা তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া গেল; সুজাতাকে বাহির হইতে আসিতে দেখিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল, কিন্তু তাহাকে কিছু না বলিয়া ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত রাত্তিরে কোথায় গেছলি ঝি?'

'বউমাকে নিয়ে এলাম মা!' ঝির কথা শুনিয়া চৌধুরাণী বলিয়া উঠিলেন, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি; কোত্থেকে নিয়ে এলি, শুনি?'

ঝি ভয়ে ভয়ে বলিল, 'সইমার ছেলেটি আজ মারা গেছে কিনা, তাই বউমা—'

'ও, সেখানে যাওয়া হয়েছিল! তা ওকে চান ক'রে যেতে বল্, মড়া ছুঁয়ে ঘর দোর যেন একাকার করে না!

সুজাতা উপরে যাইতেছিল, সিঁড়ি হইতে বলিল 'সে সব তো আমি ছুঁই নি; তা ঝি, ওপরে একঘড়া জল দিয়ে যা, কাপড়খানা ছেড়ে ফেলি।'

চৌধুরাণী স্থির করিয়াছিলেন, সুজাতার সহিত কথা কহিবেন না; গোল হয় যখন, কাজ কি! তাই পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'কথার ছিরি দেখলি রবি? পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে এসে, এখন—ঝি, ওপরে এক ঘড়া জল দিয়ে যা! নীচে থেকে নেয়ে গেলে কি হয়, জিজ্ঞেস কর্ তো ওকে!'

রবি হাসিয়া বলিল, 'আমায় আবার কেন মা, তোমার বউ, তুমিই জিজ্ঞেস কর!'

চৌধুরাণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'বউ কা'কে বলচিস রবি, উনি যে এখন গিন্নি হয়ে উঠেছেন। যেখানে খুশী যান, যা খুসী তাই করেন, মুখের পানে তাকিয়ে কথা কয় কার সাধ্যি। আমিতো দাসী বাঁদীর মত একটি পাশে পড়ে আছি আর এই সব আদিখ্যেতা দেখছি!'

অন্য দিন হইলে সুজাতা সহিয়া যাইত, এসব কথা সে কত শুনিয়াছে; আজ তার মনটা বড়ই খারাপ ছিল, তাই ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'মাকে চুপ করতে বল তো ঠাকুরপো, রোজ রোজ আর এসব কথা শুনতে পারা যায় না; তুমি তো বেশ বসে বসে মজা দেখছ! কিসের জন্যে এত কথা শুনতে যাব আমি? কিছু চুরিও করি নি, কারু বাড়া ভাতে ছাইও দিই নি, কেন উনি দিন রাত আমায় অমন কোরে বলবেন?'

রবি রায় সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, 'মা, চুপ কর তো তুমি; এ সব বলে কি সুখ পাও? কলকাতা থেকে এসে আমি একটি দিনও সোয়াস্তিতে থাকতে পেলাম না, অমন কর তো কালই কলকাতা চলে যাব।'

সুজাতার পানে জলন্ত নয়নে চাহিয়া চৌধুরাণী বলিলেন, 'তুই থাম তো রবি, উনি চোপা করবেন আর আমি চুপ ক'রে থাকব, সেটি হতে পারবে না। এ কথা তো কেউ বলে নি যে তুমি কারু কিছু চুরি করেছ কি বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছ; কিন্তু তার চেয়েও বেশী করেছ মা তুমি। এ বাড়ীতে পা দিয়েই তো আমার হাতের নোয়া খসিয়েছ, তাও সয়েছিলুম; অমন সোণার চাঁদ মণি, যাই ষোল বছরে পড়লো, তুমি শনির দৃষ্টি দিয়ে তাকেও ছাই করেছ! জাতি শত্তুরের বাড়ী যেতে তোমায় দু'শো বার মানা করেছি আমি, তুমি তাও শোন নাই; তাদের ওপরে দরদ তোমার কত একেবারে! অমন ঘরজ্বালানী পরভালানী বউ দিয়ে কিচ্ছু দরকার নেই আমার!'

'আমারো দরকার নেই মা এখানে থাকবার,—যে সুখে রয়েছি! মা পেটে ঠাঁই দিয়েছে যদি তবে বাড়ীতেও ঠাঁই দিতে পারবে; আমি কালই এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি!'

'তাই যাও!' চৌধুরাণী স্বর সপ্তমে তুলিয়া বলিলেন, 'মাগো, নির্ব্বিষ সাপের কুলোপানা চক্কর দেখ! বাপের বাড়ীর যা দশা, সবাই তা জানে; সাত জন্মে যারা একটি বার ডেকে জিজ্ঞেস করে না, যাবেন তো সেই মা ভাজের বাঁদীগিরি করতে, তাও কেমন তেজ ক'রে জানানো হচ্ছে!'

দুঃখে, অপমানে সুজাতার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল; আঁচলে তাহা মুছিয়া সে কম্পিত কণ্ঠে কহিল, 'যাবই তো, এখানে যে অপমান, এত অন্যায় সহ্য করেছি, আজ তার শোধ দিয়ে যাব! এমন কথা শুনিয়ে দিয়ে যাব, যা মনে থাকবে—অকারণ আর কাউকে অপমান করতে কেউ সাহস করবে না!'

রবি রায় বলিয়া উঠিল, 'সে হচ্ছে না বউদি! রাগ হয়ে থাকে, তোমার যা খুসী আমাকে বল, আমি সহ্য করব; কিন্তু মাকে আমার কেউ কিছু বলতে পারবে না!'

চৌধুরাণী বলিলেন, 'কেন রবি মানা করছিস? মনে মনে তো দিবে রাত্রি আমার মুণ্ডপাত করছেই, মুখেও করুক না! শোন বউমা, এর পরে তোমাতে আমাতে আর এক জায়গায় থাকা চলে না; এক জনকে যেতেই হবে, সে তুমিই যাও কি আমিই যাই! যে মুখে তুমি আমায় অপমান করতে চেয়েছ, যদি মানুষের পেটে জন্মে থাক, তবে তাতে আর আমার অন্ন তুলে দিও না; এখানে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া চলবে না!'

রবি রায় ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'চুপ কর না মা, রাগলে তোমার একেবারেই জ্ঞান থাকে না; কি যে বল তার ঠিক নেই!'

চৌধুরাণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, 'না রে, এ শুধু রাগ নয়, কত দুঃখে যে এসব কথা মুখ দিয়ে বেরোয়, তা তুই বুঝবি নি! কর্ত্তা ঘটা ক'রে বেটার বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে এলেন; আমার কত সাধের রতন—হীরে মতির গয়না দিয়ে গা সাজিয়ে কত আনন্দে আমি তার বউ বরণ করে ঘরে তুলেছি; সে আজ এই মূর্ত্তি ধরেছে! আচ্ছা রতন আসুক, সে পরের বিচার ক'রে বেড়ায়, ঘরের বিচার করতে পারে না? একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যাক আজ; তুই তো কলকাতায় যাবি, আমাকেও নিয়ে চল, কাশীতে রেখে আসবি। এত হেনস্তা সয়ে থাকতে পারব না আমি!'

সুজাতা আর সেখানে দাঁড়াইল না; উপরে গিয়া দেখিল ঝি জল আনিয়া রাখিয়াছে, কোনও রূপে কাপড় কাচিয়া ঘরে গিয়াই, বিছানায় পড়িয়া সে অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল আজ সব শেষ! শাশুড়ীর বড় সাধ, রতন রায়ের আবার বিবাহ দিয়া মনের মত বউ আনেন। সুজাতা চলিয়া গেলে নিশ্চয়ই তিনি বিবাহ করিবেন, কেনই বা করিবেন না? সুজাতাও চিরদিনের মত মার কাছে থাকিতে যাইবে; মা তাহা বিশ্বাস করিবেন না, ভাবিবেন রাগ করিয়া আসিয়াছে, রাগ পড়িলেই আবার স্বামীর কাছে যাইবে; কিন্তু সে যখন আর যাইবে না, তখন—

রবি রায় বাহির হইতে বলিল' 'বউদি, ঘরে যাব?'

'এস ভাই!' বলিয়া সুজাতা চোখ মুখ মুছিয়া ফেলিল; তাহার রোদনারক্ত মুখের পানে চাহিয়া রবি রায় বলিল, 'বৌদি, তুমিও কাঁদছ! ওদিকে মা তো কাশী যাবেন ব'লে বায়না ধরেছেন; কোথাও যাবার বেলা মাকে ব'লে গেলেই তো পার, তাঁকে একটু মেনে চললে দোষ নেই তো কিছু!'

'তুমিও তাই বলছ? তোমরা এমনি একচোখোই বটে!' সুজাতা উঠিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না; কালই তো চলে যাব, আজকের রাতটা আমায় চুপ চাপ পড়ে থাকতে দাও!'

'তুমি আবার কোথা যাবে, বৌদি?'

'সে খবরে তোমার কি দরকার ভাই? তুমি আর আমার কথায় থাকতে এস না!'

'ছি বৌদি, সবাই অবুঝ হ'লে চলে কি? মার মনে কষ্ট দেওয়া আমাদের কারুই উচিত নয়; তিনি যা বলেন, তা মেনে নিলে আর কোনো গোল থাকে না।'

'সে আমি পারলুম না তো ভাই! তা সব গোল চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; আদেশ উপদেশ অনেক শুনেছি, আর শুনতে পারি না! আচ্ছা, সইয়ের ছেলেটি মারা গেছে ব'লে তা'কে দেখতে গেছি, এই ত? তুমিও তা'তে দোষ ধরলে ঠাকুরপো, তোমাদের এই বিচার!'

সুজাতা আবার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল দেখিয়া রবি রায় বুঝিল, তাহার দ্বারা মিটমাট হওয়া অসম্ভব; 'যাই তবে বৌদি!' বলিয়া সে বাহিরে গেল ও দাদাকে ডাকিয়া আনিতে কাছারীতে লোক পাঠাইয়া দিল।

রতন রায় সেই লোকের সহিত বাড়ী আসিলেন; রবি রায়কে বারান্দায় পায়চারি করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমায় ডেকেছিস নাকি রবি?'

'হ্যাঁ দাদা, মা আর বৌদির যে কি কাণ্ড! দেখতে যদি, অবাক হয়ে যেতে। আমার কথা তো কেউ শোনেন না, তাই তোমাকে ডাকতে হলো' বলিয়া রবি রায় ঘরের ভিতরে গেল।

৫

'মা ঘুমুচ্ছেন নাকি, ঝি ?'

চৌধুরাণী চোখ বুজিয়া শুইয়াছিলেন, পরিচারিকা তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল ; পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা বলিলেন, 'না বাবা, ঘুমুই নি ; ঘুম তো আসচে না, অমনি শুয়ে পড়ে আছি। ঝি, রতনকে বসতে দে।'

ঝি একখানা চৌকী আনিয়া নিকটে রাখিল, রতন রায় বসিয়া বলিলেন, 'আজ আবার কি হয়েছে মা ?'

'কি হ'বে বাবা—ঝি, তুই এখান থেকে যা তো ; হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে কথা গিলছে, বেরো বলছি ! কিছু হয় নি রতন, বউ মা এই একটু আগে সইয়ের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এল ; কোথাও যাবার বেলা আমাকে বলেও না, যা খুসী তাই করে ; তাই বলেছি ব'লে আমায় কত শাসালে—বলে, বাপের বাড়ী চলে যাব, এখানে আর থাকব না। তা, ও কেন বাবা যাবে, আমায় তুই কাশী পাঠিয়ে দে, আমি চলে যাই ; অত অসৈরণ সইতেও পারব না, এ বউ নিয়ে ঘর করা আমার পোষাবে না !' বলিয়া চৌধুরাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রতন রায় বলিলেন, 'মা ওঠো, জল টল খেয়ে সুস্থ হও ; সামান্ত ব্যাপার নিয়ে কাঁদতে আছে কি ? ছি, তুমি বড় অবুঝ হয়েছ।'

চৌধুরাণী চোখের জল মুছিয়া কহিলেন, 'না রতন এ সামান্ত ব্যাপার নয় ; রোজ রোজ অশান্তির চেয়ে তফাত হয়ে থাকাই ভালো ; তুই আমায় কথা দে, কালই কাশী পাঠিয়ে দিবি ; তবেই জল গ্রহণ করবো, নইলে আর নয় !'

'মা কাশী যাবে বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করতে, সে তো খুব ভালো কথা ; কাছারীর কাজ একটু কমলেই আমি তোমায় কাশী নিয়ে যাব। সত্যি, একটা বাড়ীতে বন্ধ হয়ে থাকলে মানুষের মন শান্তি পেতে পারে না, মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসা ভালো। মহালের নায়েবরা নিকেশ দিয়ে যাক, তার পরে তোমাতে আমাতে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু মা আমরা তোমার সন্তান, আমাদের দোষ ঘাট তোমার কতই সইতে হয়েছে ; আজ কেন এমন অসহ্য হয়ে উঠলো যে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে চাইছ ? শুনেছি, বউকে সবাই মেয়ের মত মনে করে ; তা করাই যে উচিত, ওদের তো এখানে আপনার লোক কেউ নেই। বউকে যদি আপনার ক'রে নিতে না পার, তবে সে চিরকাল পর হয়েই থাকবে—আমাদের। ভালো দেখলে দুঃখ করবে, মন্দ হ'লে খুসী হবে ; পর নিয়ে ঘর করবার মত বিপদ আর নেই ! মা, ওকে কি তুমি আপন ক'রে নিতে পারবে না ? ওর জন্তে সংসার ছেড়ে চলে যাবে—তবুও না !'

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া চৌধুরাণী বলিলেন, 'বাবা, সে আর হয় না ! ও বউ যে অপয়া, এসেই আমার হাতের নো খসিয়েছে ! সীঁথের সিঁদুরটুকু মুছে ফেলে এই বেশ ধরেছি, যার চেয়ে হীন বেশ মেয়েদের আর নেই ! তোর অমন সোণা ছেলে মণি, একটা পাশ দিয়েছিল, সেও ওর নজর লেগে ছাই হয়ে গেল ! তারপর থেকে ওকে আমার একটুও ভাল লাগে না, বউমাও আমার দেখলেই জলে যায় ; এমন কোরে এক জায়গায় থাকা চলে কখনো ? আমায় কাশীধামে নিয়ে চল রতন, আমি সেখানেই বেশ থাকবো।'

'তাই চল ! যা হবে না, তার চেষ্টা না ক'রে চল মা, আমরা কাশীবাস করি গে। তোমার সেবা আমার প্রধান কাজ ; প্রজাদের উপকার কি জমিদারী রক্ষে করা, এসব তার পরে। তবে যা বললে, সে জন্তে বউকে দোষী করা যায় না। শাস্ত্রে বলে, যার যখন মৃত্যু হ'বার সে হবেই, কেউ খণ্ডাতে পারবে না। বাবা ওকে কত ভালবাসতেন, তিনিই দেখে শুনে বাড়ীর বড় বউ এনেছিলেন ; তিনি মারা গেলেন, ওরও আদর যত্ন ফুরলো ! মণি থাকলে পরে ওকেই মা ব'লে ডাকতো। পুত্র শোক যে কি, তা'তো মা তুমি জান—সে শোক যে পেয়েছে, তা'কে সান্ত্বনা না দিয়ে নির্য্যাতন করা কি মানুষের কাজ ?'

চৌধুরাণী নিরুত্তর ; রতন রায় আবার বলিলেন, 'বল মা শুনে যাই—মণির মৃত্যুর জন্ত বউকে দোষী করা যায় কিনা, সে তুমিই বিচার ক'রে দেখ। তবে বউ যে তোমাকে মানে না ; সে কথা অবশ্য বলবে ; তারও কারণ, সে তোমাকে শ্রদ্ধা

করতে পারে না। তুমি যদি ন্যায় বিচার করতে মা, সবাই তোমায় মান্য করতো; শ্রদ্ধা ভক্তি মনের জিনিষ, সে কথনো বলে কয়ে হয় না, ও জিনিষটি না পেলে সংসারে থাকাও চলে না; দিনরাত কলহ করা কি ছোট মুখে বড় কথা শোনার চেয়ে সংসার ত্যাগ করা ঢের ভালো; তাই হবে—আমায় সাতটি দিন সময় দাও মা, রজতকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাই। মণি মারা গেছে আমারই কর্ম্মদোষে—আমার কোষ্ঠীতে পঞ্চমে পাপগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি থাকাতে এমন সন্তানহানি যোগ হয়েছে, যে সন্তান হবে না, হ'লেও বাঁচবে না। আমারও ইচ্ছে, তীর্থস্থানে গিয়ে জপতপ ক'রে ও-পাপ খণ্ডাই।'

চৌধুরাণী আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে না না, তোকে আমি কাশীবাসী হ'তে দেব না—ওমা সেকি হয়! শোন্ রতন, আমি বলছি, আজ হ'তে সুজাতা আমার মেয়ে, আমি তার মা—বাড়ীতে আর কোনো গোল হবে না; তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে তোর কাজ কর্ম্ম কর্, কাশীর কথা আর মুখেও আনিস্ নে!'

আনন্দে রতন রায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্রফুল্ল নয়নে মার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, 'আমায় আজ কত সুখী করলে তুমি মা! আমাদের অবহেলায় মনে কত কষ্ট পেয়েছ, কত অশান্তি ভোগ করছ, তবুও আমাদের এতটুকু অমঙ্গল হ'তে দিতে চাও না! এমন কি আর কেউ করতে পারে? জগতে এসেই মা, তোমায় পেয়েছি; রোগে সেবা করে, শোকে সান্ত্বনা দিয়ে, আপদ বিপদে তুমি আমায় কত সাহায্য করেছ; আজ তোমায় ছেড়ে দিয়ে কি নিয়ে মা থাকবো? সে আমায় কি সুখ দেবে, তোমায় যে অবহেলা করে?'

চৌধুরাণী তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, 'ষাট ষাট, অমন কোরে বলতে নেই; তুই যে রতন, আমার অমূল্য ধন—আমি প্রাতর্ব্বাক্যে তোকে কত আশীর্ব্বাদ করি!'

'তবে এই আশীর্ব্বাদ করো, যেন তোমাকে না হারাই! ভগবান আমায় সন্তানহারা করেছেন, তিনি সবই করতে পারেন; কিন্তু মানুষ কথনো মা, আমায় মা-হারা করতে পারবে না! তুমি যেখানে, আমিও সেইখানে থাকবো। চল মা, আমরা কাশীধামে যাই; শুনেছি, শোকার্ত্ত মন সেখানে গেলে শান্তি পায়; বিশ্বনাথের চরণ দর্শন ক'রে শান্তি নিয়ে আসিগে চল!'

মাতা পুত্রে এমন নিবিষ্ট মনে কথা কহিতেছিলেন, রবি রায় কথন যে ঘরে আসিয়াছে, জানিতে পারেন নাই; তাহাকে দেখিয়া তাঁহারা আত্মস্থ হইলেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া কল্যাণীও অবাক হইয়া দেখিতেছিল, বৃদ্ধা মাতার কোলের কাছে বসিয়া আছে পৌঢ় পুত্র; মাতা কাশী যাইবে শুনিয়া সেও সঙ্গে যাইতে চাহিতেছে—শিশু যেমন কিছুতেই মা ছাড়িয়া থাকিতে চায় না, সেও তেমনি একান্তভাবে মাতাকে ধরিয়া আছে, শিশুর মতই সরল তাহার মুখের ভাব! কল্যাণী ভাবিয়াছিল আড়াল হইতেই ইঁহাদের কথা শুনিয়াই চলিয়া যাইবে, কিন্তু ইহা দেখিয়া যেন আর নড়িতেও পারিতেছিল না; রবি রায় তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলে পরে সে লজ্জিতা হইয়া সরিয়া গেল।

সুজাতা তথনও তেমনি পড়িয়াছিল; কল্যাণী ছুটিয়া ঘরে গিয়া ডাকিল, 'ঘুমুচ্ছ নাকি, দিদি?'

সুজাতা একটু নড়িয়া উঠিল, উত্তর দিল না দেখিয়া কল্যাণী রাগিয়া গেল; সে তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, 'দিদি, বড়ঠাকুর মাকে নিয়ে কাশী যাবেন, এখানে আর থাকবেন না; তথন কত বললুম, মাকে বলে যাও, তা তুমি শুনলে না! এখন রাগ রঙ্গ রাখ তো, বড় ঠাকুরকে বলে কয়ে গোল মিটিয়ে ফেল: ওই যে তিনি আসছেন; দিদি ওঠ, এসময়ে মান অভিমান ক'রে সব নষ্ট করো না!'

রতন রায়ের পদ শব্দ শুনিয়া কল্যাণী বাহির হইয়া গেল; তিনি ঘরে আসিয়া দেখিলেন সুজাতা শুইয়া আছে। 'অসময়ে শুয়ে আছ কেন?' বলিয়া খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। সুজাতা তথন উঠিয়া বসিল; তাহার অশ্রুমাখা মুখের পানে চাহিয়া রতন রায় বলিলেন, 'তুমিও কাঁদছ! এই কান্না আর কলহ, কি করলে বন্ধ হয়, তা আমায় বলতে পার, সুজাতা?'

একটা কথা সুজাতার খুবই মনে আসিতেছিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না, কল্যাণীর কথা শুনিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে নীরবে কাঁদিতে দেখিয়া রতন রায়

একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'কান্না এখন থামাও, স্থির হয়ে আমার কথার জবাব দাও তো! তুমি নাকি বাপের বাড়ী গিয়ে থাকবে ঠিক করেছ? তার কি দরকার, আমরা সাত দিন পরেই চলে যাব, তখন তুমি এখানেই বেশ স্বাধীন ভাবে থাকতে পারবে!'

স্বামীর অভিমানভরা কথাগুলি সুজাতার মর্ম্ম বিদ্ধ করিল, সে মুখ তুলিয়া কাতর নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার নীরব ভাষা রতন রায় বুঝিতে চাহিলেন না, তিনি কঠিন স্বরে কহিলেন, 'কি বলতে চাও, স্পষ্ট ক'রে বল, চুপ ক'রে থেকো না! আমায় বুঝিয়ে দাও, মাকে না ব'লে আমি কিছু করি না, তুমি কি ক'রে সে সাহস কর? অন্যায় ক'রে মাপ চেয়ে নিতেও জান না; পুত্র শোক সইতে পেরেছ, কিন্তু মা কিছু বললে তা অসহ্য হয়ে ওঠে! তুমি কেন ভুলে যাও, মার সেবা করা তোমারই কাজ, তুমি বড় বউ; সেতো করই না, খেয়ালের জন্যে মাকে কষ্ট দিয়ে বাপের বাড়ী যেতে চাও! এসব কি সুজাতা? বিয়ের পরে যে মেয়েদের বাপের বাড়ীতে থাকতে হয়, তাদের কথা ভাব দেখি, তা'হলে ওকথা আর মনেও আনতে পারবে না! এমনি কোরে আমাদের বাড়ী-ছাড়া করবে, না রয়ে সয়ে সবাইকে নিয়ে থাকতে পারবে—আমি এই কথাটাই শুনতে চাই!'

সুজাতা নতমুখে ভাবিতেছিল, কি বলিবে—রতন রায়কে সে চিনিত; এই অর্দ্ধ উদাসীন লোকটি যদি সত্যই সংসার ছাড়িয়া যায়, তবে মা বাপ, এমন কি সইও তার মুখ আর দেখিবে না! রতন রায় উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার চিন্তায় আর বাধা দিলেন না।

বহুক্ষণ পরে শিশির সিক্ত শুভ্র শতদলের মত অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া সুজাতা বলিল, 'ওগো, কেন আমায় ওসব কথা বলে ব্যথা দিচ্ছ? তুমি তো আমায় জান; আমি যে কত কষ্ট পেয়েছি, কত অপমান সয়ে তবে এখান থেকে যেতে চেয়েছি তাকি তুমিও বুঝবে না? বেশ, আজ থেকে আমার সব যাক—মনের সুখ সাধ, ন্যায় অন্যায়, বিচার বিবেচনা সব দূরে সরে যাক, শুধু তুমি থাকো! তোমার সুখই আমার একমাত্র কামনা হোক—তারি জন্যে আমি সব করবো; তোমার মাকে মা, ভাইদের ভাই বলেও মনে করবো, কিন্তু তোমায় ছাড়তে পারবো না!'

'তবে যাও!' বিছানায় বসিয়া পড়িয়া রতন রায় ক্লান্ত স্বরে কহিলেন, 'মার এখনো খাওয়া হয় নি সুজাতা, তাঁকে জল খেতে দাও গে; তিনি আজ মনে বড় কষ্ট পেয়েছেন, মিষ্ট ব্যবহারে তাঁকে শান্ত ক'রে এসে আমাদের খাবার দিতে বল; আমি একটু জিরিয়ে নি।'

ধীরে ধীরে সুজাতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীমতী হেমবালা বসু

কালবৈশাখী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

ওগো কাল ওগো ভয়ঙ্কর
তোমার বৈশাখী নৃত্যে পৃথ্বীব্যোম্ কাঁপে থর থর
হুহুঙ্কারে গর্জ্জি' উঠে প্রভঞ্জন প্রলয়ের বেশে .
উন্মাদ প্রলয়লীলা ভীমরোলে অট্টহাসি হেসে
বজ্রনাদে কাঁপায় অম্বর ;
হে কাল বৈশাখী মূর্ত্তি রুদ্ররূপী ভীষণ সুন্দর !
কৃষ্ণমেঘ রুক্ষ জটাজাল,
অনল বিদ্যুৎশিখা শিবনেত্রে চমকে ভয়াল !
শঙ্কাকুল বিশ্বভূমি আর্ত্তরবে করে হাহাকার,
পবন শ্বসিছে ফিরি উচ্চারিয়া সংহার, সংহার,—
শান্ত হও ওগো মহাকাল,
বৈশাখের ঝঞ্ঝাবাতে একি খেলা খেল চিরকাল !
সশঙ্কিতে অচল মৈনাক
মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত গর্জ্জে তব হে ইন্দ্র বৈশাখ
দধিচীর অস্থিপুঞ্জ কভু কিগো হবেনা শীতল
বর্ষে বর্ষে উদগারিবে ধরাতলে প্রলয় অনল
ঝঞ্ঝাবাহু করিয়া বিস্তার ;
কাঁদিছে নিখিল চিত্ত ব্যর্থতার তুলি হাহাকার।

বহে উষ্ণ প্রলয়ের বায়ু,
প্রচণ্ড নিঃশ্বাস তব হরিবারে জীর্ণতার আয়ু ;
উন্মত্ত সমুদ্র হ'তে ঊর্ম্মিমালা ধরাবক্ষে ধায়
বিশ্ব করে টলমল সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়,
ভয়ত্রস্ত কাঁপে চরাচর,
থামাও বিপ্লব মূর্ত্তি ক্ষান্ত হও ওগো ভয়ঙ্কর।
বাজে তব প্রলয় বিষাণ
দিগন্ত ভরিয়া ক্রুদ্ধ প্রতিধ্বনি ধরে তার তান ;
ফেনিল তরঙ্গ তুলি নদনদী উঠিছে ফুলিয়া
ভীষণ আক্রোশে চাহে ধরিত্রীরে ফেলিতে গ্রাসিয়া,
শান্ত হও মরণ ঈশ্বর,
হে কাল বৈশাখী মূর্ত্তি রুদ্ররূপী ভীষণ সুন্দর !
কাঁপে দ্রুত বক্ষের স্পন্দন
মর্ম্মভেদী হাহাকারে বনানীর উঠিছে ক্রন্দন
সৃজনের বক্ষ 'পরে হে নিষ্ঠুর নির্ম্মম দেবতা
অভয় প্রার্থনা শুনি বুকে তব বাজেনা কি ব্যথা ?
কঠোর কি রবে চিরকাল,
হে ভৈরব ! হে পাষাণ ! রুদ্ররূপী ওগো মহাকাল !

দারা ও সুজার শেষ জীবন

অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু এম-এ

সামুগড় যুদ্ধ অবসানে ভাগ্যহীন বিজিত সাহাজাদা দারা পিতা সাহজাহানের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও আগ্রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া নিজের পরিবারবর্গ ও অনুচরগণের সহিত নানা ঘটনার মধ্য দিয়া দিল্লী পৌছিলেন (৫ জুন, ১৬৫৮ খৃঃ)। সরকারি সম্পত্তি হস্তগত করিয়া এখন তিনি নূতন সৈন্যসংগ্রহে মন দিলেন। ওদিকে, আগ্রা দুর্গ আওরংজীবের করতলগত হইল। এই সংবাদে ভীত হইয়া দারা দিল্লী হইতে লাহোর রওনা হইলেন। পাঞ্জাবের সমস্ত অধিবাসী দারার অনুগত ছিল। সাহজাদা এই দেশ বহুকাল শাসন করিয়াছিলেন। উপস্থিত তাঁহারই এক কর্ম্মচারীর হস্তে এই দেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। দশ হাজার সিপাহী লইয়া দারা লাহোর পৌছিলেন (৩ জুলাই)। পুনরায় যুদ্ধের জন্য সমস্ত আয়োজন শেষ করিতে তাঁহার দেড় মাস সময় লাগিল। স্থানীয় সরকারী খাজনাখানা তাঁহার করায়ত্ত হইল। ক্রমে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ হইল, খেয়াঘাটগুলির উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইল।

ওদিকে, সুচতুর বিজয়ী আওরংজীব তাঁহার ৺নৈক সেনাপতি খাঁ-ই-দৌরান্‌কে এলাহাবাদ দখল করিবার জন্য এবং অপর এক সেনাপতি বাহাদুর খাঁকে তাঁহার পলাতক জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া নিজে দিল্লী রওনা হইলেন (৬ জুলাই)। প্রায় সাতমাস দিল্লী বাস করিয়া তিনি সেই স্থানে এক নূতন শাসন ব্যবস্থার অনুষ্ঠান করিলেন, এবং পরে, "আলমগীর গাজী" নাম লইয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (২১ জুলাই)। দারার অনুসরণে প্রবৃত্ত বাহাদুর খাঁর সৈন্যের সাহায্যার্থ পঞ্জাবের নূতন শাসন কর্ত্তা খলিল উল্লা খাঁকে পাঠান হইল।

সম্রাটসৈন্য দারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুচ করিতে লাগিল। বিপক্ষের আগমনে দারার সৈন্যাধ্যক্ষেরা সতলেজ নদী পরিত্যাগ করিয়া বিয়াস নদী তীরে উপস্থিত হইল। আর দারা নিজে পরিবারবর্গের সহিত লাহোর হইতে মুলতান যাত্রা করিলেন। এইরূপ স্থানান্তরে পলায়ন হেতু দারা নিজে ত হতাশ হইয়া পড়িলেনই, উপরন্তু তাঁহার সৈন্যেরাও একেবারে নিরাশ হইল।

আওরংজীব কিন্তু একেবারেই নাছোড়বান্দা—জ্যেষ্ঠের পলায়নে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাকে বন্দী করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প। এবার তিনি নিজে অনুসরণকারী সৈন্যে যোগদান করিলেন (১৩ সেপ্টেম্বর)।

দারা এইবার মুলতান হইতে সক্কর পলায়ন করিলেন (১৩ অক্টোবর)। কিন্তু আওরংজীব আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তাঁহার মধ্যম সহোদর সুজা এক সৈন্য লইয়া আওরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এলাহাবাদের নিকট উপস্থিত। কাজেই, তাঁহাকে শীঘ্র দিল্লী ফিরিতে হইল (৩০শে সেপ্টেম্বর)। পনের হাজার সৈন্য লইয়া কেবল সফশিকন খাঁ ও শেখ মীর দারার পিছু লইল।

সক্কর পৌছিয়া সম্রাট সৈন্য খবর পাইল, পাখী আবার আবার উড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সম্পত্তি, বড় বড় কামান ও নিজের গোলান্দাজ সিপাহীদের সক্কর দুর্গে রাখিয়া দারা সেওয়ানের দিকে পলায়নপর হইয়াছেন। তখন দারার সহিত মাত্র তিন হাজার অনুচর অবশিষ্ট। এই দুর্দ্দিনে একে একে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এমন কি তাঁহার অতি বিশ্বস্ত অনুচর পর্য্যন্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে ইতস্ততঃ করে নাই। ক্রমে সম্রাট সৈন্য সক্কর পৌছিল ও দারার গতিরোধ করিবার জন্য সিন্ধু নদীর দুই তীর অধিকার করিল। কিন্তু উহাদের অল্পসংখ্যক নৌকা দারার গতিরোধ করিতে পারিল না। নির্ব্বিঘ্নে নদী উত্তীর্ণ হইয়া দারা টাট্টা পৌছিলেন (১৩ নভেম্বর)।

সম্রাট সৈন্যও তখন টাট্টা পৌঁছিল। দারা এইবার দক্ষিণে কচ্ উপসাগর দিয়া গুর্জ্জর পলায়ন করিলেন। দারাকে আর অনুসরণ করা নিরর্থক হইবে মনে করিয়া সম্রাট তাঁহার সৈন্যদের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হুকুম দিলেন।

(২)

টাট্টা হইতে পলায়ন কালে "রাণ" বা জলাভূমি পার হইবার সময় পানীয় জলের অভাবে দারা অশেষ কষ্ট পাইলেন। কচ্ দ্বীপের রাজধানী পৌঁছিলে সেখানকার রাজা ও কাথিয়াওয়াড় প্রদেশের সর্দ্দার "নওয়ানগরের জাম" সাহাজাদাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণ করিলেন। এই প্রকারে প্রায় তিন হাজার অনুচরের সহিত তিনি আহমদাবাদ যাত্রা করিলেন। এই প্রদেশের নূতন শাসনকর্ত্তা সাহনওয়াজ খাঁ তাঁহার সহিত যোগদান করিল ও রাজকোষ সাহাজাদার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিল (জানুয়ারী, ১৬৫৯)। দারার সৈন্য সংখ্যা এখন বাইশ হাজার হইয়া দাঁড়াইল। দারা সুরত হইতে কামান আনয়ন করিলেন। আওরংজীবকে আক্রমণ করিবার জন্য সুজা এলাহাবাদ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছেন জানিতে পারিয়া দারা আগ্রা অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। পথে, তিনি আজমীর সর্দ্দার যশোবন্ত সিংএর নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পাইলেন। ইনি রাঠোর বা অন্যান্য রাজপুত জাতিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

ওদিকে, আওরংজীব খাজওয়া যুদ্ধে সুজাকে পরাজয় করিয়া (৫ই জানুয়ারী) মিরজা রাজার সাহায্যে যশোবন্তকে এককালে আক্রমণের ভয় ও পদোন্নতির আশা দিয়া নিজের দলে আনিলেন। যুদ্ধ করা ব্যতিরেকে দারার তখন আর অন্য কোন উপায় রহিল না। আওরংজীব তাঁহার সমীপে পৌঁছিয়াছেন। দারা বুদ্ধি করিয়া নিজের কৌশল পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি খোলা মাঠে যুদ্ধ না করিয়া আজমীর হইতে চার মাইল দক্ষিণে দেওরায় গিরি পথটি দখল করিবেন ঠিক করিলেন, কারণ, এই সংকীর্ণ গিরিপথ হইতে মাত্র মুষ্টিমেয় সৈন্য বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্যের অগ্রগমনে বাধা দিতে পারে। এই গিরিবর্ত্মের দুই পার্শ্বে দুই গিরিশ্রেণী, আর, পশ্চাতে সমৃদ্ধিশালী আজমীর সহর। এই সহর হইতে অনায়াসে সৈন্যের রসদ পাওয়ার সম্ভাবনা। দারা এক গিরিশ্রেণী হইতে অপর গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত এক নীচু প্রাচীর, সম্মুখে পরিখা এবং স্থানে স্থানে উপদুর্গ তৈয়ারী করিলেন।

আওরংজীব দক্ষিণ দিক হইতে দারার বিপক্ষে অগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন রাত্রি পর্য্যন্ত গোলা বর্ষণ চলিল (১২ই মার্চ্চ, ১৬৫৯)। দারার গোলন্দাজ ও বন্দুকধারী সৈন্য উচ্চ স্থান হইতে আওরংজীবের সৈন্যের উপর মৃত্যু বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু আওরংজীবের সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না। অগত্যা আওরংজীব এক সভা আহ্বান করিলেন। ইহাতে সাব্যস্ত হইল, বহুসৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের বাম অংশ আক্রমণ করা হইবে ও সেই সঙ্গে বিপক্ষের দক্ষিণ অংশকেও যুদ্ধে নিযুক্ত করিতে হইবে। শত্রুকে সম্মুখ হইতে আক্রমণ করায় সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না। পর্ব্বত আরোহণে দক্ষ জম্বুগিরির রাজা যদি তাঁহার সৈন্য লইয়া পশ্চাৎ হইতে গিরিশ্রেণী আরোহণ করিয়া বিপক্ষ সৈন্যকে অকস্মাৎ আক্রমণ করেন তাহা হইলে উদ্দেশ্য সফল হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই; সম্রাটবাহিনী বিপক্ষ সৈন্যের বাম অংশ আক্রমণ করিল (১৪ই মার্চ্চ)। প্রবল কামান বর্ষণ চলিল। দারার সৈন্যের অপর অংশ নিজেদের স্থান ছাড়িয়া শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত বামের সহকর্ম্মীদিগের সাহায্যের জন্য যাইতে পারিল না। তুমুল যুদ্ধ চলিল। দারার সৈন্যেরা খুবই দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত সম্রাট সৈন্য বিপক্ষকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা দারার সৈন্যকে মাঠ হইতে বিতাড়িত করিয়া শত্রুপক্ষের পরিখা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি অধিকার করিল।

ইতিমধ্যে জম্বুগিরির সৈন্যেরা বিশেষ পরিশ্রম সহকারে গিরিশ্রেণীর উপর আরোহণ করিল। সে সময়ে বিপক্ষ সৈন্য সম্মুখে তুমুল সংগ্রামে নিযুক্ত ছিল। জম্বু সৈন্য পর্ব্বতের শিখরদেশে নিজেদের জয়পতাকা প্রোথিত করিয়া

চীৎকার আরম্ভ করিল। পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইয়া দারার সৈন্যের বাম অংশ সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িল। তথাপি তাহারা সাহসের সহিত যুদ্ধ করা বন্ধ করিল না। শত্রু পক্ষের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে আওরংজীবের সেনাপতি শেখ মীর নিজের হস্তী অগ্রসর করিলেন। কিন্তু, বিপক্ষের গুলিতে তিনি নিহত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহাদের আশা ভরসা লোপ পাইলেও, দারার সৈন্যেরা তাহাদের সেনাপতি সাহনওয়াজ খাঁর পরিচালনায় একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু অকস্মাৎ এক গোলার আঘাতে সাহনওয়াজের মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার সৈন্যেরা রণে ভঙ্গ দিল।

ওদিকে, গিরিশ্রেণীর দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় দারার অবশিষ্ট সৈন্য আর দাঁড়াইতে পারিল না। তখন, দারা তাঁহার পুত্র সিপির সুকো ও বারটি অনুচর লইয়া গুর্জ্জর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। আজমীর শহরের আশপাশে লুটপাট চলিল। যশোবন্তের আহ্বানে সহস্র সহস্র রাজপুত সৈন্য একত্র হইয়া, শকুনির মত শিকারের আশায় চারি-দিকে ঘুরাফেরা করিতেছিল। এখন সুবিধা পাইয়া তাহারা পরাজিত সৈন্যের দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

দেওরায়ে যুদ্ধের সময় দারার পরিবারবর্গ ও সঞ্চিত ধনরত্ন তাঁহার এক বিশ্বস্ত খোজার অধীনে একদল সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণে আজমীরে অবস্থিত অনাসাগর হ্রদের তটে অবস্থান করিতেছিল। দারার পরাজয় সংবাদে তাহারা সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া (১৪ই মার্চ্চ) পরদিন বৈকালে মায়েরটা নামক এক স্থানে দারার সঙ্গ লইল। ইতিপূর্ব্বে, আওরংজীব পলাতকদিগের অনুসরণ করিবার জন্য জয়সিং ও বাহাদুর খাঁর অধীনে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দারা কোন স্থানে বিশ্রামের অবকাশ পাইলেন না। বিলম্ব হইলেই বিপদের সম্ভাবনা। তাঁহাকে পলায়নের বেগ বর্দ্ধিত করিতে হইল। মায়েরটা পরিত্যাগ করিবার সময়ে তাঁহার সহিত দুই হাজার পদাতিক ছিল। অত্যধিক গ্রীষ্ম ও ধুলার মধ্যে, প্রতিদিন কিঞ্চিদধিক ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করায় দারাকে অশেষ কষ্টভোগ করিতে হইল। শিবির. বা ভারবাহী পশুর অভাবে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁহার অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক অশ্ব ও উষ্ট্র পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

দারা দেখিলেন যে, আওরংজীবের পত্র চারিদিকেই পৌঁছিয়াছে, এবং স্থানীয় সম্রাটকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে প্রস্তুত। আহমদাবাদ হইতে দারার দূত ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, তিনি এই সহরে প্রবেশ-লাভ করিবার চেষ্টা করিলে ব্যর্থ হইবেন। সাহজাদা নিরাশ হইয়া পড়িলেন। আশ্রয়লাভের আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল। দারার অনুচরেরা হতবুদ্ধি ও ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং তাঁহার পুরমহিলাদের মর্ম্মভেদী চীৎকারে সকলের নয়নে অশ্রু দেখা দিল। এই সময়ে ডাক্তার বার্ণিয়ে দারার পীড়িতা স্ত্রীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। সাহাজাদার অনুচরেরা কিরূপ দুর্গতি ও কষ্টভোগ করিয়াছিল তাহারই এক শোচনীয় বর্ণনা বার্ণিয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের অবস্থা ভিখারীর কাঁথার মত হইয়াছিল। সাহজাদার নিকট তখন একটি অশ্ব, একটি গোযান, মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঁচটি ও আরও গুটি-কয়েক উট ছিল।" সাহজাদা সেই ভীষণ রাণ্ পুনরায় উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুপ্রদেশের দক্ষিণে পৌঁছিলেন।

আওরংজীবের দূরদর্শিতা হেতু সিন্ধুদেশের দক্ষিণেও দারার গন্তব্য পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। আওরংজীবের আদেশক্রমে খলিলউল্লা খাঁ লাহোর হইতে ভাক্করে রওনা হইয়াছিলেন। সম্রাটের অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারী এবং জয়সিংএর সৈন্য উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে দারার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সুতরাং, পলায়নের জন্য মাত্র একটি পথ উন্মুক্ত ছিল। সেক্ষেত্রে, কান্দাহারের পথে পারস্য দেশে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্যে দারা উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে রওনা হইয়া সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইলেন ও সিউই স্থানে প্রবেশে করিলেন।

ইতিমধ্যে, পানীয় জলের অভাব, রসদের অল্পতা, এবং অশ্ব বা ভারবাহী পশুদের ক্লান্তি উপেক্ষা করিয়া, প্রতিদিন বোল হইতে কুড়ি মাইল পথ গমনোপযোগী বেগে জয়সিং আজমীর হইতে দারার বিরুদ্ধে ধাবিত হইতেছিলেন। এই রাজপুত সর্দ্দার দারা ও তাঁহার অনুচরদের পদচিহ্ন

লক্ষ্য করিয়া ছোট ও বড় "রাণ" এবং কচ দ্বীপ উত্তীর্ণ হইলেন। পথে খাদ্যাভাবে তাঁহাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি ভীষণ দৃঢ়তার সহিত লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। তিনি সিন্ধুনদী তীরে উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাইলেন, যে দারা ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি পশ্চাদপদ হইলেন।

দারার পরিবারবর্গের কেহই পারস্য যাইতে সম্মত ছিলেন না। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী নাদিরা বানু সাঙ্ঘাতিক পীড়িতা। জনশূন্য বোলান গিরিবর্ত্ম এবং অনুর্ব্বর কান্দাহার প্রদেশের মধ্য দিয়া গমনজনিত কষ্টে তাঁহার মৃত্যু হইবার খুবই সম্ভাবনা, সুতরাং দারা তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তিনি পারস্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন না। তাঁহাকে নিরাপদ আশ্রয় এবং লোকবল দিয়া সাহায্য করিতে পারে এমন কোন এক নিকটবর্ত্তী সর্দ্দারের তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে, বোলান গিরিপথের নয় মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত দাদর প্রদেশের জমীদার মালিক জিউন হয়তো তাঁহাকে উপকার করিতে পারেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, সম্রাট সাহজাহানের আজ্ঞায় এই সর্দ্দারকে শাস্তি দিবার জন্য হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পিতার প্রিয়পুত্র দারা সম্রাটের নিকট অপরাধীর প্রাণভিক্ষা করিয়াছিলেন। সর্দ্দারের জীবন সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। এই বিপদসময়ে সেই সর্দ্দার তাঁহার প্রত্যুপকার করিবেন এই আশায় সাহজাদা দাদর পৌছিলেন। জিউন দারাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা ও তাঁহার সেবা যত্ন করিল।

দাদর যাইবার সময় পথের কষ্ট এবং ঔষধ বা বিশ্রামের অভাবে নাদিরা বানু ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। সাহজাদা তাঁহার জীবনসঙ্গিনীকে হারাইয়া দুঃখে পাগল হইলেন। তাঁহার নিকট পৃথিবী তমসাবৃত মনে হইল; তিনি একেবারে দিশাহারা হইলেন। তাঁহার বিচারশক্তি ও বুদ্ধি তিরোহিত হইল।" স্বীয় দীক্ষাগুরু ফকীর মিঞা মীরের কবরস্থানে সমাধি দিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর গুলমহম্মদ ও অবশিষ্ট ৭০টি পদাতিক সিপাহীর সাহচর্য্যে দারা তাঁহার পত্নীর মৃতদেহ লাহোরে প্রেরণ করিলেন। অনুচরদিগের উপর আদেশ হইল যে, যদি তাহাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহারা স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে, এবং যাহাদের ফিরিবার ইচ্ছা নাই তাহারা সাহজাদার সহিত পারস্যে যাইতে পারে। দারার নিকট এখন একটিও বিশ্বাসী অনুচর রহিল না। তিনি নিরুপায় হইলেন। আশ্রয়দাতা কখন বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না এই মনে করিয়া তিনি জীউনএর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

কিন্তু জীউনের অর্থলোলুপতা তাহার অপরাপর কোমল হৃদয়বৃত্তি নষ্ট করিল। সত্যানুরাগ যে পরম ধর্ম্ম, জীবন-রক্ষাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া যে প্রত্যেক মানবেরই অতি অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা সে ভুলিল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করিল। দারা, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এবং কন্যা দুইটিকে বন্দী করিয়া সে বাহাদুর খাঁর নিকট প্রেরণ করিল (৯ই জুন, ১৬৫৯)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু

নারীর মন *

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত এম-এ

এখন সে প্যারির একজন নামজাদা অভিনেত্রী, কিন্তু যে-সময়কার কথা আমরা বলছি তখন সে সাধারণ মেয়েদেরই একজন। তা'র প্রেমে পড়েছিল এক তরুণ কবি। কবির প্রেম তরুণীর অন্তরকে ভরে দিয়েছিল অপরূপ মাধুর্য্যে। তা'রা থাকতো ড্যান্যুব নদীর তীরে এক ক্ষুদ্র সহরে। দারিদ্র্যের দুঃখ তা'দের অন্তরকে একেবারেই স্পর্শ ক'রতে পারত না। কবি কাব্য রচনা করত আত্মভোলা হ'য়ে। কবির সাফল্যে তা'র তরুণী প্রিয়ার আনন্দ ধরত না—প্রণয়ীর গলায় সে জয়মাল্য পরিয়ে দিত। এম্‌নি ক'রে দিন তাদের কেটে যাচ্ছিল। জীবনে কখনো ছাড়াছাড়ি হ'তে পারে এ ধারণা ছিল তখন তাদের স্বপ্নের অতীত। এমন সময় হাঙ্গেরীতে যুদ্ধ বাঁধল। বিপুল আয়োজন ক'রে অষ্ট্রীয়ানরা হাঙ্গেরী অধিকার ক'রতে এল। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কবি ম্যাগিয়ার সৈন্যদলে ভর্ত্তি হ'ল। ক'মাস ধরে ভীষণ যুদ্ধ চলল। অবশেষে রুষ ও অষ্ট্রীয়ার মিলিত সৈন্যের কাছে ম্যাগিয়ার সৈন্য পরাজয় স্বীকার করলে।…

শত্রুসৈন্য শহর অধিকার করেছে। তরুণী খবর পেলে, যুদ্ধে তা'র প্রণয়ীর মৃত্যু হ'য়েছে। তরুণী কাঁদলে, কেঁদে কেঁদে চোখ তা'র লাল হ'য়ে উঠল, তারপর—চিরদিন যা' হয়—বিবাহ করলে আর একজনকে।

* * * *

ফ্রাউ ভন্ কুবিনী—এখন সে এই নামেই পরিচিত—বিবাহের কিছুদিন পরেই স্থির করে ফেললে, স্বামীর সঙ্গে থাকা তা'র পক্ষে সম্ভবপর নয়। লোকটি কেমন সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। তা'র পূর্ব্ব প্রণয়ী প্রায়ই বলত, অভিনেত্রী হ'লে সে সহজেই সুনাম অর্জ্জন করতে পারবে—এখন সেই কথাটাই তা'র মনের মধ্যে কেবলই জাগতে লাগল। রঙ্গমঞ্চে যাওয়াই শেষে সে স্থির করলে। স্বামীর কাছ থেকে পৃথক হ'য়ে দিনকতক সে রইল শুধু পড়াশুনা নিয়ে। শহরের এক রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষের সঙ্গে তা'র একটু আধটু পরিচয় ছিল—কাজ যোগাড় হ'য়ে গেল সহজেই। প্রথম দু'চারটে ছোটখাটো ভূমিকায় একটু খ্যাতি অর্জ্জন করার পর সে নামতে লাগল নায়িকার ভূমিকায়। মাস কয়েকের মধ্যেই তা'র নাম লোকের মুখে মুখে। তা'র সঙ্গে দেখা করার জন্যে কত লোকেই না উৎসুক! শহরের ধনীরা অভিনয়ের পর রোজই তা'র সাজঘরের সামনে ভীড় করে ফুলের তোড়া হাতে ক'রে। অভিনেত্রী কারো পানে চেয়ে দেখে না।… ..

হঠাৎ একদিন অভিনেত্রীর একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সৈন্যবিভাগের কর্ত্তা—সহরের শাসনভার এখন যাঁর হাতে—তিনি এসেছিলেন কুবিনীর অভিনয় দেখতে। লোকটি আধবয়সী—চেহারায় অভিজাত্যের ছাপ আছে আর ব্যবহারও অত্যন্ত মোলায়েম। অভিনয়ের পর তিনি কুবিনীর সঙ্গে দেখা করলেন। রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তাও সঙ্গে ছিলেন। কুবিনী তাঁর ফুলের তোড়াটি আগ্রহের সঙ্গেই নিলে। নেবার সময় তার ঠোঁটের কোনে গর্ব্বের একটু হাসি ফুটে উঠল। অত বড় লোকটা যে ভাবে তা'কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলে তা'তে মনে একটু গর্ব্ব না হওয়াটাই আশ্চর্য্য!……দু'চারদিন পরেই লোকে শুনলে, কুবিনী রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে—সে আছে সৈন্যাধ্যক্ষের গৃহে তাঁ'র প্রণয়িনী হ'য়ে? সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর প্রণয়িনীকে সুখী করতে কিছুরই অভাব রাখেন নি। বিলাসের সমারোহের মধ্যে কুবিনীর দিন কাটতে লাগল।……

তারপর একদিন এক কল্পনাতীত ব্যাপার ঘটে গেল।

---

* শ্রী ভ সোপান হইতে।

যাকে সবাই মৃত বলেই জানত সে ফিরে এল বেঁচে। সেদিন রুবিনী সৈন্যাধ্যক্ষের গাড়ী ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছিল—নরম গদীতে হেলান দিয়ে বসে অন্যমনস্কভাবে দু'পাশের জনতাকে সে লক্ষ্য করছিল, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে গেল পথচারী এক সাধারণ অস্ত্রীবান্ সৈনিকের উপর। রুবিনী নিজের অজ্ঞাতেই চেঁচিয়ে উঠল অব্যক্ত বিস্ময়ে!...তা'র সে চীৎকার কারো কানে পৌছল না—কেউই লক্ষ্য করলে না এই স্থিরচিত্ত উচ্ছ্বাসবর্জ্জিত নারীর আকস্মিক চাঞ্চল্য! পথের যে সৈনিকটি তা'কে হঠাৎ এমনি ক'রে বদলে দিলে তারো পানে দৃষ্টি দিলে না কেউ!

* * * * * *

পরের দিনই কবির ডাক পড়ল। কবি তো ভেবেই পেলে না, কী এমন কারণ থাকতে পারে যা'র জন্যে তা'কে প্রয়োজন হ'তে পারে সৈন্যাধ্যক্ষের। বেশ একটু কৌতূহল নিয়ে সে সৈন্যাধ্যক্ষের আবাসে উপস্থিত হ'ল।

কবি জানত না সৈন্যাধ্যক্ষের প্রণয়িনী কে—সে শুধু শুনেছিল তাদেরই দেশের এক মেয়ে সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে—শুনে অবধি তা'র প্রতি তা'র মন বিতৃষ্ণায় ভরে ছিল। তা'র কেবলই মনে হচ্ছিল, তা'র সঙ্গে দেখা না হ'লেই ভাল।

সে যে আসবে একথা যেন আগে থাকতেই দ্বাররক্ষীর জানা ছিল। তা'কে সে এক ভৃত্যের সঙ্গে ভিতরে পাঠিয়ে দিলে। বারান্দার এক কোণে টেবিলের উপর চাকরদের ব্যবহারের একপ্রস্থ পোষাক পড়েছিল, ভৃত্য সেইদিকে তা'র দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললে, তা'রই জন্যে ঐগুলো আনা, কর্ত্রীর খাসকামরার চাকর সে। কবির চোখদুটো ক্রোধে আরক্ত হ'য়ে উঠল—কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। অদৃষ্টের পরিহাস মনে ক'রে নিজেকে সংযত ক'রে নিলে।...সে ভাবতে লাগল, কোনদিন সে কি এই নারীর প্রতি কোন অবিচার করেছে—যার জন্যে তা'কে এইভাবে অপমানিত করার আয়োজন! কোনো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'বার আগেই সংবাদ এল, কর্ত্রী তা'কে আহ্বান করেছেন।

সংবাদ-বাহক তা'কে এক সুসজ্জিত কক্ষে পৌছে দিয়ে অন্যত্র চলে গেল। কবি দাঁড়িয়ে রইল কর্ত্রীর প্রতীক্ষায়। খানিক পরেই পর্দ্দাটা সরে গেল—কর্ত্রী কবির সামনে এসে উপস্থিত। তা'কে বেশ স্থির বলেই মনে হ'ল, কিন্তু তা'র মুখখানা অত্যন্ত বিবর্ণ। মূল্যবান্ পরিচ্ছদে তা'র দেহ আবৃত। কবি তা'কে দেখেই চিনতে পারলে। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকলে, "ইর্ম্মা!"...

সে ডাক পিয়াসী তরুণীর বুকে বাজল তীরের মত। স্থির থাকতে পারলে না সে, প্রণয়ীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু এ শুধু ক্ষণেকের জন্যে। কবি তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে।

তরুণী বললে, "এর জন্য আমায় তুমি দোষ দিতে পার না! সবাই জানত, দেশের জন্য তুমি প্রাণ দিয়েছ।... আমি তোমার জন্যে কত কেঁদেছি......

কবি শ্লেষের সুরে বললে, "সত্যাই তোমার অসীম দয়া। কিন্তু আমার কাছে তুমি কৈফিয়ৎ দিচ্ছ কেন? আমি তোমার দাস। তুমি আদেশ করবে—আমি তা' পালন ক'রব বিনা দ্বিধায়।......এই না আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ!"

তরুণীর চোখদুটো জলে ভরে এল। সে মুখ ফিরিয়ে নিলে অশ্রু গোপন করতে।

কবি লক্ষ্য ক'রে বললে, "তোমাকে আঘাত করার জন্যে আমি ওকথা বলিনি। তবে আমার মনে হয়, আমাদের আর দেখা না হ'লেই ছিল ভাল।...কেন তুমি আমায় এইভাবে এখানে আটকে রাখতে চাও? তুমি যে-পথে চলেছ আমি তা'তে বাধা জন্মাতে চাই নে—আমায় আমার পথে চলতে দাও। আমার সুখ তুমি কেড়ে নিয়েছ—এখন চাও আমায় লাঞ্ছিত ক'রতে?"

তরুণী কান্নার সুরে বললে, "তুমি আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবলে কি ক'রে? তোমার দুর্ভাগ্যের কথা শোনার পর থেকে তোমায় সুখী ক'রতে কত চেষ্টাই না আমি করেছি!"

কথা শেষ না হ'তেই কবি ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল,

"তাই বুঝি তোমার বর্ত্তমান প্রণয়ীকে অনুরোধ করেছ আমায়—তোমার পূর্ব্ব প্রণয়ীকে তোমারই অধীনে একটা চাকরি দিতে।"

"তুমি আমায় এমন কথা বলছ······আমি যে······" তরুণীর কণ্ঠস্বর কান্নায় ধরে এল।

কবি তিক্ত কণ্ঠে বললে, "তুমি বোধ করি আমায় শাস্তি দিতে চাও তোমায় একান্ত ভাবে ভালবাসার জন্যে।...এতে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি না—নারীর স্বভাবই যে ঐ! আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার এ লাঞ্ছনা তোমার এক নতুন অভিজ্ঞতার—এক নতুন আনন্দের কারণ হবে।"

তার কথা শেষ হ'বার আগেই তরুণী সেখান থেকে সরে গেল। পাশের ঘর থেকে তার কান্নার চাপা আওয়াজ কবি শুনতে পেলে, কিন্তু সে তা ভ্রূক্ষেপ করলে না। তরুণীর প্রতি তার ঘৃণা বেড়ে গেল যখন সে লক্ষ্য করলে চারিদিকের ঐশ্বর্য্য ও বিলাস।···

কিন্তু কেন এ ক্রোধ—কেন এ জ্বালা! সে তো তার দাসত্ব গ্রহণ করেছে, আর দাস যে তার তো স্বাধীন মত থাকতে পারে না—শুধু আদেশ পালন করাই যে তার কাজ।······

সৈন্যাধ্যক্ষের দুটী বন্ধু একটু পরেই চায়ের নিমন্ত্রণে আসবেন। কবিকে সে সময় হাজির থাকতে হবে তাঁদের কাছে।

* * * *

কবি ব্যস্ত ছিল পাকশালার কাজে পাচককে সাহায্য করতে। পাশের ঘরের হাসি তামাসা বেশ স্পষ্ট ভাবেই শোনা যাচ্ছিল। খানিক পরে পাচক দরজাটা খুলতেই কবির সারা দেহ উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ক্রাউজন কুবিনী—তার ডান হাতখানা সৈন্যাধ্যক্ষের মুঠোর ভিতরে।...

কুবিনীর দৃষ্টি কবির মুখের উপর ন্যস্ত— সে-দৃষ্টিতে জয় বা ঘৃণার চিহ্নমাত্র নেই—আছে গভীর মমতা ও সহানুভূতি!

সে কি তবে কোনো দিন অজ্ঞাতে তার কোন অনিষ্ট করেছে!—কবি কেমন ধাঁধাঁয় পড়ে গেল!···

ঘৃণা, প্রেম, বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা, তার মনের মধ্যে এক তুমুল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করলে।···পাত্রে সুরা ঢালতে গিয়ে তার হাতটা কাঁপতে লাগল।

সৈন্যাধ্যক্ষ তাকে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করছিলেন।··· "তুমি যার কথা বলছিলে সেই নাকি?"

প্রণয়িনী ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, "হ্যাঁ।"

সৈন্যাধ্যক্ষ একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "সামান্য ভৃত্য হ'বার জন্যে এর জন্ম হয়েছে বলে মনে হয় না।"

মৃদুস্বরে কুবিনী উত্তর করলে, "সৈনিক হবার জন্যেও না।"

কথাগুলো কবির অন্তরকে জোরে একটা ধাক্কা দিলে।··· কিন্তু এটা সে বেশ বুঝতে পারলে কুবিনী তারই পক্ষ সমর্থন করছে· সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে তার প্রকৃত পরিচয় পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে—পাছে কবির আত্মসম্মানে আঘাত লাগে তা'র জন্যে তাকে রীতিমত সন্ত্রস্ত বলে মনে হল।

কিন্তু কবির মন তখনো সন্দেহের আঁধার পথে ফিরতে লাগল।···নারী চায় বৈচিত্র্য—উত্তেজনা! একদিন যাকে ভালবেসেছিল—স্বেচ্ছায় হৃদয় দিয়েছিল, আজ তা'কে দয়ার ভিখারীরূপে পাওয়ায় বৈচিত্র্য, উত্তেজনা - দুইই আছে! নূতন প্রণয়ীর সামনে তাকে লাঞ্ছিত ক'রে যদি তার আনন্দ লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকত তা'হলে তাও হয়ত করতে সে কুণ্ঠিত হ'ত না!···

কবি হঠাৎ চোখ তুললে। চোখ তার কুবিনীর চোখের সাথে এক হ'য়ে গেল। কুবিনীর দৃষ্টি বেদনায় ভরা···কবি চোখ নামিয়ে নিলে···তার চিন্তাগুলো কেমন জোট পাকিয়ে গেল।

* * * * *

সেদিন থেকে কবি সৈন্যাধ্যক্ষের বাড়ীতে আছে। এখন আর তাকে কর্ত্রীর কোনো কাজই করতে হয় না। কর্ত্রীর সঙ্গে দেখাও তা'র হয় না কোনো দিন—সেও খবর নেবার চেষ্টা করে না।

এই ভাবে কেটে গেল ছ'মাস। হঠাৎ একদিন সৈন্যাধ্যক্ষ তাকে ডেকে পাঠালেন।

দর্শনার্থীরা যে ঘরে বসে ছিল কবি সেখানে উপস্থিত হ'ল। খানিক পরেই বাইরের কি একটা কাজ সেরে

সৈন্যাধ্যক্ষ ফিরলেন। তাঁকে দেখে সকলে উঠে দাঁড়াল। কবির দিকে দৃষ্টি পড়তেই সৈন্যাধ্যক্ষ তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি এখন যেখানে খুসী যেতে পারো—মুক্তিক্রয়ের অনুমতি পরিষদ্ তোমায় দিয়েছে।"

বিস্মিত কবি বললে, "সে কি!...কিন্তু আমি..."

"মুক্তিমূল্যও পরিষদ্ পেয়েছে—তুমি এখন মুক্ত।"

"এ যে আমি ভাবতে পারছি না! আপনি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা..."

"কৃতজ্ঞতা আমায় জানাবার কোনো দরকার নেই। তোমায় মুক্ত করেছেন ফ্রাউ ভন্ কুবিনী।"

কবির হৃদয়ের স্পন্দন যেন থেমে গেল! চেষ্টা করেও সে একটি কথা মুখ দিয়ে বা'র করতে পারলে না। নত হয়ে সৈন্যাধ্যক্ষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সে প্রস্থান করলে।...

কুবিনীর কক্ষের দিকে সে দ্রুতপদে চলল। তার প্রতি সে যে অবিচার করেছে—মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তাকে যে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছে তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করতে! তীব্র অনুশোচনায় তখন তার অন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে। কুবিনীর কক্ষদ্বারে উপস্থিত হ'তেই একটি পরিচারিকা জানিয়ে দিলে, কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে না তার।

রুদ্ধকণ্ঠে কবি প্রশ্ন করলে, "কেন?"

"এখানে নেই তিনি—চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন?...কোথায়?" কবির কণ্ঠস্বর আর্ত্তনাদের মত শোনাল।

"প্যারিতে...ঘণ্টা দুই আগে।"

কবি নিশ্চল—অব্যক্ত বেদনায় মুখ তার পাণ্ডুর!

পরিচারিকা ব্যস্তভাবে বললে, "অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে? শরীরটা ভাল নেই বুঝি? এসো, এখানে বসে একটু জিরিয়ে নাও—কোনো জরুরী কাজ নেই তো?"

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত
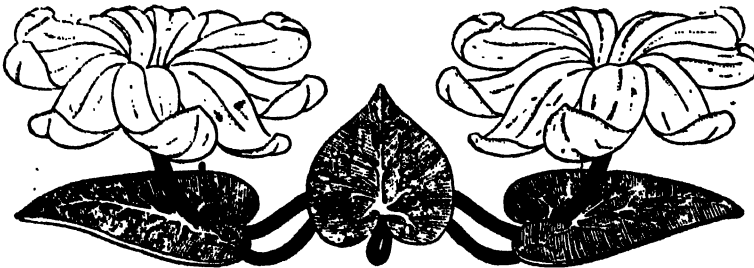
কাবুলিওয়ালা *

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ

মানুষে মানুষে ভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গ'ড়ে তুলেছে মানুষের নিজ হাতের গড়া তা'র আপন সভ্যতা। এই সভ্যতা একদল মানুষকে সর্ব্বদা মানুষের চক্ষে ধ'রেছে উজ্জ্বল ক'রে, সব কিছুতে তা'কে দিয়েছে প্রাধান্য, অপর আর একদলকে ক'রে রেখেছে অখ্যাত —সব কিছুতে তা'কে ক'রেছে গৌণ। সাহিত্যেও দেখি এই অখ্যাত দলের লোকদের করা হ'য়েছে অস্বীকার; তা'দের অবজ্ঞাত জীবনের রসের চিত্রের একটা মস্ত বড় দৈন্য, একটা মস্ত বড় শূন্যতা র'য়ে গেছে সাহিত্যের যুগ-যুগ-সঞ্চিত ভাণ্ডারে। যুগে যুগে সাহিত্য যা গ'ড়ে উঠেছে তা কেবল ঐ সভ্য সমাজের নরনারীর জীবন নিয়ে। তাই জগতের সাহিত্যের আজ শতকরা নিরানব্বই ভাগই হ'চ্ছে যা'কে বলা যেতে পারে বুর্জো literature বা নাগরিক সাহিত্য। অধুনা রুষ দেশে অবশ্য এই অখ্যাত অবজ্ঞাত লোকদের নিয়ে সাহিত্য গড়ে তুলবার খুবই প্রয়াস দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু তা'কে ঠিক সাহিত্য বলা যায় না, কেননা তা'দের জীবনের রসের চিত্রটি সেখানে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা হ'চ্ছে না, হ'চ্ছে শুধু তা'দের প্রতি বুর্জোয়াদের যুগ-যুগান্তরের অবিচার, অত্যাচারের নির্ম্মম নিষ্ঠুর কাহিনী।

সভ্যতার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে যতই কেন না মানুষে মানুষে বৈষম্য দেখানো হ'য়ে থাক্‌, তবু—মানবহৃদয়ের এমন এক-একটি স্থান আছে যেখানে সব মানুষই এক, যেখানে সব মানবই হ'চ্ছে আদিম মানব। সেখানে "সেও যে আমিও সে", সেখানে শান্তস্বভাব মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন ভদ্র বাঙ্গালী ও পর্ব্বতবাসী বলিষ্ঠকায় স্বাধীনজীবনযাপী হিংস্র কাবুলিওয়ালায় কোনই প্রভেদ নেই। প্রেমের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বাৎসল্যের ক্ষেত্রে, মানবহৃদয়ের এই শাশ্বত মূর্ত্তি সব চাইতে বেশী হ'য়ে ওঠে পরিস্ফুট, সেখানে মানুষে মানুষে কোনই তারতম্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। মানবের এই মানবতাটুকু, আর প্রেমের এই চিরন্তন রহস্যটুকু অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্যে ফুটে উঠেছে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিতে। সমস্ত গল্পটি শরতের শুভ্রগম্ভীর সুনির্ম্মল প্রকৃতির ন্যায় একটি অপরূপ পবিত্রতায় মণ্ডিত। সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় একটা মুক্তির আস্বাদন, একটা বৃহত্তের স্পন্দন। সরলহৃদয়া বালিকা মিনি ও পর্ব্বতবাসী কাবুলি-ওয়ালার মধ্যে প্রীতির যে নিগূঢ় বন্ধন অতি দ্রুত গড়ে উঠেছে তা'র মধ্যে আছে শরৎ আকাশের একটা ব্যাপ্তি একটা শান্তোজ্জ্বল স্নিগ্ধ ছবি। এ তো নরনারীর যৌবনের প্রেম নয়, এ যে মানবের সুপ্ত পিতৃহৃদয় হ'তে উত্থিত। এ প্রেমের প্রকৃত সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এর মধ্যে চঞ্চলতা নেই, আছে গভীরতা, আছে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তির ছায়া। এ যে একটি সরলহৃদয়া বালিকার সঙ্গে একটি মানবের স্নেহের বিচিত্র কাহিনী যার প্রকৃত কৃত্রিম সভ্যতার হিমস্পর্শে তা'র বালকসুলভ সহজ সরলতাটুকু,— তা'র সহজ গতিটুকু বিকিয়ে দেবার অবকাশ পায় নি। জটিল মনস্তত্ত্বের কঠিন বিশ্লেষণ এতে নেই, অতৃপ্ত কামনার আবেগ এতে নেই, সুখের উন্মাদনা নেই, দুঃখেরও হাহাকার ধ্বনি নেই; আছে শুধু দুটি অন্তরের বিচিত্র সুন্দর সহজ প্রেমকাহিনী যা'র মধ্যে তীব্রতা নেই আছে গভীরতা। যে দুটি চরিত্র নিয়ে এই সহজ সরল সুন্দর প্রেম আখ্যান গড়ে উঠেছে তা'রা নিজেরাই তা'দের প্রেম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ নয়, তা'র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চেতন নয়। "শিশু আননের সরল হাসির মতো" তা যেমন আপনি সহজে ফুটে উঠেছে তেমনি সহজে আবার তা মিনির বয়সের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা'র হৃদয় হ'তে ঝরে প'ড়েছে। তাই বলছিলাম গল্পটির মধ্যে আছে একটা ব্যাপ্তির, একটা মুক্তির সুর। বালিকা মিনি ও কাবুলিওয়ালার রহস্যমধুর সংক্ষিপ্ত

---

* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠচক্রে "কাবুলিওয়ালার" আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক কর্তৃক পঠিত।

বিক্ষিপ্ত কৌতুকালাপ গল্পের এই দিকটি আরও সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুলবার সহায়তা ক'রেছে। গল্পের আরম্ভ ও শেষ দুই হয়েছে শরতের দুটি সুনির্ম্মল সুপ্রভাতে। গল্পের এই আরম্ভ ও শেষের মধ্যেই যেন নিহিত র'য়েছে গল্পের সমস্ত অর্থটি। শরতের আকাশে বাতাসে আছে একটা স্তব্ধতা, একটা নির্ম্মলতা, একটা বিস্তৃতি, একটা মুক্তি। গল্পের যবনিকা শরৎপ্রকৃতির যে সুনির্ম্মল প্রভাতে প্রথম উত্তোলন করা হ'য়েছে প্রকৃতিদেবীর সেই স্তব্ধতা সেই পবিত্রতা অতি সুন্দর সুনিপুণভাবে পরবর্ত্তী সমস্ত গল্পটিতে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে মিনি কাবুলিওয়ালার জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়ে। গল্পের শেষ যেখানে হ'য়েছে সেখানেও গল্পটির মধ্যে আছে একটা বিস্তৃতি। কাবুলিওয়ালার নীরব বেদনার সেখানে অভ্রভেদী হাহাকারধ্বনি নেই। তার বেদনা তার হৃদয় হতে উত্থিত একটি নিঃশব্দ সকরুণ সঙ্গীতের গুঞ্জরণধ্বনির মতো দশদিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার বেদনা যেন একটা মস্ত প্রসার লাভ করেছে যা শরৎপ্রকৃতিরই অনুরূপ। মনে করে দেখুন গল্পের সেইখানটি যেখানে মিনির দর্শন-প্রার্থী কাবুলিওয়ালা তার দর্শনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে না জেনে ক্ষণেকের তরে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুধু মাত্র 'বাবু সেলাম' বলে দ্বারের বাইরে চলে গেল। তারপর পুনরায় ঘরে ফিরে মিনির জন্য সংগৃহীত কিস্‌মিস্ বাদামের নৈবেদ্য ধীরে ধীরে মিনির পিতার টেবিলের উপর রেখে তাকে বলা তার কথাগুলি ও পরে মিনির পিতা দাম দিতে উদ্যত হলে মিনতিসহকারে তা' নিতে অস্বীকৃত হওয়া কি সুন্দর ভাবেই না তার ব্যথাতুর মনের ব্যথাটুকু ব্যক্ত করে দিয়েছে। তারপর তার ঢিলে জামার ভিতর হতে তার নিজ কন্যার হাতের ভুষিমাখানো স্মরণচিহ্নটুকু বের করে মিনির পিতাকে বলা তার কথাগুলি, 'বাবু, তোমার যেমন একটি লড়্‌কি আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়্‌কি আছে।'—কি সুগভীর করুণ সুরেই না সমস্ত চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছে! বেশী কথা সে বলতে জানে না, তার বেদনা যে কত গভীর তাও সে ব্যক্ত করতে পারে না, অথচ সমস্ত জড়িয়ে—তার স্তব্ধতা, তার সংক্ষিপ্ত কথা, তার নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে যাওয়া ও পরে আপনি ফিরে আসা—তার মনের একটি স্তব্ধ গভীর ব্যাকুলতার আভাস দেয়। শরতের প্রকৃতির মতই সে শান্ত, স্তব্ধ, গভীর। তার বেদনা যেন তার এই স্তব্ধতার ভিতর দিয়ে একটি বিস্তৃতি লাভ করেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে তা যেন শরতের রৌদ্রের সঙ্গে মিশে সমস্ত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। বসন্তের চঞ্চল হাওয়ার মতো তা যেন দ্রুত এসে আমাদের আঘাত করে না। ধীরে নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে তা একটি পরশ বিছিয়ে দেয়। এমনি ধরণের একটি বেদনার আভাস সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে কবিগুরুর 'হৈমন্তী' গল্পটিতে। 'হৈমন্তী' নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তার প্রকৃতিটী, তার বেদনার স্বরূপটি। পোষ্টমাষ্টার গল্পটিতেও এমনি ধরণের একটি অব্যক্ত মর্ম্মবেদনার আভাস পাওয়া যায় রতনের মধ্যে।

নানা দিক দিয়ে ছোট বড়র সমন্বয় ঘটেছে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিতে। প্রথমতঃ যে দুটি চরিত্র নিয়ে প্রধানতঃ গল্পটি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে বয়সের কত বড়ই না পার্থক্য! তাদের নিজ নিজ সমাজের দিক দিয়েও ব্যবধান তাদের বড় কম নয়। তারপর কাবুলিওয়ালার প্রকৃতির মধ্যেও দেখতে পাই ছোট বড় দুটি element। এক দিকে যেমন মিনির প্রতি তার সুগভীর স্নেহ তার ভিতরকার স্নেহকোমল সুন্দর মানুষটির পরিচয় দেয়, অন্য দিকে তেমনি আবার তার পাওনাদারের প্রতি তার অসহিষ্ণু আচরণ তার ভিতরকার হিংস্র ক্ষুদ্র মানুষটিরই পরিচায়ক। এ ছাড়া গল্পের আরম্ভ ও শেষের মধ্যে আছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিপরীত দুটি সুর, একটি হাসির অপরটি অশ্রুর। আখ্যানটির প্রথমদিকের ঘটনাবলী সর্ব্বত্রই একটি প্রসন্ন হাসির আলোকে উদ্ভাসিত। শেষ দিকটি তার শেষ হয়েছে গিয়ে বেদনার একটি অশ্রুমাখানো সকরুণ দৃশ্যে। 'কাবুলিওয়ালার' মিনির ও মিনির পিতার প্রশস্ত প্রকৃতির সম্মুখে মিনির মাতার সংশয়াকুল সঙ্কুচিত, শঙ্কিত প্রকৃতি গল্পের এই দিকটারই একটু ইঙ্গিত করে।

যে জিনিষটী গল্পটিতে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার তা হচ্ছে এই যে গল্পের প্রতিটি চরিত্র অতি সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। অথচ কোথাও তাদের প্রকৃতি

নিয়ে খুব বেশীক্ষণ ব্যাখ্যান করবার কবি সুযোগ পান নি। এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সামান্য দু চারটি ঘটনার আবর্ত্তে তিনি এমনি নিখুঁত ভাবে প্রতিটি চরিত্র এঁকেছেন যে তারা প্রত্যেকে তাদের স্ব স্ব মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে, প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। কোনও চরিত্রের বিকাশের জন্তই কবিকে যেন কোথাও এতটুকু কষ্ট করতে হয় নি। তারা যেন ফুলের মতো আপনি হয়ে উঠেছে প্রস্ফুটিত। চরিত্রগুলির মধ্যে আবার মিনির চরিত্র পেয়েছে সবচেয়ে বেশী পূর্ণতা। শিশু চরিত্রের এমন সহজ সুন্দর বিকাশ বাংলাসাহিত্যে খুব কমই আছে। একমাত্র বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র অপু-দুর্গা ছাড়া বাংলা দেশে যে অজস্র কথা সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার মধ্যে এমন একটি সুন্দর বিকাশের ছবি পাওয়া যাবে না বললে অতিশয়োক্তি হবে না। মিনির সেই তার পিতার ঘরে প্রথম ঢুকে বালিকাসুলভ চপলতার সহিত অনর্গল কথা বলে যাওয়া, পরক্ষণে আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম খেলা ও জানালার ধারে ছুটে গিয়ে কাবুলিওয়ালাকে দেখে উচ্চৈঃস্বরে 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' বলে চীৎকার করা এবং পরে ঝুলি ঘাড়ে মস্তদেহ কাবুলিওয়ালাকে তাদের বাড়ী অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখে ভয়ব্যাকুল চিত্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে তার পিতার ঘর থেকে পলায়ন—এ সকলের ভিতর দিয়ে কি সুন্দর ভাবেই না তার শিশু প্রকৃতিটি ফুটে উঠেছে! তার শিশুপ্রকৃতি সবচেয়ে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে তার পিতার ও কাবুলিওয়ালার সঙ্গে তার বলা তার কথার ভিতর দিয়ে। ভাবে ও প্রকাশভঙ্গীতে শিশু-প্রকৃতির কি সুন্দর অনুরূপই না তরে বলা তার কথাগুলো হয়েছে!

পূর্ণেন্দু গুহ

"লতা ভাসে সফল আঁখিনীরে"

শ্রীবিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ

গোলাপ লতা দিনের পরে দিন
হৃদয় রসের নিবিড় করা ক্ষীরে
ফুটিয়ে তোলে সলাজ নতমুখী
পাপ্‌ড়ি ঢাকা রাঙা গোলাপটিরে॥

হঠাৎ কবে পাপ্‌ড়ির মুখ খোলে
দিশে দিশে বারতা যায় ছুটে।
গন্ধে আকুল ভ্রমর এসে বলে
মধু, পরাগ, নেবো আজই লুটে॥

গোলাপ কলি কয় না কোন কথা
বাতাস এসে আদরে দেয় দোলা।
গোলাপ লতা বুকে হাসে কলি
আপন সুখে সদাই আপন ভোলা॥

কেউ ত তারে বলে না ক' কভু
বারেক দেখ চেয়ে লতার পানে।
গোলাপ কলি ফুটেছে যার বুকে
বাঁধা আছে নাড়ীর টানে টানে॥

হাসি মুখে গোলাপ লতা শুধু
দান করে দেয় রাঙা গোলাপটিরে।
গোলাপ-ভ্রমর সুখে মাতোয়ারা
লতা ভাসে সফল আঁখিনীরে॥

শ্যাম ও কুল

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

আমাদের টুমুর কথাই বলিতেছিলাম।

ওর প্রায় সাত বছর আগে পৃথিবীতে আসিয়া আমি যে-অভিজ্ঞতাটুকু ওর আগেই সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছি, টুমু তাহার কোনোই মূল্য দিতে রাজি নয়। ওর মতে সেটা নাকি নিতান্তই দৈবদুর্বিপাকের কথা এবং সেটা না-হইয়াও পারিত। যদি-ই বা কোনোক্রমে এই দৈবদুর্বিপাকটা ফস্‌কাইয়া যাইত, তাহা হইলে নাকি আমার বদলে আজ টুমুই প্রেমে পড়িয়া হাবুডুবু খাইত, আর আমাকে টুমুর মতো গৌরব-ভরা মাথা লইয়া আঁক কষিতে কষিতে হয়রাণ হইতে হইত।

আমাদের টুমুর একটা আলাদা ফিলোসফি আছে!

টুমুর বয়স সবে এই চৌদ্দ ছাড়াইয়াছে, কিন্তু কথা কয় আমাদের পাড়ার লোচন-ঠাকুদ্দার মতো! ভাবিয়াছি, আগামী বারের কাউন্সিল নির্ব্বাচনে টুমুকে একজন ক্যান্‌ডিডেট্‌ দাঁড় করাইয়া দিব। তবে, অঙ্কে ওর মাথা খেলে না,—ও-ই যা' একটু ভরসা।

অদ্ভুত মেয়ে! রাগ করিয়া চোখ রাঙাইবারও উপায় নাই, তাহা হইলেই হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া বলিবে, অ খোকাদা' থামো—থামো। একেবারে মানায় না তোমায়—

রাগ করিলে তাহা মানাইল কিনা, সেকথা ভাবিতে গেলে রাগ করিবার কথা কাহার মনে থাকে মশাই?

এমন আকাট-মূর্খ মেয়ের ভবিষ্যৎ যে কি, তাহা আমি নখদর্পণে দেখিতেছি। মাথার বেণীটা ধরিয়া একটু টানিয়া দিলে কাঁদিয়া ফেলিবে, অথচ আছাড় পড়িয়া একটা হাত ভাঙিয়া আসিয়া সেদিন হাসি যেন আর কিছুতেই থামে না মেয়ের। গলার সঙ্গে দড়ি দিয়া হাতটা ঝুলাইয়া নাচিতে নাচিতে পাড়ায় এই নতুন দৃশ্যটি দেখাইতে বাহির হইয়া গেলো।

আমি হলপ্‌ করিয়া বলিতে পারি, এ-মেয়ের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার!

সহরতলিতে পাশাপাশি বাড়ি। প্রায় তিনপুরুষের আলাপ; নৈকট্যের বন্ধনটাই একদিন স্বাভাবিক আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছে। সেই সূত্রে আমি টুমুর খোকাদা' এবং টুমুদের বাড়ির সকলেই আমার একটা-না-একটা-কিছু। আমার মাকে টুমু বলে জ্যেঠাইমা, আর টুমুর মাকে আমি বলি মাসিমা; এর ভিতরে লজিক্‌ খুঁজিতে যাওয়া বৃথা।

এমনি চলিয়া আসিয়াছে তিন-পুরুষ ধরিয়া।

কিন্তু টুমু বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে। আমার সঙ্গে একটু বেশি ঝগ্‌ড়া করে বটে, তাহা হইলেও ও আছে বলিয়াই আমার ফুট্‌ফরমায়েস্‌ খাটিবার লোকের অভাব হয় না। বাড়িতে একটা ছোট মেয়ে না থাকিলে যে কত অসুবিধা হয়, সেবার টুমুর জ্বরের সময় তাহা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছিলাম।

সে যাহাই হোক, আজিকার এই সকাল বেলাটা ওর সঙ্গে বক্‌ বক্‌ করিয়া কাটাইবার আগ্রহ আমার মোটেই নাই। তাই বই-খাতা লইয়া ঘরে ঢুকিতেই বলিলাম, তেরোর থিওরেম্‌টা মুখস্থ হয়েছে?

টুমু অসঙ্কোচে মাথা নাড়িয়া বলিল, হয় নাই।

গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম, আগে মুখস্থ ক'রে এসো, তার পরে আর-সব পড়া হবে।

টুমু ঝঙ্কার দিয়া বলে, তার চেয়ে পরিষ্কার বল্‌লেই পারো, এখন তোমার কাছে এলে ডিস্টার্‌ব্‌ করা হবে তোমায়। লিখ্‌বে হয়তো ছাইয়ের প্রেম-পত্তর, তা-ও আবার বাবুর নিরালা হওয়া চাই।

বলি, প্রেমে পড়িস্‌নি তো কোনদিন, কী বুঝ্‌বি তুই?—

ইঃ, তা—মি তো আমার প্রেমে-পড়া! মিলা আমার বন্ধু বলেই না জীবনে একটা মেয়ের সঙ্গে মেশ্‌বার সুযোগ পেলে। আমার কাছে তোমার ঋণী থাকা উচিত।

গালে সাবান ঘষিতে ঘষিতে বলি, বলিস্ তো ঋণটা এখুনি শোধ ক'রে দিতে পারি। জীবনে একটা ছেলের সঙ্গে মেশ্‌বার দরকার হয়ে পড়েছে তোর, তা বন্ধু আমারো দু'একজন আছে—

বা—রে, ভালো হ'বে না কিন্তু খোকাদা', খালি খালি কাল্‌লেমি করা হচ্ছে, দাড়ি কামাবে তো কামাও না বাপু—

দাড়ি কামাবার সময় চীৎকার ক'রে বাড়ী মাথায় ক'রে তুল্‌লে, দাড়ি কামানো তো হয়-ই না, বরং গাল কেটে যাওয়ার ভয়ও থাকে ভারি—

চাহিয়া দেখি, ততক্ষণে টুনু চলিয়া গেছে।

আগেই বলিয়াছি, টুনুর ধারণা—আমি নিশ্চয়ই প্রেমে পড়িয়াছি, তা-ও কিনা ওরই বন্ধু উর্ম্মিলার সঙ্গে। হাঃ, প্রেমে পড়িবার মতো মেয়েই বটে! বাঙ্‌লা-দেশে যেন মেয়ের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে! কিন্তু যাহাই করি বা না-করি, ওই এক ফোঁটা মেয়ে টুনু—সে-ও তাহা লইয়া ঠাট্টা করিবে নাকি?

সে-ঠাট্টাও সহ্য করিতে রাজি ছিলাম, যদি সত্যি বা ও-রকম একটা কিছু ঘটিয়া যাইত। আরে মশাই, প্রেমে-পড়া কি চারটিখানি কথা?—না, ভদ্রলোকের কাজ? তিন বছর ধরিয়া কসরৎ করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া গেলাম। বাঙ্‌লা দেশের কুমারী মেয়েগুলো যেন হঠাৎ ডুমুরের ফুল হইয়া উঠিয়াছে!

যাহাও হাতের পাঁচ একটা মেয়ে ছিল উর্ম্মিলা, তার সম্বন্ধেও এখন আর কোনো উচ্চ আশা পোষণ করিতে ভরসা হয় না। এমন অদ্ভুত মেয়ে জীবনে দু'টি দেখি নাই। মেয়েটা বোকা, কি চালবাজ—সেকথাই আজ তিন বছরে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলাম, বুঝ্‌লে মিলা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমার যে-যুগে জন্মানো উচিত ছিল, সে-যুগ এখনো অনাগত।

মিলা খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, কি জানি আমি ঠিক বুঝি না। তবে এইটুকু আমি বল্‌তে পারি, আপনার আর আমার একই যুগে জন্মানো উচিত হয়নি।

এ-কথায় আপনারা ওর মনোভাবের কোনো আভাস পাইলেন কি? বোকা বলিবার সাধ্য তো রহিলই না, অধিকন্তু চালিয়াৎ বলাও নিরাপদ নয়। মুখে ওই ক্ষীণ হাসিটুকু না থাকিলে নবপরিচিতের দস্তুরমতো ভয় পাইয়া যাইবার কথা! একটুখানি ফ্লার্ট করিবার প্রবৃত্তিও যদি মেয়েটার মধ্যে থাকিত! সব সময়েই এমন করিয়া কথা বলিবে, যাহার মানে খুঁজিয়া তোমার মাথার টনক্ নড়িয়া গেলেও ওর মনের কাছ ঘেঁসিতে পারিবে না।

এই তো গত-কালের কথা—

বন্যা-রিলিফ্-ফণ্ডের জন্তে মেয়েরা ওভারটুন্ হল্-এ চ্যারিটি পারফরমেন্স্ করিবে। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, যন্ত্র-কসরৎ—সবই আছে।

টুনু আসিয়া বলিল, তোমাকে বাঁশী বাজাতে হবে, তা জানো তো?

বলিলাম, না। জানিও না, পার্‌বোও না।

পার্‌বে না কি রকম? বল্‌লেই হলো আর কি, তোমার নামে প্রোগ্রাম ছাপা হ'য়েছে, তা জানো?—টুনু হাত নাড়িয়া মুরুব্বিয়ানার সুরে বলে।

গম্ভীর-কণ্ঠে বলি, ছাপা হওয়ার পরে জান্‌লে, ওতে আর কোনো ফল হয় না।

খুব খানিকটা মেজাজ্ দেখাইয়া টুনু চলিয়া গেল। আমি বুঝিলাম, চলিয়া গেল্ল বটে, কিন্তু আমাকে রেহাই দিয়া নয়; বরং ওর চাইতে যার কথায় বেশি কাজ হইবে বলিয়া ওর ধারণা—তাহাকেই ডাকিয়া আনিতে। কাজেই আমার পক্ষে একটু সন্ত্রস্ত হইবার কথা।

মিলা আসিল।

কোনো ভূমিকা না করিয়াই শুধাইল, যাবেন না তো আপনি? বেশ ভালোই হোলো, আমিও আপনার দলে।

কথাটা ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ওর কোনো কথাই আমি চট্ করিয়া বুঝিতে পারি না। বলিলাম, আমার দলে কি রকম? তোমার তো ওতে মেন্ পার্ট রয়েছে।

বসিবার জন্ত ঘরে চেয়ারের অভাব না থাকিলেও, মিলা আমার সম্মুখের টেবিলটার এক কোণে উঠিয়া বসিল এবং নির্ব্বিবাদে পা দোলাইতে লাগিল।

যে-কথাটা তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এইমাত্র বলিলাম, তাহার কোনো উত্তর পাইব মনে করিয়া কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম এবং শেষ পর্য্যন্ত যখন বুঝিলাম যে উত্তর পাওয়ার আশা করিয়া আমিই ভুল করিয়াছি, তখন নিশ্চিন্ত মনে আবার 'শেষের কবিতা'য় মনোযোগ দিলাম। যে-মেয়েটা মুখের উপর বসিয়া থাকিবে, অথচ একটাও কথা কহিবে না—এমন কি কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও জবাব দিব না, তাহাকে লইয়া কী করিব? তার চেয়ে কিটির ছাপার হরফের মুখরতাও ঢের ভাল লাগে।

একটু পরেই মেয়েদের লইয়া যাইবার জন্ত বাস্ আসিয়া পড়িল।

টুনু ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, আর দেরি নয়, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—খোকাদা', তোমার বাঁশী আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—তুমি বেশী দেরি কোরো না, ঠিক সময়েই যেয়ো কিন্তু, বরং একটা ট্যাক্সি করেই না হয়—ওমা, মিলাদি যে এখনো কাপড়-চোপড় বদ্‌লাওনি—

মিলা এতক্ষণ টেবিলের উপর লাল কালির দোয়াতটি উল্‌টাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে দু'টি হাত বেশ করিয়া রঙাইতেছিল; টুনুর তাড়াতেও তার কাজে বিশেষ কোনো অমনোযোগ দেখা গেল না। কেবল মুখ তুলিয়া একবার বলিল, আমি যাবো না, গাড়ী আমার জন্তে যেন দেরি না করে।

এবার টুনুর রাগ দেখে কে! তাহার মুখে কথার খৈ ফুটিতে শুরু করিয়াছে,—এসব তামাসা করার কী দরকার ছিল? আগে থাক্‌তে বল্‌লেই হোতো—যত সব ইয়ে—মুখ দেখানো যাবে না—ফাংশনটা মাটি হ'য়ে গ্যালো—এত কষ্ট ক'রে কেন আর তা'লে কাপড়-চোপড় বদ্‌লে এলাম—কতকগুলো স্নো আর পাউডার অনর্থক বাজে খরচ হোলো—ইত্যাদি।

বাইরে বাস্-চালকের ঘন ঘন হর্ণ, আর ঘরের ভেতরে বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রাভিনয়,—কোন্ দিকের তাল সাম্‌লাই ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া অগত্যা টেবিলের উপরকার খানিকটা লাল কালি মিলার গালে ও মুখে বেশ করিয়া মাখাইয়া দিয়া বলিলাম, খুব হ'য়েচে, এবার লক্ষ্মী মেয়েটির মতো তাড়াতাড়ি ক'রে গাড়িতে ওঠো গে, আমি এখুনি যাচ্ছি।

মিলা হাস্যস্ফুরিত গণ্ডে শাড়ির আঁচল ঘষিতে ঘষিতে বলে, ভাগ্যিস্ এত তাড়াতাড়িই রাজি হলেন, আর দু'মিনিট দেরি কর্‌লেই হয়তো আমাকে চ'লে যেতে হোতো। না গিয়ে সত্যি তো আর পার্‌তুম না। আপ্‌নি ভারি বোকা—

মিলা ও টুনু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গ্যালো।

মনে মনে বলিলাম, বোকা না হইয়া কী আর করি বলো! যেহেতু তিন বছর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির মতো তোমার দুর্ব্বোধ্য মস্তিষ্কটি পাঠ করিয়াও কোনো কূলকিনারা করিতে পারিলাম না, তখন কেহ বুদ্ধির অভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত বা স্পষ্ট কথা বলিলে রাগ করি কেমন করিয়া?

একটা খয়েরী খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে চড়াইয়া ওভারটুন্ হল্-এর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাগে তখন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে। সবাই যেন আমাকে ছেলেমানুষ পাইয়াছে! আমি বোকা! আমি কিছু বুঝি না—আমার সব তাতেই ঠাট্টা!—আচ্ছা, বেশ।

সদর দরজা ছাড়িয়া অনেকখানি চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার হন্ হন্ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বরাবর মা'র কাছে গিয়া হাজির হইলাম। কোনো ভূমিকা না করিয়াই বলিয়া, চলিলাম, বুঝ্‌লে মা, আজ্‌কে ফাগুনের তেরোই, এমাসে আর মাত্র দু'টো তারিখ আছে—উনিশে আর চব্বিশে; উনিশে যদি একান্তই না হয়, চব্বিশে তারিখে আমার বিয়ে হওয়া চাই-ই। যেখান থেকেই হোক, এর ভেতরে ক'নে যোগাড় কর্‌তেই হ'বে, ব'লে দিলুম।

তা না হ'লে কিন্তু আমি সন্ন্যিসী হ'য়ে বেরিয়ে যাবো—

মা হাতের কাজ ফেলিয়া অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া থাকিবারই কথা বটে। যে-ছেলের ঝুনো বাঁশের-মতো ঘাড়টিকে কোনোদিন তিনি সাধ্যসাধনা করিয়াও বিবাহের নামে নোয়াইতে পারেন নাই, আজ হঠাৎ তাহা আপনা হইতেই নুইয়া পড়িল,—ইহা মা'র কাছে কম আশ্চর্য্যের কথা নয়।

যাহা হোক্, মা খুব খুশীই হইলেন। বলিলেন, সে কি একটা খুব বেশি কথা হ'লো রে খোকা? আমি আজ তোর মুখের কথা পেলে, কালই তোকে বিয়ে করিয়ে একটি টুক্‌টুকে বউ ঘরে আন্‌তে পারি —তা জানিস্? এতদিন তোর অমত ছিল বলেই তো আমার সে-সাধ পূর্ণ হয় নি—

বাধা দিয়াই বলিলাম, সাধ-টাধ আমি বুঝিনে, এই ফাগুনে আমাকে বিয়ে করাতে হবে, ব্যস্।

মা হাসিয়া বলিলেন, শোন একবার আমার পাগ্‌লা ছেলের কথা! বিয়ে যেন এতদিন আমিই ইচ্ছে ক'রে ওকে দিই নি। হ্যাঁরে খোকা, আমাদের টুনুকে বিয়ে কর্‌বি? ওর মা একদিন কথায় কথায় আমার কাণে কথাটা তুলেছিল।

আমিও এবার না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথাটা হাসিবারই বটে। টুনুকে বউ কল্পনা করিলে, আর যাই হোক্—হাসিটা কিছুতেই থামাইয়া রাখা যায় না। বলিলাম, তবেই হয়েছে, টুনটুনি পুষ্‌তে গিয়ে এখন ঘরের ভেতর পাখীর বাসা করি আর কি! যাক্, আমি এখন চল্‌লুম—

•

পথ চলিতে চলিতে মা'র কথাটাই আমার বার বার মনে হইতে লাগিল। কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু উড়িয়া গেল বলিয়া তো মনে হইতেছে না। কথাটা এরকম ভাবে ভাবিয়া দেখি নাই বলিয়াই হয়তো, ভাবিতে মন্দ লাগিতেছে না।

ওভারট্যুন্ হল্-এ গিয়া যত মনোযোগ দিয়া বাঁশী না বাজাইলাম, তার চেয়ে বেশী মনোযোগ দিয়া টুনুর সঙ্গীত ও অভিনয় শুনিলাম। নাঃ, মোটের উপর আমাদের টুনু মেয়ে এমন কিছু মন্দ নয়। না হয় অঙ্কে ওর মাথা একটু কমই খেলে, তা বলিয়া বেচারি কী আর করিবে? সকলের মাথা সব দিকে সমান খেলে না।

বাড়ী ফিরিবার সময় মিলাকে শুনাইয়াই টুনুকে বলিলাম, ইস্কুলের গাড়ীতে তোকে আর বাড়ী ফির্‌তে হবে না, আমার সঙ্গেই চল্, ট্রামে যাওয়া যাবে'খন—

কিন্তু টুনুটা এমনি বোকা, ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, মিলাদিও চলো না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।

• •

বাড়ী ফিরিয়া আহারাদির পর মাকে বলিলাম, জানলে মা, টুনুটা একেবারে বোকা, আর অঙ্ক জিনিষটা ওর মাথায় কোনোমতেই ঢোকে না। এজন্যেই তো ওকে আমার ভালো লাগে না—

মা তো হাসিয়াই খুন! বলেন, তোর মাথা খারাপ হয়েছে খোকা। টুনু আঁক ক'ষে তোকে স্বর্গে তুলে দেবে নাকি? —আর বোকা? আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি, তোর চেয়ে টুনু ঢের চালাক। টুনুর মতো লক্ষ্মী মেয়ে আজকাল খুব বেশী বড়ো দেখা যায় না। আঃ, ওর মা যে তাহ'লে কী খুশীই হবে—

আচ্ছা, রাখো রাখো তোমার খুশী এখন চাপা দিয়ে। কাল সকালে টুনুকে একবার ডেকে দিয়ো তো, আমি শুতে চল্‌লুম—রাত ঢের হয়েচে। বলিয়াই প্রস্থান।

কিন্তু রাত ঢের হইলে কি হইবে?—ঘুম সেদিন মোটেই ভালো হইল না। মিলার কথা যতবার মনে হইয়াছে, ততবারই ওই দুর্ম্মুখ মেয়েটাকে জব্দ করিবার নানা রকম ফন্দি আঁটিতে গিয়া আমার চোখের ঘুম ও মনের সোয়াস্তিকে দেশ-ছাড়া করিয়াছি। মা আর টুনু ছাড়া সমস্ত মেয়ে জাতটার উপর আমার সে কী রাগ! এক কড়া বুদ্ধির পুঁজিও না লইয়া কেমন করিয়া পুরুষানুক্রমে তাহারা বুদ্ধিমান পুরুষ জাতটাকে ভাঙাইয়া খাইয়া আসিয়াছে এবং ঘোল খাওয়াইয়াছে, সেকথা ভাবিতে বসিলে শোপেন্‌হাওয়ার প্রমুখ জগতের দুঃখবাদীদের উপর ভক্তি চটিয়া যায়।...কিন্তু আমাদের টুনু! আমি হলপ্ করিয়া বলিতে পারি, সে যদি

বৈদিক যুগে জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে আজ এ-যুগে, খনা-লীলাবতী-গার্গী-প্রমুখ দেবীগণের সঙ্গে তাহারো একই আসন নির্দ্দিষ্ট হইত। কিন্তু বৈদিক-যুগে জন্মগ্রহণ না করিয়া টুনু খুব ভালো কাজই করিয়াছে; আমি তাহা হইলে আজ টুনুকে কোথায় পাইতাম?

যাক্, এখন 'শুভস্য শীঘ্রম্' করিয়া কাল সকালে ভালোয় ভালোয় টুনুকে কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচি। বিশ্বাস তো নাই কিছু, যে-রকম মেয়ে, হয়তো একটা কাণ্ডই করিয়া বসিবে। হয়তো বা হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িয়া বলিবে, খোকাদা'র সঙ্গে কিনা—হি-হি-হি—

কথাটা কেমন করিয়া পাড়িলে একেকটুটা সুবিধাজনক এবং অনুকূল হইবে, তাহারই একটা প্লান্ করিতে লাগিয়া গেলাম।

সকাল বেলা দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া টুনু হাঁক্ দিল, আমায় নাকি ডেকেছো খোকাদা'? জ্যেঠাইমা বলে পাঠালেন।

সুমুখের চেয়ারটা দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, বোস্, কথা আছে। যা যা জিজ্ঞেস্ কোর্‌বো, ঠিক ঠিক উত্তর দিবি—

বুকটা একটু দুরুদুরু করিয়া উঠিল নাকি?—বেশি রকম ঘাম সুরু হইল যে! না, ওসব কিছু নয়। কোনো কিছুতে ঘাব্‌ড়াইয়া যাইবার ছেলে আমি নই, সে-কথা দেশ-ভরা লোক জানে! যাক্—

টুনু হাসিয়া বলিল, তোমার থিওরেম্ কিন্তু আমার এখনো মুখস্থ হয় নি, সে-কথা আগে থাক্‌তেই বলে' রাখ্‌লুম।

সে-কথায় কাণ না দিয়া বলি, তোর এবার থার্ড ক্লাশ্ নয়?—ম্যাট্রিক দিতে আরো তিন বছর দেরী আছে তো?

টুনু বলিল, হ্যাঁ, যদি কি বছর পাশ কর্‌তে পারি।

মিলা বুঝি এবার ম্যাট্রিক দেবে—না?

হ্যাঁ। কী সব বাজে কথা জিগ্যেস্ কর্‌তে ডেকে আন্‌লে তুমি। তার চেয়ে একটা তাসের বাজি দেখিয়ে দাও না খোকাদা'—

থাম্ থাম্, সবতাতেই অস্থিরপনা। তারপর, ইংরেজিতে দু'চারটে কথা বল্‌তে পারিস্ তো? এই ধর্, আমি যদি জিগ্যেস্ করি—'হাউ মেনি বয়েজ্ ইন্ ইয়র্ ক্লাশ?—তা'হলে' কী জবাব দিবি?

টুনু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, বল্‌বো যে আমাদের ক্লাশে একটিও 'বয়' নেই—কিন্তু তোমার কী হ'য়েছে আজ সকালবেলা, বল দেখি খোকাদা'?

টুনুর কাছে অপ্রতিভ হওয়ার কোনোই কারণ নাই। তাই জিব্ না কাটিয়াই বলিলাম, ওহো 'বয়েজ' বলে ফেলেছি বুঝি, তা যাক্—ও-কথার আর জবাব দিতে হবে না। তুই বাইকে চড়্‌তে জানিস্?

টুনুর হাসি এবার আর কিছুতেই থামে না। তবু কোনো মতে বলে, তোমার বউকে—হি-হি-হি—বাইকে চড়্‌তে শিখিও—হি-হি-হি—নয়তো ঘোড়ায়। উঃ, বাব্বা, হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল্ ধ'রে গ্যালো।

যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাই। মেয়েটার যদি একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি থাকিত! সব তা'তেই ঠাট্টা! জিয়োমেট্রির থিওরেম্ যেন! কিন্তু কথাটা যে আমাকে বলিতেই হইবে এবং তার মানেটাও ওর মগজ অবধি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে!...মিলার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে না পারি তো—

মনে মনে একটা দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম এবং দেহে-মনে অনেকটা বল পাইলাম। খুব রাগ দেখাইয়া ঝাঁঝালো গলায় বলিলাম, ফের যদি ও-রকম অসভ্যের মতো হি-হি ক'রে হাসো, তাহ'লে কাণ মলে' লাল ক'রে দোব বলে দিচ্ছি। এতখানি ঢ্যাঙা মেয়ে হয়েচেন, একটুখানি সিরিয়াস্ হ'তে শিখ্‌লেন না—

ডাগর দু'টি কালো চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া টুনু এবার হঠাৎ মুখখানি শাওন আকাশের মতো অন্ধকার করিয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত্তে চোখ ছলছল্ করিয়া উঠিল, এবং পরবর্ত্তী টেকে কখন্ আসিয়া পড়ে—এ-ভয়ে আমি দস্তুরমতো ভড়্‌কাইয়া গেলাম। মাত্রাটা একটু বেশি হইয়া গেল নাকি?

একখানি হাত ধরিয়া সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, বোকা আর কি! আমি সত্যি কি আর রাগ করলাম?

তারপর চেয়ারটা একটু কাছে টানিয়া নিয়া,—আমি বলছিলুম কি, মা ভয়ানক পীড়াপীড়ি সুরু করেচেন, এই ফাগুন মাসেই—

টুনু খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল, ও, সেই বেলঘরিয়ার—

আরে না—না। মা বলছিলেন, এই ফাগুন মাসেই বিয়েটা যাতে—

এবার টুনুর পক্ষে চেয়ারের মতো নিরাপদ জায়গায় বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত তালি সহযোগে চীৎকার করিয়া উঠিল, হুর্-র্-রে, খোকাদা'র বিয়ে! বেশ বেশ, শীগ্‌গির করে—

হাঁ্যা, মাসিমারও নাকি অমত নেই, মাকে তিনি বলেচেন—

টুনু গর্ গর্ করিয়া বলিয়া চলিল, অমত আমারো নেই, কারই বা থাকে? পেট পুরে নেমন্তন্ন খাবো'খন, আর নতুন বউএর সঙ্গে—

কিন্তু তোর সঙ্গেই যে বিয়ের কথা হচ্ছিল—

'ধ্যৎ' কিম্বা ওই ধরণের একটা কিছু মন্তব্য করিয়া পলাইয়া যাইতে পারে আশঙ্কা করিয়া, আগে হইতেই চাণক্য শ্লোক অনুসারে টুনুর একখানি হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। কাজেই চেষ্টা সত্ত্বেও পলাইবার সুবিধা হইল না। কিন্তু চপলতা ওর এক মুহূর্ত্তেই ঘুচিয়া গ্যালো। ঠাট্টা করিতেছি মনে করিয়া হয়তো প্রথমে ওর চোখে একটুখানি অবিশ্বাসের ছায়া পড়িয়াছিল, আমার চোখের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হইতেই তাহা মিলাইয়া গ্যালো এবং অমন দুরন্ত মেয়ের মস্তকটিও কচি পুঁয়ের ডগাটির মতো নুইয়া পড়িল।

ওর হাত ছাড়িয়া দিয়া পিঠের ওপর একখানা হাত রাখিয়া বলিলাম, মা তাহলে সত্যি খুব খুশী হবেন, টুনু, মাসিমাও। শুধু তুমি যদি—

টুনুকে তুমি বলিতে গিয়া হঠাৎ এমন অদ্ভুত শোনাইল যে, নিজেই একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। হাসিও পাইয়াছিল। কাজেই, টুনুর সম্মতি পাইলে আমিও যে খুসী হইব, সে কথাটা আর বলা হইল না। টুনু কিন্তু একবার আমার মুখের দিকে ক্ষণিকের জন্য চাহিয়া, আরক্ত মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গ্যালো।

আর বাধা দিলাম না। একটুখানি নার্ভাস্ হইয়া পড়িয়াছিলাম হয়তো। কিন্তু সে কথা যাক্,··কাজ যে উদ্ধার হইয়াছে—তা' আর বুঝিতে বাকী ছিল না আমার। বহু উপন্যাস গল্পে এরকম লক্ষণ আশাজনক হইয়াছে দেখিয়াছি। সেই কথায় বলে, মৌনং—ইত্যাদি।

অবাক কাণ্ড আর কি!

আজ তিন দিন ধরিয়া টুনুর টিকিটিরও দর্শন মিলিল না। অমন মুখরা আর দুরন্ত মেয়ের পক্ষে যে একেবারে দম্ আটকাইয়া মরিবার কথা। কেমন করিয়া এমন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইল, তাহাই ভাবি। ভাবিতে ভালোই লাগে। হাসিও পায় এই বলিয়া যে, টুনুও শেষ কালে আমাকে লজ্জা করিতে শিখিল!

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

টুনুকে লইয়া সংসার পাতাইবার খস্‌ড়া তৈয়ার করিতে থাকি।—

সব উপরের তলার ঘরখানা থাকিবে আমাদের। তাতে টুনু আর আমি, আমি আর টুনু। দক্ষিণের বারান্দার দুই কিনারে গুটিকয়েক ফুলগাছের টব্ থাকিবে—বেশির ভাগই বেলফুল। বর্ষা আসিতেই যেন ফুল ধরিতে সুরু হয়। তা ছাড়া কয়েকটা জাপানী 'বামন গাছ'ও থাকিতে পারে চীনা মাটির টবে। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই থাকিবে না। কেবল চারদিকের দেয়ালে রুবেন্স, কন্‌সটেব্‌ল, ল্যাণ্ডসিয়ার, গেন্‌স্‌বারো প্রভৃতি ওস্তাদ শিল্পিদের চিত্র-প্রতিলিপি কয়েকখানা থাকিলে মন্দ হয় না।

ছোট্ট নিরিবিলি সংসার। কোনো কোলাহল ঝঞ্ঝাট নাই। সেখানে সারাদিন ধরিয়া টুনুকে আমি জিয়োমেট্রি শিখাইব—কারণ টুনু ভালো অঙ্ক না জানিলে আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করিবে। আমার টুনু কোনো বিষয়েই মিলার

চাইতে কম থাকিবে না। মাত্র তিনটি বছর তো—তা টুনুও তখন ম্যাট্রিক পাশ করিবে। তারপর কলেজে—

খুট্ করিয়া দরজা খুলিবার শব্দে মনটা আপনিই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু চাহিয়া দেখি, সেই পাজি মেয়েটা—নাম করিতেও গা জলিয়া যায়—মিলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মিটিমিটি হাসিতেছে। গাল দু'টিতে তেমনি দুটি ছোট্ট টোল পড়িয়াছে; ইচ্ছা করে সে দিনের মত দুই হাতে লাল কালি চুবাইয়া ওর গালে মাখাইয়া দিই।

দুরন্ত আক্রোশে ফুলিতেছিলাম, তাই কিছু না বলিয়া মনোযোগ সহকারে টেবিলের উপরকার একটা পুরাণো চিঠি দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু মেয়েটা এমনি বেহায়া যে, আমার কাছে আসিয়া অনায়াসে দুই হাতে আমার মুখটা তুলিয়া তাহার দিকে ফিরাইয়া দিল এবং নিঃসঙ্কোচে দু'টি ডাগর চোখের ধারালো দৃষ্টি ষ্টিমারের সার্চ্চ লাইটের মতো আমার চোখের উপর ফেলিয়া সমস্ত অন্তরটার আনাচ কানাচ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

এমন বিপদেও মানুষে পড়ে। আমি হলপ্ করিয়া বলিতেছি—মিলার উপর রাগ আমার তখনো পুরা মাত্রায়। কিন্তু কি করিব, হাতের কাছে লাল কালির দোয়াতটা পর্য্যন্ত ছিল না।

দস্তুরমতো মেজাজ দেখাইয়া বলিলাম, এ সব কী হচ্ছে মিলা?—সব সময়ে ইয়ে ভাল লাগে না বলে দিচ্ছি।

মিলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসি তো নয়, যেন জলতরঙ্গ বাজনা!—কিছুতেই আর থামিতে চায় না। ওর ধারণা, কোনো কিছুতেই আমার যেন রাগ হইতে পারে না।

কিন্তু রাগটা দেখাই কেমন করিয়া? অতো বড়ো ধিঙ্গি মেয়ের গায়ে শেষটায় হাত তুলিতে হইবে নাকি?

হাত কিন্তু তুলিতে হইল না, আমারই হাত দুইটা মিলা দুই হাতে তুলিয়া লইয়া যাহা করিতে লাগিল, তাহা আর 'কহতব্য' নয়! আপনারা কেহ সুমুখে থাকিলে আমার হাত দুইটার হাল দেখিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না।

আমার কিন্তু তখন চোখে জলও ছিল না, মুখে হাসিও ছিল না। আমার আসল গোলমালটা লাগিয়াছিল, অন্তরের মধ্যে। সেখানে টুনু আর মিলাতে মিলিয়া প্রচণ্ড সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেছে!

কিছুক্ষণ পরে মিলা যখন মুখখানা শাওন-আকাশের মতো অন্ধকার করিয়া শুধাইল, টুনুকে আমি বিবাহ করিব বলিয়া সম্প্রতি যে একটা গুজব রটিয়াছে এবং টুনুও যাহা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে, তাহার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে—আমি তখন হঠাৎ অনুভব করিয়া ফেলিলাম যে, অন্তরলোকের সেই দ্বন্দ্বটাও যেন আপনা হইতেই মিলাইয়া গ্যালো!

টুনু যে কেবল অনুকম্পাই পাইবার উপযুক্ত সেকথা কে না বলিবে?

সুতরাং মিলার কথায় দস্তুরমতো সপ্রতিভভাবে জবাব দিয়া ফেলিলাম,—রাঃ—মোঃ! টুনুকে বিয়ে?—

বাকিটা একটা উচ্চ হাসিতে প্রমাণ করিয়া দিলাম যে, তার চেয়ে জীবনে আর বড়ো ট্রাজিডি কী হইতে পারে?

মিলা হাসিমুখে চলিয়া গ্যালো। ওর চলার ছন্দ দেখিয়াই বুঝি, ওর মনে খুশীর জোয়ার আসিয়াছে, দেহেও। এই মাত্র যেন ও সমস্ত পৃথিবীটা জয় করিয়া লইয়া গ্যালো!

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বলি-বলি করিয়াও ওকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না! কে জানে, ভুল বুঝিলাম কিনা? মেয়েটার সবই অদ্ভুত—ওর কোনো কিছুতেই হঠাৎ কোনো মতামত প্রকাশ করিতে ভরসা হয় না!

কথাটা তো ঠিকই।

টুনুকে কে না ভালো মেয়ে বলিবে? চমৎকার মেয়ে—এক কথায় সুপারফাইন্! তামাসা করিল কিন্তু মন্দ নয়। ভাবিলেও পেটের ভিতরে হাসির ফোয়ারা ঘোলাইয়া ওঠে। কবে আমি একটু ঠাট্টা করিয়া কি বলিয়াছিলাম, তাহাকে মস্ত একটা সিরিয়াস্ ব্যাপার ধরিয়া লইয়া কী কাণ্ডটাই না করিয়া বসিল!—এতদিনে সে একবারো আমাকে তাহার মুখটা দেখাইতে পর্য্যন্ত পারিল না? টিপিক্যাল্ বাঙালি

মেয়ে! গল্প উপন্যাসে ইহাদের লইয়া অতি সহজে রোমান্স্ সৃষ্টি করা চলে।

যাক্, ঢের হইয়াছে। এবার কিন্তু ঘরের কোণ হইতে টুনুকে টানিয়া বাহিরে না আনিলেই নয়। টুনু না হইলে একটুও জমে না। দিনরাত আমার সঙ্গে ঝগ্ড়া করিবে কে? আমি রাগ করিলে, হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার সাহস তো কেবল টুনুরই আছে!

টুনুকে আবিষ্কার করিতে কিন্তু যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। বাড়িতে আমার সাড়া পাইয়াই সে এমন ভাবে এ-ঘর ও-ঘর ছুটাছুটি করিতে লাগিল যে, শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা।

তবু টুনুকে বাহির করিলাম। কিন্তু আসল বিপদ একটুও কাটে না। টুনু এমন করিয়া মুখ নীচু করিয়া থাকে যে, নববর্ষার নিবিড় মেঘস্তূপের মতো এক-মাথা কালোচুলের আড়াল হইতে ওর মুখখানা আবিষ্কার করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

অগত্যা আগের মতো সহজ সুরে বলি, পড়াশুনা একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েচো তো?—

কি জানি, টুনুকে 'তুমি' বলিতে আজ আর তেমন লজ্জা করিল না, কিম্বা সেদিনের মতো পেটের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ঘোলাইয়া উঠিল না। বরং কোনোদিন যে 'তুমি' ছাড়া অন্য কিছু সম্বোধন করিয়াছি—সেকথা ভাবিতেও মনটা কি রকম খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। বুঝিলাম, এ অসোয়াস্তির কিছুটা টুনু আমার মগজে ঢুকাইয়া দিয়াছে এ-কয়দিনের একটা মিথ্যা-অর্থপূর্ণ অন্তর্দ্ধানে এবং আমি নিজেই কিছুটা অর্জ্জন করিয়াছি নিজের অসুস্থ-মনের বিলাসিতায়—বিলাসিতায়ও নয়, নিতান্ত ছেলেমানুষীতে! এই টুনুকেই কতদিন পড়া বলিয়া দিতে গিয়া কাণ মলিয়া দিয়াছি, অথচ আজ শুধু তুচ্ছ (শব্দটি তুচ্ছার্থে ব্যবহার করি নাই!) চুলের গুচ্ছ কয়টি সরাইয়া দিয়া তার মুখখানা তুলিয়া ধরিতে হাত উঠিল না।

কথার জবাব না পাইয়া আবার বলিলাম, কী, জবাবই যে দাও না বড়ো, যা শিখেছিলে—এ ক'দিনে সব ভুলেচ তো?

টুনু মাথা নাড়িয়া জবাব দেয়—ভুলিয়াছে। মাথা নাড়িবার সপ্রতিভ ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, বেশ যত্ন করিয়াই যেন সব ভুলিয়াছে! আপনারাই বলুন, এমন মেয়ের ভবিষ্যৎ যে একেবারেই তিমিরাবৃত, সেকথার মধ্যে মিথ্যা উক্তি আছে কি?

একটু রাগ হইল, ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে শুধাইলাম, তার মানে? পড়াশুনা কি ছেড়ে দিলে?

টুনু এইবার মুখ তুলিয়া ক্ষিপ্রতাসহকারে দুই হাতে চুলের গুচ্ছ পিঠের দিকে সরাইয়া দেয়। তারপর সে এক কাণ্ড!—বিদ্যুতের মতো চঞ্চল ধারালো একটি দৃষ্টি আমার চোখের উপর ফেলিয়াই বন-হরিণীর মতো আমার সুমুখ হইতে ছুট্ দিল এবং দরজার চৌকাঠ মাড়াইবার সময় বলিয়া গ্যালো,—পড়াশুনা আবার নতুন ক'রে সুরু কর্‌বো ভাব্‌চি, কিন্তু উনিশে কি চব্বিশে ফাগুন, সেইটেই যা' একটু—

আর শোনা গ্যালো না।

এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।—একটা খট্‌কা মনের মধ্যে লাগিয়াই রহিল, টুনু কি সত্যই বোকা? মা কিন্তু বলিয়াছিলেন, টুনু আমার চেয়েও নাকি ঢের চালাক—

মিলার কথাই হয় তো ঠিক, আমি বোকা! আমার চেয়ে সকলেই বেশি বুদ্ধিমান আর ঢের চালাক!

কে জানে?

জানিতে কিন্তু দু'দিনের বেশি অপেক্ষা করিতে হইল না। দু'দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি, সদর-দরজায় তালা-পরানো রহিয়াছে। বিস্মিত হইবার অবকাশ জুটিল না। পাশের বাড়ি হইতে টুনুর ছোট ভাই মন্টু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, অ খোকাদা, জ্যেঠাই-মা আমাদের বাড়ি রয়েচেন যে। তুমিও এসো না,—আজ দিদির পাকা-দেখা—তা জানো তো?

একমুখ হাসিয়াই বলিলাম, তা আর জানিনে? তা তুমি মা'র কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে এসো গে। আমি এখন তোমাদের ওখানে গেলে ঠাট্টা কর্‌বে।

কি বুঝিয়া মন্টু চলিয়া গেলো।

মনে মনে বলিলাম, মা'র কিন্তু এটা দস্তুরমতো অন্যায় হইয়াছে। আমাকে এ-বিষয়ে পূর্ব্বেই জানানো উচিৎ ছিলো। মিলার কাছে আর মুখ দেখানো যাইবে না—

মন্টুর বদলে মা-ই চাবি লইয়া আসিলেন। ভিতরে ঢুকিয়াই মা বলিলেন, আমিও তোর বিয়ে এই ফাগুনের মধ্যেই দোব,—এই আমার জেদ। টুনুর চেয়ে ভালো মেয়ে কি আর দুনিয়ায় মেলে না? তা' ছাড়া—

আর বেশি শুনিবার প্রয়োজন ছিল না; এতক্ষণে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা মগজে ঢুকিল। বলিলাম, টুনুর কোথায় সম্বন্ধ হলো?

ওই বেলগাছিয়ায়, না কোথায়; ছেলে দেড়-শো টাকা পায়,—ওই লাভেই তো—। ভালোই হলো, মিলার সঙ্গে টুনুর ভাব ছিল,—পড়েছেও একই বাড়িতে। টুনুর জা হবে মিলা—

বলিলাম, ও।

মা বলিয়া চলিলেন, তোর ছোট-মামাকে আজ চিঠি দিয়েছি, তোর জন্যে একটি সুন্দরী মেয়ে দেখ্‌তে—এই ফাগুনেই যাতে বিয়ে হতে পারে।

সটান পড়ার ঘরে চলিয়া গেলাম। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বের আকাশে গুটি তিনেক তারা উঠিয়াছে, তারই তলে প্রকাণ্ড থালার মতো চাঁদ। বড়ো জোর এই সামান্য পুঁজি লইয়া কবিতা লেখা চলিতে পারে; কিন্তু কবিতা লিখিয়াই বা কি হইবে?

মাঝি

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

রে মাঝি, আজি মোরে ও-পারে নিয়ে চল্
আকুল সাঁঝে আজি
কাঁদিছে বনরাজি
গিরির চোখে ঝরে করুণ আঁখিজল,
রে মাঝি আজি মোরে ও-পারে নিয়ে চল্।
আঁধারে ঘন শোকে ডুবিছে ধরাতল
চপলা চমকিছে
সমীর শিহরিছে
গভীর গরজিছে গগনে মেঘদল
রে মাঝি, আজি মোরে ও-পারে নিয়ে চল্।
পথের মাঝে আজি হয়েছি হীনবল
লহরী সেনাগুলি
হাঁকিছে মাথা তুলি
ফুলিয়া উঠে রাগে সেনানী কালো জল,
রে মাঝি আজি মোরে ও-পারে নিয়ে চল্।
জ্বেলে দে' বুকে আজি অযুত দাবানল
মুছে দে ভীতি-ব্যথা
দৈন্য কাতরতা
এনে দে ফুলরাশি শিশিরে ঝলমল্
রে মাঝি, আজি মোরে ও-পারে নিয়ে চল্।

ধ্বনি

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

আমার হৃদয়ে লাগে ধরিত্রীর হৃদয় স্পন্দন।
ঐ শ্যাম বনানীর শ্যামল নন্দন
যেথা পাতিয়াছে আজি শ্যামল অঞ্চল,
বায়ু যেথা হিন্দোল চঞ্চল
বাঁধিয়াছে বনশাখা শিরে
ধীরে ধীরে ধীরে,
চিত্ত মোর দোলে আর খোলে সব মিথ্যার বন্ধন ;
আমার হৃদয়ে লাগে ধরিত্রীর হৃদয় স্পন্দন !

ঐ যেথা গাহে পাখী
নাচাইয়া পুচ্ছটিরে ওঠে ডাকি ডাকি,
কাঁপাইয়া ডানা দুটি ঐ যেথা পতঙ্গ শিহরে
গুঞ্জরিয়া প্রাণসাথী তরে,
সর্ব্ব প্রাণ জগতের সর্ব্বস্তর ধ্বনি
আমার হৃদয় তারে বারম্বার উঠিছে রণনি'
কাঁদাইয়া মুক্তির ক্রন্দন ;
আজি মোর বুকে লাগে ধরিত্রীর হৃদয় স্পন্দন।

ঐ যেথা দিগন্তের তীরে
অনন্তের সুগম্ভীর ধ্যানের তিমিরে
স্তিমিতচেতন যোগী নীল গিরিমালা
তপাসনে একান্ত নিরালা,
সন্ধ্যায় ঊষায়
শুভ্র লঘু মেঘদল সাজায় ভূষায়,
ওরা মোর বক্ষপটে বার বার লেপে যায় পবিত্র চন্দন।
আমার হৃদয়ে লাগে ধরিত্রীর হৃদয় স্পন্দন !

ঐ যেথা গিরিতললীনা
স্বচ্ছতোয়া নদীধারা বাজাইছে উচ্ছ্বসিত বীণা,
দ্রুত পদ সঞ্চালনে চলে অভিসারে,
উপলে উপলে বারে বারে
প্রতিহত গতি
অন্ধ প্রেমে অতি বেগবতী,
তারি গান দিনমান ঝঙ্কারিছে দয়িতের গভীর বন্দন।
আমার হৃদয়ে লাগে ধরিত্রীর হৃদয় স্পন্দন।

আমেরিকার জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণ সমিতি

ডাঃ শ্রীশরৎচন্দ্র মুখার্জী

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কক্ (Koch) যখন তার বিশ্ব বিখ্যাত যক্ষ্মা জীবাণু আবিষ্কার করেন, তখন পৃথিবীর নানা যায়গায় একটা নূতন সাড়া প'ড়েছিল। এর আগে কেউ জান্‌ত না যে কেমন ক'রে যক্ষ্মা রোগ হয়। কিন্তু কক্ যখন দেখিয়ে দিলেন যে যক্ষ্মারোগীর থুথু থেকে যক্ষ্মাবীজ নিয়ে অন্য সুস্থ প্রাণীকে যক্ষ্মা রোগ দেওয়া যায় এবং মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে যক্ষ্মাবীজ দেখাও যায়, তখন অনেকের প্রাণে একটা ভরসা এসেছিল যে, তা'হলে চেষ্টা কর্‌লে, যক্ষ্মার বিস্তৃতি খানিকটা —এবং সময়ে হয়ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হবে। এই আবিষ্কারটি এযুগের একটা মহৎ আবিষ্কার সে-বিষয়ে কারও সন্দেহ নাই। ককের আবিষ্কারের পর অনেকে অনেক গবেষণা ক'রেছেন—এবং এখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে সত্যই যক্ষ্মাবীজ যতক্ষণ সংস্পর্শে না আসে ততক্ষণ যক্ষ্মারোগ হ'তে পারে না। তাই তখন সকলে আশ্বস্ত হ'লো যে, তাহ'লে যেমন উপায়ে সম্ভব যত যক্ষ্মারোগী আছে, তাদের যদি সুস্থ লোকের সংস্পর্শে আস্‌তে দেওয়া না হয় তবে যক্ষ্মা-বীজ ছড়াতে পারবে না এবং ক্রমশঃ যক্ষ্মা মৃত্যু সংখ্যা অনেক ক'মে যাবে।

যক্ষ্মা নিবারণের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখ্‌তে গেলে একখানা বড় বই লেখা যায়। কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, এর সামান্য একটু আভাস দেওয়া মাত্র। আমেরিকার (জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণ সমিতির National Tuberculosis Association) কথা লিখ্‌তে গেলে নিউ ইয়র্কের ডাক্তার বিগ্‌স্ (Dr. Biggs) এর নাম উল্লেখ না করা অসম্ভব। ককের আবিষ্কারের অল্পদিনের মধ্যেই এঁরই চেষ্টায় নিউ-ইয়র্কের যক্ষ্মা নিবারণী কাজ পুরামাত্রায় আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম অনেক ডাক্তার এসব কাজকে "অসম্ভব" ব'লে উৎসাহ দিতে রাজী হন নাই। কিন্তু বিগ্‌স্ তখন নিউ-ইয়র্ক সহরের হেল্‌থ্ কমিশনার, তাঁর হাতে ক্ষমতা খানিকটা ছিল। তিনি তাঁর দেশের লোককে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে যক্ষ্মা নিবারণ পুরা মাত্রায় না ক'রলে দেশের অকাল মৃত্যুর সংখ্যা কিছুতেই ক'মবে না। তখন যারা তাঁর বিরুদ্ধে তর্ক ক'রে কাজে বাধা দিতে চেয়েছিলেন তার পরে তারা অনেকেই সেজন্য লজ্জিত হয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যক্ষ্মা নিবারণী কাজের ফলে যক্ষ্মা মৃত্যুর হার এদেশ থেকে যেমন ক'মেছে, তাতে বিগ্‌স্ এর অদম্য উৎসাহকে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না। এখানে এদেশের যক্ষ্মা-মৃত্যুর হার তুলে দেখাচ্ছি, যে, বিগ্‌স্ কেমন মহৎ আদর্শ নিয়ে এদেশের যক্ষ্মামৃত্যু বন্ধ করার পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

১৮৯০ সালে আমেরিকার প্রতি লক্ষ লোক সংখ্যায় যক্ষ্মামৃত্যুর হার ছিল ২৪৫.৪। ডাক্তার বিগ্‌স্ এর অদম্য উৎসাহে ও চেষ্টায় ১৯০৪ সালে এই হার ক'মে লক্ষ প্রতি ২০০ হয়। এই সময়ে এদেশের জাতীয় যক্ষ্মা সমিতির সৃষ্টি হয়। জাতীয় অর্থে কেউ যেন মনে না করেন যে এদেশের সর্ব্বত্র—অথবা সব ষ্টেটে (মোট ৪৮ টি ষ্টেট্) প্রচারের কাজ তখন আরম্ভ হ'য়েছিল। নিউইয়র্ক, বষ্টন, ফিলা-ডেলফিয়া চিকাগো, ওয়াশিংটন এবং কেম্ব্রিজ (New york, Boston, Philadelphia, Chicago, Washington and Cambridge, Mass) মাত্র এই ৬টা সহরে যক্ষ্মা নিবারণের কাজ চল্‌ছিল। কিন্তু এই কয়েকটা সহরের প্রচারের ফল এত উদ্দীপনাজনক হ'য়েছিল যে এদেশের সর্ব্বত্রই একটা আশ্বাসের চিহ্ন ও উদ্যমের চেষ্টা দেখা গেল। এ উদ্যম যে কত কাজ ক'রেছে তা বোঝা যায় যখন আমরা এদেশের বর্ত্তমান যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির সংখ্যার দিকে তাকাই। ১৯৩১ সালে এদেশে

মোট ২০৪৮টি ছোট বড় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি পূর্ণ উদ্যমে কাজ ক'রেছে। সংখ্যা ক্রমশঃ আরও বাড়্ছে এবং আরও যে বাড়্বে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এতগুলি সমিতির যুক্ত উদ্যমে যক্ষ্মার ভীতি এদেশে অনেক ক'মেছে, এবং যক্ষ্মামৃত্যুহারও ক্রমশঃ নীচের দিকে যাচ্ছে। ১৯২৯ সালে মৃত্যুহার এসে লক্ষ প্রতি মাত্র ৭৬ জনে দাঁড়িয়েছে। ২৪৫ থেকে ৭৬ জনে কমান বড় কম কথা নয়!

অবশ্য এখানে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। যক্ষ্মা মৃত্যুহার কমার একমাত্র কারণ যে এই সব সমিতি, তা খুব অনায়াসে বলা চলে না। ১৮৯০ সালের সঙ্গে ১৯৩১ সালের তুলনা করতে গেলে অনেক বিষয়ের পার্থক্য দেখা যাবে সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাবিষয়ক, সাধারণ-স্বাস্থ্য-জ্ঞানবিষয়ক নানা রকম পরিবর্ত্তন যে এই ৪০ বছরে হয়েছে সে বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ হতে পারে না। ৪০ বছর আগেকার লোক আজকার মত এত সহজে অনেক কথা বুঝতে পারত না, এত সব নূতন নূতন আবিষ্কার তখন হয় নি। শরীর, স্বাস্থ্য, বা এমন কি অনেক নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ের জ্ঞান এখন তখনকার চেয়ে অত্যন্ত বেশী। সুতরাং হয়ত বা যদি এই সব যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির সৃষ্টি নাও হোত, তবুও যক্ষ্মা মৃত্যুর হার কম্‌ত। কিন্তু এটা বোধহয় খুব জোর গলায় বলা যেতে পারে যে এইসব সমিতির শিক্ষা, প্রচার ও চিকিৎসা প্রণালীর কাজ না হলে এত শীঘ্র মৃত্যুহার কখনও এত কম্‌ত না। অশিক্ষিত লোক আগে যেমনভাবে থুথু ফেল্‌ত, অবহেলায় নিজের যক্ষ্মাবীজ অপরকে দিয়ে দিত ও একবার যক্ষ্মা হলে "শিবের অসাধ্য" ব'লে শেষ দিনের আশায় দিন গণ্‌ত, এখনও হয়ত অনেকটা তাই ক'রত। কিন্তু আমার মনে হয়, এই সব সমিতির প্রচারের ফলে আজ এদেশের যক্ষ্মা রোগের চিন্তার ধারা পর্য্যন্ত বদ্‌লে গেছে। আজ এরা সহজে বুঝ্‌তে পারে যে যক্ষ্মা রোগ অনেকটা অন্য রোগেরই মত। সাবধান মত স্বাস্থ্য রক্ষা ক'রতে পারলে, উপযুক্ত খাবার, ভাল হাওয়া ও যথেষ্ট সূর্য্যালোক পেলে রোগকে চাপা দিয়ে স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়ে পাওয়া সম্ভব। তাই, এখন এদেশে যক্ষ্মা হ'লে তাড়াতাড়ি এরা উপযুক্ত স্যানিটোরিয়ামে যায়। উপযুক্ত খাবার খায়। অল্পদিনে আবার সুস্থশরীর নিয়ে সংসারের কাজে লেগে যায়।

আমার একটী বিশেষ বন্ধু বর্ত্তমানে এদের জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির প্রচারের কর্ত্তা। এঁকে এদেশে বলে ইনি হলেন যক্ষ্মা সমিতির "জন্মদাতা"। সমিতির জন্ম থেকেই ইনি—ডাঃ ফিলিপ জেকব্‌স্ (Dr. Philip P, Jacobs) এঁর সমস্ত সময় প্রচারের কাজেই দিয়ে আস্‌ছেন। কত লোক আস্‌ছে—কত যাচ্ছে—কত আবার আস্‌বে।" ডাঃ জেকব্‌স্ সেই পুরান কাল থেকে একান্ত মনে কাজ চালিয়ে নিজেকে ধন্য ও দেশকে যাগোপযোগী করার চেষ্টা ক'রছেন। আমি যখন বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "আপনারা এই যে বিস্তৃত আফিস ক'রে ব'সে আছেন, প্রচার ক'রছেন কখন?"

উত্তরে আমায় একটু লজ্জা দিয়েই বল্লেন—"সব সময় কি শারীরিক পরিশ্রম না ক'রতে দেখ্‌লে—কাজ করা হয় না ব'ল্‌তে হয়? তবে শোন, আমরা কি করি। আমরা বছরে ১০,০০০,০০০ খানার বেশী উপদেশপূর্ণ যক্ষ্মা নিবারণ পুস্তিকা বিতরণ করি। তাছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে প্রবন্ধ বছরে বহুবার লেখা হ'চ্ছে। রেডিওতে বক্তৃতা, মুখে বক্তৃতা, ছবিতে দেখান, চলচ্চিত্রে দেখান এ সবই হয়। এগুলো কি কাজ নয়?"

সত্যই এগুলো বড় ভাল কাজ। নিজেই একটু লজ্জিত হ'লাম। ক্ষণিকের জন্য ভুলেছিলাম যে এ হোল আমেরিকার কথা—ভারতের কথা নয়। বন্ধুবর একটু বেশী ক'রে বুঝাবার জন্য, তাঁর ডেস্ক্ (Desk) থেকে এক খানা বই খুলে দেখালেন এদেশের সংবাদ পত্রের সংখ্যা কত! একটু অবাক্ হ'য়েই পড়লাম।

যুক্তরাজ্যের দৈনিক সংবাদপত্র মোট—	২৯৯১টী
সাপ্তাহিক —মোট—	১৪,৩৩১টী
মাসিক—মোট—	৫,৫২৯টী
মোট সংখ্যা—	২২,৮৫১টী

জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি ধারাবাহিক রকমে এই

সব কাগজগুলোকে সময়োপযোগী প্রবন্ধ পাঠায়। এক সঙ্গে অনেকগুলো ছাপালে "একঘেয়ে" হ'য়ে যায়—তাই সময় বুঝে পাঠান হয়। তাছাড়া, লেখা ভাল হয় বলে কাগজ-ওয়ালারা সর্ব্বদা যক্ষ্মাপ্রবন্ধগুলি ছাপানর জন্ত উৎসুক হ'য়ে বসে থাকে। বন্ধুবর আমাকে আরও একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্তই বোধ হয় তার কয়েকটা প্রবন্ধ আমার সাম্‌নে খুলে ধ'রলেন। এদেশের লেখার দস্তুর এই যে প্রবন্ধ যদি খুব বেশী বড় হয়—বা অতিরিক্ত বাজে কথায় পূর্ণ হয় তবে লোকের পড়ার উৎসাহ ও ধৈর্য্য থাকে না। ভাল প্রবন্ধ লেখক তার প্রথম কয়েক লাইনের মধ্যেই বুঝিয়ে দেয় যে প্রবন্ধে কি ব'ল্‌তে যাচ্ছে। এতে পাঠকের উৎসাহ খুব বেড়ে যায়।

যক্ষ্মা নিবারণের কাজের জন্ত টাকা যথেষ্ট দরকার। কি ক'রে এরা এ টাকা তোলে সে এক বড় ইতিহাস। এরা যে ভাবে টাকা খরচ করে তা বোধ হয় আর কোনও দেশে সম্ভব হয় না। শুন্‌লাম যে এই কাজের জন্ত জাতীয় সমিতি বার্ষিক ৫,০০০,০০০ ডলার শুধু (Christmas Seals) বড় দিনের সময় ষ্ট্যাম্প বিক্রী ক'রে তোলে। এই 'শিল্‌' বিক্রী এক বিরাট ব্যাপার। এদের দেখা দেখি এখন অনেক দেশে এই রকমে টাকা তোলার ব্যবস্থা হ'য়েছে।

আমাদের দেশেও এইভাবে টাকা তোলার জন্ত এরা সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছে। "শিল" বিক্রী করার সুবিধা এই যে এতে ধনী দরিদ্র সকলেই সাহায্য ক'রতে পারে। লোকে যেমন ষ্ট্যাম্প্‌ দিয়ে ডাকে চিঠি পাঠায়, বড় দিনের সময় সকলে চিঠির উপর, বা উপহারের পার্শ্বেলের উপর যক্ষ্মার 'শিল' লাগিয়ে দেয়। "শিলের" দাম খুব কম। ডাকের ষ্ট্যাম্পের দামের মতই সস্তা। অথচ, এই রকম এক পয়সা দুপয়সা ক'রে এরা ৫০ লক্ষ ডলার বৎসরে তোলে। কারও গায়ে লাগে না, অথচ কাজ উদ্ধার হয়।

যক্ষ্মা নিবারণ অনেকটা নির্ভর করে সাধারণের শিক্ষার উপর। সাধারণে যত দিন না বুঝ্‌বে যে এ রোগ সংক্রামক এবং সাবধান হ'লে নিবারণ করা সম্ভব, ততদিন প্রকৃত যক্ষ্মা নিবারণ হবে না। তাই এদেশে এখন প্রচারের জন্ত এত চেষ্টা হচ্ছে। এবং এর ফলও ভাল হয়েছে। এখন আর আগেকার মত লোকে যক্ষ্মার নামে যমের কথা ভাবে না। এখন এরা সাহস ক'রে রোগের প্রতিকার চেষ্টা করে। এদের দেখে আমাদের এবিষয়ে শিখ্‌বার যথেষ্ট আছে। হয়ত এদের মত আমাদের এত সুবিধা নাই। এদের এক ভাষা, এক দেশ, এক জাতীয় লোক, শিক্ষিতের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী—পয়সাও যথেষ্ট। তবু আমরা যদি ছোটখাট ভাবেও আরম্ভ করি, একটা জেলা বা অন্ততঃ একটা সহর এক সময়ে হাতে নিই, চলচ্চিত্র বা মৌখিক বক্তৃতায় সকলকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করি, তা হলে সময়ে এর ফল দেখে অন্তান্য সহরে ও প্রদেশে এই রকম কাজ প্রচার হবে, যক্ষ্মা নিবারণ হবে, বহু অকাল মৃত্যু বন্ধ হবে।

ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখার্জ্জী

মিষ্টিক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বাংলাভাষার—অনেক সমজদার মিষ্টিক শব্দের তর্জ্জমা করিয়াছেন মরমী কবি, আর একজন করিয়াছেন দরদী কবি,—মরমীই হোক আর দরদীই হোক মূলতঃ অর্থ খুঁজিতে গেলে আমরা এক সংজ্ঞায় উপনীত হই—যিনি মরমী অর্থাৎ সব জিনিষের তলায়ে দেখবার শক্তি সঞ্চয় করেছেন, দরদী অর্থাৎ সব জিনিষ সম্বন্ধে যার বুকে দরদ আছে, যিনি মহৎ হইতে অণুরেণুকণা পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যবৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা প্রত্যেক জিনিষের বিভিন্নরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহাকেই মিষ্টিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

সৌন্দর্য্যবোধের অন্তর্নিহিত সত্যের ধ্যানই মিষ্টিক কবিদের লক্ষ্যের আদি সোপান। Romantic যুগের সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মানদণ্ডের উপর Romance-এর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহা সৌন্দর্য্যবৃত্তির প্রথম পরিচয় মাত্র। সুতরাং সৌন্দর্য্যবৃত্তির পরিচয়কে আমরা Romanticism বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। যে বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা মনের উচ্ছ্বাস রোমান্সের পূর্ণ মাত্রায় উঠার আকুল নিবেদন লেখনীতে দুটি কথায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে—

বঁধু কি আর বলিব আমি—

জনমে জনমে মরণে মরণে প্রাণনাথ হৈও তুমি।

সেই লেখনীতে কেন আবার বাঁচামরার হিসাব-নিকাশ বা ভগবতপ্রেমে ভরপুর প্রাণের কাকুতি-মিনতি দেখে অব্যক্ত হাহুতাশ!

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
নাহি তার আদি অবসান
তুঁহে জনমি পুন তুঁহে সমাওত
সাগর লহরী সমান।

নিজের ঘরোয়া ধরণেই (domesticated ideas) তার ব্যাপ্তি নয়। সে মহাপ্রলয়ের দিন হতে ধরিত্রীর পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তির বা মরণের কী এক অচিন্ত্যধারার পদ্ধতি আকুলপ্রাণে খুঁজিতেছে

তুঁহে জনমি পুন তুঁহে সমাওত
সাগর লহরী সমান

এখানেই সকল কিছুর শেষ। ভগবতপ্রীতির বা সাধনার ও কর্ম্মপ্রেরণার বিমলমুক্তি আপনা হতে আসিয়াই যেন ধরা দিতেছে

তোমা হতে আসি পুন তব পদে হই লয়,
তবে মাঝখানে অত ফাঁক কেন?
নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতায়—শূন্য থাক্
....

মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক

তোমা হতে আসিয়া তোমাতেই যখন ফিরে যাব—তখন মাঝখানে মহাপ্রলয়, ব্রহ্মা, সৃষ্টি, নদনদী, সাগর, অনন্ত, অসীম অতশত কেন? এই কেনই তাহার প্রধান তাৎপর্য্য।

বস্তুতঃ যাঁহারা মরমী বা দরদী কবি তাঁহাদের অন্তঃ অনুভূতি অতীব সজাগ, তাঁহারাই সৌন্দর্য্যপিপাসু বা worshippers of beauty এনডিমিয়ন্-এর প্রথম ছন্দ। A thing of beauty is joy for ever ই তাহার আদি ও অন্তিম পরিণতি বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

মিষ্টিকেরা সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা অরূপের মাঝেও রূপ দেখিয়া থাকেন, প্রতি ধূলিকণাও তাঁহাদের নিকট মহান ভাস্বর হইয়া ওঠে, মধুবৎ পার্থিবং রজঃ, মহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধূলিকণা পর্য্যন্ত, তাঁহাদের নিকট মধুময় বলিয়া অপরূপরূপে পরিগণিত হয়, এরূপ সৌন্দর্য্য-বোধের দ্বারাই মানুষ দেবতা বা extemphor সংজ্ঞায়

উপনীত হইতে পারে, অচেনা জগতের অজানা কাহিনীও তাঁহাদের নিকট চিরপরিচিত বলিয়া বোধ হয় স্বয়ং অন্তর্যামী মরমে বসিয়া তাঁহাদের মুখ দিয়া কথা কহান, রবীন্দ্রনাথই এইভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
তব কথা দিয়ে মোরে কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

অন্তর্যামী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাল কাড়িয়া লন, কাণ্ডারী যেমন তরীকে চালাইয়া লইয়া যায় তিনিও সেইরূপ তরীর ন্যায় চলিয়া থাকেন। বীণাপানি যেন স্বহস্তে তাঁহার মরম-কোঠায় মধুচক্র রচিয়া থাকেন এবং তাহাতেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ আনন্দের উচ্ছ্বাসে রূপকে বাণী দিবার নিমিত্ত আকুল হইয়া ওঠে। এক অজানা বাসন্তী হাওয়ায় মশগুল মনপ্রাণ সমুখ বন্যার বেগ সামলাইতে না পারিয়া দিকে দিকে ছড়ায়ে যায়, এরূপেই—

অন্তঃপ্রাণ পায় গো চেতন
লুটে দিতে চায় তনুমন,

এখানেই নিজের মধ্যে আর একজন এসে দাঁড়ায়, তখন জীবনের তারগুলি ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিয়া ওঠে,

চারিদিকে গান বিশ্বে ছোটে
চারিদিকে প্রাণ নেচে ওঠে।

তখন সমগ্র বিশ্ব যেন আনন্দের তুফানে উদ্বেলিত হইয়া অনন্তের দোলনায় দোল দিবার জন্য লুটোপুটি খায়।

তখন অমৃতরূপমানন্দং যদ্বিভাতি।

সমগ্র বিশ্ব এক অমৃতের আসর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বীণাপাণি স্বহস্তে রাগরাগিণীর মূর্চ্ছনায় দরদী কবিকে পাগল করিয়া তুলেন; তিনি তখন সম্পূর্ণ আত্মহারা হন, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। এই নিঁখুত সৌন্দর্য্যপূজারীকে আমরা mystic বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এ বিষয়ে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অনেক কাব্যস্রষ্টাদের লেখার মধ্যে এরূপ তন্ময়তা খুঁজে পাওয়া যায় না। অতীন্দ্রিয়তার যে আভাস প্রতি ছন্দে মুখর হইয়া উঠে মিষ্টিকের লেখা থেকেই আমরা উহা পাই। সৌন্দর্য্যধ্যানে মগ্ন কবির কাব্যের রূপ আপনা হতেই ফুটিয়া ওঠে ও অপরূপ হয়। অন্তর্গত লইয়াই তখন তাঁহার সম্বন্ধ, তিনি যাহা শোনেন তাহাই তাঁহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে ও প্রাণ আকুল করে।

এই অনন্ত সৌন্দর্য্যতত্ত্বের একটুকু কণার আস্বাদই তাঁহাদের কাব্যের রসসৃষ্টির উন্মাদনা। কারণ অত উঁচু স্তরে (highest standard) ভাব থাকিলেও ভাষা থাকিতে পারেনা; উহা প্রাণের সরল কথার মত সাদাসিধে হইয়া যায়।

ঐ সৌন্দর্য্যতত্ত্বানুশীলনের অন্তর্বৃত্তি বা তুরীয়বৃত্তি যে স্তরের সেই স্তরে গেলেই প্রকৃত রূপ আস্বাদন করা যায়, কিন্তু অনেক কবির লেখা ঐ স্তরের নাগাল পাইলেও প্রকৃত পক্ষে পায় না। মরুভূমি মরিচীকার ন্যায় বহিরাবরণ দেখিয়াই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায় না, যেমন—

ফুলকরবী ঘোমটা খোলো
ডাকছে ডালে বুলবুলি হায়।

ইহা এমন মিষ্টত্বে ভরপুর হলেও 'মিষ্টিচিজম্-এর ঘরে যাইবার মত শক্তি রাখে না, কাজেই এই দুটী পংক্তিকেও আমরা রোমাণ্টিক বৃত্তির পরিচয়ের নিদর্শনস্বরূপ ধরিতে পারি, সোজাভাবে বলিতে গেলে রোমাণ্টিচিজম্ সৌন্দর্য্য বোধের প্রথম সংস্করণ আর মিষ্টিচিজম্ চরম সংস্করণ, প্রথমোক্তটিতে মানুষের চিত্তবৃত্তি উতলা হয় বটে কিন্তু শেষোক্তভাবে মানুষ পাগল হইয়া যায়। ঐরূপ আত্ম-ভোলাকবিগণই প্রকৃত রসসৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহারা রূপের পূজারীগণ্য রূপের পূজারী। তাঁহারা প্রকৃতিপক্ষে স্ব স্ব জীবনে সৌন্দর্য্যানুভূতি উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মাণ্ডের বিচিত্র রূপেই মগ্ন হইয়া যান। তাই রবীন্দ্রনাথ—

জগতের মাঝে তুমি বিচিত্ররূপিনী হে—
বিচিত্ররূপিনী।

এখানেই বিচিত্রার রূপ।

তাই বৈরাগ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়—
অসংখ্যবন্ধনমাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।

আবার 'তোমাদের মাঝে আমি পেতে চাই স্থান'।

এরূপেই অসংখ্যবন্ধনের মাঝে বিচিত্ররূপে বিভোর হওয়াই মিষ্টিকের বিশেষত্ব—তাঁহারা মর্ত্তকে স্বর্গে পরিণত করিয়া তুলেন—

Up the heaven down the hell
It'sn't due reasoning
Here's the heaven and here's the hell
This's true and all are nothing.

সৌন্দর্য্যের আবাহন, পূজা ও ধ্যানে যে মর্ত্ত্যও স্বর্গে গড়িয়া ওঠে, অসুন্দরও সুন্দর হয় এ কথা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ যাহারা মরমী তাঁহারা অন্ততঃ নিম্নোক্ত বাণী স্মরণ করিয়াই জীবন পথকে সুন্দর করিয়া তুলেন—

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম—
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

এই সত্য ও শিবসুন্দরের উপাসকেরাই মিষ্টিক, মরমী বা দরদী কবি। সৌন্দর্য্যতত্ত্বে মগ্ন হইয়া তাঁহারা জীবন যাত্রা শেষ করিয়া থাকেন—মধুর হইতে মধুরতর ছন্দে উল্লসিত হইয়া, কিন্তু এই মধুরেণ সমাপয়েৎ ই তাঁহাদের last basis নহে, তাঁহারা light more light, সিঁড়ি কই সিঁড়ি বলিয়া ওপারের আলো দেখিতে তৎপর হন, প্রত্যেক মহাত্মার জীবনেই এরূপ সম্পূর্ণতার অভিযানের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়—শেষ দিনেও এই মরমী বা মিষ্টিকেরা 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো' বলিয়া পথ খুঁজিতে থাকেন; সীমার মাঝে অসীমের রূপ ফুটাইয়া থাকেন।

ওঁ সহনাববতু, সহনৌভুনক্তু—
সহচিত্তং করবাবহৈ।

চিত্তরঞ্জন দাশ

"স্বপনে হেরিনু করাল ঝঞ্ঝা গ্রাসিছে সোনার চরে!"

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কালি, নিশীথ শয়নে স্বপন দেখিনু
ভাঙন ধ'রেছে চরে—
হেরি, কালো জল-রাশি উঠি' উচ্ছ্বাসি'
কাল ফণা যেন ধরে!

আলোড়ি বিলোড়ি বিপুলোল্লাসে
প্রলয়-মত্ত ঢেউ ছুটে আসে
আঘাতে আঘাতে বালু-পাড় যত
খসিয়া খসিয়া পড়ে!
কালি, নিশীথে হেরিনু করাল ঝঞ্ঝা
গ্রাসিছে সোনার চরে!

সভয়ে কাঁপিছে সবুজের ক্ষেত,
কাঁপে পীত শস্য ফুল—
থর থর করি' ভূমি উঠে নড়ি'
পলায় বিহগ কুল—

এখনো ঘূর্ণি ঘুরিতেছে যেন
শিরায় শিরায় প্রমত্ত হেন
এখনো নয়নে ভেঙ্গে ভেঙ্গে মাটি
ক্ষুধিত দরিয়া ভরে!
স্বপনে যে ছবি দেখেছি, জাগিয়া
তাই দেখে কাঁপি ডরে!

কর্ম্ম-ভিক্ষু

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

ঘড়ি ধরে ঠিক এগারোটার সময় বেড়িয়ে পড়ে, আর সারাটা দুপুর রাস্তায় ঘাস্তায় ঘুরে ইডেন গার্ডেনে ঝিলের ধারে শুয়ে বসে, মার্কেটের এ মাথা ও মাথা করে, ঠিক পাঁচটায় বাসায় ফিরে আসে।--"না : ভাই বিমল দা' আর পারা যায় না, বেশ আছ তোমরা, বাড়ী থেকে মাস মাস টাকা আসচে, আর দিব্যি খাতা হাতে কলেজ যাচ্চো, আর থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখে ফিরচো, আর আমাদের হালটা দেখ একবার, কোন্ সাত সকালে চাট্টে ভাতে ভাত নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়েচি, আর সারাদিন কলের মতো কলম পিষে এই ঘরে ফিরচি,—তাও মাসান্তে মাত্র একশো'টি টাকার জন্যে···টেবলের ওপর ওটা কি হে? বাঃ বেড়ে পাকা পেঁপে তো, পেলে কোথা? দাও দিকিন্ ছুরিটা একটু চেখে দেখি।" —তারপর কাগজ কলম নিয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখতে বসে—'আজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম তার আপিসে, বিশেষ কিছু আশা দিতে পারেন নি, তবে বললেন ভ্যাকেন্সি হ'লেই আমায় স্মরণ করবেন,······ আর কুড়িটী টাকা পাঠিয়ে দেবেন' ইত্যাদি।···

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি ডিগ্রিই অবলীলাক্রমে হাতে এসে গেছে, কলেজ বেরোবার ছুতো ক'রে যে আর ক'টা দিন কাটিয়ে দেয়া যাবে তারও উপায় নেই, যা হোক একটা কাজকর্ম্ম জুটিয়ে উদরান্নের সংস্থানটা অন্ততঃ না করলেই আর চলে না। অথচ ললাটে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানের ছাপ, দরজায় দরজায় হাত পেতে উমেদারি করতেও আত্মসম্মানে বাধে, কাজেই···

পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে; দৈবাৎ মুখোমুখি হয়ে পড়লে বলে 'রিসার্চ্চ কচ্চি,' ভেতরকার কথা যারা জানে, তারা হাসে, বলে,—রিসার্চ্চই বটে, মিথ্যে নয়, তবে বিষয়টা একটু অভিনব, প্রচলিত জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত বেশী গবেষণা হয়ে গেছে যে এতে আর নতুন কিছু করবার নেই, তাই তার সব্জেক্ট হচ্চে 'আধুনিক জগতে বিশ্বমানবের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা আর তার প্রশান্তির উপায়', এর মেথড্টাও অভিনব, লাইব্রেরী, লেবরেটরির কোন প্রয়োজন নেই, প্রাত্যহিক জীবনের প্রাণান্তকর অভিজ্ঞতা—ঘরে অভাবের তাড়না, পাওনাদারের রক্তচক্ষু, বাইরে প্রতিবাসীদের নির্ম্মম উদাসীনতা—এর matters যোগায়, ফোঁটা ফোঁটা ক'রে হৃদয়ের রক্তে এর থিসিস্ লেখা হয়।···

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে যায়, কাগজওয়ালার দোকানে, ষ্টেট্স্ম্যান, অমৃতবাজার ক'রে সব ক'টা দৈনিকের কর্ম্মখালির columnগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে এক পয়সা দিয়ে একখানা 'অবতার' কিনে নিয়ে চলে আসে। কোনদিন তাও আনতে পয়সা থাকে না। কাগজওয়ালা রাগ করে, করুক, উপায় নেই।···

বাসায় ফিরে মুখ হাত ধুয়েই আবার বেরিয়ে যাবে, এমন সময় দরজাপথে দেখা দেয় মেসের ম্যানেজারের কালান্তকের মত মূর্ত্তি,—

'সরোজ বাবু, আজকাল ক'রে তো দেড়মাস ঘোরালেন, এবার আমার কিছু দিন্। এ গরীবের টাকা কটা ভাঁড়িয়ে আর আপনার কি হবে বলুন'।

'এই যে রাম বাবু, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম, আপনি কত পাবেন বলুন তো'?

'গত মাসের খোরাকিতে আর ঘর ভাড়ায় পোনেরো টাকা, আর তার আগের মাসের বাকী তিন টাকা সাত আনা তিন পয়সা,—একুনে হলো গিয়ে আঠারো টাকা সাত আনা তিন পয়সা।'

'থাক্গে, আঠারো টাকা আট্ আনা-ই ধরুন,—তা আজ

হোল শুক্রবার, শনি—রবি—আচ্ছা রাম বাবু, এতদিনই যদি সয়েছেন তবে দয়া ক'রে আর দু'টো দিন অপেক্ষা করুন। এই সোমবার মাইনেটা পেলেই আপনার পাই পয়সা মিটিয়ে দোব।—কি, কি ভাব্ চেন ?'

'ভাব্ চি, আপনার এ মাইনে পাওয়ার শেষ হবে কবে ? এ দু'মাস ধ'রে রোজই তো শুনে আস্ চি, আপনি সোমবার মাইনে পাচ্ছেন।'

'তা রামবাবু, আপনাদের আশীর্ব্বাদে কামাচ্চি কি আর কম ? কিন্তু হলে কি হয় ? একত্র কত্তে পাচ্চি না, মাসান্তে যা কিছু পাই সব মানি অর্ডারে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হয়। বাড়ীতে পোষ্য হচ্চে এক পাল, তা ছাড়া ছোট ভাইবোনেরা রয়েচে, তাদের পড়ার খরচ রে, কাপড় জামা রে, হেনো রে, তেনো রে—একটা পয়সা সেভ্ কত্তে পারি না। আর কুলোবেই বা কেন ? Earning member তো এক—আপনি এখন তবে আসুন, রামবাবু, আমায় আবার এখুনি বেরোতে হবে টুইশানিতে, মরবার ফুরসুৎটুকু নেই, বলেন কেন ? আপনি ভাব্ বেন না, সোমবার ঠিক পেয়ে যাবেন।'—

বড় রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়াতে ভরসা হয় না, কি জানি কার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। দুপুর বেলাটা সবাই যে যার কাযে ঘরে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সকালে আর বিকেলে চেনা লোকের জন্ত রাস্তায় পা ফেলা যায় না,—

ঘণ্টা দুই অলিগলি দিয়ে ঘুরঘুর করে বাসায় ফিরে এসে ব্যস্তভাবে নাওয়া খাওয়া শেষ কত্তে লেগে যায়। সব সময় ব্যস্তভাব দেখাতে হয়, নৈলে বাজারে ক্রেডিট্ থাকে না।

মেসের লেটার বক্স্‌টা দিনে তিনবার যেন দু'হাত তুলে ডাক্‌তে থাকে, দু'জায়গায় Being given to understand পাঠানো গেছে। Leslieর বাড়ী থেকে একটু আশ্বাসের মতও পাওয়া গেছে, কি জানি কখন ওঁদের appointment letter এসে হাজির হবে,·····হাঁ, এই যে একখানা পত্র আছে, কিন্তু,—কোন আপিসের চিঠি নয় তো। পিতৃদেব লিখেছেন দেশ থেকে—বাবা সরোজ, তোমার পত্র পেয়েচি, কিন্তু টাকা পাঠাবো কোথা থেকে, বাবা ? দেশের অবস্থা অতি মন্দ, আজ তিন মাস একটা কেস্ হাতে আসেনি, লোকে মোকদ্দমা করবে কি, খেতে পায় না। তোমার গর্ভধারিণী আজ দু'সপ্তাহ আমাশয় রোগে শয্যাগত আছেন, পয়সার অভাবে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্চে না। তুমি আমার সুযোগ্য পুত্র, এবার সংসারের ভার নিয়ে আমায় মুক্তি দাও' ইত্যাদি,—

পিতা উকীল, ব্যবসায়ে খ্যাতি আর অর্থাগম দুই এক সময় হয়তো ছিল, কিন্তু প্রজার হীন অবস্থা, আর বাজার খাঁই, দু'য়ে মিলে একটু একটু করে আজহারের পথ সাধারণের পক্ষে দুর্গম করে তুললো, আইনব্যবসায়ীদেরও অন্ন গেল।—

পত্র পড়ে খানিক গুম্ হয়ে বসে থাকে, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে। ঘামে চট্‌চটে আধময়লা জামাটা দড়ির আল্‌না থেকে খুলে গায়ে দেয়, পিঠের দিকে একটা জায়গা বিশ্রীভাবে ছিঁড়ে গেছে, ময়লা তাঁতের ওড়নাটা জড়িয়ে সেটাকে লোকচক্ষুর আড়াল করবার বৃথা চেষ্টা করে।—জুতোগুলোর অবস্থা একেবারে অকথ্য, এক টাকা দিয়ে 'বাটা'র কেড্‌স্ একজোড়া কেনা গেছ্‌ল দু'মাস আগে, এতদিন গেছে, আর যেতে চায় না,—নাঃ, এবার টাকা এলেই first thing এক জোড়া নতুন জুতো কিনে ফেল্‌তে হবে, যায় যাবে এক টাকা—কিন্তু ?—টাকা আসবে কোথা থেকে ? বাবা তো লিখেছেন—টাকা নেই। টাকা নেই ! টাকা নেই !—তা হলে কি হবে ? রামবাবুকে কি বলা যাবে ? পকেটে তো একটা আধলাও নেই, কি হবে ? উঃ, আর ভাবতে পারে না, দু'হাত দিয়ে ভবিষ্যৎটাকে চোখের সমুখ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে একবারে নীচে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। জনস্রোতের মধ্যে মিশে গিয়ে, বিশ্বমানবের চিন্তাসমুদ্রে নিজের এক বিন্দু চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আরাম পেতে চায়।—

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে নেহাৎ অভ্যাসের বশেই যেন একটু দাঁড়ায়। ট্রামগুলো অসংখ্য কেরাণী বুকে বয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসে, একটু থামে, আবার চল্‌তে থাকে। বাস্‌গুলোও আসে, খানিক ওঠানামা, হাঁক ডাক চলে, আবার যে যার পথে পাড়ি জমায়। তাদের যে কাজ আছে, দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করবার বিলাসিতা তাদের সাজে না তো।—

লক্ষ্যপথ ড্যালহৌসি স্কোয়ার, একটা কর্ম্মখালির খবর

পাওয়া গেছে, 'অমৃতবাজারে'।—আচ্ছা, যদি কাযটা হ'য়ে যায়,—মাইনে লিখেচে মাত্র আশী টাকা, তা হোক,—গুটি পঞ্চাশ টাকা অন্ততঃ আগাম চেয়ে নিতে হবে,—রামবাবুর টাকাটা ফেলে দিতেইহচ্চে—বাড়ীতেও কয়টা টাকা না পাঠালেই নয়,—মার অসুখ—অসুদ পত্তরটা চাই, পথ্যিটা চাই। তারপর এদিকে জুতো একজোড়া না কিনলে আর রাস্তায় বেরোবার উপায় নেই—জামাটাও গেছে ছিঁড়ে—

'বাবু আপনার ভাগ্যলিপি অবগত হয়ে যান।—ফলিত জ্যোতিষ, করকোষ্ঠি বিচার, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ যথাযথ বলে দোব,—অন্ধকার দিন আপনার শুভ কি অশুভ, —যে কাযে যাচ্চেন, তাতে সফলকাম হবেন কিনা—'

হাতটা আপনা থেকেই পকেটে গিয়ে ঢোকে, আবার তখখুনি ফিরে আসে। এ যাত্রার ফলাফলটা জেনে গেলে বেশ হোত। যাক গে, কী-ই আর হবে জেনে? যদি বলে ফল অশুভ? কায নেই আগে থাকৃতে মন খারাপ করে।—

দু'তিনটি স্কুলের ছেলে কলরব কত্তে কত্তে পাশ কাটিয়ে চলে যায় তাদের কথার রেশ কানে এসে লাগে, একজন বলচে—কী হবে আর পড়া শুনো করে?...চাকরির গুড়ে তো বালি, দেখ কালই ইস্কুল ছেড়ে, একটা দোকান টোকান যা হয় করে বসবো।—

আর কি রোদই উঠেচে! সহরের বুকে যেন আগুন লেগেচে।...মেডিকেল কলেজের লাল দালানগুলো রোদে পুড়ে এক এক'টা জলের জন্ত হাঁ করে দাঁড়িয়ে মরচে যেন! তার ওপর আবার ধুলোর হোলি খেলা চলেচে। নাঃ, কর্পোরেশনের এ ভারী অন্তায়, ফি মাস মুটো মুটো টাকা গলা টিপে নিচ্চে, কিন্তু poor ratepayers দের জন্তে এতটুকু দরদ নেই! এ বিষয়ে একটু লেখালেখি না করলে আর চলচে না। কালই অমৃতবাজারে একটা কোরেস্‌পনডেন্‌স্‌ লিখে পাঠাতে হবে।

আচ্ছা, কি ভাবে আরম্ভ করা যায়? May I crave the hospitality of your esteemed journal ...নাঃ; too hackneyed......Permit me to draw the attention of our city fathers, through your renowned paper, to the just grievances of the ratepayers regarding the most deplorable state of the public thoroughfares...হঁ্যা, এই ঠিক হয়েচে, আজ রাতেই লিখে ফেলতে হবে।—

'কম্‌ ইন্‌ বাবু—ভালো সু হ্যায়—গুড্‌মেক্‌, চীপ্‌ প্রাইস্‌'—

ধন্ত জাতি এই চীনাম্যান্‌রা। কোথায় তাদের দেশ, আর সব ছেড়ে ছুড়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে চলে এসেচে এই সুদূর কলকাতায়। এখানে এসে যা হোক্‌ করে খাচ্ছে তো? নাঃ ব্যবসায় ছাড়া কোন জাতি উঠতে পারে না, পি, সি, রায় দূরদর্শী লোক! হাতে কয়েকটা টাকা এলেই business করব যা থাকে কপালে। চাকৃরিটা পেলে হয়, খুব economically চলতে হবে এবার থেকে। রামবাবুর মেস্‌ ছেড়ে দোব, বারো টাকার মধ্যে খাওয়া থাকা হয়ে যায় এমন একটা বাসা দেখে নিতে হবে।... তা ছাড়া রামবাবু লোকও ভাল নন্‌, বিপদ আপদ কার না আছে, কথার অমন নড়চড়্‌ সবারই হয়ে থাকে। এক মাসের টাকা বাকী পড়েছে বলে রোজ দু'বার তাগাদা! দেব কালই তার মেস্‌ ছেড়ে, এত-ই কী?—হঁ্যা, ওই বারো টাকার মধ্যে খাওয়া থাকা সেরে নিতে হবে—আর হাত খরচার জন্তে ধর পাঁচ টাকা—না হয় আট টাকাই ধরা যাক, অসুখ বিসুখটাও তো আছে? তা হলে হলো কুড়ি, আশী টাকা হতে গেল কুড়ি, থাকে গে—ষাট। বাড়ী পাঠাতে হবে কুড়ি—এ-না, ত্রিশই ধর, ভুলুর পড়ার খরচ রয়েচে, আর মিনুর বিয়ের জন্তেও তো এখন থেকেই কিছু কিছু সেভ্‌ করা দরকার। যাকগে, সব গিয়ে থুয়ে রইলো তা'লে ত্রিশ টাকা। বেশী কিছু থাকচে না, তা না থাকুক, মাইনেও তো ঐ আশী টাকা মাত্র। প্রতি মাসে মাইনে পেলেই ত্রিশটি করে টাকা সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে জমা রেখে আসতে হবে। বছর ঘুরে আসতে ব্যাঙ্কের খাতায় টাকার অঙ্ক হু হু করে বেড়ে যাবে। এ ভাবে চলতে পারলে, তিন বছরে কোন্‌ না হাজার খানেক টাকা হাতে আসবে?......তখন?...না, অমন ছন্নছাড়ার মতো চিরটা কাল থাকা যাবে না। আশী টাকা

ফাঁকা মনে হবে। একজন সঙ্গী—অথবা সঙ্গিনী, নয় কেন? হাজার টাকা যার ব্যাঙ্কে জমা, বিয়ে করবার যোগ্যতা তার আছে।...কলকাতায় একখানা বাসা ভাড়া করা যাবে। ছোট্ট বাসা, খান দুই ঘর—একখানা শোবার একখানা বস্‌বার হলেই চলে যাবে। তারপর? উঃ ভাব্‌তেও মন আবেগে মাতাল হয়ে ওঠে। আমি যাবো আপিসে, আর নিঃসঙ্গ মধ্যাহ্নের অলস মুহূর্ত্ত গুলো তার শুয়ে, বসে, বই পড়ে রাস্তার জনস্রোত দেখেও কাটতে চাইবে না। চারটা বাজতে না বাজতেই সে গা ধুয়ে চুল বেঁধে, জানালায় গিয়ে দাঁড়াবে আর তার চঞ্চল দৃষ্টি খুঁজে বেড়াবে গলির পথে আমার আফিস-ফেরত শ্রান্ত, ক্লান্ত মূর্ত্তি। দূরে আমায় দেখতে পেয়ে তার বুক উঠবে দুলে, তার চোখে ফুটে উঠবে এক অভিনব আলোর আভা। চোখোচোখি হতে লজ্জায় রাঙা হয়ে জানালা থেকে সরে দাঁড়াবে সে। তারপর সাজানো টেবলের জিনিষ পত্তর সব এলো মেলো করে অতিব্যস্তভাবে লেগে যাবে সে গুলো নূতন করে সাজাতে। আমি ঘরে ঢুকবো, কিন্তু সে আমায় দেখতেই পাবে না। আমার দিকে পেছন ফিরে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে সে নিজের কায করে যাবে, যেন এর ওপরই তার জীবন মরণ একান্তভাবে নির্ভর কচ্চে। আমি জুতো ঠক্‌ঠক্ করবো, হয়তো একটু কাস্‌বো—চমকের ভান করে ফিরে দাঁড়াবে সে, তার বড় বড় শান্ত, উজ্জ্বল দুটো চোখ তুলে চাইবে আমার পানে—এক মুহূর্ত্ত—তারপর সব দৃষ্টি, সব অনুভূতি লীন হয়ে যাবে একটা গভীর, উষ্ণ, সুদীর্ঘ চুম্বনের মাঝে।—

হয়তো এক দিন আপিস থেকে এসে দেখলুম, সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্চে আর আপন মনে গুন্‌ গুন্‌ করে গান কচ্চে, মেঘের মতো কালো, কুঞ্চিত কেশপাশ তার কোমর ছাড়িয়ে পড়েচে—চুলের মৃদু সৌরভ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে একটা অপূর্ব্ব মাদকতার সৃষ্টি কচ্চে। পেছন থেকে পা টিপে টিপে গিয়ে তার চোখ চেপে ধরলুম। সে আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো—'ওগো বুঝেচি, ছাড় ছাড় এবার, বড্ড লাগচে যে—উঃউঃ—'

'এতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রইলুম, একবার ফিরেও দেখলে না, তার কী? ফাইন্ দিতে হবে না বুঝি'?

'ওগো নাও, যা খুসি তোমার ফাইন্ নাও, শুধু চোখ দু'টো ছেড়ে দাও',—চোখ ছেড়ে দিতেই ঠোঁট ফুলিয়ে বললে,—'হুঁ', ভারী দুষ্টু হয়েচো, দেব না তো ফাইন্, কখ্‌খনো দেব না'।

'অমনি না দিলে জোর করে আদায় করে নেব। রাজার আইনে যেমন দণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার রীতি আছে তেমনি আবার দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিনত করবার সুবন্দোবস্তও আছে'।

ফাইন আদায় হোল বিনা বলপ্রয়োগেই, তারপর সে আমার বুকে মাথা রেখে আব্দারের সুরে বললো—'চল না আজ সিনেমায়, কাগজে দেখছিলুম, একটা খুব ভাল বই আছে 'চিত্রা'য়, যাবে তুমি আমায় নিয়ে?'

সমস্ত দেহটা আশ্চর্য্যরকম হালকা হয়ে পড়ে, অলক্ষিতে গতিবেগ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। চলার পথ কখন শেষ হয়ে আসে খেয়াল থাকে না। চমক ভাঙ্গে একটা বিশ্রী, বেসুরো কর্কশ কণ্ঠস্বরে—'রাস্তায় বেরোলে চোখ চেয়ে চলতে হয়, গায়ের ওপর পড়্‌চেন এসে, চোখ নেই সঙ্গে?—'

ডানধারে ডালহৌসি স্কোয়ার, বাঁয়ে, হাঁ এইতো—দি পাওনিয়ার লাইফ এসিওরেন্স্ কোং,—বুকটা হঠাৎ ঢিপ করে ওঠে। চারতলার ওপর অফিস। লিফ্‌টের সাহায্যে উপরে গিয়ে শ্লিপ পাঠিয়ে দিয়ে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়ায়, যদি ততক্ষণ বুকের অবস্থা কতকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে।—ভেতর থেকে ডাক আসে, সসম্ভ্রমে ঘরে ঢুকে বড় টেবলটা আশ্রয় করে দাঁড়ায়,—

Well, what can I do for you?

আজকের অমৃতবাজারে দেখছিলুম আপনাদের একজন Branch Secretary'র দরকার—

It is a fact.

'I—I would like to offer my services'—

'আপনার বয়স কত'?

'চব্বিশ'।

'এর আগে এ লাইনে কাজ করেচেন কোথাও'?

'আজ্ঞে না'।

'Academic qualifications?

'M.A. in Philosophy, Second class Third'.

'I see. Can you name me the several districts in Bihar and Orissa' ?

'What a question ! I can't, just now.

দেখুন, I appreciate your scholarship, তাই বলচি আপনি কোন স্কুল কলেজে ঢুকে পড়ুন, shine করবেন। আমাদের এ লাইনটা নেহাৎই unintellectual, never meant for scholars like you. আচ্ছা নমস্কার।

আবার পথচলা সুরু হয় !—

এ সব ক্ষুদ্র প্রত্যাখ্যান এখন আর গায়ে লাগে না, তবু পা দু'টো হঠাৎ যেন অসম্ভব কম ভারী হ'য়ে ওঠে,—লাল দীঘির কাকচক্ষু জলের ওপর রোদের ঝিকিমিকি যেন একটা সাদর আমন্ত্রণের ইঙ্গিত জানায় !—সোজা পথ ধরে দক্ষিণে মাঠের দিকে এগিয়ে চলে।—

মোড়ের ঐ কলের পাহারাওয়ালাটা, কী আশ্চার্য্য ক্ষমতা তার চোখে, চারটা রাস্তার বিরামহীন ট্রাফিককে নিয়ন্ত্রিত কচ্ছে শুধু চোখের ইঙ্গিতে। দৈত্যের মত শক্তিমান সব যানবাহন ঝড়ের বেগে পৃথিবী কাঁপিয়ে ছুটে আসে, আর দু'হাত ঐ খুঁটিটার রক্তচক্ষুর সমুখে ভয়ে জড়সড় হয়ে নিশ্চল, নিষ্পন্দ হয়ে থেমে যায়।—

অদ্ভুত যন্ত্রমহিমা !

পৃথিবীর বুক চেপে বসে আছে, বিরাট অতিকায় যন্ত্রদেব, আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অসংখ্য স্তাবকের দল তার জয়গানে আকাশ বাতাস শব্দময় করে তুলচে। কী বিশ্বগ্রাসী, সর্ব্বনেশে ক্ষুধা এ দেবতার ! এই তৃপ্তিলেশহীন জঠরানলের খোরাক যোগাতে গিয়ে শত শত নরনারী আর্ত্তনাদ করে ঢুলে পড়চে এর সদা ঘূর্ণ্যমান দুই চাকার নীচে। দলিত, নিষ্পেষিত, চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে চক্ষের পলকে, কে তার খোঁজ রাখে ? সমষ্টির পদতলে ব্যষ্টির আত্মদান, এই তো জাগতিক বিধান !—

'সরোজ—অ সরজ'—.

আরো জোরে পা চালিয়ে দেয়, পেছনে যে ডাকচে সে যেন মানুষ নয়, যন্ত্রদেবতার কোন উপাসক, তাঁর পূজার বলিদান খুঁজতে বেরিয়েচে।

'সরোজ, একটু দাঁড়াও ভাই, একটা কথা শোন'।—

কর্জ্জন পার্কের ভেতর দিয়ে সোজা চৌরঙ্গীর দিকে ছুটে চলে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, প্রাণভয়ে যেন !—কিন্তু পা দু'টো হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসে, এগোতে চায় না। একটা ঝোপের পাশে গাছের ছায়ায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে, দু'হাতে মুখ ঢেকে।—

'কি ভাই সরোজ, অমন করে পালাচ্চিলে যে ? ভাবচিলে বুঝি মনিদা' আসচে টাকা চাইতে, না' ?

'না, না,—তা নয়, তা তুমি জেল থেকে বেরোলে কবে ?'

'সে কথা বলতেই তো আসছিলুম, তা তোমার এ হাল হলো কি করে ? 'হা অন্ন' ষ্টেজ্ এসে গেছে বুঝি' ?'

'পুরোদমে, তোমাদের তবু এটুকু সান্ত্বনা আছে যে দেশকে ভালবেসে তাঁর পায়ে নিজের সব সুখ সুবিধে বিসর্জ্জন দিয়েচো, আমাদের যে তাও নেই'।

'ওঃ, তুমি বুঝি তাই মনে করে আছ যে দেশের জন্ম আমি জেলে গেছি। হাঃ হাঃ,—ভুল বুঝেচো ভাই সরোজ, ভুল বুঝেচো—আমার এ কারাবরণ দেশের জন্ম নয়, নেহাৎই নিজের জন্ম'।

'তার মানে' ?

'তবে শোন আমার স্বদেশ-প্রীতির ইতিহাস।—যে দিন খবর এলো আমি বি, এ পাশ করেচি, সেদিনই আমার পিতা দেহরক্ষা করলেন। তিন মাসের মধ্যে মাও গেলেন, এতে একটা সুবিধে হলো এই যে ব্যাঙ্কে বাবার সঞ্চিত শো'চারেক টাকা ছাড়া সংসারে আমার বলতে আর কিছু রইলো না।—ভাবলুম, যা হোক একটা কাজকর্ম্ম জুটিয়ে খাওয়া থাকার ব্যবস্থাটা করে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। বাবা, ইউ, পি, গবর্ণমেণ্টে কর্ম্ম করতেন, প্রথমেই গেলুম সেখানে যদি একটা কিছু হয়। সেক্রেটারিয়েটে একটা কর্ম্ম খালিও ছিল, কিন্তু শুনলুম মুসলমান এখানে মাইনোরিটি জাতি, কাজেই পোষ্টটা তাদের জন্ম রিজার্ভ করা আছে।—ফিরে এলুম আমার জন্মভূমি বাংলার রাজধানী এই কলকাতায়, এখানেও একটা ডিপার্টমেণ্টে দু'টো পদ খালি ছিল, দরখাস্ত পেশ করা গেল, যথা সময়ে খবর এলো মুসলমানরা এখানে
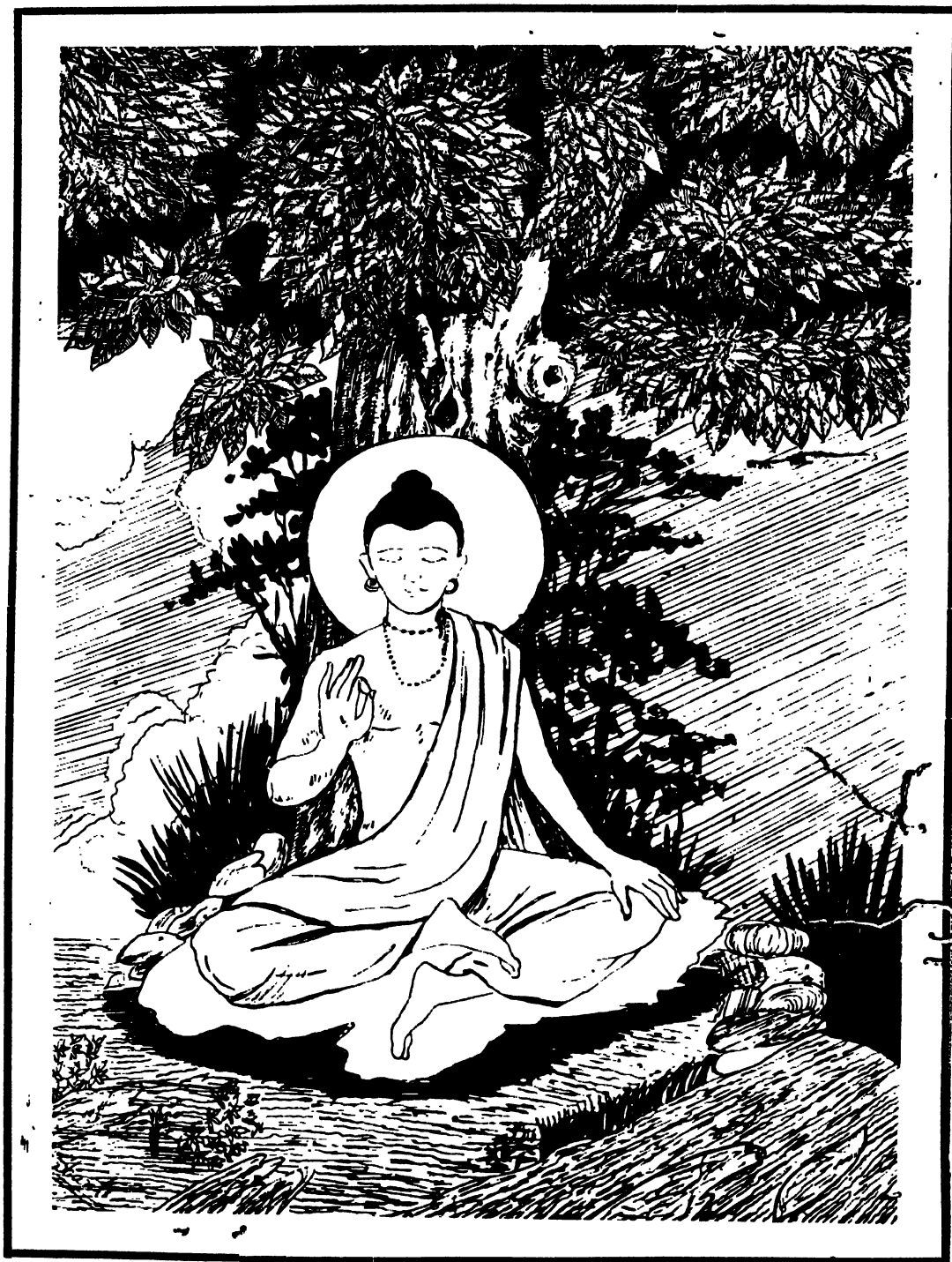
তথাগত

বৈশাখ, ১৩৪১

শিল্পী—শ্রীমতী শান্তি ঘোষাল

ম্যাজোরিটি জাতি কাজেই তাদের দাবী অগ্রগণ্য, একটা পোষ্ট্ তাদের জন্ম রিজার্ভড্, আর একটা ডিপার্টমেণ্টের একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর কোন আত্মীয়কে দেওয়া হবে, সুতরাং আমার চান্স্ নেক্স্ট্ টু নথিং।

সব খরচ পত্তর বাদে ব্যাঙ্কে আর শো খানেক টাকা ছিল, তাই তুলে নিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের উপর একখানা ঘর ভাড়া করে একটা চা'য়ের দোকান করলুম। দিনকতক খুব হাই ষ্টাইলে দোকান চল্‌লো, তিন মাস পরে দেনার দায়ে টেবল চেয়ারগুলো পর্য্যন্ত নীলেম হয়ে গেল।

যাকে বলে একেবারে পথে বসা, তাই হলো আমার।

একদিন দিনরাত্রি উপোস থেকে, পরদিন ভোরে ভবানীপুরে মামার শ্বশুর বাড়ী গিয়ে উঠলুম। মামা, মামী নেই, এ অবস্থায় যতটুকু আদর যত্ন পাওয়া উচিত তাই পেলুম। দুপুরে আহারাদির পর একটু গড়িয়ে নিচ্চি, পাশের ঘরে স্বামী স্ত্রীর বিশ্রম্ভালাপের একটা অংশ কাণে এলো—'যে পুরুষ রোজগার করে পেট চালাতে পারে না, তার মরণ ভালো'—

এক বস্ত্রেই ঢুকেছিলুম, আবার এক বস্ত্রেই বেরিয়ে এলুম।

তারপর দু'দিন শুধু কলের জল আর মাঠের হাওয়ার ওপর থেকে এক রাত্রিতে ঐ ইডেন গার্ডেনে এক গাছের তলায় শুয়ে ভাবলুম—যে পুরুষ রোজগার করে পেট চালাতে পারে না, তার মরণ ভালো,—সত্যি কথা, মরণই ভালো, কিন্তু, কি উপায়ে? বিষ খাই, না গঙ্গায় ডুবে মরি?…কিন্তু এভাবে মরণটা নেহাৎ কাপুরুষের মতো হবে না কি?… তার চেয়ে—তার চেয়ে যখন মরবোই তখন—হোমড়া চোমড়া দেখে একজন কাউকে মেরে ফেললেই তো মরণ এসে হাত ধরে কোলে তুলে নেবে, আরো উপরি পাওনা হবে পৌরুষ আর স্বদেশ প্রেমের খ্যাতি।

হাঁ, সেই ভালো, সে-ই ভালো, কিন্তু?…কিন্তু এ যে অনেক হাঙ্গাম,…এ ক্লান্ত শরীরে কোথায় পাবো পিস্তল, কোথায় পাবো কি? আর তা ছাড়া মরণের পারে দাঁড়িয়ে কেন আর নরহত্যা করে পাপের বোঝা বাড়াবো? তার চেয়ে—হাঁ তার চেয়ে, একেবারে পৌরচন্দ্রিকায়ই ক্রিমিন্যাল না সেজে, সিভিল একটা কিছু করলেই তো অন্ততঃ মাস ছয়েকের জন্ম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, মরতেও হয় না। না-ই নিলুম প্রথমেই একটা এক্‌স্‌ট্রিম ষ্টেপ।—মরণ তো আর পালিয়ে যাচ্চে না। এর পর বুঝে সুঝে যা হয় একটা করলেই চলবে।…

সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল, পরদিন বিকেলে কলেজ-স্কোয়ারে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলুম। সত্যিই বলবার ক্ষমতা আমার ছিল না, আবেগে নয়, অনাহারে কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠেছিলো। যাহোক বেশীক্ষণ বকতে হলো না। 'ইংরেজ রাজত্বে পুলিশের অভাব নেই। আধঘণ্টার মধ্যেই সোজা লালবাজার লক্ আপ…পরদিন বিচারে আইন অমান্ত অপরাধে নয় মাসের কারাদণ্ডাজ্ঞা হয়ে গেল—যাক্ নিশ্চিন্ত,—কে বলে আমার পেট চালাবার যোগ্যতা নেই? এই তো বিনা আয়াসে, মাত্র দু'মিনিট একটু মিথ্যে অভিনয় করে ন'মাসের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে নিলুম। হা: হা: হা:—

'এখন তা হলে কি কচ্চো?'

'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। চাকরি বাকরি আর হবে না, গবর্ণমেণ্ট আগেই নেয় নি, এখনতো qualification বেড়েচে। কর্পোরেশনে একটু আশা ছিল, তাও গবর্ণমেণ্টের নেকনজর আবার ওদিকে পড়েচে। পড়ুক, আমার স্বদেশী বেঁচে থাকলেই হলো'।

'আবার স্বদেশী করবে নাকি'?

'নিশ্চয়ই, তবে এবার সিভিল কি ক্রিমিন্যাল, তা ঠিক করে উঠতে পারি নি। হা: হা: হা:'—

রাত্রে আহারাদি শেষ হয়ে গেলে কাগজ কলম নিয়ে বসে 'অমৃতবাজারে' correspondenae লিখতে—Permit me to draw the attention of our cityfathers, through your renowned paper, to the just grievances of the poor ratepayers, regarding the most deplorable state of the public thoroughfares.

রমেশচন্দ্র রায়

মহামানব রবীন্দ্রনাথের প্রতি

(ত্রিসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে)

তুচ্ছতার বহু ঊর্দ্ধে তুলিয়াছ উত্তুঙ্গ শিখর,
দ্যুলোকের দ্যুতি আসি' পড়েছে ললাটে,
পদতলে বিশ্বরূপী পাদপীঠে দিয়াছ হে ভর,
মানবেরে আলিঙ্গিছ বক্ষের কপাটে।
দৃষ্টি সে সুদূরগামী সুন্দরের অভিসারে ধায়,
অতীন্দ্রিয় ধ্বনি লাগি' অতন্দ্র শ্রবণ ;
করে ধৃত ন্যায়দণ্ড জেগে তুমি, বিভ্রম ছায়ায়
দুঃস্বপ্ন-পীড়িত যবে নিখিল ভুবন ॥
প্রেমিক, মরমী, কবি, বজ্রকণ্ঠ হে বিশ্ব প্রহরী,
ধরণী যে ধন্য আজি এ ধ্যান-মূর্ত্তিরে
ধারণায় ধরি' ॥

প্রকৃতির বক্ষে [illegible] আলিঙ্গনে ছিলে অঙ্গহীন,
কায়া [illegible] মানবের আকাঙ্ক্ষা মিলিত ;
মনুজের মনোরঙ্গে তাই তব সঙ্গ ক্লান্তিহীন,
[illegible] রহস্যভরা অন্যদিকে চিত।
মানুষ-পূজারী কবি, যেই কণ্ঠে মানুষের ভীড়
সরিৎ সাগর সেথা মিলাইছে সুর,
নরনারী-মিলন-লীলায় পড়ে ছায়া বনানীর,
বাজে তাহে কোথাকার অরূপ নূপুর ॥
মাটী নীর সাথে নরে কোন্ যন্ত্রে মিলালে হে কবি,
মূক মুখরের মর্ম্মবাণী মিলনের
দেখাইলে ছবি ॥

তরুলতা পশুপাখী নরনারী নদী গিরি বন—
দৃশ্যমান ধরা—তোমা পারেনি বাঁধিতে,
পলাতকা প্রিয়া কোথা খুঁজে ফির, ধরণী-গুণ্ঠন
তুলি' ধরি' অধরারে চাহিছ ধরিতে।
কবিতা কল্পনা-লতা, প্রাণলক্ষ্মী কভুবা মানসী—
খুঁজিলে নায়ক বেশে সঙ্গিনী লীলার ;
চিরন্তনী নারীরূপে পুনঃ প্রিয় প্রাণ-পূর্ণ শশী
খুঁজিলে মথিয়া কভু হিয়ার আঁধার :—
অধ্যাত্ম-রাজ্যের এক অপরূপ যৌন-বিনিময়
দেখাইলে বহুমুখ জীবনে তোমার
অজর অক্ষয় ॥

কীর্ত্তি তব অভ্রভেদী দেশকাল সীমা-পরাজয়ী,
ক্রমায়ত বৃত্তে তুমি উড্ডীন আকাশে,
ধ্রুব কেন্দ্রবিন্দু 'পরে চিত্ত তব স্থির অসংশয়ী,
সুতীক্ষ্ণ শায়ক সম সত্যের সকাশে।
নরে নরে ঐক্যভিত্তি চিরন্তন তোমার চিন্তায়,
আত্মা চির বদ্ধ-মুক্ত লঙ্ঘি প্রথা-সীমা ;
সংযম-শৃঙ্খল শুচি পরাইলে সৌন্দর্য্যের পায়,
কর্ত্তব্যেরে প্রদানিলে আনন্দ-মহিমা ॥
বিশ্বেতিহাসের ওহে পূর্ণতম মানব মহান,
সত্য শিব সুন্দরের স্বপ্ন আজ তব
ধরণীর ধ্যান ॥

কিন্তু তব কীর্ত্তি চেয়ে তুমি ওহে বহুগুণে বড়,
নিজ কীর্ত্তি-গুটিকায় পড়নি আটক,
তব স্রোতোগতি পথে মাঝে মাঝে কর্ম্মাবর্ত্তে পড়,
তখনি উত্তরি চল প্রথার ফাটক।
ওহে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম, তোমার উড়ার বেগে
পাথরে পাথরে হলো পক্ষের উদ্ভেদ ;
ভাস্বর জ্যোতিষ্ক, ওহে স্পর্শমণি, তব স্পর্শ লেগে
অঙ্গার হীরক, লৌহ স্বর্ণ সে অক্লেদ ॥
মুখে ভাষা দিয়ে তুমি, প্রাণে দিলে খাদ্য জল বায়ু,
বুকে আত্ম-পরিচয়, প্রিয়তম, তব
ইচ্ছি অমিতায়ু ॥

শ্রীসুখরঞ্জন রায়
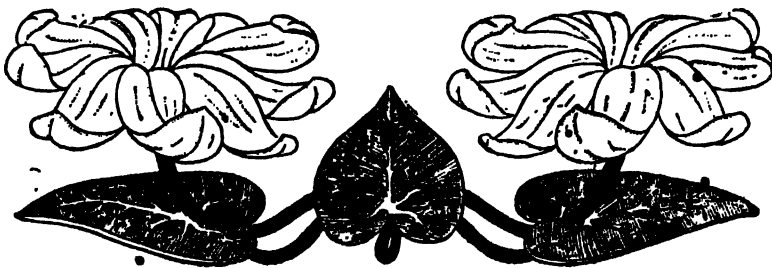
দোকানি

শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস

সে ছিল দোকানি। ছোট্ট ডোঙা নৌকায় ক'রে চল্‌ত তা'র বিপণি—হাট থেকে হাটে—গ্রাম থেকে' গ্রামে।

বাংলার শ্যামলিমা তা'কে দিয়েছিল উৎসাহ—নীল গগনের সোনালী রৌদ্র দিয়েছিল শক্তি। দূরের গাছ থেকে ভেসে আসা পাখীর গান তা'র মনে ঢেলে দিয়েছিল মাধুর্য্য তা'র এই বয়সে। দুনিয়ার সব কিছুই যেন সুন্দরের বেশ ধরে তা'র কাছে এসে দেখা দেয়।

পল্লীবধূরা কেনে—আর্শি, চিরুণি, শাঁখা, কেউবা কেনে রেশমী চুড়ি। শিশুরা কেনে খেল্‌না—বাঁশী, বল রেলগাড়ী, রবারের পুতুল।

এম্‌নি ভাবেই তা'র দিন কাটে নানারকম বৈচিত্র্যের মাঝ দিয়ে।...

...সকল শিশুই কিন্‌লো দোকানীর জিনিষ, বাদে একটি শিশু। সে খালি একটা রবারের পুতুল নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌ল। পুতুলটাকে টিপ্‌লে বেশ বেজে ওঠে বাঁশীর সুরে।

তা'র মা দেখ্‌ছিল তাকিয়ে—দূর থেকে দাঁড়িয়ে,—বড় করুণ তা'র চোখের ভাষা।

শিশুটী মনের দুঃখে পুতুলটা রেখে দিয়ে চলে গেল তার' মায়ের কোলে।

—মা, পুতুলটা কেমন সুন্দর বাজে? না, মা?—মা তা'র সন্তানকে বুকে চেপে ধরল, তা'রপর তা'র চোখ মুছ্‌ল কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে।

পাশেই অন্য শিশুরা খেলছিল—তা'দের নতুন-কেনা খেল্‌না নিয়ে, মনের আনন্দে।

দোকানি আর পার্‌ল না থাক্‌তে। সেই পছন্দ-করা পুতুলটা নিয়ে সে গেল শিশুর কাছে, তা'র মায়ের কাছে।

—খুকুমণি, পুতুলটা তুমি নিলে না?

—না, আমার পয়সা নেই; আমি নেব না।

দোকানি বল্‌ল—না, তোমার পয়সা লাগ্‌বে না, এ যে তোমারই পুতুল।

খুকুমণি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে তা'র মায়ের দিকে—আদেশের প্রতীক্ষায়।

সলজ্জভাবে মা আপত্তি জানায়—অম্‌নি দিলে আপনার লোকসান হবে যে। আপনি দেবেন না।

লোকসান হ'বে না মা। ছেলেদের আনন্দেই আমার দোকানের লাভ।

...খুকুমণির মুখ আনন্দে মুখর হয়। পুতুল বেজে ওঠে বাঁশীর সুরে।

করজোড়ে দোকানী ভিক্ষা চায় মায়ের কাছে—মা, আজ আমায় আশীর্ব্বাদ করো, আমার খেল্‌না যেন সকল শিশুর হাতেই আমি দিতে পারি। তা' হ'লেই আমার দোকান হ'বে সার্থক—ধন্য হবে আমার জীবন। তুমি এই আশীর্ব্বাদ করো মা।

পল্লীবধূর চোখ দুটী ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌ল—নীরব ভাষাতেই সে তা'র কৃতজ্ঞতা জানায়।

আবার দোকানি তা'র ডোঙা নৌকা খুল্‌ল গ্রামান্তরের উদ্দেশে।

পল্লীবধূ চেয়ে থাকে সেই দিকে নির্নিমেষ নয়নে,—যতক্ষণ না দূরে নদীর মাঝে দোকানির ডোঙা মিলিয়ে যায়।

দোকানির মনে আজ বিপুল আনন্দ।

বিভাস—একতালা

জাগিয়ে গোপাল লাল পল্লীবন বোলে।
চন্দ্র কিরণ শীতল ভই, চকই পিয় মিলন গই,
ত্রিবিধ মন্দ চলত পবন পল্লব দ্রুম ডোলে।
প্রাত ভানু প্রকট ভয়ো রজনীকো তিমির গয়ো
ভৃঙ্গ করত গুঞ্জ গান কমলন দল খোলে॥

ব্রহ্মাদিক ধরত ধ্যান সুর নর মুনি করত গান
জাগন কী বের ভই নয়ন পলক খোলে॥
তুলসীদাস অতি আনন্দ নিরখি কে মুখারবিন্দ
দীনন কো দেত দান ভূষণ বহুমোলে॥

কথা—তুলসীদাস   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ

(সঙ্গীত রত্নাকর)

আস্থায়ী—

২´   ৩   ০   ১
সা -া রা । গা -া গা । পা -া পা । না -ধা ধা I
জা ০ গি   য়ে ০ গো   পা ০ ল   লা ০ ল

পা গা গপা । ধনা ধা পা । গপা রা গা । রসা সা -া I
প ০ ল্লী০   ০০ ব ন   বো০ ০ ০   লে০ ০ ০

সা -সন্‌া ধ্‌া । সন্‌া রা সা । সা রা গা । গরা সা -া I
চ ০০ ন্দ্র   কি০ র ণ   শী ত ল   ভ০ ই ০

সা রা গা । -পা পা পা । পা ধা ধা । পনা ধা -া I
চ ক ই   ০ পি য়   মি ল ন   গ০ ই ০

র্সা র্সা র্সা । র্সনা র্রা র্সা । র্সা না ধা । না ধা পা I
ত্রি বি ধ   ম০ ০ ন্দ   চ ল ত   প ব ন

গা পা ধা । র্সা ধা পা । গপা ধনা র্সনা । ধপা গরা সন্‌া I
প ০ ল্ল   ব দ্রু ম   ডো০ ০০ ০০   লে০ ০০ ০০

অন্তরা—

পা গা গা । প্মা ধপা ধা । র্সা র্সা র্সা । র্সর্রা র্সা -া
(১) প্রা ০ ণ ভ ০০ রু [illegible] ক ট ভ০ য়ো ০
(২) ত্র ০ স্ত দি ০০ ক [illegible] র ত ধ্যা০ ০ ন
(৩) তু ল সী দা ০০ স অ তি আ ন০ ০ ন্দ

র্সা র্রা র্সর্রা । র্গা র্রর্সা র্সা । র্রা র্সা নধা । না ধপা -া
(১) র জ নী০ ০ কো০ ০ তি মি র০ প য়ো০ ০
(২) সু র নঁ০ র মু০ নি ক র ত০ গা ০০ ন
(৩) নি র খি০ ০ কে০ ০ মু খা র০ বি ০০ ন্দ

পা ধপা ধা । ধা র্রা র্সা । র্সা না ধা । না ধা পা I
(১) তু ০০ জ ক র ত ভু ০ ঞ্জ গা ০ ন
(২) আ ০০ গ ন ০ কী বে ০ র ভ ই ০
(৩) দী ০০ ন ন কো ০ দে ০ ত দা ০ ন

গা পা ধা । র্সা ধা পা । গপা ধনা র্সনা । ধপা গরা সনা I
(১) ক ম ল ন য় ন খো ০০ ০০ লে০
(২) ন র ন প র্দ ক খো ০০ ০০ লে০
(৩) তু ০ য প ব ৎ সো ০০ ০০ লে

তান—

২´ ৩ ০ ১
১ম সরা গপা ধনা । পধা র্সর্রা র্গর্রা । র্সর্রা র্সনা ধপা । ধপা গরা সনা I
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২´ ৩ ০ ১
২য় র্গর্রা র্সর্রা র্সনা । র্সনা ধনা ধপা । গপা ধনা র্সনা । ধপা গরা সনা I
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

ইমন্-পূরিয়া মিশ্র—দাদ্‌রা

আজি আমারি কথা
ওগো বিমনা সাঁঝে
তব স্মরণ-বীণে
যেন বারেক বাজে।
যদি আঙিনা-তলে
তব দীপালি জ্বলে,
জ্বেলো একটি বাতি
মোরে স্মরিয়া লাজে।

মৃদু নিশীথ-বায়ে
তব শেফালি-বনে
ভুলে গোলাপ যদি
জাগে আপন মনে।
ঢালি' নয়ন-বারি
জ্বালা জুড়ায়ো তারি
ডাকি' আমারি নামে
প'রো অলক-মাঝে।

কথা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য স্বরলিপি—শ্রীজগৎ ঘটক সুর—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত,
সুরসাগর

+ ২ II
গরা গা II সা -া ন্সা । -ধ্ন্া রা মগা I সা -া -া । -া সা সগা I
আ॰ জি আ ॰ মা॰ ॰॰॰ রি ক থা ॰ ॰ ॰ ও গো॰

I গাঃ -মঃ রগমা । -রগপা পা পধা I পমা -া -া । -া গা মগা I
বি ॰ ম॰॰ ॰॰॰ না সাঁ॰ ঝে॰ ॰ ॰ ॰ ত ব॰

I গরা -া রা । -া ধ্া ন্া I ধ্ন্া -সা -া । -া ন্া ধ্ন্া I
স্ম ॰ র ॰ ণ বী ণে॰ ॰ ॰ ॰ ॰ যে ন॰

I ধপ্া -া প্পা । -া -মা মপা I গমা -গমা -গরা । -সা গরা গা II
বা ॰ রে॰ ॰ ক বা জে॰ ॰॰ ॰॰ ॰ আ॰ জি

+ ২
{ সা সা II মপা -া মপা । -া পর্সা ধা I পা -া -া । -া পর্সা পা I
য দি আ ॰ ঙি ॰ না॰ ত লে ॰ ॰ ॰ ত॰ ব

I গমা -গনধা পর্সা । -ধপা র্সগা গমা I গা -া -া । -া } { গা গমা I
দী॰ ॰॰॰ পা॰ ॰॰ লি॰ জ্ব লে ॰ ॰ ॰ জ্বে লো॰

I মগা -রা -গা । রা -ধ্া ন্া I ধন্া -সা -া । -া } ন্া ধন্া I
এ· · কৃ টি · বা ভি· · · · মো রে·

I ধপ্া -া প্পা । -া -মা মপা I গমা -গমা -গরা । -সা গরা গা II
স্ব · রি· · য়া লা জে· ·· ·· · আ· জি

{ সন্া সা II ন্া -া -ন্া । -া ধ্া ন্া I ধস্া -ধ্া -ধগ্া । -া ধস্া ধ্া I
মু· হু নি · শী · থ বা রে · · · ত ব

I ন্া -া ন্া । -া সা ঋা I সঋা -ন্সা -া । -া সা সগা I
শে · ফা · লি ব নে· ·· · · ফু লে·

I গা -া জ্ঞগা । -পজ্ঞপা গা মা I গা -া -ঋা । -া ঋা ঋা I
গো · লা ·· প থ দি · · · জা গে

I ঋা -সা সা । -া ঋা ন্া I সা -া -া । -া } { সা সা I
আ · প · ন ম নে · · · ঢা লি

[পজ্ঞা —জ্ঞপা]

I সপা -া জ্ঞপা । -া পজ্ঞা ধা I পা -া -া । -া পজ্ঞা পা I
ম · য় · ম বা রি · · · আ· লা

I গমা -গনধা পজ্ঞা । -ধপা জ্ঞগা গমা I গা -া -া । -া } { গা গমা I
তু· ··· ডা· ·· ·· তা রি · · · ডা কি·

I মগা -রগা রা । -া ধ্া ন্া I ধন্া -সা -া । -া } ন্া ধন্া I
আ· ·· মা · রি না মে· · · · প' রো

I ধপ্া -া প্পা । -া মা মপা I গমা -গমা -গরা । -সা গরা গা II II
অ · ল· · ক মা ঝে· ·· ·· · আ· জি

এই গানখানি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত মতিলাল "হিন্দুস্থানে" রেকর্ড করিয়াছেন। গানটি গাহিবার সময় গায়কেরা নিজ নিজ স্কেলের মধ্যমকে "সা" করিয়া লইয়া গাহিবেন।

—স্বরলিপিকার।

ভূমিকম্পে উত্তর বিহার

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মজঃফরপুরে ফিরিয়া দেখিলাম সহরের চারিদিকে ধূলিসাৎ দালানের ধ্বংসস্তূপ। সহরটি শোকে ও আতঙ্কে বিষম আলোড়নে তাহা পৃথক পৃথক হইয়া স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। সেই ধূলিসাৎ গৃহসামগ্রীর নীচে প্রোথিত হইল অসংখ্য হতবুদ্ধি নাগরিক। গোটা লাল ইঁটগুলি স্তূপীকৃত পড়িয়া আছে, কড়িবড়গাগুলি গা ঝাড়া দিয়া পৃথকভাবে পড়িয়া আছে। এগুলি যে কখনো একত্র মালমশলার দ্বারা দালানের সহিত সংযুক্ত ছিল তাহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। জানালা কপাট চৌকাঠ খসিয়া নানা ভাবে পড়িয়া আছে ও দালানের বীভৎসতার বৃদ্ধি করিতেছে। খোলার বাড়ীও রক্ষা পায় নাই।

দ্বারভাঙ্গা মহারাজার নওলখা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—দ্বারভাঙ্গা

ধ্বংসরাশির উপর দিয়া কোনো রকমে পথ করিয়া সহর পরিদর্শন মুহ্যমান ও নীরব। এই শ্মশানদৃশ্য দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যেন পাতালের কোন্ দৈত্যপুরীর দানব প্রচণ্ড শক্তিতে পাকা সহরের ভিৎ নাড়া দিয়া বহু শতাব্দীর গড়া জিনিষকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে। সুদীর্ঘ ও গভীর ফাটল কম্পনরেখার পথ ধরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সহরটিকে চিরিয়া চিরিয়া খাঁক করিয়া দিয়াছে। মালমশলা দিয়া মানুষ ইঁটের পর ইঁট সাজাইয়া লোহাকাঠপাথরের কঠিন বন্ধনে যে হর্ম্ম্য রচনা করিয়াছিল ভূকম্পের

দ্বারভাঙ্গা মহারাজাধিরাজের ভগ্ন প্রাসাদ—মজঃফরপুর
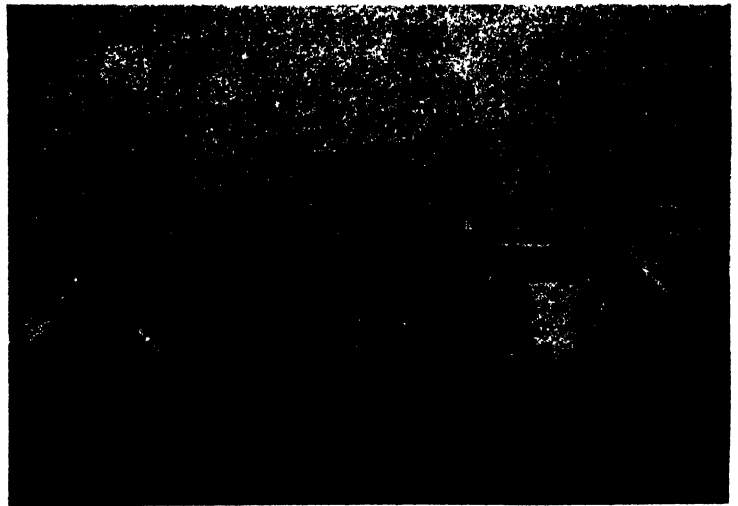
করিলাম। সর্ব্বত্র ভগ্ন-বস্তুর স্তূপ। পথঘাট বাড়ীঘর বাজার চেনা যায় না। গৃহগুলি ধূলিসাৎ নতুবা বিদীর্ণ।

পুরাণী বাজারে সঙ্কীর্ণ গলির ধ্বংস-দৃশ্য—মজঃফরপুর। এই মহাল্লাটির পুনর্গঠন বহুব্যয়সাধ্য ও প্রায় অসম্ভব

বহু জায়গায় বড় বড় ফাটল অতর্কিত পথিকের ভীতি উৎপাদন করে। পুরাণী বাজারে বহুলোক মরিয়াছে। এখানে বহু সঙ্কীর্ণ গলিতে সারি সারি দোকানপাট ও বাসগৃহ ছিল। ভূমিকম্পে এই অঞ্চলটি বিষম বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং ইহার পুনর্গঠন একবারে অসম্ভব ও বহু ব্যয়সাধ্য। এখানকার বাস্তু ভিটার মোহ ত্যাগ করিয়া লোকেদের সহরের অন্য কোনো জায়গায় আবাস গড়িয়া তুলিতে হইবে। কল্যাণী বাজার একটি ব্যবসার কেন্দ্র। এখানে প্রধানতঃ বাঙ্গালীদের ঔষধ সাইকেল প্রভৃতির দোকান, এবং বোসেদের নানা ব্যবসায়। ভূমিকম্পে এই অঞ্চলও আংশিক বিনষ্ট হইয়াছে। চান্দওয়ারা আরেকটি জনপূর্ণ অঞ্চল। এখানে অসংখ্য ফাটল হইয়াছে, বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং প্রাণহানি ঘটিয়াছে। এখানে কোথাও জমি প্রায় ১০।১৫ ফুট নীচে ধ্বসিয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে ভূমির সমতার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং বর্ষায় এখানে গণ্ডক নদীর জলের প্লাবন হইতে পারে আশঙ্কা হইতেছে। আরো সহরের অন্যান্য অঞ্চলে ধ্বংস ব্যাপার কম নয়। সিকান্দ্রাপুর গণ্ডকের তীরবর্ত্তী। এখানে পোলো ও টেনিসের ও বেড়াইবার বিশাল মাঠ। ভূমিকম্পে ইহা ভীষণভাবে ফাটিয়া ধ্বসিয়া গিয়াছে। অতি গভীর ও দীর্ঘ ফাটলে মাঠটি পূর্ণ হইয়াছে। এক এক জায়গায় এক মানুষ সমান ফাটল, ভূখণ্ড নীচের স্তরে নামিয়াছে। বর্ষাকালে এই মাঠটি নদীর কবলে যাইবে আশঙ্কা হয়।
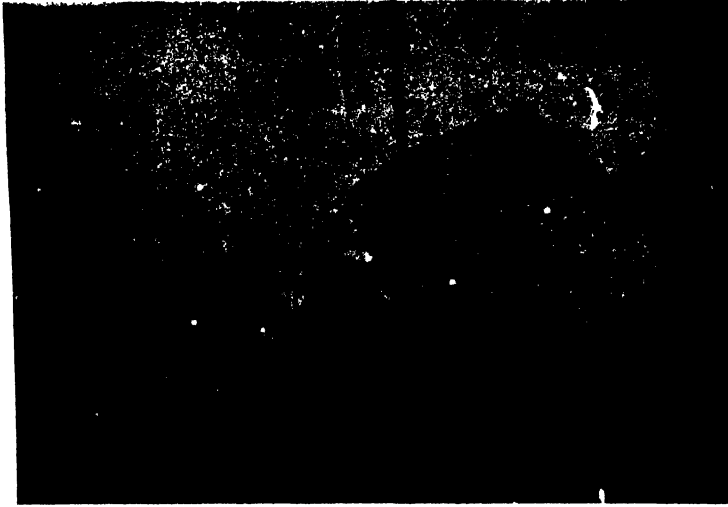
উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ও মতিলাল সেন মহাশয়ের ধূলিসাৎ গৃহ। ভূমিকম্পে প্রবাসী বাঙালীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে—মজঃফরপুর

ভূমিকম্পের দিন আমি মজঃফরপুরে উপস্থিত ছিলাম না,

পরে ঐ ভীষণ দিনের বিবরণ শুনিয়াছি। এই সহরে লোক-সংখ্যা খুব বেশী এবং আন্দোলনের তীব্রতাও বিশেষ অনুভূত হয়। ২-১৬ মিনিটে আফিস-কাছারী-স্কুল, কলেজের সময় ছিল, কাজেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী ও শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা বেশী। নানাস্থানে ধ্বংসস্তূপের ফাঁদে পড়িয়া বহু লোকের মৃত্যু বা জীবন্ত সমাধি হইয়াছে, অথবা সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে। ভূমিকম্পের সময়ে উপর-নীচ আন্দোলন হয় তাহার পর এপাশ ওপাশ এবং পরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। এই to and fro এবং twisting আলোড়নে মানুষকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে। তাছাড়া অনেকে নিরাপদ স্থান হইতে পুনর্ব্বার আপনার জনকে বাঁচাইতে দোলায়মান গৃহে ছুটিয়া তাহার নীচে প্রাণ হারাইয়াছে।

"ক্ষুধিত পাষাণ"—ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ভাদুরীর বাসাবাটী, ইহাতে উপেনবাবু তাঁহার কন্যা ও দৌহিত্রীর মৃত্যু হয়—মজঃফরপুর

একটি বাঙালী অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারের পরিবারে ১১টি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নিজে ভগ্নস্তূপের নীচে প্রোথিত হন। কিন্তু তখনও ফাঁকের মধ্য দিয়া কথা বলিতে সক্ষম হন। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা চলিতে থাকে, সে সময়ে তিনি সহায়কদের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। স্তূপ অপসারণ করিতে করিতে যখন সহায়কেরা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল তখন নাড়াচাড়িতে যেটুকু ফাঁক ছিল তাহা বন্ধ হইল। শেষ হতাশার বাক্য শোনা গেল "তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারলে না" আধঘণ্টা পরে যখন তাঁহাকে উদ্ধার করা গেল তখন তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে।

এভাবে জীবন্ত সমাধি অবস্থায় ৫।৬ দিন থাকিয়া অনেকে তিলে তিলে মরিয়াছেন এমন অনুমান হয়। ৭।৮।১০ দিন পরে জীবন্ত মানুষকে উদ্ধার করা হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই ভগ্ন পাষাণপুরী ভেদ করিয়া সেই আর্ত্তস্বর পাষাণেই মিলাইয়া গেছে, মানুষের কানে পৌঁছায় নাই।

মজঃফরপুর সারাইয়াগঞ্জ বাজার

আলোবাতাস জলের অভাবে পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপের নীচে মানুষের অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু হইয়াছে।

আহতদের কথা কি বলিব? কাহারো পাঁজর ভাঙ্গিয়াছে, কাহারো মাথা ফাটিয়া বড় বড় ক্ষত হইয়াছে, কেহ বা

পঙ্গু হইয়াছে। শীতকালে এই ঘটনা হওয়াতে কতগুলি অতি সত্বর আরাম হইতে থাকে। গ্রীষ্মকাল হইলে আহতদের যে দুর্দ্দশা হইত এবং মহামারির ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইত তাহা নিঃসন্দেহ।

মজঃফরপুর বাজার—ভূমিকম্পের পর

বিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবী আমাদের মজঃফরপুরের বাসিন্দা। তাঁহার স্বামী শেখর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ওকালতী করেন। তাঁহাদের আদরের পৌত্রীটি (অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা) ঠাকুরমার কাছেই থাকিত। তিনি এই নাতনীটিকে আপনার আদর্শ অনুসারে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। ভূমিকম্পে ভগ্নস্তূপের নিষ্পেষণে বালিকাটির শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে। অনুরূপা দেবীও ভীষণভাবে আহত হন। তাঁহার বুকের কয়েকটি পাঁজর ভাঙিয়া যায় এবং তিনি মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পান। মজঃফরপুরে ডাক্তার বলাই রায় চৌধুরীর অক্লান্ত চিকিৎসায় তিনি প্রাণে বাঁচিয়াছেন। তিনি এখন কলিকাতায় আছেন এবং আরোগ্যলাভের পথে সত্বর অগ্রসর হইতেছেন। ডাক্তার বলাই বাবু নিঃস্বার্থভাবে বহু আহতকে অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়াছেন, একথা এখানে উল্লেখযোগ্য।
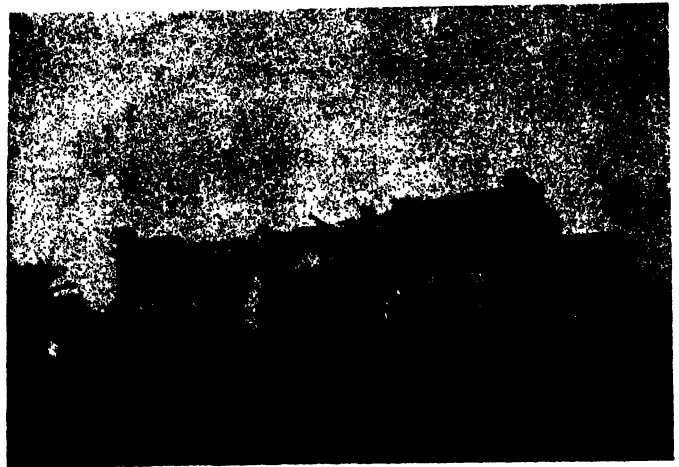
খ্যাতনামা লেখিকা অনুরূপা দেবীর আবাসগৃহ—মজঃফরপুর। এই গৃহে তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হন এবং তাঁহার পৌত্রী অম্বুজ বাবুর ১২ বৎসরের কন্যার অতি শোকাবহ মৃত্যু হয়

ভূমিকম্পে যে সকল পরিবারের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ে আমার প্রতিবেশী ও বন্ধু ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভায়ার কথা। ইনি বাঙালী বৈদ্য, রাজসাহীতে ইঁহার ভাই সুরেন বাবু সরকারী উকীল। উপেনবাবু স্ত্রী ও দুই কন্যা লইয়া দালানের বাহিরে আসেন, তখন মনে পড়িল ছোট তিনমাসের নাতনীটির কথা, সে উপরতলায় ছিল। তিনি অমনি ছুটিলেন সেই বিপদের মুখে তাকে বাঁচাইতে। পিছন পিছন ছুটিল শিশুটির মা, এবং তাহার পশ্চাতে শিশুর এক বোন। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। নির্ম্মম ভগ্ন স্তূপে অদৃশ্য হইলেন—পিতা, কন্যা ও একটি শিশু। ডাঃ ভায়াকে তখনই স্তূপ সরাইয়া

বাহির করা হয় কিন্তু অল্প পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার কোলে পাওয়া গেল সেই তিন মাসের শিশুটি জীবিত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর বাড়ীর উঠান—
এইখানেই তিনি ও তাঁহার পৌত্রী অরুণা চাপা পড়িয়াছিলেন

অবস্থায়। এই প্রাণের কণিকাটিকে বাঁচাইতে তিনটি প্রাণ নিঃস্বার্থভাবে মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দিল। ডাক্তার জায়া অতি সজ্জন ও লোকপ্রিয় ছিলেন। এই মৃত্যুতে সহরের সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী সাংঘাতিক ভাবে আহত হন এবং এখনও শুশ্রূষাধীন।

এমন সাহসিকতার দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়। ডাক্তার অবিনাশ সেনের পরিবারে তাঁহার দুইটি বিবাহিতা কন্যা এবং মাতৃঅঙ্কের ছটি শিশু ধ্বংসস্তূপের নীচে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যখন মহিলা দুটীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হইল তখন দেখা গেল তাঁহারা বক্ষের আশ্রয়ে শিশুদের চাপিয়া ধরিয়া নিজেরা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। পিঠের উপর ভাঙা দালানের দুঃসহ ভার পড়িয়া তাঁহাদের দলিত করিয়াছে, স্নেহপরায়ণ মাতা সেই ধ্বংসলীলায় আপনাদের ভুলিয়া শিশুদের আগলাইয়া পড়িয়া আছেন।"

রবীন্দ্রনাথের "সিন্ধুতরঙ্গ"—পুরীতীর্থযাত্রী তরণীতে আটশত প্রাণীর নিমজ্জন উপলক্ষ্যে লিখিত। এই কবিতাটির কয়েক ছত্র উপরের ঘটনা দুটীর সহিত মেলে, তাই উদ্ধৃত করিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না—

"প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথা-ভরা স্নেহময়
মানবের মন ?

* * * *

ওই যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষপরে সন্তান আপন ?
মরণের মুখে ধায়, সেথাও দিবেনা তায়
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন।

* * * *

জড় দৈত্য শক্তি জানে, মিনতি নাহিক মানে
প্রেম এসে কোলে টানে দূর করে ভয়।"

নবনির্ম্মিত ত্রিতল গৃহের দশা—ইহার মালিক বাঙালী—মজঃফরপুর

ভূমিকম্পে প্রবাসী বাঙালীদের যে দুর্দ্দশা ও ক্ষতি হইয়াছে তা স্বচক্ষে না দেখিলে অনুমান করা যায় না। মজঃফরপুর সহরের কথাই ধরুন। এখানে বহু বাঙালী

উকীল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ও কয়েকটি জমিদারের বাস। যখন বাঙলা-বিহার প্রদেশ এক ছিল, বিহারের সেই শৈশব:

দেওয়ানী আদালত ধ্বংসীভূত—মজঃফরপুর

কাল হইতে অনেক মনীষী বাঙালী নানা কর্ম্মসূত্রে, বিশেষ আইন ব্যবসায়ে, এখানে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহারা এখানকার বহু কল্যাণকর্ম্মে শক্তি নিয়োগ করেন। সেই সকল পুরগামী বাঙালীরা উত্তর বিহারের প্রতি জিলায় পূর্ণিয়া হইতে ছাপরা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়েন এবং বহুধা কর্ম্মে শক্তি ও অর্থ প্রয়োগ করেন। সেই বাঙালীর বহু পুরাতন অট্টালিকাগুলি এই সহরে তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান কালেও বহু আইনজীবী ও ব্যবসায়ী গৃহসম্পত্তি গড়িয়া তোলেন। ভূমিকম্পে বাঙালীদের গড়া সেই সকল বহু সুবৃহৎ গৃহ ভাঙিয়া গিয়াছে এবং এই সকল পরিবারের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। আশ্রয়-সম্বলহীন প্রবাসী বাঙালীদের অন্য কোনো সংস্থানও নাই। এই বাস্তুভিটাতেই পুনর্গঠন কার্য্য সম্পন্ন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে।

সহরের বিপন্ন বাঙালীদের সংখ্যা কম নয় এবং ধূলিসাৎ গৃহ ও ক্ষতির পরিমাণও বিপুল। সমগ্র সহরটীর তুলনায় বাঙালীদের এই গৃহ-সম্পত্তির ক্ষতি অগ্রাহ্য নয়।

দ্বারভাঙ্গাতেও অনেক বাঙালী উকীলের বাসগৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখানেও অনেক বাঙালী অগ্রণী হইয়া বিহারের শৈশব হইতে আজীবন এই প্রদেশের কল্যাণকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। লাহেরিয়া সরাইতে বহু বাঙালীর দ্বিতল গৃহ ভগ্ন হইয়াছে।

বহুযত্নে সঞ্চিত অর্থে নির্ম্মিত এ সকল গৃহ বিনষ্ট হওয়াতে মধ্যবিত্ত লোকেদের অতিশয় দুর্দ্দশা হইয়াছে। এই কথা বিহারের লাটসাহেবের ২রা ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতেও আছে। তিনি বলেন যে সহরে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ব্যবসায়িগণ এবং পেশাদার ব্যক্তিরা। ধনী ব্যক্তিদের কিছু মজুত টাকা আছে, বিপদের দিনে তাহা সম্বল হইবে। মজুর ও কারিগর শ্রেণীর লোকদেরও কাজ জুটিবে, ভাবনা

মজঃফরপুর পুরাণী বাজার—দোকান-পাটের ভগ্নস্তূপ, বিজলী তারের লৌহদণ্ড আনমিত, হতবুদ্ধি লোক দণ্ডায়মান

নাই; কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকেদের সব চেয়ে বেশী দুর্দ্দশা। তাঁহাদের গৃহ পুনর্গঠন করিতে এবং নূতন ব্যবসায় বা পেশা সুরু করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থসাহায্য বা ঋণ না পাইলে ইঁহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না।

গঙ্গার উত্তরতীরবর্ত্তী পাঁচটী জিলা লইয়া উত্তর বিহার, অর্থাৎ পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, চাম্পারাণ ও সারণ। এতদ্ভিন্ন উত্তর ভাগলপুরের দুটি সবডিভিসন এবং উত্তর মুঙ্গেরের এই সীমার মধ্যে পড়ে। উত্তর বিহারকে Cream of Bihar বলা হয়, এই অঞ্চলটি বিহারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শস্যশালী ও সমৃদ্ধ। ইহার মাটিতে অড়হর, মটর, কলাই, বুট, মকই, সরিষা, ধান, (উত্তর ভাগলপুর ও উত্তর চম্পারণে) প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তাহা বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে চালান হয়। দ্বারভাঙ্গার তামাক ও মরিচ, সীতামাঢ়ির তিসি, উত্তর ভাগলপুরের মকই ও কলাই, পূর্ণিয়ার পাট ভারতে বিখ্যাত। এই সকল শস্যের রপ্তানির সূত্রে বহু ব্যবসাদারের এই অঞ্চলে সমাগম।

গণেশজী ভগ্নস্তূপের মধ্যে বিরাজমান—পার্শ্বে মাটীর খেলনা ভগ্নাবস্থায়—মজঃফরপুর

ভূমিকম্পে উত্তর বিহারে যে চাষের ক্ষতি হইয়াছে তাহা অতি বিরাট এবং ভীষণ। চাষীদের দুঃখনিবারণের জন্য বহু লক্ষ অর্থের প্রয়োজন হইবে। বিহারের লাট-সাহেবের ২রা ফেব্রুয়ারীর বিবরণটিতে প্রকাশ যে জাপান ও নিউজিল্যাণ্ডে যে ইহার সমতুল্য ভূকম্পন হয় তাহাতে শুধু ২০ মাইল পরিধি বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু বর্ত্তমান ভূমিকম্পের প্রসার মতিহারী হইতে মুঙ্গের পর্য্যন্ত ১৩৫ মাইল। লাটসাহেব বলেন যে কৃষি বিভাগ ভূপরিদর্শনের ফলে অনুমান করেন যে মজঃফরপুর জিলার প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল জমি এবং দ্বারভাঙ্গা জিলার অর্দ্ধেক জমি ভূমিকম্পের বালি ও জলে বিনষ্ট হইয়াছে।

মজঃফরপুর পুরাণী বাজার

উত্তর বিহার হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত, ইহাকে গঙ্গানদীর উপত্যকাদেশ বলা যাইতে পারে। উত্তর বিহারের

পরই নেপাল-সীমান্ত, যাহাকে 'তেরাই' বলা হয়। এই নদীবিধৌত হিমালয় সন্নিহিত দেশটির মাটি বিশেষ উর্ব্বর। ইহার ভূনিম্নগলিলের স্তর (Subsoil water level) উচুতে থাকার দরুণ এই মাটি ইক্ষু-চাষের বিশেষ অনুকূল। টাকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া ভারতের চিনির সংরক্ষণের জন্য Sugar Industry Protection Act 1932. এই আইন পাশ করেন। তাহাতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় চিনির সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে। প্রথম

মজঃফরপুর—একটি বনেদী জমিদারের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ (পরমেশ্বর নারায়ণ মাহতার গৃহ)

মজঃফরপুর কল্যাণীর রাস্তা

পূর্ব্বে এখানে কয়েকটি মাত্র চিনিকল ছিল। তাছাড়া Open Pan System-এ কিছু চিনি প্রস্তুত হইত। জাভার চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় এতদিন এই ব্যবসায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। কিন্তু ভারতসরকার প্রায় আটকোটি আট বছরে বিদেশী চিনির উপর ৭।০ প্রতি হন্দর শুল্ক বসিল। ইহার পর ১৸৴০ সারচার্জ্জ বসিয়া প্রতি হন্দর ৯৴০ শুল্ক বসিল। তাহাতে বিদেশী চিনির আমদানী কমিল, সরকারী শুল্ক দশ হইতে দুই কোটিতে দাঁড়াইল

কিন্তু ভারতের চিনির কারবারের প্রসারের পথ সুগম হইল এবং জাভার চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চিনি দাঁড়াইতে সক্ষম হইল। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসরের ভারাক্রান্ত হয়। ১৯৩২ সালের আইন পাশ হইলে বহু চাষী অন্য আবাদ ছাড়িয়া আকের চাষ ব্যাপকভাবে আরম্ভ করিয়াছে। এই ইক্ষুচাষে ইহাদের দুঃখের অবসান হইয়াছে। গত বছর এই আইন প্রচলনের পর চিনির কারখানাগুলির যথেষ্ট মুনাফা হয়। অধুনা চিনির কলের সংখ্যা অতিরিক্ত বাড়িতেছিল, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী অর্থসচিবের বাজেটের বক্তৃতায় তাহার ইঙ্গিত আছে। এই আশঙ্কায় ১।/০ বিদেশী চিনির সারচার্জ শুল্ক উঠাইয়া আগামী ১৯৩৪-৩৫ সালে তাহা ভারতীয় চিনির উপর excise duty হিসাবে বসানো হইল।

মজঃফরপুর পুরাণী বাজারের দৃশ্য—
একটি দ্বিতল ছাদ হইতে এই ছায়াচিত্র গৃহীত। ভগ্ন দ্বিতল গৃহের সারি।

ভূমিকম্পে উত্তরবিহারে ছয়টি চিনিকল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং দুটী আংশিক বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভীষণ ধ্বংসব্যাপারে ইক্ষুচাষীদের বিষম ক্ষতি হইয়াছে। কারণ ঐসকল কারখানার মালিকদের এখন

মধ্যে এই চার জিলায় বহু চিনির যৌথকারবার দেখা দিয়াছে।

উত্তরবিহারে এখন নিম্নলিখিত সংখ্যার চিনির কল বিদ্যমান। ইহার মধ্যে কোনো কোনো কারখানায় এখনো সম্পূর্ণরূপে কল বসাইয়া কাজ সুরু করে নাই।

জিলা	সংখ্যা
সারণ	১১
চাম্পারাণ	৮
মজঃফরপুর	৩
দ্বারভাঙ্গা	৫
পূর্ণিয়া	১
	২৮

পুরাণী বাজারে ধ্বংস-স্তূপ—মজঃফরপুর

১৯৩১ সাল হইতে উত্তরবিহারে চাষীরা অর্থসঙ্কটের দরুণ শস্যের মূল্য হ্রাস হওয়াতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও ঋণ-

আকের ফসলে প্রয়োজন নাই। চিনিকলগুলি নভেম্বর হইতে, এপ্রিল পর্য্যন্ত ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে ক্ষেতের আক ক্রমে ক্রমে কারখানায় চালান হয়। কোনো কারণে কল বিগড়াইলে ইক্ষু চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চিনিকলের বিনষ্টির দ্বারা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষের মত ইক্ষুর বিক্রয় সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।

ভগ্ন স্তূপের মধ্যে পথিপার্শ্বে পানের দোকান—মজঃফরপুর

বিহার সরকার ইতিমধ্যে ১০০০টি ছোট বলদ-চালিত 'ক্রশার' এই বিধ্বস্ত অঞ্চলে বিতরণ করিয়াছেন। এই কলে আক মাড়াইয়া আগুনে জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত হইবে এবং এই গুড়ের ক্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উদ্বৃত্ত ইক্ষু যাহাতে চালান করিয়া দূরবর্ত্তী চিনিকলে বিক্রয় করা যায় সেজন্য রেল কোম্পানী মাশুল কমাইতে স্বীকার করিয়াছেন। চাষীদের সমুদয় উদ্বৃত্ত আকের সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা অবিলম্বে না করিলে ক্ষেতের ফসল শীঘ্র নষ্ট হইবে, এখনো বহু 'ক্রশারের' প্রয়োজন আছে। ইহা ছাড়া চাষীদের ইক্ষু যাহাতে কলওয়ালারা সস্তা দরে না কেনে তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতে হইবে। গত বছর চাষীরা ধনী কারখানার মালিকদের কবলে পড়িয়া কোথাও কোথাও নগণ্য মূল্যে আক বেচিয়াছে এমন জনশ্রুতি শুনিয়াছি।

ভূমিকম্পে বহু অঞ্চলে চাষের জমি ভূগর্ভনিঃসৃত বালিতে পূর্ণ হইয়া মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। পল্লীগ্রাম পরিদর্শন করিলে এই দৃশ্য চোখে পড়ে। শস্যশ্যামলা ভূমি ৫।৬ ফুট বালির নীচে অদৃশ্য হইয়াছে; বহু ক্ষেত জলাকীর্ণ হইয়াছে। ভূমির সমতার পরিবর্ত্তন হওয়াতে বর্ষাকালে বহু গ্রাম দুর্গম হইবে এবং নদীর গতি পরিবর্ত্তন হওয়াতে সীতামাঢ়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। জমির এই বালির অপসারণ বহু ব্যয়সাধ্য, হয়তো অনেক ভূখণ্ড ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং

ধ্বংস স্তূপ অপসারণ—
Sapper ও minerগণ দালানের ভগ্নাংশ ফেলিতে ব্যাপৃত—মজঃফরপুর

সেখানকার অধিবাসীদের অন্যত্র গৃহপত্তন করিতে হইবে।

ভূমিকম্পে ভগ্ন ইস্কেপ্ সেতু
একটি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এই দুরাবস্থা (সারণ জিলা)

উত্তর বিহার পলিমাটির দেশ, ভূমির সমতার সামান্য পরিবর্ত্তনে নদীর স্রোত ফিরিয়া যায়। উত্তর ভাগলপুরে গত দশ বছর হইতে কোশি নদী (কৌশিকী) যে সাংঘাতিক ধ্বংস সাধন করিতেছে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ধারণা করা যায় না। এই নদীর নিয়ত গতি পরিবর্ত্তনের ফলে বহু জমি বালুতে ও ঝাউকাশের জঙ্গলে পূর্ণ হয়। এখানে অসংখ্য বন্য শূকরের উৎপাত হয়। চাষের কোনো উপায় থাকে না। তারপর বহু বছর গত হইলে এই বালির উপর কিছু পলিমাটি পড়ে, অন্যান্য গাছ জন্মায় এবং ক্রমে মাটির সমাগম হইলে অনেক পরিশ্রম করিয়া পুনরায় আবাদ করা যায়।

বর্ত্তমান ভূমিকম্পে জমিতে বালিস্তরের সঞ্চার হওয়াতে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী—এই সকল উৎপাত হইলে এখানকার অধিবাসীদের দুর্দ্দশার চরম সীমা উপস্থিত হইবে। উত্তর বিহারকে বাঁচাইতে হইলে বহু অর্থের বহুবর্ষব্যাপী পুনর্গঠন কার্য্যের প্রয়োজন হইবে।

বি, এন, ডবলিউ, রেলওয়ের এজেন্ট ১২ই ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে ভূমিকম্পে রেলপথের অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন ছাপরাতে গোগরা নদীর উপরের ইস্কেপ সেতু বিনষ্ট হইয়াছে, ইহার সংস্কারে তিন লক্ষ টাকা লাগিবে। কম্পনে গঙ্গা ও গোগরা নদীর গতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি আরো বলেন, রেলের বড় বড় সেতু কম্পনের বেগে নানা আকারে বিকৃত হইয়াছে, কোথাও সেতু সম্পূর্ণ উঠিয়াছে, কোথাও নদীগর্ভে ধ্বসিয়াছে, কোথাও ধনুকের আকার ধারণ করিয়াছে। একটি সেতুর মাঝের ১২ ফিট স্তম্ভটি হঠাৎ ২ ফুট ঠেলিয়া উপরে উঠিয়াছে। এই রেলপথের ৯০০ মাইল লৌহবর্ত্ম ভূমিকম্পে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কোথাও লাইন বাঁকিয়াছে, কোথাও বন্যাবিধ্বস্ত হইলে যে আকার হয় সেই রূপ ধারণ করিয়াছে। বহু সেতুর ইঁটের গাঁথনীতে ফাট ধরিয়াছে। লোহার সেতুগুলি

ভূমিকম্পে ভগ্ন ইস্কেপ্ সেতু
ছাপরা হইতে ১১ মাইল দূরে সরযূ (গোগরা?) নদীর উপরিস্থিত। (সারণ জিলা)

বিশেষ বিনষ্ট হয় নাই। সম্পূর্ণ সংস্কার সম্পন্ন করিতে বহু বৎসর লাগিবে এবং অন্ততঃ ২০ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

সারণ জিলাতে গণ্ডক নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইলে ঐ জিলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ বন্যাপ্লাবিত হইবে। সরকার এই আশঙ্কায় বাঁধগুলির মেরামতের কাজে নিযুক্ত আছেন।

রেল সেতুর প্রলয় নাচন—
সাহেবপুর কামালের নিকটবর্ত্তী বড় গণ্ডক নদীর ভগ্নসেতু—
বিরাট স্তম্ভ দ্বিখণ্ডিত হইয়া সরিয়া গিয়াছে। (উত্তর মুঙ্গের)
(শ্রীরাধারমণ ঘোষ (সমস্তিপুর) কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

হায়াঘাটের নিকটবর্ত্তী ভগ্ন রেল-সেতু
(দ্বারভাঙ্গা জিলা)
(শ্রীরাধারমণ ঘোষ (সমস্তিপুর)
কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)
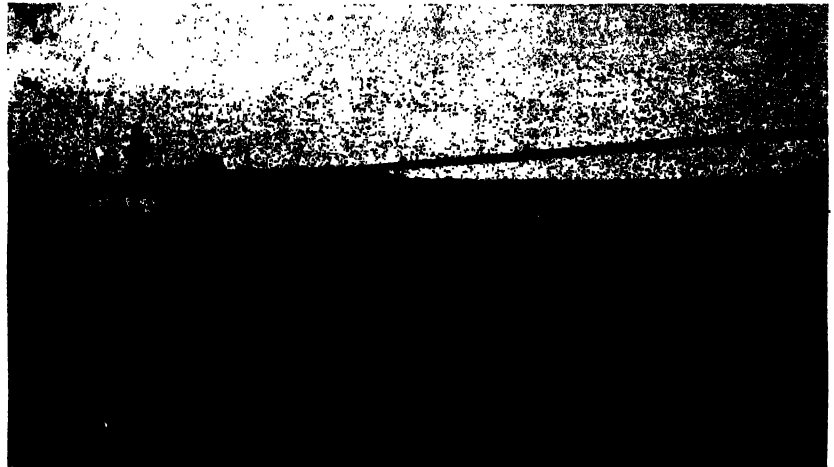
পূর্ব্বে বি, এন, ডবলিউ রেলের কিছু লাইন তিরহুত ষ্টেট রেলওয়ে নামে অভিহিত ছিল। ইহা ভারত-সরকারের সম্পত্তি, কিন্তু ঐ কোম্পানীর হাতে পরিচালনের জন্য ন্যস্ত। সরকারী রেলপথের ক্ষতির পরিমাণ (E. I. R, B. N. W. R, E. B. R) ১ কোটি টাকা।

বৈজ্ঞানিকদের মতে নানা কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিশাল পাহাড় আছে এবং বহু গহ্বর আছে। নানা নৈসর্গিক কারণে এই সকল গিরিগহ্বরের স্থানচ্যুতি হয়, সম্ভবতঃ চাপের তারতম্যে ইহাদের নড়চড় হয়, সেই আলোড়নে ভূকম্পনের উদ্ভব হইয়া থাকে; তাহার ফলে

ধরা-বক্ষ আন্দোলিত হয়, এবং পৃথিবীর মাটির আবরণ বিদীর্ণ হয়। এই কম্পনের বেগ তীব্র হইলেই মানুষের

ভূমিকম্পে রেল লাইনের বক্ররেখা ধারণ—ইহা হইতে আলোড়নের প্রচণ্ডতা বুঝা যাইবে। (দ্বারভাঙ্গা জিলা)
(শ্রীরাধারমণ ঘোষ (সমস্তিপুর) কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

গড়া নানা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস হয় এবং বিষম প্রাণহানি হয়। ইহা ছাড়া আগ্নেয়গিরির সন্নিহিত অঞ্চলেও ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়। ভূগর্ভের বাষ্প ও উষ্ণধাতু অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উৎস্থত হইবার চেষ্টা করে, তাহাতে সেই অঞ্চলে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূবক্ষের বিরাট পাহাড়গুলিরও স্থানচ্যুতি হয়, তাহাতেও ভূমিকম্প হয়। যে সব ভৌগলিক সীমায় পাহাড়গুলির শৈশব কাল এখনো অবসান হয় নাই এবং তাহাদের ভাঙাগড়া চলিতেছে, সেখানে ধরা-পৃষ্ঠের আন্দোলন চলিতে থাকে।

গত ১লা মাঘ যে ভূমিকম্প হয়, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে তাহা অগ্ন্যুৎপাত-সম্ভূত নহে, ভূগর্ভের এই গিরিগহ্বর ও আয়তনের স্থান-চ্যুতি হওয়াতেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। তবে অনেকে মনে করেন হিমালয় পাহাড়টিতে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি আছে, তাহারই জাগরণের সূচনা হইল গত ভূকম্পনে। এই ধারণাটি অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরা সমর্থন করেন না এবং সরকারী ভূতত্ত্ববিদগণের যে গবেষণা সুরু হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ

কিষণপুরের নিকট রেল সেতুর দুর্দ্দশা—একটি প্রস্তর স্তম্ভ সটান নদীবক্ষে শায়িত। (দ্বারভাঙ্গা জিলা)
(শ্রীরাধারমণ ঘোষ (সমস্তিপুর) কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

না হইলে সঠিক কিছু বলা যায় না। গত ভূমিকম্পনের পরিধিটিকে ডাঃ সেন মহাশয় একটি ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের মধ্যে ফেলিয়াছেন। কাটমুণ্ডু, ছাপরা, ও ভাগলপুরের

সীমারেখার মধ্যে যে ত্রিভুজ পড়ে ভূমিকম্পের যথার্থ কেন্দ্র তাহার অন্তর্ভুক্ত।

গত ভূমিকম্পের ফলে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহাশয় তাহার যে তালিকা দিয়াছেন তাহা

পূর্ণিয়া সহরের কাপ্টেনস্ ব্রীজ কম্পনের প্রাবল্যে লৌহস্তম্ভ ভাঙ্গিয়াছে (পূর্ণিয়া জিলা)

ধ্বংস স্তূপের কঙ্কাল পরিষ্করণ—মজঃফরপুর

উদ্ধৃত করিলাম—ধ্বংসস্তূপ নিষ্কাশন ও সম্পত্তি উদ্ধার; বালুপূর্ণ কূপের খনন; বাসগৃহ ও প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন; চাষের জমির বালি অপসারণ; ক্ষেতের শস্য ও জমি বিনষ্ট হওয়াতে যে খাদ্যাভাব হইবে তাহার দূরীকরণ; ব্যবসায় ও পেশার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়তা; জমির বালি অপসারণ অসম্ভব হইলে তথাকার অধিবাসীদের অন্যত্র গৃহপত্তনের ব্যবস্থা; সরকারী খাজনা আদায়ে সাহায্যদান; ইক্ষুফসলের বিক্রয়-সমস্যার সমাধান। পাটনার অর্থনৈতিক অধ্যাপক মিঃ বাথেজা (Prof. Batheja) কয়েকটি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে 'Gift' 'Taxation' 'Loan' এই তিনটির দ্বারা বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সহরতলীতে জমি খরিদ করিয়া নূতন সহর গড়িতে হইবে। তিনি কম্পন-পীড়িত স্থান সমূহের রেলের টিকিটে টারমিনাল ট্যাক্স বসানো (যেমন

হাওড়ার আছে), পথ ও সেতুর পারাণী বসানো, কম্পন-বিধ্বস্ত সহরের পণ্যদ্রব্যের উপর চুঙ্গী বসাইয়া মিউনিসি-

ভগ্ন গৃহ হইতে আসবাবপত্র উদ্ধার—মজঃফরপুর
এই গৃহের মালিক মজঃফরপুরের উকীল শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী।

প্যালিটির আয়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানা আভাস দিয়াছেন।

আর্ত্তত্রাণ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ হইতে বহু বিভাগে নানা কাজ হইতেছে। আহত চিকিৎসা, কুটীর নির্ম্মাণ, কম্বল ও চাউল বিতরণ, স্তূপ-নিষ্কাশন, পথ ও সেতুর সংস্কার, কূপ-সংস্কার, টিউবওয়েল স্থাপন, ছোট চিনিকল বিতরণ, ভগ্নগৃহ-নিপাতন, সহরের পথ পরিষ্কার, গৃহসম্পত্তির পাহারা দেওয়া ইত্যাদি নানা কর্ম্মে সকল বিভাগের রাজ-কর্ম্মচারিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। কালেক্টারের আদেশে ও চেষ্টায় সহরগুলিতে বাজারদর সংরক্ষিত হইয়াছে এবং অসঙ্গত লাভের উপায় বন্ধ হইয়াছে।

কূপের বালি নিষ্কাশন—মজঃফরপুর

ভূমিকম্পের আরম্ভেই বড় লাট সাহেব যে আবেদন জারি করেন এবং নানা চেষ্টা করেন তাহার ফলে Viceroy's Fundএ এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। ভারত সরকার বর্ত্তমান বাজেটের উদ্বৃত্ত হইতে বিহার সরকারকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বিহারের লাটসাহেব অনতিবিলম্বে বিমানবিহারে বিধ্বস্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া সাহায্যের সুব্যবস্থা করেন। বিহারের মন্ত্রী আবদুল আজিজ সাহেবও ইক্ষু-সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং উত্তর-বিহার ও মুঙ্গের পরিদর্শন করিয়া নানা কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত বিভাগীয় কমিশনার, জিলার কালেক্টার, পুলিশ সাহেব প্রভৃতি বহু কর্ম্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। নানা Special কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া বিহারসরকার ভূমিকম্পের বিরাট সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত আছেন।

সরকারী সাহায্য দান ছাড়া বহু বেসরকারী সহায়ক

"এস এস হে তৃষ্ণার জল"
টিউব ওয়েল (Tube Well) খনন—
বহু কূপ বালুপূর্ণ ও শুষ্ক হওয়াতে জলকষ্ট হইয়াছে—মজঃফরপুর

তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটি, মারওয়ারী রিলিফ সোসাইটী, মেমন রিলিফ কমিটি, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন (I. M. A.), রামকৃষ্ণ মিশন, ভোলানন্দ-গিরি সমিতি, বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতি এবং কল্যাণব্রত সঙ্ঘ। ইহা ছাড়া বহু সহায়ক সমিতি ক্রমে ক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন।

কল্যাণব্রত সঙ্ঘ বাঙালীদের পক্ষ হইতে আর্ত্তত্রাণের জন্য গঠিত হয়। এই সঙ্ঘ বাঙালীদের ওরিয়াণ্ট ক্লাবের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে বহু কুটীর রচনা করিয়া প্রধানতঃ বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারদের আশ্রয় দান করিয়াছে। তাহা ছাড়া নানা হিতকর্ম্মে তাহারা প্রথম হইতে নিযুক্ত আছেন। ইহার অধিনেত্রী লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসান কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া ২৩শে জানুয়ারী হইতে আহত শুশ্রূষা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। অগণিত আহতদের বাড়ী বাড়ী গিয়া ইঁহারা প্রতিদিন শুশ্রূষা করিয়াছেন। পুরাণীবাজার অঞ্চলে যেখানে ধ্বংসলীলা ভীষণ হয় সেখানে ইঁহারা প্রতি গৃহে অনুসন্ধান করিয়া রোগীদের ড্রেসিং ও ব্যাণ্ডেজিং করিয়াছেন। তাছাড়া ইঁহাদের শিবিরেও বহু রোগী ভর্ত্তি হয়।

উত্তরবিহারে সন্ত্রাসের অবসান হয় নাই, সমিতি ও কর্ম্মী ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত সহর ও গ্রামগুলিতে নানা কল্যাণ-কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই সাহায্যকল্পে অসংখ্য সেবা-সমিতি ব্যাপকভাবে কাজ করিতেছেন। তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহাশয়ের সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটিতে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে, কলিকাতা মেয়রের ফাণ্ডে সাড়ে চার লক্ষ সংগৃহীত হইয়াছে। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই যে সকল সমিতি কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া কাজ সুরু করেন

টিউব ওয়েল খনন—মজঃফরপুর। (শ্রীকুলপ্রসাদ সেনগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত চিত্র)

কারণ কম্পনের বিরাম নাই। ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই ভূমির আলোড়ন মানুষকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সহরবাসী এখন কুটীর ও শিবিরেই কালযাপন করিতেছে। পাকা দালানে রাত্রি যাপন নিরাপদ নয়। কখনো কখনো এই কম্পন বেশ নাড়া দিয়া মানুষকে ঘরে-বাইরে ছুটাছুটী করাইয়া নাকাল করিতেছে। তাহার উপর ভবিষ্যদ্বাণীর বিরাম নাই। কখনো কম্পন, কখনো তুফান, কখনো মহাপ্রলয় ঘোষিত হইতেছে, বিশ্বাস-পরায়ণ জনসাধারণের আশঙ্কার অবসান নাই। এদিকে সীতামাঢ়িতে অগ্ন্যুৎপাতের নানা নিদর্শন কল্পনা করিয়া লোকে ত্রাসের বৃদ্ধি করিতেছে। সেখানে নাকি গুরু গুরু ডাক মাটির নীচে প্রায় শোনা যায়।

তাঁবুতে দেওয়ানী আদালত—মজঃফরপুর

মহেঞ্জদারোর কথা মনে পড়িতেছে। ৫০০০ বছর পূর্ব্বে একটি বর্দ্ধিষ্ণু সহর কিরূপে ভূগর্ভে প্রোথিত হইল তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। আধুনিক ভূকম্পন হইতে গুরুতর কোনো কম্পনে সিন্ধুবিধৌত এই নগরীর সভ্যতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল এই অনুমান হয়। বন্ধুবর বলিতেছেন "বাড়ী বাড়ী কিছু শিলালিপি তৈরী কর। যদি উত্তর-বিহারও মহেঞ্জ-দারোর পথানুবর্ত্তন করে তবে বহুযুগ পরে এই শিলালিপি গুলিতে ইহার পরিচয়-সাধন সহজ হইবে।"

তবে বৈজ্ঞানিকগণ ভরসা দিতেছেন আর ভয় নাই। বড় ভূমিকম্পের পরে এমনি ছোটখাট আন্দোলন হয়। অগ্ন্যুৎপাত স্বরূপ কোনো উৎপাতের নাকি আশঙ্কা নাই।

তাঁবুতে মুন্সীফের আদালত—মজঃফরপুর
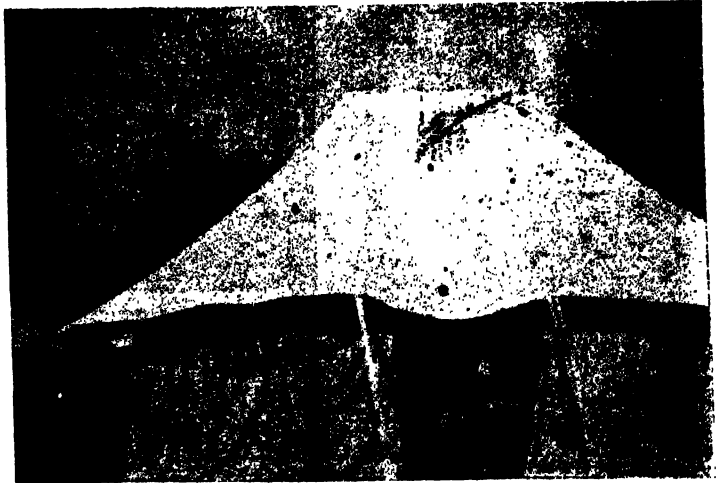
প্রকৃতির এই আভ্যন্তরীন হিসাবনিকাশ চলিতে থাকুক, ততদিন পর্য কুটীরে দিন যাপনের আনন্দ উপভোগ

আশ্রিতদের কুটীরের দৃশ্য মাড়ওয়ারী মহিলাদের গৃহস্থালী—মজঃফরপুর

ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল এসোসিয়েসন্ (I.M.A.)-এর শিবির—মজঃফরপুর
(শ্রীকুলপ্রসাদ সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক গৃহীত ছায়াচিত্র)

করা চলিবে। বসুন্ধরা মানুষকে ডাক দিল। নগরীর ইঁট কাঠের পুরীতে সে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া ধরিত্রীর বক্ষ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছিল। তাহার সেই কৃত্রিম রচনা ধ্বংসীভূত হইল, এই ধ্বংসাবশেষের আবর্জ্জনার মধ্যে বসুন্ধরার ডাক পৌঁছাল; আম্রকুঞ্জে ফাল্গুনের পাখীর গানের বিরাম নাই। বনস্থলীতে তৃণাবৃত প্রান্তরে পত্রপুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত প্রকৃতির কোলে সহরের মানুষ পর্ণকুটীর রচনা করিল। দুঃখদৈন্য মৃত্যুশোকের মধ্যেও এই আলোক-বাতাস-আকাশের শান্তি ও মাধুর্য্যে চিত্ত পরিপূর্ণ হোক্।

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

মজঃফরপুর—২২শে ফাল্গুন ১৩৪০

প্রবন্ধলেখক এখনও উত্তরবিহারের ভূকম্প-পীড়িত স্থান সকল পরিদর্শন ক'রে বেড়াচ্ছেন, সুতরাং আগামী সংখ্যায় একটি পরিশিষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা রইল। বিঃ সঃ

পুস্তক পরিচয়

অশোক—(নাটক) শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ; ১২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ; দাম—পাঁচসিকা।

যখনই যে-কোন দেশের সাহিত্যে সার্ব্বজনীন উন্নতি সাধিত হয়েছে, তখনই দেখা গেছে সেই উন্নতির পথে সেই দেশের নাটক এবং নাট্য-সাহিত্যেরও একটি বিশেষ অংশ আছে। অন্যান্য বিভাগের মতো নাট্য-সাহিত্যও জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। লোক-শিক্ষা এবং জাতীয়তা প্রচারের কাজে নাটক যতখানি সাহায্য করতে পারে ততখানি সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগের দ্বারা সম্ভব নয়—একজন রুষ-মনীষী সম্প্রতি এই মত ব্যক্ত করেছেন ; এবং তাঁর সে-মত যে ভীত্তিহীন নয় বর্ত্তমান রুষ-সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে তার প্রমাণের অভাব হবে না।

আমাদের দেশের নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে গৌরব অনুভব করতে পারি—তেমন সৌভাগ্য আজো আমাদের আসেনি। দু'-একখানি ভিন্ন আমাদের সাহিত্যে নাটক নামে যে বইগুলি চ'লে যাচ্ছে তাদের একখানিও সত্যিকারের নাটক নয় ; সেগুলি ইংরাজীতে যাকে Play বলে, তাই।

এই "ড্রামা" এবং "প্লে"র মধ্যে যে তারতম্য আছে তা আমাদের দেশের নাট্যকারগণ বুঝতেন না বা বুঝতে চাইতেন না। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'য়ে যাতে তাঁদের রচনা দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পকেটে অর্থ আনতেও সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তারা নাটক রচনা করতেন—নাটকীয় রীতিনীতির তোয়াক্কা তারা রাখতেন না। রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর", "নটীর পূজা" এবং অন্য দু'-একজন লেখকের দু'-একটি নাটক ছাড়া আমাদের দেশের সকল নাট্যকারদের সম্বন্ধেই উল্লিখিত কথাগুলি খাটে।

অধুনা পাশ্চাত্যদেশে "ড্রামা" এবং "প্লে"-র মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করবার চেষ্টা চলেছে ; অর্থাৎ নাটকীয় নীতি অনুসরণ করেও জনপ্রিয় "প্লে" রচনা করা যায় কিনা, তারই পরীক্ষায় একাধিক নাট্যকার আত্মনিয়োগ করেছেন। নোয়েল কাওয়ার্ড বর্ত্তমানে বিলাতের সব-চেয়ে প্রিয় Playwright ; নাটক লিখে তিনি যত টাকা রোজগার করছেন, এত টাকা অন্য কেউ-ই উপার্জ্জন করতে পারেন নি—শেক্সপীয়র বা বার্ণার্ড শ-ও না। নোয়েল কাওয়ার্ডকে এতদিন আমরা Playwright ব'লেই জানতাম, কিন্তু সেদিন তাঁর এক গুণগ্রাহী সমালোচক কাওয়ার্ডকে প্রথম শ্রেণীর ড্রামাটিষ্ট ব'লে অভিনন্দিত করেছেন ; নোয়েল কাওয়ার্ডের Cavalcade নাটকখানির মধ্যে তিনি উচ্চতম শ্রেণীর নাটকীয়তার পরিচয় পেয়েছেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আজকাল ওদেশের Playwrightগণ তাদের রচনার মধ্যে নাটকীয়তা সঞ্চার করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন।

কিছুদিন ধ'রে আমাদের দেশের নাট্যসাহিত্যের মধ্যেও এই জিনিষটি দেখা দিয়াছে ; নবযুগের এমন দু'-একজন নাট্যকারের নাম করতে পারি যাঁরা তাঁদের রচনার মধ্যে এই সামঞ্জস্য ঘটাবার চেষ্টা করছেন ; নাটকখানিকে জনপ্রিয়, মঞ্চোপযোগী অর্থাৎ অর্থকরী ক'রে তোলবার চেষ্টাও যেমন তাঁদের রচনার মধ্যে ধরা পড়েছে, তেমনি সেই সঙ্গে তাঁদের নাটক প'ড়ে একথা মনে হয়েছে যে নাটকখানিকে অনিবার্য্য-ভাবে নাটকীয় কোরে তোলা এবং তার মধ্যে নাটকীয় নীতি অনুসরণ করার কাজেও তাঁদের অবহেলা এবং অমনোযোগ নেই। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়কে আমরা এই শ্রেণীর নাট্যকারদের মধ্যে গণ্য করতে আনন্দ উপভোগ করছি।

আলোচ্য নাটকখানি পড়লে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে নাটকীয় রীতি-নীতির সঙ্গে নাট্যকারের পরিচয় নিতান্ত

হাল্কা নয় এবং সেগুলিকে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন বিশেষ কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গেই,—তাঁর নাটক সেই কারণে অসার্থক হয়নি। নাটকের ঘটনাগুলিকে পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ ক'রে তার পরিণতিকে কেমন ক'রে অবশ্যম্ভাবী ক'রে তুলতে হয়, সে-বিদ্যা মন্মথ বাবু ভাল কোরেই আয়ত্ত করেছেন। এবং সেই সঙ্গে নাটকের বিষয়-বস্তুটিকে পাঠক ও দর্শকদের কাছে কেমন ক'রে মনোরম-রূপে উপস্থাপিত করা যায়, সে লিপি-নৈপুণ্যও তাঁর বড় কম নয়। আলোচ্য নাটকখানির দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যে-অভিনব উপায়ে তিনি একটি নারীচরিত্রের একটি বিশেষ জটিল দিককে উদ্ঘাটিত করেছেন, তা সত্যিই প্রথম শ্রেণীর রচনা-কৌশলের পরিচায়ক। এমনিতরো উদাহরণ আরও দিতে পারতাম।

'অশোক' নাটকের আর একটি সম্পদ হচ্ছে এর গান। সুপরিচিত শিল্পী অখিল নিয়োগী গানগুলি রচনা করেছেন। প্রত্যেকখানি গান ছন্দ, মিল ও ভাবের ঐশ্বর্য্যে যথার্থ কাব্যরসাশ্রিত হ'য়ে তাদের রচয়িতার দক্ষতা ও কাব্য-শক্তিকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করেছে।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অন্দরের আলো:—শ্রীলালমোহন দে এম-এ প্রণীত। পি, সি, সরকার এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত এবং সুরেশ চন্দ্র দাস এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৬৬ পৃষ্ঠা—মূল্য ১॥০ টাকা।

ছয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি। তন্মধ্যে একটি "পাণিনির পরাজয়" বঙ্গশ্রী মাসিক পত্রে ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন প্রকাশিত হয় তখন পড়িয়াই মনে হইয়াছিল এ গল্প ছাপিবার কোন কারণ ছিল না। বাকী পাচটি গল্প পড়িয়াও ধারণা বদল হয় নাই। লেখকের হাত এখনো কাঁচা, রসবোধ অপরিণত। একটু উদাহরণ দিই :—"হে মা ওলাউঠে, একি চোট খাঁচার দরজাটি খুলিয়া হুস্ করিয়া শ্রীমান আত্মারামকে উড়াইয়া দিও না যেন!"

মুখবন্ধে ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে বলিয়াছেন যে প্রথম রচনায় অসম্পূর্ণতা থাকিলেও লেখকের রচনায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত ও নিদর্শন রহিয়াছে। ভবিষ্যতে তাঁহার রচনা সার্থক হইতেছে দেখিবার কামনায় রহিলাম।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

পদ্মা—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, "গোলাপ পাব্লিশিং হাউস" ১২ নং হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

"পদ্মার" কয়েকটি কবিতা কবির স্বনামে এবং ছদ্মনামে সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইগুলির সহিত নূতন কয়েকটি কবিতা জুড়িয়া বইখানি সঙ্কলিত হইয়াছে।

আজকালকার কোন কবিই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। "পদ্মার" কবিও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবান্বিত। তবে অন্য অন্য কবিদিগের সহিত তাঁহার প্রভেদ এই যে তাঁহার কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের জিনিষ খুব বেশী এবং তাঁহার নিজস্ব জিনিষ অত্যন্ত কম। কোনও কোনও কবিতায় আবার এমন কতকগুলি পদ আছে যাহা অত্যন্ত বেশী রকম কানে লাগে ;—

"ভরা পদ্মার দু'ধারে নিয়ত জাগিছে বালির চর,
কে যেন সুখের এস্‌রাজে শুধু চালায় ব্যথার ছড়।"

অথবা

"লোচন-হরা পরশমণি, আশমানি মোর
বঁধুয়া,
দিল-মজান তোর ছোঁয়াতে ঘোর রঙদার
যাদুয়া।"

প্রভৃতি ধরণের পদগুলিকে আর যাহাই বলা চলুক, কবিতা বলা চলে না। এগুলি কেবল কথার চালাকী মাত্র। ইহার উপর আবার মাঝে মাঝে ছন্দপতনও লক্ষিত হইল।

কিন্তু পঙ্কের ভিতর হইতে পঙ্কজের মত কোনও কোনও কবিতায় স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিতার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—এগুলির সহিত ইহাদের সমগোত্রীয় অন্যান্য কবিতাগুলির কোনও সম্পর্ক নাই। যেমন—

"যেটুকু লুকাতে সবে চাহে যতবার,
নীল নেত্রছায়ে হেরি রহস্য তাহার!"

অথবা—

"লোহার বাসর ঘরে
বেহুলার ব্যথা বুকে জাগে মোর লখিন্দরের তরে।"

—প্রভৃতি।

—এই পদগুলি কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে সাবধানে কবিতা লিখিলে কবির হাত দিয়া ভাল লেখা বাহির হইলেও হইতে পারে।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বিরহ-শতক—শ্রীমতিলাল দাশ এম্-এ, বি-এল্ বেঙ্গল-সিভিলসার্ভিস, মুন্সেফ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলরতন দাশ এম্-এ, বি-এল্, এড্‌ভোকেট, খুলনা।

চারি চরণযুক্ত একশটি বিরহদগ্ধ কবিতার সমষ্টি লইয়া বিরহশতক রচিত। কয়েকটি কবিতা বাদ দিলে প্রায় সকল কবিতাগুলিতেই ভাবের অভাব ও ভাষার দৈন্য চক্ষুপীড়াদায়ক ভাবে ফুটিয়া আছে—এমন কি ছন্দপতনও বহুস্থানে পরিলক্ষিত হয়। এক স্থানে কবি অন্য উপমার অভাবে মকরধ্বজের উল্লেখ করিয়াছেন—

"বৃষ্য যেমন স্বর্ণসিন্দুর নবনীসাথে পিষি"—পৃঃ ২২

—কবির অসাধারণ ভূমাপ্রীতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য;

"ভূমার পরশ সুধাসরস আমারি গৃহকোণে"—পৃঃ ১২
"বেস্ত যাহা হৃদ্য যাহা ভূমারি যাহা জাতি" —পৃঃ ২০
"ক্ষোদিষ্ঠানে দোঁহার রতি ভূমারে আজি বন্দে"—পৃঃ২২
"ভূমার সনে সঙ্গোপনে বাঁধিনু প্রীতি ডুরি"—পৃঃ ৩০
"মুগ্ধা মহীর কণায় কণায় প্রস্ফুট ভূমানন্দ"—পৃঃ৩৪

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

স্বপ্ন-ছবি—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক—লালা বিনয়কৃষ্ণ, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ, মূল্য এক টাকা।

"স্বপ্ন-ছবি"র কবিতাগুলিতে প্রথমেই কয়েকটা ত্রুটি চোখে পড়িল, যাহা কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। কয়েকটা কবিতায় এমন কয়েকটা শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যাহা সাধারণ পাঠকের সহজ-বোধ্য নহে; যেমন—সাধারণ অর্থে 'সমান'; বিভিন্নমূর্ত্তি অর্থে 'বিরূপ'; দ্যুলোক-ভূলোক অর্থে 'রোদসী' ইত্যাদি। এগুলি কবির বৈদিক সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দেয়। কোনও কোনও কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। ইহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় নহে। কোনও কোনও কবিতায় ছন্দের দিকে একেবারেই লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

এই ছন্দের ত্রুটি সব জায়গায় কবি যে ইচ্ছাবশতঃ করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। অনেক কবিতাতে তাহা অনবধানতার জন্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

কিন্তু এসকল ত্রুটিগুলি বাদ দিলে—এমন কি এসকল ত্রুটিযুক্ত কবিতাগুলিকেও বাদ দিলে যাহারা বাকী থাকে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয় এবং সেগুলি যে কোনও ভাল কবির রচনা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। কেবলমাত্র ভাব ও ভাষার জন্য সেগুলি মূল্যবান নহে, সেগুলি আন্তরিকতাতেও সমুজ্জ্বল। সেগুলির ভিতর আমরা এমন একটি কবি-প্রাণের পরিচয় পাই যিনি বেদনা এবং আনন্দ দুইটিকেই সমানভাবে বরণ করিয়া লইয়া নিজের জীবন-দেবতাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রেমে নিজেকে ধূপের মত বিলাইয়া দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের এই আকাঙ্খার আকুলতা প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

"হে পাখী, তোমার আমি!
ঘরের প্রদীপ রাখিবে না আর ধরে'!
আকাশের তারা কোথায় যেতেছে সরে'!
দূর বনানীর গুঞ্জন গেছে নামি'!
হে পাখী তোমার আমি।" (সঙ্গী পৃঃ ১০১)

—বেদনা এই বিলাইয়া দিবার আয়োজনকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে, কারণ বেদনার অনুভূতি ভিন্ন ত' জীবন-দেবতাকে পাওয়া যায় না! তাই—

"তোমার ব্যথা হাওয়ার মত লাগে
আমার রাঙা হৃদয় পুরোভাগে;"

—কারণ,

"আমি তোমার প্রেমে বিলীন হ'তে ক্ষণে
চলেছি আজ পরম আয়োজনে।"

(প্রতিরূপ—পৃঃ ৬৬)

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

Vatious Feats of Hair and Teeth (চুল এবং দাঁতের নানা কেরামতি)—মণিধর (এমেচার) কর্ত্তৃক প্রদর্শিত। ১১নং মধুগুপ্ত লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

পুস্তকখানিতে শ্রীযুত পুলিন দাসের একখানি, প্রোঃ শ্রীযুত রাজেন গুহ ঠাকুরতার একখানি, শ্রীযুত বিষ্ণুচরণ ঘোষের একখানি, শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র দাসের একখানি এবং শ্রীযুত মণিধরের বিভিন্ন সময়ের চারখানি ও নানাবিধ ক্রীড়ারত অবস্থার ছবি নয়খানি মোট সতেরখানি ছবি আছে। প্রত্যেক ছবির তলায় ইংরাজীতে তাহার পরিচয় দেওয়া আছে। পুস্তকের গোড়ায় শ্রীযুক্ত মণিধর যে যে ক্লাবের সভ্য তাহাদের তালিকা এবং পুস্তকের শেষে যেখানে যেখানে চুল এবং দাঁতের সাহায্যে নানারূপ অত্যাশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শন (যথা ভার তোলা, ভাড়ী গাড়ী টানিয়া লইয়া যাওয়া, মোটর থামান প্রভৃতি) করিয়াছেন তাহাদের তালিকা আছে। একজন বাঙালী যুবকের এইরূপ কৃতিত্ব দেখিলে হৃদয়ে সত্যই গর্ব্বের সঞ্চার হয়। ছবিগুলির ছাপা বেশ ভালই, বাঁধাইও সুন্দর। ইহাদের সহিত দাঁত ও চুলের যত্ন লইবার সম্বন্ধে কিছু উপদেশ থাকিলে বইখানি আমোদের সঙ্গে শিক্ষাও দিতে পারিত।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

অন্ধকূপ—(যুগসাহিত্য সিরিজ, দ্বিতীয় সংখ্যা)—শ্রীক্ষিতীশ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ১।২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।/০ আনা।

—ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বমূলক একটি গল্প।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বিতর্কিকা

১। নামের পদবী

শ্রীনীহার রুদ্র

নামের পদবী সম্বন্ধে শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কিছু লিখে অনেকের দৃষ্টি ওদিকে আকর্ষণ করেছেন। বাস্তবিক আর একটা ভাববার কথা বটে।

যদি কোন নারী বন্ধুকে ভিড়ের ভিতর হতে ডাকতে হয় তবে তাঁর কাছে গিয়ে "শুনছেন" বলতে হবে। কেন, তাঁর নাম ধরে দুর হতে ডাকতে কোন বাধা আছে কি? অবশ্য যদি তিনি বন্ধু বা বন্ধু স্থানীয়া হন। পুরুষ বন্ধুকে যদি তুমি, তুই সম্বোধন ও নাম ধরে ডাকতে পারি তবে নারী বন্ধুদেরই বা পারব না কেন!

তবে কথা হচ্ছে ব্যাপারটা বলতে যত সোজা, কাজে কিন্তু ততটা নয়। একটু বাধ বাধ ঠেকে, কিন্তু ওটা অভ্যাসের দোষ, ধীরে ধীরে হয়ত সয়ে যাবে।

আর যাঁরা সম্বন্ধে আমাদের বড় বা গুরুস্থানীয়া তাঁদের জন্য কোন চিন্তাই নাই, কারণ দিদি, বৌদি, কাকীমা ও মাসীমা আমাদের হাতেই আছে দরকার মত প্রয়োগ করলেই চলবে।

আর মেয়েরা তাঁদের মেয়ে বন্ধুকে যখন ডাকেন, তখন দিদি বা নাম ধরে ডেকেই সেরে দেন, কাজেই তাঁদের জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। পুরুষ পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে যে অসঙ্কোচ ব্যবহার আছে, মেয়ে মেয়ে বন্ধুদের মধ্যেও তাই আছে।

শ্রীমতি রুবি বা ইলা দেবী যদি কোন পুরুষের intimate friend (?) হন তবে তাঁকে নাম ধরে ডাকতে বাধা কি? আর যদি শুধু মুখ চেনা বা ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলবার বা জিজ্ঞাসা করবার দরকার হয় তবে, 'দিদি' বা বৌদি বললেই চলবে।

কোন মেয়ের অবর্তমানে আমরা শুধু তাঁর নাম বলে—যথা ইলা দেবী বা রুবি মিত্র পরিচয় দিয়ে কথাবার্তা বলতে যেমন সঙ্কোচ করি না, তাঁর সামনেই বা নাম বলতে সঙ্কোচ করব কেন? হয়ত নাম ধরে ডাকতে বা বলতে—বিশেষতঃ স্বল্প পরিচিতার সঙ্গে—মুখে প্রথমতঃ একটু বাধবে, কিন্তু তুমি, তুই ও আপনির মধ্যে যদি 'আপনি' উঠে যায় তবে গুরুজনদের যেমন তুমি বা তুই বলা অভ্যাস করে নিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে এও অভ্যাস হয়ে যাবে।

ছোট বেলায় গল্প শুনেছিলাম, কে নাকি তার বাবাকে ভিড়ের মধ্যে 'অমুক বাবু' বলে নাম ধরে ডেকেছিল, কারণ ভিড়ের মধ্যে কাকেই বা ডাকবে আর কেই বা সাড়া দেবে। আর মেয়ে বন্ধুদের জন্যও তাই করব—নাম ধরে ডাকব। 'বাবা' বলার একটা উপায় সত্ত্বেও যখন ভিড়ের মধ্যে নাম ধরে ডাকতে হয়েছিল, তখন যেখানে কিছু বলবার নাই সেখানেই বা নাম ধরে ডাকতে পারবনা কেন?

যাক, আশা করি এ বিষয়ে আরও অনেক আলোচনা হবে ও কিছু নূতন সম্বোধন আবিষ্কৃত হয়ে আমাদের অত বড় বোঝাটাকে কিঞ্চিৎ লাঘব করে দেবে।

২। "তুই, তুমি ও আপনি" সম্পর্কে

শ্রীজ্যোৎস্না নাথ চন্দ এম্-এ

কথা বলাটা যে একটা বিশেষ রকমের আর্ট সেটা লক্ষ্মৌয়ের অধুনা আমাদের বালীগঞ্জের ধূর্জটী বাবুই প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে রেওয়াজি সৃষ্টি করেছেন—তাঁর প্রতি এজন্য আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। তুই, তুমি

ও আপ্‌নি নিয়ে বিচিত্রার বিতর্কিকায় উপেনবাবু যে সুষ্ঠু সমালোচনাটীর উদ্বোধন করেচেন তার পেছন থেকেও ওঁর কথোপকথনবিলাসী আত্মাটী উঁকি মারচে। লোকের সঙ্গে কথা কইতে গিয়েই নিশ্চয় উপেন বাবুর মনে এই তিনের ভেতরে পরস্পর কি সম্পর্ক রয়েচে এই প্রশ্নটা জেগেচে। আর সেই সঙ্গে আমার কাছেও একটা "জিজ্ঞাসা"র দাবী এসে পৌঁছেচে।

এই সম্বোধনগুলি যে বিশেষ করেই "সামাজিক" ধূর্জ্জটী বাবুর এই যুক্তিটী মেনে নিয়েও এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে আমাদের প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনে তুই, তুমি এবং আপনি এই তিনেরই এক একটী বিশিষ্ট স্থান এবং প্রয়োজনীয়তা আছে। যে জায়গায় তুমি বলাটাই ঠিক্, সে জায়গায় তুই বললে বেমানানসই হবে। যাকে আপ্‌নি বলাটাই শোভন তাকে তুই বললে বিস্তর অনর্থ ঘটবে। বলতে পারেন যে তুই, তুমি ও আপনি এই তিনের প্রয়োগ সম্পর্কে যখন তুমি কোন uniform standard of use বাৎলে দিতে পারছোনা তখন কি করে বল যে অমুক লোককে "তুই" না বলে "আপনি" বলাটাই বেশী শোভন। এর একটা কৈফিয়ৎ পেশ্ করচি। বিলিতি constitution সম্পর্কে যাঁদের একটা মোটামুটি ধারণা আছে তাঁরাই জানেন যে সে ক্ষেত্রে "conventions of the constitution" বলে রাশি রাশি নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রের কাঠামের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে কেবলমাত্র চলতি নিয়মের দোহাই দিয়ে—আপ্‌নি হাজার বই ঘাটুন, কোথাও এই নিয়মগুলোর একটা লেখা ধরা-বাঁধা authority নেই। তবু তারা চলে গেছে। ভোলতেয়ারের জাতি ভাই Tocqueville তাই বলেচেন যে বিলিতি রাষ্ট্র পরিচালনার কোন নিয়মী-কেতাব নেই। তুই, তুমি, ও আপ্‌নি বিশেষ করেই এই ধরণের একটা সামাজিক 'কন্‌ভেনশ্যান্', সুতরাং কোন ইতিহাসেই এদের জন্ম-তারিখ লেখা নেই। ধূর্জ্জটীবাবু বিদ্বান্ লোক হয়েও একটা বড় রকমের ভুল করেচেন। তাঁর মতে তুই, তুমি ও আপ্‌নি'র জন্মের মূলে রয়েচে সমাজ-গত class-distinction. এটা খানিকটে পরিমাণে সত্য হলেও পুরোপুরিভাবে সত্য নয়। নিম্নতম সমাজের লোককেও আমরা অনেক সময় আপ্‌নি করে বলে থাকি। গোটা কথা হচ্ছে এই যে অধুনা আমাদের সমাজটা ধন-দৌলতের পরিমাণ হিসেবে সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের দিকে পা বাড়িয়েচে। যার টাকা আছে বলে জানি তাকে আপ্‌নি বলতে না বাঁধে সমাজে, না বাঁধে প্রবৃত্তিতে, হোক্ না কেন সে নীচু সমাজের লোক। সুতরাং এতে এই কথাটাই প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা পুরোণো ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ হারিয়ে বসেছি। এটা ভালো-লক্ষণ কি খারাপ-লক্ষণ সে বিচার করবে ভবিষ্যৎ। "ময়লা পোষাক পরা পণ্ডিতকেও, এমন কি ভদ্র মুসলমান ও ভদ্র শূদ্রকেও আমরা তুমি বলি।" ধূর্জ্জটীবাবুর এ কথাটাও আমি মেনে নিতে পারছিনে। ময়লা পোষাক পরা পণ্ডিত, ভদ্র মুসলমান ও ভদ্র শূদ্র আজ আমাদের কাছ থেকে অতি অনায়াসে "আপনি" আখ্যা পাচ্ছেন এতে আমাদের কোন কুণ্ঠা নেই। সুধীর মিত্র মহাশয়ের "তুই কথাটার চেয়ে তুমির সম্মান এক ধাপ্ উঁচুতে" এও ঠিক নয়। কলেজে একসঙ্গে পড়বার সময় যাঁরা আমাকে তুই বলতেন তাঁরা এখন অনেকেই তুমি বলতে সুরু করেচেন—এর পেছনে রয়েচে একটা দূরত্ব-জ্ঞাপক আইডিয়া। তুমি বলে তাঁরা আমাকে সম্মান করচেন না, অধিকন্তু আমাকে অপমান করচেন। অনেক জায়গায় দেখে থাকবেন ছেলে মাকে "তুই" বলে—সে বাড়ীর সেইটেই রেওয়াজ। আরেক্‌টী বাড়ী দেখেচি যেখানে ছেলে এবং মেয়েরা সবাই মাকে "আপ্‌নি" বলে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই ক্ষেত্রে "তুই" এবং "আপনি"ও চলতে পারে এবং চলছে। সুধীরবাবুর লেখার ভেতর পেলুম যে আপ্‌নি (স্বয়ং উপেনবাবু) নাকি তুই, তুমি এবং আপ্‌নির ভেতর এই মামলায় একটা আপোষ দায়ের করেচেন এবং সেই আপোষের ফলে "তুমি"-কে বহাল রেখে বাকী দুটীকে নির্ব্বাসনদণ্ড দিয়েচেন। যদি তা করে থাকেন তো কাজটা ভালো করেন নি, কেন না আমার মতে এদের তিনটীরই এক একটী বিশিষ্ট স্থান রয়েচে এবং সে স্থান থেকে এদের চ্যুত করবার চেষ্টা আদবেই ফল-প্রসূ হবে না। ইংরিজী ভাষাটা বড় ভালো ভাষা। দোহাই আপ্‌নার এই স্বাদেশিকতার দিনে

আমার অপরাধ নেবেন না, তবে কি জানেন এটা বড় খাঁটী কথা যেহেতু এ ভাষায় বড় সুরসাল গালাগালি দেওয়া চলে। গালাগালির সময়ই কেবলমাত্র মানুষ original stateএ ফিরে যায়, অন্য সময়ে সে বুড় সাবধানী। তাই বলছিলুম যে গালাগালির ভাষাই শ্রেষ্ঠ ভাষা। তা'ছাড়া, আরেক্‌টা জিনিষ দেখুন—"you" বললেই সব ল্যাঠা চুকে গেল। তুই, তুমি ও আপ্‌নির বালাই নেই। বুঝি যে এই রকম একটা সুবিধার কথা পেলে ভারি আরাম হত, কিন্তু উপায় কি বলুন্? আমাদের হাইকোর্টের Lordships-দের একটা Full Bench হলেও এ বিবাদ অমিমাংসিতই থেকে যাবে। সুধীর বাবুর মতে আমি যদি আমার বাবাকে তুমি বলি তো তাতে আমার "গোল্লায়"যাওয়া হবে। কিন্তু এ সোজা কথাটা তিনি কি করে ভুল্‌চেন যে বিত্তর ছেলে বিত্তর বাবাকে তুমিও বলে থাকে, আপ্‌নিও বলে থাকে? তাই এই ছোট্ট আলোচনাটুকুনের গোড়াতেই বল্‌ছিলুম্ যে এই তিনের কোন uniform standard of use নেই, থাকাটাও হয়তো সম্ভব নয়। যে যেখানে আছে সে সেইখেনে থাক্ এইটেই হচ্ছে আমার মত। উপেন্‌বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ে তিনি ব্যবহার করেছিলেন "আপ্‌নি", ক্রমে ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সেই অম্‌কালো "আপনি"টা পেকে উঠ্‌লো মধুরতর "তুমি"তে, তাই বলে কি বল্‌বো উপেনবাবু আমার অসম্মান করেচেন? আপ্‌নি কথাটা আমার কাছে একান্ত করেই দূরত্ব নির্দ্দেশক, তবে স্থান বিশেষে এটা সু-প্রয়োজনীয়ও বটে। ধূর্জ্জটীবাবুর শুনলুম সংস্কার আছে, আমার কিন্তু সে বালাই আদবেই নেই।

২ক। তুই, তুমি, আপনি

শ্রীসুধীর কুমার নিয়োগী

তুই, তুমি ও আপনি এই তিনটীর একটীকে রাখা উচিত কি অনুচিত এই নিয়ে যে আলোচনার প্রতিযোগিতা হচ্ছে তাহার অধিকাংশ মত থেকে এই মাত্র বোঝা যায় যে উহাদের তিনটীকে একটী কথাতে Standardised করা দুরাশা ছাড়া কিছুই হবে না। বাস্তবিক ইহাদের তিনটীর একটীকেও বিসর্জ্জন দিলে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনা বেশী। যে যতই উদাহরণ বা যুক্তি দিক না কেন কেহই অস্বীকার করতে পারেন না যে এই তিনটী কথাই সামান্য রূপান্তরিত ভাবে ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। যদি ভারত সমভাবীদের স্থান হত তাহলে উহাদের Standardisation-এর সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু যেখানে সমাজ বা জাতিবিচার সমস্যারই কোনরূপ প্রতিবিধানের সম্ভাবনা নেই সেখানে উপরোক্ত তিনটী কথার ২টী ছাড়িয়া একটী চালান শক্ত নয় কি?. কারণ প্রত্যেক কথাটীই বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উচ্চস্তরের লোক নিম্নস্তরের লোককে "আপনি" সম্বোধন করতে পারেই না যতদিন না জাতিগত পার্থক্যের ব্যবধান কিছু কম হয়। অথচ হিন্দুর মধ্যে জাতিভেদ এত বেশী যে পৃথিবীর সব জাতিকেই পরাজিত হতে হয়। গত মাঘ সংখ্যায় সুশীল বাবু বলেছেন যে মহাত্মা গান্ধির ন্যায় ব্যক্তিকে নিম্নস্তরের লোকদিগের সহিত একাসনে রাখতে মন চায় না। তাই যদি হয় তবে ঊর্দ্ধ ও নিম্নস্তরের লোকদের ভিতর সাম্যভাবই বা আসবে কেমন করে? কিন্তু আমার মনে হয় মহাত্মা গান্ধির মত ব্যক্তি বরং দরকার হলে সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তুই, তুমি ও আপনির যে কোনও একটী ব্যবহার করতে সঙ্কুচিত হবেন না। কিন্তু এ দেশীয় সম্ভ্রান্তকুল অর্থাৎ যাঁরা স্ব স্ব সম্মান রাখতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত তাঁহাদিগের কাছে এ সহানুভূতি পাওয়া দুষ্কর হবে। তাঁরা "আপনি" কথাটী শুনতে ভালবাসেন কিন্তু শুনাতে নারাজ। অর্থাৎ প্রথম দুইটী তাহারা নিজে ব্যবহার করবেন এবং অপরটী অন্যকে ব্যবহার করাবেন এই তাঁদের ইচ্ছা। তাহলেই বোধ হচ্ছে সমাজ সমস্যা না মিটা পর্য্যন্ত এ আলোচনার সিদ্ধান্ত হওয়া দুরাশা মাত্র। ইংরাজ জাতির ভিতর তত জাতিভেদ না থাকাতে একটী কথাকে

Standardised করে নেওয়া শক্ত হয় না। তবুও You কথার সঙ্গে Please বা Sir না দিলে "আপনির" মত শুনায় না।—তাহাদের Good Mornig কথায় যতই সাম্যভাব থাকুক না কেন ওটা Telephone এর উপর্য্যুপরি Hallow বা Yes এর মতই হয়ে গেছে।—উহাতে প্রাণ ত নেই বরং Etiquette-এর একটি Code word বলা যায়। ভারতের এখনও সংস্কৃত ভাষাতে ওঁ বা বিষ্ণু শব্দ একরূপ অর্থশূন্য ভাবেই ব্যবহৃত হয়। তাই বলি যে সাম্যভাবের দোহাই দিয়াও ইহাদের Standardisation এর প্রস্তাব করা ভ্রমাত্মক, বিশেষতঃ যেখানে সমাজ একস্তরে নেই। সাঁওতালদিগের জাতিগত পার্থক্য না থাকাতে মাত্র "তুই" কথাটীকে ওরা সর্ব্বস্থানে প্রয়োগ করে। আমরাও তাদের কাছ থেকে তুই সম্বোধন পেয়ে অপমান বোধ করি না। আর করা উচিতও নয়।—একটী সাঁওতাল রমণী যদি "তোর বেটা ভাল থাকুক" না বলে "আপনার বেটা ভাল থাকুক" বলে তাহলে বুঝি যে তারা আশীর্ব্বাদ না করে খোসামুদের বুলিই আওড়াচ্ছে। অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে আপনি কথাটা আমরা যেন আশা করতে পারি না। কিন্তু হিন্দুজাতির ভিতর যেখানে সমাজ নানা ভাবে বিভক্ত সেখানে একটী কথা Standardised করা একটু কঠিন হবে না কি?

আর একটি কথা এই যে এই তিনটী কথাকে শিক্ষা বা ভদ্রতার মাপকাটি বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। বালকদের মধ্যে এই কথাগুলির ব্যবহারের তারতম্য থেকে বোঝা যায় তাহারা ভদ্রতার ধাপে কতদূর Promotion পেয়েছে। আবার বালকেরাও অপরের কাছ থেকে এইগুলির উচিত অনুচিত ব্যবহার শিক্ষালাভ করে পরোক্ষভাবে ভদ্রতার পথে অগ্রসর হয়। অবশ্য এ কথা হতে পারে যে শিক্ষার কি আর কোন বস্তু জগতে নেই? আছে, কিন্তু যে কথাগুলি কথাবার্ত্তায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় তার ভিতর যদি শিক্ষার পথ সুগম থাকে তাহাই আমাদের বাঞ্ছনীয় নয় কি? পরিশেষে আমার লেখক ভাইদের নিকট এই নিবেদন যে একটী উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা মারফত তর্কস্থলে থোড়, বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় না লিখে সাধারণ বিবেচ্য যুক্তি সকল দ্বারা তুই তুমি ও আপনির কোনটীর অন্তর্ধান বাঞ্ছনীয় প্রমাণ করাইবেন। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় যদি উচিত বিবেচনা করেন ত এ তর্কের প্রশ্রয় না দিয়া বরং অন্য কোন প্রসঙ্গের আলোচনা করালে বাধিত হইব। কারণ ইহার কোনও স্থির সিদ্ধান্ত হওয়া সুদূরপরাহতই মনে হয়।

২খ। তুই-তুমি-আপনি

শ্রীযতীন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত

তিন চার সংখ্যা "বিচিত্রা"য় এই বিষয়ের আলোচনা চলেছে। কেউ "তুমি"র পক্ষে, কেউ "আপনি"র পক্ষে, কেউ আবার পরিবর্ত্তনই চান না। যাঁরা "তুমি"র পক্ষে তাঁদের উদ্দেশ্য সাম্য প্রতিষ্ঠা, যারা "আপনি"র পক্ষে তাঁদের উদ্দেশ্যও তাই—তবে এ দুটোর মধ্যে যেটা চলার পক্ষে অধিকতর সহজ সেইটাই গ্রাহ্য; যদি কোনটাই চলার পক্ষে সুবিধাজনক না হয় তা হলে পরিবর্ত্তন দরকার করে না, যেমন আছে তারই কিছু সংস্কার করা দরকার। ভাব নিয়েই যত মারামারি, সম্বোধনের উপর বিশেষ নির্ভর করে না। কোথাও কোথাওকার লোক আছে, তারা বলে "এ রাজা, তাকে যেতে দিস্ না" তাতে রাজা ক্রুদ্ধ হয় না, জানে মনে, এই উচ্চারণের মধ্যে অনুরোধ আছে, কথার মারামারি কিছুই নয়। তেমনি সবাই নিজের সুবিধানুযায়ী কথা বলে, লক্ষ্য রাখা উচিত যেন তাতে ঘৃণা বা অবহেলার ভাব প্রকাশ না পায়—সেটা তুই, তুমি, আপনির যে কোনটা দিয়েও করা চলতে পারে। আমাদেরও অনেক-স্থলে এমন সব কথা শুনতে হয় যাতে আমাদের সংস্কার অনুযায়ী শ্রুতি-কটু লাগে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখতে গেলে বক্তার অনুযায়ী সেটা সম্মানকর—যেমন সম্মানিত লোকদের প্রতি "তোরেই ত বলেছিলাম" কথার মধ্যে প্রকাশ পায়।

যে কথাই থাক উদ্দেশ্য হবে সাম্য ও সম্বোধন করার যে সঙ্কট তা থাকবে না। ছোটকে আপনি বলতে হলে সম্বোধন-সঙ্কট এসে যায়, কিম্বা অফিসারদের তুমি বললেও সেই সম্বোধন-সঙ্কট। যে নিয়মই স্থাপিত করা হবে তাতে দেখতে হবে যেন বিশৃঙ্খলা না এসে যায়, কাজেই এখানে একটু দূরদর্শিতার দরকার।

একটা বড় উদ্দেশ্য স্থাপিত করবার জন্যে যদি কিছু কিছু সাময়িক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় তা হলে সবারই তা করা উচিত। প্রকৃত পক্ষে দেখতে হবে পরিবর্ত্তন দরকার কিনা। বোঝা যাচ্ছে, এই সাম্য যুগে কাউকে ছোট করে রাখবার অধিকার কারুর নেই, কাজেই যে নিয়মে চলেছে তার পরিবর্ত্তন বা প্রতিকার দরকার। বয়সে ছোটকে তুই বা তুমি সম্বোধন করলে তাদের অবশ্য আত্মসম্মানে ঘা লাগে না, কিন্তু জাতির বা কার্য্যের তারতম্যে যখন বয়োবৃদ্ধকে তুই বা তুমি বলে সম্বোধন করা হয় তখনই প্রশ্ন জেগে উঠে 'এ রকম কেন হবে'। বর্ণের তারতম্যে কনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠকে তুই বা তুমি বলে ডাকছে তাতে বয়োজ্যেষ্ঠের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। তাই বর্ত্তমান সমস্যার অভ্যুত্থান, তাই সবার হৃদয়ে জেগে উঠেছে একটা সমাধান যাতে কোন গোল থাকবে না।

যে কোন পরিবর্ত্তনই করা হোক সংস্কারকদের খুবই বেগ পেতে হবে। তুই, তুমি, আপনির যে কোন একটাকে চালানো কিম্বা চলতি নিয়মের সংস্কার করা কোনটাই একান্ত পরিশ্রম ও সংগঠন ছাড়া হতে পারে না। কাজেই এ স্থলে খুব বুদ্ধিমত্তার সহিত চলতে হবে—যেটাকে বেছে নেবো সেটার সম্বন্ধে আমাদের কর্ম্মঠতার পরিমাপও দেখে নিতে হবে। দলাদলি প্রথমটায় থাকবেই, কিন্তু একটা নিয়ে যদি এগুতে হয় তা হলে অগ্রসরের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রাদের পূর্ণভাবে জানা উচিত।

দেখতে হবে তিনটের মধ্যে কোনটাকে চালানো সহজ হতে পারে, এবং তাতে লোকের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে কিনা। জায়গা বিশেষে প্রত্যেকটারই দরকার আছে, সে সব জায়গায় অন্য কথা দিয়ে তাকে চালানো যেতে পারে কিনা তাই বিবেচ্য। অফিস্ সংক্রান্ত ব্যাপারে 'আপনি'র দরকার খুবই, আবার ছোটদের বা চাকরকে 'আপনি' বললে সবই গোলমাল হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম ত তারা ভাববে লোকটা পাগল হয়ে গেছে, দ্বিতীয়তঃ তাদের কাছ থেকে ঠিক মত কাজ পাওয়া যাবে না। এদের সঙ্গে ডেমোক্রাসী আনলে নিজের হাতেই সব করতে হবে—লোকে যদি তার জন্যে প্রস্তুত হয় তা হলে "আপনি" কথা চালানো সমীচীন কিন্তু এর সম্ভবতা একেবারে সুদূর-পরাহত, কেউ এ বিপদ মাথায় করে নেবে না। মুখেই বলশেভিজম্ চাইলে হবেনা, নিজের হাতে বাসন মাজতে হবে, তখন পারতপক্ষে চাকরের দরকারও হবে না। কিন্তু চাকর রাখা অবশ্য করণীয় হলে তাকে একটু দাপে রাখতেই হবে, তা নইলে অন্যায় ভাবে মাথায় চড়বে—এরা অশিক্ষিত। সাধারণ-ভাবে শিক্ষিত যারা তাদের মধ্যেই শিষ্টাচার পাওয়া মুস্কিল, অশিক্ষিতের কাছ থেকে আশা করা ত বোকামি। ছোট ভাই বা ছেলেকে 'আপনি' বললে তাতে সংস্কারগত শ্রদ্ধার ভাব আসে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এদের শ্রদ্ধাভাবে আহ্বানে এদের উপর আধিপত্য রাখা চলে না, কাজেই অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে এরা সুপথে নিয়ন্ত্রিত হবে না; কিম্বা এদের স্বভাবের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে এদের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে। বাপ-মা জন্ম দিয়েই খালাস, কোন দায়িত্বই থাকবে না খেতে পরতে দেওয়া ও নিজেদের গঠন করা ছাড়া—এটা কু-প্রথা। ছেলে বাপের কাছে শিক্ষা পাবে কিন্তু বাপের ভাষার মধ্যে একটা দাবীর ভাব ফুটে ওঠা চাই তা নইলে ছেলে মানবেই না, অথবা বাপকে মহাত্মা গান্ধীর চেয়েও বড় কিছু একটা হ'তে হবে ছেলেকে অধীনে রাখবার জন্যে, যা পৃথিবীতে হওয়া এক রকম অসম্ভব।

"তুই" কথারও এক আধ জায়গায় দরকার আছে, শতকরা নব্বই ভাগ স্থলে দরকার নেই, কারণ এটা অবজ্ঞা সূচক। কিন্তু যেখানে এটা প্রেমের ভাবে ফুটে ওঠে সেখানে লঙ্ঘন করা মুস্কিল। বন্ধুকে "তুমি" বা "আপনি" বলে সম্বোধন করায় যেন অন্তরঙ্গতা কমে যায়—অবশ্য এটা খুবই নগণ্য ব্যাপার। যেখানে ছোটদের "আপনি" বলতে হয় সেখানে বন্ধু কোন ছার। ছোটদের অবশ্য 'তুই' বলা হয়, 'তুমি'ও বলা চলতে পারে। অবশ্য "তুই" না বলার সংস্কারে বাধে,

কিন্তু যুক্ত যখন সংস্কারের বিরুদ্ধে তখন এ সব আপত্তি খাটতে পারে না। "তুই"কে আমরা একেবারে বাদ দিতে পারি।

এবার "তুমি"র সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করা যাক। দেখা যায় "তুমি"র প্রচলনের মধ্যেই তারতম্যের বোধ বিশেষ থাকে না। আমরা বড় ভাই, মা, বাবা, মামা ইত্যাদি গুরুজনদের সম্বোধনে "তুমি" ব্যবহার করে থাকি, আবার ছোট কেউ যথা, ছোট ভাই, বোন কিম্বা ছাত্র ইত্যাদিকেও "তুমি" বলে থাকি—কেবল থাকে মাত্র সুরের অর্থাৎ সম্বোধন করবার ও কথা কইবার ভাবের উপর এই "তুমি"র অর্থ। গুরুজনদের "তুমি আমায় পয়সা দিলে না কেন" কথার মধ্যে ভালবাসার অনুযোগের সুর বেজে ওঠে, আবার শিক্ষক যখন ছাত্রকে বলেন, "তুমি অমুককে মেরেছিলে কেন" তার মধ্যে রাগ ও ভয় দেখানোর ভাব থাকে। ছোটকে "আপনি" বলে এই ভাবের সুর আনা চলে না, এ সব স্থলে "তুই" কথারই প্রচলন বেশীরভাগ দেখা যায়। যেখানে শিক্ষক ছাত্রকে "তুমি" ব'লে কথা বলেন সেখানেও সুরের মিষ্টতা থাকে, কিন্তু তা হলেও "তুমি"র দ্বারা কাজ আমরা পূর্ণ ভাবে নিতে পারি, শুধু প্রযোজকের সামান্য মাত্র মাত্রাবোধ ও নিজের রুচির দরকার—তা সহজেই সম্ভব।

এখন সমস্যা, ছাত্র শিক্ষককে কি ভাবে সম্বোধন করবে। যখন একটা বাঁধা নিয়মের পরিবর্ত্তন করতে হবে তখন সবার বিবেচনায় যা মত হয় তাই মেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্র যদি শিক্ষককে "তুমি" বলে সম্বোধন করে তাতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। ভায়ে ভায়েও ত শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ আছে, তারা তখন কথা বলে কি ভাবে? ছোট ভাইকে বড় ভাই যখন শিক্ষক হিসাবে মারেন তখন ছোট ভাই কাঁদতে কাঁদতে এই ভাবেই অনুযোগ করে "তুমিই ত' আমার কাজে পাঠিয়েছিলে—ইত্যাদি।" যখন একটা ছাত্র শিক্ষককে "তুমি" বলতে পারে তখন অন্যান্য ছাত্র নিশ্চয়ই বলতে পারে। হয়ত শিক্ষকের বন্ধুর ছেলে স্কুলে পড়ে, সে নালিশ করলে, "দেখো কাকা, আমাকে মেরেছে",—কাজেই দেখা যাচ্ছে "তুমি"র প্রচলন "আপনি"র স্থলে আমরা অনেক জায়গায় ব্যবহার ক'রেই থাকি, তাই সার্ব্বজনীন ভাবে এই "তুমি"র প্রচলনই প্রশস্ত ও অধিকতর সহজ সাধ্য। "তুমি"র প্রচলন ভাল ভাবে হ'লে প্রেমভাব ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আসা সম্ভব। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধের দূরত্ব এই "তুমি"র মধ্যে দিয়েই দূর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বিদ্যমান।

মাননীয় শ্রীহরিগোপাল বৈরাগী মহাশয় লিখেছেন, "কিন্তু মার্চ্চেন্ট অফিসের একটা কম মাইনের কেরানী বাবু যদি তাঁর বড় বাবুকে বলেন—'তুমি যদি কাল ছুটি দাও' তা হ'লে আমার মনে হয় যে সেই অফিসে সেই ছুটিই হবে তাঁর শেষ ছুটী।" অনেক অফিসে এমনও ত' আছে, বাপ বড় অফিসার, তাঁরই অধীনে ছেলে কাজ ক'রছে, কোন কিছু ব'লতে হ'লে ছেলে তুমি ব'লেই সম্বোধন ক'রে থাকে—সেখানেও "তুমি"র প্রচলনে বাধা নেই। "তুমি"র প্রচলনে কাজের কোন ক্ষতি হয় না, কেবল দরকার আপোষের সম্মতি। চেষ্টা যখন ক'রতেই হবে তখন যা অধিকতর উপযোগী তার জন্যেই করা যুক্তি সঙ্গত। "আপনি"র প্রচলনে অশিক্ষিত ও কনিষ্ঠদের মধ্যেই বিশেষ ক'রে পরিশ্রম ক'রতে হয়, যেখানে বুঝিয়ে পারা মুস্কিল। শাস্ত্রেই বলে মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি—অর্থাৎ মিষ্টি কথায় মূর্খদের মধ্যে কাজ করা চলে না। তবে ডেমোক্রাসী মতে তাদের সঙ্গে মিষ্টতার সহিত ব্যবহার করতে হ'লেও প্রথম প্রথম চোখ রাঙিয়েই রাখতে হবে, তারপর সমতার অধিকার দেওয়া চলবে। যাই হোক, এই ভাবে কাজ করা যুক্তি-যুক্ত হবে না, কারণ শিক্ষা না হ'লে শিষ্টতা আনা দুষ্কর। "তুমি" নিয়ে কারবার করতে হ'লে সে গোলমালের সম্ভাবনা কম। চোখ রাঙাতে হ'লেও "তুমি" দিয়ে কাজ করা যায়—ছোট ভাইকে বলা চলে, "সেখানে যাবেনা (আজ্ঞা), দুষ্টুমি কোরো না।" "দুষ্টুমি করবেন না" বলার আজ্ঞার গুরুত্ব ক'মে যায়। "তুমি"কে চালাতে হ'লে ছোটদের বা শিক্ষিতদের সংগঠনের তেমন দরকার করে না, শিক্ষিতদের সংগঠন অনুযায়ী তাদের মধ্যে আপনিই প্রচারিত হবে—তাইই জাগতিক নিয়ম—আস্তে আস্তে উপর থেকেই নীচে

আসবে। কাজেই "তুমি"র প্রচলন ক'রতে হ'লে শিক্ষিত ও অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেই করতে হবে—অফিসের বাবুরাও এই শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত।

অপর স্থানে বৈরাগী মহাশয় লিখেছেন, ধরুন, একটি গ্রামে পাঁচজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আছেন তাঁদের সকলে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে এবং বিশ্বাস করে। এঁরা যদি এ কাজের অগ্রদূত হন তা হ'লে বিশেষ ভাবে উপকার আশা করা যেতে পারে। তাঁরা যদি এরূপভাবে সম্বোধন ক'রতে সুরু করেন এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সকলকে বুঝিয়ে বলেন তা হ'লে তাঁদের অনুসরণ ক'রে সেই গ্রামে এ প্রকারের সম্বোধন প্রচলিত হ'তে পারে। অফিসের বেলাতেও এই পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। তখন বড় বাবুদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হ'তে হবে।" "তুমি" প্রচারের বিষয়েও এই নিয়ম অবলম্বনীয়। অফিসের বড় বাবুকেও সংগঠনে সম্পূর্ণ যোগ দিতে হবে।

৩। বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক।

মোহাম্মদ আবদুল হামিদ।

প্রায় আধ বছর ধরেই চলেছে বিচিত্রার পাতায় বাঙ্গালীর আবরুরক্ষা মামলার শুনানী। ব্যাপারখানা সম্প্রদায় নির্বিশেষে বঙ্গবাসী মাত্রেরই জীবন যাত্রা সম্বন্ধীয়, তাই আমারও একটা জবানবন্দী দাখিল করছি। ধুতিপরা বহুকাল থেকে আমাদের চলে আস্‌ছে বলে তার বিরুদ্ধে কথা বল্‌তে গেলেই যেন প্রথমটা আমাদের সংস্কারে বাধে। পরিধেয় হিসাবে একখানি চতুষ্কোণ বস্ত্র খণ্ডকে কোমর পর্য্যন্ত জড়িয়ে রাখা নেহাৎ যেন মধ্যযুগের ব্যবস্থা। বস্‌তে, দাঁড়াতে, নীচে দাঁড়িয়ে এক পা উপরের কোন ধাপে বা কিছুতে রাখতে, বা একটু এলোমেলো বাতাস আস্‌তে সদাই সন্ত্রস্ত—কোন দিক থেকে বুঝি বেপর্দ্দা, বেআবরু হল। অনেক কাজের মাঝে,—যথা পরিবেষণ করতে, দুহাতে কোন কালিঝুলি মাখা কাজ করতে প্রায়ই অনেককে আর এক জনকে বলতে হয় "ভাই আমার খুঁটটা ভাল করে গুঁজে দাও ত।" কারও কারও দমকা হাসি হাস্‌তে ধুতির খুঁট খুলে যায়। হঠাৎ কোন শ্রমসাধ্য কাজ সাম্‌নে পড়েছে,—খুঁট কষে নাও, মালকোঁচা মার, হাঁটুর কাছটা ক্লিয়ার কর,—তারপর কাজ আরম্ভ। কল কারখানার কাজে ধুতি ত একটা মারাত্মক পোষাক। অনেক জুটমিল এবং ফ্যাক্টরীর কর্ত্তৃপক্ষরা ত না পেরে শেষে জোর করেই শ্রমিকদের হাফ্ পেন্ট্ পরাচ্ছেন। কোঁচার অপকারিতা অনেকেই দেখিয়েছেন,—সুতরাং আমার কথা বাড়ান নিষ্প্রয়োজন। কেউ আবার বলেন ধুতিটাকে খাট করে কোঁচার বাকেট রিট্রেঞ্চ করতে। আচ্ছা তাই যদি হল তবে কোঁচা-শূন্য ধুতির টান্, কোঁচ, বাড়তি কম্‌তিগুলো সমান করে দিলে জিনিষটা কি একটা পায়জামায় দাঁড়ায় না? কেহ হয়ত এখন মনে করবেন এইবার আমি মুসলমানিত্ব উচ্চৈঃস্বরে জাহির করতে আরম্ভ করলাম কিন্তু এইখানে আমি আমার ব্যক্তিগত ঘটনা বলছি যে আমার জীবনের শতকরা সাড়ে নিরানব্বই ভাগ সময় ধুতি পরেই কেটেছে। সুতরাং কথাগুলা আমার নিজের দিক বজায় রেখে মোটেই হচ্ছে না। আর পায়জামা পরলে বছরে কাপড়ে যত খরচ হয়, ধুতি পরলে তার থেকে বেশী খরচ হয় এ একেবারে পরীক্ষিত সত্য—যদিও আমার নিজস্ব পরীক্ষা নয়। এতকাল ধুতি পরে এসেছি বলে যে সেই ধুতিকেই চিরকাল বাহাল রেখে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে এও ত কোন যুক্তি নয়।

পায়জামা পরলে মুসলমানিত্ব দেখান হয় এ যাঁরা বলেন তাঁদেরই কোন পেশায় শতকরা কত লোক ঐ পায়জামারই রাজ সংস্করণ পরে কাটাচ্ছেন তার হিসাব পূর্ব্ববর্ত্তী এক লেখক দিয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন যে বাঙ্গালীর শতকরা ৫৬ জন অর্থাৎ কিনা মুসলমানেরা পায়জামা পরছে

যেন উন্মুখ হয়ে আছে। এ কথাটা আমি মানিনে। পায়জামা পরতে যদি তাঁদের এতই আগ্রহ তবে তাঁরা পরেন না কেন? হিন্দুরা কি তাঁদের জোর করে ধুতি পরাচ্ছেন?—তা নয়। পাড়াগাঁয়ে, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলায় এমন হাজার হাজার মুসলমান আছে যে শুধু বিয়ের দিনে ভাড়া করা পায়জামা পরা ছাড়া জীবনে তারা আর কখনও ও "বোগল"তে ঢোকে না। তাদের কাছে পায়জামা পরার প্রস্তাব নিয়ে যদি কেউ উপস্থিত হন ত তিনি পালাতে পথ পাবেন না এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। টুপি পরাও তাদের মধ্যে ঢের কম। কখনও যদি পাল্ পার্ব্বণে পরে ত এমন ভাব খানা দেখায় যেন ও পাপ ঘাড় থেকে নামলেই তারা বাঁচে। জাতীয় পোষাক হিসাবে যদি শিরস্ত্রাণের দরকার হয় তবে যে কোন এক রকম টুপী না হয় ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু একজন লেখক দেখছি পাগড়ীর ব্যবস্থা দিচ্ছেন। যিনি ধুতি থেকে কাছা কোঁচা চেঁচে পুঁছে পায়জামায় রূপান্তরিত করতে বলেন তিনিই আবার মাথায় এক সাড়ে বত্রিশ গজ ন্যাটা জড়াইবার ব্যবস্থা করেন কি করে ভেবে পাইনে।

কেউ কেউ আবার বলছেন—এটার সঙ্গে ওটা মানায় না, ওটার সঙ্গে সেটা মানায় না। এই মানান্ বেমানান নির্ভর করে আমরা যেমন ভাবে জিনিষটা দেখ্‌তে অভ্যস্ত তারই ওপর। কত জিনিষ পূর্ব্বকালে বেমানান ছিল, পরবর্ত্তী কালে আবার মানানসই হয়ে গেল। যেটা একজনের কাছে বেমানান, সেটা আবার আর একজনের কাছে মানানসই হয়। সংসারের চিরন্তন বিবর্ত্তনের মাঝ দিয়ে আমরা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখানে এখন ভাবতে হবে কোন পোষাকে আমাদের সব চেয়ে কাজের সুবিধা। তার জন্য যদি আমাদের কোট প্যাণ্টের ব্যবস্থা করতে হয় ত ক্ষতি কি? কোট প্যাণ্ট পরলেই মানুষ সাহেব হয়ে যায় না। হয়, যখন তার মনটা হয়ে যায় সাহেবী, যখন সে ভাবে বিলাতটাই বুঝি তার 'হোম'। আমাদের দেশের অনেক মুসলমান কেবল, মুসলমান বলেই, 'স্বদেশ' সম্বন্ধে যেন একটা ধোঁয়াটে ধারণা পোষণ করেন; মনে মনে তাঁরা পশ্চিম দিকটার পানে একটা দেশ খুঁজতে থাকেন। সুখের বিষয় মুসলমানের চোখের এ ঘোর আজ বহু পরিমাণে কেটে গেছে। সাহেবী পোষাক প'রে মানুষের মন যখন এই রকম ভাবে আর ঘরের পানে তাকায় না তখনই সেটা হয় মারাত্মক। তুর্কীও ত কোট প্যাণ্ট পরছে;—কই, সে ত বাইরের লোককে তার ভাইয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে সাহায্য করে না। জাপান দুনিয়ার যেখানে যেটা ভাল পাচ্ছে কুড়িয়ে আন্‌ছে, আবার তার ওপরই ওস্তাদী করে ওস্তাদের কান মলে দিচ্ছে।

আমার মনে হয়, আজ যখন সমস্ত ভারত এক জাতীয়তা সূত্রে গ্রথিত হতে চলেছে, আসমুদ্র হিমাচল যখন এক ভাষা প্রচলনের কল্পনা চলেছে, তখন শুধু বাঙ্গালীর বিশিষ্ট জাতীয় পোষাক নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সমস্ত ভারতের একটা জাতীয় পোষাকের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য যাবে তাতে ক্ষতি কি? বাংলাদেশেই ত বাস করব? সুতরাং বাঙ্গালীই রয়ে যাব। ব্রহ্মতেজ যদি থাকে ত আর পৈতের দরকার হবে না। ফরাসী জাতী ইংরাজের তুলনায় তার পোষাকে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য রাখে নি। তাতে তাকে না চেনা গেলেও তার কিছু এসে যায় না।

সুতরাং ঘরোয়া পোষাক পায়জামা-সার্ট, কাজোয়া পোষাক প্যাণ্ট-কোট, আর মাথায় একটা টুপি, যার ডিজাইন একটা পরে ভেবে দেখা যাবে। 'ধুচুনি' মাথায় না হয় নাই দিলাম।

৩ক। বাঙালীর জাতীয় পোষাক

শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ সেন

বহুদিন ধরিয়া "বিচিত্রা"তে বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক লইয়া নানাবিধ আলোচনা হইয়া আসিতেছে। এতদিন মুগ্ধচিত্তে পড়িতেছিলাম, আজ কেন জানি না, আলোচনায় যোগ দিবার বাসনা হইল। জানি না হয় ত এতদিনে

সম্পাদক মহাশয়ের আদেশ জারি হইয়া গিয়াছে, যে এ আলোচনা আর অধিক চলার আবশ্যক নাই।

আলোচনার মধ্যে একটী জিনিষ বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে খুব কম লেখকই পোষাকের উপযোগীতার উপর ভিত্তি করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বেশীর ভাগ লেখকই ভিত্তি করিয়াছেন বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বকে। আমরা বিদেশে থাকি, সুতরাং বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে, আমরা অধিকতর সচেতন। কিন্তু ইহাও আমরা জানি, যে মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির ভিতর দিয়া, বাহ্যিক আড়ম্বরের ভিতর দিয়া নহে। গত ফাল্গুন মাসের "বিচিত্রা"য় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যে বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে, আমাদের পোষাক যে রকম আছে, ঠিক সেই রকমই রাখিতে হইবে, একটু অদল বদল করিলেই তাহা অন্য প্রদেশবাসীদের মত হইয়া যাইবে। উপযোগিতার দোহাই দিয়া আমরা বিদেশী সুটকে পরিপূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া লইয়াছি, কিন্তু নিজেদের দেশের অন্য প্রদেশের লোকের সহিত একটু মিল হইলেই তাহা সহ্য হয় না। আমি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গায় গিয়াছি। আমার ভ্রমণ হইতে এই একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে এক মাদ্রাজী ছাড়া, বাঙ্গালীর মত নারীসুলভ (Effiminate) স্বভাব আর কোন প্রদেশবাসীর নাই। অবশ্য বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা শরীর চর্চ্চার দিকে মন দিয়াছেন, তাঁহাদের কথা আমি সসম্ভ্রমে বাদ দিতেছি। যে কোন জাতির চরিত্রের উপর, তাহার ভাষা, খাদ্য এবং পোষাক, যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া শ্রোতাকে কাঁদাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু উত্তেজিত করা যায় না। বাঙ্গলা ভাষা অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্তু যথেষ্ট পুষ্টিকর নহে। বাঙ্গালীর পোষাক শিল্পীর চোখে দেখিলে খুবই সুন্দর, কিন্তু তাহা যথেষ্ট পুরুষত্ব ব্যঞ্জক নহে। ধুতির উপর একটা কোট পরিলেই বুক ফুলাইয়া হাঁটিতে ইচ্ছা যায়, কিন্তু পাঞ্জাবী পরিলেই বুকটা আপনা হইতে নামিয়া আসে। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব যতটা সম্ভব বজায় রাখিয়া আমাদের পোষাকের পরিবর্ত্তন করার সময় আসিয়াছে।

আমার মনে হয় আমাদের দুই রকম পোষাক হওয়া উচিত। প্রত্যেক জাতিরই উহা আছে। একটী পোষাক কাজকর্ম্মের জন্য, আর একটি উৎসবের জন্য। সাহেবরা অফিস যায় Morning Suit এবং Bowler hat মাথায় দিয়া কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যায় Dinner Suit ও Top hat মাথায় দিয়া। কাজ কর্ম্মের জন্য যাহা উপযোগী, তাহাই আমাদের adopt করা উচিৎ। বিবাহ কিংবা শ্রাদ্ধবাড়ীতে আমরা সু, মালকোঁচা এবং কোটের উপর কলার উল্টানো সার্ট দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, সুতরাং সামান্য একটু পরিবর্ত্তিত বেশ আমাদের চোখে লাগিবে না। আমার মনে হয় সাধারণ সময়ের জন্য মালকোঁচা মারা ধুতী (মাদ্রাজী বা মারাঠি প্যাটার্ণ নহে) পাঞ্জাবী, এবং নাগরা, স্যাণ্ডাল, অথবা চটীই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী পোষাক। শিরস্ত্রাণের কোন প্রয়োজন আমি বোধ করি না। বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি যে সকল প্রদেশের লোকেরা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের চুল ২০ হইতে ২৫ বৎসরের ভিতরেই পাকিয়া যায়।

ফাল্গুন মাসের "বিচিত্রা"য় শ্রীযুক্ত ফকির আহম্মদ সাহেব পায়জামা ও কোটের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পায়জামা জিনিষটা আরাম দায়ক হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের মনোবৃত্তির সহিত উহা একেবারেই খাপ খায় না। তাছাড়া কোট জিনিষটা একেবারেই বাহুল্য। আহম্মদ সাহেব এই সুযোগে Census report এর কল্যাণে প্রাণ ভরিয়া কয়েকবার "মুষ্টিমেয় হিন্দু" বলিয়া লইয়াছেন। এই "মুষ্টিমেয় হিন্দুর" ভাষাই যে বাংলার ভাষা, ইহাদের পোষাকই যে বাংলার পোষাক, এবং ইহাদের cultureই যে বাংলার cultrue, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাকের ভিতরেও Communal representation টানিয়া আনিবার ইচ্ছা আমার মোটেই নাই, কারণ Communal ব্যাপার মাত্রকেই আমি জাতীয় উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করি, কিন্তু এক্ষেত্রে ইহাও বলা আবশ্যক, যে বাঙ্গালীর পোষাকের আর যাহাই পরিবর্ত্তন হউক না কেন, উহা কখনই ধুতী হইতে পায়জামায় রূপান্তরিত হইয়া যাইবে না। মালকোঁচা মারিয়াও যে যুদ্ধ চলে, তাহার প্রমাণ বাঙ্গালী অনেকবার দিয়াছে। আর যুদ্ধের কথা যখন উঠিবে, তখন ধুতীও থাকিবে না, পায়জামাও থাকিবে না, তখন হাফপ্যাণ্টই পরিতে হইবে, কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের পোষাক লইয়া।

আমরা যদি উৎসবের সময় কোঁচা দিয়া ধুতী পরি, এবং তাহার উপর পাঞ্জাবী ও চাদর গায়ে দিই, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই কারণ উৎসবের সময় সকলেই নিজেকে যথাসম্ভব সুন্দর করিবার চেষ্টা করেন। তখন utilityর প্রশ্ন আসেনা, তখন সৌন্দর্য্যকেই অধিকতর সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের পোষাক, যতটা পুরুষোচিত এবং কাজের উপযোগী হয়, তাহাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

আরবের কুৎসা কবিতা

মোহাম্মদ গোলাম মাওলা এম-এ ; বি-এল ; বি-সি-এস,

প্রাচীন আরবের ঐতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কবিতা আরবের সাম্প্রদায়িক জীবনে অসীম শক্তি বিস্তার করিয়া রহিয়াছিল। প্রাচীন আরবের মাঝে আমরা গদ্য সাহিত্যের কোন বিকাশ দেখিতে পাই না। কবিতাই তখন সাহিত্য-চর্চার একমাত্র নিদান ছিল।১ একমাত্র কবিতার ভিতরেই আরব বেদুঈন তখন তাহার সুকুমার ভাব সমূহকে মূর্ত্তি দিত।

কবিতার ভিতর দিয়াই আরব জাতির যাবতীয় মহত্ত্ব, গুণ ও গরিমা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। একাধারে উহাতেই যেন সমস্ত জাতিটার courage, loyalty (to friends), blood revenge, sense of honour স্বরূপ প্রকাশ করিয়া রহিয়াছিল। আরব-বেদুঈন তাহার 'মুরুত্তা' ("muruwa" or virtue) বলিতে যাহা বুঝে তাহা যেন সমস্তই কবিতার ভিতরেই সংবিষ্ট ছিল, এবং তাহাদের কবিতার ভিতর দিয়াই যেন তাহাদের প্রকৃতিগত এই গুণাবলী সমস্ত জাতিটার ভিতরে সংক্রমিত হইত। তৎকালে কোন লিখিত বা রাজশক্তি-প্রণীত আইনের অস্তিত্ব ছিল না।(২) সমস্ত জাতির নির্দ্দেশ ও মনোনয়ন প্রাপ্তি এবং স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসার হেতুটাই যেন ঐ "Sunan" or 'Tradition' বা চিরাচরিত প্রথা সমূহের sanction বা অনুজ্ঞা প্রাপ্তির একমাত্র ভিত্তি ছিল, এবং ঐ অলিখিত বিধিপদ্ধতি সমূহের ঐ মনোনয়ন-প্রাপ্তি ও শক্তিলাভ কবিতার ভিতর দিয়া উহাদের চির-প্রচলন ও চির-প্রকাশের কারণেই একমাত্র সম্ভব হইয়াছিল। আরব জাতি তাহার প্রিয় ভাষার শ্রেষ্ঠতম সুন্দর জিনিষ কবিতাকে এত প্রিয় মনে করিত যে উহার ভিতরে প্রকাশমান যাবতীয় বিধিনির্দ্দেশও তাহার অন্তর প্রকৃতি ও বাহ্যিক জীবনকে তদ্রূপভাবে অনুপ্রাণিত এবং গঠিত করিয়া তুলিত। এক কথায়, কবিতা যেন সমস্ত জাতিটার জীবনের মাঝে জড় গাড়িয়া বসিয়াছিল। কবিতার প্রভাব দুর্দ্দান্ত আরব জাতির জীবনে রাজ-প্রণীত আইনের যাবতীয় বিধিবিধানের মতই শক্তিশালী ছিল।(৩)

কিন্তু আরবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালিনী কবিতা 'হিযা' (বিদ্রূপ বা কুৎসা) কবিতা। যাবতীয় কবিতার চেয়ে উহাই আঁধারী আরবের সাম্প্রদায়িক জীবনে সমধিক প্রয়োজনীয় ছিল। এবং কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও শক্তি উহাতেই নিহিত ছিল এবং উহারই জন্য তাহার স্থান সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি উচ্চে ছিল।

দুর্দ্দান্ত আরব-বেদুইন দুনিয়ার কোন কিছুতেই ভয় করে না, ভয় করে শুধু তিনটি জিনিষকে,—প্রথম যীন (Jin or Genii), দ্বিতীয় সাইমুম (Sand storms) এবং তৃতীয় 'হিযা' (Satire or lampoon) কবিতাকে। বহু প্রাচীন-

(১) "Poetry was then the sole medium of literary expression"—A literary History of the Arabs by Dr. R. A. Nicholson.

(২) "There was no legal code, no legal or religious sanction, nothing in effect save the binding force of traditional sentiment & opinion,—in one word, "Honour."—Ibid.

(৩) It was a poetry rooted in the life of the people that insensibly, moulded their minds and fixed their character (and) animated (them) for some time at least by a common purpose...Thus in the midst of outward strife and disintegration a unifying principle was at work. Poetry gave life and currency to an ideal of 'Arabian Virtue (Muruwa) which though based on tribal community of blood...nevertheless became an invisible bond between diverse clans,—and formed whether consciously or not a national community of sentiment"—Ibid.

কাল হইতেই মানবের মন যীন প্রেত বা তদ্রূপ কোন অশরীরি আত্মার প্রতি একটা ভীতির ভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। আরব জাতিও বহু প্রাচীনকাল হইতেই তদ্রূপ যীন ও শয়তানের অস্তিত্বে এবং তাহাদের অসীম শক্তির প্রতি বিশ্বাসবান ছিল। তাহারা বিশ্বাস করিত যে মরুভূমির গভীর অভ্যন্তরে, বহু অজানা ভূখণ্ডের মাঝে যীনদের উপনিবেশ ছিল এবং মরুভূমির মাঝে বিচরণ করিতে করিতে ঐ সব ভূখণ্ডের মাঝে কেহ প্রবেশ করিলে তথা হইতে সে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না। এই জন্য শত লুণ্ঠনের মাঝেও মরুচারী বেদুঈন যখন দূর আকাশে আঁধির ঘটা দেখিত, তখন তাহার আত্মা শিহরিয়া উঠিত এবং সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে তাহার ঘোড়ার উপরে লাফাইয়া উঠিয়া পলায়নপর হইত। ভীষণ বাত্যায় বালুকা কণা যখন উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া বহিতে আরম্ভ করিত, —আকাশ যখন আঁধির ঘটায় ছাইয়া যাইত, তখন আরব-বেদুঈন মনে করিত, না জানি কোন অচেনা মরুপ্রান্তরের পাগ্‌লা যীনসর্দ্দার তাহার দলবল লইয়া খুরের দাপটে আকাশ আঁধার করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। লুণ্ঠন ফেলিয়া বাতাসের আগে তাহারা তখন ছুটিয়া পলাইত, অগ্নিকণার মত সাইমুমের বালুর কণা তাহাদের চোখে মুখে আগুন-দানার মত লাগিত, দিশাহারার মত সে তখন ঘোড়ার রাশ ফেলিয়া দিয়া উহার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিত। (৪)

এই ত গেল যীন্ এবং সাইমুমের কথা। কিন্তু প্রাণহীন হিযা কবিতাকে আরব এত ভয় করিত কেন? উহার কারণ এই যে হিযা কবিতাকে তাহারা যীনের আবেশ প্রসূত এবং উহার শক্তি-সমন্বিত বলিয়া মনে করিত। যাবতীয় কবিতাকেই তাহারা কোন অদৃশ্য শক্তির আবেশ-প্রসূত মনে করিত, এবং তন্মধ্যে হিযা কবিতাকে অতি অবিশ্বাস্য পরিমানে ভয় করিত (৫) যীনের নাম শুনিলেই দুর্দ্দান্ত আরবের হৃদয় ভয়াতুর হইয়া যাইত। হিযা কবিতাবলী যে বিশিষ্ট প্রণালী ও নিয়মের মাঝে উচ্চারিত হইত তাহা দেখিয়াও কুসংস্কারাপন্ন আরবের মন উহাকে এক অতীব ভীত ত্রস্ততার চক্ষে দর্শন করিত। (৬)

---

(৪) কবি মোহিতলাল মজুমদার এতদ্‌প্রসঙ্গে তাঁহার "বেদুঈন" কবিতার মাঝে যে সুন্দর কয়েকটি লাইন দিয়াছেন তাহা পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার না দিয়া পারিলাম না। মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় ঐ কবিতাটিতে আরব-বেদুঈনের জীবন এমন চিত্তাকর্ষক, স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে ঐ ভদ্রলোক হিন্দু হইয়াও কিরূপভাবে তাহাতে সক্ষম হইলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্ময় লাগে। ১৩২৮ সনের বৈশাখ মাসের (অধুনালুপ্ত) 'মোসলেম ভারত' পত্রিকাতে প্রথম যখন তাঁহার এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার এমন কঠিন বিষয়ের এমন সাবলীল বর্ণনা-শক্তিতে বিস্ময়ান্বিত হইয়া কোথা হইতে তিনি তাহার কবিতার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিলেন, তাহা জানিতে নিতান্ত বাসনা হয়। পাঠক পাঠিকাগণকে তাঁহার এই কবিতাটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। কবিতাটি তাঁহার 'স্বপন-পসারী' নাকি কি একটা বইএ ছাপা হইয়াছে বলিয়া বহুকাল পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছিলাম।

* নিম্নোদ্ধৃত লাইনগুলিতে লুণ্ঠন-ব্যাপৃত বেদুঈন হঠাৎ আঁধির ঘটা দেখিয়া ভীতত্রস্তভাবে তাহার বন্ধুদিগকে বলিতেছে :—

* * * * *

"ওরে আর নয়, আঁধির পাহাড় দেখা যায় ঐ উড়েছে ধূলা।—
সব পয়মাল! লোকসান ভাই, দিন যে নিবায় দুপুর রাতে,
লক্ষ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসে কারা ঐ চাবুক হাতে।
শুধু ওরি হাতে নিস্তার নেই জিন সর্দ্দার পাগ্‌লা ও যে;
ওর সাড়া পেয়ে আসমানে ঐ দিনের মালিকও আড়াল খোঁজে।
থাক্ পড়ে থাক উটের বোঝাই সারি সারি ঐ গোলাম-বাঁদী,
পেয়ালা ভরিতে যায় যে ঘোরাতে বড় মজবুত খুন সে জানি।
তবু ফেলে দে দূ, দেখ্ না দখিনে ডাকাতের দল গর্জ্জে আসে,
দাপটে তাদের আলোর কোয়ারা কালো হয়ে যায় ধোঁয়ার গ্রাসে!
ছেড়ে দাও ঘোড়া রাশ ফেলে দাও, ছুটে যাক ওর যেথায় খুশী!
আরে বেল্লিক কি হবে এখন হাওয়ার উপরে বৃথাই রুষি!

* * * * *

এইবার এল দমকি দমকি বালির ধাক্কা দমক মারে!
একখানি কালো কাফনে ঢাকিল দুনিয়ার মুখ অন্ধকারে!
বাপ্‌! একি জ্বলে! চোখে মুখে লাগে বালির কণা যে আগুন-দানা!
তারি মাঝে তবু ছোটে দিশাহারা 'বাহাদুর' যেথ মানেনা মানা।"

(৫) "By the ancient Arabs the poet was held to be a person endowed with supernatural knowledge and in league with the spirits (Jin) or Satan"— •

(৬) Their pronunciation was attended with peculiar ceremonies of a symbolic character, such as anointing the hair on one side of the head, letting the mantle hang down loosely and wearing only one sandal." Ibid,

এই হিবা কবিতা আর কিছুই নহে, ইহা আরবের নিত্যকারের যুদ্ধের মাঝে শত্রুপক্ষের উপরে বর্ষিত নিন্দা ও তাহাদের পিতা পিতামহ এবং বংশের গুপ্ত কুৎসা প্রকাশক কবিতাবলী মাত্র ছিল। কিন্তু এই নিন্দা ও কুৎসা বর্দ্ধক কবিতার শক্তি আরব জাতির বংশগত সম্মানজ্ঞানের উপর এতটা বিষবৎ শক্তি রাখিত যে আরব তাহার বংশের এই কুৎসা প্রকাশক কবিতার উচ্চারণ মাত্র একেবারে উন্মত্ত ও দিশাহারা হইয়া যাইত। কবিতা তখন আরব দেশের টেলিগ্রামের তুল্য ছিল। আরব দেশে কবিতা আবৃত্তি ও কাহিনী কথনের একটা বিশিষ্ট ব্যবসায়ই ছিল। উহাদিগকে 'রাবী' (narrators or story tellers) বলা হইত। তাহারা কবিদের কবিতা সমূহ এবং উহার প্রণয়নের উপলক্ষ বা কাহিনী সমূহ মুখস্ত করিয়া রাখিত এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘুরিয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট আবৃত্তি করিয়া বখ্‌শিশ আদায় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত।

এই 'রাবী'দের দ্বারা, আজ এক সম্প্রদায়ের কুৎসা প্রচার করিয়া যে একটি কবিতা প্রচারিত হইত, কাল তাহা সমগ্র আরবে তীরবেগে প্রচারিত হইয়া যাইত। (৭)

আরব জাতি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বাস করিত। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সম্মান আরব-বেদুঈন তাহার নিজের প্রাণাপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান মনে করিত। নিজ নিজ পিতা পিতামহ এবং বংশ-সম্মানের বড়াই করা ও অন্য সম্প্রদায়কে নিজেদের অপেক্ষা হীন প্রতিপন্ন করা এবং নিজেদের সম্বন্ধে গর্ব্ব করিয়া কবিতা বলা আরবদের একটা প্রকৃতিগত সম্বা ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের সকল লোকই ত আর ভাল হয় না। উহার নারীদের মাঝে অনেক গুপ্ত কাহিনীও থাকে। কালক্রমে ঐ সব গুপ্ত ও কুৎসার কাহিনী হয়ত লয় পাইয়া যাইত কিংবা অতি পারিপার্শ্বিকতার লোক ছাড়া বহির্সীমার লোক তাহা জানিতে পারিত না। কিন্তু কবিতার ভিতর দিয়া যখন একবার উহা প্রকাশিত হইত তখন উহা আর প্রচ্ছন্ন থাকার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। সমস্ত রাবীদের মুখে মুখে তখন তাহা প্রচারিত হইয়া আরবের সমস্ত কবিলার (clans বা tribes এর) মাঝে ঐ বংশ-সম্মানকে হীন ও 'অলীন' (নীচ) করিয়া তুলিত। হত্যার প্রতিশোধ বেদুঈন তাহার তরবারির দ্বারাতে লইতে পারিত, কিন্তু এই কবিতার আঘাতের প্রতিশোধ সে তাহার অস্ত্র দ্বারা লইতে পারিত না। তজ্জন্য কবিতার ভিতর দিয়া যখন তাহার বংশের কুৎসা কাহিনী সমূহ কথিত হইতে দেখিত, তখন সে দিশাহারা হইয়া উঠিত, মনের শক্তি তখন তাহার দমিয়া যাইত, হস্তের তরবারি শিথিল হইয়া পড়িত।

এই সমস্ত কারণে আঁধার আরবের সমাজের মাঝে কবির উদ্ভব একটা অতি বিশিষ্ট আনন্দের কারণ ছিল। যেহেতু শত্রু পক্ষীয়ের বর্ষিত কুৎসা কবিতার প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ একমাত্র তাহার দ্বারাই সম্ভব ছিল। এতৎ প্রসঙ্গে Sir Charles Lyall তাহার বিখ্যাত বহিতে (An Introduction into the Ancient Arabian Poetry) লিখিয়াছেন :—

"When there appeared a poet in a family of the Arabs, the other tribes round about would gather together to that family and wish them joy of their good luck. Feasts would be got ready, the women of the tribe would join together in bands, playing upon lutes as they were wont to do at bridals, and the men and boys congratulated one another, for a poet was a defence to the honour of them all, a weapon to ward off insult from there good name, and a means of perpetuating their glorious deeds, and of establishing their fame for ever. And they used not to wish one another joy but for three things,—the birth of a boy, the coming to light of a poet, and the foaling of a noble mare."—p XVII.

(৭) "Their unwritten words flew across the desert like arrows and came home to the heart and bosom of all those who heard them"—Ibid.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরবের কুসংস্কারাতুর মন হিযা কবিতার উচ্চারণে বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বিত হইত বলিয়া উহাকে আরো বিশেষ ভীতির চক্ষে দর্শন করিত। তজ্জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়িক যুদ্ধের মাঝে হিযা কবিতা অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের মতই এক অত্যাবশ্যক অস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত, এবং শত্রু পক্ষীয়ের উপরে উহা এক অদৃশ্য মন্ত্রঃপূত মৃত্যুবাণ বলিয়া গণ্য হইত। (৮) এইজন্য যুদ্ধশেষে যখন লুণ্ঠনদ্রব্যের ভাগ বাটোয়ারা হইত তখন কবিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ প্রদান করা হইত, কারণ অন্য সকলের ন্যায় সে-ও তাহার কবিতার বাণ দ্বারা যুদ্ধ করিয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইত।

এই হিযা কবিতাবলী জগতের Satire, Lampoon ও sarcasm জাতীয় জিনিষের মধ্যে এক ভীষণ শক্তিশালী ও অতীব মর্ম্মদাহী জিনিষ। উহার ভীষণতা ও মর্ম্মগ্রাহীতার শক্তি আরব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অসমঞ্জস ভাবধারাপূর্ণ আমাদের সমাজ ও ভাষার মধ্যে ফুটাইয়া তোলা বা সম্যক ধারণা করান সম্ভবপর নহে। উভয় সমাজের ভাবধারার প্রকৃতি এত বিভিন্ন ধরণের যে উহার তর্জ্জমার (অনুবাদের) দ্বারা উহার সম্যক উপলব্ধি দূরে থাকুক, সামনাসামনি একটা ধারণাও কিছুতেই আমাদের মনের মধ্যে আসিতে পারে না। বিশেষতঃ আরবী ভাষার শব্দাবলী এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশক, এবং একটি ভাবেরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভেদের জন্য এত বিভিন্ন ধরণের শব্দ বর্ত্তমান, (৯) এবং হিযা কবিতাবলী সাধারণতঃই এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশক শব্দমালায় দ্বারাতে গ্রথিত হয় যে উহার সম্যক ধারণা একমাত্র আরবী ভাষার ভিতর দিয়া এবং সম্ভবতঃ একমাত্র আরবদের দ্বারাই হইতে পারে।

হিযা কবিতা কিরূপ ধরণের ছিল তাহা জানিবার জন্য হয়ত পাঠকপাঠিকাগণের কৌতূহলের উদ্রেক হইতে পারে। তজ্জন্য আবু তাম্মাম কৃত আধার আরবের কবিতা বহি বিখ্যাত 'হামাসাহ' গ্রন্থ হইতে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা গেল, কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণ যেন উহার দ্বারা হিযা কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা করিয়া না বসেন :—

কালা যাওওাশ্

ওাযাদ্‌তা আবাকা ভাবেআম্ কা হাবে'-ভাহ,
ওা আন্‌তা লে উহ্‌হায়ের য়েযালে লাজ্‌মু।
'আলা কুল্লে 'আয়েজিইএন্ দামামাতুন্,
য়ুআফী বেহাল্ আক্‌ওায়্ হীনা তাকূমু।
ওা আওয়াযাহা শারয়াত্‌, তুরাবে আবুহয্,
কুমাআতা কেস্‌সেও ওায় রুওাউ দামীমু॥

"হামাসাহ"

আধার আরবের কবি যাওওাশ্ বলিতেছেন—

বান্দার দল! গর্ব্ব কিসের?
বড়াই করিস্ মোদের সনে?
বাপ পিতাম'র কেটেছে জীবন,
চিরদাস রূপে হীনতা পানে
তোদের বংশ কোন কবীলার
আছে কিরে জানা বাকী?
তোদের কালিমা ছায়াই তোদেরে
চিনায় চেহারা ঢাকি।
তোদের পূর্ব্ব পুরুষেরা রেখে
তোদের গিয়েছে ভালো!
হ্রস্ব শরীর, গঠন কুশ্রী,
বর্ণ গভীর কালো!

(৮) "The satire or 'Hija' was an element of war just as important as the actual fighting. The menaces which he (the poet) hurled against the foe was believed to be inevitably fatal. His rhymes, often compared to arrows, had all the effect of a solemn curse stolen by a divinely inspred prophet or priest."—Ibid,

(৯) "In one direction the exceeding richness of Arabic poetry becomes so exuberant as to approach redundancy. It (the Arabic language) posseses multitedes of words to express the same thing, which point may best be illustrated by the fact that it offers a choice of a thousand words for camel, about the same number for horse and about five hundred words each for sword and tiger. But the most valuable result of its copiousness is to be looked for in the fact that it possesses words expressive of the minute differences of the shades of meaning."—Al—Obaidi.

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে আদিম হিব্রু কবিতাবলীর একটা সামান্যতম অংশও আমাদের হস্তগত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আবু তাম্মাম ও বুহ্ তুরীর বিখ্যাত কবিতা-সংগ্রহ-দ্বয়ে যে হিব্রু কবিতামালা সংগৃহীত আছে, তদ্দ্বারা আধার আরবের হিব্রু কবিতার একটা নগণ্য অংশেরও বোধ হয় পরিচয় পাওয়া যায় না।

অনুবাদের দ্বারা হিব্রু কবিতার শক্তি ও মর্ম্মগ্রাহীতার স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য একটা ধারণা আনয়ন করাও সম্ভাবনার বহির্ভূত হইবে ভাবিয়া অত্র প্রবন্ধে আমি হিব্রু কবিতা সম্পর্কীয় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ দ্বারাই পাঠক পাঠিকা-গণকে উহার ভীষণতার সম্বন্ধে একটা ধারণা প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে কা'আব বিন্ জুহায়র নামক এক বিধর্ম্মী কবি ছিল। কা'আবের পিতা জুহায়রা বিন্ আবী-সাল্মা আরবের 'সপ্ত-কবিতার' (সাবআ মু'আল্লাকার) তৃতীয়(১০) কবি ছিলেন। কা'আব পিতার কবিত্ব শক্তির বহু পরিমাণে অধিকারী হইয়াছিল। সে ইসলাম ও উহার নবীকে আক্রমণ করিয়া কুৎসা কবিতা লিখিতে আরম্ভ করে। আরব জাতির প্রাণ প্রিয় ভাষার সর্ব্বোচ্চ শক্তিবান রচনা এই বিদ্রূপ-কবিতা; আরবী ভাষার ভিতর দিয়া আরবের মনে উহা কী সজীব শক্তি বিস্তার করিবার ক্ষমতা রাখে তাহা তর্জ্জমার দ্বারা বুঝান যাইবে না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ইসলাম প্রচারের মাঝে কা'আবের ঐ কুৎসা কবিতা প্রভূত পরিমাণে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। করুণার আদর্শ নবী, যিনি মক্কাবাসীদের দ্বারা অতি ভীষণ ভাবে অত্যাচারিত হইয়াও মক্কা জয়ের পরে তাহাদিগকে অম্লান বদনে ক্ষমা করিয়াছিলেন, তিনি কা'আবের এই মর্ম্মন্তুদ কবিতাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। বিরক্ত হইয়া তিনি কা'আবের হত্যার আদেশ প্রদান করিলেন। শান্তির প্রতিমূর্ত্তি নবী কতটা বিরক্তির কারণে এই হত্যার আদেশ দানে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার পড়িবে না। কা'আবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইতঃপূর্ব্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কা'আবকে ইসলাম অবলম্বনের জন্য উপদেশ দান করিয়া পাঠাইলেন। কা'আব তখন প্রাণ ভয়ে কয়েকদিন পাহাড়ে জঙ্গলে ও পর্ব্বত গুহায় অতিবাহিত করিল। কিন্তু এইরূপ জীবন যাপন যখন তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সে একদিন ছদ্মবেশে হঠাৎ নবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা সূচক এক কসীদা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল। এই কসীদাই "বা-নাত্ সু'আদ" নামে আরবী সাহিত্যে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। কা'আবের এই কসীদা ইসলামের নবীর গুণ গানে মুক্তার মালার মত এমনই উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে যে উত্তর কালে বহু মসজেদ গাত্রে উহার শ্লোকাবলী মূল্যবান প্রস্তর সহযোগে লিখিত হইয়া থাকিত। কা'আব ব্যতীত উমায়্যাহ বিন্ আবিস্ সাল্ত্ প্রভৃতি আরও কয়েকজন কবি ইসলামের কুৎসা মূলক কবিতা প্রচার করিত। এই সব কবিতাবলীর দ্বারা ইসলাম প্রচারে বিঘ্ন ঘটিতে দেখিয়া ইসলামের নবী তদীয় সাহাবা-কবি হাস্সান বিন্ ষাবিত্‌কে ঐ কবিতা সমূহের প্রত্যুত্তর ও প্রতিরোধ কল্পে কবিতা প্রণয়নে আদেশ দিয়াছিলেন। এতদ্‌সম্পর্কে নবী বলিয়াছেন, "বহু শহীদের (ধর্ম্ম-যোদ্ধার) শোণিত যাহা করিতে পারে নাই, হাস্সানের লেখনী ইসলাম প্রচারে তাহা করিয়াছে।" সাব'আ মু'আল্লাকার অন্যতম কবি লাবীদ ইসলাম গ্রহণ করিলে ইসলামের নবী তাহাকেও বিধর্ম্মী কবিদের প্রত্যুত্তরে কবিতা রচনার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু লাবীদ বলিয়াছিলেন, "হে নবী, আপনি আমাকে আর কবিতা রচনার জন্য অনুরোধ করিবেন না; কবিতার বদলে আমি যাহা পাইয়াছি আল্লার সেই কোর'আনই এখন আমার জন্য যথেষ্ট।

(১০) আরবের এই 'সপ্ত-কবিতা'র কথা আমি অন্য এক প্রবন্ধে বলিতে চেষ্টা করিব। আরব জাতি কবিতার জন্য বিখ্যাত। আরব কবিদের মধ্যে যে সাত জন কবির সাতটি কবিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আরবদের দ্বারা পরিগণিত হইয়াছিল, সেই সাতটি কবিতা মিসর দেশীয় কিংখাবের উপরে সোনার অক্ষরে লিখিত হইয়া আরব জাতির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সম্মানিত স্থান কা'বার দ্বারে দোলায়িত হইয়াছিল। তজ্জন্য উহাদিগকে সপ্ত দোলায়িত কবিতা (Seven Suspended poems of the Arabs) বা সপ্ত স্বর্ণ কবিতা (সাব'আ মুজাহ হাবাত্, বা (Seven Golden Poems) নামে অভিহিত করা হয়।

কবিদের কুৎসাবর্ষী বাক্যবাণকে আরব জাতি কতটা ভয় করিত তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

উমায়্যাহ্ বংশীয় খলিফাহ্‌গনের রাজত্বকালে যারীর ও ফারাজ্‌দাক্ নামক দুই বিখ্যাত কবি ছিল। এই দুই কবির মধ্যে কবিতার যুদ্ধ নিত্য লাগিয়াইছিল, এবং এক কবি অন্য কবিকে আরবীয় ভাষার যাবতীয় বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ ও গালাগালি-বর্ষক কবিতা দ্বারা আক্রমণ করিত। তাহাদের এই দ্বন্দ্ব-কবিতা বা "নাকায়েদ" কি নাগরিক, কি সৈনিক, সমুদয় শ্রেণীর মধ্যেই তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং এতদুভয়ের মধ্যে কে কাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কবি এই আলোচনা নিয়া যাবতীয় নাগরিক, সৈনিক ও কবি দুই প্রকাণ্ড দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। (১১)

এক্ষণে, আমার বর্ণনার ঘটনা এই যে তাহাদের সমসাময়িক সময়ে রা-'ঈল ইবিল নামে এক কবি ছিল। সে ফারাজ্‌দাক্‌কে যারীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবি বলিয়া উচ্চরবে মত প্রকাশ করিয়া বেড়াইত। এক্ষণে ব্যাপার হইল এই যে যারীর রা-'ঈগ ইবিলের বংশ বানু-নুমায়েরের প্রশংসা করিয়া কবিতা লিখিয়াছিল, কিন্তু ফারাজ্‌দাক্ তাহাদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করিয়াছিল। একদিন যারীর রা-'ঈলের নিকট গমন করিয়া এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিল, কিন্তু রা-'ঈ কোন উত্তর করিল না। রা-'ঈ তখন খচ্চরারোহণে কোথায় গমন করিতেছিল এবং তাহার পুত্র যান্‌দাল তাহার অনুগমন করিতেছিল। রা-'ঈকে থামিতে দেখিয়া যান্‌দাল চীৎকার করিয়া বলিল, "বানু কুলায়েবের এই কুকুরটার নিকটে দাঁড়াইয়া কেন বৃথা সময় ক্ষেপণ করিতেছ; মনে হয় যেন উহা হইতে তুমি কিছু লাভবান হওয়ার আশা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা কর।" এই বলিয়া সে তাহার পিতার খচ্চরের পৃষ্ঠে খুব জোরে কষাঘাত করিয়া দিল। অবোধ প্রাণী অকস্মাৎ ভীষণ ভাবে প্রহৃত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া দৌড় দিল। যারীর পিছনে দণ্ডায়মান ছিল; সে খচ্চরের লাথির আঘাতে পড়িয়া গেল এবং তাহার টুপী দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। যান্‌দাল তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করিয়া খচ্চর হাকাইয়া চলিয়া গেল। যারীর মৃত্তিকা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া টুপীটি তুলিয়া লইল, এবং উহা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া মাথায় পড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—

"ওরে যান্‌দাল, কি বলিবে তোর
বংশ নুমায়ের কবে,
আমার কুৎসা-কবিতার বাণে
বক্ষ বিঁধিবে যবে?"

যারীর নিতান্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ অবস্থায় বাড়ী ফিরিল, এবং সন্ধ্যার উপাসনান্তে একজগ খর্জুর সুরা এবং একটি প্রদীপ আনাইয়া কবিতা লিখিতে বসিল। ঐ গৃহের জনৈক বৃদ্ধা তাহাকে কি বিড়বিড় করিতে শুনিয়া কি হইয়াছে দেখিবার জন্য সিড়ির উপরে আসিল, এবং দেখিল যে যারীর তাহার শয্যার উপরে উলঙ্গ অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। এতদ্দর্শনে বৃদ্ধা দৌড়িয়া যাইয়া গৃহবাসীদিগকে চীৎকার করিয়া জড় করিয়া যারীরের অবস্থা বর্ণনা করিল। তাহারা বলিল, "ওরে বুড়ি, তুমি চুপ কর, সে কী করিতেছে তাহা আমরা জানি।" ভোর হওয়ার পূর্ব্বেই যারীর বানু-নুমায়েরের বিরুদ্ধে ৮০ চরণের এক কুৎসা কবিতা রচনা করিয়া ফেলিল যখন কবিতা শেষ হইল, তখন সে যুদ্ধবিজয়ী সেনানীর মত 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং

১১) "These flytings (nagaid) were recited every where and each poet had thousands of enthusiastic partisans who maintained that he was superior to his rival. One day Mutallab-bin-Abi Sufra, governor of khurasan, who was marching against the Azaiqa, a sect af the khariits, heard a great clamour and tumult in the camp On enquiring its cause he found that the soldiers had been fiercely disputing as to the comparative merit of Jarir and Farazdaq, and desired to submit the question to his d cision. "Would you expose me," said mutallab, "to be torn in pieces by these two dogs? I will not decide between them, but I will point out to you those who care not a bit for either of them. Go to the Azaiqa! they are Arabs who understand poetry, and judge it aright." Next day when the armies faced each other, an Azaigite named Abida bin Hilal stepped forth from the ranks and offered single combat. One of the Mutallabs men accepted the challenge, but before fighting, he begged his adversary to inform him which was the better poet,—Farazdaq or Jarir? "God confound you," cried Abida, "Do you ask me about poetry instead of studying the Qoran and the sacred law?" Then he quoted a verse by Jarir and gave judgment in his favour"—Nicholson.

তৎপরে যেখানে রা-'ঈ এবং ফারাজ্দাক্ এবং তদ্দলভুক্ত কবিগণের সাক্ষাৎ পাইবে, তথায় গমন করিল, এবং রা-'ঈর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবা মাত্র রাজের রচিত কুৎসা কবিতাটির আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ তাহার আবৃত্তি চলিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ফারাজ্দাক্ ও রা-'ঈ ও তাহাদের সঙ্গীরা অবনত মস্তকে উপবেশন করিয়া রহিল এবং যখন যারীর তাহার সর্ব্বশেষ চরণদ্বয়,—

"হীন নুমায়ের বংশের তুই
নহিস্ ক আব কেলাব-বীর
অবনত ওরে করে কেন আঁখি,
লজ্জা ছেয়েছে আপাদ-শির।"
ফাগুদ্দেত্ তার্ফা ইন্নাকা মিন্ নুমায়রি,
ফালা কা'বান্ বালাগ্তা ওয়ালা কিলাবা।

—আবৃত্তি করিল, তখন রা-'ঈ ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার খচ্চরে আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার পরিজনবর্গকে চীৎকার করিয়া বলিল, "সত্বর অশ্বারোহণ কর, সত্বর অশ্বারোহণ কর, তোমরা এইস্থানে আর তিষ্ঠিতে পারিবে না, আজ যারীর তোমাদের সমুদয় বদন কালিমা-লিপ্ত করিয়া দিয়াছে।" এতদ্শ্রবণে তাহারা তাহাদের মালামাল বাঁধিয়া ছাদিয়া বসরা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল, এবং যখন তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ে উপনীত হইল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা সমস্ত বংশের প্রতি কুৎসা-কালিমা আনয়নের জন্য রা-'ঈ এবং তাহার ছেলেকে ভীষণভাবে ভৎ'সনা করিল। বহু শতাব্দী পরেও রা-'ঈ এবং তাহার পুত্রের নাম তাহাদের বংশের কালিমা আনয়নের কারণ স্বরূপে এক প্রবাদ বাক্যের হেতু হইয়া রহিয়াছিল। (১২)

কবিদের মুখরতাকে আরবেরা কিরূপ ভয় করিয়া চলিত তাঁহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আরব মরুভূমির উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের পারে হেরা নামক প্রদেশ ছিল। ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে 'আম্‌র্ বিন্ হিন্দ্ হেরায় সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। তাঁহার সভাতে তারাফাহ্ বিন্ আব্দিল্ বাক্‌রী ও তদীয় মাতুল কা'ব মুতালাম্মিস নামীয় দুই বিখ্যাত কবি ছিল। তারাফার কবিতা আরবের 'সপ্ত ঝোলায়িত কবিতা'র মাঝে দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা হইতেই তাহার কবিতার প্রভাব, সৌন্দর্য্য ও শক্তিশালীতা সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণ ধারণা করিতে পারিবেন। (১৩) কথিত আছে যে সে তাহার যৌবন উন্মেষের পর হইতেই এমন উচ্ছৃঙ্খল, ছন্নছাড়া ও লা-পরোওয়া প্রকৃতির ছিল যে অতি শীঘ্রই সে তাহার ভ্রাতা আবদুল মালেকের সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া হেরায় চলিয়া আসিয়াছিল। কিছুকাল হেরায় অবস্থান করিবার পর মুক্ত মরুচারী তারাফাহ্ সহরের সসীম পরিবেষ্টন এবং রাজসভার বিধি নিষেধের মধ্যে অতিষ্ঠ হইয়া আম্‌র্ বিন্ হিন্দ্‌কে উপলক্ষ করিয়া এক হিযা কবিতা রচনা করিল,—

"Would that we had instead of 'Amr,
A milch-ewe bleating round our tent"
—Nicholson

অর্থাৎ রাজ সভার এই জাঁকজমকপূর্ণ সমারোহের চেয়ে মুক্ত মরুর তাবুর পাশে যে মেষ চরিয়া বেড়ায় তাহাও আমার বেশী নয়নানন্দের জিনিষ। রাজা আম্‌র্ তারাফার এই কবিতার বিষয় অবগত হইয়া তদ্প্রতি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তারাফাহকে শাস্তি প্রদান করিতে তাহার সাহস হইল না, যেহেতু তাহা হইলে তারাফাহ্ ও তাহার মাতুল তাহাকে আরো ভীষণতর 'হিযা'র বাণে বিদ্ধ করিয়া মারিবে। সুতরাং রাজা 'আম্‌র্' মনের রাগ মনেই চাপিয়া রাখিলেন। কিন্তু পরোওয়া বিহীন যুবককবি তারাফাহ্ সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইলে উহার মাধুরী-পানের ব্যাপারে দুনিয়ার কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করিতে শিখে নাই। তাই কিছু কাল পরে একদিন যখন রাজা 'আম্‌র্ তাহার অন্তঃপুরে তারাফাহ্‌কে

(১২) রাজাতুল মাবালেব ওয়াল মাবানী নামক আরবীয় গ্রন্থের ১৯০ পৃষ্ঠা হইতে অনুবাদিত।

(১৩) কবি তারাফাহ্ আরবের সপ্ত-কবিতার কবিগণের মধ্যে সর্ব্ববয়ঃকনিষ্ঠ ছিল। মাত্র ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে জীবিত ছিল। এই অল্প বয়সের মধ্যে যুবক কবি তারাফাহ্ আরবী কবিতার মাঝে 'শুবুবিয়াত' বা যৌবন-কবিতার যে দান রাখিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। বাংলা ভাষার মাঝে—(আমার জানা মতে) একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামের 'পূবালী হাওয়া' এবং ঐরূপ আর দু'একটি কবিতার মাঝে মাত্র তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাইয়াছি।

নিমন্ত্রণ করিয়া এক সঙ্গে ভোজন করিতে আনিলেন, তখন ঐ দস্তরখানেরই (dinner cloth) অন্য পার্শ্বে যৌবন-উপনীতা অনুপম সুন্দরী রাজ-ভগিনীও আসিয়া উপবিষ্টা হইলেন। তারাফাহ্ তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—

"Behold, she has come back to me,
My fair gazelle, whose ear-rings shine;
Had not the king been sitting here,
I would have pressed her lips to mine"
—Dk Ibid.

দেখ দোস্ত ঐ
হারান আমার
হরিণ আবার
ফিরিয়া এসেছে বুকে,
আহা যদি রাজা
হেথা না থাকিত
কত সাধে ঠোট
চুমিতাম ঠোটে রেখে।

—এতটা ধৃষ্টতার কি আর মার্জ্জনা আছে? 'আম্‌র্ বিন্ হিন্দ্ নিজকে যারপর নাই অপমানিত মনে করিলেন, এবং তারাফার এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাহার নিধন-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু মুতালাম্মিস জীবিত থাকিতে ত তাহা সম্ভবপর হইবেনা, কারণ সে তাহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবেই লইবে। হেরার মাঝে তাহাদিগকে হত্যা করিলে তাহার অন্তঃপুরের এই গুপ্ত কাহিনী কোন না কোন রকমে প্রকাশিত হইয়া তাহার গর্ব্বোন্নত বংশের মাঝে এক চির-কালিমার সৃজন করিবে। তজ্জন্য 'আম্‌র্ বিন্ হিন্দ্ স্থির করিলেন যে উভয়কে দূর বাহ্‌রায়ন প্রদেশে তাহাদের জন্মভূমি পরিদর্শনে প্রেরণের ভাণ করিয়া উক্ত প্রদেশের শাসন-কর্ত্তার নিকট তাহাদের গুপ্ত হত্যার আদেশ প্রদান করিয়া পাঠাইবেন। তদনুসারে উভয়কে তিনি স্বদেশ পরিদর্শনের ছলে বাহ্‌রায়নের শাসন কর্ত্তার নিকট মোহরাবদ্ধ লিপিকাসহ প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে মুতালাম্মিস সংশয়ান্বিত হইয়া হেরার এক খৃষ্টান বালকের দ্বারা লিপিকা খুলিয়া পাঠ করাইয়া উহার গুপ্ত বিষয় অবগত হইল। উহাতে তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত করার আদেশ ছিল। মুতালাম্মিস তারাফাহ্‌কে ঐ বিষয় অবগত করাইয়া তাহার নিজের লিপিকাও উন্মোচন করিয়া পাঠ করাইয়া দেখিতে বলিল। কিন্তু তারাফাহ্ মুতালাম্মিসের কথায় কর্ণপাতও করিল না। মুতালাম্মিস কিছুতেই যখন তারাফাহ্‌কে সম্মত করাইতে পারিল না, তখন স্বীয় প্রাণ রক্ষার জন্য একাই অন্যত্র পলায়ন করিল, এবং দুরদৃষ্ট তারাফাহ্ বাহ্‌রায়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। ফলে যাহা হইবার তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। আরবী সাহিত্যবিদ্ ডক্টর নিকলসন তারাফার এই অকাল মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"Thus perished miserably in the flower of his youth,—according to some account he was not yet twenty,—the passionate and eloquent Tarafah. In his Mu'allaqah he has drawn a spirited portrait of himself. The most striking feature of his poem is his insistence on sensual enjoyment as the sole business of life....He had early developed a talent for satire which he exercised upon friend and foe indifferently, and after he had squandered his patrimony in dissolute pleasures, his family chased him away as though he was a mangy camel" :— (pp. 107/8).

আশা করি ইহা হইতেই আমার পাঠক পাঠিকাগণ হিব্রু কবিতার সংঘাতিক শক্তি সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন। প্রবন্ধ অনেকটা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক স্থলেই আমাকে পাদটীকা প্রদান ও উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। পাদটীকা এবং উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে এই ধরণের প্রবন্ধ পাঠক পাঠিকাগণের বোধগম্য করান সম্ভবপর হইত না বলিয়া, বাধ্য হইয়া যাহা আমাকে দিতে হইয়াছে, আশা করি তাহা আমার পাঠক পাঠিকাগণের নিতান্ত অনুপাদেয় হয় নাই। যদি অবসর পাই তবে আরবের যৌবন-কবিতা প্রসঙ্গে আরবের যে সপ্ত-কবিতার কথা এই প্রবন্ধে আমাকে উল্লেখ করিতে হইয়াছে তদ্বিষয়ে পাঠক পাঠিকাগণকে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

মোহাম্মদ গোলাম মাওলা

দেশের কথা

শ্রীসুশীল কুমার বসু

আমাদের রাষ্ট্রীক অধিকার

আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্য সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে, পাশ্চাত্যের চিন্তা ও ঘটনা সমূহের প্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। সেখানকার পরিবর্ত্তনশীল নূতন চিন্তা ও মতের দ্বারা আমাদেরও চিন্তা ও আদর্শ নিত্য প্রভাবিত ও সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাতে অন্যায়, দোষের অথবা সঙ্কুচিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু, বিশেষ বিচার না করিয়া, অন্ধভাবে কোনও জিনিসের অনুসরণ আমাদের পক্ষে লজ্জাকর ও ক্ষতিকর হইতে পারে। সকল প্রকার চিন্তাধারা ও ঘটনাবলীর উপর আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং তাহার শ্রেষ্ঠ অংশগুলি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আমাদের দেশের একদল রাজনীতিক যেমন, রাষ্ট্রে বর্ত্তমান সময়ের মধ্যবিত্তদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রাখিবার অন্যায় মত পোষণ করেন, সেইরূপ ইউরোপীয় কমিউনিজম্‌-এর আদেশে অনুপ্রাণিত একদল তরুণ ভুল করিয়া আমাদের বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে ইউরোপীয় ধনিক সম্প্রদায়ের সমস্থানীয় মনে করেন, এবং ইঁহাদের উচ্ছেদ ও বিলোপ সাধনকে দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশের মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা যে ইউরোপের ধনিক সম্প্রদায়ের মত নহে, অনেক দিক দিয়া যে তাঁহারা কৃষকদের অপেক্ষাও অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত, আমাদের কৃষক বা শ্রমিকেরা যে তাহাদের ইউরোপীয় ভ্রাতৃবর্গের ন্যায় দেশের সঙ্ঘবদ্ধ ধনবলের শিকারের পাত্র নহে, দেশের প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান করিলে, তাহার পরিচয় পাওয়া অসম্ভব হইবে না। আমাদের কৃষক বা শ্রমিকদের কোনও প্রকার দুঃখ দুর্দ্দশা নাই, অথবা দেশের ভূম্যধিকারী বা মহাজনদিগের দ্বারা যে তাঁহারা অত্যাচারিত হন না এবং দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদিগকে শোষণ করেন না, বা তাহাদের উপর অন্যায় সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করেন না, তাহা নহে। কিন্তু, ইউরোপীয় ধনিকদের ন্যায় ইঁহাদের পশ্চাতে একত্রিত ধনবল না থাকায় এবং ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা ইঁহাদিগকে বিশেষ কিছু সুবিধা দিতে না পারায়, এই অবস্থার প্রতিকার এবং দেশের মধ্যে আর্থিক সাম্য বিধান বিশেষ কষ্টকর হইবে না। ইঁহাদের অনেকেই দেশের আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

এই সকল অবস্থার কথা পুরাপুরি বিচার না করিয়া যাঁহারা কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা আবশ্যক ভাবে দেশের মধ্যে শ্রেণী বিরোধের ভাব জাগাইতেছেন কি না, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

পরমত সহিষ্ণুতা

সকল দিকেই আমরা বিপুল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। ইহার পশ্চাতে যে উদ্যম ও কর্ম্ম প্রচেষ্টা আছে, নানা দলে, নানা মতে এবং বিভিন্ন মুখী কর্ম্মে তাহার আত্মপ্রকাশ নিতান্তই স্বাভাবিক। আমাদের জাতীয় জীবনের নানা দিকে নানা প্রকারের ত্রুটি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের অগ্রগতির পক্ষে ইহার সকল গুলিরই সংশোধনের প্রয়োজন আছে। কোনও বিশেষ ত্রুটির দিকে যে কোন বিশেষ লোকের বা দলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, এবং তিনি বা তাঁহারা তাহার প্রতিকারের জন্য যে চেষ্টা বা কাজ করিবেন, ইহা খুবই সম্ভব। আবার একই জিনিষের প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন লোকের বা বিভিন্ন দলের পক্ষে বিভিন্ন প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন অন্যায় বা অসম্ভব নহে।

এরূপ অবস্থায় আত্মকলহে অথবা পরস্পরের সহযোগিতার অভাবে যাহাতে আমাদের উদ্যম ও কর্ম্মশক্তির অপচয় না ঘটে, সে জন্য সকল দলের এবং সকল মতের লোককেই সাবধান হইতে হইবে।

কোন বিশেষ অবস্থায় প্রতিকারের জন্য যাঁহারা কোন বিশেষ পন্থায় কোনও বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের দল, মত, পন্থা বা কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে, জাতির উন্নতি কল্পে অন্যান্য যে সকল লোক বা দল যে সকল কাজ করিতেছেন, সেই সকল কাজ যদি যুক্তির দ্বারা কোন-না-কোন প্রকারে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত অথবা সমর্থিত হইতে পারে তবে চিন্তা, কথা এবং সহানুভূতির দ্বারা সব সময়েই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে; নিজ দল বা মতের ক্ষতি না করিয়া সম্ভবমত সহযোগিতা করিতে হইবে এবং অন্তরে ও বাহিরে সব সময়েই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে হইবে।

পরমতে অসহিষ্ণুতা এবং দলের বাহিরের লোককে শ্রদ্ধা করিবার ক্ষমতা অথবা অভ্যাসের অভাব আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই। এই মনোভাব নিন্দনীয় এবং আত্মঘাতী। ইহা প্রবল হইলে, দেশের উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে এবং অপরের নিজমত পোষণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। এমনও দেখিয়াছি, যাঁহারা কিছুই করিতেছেন না, অথবা যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কার্য্যে বাধা দিতেছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও প্রতিদ্বন্দ্বীদলের (?) কর্ম্মীদের উপর অশ্রদ্ধার ভাব প্রবলতর হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে লোকচক্ষে হেয় করিবার ন্যায় ও অন্যায় সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোনও দল বা লোকের প্রতি আসক্তি অপেক্ষা সমগ্র জাতির উন্নতির জন্য যাঁহারা অধিকতর আগ্রহান্বিত, তাঁহারা কথাগুলি, আশা করি, ভাবিয়া দেখিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ ইসাক

এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, পারস্য ভাষা ও সাহিত্য সেবার জন্য পারস্যের শিক্ষামন্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ মহম্মদ ইসাককে 'নিশান-ই-নিমি' পদক পুরস্কার দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় এই সম্মান প্রাপ্ত হন নাই।

মিঃ ইসাক পারস্যের আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে 'সুখান-বরণ-ই-ইরাণ-দার-আসর-ই-হাজির' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এই উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন।

পারস্যের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে। জাতি, ধর্ম্ম, এবং সংস্কৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই এই যোগ বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল। মধ্যে যখন সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডেই অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছিল, সেই সময় আমরা পরস্পরকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতাই আজ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সংযোগসূত্র। এই নূতন সভ্যতার আলোকে পরস্পরকে আমরা আবার নূতন করিয়া নূতন রূপে চিনিতেছি। প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত কৃষ্টিগত যোগাযোগ আমাদের মধ্যে মৈত্রীর সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিবে ও বর্দ্ধিত করিবে।

পারস্যের বর্ত্তমান রাজা, রিজা সাহ রবীন্দ্রনাথকে পারস্যে নিমন্ত্রণ করিয়া এবং শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক প্রেরণ করিয়া পূর্ব্বেই ভারতের প্রতি তাঁহার বন্ধু মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যেমন পার্শীর চর্চ্চা হয়, পারস্যেও তেমনই হিন্দি, বাংলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষার চর্চ্চার ব্যবস্থা করিলে ও ইহা শিখিবার জন্য ছাত্রদের যথোপযুক্ত উৎসাহ প্রদান করিলে, উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইবে।

সন্ত্রাসবাদ ও দমন আইন

বাঙ্গালী তরুণদের একাংশের মধ্যে [সম্ভবতঃ সংখ্যায় ইঁহারা অধিক হইবেন না] সন্ত্রাসবাদ যে কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল, স্বদেশহিতৈষী বাঙ্গালীরই চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। কোন লোকেরই পক্ষে ইহা ইচ্ছা না করাই স্বাভাবিক যে, তাঁহার পুত্র, ভ্রাতা অথবা কোন আত্মীয় এরূপ কোন নীতিতে দীক্ষিত হইবেন বা এরূপ কোন কার্য্যে

লিপ্ত হইবেন, যাহাতে তাঁহারা বিপদাপন্ন হইতে পারেন, তাঁহাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে পারে এবং যাহার জন্য সমবেত ভাবে তিনি এবং তাঁহার অনেক আত্মীয়ের নানাবিধ ক্ষতি ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতে পারে। সকল পিতা-মাতা, অভিভাবক, এবং স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি এই প্রকার নীতি এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাহাতে দেশ হইতে দূরীভূত হয়, তাহার ইচ্ছা করেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী চেষ্টা করেন। তাহা হইলেও, ইহা দূর করিবার পন্থা সম্বন্ধে সরকারের সহিত দেশের লোকের মতভেদ রহিয়াছে।

দেশের অধিকাংশ চিন্তাশীল লোক মনে করেন, সৈন্য বিভাগের প্রবেশাদির ন্যায় সাহসিক কার্য্য করিবার, আইন ও ন্যায়সঙ্গত উপায় থাকিলে, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অত্যন্ত তীব্রভাবে অর্থাভাব ও কর্ম্মাভাব দেখা না দিলে, যুবকদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ব্যাপকতা লাভ করিতে পারিত না। শিক্ষিত যুবকদের জীবিকার উপায় অপেক্ষাকৃত সহজ হইলে যে, তাহাদের মধ্য হইতে সন্ত্রাসবাদ লুপ্ত হইতে পারিত তাহা লর্ড উইলিংডন ও অন্য অনেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষও স্বীকার করিয়াছেন।

দেশের সকল সংবাদপত্র, প্রধান ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নেতা এবং সকল প্রকার দমন আইনের বিরোধীরা এবং তীব্র সমালোচকেরা বার বার সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করিয়াছেন ও ইহার অনিষ্টকারিতার কথা বলিয়াছেন। আমরাও আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্য অনুসারে ইহার নিন্দা করিয়াছি ও ইহার ক্ষতিকর দিকগুলি উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোন প্রকার গুপ্তহত্যা বা ষড়যন্ত্র প্রভৃতি যে নিতান্ত ঘৃণ্য ও কাপুরুষোচিত, ইহা যে ভারতের চিরন্তন নীতি ও আদর্শের বিরোধী, কয়েক লক্ষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে সংগৃহীত অল্পসংখ্যক যুবকের এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নহে, আধুনিক মারণাস্ত্র সমূহ এবং আধুনিক রণনীতিতে শিক্ষিত সৈন্যদলের সম্মুখে ২।১ টি বোমা বা রিভলবার যে কিছুমাত্র ফলপ্রদ নহে, যে সকল যুবক অন্য দিক দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের কেহ কেহ যে সন্ত্রাসবাদের আওতায় আসিয়া নিজেদের ও দেশের ক্ষতির কারণ হইয়াছেন, একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছি। কোন হত্যা বা ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে যাঁহারা লিপ্ত আছেন তাঁহারা কঠোর দণ্ডভোগ করুন, ইহাও আমরা চাই। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চাই যে, শাস্তি দিবার পূর্ব্বে ইঁহাদের অপরাধ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান, সাধারণ আদালতে উপযুক্ত সঠিক সাক্ষ্যাদি গ্রহণের দ্বারা তাঁহাদের দোষ প্রমাণিত হউক এবং তাহাদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ও নিজেদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার সুযোগ প্রদান করা হউক। নহিলে, অনেক নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ লোকের লাঞ্ছনা ভোগ করিবার আশঙ্কা থাকে।

দেশের শান্তি ও কল্যাণের জন্য, রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের পথে বাধাহীন অগ্রগতির জন্য সর্ব্বোতোভাবে আমরা দেশ হইতে সন্ত্রাসবাদের উচ্ছেদ সাধন চাই। কিন্তু, এই উদ্দেশ্যে বাংলা কাউন্সিলে, সম্প্রতি যে আইন সমর্থিত হইল, তাহা বহুল পরিমাণে দেশের লোকের চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবে, ও অনেক নিরীহ লোকের নানাবিধ দুঃখ ও শাস্তিভোগ করিবার কারণ স্বরূপ হইবে বলিয়া এই আইনকে আমরা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করি।

বাঙলা কাউন্সিল ও নূতন আইন

সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে বাঙলা কাউন্সিলে দণ্ডবিধির যে নূতন সংশোধন হইল, তাহা ৬১—১৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। সন্ত্রাস দমনের জন্য সরকার যে প্রকার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা তাঁহাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রত্যাশিত হয় নাই। কাউন্সিল কর্ত্তৃক ইহা পরিত্যক্ত হইলেও, রক্ষিত অতিরিক্ত ক্ষমতার বলে এই আইনকে কার্য্যকরী করা হইত,—ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

তাহা হইলেও, কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যেরা দেশ ও জনমতের প্রতিনিধি, একথা দেশের এবং বিদেশের লোকের পক্ষে ধরিয়া লওয়া অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। তাঁহাদের অধিকাংশের দ্বারা কোনও বিধি গৃহীত হইলে, তাহার

পশ্চাতে জনমতের সমর্থন আছে, এরূপ অনুমান করা নিতান্তই স্বাভাবিক। বাংলা কাউন্সিলের ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২৬ জন সদস্য মনোনীত; ইহার সহিত ১৮ জন ইউরোপীয় এবং ৩ জন ইঙ্গ-ভারতীয়কে ধরিলেও,—মাত্র ইঁহাদের দ্বারা কোন জনমতবিরোধী আইন গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে। অথচ, সমগ্র দেশের জনমত যে এই আইনের বিরুদ্ধে ছিল, সম্ভবতঃ তাহা সপ্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এই আইনের পক্ষে যে সকল নির্ব্বাচিত সদস্য ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর প্রতি কি প্রকার সুবিচার করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় তাঁহারা অবগত আছেন।

শ্রীযুক্ত এন-কে-বসু প্রমুখ যে ক্ষুদ্র দলটি ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁহারা যে প্রকার ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন,—আইনটিকে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও ভাল করিবার জন্য যেরূপ অবিরত নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহার সকল মন্দ দিক যেরূপ দক্ষতার সহিত উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা কালে, খালিফা সুজা-উদ্দিন সিনেট সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে অন্তত অর্দ্ধেক যাহাতে মুসলমান হন, এরূপভাবে সিনেট পুনর্গঠিত হওয়া উচিত।

একজন শিখ-সদস্য প্রস্তাব করেন যে, সিনেটের এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব শিখদিগের পাওয়া উচিত।

এই দুইটি প্রস্তাবই অল্প ভোটাধিক্যের সাহায্যে পরিত্যক্ত হইলেও, ইহা তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচায়ক।

ডাঃ লুকাসের যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত মৃদু হইলেও, এবং তাহাতে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ না থাকিলেও, তাহা সমানই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ হইতে উদ্ভূত এবং তাহা সমভাবেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়িয়া তুলিবে। অথচ ১৯২৪ সালে এই ডাঃ লুকাসই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিরোধী প্রস্তাব আনিয়াছিলেন।

তদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের অংশ নির্ণয় যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেশে কোন্ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কত, তাহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ বিচার করা সঙ্গত হইবে না।

যাহাদের অর্থে, চেষ্টায় ও আত্মত্যাগে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান-গুলিতে অধ্যয়ন করে, তাহাদের সাম্প্রদায়িক অনুপাত অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

১৯৩২ সালে সিনেটের ২৪ জন হিন্দু সদস্যের মধ্যে চ্যান্সেলর কর্ত্তৃক মাত্র ৮ জন মনোনীত হইয়াছিলেন এবং ২৪ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে ২০ জন চ্যান্সেলর কর্ত্তৃক মনোনীত হন।

হিন্দু সিনেটরদের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইয়া অন্যান্য সংখ্যা পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান
১৯২৭	৩০	২১	২৮
১৯৩২	২৪	২৪	৩০

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু মুসলমানের আরও ২।১টি তুলনামূলক হিসাব :—

	হিন্দু	মুসলমান
১৮৮৪-১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত মোট গ্রাজুয়েট	১১,৫৪০	৪,৩২১
১৯৩২ সালের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা	১৭,৬৪১	১০,৯৮২
১৯৩১ সালে পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে ফীঃ স্বরূপে প্রাপ্ত টাকা	৩,৭১,৩১২,	২,০৭,১৬৭
১৯৩২ সালের রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট	৯৪১	৯১
হিন্দু বা মুসলমান পরিচালিত স্কুল	১০২	৪২
ঐ কলেজ	১০	২

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা

একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যাঁহারা বাস করেন, বর্ত্তমানে জাতি বলিতে আমরা তাহাদিগকে বুঝিতেছি। সাধারণতঃ ইঁহাদের সকলের স্বার্থই অভিন্ন এবং এই মিলিত স্বার্থকে আমরা জাতীয় স্বার্থ বলিয়া থাকি। একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করিয়া ধর্ম্ম বা অন্য কোন কোন বিষয়ে যাঁহারা পৃথক পৃথক কতকটা স্থায়ী দলের অন্তর্গত তাঁহারা সম্প্রদায় নামে অভিহিত হন। একই দেশের অন্তর্গত সম্প্রদায়গুলির জাগতিক স্বার্থ প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বার্থ হইতে পৃথক বা তাহার বিরোধী হইতে পারে না। কারণ, সকল লোকের এবং সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থই জাতীয় স্বার্থ। কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা দলের প্রকৃত স্বার্থ (কল্পিত নহে) যদি অন্য কোন বিশেষ দলের দ্বারা প্রভাবিত সরকারের কার্য্যে ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে, সেই কার্য্য জাতীয় স্বার্থ ও শক্তিকেই আঘাত করে। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া সকল সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোকেরই তাহাতে বাধা প্রদান করা উচিত। কিন্তু, ব্যাপার যখন এই প্রকার স্বাভাবিক থাকে না, বিভিন্ন সম্প্রদায় যখন পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হয়, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মনোভাব যখন এই হয় যে, অপর সম্প্রদায়গুলিকে কোণঠাসা করিয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে তখন এই কৃত্রিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থ জাতীয়তা এবং জাতীয় সংহতিকে নষ্ট করে। আমাদের মধ্যে জাতীয়তা এখনও ঠিক গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া, আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব আরও অনেক অধিক ক্ষতিকর। আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব সর্ব্বক্ষেত্রে জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধার সৃষ্টি করিতেছে।

আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনকে এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে হইলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। সেখানেই আমাদের একমাত্র আশা। কাজেই অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতিকর প্রভাব অনেকটা বর্ত্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতার ফল দূর ভবিষ্যতের মধ্যেও প্রসারিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাঁহারা শুধু বর্ত্তমান নহে, জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও বাধাসঙ্কুল করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমানদিগের স্বার্থ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের বাঙ্গালীরই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও গৌরবের বস্তু। ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর শিক্ষাবিধানের, সকল কৃতী বাঙ্গালীকে সমান সুযোগ প্রদানের অপক্ষপাত ব্যবস্থা এখানে থাকিবে, ইহা সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের ধর্ম্মগত বা জাগতিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিলে, অথবা পক্ষপাতিত্ব দেখাইলে, তাহা নিঃসন্দেহ নিন্দনীয় হইত। কিন্তু, বাংলা কাউন্সিলে আলোচনা কালে, যে সকল মুসলমান সদস্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের স্বার্থ অবহেলা করিবার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এরূপ কোন দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া সিনেটে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যাল্পতার জন্য ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সমর্থনযোগ্য মনোভাব নহে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ রহমান বলেন, মুসলমানদিগের প্রয়োজন, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না। কিন্তু, তিনিই আবার বলিয়াছেন, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি জনসাধারণের জীবন, প্রয়োজন এবং চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহা সাধারণের চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই এবং এই প্রদেশের জীবন ও চরিত্রের উন্নয়নে প্রত্যাশিত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে যদি শেষের কথাগুলি সকলের পক্ষেই সত্য হয়, তাহা হইলে মুসলমানদিগের বিশেষ অভিযোগের আর কিছু থাকে না।

বর্ত্তমানে ১০০ জন সিনেটরের মধ্যে ২০ জন মুসলমান। অথচ, ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন হিন্দু এবং ১২ জন মাত্র মুসলমান।

এই কথার উত্তরে খান্ বাহাদুর মমিন বলেন, মুসলমানদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব না থাকায়, এরূপ ঘটিয়াছে। এই যুক্তি আমরা অনুসরণ করিতে পারি নাই। প্রতিনিধিত্বের সাম্প্রদায়িক দাবী যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে এই কথা বলা হয়ত কতকটা শোভন হইতে পারিত, যে, অমুক সম্প্রদায়ের এত সংখ্যক ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, অথচ, তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজনের (?) দিকে দৃষ্টি রাখিবার মত উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি সেই সম্প্রদায় হইতে গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু, কোন সম্প্রদায়ের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে থাকিলে, তবে, সেই সম্প্রদায় হইতে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে, এমন অদ্ভুত এবং অসম্ভব কথা আমরা আর শুনি নাই। কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বা তদন্তর্গত স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসংখ্যা দেখিয়া, তবে নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসংখ্যার অনুপাতে সেই সম্প্রদায় হইতে ছাত্র আসিতে থাকে, এরূপ ইঙ্গিত নূতন এবং মৌলিক বটে।

হিন্দুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়কে কোন বিশেষ সুবিধা বা সুযোগ দানের নিমিত্ত নহে। তাহার দ্বারা বাঙ্গালী মাত্রেই উপকৃত হইলে, তাঁহাদের দানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হইবে। তাহা হইলেও, কোন সম্প্রদায় নিজেদের জন্য বিশেষ কোন দাবী করিতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহারা অর্থের দ্বারা কতটা সাহায্য করিয়াছেন, তাহাও দেখান আবশ্যক।

গত পাঁচ বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয় ১৬ লক্ষ টাকা দান-স্বরূপে পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা একজন খৃষ্টান ভদ্রলোক দিয়াছেন এবং মুসলমানদের নিকট হইতে মাত্র ৬ শত টাকা পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা সহর ও বাংলা ভাষা

কলিকাতার ১১,৯৬,৭৩৪ জন অধিবাসীর মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ৫০টি ভাষা প্রচলিত এবং ইহার মধ্যে বাংলা ভাষার সংখ্যা ৬,৪৮,৪৫১ জন মাত্র। অর্থাৎ কলিকাতা বাংলার সহর হইলেও বাঙ্গালীর সহর নহে।

কলিকাতা যখন ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, তখন ইহার উপর সমগ্র ভারতবর্ষেরই একটা দাবী ছিল, এবং ইহার সার্ব্বজনীনত্বে বাঙ্গালীদের ততটা ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ থাকিত না। কিন্তু, খুব বড় সহর হইলে, এবং বাণিজ্য, বিদ্যা ও দেশের নানা অংশের সহিত যোগাযোগের বড় কেন্দ্র হইলে, সেখানে নানাদেশের লোকের সমাগম স্বাভাবিক। এইজন্য সব বড় সহরেরই কতকটা সার্ব্বজনীনত্ব আছে। কিন্তু, বাঙ্গালীরা যদি শারীরিক শ্রমে, ব্যবসায়ে, দক্ষতাসাপেক্ষ নানাবিধ শ্রম শিল্পে অধিকতর পটু হইতেন এবং ইহার অনেক কার্য্যে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁহাদের থাকিত, তাহা হইলে, কলিকাতা সহরে বাঙ্গালীর সংখ্যা আরও বেশী হইত এবং অন্য প্রদেশ বা দেশের লোকের সংখ্যা স্বভাবতই কম হইত।

অন্যদেশ বা প্রদেশ হইতে যে সকল লোক বাংলায় আসেন, এবং এখানে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী হইলেও দীর্ঘ দিন বাস করেন, তাঁহাদের অত্যন্ত বেশীর ভাগ লোকের উদ্দেশ্য হইতেছে অর্থোপার্জ্জন। কাজেই, বাঙ্গালীদের, তাঁহাদের নিকট বিশেষ কিছু ঋণ নাই; কিন্তু, যে-বাংলা হইতে তাঁহারা অর্থশোষণ করিতেছেন, তাহার প্রতি প্রতিদান স্বরূপেও তাঁহাদের কিছু কিছু কর্ত্তব্যের কথা অন্ততঃ অস্বীকার করা যায় না। ইহার মধ্যে, বাংলার শিক্ষার ধারাকে তাঁহারা পুষ্ট করিবেন, ইহার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিবেন, এ আশা করা অন্যায় নহে। অন্ততঃ ইহার শিক্ষাবিধানের মধ্যে নিজ নিজ ভাষা চালাইবার চেষ্টা করিয়া যে জটিলতার সৃষ্টি করিবেন না, এটুকু সহজেই আশা করা যাইতে পারে। বাংলা একমাত্র প্রদেশ যেখানে ভিন্ন প্রদেশ ও দেশবাসীরা স্থানীয় ভাষা না জানিয়াও কোন প্রকার অসুবিধায় পতিত হন না, অথবা যেখানে এই সকল অবাঙ্গালীদের শিক্ষার জন্য বাংলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষার মধ্যবর্ত্তিতার কথা উঠিতে পারে। রায় বাহাদুর ডাঃ সুরেশচন্দ্র সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা কর্পোরেশনকে কয়েকটি পরামর্শ প্রদান করেন; তাহার মধ্যে তিনি বলেন, "বাংলার প্রতি একহাজার লোকের মধ্যে

নয়শত নিরনব্বই জনের মাতৃভাষা বাংলা, এখানকার শিক্ষার বাহন বাংলা হওয়া উচিত। যদি অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাস করিবার জন্য অথবা জীবিকার্জ্জনের জন্য লোক বাংলায় আসে এবং আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে, তাহাদের ছেলেদের শিক্ষা দিতে চায়, তবে তাহাদিগকে, **ছেলেদের বাংলায় শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।** বর্ত্তমানে আমাদের স্কুলগুলিতে বিভিন্ন ভাষার এরূপ অদ্ভুত মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পৃথিবীর আর কোথায়ও একদিনের জন্যও থাকিতে পারিত না।... ......লণ্ডন অপেক্ষা অধিকতর সার্ব্বজনীন সহর পৃথিবীতে আর নাই। অন্যান্য জাতির লোকের কথা বাদ দিলেও, লণ্ডনে হাজার হাজার স্কটস্‌মেন ও ওয়েলস্‌মেন বাস করেন। তবুও, ইহার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার বাহন স্বরূপে ইংরাজী ব্যতীত অন্য ভাষা প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব, লোকের নিকট হইতে উপহাস লাভ করিবে। শুধু মাত্র আর্থিক দিক দিয়া নহে, **জাতীয়তার দিক হইতেও ভাষার সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষভাবে ক্ষতিকর।"**

বাঙালীরা আত্মনাশের পরিবর্ত্তেও অপরের স্বার্থরক্ষা করিবার মত ঔদার্য্য কোন দিন হারান নাই; কাজেই, ডাঃ সরকারের এই প্রস্তাব যে কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা বর্ত্তমানে কার্য্যোপযোগী মনে করিবেন না, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

সরকারের সম্মতি

প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহন প্রধানতঃ বাংলা করিবার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে গৃহীত প্রস্তাবের মূলনীতিতে সরকার এতদিন পরে সম্মতি জানাইয়াছেন। এই ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য শীঘ্রই একটি বৈঠক আহুত হইবে।

প্রবেশিকা এবং শিক্ষার উচ্চ বিভাগে শিক্ষার বাহন বাংলা করিবার আবশ্যকতার কথা আমরা ইহার পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। প্রবেশিকা পর্য্যন্ত আংশিকভাবেও এই নীতি অনুসৃত হইলে, আমাদের ছাত্রসমাজের উপর তাহার সুফল দেখা যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান সমিতির সুপারিশ অনুসারে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, দশবৎসরের মধ্যে স্কুলে ইংরাজী ব্যতীত সকল বিষয় দেশীয় ভাষার সাহায্যে পড়াইবার ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বিভাগেও অনেক বিষয় হিন্দীতে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্মিলনেও শিক্ষার প্রাথমিক ও মধ্যবিভাগে দেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ

আমাদের জাতীয় জীবনের নানাদিকে উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। দেশে জাগরণের ঢেউ যখন প্রথম আসিয়াছিল, সমাজের সর্ব্বস্তরে যখনও তাহা ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে নাই, তখন আমাদের কর্ম্ম ও চিন্তার ক্ষেত্র শুধুমাত্র সহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। আশানুরূপ না হইলেও, বর্ত্তমানে এই নূতন চিন্তা ও নূতন ভাব নানা ছোটখাট প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া সমগ্র দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র সংবাদ আদান প্রদানের ভাল ব্যবস্থা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতার অভাবে এই সকল প্রচেষ্টার পূর্ণপরিচয় সাধারণের সমক্ষে ঠিকভাবে উপস্থিত হয় না। এই সকল প্রচেষ্টার সহিত সংযুক্ত কর্ম্মীরা দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে যেসকল চিন্তা করিতেছেন, তাহাও নানাকারণে পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতিতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইতেছে না।

সম্প্রতি যশোরের অন্তর্গত পাঁজিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উৎসব সভায় দেশের কথার লেখকের উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এখানে বালিকারা নানাবিধ ক্রীড়া, ব্যায়াম এবং আবৃত্তি প্রভৃতিতে যে প্রকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, একটি গ্রাম্য স্কুলের পক্ষে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণে

মেয়েদের শিক্ষার আদর্শ, বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের সহিত শিক্ষার বৈষম্য, এবং শিক্ষা ও মেয়েদের স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য ও চিন্তা-উদ্দীপক।

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ। মেয়েরা যাহাতে সুমাতা এবং সুগৃহিণী হইতে পারেন, স্বামীর অধিকতর উপযুক্ত সহচরী হইতে পারেন, তাহাই মাত্র মেয়েদের শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য এই কথা আমরা অনেকে মনে করিয়া থাকি। অথচ, যদি বলা যায় যে, পুরুষদের শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য সুপিতা হওয়া বা স্ত্রীর উপযুক্ত সহচর হওয়া, তাহা হইলে তাহা সকলের নিকটই নিতান্ত হাস্যকর মনে হইবে। সভাপতি মহাশয় এদিকে বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং মেয়েদের শিক্ষাকে দাম্পত্য জীবনের ছাঁচে ঢালাই করিবার মনোবৃত্তিকে নিন্দা করেন।

স্ত্রীশিক্ষার সহিত স্ত্রীস্বাধীনতার সম্পর্ক যে অবিচ্ছেদ্য একথা সভাপতি মহাশয় বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলেন এবং যাহাতে আমাদের মনের "ভীতিপুষ্ট" দুর্ব্বলতা দিয়া, স্ত্রীস্বাধীনতার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া পরোক্ষভাবে স্ত্রীশিক্ষাকে বাধা না দিই, সেজন্য অনুরোধ করেন।

পাট রপ্তানি শুল্কের অর্দ্ধাংশ

পাট রপ্তানি শুল্কের প্রায় অর্দ্ধাংশ, ১৬৭ লক্ষ টাকা, ১৯৩৪-৩৫ বাজেটে বাংলাকে প্রত্যর্পণ করায়, বাংলার প্রতি বহু-বিলম্বিত সুবিচারের অর্দ্ধেকটা করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে বাংলা সরকারের বর্ত্তমান ঘাটতি পূরণ হইল বটে, কিন্তু, বাংলার জাতিগঠনকর বিভাগগুলিকে উপবাসীই রাখিতে হইল। পাট রপ্তানি শুল্কের সমগ্র টাকাটা পাইলে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য হয়ত কিছু ব্যয় করিতে সরকার বাধ্য হইতেন।

পাট রপ্তানি শুল্কের উপর বাংলার দাবীর ন্যায্যতা গোলটেবিল বৈঠকে এবং সিলেক্ট্ কমিটিতে বাঙ্গালী প্রতিনিধিরা বিশেষ দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছিলেন। হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

যে করভার শুধুমাত্র কোন একটি প্রদেশের উপর পতিত হয়, ন্যায়তঃ সেই কর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হইতে পারে না। পাটের দর এবং চাহিদা যখন খুব বেশী ছিল, অর্থাৎ পাটের উপর যে শুল্ক বসিত, ক্রেতারা যখন সেই শুল্কের জন্য বর্দ্ধিত মূল্যে পাট ক্রয় করিতেন, তখন প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদকদিগের উপর ইহার সব বোঝা পড়িত না। কিন্তু, বর্ত্তমানে পাটের চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন বেশী হওয়ায়, পাটের মূল্য অসম্ভবরূপে নামিয়া গিয়াছে এবং প্রচুর মাল মজুত থাকায় ক্রেতারা একটা নির্দ্দিষ্ট দর অপেক্ষা অধিক মূল্যে পাট কিনিতেছেন না। কাজেই, এই শুল্ক বর্ত্তমানে উৎপাদকদিগকে দিতে হইতেছে। এই হিসাবে পাটরপ্তানি শুল্কের সবটাই বাংলার প্রাপ্য। তদ্ব্যতীত, পাটের জন্য বাঙ্গালীদের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। অর্থের দ্বারা হয়ত তাহার সম্পূর্ণ পূরণ সম্ভব নহে; তবে, সব টাকাটা পাইলে, হয়ত আংশিক পূরণ অসম্ভব হইত না।

বাংলা সরকারের বাজেটে প্রতি বৎসরই ঘাটতি পড়িয়া আসিতেছে। এই দেনা বাংলাকে বহন করিতে হইবে; আগামী বৎসরে ইহার পরিমাণ ৭ কোটি টাকায় পৌঁছিত। বাংলা সরকারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলে একথা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, ইহা বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলার উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে।

বাংলা এই টাকাটা পাওয়ায়, সর্ব্বাপেক্ষা বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে বম্বেতে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন, যদি সমগ্র ভারতের উপর বোঝা চাপাইয়া, বাংলাকে সাহায্য দেওয়া হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও, বম্বের ভাগে ২০ লক্ষের উপর টাকা পড়ে নাই। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, কে উপকৃত হইবে, তাহা না ভাবিয়াই বাংলা বহু বোঝা বহন করিয়াছে। ভারতে উৎপাদিত বস্ত্রের প্রধান খরিদ্দার যখন বাংলা ছিল এবং বাংলায় যখন বস্ত্র উৎপাদিত হইত না বলিলেই হয়, তখনও কার্পাস শিল্প সংরক্ষণের জন্য বাংলা বম্বের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে। বস্ত্রের উৎপাদন শুল্ক উঠাইবার আন্দোলনে বাংলা অপেক্ষা বম্বেকে আর কেহ অধিক সাহায্য করে নাই। ইহাতেও কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হ্রাস পাইয়াছিল, এবং তাহার ফলে, অন্যান্য প্রদেশকে বর্দ্ধিত করভার বহন করিতে হইয়াছিল। সে সময় বাংলা অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই।

বাংলা অপেক্ষা বম্বের রাজস্ব অনেক বেশী; লোক সংখ্যার অনুপাত ধরিলে, ইহা আরও অনেক অধিক হয়। বম্বে সরকার প্রদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য বাংলা সরকার অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করিতে পারেন। কিন্তু, বাঙ্গালীরা হীনস্বাস্থ্য ও মূর্খ হইয়া থাকিলে ভারতের এবং ফলে বম্বেরও লাভ হইবে না।

জার্ম্মানিতে সংস্কৃতের আদর

মাদ্রাজের পণ্ডিত কাশী কৃষ্ণকামাচার্য্যের কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তকের জার্ম্মান-অনুবাদের জন্য জার্ম্মানির কয়েকজন অধ্যাপক উক্ত পণ্ডিতের নিকট অনুমতি চাহিয়াছেন।

জার্ম্মানির স্কুল কলেজে পড়াইবার উপযোগী একটি সংস্কৃত পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য পণ্ডিত কৃষ্ণাচার্য্যের বিশেষ খ্যাতি আছে। হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে ইঁহার মতামত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়।

শ্রীসুশীলকুমার বসু
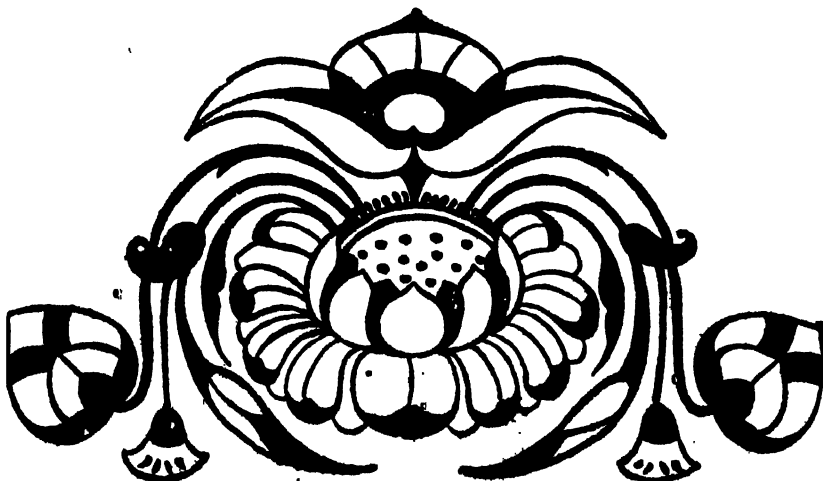
নানা কথা

ইষ্ট বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিমিটেড

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলে বিখ্যাত কিন্তু এমন দিন এসেছে যখন আর শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করে থাকলে চল্‌বে না ; কল কারখানাও চাই। যে সব জিনিষ আমরা বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করি অথচ অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসেই যা দেশেই উৎপন্ন করা সম্ভব সে সব জিনিষের মধ্যে চিনি অন্যতম। সুখের বিষয় চিনির কারখানা সম্প্রতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এখনও অনেকগুলির প্রয়োজন। পরিষ্কার সাদা চিনি আমরা বছরে আমদানি করি প্রায় ন দশ লক্ষ টন ; চিনির কারখানা আজ পর্য্যন্ত দেশে যতগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে চিনি উৎপন্ন হয় মাত্র তিন লক্ষ টন। এতেই বোঝা যায় দেশীয় চিনির কারখানার প্রয়োজন এখনও কত বেশী।

আমরা বিশেষ করে ইষ্ট বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠায় আনন্দিত হয়েছি তার কারণ ভারতবর্ষে চিনির কারখানা কয়েকটি থাক্‌লেও বাংলাদেশে এই প্রথম। অথচ চিনি উৎপাদনে যে সব সুবিধাজনক ব্যবস্থা তা' অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম নয়। বাংলা দেশে ইক্ষু চাষের জমি প্রায় দু' লক্ষ একর হবে, অন্যান্য প্রাকৃতিক সুবিধাও অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশে কম নয় বরং বেশী। অতএব আশা করা যায় অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কম খরচেই বাংলা দেশে চিনির উৎপাদন সম্ভব হবে। আমরা আশা করি বর্ত্তমানের অর্থের অনাটনের দিনেও এই কারখানার উন্নতির পথ সুগম হবে। কর্ত্তৃপক্ষেরা সকলেই ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ভদ্রলোক। আমরা প্রার্থনা করি শ্রীযুক্ত রমানাথ দাসের সুদক্ষ পরিচালনায় এই কারখানার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক।

পরলোকে কে-এন্ চৌধুরী

প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও শিকারী শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরীর সহসা মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হ'য়েছি। তাঁর মত সুদক্ষ শিকারী বাংলাদেশে বোধ করি আর কেউ ছিল না। শিকারের সময় কোন্ দিকে কত বিপদ এড়িয়ে চল্‌তে হয়, এ বিষয়ে তিনি সুচিন্তিত বিশদ প্রবন্ধ লিখে শিকারীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছিলেন। নিয়তির এমনই পরিহাস, তাঁকেই শেষ পর্য্যন্ত আহত ব্যাঘ্রের কবলে প্রাণ দিতে হোলো!

মৃত্যুর সময় কুমুদনাথের বয়স হয়েছিল প্রায় সত্তর। এই বয়সে শিকারে প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে যে দৈহিক ও মানসিক শক্তির পরিচয় আছে তা' সত্যই বিস্ময়কর। আমরা কুমুদনাথের আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা নিবেদন করি।

নিখিলবঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ-মহাসম্মেলন

বিগত ১৮ই চৈত্র হ'তে তিন দিন কলিকাতা এলবার্ট হলে নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়ে গেছে। সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, এবং মূল সভাপতির আসন অধিকার করেছিলেন কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়। কি উপায় অবলম্বন করলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেত উন্নতি সাধন হ'তে পারে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করতে পারে তদ্বিষয়ে গবেষণা এবং প্রচেষ্টার জন্য একটি নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদ সমিতি আছে। এতাবৎ উক্ত সমিতির ২৪টি অধিবেশনের মধ্যে অন্তত সাতটি অধিবেশনে

সভাপতির আসন বাঙলা দেশের কবিরাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। সুতরাং নিখিল ভারত সমিতির কার্য্যে বাঙলা দেশের দান যে অল্প নয় সে কথা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ এবং পাঞ্জাবে যেমন প্রাদেশিক আয়ুর্ব্বেদীয় সমিতি সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে বাঙলা দেশে এ পর্য্যন্ত তা হয় নি। সেই অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নিখিলবঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনের সৃষ্টি এবং প্রথম অধিবেশন। এই সম্মেলনের যাঁরা প্রধান উদ্যোক্তা তাঁরা বহুবিখ্যাত বিচক্ষণ কবিরাজ। সুতরাং তাঁদের নেতৃত্বে সম্মেলনটি যে অভিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে।

এক সময় সমস্ত জগতের মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্রে ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদ প্রাধান্য ভোগ করেছিল। নানা কারণে, বিশেষত রাজপৃষ্ঠ-পোষকতার অভাবে এই চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক অবনতি ঘটেছে। এই জাতীয় জাগরণের যুগে যদি এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টির পুনরুদ্ধারের প্রতি যথোচিত যত্ন না নেওয়া হয় তা' হলে গভীর পরিতাপের বিষয় হবে। আয়ুর্ব্বেদের মূল গ্রন্থ অনেকগুলি, সম্ভবত শতাশের কম নয় এবং প্রায় সবগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করতে হলে সংস্কৃতের জ্ঞান অনিবার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমানে সাধারণত যে সকল ছাত্র কবিরাজী শিখে তাদের অধিকাংশের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয় বলে কবিরাজী শিখবার পূর্ব্বে দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং আমাদের মনে হয় সংস্কৃত ভাষায় বিচক্ষণ কবিরাজগণের দ্বারা মূল সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলি নির্দোষ ভাবে বাঙলা ভাষায় অনূদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা আশা করি নিখিলবঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করবেন।

সন্তরণ-বীর প্রফুল্ল ঘোষের নূতন কৃতিত্ব—

বিগত ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৩ রেঙ্গুন রয়েল লেক্‌স্‌-এ ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট নিরবসর সাঁতার কেটে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ সহন-সন্তরণে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন একথা সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি তিনি সন্তরণ বিষয়ে একটি নবতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গত ৩১শে মার্চ্চ শনিবার তাঁকে একটি ইউরোপীয়ান্ সার্জ্জেণ্ট দু হাত একত্র করে হাত-কড়া লাগিয়ে দেয়, তৎপরে তিনি অপরাহ্ন ৫টা ৩৪ মিনিটের সময় ঐ অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা নিরবসর সাঁতার কাটবার প্রতিশ্রুতিতে

জলে অবতরণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর সঙ্গে প্রফুল্লকুমারের করমর্দন।
(ফটো গ্রহীতা শ্রীযুক্ত বি, বি, চন্দপটীর সৌজন্যে)

হেদুয়ার জলে অবতরণ করেন। সে-সময় সেখানে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু মহাশয় এবং

হাত-কড়া বদ্ধ অবস্থায় প্রফুল্লকুমার সাঁতার দিতেছেন।
(ফটো-গ্রহীতা শ্রীযুক্ত বি, সি, চম্পাটির সৌজন্যে)

কাল মধ্যেই ইংলিশ্ চ্যানেলের শীতল জলরাশী তাঁর নিকট পরাভূত হবে।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষের সন্তরণ বিষয়ে তাঁর গুরু শ্রীযুক্ত শান্তি পাল বিচিত্রায় মাসে মাসে ধারাবাহিক যে প্রবন্ধ লিখছেন এবার প্রফুল্লকুমারের হাত-কড়ি সাঁতারের ব্যবস্থায় তিনি ব্যস্ত থাকায় বর্ত্তমান সংখ্যায় সেটি বাদ পড়ল। আগামী মাসে পুনরায় প্রকাশিত হবে।

আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পরদিন বৈকালে ৫টা ৪৪ মিনিটের সময় অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট হাতকড়া লাগিয়ে সাঁতার কাটবার পর বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং জল হইতে সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চের উপর ওঠেন। সে-সময়েও মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রফুল্ল কুমারের সহিত করমর্দ্দন ক'রে সানন্দে তাঁর হাত-কড়া উন্মোচন করেন। এই ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রফুল্ল কুমার তাঁর স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পেয়ে রাজপথে বহির্গত হন।

যে-কোনো সুদক্ষ সাঁতারুর পক্ষে দুই হাত একত্র আবদ্ধ করে একঘণ্টা কাল সাঁতার কাটা কঠিন ব্যাপার। সে অবস্থায় ২৪ ঘণ্টারও বেশী সময় সাঁতার কেটে প্রফুল্ল কুমার সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও আশ্চর্য্যতর কোন কীর্ত্তি সাধন করে তিনি সকলকে চমৎকৃত করেন জন সাধারণ এই সম্ভাবনায় উদগ্রীব হয়ে রইলো। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রফুল্লকুমারের দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং আশা করি অচির

হাত-কড়া বদ্ধ অবস্থায় সাঁতার কাটিতে কাটিতে প্রফুল্লকুমারের সন্দেশ ভক্ষণ, নৌকায় শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী (ফটো গ্রহীতা শ্রীযুক্ত অরুকুমার ঘোষের সৌজন্যে)

কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলন

বিগত ১৫ই চৈত্র হইতে ১৭শে চৈত্র পর্য্যন্ত তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে ৪৬নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট কুমার সিং হলে 'কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের' দ্বিতীয় অধিবেশন হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এম্‌-এ, বি-এল, এম্‌-আর্‌-এ-এস, মহাশয় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং বিভিন্ন শাখাগুলির পৌরহিত্য করেছিলেন বাঙ্‌লা সাহিত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক। 'কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনে'র ক্রমোন্নতি দেখে আমরা সুখী হয়েচি। এবিষয়ে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উৎসাহ এবং প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য।

কর্ণওয়ালিস্‌ ইউনিয়ন্‌ ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী

এই পাঠাগারটি উত্তর কলিকাতায় ৬নং আর, জি, কর রোডে অবস্থিত। ১৮৯০ সালে পাঠাগারটি স্থাপিত হয়, সুতরাং এখন ইহার বয়ক্রম প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর। শুধু বয়সেই নয় পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা গৌরবেও এই পাঠাগারটি কলিকাতার সাধারণ পাঠাগারগুলির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পাঠাগার। সাধারণ পাঠাগারে শিশু-সাহিত্য এবং শিশু-পাঠকেরও একটা দাবী আছে একথা হৃদয়ঙ্গম ক'রে কর্ণওয়ালিস্‌ লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি শিশুবিভাগ খুলেচেন। বিগত ২রা এপ্রিল সমারোহের সহিত উক্ত শিশুবিভাগের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়েচে এবং সে উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেব রায় এম, এল, সি মহাশয়। শিশুচিত্তের জ্ঞানোন্মেষ সম্বন্ধে মুনীন্দ্রবাবুর গবেষণা কত বিস্তৃত তা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং উপস্থিতক্ষেত্রে সভাপতি নির্ব্বাচন যে বিশেষ সন্তোষজনক হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বহু সারগর্ভ তথ্যে এবং উপদেশে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ এবং পাঠাগারের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল শ্রীমানি মহাশয়ের লিখিত বিবরণী উপভোগ্য হয়েছিল। এই সাধু কার্য্যের জন্তে আমরা কর্ণওয়ালিস লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করছি এবং কলিকাতার ও বাঙলা দেশের অন্যান্য লাইব্রেরী, যাঁরা এ পর্য্যন্ত শিশুবিভাগের প্রতি মনোযোগ দেননি, তাঁদের এবিষয়ে কর্ণওয়ালিস্‌ লাইব্রেরীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে অনুরোধ করছি।

বেঙ্গল ইকনমিক কেমিক্যাল ওয়ার্ক্‌স্‌

আমরা বেঙ্গল ইকনমিক্‌ কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌ কর্ত্তৃক প্রস্তুত 'ভৃঙ্গরাজ' এবং 'কেশল' তৈল দুটি উপহার পেয়েছি এবং ব্যবহার ক'রে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েচি। দুটি তৈলের মধ্যে 'ভৃঙ্গরাজ' তৈলের ভেষজগুণ অধিক, সুতরাং মস্তিষ্ক যাঁদের পীড়িত তাঁরা 'ভৃঙ্গরাজ' তৈল ব্যবহার ক'রে বিশেষ উপকার পাবেন। কিন্তু যাঁদের মস্তিষ্কের কোনো পীড়া নেই তাঁরা স্নানের সময় 'কেশল' তৈলটি ব্যবহার ক'রে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করবেন। তৈলটির সুমিষ্ট সৌরভ স্নানের বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত মনকে প্রফুল্ল রাখে। শিরোঘূর্ণনে 'ভৃঙ্গরাজ' তৈলের উপকারিতা প্রত্যক্ষ ক'রে আমরা আনন্দিত হয়েছি। বেঙ্গল ইকনমিক কেমিক্যাল ওয়ার্কসের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং প্রসার দেখ্‌লে আমরা সুখী হব।

ভ্রম-সংশোধন

গত চৈত্র মাসের নানা কথায় "বাঙ্‌লার বিশুষ্ক নদ-নদীর পুনরুদ্ধার" প্রসঙ্গে অনবধানতা বশতঃ একটি ভ্রম-প্রমাদ ঘটেছে। ইজিপ্টের যে ইরিগেশন্‌ এক্সপার্টের কথা উল্লেখ করা হয়েচে তাঁর নাম স্যর উইলিয়াম্‌ উইল্‌কক্‌স্‌ (Sir William Willcocks),—স্যর উইলিয়াম্‌ বেণ্ট্‌লী নয়। যে সময় স্যর উইলিয়াম্‌ উইলকক্‌স্‌ বাঙলা দেশে আসেন ডক্টর সি, এ, বেণ্টলী তখন বাঙলা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন।

আমাদের জনৈক পাঠক শ্রীযুক্ত অমলেশ ঘোষ এই ভ্রমটির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করায় আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ ডি-এস্ দাসগুপ্ত ডি-ই, ডি-এফ্ (প্যারী)

কলিকাতার দন্ত-চিকিৎসার ব্যবসা করে যাঁরা যশস্বী হ'য়েছেন, তাঁদের মধ্যে ডাক্তার ডি-এস্ দাশগুপ্ত অন্যতম। তিনি প্যারী নগরীতে সুদীর্ঘ চার বৎসরকাল দন্ত-চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছিলেন। দেশে ফিরে ১৮৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে এক আধুনিক উন্নত প্রণালীর দন্ত-চিকিৎসার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সম্প্রতি তিনি আধুনিক প্রণালীতে কয়েকটি রোগীর উচ্চ ও বক্র দন্ত উৎপাটন না করেও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ কৌশল তিনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত প্যারী নগরীতে অর্জ্জন করেছিলেন, এবং এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও লাভ করেছেন বিস্তর। তাছাড়া পাইওরিয়া প্রভৃতি যাবতীয় কঠিন দন্তপীড়া তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সারাইয়াছেন।

ডাক্তার দাশগুপ্ত প্যারী নগরীর ক্লিনিক দাঁতেয়ার ফ্র'াসেজ (Clinique dentaire francaise) এ কিছুকাল কার্য্য করে বিশেষ প্রসংসা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে এসেছেন। আমরা আশা করি তাঁর সেই অভিজ্ঞতা দেশবাসীর বিশেষ উপকারে আসবে। আমরা এই তরুণ দন্তচিকিৎসকের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ও উত্তরোত্তর যশ কামনা করি।

ইংলণ্ডে বাঙ্গালী ছাত্রের অসামান্য কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্তায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে সম্প্রতি ইংলণ্ড থেকে ফিরে বিহারে এ্যাসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি পাটনা বিশ্ববিভালয়ের ভূতপূর্ব্ব কৃতী ছাত্র। সেখানকার বিহার কলেজ অফ্ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে তিনি আই-সি-ই এবং বি-সি-ই উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩২ সালে তিনি প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্স্ স্কলারসিপ্ (Prince of Wales Scholarship) নিয়ে প্রাকৃটিকেল্ ট্রেনিংএর জন্যে ইংলণ্ডে যান্। মাত্র দেড় বৎসর কাল তিনি সেখানে ছিলেন। এই অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিনি সমুদয় বাঙ্গালী জাতির গৌরব বাড়িয়ে এসেছেন। A. M. S. E, M. R. San. I., A. M. I. San. E., S. I. Mech-E. Grad. 1. Struct. E., A. M. Inst. M. & Cy. E., Stud. Inst. C. E. ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এই সাতটি উপাধিতে তিনি ভূষিত হয়েছেন। সম্প্রতি তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর।
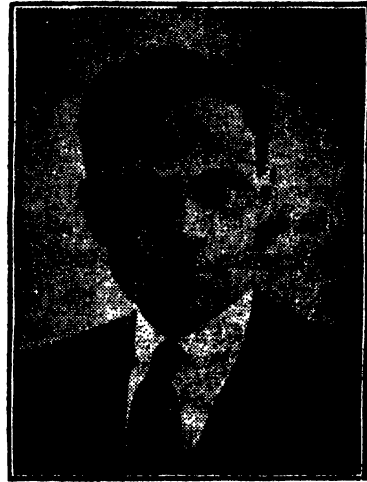
শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়

লণ্ডন নগরীতে ১৯৩৩ সালে কংগ্রেস্ অফ্ এঞ্জিনিয়ার্স-এর সম্মেলনে তিনি যোগ দেন। সেই সম্মেলনে ভারতবাসী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র বক্তা। গিলফোর্ডের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার হিপ উড্ সাহেব (Mr. Hipwood) তাঁর অভিভাষণ পাঠ করবার পর হরিহর বাবু সে-সম্বন্ধে তাঁকে এমন প্রশ্ন করেন যে বিদ্বান্ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই তরুণ বাঙালী ছাত্রের প্রতিভা স্বীকার করে বলেন—"Mr. Banerjee went too quickly through the detailed points he raised for me to be able to reply to them now, but I shall be pleased to let him have the exact details."—

(Journal of the Institution of Sanitary Engineers) এই পত্রিকায় হরিহর বাবু সম্বন্ধে লিখেছে—"Mr. Banerjee who has had a distinguished career,...headed the list of successful candidates in the final examination of the degree of Bachelor of Civil Engineering···. He carries with him our best wishes for a successful career in India".

এসেক্স্ নগরীর Engineer's and Surveyor's Department of the Dagenham urban District Councilএর চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার হরিহর বাবুর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বলেছেন—"In summary I may state that Mr. Banerjee has given every indication of developing into an exceptionally skilled engineer. He has maintained the very high standard of his precursors in this scholarship. ···He has justified my attention and has certainly proved a credit to his Principal and Professors of the Bihar College of Engineering".

হরিহর বাবু যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। তাঁর পিতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব ইংরাজীর অধ্যাপক। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ।

আমরা এই প্রতিভাবান্ বাঙ্গালী যুবকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ভগবান তাঁর সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

এডুকেশন গেজেট

আমরা এডুকেশন গেজেটের কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি পেয়েছি। সাধারণের অবগতির জন্ম নিম্নে প্রকাশিত করলাম।

"প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "এডুকেশন গেজেটের" নাম সুধী বঙ্গবাসী মাত্রই অবগত আছেন। বর্ত্তমান যুগে এদেশে শিক্ষার বিস্তার হওয়ার সময় হইতেই এডুকেশন গেজেট বাংলার শিক্ষা-ক্ষেত্রে সমাজের কল্যাণকর সমাচার-পত্ররূপে দেশ সেবার কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। এক সময় উক্ত পত্রিকা যেরূপ প্রভাবশালী ছিল এবং নব বঙ্গ-সংগঠন কার্য্যে যে সহায়তা দান করিয়াছিল, দেশের প্রবীণগণ তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। ইহাও সুবিদিত যে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পূজ্যপাদ ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে এই পত্রিকা দীর্ঘকাল যাবৎ সুপরিচালিত হইয়াছিল। তৎপর বহুদিন নানা বিপদ্‌পাতের মধ্য দিয়া এডুকেশন গেজেট আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—সমাজ সেবায় ব্রতে এবং ভারত-ধর্ম্মের আদর্শ সংরক্ষণে কোন অবস্থাতেই কুণ্ঠিত হয় নাই।

বর্ত্তমান সময় দেশে নানা দিকে বিপুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। নানা জটিল প্রশ্ন এখন দেশবাসীগণের সম্মুখে উপস্থিত। শিক্ষার প্রশ্নই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিতে হইবে। শিক্ষার সমুচিতরূপ বিস্তার লাভ হইলে, এবং সুশিক্ষার আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলে, জাতীয় আর সমুদয় প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হইয়া যাইবে। বঙ্গে আজকাল নানা বিষয়ে নিয়োজিত নানাবিধ সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে; অনেক নূতন নূতন ভাবের খেলা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও নূতন কাগজ বা ভাব তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে আমরা এডুকেশন গেজেটখানিকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার অনুযায়ী একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষার সহায়ক যন্ত্ররূপে পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সাধারণ শিক্ষানীতির আলোচনার সহিত দেশের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী এবং বিভিন্ন শিক্ষালয়গুলির অভাব ও আবশ্যকাদির পর্য্যালোচনা এডুকেশন গেজেট আপন কর্ত্তব্যরূপেই গ্রহণ করিবে। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্যক-রূপ পরিস্ফুট করিয়া দেশবাসীকে বর্ত্তমান জগতের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সুস্থির ও সবল রাখিতে পারে, এতদর্থে গেজেট বিশেষরূপে নিয়োজিত থাকিবে।

প্রোক্ত উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমরা দেশবাসী শিক্ষাভিজ্ঞ, শিক্ষা-সেবী, এবং শিক্ষা-প্রেমী স্ত্রী ও পুরুষ সকলেরই সহানুভূতি ও সহায়তা প্রার্থনা করি। বৈশাখের প্রথম হইতে শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত সহযোগে সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী এই পত্রিকা সম্পাদন করিবেন।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works
259 Upper Chitpore Road. and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

সপ্তম বর্ষ, ২য় খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ | ৫ম সংখ্যা

ইংরেজি গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে
লিখিত পত্র

Ludgate Circus, London
৬ই মে, ১৯১৩

কল্যাণীয়াসু,

গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমার কথা লিখেছিস্। ওটা যে কেমন করে লিখলুম এবং কেমন করে লোকের এত ভাল লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্য্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজি লিখতে পারিনে, এ কথাটা এমনি সাদা যে এ সম্বন্ধে লজ্জা করবার মত অভিমানটুকুও আমার কোনদিন ছিল না। যদি আমাকে কেউ চা খাবার নিমন্ত্রণ করে ইংরেজিতে চিঠি লিখত, তাহলে তার জবাব দিতে আমার ভরসা হত না। তুই ভাবছিস আজকের বুঝি আমার সে মায়া কেটে গেছে—একেবারেই তা নয়; ইংরেজিতে লিখেছি এইটেই আমার মায়া বলে মনে হয়। গেলবারে যখন জাহাজে চড়বার দিনে মাথা ঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্ক ষোলো আনা সবল না থাকলে একেবারে বিশ্রাম করবার মত জোর পাওয়া যায় না। তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্যে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। তখন চৈত্র মাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না, এবং পাখীর ডাকাডাকিতে দিনের বেলাকার সকল ক'টা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল। ছোট ছেলে যখন তাজা থাকে তখন মার কথা ভুলেই থাকে, যখন কাহিল হয়ে পড়ে তখনি মায়ের কোলটি জুড়ে বসতে চায়—আমার সেই দশা হল। আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে, আমার সমস্ত ছুটি দিয়ে ঐ চৈত্র মাসটিকে যেন জুড়ে বসলুম—তার আলো তার হাওয়া, তার গন্ধ, তার গান একটুও আমার কাছে বাদ পড়ল না।

কিন্তু এমন অবস্থায় চুপ করে থাকা যায় না—হাড়ে যখন হাওয়া লাগে তখন বেজে উঠতে চায়, ওটা আমার চিরকেলে অভ্যাস জানিস্ত। অথচ কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মত বল আমার ছিল না। সেই জন্যে ঐ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করতে বসে গেলুম। যদি বলিস্ কাহিল শরীরে এমনতর দুঃসাহসের কথা মনে জন্মায় কেন—কিন্তু আমি বাহাদুরি করবার দুরাশায় এ কাজে লাগিনি। আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে উঠেছিল, সেইটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত করে নেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল। একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল। এইটি পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে, ভাবলুম সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখন উস্‌খুস্ করে উঠবে, তখন ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি দুটি করে তর্জ্জমা করতে বসব। ঘট্‌লও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছন গেল।

রোটেন্‌ষ্টাইন আমার কবিযশের আভাস পূর্ব্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিতমনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য়েট্‌সের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন—তার পরে কি হল সে ইতিহাস তোদের জানা আছে। আমার কৈফিয়ৎ থেকে এটুকু বুঝতে পারবি আমার কোনো অপরাধ ছিল না—অনেকটা ঘটনাচক্রে হয়ে পড়েছে।

তারপরে যখন আমেরিকায় গেলুম, ভাবলুম কিছুদিন চুপচাপ করে বিশ্রাম করব। কিন্তু চুপ করে থাকবার জায়গা আমেরিকা নয়। ও দেশ মূকং করোতি বাচালং—বিদেশ থেকে যে কেউ গেলেই আমেরিকা তার কাছ থেকে বক্তৃতা দাবী করে বসে। আমি আর্ব্বানা সহরে একটু গুছিয়ে বসবামাত্রই বক্তৃতার জন্য তাগিদ আসতে লাগল। আমি বল্লুম আমি ইংরেজি ভাষা জানিনে, কিন্তু সেটা ইংরেজি ভাষাতেই বলতে হয় বলে কেউ বিশ্বাস করে না, বলে, তুমি ত বেশ খাষা ইংরেজি বলচ। অনুরোধ এড়ানোর বিদ্যাটা আজও আয়ত্ত হয়নি। বলতে পারব না—এ কথা বার বার বলার চেয়ে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সহজ। এমনি করে আমেরিকায় আমার টুঁটি চেপে ধরে বক্তৃতা বের করে নিলে। এ সম্বন্ধে সেখানে খ্যাতিও লাভ করেছি—কিন্তু তবু আজ পর্য্যন্ত আমার মনে হয় ওগুলো দৈবাৎ লেখা হয়ে গেছে। ইংরেজি ভাষায় যে অনেকগুলো অত্যন্ত নড়নড়ে জিনিষ আছে—যেমন ওর articleগুলো, ওর prepositionগুলো, ওর shall এবং will—ওগুলো ত সহজ জ্ঞান থেকে জোগান দেওয়া যায় না, ওর শিক্ষা থাকা চাই। এখন বুঝতে পারচি আমার মগ্নচৈতন্য অর্থাৎ আমার subliminal consciousnessএর মধ্যে ওগুলো মাটির তলার গর্ত্তের ভিতরকার কীটসম্প্রদায়ের মত বাসা বেঁধে রয়েছে—যখন হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে লিখতে বসি, তখন অন্ধকারে ওরা সুড়সুড় করে বেরিয়ে এসে আপনাদের কাজ সেরে দিয়ে যায়, কিন্তু জাগ্রৎ চৈতন্যের আলো দেখলেই ওরা অত্যন্ত এলোমেলো হয়ে দৌড় দিতে থাকে—সুতরাং ওদের সম্বন্ধে কোনমতেই শেষ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ভরসা পাইনে। সুতরাং আজ পর্য্যন্ত এ কথাটা সত্য

রয়ে গেল যে, আমি ইংরেজি ভাষা জানিনে। ঠিক জানিনে বল্লে একটু অত্যুক্তি করা হয়, কিন্তু নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। আমি তোকে সত্য কথাই বলচি, এ কয়টা ইংরেজি প্রবন্ধ লিখতে পেরেছি বলে আমার মনে একটা দুশ্চিন্তা জাগ্‌ছে এই যে, এই নজিরের উপর বরাবর আমি চলব কি করে? কৃতকার্য্য হবার মত শিক্ষা যাদের নেই, যারা কেবলমাত্র নেহাৎ দৈবক্রমেই কৃতকার্য্য হয়ে ওঠে, তাদের সেই কৃতকার্য্যতাটা একটা বিষম বালাই। * * * *

আমার এখন ফেরবার জো নেই। কারণ জুন মাসের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত আমি এখানে বক্তৃতার দায়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। তারপরে Irish Theatreয়ে আমার ডাকঘরের ইংরেজি তর্জ্জমাটা অভিনয় হবার আয়োজন চল্‌চে—ওটা য়েট্‌স্ এবং তাঁর দলের বিশেষ্ ভাল লেগেছে। তারপরে আমার আরো একটা বড় খাতাবোঝাই তর্জ্জমা সারা হয়েছে—সেগুলোও রোটেন্‌ষ্টাইন প্রভৃতি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, এবং এগুলি ছাপবার বন্দোবস্ত করতে তাঁরা উৎসুক হয়েছেন। ম্যাক্‌মিলানরা আমার প্রকাশক। গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় সংস্করণটা অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, এতে ম্যাক্‌মিলানরা উৎসাহিত হয়েছে। নতুন লেখাগুলো সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় প্রবৃত্ত হতে হবে। এই সব কাজে সময় লাগবে। ওদিকে আমেরিকায় হার্ভার্ড য়ুনিভসির্টিতে আমি যে বক্তৃতাগুলি পাঠ করেছিলুম, সেগুলি বই আকারে বের করবার জন্যে সেখানকার একজন অধ্যাপক আমাকে অনুরোধ করচেন। বই তাঁরা বিনামূল্যে ছাপিয়ে দেবেন, এবং তার সমস্ত মুনফা বোলপুর বিদ্যালয় পেতে পারবে। আমার এ লেখাগুলো এখানকার সমজদারদের কাছে একবার যাচাই না করে ছাপব না বলেই দেরি করচি। ওর মধ্যে একটা প্রবন্ধ Hibbert Journalএর সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলুম, তিনি সমাদর প্রকাশ করে গ্রহণ করেছেন, তাতে বোধ হচ্চে এগুলো চলতে পারবে।

প্রমথর সনেটপঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি। আমার মেঘদূতের যক্ষবধূর বর্ণনা মনে পড়্‌ল —এই বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর দশনপংক্তি তীক্ষ্ণশিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই—"মধ্যে ক্ষামা", দুটি লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট—তার উপরে "চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা"। এ যেন চোদ্দনলী হার, একেবারে ঠাসা গাঁথুনি, আর ভাবটুকু এক একটি নিরেট মাণিকের বিন্দুর মত ঝক্‌ঝক্ করে দুল্‌চে। কেবল আমি এই আশা করচি, কবিত্বের এই সুতীক্ষ্ণতা ক্রমে প্রশস্ত হয়ে আস্‌বে, এর ধারালো নবযৌবন পূর্ণযৌবনে রসভারে বিনম্র হয়ে পড়বে, এবং এখন পাঠকের মনকে প্রতিচ্ছত্রে ফুটিয়ে দেবার দিকে এর যে ঝোঁক আছে, সেটা আপনি ফুটে ওঠবার দিকেই সম্পূর্ণ হবে,—তখন কবিতা এমন নির্ম্মমভাবে নিখুঁত হবেনা। বীণাপাণিকে প্রমথ খড়্গপাণি মূর্ত্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন। ভাষার ছন্দে ও ভাবের সংযমে এবং নৈপুণ্যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। * * * * *

এ কথা খুবই সত্য, ইংরেজি ভাষা নিয়ে অভিমান করতে পারি এমন আয়োজন আমার জীবনে কখনই হয়নি—কিন্তু যে কারণেই হোক্, জগৎটাকে আমি যেমন করে উপলব্ধি করেছি, সেটা আমার আন্তরিক সত্য জিনিষ—সেই সত্যটুকুকে তার নিজের তাগিদেই আমি প্রকাশ করবার চেষ্টা করে এসেছি। এইজন্যে ইস্কুলমাষ্টারকে ফাঁকি দিয়েও আমি নিজের জীবনটাকে ফাঁকি দিই নি—ইংরেজি ব্যাকরণের কাছে আমার

যত অপরাধই থাক, সাহিত্যের কাছে অপমানিত হবার মত অপকর্ম্ম খুব বেশি করিনি। * * * * * * * * *

মে মাস পড়েছে, আজ ২২শে বৈশাখ, কিন্তু তবু এখানে আকাশ ঝাপসা, আলো ঘোলা এবং সূর্য্যদেবের সোনার ভাণ্ডারের দ্বার একেবারে এঁটে বন্ধ; মাঝে মাঝে মন্দ মন্দ বৃষ্টিও হচ্চে, ভিজে স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় আজও ঘরে আগুন জ্বালাতে হচ্চে। ভাল লাগ্‌চে না—কেননা আমি আলোর কাঙাল; আমার সেই বোলপুরের মাঠের উপরে একেবারে আকাশ-উপুড়-করে-ঢালা আলোর জন্যে হৃদয় পিপাসিত হয়ে আছে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি, দেশে ফিরে গিয়ে চারিদিক থেকে কত ছোট কথাই শুনতে হবে, কত বিরোধ বিদ্বেষ, কত নিন্দাগ্লানি, তখন মনে মনে ভাবি, আরো কিছুদিন থাক, যতদিন পারি এই সমস্ত কাকলী থেকে দূরে থাকি। কিন্তু অপ্রিয়তাকে পাশ কাটিয়ে চলা চলে না, তাকে ঠেলে চলাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা—নদীর ধার দিয়ে দিয়ে গিয়ে নদী পার হওয়া যায় না, একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে ঢেউ কাটিয়ে তবেই পারের ডাঙায় ওঠা সম্ভব—যা ভাল লাগে না তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে ডরিয়ে ডড়িয়ে চলব না, তাকে সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলা দিয়ে চলে যাব এই প্রতিজ্ঞাকেই আঁকড়ে ধরে রাখা ভাল।*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* আজ থেকে একুশ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন থেকে আমার স্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে যে পত্রখানি লেখেন, সেখানি প্রকাশ করবার অভিপ্রায় আমার প্রথম থেকেই ছিল। এর কারণ, গীতাঞ্জলি দেহমনের কোন্ অবস্থায় আর কি কারণে তিনি ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত করেন, এ চিঠিখানিতে তার সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে সেখানি প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করেছি এই কারণে যে, এ চিঠিতে সে যুগে আমার সদ্য-প্রকাশিত সনেট-পঞ্চাশৎ সম্বন্ধে এমন দু'চারটি কথা আছে, যা শুনে লেখকের মন যতটা খুসী হয়, অপর পাঠকের মন ততটা না হ'তে পারে। আজ যে চিঠিখানি প্রকাশ করছি, তার কারণ নিজের সার্টিফিকেট ছাপার অক্ষরে তোলাই যে এ পত্রপ্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য, এ সন্দেহ আমি যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা কেউ করবেন না এ ভরসাটুকু করি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বসন্ত

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কান্তারে আজি মুঞ্জরি' ওঠে বনদেবী-আরাধনা
বনফুলদল-দোলে,
ভৃঙ্গের যত গুঞ্জনে বাজে সঙ্গীত-উপাসনা
সমীরণ-হিল্লোলে,
বল্লরী যত বল্লভে খুঁজি' স্পন্দিত কাঁপে বা'য়
সরমের কথা স্মরি',
অঙ্গন নভ ছন্দিত করি' নব ঘন নীলিমায়
দিক দেশ গেল ভরি'।

শৈত্যের মাঝে সঞ্চিত যাহা হ'ল ঋতুকাল ধরি'
তার মাঝে প'ল সাড়া।
ঝর্ণার ধারা ঘূর্ণির বেগে বাহিরিল যেন অরি
ভাঙিবারে গিরি-কারা।
সঙ্গীত-রাগে উচ্ছল প্রাণ উচ্ছ্বাসে ওঠে মাতি'
পৃথ্বীর বুক চিরি',
পান্না ও চুণি মুক্তা ও মণি শত রঙ্ ওঠে ভাতি'
রিক্ত ধূনারে ঘিরি'।

কাঞ্চন আজি কল্পনা তার বিশ্বের অটবীতে
ছায় পাগলের পারা,
নন্দিত করি' গন্ধে ও গীতে বল্লরী বিটপীতে
বহাইল প্রাণ-ধারা;
পঙ্কের থেকে পঙ্কজ জাগি' বিস্মিত চোখে চায়
নির্জ্জন পল্বলে!
ক্রন্দসী যেন ক্রন্দনে তার জাগাইল বঁধুয়ায়
নিদ্রিতা জলতলে!

লাস্যের মতি হাস্যের রতি রঙ্ রস রূপ গানে
নন্দিল নগ্নতা;
যৌবনা নব উর্ব্বশী যেন কুণ্ঠিতা নহে জ্ঞানে
বেকত নৃত্যরতা।
শিঞ্জিনী তার সিম্ফনি বোনে জল থল নভ গায়
নাহি কাটে কোথা তাল,
দৃষ্টিতে তার রূপকথা জাগি' পৃথ্বীর দিকে চায়
জ'মে ওঠে মোহ-জাল।

রঙ্গিলা আজি বিশ্ব-প্রকৃতি মদিরার পরিমলে
ফাগুনের পেয়ালায়,
দিকে দিকে তারি মত্তা জাগি' প্রাণ গান উচ্ছলে
রঙ্ রস তনু পায়।
সঙ্গীতে যাহা সঞ্চিত ছিল মৌনতা ঘিরি' মাঘে
কৃপণতা অবসানে
উচ্ছ্বসি ওঠে পুষ্পিত বনে আকাশের অনুরাগে
ফাগুনের গানে গানে।

কান্তারে আজি মুঞ্জরি' ওঠে বনদেবী-আরাধনা
বনফুলদল-দোলে,
ভৃঙ্গেরা যত গুঞ্জনে করে সঙ্গীত-উপাসনা
সমীরণ-হিল্লোলে,
বল্লরী যত বল্লভে খুঁজি স্পন্দিত কাঁপে বা'য়
সরমের কথা স্মরি',
অঙ্গন নভ ছন্দিত আজি নব ঘন নীলিমায়
দিকে দেশে সঞ্চরি'। *

* গত ফরিদপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে শ্রীযুত কাজী মোতাহার হোসেন কর্তৃক পঠিত।

কাব্য-কথা

অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ

'ঠাকুর ঘরে কে ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে, 'কলা খাইনে' বলিতে গিয়াই কদলী-গৃধ্নু আসল কথাটি ফাঁস ক'রে দেয়। সাহিত্য মন্দিরে আমার এই অনধিকার প্রবেশের জন্য পূজারিদের নিকট সেরূপ একটা ধাপ্পা দিতে গিয়ে ধরা পড়্‌তে চাইনা। প্রথমেই অপরাধ স্বীকার করে মার্জ্জনা ভিক্ষা করলে হয়ত গুরুপাপে লঘু দণ্ড হ'তে পারে। যে আসনে আপনারা আমাকে আজ বসালেন তা' গ্রহণ করবার যোগ্যতা যে আমার নাই, সে কথা আপনারাই আমাকে ভুলিয়েছেন। এই ফরিদপুরে একদা আমাদের পৈত্রিক ভিটা ছিল। আপনাদের সাহিত্য-পরিষদের আমন্ত্রণ যখন সেই কথাটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল, তখন দেশ-মাতৃকার সাদর আহ্বান মা-হারা সন্তানের কানে এসে পৌছিল। তখন আর আপনার অযোগ্যতার কথা মনে রইল না। আমি কবি নই, তবে কাব্যরসভিক্ষু ত বটে। রসোৎসবের নিমন্ত্রণে ভিখারীকে যদি আপনারা সম্মানের আসন দান করেন, এবং সে যদি লোভবশে ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হয় আপনাদের বদান্যতার দোহাই দিয়াই সে আত্মরক্ষা করতে চাইবে।

তবু, একটা প্রশ্ন কিন্তু মনে জাগ্‌ছিল। এত যোগ্যতর ব্যক্তি থাকতে আপনারা কাব্যশাখার সভাপতিত্বে আমাকে বরণ করলেন কেন ? শুনেছিলাম শিলং পাহাড়ে খাসিয়াদের ভূত পূজায় কমলা লেবু লাগে। কিন্তু সে কমলা-লেবুর পুনর্যৌবন হওয়া চাই। কথাটা প্রকাশ করে বলি। এমন এক একটা কমলা লেবু সেখানকার জঙ্গলে ফলে যা' পাক ধরে রাঙা হয়ে যাবার পর, বোঁটায় থেকে না খ'সে, ধীরে ধীরে যেন পিছু হেঁটে ক্রমশঃ সবুজ হ'তে থাকে। খাসিয়ারা খুঁজে খুঁজে বন থেকে সেই পুনর্নবীন কমলা লেবুটি এনে ভূতের উদ্দেশে উৎসর্গ করে। যে বার্দ্ধক্যে মানুষ দ্বিতীয় শৈশবে পৌছায়, আমি এখনো ততদূর অগ্রসর হ'তে পারিনি। তবে, স্থবিরত্বের পথে পিছু হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে, বোধকরি আবার যৌবনের এলেকায় এসে পৌছে থাক্‌ব, ওই শিলং পাহাড়ের কমলালেবুর মত। তাই আপনারা পিঁজ্‌রাপোল্ থেকে এই দ্বিতীয় শৈশবযাত্রী পুনর্যৌবন-প্রাপ্ত বৃদ্ধকে ধরে এনেছেন ভূত-পূজায়। কারণ, কাব্য-চর্চ্চা যে ভূতার্চ্চনা, তা শত্রু-মিত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। শত্রুপক্ষের কথা এখন ছেড়ে দিই। কিন্তু সুহৃদবর্গের ত অগোচর নাই যে কাব্যলোক স্থূল জগতের অন্তরালে অতীন্দ্রিয় অন্তরীক্ষে। কবির ভাষায় বলতে গেলে,—

"নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।

* * * *

এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা,
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তায় ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।"

কবির কারবার এই অন্তর্লোকে। এই লোক যখন নীহারিকার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকে তখন আদিম-মানবের বিস্ময়-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তা' হয় ভূত-লোক। প্রধান মানবের সমীভূত দৃষ্টিতে হয় ভূর্ভুবঃস্বর্লোক, যেখানে আবির্ভূত হন সবিতা,—ধীয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ। আর কবির আনন্দোৎফুল্ল নয়নে এ রূপান্তরিত হয়ে যায় সেই লোকে, যেখানে খেত-

১৩ই মাঘ ১৩৩০ ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনে কাব্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

শতদল আসনে আসীনা 'বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তা' ভগবতী ভারতী।

আমরা বাস করি এই জড় জগতে। এখানে ভাল ক'রে বনের খুঁড়ে ঘর গড়ি। তেজারতি করি, ঠকি এবং ঠকাই। কীট পতঙ্গ পশুপক্ষীদের মত এই দৃশ্য জগৎটার সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রাম ও সহযোগ ক'রে বংশপরম্পরা ক্রমে বেঁচে আর মরে আস্‌ছি বহুযুগ ধরে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কিছু করি যা অন্য জীবের অসাধ্য। রূপময় বিশ্বটাকে নিংড়ে বিচিত্র বর্ণের নির্যাস আহরণ করি। ধ্বনিময় আকাশকে মন্থন করে সংগ্রহ করি ছন্দ এবং সুর। আর প্রাণের অন্তস্থল থেকে জোগাই প্রেম এবং আনন্দ। তারপর তুলি ধরে আঁকি ছবি, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রচনা করি কবিতা এবং সঙ্গীত। এই সৃজনলীলায় দুনিয়ার আর সকল থেকে আমরা স্বতন্ত্র। বিশ্ব-স্রষ্টা যিনি, তাঁর সঙ্গে এই খেটেই সৃষ্টি প্রবন্ধে আমরা স্বগোত্র। সাহিত্য মানবের চিরন্তন সৃষ্টি ক্ষেত্র। বনভূমি যেমন কথা কয় তার ফুলে ফলে তরু মর্ম্মরে, মানব হৃদয় তেমনি আত্মপ্রকাশ করে তার কাব্যে সঙ্গীতে শিল্প চিত্রকলায়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ়তম যোগ সূত্রটি প্রেম। এই প্রেমের উদ্বোধন সৌন্দর্য্যে, এবং অভিব্যক্তি আনন্দে। যে ভাষার সাহায্যে আমাদের দৈনিক আদান প্রদান চলে তাকে সুন্দর এবং আনন্দময় করে তোল্‌বার তাগিদেই বোধ করি কাব্য সৃষ্টির সূচনা। চল্‌তি ভাষায় আমাদের হাটবাজার ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম বেশ চলে যায়, যে কথাটা বল্‌তে চাই স্বচ্ছন্দে বলে ফেলি, কোথাও বাধে না। কিন্তু এমন সব অনুভূতি অভিজ্ঞতা আছে, এমন সুখ এমন দুঃখ এমন আনন্দ প্রাণ জানে, যা প্রকাশ কর্‌তে গেলে সে আটপৌরে ভাষায় আর হালে পানি পায়না। তখন তাকে উল্টে পাল্টে, ছন্দের বাঁধনে নিপীড়িত করে, মিত্রাক্ষরের রিনিঠিনিতে পদে পদে ঝঙ্কৃত করে তুলে তাকে অভিনব আবেগ ও তাৎপর্য্য দান করি। বাখারি তখন হয় বাঁকা ধনুক, গুণের টানে, কথাগুলো ছুঁচ্‌লো তীরের মত হৃদয় হ'তে হৃদয়ান্তরে গিয়ে বেঁধে। অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশ কর্‌বার বেদনায় গদ্য হয়ে ওঠে পদ্য।

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রবর্ত্তনায় যখন কাব্যের উৎপত্তি, তখন একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে কবির পক্ষে গভীরতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কাব্য সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। শুধু একা কবির পক্ষে নয়; আমরা, যারা কাব্যরসপ্রার্থী, কবির পারিপার্শ্বিক মণ্ডলী, যাদের উদ্দেশে তাঁর আত্মপ্রকাশ,—আমাদের ভাবসম্পদ ও ভাবগ্রাহিতা পরোক্ষ ভাবে কবিকে উদ্বুদ্ধ করে। স্বভাব কবি যিনি, প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ আছে। এই নিগূঢ় প্রেমের আনন্দে পুষ্পোদ্যানের মতই তাঁর বাণী বিচিত্র কুসুমে পুষ্পিত হয়ে ওঠে।

শিক্ষিত বাঙ্গালী যেদিন থেকে পল্লী সম্পর্ক ঘুচিয়ে সহরে হয়েছে সেদিন থেকে তার অন্তরের ভরা গাঙ্‌ পরিণত হয়েছে মরা বালুচরে এবং

'যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল,
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফুটে ফুল।'

তারপর ত আছে দারিদ্র্য, হিংসা, অপ্রেম, অনুদারতা, চিত্তবিক্ষেপ। এরূপ অবস্থায় কোথায় সে স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবন, যা কেবল অন্তঃসলিলার রসে পুষ্পিত হয়ে উঠ্‌বে? একথা বল্‌তে চাই না যে, সহরের সঙ্কীর্ণতা ও সংঘর্ষের মধ্যে কাব্য সৃষ্টি অসম্ভব। কিন্তু যে জনতার ভিতর দেখা হয় অনেকের সঙ্গে কিন্তু আত্মীয়তার অবকাশ সেই অনুপাতেই সঙ্কুচিত, সেখানে কবির পক্ষে অনুকূল সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যের শুভ অবসর কতটুকু?

ধরিত্রী যেমন সিন্ধু বলয়িত, মানুষের প্রাণেও তেমনি অনন্তের চক্রবাল। উপকথার রাজপুত্রের মত মানুষ সংসারের হাটে কেনে ছোট্ট একটি ধামা আর হাতীর বাচ্চা। তারপর তার অবোধ আব্‌দার,—ওই ধামার মধ্যে হাতীর বাচ্চা পুর্‌তে হবে! ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মধ্যে পায় সে বিরাটের পরিচয়, আর চায় তাকে "করতলগত আমলকবৎ" কর্‌তে। কবির কাজই ত যেমন করে হোক্‌ অসীমকে, অরূপকে বাঁধনের ভিতর আনা, আর, ক্ষণিককে চিরন্তন এবং ক্ষুদ্রকে ভূমায় নিলীন করা। কবি তাই যুগপৎ বস্তু-তান্ত্রিক ও অধ্যাত্মরসিক। তাঁর কাছে দেহ ঘনীভূত আত্মা,

প্রাণ বাষ্পীভূত দেহ। জড়প্রকৃতি তাঁর চক্ষে প্রাণময়ী, ভুজবন্ধনের প্রিয়া বিশ্বব্যাপিনী।

'বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। অর্থাৎ বিশেষ ভাবে বিচার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধিৎসার যুগ। যাকে যতটুকু জানি সেই অনুসারে তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের বৈচিত্র্য ও নিবিড়তা নিরূপিত হয়। সত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটায় বিজ্ঞান। সে পরিচয় যখন নিবিড়তর আত্মীয়তায় পরিপাক লাভ করে, তখন তার নিদর্শন পাই কাব্যে। বর্ব্বর যুগে কাব্য-সাহিত্য শিল্পকলার অবকাশ ছিলনা। তখন মানুষকে প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত হ'তে হ'ত। প্রথম পরিচয় লব্ধ সংসারের সঙ্গে যখন তার সম্বন্ধটা কতকটা স্থিতি-স্থাপক হল তখন এল ললিতকলা, প্রেমের প্রসাধন, ভাষায় সঙ্গীতে, শিল্পে স্থাপত্যে সুন্দরকে সুন্দরতর করার এই প্রচেষ্টা ও সাধনা। সত্য পরিণত হ'ল রসে, প্রবৃত্ত হ'ল কাব্যসৃজনে। সম্প্রতি বিজ্ঞানের কল্যাণে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে মানুষের যে নূতনতর পরিচয় ঘটেছে সেটা কাব্যরসাত্মক হয়ে উঠতে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের অভিনব সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। সে সামঞ্জস্যের সমাধান পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মহামিলন ক্ষেত্রে হ'বে। ভারতবর্ষ সেই পুরাণ বোতল যা'তে নূতন মদ বোতল না ভেঙে আপনাকে অমৃতমদিরা করে তুলবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষায় আমাদের যে পরিমাণে চিত্তবিক্ষেপ ও পল্লবগ্রাহিত্ব হয়েছে, তদনুরূপ নূতন মন্ত্রের নিদিধ্যাসন হয়নি। যাকে বাহিরে পেয়েছি তাকে অন্তরে আনতে পারিনি। সেইজন্য আমাদের কাব্য সৃষ্টি সাধারণতঃ এরূপ বন্ধ্যা। এই অক্ষমতার কারণ আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব। যে গাছের শিকড়ের গ্রন্থি শিথিল, বাতাস তাকে সমূলে উৎপাটিত করে, রৌদ্রাতপ তাকে জীর্ণ পত্রে কঙ্কালসার করে। ওই বাহিরের আলো বাতাস যে গাছের প্রাণ, তার প্রমাণ পাই আমাদের যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায়, এবং সাহিত্যে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের নবনবোন্মেষশালিনী সৃজনী লীলায়। কারণ, এঁদের প্রাণ-মূল ভারতবর্ষের অন্তস্থলে, শাখাবলী প্রসারিত উদার আকাশে, জ্যোতির্ব্বাষ্পমণ্ডলে। শিক্ষিত বাঙালীর মত "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ" সম্প্রদায় অন্যত্র দুর্লভ। ক্রোটনের ভাঙা ডাল এক বোতল জলে ডুবিয়ে রাখলে তার যে শিকড়গুলি গজায়, তারা যেমন মাটি না পেয়ে শূন্যে হাতড়ায়, আমাদের মগজে তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষার পল্লব অঙ্কুরিত হয় মাত্র, আশ্রয়ভূমি পায়না। আমরা বিজ্ঞান পড়ি, কিন্তু ক'জনের প্রাণে অনুসন্ধিৎসা জাগে, চিন্তায় শৃঙ্খলা আসে? সাহিত্য চর্চ্চা করি, জীবনের ক্ষেত্রে তার অভিব্যক্তি কতটুকু?

দৈন্যের নাভিশ্বাসটুকু ধরে রাখে আশা। সে আশা যে আকাশকুসুম নয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সাহিত্য-পরিষদের মতন প্রতিষ্ঠানগুলি। আমরা যে মরেও মরিনি তার নিদর্শন পাই আমাদের জাতীয় জীবনের জীর্ণতার মধ্যে নবনব প্রচেষ্টার অঙ্কুরোদ্গমে। ফরিদপুরের সাহিত্য-সেবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যে মধুচক্রটি রচনা করেছেন তার সুধাভাণ্ডার স্বয়ং বীণাপাণি যে পূর্ণ করে দেবেন সেই আশা ও প্রার্থনা আজ আমাদের সকলের প্রাণেই জাগছে।

এমন অনুযোগ মাঝে মাঝে শোনা যায় যে দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দিনে কাব্যচর্চ্চা এক প্রকার নিষ্ক্রিয় ভাববিলাস মাত্র। কিন্তু মুমূর্ষু যে, তার মুখেই ত অমৃত বিন্দু দিতে হবে। দেশের কবি যাঁরা, জীবন্মৃতদের বাঁচাবার ভার তাঁদেরই উপর। তাঁরা ত শুধু কবি নন, কবিরাজও বটে, মৃত্যুঞ্জয় বটিকার রসায়ন তাঁদের রচিত পরমায়ুর্বেদে নিহিত আছে।

এই নবজীবন ও নবযুগকে যাঁরা আনবেন তাঁদের প্রাণের মূল শিকড়টি "বাংলার মাটি বাংলার জলে লালিত হবে।" তাঁদের শাখা প্রশাখা মুক্ত আলো বাতাস নব-কিশলয়ের অঞ্জলিভরে পান করবে। এইজন্য একদিকে যেমন সংস্কৃত আরবী পারসীর অনুশীলনের প্রয়োজন, অপর পক্ষে তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশিষ্ট চর্চ্চা ও অনুবাদ প্রচারের আবশ্যক। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত লেখকের রচনা প্রকাশিত হওয়া মাত্র ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই অনুবাদিত হয়ে যায়। কিন্তু বাংলায় এ পর্য্যন্ত ক'খানা অশ্বমেধের ঘোড়া-মার্কা কেতাবের তর্জ্জমা হয়েছে?

সর্ব্বোপরি চাই, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর

আত্মীয়তা। কাব্য রচনা ত কেবল সুনিপুণ বাক্যবিন্যাস নয়। এ যে প্রাণসিন্ধু মন্থন, ভাষা যার অস্ফুট কল্লোল ধ্বনি মাত্র। একটা যুগ সন্ধি ক্ষণে আমরা এসে পড়েছি। আলোক বিজ্ঞান বলে, সূর্য্যোদয়ের আগে উদয়াভিমুখ রবির একটা বিচ্ছুরিত ছায়া (Refracted image) পূর্ব্বাচলে দেখা দেয়। হোক্ অস্পষ্ট, তবু সে আলোয় ঘুম-ভাঙ্গা দুএকটি পাখীর গান নিদ্রালস প্রাণে এসে পৌঁছেচে। সে সুরে বাংলার মর্ম্মোক্তি আছে। অতি আধুনিক বাংলা গদ্যে ও পদ্যে এমন নিদর্শন পাওয়া যাচ্চে যাতে আর সংশয় থাকে না, আমাদের প্রাণে যেটা অন্ধ অনুভূতি মাত্র, সেটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পেয়েছে এই সকল লেখকের রচনায়। বাংলার পল্লীর সঙ্গে এঁদের নাড়ীর যোগ আছে। তাই এঁদের কণ্ঠে যে বাণী ফোটে, সেটা হয় কাব্য, রসাশ্রিত বাক্য।

প্রত্যেক দেশের মাটির বিশিষ্টতা স্থানীয় ফসলের ভিতর যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি সেখানকার মানুষেরও একটা অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ভাবে ও ভাষায় সম্ভবতঃ আত্মপ্রকাশ করে। ফরিদপুরের পল্লীলক্ষ্মীর শ্যামাঞ্চল ও সামাজিক আবেষ্টনের প্রভাব তদ্দেশীয় কবির রচনায় এমন একটি অনুরঞ্জনা এমন একটি সুর ফুটিয়ে তুলবে যা অন্যত্র দুর্লভ। বাংলা ভাষা এই রকম করে নানা পল্লীর মর্ম্মবাণীর আনুকূল্যে সমৃদ্ধিশালিনী হবে। এখনো যে আমাদের ভাষার কত অপূর্ণতা আছে, তা যে কোনো ইংরাজি লেখা তর্জ্জমা করবার চেষ্টায় ধরা পড়ে। বাংলাভাষা যদি সমগ্র বাংলার মাতৃভাষা হয় তবে সৎসাহিত্যের শাখা উপশাখাগুলিকে মিলাইয়া দিতে হবে। এইজন্য বহুকেন্দ্রে সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। ভাষার বাণিজ্য সাহিত্যিক বজরার পণ্যভারে। অনেক সুশ্রী কথা "ভরার মেয়ের" মত, কুলীন সাহিত্যের ঘর আলো করবে গৃহদীপখানি জ্বেলে। কোন্ কথাটি সাহিত্যে চলবে, কি অচল হবে তার কোনো বিশেষ আইন কানুন আছে কিনা জানিনা। তবে মানুষ যেমন আপন সহৃদয়তার গুণে পরকে আপন করে, তেমনি একটি অচিন্ কথা ভিন্‌গাঁয়ের মেয়ের মত নিজ গুণেই দুর্দ্দর্ব শাশুড়ীর হৃদয় হরণ করতে পারে। যিনি প্রকৃত কবি, তিনি জহুরীর মত জহর চেনেন, এবং যে কথাটি বরণ করে ঘরে আনবেন কাব্যামৃতের পরিবেশনে তার পাকস্পর্শ হ'য়ে যাবে। কেউ তার গাঁইগোত্রর অনুসন্ধান করবে না। ভাষা জিনিষটা বড় রক্ষণশীল, কারণ সকলের সঙ্গে তার কারবার, ভদ্রাভদ্র অনেকের মন জুগিয়ে চলতে হয়। গায়ের জোরে কাউকে চালাতে গেলে স্বয়ং চালককেই অচল হ'তে হয়। যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, তিনি প্রবীণই হোন্ আর নবীনই হোন্, তাঁর সুরের সঙ্গে যে কথাটি সুর মিলাতে পেরেছে, সম্ভ্রমের আসন তার জন্য সর্ব্বত্র অবারিত।

সমগ্র ভারতব্যাপী মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যে একটি মাত্র মৌমাছির দ্বারা কত সুধা কত মধুর সঞ্চয়ন হ'তে পারে, তা সুরসিক সুপণ্ডিত অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের ভাণ্ডারের সঙ্গে যাঁদের অনুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরা জানেন। দুইয়ে দুইয়ে চার হয় পাটীগণিতে। কিন্তু মানুষে মানুষে যখন যোগ হয় তখন তার অঙ্কফল যে কত বিপুল হ'তে পারে, কোন্ গণিতে তার সীমা নির্দ্দেশ করবে? এই সঙ্ঘ শক্তিকে অর্জ্জন করে আপনারা ফরিদপুরের এক কোণে যদি একটি মৌচাক্ বাঁধতে পারেন, তাহ'লে হয়ত অনেক অজানা ফুলের মধু সংগৃহীত হ'তে পারে। সম্প্রতি আপনাদের প্রকাশিত "বারমাসী" পত্রিকা খানি দেখে আশা হয় যে পরিচালকবর্গ সুযোগ্য সম্পাদকের নেতৃত্বে বদ্ধপরিকর হয়েছেন স্বদেশবাসী সাহিত্যসেবীদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তাঁদের চেষ্টা জয়যুক্ত হোক্।

আজ এই কথা বলে শেষ করতে চাই যে, কবয়ঃ স্বপ্নদ্রষ্টারঃ, যে স্বপ্নে অন্তরের উপলব্ধি ও অনুভূতি দানা বেঁধে ওঠে বাঙ্ময় রূপে। ইহাই কাব্যলোক। সমগ্র মানব হৃদয় ভরিয়া ইহার আকাশ, যেখানে নক্ষত্রেরা আপন হাতে প্রদীপ জ্বালে। কবিরা সেই নক্ষত্রদীপালি সুন্দর পাত্রে যাঁদের স্নেহ সঞ্চয়, লিপি-রেখায় যাঁদের অমরশিখা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

মুক্তধারা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

'মুক্তধারা'র গল্পটা সংক্ষেপে এই :—মুক্তধারা নামক ঝরণার জল চিরকাল সকল মানুষকে সমান ভাবে তৃষ্ণার জল জুগিয়ে আসচে—এই অব্যাহত জলদানের মধ্যে কোন দিন কোন রাজনৈতিক কারণ উঁকি মারেনি। কিন্তু সেবার উত্তরকূট পার্ব্বত্য প্রদেশাধিপতির অধীনস্থ শিবতরাইয়ের বিদেশী প্রজারা দুর্ভিক্ষের জন্তে রাজার প্রাপ্য দিতে পারলে না—তখন স্থির হ'ল মুক্তধারাকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে শিবতরাইয়ের প্রজাদের জল থেকে বঞ্চিত করলেই তারা জব্দ হবে এবং তারপর রাজার প্রাপ্য আদায় হ'য়ে যাবে। যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধ'রে পরিশ্রম ক'রে এই বাঁধ বাঁধলেন—রাজ্যময় সেদিন উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। যন্ত্ররাজ বিভূতি অসাধ্য সাধন করেছেন—যন্ত্রের কাছে দেবতার পরাভব ঘটেচে। উত্তরকূটের পুরদেবতা উত্তর ভৈরবের মন্দির চূড়ার ত্রিশূলের চেয়েও উঁচু হ'য়ে উঠ্‌লো মুক্তধারার বাঁধের লৌহযন্ত্রের অভ্রভেদী মাথাটা। কিন্তু নৃত্যচ্ছন্দা স্রোতস্বতীর এই বন্ধন একজনের বুকে ভীষণ ভাবে বাজ্‌লো—তিনি যুবরাজ অভিজিৎ। তিনি জন্ম থেকেই মুক্ত, কোন বন্ধনই কোনদিন তাঁকে বাঁধ্‌তে পারে নি। ঘরের শঙ্খ তাঁকে ঘরে ডাকেনি, মুক্তধারার ঝরণাতলায় কোন্ ঘরছাড়া মা তাঁকে জন্ম দিয়ে গিয়েছিল। তিনি বল্‌তেন যে পৃথিবীতে পথ কাটবার জন্তেই তাঁর জন্ম—কেননা যে পথ খুলে যায় সে পথ কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, সে পথ সকলের। তিনি ছিলেন শিবতরাইয়ের শাসনকর্ত্তা। শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় সেই জন্তে নন্দিসঙ্কটের পথ বহুদিন থেকে আটক করা ছিল। অভিজিৎ দিয়েছিলেন এই পথ খুলে। এতে শিবতরাইয়ের নিত্য দুর্ভিক্ষ বাঁচলো বটে কিন্তু উত্তর কূটের অন্নবস্ত্র দুর্ম্মূল্য হ'য়ে উঠ্‌লো। সুতরাং রাজা এবং উত্তরকূটের প্রজারা যে যুবরাজের উপর খুসী হলেন না সে কথা বলা বাহুল্য। মহারাজ যুবরাজকে বন্দী করলেন কিন্তু তাঁবুতে আগুন লাগার ফলে এবং রাজা রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিতের চেষ্টায় যুবরাজ মুক্তিলাভ করলেন। যে রাত্রে মুক্তিলাভ করলেন সেই অমবস্তার রাত্রে ভৈরবের মন্দিরে উৎসব এবং পূজার আয়োজন চল্‌ছিলো। যুবরাজ সোজা চল্লেন মুক্তধারার বাঁধের কাছে মুক্তধারাকে তার বন্ধনদশা থেকে মুক্তি দিতে। এই লৌহসেতুর একটা জায়গায় একটা ছিদ্র ছিল—বিরাট যন্ত্রদানবের সেই ছিল একমাত্র দুর্ব্বলতা। যুবরাজ সেইখানে আঘাত ক'রে বাঁধ ভেঙে ফেল্লেন, কিন্তু সেই বিপুল স্রোতের মুখে নিজেকে উৎসর্গ করতে হ'ল। যে স্রোতস্বতীর কলরোলে তিনি তাঁর মাতৃভাষা শুন্‌তে পেতেন সেই স্রোতোবেগ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অমাবস্তার রাত্রে ভৈরবকে জাগানোর সাধনা চল্‌ছিলো—ভৈরব জাগ্‌লেন এবং নিজের বলি গ্রহণ করলেন।

এই হ'ল গল্পের কাঠামো। এখন এই রূপকের বহু অর্থ বহু পাঠক করতে পারেন। সব চেয়ে সোজা অর্থ যেটা মনে পড়ে সেটা হচ্চে এই যে মানুষ না চাইতেই বিধাতা তাকে তার তৃষ্ণার জল দিয়েচেন—সুতরাং সেই জলে তার অবাধ অধিকার এবং এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা স্বয়ং রাজারও নেই। কিন্তু যদি এমন দিনও আসে যে এই প্রাথমিক অধিকারে হস্তক্ষেপ ঘটে তবে সেই অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্তে মানুষকে তার মূল্য দিতে হয়। বক্ষ্যমান নাটিকায় যুবরাজ অভিজিৎকে সেই মূল্য দিতে হয়েছিল।

আর একটা অর্থ এই হতে পারে যে কবি পাশ্চাত্যের

যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে প্রাচ্যের হৃদয়বৃত্তি মূলক সভ্যতার তুলনা করচেন। পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা যন্ত্রকেই জানে—মানুষকে জানে না, চেনে না বা চিন্‌তে চায় না। তারা যন্ত্র দিয়েই সমস্ত জয় করতে চায়—দেবতার আসন টলাতে চায়। কিন্তু যন্ত্র যত পূর্ণতাই প্রাপ্ত হোক্ তার একটা মারাত্মক দুর্ব্বলতা থাক্‌বেই এবং সেই দুর্ব্বলতার ছিদ্র দিয়েই একদিন আস্‌বে তার ধ্বংস। দেবাদিদেব মহাদেবের কমণ্ডলু নিঃসৃত যে জলধারা সে বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্য, বিদ্রোহী শিবতরাইয়ের প্রজাদের শাসন করবার জন্যে তাকে রুদ্ধ করবার মধ্যে একটা মারাত্মক ভুল ছিল। মন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছিল যুবরাজকে শিবতরাই-এ পাঠিয়ে প্রজাদের হৃদয় জয় করতে এবং সেই ছিল প্রাচ্যের উপযুক্ত মন্ত্রণা। কিন্তু রাজার ছিল যন্ত্রদানবের উপর অতিবিশ্বাস—তিনি উত্তরকূটের পুরদেবতার দাক্ষিণ্যের কথা ভুলতে বসেছিলেন। তাই যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধ'রে পরিশ্রম ক'রে যন্ত্রের বিজয়কেতন উড়ালেন কিন্তু তাকে নির্দ্দোষ করতে পারলেন না। কেননা যান্ত্রিক সভ্যতা নির্দ্দোষ হতে পারে না—সে সভ্যতা মানুষের মিলিত সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধ'রে যে টাকাটা খরচ করলেন শিবতরাইয়ের প্রজারা নিশ্চয়ই তত রাজস্ব বাকী ফেলেনি। সুতরাং রাজার আয় ব্যয়ের হিসাবে একটা অর্থনৈতিক ভুলও ছিল এবং সে ভুল সম্ভব হয়েছিল শুদ্ধ জেদের বশে। তখন শিবতরাইয়ের প্রজাদের পীড়ন করার কথাটাই বড় হ'য়ে উঠেছিল। ক্ষুধার উদ্বৃত্ত অন্নে যে রাজার অধিকার, ক্ষুধার অন্নে নয় এ সত্য তখন রাজা ভুলেছিলেন। পঁচিশ বছর ধ'রে যে যন্ত্রদানবকে গড়ে তোলা হ'ল তার বিরাট স্ফীতির মধ্যে চণ্ডপত্তনের অনেক ঘরের আঠারো বছরের বেশী বয়সের ছেলের আত্মাহুতি ছিল, অনেক মায়ের কান্না লুকিয়ে ছিল কিন্তু তাতে যন্ত্ররাজ বিভূতির কিছুমাত্র চাঞ্চল্য ঘটেনি। যেদিন নির্ম্মাণ শেষ হ'ল সেদিন সে বলেছিল যে যারা এর জন্যে প্রাণ দিয়েচে তাদের সে ত্যাগ সার্থক হয়েচে, কেননা আজ যন্ত্র জয়ী হ'ল। আমরা পূর্ব্বদেশের মানুষ—আমরা একথা বলিনে। আমরা বলি যে কোন যন্ত্রকে জয়ী করার উদ্দেশ্যেই একটি প্রাণেরও বিনিময় করা যায় না। কেননা যন্ত্রের চেয়ে প্রাণ বড়—মানুষ বড়। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সভ্যতার মূলগত পার্থক্য এইখানে। "ধ্বংস-বিকট-দন্ত" যান্ত্রিক সভ্যতার নিজের ভিতরেই ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে।

আর একটা অর্থের কথা মনে আসে যাকে কবিজন-সুলভ বা কাব্যিক বলা যেতে পারে। সেটা হচ্চে এই যে অবারিত আকাশের তলে সূর্য্য চন্দ্র তারকার নীচে এক বিরাট যন্ত্রদৈত্যের গর্ব্বোদ্ধত শির দৃষ্টিকে পীড়িত করে। নীচের ধরণী থেকে অহরহ যে সঙ্গীত উপরের আকাশের দিকে উঠচে ঐ বিরাটকায় লৌহদৈত্য যেন তার টুঁটি টিপে ধরেচে। সূর্য্য চন্দ্র তারকার দৃষ্টিকে প্রহত করে ও যেন লোহার দাঁত মেলে আকাশে অট্টহাস্য করচে। প্রকৃতির চিরসুন্দর শোভার নীচে এ যেন মানুষের এক দারুণ অপকীর্ত্তি। যাঁর চোখ ফুটেচে, যিনি ধরণীর এবং সৌরজগতের সৌন্দর্য্যলীলা প্রত্যক্ষ করতে পারেন তাঁর চোখে মানুষের এই অসুন্দর সৃষ্টির নিষ্ঠুর মহিমা ধরা পড়ে—সাধারণ যন্ত্রজীবী মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে এর কোন অপকারিতা নেই, বরঞ্চ উপকারিতা আছে তাই তাদের দৃষ্টিতে আকাশতলের এই বাধা কোনদিন প্রত্যক্ষীভূত হয় না।

মহারাজার গুরুর গুরু অভিরাম স্বামী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যুবরাজ অভিজিৎ রাজচক্রবর্ত্তী হবেন। আপাতদৃষ্টিতে এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি কিন্তু সত্যিই এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। যুবরাজ অভিজিৎ যদি উত্তরকূটের রাজা হ'য়ে বস্‌তে পারতেন তবে তিনি রাজাই হতেন মাত্র, রাজচক্রবর্ত্তী হতেন না। কিন্তু তিনি যে মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে উদার আকাশতলে জন্মেছিলেন তার ফলে তিনি সকলেরই হৃদয়ের রাজা হ'তে পেরেছিলেন। একটি মেয়ের মুখ দিয়ে কবি এই চিত্রটি অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়েচেন। মেয়েটি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়না যে যুবরাজ কিছু অন্যায় করেচেন বা করতে পারেন। শিবতরাইয়ের প্রজাদেরও সেই অবস্থা। উত্তরকূট যুবরাজকে চায়না শুনে তারা শিবতরাইয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। রাজার খুড়া বিশ্বজিৎ ও যুবরাজের মতাবলম্বী হ'য়ে নিজের

পূর্ব্বমত সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। কোন যন্ত্র দেবতার সাধ্যও ছিল না যে মানুষের মনের এই সব পরিবর্ত্তন ঘটায়।' যুবরাজ যখন শুনলেন যে মুক্তধারা বাঁধা পড়েচে তখনি তাঁর মনে হ'ল যে উত্তরকূটের রাজসিংহাসনও তাঁর জীবন-স্রোতের পক্ষে বাঁধ স্বরূপ। কেননা এ তাঁর জীবন-স্রোতকে স্বেচ্ছানুযায়ী প্রবাহিত হ'তে দেবে না। এর অনেক নিয়ম অনেক কানুন, অনেক মাপজোখ। তাই তিনি নিজের জীবনস্রোতকে মুক্তধারার স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন।

এই নাটিকাখানির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক লাইনে এমন একটি সূত্র দিয়েচেন যার সম্বন্ধে দু' একটি কথা না বললে সেটি পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। সে লাইনটি হচ্চে এই :—"মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগ্‌চে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।" মার খেতে ভয় নেই, কেননা "আসল মানুষটি যে তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কাঁই কাঁই ক'রে মরে"। (৫৫ পৃঃ) বলা বাহুল্য এর সঙ্গে গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ের আইডিয়ার কোন প্রভেদ নেই। সুতরাং এই সত্যটি সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের এবং সকল মানুষের। আর এ যে কেবলমাত্র আইডিয়ার জগতে সত্য তাই নয়, ব্যবহারিক জগতেও এর সত্যতায় আমরা প্রমাণ পেয়েছি।

নাট্যকার আর এক জায়গায় রাজার প্রমুখাৎ বলেছেন যে 'প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।' জীবনের বহুদর্শিতা থেকে জানা যায় যে এই সূত্রটিও জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রের পরীক্ষিত সত্য নয়। বরঞ্চ এর উল্টোটাই সত্য অর্থাৎ প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় সকল লোককে। বলা বাহুল্য ব্যবহারিক জগতে এই নীতি সর্ব্বত্র পালিত হয় না, হলে হয়ত জগতটা আরো সুখের হ'ত।

যন্ত্রদানবের পরিস্ফীতির মধ্যে অনেক মায়ের চোখের জল লুকিয়ে আছে এ কথা আগেই বলেছি। এর খুব একটি করুণ চিত্র কবি ফুটিয়েচেন অম্বার চরিত্রের ভিতর দিয়ে। তার ছেলেকে বাঁধ নির্ম্মাণের কাজে ধরে নিয়ে গেছে—সে সেখানে দৈত্যের লেলিহান জিহ্বায় উৎসর্গ হ'য়ে গেল কিন্তু তার মা এদিকে তার আশাপথ চেয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্চে। সে ভাবচে সন্ধ্যাবেলার শেষ দান নিয়ে তার ছেলে তার কাছে ঘরে ফিরে আসবে। রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে, তোমার পরিচয় কি, তখন সে বললে, আমি কেউ না, যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে ধ'রে নিয়ে গেল—অতএব তার অভাবে আমার আর কোন পরিচয় নেই। এর চেয়ে মানুষের বড় রিক্ততা আর হয় না, আর কত বড় সর্ব্বনাশের আঘাতে মানুষ নিজেকে এই রকম পরিচয়হীন ক'রে একেবারে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারে তার ধারণা করাও শক্ত। মানুষের এই সর্ব্বনাশ যান্ত্রিক সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফল।

উপনিষদে আছে "শিবায় চ, শিবতরায় চ।" উত্তর ভৈরব শিবের যে দাক্ষিণ্য অজস্র ধারায় শিবতরাই ভূখণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছিল রাজা যান্ত্রিক সভ্যতার বশবর্ত্তী হ'য়ে তার মূলোচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। রাজা সফলও হয়েছিলেন কিন্তু ভৈরব তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানকে বলি দিয়ে নিজের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের নাটিকাগুলিকে নাটকের পর্য্যায়ে ফেলা শক্ত এবং সেগুলি যে কি তার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা আরো শক্ত। কেননা তারা নাটকের কোন রীতি নীতিই মেনে চলে না। রবীন্দ্রনাথ অজস্র আইডিয়ার জনক—এক সেক্‌সপীয়র ব্যতীত পৃথিবীর অপর কোন স্রষ্টার রচনায় এত অজস্র আইডিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কাব্যে, উপন্যাসে, গল্পে এবং চিঠিতে সমস্ত আইডিয়াকে মুক্তি দিতে না পেরে তাঁকে নাটকের আশ্রয় নিতে হয়। তাঁর নাটকের এক একটি চরিত্র তাঁর আইডিয়ার এক একটি প্রতিরূপ। তাদের প্রত্যেকের মুখ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ কথা কন। এই হচ্চে যুগপৎ তাঁর নাটকের দোষ এবং গুণ। এক মেটারলিঙ্ক ব্যতীত এই বিষয়ে আর কেউ তাঁর স্বগোত্র দেখা যায় না। নাটকের রীতি অনুসারে প্রত্যেকটি চরিত্র হবে স্বতন্ত্র এবং তাদের কথাবার্ত্তার (dialogue) ধরণ এবং ভঙ্গী হবে পৃথক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক চরিত্রের বা আইডিয়ার পেছনেই রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান। অতএব তাঁর নাটিকাগুলিকে নাটকের পংক্তিতে না ফেলে যদি কেবলমাত্র এগুলিকে তাঁর ভাবাবেগের মুক্তি নাম দিই তা' হ'লে আশা করি কেউ অপরাধ নেবেন না।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য *

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহোদধি তীর্থে যে পরমপুরুষের মাহাত্ম্য গাহিবার জন্য অদ্য এই সুধী সমাজে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার মাহাত্ম্য গাহিবার স্পর্দ্ধা আমার মত একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির কেন হইল তাহা অবতারণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই পুরুষোত্তমের মাহাত্ম্য আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বর্ণনা করিবার ধৃষ্টতা আমি আদৌ হৃদয়ে পোষণ করি না। শুধু উড়িষ্যার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে যেটুকু ইতিহাসের ক্ষুদ্র উপাদানের রেণুকণা আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহারই অস্পষ্ট আভাষটুকু আপনাদিগের সম্মুখে চিত্রিত করিবার প্রয়াস মাত্র পাইয়াছি। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য ঠিকভাবে গবেষণা করিতে হইলে তিন চারি খণ্ড বৃহৎ পুস্তক সঙ্কলন করা যায়, কারণ ঐতিহাসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করিয়া এই জটিল গবেষণাপূর্ণ বিষয়টী সুন্দরভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। আমি শুধু বিদ্বৎ সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিন্তার ধারা এই দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র খসড়া নক্সা মাত্র আঁকিয়াছি। আশা করি ভবিষ্যতে যোগ্যতর ব্যক্তি এই জটিল বিষয়টী হস্তক্ষেপ করিয়া সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করিবেন।

প্রথমতঃ—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অনার্য্যদিগের নীলমাধব দেবতারূপে লুক্কায়িত থাকিয়া আর্য্য অনার্য্যদের মিলন-ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দেন, অনার্য্য শবর জাতিদের কতিপয় আচার পদ্ধতি আজও পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, জগন্নাথদেব এখনও পর্য্যন্ত শবর জাতিসম্ভূত দৈত্যারী পাণ্ডা বা দৈত্য পাণ্ডাদের হস্তে সেবা গ্রহণ করেন। স্নান-যাত্রা, রথযাত্রা ও নব কলেবরের উৎসবে তাহাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। দ্বিতীয়তঃ, পাণ্ডারা যে বেতের গুচ্ছ সকলের গায় ও মাথায় স্পর্শ করে তাহা অনার্য্যদের শক্তি প্রেরণ করা বা শক্তি পরিবর্ত্তন করা বলিয়া কথিত হয়। সাধারণতঃ মণ্ডলীর মোড়ল তাহার প্রতিনিধিকে শক্তি সঞ্চারিত করে। তৃতীয়তঃ—রথের সময় যে অশ্লীল গান সারথিদের দ্বারা গীত হয় তাহার মধ্যে অনার্য্যদের Evil Power বা ভূত প্রেতদের তাড়ানর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আর্য্যদিগের সভ্যতার বিকাশ ও আচার-পদ্ধতি এই পুরুষোত্তমের সেবা, পূজা, মন্দিরনির্ম্মাণ, দেবতাগঠন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, সামাজিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে স্তরে স্তরে সুন্দরভাবে বিকশিত রহিয়াছে।

প্রথমতঃ—বৈদিক যুগের অগ্নি, বৃক্ষ, জল, বায়ু ইত্যাদি উপাসনা পদ্ধতির প্রথম স্তরে পরমেশ্বরকে নিম্ব বৃক্ষরূপে বিরাজিত দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ—কোন অবতার বা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া "জগতের নাথ" নামে অভিহিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ যুগের কথাঃ—

গোদাবরী হইতে মহানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশ পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ নামে কথিত হইত। এবং এইখানে সম্রাট অশোক আট বৎসর ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৬১ সালে কলিঙ্গ বিজয় করেন। কলিঙ্গর ভয়াবহ যুদ্ধই অশোকের চরিত্রকে হঠাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। এই যুদ্ধ কলিঙ্গর মহাক্ষত্রিয় বলকে চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দেয়। ঐ যুদ্ধে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কলিঙ্গ পদাতিক বন্দী হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে এক লক্ষ কলিঙ্গ সৈন্য হত হয় এবং ঐ সংখ্যার তিনগুণ লোক শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত ও লুণ্ঠিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধের পরিণামই অনুতাপদগ্ধ সম্রাট অশোককে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণে করিতে প্রবৃত্তি দেয় এবং জগতে সাম্য, মৈত্রী,

* পুরী বঙ্গসাহিত্য পরিষদে পঠিত।

করুণা ছড়ানই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়ায়। কলিঙ্গের উপর তাঁর অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী স্মরণ করিয়া তিনি কলিঙ্গর সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রেরণ করেন এবং মৈত্রী করুণা দিয়া সমস্ত কলিঙ্গ দেশকে একদিন আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। বিখ্যাত চীন পর্য্যটক হিয়ং সিকিয়ং যখন ৬২৯ খৃষ্টাব্দে এই দেশ ভ্রমণ করিতেছিলেন (উচা প্রদেশ নামে কথিত) তখন অনেক স্তূপ সঙ্ঘরামে এ দেশ পরিপূর্ণ দেখেন। চেলিটা-লোচিং বা চরিত্রপুর বা বর্ত্তমান পুরী পাঁচটী বড় বড় স্তূপ সৌধ এবং খুব উচ্চ সঙ্ঘরাম একত্রে দেখিতে পান এবং তাহার মধ্যে বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘের ত্রিরত্ন দর্শন করেন। সেই সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব ত্রিরত্ন-ভাবে পূজিত হইতেন এবং আজও পর্য্যন্ত তাহার ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ—মূর্ত্তিত্রয়ের মধ্যে ত্রিরত্ন চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্নের আকারের সঙ্গে মিলিয়া যায়—হিন্দুদের এইরূপ অদ্ভুত মূর্ত্তি কেন হইল তাহার মীমাংসা সমাধান করিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ—ভ্রাতাভগ্নীর সম্বন্ধ দ্বারায় পূজা পদ্ধতি বৌদ্ধধর্ম্মের Brotherhood and Sisterhood অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব ও ভগ্নীত্ব হইতে উদ্ভূত। হিন্দুদিগের সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধযুক্ত যুগল মূর্ত্তির পূজা পদ্ধতি দেখা যায়, বিশেষতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিকেতন দ্বারকা, মথুরা বা বৃন্দাবনে সুভদ্রা, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পূজার পরিবর্ত্তে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ হিন্দুদের স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ এইরূপ মধুর ও পবিত্র যে তাহাদের দেব দেবীও সর্ব্বত্রই ঐ সম্বন্ধেই স্থাপিত ও পূজিত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, উড়িষ্যার মন্দিরগুলি একটী বৃহৎ স্তূপের আকারে কল্পিত ও গঠিত এবং ইহার গাত্রে ছোট ছোট মন্দিরের খোদিত শোভা votive স্তূপ বা ক্ষুদ্র স্তূপ মালার সুদৃশ্য পরিকল্পনা। চতুর্থতঃ—জগন্নাথ দেবের রথোৎসবটী পূর্ব্বকালে দন্তোৎসব নামে কথিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য সম্রাট অশোক বৌদ্ধের দন্তরক্ষিত স্বর্ণ কৌটাটী কাষ্ঠনির্ম্মিত রথোপরি স্থাপিত করিয়া পাটলীপুত্র নগর পরিক্রমপূর্ব্বক এই দন্তোৎসব ব্রত উদ্‌যাপন করিতেন এবং প্রতি বৎসর নূতন কাষ্ঠ রথ নির্ম্মিত হইত। ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে ইহার পূর্ব্বে রথোৎসবটী ঐতিহাসিক উৎসব ভাবে পরিগণিত হয় নাই—শুধু বুদ্ধক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। পঞ্চমতঃ—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বজাতি স্পর্শিত অন্নগ্রহণ কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না—এই দেশে ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যখন এক সময় উড়িষ্যা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, সেই সময় জাতিভেদ অস্তিত্বে প্রবল কুঠারাঘাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নমহাপ্রসাদ বিতরণের প্রণালী ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ষষ্ঠতঃ—এখানে দশ অবতার মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বুদ্ধ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়—কি ভাস্কর্য্যে, কি চিত্রপটে সর্ব্বত্রই এই মূর্ত্তি লক্ষিত হয়। সপ্তমতঃ—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে সূর্য্য মন্দিরের অভ্যন্তরে সূর্য্যমূর্ত্তির পশ্চাতে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত ও লুক্কায়িত রহিয়াছে। অষ্টমতঃ—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নব কলেবরের উৎসবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটী আবদ্ধ স্বর্ণ কৌটায় রক্ষিত সামগ্রী বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় জগন্নাথদেবের দারু মূর্ত্তির হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করা হয়। যে পাণ্ডা ইহা স্থাপন করেন তাঁহার চক্ষু বস্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়, কারণ ইহা কথিত হয় যে এই বিষয়টী বিশেষ গোপনীয় ও ভয়াবহ। কেহ বলেন এই কৌটার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অস্থি রহিয়াছে—কেহ বলেন শালগ্রাম শিলা রহিয়াছে—কেহ বলেন কালা পাহাড় কর্ত্তৃক দগ্ধ দারুমূর্ত্তির খণ্ড রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন ইহার মধ্যে বৌদ্ধ দণ্ড স্থাপিত রহিয়াছে—এবং ইহা সম্ভবও হইতে পারে কারণ এই প্রদেশে দুই স্থানে দুইটী বুদ্ধদণ্ডের অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়। একটী পরে সিংহল দেশে লইয়া যায়, অন্যটীর অস্তিত্বের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

তন্ত্র যুগের কথা :—

তন্ত্রধর্ম্মের আধিপত্য বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রথমতঃ—"বিমলা ভৈরবী যত্র, জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ" তন্ত্রশাস্ত্রে পীঠস্থান মাহাত্ম্যে কথিত রহিয়াছে এবং অদ্যাপি ভৈরব ভৈরবী ভাবে পূজা পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয়তঃ,

মণ্ডলী কারণাৎ মূর্ত্তি তন্ত্র স্থাপত্য অনুযায়ী শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বিশাখা যন্ত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিকে মহাকালী—মহাসরস্বতী—মহালক্ষ্মী, মধ্যে "শ্রীনাথাদি গুরুং ত্রয়ং"—একদিকে মঙ্গলা, অন্যদিকে উত্তরাণী, মধ্যে গণপতি, পার্শ্বে ঈশানেশ্বর, পাতালেশ্বর, অগ্নিশ্বর ভৈরবত্রয়; অন্যদিকে আটটি পদ্মের মধ্যে অষ্ট শিব মন্দির, ইহা তন্ত্রস্থাপত্য বিস্তার উজ্জ্বল নিদর্শন। তৃতীয়তঃ—বলরাম দেব—ওঁ, জগন্নাথ দেব—অং, সুভদ্রা দেবী—হ্রীং অর্থাৎ ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে পূজিত হয়। সুভদ্রাদেবীর বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় অর্থাৎ হলুদ বর্ণ। সমস্ত পূজা পদ্ধতি তন্ত্রসার অনুযায়ী হয়। চতুর্থতঃ—মাংসের অনুকল্পে আদা প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত মাসকলাইএর পিঠে বা হংসকেলী ভোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কারণ বারির অনুকল্পে "জারফলোদকং" বা যসা জল ও কাংস্য বা তাম্রপাত্রে নারিকেল বারি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ভোগ পূজাতে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চমতঃ - রত্নসিংহাসনের নিকট ভৈরবের বাহন কুকুরের মূর্ত্তি খোদিত ছিল এবং দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে ছিল বলিয়া পুরাতন ব্যক্তিরা সাক্ষ্য প্রদান করে। রামানুজ সম্প্রদায়রা ইহা উঠাইয়া মুক্তিমণ্ডপের নিকট স্থাপিত করিয়াছেন এবং প্রতিদিন জগন্নাথ দেবের ভোগের পর তাঁহার ভোগ কুকুরকে দেওয়ার বিধি আছে। এবং এই কুকুরেরও নিয়মিত পূজা হয়। ষষ্ঠতঃ—রত্নবেদীস্থানটী মহানির্ব্বাণ ক্ষেত্র বলিয়া কথিত এবং পূজিত হয় এবং ইহার ভিতরে তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী উড়ম্বর যন্ত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী স্থাপিত রহিয়াছে। সপ্তমতঃ—শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা উপলক্ষে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে প্রতিদিন দুইটী করিয়া ছয়টী ছাগ শিশু শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রাঙ্গণে ৺বিমলা দেবীর মন্দির পার্শ্বে গভীর রাত্রে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী এই বিধি অনাদ্যন্ত কাল চলিয়া আসিতেছে। অষ্টমতঃ—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অন্নভোগ মহাপ্রসাদ শ্রীশ্রীবিমলা দেবীকে অর্পিত হয়, কিন্তু মন্দিরের অন্য কোন দেবদেবীকে অর্পিত হয় না। এমন কি শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর ভোগও পৃথকভাবে রান্না হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব ও শ্রীশ্রীবিমলা দেবীর নিকটতম সম্বন্ধ তন্ত্রযুগ হইতে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য স্থাপিত বৈদিক পূজা প্রণালীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অ, উ, ম, ওঁকার রূপে তিন অংশ পূজিত হইত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই ভাবে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের দ্বারা স্তব পঠিত হইতে দেখা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম খণ্ডন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে বৈদিক মন্ত্রে স্থাপিত করিয়া শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য দেব মন্দিরে ভোগ মণ্ডপের পার্শ্বে তাঁহার আসন স্থাপিত করেন এবং ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ নামে চারি বেদের মধ্যে একটা ঋবেদের শ্রেষ্ঠ স্থান এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকের ধর্ম্মদুর্গ নামে এই মঠ মন্দিরের মধ্যেই স্থাপন করেন, এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য শ্রীপদ্মপাদাচার্য্যকে প্রথম মঠাধীশ করেন। এখনও পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য মঠের বিধান অনুযায়ী মন্দিরের কার্য্যাদি হইয়া থাকে। অনঙ্গভীমদেবের সময় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের এই মঠ সমুদ্র তীরে বালুকারাশির মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।

শৈব যুগে শিব দুর্গা গণেশভাবে ত্রিমূর্ত্তির পূজা দেখা যায় এবং চতুর্দ্দিকে শিব মন্দির স্থাপিত হইয়া থাকে, এখনও পর্য্যন্ত বৃষ ও ত্রিশূলের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় এবং বলদেব ত্র্যম্বক মন্ত্রে বা শিবমন্ত্রে পূজিত হয় এবং বলদেবের শুভ্র মূর্ত্তি দেখা যায়।

গাণপত্য যুগের নিদর্শন স্বরূপ এই স্থান "গণপতি পীঠ ত্রয়ম্" নামে অভিহিত হয় এবং স্নানযাত্রা উৎসব কালে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের গণপতি বেশের পূজা হয়।

সৌর যুগের নিদর্শন স্বরূপ প্রতিদিন শ্রীমন্দিরে আদিত্য পূজা প্রথমে হইয়া জগন্নাথ দেবের সম্মুখে অগ্নি স্থাপন করা যায়। জগন্নাথ দেবের জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুদ্বয়কে "দিবিব চক্ষুরাততম্" নামে কথিত হয়। মকর সংক্রান্তিতে শ্রীসূর্য্যদেবের উপাসনায় শ্রীজগন্নাথ দেবের স্বরূপ পূজা কল্পিত হয় এবং সূর্য্যনারায়ণ নামে অভিহিত হয়।

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ভাবে এক সময় এই ত্রিরত্ন পূজিত হইয়াছে তাহার আভাষ এখনও পর্য্যন্ত রহিয়াছে, যথা—রাম জন্মোৎসব, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রঘুনাথ বেশ এবং রাম নবমী উপলক্ষে সপ্ত দিনের যাত্রাকথা ইত্যাদি।

বৈষ্ণব যুগের প্রাদুর্ভাব বা বিশিষ্টতা এই ত্রিরত্নের মধ্যে

বিশেষভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য আরও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহাদের উদারতায় সমস্ত ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক অংশকে ইহার মধ্যে স্থান দিয়াছে, তাহাদের বিশিষ্টতা নষ্ট না করিয়া। প্রথমতঃ—অতীত যুগের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীমন্দির স্থাপনার বর্ণনার মধ্যে নীল মাধব বা চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে আমরা এই নীলাচলে দেখিতে পাই।' দ্বিতীয়তঃ—

অনন্তম্ শেষদেবাখ্যং
সুভদ্রা লক্ষ্মী সংজ্ঞকম্
বাসুদেব জগন্নাথ
চতুর্ধাং মূর্ত্তয়ে নমঃ।

তৃতীয়তঃ—অন্ধ্র সভ্যতার সংস্পর্শে জগন্নাথ দেবের নৃসিংহ মূর্ত্তির পরিকল্পনা ও পূজা এদেশে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দশাবতারের অন্যান্য দেবতারও পূজা পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থতঃ—শ্রীরামানুজ সম্প্রদায় অনুযায়ী এই ত্রিরত্ন লক্ষ্মী-নারায়ণ ও শেষ নাগ ভাবে পূজিত হয় অর্থাৎ শেষ নাগের কোলে লক্ষ্মী-নারায়ণ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন এই চিত্রখানি উদ্ভাসিত হয়। এখনও পর্য্যন্ত মন্দিরের উচ্চ শৃঙ্গে ও ত্রিমূর্ত্তির মস্তকের উপর রামানুজ সম্প্রদায়ের তিলক বা ছাপ দেখা যায়। পঞ্চমতঃ—শ্রীচৈতন্য পন্থানুযায়ী—বৃন্দাবন লীলা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য লীলা গুপ্তভাবে প্রকটিত হইতেছে এই নীলাচলে। বাল্যে—ভগ্নী ভ্রাতার মধুময় স্নেহ প্রীতিভাব। যৌবনে—রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলায় রসময় প্রেমের ভাব। বার্দ্ধক্যে—সারথি বেশে রথের উপর উপবিষ্ট মধুর সখ্যভাব। এই ভাবের লীলা যেই রসিক সে-ই এই নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মধ্যে আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেছে এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবই সেই ভাবতরঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া এই নীলাচল ধন্য করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের বালগোপাল বেশের আহ্বানে একদিন শ্রীচৈতন্যদেবকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল।

অন্যদিকে—অব্যক্ত উপাসনায় দারু-ব্রহ্মের অপূর্ব্ব বিকাশ যাহার হাত নাই, পা নাই, মুখ নাই, চক্ষু নাই. সেইরূপ পরমাত্মা বা পরম পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ নীলাচলের এই অনন্ত লীলার মধ্যে কলিযুগে উজ্জ্বলতর রূপে পরিদৃশ্যমান। সত্যম্ শিব সুন্দরের এই ত্রিরত্ন সর্ব্বজগতে আজ নূতন আলোক, নূতন স্পন্দন, নূতন সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছে নীলাচলে জগত নাথের অনন্ত ভাবময় মাহাত্ম্য। আমরাও সেই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় দারু-ব্রহ্মের মধ্যে আমাদের অভিষ্ট দেবতাকে লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই এই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া যদি কোনও ভক্তের প্রাণে অজ্ঞাতে আঘাত দিয়া থাকি তবে সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ঐতিহাসিক সত্যের মধ্য দিয়া উপনিষদের ব্রহ্মসাগরে সমস্ত ধর্ম্ম বা নদীর পরিণতি দৃষ্টিগোচর করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পুরুষোত্তম যে কত বৃহৎ ও মহৎ তাহাই প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসমাত্র করিয়াছি।

'যে পুরুষোত্তম এই মহাতীর্থে দারু-ব্রহ্মরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনি ত্রিসংখ্যক নিম্ব-বৃক্ষ মাত্র এবং ইনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের উজ্জ্বল ত্রিরত্ন—সমস্ত হিন্দুধর্ম্মকে আপনার মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন ঐ ত্রি-মূর্ত্তি—অনার্য্য, শবর, আর্য্য সভ্যতার স্তরে স্তরে বিকশিত বৈদিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন, গাণপত্য, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব সমস্ত ধর্ম্মের নানা ধর্ম্মের নানারূপে অলঙ্কারে সুসজ্জিত রহিয়াছেন আমাদের এই পুরুষোত্তম—যার একধারে বিশাল বারি-রাশির মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের তরঙ্গনিচয়—অন্য দিকে আকাশ-ভেদী উচ্চ মন্দিরের শৃঙ্গে ভক্তি ও বিশ্বাসের উড্ডীয়মান ধ্বজা—আর মধ্যে নীলাচলের সমতল ক্ষেত্রে পঞ্চভূত আসিয়া মিশিয়াছে এক বিশাল অন্তহীন অবস্থায়! ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম্ সমস্তই মহানের আকারে এখানে বিরাজমান—বারি-ব্রহ্মের সীমা নাই, শব্দ-ব্রহ্মের সীমা নাই, বায়ু-ব্রহ্মের সীমা নাই, বালি-ব্রহ্মের সীমা নাই, তেজোময় অর্কের উজ্জ্বলতা ও তপস্যার সীমা নাই—সমস্তই অসীম, অনন্ত ও মহান্—আর ইহারই মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ঐ বৃহৎ দারু-ব্রহ্ম অন্ন-ব্রহ্ম; একটী অব্যক্ত—অন্যটী ব্যক্ত, একটী পুরুষ—অন্যটী প্রকৃতি, একটী সাক্ষী-স্বরূপ—অন্যটী প্রাণ-স্বরূপ, একটী জ্ঞান—অন্যটী ভক্তি, একটী potential বা বৃক্ষ-শক্তি—অন্যটী Kinetic বা বীজ-শক্তি।

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

অন্তরের অবিচল ভালোবাসা দিয়া
তোমারে যে চিরদিন ক'রেছি বরণ
তুমি কি বুঝেছ তাহা ? রেখেছি স্মরণ
মৃত্যুহীন আনন্দের রসে ভরি হিয়া
বৈশাখের পঁচিশের কথা, তা কি জানো ?
বার বার এই দিন বরষে বরষে
সে কী নব মাধুরীর পাবন পরশে
মরমের সুনিভৃত শয়নে লুকানো
প্রেমকে গিয়াছে দিয়া গাঢ় আলিঙ্গন
বলিয়াছে 'আপনারে রাখিয়ো নির্ভয়
আয়ু মোর দীর্ঘতম, বহু দূরে ক্ষয়' ;
তুমিও কি পাও নাই তাহার লিখন ?
বাঙালীর তুমি সব, পঁচিশে বৈশাখ
তাহাদের সকলের প্রাণে প্রাণ পা'ক্।

সাগর দোলায় ঢেউ

শ্রীনবগোপাল দাস আই-সি-এস্

*
* *

শীলার ডায়েরী হইতে :

বুধবার, সকালবেলা। আজ আমার এত ভালো লাগ্‌ছে যে কী বল্‌ব! জাহাজটার প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন মধুতে স্নাত বলে মনে হচ্ছে।···সূর্য্যোদয় ত রোজই দেখি, রোজই সুন্দর লাগে, কিন্তু আজকের সৌন্দর্য্য যেন সব সৌন্দর্য্য-গরিমা ছাপিয়ে উঠেছিল। মনটা হয়ে উঠেছে খুঁতখুঁতে ছেলের মত, কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না... অথচ একটুখানি চাঞ্চল্যের পরই কী জানি কেন ফেণিয়ে ওঠা মদের মত শান্ত-সমাহিত হয়ে পড়ছে।

কাল ডিনারের পর নাচ হ'ল। নাচটা চিরকালই আমার ভালো লাগে...সুরের মূর্চ্ছনা আর সমুদ্রের বাতাস এই দুই মিশে ভারী রোম্যান্টিক্ একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। আমি সুন্দর নীলরঙের একটা গাউন পরেছিলুম, আর আমার গলায় ছিল নীল পাথরের ছোট্ট একটি দ্যুতি।... কর্ণেল গ্রীণ ত সারাটা সময় আমাকে কম্‌প্লিমেণ্ট দিতেই ব্যস্ত ছিলেন! বুড়োকে আমার বড্ড ভালো লাগে, ভয়ানক আমুদে ও রসিক লোক কিন্তু! আর কী ভীষণ হুইস্কি আর সোডা খেতে পারে! আমি ওকে বল্‌ছিলুম, এবার কিন্তু তুমি আর টাল সাম্‌লাতে পারবে না, শেষে তোমার বাহুতে বদ্ধ হয়ে আমি ও কি সমুদ্রের জলে পড়ে যাব?... কর্ণেল তাতে একটুখানি হেসে বলেছিলেন, এ ওস্তাদ বহুদিন এর মধু খেয়ে খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে গেছে, এ আজও তবু নড়বে না!

নাচের মাঝখানে হঠাৎ একবার সেনের কথা মনে হয়েছিল। ভাব্‌ছিলুম, ও যদি আমার এমনি ভাবে নাচ্‌তে দেখে তাহ'লে কী ভাব্‌বে?...ওর যা' মন তাতে হয়ত বিচ্ছিরি একটা কিছু ভেবে বস্‌বে, আর আমার সাথে জীবনেও কথা কইবে না! অবশ্যি ওকে দোষও দেওয়া যায় না...নাচের মধ্যে না হোক্, নাচের পর অনেক সময় যা' সব কাণ্ড হয় তাতে যে-কেউ শক্ পেতে পারে!... প্যাট্‌রিশিয়ার যৌবন বোধ হয় প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় এসে ঠেকেছে, তবু সে কী ঢলাঢলিটা না করলে! সবাই একটুখানি হাস্‌লে তাদের উপরের ডেকে চলে যেতে দেখে। কর্ণেল গ্রীণ আমার কানে অস্ফুটস্বরে বল্‌লেন, ওদের সী-সিক্‌নেস্ হয়েছে···

কাল রাতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম হয়নি', বোধ হয় নাচের উত্তেজনার ফলে! বারোটার সময় নাচ শেষ হবার পর অনেকক্ষণ আমি ডেকে দাঁড়িয়েছিলুম, কর্ণেল গ্রীণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস্ করছিলেন, ইণ্ডিয়া কেমন লাগ্‌ল।···আমি কী জবাব দেব বুঝ্‌তে পারছিলুম না। যেভাবে দেশটা দেখেছি তা' না দেখারই সমান। গেলুম একটা নতুন দেশ দেখ্‌তে, কিন্তু সব সময় রইলুম আমার রং এবং রক্তের মর্য্যাদা নিয়ে দেশের লোকদের এড়িয়ে। মিস্ হিলকে কত ক'রে বল্‌লুম, চলো, এসব বড় বড় হোটেল ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট একটি সহরে দিশী কোন একটা ধর্ম্মশালায় জাতীয় জায়গায় গিয়ে বসি।···শুনে মিস্ হিলের মূর্চ্ছা হয় আর কি! তাঁর ক্ষীণ বপু, ঋজু দেহ আর চশমার ভিতর দিয়ে [illegible] চাউনি নিয়ে তিনি বল্‌লেন, তোমাকে [illegible] পেয়েছে নাকি?

সত্যি, এত বড়ো একটা দেশ, এর মধ্যে যে কোন মর্ম্মবেদী [illegible] আছে তা' আমরা বাইরের পথিকেরা [illegible] বা বুঝ্‌তে পারি?···আসি, বড় বড় হোটেলে থাকি, তাজমহল, উদয়পুর, দার্জ্জিলিং আর কল্‌কাতা দেখি, তারপর দেশে ফিরে একটা ইম্প্রেশন্‌স্-এর বই লিখে বসি...

The mysterious East···The glamorous East! কিন্তু এই রহস্য, এই বৈভবের পেছনে যে কতো বড়ো যন্ত্রণা লুকানো আছে সেটা আমাদের চোখে আসে না, এলেও তার কুশ্রীতা আমাদের মনের ভাবসাম্যকে এতখানি চঞ্চল করে দেয় যে তা' কোন রকমে বিদায় কর্‌তে পার্‌লে বাঁচি!

কর্ণেল গ্রীথ যখন সাড়ে বারোটার সময় আন্দাজ বিদায় নিয়ে তাঁর ক্যাবিনে শুতে চলে গেলেন তখনও আমি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে রইলুম। কালো নিষ্ঠুর জল ভেদ ক'রে আমাদের জাহাজ চল্‌ছিল, আর ট্রপিক্যাল্ আকাশে তারার শোভা যেন শা'জাহানের হারেমের রূপসীদের হীরকখচিত শাড়ীর আঁচলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমি শুধু ইণ্ডিয়ার কথা ভাব্‌ছিলুম; যতদিন সেখানে ছিলুম আমার মনের গোপন অন্তঃপুর মথিত ক'রে একটা অসোয়াস্তির ভাব জেগে উঠেছিল, কিন্তু তার বেশী কিছু আলোড়ন হয়নি'।... এখানে এসে সেনের সাথে দু' চারটি কথাবার্ত্তা হওয়াতে যেন একটা বিপ্লবের নৃত্য সুরু হ'ল! তার শান্ত দৃঢ়তা আর আবেগময়ী চাউনিতে দেশের সব অর্দ্ধস্ফুট ভাব যেন সবাক্ ভাষা হয়ে ফুটে বেরুল!

আজ সকালবেলা যখন সেনেদের ডেকে গিয়েছিলুম তখন কেউই ছিল না সেখানে। কাল একটু ঠাণ্ডা পড়েছিল কিনা, তাই ডেকের উপর শোবার সাহস কেউ করেনি' এবং ভোরের আলো ফুটে ওঠা সত্ত্বেও কম্বলের সুখস্পর্শ ছেড়ে কেউ বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে চায় নি'।

আমি প্রতীক্ষমানা মূর্ত্তিতে ডেকের উপর একটা চেয়ার নিয়ে রেলিংএর সাথে গালটি যেসে বসেছিলুম। আর লাল আলো আগমনের ঔৎসুক্যে আমার সব ইন্দ্রিয়কটাকে সচেতন রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলুম, এমন সময় স্লিপারের মৃদুশব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালুম। দেখ্‌লুম, সেন, পাত্‌লা এক কিমোনো পরে এসেছে। চোখে তার তখনও ঘুমঘোর, ঠোঁট দুটো আলস্যে ভরা, চুলগুলো দুষ্টু ছেলের মত বেপরোয়া।

বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু সূর্য্য উঠবার আগে। আমি ওকে জিজ্ঞেস কর্‌লুম, আপনার শীত কর্‌ছে না? এরকম পাত্‌লা একটা কিমোনো পরে আছেন...

সে আমাকে প্রথমে দেখ্‌তে পায়নি', আমার কথা শুনে একটুখানি চম্‌কে উঠে বল্‌লে, ওঃ, আপনি বসে আছেন... না, ঠাণ্ডা আর এমন কি!

বেশ হাসি মুখেই সে কথাক'টি বল্‌লে, কিন্তু তার পরই পলকের মধ্যে তার মুখ ভয়ানক ভাবে গম্ভীর হয়ে গেল, সে বল্‌লে, আমি ত তবু দিব্যি এখানে কিমোনো গায়ে ঘুরছি, কিন্তু আমার দেশের লোকেরা একটি ছেঁড়া কাঁথার অভাবে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছে!

মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। সেনের কথার সুরে মনে হ'ল যেন আমাকে খোঁচা দেবার জন্যেই ও এম্‌নি করে বল্‌লে। আমি একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বল্‌লুম, আমার সাধারণ একটা কথার উত্তরে এরকম জবাব দেবার উদ্দেশ্য কি আমার রক্ত আর রংএর কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া, মিঃ সেন?

মিঃ সেন এর উত্তরে মাত্র একটি কথা বল্‌লে, সেটা সত্যি হত, যদি একথাটি শুনতেন কাল বিকেলের আগে, মিস্ রজার্স...এখন এটা যে বল্‌লুম তা' বিবাদ বা অভিযোগের অভিপ্রায়ে নয়, আপনি আপনার সমবেদনা দিয়ে বুঝ্‌তে পার্‌বেন এই বিশ্বাসে...

মুহূর্ত্তের জন্য অবগুণ্ঠন সরে গেল। বিদ্যুতের ঝিলিকে যে আমি একটি মনের ছবি দেখ্‌তে পেলুম তার জন্যে আমি আমার নিয়তিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাই আমার মন আজ সকালবেলাটা এত খুসীতে ভরে আছে!

বুধবার, চায়ের আগে। মিস্ হিল কি আমার শান্তিতে থাক্‌তে দেবেন না? কাল থেকেই লক্ষ্য কর্‌ছিলুম তাঁর মুখখানা যেন শ্রাবণ-মেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন। আজ লাঞ্চ্এর পর আমি সেকেণ্ডক্লাস ডেকে যাব এমন সময় আমায় ডেকে গুরুগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন কর্‌লেন, কোথায় যাচ্ছ?

আমি জবাব দিলুম, একটি বন্ধুর সাথে দেখা কর্‌তে।

ভ্রুকুটিকুটিল চক্ষে প্রশ্ন কর্‌লেন, সেই ভারতীয় ছোক্‌রা দুটো বুঝি?

তাঁর কথার ভঙ্গীতেই আমার মেজাজ খিঁচ্‌ড়ে গিয়েছিল। আমি সোজা জবাব দিলুম, যদি তাই হয়ে থাকে তাহ'লে ক্ষতি আছে কি?

হঠাৎ পায়ের সামনে সাপ দেখ্‌লে মানুষের মুখের চেহারা কেমন হয় কেউ দেখেছ কি? মিস্ হিলের মুখের বর্ণ বৈচিত্র্যও ঠিক তেম্‌নি হ'ল। আমার মত শান্ত সুবোধ মেয়ের কাছ থেকে বোধ হয় এরকম জবাব তিনি স্বপ্নেও আশা করেন নি'...তিনি খানিকটা স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন...তাঁর সে সময়কার চাউনি আমি কখনও ভুলতে পার্‌ব না!

পরে একটু ক্রুর হাসি হেসে বল্‌লেন, সাগর জলের হাওয়া লেগেছে কি না, তাই একটুখানি স্বেচ্ছাচারের স্পৃহা জেগে উঠেছে, না?...তা' মন্দ নয়, যদি সীমানা ছাড়িয়ে না যায়!

মিস্ হিলের এই বক্র ইঙ্গিতে আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌লুম। তীব্রকণ্ঠে বল্‌লুম, নিজের স্বৈরিতা দিয়ে অপর লোকের ভদ্রব্যবহারকে বিচার করতে যাওয়াটা তোমার মত ইতর মেয়েরই পরিচায়ক!

রাগে আমার মাথার শিরাগুলো দপ্ দপ্ ক'রে জল্‌ছিল। মিস্ হিলের সাম্‌নে আর দাঁড়াতে পার্‌ছিলুম না, কেবলই ভয় হচ্ছিল হয়ত অসম্ভব একটা চীৎকার করে একটা সীন্ করে বস্‌ব!

মনটা বড্ড অবসন্ন হয়ে গেছে। মিস্ হিল যে বাবার কতখানি বিশ্বাসের পাত্রী তা' আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। লণ্ডনে পৌঁছ্‌বার সাথে সাথেই ত সব ঘটনা বাবার কাছে রিপোর্ট হয়ে যাবে, আর তাঁর স্বভাব ত' আমি জানি! খাঁটি ব্রিটিশার ছাড়া আর কারো ছায়া মাড়ালেও যাঁর আভিজাত্যের গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হয় তিনি আমার এই যোশী আর সেনের সাথে বন্ধুতাকে কখনই সদ্‌চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বেন না!

দুর হোক্‌গে ছাই! কী সব আজ্‌গুবি ব্যাপার ভাব্‌ছি!...লণ্ডনে পৌঁছে কী হবে তা' নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? যা' ভালো এবং সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে তা' করে যাই, পরের ভাবনা পরে হবে!... অনুতাপ করাটা আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে, কাজেই মিস্ হিলের সাথে আজকের এই বচসা বা সেনের প্রতি আমার একটুখানি আকর্ষণ এর কোনটার জন্যেই অনুশোচনা আমার কোনদিন হবে না! বার্ণার্ড শ' না কে যেন বলেছিলেন, অনুতাপ করে মূর্খেরা, যাদের মনের দৃঢ়তা নেই, সত্যে নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের অভাব যাদের অণুপরমাণুতে।

বুধবার, ডিনারের পর। সবাই সিনেমা দেখ্‌তে চলে গেছে, আর আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখ্‌ছি। মিস্ হিলের শ্যেনদৃষ্টির বিভীষিকা থেকে কয়েকটি ঘণ্টার জন্য যে বেঁচেছি এই আমার আনন্দ! এমন নীরস, কল্পনা-বোধহীন মেয়েমানুষ আমি আর দেখিনি'...আমার এ ডায়েরী লেখাকে মিস্ হিল দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারেন না, বোঝেন না যে এ আমার মনের একটা অভিব্যক্তি মাত্র, এর মধ্যে যুক্তি বা বুদ্ধি নেই। রক্ত যখন যুক্তির নিগড় ছাড়িয়ে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে এবং তার উপর সাগরের দোলা এসে লাগে তখনই আমি আমার এলোমেলো কাগজের-টুক্‌রোগুলো নিয়ে বসি।

সাগরদোলার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা উচ্ছৃঙ্খল বাঁশীর সুর আছে। নইলে সেনের মত লোকও আস্তে আস্তে আমার পাশে সোফাটির উপর এসে বস্‌লে! সন্ধ্যার ঠিক আগে ফার্ষ্ট ক্লাশ ডেকে একবার ঢুঁ মারাটা যেন ওর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে গেছে।...আজও সে স্মোকিং-রুমে ঢুকেছিল, চলে যাবার ছলও করেছিল, কাজেই আমাকেই ডাক্‌তে হ'ল। সে ফিরে এল, এসে খানিকক্ষণ নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলে; তারপর ছোট্ট একটি কম্‌প্লিমেন্ট দিলে, আপনাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে!... তার পর অনুমতির অপেক্ষা না রেখে আমার ডান পাশে সোফার উপর বসে পড়্‌লে।

আমি একটু খুসী যে হলুম তা' বলাই বাহুল্য। এতদিন যেন ওর ধরা-ছোঁয়া পাচ্ছিলুম না, ওর মনের আলো-আঁধারের ইসারায় আমার বুদ্ধি ধাঁধাঁয় মধ্যে ঘুরছিল; আজ সন্ধ্যায় ইসারাটা যেন একটু সহজ হয়ে উঠ্‌ল।

এরপর ঘণ্টাখানেক যা' হ'ল তাকে সোজা ভাষায় বলুব—tête-à-tête. মঁপাসাঁ যখন এর মাধুর্য্যের ব্যঞ্জনা করেছিলেন তখন আমি হেসেছিলুম মনে মনে, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় প্রাক্কালে সেনের পাশাপাশি বসে আমি ওর প্রাণের

প্রত্যেকটি স্পন্দন যেন অনুভব করছিলুম, ওর কথার মূর্চ্ছনায় আমার মন তালে তালে নেচে উঠ্‌ছিল···আমার মনের গুটি থেকে আনন্দের দ্যুতি বেরিয়ে আস্‌ছিল প্রজাপতির মত!

সেন কথা বলে কম, একটু লাজুক স্বভাব কি না! কিন্তু দু'একটি টুক্‌রো বা' বলে তাতেই মনের বাঁধন খসে যায়। মাঝে মাঝে তার চোখে অস্বাভাবিক এক দীপ্তি ফুটে ওঠে। দেশকে ও যে কী প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তা' ওর সাথে খানিকক্ষণ নিবিড়ভাবে আলোচনা না করলে বোঝা অসম্ভব; ও হচ্ছে অথই জলের মাছ, ভাসাভাসা স্তুতি বা উচ্ছ্বাস ওর মনের গভীরতার কাছে সাগরজলের বুদ্বুদের মত।

তবু দেখ্‌তে পাই মাঝে মাঝে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সে বোধ হয় আমার সান্নিধ্যের জন্যে। সে কখনই আমায় ভুলতে দেয়না যে আমি হচ্ছি তার শাসকদেরই জাতের মেয়ে···তাই নিবিড়তা আস্‌বার পথে বাধা ফুটে ওঠে, ব্যবধানের পাঁচীল এসে সহজতার মাঝেও একটা অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে।

আমি সেনকে তার আগের দিনকার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলুম। সে ভুলেই গেছ্‌ল প্রায়। আমি বললুম, আপনি আপনার দেশের কথা আমাকে বলবেন কাল প্রতিশ্রুতি করেছেন, আজ বল্‌তেই হবে···

সে কথাটি এড়িয়ে জবাব দিলে, আপনি ত' নিজেই দেখে এসেছেন, আমায় আবার প্রশ্ন করছেন কেন?

আমি বললুম, আমি কিছুই দেখিনি' আপনার দেশের। আমি দেখেছি শুধু গুটিকয়েক প্রাসাদ আর স্তূপ···আপনাদের জীবন্ত দেশ একেবারে এড়িয়ে এসেছি!

মলিন হাসি হেসে মোহিত বললে, আমাদের দেশ জীবন্ত নয়, ও হচ্ছে মৃত্যুপথের যাত্রী···

আমি নাছোড়বান্দা হয়ে আবার বললুম, তারই একটু ছবি আমায় বলে দিন্ না!

বোধ হয় আমার কণ্ঠের মধ্যে সত্যিকারের আগ্রহের সুর ফুটে উঠেছিল, সে আর কোন প্রকার দ্বিধা করলে না। অতি সংক্ষেপে দু'চারটি কথায় আমার চোখের সামনে এমন একটি ছবি এঁকে তুললে যে আমি ওর ক্ষমতাকে মনে মনে প্রশংসা না ক'রে পারলুম না।···কথা যখন শেষ হল তখন দেখ্‌লুম অন্তর-নিংড়ানো আবেগে সে অবশ হয়ে পড়েছে!

আমি প্রশ্ন করলুম, ক্লান্তি লাগ্‌ছে? আপনাকে কষ্ট দিলুম?

বললে, না···একটুখানি বিস্ময় বোধ করছি মাত্র— আপনার কাছে এসবকথা এমন আগ্রহভরে বলব এ আমি কখ্‌খনও ভাবিনি' কিন্তু!

আমি ভয়ানক ভাবে পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লুম, জয়ের গৌরবে আমার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল।

* * * *

মিস্ হিল সিনেমা দেখে ফিরে এসেছেন, মুখখানি খুব হাসি-হাসি। কর্ণেল গ্রীণ বোধ হয় ওঁর গাউনটার প্রশংসা করেছেন আজ!···কর্ণেল গ্রীণ খুব লোকভুলানো পুরুষ বটে!

আমি মিস্ গ্রীণকে প্রশ্ন করলুম, কেমন ছবি দেখ্‌লে?

— বেশ হয়েছিল, তুমি গেলে না, কর্ণেল এবং আরো অনেকে তোমার কথা জিজ্ঞেস্ করলেন।

— আরও অনেকের মধ্যে কারা আছেন?

— জিমি, ম্যাকি এরা সবই!

জিমিকে আমি বেশ ভালোরকমই জানি। আমার দুর্ভাগ্য হয়েছিল দিল্লীতে ওর ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলুম, তারপর থেকে সে যে আমার পেছনে লেগেছে আমার একদণ্ডও শান্তি নেই! আমারই জন্যে সে ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে!···কিন্তু কাল ওকে আমি বেশ শক্তরকম দাব্‌ড়ানি দিয়েছি, তার ফলে আজ সারাদিন আমায় বিরক্ত করতে আসেনি'।

মিস্ হিল আমার মৌনতায় খুব প্রসন্ন হলেন না। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, ওরা তোমার কথা নিয়ে যেন একটু হাসাহাসি করছিল বলে মনে হল···আর ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না!

আমি বুঝ্‌তে পারলুম মিস্ হিল কোন্ বিষয়ে ইঙ্গিত করছেন। ওর সাথে এসব বিষয় নিয়ে তর্ক করাটাও আমার

কাছে অপমান বলে মনে হচ্ছিল, আমি কিছু জবাব দিলুম না।

মিস্ হিল আপন মনে অস্ফুটস্বরে গজ্ গজ্ করতে লাগ্‌লেন, কিন্তু দেখ্‌লেন আমার গাম্ভীর্য্য অটল এবং দুর্ভেদ্য। শোবার পোষাক পরে আমাকে প্রশ্ন করলেন, রাত হ'ল, শোবে না?

আমি বুঝ্‌লুম, আলোটাতেই মিস্ হিলের আপত্তি। আমি বেড্‌সুইচের আলোতে লিখ্‌ছিলুম, কিন্তু ঝাল মেটাতে হ'লে একটা বস্তু চাই! মিস্ হিলের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়্‌ল আমার শিয়রের কাছের বাতিটার উপর।

সারাদিন ডায়েরী লিখে লিখে আমারও চোখ জড়িয়ে আসছে, আমি আর কিছু না ব'লে বাতিটা নিবিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্যুৎবার, সন্ধ্যার পর। আজ সারাটি দিন ডায়েরী লিখ্‌বার অবসর পাইনি'। সকালবেলায় যখন শুনলুম যে আমরা আজ বিকেলে এডেন্ পৌছ্‌ব তখনই মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। এতদিন শুধু জলের রাশি দেখে আর সাগরের দোলা খেয়ে মনটা ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। তাই মাটির স্নেহস্পর্শ পাবার আশায় খেয়ালী আমি আনন্দোন্মুখ হয়ে উঠ্‌লুম।

সারাটা সকাল ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি। খানিকক্ষণ কর্ণেল গ্রীণ্‌এর সাথে গল্প করলুম। কর্ণেল গ্রীণ বেশ একটুখানি চোখের ভঙ্গী ক'রে আমাকে প্রশ্ন করলেন, নতুন বন্ধুদের কেমন লাগ্‌ছে?

আমি ওঁর ইঙ্গিত বুঝ্‌লুম। কর্ণেলের কথার ভঙ্গীটির মধ্যে কিন্তু কোনই বিষ নেই, তাই হাসিমুখে বললুম, মন্দ লাগ্‌ছে না, কর্ণেল, তবে জানই ত', পুরাণো জিনিষ হচ্ছে সব চেয়ে সেরা, তার সাথে কিছুরই তুলনা হয় না।

কর্ণেল হেসে বল্‌লেন, কথাটা কিন্তু মাত্র আংশিকভাবে সত্যি! এই ধর না, যদি আমার ছেলেবেলাকার একটি মিসেস্ গ্রীণ এখন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাহ'লে কি আর আজ তাঁর সাথে প্রেম করতে পারতুম?...তরুণী যুবতী শীলা রজার্স যেমন মিষ্টি প্রৌঢ়া বর্ষীয়সী মিসেস্ গ্রীণ কি তেমন মিষ্টি হতে পারেন?

এখানে বলে রাখি, কর্ণেল গ্রীণ হচ্ছেন কুমার। তাই তাঁর মুখে রসের ফোয়ারার কখনও কমতি নেই। আমি কর্ণেলের কথায় একটুখানি তর্জ্জন করে বললুম, তুমি তরুণী যুবতীদের মধুই দেখ্‌ছ, কর্ণেল, মধুর পেছনে যে হুল আছে সেটা ভুলে যেয়োনা যেন!

কর্ণেল বল্‌লেন, কিন্তু মধুভরা হুল ত? মধুর খাতিরে সে হুলটুকু সহ্য করা যায়।

আমি দেখ্‌লুম কর্ণেলের সাথে কথায় পারবার যো নেই। তাঁর আগেকার প্রশ্নের সোজা উত্তর দেই নাই সেটা মনে হ'ল। বললুম, কর্ণেল, তোমরা ভারতীয় ছেলেদের সাথে আমাদের মিশ্‌তে দেখ্‌লে এমন আঁৎকে ওঠ কেন, বলত?

কর্ণেল আমার প্রশ্নে খুবই প্রীত হ'লেন বলে বোধ হল। বল্‌লেন, যারা বুদ্ধিমান্ তারা কখনই আঁৎকে উঠ্‌বে না... কারণ এদেশের শিক্ষিত ছেলেরা যথার্থ ভদ্রতায় আমাদের শিক্ষিত ছেলেদেরও ছাড়িয়ে যায়। তবে কি জানো, আমাদের একটা কম্‌প্লেক্স্ আছে, সেটা হচ্ছে রং-এর, রক্তের, মিথ্যা আভিজাত্যের। পাছে তার কোন হানি হয় এই ভয়ে আমরা সর্ব্বদাই সজাগ থাকি যেন! বুঝি, এরকম কম্‌প্লেক্স অন্যায়, অন্ধ...কিন্তু সংস্কারের স্বভাবই এই, বুদ্ধি দিয়ে মানুষ তার বিচার করে না, তার বিচার করে নিজের কতকগুলো প্রবৃত্তি দিয়ে!

—কিন্তু আমরা যারা শিক্ষিত তারাও যদি এমন করি তাহ'লে আমাদের শিক্ষার দাম কতটুকু?

হেসে কর্ণেল বল্‌লেন, সেইজন্যেই ত আমি বলি, আমরা ব্রিটিশাররা সব চেয়ে বেশী অর্দ্ধ-শিক্ষিত জাত!

কর্ণেল ভয়ানক চালাক কিন্তু! কোন একটা সমস্যা উঠ্‌লেই ভারী চমৎকারভাবে সেটা এড়িয়ে যান্। অথচ এমন ভাবে সেটা করেন যে কেউ তাতে রাগ করবার অবকাশও পায়না, তাঁর আমুদে কথায় প্রীত হয় বেশী।

কর্ণেল গ্রীণের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গেলুম সেকেণ্ড-ক্লাশ ডেকে। যোশী আর আর-একটি ছেলে দাঁড়িয়ে কী যেন গল্প করছিল। আমাকে দেখে যোশী একটু হাসলে, কিন্তু তখ্‌খুনই সরে এল না। বুঝ্‌লুম অভিমান হয়েছে।

চোখের ইঙ্গিতে ডাকলুম, আমার ভাষা যোশী বুঝলে। ছেলেটির কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে এল।

প্রশ্ন করলে, মিস্ রজার্স এর হুকুম ?

যোশীর কথা বলবার ভঙ্গীটি ভারী চমৎকার—ওর মধ্যে প্রাচ্যের লজ্জা বা আড়ষ্টতা নেই, অথচ মাধুর্য্য আছে বেশ।··· লণ্ডনে ও আমার সাথে ভাব জমাবার জন্তে কী কম চেষ্টা করেছিল! মুস্কিল হচ্ছে এই যে এরকম ভাব জমানো আমার ধাতে সয় না। আমি চাই সবার বন্ধু হ'তে—যারা আমার সংসর্গ এবং সাহচর্য্য কামনা করে তাদের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য করাটা আমার ভয়ানক খারাপ লাগে।

আমি যোশীর কথার জবাব দিলুম, বহুদিন তোমার দেখাশুনো নেই, ভাবলুম এডেন পৌঁছবার মুখে সী-সিক্‌নেস্ হ'ল নাকি ?

যোশী বললে, যদি হ'ত তাহ'লেও কি আর মিস্ রজার্স দয়া করে এই রোগীকে দেখতে আসতেন ?

আমি ওর বাহুতে একটা ঠোনা মেরে বললুম, তুমি ভয়ানক আদুরে হয়ে উঠছ, যোশী। তুমি ভুলেই যাচ্ছ যে আদর পাবার যোগ্য তুমি মোটেই নও।···উচ্ছৃঙ্খলতার শিখা যাদের রক্তের শিরায় শিরায় তারা আদর চাইবে কেন ?

আমি জানতুম ঐখানেই যোশীর দুর্ব্বলতা। ওকে যদি কেউ উচ্ছৃঙ্খল বলে তাহ'লে সে ভয়ানক মুষড়ে পড়ে। অথচ মনে প্রাণে আমি জানি যাকে উচ্ছৃঙ্খল বলে ও তা' নয়, ও হচ্ছে একটু খেয়ালের চরম সুরে গাঁথা।

যোশী মুখখানা একটু ভার করলে। আমি প্রশ্ন করলুম, তোমার সুবোধ বন্ধুটি কোথায় ?

একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি, যোশীর মধ্যে শেষ রিপুটার বিষ খুবই কম। ও আমাকে খানিকটা ভালোবাসে তা' আমি জানি, কিন্তু এটা ও জানে যে আমি ওর বন্ধুকে পছন্দ করতে আরম্ভ করেছি। তার জন্তে একটুও ঈর্ষান্বিত ও হয়নি'।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে, কুকের গাইড্ দেখছে—এডেন সম্বন্ধে।

প্রশ্ন করলুম, কোথায় ?

—উপরে, স্পোর্ট্‌স্ ডেকে।

বললুম, এসো না, সেনকে দেখে আসি···

যোশী ভারী সুন্দর একটি হাসি হাসলে, তারপর বললে, আমার এই বন্ধুটির সাথে গল্প করছিলুম, তা' শেষ হয়নি' ত এখনও।

কী সহজ ও সরলভাবে যোশী নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে! আমি মনে মনে তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলুম না।

স্পোর্ট্‌স্ ডেকে সেন গভীর অভিনিবেশের সহিত কুকের বই পড়ছিল—আর ঘণ্টা কয়েক পরেই জাহাজ ডাঙায় ভিড়বে কি না! কিন্তু ওর মুখের ভঙ্গী দেখেই বুঝতে পারছিলুম যে মনের সঙ্গে বইএর আলাপ পুরোপুরি ঘনিয়ে উঠছে না!

আমি যে এগিয়ে আসছি সেটা ওর চোখ এড়ায়নি', যেন আমারই অপেক্ষায় বসেছিল! পরিচিত হাসি হেসে সে আমাকে অভিনন্দন জানালে।

আদবকায়দা যে ও শেখেনি' এখনও তার পরিচয় হ'ল এইতে যে সে আমাকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালে না।···আমার কিন্তু সেনের এই সহজ স্বাভাবিক অভদ্রতাটুকুই ভালো লাগে।

আমি কাছে গিয়ে রেলিংটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালুম। বললুম, এডেন দেখতে যাবেন ত ?

—হ্যাঁ, সেইজন্তেই ত আগেই একটুখানি খবর সংগ্রহ করে রাখছি।···আপনাদের বাহাদুরি আছে যা'হোক··· পথের আনাচে-কানাচে আপনারা ঘাঁটি বেঁধে রেখেছেন, আপনাদের নিশানের কাছে একবার মাথা না নুইয়ে যাবার যো কি আর আছে ?

কথার মধ্যে একটুখানি শ্লেষের সুর বোধ হয় ছিল, কিন্তু এতদিনে সেটা আমার গা'সহা হয়ে গেছে, কাজেই আমি রাগ করলুম না। আমার মনের ক্ষোভ বা বিরক্তি যা' কিছু ছিল তা' আগেই স্থির হয়ে জমে গিয়েছে কি না! বললুম, আপনার জন্ত দুঃখ হচ্ছে···কিন্তু কাজের কথা বলছি, আমি যদি আপনার সহযাত্রী হই তাহ'লে কি আপনার আপত্তি হবে ?

পলকের জন্ত সেনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল, সে কী বলবে যেন ভেবে পেল না। আমার সহযাত্রী হবার

প্রস্তাবটা শুনে সে কী ভাবলে সেই জানে। মনে হ'ল আমার উপর ওর শ্রদ্ধা অনেকখানি জমে গেল। আস্তে আস্তে সে বল্লে, বোসী যাচ্ছে ত?

আমি বল্লুম, জানিনে...যেতেও বা পারেন। আর বোসী না গেলে কি আপনার সাথে আমার যাবার পক্ষে কোন বাধা হতে পারে?

আমি খুব তীক্ষ্ণভাবে সেনের মুখের ভাব লক্ষ্য কর্‌ছিলুম...যেন একটা নতুন গ্রহের মধ্যে এসে পড়েছে সে, সেখানকার আলোছায়ার লুকোচুরি যেন পৃথিবীর নিয়মে চলে না, বাতাসের গুরুত্ব যেন সেখানে কম, মাটির 'আকর্ষণ যেন নতুন ছাঁদে বাঁধা!

অবশেষে বল্লে, বাধা হতে যাবে কেন?

আমার মনটা শঙ্কায় ঝাপ্‌সা হয়ে উঠ্‌ছিল, সেনের একটি কথায় আলোর প্রবাহ এসে সব আবিলতা ধুইয়ে দিলে।

* * *

জাহাজ যখন এডেনে পৌছল তখন সন্ধ্যা হ'তে আরম্ভ করেছে।...এডেনে সেনের সাথী ছিলুম শুধু আমিই; এই সন্ধ্যাটির কথা আমি ডায়েরীতে লিখ্‌ব না, কারণ এ ডায়েরী হচ্ছে সাগরের দোলার একটি ছোট্ট ঢেউ, আর এর তুলনায় এই সন্ধ্যাটি হচ্ছে অনেক বড় অমর্ত্ত্য জগতের একটা অব্যক্ত ধ্বনি।

*

* *

মোহিত একদৃষ্টিতে লোহিত সাগরের ঘোলাটে জলের দিকে তাকিয়েছিল।...এডেনের কাছে বিদায় নিয়ে আবার তারা চলা সুরু করে দিয়েছে...অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখীর মত তার মন ঘুরে বেড়াচ্ছিল সাম্‌নের দিনগুলোর দিকে। এডেনের স্মৃতি তার মনে যতই জাগ্‌ছিল ততই তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্তে সে এগিয়ে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল।...যেন স্বপ্নোত্থিত সে, স্বপ্নের স্পর্শটুকুর মাধুর্য্যের চেয়ে তার অস্বাভাবিক অতীন্দ্রিয়তায়ই যেন সে শিউরে উঠ্‌ছিল।

এডেনের শুষ্ক কঠোর পাহাড়ের মাঝে কী মাদকতা ছিল মোহিত জানেনা, তবে যা' কাণ্ড ঘটে গেল তাতে সে বিস্ময়ের চেয়ে ব্যথা অনুভব কর্‌ছিল বেশী। ব্যথা হচ্ছিল এই ভেবে যে সে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়ে ফেলেছে একটি বিদেশিনী মেয়ের দুর্দ্দান্ত উচ্ছ্বাসের সম্মুখে।

শীলা আর মোহিত এঁকে বেঁকে এডেনের মরুপাহাড় ধরে উঠ্‌ছিল। শীলা ছিল আগে, আর পেছনে ছিল মোহিত। শীলা বর্ষার সদ্যোজাত ঝরণার মত উচ্ছ্বসিত ভাবে আপন মনে বকে চল্‌ছিল, আর পেছনে পেছনে মোহিত শুধু একটি "হুঁ"—"হুঁ" ব'লে-কথোপকথনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কর্‌ছিল।

অনেকখানি উঁচুতে উঠে তারা একবার সাগর পানে তাকালে। দেখ্‌লে, তাদের জাহাজের বাতিগুলো জ্বল্‌ছে...যেন বহুদূরে কোন্ গ্রহের অপরিচিত অধিবাসীরা সঙ্কেতের নিশান উঁচিয়ে রেখেছে—পৃথিবীর পথিকের পদধূলির প্রতীক্ষায়।

শীলা চুপটি করে তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, কী সুন্দর!

মোহিত প্রথমে কোন কথা বল্‌লে না।...দেশ ছেড়েছে সে মাত্র পাঁচ দিন, এরই মধ্যে যে সে একটি বিদেশিনী মেয়ের সাথে এম্‌নি ভাবে ঘুরে বেড়াবে সে তার স্বপ্নেরও অগোচর!...ফস্ করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, তোমার নামের চেয়েও সুন্দর কি?

শীলা মোহিতের কাছ থেকে এমন জবাব মোটেই প্রত্যাশা করেনি'। ক্ষণিকের জন্ত তার মধ্যে একটা ইচ্ছা অশান্ত হয়ে উঠ্‌ল, সে বল্‌লে, তাহ'লে সুন্দরকে উপেক্ষা কর কেন? আমার নাম ধরে ডাক্‌লেই ত পার!

দিনের পর দিন নীরবে চলে যায়, কিন্তু মনের রুদ্ধ তারা যখন দুয়ারে এসে আঘাত করে তখন তার আকস্মিকতায় নিজেই বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।...মোহিত গভীর ভাবে বল্‌লে, তাই ডাকব, শীলা...

পুলকে শীলার মনটি নেচে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, তোমার নামটিও আমার বল্‌তে হবে সেন।...একতরফা স্বাধীনতায় আমি কিন্তু কিছুতেই রাজী নই!

নামটি জেনে নিয়ে শীলা যখন পাহাড় থেকে নাম্‌লে তখন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে তার খবর দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল, ওগো, তোমরা সবাই শোন, আমি মোহিতের মনের স্নেহ

পেয়েছি···তার স্থির অটল গাম্ভীর্য্যের মধ্যেও দোলার চাঞ্চল্য এনেছি...

মোহিত এই ঘটনাটির কথাই ভাব্‌ছিল, এবং এর পর শীলার সম্মুখীন কী ক'রে হবে তা' চিন্তা করে আকুল হয়ে উঠ্‌ছিল।···গভীর একটা অবসাদ, নিবিড় একটা নৈরাশ্যে তার মন ভরে উঠ্‌ছিল।

যোশী এসে প্রশ্ন করলে, কাল এডেন কেমন দেখলে?

যেন অপরাধ করেছে এম্‌নি এক চাউনি নিয়ে মোহিত নতমুখে জবাব দিলে, মন্দ নয়।

যোশী হেসে প্রশ্ন কর্‌লে, তা' অমন গম্ভীর যে? শীলা রজার্স'এর সাহচর্য্য কি ভালো লাগ্‌ল না?

মোহিত প্রথমে কোন জবাব দিলে না। তার মনে হচ্ছিল যোশী সব কথাই জানে···হয়ত বা শীলা রজার্স'ই কৌতুকভরা সুরে যোশীকে তার পরাভবের কথা বলেছে! একটু তীব্রকণ্ঠে বল্‌লে, তোমার নিজের অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে কী বলে?

তাহার কথার তীব্রতায় যোশী অবাক্‌ হয়ে বল্‌লে, হঠাৎ এমন ধারা চট্‌ছ কেন?...আমার অভিজ্ঞতার মাপকাঠি দিয়ে ত তোমার আনন্দ বা বিপদের বিচার হবে না!

একটুখানি নরম হয়ে মোহিত জবাব দিলে, কাল একটা কাণ্ড হয়ে গেছে, যোশী···মিস্‌ রজার্স' আর আমি আমাদের পরস্পরের নাম ধরে ডাক্‌ব এরকম একটা under-standingএ এসেছি!

যেন কিছুই হয় নাই এম্‌নি একটা তাচ্ছিল্যভরা সুরে যোশী বল্‌লে, ওঃ, এই! আর এরই জন্তে তুমি এতখানি ভাব্‌ছ!···তোমার মনের শুচিতায় আঘাত লেগেছে বুঝি?

আসলে কিন্তু যোশী একটু বিস্মিতই হয়ে উঠেছিল। যে শীলা রজার্স' সহজে কাউকে তার নাম ধরে ডাক্‌বার অধিকার দেয় না সে শুধু তিনদিনের পরিচয়েই কী করে মোহিতকে এতখানি আপনার করে নিলে তা ভেবে সে অবাক্‌ হয়ে গেল। সাগর সম্মোহনে অনেক কিছু সম্ভব হয় সে জান্‌ত, কিন্তু এতকাল শীলা রজার্স'কে সে সেই সম্ভবনীয় সমষ্টি থেকে পৃথক্‌ করেই রেখেছিল।

মোহিত কিন্তু ভয়ানক ভাবে অস্বস্তিবোধ কর্‌ছিল। অলঙ্ঘনীয় এক নিস্তব্ধতা যেন তার আর যোশীর মাঝে পাঁচিল তুল্‌ছিল, সমস্ত শক্তি সংহত ক'রেও মোহিত তাকে ভাঙতে পার্‌ছিল না। খানিকক্ষণ পর সে হাই তুলে বল্‌লে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আজ, যোশী···

যোশী বুঝ্‌লে মোহিতের চিত্ত একটু বিক্ষিপ্ত, ভাব্‌বার অবসর চায় সে। কিছু না ব'লে সে চিদম্বরম্‌এর খোঁজে চলে গেল।

মোহিত চোখ মুদে অসাড়ের মত পড়ে রইল। তার মনের মধ্যে কালের প্রবাহ যেন থমকে গিয়েছিল, চিন্তা করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত যেন সে হারিয়ে ফেলেছিল।

চিদম্বরম্‌ তখন মহোৎসাহে ব্রিজ্‌ খেল্‌তে আরম্ভ করেছে। যোশী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার খেলা লক্ষ্য কর্‌লে, তারপর বিরক্ত হয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশ ডেকের দিকে চলে গেল।

শীলা রজার্স' যোশীর প্রতীক্ষায়ই যেন ছিল। যোশীকে আস্‌তে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, এসো, তোমাকে ভয়ানক দরকার কিন্তু···

যোশী কাছে এসে বস্‌লে, তারপর বল্‌লে, আমার বন্ধুটির কী অবস্থা তুমি করেছ তা' একবার ভেবে দেখেছ কি মিস্‌ রজার্স'?···এডেনের বাতাস তার মনের উপর ইডেন্‌এর কাজ যে করেনি' তা' আমি হলপ নিয়ে বল্‌তে পারি!

শীলা মোহিতের সংবাদের প্রত্যাশায়ই বসে ছিল। সে আগ্রহের সুরে বল্‌লে, কী হয়েছে?

—হবে আবার কী! যা' হবার তা' হয়েছে!···ছিল বেশ, কী মোহিনীশক্তিতেই যে তুমি ওকে ভুলোলে, সে এখন চুপটি ক'রে চোখ মুদে স্বপ্ন দেখ্‌ছে।...বোধ হয় শীলা রজার্স'এর মুখখানি ধ্যান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে!

কথাটা শীলার বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিল না, কিন্তু মনের মধ্যে কৌতূহল তার দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠ্‌ছিল।···ঘরে যদি নানা জিনিষ ভিড় ক'রে থাকে তাহ'লে তার মধ্যে সুন্দর একখানা ছবিও শুধু একখানা আস্‌বাবের চেয়ে বেশী মর্য্যাদা পায় না; কিন্তু রিক্ততার মাঝে ছবির সৌন্দর্য্য ফুটে

ওঠে।···শীলা কল্পনা করছিল, ঠিক তেমনি বোধ হয় মোহিতের মনের অন্দরে তার মুখচ্ছবির জ্যোতি প্রকাশিত হয়ে উঠ্‌ছে!

যোশীকে প্রশ্ন করলে, আমার কথা কিছু বল্‌লে সে?

—ঐখানেই ত গলদ, মিস্ রজার্স...যদি কিছু বল্‌ত তাহ'লে না হয় বুঝ্‌তুম ব্যাধি কোথায়, প্রতীকারের চেষ্টাও দেখ্‌তুম। কিন্তু হতভাগা যে মনের মধ্যে গুমরে গুমরে মরতে চায়, কাউকে তার অংশটুকুও দিতে সে ভয়ানক ভাবে নারাজ!

—কিছু্ই বলেনি' মোহিত?

—বলেছিল, কালকে নাকি কী একটা কাণ্ড হয়েছে তোমাদের···তোমরা পরস্পরের সম্বোধনটাকে নাকি একটু সংক্ষিপ্ত এবং সু-উচ্চার্য্য করে নিয়েছ!

হেসে শীলা বল্‌লে, যদি শুধু এই ঘটে থাকে তাহ'লে এর জন্যে এতখানি ব্যাকুলতার প্রয়োজন যে কী সে ত আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, যোশী...

—ব্যাকুলতা আমার হতনা, যদি সেন আমার মত ছন্নছাড়া উদাসী হত!

প্রতিবাদ ক'রে শীলা বল্‌লে, নিজের প্রতি অবিচার করোনা, যোশী···তুমি যদি ছন্নছাড়া উদাসী তাহ'লে ভোগকামী কে?

কথোপকথনে তাদের উপস্থিত সমস্যা সেনের মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোনই সমাধান হ'ল না। অবশেষে শীলা বল্‌লে, আমি একবার দেখে আসিগে মোহিতের কী হয়েছে, কী বল?

যোশী বল্‌লে কী আর বল্‌ব?···ওষুধও তুমি, বিষও তুমি; তোমার একটা বিষে যদি আরেকটা বিষ ছাড়ে তাহ'লে আমি আমার বন্ধুর হ'য়ে তোমার কাছে চিরদিনের জন্য কেনা হয়ে থাকব!

হেসে শীলা বল্‌লে, শুধু বিষে বিষ ছাড়ে না, যোশী, ওষুধেও বিষ ছাড়ে!

পথে মিস্ হিলের সাথে দেখা। এডেনে সে যে কালো ছেলেদের একজনের সাথে গিয়েছিল তা' মিস্ হিলের নজর এড়ায়নি'। রাত্রিবেলা শীলা খুব দেরীতে শুতে আসায় এবং ভোরবেলায় সকলের আগে বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়ায় মিস্ হিল শীলার সাথে একবার বোঝাপড়া করতে পারেননি'। এখন শীলাকে দ্রুতগতিতে সেকেণ্ডক্লাসের দিকে যেতে দেখে পথ রুখে দাঁড়িয়ে মিস্ হিল বল্‌লেন, শীলা, তোমার সাথে আমার খুব দরকারী এবং জরুরী একটা কথা আছে।

কথাটা যে কী শীলা তা' মিস্ হিলের মুখভঙ্গী থেকেই খানিকটা আঁচ করে নিয়েছিল। শ্রাবণ গগনের থম্‌থমে মেঘভরা মিস্ হিলের মুখ—যেন কোন একটা উচ্ছ্বাসে নিজেকে নিষ্কাশিত করে ফেল্‌তে পার্‌লে বাঁচে!

শীলা প্রতীক্ষমানা মুখে তাকালে।

মিস্ হিল প্রশ্ন করলেন, কাল এডেনে কার সাথে যাওয়া হয়েছিল শুনি?

খুবই শান্তস্বরে গম্ভীর ভাবে শীলা বল্‌লে, আমার এক ভারতীয় বন্ধুর সাথে···

মিস্ হিল দপ্ করে জ্বলে উঠে বল্‌লেন, তোমার হয়ত আত্মসম্মান জ্ঞান থাকতে না পারে, শীলা, কিন্তু চোখের সাম্‌নে আমি আমাদের সবাকার এই অপমান ভরা প্রহসনের খেলা ঘট্‌তে দেব না!

দৃঢ়স্বরে শীলা জবাব দিলে, অপমান বোধ যদি তোমাদের থাকৃত, মিস্ হিল, তাহ'লে এমন নির্লজ্জের মত এমন কথা আজ তুমি বল্‌তে না!···আমার ব্যবহারের মধ্যে তুমি অন্যায়টা দেখ্‌লে কোথায় শুনি?...যোশী, সেন এরা তোমার জিমি আর ব্লাকির চেয়ে কোন্ অংশে ছোট?···আমি যদি আজ সারারাত জিমির সাথে ঢলাঢলি করি তাতে আমার বা তোমার মর্য্যাদা ও শ্রী একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না, অথচ যোশী বা সেনের সাথে খানিকক্ষণ বেড়ালে বা গল্প করলে তোমাদের সবার মুখে চূণকালি পড়বে!

রাগে মুখ চোখ লাল ক'রে মিস্ হিল বল্‌লেন, সাবধান হয়ে কথা ব'লো, শীলা...কাদের সাথে কাদের তুলনা করছ একবার ভেবে দেখ!

তীব্রকণ্ঠে শীলা জবাব দিলে, তুলনায় ভুল হয়েছে সে আমি স্বীকার করছি!···মানুষের সাথে বাঁদরের তুলনা কখনও শোভা পায়না!

ব'লে আর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে শীলা গট্‌গট্‌ ক'রে তার গন্তব্যপথে চলে গেল।

মোহিত তখনও ডেক্‌চেয়ারে নিমীলিত চোখে শুয়েছিল। শীলা এসে মুগ্ধনেত্রে খানিকক্ষণ মোহিতের তন্দ্রালস মুখটির দিকে তাকিয়ে রইলে, তারপর আস্তে আস্তে তার কপালে হাতটি দিয়ে ডাক্‌লে, মোহিত···

মোহিতের কাছে এই আহ্বান ঠেক্‌ল দূরাগত বাঁশীর ডাকের মত। সুরের রেশটি তার অর্দ্ধচেতন মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মৃদু এক নৃত্যের সুরু ক'রে দিলে।

শীলা আবার ডাক্‌লে, মোহিত···

এবার মোহিতের তন্দ্রা ভাঙ্‌ল। চোখ খুলে সম্মুখেই শীলাকে দেখে সে প্রথমে একটুখানি চম্‌কে উঠ্‌লে, আর তার দৃষ্টি গেল ডেকটার একটা survey দিতে···কেউ শীলার এই স্নেহভরা ডাক শুনেছে কিনা!

ডেক্‌ লোকের ভীড়ে জম্‌কালো না হ'লেও দর্শক এবং শ্রোতার অভাব ছিলনা। মোহিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত এদিক্‌ ওদিক্‌ তাকালে, কিন্তু শীলা একটুও ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মোহিতের পাশে বসে প্রশ্ন করলে, শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে কি, মোহিত?

মোহিত এর কী জবাব দিবে বুঝতে পার্‌লে না। ঘাড়টি নেড়ে জানালে যে শারীরিক সে বেশ সুস্থই আছে।

শীলা আবার প্রশ্ন করলে, তাহ'লে কি মন ভারী হয়েছে তোমার? দেশের কথা মনে পড়েছে?

শীলার এই প্রশ্নে মোহিতের চোখ দিয়ে হু হু করে জল-ধারা বেরিয়ে এল। সে কোন ক্রমে অশ্রু সংবরণ করে বল্‌লে, আমাকে প্রশ্ন করোনা, শীলা...

শীলা আস্তে আস্তে দরদমাখা ভঙ্গীতে তার মাথাটার উপর হাত রাখলে, তার অসম্বৃত চুলগুলোর মধ্যে চাঁপার কলির মত আঙুলগুলো একবার চালিয়ে দিলে।

মোহিত খানিকক্ষণ নীরবে শীলার স্পর্শটুকু উপভোগ করছিল, তারপর আস্তে আস্তে বললে, আমার মন যে এত কোমল তা' আমি জান্‌তুম না···

শীলাও তেমনি সুরে, যেন আর কেউ শুন্‌তে না পায় এম্‌নি ভঙ্গীতে বল্‌লে, তাতে লজ্জার কি আছে মোহিত?

একটি অদ্ভুত হাসি হেসে মোহিত বল্‌লে, লজ্জার কিছু আছে তা' ত' আমি বলিনি', শীলা।···আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি শুধু এই ভেবে, যে এ কয়দিনের পরিচয়ে তুমি কী করে আমায় এতখানি আপন করে নিলে!···আর যে আমি তোমাদের জাতকে কখনও ভালোবাস্‌তে পারব এই কল্পনাটাকেই স্বপ্নেরও অতীত ব'লে ভাবতুম সেই আমিও কী ক'রে তোমার কাছে এত শীগ্‌গীর ধরা দিলুম!

মৃদুকণ্ঠে শীলা বল্‌লে, সাগরের দোলানিতেই এসব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে, মোহিত। তুমি ভেবোনা, দোলানি যেই থামবে তোমার মনের নাচও বন্ধ হবে!

আহতকণ্ঠে মোহিত বল্‌লে, তুমি ভুল বুঝ্‌ছ, শীলা, দোলানিকে আমি খারাপ বল্‌ছি না মোটেই, শুধু ভাবছি, দোলানি ত বন্ধ হবে, কিন্তু মনের নাচ যদি বন্ধ না হয়!

হেসে শীলা বল্‌লে, তোমার অন্তর স্পন্দনের উৎস হচ্ছে এই দোলানি; উৎস যখন শান্ত হয়ে যাবে, স্পন্দন বন্ধ হ'তে বাধ্য!

দুপুরবেলা সেকেণ্ডক্লাশ স্মোকিং-রুমে এককোণে খুব জটলা হচ্ছিল। শীলা আর মোহিতের নিবিড় আলোচনার দৃশ্যটুকু অনেকের চোখই এড়ায়নি'; এরকম ঘটনা সেকেণ্ড ক্লাশ ডেকে সচরাচর ঘটেনা, তাই আলোচনা আর মন্তব্যের প্রস্রবণ ছুটেছিল অবাধে।

ডাক্তার বর্ম্মণ খুব বিজ্ঞের হাসি হেসে বল্‌ছিলেন, অভিনয় এ জাহাজে অনেক দেখেছি, মশাই, কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, এমন সাদাসিধে গোবেচারীকে এমন ফাঁদে পড়তে কখনও দেখিনি'।

আহম্মদ প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, সাদাসিধে বল্‌বেন না, ডাক্তার···ওর পেছনে অনেকখানি দুষ্টবুদ্ধি লুকানো আছে এ আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি।

চিদম্বরম্‌ এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল; একটা নতুন কিছু বল্‌বার জন্যে তার মন উৎসুক হ'য়েছিল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লে, ও ত আমারই ক্যাবিন্‌-মেট্‌, আমি ওর খবর

বেশ জানি! কালকে দু'জনে একা গিয়েছিল এডেনের পাহাড়ে...বেড়াতে···

ডাক্তার বর্ম্মণ একটু ক্রূর হাসি হেসে বল্‌লেন, শুধু বেড়াতে নয়, মশাই!...বলুন, চোখ টিপ্‌তে, মুচ্‌কে হাস্‌তে, মাথায় হাত বুলাতে, আরো কত কি!

সবাই ডাক্তার বর্ম্মণের কথায় হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লে।

ডাক্তার বর্ম্মণ বল্‌লেন, আর একটা ছোকরা যে আছে, যোশী না কোশী কী নাম ওর, সে ভয়ানক ধুরন্ধর কিন্তু!... ওর চেহারা দেখ্‌লেই বোঝা যায় বেশ কিছু ফূর্ত্তি ক'রে নিয়েছে মেয়েটার সাথে, তারপর বুদ্ধিমানের মত সরে পড়েছে!

চিদম্বরম্ বল্‌লে, তাইত সেনের জন্য দুঃখ হয়, মশাই! যোশীর সাথে আমারও আলাপ আছে, সেনের গভীর বন্ধু সে, তাই ওর কাছ থেকে কথা বার করা মুস্কিল!...কিন্তু আগুন তো আর লুকানো থাকে না। যোশীর সাথে মেয়েটার পরিচয় বহুদিনের...

আহম্মদ হাই তুলে বল্‌লে, সে যাই হোক্, সেনকে একটু হিংসে না ক'রে পাচ্ছি না, ডাক্তার বর্ম্মণ। এই ত আমরাও যাচ্ছি, আমাদের ভাগ্যে ত এমন তুষারনিন্দিত শুভ্রকোমল হাতের স্পর্শ জুট্‌ল না!

ডাক্তার বর্ম্মণ একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্‌লেন, ভারী ত ভাগ্য! এমন ভাগ্যের মুখে আগুন!...কোথাকার কোন এক ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে, সে আমার প্রেমে পড়্‌ল না ব'লে বুঝি আমার ঘুম হবে না?...ছোঃ!···

চিদম্বরম্ প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, ওখানে ভুল করলেন, ডাক্তার। ও ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে যে নয় তা' ওর চালচলন থেকেই বোঝা যায়!...তাছাড়া যোশী আমায় বলেছে, মেয়েটার সাথে তার আলাপ হয় কলেজে, যেখানে যোশী পড়্‌ত।

আহম্মদের এই প্রথম বিলাত যাত্রা, এর আগে সে কখনও বিলাত-ফেরত সমাজের সংস্পর্শে আসেনি'। ল্যাণ্ড্‌লেডী এবং অভিজাতের 'মধ্যে তফাৎটা কোথায় তা' তার বিচারের অতীত। সে চুপ ক'রে রইলে।

ডাক্তার বর্ম্মণ আগেরই মত তাচ্ছিল্যের সুরে বল্‌লেন, আপনিও যেমন, যোশীর কথা বিশ্বাস করেন!...আর, আমি নিজেই কতবার আমার মেয়ে-বন্ধুদের সম্বন্ধে বলে বেড়িয়েছি যে তারা অমুক ব্যারন্ বা নাইট্‌এর দৌহিত্রী বা ভাইঝি! তাই বলে কি সত্যিই তারা তাই ছিল?

অকাট্য যুক্তি!···নিজের ব্যবহারগত অভিজ্ঞতার দোহাই, এর সাথে আর তর্ক চলে না!

আহম্মদ বল্‌লে, মেয়েটির চেহারার মধ্যে লালিত্য আছে কিন্তু বেশ!

ডাক্তার বর্ম্মণ জবাব দিলেন, ওরকম চেহারা অনেক দেখ্‌তে পাবেন, মশাই; একবার বিলিতি ডাঙায় পা' দিন! তখন আপনাকে খুঁজে পেলে হয়!···ভারী ত' চেহারা, যেন আদরে খুকী আর কি!

চিদম্বরম্ সায় দিয়ে বল্‌লে, আর কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে! আমি একটুখানি শুন্‌ছিলুম, সাগর দোলা সম্বন্ধে কী যেন বল্‌ছিল!

প্রাজ্ঞের মত ডাক্তার বর্ম্মণ বল্‌লেন, বল্‌ছিল বোধ হয়, আমাদের এই ভাবটুকু সাগর দোলারই মত···তোমাকে খানিকটা চঞ্চল ক'রে রেখে আমি অন্য নৌকায় দোল দিতে যাব!

শীলা চলে যাবার পরও মোহিত চুপ করে শুয়ে রইলে। তার অস্পষ্ট ভাবনাগুলোর উপর ঝরে পড়্‌ছিল সমুদ্রের ছলছল্ শব্দ···ধারা হ'য়ে। নিবিড় তরুপল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট ছোট্ট একটি দ্বীপের মত সে সর্ব্বান্তঃকরণে নিজকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিল।...শীলার স্নেহস্পর্শে তার মনের সঙ্কোচ অনেকখানি কেটে গিয়েছিল...তার সমস্ত অন্তর ছাপিয়ে একটি ঘনীভূত অনুভব জেগে উঠ্‌ছিল, যার নাম দেওয়া যায়, তৃপ্তি। অনবচ্ছিন্ন এক গভীর ভাবে তার মন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

চুপটি ক'রে সে লোহিত সাগরের বুকে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলোর খেলা দেখ্‌ছিল। রূপে, রং-এ, আলোর সেগুলো তার মনের অস্ফুট অথচ পরিপূর্ণ ভাষার প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল। সে ভাব্‌ছিল, সংসার কি বিচিত্র! যে বিরাট্ শূন্যতা তার মধ্যে এতদিন ছিল, যার কথা সে

এতদিন চিন্তাই করেনি, তা' যেন ধীরে ধীরে সমুদ্রের কল্লোলে পূর্ণ এবং সমগ্র হ'য়ে উঠ্ছিল। সমুদ্রের এই দুঃসাহসিক স্পর্দ্ধায় তার মনে গভীর বিস্ময়ের সুর বেজে উঠ্ছিল।

যে ব্যথার ভাবটা তাকে এতক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল তা' আস্তে আস্তে কমে আস্‌ছিল। শীলার সাথে তার মনের সম্বন্ধটা সে একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করবার চেষ্টা করছিল। শীলার সাহচর্য্য তার ভালো লাগে এটা মনের কাছে স্বীকার করতে সে আর দ্বিধাবোধ করছিল না।... এই ভালো লাগাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা' নিয়ে এখনই গবেষণা করাটা সমীচীন নয় এ সিদ্ধান্তে সে এসে পড়েছিল। ভালো লাগে, এই যথেষ্ট নয় কি? মানুষ ত' আর একটা জায়গায় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে না—প্রবহমান ঘটনার সাথে সাথে পরিচয়ের দ্বার সে উদ্ঘাটন করতে থাকে।

মনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ক'রে নিয়ে মোহিত উঠে দাঁড়ালে। রেলিং-এর সামনে এসে একবার ঝুঁকে জলের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে—মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণ-সম্পাতে জলটা ঝল্‌সে উঠেছে।

শীলা যখন মোহিতকে ওষুদ দিতে চলে গেল তখন যোশী খানিকক্ষণ চুপটি ক'রে শীলার চেয়ারে বসে রইলে। অন্যমনস্কভাবে সে শীলার পরিত্যক্ত একখানা মাসিক কাগজের পাতা উল্‌টাচ্ছিল এমন সময় কর্ণেল গ্রীণ এসে হঠাৎ বল্‌লেন, মাপ করবেন, আপনার সাথে একটু আলাপ করতে পারি কি?

যোশী মুখ তুলে তাকিয়ে দেখ্‌লে আগন্তুককে সে চেনে না। একটু বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বল্‌লে, নিশ্চয়ই...

—আমার নাম হচ্ছে কর্ণেল গ্রীণ, আমি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছি...আপনি বোধ হয় এই প্রথম ইণ্ডিয়া ছাড়্‌ছেন?

যোশী এর আগে কর্ণেল গ্রীণের নাম শোনেনি'...শীলা এর কথা গল্পচ্ছলেও কখনও বলেনি'। বল্‌লে, oh no, আমি দু'বছর বিলেতে ছিলুম, ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসেছিলুম, আবার ফিরে যাচ্ছি...আমার নাম হচ্ছে যোশী...

কর্ণেল একটুখানি দমে গেলেন। তারপর বল্‌লেন, আপনার সাথে শীলা রজার্স বলে একটি প্যাসেঞ্জারের পরিচয় আছে?

যোশী ধীরে ধীরে ব্যাপারটা আঁচ করে নিচ্ছিল। বল্‌লে, সে সম্বন্ধে আপনার সাথে আলোচনা করতে আমি বাধ্য কি?

কর্ণেল দেখ্‌লেন যোশী খুব সোজা প্রকৃতির ছেলে নয়। বেশ মোলায়েম সুরে বল্‌লেন, অবশ্যি আপনি বাধ্য নন্, তবু জিজ্ঞেস্ করছি এই জন্যে যে মেয়েটি আমাদেরই সহযাত্রিণী, আমি তার একপ্রকার অভিভাবক বল্‌লেই চলে এবং আইন অনুসারে সে এখনও নাবালিকা...

যোশী খুবই শান্তসুরে বল্‌লে, এসব বলার তাৎপর্য্য?

—তাৎপর্য্য বিশেষ কিছুই নয়; তবে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, মিঃ যোশী, মেয়েটির বাবা যদি শুনতে পান যে সে তার অভিভাবকদের কথা শুনছে না, আর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহ'লে তার অনেক দুর্গতি হবার সম্ভাবনা আছে।

যোশী বেশ শান্তসুরে বল্‌লে, তার মানে আপনি বলতে চান্ যে মিস্ রজার্স আমার এবং আমার বন্ধুর সাথে মাঝে মাঝে আলাপ করেন ব'লে তাঁর বাবা তাঁকে লাঞ্ছনা এবং অবমাননায় ফেল্‌বেন, এবং প্রকারান্তরে তার জন্যে আমরাই হব দায়ী?

কর্ণেল গ্রীণ মনে মনে যোশীর বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছিলেন না। বল্‌লেন, আপনি সংক্ষেপে বিষয়টা ঠিকই বর্ণনা করেছেন, মিঃ যোশী...

যোশী বল্‌লে, মিস্ রজার্স-এর অবমাননা বা লাঞ্ছনার কারণ আমরা কেউই হ'তে চাইনে, কর্ণেল গ্রীণ, এটা আপনি তাঁকে খুব বিশদ্‌ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। আর, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে অপমানের মুখে ফেল্‌বার জন্যে আমাদের কারোরই আগ্রহ নেই...তার চেয়ে সময় কাটাবার মত উপযোগী কাজ আমাদের অনেক আছে।

শান্তভাবে কথাটা বল্‌লেও তার মধ্যে খোঁচা ছিল অনেকখানি। কর্ণেল গ্রীণ একটুখানি লজ্জিত হয়ে বল্‌লেন, আপনারা ইচ্ছা করে মিস রজার্সকে অপমানের মুখে ফেলতে চাচ্ছেন এমন ইঙ্গিত আমি করিনে', মিঃ

যোশী।···সত্যি কথা বল্‌তে কি, মিস্ রজার্স যদি আমার মেয়ে হ'ত তা'হ'লে আমি এরকম ভাবে আপনার কাছে এ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উপস্থিত হতুম না।···মানুষে মানুষে সম্বন্ধের মর্য্যাদা আমিও একটু বুঝি, মিঃ যোশী; কেবল মেয়েটার ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনার কথা ভেবেই আপনার সাথে এ আলাপটুকু করলুম, আপনি কিছু মনে করবেন না।

যোশী হাসিমুখে বল্‌লে, মনে কিছু করি আর নাই করি, কর্ণেল, আপনাদের এই বর্ণ-সমস্যার সমাধান ত' তাতে হবেনা!

ফার্ষ্টক্লাশ স্মোকিং-রুমেও আলোচনা হচ্ছিল মন্দ নয়। মিস্ হিল ছিলেন তার উদ্যোক্তা। যেন ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটেছে এম্‌নি ভাবে জল্পনা হচ্ছিল আর প্রতীকার নির্দ্ধারণের চেষ্টা হচ্ছিল। জিমি আর ব্ল্যাকি দলের মধ্যে যে ছিল সেটা নিশ্চয়ই আর বিশেষ ক'রে বলে দিতে হবে না···আর অপবিত্রতার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্যে ছিলেন দু'জন মেয়ে মিশনারী যাত্রী।

শীলা রজার্সকে যে কিছুতেই উচ্ছন্নের পথে যেতে দেওয়া হবে না এ বিষয়ে তারা সবাই একমত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কী ক'রে স্রোতকে রোধ করা যায় সেটা তারা কিছুতেই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারছিল না।

মিস্ হিল বল্‌লেন, আমি ওকে অনেক ভয় দেখিয়েছি, বাপু, কিন্তু এমন লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, একটুখানি ও কাঁপে না!

জিমি বল্‌লে, আমার মনে হয় এর মধ্যে সেই কালো ছেলে দুটোর যোগ আছে। শীলাকে আমি খুব ভালো রকমই জানি, নিজে ওর এতখানি সাহস হবে না যে আমাদের সকলের বিরুদ্ধে যায়।

ব্ল্যাকি প্রস্তাব করলে, একবারটি ওদের একটুখানি নাকানিচুবানি দিলে কেমন হয়?···বলেই সে আস্তিন গুটালে, তার স্ফীত মাংসপেশীগুলোর দিকে প্রশংসাসূচক চোখ কয়েক জোড়া পড়্‌বে এই আশায়।

জিমি দুঃখভরা সুরে বল্‌লে, মুস্কিল হচ্ছে এই যে এটা একটা জাহাজ, এবং এর মধ্যে যা' কিছু করতে হয় সাবধানে করতে হ'বে।

কর্ণেল গ্রীণ এমন সময় যোশীর সাথে কথাবার্ত্তা শেষ করে তাঁর ক্যাবিনের দিকে যাচ্ছিলেন। মিস্ হিল তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে ডাক্‌লেন, কর্ণেল, এখানে এসো, বড্ড জরুরী কাজ আছে।

কর্ণেল এগিয়ে এলেন। মিস্ হিল বললেন, আমরা বড্ড সমস্যার মধ্যে পড়েছি শীলাকে নিয়ে, কর্ণেল। তুমি ত' অনেক ফন্দীফিকির জান, কী ক'রে ওকে ঠিক আগেরটির মত ক'রে নেওয়া যায় বল দেখি!

খুবই গম্ভীরভাবে কর্ণেল গ্রীণ বল্‌লেন, মিস্ হিল, আমার উপদেশ আপনারা শুন্‌বেন না জানি···তবু আমি বল্‌ছি, শীলা রজার্স‌এর এই ব্যাপারে আপনারা হস্তক্ষেপ না করে তাকে তার স্বাধীনতাসহ ছেড়ে দেওয়াই বোধ হয় সুরুচিসঙ্গত হত!

তাঁর উপদেশ কারো মনঃপূত হবেনা তা' কর্ণেল জান্‌তেন। মিস্ হিলের আহ্বানের জবাব দিয়ে তিনি আর কোনপ্রকার অলোচনার অপেক্ষা না রেখে চলে গেলেন। ভিজিল্যান্স কমিটির সভা ভাঙ্‌ল লাঞ্চের ঘণ্টার সাথে সাথে।

কর্ণেল গ্রীণের সাথে যে কথোপকথন হ'ল তা মোহিতকে বলা সঙ্গত কিনা যোশী বার কয়েক ভাব্‌লে। তারপর স্থির করলে সব ঘটনা মোহিতকে জানিয়ে রাখাই ভালো। ঘটনার সমাবেশ যা' হয়েছে তাতে কখন কী হয় তা' বলা যায় না, তখন যদি মোহিত বেচারীকে দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়্‌তে হয় তার জন্যে দায়ী হবে যোশী নিজে।

মোহিত খুব গম্ভীরভাবে যোশীর কথাগুলো শুন্‌লে। প্রথমে কর্ণেল গ্রীণের উপর সে অনেকখানি রুষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা করছিল। অবশেষে সে স্থির করলে যে যা' হবার হয়েছে, বেশীদূর আর সে এগোবেনা···মিস্ রজার্স‌এর সান্নিধ্য সে এড়িয়ে চল্‌বে।···এত' সাগরদোলায় ঢেউ, বাতাসের গতি বদ্‌লে গেলে ঢেউএর উত্থান পতনও নতুন এক সীমারেখার দিকে ছুটবে!

মনকে বোঝান কিন্তু শক্ত। সারাটি দিন মনের সাথে তার বোঝাপড়া চল্‌ল। যোশীর কথার এক ধাক্কায় তার

মনের বেড়া গেল ভেঙে। দেখ্‌লে, এতদিন সে যাকে ভেবেছিল শুধু ভালোলাগা, তা' তার অজ্ঞাতে কোন্‌ এক ফাঁক দিয়ে এসে জড়িয়েছে তার সমস্ত সত্তাকে—বেদনা এবং আনন্দ নিবিড়ভাবে মিশে মনটাকে করে দিয়েছে এলোমেলো।

ঈজিপ্ট্‌ থেকে বন্ধু শোভনলালকে কল্‌কাতায় সে চিঠি লিখতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল। সে লিখ্‌লে:

"ভাই শোভনলাল,

যদিও দেশের মাটি ছেড়েছি আজ হপ্তাখানেকের বেশী হয়নি', তবু যেন মনে হচ্ছে দেশ ছেড়ে এসেছি যুগযুগান্তর আগে। একটা ধূমকেতুর ধাক্কায় যেন দেশের বুক থেকে ছিট্‌কে পড়েছি, মাধ্যাকর্ষণটা কেটে গেছে, তাই ফির্‌বার আর পথ খুঁজে পাচ্ছিনা। ...মাটির বাঁধন ত' খুলেই গিয়েছিল, চলার বাঁধনও বুঝি এবার খুল্‌তে চল্‌ল। পথহারা আমি ভাব্‌ছি মিশরের মরুস্থানের মধ্যেই আমার আস্তানা গাড়্‌ব কি না!

তুমি তোমার নৃতত্ত্বের রসের মধ্যে বসে বসে হাস্‌বে তা' আমি জানি। এসব বাঁধনের খবর তোমার পাথরে গড়া মনের ত্রিসীমানার মধ্যেও পৌঁছায় না! আমি মিশরের যেখানেই বাসা করিনা কেন, তুমি ভাব্‌বে ভালোই আছে সেখানকার মামি এবং ফারাওদের মধ্যে।...এদের বাদ দিয়ে শুধু আমার কথাটি যদি কখনও তোমার মনে উঁকি মারে সে আমার সৌভাগ্য!

তুমি ভাব্‌ছ, বন্ধুটির আমার হ'ল কী? হ'বার মত যদি কিছু হ'ত তাহ'লে তবু একটা সান্ত্বনা থাক্‌ত!...না হওয়ার অতৃপ্তি আমায় পেয়ে বসেছে, শোভনলাল! বাঁশীর সুর কানে এসে পৌঁছেছিল, সুরের আধিনায়িকার স্পর্শটুকু কিন্তু পেলুম না!

কানে না আস্‌তে আস্‌তেই এই হারিয়ে যাওয়ার জন্যে দুঃখ একটু হচ্ছে বৈ কি! তুমি বল্‌বে, মেলানেশিয়ার অনেক দ্বীপপুঞ্জেই সেখানকার আদিম অধিবাসীদের কানে এমন অনেক সুর এসে লাগে, আবার হারিয়ে যায়...তাতে তারা ভ্রূক্ষেপও করে না! তারা নিজেদের প্রাণের স্পন্দনে চল্‌তে থাকে, মনের গানের তালে তালে—বাইরের সুরের প্রতীক্ষায় নয়।

সে যাই হোক্‌, বন্ধু, এই আলো-ছায়ার মাঝখানে অস্পষ্ট আঘাতেরও দাম আছে, তাই আমি ব্যথার মধ্যেও আলোর রেখা দেখ্‌তে পাচ্ছি।

মনে কী হচ্ছে তা' বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পার্‌লুম না।...তোমার ল্যাবরেটারী হচ্ছে বিশ্বজোড়া মানুষের মন আর তার ব্যাপকতা হচ্ছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। আমার চিঠিখানা তোমার ল্যাবরেটারীর মধ্যে যদি তোমার সাধনায় একটুও বিঘ্ন ঘটায় তাহ'লে আমার আনন্দ হবে অপরিসীম।

—তোমার মোহিত।"

চিঠি লেখা ত' শেষ হ'ল, কিন্তু ঈজিপ্টে পৌঁছবার যে তখনও আরো আড়াই দিন বাকী! চিঠিখানা নিয়ে মোহিত খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া কর্‌লে, তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ষ্টীমারের ডাক বাক্সে ফেলে দিলে।...যদিও সে জান্‌ত, ইচ্ছা কর্‌লেই ষ্টুয়ার্ডকে ব'লে সে চিঠিখানা আবার তুলে নিতে পারে, তবু সেটা ফেলার সাথে সাথেই তার এক স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরুল, যেন সে তার মনের রুদ্ধ আবেগ পরিচিত কারও কাছে বলে ফেল্‌লে।

সারাটা দিন মোহিত একটু অন্যমনস্কভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালে। যোশী মোহিতকে খানিকটা ভাব্‌বার অবসর দিয়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। চিদম্বরম্‌, ডাক্তার বর্ম্মণ প্রমুখ সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে খুব হাসি ঠাট্টা কর্‌ছিলেন...বোধ হয় মোহিতকে নিয়েও খানিকটা!

শীলা রজার্স সেই যে ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল তার আর পাত্তাই ছিল না। এক একবার মোহিতের মনে দুর্দ্দমনীয় একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌ছিল শীলা রজার্স-এর মুখোমুখী হ'য়ে তাকে প্রশ্ন করে, এমন প্রহসন কর্‌বার প্রয়োজনটা কী ছিল?...তীব্রস্বরে সে শুধোবে, তরুণ একটা মন নিয়ে না খেল্‌লে কী চল্‌ত না?...ব'লে তার মুখের উপর রেখার বিন্যাস দেখ্‌বে, তার আঁখির পাতা নড়ে কি না লক্ষ্য কর্‌বে...

(ক্রমশঃ)

নবগোপাল দাস

দারা ও সুজার শেষ জীবন

অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু এম-এ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৪

২রা জুলাই তারিখে সম্রাট আওরংজীব জিওয়ন এর দ্বারা লিখিত এক পত্রে জানিতে পারিলেন যে, দারা বন্দী হইয়াছেন। এই পত্রটি তিনি দরবারে সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিলেন। "হৃদয়াবেগ দমন করিবার কী অদ্ভুত তাঁহার ক্ষমতা। তিনি কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি কোন উল্লেখই করিলেন না। রাজ বাদ্যকারেরা জয়সূচক কোন রাগিনী আলাপ করিল না।" তাঁহার এক প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবম্বিধ উপায়ে বন্দী হইবার সংবাদে তিনি যে মনের মধ্যে উৎফুল্ল হন নাই এমত হইতে পারে না। তবে তিনি কেন নিজের ভাব তরঙ্গ রোধ করিলেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তিনি এই সংবাদের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। সম্রাট যখন বাহাদুর খাঁ কর্ত্তৃক লিখিত এক পত্রে জানিতে পারিলেন যে, দারা তাঁহার নিকট বন্দী রহিয়াছেন তখন আর তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। দরবারে তখন আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল।

বন্দীগণ দিল্লী পৌছিল। দারাকে অবজ্ঞাভাজন করিবার জন্য জনসাধারণ সমক্ষে প্রদর্শন করা হইল। এই উপেক্ষিত ব্যক্তিই যে দারা ইহা পুরবাসী সকলকে নিঃসন্দেহ-রূপে জানাইবার উদ্দেশ্যেই সম্রাট আওরংজীবের এই ব্যবস্থা। এইরূপ করিলে ভবিষ্যতে কোন কৃত্রিম দারা উদ্ভূত হইয়া প্রজাবর্গের সাহায্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। সহরের প্রধান রাজপথ দিয়া বন্দীদিগকে লইয়া যাওয়া হইল। ধূলায় ধূসরিত এক হস্তিনীর পৃষ্ঠে, নগ্ন হাওদার উপর দারাকে বসান হইল। পার্শ্বে তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয় পুত্র সিপির সুকোর আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। উভয়ের পশ্চাতে নিষ্ঠুরতার প্রতীক ভীষণকায় নজর বেগ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে উপবিষ্ট। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সিংহাসনের নির্ব্বাচিত উত্তরাধি-কারীর পরিধানে আজ এক মোটা পরিচ্ছদ; তাহাও আবার পর্য্যটনজনিত ধূলা ও মলিনতায় পরিপূর্ণ! শিরোদেশে ভিখারীর উপযোগী কাল রঙের এক অপরিষ্কার উষ্ণীষ! পিতাপুত্রের সুকোমল অঙ্গ আজ অলঙ্কার বিহীন! পাদদেশ লৌহ নিগড়ে বদ্ধ, কিন্তু দুইটি কর শৃঙ্খলমুক্ত। সেই পুরাতন দৃশ্যপট—সেই চিরপুরাতন রাজপথ, অট্টালিকা সমূহ ও বৃক্ষ শ্রেণী; এমন কি, প্রত্যেক ধূলিকণা পর্য্যন্ত সাহজাদার স্মৃতির সহিত বিজড়িত। সম্রাটের প্রিয়তম পুত্র দারা একদিন কতই না গৌরব ও মর্য্যাদার সহিত কতবারই না এই পথে যাতায়াত করিয়াছেন। আর আজ তাঁহার এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের দিনে, আগষ্ট মাসের দুঃসহ উত্তাপের মধ্যে এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় সেই চিরপরিচিত স্থান দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল দারুণ অপমানে মৃতপ্রায় সাহজাদা মুখ উত্তোলন করিতে পারিলেন না। নিষ্পিষ্ট পেলব বৃক্ষশাখার ন্যায় তিনি বসিয়াছিলেন। এমন সময় পথের পার্শ্বে এক ভিখারীর করুণ চীৎকারে দারা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ভিখারী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এই দীনহীন ভিখারীকে কি স্মরণ হয় সাহজাদা? তুমি যখন ক্ষমতার শিখরদেশে অধিষ্ঠিত ছিলে, এই দীন দরিদ্র এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষার জন্য লালায়িত কাঙ্গালকে কখনও তুমি বিমুখ কর নাই; আর, আজ—বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—তোমার নিজের এমন কিছুই নাই যাহা এই দরিদ্রকে দান

করিতে পার!" সাহজাদা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্কন্ধ হইতে নিজের উত্তরীয় উন্মোচন করিয়া ভিখারীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

সাহজাদার বাহ্যিক আড়ম্বর ও অদ্ভুত দানশীলতার জন্য নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। সুতরাং এই দুর্দ্দিনে তাঁহার এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে সকলেই শোকাকুল হইল। পুরবাসীগণের মনঃকষ্ট তাহাদের অন্যান্য হৃদয়বৃত্তি ভাসাইয়া লইয়া গেল। পথের উভয় পার্শ্ব লোকে লোকারণ্য হইল। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি শিশু সকলেই দারার দুর্গতির জন্য ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া মনে হইল যেন তাহাদেরই কোন বিপদ ঘটিয়াছে। কিন্তু হায়, বন্দীকে সাহায্য করিবার কোনই উপায় নাই। বন্দীদিগের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া উন্মুক্ত শাণিত তরবারি হস্তে অশ্বারোহী সিপাহীর দল ও তীরন্দাজগণ ধনুকের ছিলায় তীর রোপন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেছিল। আর, সর্ব্বাগ্রে সেনাপতি বাহাদুর খাঁ হস্তীপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতেছিলেন। এইরূপে সমস্ত সহর প্রদক্ষীণ করাইয়া বন্দীদিগকে খাওয়াশপুরা প্রাসাদে কারারুদ্ধ করা হইল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময়, দারার সম্বন্ধে কি করা হইবে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য, আওরংজীব তাঁহার মন্ত্রীদের আহ্বান করিলেন। দানিশমন্দ খাঁ দারার পক্ষ হইয়া সাহজাদার প্রাণরক্ষার জন্য অনেক তর্কবিতর্ক করিলেন। কিন্তু, সায়েস্তা খাঁ, মুহম্মদ আমিন খাঁ ও বাহাদুর খাঁর মত হইল যে, ইসলাম ধর্ম্ম ও দেশের হিতের জন্য দারাকে মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া উচিত। অন্তঃপুর হইতে কনিষ্ঠ রাজনন্দিনী সাহজাহান-দুহিতা রৌশনারাও আওরংজীবের নিকট দারার মৃত্যু কামনা করিলেন। সুতরাং দারার যাহাতে প্রাণরক্ষা হয় এই ইচ্ছা অনেকের ভিতরে ভিতরে থাকিলেও সাহজাদী রৌশনারার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহই কিছু বলিতে সাহস করিল না। আওরংজীবের বেতন ভোগী মোল্লারা ফতোয়া (বিচার আজ্ঞা) দিলেন যে, দারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

হতভাগ্য সাহজাদা নিজের প্রাণরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। তিনি সম্রাটের নিকট সালিশি করাইলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। অবশেষে তিনি এই প্রার্থনা পত্র সম্রাট আওরংজীবকে লিখিলেন, "হে আমার সম্রাট ভ্রাতা! সিংহাসন লাভ করিবার আর কোন ইচ্ছাই আমার নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি ও তোমার পুত্রেরা এই সিংহাসন সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। আমাকে বধ করিবার যে ইচ্ছা তুমি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছ ইহা ন্যায়-সঙ্গত নহে। দয়া করিয়া, আমাকে একটি বাসোপযোগী বাটী দাও ও আমার সেবা করিতে পারে এমন এক পরিচারিকা আমার জন্য নিযুক্ত করিয়া দাও। আর আমি কিছুই চাহি না। তোমার এ উপকার আমি কখন জীবনে বিস্মৃত হইব না। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন তোমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমি প্রার্থনা করিব। আমার প্রাণভিক্ষা দাও!" দারার আবেদনপত্রের এক পার্শ্বে আওরংজীব স্বহস্তে লিখিলেন, "তুমিই প্রথমে অন্যায়রূপে সিংহাসন অধিকার করিতে চাহিয়াছিলে। সমস্ত গোলযোগের মূলে তুমিই ছিলে।" দারার আবেদন অগ্রাহ্য হইল।

যে অপরাধ দারা করিয়াছেন তাহার ক্ষমা নাই! কিঞ্চিদধিক ষোড়শ বর্ষ কাল তিনি আওরংজীবের সুখ শান্তি, আশা ভরসা সমস্তই নষ্ট করিয়া আসিতেছেন। আওরংজীবকে তিনি পিতার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার কূট কৌশল ব্যর্থ করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট কুমন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে, আর ইহার ফলে সাহজাহানের নিকট আওরংজীব তিরস্কৃত হইয়াছেন। দারা আওরংজীবের বিরুদ্ধে গোলকোণ্ডা ও বিজাপুরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। আওরংজীবের প্রত্যেক শত্রুই দারার নিকট সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে। দারার কর্ম্মচারীরা আওরংজীবকে অপমানে ব্যথিত করিয়াছে, অথচ দারা তাহার কোনই প্রতিকার করেন নাই। এতদিন—এই সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসর কাল—আওরংজীব এই সকল অত্যাচার, অবমাননা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছেন। আর, আজ, তাঁহার প্রতিশোধ লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ সুযোগ তিনি কি করিয়া পরিত্যাগ করেন?

বিশ্বাসঘাতক মালিক জিউন সম্প্রতি একহাজারি পদে উন্নীত ও বখ্‌তিয়ার খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। একদিন

সে দরবার অভিমুখে যাইতেছিল, এমন সময়ে দিল্লীর অধিবাসীরা তাহাকে আক্রমণ করিল (৩০এ আগষ্ট)। এই ঘটনাই দারার মৃত্যুর কারণ হইল। সেদিন রাত্রে কারাধ্যক্ষ নজর বেগ ও অপরাপর কতিপয় ক্রীতদাস খাওয়াসপুরা প্রাসাদের যে গৃহে দারা বন্দী ছিলেন, সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। আগমণকারীদিগের নতজানু হইয়া দারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ?" তাহারা বলিল, "আমরা সিপির-সুকোকে অন্যত্র লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।" বালক সিপিরও নতজানু হইয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। নজর বেগ রুক্ষ স্বরে বালককে দাঁড়াইতে আদেশ করিল। বালক আরও ভীত হইয়া পিতার পাদদেশ জড়াইয়া ধরিল। পিতা-পুত্র পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে, আততায়ীরা বালক সিপিরকে পিতার বাহুপাশ হইতে সবলে পৃথক করিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট জানিতে পারিয়া দারা তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করিলেন। তিনি এক শাণিত ছুরিকা লইয়া আততায়ীদের আক্রমণ করিলেন। ফলে, হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল ও দারাকে সকলে মিলিয়া নিরস্ত্র করিল। পরে, সব শেষ হইল! প্রকোষ্ঠে রক্তের ঢেউ খেলিয়া গেল। দারার দ্বিখণ্ডিত মস্তক আওরংজীবের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি ইহা দেখিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন,—"জীবিতাবস্থায় আমি এই স্বধর্ম্মত্যাগী কাফেরের কখনও মুখ দর্শন করি নাই। তাহার মৃত্যুর পর তাহার দ্বিখণ্ডিত মস্তক দর্শন করিতে চাহি না।"

আওরংজীবের আজ্ঞানুসারে দারার মৃতদেহ হস্তীর পৃষ্ঠে বসাইয়া রাজপথ দিয়া দ্বিতীয়বার লইয়া যাওয়া হইল। পরে সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের গম্বুজের নিম্নে দারার নশ্বর দেহ সমাধি দেওয়া হইল।

৫

দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান সুকোর বিষয়ে এখন কিছু বলা যাইবে। বেনারসের নিকট সুজাকে পরাজয় করিয়া, বিহার হইতে মুঙ্গের পর্য্যন্ত খুল্লতাতকে অনুসরণ করিবার সময় (মে, ১৬৫৮) সুলেমান সুকো পিতার নিকট শীঘ্র ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ পাইয়াছিলেন। ধর্ম্মৎ যুদ্ধে আওরংজীবের নিকট দারার পরাজয় হেতু সাহজাদা সুলেমান পিতার নিকট যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই কারণে সুলেমান খুল্লতাতের সহিত শীঘ্র সন্ধি করিয়া পিতার নিকট ফিরিলেন। পথে, এলাহাবাদ হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধ একশত মাইল পশ্চিমে সাহজাদা সংবাদ পাইলেন যে, সামুগড় যুদ্ধে তাঁহার পিতা পুনরায় আওরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সৈন্যেরা বিচলিত হইল। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুই সেনাপতি জয়সিং ও দিলির খাঁ ও অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীরা সাহজাদাকে পরিত্যাগ করিয়া আওরংজীবের পক্ষ লইল। সুলেমানের এলাহাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন কালে মাত্র ছয়হাজার সিপাহী তাঁহার সহিত যাত্রা করিল (৪ঠা জুন)। কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া এক সপ্তাহ সময় তিনি বৃথা নষ্ট করিলেন। তাঁহার সহিত মূল্যবান জিনিষপত্র, বাসন ও পুরমহিলারা ছিল। সাহজাদা উতলা হইলেন। অবশেষে, তাঁহার প্রধান অনুচরবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, বারহার সৈয়দ বংশধরের পরামর্শানুসারে সাহজাদার কাজ করা উচিত। সুলেমান দিল্লী সহরটিকে বেষ্টন করিয়া, গঙ্গার উত্তর তট দিয়া অগ্রসর হইয়া বারহার সৈয়দদিগের আবাস স্থান দোয়াবের মধ্যস্থল দিয়া যাত্রা করিবেন। পরে, পঞ্জাব প্রদেশে পিতার সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে পর্ব্বতের পাদমূলে নদী উত্তীর্ণ হইবেন।

নগিনা দেশের মধ্য দিয়া হরিদ্বারের অপরদিকে গঙ্গাকূলে অবস্থিত চণ্ডীনামক স্থানে সাহজাদা সুলেমান ছুটিলেন। প্রত্যহ বহু সংখ্যক সিপাহী তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। দিল্লী হইতে প্রেরিত আওরংজীবের সৈন্য, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে তাঁহার গতিরোধ করিল। সুতরাং সুলেমান আশ্রয় লাভের আশায় শ্রীনগরের দিকে ছুটিলেন। সাহজাদা কোন সৈন্য লইতে পারিবেন না, তবে তাঁহার সহিত তাঁহার পরিবারবর্গ ও মাত্র সতেরটি পরিচারক থাকিতে পারিবে, এই সর্ত্তে শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বী সিং

সুলেমানকে নিজের সহরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। পৃথ্বী সিং বিশেষ যত্ন সহকারে অতিথি সৎকার করিলেন। বিপদে পতিত রাজকুমারের যত্নের ত্রুটি হইল না। এই রাজার ব্যবহার ক্রমে অশিষ্ট হইলেও, সুলেমান এক বৎসর কাল তাঁহার নিরাপদ আশ্রয়ে বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করিলেন।

কিন্তু অবশেষে, আওরংজীব ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহোদরদিগকে পরাভূত করিয়া সুলেমানের বিপক্ষে অগ্রসর হইলেন। কাশ্মীর প্রদেশের রাজা যাহাতে সুলেমানকে সমর্পণ করেন এই উদ্দেশ্যে আওরংজীব রাজা রাজরূপকে পৃথ্বীর নিকট প্রেরণ করিলেন (জুলাই, ১৬৫৯)। কিন্তু প্রায় দেড়বৎসর কাল আওরংজীবের সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। পরে, জয়সিং, সম্রাটের আজ্ঞায় এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। জয়সিং পৃথ্বীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, সম্রাটের আজ্ঞা অমান্য করিলে মুঘলবাহিনী তাঁহার দেশ ধ্বংস করিয়া দিবে। কাশ্মীর নরপতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। আশ্রিতের সহিত তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিলেন না। কিন্তু বৃদ্ধ রাজার পুত্র ও কাশ্মীর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মেদিনী সিং ঘোর সংসারী ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, আওরংজীব নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পার্ব্বত্য রাজাদের কাশ্মীর আক্রমণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে তাঁহাদের এই অতিথিটিকে সম্রাটের নিকট সমর্পণ করিতে হয়। আর, এই কার্য্য করিলে সম্রাটের নিকট প্রচুর পারিতোষিক পাইবারও আশা আছে। সুতরাং, রাজকুমারের মন টলিল। তিনি সাহাজাদাকে ধরাইয়া দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ওদিকে, সুলেমান আশ্রয়দাতার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তুষারাবৃত পথের উপর দিয়া লদক দেশে পলায়ন করিলেন। তাঁহাকে অনুসরণ করা হইল। তিনি আহত অবস্থায় বন্দী হইলেন ও আওরংজীবের প্রতিনিধির হস্তে সমর্পিত হইলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁহাকে দিল্লী আনা হইল (জানুয়ারী, ১৬৬১)।

দিল্লী রাজপ্রাসাদের "দেওয়ানী খাস"-এ তাঁহাকে তাঁহার ভয়াবহ খুল্লতাতের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার অল্প বয়স, অনুপম রূপরাশি, সামরিক খ্যাতি ও এবম্বিধ দুর্গতি সভাসদবর্গের ও পুরমহিলাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। কেহই অশ্রুরোধ করিতে পারিল না। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সম্রাট সাহজাহানের জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম পৌত্র সুলেমান হয়তো একদিন এই কক্ষের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন, কিন্তু হায়, আজ সামান্য এক বন্দীর মত তিনি তথায় নীত হইয়াছেন!! সম্রাট মনে করিলেন সুলেমান মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ভীত হইয়াছেন, সেই জন্য সাহজাদার ভয় অপনোদন করিবার উদ্দেশ্যে আওরংজীব বাহ্যতঃ তাঁহার সহিত সদয় ব্যবহার করিলেন। আওরংজীব সুলেমানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বালক! স্থির হও। তোমার সহিত কোন নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইবে না। জগদীশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসী হইও না। তোমার পিতা স্বধর্ম্মত্যাগী 'কাফের' ছিলেন, সেই অপরাধে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তুমি ভয় পাইও না।" সাহজাদা কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্যবাদ প্রদানার্থ সম্রাটকে কুর্নীশ করিলেন, ও কিছু পরে, কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা! যদি 'পোস্তা' পান করাইয়া আমায় বধ করিবেন সাব্যস্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি করযোড়ে মিনতি করি, এইমাত্র আমার জীবনলীলার অবসান করুন।" তখন আওরংজীব ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বালক, তুমি নিশ্চিন্ত হও; এই পানীয় তোমাকে কখনও দেওয়া হইবে না।"

এই স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, উল্লিখিত "পোস্তা" সে যুগের এক পানীয়বিশেষ। পোস্তার বীজ পেষণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ইহা ভিজাইয়া রাখা হইত। সম্রাট, লোক-লজ্জার ভয়ে গোয়ালিওর কারাগারে বন্দী যে রাজকুমারকে প্রকাশ্যে বধ করিতে পারিতেন না, তাহাদিগকেই এই পানীয় সাধারণতঃ দেওয়া হইত। এই পোস্তা পানের ফলে, হতভাগ্য বন্দী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়িত, ধীরে ধীরে তাহাদের শারীরিক বল ও বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হইত, এবং পরে অচৈতন্য অবস্থায় জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

সোলেমান গোয়ালিওর-এর সেই ভীষণ সরকারী কারাগারে প্রেরিত হইলেন (জানুয়ারী)। সম্রাট তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন। বন্দীকে অতিরিক্ত মাত্রায় "পোস্ত" সেবন করাইয়া তাঁহার প্রাণবধ করা হইল, (মে, ১৬৬২)। যে পুষ্পকোরকের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছিল, সেই সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প আজ অকালে বৃন্তচ্যুত হইল। গোয়ালিওর পর্ব্বতের উপর, মোরাদের সমাধির পার্শ্বে, সুলেমানের মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হইল।

৬

সম্রাট সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র, সাহজাদা মুহম্মদ সুজা বাঙ্গলা দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সৎ প্রবৃত্তি এবং মধুর স্বভাব ছিল। আর, আমোদ প্রমোদে তাঁহার আসক্তি ছিল যথেষ্ট। সুদীর্ঘ সতের বৎসর কাল বাঙ্গলা দেশের সহজ-সাধ্য শাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সাহজাদা দুর্ব্বল, অলস ও অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পরিশ্রমী বা উদ্যমশীল ছিলেন না। চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার সে ক্ষমতা বা একত্র হইয়া কার্য্য করিবার সে শক্তি তাঁহার না থাকায়, বাঙ্গলার শাসন-পদ্ধতি ক্রমে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সৈন্যেরা অক্ষম হইয়া পড়িল। শাসন বিভাগে শিথিলতা দেখা দিল।

সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, সম্রাট সাহজাহানের পীড়ার সংবাদও তদ্রূপ, অতিরঞ্জিত হইয়া রাজমহলে সাহজাদা সুজার নিকট পৌছিল। সে সময়ে রাজমহল বাঙ্গলার রাজধানী। সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পাইয়া সুজা সম্রাট হইয়া বসিলেন, ও "আবুল ফৌজ নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ তৈমুর ৩য় আলেকজান্দার ২য় সাহ সুজাগাজী"— এই প্রকাণ্ড উপাধি গ্রহণ করিলেন।

সাহজাদা এক বিরাট বাহিনী, উৎকৃষ্ট কামানশ্রেণী ও বাঙ্গালাদেশে নির্ম্মিত কতকগুলি জলযান লইয়া যাত্রা করিলেন, ও শীঘ্রই বেনারস পৌছিলেন (জানুয়ারী, ১৬৫৮)। ইতিমধ্যে, দারা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান সুকোর অধীনে এবং দক্ষ ও প্রবীণ সেনাপতি জয়সিং ও দিলির খাঁর সাহচর্য্যে বাইশ হাজার সৈন্য সুজার বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন।

সুলেমান একদিন খুব প্রাতঃকালে বেনারসের পাঁচ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বাহাদুরপুর নামক স্থানে সুজার শিবির আক্রমণ করিলেন (ফেব্রুয়ারী)। নিদ্রিত বাঙ্গলা দেশের সিপাহীরা ও তাহাদের সেনাপতিরা, এই অতর্কিত আক্রমণে, নিজের নিজের অঙ্গাবরণ পরিধান করিবার সময় পাইল না। সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সুজা হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহুকষ্টে বিপক্ষের বেষ্টনী হইতে বাহির হইলেন ও জলযানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নৌকা হইতে গোলাবর্ষণ করায় শত্রুপক্ষ অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না। বিজেতা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের শিবির ও অন্যান্য জিনিষপত্র লুট করিল।

ভীত সৈন্য স্থলপথে সসারাম হইয়া পাটনা পলায়ন করিল। পথে, গ্রামবাসীরাও তাহাদের লুট করিল। অনুসরণকারী সম্রাট বাহিনীর আগমন সংবাদে সুজা মুঙ্গের পলায়ন করিলেন, ও পরে, তিনি পরিখা খনন করাইয়া ও কামান শ্রেণী বসাইয়া বিপক্ষের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। ওদিকে বিজয়ী সাহজাদা সুলেমান মুঙ্গের হইতে পনের মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সুরজগড় নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া মাসাধিক কাল অমূল্য সময় নষ্ট করিলেন। পরে, ধর্ম্মৎ যুদ্ধে তাঁহার পিতার পরাজয় হইয়াছে এই সংবাদে সুলেমানকে সুজার সহিত সন্ধি করিতে হইল। সুলেমান বাঙ্গালাদেশ, বিহার প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চল ও উড়িষ্যা প্রদেশ সুজাকে অর্পণ করিয়া, আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

এইরূপে সুজা সে যাত্রা বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। তিনি বিশ্রাম লাভ করিবার অবকাশ পাইলেন। ইতিমধ্যে আওরংজীব দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করিয়া (২১শে জুলাই, ১৬৫৮) সুজাকে এক পত্র লিখিলেন। এই পত্রের প্রতি-ছত্রে আওরংজীবের ভ্রাতৃ প্রেমের (?) পরিচয় ছিল! পত্রে লেখা ছিল, "বিহার প্রদেশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় আপনি প্রায়ই সম্রাট সাহজাহানের নিকট আবেদন করিতেন। আমি এই প্রদেশ আপনাকে অর্পণ করিলাম। আপনি এখন নির্ব্বিঘ্নে শাসন কার্য্যে রত থাকুন ও আপনার নষ্ট শক্তি পুনরুদ্ধার করুন। দারার সম্বন্ধে যাহা হউক একটা কিছু

ব্যবস্থা করিয়া, পরে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। আমি আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী কনিষ্ঠ ভ্রাতা—আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নাই!" কিন্তু সুজার অজানা কিছুই ছিল না। তিনি আওরংজীবকে বিলক্ষণ চিনিতেন। আওরংজীব তাঁহার স্নেহশীল পিতা বা অপরিণামদর্শী কনিষ্ঠ সহোদর মোরাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহা তিনি বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং তিনি মোহে না পড়িয়া আওরংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে দারাকে অনুসরণ করিবার জন্য আওরংজীব সুদূর পঞ্জাব প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন। আগ্রা আক্রমণ করিয়া সাহজাহানকে মুক্তি দিবার ইহাই প্রকৃষ্ট অবসর। সুজা পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী, কামান ও নৌকা লইয়া পাটনা হইতে রওনা হইয়া (অক্টোবর, ১৬৫৮), এলাহাবাদ হইতে তিন দিনের পথে অবস্থিত খাজওয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। আওরংজীবের পুত্র সুলতান মুহম্মদ এইস্থানে সুজার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ওদিকে, আওরংজীব মুলতান হইতে দারার অনুসরণে নিবৃত্ত হইয়া দিল্লী ফিরিলেন (নভেম্বর) ও এলাহাবাদের নিকট অবস্থিত নিজের বাহিনীকে লোক ও অর্থবল পাঠাইয়া সাহায্য করিলেন। এখন আগ্রার দিকে যাইবার পথ বন্ধ হইল। পরে, আওরংজীব, সুজা যেস্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন সেই স্থান হইতে মাত্র আট মাইল পশ্চিমে সুলতান মুহম্মদের সহিত যোগদান করিলেন (জানুয়ারী, ১৬৫৯)। সেই দিবস মীরজুমলা দাক্ষিণাত্য হইতে সম্রাটের নিকট পৌঁছিলেন।

৭

আওরংজীব নিখুঁত ব্যবস্থা করিয়া অগ্রসর হইলেন ও শত্রুশিবির হইতে এক মাইল দূরে ছাউনী করিলেন। আওরংজীবের প্রত্যেক সিপাহী স্ব স্ব বর্ম্ম পরিধান করিয়া ভূমির উপর শয়ন করিত। তাহাদের শিয়রে অশ্ব প্রস্তুত থাকিত। মীরজুমলা দুই বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী এক উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়া বহু কষ্টে চল্লিশটি কামান ইহার উপর উঠাইলেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা সমস্ত রাত্রি সজাগ রহিল।

যুদ্ধের দিন, সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে আওরংজীবের সৈন্যের সম্মুখভাগে হঠাৎ এক কলরব উত্থিত হইল (৫ই জানুয়ারী)। ক্রমে সমগ্র শিবিরে গোলমাল দেখা দিল। মনুষ্যের চীৎকার ও ক্রন্দনে এবং ধাবিত অশ্বের পদশব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। অন্ধকারে গোলমাল আরও বৃদ্ধি পাইল। মহারাজ যশোবন্ত সিং এই বিপদের মূলে ছিলেন। ইনি সম্রাট বাহিনীর দক্ষিণ অংশের সেনাপতি ছিলেন। বিনা কারণে নিজে উপেক্ষিত হইয়াছেন মনে করিয়া ইনি প্রতিশোধ লইবার জন্য এক অভিসন্ধি করিলেন। সুজাকে গোপনে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, রাত্রিশেষে তিনি সম্রাট সৈন্য আক্রমণ করিবেন, এবং আওরংজীব যখন তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য ছুটিয়া যাইবেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যেন সুজা অগ্রসর হইয়া দুই শত্রু সৈন্যের মধ্যে অবস্থিত সম্রাট বাহিনী নির্ম্মূল করেন। সুতরাং যশোবন্ত দ্বিপ্রহর রাত্রের কিছু পরে চৌদ্দ হাজার রাজপুত সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহির হইলেন। পথে সাহজাদা মুহম্মদ সুলতানের শিবির আক্রমণ করিয়া যাহা পাইলেন সমস্ত লুঠ করিলেন। সম্রাট শিবিরেরও সেই এক দশা হইল। রাজপুত সৈন্য আগ্রার দিকে ছুটিল। এই আকস্মিক ঘটনার জন্য আওরংজীবের সৈন্যের সম্মুখভাগে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

নিজের অসাধারণ ধৈর্য্য ও সুজার সংশয়, এই দুই কারণে আওরংজীব সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সুজা যশোবন্তের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলেন; আওরংজীবের সৈন্যে যে তুমুল শব্দ উত্থিত হয় তাহাও তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই রাত্রে নিজের শিবির হইতে বাহির হইলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্যই আওরংজীব ও যশোবন্তের ইহা এক চাতুরী মাত্র।

নিজের শিবিরে সম্রাট উপাসনায় নিযুক্ত, এমন সময় যশোবন্তের আক্রমণ ও পলায়ন সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তখন সম্রাট কোন কথা না বলিয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, "যদি যশোবন্ত গিয়া থাকে, তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই। তাহাকে যাইতে দাও।" ক্রমে উপাসনা শেষ হইল। সম্রাট বাহিরে আসিলেন। তিনি

পদস্থ কর্ম্মচারীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই ঘটনা আমাদের উপর ভগবানের অনুগ্রহের পরিচয় দিয়া থাকে।' যদি' যুদ্ধের সময় এই কাফের বিশ্বাসঘাতকতা করিত তাহা হইলে আমাদের কী সর্ব্বনাশই না হইত। তাহার পলায়নে আমাদের মঙ্গল হইয়াছে।".

আওরংজীব অবিচলিত ভাবে নিজের স্থানে রহিলেন, ও সৈন্যের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতে দিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন সেনানায়কদিগের উপর আজ্ঞা হইল, তাঁহারা যেন নিজের নিজের স্থান ছাড়িয়া না গমন করেন, এবং ছত্রভঙ্গ সিপাহীদের যেন একত্র করেন। ক্রমে ভোরের আলো দেখা দিলে পলাতক বহু বিশ্বস্ত পদস্থ কর্ম্মচারী ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সম্রাটের পক্ষ গ্রহণ করিল। সম্রাট পক্ষের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক, এবং সুজার পক্ষে মাত্র পঁচিশ হাজার।

৮

সুজা জানিতেন তাঁহার পক্ষে যুদ্ধের সাধারণ রীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়। বিপক্ষের ব্যবস্থা অনুযায়ী, শত্রু সৈন্যের এক বিভাগের বিপক্ষে নিজের এক বিভাগ সম্মুখীন করা সহজসাধ্য নহে। তাঁহার এই অল্প সংখ্যক সৈন্য বিশাল শত্রুবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। সুতরাং সুজা এক নূতন প্রণালীতে সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। কামান শ্রেণীর পশ্চাতে এক পংক্তিতে তাঁহার সমস্ত সৈন্য সজ্জিত হইল। প্রকৃত সেনানায়কের মত তিনিই প্রথমে আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। কারণ, আক্রমণকারী সৈন্যই চিরকাল বিপক্ষ সৈন্যের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে।

বেলা আটটার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে তোপ, হাউই ও বন্দুক ছোঁড়া হইল। পরে তীর চলিল। শেষে, সুজার সেনাপতি সৈয়দ আলম নিজের সম্মুখে তিনটি উন্মত্ত হস্তী পরিচালন করিয়া সম্রাট বাহিনীর বাম অংশ আক্রমণ করিল। ফলে, এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কেহই দাঁড়াইতে পারিল না। সম্রাট সৈন্যের বাম অংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এইবার সম্রাট-বাহিনীর মধ্য অংশেও আতঙ্কের সৃষ্টি হইল; সিপাহীরা এধার ওধার দৌড়াইল। সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে এই মিথ্যা সংবাদ হঠাৎ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায়, অনেকে পলায়ন করিল। অবস্থা আরও মন্দ হইল। এবার, আলমের সৈন্য সম্রাটের মধ্য অংশ আক্রমণ করিল। এই স্থানে মাত্র দুই হাজার সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। সুতরাং ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য রক্ষিত সম্রাট পক্ষের দুই দল সৈন্য অগ্রসর হইয়া শত্রুর গতিরোধ করিল। সম্রাট হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার সৈন্যের বিধ্বস্ত বাম অংশকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সৈয়দ আলম আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া যে পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া সে পলায়ন করিল।

কিন্তু হস্তী তিনটি প্রবল বেগে অগ্রসর হইতে থাকিল। আহত হইয়া তাহারা ভীষণতর হইল। অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। সম্রাট পশ্চাৎপদ হইলে তাঁহার সমগ্র সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইবে। পর্ব্বতের ন্যায় সম্রাট দণ্ডায়মান রহিলেন। স্বপক্ষের হস্তীর পলায়ন রোধ করিবার জন্য তাহাদের পাদদেশ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিলেন। সম্রাটের আজ্ঞায় আক্রমণকারী হস্তীর মাহুতকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়া হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সম্রাট পক্ষের এক সাহসী মাহুত ক্ষিপ্রতার সহিত সেই হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আরোহীহীন পশুটিকে শান্ত করিল। সম্রাট নিঃশ্বাস লইবার অবসর পাইলেন। তিনি, তখন, নিজের সৈন্যের দক্ষিণ অংশকে সাহায্য করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। সেই অংশে, তাঁহার সৈন্যেরা শত্রুর আক্রমণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতেছিল। কিন্তু সঙ্কটকালে এবং ভীষণ বিপদেও সম্রাট নিজের ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারাইতেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি প্রথমে বাম দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এখন যদি তিনি হঠাৎ দক্ষিণ দিকে আক্রমণ করেন তাহা হইলে তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহার এই আবর্ত্তন গতিকে পলায়ন বলিয়াই মনে করিবে। সুতরাং, সম্রাট নিজের কি উদ্দেশ্য তাহা চরের দ্বারা তাঁহার সৈন্যের সম্মুখ অংশের সেনাপতিদের বলিয়া পাঠাইলেন এবং তাহারা যাহাতে ভীত না হইয়া যুদ্ধ করে ইহাও বিশেষ ভাবে আজ্ঞা করিলেন।

পরে, সম্রাট স্বয়ং শত্রু সৈন্যের দ্বারা প্রবল বেগে আক্রান্ত তাঁহার সৈন্যের দক্ষিণ অংশকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সাহায্য পাইয়া সম্রাট-বাহিনীর দক্ষিণ অংশ বিপক্ষকে পাল্টা আক্রমণ করিয়া তাহাদের হটাইয়া দিল।

ইতিমধ্যে জুলফিকর খাঁ ও সুলতান মুহম্মদ সুজার সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া অগ্রসর হইলেন ও বিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিলেন। আওরংজীবের গোলাগুলি ও হাউইএর মুখে শত্রু সৈন্য দাঁড়াইতে পারিল না। তখন, আওরংজীবের সৈন্য পুঞ্জীভূত কৃষ্ণকায় জলধরের মত সুজার সৈন্য বেষ্টন করিল। সুজা নিরুপায় হইয়া হস্তী পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

এইবার যুদ্ধ শেষ হইল। হস্তী পৃষ্ঠে সুজাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সৈন্যেরা মনে করিল যে, সাহজাদা মারা পড়িয়াছেন। তখন তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। সুজা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ঘোড়া ছুটাইয়া বাহির হইলেন। সুজার পুত্রেরা, সেনাপতি সৈয়দ আলম এবং অল্পসংখ্যক সৈন্য তাঁহার সঙ্গ লইল। বিজয়ী সম্রাট-সৈন্য সুজার সমস্ত শিবির, জিনিষপত্র, ১১৪টি কামান এবং এগারটি হস্তী লুঠ করিল।

৯

খাজওয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আওরংজীব সুজাকে অনুসরণ করিবার জন্য সাহজাদা মুহম্মদ সুলতানের অধীনে এক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি মীরজুমলা এই দলে যোগদান করায় সাহজাদা মুহম্মদের সৈন্য সংখ্যার তিন হাজার হইল। সুজা মুঙ্গের পলায়ন করিলেন এবং এইস্থানে প্রায় একপক্ষ কাল শিবির স্থাপন করিলেন। (ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ)। গঙ্গানদী এবং খড়্গপুর গিরিশ্রেণীর মধ্যস্থিত, আড়াই মাইল প্রস্থ এক সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডের উপর এই মুঙ্গের সহর অবস্থিত ছিল। পাটনা হইতে বাঙ্গলা দেশে যাইতে হইলে মুঙ্গের দিয়াই সকলকে যাইতে হইত। সুজা নদী এবং গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রাচীর ও পরীখা নির্ম্মাণ করিয়া অনুসরণকারী সম্রাট-বাহিনীর গতিরোধ করিলেন। ত্রিশ গজ দূরে এক একটি বুরুজ নির্ম্মিত হইল। প্রত্যেক বুরুজে কামান বসান হইল ও সৈন্য রাখা হইল।

মীরজুমলা মুঙ্গের পৌছিয়া সদর রাস্তা বন্ধ দেখিলেন (মার্চ্চ)। তিনি, খথন খড়্গপুরের রাজাকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া তাহার নেতৃত্বে, মুঙ্গের দুর্গের দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত গিরিশ্রেণী এবং অরণ্যের মধ্য দিয়া সুজা যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন। সুজা নিরুপায় হইয়া সাহেবগঞ্জে পলায়ন করিলেন। সাহেবগঞ্জ যাইবার পথে এক সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম পড়ে। সুজা এই পথটি প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করিলেন। কিন্তু সম্রাট-বাহিনী বীরভূম ও ছাটনগরের আফগান জমিদারকে হস্তগত করিয়া তাহার পথপ্রদর্শনে মুঙ্গের জিলার দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশ বেষ্টন করিয়া সিউরী পৌছিল।

দারা আজমীরের নিকট যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন ও তিনি রাজপুত রাজাগুলির উপর প্রতিশোধ লইতেছেন, এই মিথ্যা জনরবের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, মীরজুমলার অধীন রাজপুত সৈন্য তাঁহার পক্ষ ছাড়িয়া নিজেদের দেশে ফিরিল। এইরূপে সম্রাট পক্ষে প্রায় আটহাজার সিপাহী হ্রাস পাইলেও, সুজার সৈন্য সংখ্যার তুলনায় সম্রাটবাহিনী দ্বিগুণ ছিল।

ইতিমধ্যে সুজা সাহেবগঞ্জ হইতে রাজমহল (মার্চ্চ) এবং সেখান হইতে মালদহ পলায়ন করিলেন, (এপ্রেল)। আলাওর্দ্দী নামে সুজার জনৈক অমাত্য মীরজুমলার পক্ষ লইবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করিল। এই অপরাধের জন্য সাহজাদা তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন। সম্রাট-বাহিনী রাজমহল অধিকার করিল। এইরূপে গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত সমস্ত ভূমি সুজার হস্তচ্যুত হইল।

উভয় পক্ষে এইবার তুমুল সংগ্রাম চলিল। সুজার পক্ষে মাত্র পাঁচ হাজার সিপাহী অবশিষ্ট রহিল। মীরজুমলার সৈন্য সংখ্যা সাহজাদার সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক দাঁড়াইল। মীরজুমলার প্রত্যেক সিপাহী সুজার প্রত্যেক সিপাহী অপেক্ষা যুদ্ধে নিপুণতর ছিল। স্থলযুদ্ধে তাহারা অধিকতর দক্ষ ছিল। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের চতুর্দ্দিকেই নদী

বা জলপ্রণালী। জলের উপর দিয়া যাতায়াত করিবার জন্য মীরজুমলার একটিও নৌকা ছিল না। ইহার উপর, সুজার কামানের তুলনায় মীরজুমলার কামানগুলি সংখ্যায় অল্প ও আকারে ছোট ছিল। সুজার কামানশ্রেণী ইউরোপীয় এবং বর্ণশঙ্কর গোলান্দাজদিগের পরিচালনায় বিশেষ কার্য্যকরী ছিল। সুজার অধীনে বাঙ্গলাদেশের জলযান সমূহ থাকায়, তিনি ইচ্ছামত নদী পার হইতে বা সৈন্য স্থানান্তরিত করিতে পারিতেন, বা প্রয়োজন মত বিপক্ষের শিবিরগুলির উপর গোলাবর্ষণ করিতে পারিতেন। এই কারণে, সুজার অল্পসংখ্যক সৈন্য খুব গতিশীল এবং কার্য্যতৎপর ছিল। স্থলযুদ্ধে মীরজুমলার সৈন্যরা কার্য্যকুশল হইলেও, নৌকার অভাবে সেনাপতি কিছুই করিতে পারিলেন না।

সুজা, গৌড়এর চারিমাইল পশ্চিমে শিবির স্থাপন করিলেন। মীরজুমলা যাহাতে নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারেন এই উদ্দেশ্যে সাহজাদা গঙ্গার পূর্ব্ব কূল স্থানে স্থানে পরিখা নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু সাহজাদার চেষ্টা সফল হইল না। মীরজুমলা বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত দেশান্তর হইতে নৌকা সংগ্রহ করিলেন। আওরংজীবের আজ্ঞাক্রমে পাটনার শাসনকর্ত্তার অধীনে এক সৈন্য বঙ্গদেশে পাঠান হইল। রাজমহল হইতে তের মাইল দক্ষিণে, নিজের আড্ডা দোগাচী হইতে, মীরজুমলা উপর্য্যুপরি দুইবার সুজাকে আক্রমণ করিলেন।

গঙ্গার সমগ্র পশ্চিমকূলে দিল্লীশ্বরের সৈন্য ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সাহজাদা মুহম্মদ সুলতান, মুহম্মদ মোরাদ বেগ, জুলফিকর খাঁ, ইসলাম খাঁ, আলী কুলী ও মীরজুমলা প্রত্যেকেই সৈন্য লইয়া স্থানে স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এইবার, মীরজুমলা বিপক্ষ সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন (মে, ১৬৫৯), কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই যুদ্ধে সম্রাট পক্ষীয় চারিজন পদস্থ কর্ম্মচারী ও শতাধিক সিপাহী প্রাণ দিল ও এতদ্ব্যতিরেকে পাঁচশত সৈন্য বন্দী হইল।

সাহজাদা মুহম্মদ সুলতান অকস্মাৎ সুজার নিকট পলায়ন করিলেন (জুন)। অনেকদিন হইতেই মীরজুমলার রক্ষণাবেক্ষনে থাকা সাহজাদার মনঃপূত হইতেছিল না। তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এখন স্বীয় কন্যার গুলরুখ বাণুর সহিত মুহম্মদের বিবাহ দিবেন ও তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন গোপনে এই আশা দিয়া, সুজা এই অপরিণামদর্শী যুবককে নিজের দলে আনিলেন। এই সংবাদ মীরজুমলার নিকট পৌছিলে, তিনি পলাতক সাহজাদার নেতৃবিহীন সৈন্যদের ভরসা দিয়া তাহাদের মধ্যে সাহস ও আশার সঞ্চার করিলেন। এক যুদ্ধসভা বসিল। এই সভায় স্থির হইল যে, অন্যান্য সেনানায়কেরা মীরজুমলার আজ্ঞাধীন হইয়া কার্য্য করিবেন।

এই ঘটনার অনতিবিলম্বে মুষলধারায় বারিপাত হওয়ায় যুদ্ধ স্থগিত রহিল। বৃষ্টির জন্য রাজমহলের আশপাশ দেখিতে এক বিস্তীর্ণ হ্রদের মত হইল। সুজা উত্তর পশ্চিমদিকের গিরিশ্রেণীর রাজাকে উৎকোচ দিয়া সেই অঞ্চল হইতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিলেন। সুজার নৌকাশ্রেণী জলপথ বন্ধ করিল। সুতরাং, রাজমহলে অবস্থিত সম্রাটবাহিনী খাদ্যাভাবে বিশেষ কষ্টে পড়িল। এইরূপ অবস্থায়, সুজা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বিপক্ষের মালপত্র শুদ্ধ রাজমহল সহর অধিকার করিলেন (আগষ্ট)।

১০

কয়েকমাস পরে, সুজা রাজমহল হইতে মীরজুমলার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন (ডিসেম্বর)। মুঘল সেনাপতি সে সময়ে মুরশিদাবাদ জিলায় অবস্থিত জঙ্গীপুর সহর হইতে বিয়াল্লিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থান করিতেছিলেন। এই আক্রমণের ফলে, মীরজুমলা ক্ষতি স্বীকার করিয়া মুরশিদাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুজাও নশীপুর রওনা হইলেন। ওদিকে বিহারের শাসনকর্ত্তা দায়ুদ খাঁ সৈন্যসহ যাত্রা করিয়া সুজার সৈন্য পরাস্ত করিলেন। সুজা দায়ুদ খাঁর বিরুদ্ধে টাণ্ডা অভিমুখে অগ্রসর হইলে, মীরজুমলা সাহজাদাকে অনুসরণ করিয়া টাণ্ডা আয়ত্ত করিলেন।

এইবার মীরজুমলা এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। সুজার সৈন্য রাজমহলের অপর পার্শ্বে অবস্থিত সামদা দ্বীপ হইতে টাণ্ডা পর্য্যন্ত এক পংক্তিতে অবস্থান করিতেছিল।

মীরজুমলা স্থির করিলেন যে, তিনি রাজমহল, আকবরপুর এবং মালদার পথে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়া অকস্মাৎ দক্ষিণে রওনা হইবেন এবং পূর্ব্বদিক হইতে শত্রু সৈন্যকে আক্রমণ করিবেন। পাটনা হইতে আনীত ১৬০টি নৌকার সাহায্যে রাজমহল হইতে দশ মাইল উত্তরে সেনাপতি তাঁহার সৈন্য নদী পার করিয়া দায়ুদখাঁর সহিত যোগদান করিলেন।

প্রথম হইতেই সম্রাটের বাহিনী সুজার সৈন্য অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ছিল। এখন দক্ষিণে সুজার পলায়ন পথ বন্ধ হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৬৬০)। ওদিকে সাহজাদা মুহম্মদ সুলতান সুজার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিলেন। পিতার পক্ষ পরিত্যাগ করা জনিত অপরাধ হেতু সাহজাদা তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় কারাগারে কাটাইলেন।

মীরজুমলা স্থির করিলেন, এইবার একচালে সুজাকে পিষিয়া মারিতে হইবে। সেনাপতি নিজের আড্ডা হইতে বাহির হইয়া মহানন্দা নদীর খেয়াঘাটের নিকট শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া মীরজুমলার সৈন্যেরা নদীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গোলমালে কোন ব্যবস্থা রহিল না, খেয়াটি পর্য্যন্ত হারাইয়া গেল। সহস্রাধিক সিপাহী নদীর জলে ভাসিয়া গেল। সেনাপতি দিলীর খাঁর এক পুত্রকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

সুজার সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল। শত্রুপক্ষ তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করিবার পূর্ব্বে তিনি ঢাকা পলায়ন করিবেন স্থির করিলেন। টাণ্ডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেগমদের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবার সময় না দিয়া তিনি তাহাদের সেই মুহূর্ত্তে স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। চারিটি বড় বড় নৌকায় তাঁহার ধনসম্পত্তি ও বাছাবাছা জিনিষপত্র ভর্ত্তি করিয়া স্রোতের মুখে রওনা করা হইল। তাঁহার দুই কনিষ্ঠ পুত্র, বুলন্দ আখতর ও জইন-উল্-আবিদিন, জনকয়েক অমাত্য, যথা মিরজা জানবেগ, বারহার সৈয়দ আলম, সৈয়দ কুলি উজবগ ও মিরজা বেগ, এবং অল্পসংখ্যক সিপাহী, পরিচারক ও খোজা, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিনশত লোক সাহজাদার সহিত চলিল।

ওদিকে, মীরজুমলা টাণ্ডা অধিকার করিয়া সহরে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। সুজার জিনিষপত্র লুঠ করিয়া সরকারএ জমা করিলেন। সুজা যে সকল মহিলাদের পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন তাহাদিগকে যথাযথ যত্ন ও রক্ষা করা হইল। এবার সেনাপতি টাণ্ডা হইতে ঢাকা রওনা হইলেন।

১১

সুজা ঢাকায় পৌঁছিয়া কোনস্থানে আশ্রয় পাইলেন না (এপ্রেল)। স্থানীয় জমীদারেরা তাঁহার বিপক্ষে ছিল। সুতরাং সুজা ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া নদীপথে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে, বহু সৈন্য ও নৌকার মাঝিরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে সুজা আরাকান দেশের রাজার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঢাকা পরিত্যাগ করার দুই দিন পরে আরাকান রাজার অধীন চাটগাঁ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে একারটি নৌকা পৌঁছিল। সুজা, তখন, বঙ্গদেশের উপর নিজের আধিপত্য পুনঃস্থাপন করিবার আশা জলাঞ্জলি দিয়া বর্ব্বর মঘ জাতির দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এই সংবাদে সাহজাদার পরিবারবর্গ ও অনুচরেরা ভীত হইয়া পড়িল। পূর্ব্ববঙ্গের নদীগুলির উপর চাটগাঁর আরাকানিদের দস্যুবৃত্তির কথা সকলেই বিদিত ছিল। তাহাদের উপদ্রবে সমস্ত বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলা দুইটি বসতিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই জল দস্যুদিগের অসমসাহসিক আক্রমণ, ভীষণ নিষ্ঠুরতা, কুৎসিত চেহারা, অসভ্য ব্যবহার, কদর্য্য রীতিনীতির জন্য পূর্ব্ববঙ্গের কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই তাহাদের ভয় ও ঘৃণা করিত।

সুজা যদি আওরংজীবের হস্তে দারা সুকো বা মোরাদ বক্সের ন্যায় শোচনীয় মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে চাহেন, তাঁহা হইলে মগদেশে পলায়ন করা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং, তিনি চিরজন্মের মত নিজের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের আবাসভূমি হইতে বিদায় লইলেন (মে, ১৬৬০)। তাঁহার পরিবারবর্গ ও চল্লিশটিরও কম অনুচর লইয়া তিনি আরাকান যাত্রা করিলেন।

সুজা তাঁহার নূতন আবাস স্থানে সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার দুর্দ্দমনীয় উচ্চাশা তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। সুজা আরাকান রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তিনি এই রাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিবেন ও বাঙ্গলা দেশে পুনরায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা দেখিবেন। এই সংবাদ পাইয়া আরাকান রাজ সুজাকে হত্যা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। সুতরাং সুজা, অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া অরণ্যে পলায়ন করিলেন। পরে, মঘেরা এই হতভাগ্য সাহজাদাকে অনুসরণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল (ডচ্ রিপোর্ট, ফেব্রুয়ারী, ১৬৬১)।

শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(সমুদ্রতীরে রাক্ষুসে উৎসব। রাক্ষসেরা জাতীয় সঙ্গীত সহ যুদ্ধ-নৃত্য করিতেছে। নৃত্য-গীতের সাথে রাক্ষুসে বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে।)

রাক্ষসদের গান

থং থং থং
থোনং থোনং থং;
লঙ্কাপুরে শঙ্কা নাই
জোরসে বাজাও ডঙ্কা ভাই,
শঙ্খ বাজাও, ঘণ্টা বাজাও
ঠনং ঠনং ঠং।
থং থং থং
থোনং থোনং থং।
মুই সকলে মস্ত বীর,
চালাই জোরে ভল্ল, তীর,
খাণ্ডা, মুষল, ডাণ্ডা হাতে
সবাই রেগে টং।
থং থং থং
থোনং থোনং থং;
দেখলে মোদের লক্ষ দান,
দেব্‌তা-দানব কম্পমান,
আঁৎকে ওঠে দেখ্‌লে মোদের
দন্ত-ভরা ঢং;
থং থং থং
থোনং থোনং থং।

(দূরে ভেরীধ্বনি শোনা গেল। রাক্ষস বিরূপাক্ষ দুইজন নিশাচর লইয়া উপস্থিত হইল। নিশাচরদ্বয় বিরূপাক্ষের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভেরীধ্বনি করিল। রাক্ষসদের নৃত্যগীত থামিয়া গেল। বিরূপাক্ষ হাত তুলিয়া রাক্ষসদের লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—)

বিরূপাক্ষ

হঁঃ হঁঃ হঁঃ! রাজকুমার ইন্দ্রজিতের আজ জন্মোৎসব। রাবণ রাজার সভায় অপ্সরীদের নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়েছে। তোমাদের সে উৎসবে যোগ দিতে হবে—রাজা দশাননের আদেশ।

(আবার ভেরীধ্বনি হইল। রাক্ষসদের মধ্যে আনন্দ কোলাহল উঠিল। লম্ফঝম্পে তাহারা সম্মতি জানাইল। বিরূপাক্ষ নিশাচরদ্বয়কে লইয়া প্রস্থান করিল। রাক্ষসেরা দল বাঁধিয়া গীতবাদ্য করিতে করিতে রাবণের সভায় চলিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাবণের রাজসভায় অপ্সরীদের নৃত্যগীত আরম্ভ হইবে। রাজা রাবণ উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাহার নীচে সিঁড়ির উপর অপ্সরীরা বসিয়াছে। একে একে সমস্ত রাজপরিবারের

রাক্ষসেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজসভার একদিকে রাক্ষসীরা বসিয়াছে, অন্যান্য দিকে রাক্ষসদের আসন। রাজপরিবারের সকলেই উচ্চ আসনে উপবিষ্ট। এমন সময় কোলাহল করিতে করিতে সমুদ্রতীরের উৎসব-মত্ত রাক্ষস-গণের আগমন। রাবণের সেনাপতি প্রহস্ত উঠিয়া চীৎকার করিয়া তাহাদের কহিল।)

প্রহস্ত

হঃ হঃ হঃ! সব নিজের নিজের জায়গায় বসে যাও— মহারাজ দশাননের আদেশ।

কুম্ভকর্ণ

(সকলে নিজের নিজের আসনে বসিল। রাবণ সিংহাসন হইতে উঠিয়া প্রহস্তকে কহিল।)

রাবণ

রাজপরিবারের সকলেই উপস্থিত?

(চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) না মহারাজ, দানব কুম্ভকর্ণ অনুপস্থিত।

রাবণ

কেন?

মহাপার্শ্ব

দাদা গাঢ় ঘুমে অচেতন।

রাবণ

বেরসিক! প্রহস্ত, তাকে জাগ্রত করার ব্যবস্থা কর। ততক্ষণ নৃত্যগীত চলুক।

(প্রহস্ত একদল রাক্ষসকে কুম্ভকর্ণকে জাগাইতে পাঠাইল। অপ্সরীদের নৃত্যগীত আরম্ভ হইল।)

অপ্সরীদের গীত

ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ নাচি
ফুর্ ফুর্ হাওয়াতে—
ভরপুর প্রাণ আজ
কার আঁখি চাওয়াতে?
স্বর্গের অপ্সরী
নাচি মোরা সব পরী,
মেতে উঠি ঝঁধুয়ায়
সুরার পাওয়াতে।
বনের বিহগী মোরা
মন বন-চারিণী,
মোদের মদির গীতি
জন-মন-হারিণী,
নিশিদিন প্রাণ ভরি
সোহাগের গান করি,
বিরহী পরাণ কাঁদে
সেই গান গাওয়াতে।

(নৃত্যগীত চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিকে রাক্ষসদের মধ্যে ভীষণ কোলাহল উঠিল। অপ্সরীগণ ভয় পাইয়া নৃত্যগীত থামাইল।)

রাবণ

দেখতো প্রহস্ত কি ব্যাপার!

(উঠিয়া) হঃ হঃ হঃ! কার আস্পর্দ্ধা রাজা দশাননের সম্মুখে কোলাহল করে!!

(রাক্ষসদের মধ্য হইতে একজন উঠিয়া)

মহারাজ, অকম্পন অপ্সরীদের দিকে চোখ্ মারছিল।

মহাপার্শ

বেরসিক!

মকরাক্ষ

বেল্লিক!

বজ্রদংষ্ট্র

বেকুব!

রাবণ

প্রহস্ত, তুমি স্বহস্তে অকম্পনের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের' করে' দাও।

(রাক্ষসদের মধ্যে আর একজন উঠিয়া কহিল।)

মহারাজ, অকম্পনের কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে; এবারের মত মার্জ্জনা করুন।

বিরূপাক্ষ

অকম্পনের কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে? বটে? সমুদ্রতীরে ওই-তো বেশী লম্ফঝম্প করছিল।

রাবণ

প্রহস্ত, যে হেতু অকম্পনের কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে সে হেতু তার আর এ উৎসবে থেকে কাজ নাই, তাকে রাজবৈদ্য ভস্মকেতুর কাছে যেতে বল। না'হ'লে উৎসবের রসোভঙ্গ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

(প্রহস্তের ইঙ্গিতে অকম্পন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথানীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল। রাক্ষসেরা হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া)

ছুয়োঃ ছুয়োঃ ছুয়োঃ—

প্রহস্ত

হুঁঃ হুঁঃ হুঁঃ? চুপ্।

রাবণ

নৃত্যগীত চলুক।

অপ্সরীদের গীত

নন্দন বনে ফোটে মন্দার ফুল,
মন্দাকিনীর জল চলে ঢুল্ ঢুল্,—
আমরা তাহার তীরে
নাচি গাই ঘুরে ফিরে
মদির আবেশে সদা আঁখি ঢুল্ ঢুল্।
মোরা যুগ যুগ ধরি
প্রেমের বেসাতী করি,
আঁখি ঠারে সবাকার পরাণ আকুল।

তৃতীয় দৃশ্য

(কুম্ভকর্ণ ভীষণ গর্জ্জনে নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছে। একদল রাক্ষস তাহাকে ঘিরিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে কানের কাছে চীৎকার করিয়া গান করিতেছে। কেহ কীলচড় মারিতেছে, কেহ লাঠির খোঁচা দিতেছে।)

রাক্ষসদের গান

ওঠো ওঠো কুম্ভকর্ণ
ঘুমে ঘুমে দেহ তোমার
হ'য়ে গেছে ধুম্র বর্ণ,
ওঠো ওঠো কুম্ভকর্ণ।

(কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাহার নাসিকা আরো জোরে গর্জ্জন করিতে লাগিল। নিশ্বাসের চোটে রাক্ষসগণ ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল।)

চতুর্থ দৃশ্য

(রাবণের সভায় অপ্সরীদের নৃত্যগীত চলিতেছে।)

অপ্সরীদের গীত

তোল্ তোল্ মুখ তোল্,
ফুল-দোল আজ,
বঁধুর বাঁশীর শোন
মধুর আওয়াজ।
হেসে হেসে কাছে এসে
কথা কয় ভালোবেসে,
ভিখারীর দ্বারে এলো
রাজ্ অধিরাজ।
এখন বাগান খালি
কেন এলে ফুল মালী!
কি দিয়ে সাজাব তোমা
ভেবে পাই লাজ।

(নৃত্যগীত চলিতেছে' এমন সময়ে সভাশুদ্ধ সকলে প্রবলভাবে হাঁচিতে ও কাশিতে লাগিল। নৃত্যগীত থামিয়া গেল।)

রাবণ

প্রহস্ত, একি ব্যাপার !!

(দ্বারের নিকট হইতে একটি রক্ষ প্রহরী কহিল)

মহারাজ, অকম্পন লঙ্কা পোড়াচ্ছে—

(চারিধারে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। বিপদ সূচক ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। রাবণ উঠিয়া দাঁড়াইল। সভাশুদ্ধ সকলেই হুঙ্কার করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।)

রাবণ

(দাঁত কড়্মড়্ করিয়া) প্রহস্ত, অকম্পনের এতদূর আস্পর্দ্ধা, সোনার লঙ্কাপুরী সে পোড়াতে সাহস করে ?

অন্যান্য রাক্ষসেরা

মর্কট অকম্পনের এতদূর আস্পর্দ্ধা !

রক্ষ প্রহরী

মহারাজের বুঝ্‌তে ভুল হয়েছে, অকম্পনের বাপের সাধ্য কি সোনার লঙ্কার গায়ে আঁচড় কাটে !!

প্রহস্ত

তবে কি পোড়াচ্ছে সে ?

প্রহরী

রাজবৈদ্য ভস্মকেতুর আদেশে দশমণ শুক্‌নো লঙ্কা পুড়িয়ে সে নাকে নিচ্ছে। তার সর্দ্দি জ্বরের ওষুধ।

(সভাশুদ্ধ সকলে অট্টহাস্যে নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিল।)

প্রহস্ত

মহারাজ, তবে নৃত্যগীত চলুক।

রাবণ

না, নর্ত্তকীরা পরিশ্রান্ত, সভাস্থ সকলেই ক্লান্ত, এখনকার মত সভা ভঙ্গ হোক। কাল পূর্ণিমা রজনীতে নর্ত্তকীর যে নূতন দল এসেছে তাদের নাচের আয়োজন করা হোক অশোক বনের নব-নিকুঞ্জে।

পঞ্চম দৃশ্য

(উদ্যানে একটি বৃক্ষের তলায় বসিয়া মন্দোদরী ও সূর্পণখা। সূর্পণখা মন্দোদরীর গলা জড়াইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছিল।)

মন্দোদরী

এমন ভেউ ভেউ করে' কাঁদছিস্ কেন লা সূর্পণখা ?

(কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্পণখার গান)

কেমন ক'রে বুঝবি সখি
কাঁদছি কেন ভেউ ভেউ ভেউ,
কি দিয়ে আজ রাখব চেপে
বুকের ভিতর ওঠে যে ঢেউ।
যৌবনের এ ভিটের পরে
দিবারাতি ঘুঘু চরে,
উহঃ উহঃ মরি মরি
প্রাণের ব্যথা বোঝে না কেউ।

মন্দোদরীর গান

কাঁদিস্ কেন ননদিনী, কি হয়েছে বল্—
এমন করে' কাঁদ্‌তে কি হয়, মোছ্‌রে আঁখি জল ;
মনের কথা আমি বুঝি
মনের মানুষ দেব খুঁজি,
নতুন পাখী পড়বে ধরা, খাবি এখন চল্।

কাঁদিস্ না লো সই, খাবি চল্, তোর জন্যে তোর প্রিয় খাদ্য হাতীর কলজে ভাজা তৈরি করে' রেখেছি।

সূর্পণখা

(কাঁদিতে কাঁদিতে) সখি রে, কিসের খাওয়া দাওয়া, কিসের এই রূপ যৌবন। দাদা দশানন আমার আননের যে দশা করেছেন তা' আর কাকে বুঝাব সই ? বাগান খালি করে' মালী চলে গেছে।

মন্দোদরী

ভাবিস্ না সই, তোর রূপ আছে, যৌবন আছে,—তোর বাগানে ফুলের অন্ত নেই—আবার কত মালী আস্‌বে, ভাবিস্ কেন ?

সূর্পণখা

(নিশ্বাস ফেলিয়া) মনের মত পতি পেয়েছিলাম, কিন্তু এ পোড়া বরাতে তাও টিক্‌ল না। হুল্ ফুটিয়ে, বোল্‌তা উড়ে গেল। খাম্‌চি মেরে চাম্‌চিকে পালিয়েছে। মাঠে মারা গেলাম সই, মাঠে মারা গেলাম। (ক্রন্দন)

মন্দোদরী

চুপ, চুপ, তোর দাদা দশানন এইদিকে আস্‌ছে—।

সূর্পণখা

সর্ব্বনাশ, আমি ঐ ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকাই।

(সূর্পণখা কিছুদূরে একটি ঝোপের আড়ালে গিয়া লুকাইল। রাবণের প্রবেশ)

রাবণ

(মন্দোদরীর প্রতি) ভেট্‌কী লোচনি, গণ্ডার মর্দ্দিনী, মন্দোদরি! তুমি এখানে?

মন্দোদরী

আহা বুড়ো মিন্‌সের আর পিরীতের কাজ নেই! বেলা বাড়ছে তবু রোদের ঝাঁঝ কমে না।

রাবণ

গজেন্দ্র-দলনি, প্রাণাধিকে, উৎসব সভা থেকে সটান্ অন্তঃপুরে এসে দেখি সকলেই রয়েছে—কিন্তু তবু যেন মনে হোল কেউ নেই। তোমায় না দেখ্‌লে মনে হয় আমার সোনার লঙ্কায় যেন নোনা ধরছে।—

মন্দোদরী

থাক্ থাক্ আর কপট সোহাগের দরকার নাই। নিজে আমোদ প্রমোদ নিয়ে মেতে আছ, এদিকে খিঙ্গী বোন্‌টার কি দুর্দ্দশা করেছ তার খোঁজ রাখ কি?

রাবণ

ওহো, তুমি সূর্পণখার কথা বলছ? তাইতো, আমার তো এতদিন খেয়ালই হয় নাই। সত্যিই তো আমি অপরাধী। কালকেয়-দৈত্যবংশীয় বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানব প্রবরের সঙ্গে আমি ভগিনী সূর্পণখার বিবাহ দিয়েছিলাম। তারপর দিগ্বিজয় করতে বার হয়ে ভ্রমক্রমে তাকে আমি বধ করেছি। ঠিক্ ঠিক্, আমার ভগিনী সূর্পণখার বৈধব্যের জন্য আমি দায়ী। এ কথাতো আমার মনে কখনো জাগে নাই।

মন্দোদরী

সে রাতদিন কাঁদে, খায় না, দায়না; অমন কয়লা-পোড়া শরীর শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে। তার এমন সাধের খাদ্য হাতীর কল্‌জে ভাজা, গণ্ডারের মেটুলীর চচ্চরী তাও আর মুখে রোচে না।

রাবণ

বটে, বটে! সূর্পণখা কই?

মন্দোদরী

সে শিংশপা গাছের তলায় ধুলায় লুটোপুটি খাচ্ছে।

রাবণ

বটে, বটে? আচ্ছা তার ব্যবস্থা আমি করছি। ভগ্নির প্রতি ভ্রাতার একটা কর্ত্তব্য আছে বৈ কি! হ্যাঁ শোন প্রাণবল্লভি, মন্দোদরী, সূর্পণখাকে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য আমি পঞ্চবটী বনে পাঠাব। স্থানটি অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। আর ভগ্নি সূর্পণখাকে এ কথাও জানিয়ে দিও—সে যদি সেখানে মনোমত পাত্র পায়—তাকে সে অনায়াসে আবার পতিত্বে বরণ করতে পারে—এতে রাবণ রাজার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

মন্দোদরী

সেই ভালো হবে। ছুঁড়িটার যে অবস্থা হয়েছে তাব্‌লে দুঃখ হয়। পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, শত হোক্ মেয়েমানুষ তো!

রাবণ

সূর্পণখার পরিচর্য্যা করবার জন্তে সঙ্গে যাবে তার মাসীর দুই পুত্র খর ও দূষণ—আর প্রহরী যাবে চৌদ্দ হাজার নিশাচর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(পঞ্চবটী বন—গোদাবরীর তীর। নানারকম পাখী ডাকিতেছে, হরিণ চরিতেছে ইত্যাদি। সূর্পনখা গান গাহিতে গাহিতে নদীর তীর দিয়া আসিতেছে।)

সূর্পণখার গান

বুক-ভরা জ্বালা নিয়ে
ঘুরিয়া বেড়াই,
কোথায় জুড়াব হিয়া
ভাবিয়া না পাই।
খাঁচার দুয়ারটারে
খুলে দিনু একেবারে,
হে পাখী দিও না ফাঁকি
মিনতি জানাই।
উড়ে এসো তাড়াতাড়ি
বিরহ সহিতে নারি,
দিবানিশি প্রাণ মোর
করে আঁই চাঁই।

কি সুন্দর এই পঞ্চবটী বন। গোদাবরী নদীর হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল। বসে একটু হাওয়া খাওয়া যাক্।—

(একটি ঝোপের আড়ালে বসিয়া আপন মনে বেণী দোলাইতে লাগিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বনপথ দিয়া লক্ষ্মণ তীর ধনু হাতে ছুটিয়া আসিতেছে।)

লক্ষ্মণ

কোথায় গেল হাতীর ছানাটা? দিব্বি নাদুস্ নুদুস্ বাচ্চাটা। ভাব্লাম ধরে নিয়ে সীতাদেবীকে উপহার দেব—তাও ছাই বরাতে নাই। যে করেই হোক্ হাতীর ছানাটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। লক্ষ্মণের হাত থেকে একটা পিঁপ্ড়েও এড়াতে পারে না! এই দিকেই তো ছুটে এসেছে।

(লক্ষ্মণ ঝোপে ঝাড়ে হাতীর বাচ্চাটাকে খুঁজিতে লাগিল। হঠাৎ দূরে ঝোপের আড়াল হইতে সূর্পণখার বেণীর খানিকটা দোলানো অংশ দেখা গেল।)

লক্ষ্মণ

ঐ যে বাছাধন, ল্যাজ নাড়্ছে। পা টিপেটিপে যাই—না হলে আবার সরে' পড়বে। যা চালাক্।

(তীরধনু মাটিতে রাখিয়া লক্ষ্মণ পা টিপিয়া টিপিয়া ঝোপের কাছে গিয়া ল্যাজ্ ভাবিয়া সূর্পণখার বেণী ধরিয়া হ্যাঁচ্কা টান্ মারিল।)

লক্ষ্মণ

হেঁইও !!!—

সূর্পণখা

(চম্কাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।) কেঁরে, কেঁরে, কেঁরে—?

(লক্ষ্মণ দস্তুর মত ঘাব্ড়াইয়া কয়েক হাত পিছাইয়া)

এ আবার কে রে বাবা! তাড়কার মাসশাশুড়ী নাকি?

(লক্ষ্মণের রূপ দেখিয়া সূর্পণখা মজিল।)

সূর্পণখা

তুমি কে? (সামনে আগাইল।)

লক্ষ্মণ

আমি মানুষ, তুমি কে? (পিছনে হটিল।)

সূর্পণখা

আমি সূর্পণখা, রাবণ রাজার আদরের বোন্—।

(সূর্পণখা লক্ষ্মণের যত কাছে আসিতে চায়—লক্ষ্মণ তত পিছাইয়া যায়—।)

সূর্পণখা

তোমার নাম কি?

লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণ।—

সূর্পণখা

আমি তোমাকে চাই—

লক্ষ্মণ

ওরে বাবা, এখুনি কচ্মচিয়ে ঘাড়টি ভেঙে রক্ত চুষে খাবে। (লক্ষ্মণ প্রাণপণে দৌড় লাগাইল।)

তৃতীয় দৃশ্য

(ঋষিকুমারীরা কলস্ কাঁখে জল লইয়া গান গাহিতে গাহিতে বনপথে বাড়ী ফিরিতেছে।)

ঋষিকুমারীদের গান।

ঘট্ ভরে' জল নিয়ে
চট্ করে চল্,
বেলা হোল,—ছুটে চল
হরিণীর দল।
আমরা বনের মেয়ে
পথ চলি গান গেয়ে,
কথায় কথায় মোরা
হাসি খল্ খল্।
আমরা বালিকা দলে
ফুলের মালিকা গলে—
হেলে দুলে নেচে পথ
চলি অবিরল।

(লক্ষ্মণ হুড় মুড় করিয়া আসিয়া তাহাদের মধ্যে পড়িল। কুমারীদের কেহ ধাক্কা খাইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল, কাঁখের কলস ভাঙিল ইত্যাদি। লক্ষ্মণ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল।)

কুমারীগণ

এ আপদ আবার কোত্থেকে এসে জুটল।

১ম কুমারী

দেখ্ দেখি, চান্ করে' বাড়ী ফিরছি—কোথাকার কে এসে গা ছুঁয়ে দিল। আবার অবেলায় চান করা কি গতরে সইবে?

২য় কুমারী

তুমি কে গা?

লক্ষ্মণ

আমি লক্ষ্মণ!

৩য় কুমারী

ওঃ তুমি বুঝি আমাদের সীতার দেবর—রামচন্দ্রের ভাই?

৪র্থ কুমারী

এরা তাই আমাদের পঞ্চবটী বনে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

৫ম কুমারী

তা' তুমি যেই হও—এমন হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লে কেন আমাদের মধ্যে? দেখছ না আমরা ঋষিকুমারী। কুমারীদের সঙ্গে কি এরকম ঢলাঢলি করতে আছে? (সকলের হাস্য।)

লক্ষ্মণ

(অপ্রস্তুত হইয়া) না, ঢলাঢলি করা আমার স্বভাব নয়। রাক্ষসীর ভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে ঠোক্কর লেগে গেছে। কিছু মনে কোরো না, আমার কোন বদ্ মতলব ছিল না। বাপ্ রাক্ষসীটার যা চেহারা!

কুমারীরা

রাক্ষসী আবার কে?

(দূরে সূর্পণখার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—।)

—লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, প্রাণ আমার!

লক্ষ্মণ

ঐরে রাক্ষসীটা এই দিকেই ধাওয়া করেছে,—আমি সট্‌কে পড়ি,—আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

(কুমারীগণ সূর্পণখাকে দেখিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া যে যেদিকে পারিল ছুট্ দিল।)

চতুর্থ দৃশ্য

(সূর্পণখা লক্ষ্মণের খোঁজে বনে বনে গান গাহিতে গাহিতে ঘুরিতেছে।)

সূর্পণখার গীত

ভুবন-ভুলানো রূপে
মজেছে পরাণ,
নিদয়, তোমার কেন
হৃদয় পাষাণ?
প্রাণ-ভরা জ্বালা লয়ে
ফিরি পাগলিনী হয়ে
প্রেম জ্বরে প্রাণ মোর
করে আন্ চান্।

লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ,—যেদিন প্রথম তোমার ভুবন-ভোলানো রূপ দেখেছি—সেদিনই মজেছি। তোমার রূপের বিদ্যুৎ-

ছটায় আমার চোখ্ ঝল্সে গেছে। আমি হৃদয়ের খাঁচা খুলে বসে আছি—হে বনের পাখী, ধরা দাও, ধরা দাও।

আমি বঁড়্শী ফেলে বসে আছি, হে গভীর জলের চিংড়ী মাছ ধরা দাও,—ধরা দাও। আমি ফাঁদ পেতে বসে আছি, হে ধূর্ত্ত শেয়াল ধরা দাও,—ধরা দাও। কী সুন্দর তুমি, কী সুন্দর তুমি। আমার যৌবনের বাগানে গাদা গাদা গাঁদা ফুল ফুটে আছে, হে মালী এসো, এসো, এসো। (সূর্পণখা একটি ঝরণার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কে একজন উপুড় হইয়া ঝরণার জল পান করিতেছিল। তাহাকে লক্ষ্মণ মনে করিয়া সূর্পণখা ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিল।)

সূর্পণখা

এই যে আমার প্রাণের লক্ষ্মণ, এই যে প্রাণারাম। আজ আর ছাড়ছি না। হে নাথ, আমার এ বাহুবন্ধনে আজ তোমাকে ধরা দিতেই হবে।

(নিকটে আসিয়া সূর্পণখা পিছন দিক হইতে লোকটির গলা জড়াইয়া ধরিল। লোকটি চম্‌কাইয়া লাফাইয়া উঠিল। লোকটি একটি দীর্ঘ পাকাদাড়ী বিশিষ্ট মুনি। ভয় পাইয়া মুনি চীৎকার করিয়া দৌড় দিল এবং বনের মাঝে অদৃশ্য হইয়া গেল।)

সূর্পণখা

নাঃ, আর পারি না,—মরীচিকার পিছনে আর ঘুরতে পারি না। ছলে বলে কৌশলে লক্ষ্মণকে আমার পেতেই হবে। ছোঁড়া যেন টাট্টু ঘোড়া। কিছুতেই আর নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নাই; ঘুমে চোখটা ঢুলে আস্‌ছে। এই নির্জ্জন ঝরণাতলে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্। আবার লক্ষ্মণের খোঁজে যেতে হবে। (ঝরণার ধারে পাথরের উপর সূর্পণখা শুইয়া পড়িল এবং ক্রমে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হইল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়া মধ্যে মধ্যে 'লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ বলিয়া বিলাপ করিতেছিল। সূর্পণখা স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, লক্ষ্মণ তাহাকে ধরা দিয়াছে,—দুইজনে মিলিয়া ঝরণাতলায় বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছে।)

(=স্বপ্ন=)

সূর্পণখা

তুমি আমার কে?

লক্ষ্মণ

আমি তোমার প্রাণনাথ, প্রাণবল্লভ, প্রিয়তম, প্রেমিকপ্রবর।

সূর্পণখা

তুমি কার?

লক্ষ্মণ

(সূর্পণখার গলা জড়াইয়া) আমি তোমার, তোমার, তোমার—(সূর্পণখা আবেগে লক্ষ্মণকে বুকে জড়াইয়া

সূর্পণখা আর্ত্তনাদ করিয়া লাফাইয়া উঠিল

ধরিতেই ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল একটি শিম্পাঞ্জী তাহার বুকের উপর। তাহাকেই সে বুকে জড়াইতে যাইতেছে। সূর্পণখা আর্ত্তনাদ করিয়া লাফাইয়া উঠিল।)

পঞ্চম দৃশ্য

(গোদাবরীর তীরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। জলে জ্যোৎস্নার ছায়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। খর ও দূষণের প্রবেশ।)

খর

খাসা মেয়েটা কিন্তু ভাই দূষণ।

দূষণ

কোন মুনি ঋষির মেয়েটেয়ে হবে। বেশ কচি মাংস কচ্‌কচিয়ে খেতে ভারী মজা—নারে খর!

খর

আরে ছ্যাৎ'—তুই নেহাৎ হাবাতে রাক্ষস। ওদের কি খেতে হয়?

দূষণ

হাঁ, তোর যে কথা—তবে কি মাথায় তুলে ধেই ধেই করে' নাচ্‌তে হয়?

খর

আরে নারে না, ওদের সঙ্গে বেশ রসের কথা কইতে হয়, প্রেম করতে হয়। মানুষের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে ভারী মজা। রাক্ষুসীগুলির সঙ্গে কি আর প্রেম করা চলে।

দূষণ

আরে ছোঃ—

খর

বেটীরা নাদা পেট চিবিয়ে খালি হাবাতের মত গিল্‌তে জানে আর জানে ভোঁসভুঁসিয়ে ঘুমুতে। না আছে রস, না আছে কস।

দূষণ

হো হো হো—যা বলেছিস্ ভাই। মেয়েটা গেল কোথায়?

খর

সন্ধ্যেবেলা গোদাবরীতে মুখ ধুতে এসেছিল। তখন সবে চাঁদ উঠ্‌ছে। অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুঝ্‌তে পারলাম না চাঁদ বেশী সুন্দর কি মেয়েটার মুখ বেশী সুন্দর।

দূষণ

তারপর?

খর

ভাব্‌লাম সন্ধ্যেবেলা কেউ নেই—মেয়েটার সঙ্গে আলাপ জমাই গিয়ে। যেই কাছে গেছি পিছন দিক থেকে চুষমণের মত দুই ব্যাটা মনিষ্যি তীর ধনু বাগিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ছুটে এলো। চাঁদের আলোয় এক ব্যাটাকে চিন্‌লাম।

দূষণ

কে সে?

খর

যার জন্তে আমাদের গুণের দিদি পাগল।

দূষণ

ওঃ এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরেছি। ওই মেয়েটা আর কেউ নয় রামের বৌ সীতা আর ওই দুটো মনিষ্যি রাম আর লক্ষ্মণ।

খর

দিদির আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—ঐ একরত্তি চ্যাংড়া ছোঁড়াটার সঙ্গে কচ্‌কেমি না করলে আর চলে না।

দূষণ

না ভাই দিদির যা অবস্থা হয়েছে তাতে প্রাণে বাঁচ্‌লে হয়। চ্যাংড়াই হোক আর ল্যাংড়াই হোক পিরিত বড় বালাই। একটা কিছু হাস্ত ন্যাস্ত না করলে আর চল্‌ছে না।

খর

এর আর বেশী কথা কি—কালই লক্ষ্মণ ছোঁড়ার চুলের মুঠি ধরে হিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে আস্‌ব। বেশী টাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করে তো লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করব।

দূষণ

হাঁ, এর জন্তে আর চিন্তে কি—

যদি খর দূষণের ইচ্ছা হয়
কোনো কাজেই পিছ্‌পা নয়। (দুইজনের প্রবল হাস্ত)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(পথের একদিক দিয়া লক্ষ্মণ মনের আনন্দে লাফাইয়া গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল। অপর দিক দিয়া শূর্পণখাও আসিতেছে। কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ পথের মোড়ে দুইজনের দেখা।)

লক্ষ্মণের গান

তাইরে নারে না
তাইরে নারে না,
মনের সুখে স্বাধীন ভাবে বেড়াই বনে বনে,—
মাঝে মাঝে পড়ে শুধু ঊর্ম্মিলারে মনে,
তাইতে শুধু মনটা আমার কেমন কেমন করে
বিরহটা সইতে হবে চৌদ্দ বছর ধরে'।
তাইরে নারে না
তাইরে নারে না।

(পথের মোড়ে দুইজনের দেখা। লক্ষ্মণ 'বাপ্‌রে' বলিয়া প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়া ছুট দিল। পিছনে পিছনে সূর্পণখাও 'লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ করিয়া ছুটিল। লক্ষ্মণ ছুটিতে ছুটিতে দুই তিনবার হোঁচট খাইয়া নদীর তীরে উপস্থিত।)

লক্ষ্মণ

বাপ্‌রে, রাক্কুসীর পাল্লায় পড়ে' প্রাণটা গেল দেখ্‌ছি। উঃ কি বেহদ্দ হাড়হাবাতে। জোর করে' প্রেম করবে। দাদাকে বল্লাম, তিনি হেসে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। বাপ্, ছুট্‌তে ছুট্‌তে কালঘাম বেরিয়ে গেছে। একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্। তারপর বাড়ী ফেরা যাবে।

(লক্ষ্মণ নদীতীরে বসিল। পিছনে সূর্পণখা আসিয়া উপস্থিত। লক্ষ্মণ এতক্ষণ টের পায় নাই।)

সূর্পণখা

লক্ষ্মণ, প্রাণকান্ত—

লক্ষ্মণ

ওরে বাপ্‌রে, ঘাড়ের উপর গোখ্‌রো সাপের ছোবল্।
(লাফ দিয়া নদীতে পড়িয়া সাঁত্‌রাইতে লাগিল।)

সপ্তম দৃশ্য

(মুনিদের আশ্রম। ঋষিকুমারীরা কেহ গাছে জল দিতেছে, কেহ হরিণের গায়ে হাত বুলাইতেছে। কেহ বা গল্প করিতেছে।)

১ম কুমারী

শুন্‌ছিস্ ভাই, লক্ষ্মণচন্দ্র সূর্পণখার প্রেমে পড়েছে।

২য় কুমারী

দূর বোকা,—লক্ষ্মণচন্দ্র পড়বে কেন—ফাঁদে পড়েছে সুন্দরী সূর্পণখা। (সকলের হাস্য।)

৩য় কুমারী

প্রেম কাকে বলে ভাই?

৪র্থ কুমারী

ঈস্ রাখ্ তোর ন্যাকামী। শরভঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে যে ডাগরপানা নতুন তাপস কুমারটি এসেছে তার সঙ্গে কাল যে কি আলাপ করছিলি—আমি কি শুনিনি?

৩য় কুমারী

আমর্, তোর সবতাতেই জ্যাঠামী। ওমা তার সঙ্গে আমি আবার আলাপ করলাম কখন? তার চেহারাই আমি দেখিনি।

৪র্থ কুমারী

কাল বিকেলে—কুটীরের পিছনে—তালকুঞ্জের পাশে বসে—যার চেহারাই দেখিস্‌নি তার হাতে হাত দিয়ে—ফুসুর্ ফুসুর্, গুজুর্ গুজুর্ কত কি?

(৪র্থ কুমারীর কথা শুনিয়া একে একে অন্যান্য বালিকারা সকৌতুকে ছুটিয়া আসিল। সকলেই এক একবার ৩য় কুমারীর চিবুকে হাত দ্যায় আর বলে 'ন্যাকা!' তাহাদের মধ্যে একটি কুমারী নাচিয়া হাসিতে হাসিতে গাহিতে লাগিল।)

ঋষি কুমারীর গান

প্রেম কারে কয় জানি না ভাই
আমরা আনাড়ী,
কাঠ-খোট্টা মুনির মেয়ে
ঋষির কুমারী।
পাকা পাকা দাড়ীর মাঝে
বুনো মেয়ের প্রেম কি সাজে?
ডুবে ডুবে জল খেতে ভাই
আমরা কি পারি?

(আশ্রমের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। দূর হইতে কোন মুনির গলা শোনা গেল।)

হোম আরম্ভ হয়েছে—তোমরা সকলে এস।
(বালিকারা ছুটিয়া চলিয়া গেল।)

অষ্টম দৃশ্য

(একপাল গরু খরকে তাড়া করিয়াছে। খর প্রাণপণে ছুটিতেছে আর চীৎকার করিতেছে।)

খর

ভাইরে দূষণ, রক্ষা কর্, রক্ষা কর্, গোভূতের পাল্লায় পড়ে' প্রাণটা যে যাবার যোগাড়।

(খরের চীৎকারে দূষণ ছুটিয়া আসিল এবং গরুর পাল দেখিয়া প্রাণ ভয়ে একটি গাছে উঠিয়া পড়িল।)

দূষণ

উঠে পড়্, উঠে পড়্, গাছে উঠে পড়্ যদি বাঁচ্‌তে চাস্।

খর—গো-ভূতের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যে যাবার যোগাড়

(খরও তাড়াতাড়ি গাছে উঠিয়া পড়িল। গরুর পাল গাছের তল দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। দুইজনে গাছের ডালে বসিয়া কথোপকথন।)

খর

বাপ্ যা ফ্যাসাদেই পড়া গেছিল—

দূষণ

কি, ব্যাপারটা কি ? কার গোয়ালে সেঁধুতে গেছিলি ?

খর

না রে ভাই, মুনি ঋষিরা হোম করছিল; ভাব্‌লাম তাদের ভয় দেখিয়ে চরু আদায় করে খাই—

দূষণ

তারপর ?

খর

তারপর আর কি,—চরু খেতে গিয়ে গরুর তাড়া খেয়ে প্রাণ যায় আর কি। কি করে' কোথা থেকে যে ফুস্ মন্তরের চোটে এতগুলি গরু তেড়ে এলো—ভাতো ভেবেই পাচ্ছি না।

দূষণ

তুই একটা আস্ত গরু, না হলে গরুর ভয়ে পালাস !

খর

আর তুই বুঝি ভয় না পেয়েই তড়াক্ করে' আমার আগেই গাছে উঠে বস্‌লি ?

দূষণ

আরে বোক্‌চন্দর্, তোকে বাঁচবার একটা পথ্ বাৎলে দিলাম আরে ছোঃ—তুই রাক্ষসকুলে কালী দিলি।

খর

নে, নে, তুই খুব সাহসী,—এখন চল গাছ থেকে নেমে পড়া যাক্।

(দূষণ খরের গালে এক চড় মারিল।)

খর

একি, মারলি কেন ?

দূষণ

এ্যাত্তো বড় এক মশা—

(খর দূষণের ভুঁড়িতে এক প্রবল চাঁটি মারিয়া বলিল 'পিঁপ্‌ড়ে, পিঁপ্‌ড়ে'—। চাঁটির চোটে দূষণ গাছ হইতে পড়িয়া গেল। খর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।)

নবম দৃশ্য

(লক্ষ্মণ কুঠার হস্তে কাঠের সন্ধানে বনে বনে ঘুরিতেছে।)

লক্ষ্মণ

না, ভালো জ্বালানী কাঠ আর এদিকে নেই দেখ্‌ছি। ওই যে সামনে একটা শুকনো গাছ,—ওটাকেই কাটা যাক্—

(লক্ষ্মণ গাছ কাটিতে আসিয়া দেখিল সামনে ঝোপের পাশে একটি শাদা লেজের মত জিনিষ দেখা যাইতেছে।)

লক্ষ্মণ

আরে এটা কি? কাঠ্‌বেড়ালীর ল্যাজ নাকি?

(জিনিষটা ধরিয়া টান্‌ দিতেই দাড়ী শুদ্ধ একটি মুনির মুখ বাহির হইয়া পড়িল। মুনি চটিয়া টং।)

মুনি

অরে রে অর্ব্বাচীন্‌,—আমার ধ্যান ভঙ্গ করিস? এত সাহস তোর?

লক্ষ্মণ

(হাত জোড় করিয়া) দোহাই মুনি ঠাকুর,—আমি আপনার দাড়ীকে কাঠবিড়ালীর ল্যাজ মনে করেছিলাম। দোহাই আপনার—

মুনি

প্রগল্‌ভ বালক,—যা তোকে ক্ষমা করলাম—ক্ষমাহি
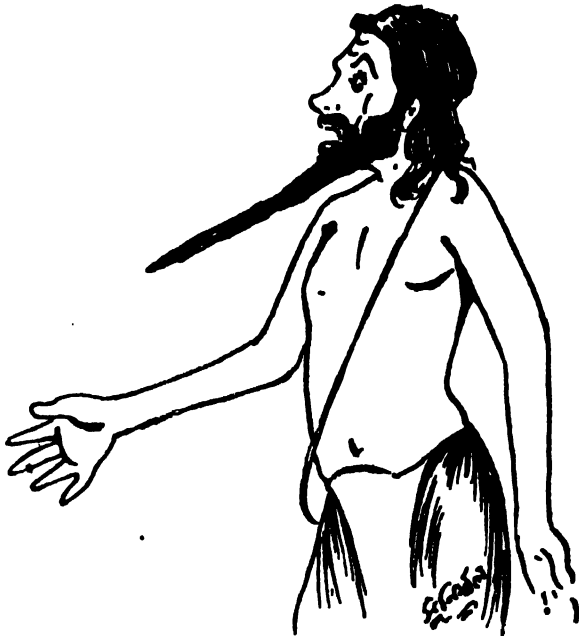
"অনড্বান্‌—অনড্বান"

পরমো ধর্ম্ম,—তোকে চিন্‌তে পেরেছি,—তুই শ্রীরামচন্দ্রের ভাই। অন্য কেউ হলে তোকে আজ ভস্ম করতাম্‌। অনড্বান্‌, অনড্বান্‌,— (মুনির প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ

ওঃ, মুনির খর্পর থেকে খুব বাঁচা গেছে বাবা। দাড়ী রাখতে হয় ভালো করে' রাখ্‌, ওরকম বিতিকিচ্ছি দাড়ী মানুষে রাখে?

(লক্ষ্মণ আসিয়া গাছ কাটিতে লাগিল। এমন সময়ে দূরে সূর্পনখার গান শোনা গেল।)

সূর্পনখার গান

কেন দূরে থাক জীবন দেবতা,
শুনাব তোমারে মরমের কথা,
এস কাছে প্রিয়
ভালোবাসা দিও,
কেমনে জানিবে মোর আকুলতা।
ভালোবাসি আমি
হৃদয়ের স্বামী,
কেন দিবাযামী প্রাণে দাও ব্যথা?

লক্ষ্মণ

ঐ রে মাগী আবার ধাওয়া করেছে'। নাঃ, আর ভয় করে' এড়িয়ে চল্‌লে চল্‌বে না। আজই একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক্‌।

সূর্পণখা

(কাছে আসিয়া) লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ,

লক্ষ্মণ

কেন কি চাস্‌?

সূর্পণখা

তোমাকে চাই—

লক্ষ্মণ

কেন, পেটে পুরতে?

সূর্পণখা

না, বুকে রাখতে—

লক্ষ্মণ

বাবে, আব্‌দার মন্দ নয়। আমি কি কচি খোকা নাকি যে বুকে রাখ্‌বি?

ণখা

আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই,

লক্ষ্মণ

এ্যাঁ, সর্বনাশ, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার স্ত্রীর নাম উর্ম্মিলা।

সূর্পণখা

আমারও তো বিয়ে হয়েছিল—তাতে কি আসে যায়?

লক্ষ্মণ

দ্যাখ, রাক্ষসী হলেও তুই মেয়েমানুষ। মেয়ে মানুষের বাড়াবাড়ি ভালো নয়। লক্ষ্মণ কিন্তু দারুণ অলক্ষণ ঘটিয়ে ছাড়বে।

সূর্পণখা

আমি তোমায় ছাড়ব না। (তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া) এই তোমাকে ধরলাম,—দেখি কেমন করে' ছাড়িয়ে যেতে পার নাথ!

(লক্ষ্মণ উপায়ান্তর না দেখিয়া হাতের কুঠার দ্বারা সূর্পণখার নাক কাটিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।)

লক্ষ্মণ

বোঝো এখন পিরিতের জ্বালা (পলায়ন)

সূর্পণখা

(ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে) হাঁউ, মাঁউ, হাঁউ,—ওঁরে খঁর, ওঁরে দুঁষণ, দৌড়ে আঁয়, দৌড়ে আঁয়, তোঁদের আঁহুরে দিদির দঁশা এঁকবার দেঁখে যাঁ—দেঁখে যাঁ—

(খর ও দূষণ দৌড়িয়া আসিল। সূর্পণখার দশা দেখিয়া তাহারা মনে মনে ভয় পাইল, কিন্তু বাহিরে ভীষণ রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল।)

উভয়ে

একি হোল, একি হোল!!

সূর্পণখা

হঁবে আঁবার কিঁ? তোঁরা থাঁকতে—চেঁয়ে দ্যাঁখ লঁক্ষ্মণ আঁমার কিঁ দঁশা করেছে—আঁমি চঁল্লুম দাঁদার কাঁছে লঁঙ্কায়—তোঁরা পাঁরিস, তোঁ প্রঁতিশোধ নেঁ— (প্রস্থান)

খর

এ্যাঁ—সেই চ্যাংড়া? ধরে' আন তার টুঁটি চেপে—ঝুঁটি ধরে'—

দূষণ

তুই এগো—আমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে (বসিয়া নিজের পায়ের কাঁটা দেখিতে লাগিল)। উঃ উঃ উঃ—উঃ টন্ টন্ করছে,—আমি পরে যাচ্ছি, তুই ঝট্ করে' যা—

খর

এই, এই, এই, এই, এই—এ্যা—চোখে কি একটা উড়ে এসে পড়্লো—ঃঃ দ্যাখ্ তো, দ্যাখ্ তো উঃ উঃ-উঃ-উঃ কন্‌কন্ করছে (চোখ রগড়াইতে লাগিল।)—তুই আগে যা, আমি পরে যাচ্ছি।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রাত্রি নিশীথে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী উগ্রচণ্ডা ত্রিশূল হাতে অতি সতর্কতার সহিত লঙ্কাপুরী পাহারা দিতেছেন। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ,—হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন নগরের প্রাচীরের পার্শ্বে মাটিতে পড়িয়া কে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিয়া উগ্রচণ্ডা কহিলেন—)

উগ্রচণ্ডা

এত রাত্রে কার এই আর্ত্তনাদ? কে কাঁদে—কে বাছা তুমি? (উগ্রচণ্ডার কথা শুনিয়া আর্ত্তনাদ থামিয়া গেল। মূর্ত্তিটি ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল।)

মূর্ত্তি

(কাঁদিতে কাঁদিতে কানে হাত দিয়া) কে, মা উগ্রচণ্ডা! কান গেল মা, কান গেল—যাতনায় প্রাণ গেল উঃ হুঃ হুঃ—

উগ্রচণ্ডা

আরে এ যে অকম্পন? কী ব্যাপার?

অকম্পন

মা লঙ্কেশ্বরি, কান গেল মা, কান গেল। রাবণ রাজার

আদেশে আমার কান কেটে নিশাচরেরা আমাকে রাজ্যের বার করে' দিয়েছে।

উগ্রচণ্ডা

অপরাধ ?

অকম্পন

(কাঁদিতে কাঁদিতে) অপরাধ আমার কিছুই নাই,—ঐ চুলোলখোর বজ্রহনুটাই যত নষ্টের গোড়া,—ওরই কান কাটা উচিত।

উগ্রচণ্ডা

কি হয়েছে তেঙ্গেই বল না ছাই।

অকম্পন

আমি লুকিয়ে লুকিয়ে রাবণ রাজার নর্ত্তকীদের সঙ্গে আলাপ করছিলাম,—তা এমন আর কি দোষ করেছি—ঐ খিটুলে রাক্ষস বজ্রহনুটা হিংসা করে' রাজা দশাননের কানে কথাটা তুলে দিয়েছে, আর রাবণ রাজার হুকুমে রাক্ষসগুলো কাঁচ্ ক্যাচ্ করে' আমার কাণ দুটো কেটে আমাকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে,—উঃ হুঃ হুঃ—কাণ গেল মা, কান গেল।

উগ্রচণ্ডা

(তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া) আহা ওঠো বাছা,—এমন কি আর দোষ করেছে,—তুমি ছেলেমানুষ বইতো নও—যাও ঘরে যাও।—এই আমি তোমার কানে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—সব যাতনা দূর হবে—(কানে হাত বুলাইয়া) আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমার মঙ্গল হবে।

অকম্পন

ঘরে যাব কি করে' মা। রাজা দশাননের আদেশ আমায় লঙ্কা পরিত্যাগ করে' যেতে হবে।

উগ্রচণ্ডা

আমি থাকতে তোমার কিছু ভয় নেই। রাজা দশানন যতই দুর্দ্দান্ত হোক্—আমার কথায় ওঠে বসে। আমি থাকতে তোমার কিছু ভয় নেই বাছা। কাল সকালে আমি তোমাকে নিজে রাবণ রাজার সভায় নিয়ে যাব। যাও বাছা এখন ঘরে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাবণ রাজার সভা। সকলে উপস্থিত)

রাবণ

প্রহস্ত, অকম্পনের কি স্পর্দ্ধা, লুকিয়ে আমার নর্ত্তকীদের সঙ্গে সে আলাপ করে ?

বজ্রহনু

মহারাজ, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি কাল অকম্পন আপনার সব চেয়ে রূপসী নর্ত্তকীটির হাত ধ'রে কোমর বেঁকিয়ে নাচ্ ছিল—(সভাস্থ সকলে—'অসহ্য, অসহ্য।')

প্রহস্ত

তার সমুচিত শাস্তি সে পেয়েছে,—তার কান দুটি কেটে রাজ্যের বাইরে বের করে' দেওয়া হয়েছে।

বজ্রহনু

তার মুণ্ডপাতই সমুচিত দণ্ড ছিল।

(এমন সময় 'হাঁউ মাঁউ' করিতে করিতে নাক কাটা শূর্পণখার প্রবেশ। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল 'একে ? একে ?')

শূর্পণখা

দাদা, তোঁমার আঁদুরে বোঁন্ শূঁর্পণখার দঁশা দেঁখ—(রাবণ উঠিয়া দাঁড়াইল,—সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলেই দাঁড়াইল।)

রাবণ

(ক্রোধে কাঁপিয়া) একি, বিশ্বত্রাসী রক্ষকুলপতি লঙ্কেশ্বর দানব দশাননের ভগিনী শূর্পণখার এ দশা করে—কার হেন স্পর্দ্ধা !!! (বসিল।)

(সভাস্থ সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল 'কার স্পর্দ্ধা ?'—তাহারাও বসিল।)

শূর্পণখা

দেঁব নঁয়—দাঁনব নঁয়—সাঁমান্য এঁক কঁচকে মাঁনুষের কীঁর্ত্তি দাঁদা—সাঁমান্য এঁক মাঁনুষের কীঁর্ত্তি,—লঁক্ষ্মণ তাঁর নাঁম, তোঁমার কুঁলে কাঁলী দাঁদা—তোঁমার কুঁলে কাঁলী—(ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল)।

রাবণ

তোমার অপরাধ ?

সূর্পণখা

আমার অপরাধ কিছু নেই দাদা,—আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে সে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিল,—আমি রাজী হই নাই তাই—

রাবণ—কার এত স্পর্দ্ধা ! !

রাবণ

প্রহস্ত, অনুসন্ধান কর কে এই অসমসাহসী নর লক্ষ্মণ,—তার সমুচিত দণ্ডবিধান করতে হবে—(সভাস্থ সকলে—'মুণ্ডপাত, মুণ্ডপাত' ।)

সূর্পণখা

(চীৎকার করিয়া) আমার কি গতি হবে গো—

(উগ্রচণ্ডার আগমন। রাবণ দাঁড়াইল। সভাস্থ সকলে দাঁড়াইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"জয় মা লঙ্কেশ্বরী উগ্রচণ্ডার জয়।")

রাবণ

কে, দেবী উগ্রচণ্ডা, প্রণাম হই,—

উগ্রচণ্ডা

তোমার মঙ্গল হোক্। (সূর্পণখাকে দেখিয়া) একি সূর্পণখার এ দশা হোল কি ক'রে ?

(সূর্পণখা উগ্রচণ্ডাকে দেখিয়া হাঁউ মাঁউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।)

প্রহস্ত

দেবি, কে এক ক্ষুদ্র নর, দানবী সূর্পণখার এ দশা করেছে।

উগ্রচণ্ডা

(হো হো করিয়া হাসিয়া) চক্রীর চক্র, চক্রীর চক্র—

রাবণ

দেবি, হাস্‌ছেন যে—

উগ্রচণ্ডা

হাসার কারণ ঘটেছে তাই হাস্‌ছি। রাজা দশানন, সূর্পণখার বিবাহের ব্যবস্থা কর।

সূর্পণখা

ঠাট্টা করবেন না দেবি, এ অবস্থায় সূর্পণখাকে কে বিয়ে করবে ?

উগ্রচণ্ডা

করবে অকম্পন—

সূর্পণখা

মা, আমার যে নাক কাটা—

উগ্রচণ্ডা

অকম্পনেরও কান কাটা—ঠিক হবে—

রাবণ

(উগ্রচণ্ডার প্রতি) দেবী, তোমার আদেশ শিরোধার্য্য ; তোমার হুকুম অমান্য করবার সাহস লঙ্কায় কারো নেই কিন্তু অকম্পনকে যে রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তার গুরুতর অপরাধের জন্য।

উগ্রচণ্ডা

ভয় নেই, তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি,—তোমার ভয়ে সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে,—তার অপরাধ ক্ষমা কর।

বজ্রহনু

(রাবণের প্রতি) মহারাজ, অকম্পন নিজের কান মলে ক্ষমা প্রার্থনা করুক—

প্রহস্ত

এই চুপ,—তার কান থাকলে অবশ্যই সে ব্যবস্থা করা যেত—এখন সেটা বিবেচনার বাইরে—

রাবণ

দেবীর আদেশে অকম্পনকে ক্ষমা করলাম। (কয়েকটি নিশাচরের প্রতি) যাও তাকে সসম্মানে কাঁধে করে নিয়ে এস।

(রাক্ষসগণ হল্লা করিতে করিতে বাহিরে গেল ও কিছুক্ষণ পর কাঁধে করিয়া অকম্পনকে লইয়া সভায় প্রবেশ করিল। অকম্পন কাঁপিতে লাগিল।)

রাবণ

প্রহস্ত, নগরে ঘোষণা করে দাও, দেবী উগ্রচণ্ডার আদেশে আজ রাত্রে সমুদ্রতীরে দানব অকম্পনের সহিত দানবী সূর্পণখার বিবাহ। এক সপ্তাহ কাল ধরে এই উপলক্ষ্যে নৃত্য গীত চলুক। সূর্পণখার বিবাহের পর বে-আদব লক্ষ্মণের বিচার হবে। আজকের মত সভা ভঙ্গ হোক।

সকলে

(দাঁড়াইয়া) জয় দেবী উগ্রচণ্ডার জয়
জয় রাবণ রাজার জয়,
জয় সূর্পণখার জয়,
জয় অকম্পনের জয়।—

শেষ দৃশ্য

(সূর্পণখার বিবাহ রাত্রে সমুদ্রতীরে উৎসব। সূর্পণখা ও অকম্পনকে ঘিরিয়া রাক্ষসদের গীত ও নৃত্য।)

রাক্ষসদের গান

ডুরুম্ দাড়াম্—ড্রাম্ ড্রাম্
ধুম্ ধাম্—হম্ হাম্
খট্ খটা খট্—
চট্ পটা পট্
নাচনা চালাও
খাস্‌না হোঁচট্—;
রঙ্গে নাচ,
ভঙ্গে নাচ,
সঙ্গে বাজাও
বাজ্‌না বিকট;
কানকাটা ও
নাক্ কাটাতে
জোট বেঁধেছে
আজ অকপট;
খট্ খটা খট্
চট্ পটা পট্
ডুরুম্ দাড়াম্—ড্রাম্ ড্রাম্
ধুম্ ধাম্—হম্ হাম্।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

রবীন্দ্রাষ্টক

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

১

নন্দন-বন হ'তে কে আনিল গন্ধ
মধুবাত হিল্লোলে সুললিত ছন্দ
বাণী মন্দিরে আজ কে সাজাল দীপালী
কে রচিল বন্দনা অভিনব গীতালি ;
দিকে দিকে দেশে দেশে বাজে জয়তূর্য্য
জয়তু রবীন্দ্র হে জয় কবি-সূর্য্য ।

২

কার গানে চোখে নামে মন্থর তন্দ্রা
ললাটে শোভিছে কার গৌরব চন্দ্রা,
বন্দিনী ছন্দে কে দিল আজ মুক্তি
অতলের তল হ'তে মুক্তা ও শুক্তি ;
গগনে পবনে হের বাজে জয় তূর্য্য,
জয়তু রবীন্দ্র হে জয় কবি-সূর্য্য ।

৩

ধ্যানলোকে জ্ঞানলোকে প্রণবের দ্রষ্টা,
জীর্ণ জাতির বুকে তরুণের স্রষ্টা,
সত্যের সন্ধানে মধুকর-চিত্ত
কাব্য-কমল বনে গুঞ্জরে নিত্য ;
সিন্ধুর গর্জ্জনে উঠে জয় তূর্য্য,
জয়তু রবীন্দ্র হে জয় কবি-সূর্য্য ।

৪

অরূপের রূপ আজ ফুটিয়াছে ছন্দে
স্বরগের পারিজাত বর্ণে ও গন্ধে,
কিন্নরী নাচে যেন ধূলিমাখা মর্ত্ত্যে,
আলোকের ঝর্ণা কে দিল মোহ গর্ত্তে ;
মেরু মরু পর্ব্বতে উঠে জয় তূর্য্য
জয়তু রবীন্দ্র হে জয় কবি-সূর্য্য ।

৫

কাব্য-তটিনী স্রোতে বহে হাসি কান্না,
তটে কত ফুটে ফুল হীরা মতি পান্না ;
কে তুলিল মূর্চ্ছনা সুপ্ত সারঙ্গে
প্রাণ করি উৎরোল নির্জ্জীব বঙ্গে ;
মেঘ মল্লারে হের উঠে জয় তূর্য্য,
জয়তু রবীন্দ্র হে জয় কবি-সূর্য্য ।

৬

'বিশ্বপ্রেমের গান কে গাহিল বঙ্গে
মিলাইল প্রাচ্যকে প্রতীচ্য সঙ্গে,
দিকে দিকে প্রচারিয়া ভারতের কৃষ্টি
লীলায়িত ভাষা আজ কে করিল সৃষ্টি,
অর্পিল বাণী পদে ছন্দারবিন্দ,
জয়তু বিশ্বকবি জয় শ্রীরবীন্দ্র ।

৭

ছন্দের হিল্লোলে ভাবে ভোর অন্তর
কে দিল জড়ের বুকে অমৃত মন্তর,
পতিতের ভগবানে কে করিছে আরতি,
সাম্য-মৈত্রী রথে কেগো ঐ সারথী,
মহর্ষি নন্দন বিশ্ব কবীন্দ্র,
জয়তু বাঙ্গালী কবি জয় শ্রীরবীন্দ্র ।

৮

কবিগুরু ! তব গানে হিয়া মোর মুগ্ধ,
উন্মন চিন্ময় ধরাধূলি ক্ষুব্ধ,
দুখ জ্বালা ভুলে যাই তন্ময় চিত্তে
লয়ে যায় ভাবময় স্বপনের তীর্থে ;
প্রণমি তোমারে গুরু বিশ্ব কবীন্দ্র,
জয়তু প্রেমিক কবি জয় শ্রীরবীন্দ্র ।

যৎকিঞ্চিৎ

ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, পি, এইচ, ডি (বার্লিন)

এ বৈঠকের আজ পর্য্যন্ত যতগুলি অধিবেশন হয়েছে তার সব গুলিতে অল্প বিস্তর (মানসিক) গুরুভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল। উপর্য্যুপরি গুরুভোজনের দুষ্পাচ্যতা-দোষ সত্বেও নিমন্ত্রিতবর্গের উপস্থিতির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না সত্য, কিন্তু এ ব্যবস্থা কায়েমী হয়ে গেলে ভবিষ্যতে নিমন্ত্রণ জিনিষটাই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠ্‌তে পারে। এতদুভয় কারণে আয়োজন মধ্যে মধ্যে একটু লঘু হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'যৎকিঞ্চিৎ'-যোগে লঘু পথ্যের ব্যবস্থা আজ সেইজন্য।

কথিত আছে একদা পঞ্চালদুহিতা মাত্র শাককণা দ্বারা দুর্ব্বাসার মত উগ্রস্বভাব ঋষি ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গোবর্গকে শান্ত করেছিলেন এবং বিদুরের ভিক্ষালব্ধ খুদকণায় স্বয়ং শ্রীভগবানেরও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছিল। তাই সাহস পেলাম।

'বৃহৎ' সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ক্ষুদ্রের দিকে আমরা মনোযোগ দিতে বড় অভ্যস্ত নই। বহির্জগতে যা ক্ষুদ্র, আমাদের মনোজগতে তা সাধারণতঃ ক্ষুদ্রই থেকে যায়। কিন্তু এটা খুবই সত্য যে নাম, আয়তন বা পরিমাণ দ্বারা বস্তুবিশেষের সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা উচিত বা সম্ভবপর হয় না। অতএব 'যৎকিঞ্চিৎ' নাম শুনেই আপনারা নাসিকা কুঞ্চন করবেন না। 'যৎকিঞ্চিৎ' বলেই যে 'অকিঞ্চিৎকর' হতে হবে এমন কি কথা আছে? বরং সময় সময় এর শক্তি ও প্রভাব যেমন বিরাট্ তেমনি দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে। বাস্তব জগতে যৎকিঞ্চিতের প্রয়োজনীয়তা বড় একটা অগ্রাহ্যের সামগ্রী নয়।

সকলেই জানেন আজকাল খাদ্যপ্রাণ (vitamin) নিয়ে খুব একটা হৈ চৈ হচ্ছে। সুরস, সুস্বাদু খাদ্য হলেই চল্‌বে না,—fat (স্নেহ জাতীয়), protein (পলীয়) ও Carbohydrate (শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয়) এই তিন উপকরণের সঠিক সংমিশ্রণ হলেও সে খাদ্যে শরীর পুষ্ট হবে না। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য, জীবনীশক্তির পূর্ণবিকাশের জন্য এমন খাদ্যসমন্বয় চাই যার মধ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণগুলি বর্ত্তমান থাকবে। অন্যথা নানা জাতীয় রোগের (deficiency disease) উৎপত্তি অনিবার্য্য। A, B, C, D, E প্রভৃতি ৮।৯ প্রকারের খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন খাদ্যে এক বা ততোধিক খাদ্যপ্রাণ বিদ্যমান, কোনটি আবার একেবারে খাদ্যপ্রাণ-হীন। এই খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ কতটুকু? অতি যৎকিঞ্চিৎ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যে নগণ্য শাক,—বিশেষতঃ পালং শাক (ইংরাজী Spinach জাতীয়) চিরকাল দুঃস্থের খাদ্য বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে আজকাল তা এক মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য বলে পরিচিত হচ্ছে। কারণ এর মধ্যে অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় বেশী পরিমাণে এবং বেশী প্রকারের খাদ্যপ্রাণ আছে। "সোনার দরে শাক বিক্রয় হওয়া উচিত"—এ কথা তাই মাঝে মাঝে শুন্‌তে পাওয়া যায়। অতিরঞ্জনের অবশ্য সীমা নাই। এ রকম গল্পগুজবও শোনা যায় যে অদূরভবিষ্যতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমন খাদ্যপ্রাণ-সংমিশ্রণ তৈরী হবে যার দু' চার ফোঁটা মিশিয়ে একবার পান করলেই সমস্ত দিনের জন্য খাদ্যগ্রহণের বালাই চুকে যাবে। যা হোক, এ সব বৈঠকী রসিকতার মধ্যে সত্য হচ্ছে এই যে খাদ্যমধ্যস্থ 'খাদ্যপ্রাণ' জিনিষটির পরিমাণ অতি যৎকিঞ্চিৎ। এত যৎকিঞ্চিৎ যে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এতাবৎকাল অনুভূত হয় নি। অথচ এর কি আশ্চর্য্য শক্তি!

বৈজ্ঞানিকগণ 'যৎকিঞ্চিৎ'কে কখনও অগ্রাহ্য করেন না। দেখা গিয়েছে অনেকে এরই অনুসন্ধানে বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বড় বড় কারখানায় 'waste matter' নামে যে দ্রব্যগুলি পূর্ব্বে

আবর্জনা হিসাবে পরিত্যক্ত হোত, ব্যবহারিক রসায়নবিদ্‌গণ এখন বিশেষ যত্নসহকারে সেগুলি পরীক্ষা করে থাকেন—এই আশায় যদি সেই স্তূপের মধ্যে কোন দুর্মূল্য 'যৎকিঞ্চিৎ' লুকায়িত থাকে। বহু স্থলে এই অনুসন্ধানের ফলে এমন সব মূল্যবান উপজাত সামগ্রী (by-products) পাওয়া গিয়েছে যার জন্য অনেক শ্রমশিল্পের কারখানা (manufacturing industry) আধুনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে এমনও টিকে আছে।

রেডিয়ম ধাতুর নাম ও তার অদ্ভুত প্রকৃতির কথা আপনাদের অবিদিত নাই। এই ধাতুর আবিষ্কারের ইতিহাস থেকে 'যৎকিঞ্চিতের' শক্তির কিছু আভাস পাবেন। এই ধাতুটি স্বতঃবিভজ্যমান (Spontaneously disintegrating); অনুক্ষণ আপনাকে ভাঙছে এবং তার ফলে এ থেকে অবিশ্রান্তভাবে উত্তাপ, অদৃশ্য রশ্মি ও গ্যাস (emanation) বার হচ্ছে। এই শেষোক্ত গ্যাসটি আবার নিজে থেকে ভেঙে-চুরে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করতে করতে পরিশেষে হিলিয়ম গ্যাস ও সীসক ধাতুতে পরিণত হচ্ছে। রেডিয়ম থেকে হিলিয়ম্ গ্যাস ও সীসক ধাতুর উৎপত্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রকৃতির রাজ্যে আপনা-আপনি এক ধাতুর অপর ধাতুতে পরিবর্ত্তন (transmutation of metals) চলছে। অতি প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণ এই 'transmutation of metals' নামক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাম্র প্রভৃতি 'নীচ' ধাতুকে স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি 'মহৎ' ধাতুতে পরিণত করা তাঁরা সম্ভবপর মনে করতেন। এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তাঁরা কয়েক শ' বৎসর ধরে 'পরশ-পাথরের' সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন—"ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর"। কিছুকাল পূর্ব্বেও এই প্রাচীন কল্পনাটিকে উপহাস করে লোকে আনন্দ পেত। কিন্তু মতবাদ-চক্র ঘুরছে। পণ্ডিত-সমাজ ধীরে ধীরে আবার পুরাতন মতবাদটীর দিকে সস্নেহনয়নে তাকাচ্ছেন।

এইবার আমাদের পুরাতন প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্। রেডিয়ম থেকে নিঃসৃত যে অদৃশ্যরশ্মির কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে, ঐরূপ রশ্মিবিকীরণ-শক্তির নাম radio-activity। তখনও রেডিয়ম ধাতু আবিষ্কৃত হয়নি কিন্তু ইউরেনিয়ম্ (Uranium) ধাতু থোরিয়ম্ (Thorium) ধাতুর মধ্যে উক্তরূপ গুণ দেখা গিয়েছিল। পিচ্‌ব্লেণ্ড্ (Pitchblende) নামক একটি খনিজ পদার্থে এই ইউরেনিয়ম্ ধাতু (Oxide রূপে) বিদ্যমান থাকে। সুতরাং পিচ্‌ব্লেণ্ড্-এর মধ্যে রশ্মিবিকীরণ-শক্তি থাকবার কথা—অবশ্য বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম-এর শক্তির তুলনায় কম মাত্রায়। বোহিমিয়া প্রদেশে প্রাপ্ত পিচ্‌ব্লেণ্ড্ পরীক্ষা করে দেখা গেল এর রশ্মিবিকীরণশক্তি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম্ থেকে কম হওয়া দূরে থাকুক তদপেক্ষা ২.৩ গুণ বেশী। অথচ সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এর মধ্যে ইউরেনিয়ম্ ব্যতীত উক্ত গুণসম্পন্ন অন্য কোনও পদার্থ ধরা পড়্‌ল না। তবে কোন্ অদৃশ্য পদার্থ পিচ্‌ব্লেণ্ড্-এর মধ্যে লুকায়িত থেকে একে এরূপ শক্তিমান্ করছে? এর পরিমাণ যে অতি যৎকিঞ্চিৎ তাতে সন্দেহ নাই—অন্যথা রাসায়নিক পরীক্ষায় তা সহজেই ধরা পড়্‌ত। অথচ এই যৎসামান্যের শক্তি অসামান্য—নিজে গুপ্ত থেকেও নিজের শক্তিকে গোপন রাখ্‌তে পারছে না। তখন কুরী-দম্পতী এই গুপ্তদ্রব্যের অনুসন্ধানে উঠে পড়ে লাগলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে একদিন তাঁরা জগৎকে শুনালেন "গুপ্ত জিনিষ ধরা পড়েছে—তার পরিমাণ মোটামুটি একশত মণ পিচ্‌ব্লেণ্ড্-এর মধ্যে এক গ্র্যাম মাত্র, এবং তার রশ্মিবিকীরণশক্তি ইউরেনিয়ম ধাতুর দশ লক্ষ গুণ।" দ্রব্যটি রেডিয়ম ধাতুর একটি যৌগিক পদার্থ—শক্তির উৎস রেডিয়ম্ নিজে। কিছু পরে ১৯১০ সনে এই পদার্থ থেকে মাদাম কুরী রেডিয়ম ধাতু পৃথক করেন। জগতে ধন্য ধন্য রব উঠ্‌ল।

কৃত্রিম আলোকের ইতিহাসে গ্যাস ও তড়িৎ-এর আবির্ভাব এক নবযুগ আন্‌ল। কয়লা-পোড়ান গ্যাস (coal gas) জালিয়ে আলোকের প্রবর্ত্তন উইলিয়াম্ মারডক্ প্রথম ১৭৯৮ সনে করলেন। তেল বা মোমবাতির তুলনায় এই আলোকের তীক্ষ্ণতায় লোকে বিস্মিত ও মুগ্ধ হল। ১৮১২ সনে লণ্ডন এবং ১৮১৫ সনে প্যারিস

সহর গ্যাস-বাতির সাহায্যে আলোকিত হ'ল। কিছু দিন পরে কিন্তু তাও যথেষ্ট বলে মনে হোল না—আরও উজ্জ্বল আলোক চাই। দেখা গেল গ্যাসের আলোকশিখার মধ্যে জমাট বাঁধা চুণ (lime) কিংবা ঐ জাতীয় অন্য পদার্থ (যেমন oxides of magnesium and rare-earths) রাখলে সেটা উত্তপ্ত হয়ে তীক্ষ্ণ শ্বেতবর্ণের আলোক বিকীরণ করে। এই হোল lime-light এর সৃষ্টি। আরও উন্নতি চাই—বিশেষতঃ বৈদ্যুতিক আলোকের অভ্যুদয়ে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় গ্যাস-বাতিকে বাঁচাতে হলে তার আরও উন্নতিসাধন প্রয়োজন। কি ভাবে হোল বলি। পূর্ব্বে গ্যাস-বাতির অগ্নিশিখা উন্মুক্ত ও দৃষ্টিগোচর থাকৃত। আপনারা লক্ষ্য করেছেন এখন ওটি একটি শ্বেতবর্ণ জালের টুপি—(gas-mantle) দ্বারা আবৃত থাকে। গ্যাস-বাতির অগ্নিশিখা এই টুপিকে উত্তপ্ত করে—এবং এই টুপি এমন পদার্থে নির্ম্মিত যা উত্তপ্ত অবস্থায় অতি উজ্জ্বল শ্বেত আলোক বিকীরণ করবার শক্তি ধারণ করে। এই টুপিই গ্যাস-আলোকের সমৃদ্ধির কারণ। ১৮৬৬ সনে Auer Von Welsbach এই টুপি নির্ম্মাণ করেন thorium oxide ও কিছু কিছু অন্যান্য rare-earth জাতীয় ধাতুর oxide এর সাহায্য নিয়ে। উক্ত উপায়ে আলোকের উজ্জ্বলতা বাড়্‌ল বটে, কিন্তু সন্তোষজনক হ'ল না। বিশুদ্ধ thorium oxide একাকী উজ্জ্বলতা দানে বিশেষ সাহায্য করে না। কিন্তু তার সঙ্গে অল্প পরিমাণ Cerium oxide মিশ্রিত করায় সুফল পাওয়া গেল এবং দেখা গেল Thorium oxide এর সঙ্গে শতকরা এক ভাগ মাত্র Ceria নিলে আলোকের তীক্ষ্ণতা দশ গুণ বেড়ে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই অনুপাতের (৯৯ : ১) হ্রাসবৃদ্ধির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হ'লে আলোকের প্রখরতা ক্ষুণ্ণ হ'বে—Ceria র পরিমাণ বৃদ্ধিতেও আলোকের হ্রাস—এবং এই পরিমাণ বেড়ে শতকরা দশ ভাগে পৌছালে আলোক-বিকীরণ-শক্তি প্রায় বন্ধ হয়েই যায়। অন্য দিকে মাত্রা ১ ভাগ অপেক্ষা যত হ্রাস করবেন আলোকও সেই পরিমাণে নিস্তেজ হবে। Ceria র সঙ্গে আলোকের তীক্ষ্ণতা জড়িত, অথচ এর পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে তীক্ষ্ণতার হ্রাস কেমন করে সম্ভব হ'ল? এ রহস্য "প্রকৃতির একটা খেয়াল" এই বলে মনকে প্রবোধ দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পন্থা। তবে সম্ভবপর যেমন করেই হোক না, আপনারা যৎকিঞ্চিৎ Ceria র পরিচয় পেলেন।

সাধারণ বাতাস জিনিষটাকে পরীক্ষা করে আমরা কি দেখি? এর মধ্যে প্রধানতঃ অম্লজান (অক্সিজেন) ও যবক্ষারজান (নাইট্রোজেন) এই দুই বায়ু এবং তদনুপাতে যৎকিঞ্চিৎ (দশ হাজারে তিন ভাগ) অঙ্গারাম্ল বায়ু (কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস) বিদ্যমান। প্রাণী-জগতের জীবনধারণের জন্য অম্লজান একান্ত প্রয়োজনীয়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ইহা শরীরমধ্যে প্রবেশ করে এবং কার্য্যশেষে প্রশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গারাম্ল বায়ু ও জলীয় বাষ্পাকারে বার হয়ে আসে। এই অঙ্গারাম্ল বায়ু জীবজন্তুর পক্ষে সাক্ষাৎ বিষবৎ প্রাণহানিকর নয় সত্য, কিন্তু বাতাসে এর অনুপাতবৃদ্ধি ঘটলে অম্লজানের অনুপাত সেই পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং এরূপ অম্লজানস্বল্প বাতাসে প্রাণধারণ চলে না। এটা দূষিত বায়ু। বদ্ধ ঘরে বহু লোকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে এই ভাবে বায়ু দূষিত হয়ে (অন্ধকূপ-হত্যা ব্যাপারের মত) মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। তবে সাধারণ বায়ুর মধ্যে স্বল্প পরিমাণ অঙ্গারাম্ল বায়ু থাকবার প্রয়োজন কি? এর অস্তিত্ব হিত না করে কি অহিতের কারণ হয়েছে? জীবজগতের পক্ষে অম্লজানের যেরূপ প্রয়োজন, উদ্ভিদ্‌জগতের পক্ষে অঙ্গারাম্ল বায়ুর প্রয়োজন তদ্রূপ। এটা উদ্ভিদের অন্যতম খাদ্যস্বরূপ। উদ্ভিদ্-পত্রের সবুজ রং-এর সাহায্যে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই বায়ু থেকে চিনি, শ্বেতসার ও অন্যান্য শর্করা-জাতীয় এবং তৈলজাতীয় পদার্থ প্রস্তুত হয়ে উদ্ভিদ্-দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত হয়ে থাকে, এবং পরিশেষে প্রাণী-জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে—খাদ্যরূপে ও অন্যান্য হিসাবে।

নরম লোহা (Wrought iron) ও ইস্পাত (Steel) মুখ্যতঃ একই পদার্থ—দুইই লোহা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গুণাগুণের পার্থক্য কত! একটি নরম, টানলে বাড়ে, চাপ পেলে বেঁকে যায়—অন্যটি কঠিন ও স্থিতিস্থাপক,—

ভারবহনের শক্তি তার প্রচুর, এবং এই সব গুণাবলীর জন্য তাকে কত প্রকারেই না ব্যবহার করা হয়ে থাকে! অস্ত্রশস্ত্র, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, লৌহবর্ম্ম, সেতুনির্ম্মাণ, ইমারৎ ইত্যাদিতে ইস্পাতেরই চাহিদা—নরম লোহা এ সব ক্ষেত্রে একেবারে অকর্ম্মণ্য। এরূপ প্রভেদের হেতু কি? পরীক্ষা করে দেখা গেছে উভয়বিধ লোহার মধ্যে স্বল্প পরিমাণ অঙ্গার বিদ্যমান থাকে। নরম লোহাতে মোটামুটি হাজারকরা এক ভাগ এবং ইস্পাতের মধ্যে দুই থেকে দশ ভাগ পর্য্যন্ত। 'যৎকিঞ্চিৎ' অঙ্গারের আনুপাতিক ইতরবিশেষ উভয়ের মধ্যে এত পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে।

রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে সচরাচর লক্ষ্য করা যায় এক কামরায় দু'জন অপরিচিত যাত্রী পাশাপাশি বসে আছেন—তাঁদের মধ্যে বাক্যবিনিময় পর্য্যন্ত চলছে না, একে অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন সময় একজন তৃতীয় ব্যক্তি এসে এঁদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন তাঁদের মধ্যে বেশ আলাপ, ভাবের আদান-প্রদান চল্‌তে লাগ্‌ল এবং যেন বেশ একটা সদ্ভাবের সৃষ্টি হ'ল। এই তৃতীয় ব্যক্তিটির মত এক শ্রেণীর পদার্থ রসায়নশাস্ত্রে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। একে Catalyst বা Catalytic agent আখ্যা দেওয়া হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় দুটি দ্রব্যের পরস্পরের প্রতি কোনও টান নাই—তাদের সংমিশ্রণে কোনরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটছে না। কিন্তু একটুকু ঐ তৃতীয় পদার্থ (Catalyst) সেখানে উপস্থিত করামাত্রই রাসায়নিক ক্রিয়া সহজ হয়ে গেল। প্রথম পদার্থদ্বয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হ'ল—আদান-প্রদান চলতে লাগ্‌ল। Catalystটি যেন এক honorary ঘটকঠাকুর। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার শেষে এর সত্তার বা পরিমাণের কোন পরিবর্ত্তন কিন্তু লক্ষিত হয় না।

দু'-একটা দৃষ্টান্ত দিই। জলজান (হাইড্রোজেন) ও অম্লজান বায়ুর রাসায়নিক সংযোগে জলকণার উৎপত্তি। একটা বোতল দু'ভাগ জলজান ও একভাগ অম্লজান বায়ু দ্বারা পূর্ণ করে তার মুখে অগ্নিশিখা ধরলে ভীষণ গর্জ্জনের সঙ্গে বাষ্পকণার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান-শ্রেণীর ছাত্রের কাছে এ গর্জ্জন সুপরিচিত। সাধারণতঃ উক্ত বায়ু দু'টির মধ্যে জলীয় বাষ্প যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে থেকে যায়। কিন্তু যত্ন সহকারে বায়ু দু'টীকে জলীয়বাষ্পহীন করে বোতলবদ্ধ করুন এবং অগ্নিশিখা সংযোগ করুন, গর্জ্জনও শুনবেন না—জল কণার সৃষ্টিও হবে না। এই বজ্রনিনাদী রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সংঘটন কে ঘটাল? কার অভাবেই বা এটা স্থগিত রইল? ঐ যৎকিঞ্চিৎ বাষ্পকণা।

সল্‌ফিউরিক এসিড্‌ নানাবিধ শ্রমশিল্পের জন্য একটি একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী ও আমেরিকায় প্রতি বৎসর তা কোটি কোটি মণ প্রস্তুত হয়ে থাকে। দগ্ধ গন্ধক বায়ু (সলফার্ ডাই-অক্‌সাইড্‌) ও অম্লজানের সংযোগে এর উৎপত্তি হয়। কিন্তু উক্ত বায়ু দুটী একত্র মিশ্রিত করলে, উত্তাপযোগেও কোন ফল পাওয়া যায় না কিংবা এত স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায় যে তা কোন কাজের হয় না। কিন্তু এই বায়ু-মিশ্রণকে গরম অবস্থায় যদি সামান্য পরিমাণ প্ল্যাটিনম ধাতুর গুঁড়ার সংস্পর্শে আনা যায় তৎক্ষণাৎ দুটি সংযুক্ত হয়ে sulphuric acid-এর সৃষ্টি করে। প্রক্রিয়ার শেষে প্ল্যাটিনম-এর কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।

'নীল' (indigo blue) রঞ্জনশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম উপকরণ। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হ'ত। বিশ্বের বাজারে ভারতই ছিল প্রধানতঃ এর সরবরাহকারী এবং প্রতিবৎসর কোটী কোটী টাকার নীল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হ'ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্ম্মেনীর লোলুপ দৃষ্টি এর উপর পড়্‌ল। Baeyer প্রমুখ রসায়নবিৎগণ কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুতের পন্থা আবিষ্কার করতে লাগলেন এবং ১৮৯৭ সনে বিখ্যাত Badische Anilin und Soda Fabrik কৃত্রিম নীল প্রথম বাজারে উপস্থিত করলেন। সেই অবধি এর দ্রুত উন্নতি হ'তে লাগ্‌ল এবং উদ্ভিজ্জাত নীল ক্রমশঃ কোণঠেসা হ'ল। ১৮৯৭ সনে ভারত থেকে প্রায় ৫ কোটী টাকা মূল্যের নীল রপ্তানি হয় এবং ষোল বৎসর পরে ১৯১৩ সনে—অর্থাৎ মহাসমরের পূর্ব্ব বৎসরে মোটে ৯ লক্ষ টাকার ভারতীয় নীল বিক্রী হয়। নীলের মূল্যও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে অর্দ্ধেক হয়ে গেল। যুদ্ধের কয়েক বৎসর জার্ম্মানী শিল্পব্যবসার দিকে মনোযোগ

দেবার অবসর না পাওয়ায় ঐ সময় ভারতের নীলের পক্ষে কতকটা সুবিধা হয় বটে—কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী মাত্র—এখন কৃত্রিম নীলেরই জয় জয়কার।

এই নীল প্রস্তুতের উপকরণাদির আদি সূত্র হচ্ছে ন্যাপ্‌থালিন। তাকে ভেঙ্গে প্‌থ্যালিক এসিড্ করা চাই, এবং এই পরিবর্ত্তন সল্‌ফিউরিক্ এসিডের সাহায্যে সম্পাদিত হয়ে থাকে। উক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহজ ও সন্তোষজনক উপায় আবিষ্কারের জন্য তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন temperature-এ পরীক্ষা চলতে লাগ্‌ল, কিন্তু মনোমত ফল পাওয়া গেল না। একদিন পরীক্ষাকালে দৈবক্রমে পাত্রস্থ তাপমান যন্ত্রটি ভেঙ্গে যায়—এবং সেদিন অভীপ্সিত ফলও পাওয়া গেল। ব্যাপারটা কি? Thermometer-এর মধ্যে যে অল্প পরিমাণ পারদ থাকে তারই সংস্পর্শে কি এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল? একটু পারদ সংযোগে পূর্ব্ব পরীক্ষার পুনরাবৃত্তির ফলে দেখা গেল ঠিক তাই। একটা নিছক দৈব ঘটনার ফলে যৎকিঞ্চিৎ পারদের যাদুশক্তি ধরা পড়্‌ল এবং বৈজ্ঞানিকের শ্রম সার্থক হ'ল। এই ভাবে—লোহা, তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতু চূর্ণীকৃত অবস্থায় নানা রাসায়নিক শিল্পে Catalyst রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আর এক রকম Catalyst আছে—প্রাণহীন অজৈব পদার্থ নয়, তারা জৈব ও ঔদ্ভিদ্—নিম্নতম স্তরের জীব ও উদ্ভিদ্ জাতীয়। micro-organisms—microbes, bacteria প্রভৃতি সূক্ষ্মতম জীবাণুর দল, অথবা yeast, mould বা fungus (ছত্রাক) প্রভৃতি উদ্ভিজ্জাণুজাতীয়। জলে, স্থলে, বাতাসে এদের অবারিত প্রবেশ। অতি সূক্ষ্ম, চক্ষুর অগোচর হলেও এদের প্রচণ্ড সংশ্লেষণ এবং বিশেষতঃ বিশ্লেষণশক্তি আমরা অনুক্ষণ অনুভব করি, এবং নানা ভাবে সেই শক্তির সাহায্যও নিয়ে থাকি। প্রাণি-জগতে বাহ্যিক ধ্বংস ও সৃষ্টিলীলা নিত্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। জীবদেহের অভ্যন্তরেও অনুক্ষণ সৃষ্টি ও লয়ের কার্য্য পাশাপাশি ঘটছে—কিন্তু এত সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে যে আমরা তা অনুভব পর্য্যন্ত করি না। এই দুই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যের উপর এক দিকে যেমন জগতের স্বাস্থ্য ও ক্রমোন্নতি, অন্য দিকে তেমনি জীবের স্বাস্থ্য ও দৈহিক পরিপুষ্টি নির্ভর করে। উক্ত ধ্বংস ও সৃষ্টিলীলায় সূক্ষ্ম জীবাণু দলের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। এদের কার্য্য কখন জীবনীক্রিয়ার অনুকূল, কখন বা প্রতিকূল। বিভিন্ন শ্রেণীর যৎকিঞ্চিৎ জীবাণুই বসন্ত, প্লেগ, ওলাউঠা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির জন্মদাতা। আজকাল Laboratoryতে নানা শ্রেণীর রোগোৎপাদক জীবাণু তৈরী করা (Culture) হচ্ছে। এবং চিকিৎসাশাস্ত্র "বিষস্য বিষমৌষধম্" এই মূলমন্ত্রের উপর নির্ভর করে—রোগস্রষ্টা জীবাণুর সহায়তায় নানা রকম রোগ নিবারণে ও প্রশমনে বদ্ধপরিকর হয়েছে। অন্যদিকে রসায়ন শাস্ত্র শ্রমশিল্পের মধ্য দিয়ে জীবাণুর প্রচণ্ড ক্ষমতার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করছে না। ভিন্ন ভিন্ন জীবাণুর সাহায্যে মদ থেকে সির্কা (vinegar), শর্করা বা শর্করাজাতীয় (carbohydrates) দ্রব্য থেকে মদ, lactic acid, citric acid, acetone প্রভৃতি, এইরূপে কত প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী কারখানায় প্রস্তুত হচ্ছে।

যৎকিঞ্চিতের শক্তির পরিচয়ের জন্য এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট দৃষ্টান্ত হাজির করা হয়েছে। যে বস্তু যত শক্তিমান্ ব্যবহারিক জগতে তার মূল্য ও আদর সেই অনুপাতে বেশী হয় যদি তার সদ্ব্যবহারের কোন উপায় নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। এই কারণে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যৎকিঞ্চিতের পরীক্ষায় পণ্ডিতগণ বিশেষ যত্নবান্ হলেন। ক্ষুদ্র হলেও, যতক্ষণ বস্তুটি দৃষ্টিগোচর থাকে, তাকে test-tubeএর মধ্যে পরীক্ষা করা চলে। কিন্তু তার আয়তন যদি দৃষ্টিসীমানার বাইরে চলে যায় তখন বৈজ্ঞানিকের মহাবিপদ্। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা আর চলে না। কারণ রাসয়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলাফল ইন্দ্রিয়গোচর এবং মুখ্যতঃ চক্ষুগোচর হওয়া চাই। যা হোক্ বৈজ্ঞানিক সহজে দমবার পাত্র নন্। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনিও নব নব পন্থা আবিষ্কার করছেন। সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব।

অত্যল্প পরিমাণ কিংবা অতি সূক্ষ্মায়তন বস্তুর পরীক্ষায় নিম্নোক্ত তিনটি যন্ত্রের সাহায্য একান্ত আবশ্যক—

(১) Spectroscope (২) Microscope (অণুবীক্ষণ যন্ত্র) ও (৩) Ultramicroscope (চরম অণুবীক্ষণ বলা যেতে পারে) ।

সর্ব্ববর্ণের সংমিশ্রণে শ্বেতবর্ণ। সেজন্য শ্বেত আলোক ত্রিশির কাচখণ্ডের (prism) দ্বারা বিশ্লিষ্ট হলে রামধনুর ন্যায় এক বর্ণচিত্রের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণতঃ আমরা এই চিত্রকে লাল, সবুজ, নীল, প্রভৃতি সাত বর্ণে বিভক্ত করে থাকি। এই রকম আলোক বিশ্লেষণ ও তদনুযায়ী বর্ণচিত্র চক্ষুগোচর করবার যন্ত্র হচ্ছে spectroscope। অতি উত্তপ্ত অবস্থায় প্রত্যেক বিভিন্ন (মৌলিক) পদার্থ থেকে তার নিজস্ব বিভিন্ন বর্ণের আলোক নিঃসৃত হয় এবং spectroscope যন্ত্রের মধ্যে তদনুযায়ী বর্ণরেখা দেখতে পাওয়া যায়। Sodium ধাতুর জন্য হল্‌দে রেখা, potassium থেকে লাল-বেগুনাভ রেখা দেখতে পাই। সুতরাং কোন অজানা পদার্থের পরীক্ষায় যদি হল্‌দে রেখা পাই তা হলে প্রমাণ হ'ল উক্ত পদার্থের মধ্যে sodium বিদ্যমান। অতি যৎসামান্য পরিমাণ পদার্থও এই প্রণালীতে সহজে ধরা পড়ে যায়। এমন কি এক গ্রামের কোটিতম অংশ sodium ধাতুঘটিত পদার্থেরও এই যন্ত্রের কাছে গোপন থাকবার ক্ষমতা থাকে না। রুবিডিয়ম্ ও সিজিয়ম্ ধাতুদ্বয় এই প্রণালীতে আবিষ্কৃত হ'ল। Bunsen ও Kirchhoff জার্ম্মানীর এক উৎসের জল spectroscope সাহায্যে পরীক্ষা করতে গিয়ে কয়েকটি বর্ণরেখা দেখতে পেলেন যা কোন পরিচিত পদার্থের রেখা নয়। নিশ্চয়ই কোন অনাবিষ্কৃত পদার্থ এই জলের মধ্যে আছে—কিন্তু এত স্বল্প অনুপাতে যে মামুলী বিশ্লেষণ-পরীক্ষায় নজরে পড়ে না। অগত্যা বিরাট্ পরিমাণ জল নিয়ে পরীক্ষা করতে হ'ল এবং এতক্ষণে উপরিউক্ত নূতন পদার্থ দু'টির চিহ্ন পাওয়া গেল। প্রায় এক হাজার মণ জল থেকে সিকি আউন্স মাত্র সিজিয়মঘটিত জিনিষ পাওয়া গিয়েছিল।

Microscope বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাজ অন্য রকমের। এটি বৈজ্ঞানিকের তৃতীয় চক্ষু। আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যে বিশাল সূক্ষ্ম-জগৎ বর্ত্তমান—তার জটিল রহস্যের সম্যক্ সমাধান কখনও হবে কি না জানি না—তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র যে এই অন্ধকারময় পথের কিয়দংশ আলোকিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এর অভাবে বৈজ্ঞানিকের অনেক প্রচেষ্টাই অসম্পূর্ণ থেকে যেত—চিকিৎসাশাস্ত্রের ও প্রাণীতত্ত্ববিজ্ঞানের (Biology) অনেক তথ্য অনাবিষ্কৃত থাকৃত এবং জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণুতত্ত্ব বিজ্ঞানের (Bacteriology) জন্মই হ'ত না। অতি সূক্ষ্মায়তনের জন্য যে সব বস্তু আমাদের দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত এই যন্ত্রমধ্যে তাদের আয়তন বহু গুণ বর্দ্ধিত হয়ে দর্শনযোগ্য হয়। এর দ্বারা আমাদের দৃষ্টিশক্তি কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে তা শুনলে আশ্চর্য্যান্বিত হবেন। কল্পনা করুন একটি গোলাকার বস্তু যার ব্যাস এক সেণ্টিমিটারের (প্রায় আধ ইঞ্চি) লক্ষতম অংশ। এর বৈজ্ঞানিক নাম micron। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মারফতে আমরা এতটুকু পদার্থটি দেখ্‌তে পাই। দৃষ্টিসীমা আরও শত গুণের অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল ultramicroscope নামে এক যন্ত্রের আবিষ্কারে। এটি হ'ল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চরম। এর সাহায্যে ১০$^{-৭}$ সেণ্টিমিটার ব্যাস আয়তনের পর্য্যন্ত বস্তু—যে বস্তুর ব্যাসের দৈর্ঘ্য এক সেণ্টিমিটারের কোটিতম অংশ তাও—চক্ষুগোচর হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম আয়তনের নাম submicron। যে সব অণু-পরমাণু (molecules and atoms) নিয়ে জড়পদার্থ গঠিত, যা এতদিন নিছক কল্পনার সামগ্রী ছিল, যার আয়তনের ক্ষুদ্রত্ব ধারণারও অতীত বোধ হ'ত—সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর গণনা, পরিমাণ নির্দ্দেশ করবার দুঃসাহস এখনকার পণ্ডিতদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা হিসাব করে বলছেন একটি অণুর আয়তন ২×১০$^{-৮}$ সেণ্টিমিটার (ব্যাস),—অর্থাৎ এটি এমন একটি গোলাকার বস্তু যার ব্যাসের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির দশ কোটিতম অংশ। একটি পরমাণুর আয়তন আরও ক্ষুদ্রতর—তার ব্যাস অণুর ব্যাসেরও অর্দ্ধেক। এক গ্রাম মাত্র ওজনের জলজান বায়ুর মধ্যে বিদ্যমান অণুর সংখ্যা নির্দ্দেশ হবে তিন-এর পিঠে ২৩টা শূন্য যোগ করে। একটা সূচের আগায় কোটি কোটি অণুর স্থান সংকুলান হবে।

Ultramicroscope এর সাহায্যে মানুষের দৃষ্টিসীমা অণু-পরমাণুর কোঠায় প্রায় এসে পড়েছে। কিরূপ

দ্রুতগতিতে পণ্ডিতেরা minus infinityর আয়তনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং অকিঞ্চিতের সীমানার কত সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন!

আমরা এত অতিসূক্ষ্মের ধারণাও করতে পারি না। অনন্ত বিরাটের উপলব্ধি এবং অসীম সূক্ষ্মের অনুভূতি—দুইই সমান কষ্টসাধ্য। পণ্ডিতেরা কিন্তু অণু-পরমাণুর অতিসূক্ষ্মত্বেও সন্তুষ্ট নন। এত দিন অবিভাজ্য বলে পরিগণিত পরমাণুর মধ্যেও তাঁরা এক বা একাধিক electron ও protonএর সন্ধান পেয়েছেন। সর্ব্বপ্রকার মৌলিক পদার্থের পরমাণুর তুলনায় জলজান বায়ুর পরমাণু লঘুতম। একটা electronএর গুরুত্ব তারও ১/১৮৩৬ অষ্টাদশশততম অংশ। পরমাণুকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করবার প্রয়াস এখন চল্‌ছে।

আমাদের atmospphereটা বোধ হয় অত্যধিক লঘু হয়ে উঠেছে। এই rarefied atmosphereএ রেখে আর আপনাদের যন্ত্রণা দেবার ইচ্ছা করি না।*

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

* রিপন কলেজ অধ্যাপক-সঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

আগামী সংখ্যা বিচিত্রায় রিপন কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম-এ লিখিত "নব্য জড়বিজ্ঞান" প্রকাশিত হইবে।
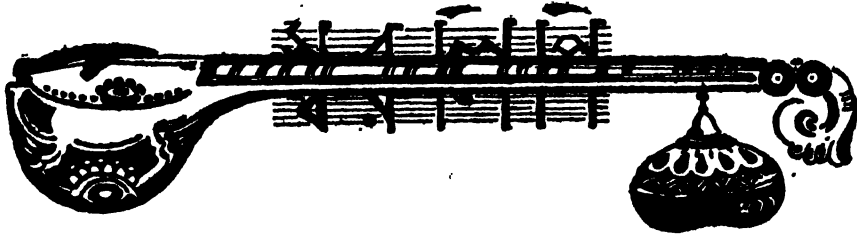
আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরৎ আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প আভায় দিগন্ত ছলোছলো।
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,
দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক, বলো বলো—
সে মোর অগম অন্তর পারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো।

দ্বিধাভরে আজো প্রবেশ করোনি ঘরে
বাহির অঙ্গনে করিলে সুরের খেলা,
জানিনা কি নিয়ে যাবো যে দেশান্তরে
হে অতিথি, আজি শেষ বিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে,
কোন খানে কিছু ইসারা কি তার পেলে
হে পথিক, বলো বলো—
সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
রক্ত আগুনে প্রাণে মোর জ্বলো জ্বলো॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

II রা রপা পমা । গা রা রা I রা -া -গা । মা -া -গরা I
আ রো কি ছু খ ন্ না • • হ • য়

I রা রপা পমা । গা রা -া I রা গা মা । পা পা পা I
ব সি য়ো পা শে • আ রো য দি কি ছু

I পণা ণা -া । মা মা -গরা I রা -া গা । রা -া গা I
ক থা • থা কে • তা • ই ব • •

I রা -মা -া । -া -া -া I পমা মা মা । মা মা মা I
লো • • • • • শ র ত আ কা শ

I গা গা ^মগা । রা সা সা I সা রা -া । -া -া -া I
হে র ্ রা ন হ রে আ সে • • • •

I রা -া গা । মা পা -া I পা -ধা পা । ^মপা -া সা I
বা স্ প আ জা • যে • দি গ ন্ ত

I সা সা -রা । রা রা -া I রা রগা -মা । গা পমা -গরা II
ছ লো • ছ লো • ছ লো • ছ লো •

II মা পা পা । পনা না -া I র্সা -া -া । -া -পা -না I
জা নি তু মি কি • ছু • • • • •

I না ^নর্সা র্সা । র্সা র্রা র্সা I না -া -া । র্সা -া -া I
চে য়ে ছি লে দে খি বা • • রে • •

I র্সা নর্রা র্রা । র্সা র্সা -ণা । ণা -া ণা । ণা ণা -ধা I
তা ই তো প্র ভা • তে • এ সে ছি •

I পা -া -ধপা । ^পমা -া গরা I রা -গমগা -রগা । রা -া -া I
লে • • মো • র দ্বা • • রে • •

I না র্রা র্রা । র্সা ^র্সণা -ধপা I পা -া -া । -া -া -া I
দি ন্ না ফু রা • তে • • • • •

I সা সা সা । রা রা রা I রা গা -রা । গা মা -া I
দে খি তে পে লে কি তা রে • হে প •

I পা -া ধা । পা মা -গরা I গা রা -া । -া -া -া I
থি • ক্ ব লো • ব লো • • • •

I ^পমা মা মা । মা মা মা I ^পমা মা মা । মা মা মগা I
সে মো র অ প ম অ ন্ ত র পা রা

I ^রগা রা -া । -া -া -া I রা রা গা । মা পা পা ।
বা রে • • • • র ক্ ত ক র দ্

I পা পা ধা । ধপা মা মগা I মগা রা -া । -া -া -র্সা I
ত র ঙ গে ট লো ম লো • • • •

I র্সা র্রা র্রা । র্সা র্সণা ণা I ধা পা -ধা । পা মা -গা I
দে খি তে পে লে কি তা রে • হে প •

I রা -া পা । পা মা -গরা I মগা মসা -া । -া -রা -গা II
দি • ক্‌ ব লো • ব লো • • • •

II ন্‌া ন্‌া ন্‌া । ন্‌া ন্‌া -সা I সা -া -া । -া -া -া I
দ্বি ধা ভ রে আ • লো • • • • •

I সা সা রা । রা রা রা I রা রা -া । -া -া -া I
প্র বে শ ক র নি ঘ রে • • • •

I রা গা মা । মা মা -া I মগা -া গা । রা সা -া I
বা হি র অ ঙ্গ • নে • ক রি লে •

I সা সা রা । রা -া -া I রা -া -া । -া -া -া I
সু রে র্‌ খে • • লা • • • • •

I মা পা পা । পা পা -া I মপ -া -পা । -া -া -া I
জা নি না কি নি • য়ে • • • • •

I ধা ধা ণা I ধা ণা ণা I ধা ধর্সা -ণা । ধা পা -া I
যা বো যে দে শা ন্‌ ত রে • হে অ •

I ধা পা -া । মা মা -গা I রা রা রা । পা মা গরা I
তি থি • আ জি • শে ষ বি দা য়ে র

I মগা সা -া । -া -া -রা I রা রা রা । রা রা রা I
বে লা • • • • ক রি লে সু রে র

I রা রা -া । -া -া -া II
খে লা • • • •

॥ মা পা পা । র্না না -া । না -া -া । না -া র্সা ।
প্র থ ম প্র ভা • তে • • স • ব্

। র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সর্রা র্সনা । র্সা -া -া । -া -া -া ।
কা জ্ ত ব কে • লে • • • • •

। র্সা র্সর্রা র্রা । র্সা র্সণা -া । ণা -া -া । -ধা -পা -া ।
যে গ ভী র বা • নী • • • • •

। পা পধা ধা । পা মা -গা । রা -া -গমা । রগা রা -া ।
শু নি বা রে কা • ছে • • এ লে •

। র্সা র্সা -নর্রা । র্সা ণা -ধপা । ধা পা -া । -া -া -া ।
কো ন • খা নে • কি ছু • • • •

। সা সা সা । রা রা রা । রা গা -রা । গা মা -পা ।
ই সা রা কি তা র্ পে লে • হে প •

। পা -া ধা । পা মা -গরা । রগা রা -া । -া -া -মা ।
থি • ক্ ব লো • ব লো • • • •

। রমা মা মা । মা মা মা । রমা মা মা । মা মা মগা ।
সে বা ণী আ প ন গো প ন প্র দী প

। রগা গরা -া । -া -া -া । রা -া গা । মা পা পা ।
জ্বে লে • • • • র • ক্ত আ গু নে

। পা পধা ধপা । -া মা মগা । রগা গরা -া । -া -া -র্সা ।
প্রা ণে মো র্ ঝ লো ঝ লো • • • •

। র্সা র্সর্রা র্রা । র্সা ণা ধপা । পা পা -ধা । পা মা -গা ।
ই সা রা কি তা র পে লে • হে প •

। রা -া পা । মা মা -গরা । রগা সা -া । -া -রা -গা ॥ ॥
থি • ক্ ঝ লো • ঝ লো •

রবীন্দ্রনাথের সুর

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

('বর্ষা-মঙ্গল' পালাগান)

'বর্ষা-মঙ্গল' পালাগানগুলি ভাবে, সুরে ও ছন্দে এক একটি অতুলনীয় অর্ঘ্য। এই গানগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বিশেষ দান। গানগুলির অন্তর্নিহিত ভাব-সম্পদ ও সুর-সম্ভারের তুলনা অন্যদেশের সাহিত্যে মিল্‌বে কিনা জানিনে, তবে একথা বোধ করি অসঙ্কোচে বলা চলে যে বাংলা দেশের মতো ছয়টি ঋতু, বিশেষতঃ বর্ষা ঋতু, পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে না ব'লে বর্ষা-কাব্য অন্য দেশের আধুনিক সাহিত্যে এত গভীর ভাবে বিকাশ লাভ করেনি; আর রবীন্দ্র-কাব্যে যে বর্ষার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং সে কাব্য যে বর্ষার অপরূপ লীলায় সমধিক প্রভাবান্বিত তাও কারোর অবিদিত নেই। গানগুলির রস-সম্পদ নিয়ে আলোচনা করা আমার এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; প্রত্যেকটি গান কি কি ভাব ব্যক্ত করে, কথার ভাবের সঙ্গে সুরের ভাবের কি পরিমাণ মিল রয়েছে এ সকলের বিশ্লেষণই অর্থাৎ শুধু সুরের দিক থেকে গানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার জন্তেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

গানগুলিতে প্রথম-গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবাণ, প্রখর রৌদ্রতাপে ক্লান্ত কপোতের কাতর ধ্বনি ও নিদাঘের বিবরণ; তারপর বর্ষাকে আহ্বান ও তার আগমন প্রতীক্ষা; তারও পরে বর্ষার আগমন ও সঙ্গে বৈশাখী ঝড় ও মেঘ, সবুজ মাঠ ও মেঘের ছোঁওয়া, ঝর ঝর বরিষণ, শ্রাবণের অবিরল ধারা এবং ক্রমে ক্রমে ভরা বর্ষা—একে একে পর পর এসেছে; সর্ব্বশেষে বৃষ্টির শেষের হাওয়া ও ভাদ্র দিনের ভরা স্রোতে ক্লান্ত বর্ষার বিদায়,—এই নিয়ে পালাটি রচিত হয়েছে।

প্রথম গান—

> দারুণ অগ্নিবাণে
> হৃদয় তৃষায় হানে।
> রজনী নিদ্রাহীন,
> দীর্ঘ দগ্ধ দিন
> আরাম নাহি যে জানে।
> শুষ্ক কানন শাখে
> ক্লান্ত কপোত ডাকে
> করুণ কাতর গানে।
> ভয় নাহি, ভয় নাহি।
> গগনে রয়েছি চাহি।
> জানি ঝঞ্ঝার বেশে
> দিবে দেখা তুমি এসে
> একদা তাপিত প্রাণে।

সুরের ভাব নিয়ে আলোচনা কর্‌তে গিয়ে প্রথমেই পাই যে সাতটি সুর যা নিয়ে আমাদের সঙ্গীত, এ সব সুর প্রত্যেকটিই এক একটি ভাব ব্যক্ত করে এবং কয়েকটি সুরের মিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সৃষ্টি হয়; আবার এক একটা রাগ-রাগিণী এক একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করে। শ্রীরাগে হাস্যরস, চঞ্চলতার সুর বা করুণ ভাবের আবির্ভাব হয় না; এতে শান্ত গম্ভীর রস ও ভক্তি ভাবের উদ্রেক হয়। খাম্বাজ ঠাটের গানে চঞ্চলতার সুর আসে। জয় জয়ন্তীর মগা মগা জ্ঞা রা সুরের ধ্বনিতে ক্রন্দনের ভাব আসে। এইরূপ নানা সুর-বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন রূপ-রসের সঞ্চার করে।

সারঙ্গ জাতীয় গান গ্রীষ্মকালের প্রখর-রৌদ্র-তাপ-দগ্ধ প্রাণের ও তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ে শীতল জলের অভাবের ভাব প্রকাশ করে। হিন্দু সঙ্গীতে 'বৃন্দাবনী' ও 'মধুমাত্' সারঙ্গ, অর্থাৎ

'গ' ও 'ধ' বর্জ্জিত সারঙ্গ, বা 'বড় হংস' সারঙ্গ মধ্যাহ্নে ভরা রৌদ্রে গান করবার রীতি। 'বর্ষামঙ্গল'-এর প্রথম গানে 'দারুণ অগ্নিবাণে' কবি গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন কালে রৌদ্র তাপে জর্জ্জরিত তরুলতার ও প্রাণীর কাতর প্রাণের বিবরণ লিখেছেন। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা এক পশলা বৃষ্টি পাবার আকাঙ্ক্ষাই করে থাকি; মনে মনে বলি 'ওগো এত নির্দ্দয় হয়ে সৃষ্টি লোপ করে দিওনা; একটু জল দাও, শীতল কর, শান্তি দাও।' যখন সপ্তাহব্যাপী এক-ধারা বৃষ্টি আরম্ভ হয় আমরা আবার বিরক্ত হয়ে উঠি; তখন বলি 'একটু রৌদ্র দাও'; সে সময় প্রাণ চায় রৌদ্র। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে প্রাণ চায় জল; কাজেই অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশের সুরও হয় শীতল জল পাবার সুর।

কবি যে-ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এ কবিতাটি লিখেছিলেন, ঠিক সে সময়ে গভীরতম অন্তরলোকে যে-সুর তিনি পেয়েছিলেন সে-সুরই তিনি এগানে সংযোজন করেছেন। অথচ আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ যাঁরা হিন্দু সঙ্গীতের আলোচনা করে গেছেন তাঁদের কথার হুবহু মিল পেয়ে যাই কবির গানের সুরের ভাবে। তাঁর এগানে 'বড়হংস' ও 'বৃন্দাবনী' সারঙ্গের সুরই পাই। হৃদয়ের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে সুরের ভাবের পরিবর্ত্তন হয় ও প্রত্যেকটি রাগ-রাগিণী যে এক একটা স্বতন্ত্র ভাব ব্যক্ত করে, প্রাচীন ঋষিদের এ সকল কথার অন্তর্নিহিত সত্যকে খুঁজে বের করবার ভাব ধরে দেয় কবির সুরের আলোচনা করলে।

হিন্দিতেও এভাবের গান আছে। এখানে একটি গান কথা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করে দেখান গেল।

দহন লাগ্যো চৌড় কিরণ
ভ্রমত ফিরত পাথিকগণ
তরু বিটপ লতা কি ছায়
গজ মৃগ হাস করত আস।
জলত পবন জৈসো দহন
কোটর গত রহে খগগণ
অগ্নি সখি অব করন জতন
চন্দ্র পিয়া নাহি পাস।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—চৌতাল, বিলম্বিত গতি

স্থায়ী—

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
[ঋন্‌সা ঋা। মা মরা। । সা]
ন্‌সা ঋা। মা মরা। । সা। সন্‌া সা। সা ঋা। ঋা সা I
দ হ ন লা ০ গ্যো চৌ ০ ড় কি র ণ

সন্‌া সন্‌া। সন্‌া সা। সা সা। মরা । ঋমা সা। ঋা সা I
ভ্র ম ত ফি র ত পা ০ থি ক গ ন

সা সা। পধা পধা। ধণা পা। মা । পা র্সণা। র্সা র্সা I
ত রু বি ট প ল তা ০ কি ছা ০ য়

পর্সা র্সা। পণা পা। মা ঋা। মন্ সাঋা। পা মরা। । সা II
গ জ মৃ গ হা স ক র ত আ ০ স

অন্তরা—

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পমা মা। মা পা। র্সনা না। র্সা । না র্সা। র্সা র্সা I
জ ল ত প ব ন জৈ ০ সো দ হ ন ০

র্সনা র্সা। ঋ্রা র্মা। ঋ্রা র্সা। ঋ্রা র্সা। র্সঋ্র র্সা। পণা পা I
কো ০ ট র গ ত র হে খ গ গ ণ

পা পমা। মরা মা। পা পা। র্সনা র্সনা। র্সা না। র্সা র্সা I
অ গ্নি স খি অ ব ক র ন জ ত ন

পর্সা । পণা পমা। মরা । মরা মা। পমা মরা। । সা II
চ ০ ন্দ্র পি য়া ০ না ০ হি পা ০ স

(১)

এ গানটিতেও গ্রীষ্মের বর্ণনা এবং সুরও শীতল জল পাবার সুর অর্থাৎ 'বৃন্দাবনী সারঙ্গ'। 'দারুণ অগ্নিবাণে' এবং উপরোদ্ধৃত হিন্দিগান এ দুটিই মূলতঃ একই বিষয় নিয়ে লেখা ও সুর করা। ভাবটুকু একই কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গী প্রত্যেকের পৃথক, কারণ তা রচয়িতাদের নিজস্ব ধারার বিভিন্নতা।

গ্রীষ্মে বৃষ্টির জল পাবার সুর কি ভাবে 'বৃন্দাবনী' ও

---

(১) বোম্বাই নিবাসী শ্রীযুক্ত জলচন্দ্র সুখ্‌তন্‌কর কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি—ক্রমিক পুস্তক মালিকা' প্রথম খণ্ড বই থেকে এই গানটি এখানে উদ্ধৃত হল।

'বড় হংস' সারঙ্গের সুর-মালিকায় প্রকাশ পায় তা দেখাতে গিয়ে নিম্নের তালিকাটির সাহায্য নেবার দরকার হবে।

সুর	তত্ত্বের নাম	ভাব	বর্ণ
সা	পৃথিবী	সকল	রক্ত
রে	বারি (রস)	করুণ	কমলা (গোলাপী)
গা	অগ্নি (রূপ)	শান্ত	পীত
মা	বায়ু (স্পর্শ)	ভয়	সবুজ
পা	আকাশ (শব্দ)	বীর	নীল
ধা		করুণ	অতি নীল (কাল)
নি		রৌদ্র ও বীর	বেগুনী

(২)

এ তালিকাটি দিয়ে আমরা সুন্দর রূপে সুরের ভাবের যাচাই করতে পারি। 'দারুণ অগ্নিবাণে' বা 'দহন লাগো্যা' এ দুটি গানেই 'গা' সুর ব্যবহৃত হয়নি। 'গা' সুর অগ্নিরূপ ও শান্তভাব প্রকাশ করে। কাজেই এখানে 'গা' সুরের অনুপস্থিতিতে অগ্নি ও শান্ত ভাবের অভাব সূচিত হচ্ছে। দুটি গানেই 'গা' সুরকে বাদ দিয়ে 'ম রা' 'প ম রা' ও 'সা' এই সুর কয়টির প্রাধান্য। অগ্নিদগ্ধ প্রাণ আর অগ্নিসুর ব্যবহার করতে মোটেই রাজি নয়, এখন মনের বীণায় শীতল জল পাবার সুর বেজে উঠেছে, মন প্রাণ এখন ঐ আশায় উতলা; কাজেই শান্ত ভাবের অভাব। এবং এ জন্যেই 'গা' সুর ব্যবহৃত হয়নি।

'র মা' 'প ম রা' ও 'সা' সুরের বহুল ব্যবহার হলেও তাতে 'র' সুরই প্রধান বা 'জান্' সুর। 'র' হ'ল করুণ ও বারির প্রতীক। 'র মা' 'প ম রা' 'সা' বলতে আমরা বুঝব আকাশে, বাতাসে, পৃথিবীতে একটা করুণ ও অশান্ত-অস্বস্তির ভাব আর জলের জন্য প্রাণের আক্ষেপ। যেমন—

মা । রা রা । সা । সরা । । ন্‌া সা রা সা ।
দা • রু ণ অ গ্‌ নি • বা • ণে •

সপা । । । ।
রে • • •

উপরোক্ত হিন্দি গানটির ও 'দারুণ অগ্নিবাণে'র ভাব সম শ্রেণীর হলেও ঠিক এক নয়। হিন্দি গানটির সুর গ্রীষ্মের প্রথম ভাগের ভাব ব্যক্ত করছে; আর কবির গানটি গ্রীষ্মের শেষ সময়কার ভাবে ভরপুর—এ গানের পরই বর্ষা দেখা দিবে। হিন্দি গানটির সুর 'বৃন্দাবনী', এতে 'ধ' সুরেরও ব্যবহার হয়নি। কিন্তু কবির গানটিতে 'বড়হংস' সারঙ্গের সুর-বিন্যাস হওয়াতে 'ধ' সুরও ব্যবহৃত হয়েছে। 'ধ' সুর করুণ, তাই 'বড়হংস' সারঙ্গ সুরে করুণ ভাবের আধিক্য। 'বৃন্দাবনী' তত করুণ নয়। গ্রীষ্মের শেষে অস্থির মনের ছাপ 'বড়হংস' সারঙ্গের সুরে বিশেষ ভাবে ফুটে উঠে। কবির সুরেও তাই হয়েছে।

'দারুণ অগ্নিবাণে' গানের সঞ্চারীতে 'ভয় নাহি, ভয় নাহি। গগনে রয়েছি চাহি।' এই অংশটির ভাব করুণ নয়; কবির সুরে এখানে বীর রস বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা সুরের ভাবে পাই বীর ভাব-ব্যঞ্জক 'পা' ও 'নি' সুর, যেমন—

সা । সা । । ন্‌া । প্‌া ন্‌া । সা । রা । ।
ভ য়্‌ না • হি • ভ য়্‌ না • হি •

পা । মা । । রা । সা । । । । । । ।
• • ভ য়্‌ না • হি • • • • •

মা পা পা । । । । । । । পণা ধা ধণা । ।
গ গ নে • • • • • র য়ে ছি •

পা । । ধা । পমা পর্ণা পা । । । । । । ।
• • • • চা • হি • • • • •

পর্রা র্সর্রা সা ণা । পা মা রা । । সা । ন্‌া । ।
চা • • • হি • ভ য় না • হি •

(২) তালিকাটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'রাগ-রাগিণীর ভাব' নামক প্রবন্ধে করা হয়েছে।

প্‌া ন্‌া সা া । রা া পা া । া া মা া ।
ভ য়্‌ না • হি • • • • • ভ য়্‌

রা া সা া । া া া া ।
না • হি • • • • •

এখানে 'পা' সুরের প্রাধান্য বীর রস ব্যক্ত করে ও 'নি' সুর তাতে ফোড়ন দেয়; আর 'সা' সুর সকল ভাবই প্রকাশ করে বলে এই অংশটি বীর ভাবেরই উদ্রেক করে। কবি এরূপ অশান্ত ভাবের রাগ নিয়েও বীর রস ফুটিয়ে তুলেছেন অভাবনীয় রূপে। কবির গানের সঙ্গে অন্য গানের এইখানেই প্রভেদ। এই 'ভয় নাহি' র সুরে যদি অন্যভাবে 'মা' ও 'রে' সুরের প্রাধান্য বজায় রেখে রচিত হয় তবে অনুরূপ ভাব থাকবে না।

আকাশ থেকে এই যে দৈববাণী হল 'ভয় নাহি' তার সুর গুরু গম্ভীর ও বীর রস যুক্ত হওয়াই কি উপযুক্ত হয়নি? পরে 'জানি ঝঞ্ঝার বেশে' বলে অতিষ্ঠ প্রাণ তা' স্বীকার করে নিলেও মনে তখনো তিক্তরসের সুর বজায় থাকাতে সুরও পূর্ব্ববৎই আছে।

২

দ্বিতীয় গান —

এস এস, হে তৃষার জল,
ভেদ কর কঠিনের ক্রুর বক্ষতল
কলকল, ছলছল!—

কলকল ছলছল রবে তৃষ্ণার জলকে এই ধরাতলে আসতে আহ্বান করা হচ্ছে এ গানে। গানের সুরে আমরা পাই 'ইমন্‌-ভূপালী'র সুর-বিন্যাস। 'ইমন্‌-ভূপালী'তে 'গা' বাদী সুর অর্থাৎ প্রধান সুর, এর প্রাধান্য না দিলে এ স্বর-বিন্যাস সুন্দর করা সম্ভবপর হয়না; যেন 'গা' ই এ গীতের প্রাণ।

সা রা] [রগা রা রপা পক্ষা । গা া া I রগা া গা রা ।
এ স এ • স • হে • • তৃ ষ্‌ণা র

রগা ধ্‌ সা রা I গা রা রপা পক্ষা । গা া া া ।
জ ল এ স এ • স • হে • • •

গা র্সা া া । র্সা া র্সা র্সা I র্সা া র্সা না ।
হে • • • তৃ ষ্‌ ণা র জ ল্‌ এ স

পধা র্সা র্সনা া I া া না ধা । ধা া ধা ক্ষা I
এ • স • • • ক ল ক ল্‌ ছ ল

ধপা া মা গা । রা গা গপা পমা I গা া া া ।
ছ ল্‌ এ স এ • স • হে • • •

া া া া I সগা া গা গা । গা গা গা গা I
• • • • ভে দ্‌ ক রি ক ঠি নে র

গা া গা রা । রসা া সা রা I গা া গা রা ।
ক্রু র্‌ ব ক্ষ ত ল্‌ ক ল ক ল্‌ ছ ল

সা ধ্‌ সা রা II
ছ ল্‌ "এ স"

এ গানের সুরের বিশেষত্ব হ'ল গা, রা, সধা, সা, রপা, ক্ষা, গা া া এ কয়টি সুরের মিলনে। 'গা' সুরকে আমরা শান্ত সুর বলি। গানটিতে এই সুরের প্রাধান্য থাকাতে এটি শান্ত রসাত্মক গীত। তবে মধ্যে মধ্যে করুণ রস এসে পড়ে, যেমন— সা ধ্‌; 'ধা' করুণ-ভাব ব্যক্ত করে। মনে প্রাণে ডাকা আশান্তভাবে বা করুণভাবেও সম্ভবপর। প্রথম গানটিতে বিরক্তির ও অস্বস্তির ভাব প্রকাশ ক'রে দ্বিতীয় গানে শান্তভাবে বর্ষাকে অহ্বান করা অতি মনোরম সুর সৃষ্টি হয়েছে। সে মৌনী তাপস বৈশাখের রুদ্রমূর্ত্তি আর নেই, এখন আর গ্রীষ্মের রৌদ্রতাপের তত জ্বালা নেই। যদিও এখন পর্য্যন্ত তৃষ্ণার জলের শুভাগমন হয়নি তবুও বাতাস উতলা হয়ে উঠাতে এবং এই অশান্ত বায়ু বর্ষার আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দেওয়াতে মন অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করেছে।

হাঁকিছে অশান্ত বায়
"আয়, আয়, আয়" সে তোমায় খুঁজে যায়।

কাজেই এখানে অশান্ত ও করুণ ভাবের সুর হওয়া উচিত ছিল সুন্দর হলো না।

উক্ত সুর-বিন্যাসে 'এস এস, হে তৃষ্ণার জল'এ দুবার ভিন্ন ভিন্ন সুরের বিন্যাস করা হয়েছে। দ্বিতীয় বারের—

গা র্সা । । । র্সা । র্সা র্সা । র্সা । র্সা র্সা
হে • • • তৃ ষ্ ণা র জ ল্ এ স্

সুরের গা র্সা মিড়ে ও চড়া সুরের বিন্যাসে এ কথাই মনে হয় যে অন্তরের সুর যেন ঊর্দ্ধ পথে চেয়ে ডাকছে—শিব যেমন গঙ্গাকে এনেছিলেন ঊর্দ্ধদিকে চেয়ে। আর এ তৃষ্ণার জলও যেন এ ডাকে চঞ্চল হয়ে ঊর্দ্ধলোক হ'তে আকাশ (পা) পথ বেয়ে নেমে আস্‌বে এই ধরাতলকে শান্ত ও শীতল করে তুল্‌তে।

ডাকা শান্তভাবে হলেও গানের গতি একটু চঞ্চল। এখানে এগানে যদি চৌতালের গতি বা টিমাতেতালার গতির ছন্দ সংযোজন করা হতো তবে আর কলকল ছল-ছল ছন্দের সমাবেশ হতো না।

শেষের দিকের একটি অংশে কবি পাশ্চাত্য গীতের ভঙ্গীতে সুর রচনা করেছেন, যেমন—

সা রা গা ক্ষা । পা ধা না । । নর্সা । । ।
তো মা য়ে৹ ক রে ছে ব ন্ দী • • •

। । । । ।
• • • •

কিন্তু এতে শ্রুতিকটু হওয়া দূরের কথা বরং মাধুর্য্যেরই সৃষ্টি হয়েছে।

৩

তৃতীয় গান—

ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্ত কেশে
আঁচলখানি দোলে।

বর্ষার প্রথম ধারা এবার এসে পড়েছে, দূরে ছায়াময় মাঠের উপর বৃষ্টি ঝরছে আর ঐ সুরে কবির দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে। সে বারিপাত এখনো নিকটে এসে পৌঁছায়নি, দূরে [illegible] নিয়াছে মাত্র। এই বর্ষণে প্রকৃতির ক্রন্দন প্রকাশ হওয়াতে কবির হৃদয়েও বাদল দেখা দিয়েছে এবং মনের সুর ক্রন্দনের পূর্ব্বকালের আভাসে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। গানটির শেষেও কবি সে ব্যথার ইঙ্গিত দিয়েছেন—

একলা দিনের বুকের ভিতর
ব্যথার তুফান তোলে।

মনের আকাশে এখন পর্য্যন্ত ব্যথার তুফানই উঠেছে মাত্র, এখনো বর্ষণ দেখা দেয়নি। এই জন্য গানটির সুর করুণ ও সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলতায় পরিপূর্ণ।

মল্লার জাতীয় গীতে বর্ষার ভাব আসে। হিন্দু সঙ্গীতে শাস্ত্রকারগণ বলেছেন যে একদিকে চঞ্চলতা ও অন্যদিকে করুণ ভাবের সুরই অর্থাৎ মল্লার জাতীয় গীতই বর্ষাকালের উপযোগী। এ গানটির সুর ও মল্লার জাতীয় হওয়ায় হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। কবি তাঁর ভাবে অভিভূত হয়ে যে-সুরের পরিবেষণ করেছেন তাতে বর্ষার ভাবই এসে পড়েছে। এ পালাগানের এই গানটি থেকেই বর্ষা আরম্ভ হয়েছে।

খাম্বাজ ঠাটের অর্থাৎ 'ণি'—কোমল ঠাটের গানে চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। এ গানটি ঐ ঠাটেরই অন্তর্গত। রা মা, রা মা, পা ণা ধা পা, মা গরা এ কয়টি সুরের এরূপ বিন্যাসই এ গানের প্রাণ। 'র' ও 'ম'-এর মীড়ও এগানে একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করে। এ দুটি সুরে আমরা পাই বারি ও বায়ু। জল ও বাতাসের আকুল কল্লোল হৃদয়ে ও সুরে প্রকাশ পেয়েছে অতি সুন্দর ভাবে।

সঞ্চারীর সুরও গতানুগতিক ভাবে সংযোজিত হয়নি।

৪

চতুর্থ গান—

হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর
বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে
উদ্দাম উল্লাসে।

এই গানটির সুরে আমরা পাই বাউল সুরের প্রাধান্য। ফকির চাঁদের বাউল সুরের সাহায্যে গানটির সুর রচনা করা হয়েছে; কিন্তু এটা অনুকরণ নয়। নিজস্ব ধারার

সুরটির সৃষ্টি হওয়াতে গানটির সৌন্দর্য্য বেশী মনোরম হয়েছে বলেই মনে হয়।

না র্সা না II নধনা র্সনা ধনা। নপা া া I
হৃ দ য় আ • • মা • র্

পনা া া । সা া না। ধা র্সা না। ধা পা া I
ঐ • • ঐ • • ঐ • বু ঝি তো র্

পণা া া । র্সা া না I ধপা া া । ধা ধপা া I
বৈ • • শা • খী ঝ • ড় আ সে •

মা া া | পা া া I গা মা পা | ধা না র্সা I
আ • • সে • • আ • • • • •

ধনা া া | না র্সা না I নধনা র্সনা ধনা |
সে • • হৃ দ য় আ • •

নপা া া II
মা • র্

সুর রচনায় 'ঐ' বা 'আসে' এ দুটি কথা দুবার বেশী ব্যবহার করাতে সুরেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অথচ বাউলে সাধারণতঃ সুরের প্রাধান্য দেওয়া হয়না, সুর নাম মাত্র। কিন্তু এখানে সাধারণের বাউল বনেদী চালে আর এক নতুনরূপ ধারণ করেছে, আর এতে আমরা নতুন রসেরই স্বাদ পেয়েছি।

কবি এ গানের কথায় কি ভাব প্রকাশ করেছেন? তাঁর মনের উল্লাস না ভয়? গানের সুরে উভয় ভাবই যুগপৎ আসে। প্রথম মনে গোপন আনন্দের-আভাস পাই; পরের

'বুঝি এল তোমার সাধন-ধন
চরম সর্ব্বনাশে'

সুরে একটু ভয়ের চিহ্ন আছে, কিন্তু তার মাত্রা খুবই কম। এত সাধ্য সাধনার পর একটু জোর হাওয়া আসাতে পিপাসায় কাতর প্রাণ অনেকটা শীতল হয়েছে এবং একটু আনন্দের রেখাপাত হয়েছে প্রাণের নিভৃত কোণে। কাজেই এখানে সুরে আনন্দের ভাব উপযুক্ত। সুরটি যেন কালবৈশাখী সম্বন্ধে দুজনের আলাপ আলোচনা। শান্ত সহজ ভাবে আলাপ আরম্ভ; তারপর একটু আনন্দ একটু ভয়, একটু আতঙ্ক—এরূপ নানাবিধ ক্ষণিক-আসা-যাওয়া ভাবের সমাবেশে দুজনের বলাবলি করার সুর এ গানের সুরের ভাব।

যা হোক্ গানটির বিশেষত্ব বাউলের সুরে সুর রচনায়। বাউলের সুর না হ'লে আলাপ আলোচনা সুরু হতো কিনা তাও দেখা দরকার। পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের হিন্দু সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীগুলি এক একটা বিশেষ ভাব ব্যক্ত করে, দশটা রাগের মিশ্রণ হল দশটা ভাবের মিশ্রণ। কিন্তু বাউলের রাগ-রাগিণীর কাঠামো পাওয়া মুস্কিল। আর এ জন্যই তত্ত্বকথায় আলাপ-আলোচনার উপযুক্ত সুরই বাউল।

শ্রীমণিলাল সেন শর্ম্মা

ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু এম্‌-এ

১

ভীম—গ্রাম্য কথায় ভীমা—স্বগ্রামের কৈবর্ত্তদের সর্দ্দার ছিল। তার ছিল দীর্ঘ আকৃতি, শ্যাম বর্ণ, তীক্ষ্ণ নাসিকা এবং তার চাইতেও তীক্ষ্ণতর দুটি চক্ষু। শরীর স্থূল ছিল না, তবে প্রত্যেকটা অঙ্গ ছিল যেন লোহার গড়া। একখানা গাঁট-ওয়ালা পাকা বাঁশের লাঠি (তার মাথাটা পেতল দিয়ে মোড়া), সে সর্ব্বদা সঙ্গে নিয়ে চলত। তার গলার আওয়াজ এক মাইল দূর হ'তে শোনা যেত। গ্রামের ছেলেরা তা' শুনে আঁৎকে উঠ্‌ত; তার স্বজাতীয়েরা সে কণ্ঠ-ধ্বনিকে বিশেষ রকম সমীহ করে চলত। তার এক কথায় সকলে উঠ্‌ত, বসত, প্রাণ দিতে নিতে প্রস্তুত হ'ত।

আমার অনেক সময়ে মনে হয়েছে, বাংলা দেশে যদি বাস্তবিকই ব্রাত্যক্ষত্রিয় কোনো জাত থেকে থাকে তবে তারা এই কৈবর্ত্তেরা। তাদের সমস্ত জীবন সংগ্রামময়। গাঁয়ে যত বড় বড় লাঠালাঠি হয়, তার মধ্যে তারা সর্ব্বদাই অগ্রগামী। তাদের ব্যবসাও সংগ্রাম-মূলক। তাদের দৈনন্দিন জীবনে কত রকম বিপদকে বরণ করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। রাতভর নদীতীরে শ্মশানে মশানে ঘুরে, কতবার মাছ তুলতে সাপ তুলে। এদের গৃহ মুক্ত নদীতীরে, বছরে বছরে সেখানে ঝড় ঝঞ্ঝা মাথায় বইতে হয়।

আর এদের নামগুলি কেমন ক্ষত্রিয়োচিত! ভীম, শঙ্কর, ভৈরব,—কখনও রমণী' মোহন, গোপি-রমণ নয়। এখনো বাংলার নব বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব এদের উপর পড়েনি।

তাদের নারীরা মোটেই বৃন্দাবনের গোপীর মত নয়। দৃঢ়, বলিষ্ঠ তাদের চেহারা, আর তাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কর্ম্মময়। তারা যখন উদুখলের উপর মুষল দিয়ে ধান ভানতে থাকে, তখন আধ মাইল দূর থেকে তার দাপট শুনে লোকে বলে উঠে, "কৈবর্ত্ত পাড়া!"

ভীম সর্দ্দার এ জাতের একজন ছোটখাটো রাজা বা প্রেসিডেণ্ট ছিল। নিজ সমাজের সব রকম ক্ষুদ্র, এবং অনেক সময় গুরুতর ঝগড়া বিবাদ তার কাছে মীমাংসার জন্যে আসত। বিচারে তার বুদ্ধির ভুল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা'তে পক্ষপাতিত্ব দেখা গেছে এমন কথা তার অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না।

তার সর্দ্দারির শ্রেষ্ঠ সুযোগ মিলত দুই সময়ে। প্রথমত শীতের দিনে, যখন সমস্ত কৈবর্ত্তের দল নদী বিলে বাঁধ দিয়ে মাছ ধরতে যেত। তখন মাস দুয়েক তারা বিলের পাড়ে ছাউনি করে থাকত। ঠিক যেন লড়াইয়ের সেনা। ভীমা তখন প্রতি বিষয়ে তাদের নায়ক ও শাসক হ'ত। তার লাঠিখানা হাতে নিয়ে, বীর দর্পে, গম্ভীর হুঙ্কারে, দুশ আড়াই-শ কৈবর্ত্তকে চালাত। সে-ই জমিদারের নায়েবের কাছ থেকে নদী বিল বন্দোবস্ত করে আনত, আর সহরের ব্যাপারীদের সঙ্গে মাছ চালানের ব্যবস্থা করত। কখন কখন দালালের সঙ্গে মতের মিল না হ'লে ভীমা নিজে ষ্টেশনে গিয়ে মাল গাড়ীতে করে মাছ চালান দিয়েছে। ষ্টেশনের বাবুদের সঙ্গে কি ভাবে কি বন্দোবস্ত করতে হয় তা' তার কিছুই অজানা ছিল না। পনর মাইল পর্য্যন্ত নদীর সমস্ত নেয়ে প্রতি বাজারের দোকানদার, আর মাঠের রাখাল সকলেই এক ডাকে ভীম সর্দ্দারকে চিনত। গাঁয়েও অবশ্য এমন লোক ছিল না যে তাকে না জানত।

ভীমার ক্ষাত্র তেজের পরিচয় পাওয়া যেত যখন তার জাতের সঙ্গে বড় রকমের ঝগড়া বাধত। সেবার বাজারে মাছ নিয়ে এক কৈবর্ত্তের সঙ্গে অপর ধর্ম্মীয় এক ব্যক্তির ঝগড়া হয়। সে লোকটী স্বধর্ম্মীয় বহু লোকসহ দল বেঁধে আসে;

তা'তে ব্যক্তিগত ঝগড়া সাম্প্রদায়িক কলহে পরিণত হয়। পরের সপ্তাহ ধরে দুই পক্ষে তুমুল আন্দোলন চল্‌ল, তার পর 'সাজ সাজ' ডাক পড়ে যায়। পরের বাজারের পূর্ব্ব-কালে দেখা গেল পণ্যদ্রব্যের আমদানি অতি কম,—চার দিক হ'তে লোকে বড় বড় তেল মাখা লাঠি নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। এক পক্ষে সমস্ত স্বধর্ম্মীরা এক জোট, অপর পক্ষে শুধু স্বজাতীয়েরা অগ্রসর, অপর স্বধর্ম্মীরা শুধু ঘন ঘন খবর নেয়, তামাসা দেখবার জন্যে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দলে বলে ভীমা সর্দ্দার "মার মার" রবে বিপক্ষের উপর লাফিয়ে পড়ল। তার পর কি তুমুল যুদ্ধ! ভীমার বজ্র হুঙ্কার দলের প্রত্যেক লোকের প্রাণে অসম সাহসের উদ্রেক করল। সন্ধ্যার পর সে সগৌরবে সদলে বাড়ী ফিরে এল।

২

ভীমা যেন একটী ব্যক্তি নয়, যেন তার সমস্ত জাতের সংহত শক্তি। কোনো কৈবর্ত্তের বিরুদ্ধে কেহ অভিযোগ করলে তার জন্যে প্রথমতঃ দায়ী হ'ত ভীমা সর্দ্দার। জমিদারের কাছারীতে এসে বলত "কর্ত্তা আমাকে বলুন।" দোষ প্রমাণ হলে সে নিজে গিয়ে দোষীর সাজা দিত। অনেক সময় অভিযোগ ছাড়াও, স্বজাতীয় কারো ত্রুটি হয়েছে জানলে, ভীমা করজোড়ে এসে বলত, "কর্ত্তা মাফ করুন। ইচ্ছে হয় আমার পিঠে পাঁচ ঘা দিন।"

উচ্চবর্ণীয় লোকদের প্রতি ভীমার বিনয় দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। হরিহর ভটচাজ পূজারী বামুন মাত্র, অথচ ভীমা,—একটা সমস্ত জাতের নেতা ভীম-সর্দ্দার—তার সামনে গড় হয়ে প্রণাম করত। বলত, "ঠাকুর আপনাদের চরণ ধুলোর জোরে বেঁচে আছি।" একদিন আগে, বাজারে, যে চোখ থেকে আগুনের ফুলকি বেরিয়েছে, তা' তখন স্নিগ্ধ, মৃদু!

হরিহর যখন সেবার কাশী চললেন, তখন ভীমাকে ডেকে বললেন, "দেখ, বিলের পাড়ে আমার যা' জমিজারাত তা' সব তোমার দেখতে হ'বে। আর বাড়ীতে রইলেন শুধু আমার বুড়ো খুড়ীমা, বাড়ী রক্ষার ভারও তোমার উপর।" ভীম সর্দ্দার বল্লে, "ঠাকুর্দা, এ ধড়ে প্রাণ থাকতে আপনার জমির বা বাড়ীর একটা তৃণও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।" তারপর হরিহরের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত ছ'মাস কাল ভীমা সে বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। তার নিজের ক্ষেতে গরু ঢুকলে অনেক সময় সয়ে নিত, কিন্তু ঠাকুরের জমিতে গরু ঢুকল কি অম্নি খোঁয়াড়ে! আর দিনে অন্তত একবার ভীমা কিংবা তার লোক পেতলে বাঁধানো মোটা মোটা গাঁটওয়ালা লাঠি হাতে করে এসে ঠাকুরের বাড়ীটা ঘুরে যেত বলত, "ঠাকরুন, প্রণাম হই, আজকে শরীরটা কেমন আছে?"

একদিন রাত্রে সে বাড়ীর কাঁটাল চুরি গিয়েছিল। সে খবরে ভীমা চারিদিকে চর পাঠাল। এবং পরদিন দেখা গেল দুপুরের পূর্ব্বেই ভীমার লোকেরা চোর এবং কাঁটাল উভয়ই তার সম্মুখে এনে হাজির করেছে।

৩

মানুষের জীবনে চিরকাল সমান যায় না। ভীমার জীবনেও পরিবর্ত্তন এল।

সেবার অকাল বর্ষাতে তার ক্ষেত-পাথর সব ধুয়ে গেল। যা' জলে ডুবোতে পারল না, তার উপর ভাসমান কচুরি পানার বন চেপে বসে সব নষ্ট করে দিতে লাগল।

আমি ভীমাকে ঐ কচুরীর সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করতে দেখেছি। উপর হ'তে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, ওদিকে নদী থেকে শত্রু সেনার মত কচুরী পানার শ্রেণী ভেসে আসছে। মোটা খাড়া ডগার উপর গাঢ় সবুজ পাতা, আর তার উপর দিয়ে থোপে থোপে উজ্জ্বল নীল ফুল ফুটে আছে। ভীমা দলে বলে বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়ে পানার বনকে ঠেলে দিচ্ছে, সেগুলি পাট ক্ষেতের পাশ দিয়ে পালবাঁধা নৌকার মত ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু যেই ভীমা লোকজন সহ তীরে উঠল অম্নি প্রকাণ্ড একটা কচুরীর বন এসে পাট গাছের ঘাড়ে চেপে বসল। সে দাঁত খিঁচিয়ে আবার সদলে জলে নামল।

কয়েকদিন ধরে ভীমা এ ভাবে দিনরাত সংগ্রাম করল। জিজ্ঞাসা করলে আর্দ্রমুখে, কাষ্ঠহাসি হেসে বলত, "কর্ত্তা, জার্ম্মেনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছি।" লড়াইয়ের সময়ে ও দেশে

কচুরী পানার নামই হয়ে গিয়েছিল, 'জার্ম্মেনী'। জার্ম্মেনীকে রোধ করতে বিপক্ষ সৈন্যদের যে এর চাইতে বেশী ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছিল, তা' আমার মনে হয় না।

কিছুদিন পরে এক বৃষ্টিহীন প্রভাতে আমি নদীতীরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রথম দৃষ্টিতে মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। প্রায় আধ মাইল স্থান জুড়ে গুচ্ছে গুচ্ছে নীল ফুল সবুজ পাতার উপর দিয়ে ফুটে আছে, প্রভাতের মৃদু বাতাস এক একবার তাদের উপর ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হ'ল ঐ জায়গায়ই কয়েকদিন পূর্ব্বে ভীমা তার লোকজন সহ 'জার্ম্মেনী'র সঙ্গে লড়াই কর্‌ছিল। পাট ক্ষেত ধ্বংস করে তার উপর আজ ঐ মনোরম কুসুমাস্তরণ রচিত হয়েছে।

ভীমা বলত, "কর্ত্তা, দেবতা যদি বিরুদ্ধে গেল, তবে আর কি করা যায়?"

বর্ষান্তে মড়কে ভীমার গোষ্ঠীর অনেক লোক মারা গেল। ভীমা অতি তিক্তভাবে, একটা গালি মুখে নিয়ে বলত, "কর্ত্তা, দেবতার কাণ্ডটা দেখেছেন? তার কোপ কোনো মতেই শান্ত হ'বে না।"

সেবার শীতে মাছ অনেকই ধরা পড়ল, কিন্তু বাজার মন্দা, তা' সিকি মূল্যেও বিকাল না। মহাজনের টাকা সবই রইল, স্রোতযোগে তার সুদ বেড়ে চলল।

ভীমা গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবে পড়ল।

৪

ব্রাহ্মণের মন যখন নৈরাশ্যে ভরে যায় তখন সে দিবারাত্র পরমেশ্বরের ধ্যান অর্চ্চনা দ্বারা নিজকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ বিগ্রহের পূর্ব্বে দেবার্চ্চনা করে, কিন্তু নৈরাশ্যের সময়ে সে নিজেকে ভুলতে চায়—মৃগয়া, মদিরা ও বামার সাহায্যে। বৈশ্যের পক্ষে মৃগয়া অসম্ভব, মদিরা ব্যয়সাপেক্ষ; তারপর ঈশ্বরকে একেবারে ছেড়ে দিলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হ'তে পারে;—সে তাঁর চিত্তের শান্তির জন্য এমন এক উপাস্য দেবতা গ্রহণ করেছে, যাঁ'তে ঈশ্বর সম্পর্কিত ভক্তিরস আছে, আবার বামা সম্পর্কিত আদি রসও আছে; এবং দরকার মত আদিরসটাকেও ভক্তিরস বলে চালিয়ে দিতে পারে, আবার ভক্তি রসটাকেও নিছক আদিরস বলে উপভোগ করতে পারে। শূদ্র উক্ত তিন পন্থার কোনোটাই অবলম্বন করতে পারেনি, তাই সে দুর্দ্দিনে আশ্রয়হীন, কাতর।

আমাদের ভীমা যদি শূদ্র হ'ত তবে সেও কাতরতা অবলম্বন করত; বৈশ্য হ'লে আদি-রসাত্মক পদাবলী কীর্ত্তন করত ও শুনত; ব্রাহ্মণ হ'লে বেদমন্ত্রে আকাশ মুখরিত করত। কিন্তু সে সব করেনি, ক্ষত্রিয়ের পন্থা ধরেছে।

অবশ্য মৃগয়া এক ভাবে তার জাত ব্যবসায়। ক্ষত্রিয়েরা বনে শিকার করত, কৈবর্ত্তেরা জলে শিকার করে। এখন সে ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়ের অপর দুটি ব্যসনে আকৃষ্ট হ'তে লাগল। প্রথম ধরল মদিরা। গ্রামে তার কারবার নেই। মুসলমানরা মদ্যপান করেনা, হিন্দু নেশাখোরেরা গাঁজা এবং আফিঙেতেই সন্তুষ্ট। ভীমা সবডিভিসনের শহরে গিয়ে ধেনো মদ কিনে পান করতে লাগল,—যা' সাধারণতঃ হিন্দুস্থানীদের জন্যে তৈরী হয়। তা'ছাড়া কখন কখন ছয় সাত ক্রোশ পূবে গিয়ে তিপ্রাদের পাহাড়ী মদ খেয়ে আসত।

ভীমা তৃতীয় প্রকার ব্যসনের কবলে পড়ল নেহাৎই ঘটনা চক্রে। সেবার দেশে সকলেরই দুর্দ্দিন ছিল, সুদিন এসেছিল শুধু রাধিকা সাহার। পাশের সহরে তার কাপড়ের গদী আছে, সেবার সে সাবেকী মাল বেচে অসম্ভব রকম লাভবান হয়েছিল। তার ফলে তার বাড়ীর পুরাণো দোলমঞ্চটা নূতন করে বাঁধানো হ'ল, এবং খুব সমারোহের সহিত দোলযাত্রার উৎসব চলল।

সে উৎসবের প্রধান অঙ্গ বাইনাচ। জেলার শহর হ'তে নাচওয়ালী এল। এক চৈত্রের সন্ধ্যায় রাধিকার ঠাকুর বাড়ীর সামনের নাটমন্দিরে মস্ত আসর পড়ল। তা'তে গ্রামের গণ্যমান্য সব ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক আর বৈশ্যেরা বসলেন, চারিদিকে নীচবর্ণীয় লোকেরা ভিড় করে দাঁড়ালো। সন্ধ্যার কিছুপরে ভীমা তার লাঠিধারী কৈবর্ত্তের দলসহ এক ধার দখল করে বসল। তাকে বসবার পিঁড়ি দেওয়া হ'ল, দলের লোকেরা কেহ ছালার চটে কেহ মাটিতে আসন পাতল।

রাত্রি দশটাতে বাই আসরে নামল। ছাব্বিশ সাতাশ

বৎসর বয়স্কা একটি মেয়েমানুষ, তার গায়ের রং ময়লা। মুখে তেলের ছাপ। ঠোঁট পানের দাগে চটচটে। তিন-পাড় ওয়ালা চটং্‌দার ধুতি ঘাগরার মত পরেছে। তা' ঘুরিয়ে সে গান ধরল

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না নাথ
বেলা হ'ল মরি লাজে।

সমবেত জনতা তাকে বাহবা দিতে লাগল।

ভীমা বিশেষ একটু নেশা করে এসেছিল, তাই এক একবার তার বাহবার মাত্রাটা স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘন করে যেতে লাগল। তার উৎসাহ ও উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলল মাঝে মাঝে নাচওয়ালীর অতি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ। প্রায় মধ্যরাত্রে রাধিকার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দকিশোর আর ভীমাতে বেশ একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। দ্বিতীয় বার যখন তার পুনরাবৃত্তি হ'ল তখন হঠাৎ ভীমা দলবলে উঠে দাঁড়াল, বলল, তারা নাচ দেখবে না, এবং—বেশ সজোরে ঘোষণা করল,—কেউ নাচ দেখবে না।

ভীমা ও তার দলের লোক লাঠি হাতে করে হৈ হৈ করে আসরের উপর এসে উঠ্‌ল। ব্যাপার সঙ্গীন দেখে ভদ্রদের অনেকেই সরে পড়লেন, যারা রইলেন, তাদের শুধু তামাসা দেখার লোভ ছিল। রাধিকার বাড়ীর চাকরেরা ও পাড়ার শূদ্রেরা ভীমার দলকে আক্রমণ করল। লাঠিতে লাঠিতে ভীষণ ঠকাঠকি আরম্ভ হ'ল।

মুহূর্ত্তে নাচওয়ালীর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ মিলিয়ে গিয়ে চোখ দুটি ছলছল করে উঠল, পানে রাঙা ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপতে লাগল। সে প্রাণের ভয়ে মুহ্যমান হয়ে আসরের মাঝখানে জড়সড় ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভীমা বিপক্ষকে পরাজিত করে সগর্ব্বে নাচওয়ালীর কাছে এসে বলল, 'চল'। নাচওয়ালী ভয়ে বিহ্বল হয়ে চোখ বুজে ভুঁয়েতে লুটিয়ে পড়ল। ভীমাও তার সঙ্গীরা তাকে চ্যাং দোলা করে নিয়ে চলে গেল।

রাধিকা গ্রামের চৌকিদারদিগকে ডাকাল, কিন্তু কেউ ভীমার বিরুদ্ধে যেতে রাজী হ'ল না। তখন সে দারোগাকে খবর দিতে শহরে লোক পাঠাল।

তারা নদী দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেল, জমিদার বাড়ীর বজরাখানা মধ্য জলে ভাসছে, আর তা' কানায় কানায় লোকে ঠাসা। তারই গলুইয়ের উপর নাচওয়ালী ঘুরে ঘুরে গান করছে,—কেন যামিনী না যেতে জাগালে না নাথ।

কিন্তু যামিনী অবসানের পূর্ব্বেই ভীমা সদলে দারোগার হস্তে বন্দী হ'ল এবং পরের চার মাস পর্য্যন্ত আইনের কঠিন কবলে পড়ে খুব হয়রান হ'তে লাগল।

প্রথমে সকলে জামিনে খালাস পেল। কিন্তু দিনের পর দিন ভীমা ও তার সঙ্গীদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ জলের মত উকিলের পকেটে যেতে লাগল।

শুধু তাই নয়। ভীমা পাড়াগেঁয়ে লোক। শহরের আবেষ্টনে এসে তাকে পদে পদে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হ'তে হ'ল। তার চোখে আগেকার দীপ্তি নেই, গতিতে দর্প নেই। শহরের উদ্ধত শক্তি তার সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ করে দিয়েছিল। সাধারণ পেয়াদা পিয়ন তার পানে অবজ্ঞা ভরে দৃষ্টি করত, হোটেলওয়ালা দোকানদার তাকে একটা নেহাৎই গেঁয়ো ভূত বলে মনে করত। একদিন সমস্ত অপমান চরমে উঠল মিউনিসিপালিটির রিজার্ভ করা পুষ্করিণীতে স্নান করতে গিয়ে। অত্যন্ত গরম হয়ে ভীমা জলে নেমে পড়েছিল। পাহারাওয়ালা বললে, ওখানে স্নান করা নিষেধ। ভীমা তা বিশ্বাস করলে না। বোধ হয় সকালে একটু বেশি মাত্রায় পান করেছিল। ভীমা যখন স্নান করে উঠ্‌ল তখন পাহারাওয়ালা এসে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে চলল। রাস্তায় ছেলের দল তার পিছু নিল। ভীমা এখন গ্রেপ্তারের অর্থ বুঝে। তাই সে আর্দ্র দেহে ঠিক ভেজা বেড়ালটির মতই পুলিশের সঙ্গে চলেছিল। সেই ভীমা, যার প্রকোপে সমস্ত কাঞ্চনপুর গ্রাম প্রকম্পিত, যার কথায় একশত বাছা লাঠিয়াল প্রাণ দিতে প্রস্তুত! শহরে বীরত্বের অনুকূল নেই; এখানে পুলিশের প্রাধান্য, ব্যুরোক্রাসি। ভীমার উকিল খবর পেয়ে তাকে ছাড়িয়ে না নিলে প্রথম নম্বর মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই তাকে দ্বিতীয় নম্বরে জড়িত হতে হ'ত।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, এবং উক্ত উকিলেরই বুদ্ধির কৌশলে, ভীমা ও তার সঙ্গিগণ প্রথম নম্বর মামলা থেকেও মুক্তি পেল। নাচওয়ালী কামিনী সাক্ষ্য দিল, সে নিজ ইচ্ছাতেই ভীমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। ভীমা যখন সঙ্গিগণসহ গাঁয়ে ফিরে এল, তখন চারিদিকে তার জয়জয়কার পড়ে গেল।

৫

কিন্তু রাধিকার হাতে ভীমার জন্যে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছিল। রাধিকা ভীমার মহাজন। তার নিকট হতেই ভীমা বিলের টাকা ধার করেছিল। ফৌজদারী হেরে রাধিকা দেওয়ানীতে গেল। তমসুকের নালিশ করে সুদে আসলে ভীমাদের উপর বহু টাকার ডিক্রি করাল। সে ডিক্রির জোরে ভীমার সমস্ত জমাজমি বাড়ী ঘরের উপর ক্রোক দিল।

গাঁয়ের টন্নী নীলমণি ঠাকুরের পরামর্শে ভীমা আবার উকিলের শরণাপন্ন হল। কিন্তু শুধু অর্থনষ্ট ও দারিদ্র্য-বৃদ্ধি ছাড়া তার কোনো ফল হ'ল না। অবশেষে সমস্ত ভাগীদাররা মিলে দাবীর টাকা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করল। ইহাতে ভীমার জমাজমি সব গেল, রইল শুধু ভিটেখানা ও তার পাশের কয়েক বিঘে জমি।

এর পর ভীমা সর্দার সংকল সর্দারের পদত্যাগ করে স্বগ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

বহুকাল পর্য্যন্ত ভীমার কোনো খবর নেই। তার স্ত্রী শিশু পুত্রকে নিয়ে নিরুপায় হয়ে সে গাঁয়ের গরীব কৈবর্ত্তানীদের সঙ্গে বিনিময়ে ফেরীর ব্যবসা করতে লাগল। ভদ্রপাড়ায় ঘুরে ঘুরে ডিম, শুঁটকী ও ছাঁচি কুমড়ার বদলে পুরাণো কাপড় আনে; সে কাপড় দিয়ে কাঁথা তৈরি করে শীতের পূর্ব্বে স্বজাতীয়দের কাছে বেচে। এইভাবে তার অন্ন সংস্থান হয়।

ভীমা নিখোঁজ হয়েই রইল। একবার শোনা গেল সে শহরে মাছের দালালি করছে। কিছুকাল তা' করেছিল সন্দেহ নেই। বোধ হয় তা' হ'তে দু পয়সা কামাইও করেছিল, কেননা সে খবর পাওয়ার কিছুকাল পরে জানা গেল যে ভীমা এক বিধবা বণিক কন্যার পানিগ্রহণে ইচ্ছুক এবং হিন্দু সমাজ সে ইচ্ছার প্রতিরোধ করাতে সে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণে উদ্যত! একথা শুনে তার ভাগে গদাধর সাড়ে সাত আনার টিকিট কেটে শহরে গিয়েছিল। কিন্তু গিয়ে জানল, বণিক-তনয়া বৈষ্ণবী হয়ে নবদ্বীপ ধামে চলে গেছে, ভীমা নাকি দালালির ব্যবসা ছেড়ে শহরের এক গুণ্ডার দলে ভর্ত্তি হয়েছে। এসব খবর গদাই এসে ভীমার স্ত্রী রুদ্রাণীকে বলল। রুদ্রাণী কপালে করাঘাত করে অদৃষ্টের নিন্দা করতে লাগল।

এর চাইতেও আরো রোমাঞ্চকর খবর আনল গ্রামের টন্নী নীলমণি ঠাকুর। ভীমা নাকি গুটিকতক মুস্লিমের সঙ্গে এক অদ্ভুত নারী হরণের ব্যাপারে সংস্পৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশে অসহায় হিন্দুনারী হরণ করে থাকে মুস্লিম সমাজের দুর্ব্বৃত্তেরা, তার চেয়েও নাকি অধিক সংখ্যক হিন্দুনারী হরণ করে হিন্দু সমাজের দুর্ব্বৃত্তগণ, এবং তার চেয়েও অধিক মুস্লিম নারী নাকি মুস্লিম দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে নির্য্যাতিত হয়। কিন্তু হিন্দুর হস্তে মুস্লিম নারীর নির্য্যাতন তা' কচিৎ ঘটে থাকে। ভীমা তাতেই নাকি অভিযুক্ত হয়েছিল, এবং সে অভিযোগ শুধু নারী হরণের নয়, একটা খুনেরও তাতে সংস্রব ছিল। তবে ভীমা মুখ্য আসামী ছিল না, মুখ্য আসামীর বহু সহচরদের মধ্যে সে একজন। শেষ পর্য্যন্ত, প্রমাণের অভাবে, আইনের কবল হ'তে রক্ষা পেয়েছিল।

এ সব ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য কি না তা' নীলমণি চক্রবর্ত্তী জানে। ভীমার সঙ্গে আমার দেখা হলে যখন আমি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করি, তখন সে সম্পূর্ণ নিরুত্তর ছিল। বোধ হয় সে সব ঘটনার জন্য সে খুব লজ্জা অনুভব করছিল। অন্ততঃ তার মুখ দেখে আমার তাই মনে হ'ত।

৬

বৎসর আড়াই পরে ভীমা স্বগ্রামে ফিরে এসে অতি নিরিবিলিভাবে জীবনযাপন করতে লাগল। সারা-দিন মাছ ধরে, বিকালে বাজারে নিয়ে তা বিক্রি করে, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসে আফিংয়ের গুলি খেয়ে ঝিমোয়। তার পর খেয়ে দেয়ে দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে। কিন্তু

কালের যাত্রা

শিল্পী—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

এ আর আগেকার ভীমা নয়। তার মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে গেছে, কথায় কথায় রেগে উঠে, ভাতের থালা উঠানে ছুড়ে ফেলে দেয়, কারণে অকারণে ছেলেটাকে ধরে মারে। তার স্ত্রী প্রথম তাকে সাদরেই অভ্যর্থনা করে-ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে দুয়ের মনোমালিন্য কলহ, এবং বিচ্ছেদ ঘটল। রুদ্রাণী তাকে ছেড়ে তার বোনের বাড়ীতে চলে গেল, এবং ছেলে নিয়ে আগের মত স্বাধীন ভাবে বাস করতে লাগল।

স্ত্রী চলে যাবার পর ভীমা নেহাৎই কোন-ঠ্যাসা হয়ে পড়ল। বেলা দুটোতে জাল বেয়ে এসে রান্না চড়ায়। আপন মনে বিড় বিড় করে বকে আর লোককে অযথা অশ্লীল গালি গালাজ করে। এতদিন ভীমা বুঝল শুধু দেবতাই তার বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত মনুষ্য সমাজও তার ঘোর শত্রু। সে ভাবটা তার প্রতি কথায় প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল। গ্রামের লোকে তাকে যথাসম্ভব পাশ কাটিয়ে চলে। মুদিরা তার কাছে বেচতেই চায়না, ধারে বেচা তো দূরের কথা! মাছ বেচতে গিয়ে কথায় কথায় লোকের সঙ্গে খন খন করে উঠে। শুধু যোগীদের আধ-পাগলা কেবলরাম বাউলকে সকালে সন্ধ্যায় তার দাওয়ায় বসে গাঁজা ফুঁকতে দেখা যায়।

লোকে ভাবল, এবার ভীমা না খেয়ে মরবে, না হয় বৈরাগী হবে, না হয় একটা খুন খরাপতি করে ফাঁসি যাবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তার কোনটাই হল না। যা' হ'ল তা অতি অদ্ভুত।

ভীমা হঠাৎ তার জমিজমা যা' কিছু ছিল সব বিক্রি করে ফেলল। শুধু বাড়ীখানা রইল। সেও রায়তী সত্বে। তার পর একদিন ভোরে টাকার তোড়া কোমরে বেঁধে ছাতা ও লাঠিসহ রাস্তায় নেমে পড়ল। পথের লোকে জিজ্ঞাসা করে, "ভীম সর্দ্দার কোথা যাচ্ছ?" তার সর্দ্দারি গেলেও সর্দ্দার নামটি যায়নি। ভীমা বলে "হাজিগঞ্জের বাজারে"। হাজিগঞ্জের বাজার তিন চল্লিশ ক্রোশ দূরে। লোকে জিজ্ঞাসা করে "সেখানে কি?" ভীমা হাসে।

তার দিন দশেক পরে একদিন ভীমা বাড়ী ফিরে এল, সঙ্গে নিয়ে এল মোটা সনের দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়। সে দেশে এত বড় এবং এরূপ অদ্ভুত চেহারার ষাঁড় কেহ কোনোদিন দেখেনি। তার ঝুঁটিটা ঘাড় থেকে প্রায় এক হাত উপরে উঠেছে, নীচে পায়ের কাছ পর্যন্ত গলার চামড়া লতিয়ে পড়েছে; চোখ দুটো বিশাল; সিং ছোট ছোট, কিন্তু আগাগুলি অতি তীক্ষ্ণ। এক মুহূর্ত্ত সে জানোয়ারটা স্থির থাকতে পারে না। ভীমা লোহার মত হাত দিয়ে দড়ি ধরে ছিল বলে সে পথের উপর দিয়ে চলছিল।

ভীমা আমাকে দেখে হাত তুলে প্রণাম করে বললে, "কর্ত্তা, একটা ষাঁড় কিনে আনলুম, বড্ড দাম নিয়েছে বেটারা।" বাস্তবিক ভীমার সমস্ত ঐহিক সম্পত্তি ঐ ষণ্ডটাতে রূপান্তরিত হয়ে ছিল।

সে ভিন্ন ঐ প্রচণ্ড জানোয়ারটাকে কেউ সামলাতে পারত না। সামলানো দূরের কথা, তার কাছে এগোনোই অসম্ভব ছিল।

এ ষাঁড়টিই এখন ভীমার নিঃসঙ্গ জীবন জুড়ে রইল। সে যখন বিলের উপর বিস্তৃত সবুজ মাঠের মধ্যে ষাঁড়টাকে ছেড়ে দিয়ে চুপটি করে বসে থাকত, আর ষাঁড় উন্মত্তভাবে সারা মাঠ ছুটে বেড়াত, তখন তার প্রাণ তৃপ্তিতে ভরে উঠত।

বহুদিন পরে ভীমার মুখে হাসি দেখা দিল। তার চরিত্রে আবার অতীতদিনের সুর সৌজন্য ও বিনয় ফুটে উঠতে লাগল।

কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই লোকে বুঝতে পারল, এ ষাঁড়টি আর কিছু নয় শুধু সমাজের উপর ভীম সর্দ্দারের ব্যর্থ জীবনের একটা দুরন্ত প্রতিশোধ। সে ষাঁড় যখন ছাড়া পেয়ে সারা গাঁ ঘুরে বেড়াত, তখন গ্রাম-বাসীরা ভয়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ত। ষাঁড় কারো বাগান ভাঙত, কারো খড়ের কুঁজি টেনে ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে আসত। বৌঝিরা ঘাটের পথে চীৎকার করে সরে দাঁড়াত, শিশুদের প্রাণ সংশয় হ'ত। সে ষাঁড়কে ধরে এমন সাধ্য কারো ছিল না; সকলেই ভীমার কাছে নালিশ করত। ভীমা তার সনের মোটা দড়ি গাছা নিয়ে এসে ষাঁড়কে বেঁধে নিত। তার গলা চাপড়ে বলত "সামলে' চল বেটা, সামলে চল।"

আমার এক এক সময়ে মনে হত ভীমার ষাঁড়টা যেন সত্যিকার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া। পূর্ব্বকালের ক্ষত্রিয় রাজা যখন লড়াইয়ের কোনো ওজুহাত না পেত, অথচ শান্তিতে বাস করা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়ত, তখন একটা ঘোড়াকে রাজ্যের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দিত, আর তাকে যে আটকাতে আসত তার সঙ্গেই লড়াই করত। সে ঘোড়াকে জীবন্তে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে, নিজেকে চক্রবর্ত্তী বলে ঘোষণা করত, মানে ঘোড়া যে চক্করটা দিয়ে এল তার ভিতর সেই প্রধান। মহা সমারোহে যজ্ঞ করে সে খবরটা চারিদিকে ঘোষণা করা হ'ত।

ভীমাও তার ষাঁড়টাকে গ্রামের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ঐ রকমেই যেন লোকের উপর প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা কচ্ছিল।

ষাঁড়টা যখন ভীমার পাশাপাশি ঘাড় দুলিয়ে চলত, তখন গর্ব্বে ভীমার বুক ফুলে উঠত। তার জীবনের সমস্ত নষ্ট শৌর্য্য যেন ঐ ষণ্ডটীতে মূর্ত্তিমান হয়ে তাকে পুনরায় বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করত।

তখন ভীম সর্দ্দার বললেই লোকের সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ত দুরন্ত, দুর্দ্দাম, দুর্জ্জয় একটা বৃষ। প্রাচীন কালের শক্তিশালী রাজাদের পুঙ্গব বা ঋষভ আখ্যা কেন দেওয়া হ'ত ভীমার ষাঁড়টা দেখে আমরা তা' যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতাম।

কিন্তু যুদ্ধের সমারোহের পর তিনমাস না যেতেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। একদিন সন্ধ্যায় ষাঁড়টি ছাড়া পেয়ে ভীমার ঘরের পেছনের বাগানে চরে বেড়াচ্ছিল। ভীমা তার পিছু পিছু গিয়ে অতি কষ্টে গলায় দড়ি লাগাল, কিন্তু ষাঁড় কোনো মতেই সেস্থান ছেড়ে আসবে না। ভীমা তাকে নানা আদরের ডাক ডাকল, শিস দিল, জিভ দিয়ে অনেক রকমের শব্দ করল, কিন্তু ষাঁড় তার দিকে ফিরেও চাইল না, সে নির্ম্মম ভাবে ভীমার ঘরের চাল হ'তে কুমড়োর লতা ছিঁড়ে নামাতে লাগল। অবশেষে ভীমার মেজাজ বিগড়ে গেল। সে ক্রুদ্ধ হয়ে অতি কঠিন ভাবে দড়িতে হেচ্‌কা টান দিল। তা'তে ষাঁড়ের ঘাড়ের চামড়া আধ হাত পর্য্যন্ত চিরে গেল। তখন ব্যাপারটা কি ভীমা তা' বুঝবার পূর্ব্বেই ষাঁড় ভীষণবেগে তার উপর এসে পড়ল, শিং জোড়া দিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য তাকে জমি হ'তে হাতখানেক উপরে তুলে রাখল, তারপর ক্যাক্ করে মাটিতে চিৎ করে ফেলে তার বুকের ভিতর শিং দুটি আমূল বিদ্ধ করে দিল। শিং ভীমার বুকের পাঁজর ভেঙে ফুস্‌ফুস্ ভেদ করে অপর দিকের পাঁজরের কাছাকাছি গিয়ে ঠেকল। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে ভীমার জীবন-লীলার অবসান হ'ল।

গাঁয়ের লোক বলাবলি করতে লাগল, ভীমা সর্ব্বস্ব বেচে হাজিগঞ্জের বাজার থেকে নিজের যম কিনে এনেছিল। আমি ভাবি, ভীমার জীবন দেবতা অপেক্ষা করেছিল একটা বিরোচিত, ক্ষত্রিয়োচিত মৃত্যুর জন্যে; এতকাল পরে সে সুযোগ মিলল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভীমা ক্ষত্রিয় ছিল; তার স্বজাতীয়েরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু

এপ্‌ষ্টাইন ও আর্ট

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এম্‌-এ

আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পজগতে জেকব এপ্‌ষ্টাইনের (Jacob Epstein) নাম সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—জনসমাজ কর্ত্তৃক তাঁর প্রতিভার স্বীকার এবং অস্বীকার দুই কারণেই : অস্বীকার অতি তীব্রভাবেই হয়েছে এবং হচ্ছে; স্বীকার অস্বীকারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। ১৯২৯ সালে লণ্ডনের St. James Park এ Underground Railway Building এর গাত্রে ক্ষোদিত তাঁর 'দিন' ও 'রাত্রি' নামক মূর্ত্তি দুটী জনসাধারণ এবং আর্ট-সমালোচকদের মধ্যে তুমুল হৈ চৈ-এর সৃষ্টি করেছিল। গেল বছর Leicester Galleries এ প্রদর্শিত 'উৎপত্তি' (Genesis) মূর্ত্তিটী আরো উগ্র সমালোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের অবতারণা করে। সাধারণ লোকের ক্ষোভের কারণ এই যে, গুণী ব্যক্তি যাঁরা তাঁরা এই কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তিগুলির মধ্যেও একজন প্রকৃত কলাবিদের পরিচয় পেয়েছেন; আর তাঁকর ওই শত নিন্দাবাদ অগ্রাহ্য করে' এখনো নিজের আর্টিষ্টিক্ খেয়াল মত মূর্ত্তি গঠন করে' যাচ্ছেন।

দিন
(লণ্ডনের St. James Park এ Underground Railway Building এর গাত্রে উৎকীর্ণ।)

এপ্‌ষ্টাইনকে নিয়ে এত গণ্ডগোলের মূল তাঁর পাথরের মূর্ত্তিগুলির অদ্ভুত বিকৃত রূপ। কিন্তু পাশ্চাত্য আর্টে আজকাল ত বিকৃতিরই বহুল প্রচলন। ফটোগ্রাফির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্টের পুরোণো আদর্শগুলির জলাঞ্জলি হয়েছে : বাস্তববাদ বা স্বভাববাদের বদলে এখন impressionism, futurism, cubism ইত্যাদি ism-এর আবির্ভাব হয়েছে, যার ফলে কেউ কেউ আদিম যুগের আর্টের পুনরাবর্ত্তনের প্রয়াস পাচ্ছেন। ফলতঃ, বাস্তবানুকরণের স্থানে বাস্তবের নানারূপ বিকৃতিই বরণীয় হয়েছে। এই নবীন পন্থীরা ছবির বিষয়ের উপর ততটা ধ্যান দেন না, যতটা দেন তার design এর উপর, ছন্দ, গতি বা বর্ণ-বৈচিত্র্য—কোন একটীর উপর।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকায় একটী মজার ব্যাপার ঘটে। একটী চিত্র প্রতিযোগিতায় যে চিত্রটি প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল, পরে জানা যায় যে সেটী টাঙান ছিল উল্টোভাবে এবং সেই ভাবেই তার বিচার হয়েছে। বেচারী বিচারকদের বেশ খানিক গালাগাল হজম করতে হয়েছিল; কিন্তু এটুকু অন্ততঃ প্রমাণ হ'ল যে তাঁরা চিত্রের বিষয়বস্তুকে সারু লক্ষ্য করেননি, তার বর্ণবিন্যাস, রেখাসম্পাত ইত্যাদিকেই

প্রধান বলে' ধরেছিলেন। তবে ছবির বিষয়বস্তু কিছুই নয় একথা যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহ'লে বলতে হবে যে আবহমান কাল থেকে যত বড় বড় শিল্পী জন্মে গেছেন, তাঁরা সবাই মহামূর্খ ছিলেন, এবং আর্টের মোক্ষলাভ হয়েছে আজকালকার ফ্রান্সের অতি-আধুনিক চিত্রকারদের হাতে, যাঁরা আমূর্ত্তিক (abstract) চিত্রের চূড়ান্ত সাধনা করছেন। তা' অবশ্য কেউই স্বীকার করবেন না। এইটুকু শুধু বলতে পারা যায় যে, চারুকলার চরম বিকাশ পাই subjective এবং objective দুই রূপের সমন্বয়ে। কিন্তু যেদিক দিয়েই দেখি না কেন, কেবলমাত্র বিকৃতির জন্ত কোন চিত্র বা ভাস্কর্য্যকে মন্দ বলা আমাদের নিতান্ত অনুচিত। আর্টিষ্ট না হয়েও ফ্রান্সিস্ বেকন একটা কথা বলে' গেছেন যা আর্ট সম্বন্ধে অতি সুন্দর ভাবে খাটে: There is no excellent beauty which hath not some

রাত্রি
(লণ্ডনের St. James Park-এ Underground Building-এর গাত্রে উৎকীর্ণ)

strange proportion. (সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ যেখানে সেখানেই আকারের কোনরূপ অদ্ভুত বা অপূর্ব্ব বিষমতার সমাবেশ দেখা যায়।) একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাই আর্টে বিকৃতি শুধু আধুনিক যুগেরই ব্যাপার নয়। প্রাচীন মিশরের প্রাচীরচিত্রে মানুষের মুখের পার্শ্বদৃশ্যে (profile) সম্পূর্ণ চক্ষু সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এ ভুল মিশরীদের অজ্ঞতা প্রসূত মোটেই বলা চলে না, কারণ তাদের তৈরী অনেক মূর্ত্তিতেই শরীর তত্ত্বের জ্ঞান সুপ্রকট। ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে। স্পেননিবাসী চিত্রকার এল গ্রেকো (El Greco) চমৎকার বাস্তবানুরূপ চিত্র আঁকতে পারতেন, কিন্তু তাঁর ধর্ম্মভাবাত্মক চিত্রে বিকৃতির সঞ্চার দেখা যায়। গুরু ভাবাপন্ন চিত্রই হোক্ বা ব্যঙ্গ চিত্রই হোক্, আর্টিষ্ট চান নিজের ঈপ্সিত অর্থকে ফুটিয়ে তুলতে। আর্টে বিকৃতির মূল আর্টিষ্টের স্বীয় অনুভূতির গভীরতা।

এপ্‌ষ্টাইনের অধিকাংশ সমালোচক তাঁর প্রতি বিশেষ অবিচার করেছেন। বল্‌তে গেলে শিল্প প্রতিভায় পরলোকগত ফরাসী ভাস্কর অগ্যুস্ত রদ্যাঁর (Auguste Rodin) পর এপ্‌ষ্টাইনের সমকক্ষ নেই বল্‌লে চলে। তিনি শিল্পকলার গতানুগতিক কোন মতবাদী নন। বস্তুতঃ, প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিভাশালী শিল্পীই শিল্পের সনাতন ধারাবাহিক নিয়ম কানুনের নিগড়বদ্ধ হন্‌নি; এপ্‌ষ্টাইনও নিজের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় যথেষ্ট দিয়েছেন। তাঁর মতে আর্ট জীবনের একটা সুকুমার বস্তুমাত্র নয়, জীবনের শক্তি বিশেষ। তিনি কেবল নিষ্ক্রিয় আনন্দ (passive pleasure) দিয়ে ক্ষান্ত হতে চাননা, দর্শকের ভাব বৃত্তিকে আঘাত করে' তাকে ভেঙ্গে গড়তে চান। রূপক মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে একথা ভালভাবেই খাটে। যে মূর্ত্তিগুলি এত হৈ চৈ-এর পত্তন করেছে, সব ক'টাই রূপাত্মক। Day, Night, Rima, Genesis, Christ এর ব্রহ্মমূর্ত্তি—প্রত্যেকটাতে ভাস্করের কল্পনালব্ধ যে রূপের ছায়াপাত হয়েছে, তদ্ভিন্ন একটা বিশদ অভিপ্রায় আছে। তিনি দর্শকের মনে বিস্ময়ের ভাব জাগিয়ে মূলতঃ আত্মপ্রসাদের (complacency) মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। মূর্ত্তিগুলির অর্থ পরিচয় দিতে এখানে প্রয়াস করব না; কেবল একটীর (Genesis) সম্বন্ধে

শিল্পীর নিজের মত অভিব্যক্ত করলে তার অনাবশ্যকতা বুঝতে পারা যাবে। তিনি বলেন, "I cannot explain 'Genesis'. My explanation lies in the work itself. If I have failed to make it understandable, then it is a bad work, and no amount of lecturing on my part can save it. You give your own explanation of the work as it appeals to you." ('উৎপত্তি'র অর্থ

মাতৃমূর্ত্তি

বোঝাতে আমি নিজে অসমর্থ। আমার অর্থ মূর্ত্তিটাতেই দেওয়া রয়েছে। এটা যদি দুর্বোধ্য হয়ে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে নিশ্চয় এতে গলদ আছে, এবং আমি যতই তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করিনে কেন, মূর্ত্তিটা খারাপই ধরে' নিতে হবে। যাঁর মনে এটা যেমন ভাবে লাগবে, তিনি তেমনি এর অর্থ নিজেই করে' নেবেন।)

এপ্‌ষ্টাইন শিল্পে সর্ব্বপ্রথমেই চান তার দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদনের শক্তি। ললিতকলার কোন নিদর্শনের অন্তরালে যদি ভাবের সমাবেশ থাকে, তাহ'লে তা' আমাদের মনে নিশ্চয়ই একটা গভীর ছাপ এঁকে দেবে। উচুদরের আর্ট মাত্রেই মনের উপর আঘাত করে এবং আমাদের কল্পনাশক্তিকে প্রবুদ্ধ করে। প্রাণময় শিল্পের গুণই এই যে তা' দর্শকের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে' সাধারণ আত্ম-প্রসাদের গণ্ডী থেকে বার করে' আনে এবং যা আপাত-দৃষ্টিতে সুন্দর বা মুগ্ধকর তদপেক্ষা উচ্চস্তরে নিয়ে যায়।

ব্রঞ্জের মূর্ত্তি বা আলেখ্যচিত্রণে—যেখানে কোন ভাবের জাগরণ অভিপ্রেত নয়, কেবল দর্শকের কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করাই উদ্দেশ্য, সেখানে—বিস্ময় উৎপাদন অতটা প্রবল হ'বার সার্থকতা নেই। এইগুলিতে এপ্‌ষ্টাইনের প্রতিভার প্রতীতি হয় আরো সহজে। 'মাতৃমূর্ত্তি' (Madonna and the Child) তাঁর ব্রঞ্জশিল্পের একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বেকনের বাক্যের সত্যতা এখানেও তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। সেই strangeness—অপূর্ব্বতা বা বৈলক্ষণ্য—ফোটাবার জন্য তিনি তাঁর ভাস্কর্য্যকে বিকৃত করেন না; শুধু গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে সে অপূর্ব্বতা আসে। ফলে তাতে আমরা একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য (excellent beauty) দেখতে পাই—নূতন ভাবে, চিরদিনের জন্য। এই অনুভূতির নূতনত্ব, এই চমৎকারিত্ব তাঁর ব্রঞ্জমূর্ত্তিগুলির স্বেচ্ছাকৃত অমসৃণতা থেকেও কতকটা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁর 'আমেরিকার যোদ্ধা' বা লর্ড রদারমিয়ারের প্রতিমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাথরে পরিষ্কার খোদাই করা কাজে অনেক সময় ব্রঞ্জের এ strangeness পাওয়া যায় না।

প্রতিমূর্ত্তি গঠনে এপ্‌ষ্টাইন মূলের অবিকল অনুকরণ করেন; যাতে অবিকৃত প্রতিচ্ছবি তুলতে পারেন সে বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল। যাঁরা বলেন যে, যদি শিল্পী কলাসম্মত কিছু দাঁড় করাতে পারেন, তাহ'লে সাদৃশ্যের তেমন প্রয়োজন নেই, এপ্‌ষ্টাইনের মতে তাঁদের কথার কোন মূল্য নেই, শুধু বুজরুকি। প্রতিমূর্ত্তি গড়তে গেলে সবচেয়ে বেশী দরকার সাদৃশ্যের। লর্ড রদারমিয়ারের ব্রঞ্জ প্রতিকৃতি তাঁর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক্ষমতার একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অনেক

গুণগ্রাহী ভক্ত তাঁর গঠিত প্রতিমূর্ত্তিগুলিতে চরিত্রচিত্রণ নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন, কিন্তু এপ্‌ষ্টাইন তাঁদের কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চান। তিনি বলেন সাদৃশ্য থেকে চরিত্রের আভাস পাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু তিনি

ন্যান (Nan)
(লণ্ডনের টেট কলাশালায় রক্ষিত)

প্রত্যক্ষ বস্তুরই অনুকরণ ছাড়া আর কিছু করেন না, কাল্পনিক বা অতীন্দ্রিয় কিছু যোগ করে' দেন না। সেইজন্য লোকে তাঁকে অসাধারণ মনস্তত্ত্ববিৎ বল্লে তিনি প্রীত না হয়ে বরং কুণ্ঠিত বোধ করেন।

ফলকথা, এপ্‌ষ্টাইনকে আর্টিষ্ট হিসাবে একজন পূর্ব্ব-সংস্কারের বিরোধী বিদ্রোহী বলে' গণ্য করলে ভুল হবে; তিনি শুধু আমাদের সুলভ আত্মপ্রসাদে ঘা দিতে চান। Leicester Galleriesএ রক্ষিত তাঁর তৈরী মূর্ত্তিগুলি প্রমাণ করে' দেয় যে সাধারণে সুন্দর বলতে যাকে বোঝে সে জ্ঞান তাঁর যথেষ্ট আছে—সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী। তাঁর মতে শিল্পীর সোনার কাঠির স্পর্শেই স্বাভাবিক কোন অসুন্দর জিনিষ সুন্দর হয়ে ওঠে না। যাঁর সেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, তাঁর কাছে সে বস্তু স্বতই সুন্দর, চিরসুন্দর। জীবনের আবর্ত্তমান ঘটনাচক্রে তার সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, কারো কাছে কখনো কখনো, কারো কাছে সদা-সর্ব্বদাই। আর্টিষ্ট যিনি তিনি স্বভাবতই জীবনের মধ্যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান এবং তাকে রূপদান করেন। আমাদের দোষ আমরা সচরাচর সৌন্দর্য্যকে একটা নির্দ্দিষ্ট জিনিষ বলে' ধরি যার মাপকাঠি সকলের কাছেই আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সৌন্দর্য্যের কোন চরম আদর্শ (standard) নেই, এবং আর্টিষ্ট সব সময় দশজনের চক্ষে যা সুন্দর সেরূপ সৌন্দর্য্যকে গড়তে চাননা। তাই এপ্‌ষ্টাইনের সকল প্রকার রূপসৃষ্টি আমাদের সহজবোধ্য না হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

এপ্‌ষ্টাইন একজন ইংলণ্ডপ্রবাসী আমেরিকান ইহুদী। আধুনিক পাশ্চাত্যজগতে দর্শন, শিল্প, নাট্য, সঙ্গীত ইত্যাদি জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় ইহুদীরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। এটা একটা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়—সুধীভির্ভাব্যম্।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয়

শ্রীগদাধর সিংহরায় এম-এ, বি-এল

পূজার ছুটিতে ও অন্য সময় অনেকেই রাঁচি গিয়ে থাকেন; কিন্তু সহরের এক নির্জ্জন প্রান্তে অথচ রাঁচি ষ্টেশন থেকে পাঁচ মিনিটের পথে এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয়ের সংবাদ অনেকেই বোধ হয় ভাল রকম রাখেন না। তাই আজ আমরা এ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলবো।

কলিকাতায় একটী সাধু-সভা আছে, তার নাম "যোগদা সৎসঙ্গ সভা"। স্বামী যোগানন্দ গিরি এর একজন প্রধান সভ্য। স্বামীজী উক্ত সভার পক্ষে একটি আদর্শ ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ইংরাজী ১৯১৭ সালে কাশীমবাজারাধিপতি স্বর্গীয় দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থী হন। স্বর্গীয় মহারাজ সাগ্রহে স্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মত হন এবং ঐ বৎসর ইংরাজী ২২শে মার্চ্চ পুণ্যতিথিতে রাঁচিতে তাঁর নিজের বৃহৎ বাগানবাড়ীতে এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদের দেশের বালকগণকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রয়োজনীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাদান। বিদ্যার্থীগণের প্রকৃত চরিত্র গঠন ক'রে স্বাবলম্বী ও কার্য্যক্ষম ক'রে তোলাই ইহার লক্ষ্য।

ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই

এই আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরে স্বামীজীরই চেষ্টায় কলিকাতায় "ব্রহ্মচর্য্য সঙ্ঘ" এবং পুরীতে "ব্রহ্মচর্য্যসঙ্ঘাশ্রম" নামে দুটী সমিতির যথারীতি রেজেষ্টারি করা হয়। সত্য, প্রেম, সংযম ও অভীঃ (নির্ভীকতা) এই চার মূল ধর্ম্মের সাধন ও রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের মত নানাস্থানে আরও আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই ছিল এ দুই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয় হ'ল ব্রহ্মচর্য্য-সঙ্ঘাশ্রমের একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার কতকগুলি মোটামুটি নিয়ম আমরা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করলাম। আশ্রমের আচার্য্য বা সম্পাদককে পত্র লিখলে যদি কেউ ইচ্ছা করেন সমস্ত বিষয় জানতে পারবেন।

আট থেকে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছাত্র ভর্ত্তি করা হয়। আশ্রম বার মাসই খোলা থাকে। শারদীয়া পূজার সময় প্রায় এক মাস এবং গ্রীষ্মকালে তিন সপ্তাহ কেবলমাত্র পড়া বন্ধ থাকে। এই সময় সাধারণতঃ বৎসরে এক মাস বালকগণকে বাড়ী যেতে দেওয়া হয়। আহারাদি ও কাগজ-কলম ইত্যাদির জন্য প্রতি বালকের অভিভাবককে প্রতি মাসে ১৮৲ টাকা খরচ দিতে হয়। প্রয়োজন হ'লে অভিভাবকগণ আশ্রমে গিয়ে থাকতে পারেন এবং বালকগণকে দেখে আসতে পারেন। বিদ্যার্থীগণের সুচিকিৎসারও বন্দোবস্ত আছে।

বিদ্যালয়ের দুইটী প্রধান বিভাগ—(১) পূর্ব্ববিভাগ (School Department) ও (২) উত্তর বিভাগ (College Department)। সংস্কৃত, মাতৃভাষা (হিন্দী বা বাঙ্গলা), ইংরাজী, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পূর্ব্ব বিভাগের পাঠ্য। দর্শন, অর্থনীতি, সংস্কৃত, ইংরাজী, গণিত প্রভৃতি উত্তর বিভাগের পাঠ্য। প্রত্যেক শ্রেণীতে যোগ্যতানুসারে ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রের আলোচনা করান হয় না। পূর্ব্ব বিভাগের পাঠ শেষ হলে বিদ্যার্থীগণের "ব্রহ্মচর্য্য-সঙ্ঘের" পরীক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক (Matric) পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রম থেকে অনেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেছে। উত্তর বিভাগের ছাত্রগণ "ব্রহ্মচর্য্য সঙ্ঘের" পরীক্ষা অথবা সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা দিতে পারেন। কোন বিভাগেই বিবাহিত ছাত্র লওয়া হয় না।

আশ্রমের কয়েকজন কর্ম্মী ও ছাত্র

হয়। শিশুদের শ্রেণীতে পাঠ্য স্তোত্রাদি, সপ্তম শ্রেণীতে 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ', ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছেলেদের মহাভারত', পঞ্চম শ্রেণীতে 'শ্রীশ্রীভাগবত কথামৃত', চতুর্থ শ্রেণীতে 'সুধাকর গীতা', তৃতীয় শ্রেণীতে 'শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা', এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা' ও 'রাজযোগ'। এই ভাবে বিদ্যারম্ভ থেকে বিদ্যার্থীগণকে আমাদের নীতি-ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করান হয়, যেটা সাধারণ বিদ্যালয়ে

এ সব পাঠ্য পুস্তক ছাড়া চরকা, তাঁত, আসন-তৈয়ারী, সেলাই, কৃষি, গো-সেবা ও রোগী-সেবা প্রভৃতি বিষয়ের কাজ শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। দেখলাম—আশ্রমের বালকগণ নিজেরা একটা ইন্দারা খুঁড়েছে এবং একখানা পাকা ঘরও তৈয়ারী করছে। গো-সেবা ও কৃষিকার্য্য নিজেরা করে। লাঠিখেলা, জলে সাঁতার ও এমন কি আধুনিক ফুটবল খেলা শিখানরও ব্যবস্থা আছে। মেলায় ও

পূজা-পার্ব্বণে বালকগণ স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী গঠন করে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের অনেক সাহায্য করে থাকে। মাঝে

আশ্রমের গো-ধন।

মাঝে দূর গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে তারা গ্রামবাসিদের শিক্ষনীয় বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যায় এবং আশ্রমের সেবাসঙ্ঘ দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে ঔষধ নিয়ে দরিদ্র রোগীদের দেয়। এ সব কাজের দ্বারা বালকগণকে দেশহিতব্রতী করে তোলা হয়।

আশ্রমের গোটাকতক বিশেষ পদ্ধতি আছে। কবি-বরের "শান্তি নিকেতনের" মত এখানেও এক একটি ক্লাশ হয় এক একটি গাছের তলায়—চেয়ার, টেবিল নিয়ে ঘরের

ছাত্রগণ কৃষিকাজ করছে। সম্মুখে যে ইন্দারা দেখা যাচ্ছে আর পিছনে যে ঘর দেখা যাচ্ছে এ দুটীই ছাত্রগণ নিজেরা নির্ম্মাণ করেছে।

মধ্যে নয়। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ আসন পেতে মাটির উপর বসেন। কেবল বর্ষাকালে ক্লাশ হয় ঘরের বারান্দায়। অনেকটা পাঠশালার মত। হিন্দুর ধর্ম্মনীতিশাস্ত্র শিখান হয় বলে হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি কিছু নেই। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় আহ্নিক স্তোত্র ও প্রার্থনা নিত্য হয় বটে কিন্তু বালকগণকে সকল দেশের সকল ধর্ম্মের মহৎ মূলতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা করতে শিখান হয়—ঘৃণা করতে নয়। সকল উপাসক সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীরদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া

সেবা-সঙ্ঘ দাতব্য চিকিৎসালয়ের এক পাশের দৃশ্য।

হয়। যে মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্তে যে ঘটনাটী মহৎ তার স্মরণার্থে প্রতি বৎসর সেইদিনে নিয়মিত ভাবে উৎসব হয়। যেমন, মহরম, বড়দিন ইত্যাদি। বাহিরে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরে নিত্য পূজা হয়। এছাড়া ভিতরে একটী আশ্রমবাসিগণের সকলের সাধারণ উপাসনার

আশ্রমের পুকুরে ছাত্রদের সাঁতার শিখান হচ্ছে।

ঘর আছে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় এখানে সকলে মিলে উপাসনা করেন। এ ঘরে বুদ্ধ, চৈতন্য,

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ছবি ত আছেই তাছাড়া খ্রীষ্ট, জরথুস্ত্র, প্রভৃতি বিদেশীয় ধর্ম্মগুরুদের ছবিও

গাছের তলায় ক্লাশ হচ্ছে। মাঝে অধ্যাপক, দুইপাশে ছাত্র

আছে। মহম্মদের ছবি ভয়ে রাখা হয়নি পাছে একটা কাণ্ড বেধে বসে। এই যে সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব এটা আমাদের কাছে ভাল বলে বোধ হল—বিশেষতঃ আজকালকার দিনে। প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য ছাড়া বিলাসের দ্রব্য কোথাও দেখলাম না। অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেরই অতি সাধারণ খদ্দরের বসন। আশ্রমের পরিচ্ছদ পীতবাস।

আশ্রমে বিদ্যালয়ের সংলগ্ন আরও কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আছে। প্রথম সেবাসঙ্ঘ দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়। এখানে বৎসরে প্রায় ৭০০০ দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়, সাধারণ পাঠাগার; এখানে প্রায় তিন হাজার ভাল বই ও প্রয়োজনীয় মাসিক পত্রাদি আছে। তৃতীয়, মধ্যইংরাজী ও উচ্চ

একদল লাঠি খেলোয়াড় ছাত্র

ইংরাজী বিদ্যালয়; এখানে বাহিরের প্রায় ১২০ জন স্থানীয় বালক শিক্ষা পায়। চতুর্থ, স্থানীয় আদিম জাতিগণের (যথা সাঁওতাল) অবৈতনিক দৈনিক ও নৈশ বিদ্যালয়; এখানে এই সকল নিরক্ষর জাতিগণকে সাধারণ লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুনন, লাঠি খেলা ইত্যাদিও শিখান হয়।

বর্ত্তমানে এই ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের দুইটী মাত্র শাখা আছে। একটী মানভূমে পুরুলিয়ার কাছে হুটমুড়ায়, অপরটী দেওঘরে রিখিয়াতে। ষোল বৎসরের মধ্যে এই আশ্রম থেকে অনেকে প্রকৃত মানুষ হয়ে বেরিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইউরোপে গেছেন, কতক দেশের কল্যাণকর কাজে যোগদান করেছেন, আর কতক ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ব্রহ্মচর্য্যসঙ্ঘের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইংরাজি ১৯২৬ সালে যে যতীন শূর নিরীহ কলিকাতাবাসিদের জীবনরক্ষার্থে নিজের জীবন দান করে অমর হয়েছেন তাঁরও শিক্ষা এই ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ে। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আচার্য্য স্বামী যোগানন্দ আজ দশ

আশ্রম বাড়ীর মধ্যে একখানি ঘরের একপাশের দৃশ্য

বৎসর যাবৎ আমেরিকায় যোগদা সৎসঙ্গসভার পক্ষে ধর্ম্ম ও যোগ শিক্ষার প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। স্বামী ধীরানন্দ ও ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ব্রহ্মচারী যতীন তাঁর সহকর্ম্মী। ইতিমধ্যে আমেরিকার নানাস্থানে স্বামীজী নাকি পঞ্চাশটী শিক্ষাকেন্দ্র খুলতে সমর্থ হয়েছেন। এ কম গৌরবের কথা নয়।

দেশপূজ্য অনেক মহাত্মা এই ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় পরিদর্শন করে বহু প্রশংসা করে গেছেন। বর্ত্তমানে মাননীয় স্বর্গীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অভাবে ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এরূপ একটী প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের দিকে আমরা সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি ও প্রার্থনা করি শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণের সকল চেষ্টা যেন জয়মণ্ডিত হয়।

শ্রীগদাধর সিংহরায়

প্রতিক্রিয়া

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল

বত্রিশ-গড় পরগণা মুখুজ্যেদের জমিদারির মধ্যে মস্ত বড় একটা লাভের সম্পত্তি। কিন্তু এখানকার প্রজারা যেমনি অবস্থাপন্ন তেমনি অবাধ্য, জমিদারকে কোনও প্রকারে ফাঁকি দিতে পারলে তারা কোনও দিনই ছেড়ে কথা কয় না; দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা দিনের পর দিন লেগেই আছে, এবং সব-শুদ্ধ মিলিয়ে অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে লাভের কড়ি সুশাসনের বন্দোবস্তেই নিঃশেষ হয়ে গিয়ে আসলে টান পড়ে।

দুঁদে প্রজা হিসাবে মহিম চাটুয্যের নাম এ পরগণায় বিখ্যাত। জমিদারের সঙ্গে লড়তে হ'লে প্রজারা চাটুয্যে মশায়ের পরামর্শ নইলে চলেনা,—মামলা—মোকদ্দমায় চাটুয্যের তদ্বির উকীল ব্যারিষ্টারকে বিপন্ন করে। পাৎলা রোগা দেহ, বয়স ষাটের কাছাকাছি, উৎসাহ অদম্য, রং শ্যামল, গলায় মোটা পৈতা, গায়ে একটা চাদর, পায়ে চটিজুতা, হাতে প্রায়ই মোটা লাঠি, শুধু তীব্র রোদে একটা জীর্ণ ছাতা,—এই ত' লোকটি, কিন্তু তার নাম এবং প্রতাপ বত্রিশ-গড়ে যেন ভেল্কি খেলে।

সহজেই এই অবস্থা তার ওপর এই পরগণায় সম্প্রতি সরকারী সেটেলমেণ্ট কাজ সুরু হওয়ায় মালিকের দুশ্চিন্তার সীমা নেই। হয়-কে নয় করতে এবং নয়-কে হয় করতে, চাটুয্যের সমান কেউ নেই, এবং সেটেলমেণ্ট বিভাগে এই হয়-নয়ের অপরিসীম অনিশ্চয়তার কথা কারুর অবিদিত নেই।

পুরাণো অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোক নিয়ে কাজ চলা মুস্কিল, সেটেলমেণ্টে সনাতন প্রথা চলেনা, আধুনিক প্রথা এবং কায়দায়, মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করবার কৌশলে অভ্যস্ত লোকের প্রয়োজন। জমিদার ইউনিভার্সিটির উচ্চ-শিক্ষিত যুবক, এ সকল কথা তাঁর জানা ছিল,—সুতরাং এই পরগণায় যে নতুন এসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে এলেন, তিনিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিত যুবক, চালাক চতুর, কথাবার্ত্তায় সুপটু, এবং এক-কালে একটা বড় কলেজে স্পোর্টস-এর ক্যাপ্টেন ছিলেন, সুতরাং স্পোর্টস-ম্যানও বটে।

হ্যাট-কোট-টাই শুদ্ধ যে দিন মিঃ সুধীরচন্দ্র ব্যানারজি, বি, এল, এসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার রূপে বত্রিশ-গড় কাছারীতে উদয় হলেন সেদিন অন্ততঃ পুরাণো কর্ম্মচারীদের বুক দুর দুর করে উঠল। মুখে এমনি একটা কাঠিন্য যে শিস্ যেন শোনায় রেলের বাঁশির মত কর্কশ, আধখানা করে কাটা গোঁপের মধ্য থেকে লাবণ্যর চেয়ে কঠোরতাই ঝরে বেশী, এবং হাতের ছড়ি যখন ঘোরে তখন মনে হয় তার ভেতর বিলাসের চেয়ে আঘাতই প্রচ্ছন্ন রয়েছে পুরোমাত্রায়।

কাছারীর সন্নিকটে একটি পরিচ্ছন্ন বাংলোয় এসিসট্যাণ্ট বাবুর বাসস্থান ঠিক হ'ল, চারিদিকে নানা ফল-ফুলের গাছ, এবং গেটের ওপর সতেজ হাসনা-হানা সন্ধ্যায় যখন ফুলেফুলে ভ'রে ওঠে, তখন অদূরবর্ত্তী তার সুবাস, যেন একটা স্বপ্নের হিল্লোলের মতই অনুভূত হয়।

২

অচিরেই তাঁর নিম্নতন কর্ম্মচারীরা বুঝতে পারলে যে এঁর শাসন-দণ্ড একেবারে অবিমিশ্র লৌহময়, এবং তাদের গোড়াকার সন্দেহ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কথায় কথায় হুমকি, জরিমানা, কঠোর তিরস্কার, অথচ উপায় কি? অভিমান ভরে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবার মত সামর্থ্য কারুর নেই, এবং কাণাঘোষা এ কথাও শোনা গিয়েছে যে মালিক বোধহয় এমনি লোকই চান। এবং এ কথাও শোনা যায় যে এঁর সঙ্গে মালিকের একটা কি দূর সম্পর্কও

আছে। সুতরাং যে অটল আসনে এঁর স্থান, সেখানে মাথা খুঁড়ে মরলেও একমাত্র মাথাই পাবে আঘাত, আসন থাকবে অচল।

সন্ধ্যার সময় তশীলদার শ্যামল চক্রবর্ত্তীর ডাক পড়ল ম্যানেজার বাবুর বাংলোয়।

চক্রবর্ত্তী কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মুখের মোটা চুরুটটা নাবিয়ে এ্যাস-ট্রের ওপর রাখতে তা থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরিয়ে সমস্ত বাতাস যেন ভারী করে দিলে। চক্রবর্ত্তীর বুকের মধ্যে তোলপাড় যেন আরও বেড়ে উঠল।

সুধীর বল্লে, এই মহিম চাটুয্যে লোকটার কথা যা শুনছি তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে আমাদের পরম শত্রু; তাকে শাসন করবার আপনারা কি উপায় করেছেন?

চক্রবর্ত্তী বিনীত ভাবে বল্লে, উপায়ের অনেক চেষ্টা হয়েছে হুজুর, কিন্তু সে লোকটা এমন চতুর—

সুধীর কঠিন হাসি হেসে বল্লে, চতুর! আমাদের এত পাইক, পেয়াদা লোক, লস্কর, তবু তার চাতুর্য্যের নাগাল পেলেন না চক্রবর্ত্তী মশায়, এতদিন ধরে। আর আমি যদি পারি? বলে চুরুটটা মুখে তুলে নিয়ে সবেগে টান দিলে।

চক্রবর্ত্তী হাতযোড় করে বল্লে, পারেন যদি হুজুর ত' এই বত্রিশ-গড়ে সুশৃঙ্খলা ফিরে আসবে, এর আবার সুদিন হবে। শুনেছি বুড়ো কর্ত্তার আমলে অর্থাৎ আমাদের উপস্থিত মালিকের পিতামহের সময়ে, তার যৌবনকালে, মহিম চাটুয্যে ছিল মালিকের শুভ-কামী, সে সময় বত্রিশ-গড় ছিল সোণার রাজ্য। তারপর কি এক কারণে,—

সুধীর বল্লে, পুরাণো কাহিনী শোনবার আমার ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই। আমাদের প্রয়োজন বর্ত্তমান নিয়ে। বুঝেছেন তশীলদার বাবু!

তশীলদার চুপ করেই রইল। এবং বর্ত্তমানে প্রয়োজন ওকে শাসন করা, এমন করে পিষে দেওয়া যে সে আর মাথা তুলতে না পারে। তার জমি—জমা কত?

নিষ্কর জমি বিশ বিঘা আন্দাজ এবং জোত জমি আরও বিশ বিঘা।

সুধীর বল্লে এই নিষ্করের প্রমাণ কি? কোনও দান-পত্র আছে?

তশীলদার বল্লে দেখিনি হুজুর। তবে সে বলে তার কাছে আছে। না থাকলেও তৈরী করতে বেশী সময় লাগবেনা তার, সেটেলমেণ্টের সময়, হয়ত বা এতদিনে তৈরীও হয়ে গিয়ে থাকবে। অপর পক্ষে আমাদের তরফ থেকে কোনও দিন খাজনা আদায়ের কোন প্রমাণ নেই।

সুধীর বল্লে হুঁ। আর জোত জমির খাজনা কতদিনের বাকী?

তশীলদার বল্লে, বছর চারেকের কাছাকাছি। নালিশ না হলে সে দেয় না, এবং ডিক্রি হলেও বছর দু তিন এ-আদালত সে-আদালত ঘোরা-ফিরি করে আমাদের যা আদায় হয়, ততদিনে ওর বাবতে খরচের পরিমাণ হয় তার চেয়ে বেশী!

সুধীর হাসতে লাগল, বল্লে, বেশ বেশ! আপনাদের মত আরও গুটিকতক হিতার্থী জুটলে মনিবের আর দেখতে হবেনা—সশরীরে অচিরেই স্বর্গলাভ ঘটবে শুধু বত্রিশ-গড়ের কেন, হাজার বত্রিশ-গড় থাকলেও সবগুলোর এক—গাড়েই।

এর জবাব দেওয়া চলেনা।

সোজা হয়ে চেয়ারের উপর বসে সুধীর বল্লে, দেখুন তশীলদার বাবু, যা বলি তা শুনুন। কাল সকালে দোবে চোবে পাঁড়ে এই রকম ষণ্ডা ষণ্ডা জন চারেক পেয়াদা পোঠিয়ে দেবেন, খাজনার তাগাদায়। যদি না দেয়, আর দবেনা বলেই মনে হয়,—তাকে যেমন করে পারে ধরে নিয়ে আসবে। আর ঐ নিষ্কর জমির বছর চারেক আগেকার গোটা চার রসিদ ঠিক করে রাখবেন, তাতে ওর আঙুলের টিপ নিতে হবে। ঘোচাচ্ছি আমি ওর নিষ্কর, তার সঙ্গে সঙ্গে ওর বদমায়েসি। নিষ্কর জমির খাজনা ঠিক করে হিসাব করবেন ওর জোতের রেটে। বুঝলেন।

চক্রবর্ত্তী খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লেন হুজুরের যা হুকুম।' কিন্তু—ব'লে একটা ঢোক গিলে বল্লেন—হুজুর যতটা সহজ ভেবেছেন হয়ত' অত সহজে হবে না, ও-লোকটা অত্যন্ত ধড়িবাজ ট্যাড়া লোক, শেষ পর্য্যন্ত একটা মামলা

মোকদ্দমা না বাধিয়ে তোলে, আর ওর লোক-বলও কম নয় হুজুর।

সুধীর উষ্মা প্রকাশ করে বল্লে, সে কথা আপনার ভাববার দরকার নেই, তশীলদার মশাই। সে ভাবনা রইল আমার। অহরহ মামলার ভয় করতে গেলে জমিদারী চলেনা, যারা করে তাদের বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে সংসার ত্যাগ করে চলে যাওয়াই শ্রেয়।

৩

দোবে চৌবে-রা তাদের কায ঠিক মতই করেছিল,—খুব সকালেই মহিম চাটুয্যেকে ধ'রে এনেছিল কাছারী বাড়ীতে। কাযটা অতি প্রত্যুষে সমাধা করাতে হাঙ্গাম বাধতে পারেনি কিছুই। এবং এমন বেশী দূরও নয়, মহিম চাটুয্যের বাড়ী কাছারী থেকে ক্রোশ খানেকের মধ্যেই।

সুধীর অত্যন্ত ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করলে, মহিম চাটুয্যে তোমারই নাম?

মহিম একটুখানি কেশে জবাব দিলে, আমার স্বর্গগত পিতা ঐ নামই রেখেছিলেন এ অধীনের, সুতরাং ঐটেই আমার নাম বলতে হবে বৈ কি।

কথার বাঁধুনীতে সুধীর প্রায় মুগ্ধ হবার মত হ'ল। কিন্তু এটাও বুঝতে দেরী হ'লনা, যে লোকটার সামান্য কথাও এমন বাঁকা, তার প্রকৃতি জলের মত সরল নয়।

মহিমই কথা কইলে আবার। বল্লে ভোর না হতেই নিয়ে এসেছে আপনার পাইক-পেয়াদারা। কোন কাজই হয়নি। আমাকে যে কাযে ডাকা হয়েছে সেটা যদি একটু চটপট সেরে নেন্—ত' ফিরে গিয়ে কাযগুলো করতে পারি।

সুধীর বল্লে, দেরী করবার ইচ্ছে আমারও নেই, চাটুয্যে মশাই, মিনিট পনরর কাজ হবে সব শুদ্ধ, শেষ করে দিলেই আপনার ছুটি। প্রথম কায হচ্ছে জোতের খাজনার বাকী টাকাটা পরিশোধ করা। ইচ্ছে থাকলে এতে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগ্‌বে না।

চাটুয্যে বল্লে অনেক দিনের পুরাণো প্রজা আমি মালিকদের, এবং বরাবর খাজনা আদায় করেই প্রজাসত্ব বাহাল রেখেছি, নইলে—যে-সব আইন কানুন, সাধ্য কি একমুহূর্ত্ত টিঁকতে পারি। সুতরাং ও আপনাদের যেমন করে হ'ক আদায় হবেই—ওর জন্য এত সকালে পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে হাঙ্গাম করবার কি দরকার ছিল, ম্যানেজার বাবু? টাকা ত' এমন জিনিষ নয় যে চাইলেই সহসা হাতে এসে পড়বে,—তার যোগাড় চাই, ব্যবস্থা চাই, সুতরাং হঠাৎ সকালে উঠে যদি একরাশ টাকার ফরমায়েস ক'রে বসেন ত' দিই কোথা থেকে বলুন ত'? বিশেষ যে টাকাটা আপনাদের কিছুতেই মারা পড়্‌বেনা, তার জন্যে এত চিন্তার আপনাদেরই বা কি দরকার এবং আমাকেই বা এ দুঃখ দেবার প্রয়োজন কি? ও-তো আসবে একদিন নিশ্চয়ই!

সুধীর বল্লে, কথার চেয়ে আরও বেশী কিছু পাবার জন্যেই আজ সকালে পাইক-পেয়াদার অভিযান তা যদি বুঝতে না পেরে থাক ত' তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করবনা চাটুয্যে। তোমার কথার চাতুরীতে দিনের পর দিন ভুলে থাকবার মত লোক দুনিয়ায় সবাই নয়। প্রথম কায বলেছি, খাজনার টাকা আদায় করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তোমার বাঁ আঙুলের গোটা চারেক টিপ্ সই দেওয়া, এই হলেই তোমার ছুটি।

চাটুয্যে হাসতে লাগল, বল্লে, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ সই যে কোনও দিন দিই নি এমন কথা বলবনা, কিন্তু সে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। জমিদারের কাছারী বাড়ীতে ও জিনিষটা দেবার আজ পর্য্যন্ত সুবিধে হয়নি, বাঁড়ুয্যে মশাই, সুতরাং ও-কাযটাও আপাততঃ মুলতুবি থাকবে।

সুধীর দৃঢ়-কণ্ঠে বল্লে, মুলতুবি কোনটাই থাকবে না চাটুয্যে। সহজে না হয়, ওই পাইক-পেয়াদা আর তাদের একশো রকমের পদ্ধতি আছে—আর ঐ কাছারী-বাড়ীর হাজতখানা আছে। বুঝেছ?

চাটুয্যে বল্লে, তা আর বুঝিনি? এই বয়সে কত রকম পদ্ধতিই দেখলাম, সে সব আরও ওস্তাদি হাতের বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনার পাইক-পেয়াদাদের মত শিক্ষানবিশের নয়। আর কত হাজত ঘরই দেখেছি, কিন্তু এখনও ত' দেহে প্রাণটা টিকে আছে! তারপর যখন এই সব পদ্ধতি টদ্ধতির প্রতিক্রিয়া সুরু হয় তখন কত ম্যানেজার তশীলদারকে প্রচণ্ড রকমের হিমসিম খেতেও ত' দেখলাম্।

সুধীর বল্লে বেঁচে থাকলে মানুষের দেখার অন্ত থাকেনা, আজও না হয় দু' একটা দেখে নাও চাটুয্যে।

চাটুয্যে বল্লে, মন্দ কি?

৪

বিকেল বেলার দিকে কাছারী বাড়ীতে হৈ হৈ কাণ্ড। জন পনর প্রজা চাটুয্যের এই সংবাদ পেয়ে, লাঠি নিয়ে উপস্থিত এবং কাছারী বাড়ীর দোবে চোবেরাও সশস্ত্র। এ সংবাদ প্রজারা পায় চাটুয্যের মেয়ে কিশোরীর কাছে,—বেলা যখন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে তখনও চাটুয্যে ফেরে না দেখে কিশোরী গিয়ে প্রতিবেশীদের সংবাদ দেয়। অত্যন্ত উৎকণ্ঠার বশে একটা গরুর গাড়ী ক'রে কিশোরীও এসেছে—ছই-এর উপর কম্বল ফেলা—তার মধ্যে এই মেয়েটি চিন্তিত সন্ত্রস্ত চিত্তে অপেক্ষা করছে। হাজত ঘরের মধ্য থেকে চাটুয্যের গর্জ্জন মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

প্রজারা এসে ম্যানেজার বাবুর কাছে চাটুয্যের মুক্তি প্রার্থনা করলে।

ম্যানেজার সুধীর বল্লে, ওর দুটো কায করবার আছে, সেই দুটো করে দিলেই ওর রেহাই। এ কথা ওকে সকালেই বলেছি। এখনও বলছি। নইলে ওকে আটকে রেখে আমার কোনও লাভ নেই।

হাজত-ঘর থেকে গর্জ্জন শোনা গেল, দেখি না কতদিন রাখতে পারে।

প্রজারা বল্লে সে-দুটো কায কি জানতে পারলে আমরাই না হয় ওনার জন্যে করে দি হুজুর।

সুধীর হাসবার মত করে বল্লে, একটা কায তোমরা ইচ্ছে করলেই করতে পার, ওর চার বছরের বাকী খাজনা মায় সুদ গুণে দেওয়া। আর একটা যে কায সে তোমাদের দ্বারা হবে না ত', খাস চাটুয্যেরই দরকার। আর হলেও লাঠি সোটা নিয়ে মালিকের কাছারীতে হামলা দিবার সঙ্গে এ-ও ঠিক খাপ খায় না! তোমাদের চেহারা আর ভাব দেখে তোমরা যে মালিকের কায করবার জন্যেই এখানে ছুটে এসেছ অমনটি'ও' ঠিক মনে হচ্ছে না!

তারা বল্লে, আমাদের দ্বারা নাই যদি হয় তবুও আমরা চাটুয্যেকে চাই।

সুধীর বল্লে, হরকিষণ দোবে, রাম-বালক চোবে তোমরা তোয়ের হও। চক্রবর্ত্তী আমার বন্দুকটা নিয়ে এস,—কাছারী বাড়ীতে কতকগুলো ন্যাংটা প্রজা এসে চোখ রাঙাবে বত্রিশ-গড়ের আর সেদিন নেই ওরা বুঝুক। হয়ে যাক ইস্পার কি উস্পার।

ছিদাম পরমাণিক বল্লে আমরাও জান দিতে তোয়ের—ভাইরা সব ভাঙো হাজত-ঘর।

তারপর এমনি একটা ভীষণ কলরবে কাছারী বাড়ী ভ'রে উঠল যে ব্যস্ত হয়ে চাটুয্যের মেয়ে কিশোরী গাড়ী থেকে নেমে পড়ে চীৎকার ক'রে উঠল ছিদাম-দা, ছিদাম-দা, দোহাই তোমাদের, বলে সে কেঁদে ফেল্‌লে।

ভেতর থেকে ছিদামের উন্মত্ত কণ্ঠের আওয়াজ এল, কিশোরী ফিরে যা, আজ ইস্পার কি উস্পার।

ভেতরে যখন এই তাণ্ডব তখন বাইরে ইষ্টিশনের পথ বেয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল একটা গরুর গাড়ী, এবং তার ভেতর থেকে একজন ছিপ ছিপে গৌরবর্ণ সুদর্শন পুরুষ নামতেই অনন্যোপায় কিশোরী গিয়ে তার পায়ের কাছে পড়ে কেঁদে উঠল—দোহাই আপনার, রক্ষা করুন।

অতিশয় বিস্ময়ের চিহ্ন যুবকটির চোখে মুখে পরিস্ফুট, বল্লে, এ সব কি—এ কিসের হল্লা?

মেয়েটি বল্লে বাবাকে ধরে এনেছে ওরা, তারি জন্যে এই হাঙ্গামা।

আপনার বাবা? কে তিনি?

মহিম চাটুয্যে।

মুহূর্ত্তের জন্য ভেবে নিয়ে যুবকটী বল্লে, আচ্ছা ভয় নেই। কিন্তু এ সব হাঙ্গামে আপনি কেন? গাড়ীতে গিয়ে বসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে এখন। চলতে পারছেন না—আচ্ছা আমি উঠিয়ে দিচ্ছি। বলে তার হাত ধরে তাকে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে যুবকটি কাছারী বাড়ীতে ঢুকল।

তখন সেখানে হৈ হৈ কাণ্ড। কে কাকে দেখে—বন্দুকের গর্জ্জন শোনা যায় নি বটে কিন্তু লাঠি যে নিশ্চেষ্ট ছিল না তা সহজেই বোঝা যায়।

হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ হ'ল, থাম! দু দলের লোকেরই যার ওপর সমবেত দৃষ্টি পড়ল, সেই এই নবাগত যুবকটি। মুহূর্ত্তে যেন ভেল্কি খেলে গেল, ঘোষে চোবে এবং পরমাণিকের দল, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, এবং উভয় পক্ষই আভূমি প্রণাম করে নবাগতকে সম্মান প্রদর্শন করলে।

যুবক জিজ্ঞাসা করলে তোমাদের হয়েছে কি—কাছারী বাড়ীতে চড়াও করে বিকাল বেলা খামখা এ লড়ালড়ি!

কেউ কেউ চিনত এবং যারা চিনত না তারাও বুঝতে পারলে যে এই সৌম্যমূর্ত্তি যুবকটি তাদেরই বত্রিশ-গড়ের মালিক সুরেশ মুখুজ্জে।

ছিদাম প্রণাম করে বল্লে, হুজুর মহিম চাটুয্যেকে আজ সকাল থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে ওই হাজত ঘরে, কিছুতেই ছাড়া হয়নি, তাকেই ছড়াতে এসেছি আমরা।

সুরেশ বল্লে সকাল থেকে মহিম চাটুয্যে মশায়কে? কেন? চক্রবর্ত্তী মশায় এখনই মুক্ত করুন।

মুক্ত হয়ে এসে মহিম চাটুয্যে পিট দেখিয়ে বল্লে দেখছেন, এখনও দাগড়া দাগড়া দাগ, কাঁচা হাতের কায কি না! কিন্তু মহিম চাটুয্যে বসে থাকবার লোক নয়,—চল্লো থানা-পুলিশ করতে। তার-পর বে-আইনী আটক এই সমস্ত দিন ধ'রে!

সুরেশ বল্লে, থানা-পুলিশ আর কাছারীর দরজা ত' খোলা আছেই চাটুয্যে মশায়,—সে সম্প্রতি বন্ধ হচ্ছে না। অনেক বারই গিয়েছেন সে সব জায়গায় আর একবার না হয় যাবেন। কিন্তু তার আগে একটি কায না করলে ত' ছাড়ছি না, চাটুয্যে মশাই।

চাটুয্যে বল্লে, কি কায শুনি!

সুরেশ বল্লে, সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই। বাকী যে সব ব্যাপার তার জন্যে থানা পুলিশ আছে—সেইখানেই বোঝা-পড়া হবে। কিন্তু আমার তরফ থেকে আপনাকে ধরে এনে সমস্ত দিনটা উপোসী রেখে, অমনি মুখে চলে যেতে দেওয়া এ ত' চলবেনা, এ যে আমাদের একেবারে নিজস্ব ব্যাপার, থানা-পুলিশের এলাকার বাইরে!

ইতিপূর্ব্বে চাটুয্যে তাদের যুবক জমিদারকে কোনও দিন চাক্ষুষ দেখেনি, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিল তার সঙ্গে ত একটুও খাপ খায় না। সুরসিক, সৌম্যদর্শন যুবক, চাটুয্যের মত কঠিন লোকেরও মন ভেজে! চাটুয্যে বল্লে, কিন্তু সমস্ত দিনটা ধরে যে বে-ইজ্জতি গেল এই দেহটার ওপর, তার সঙ্গে এই কাছারী বাড়ীতে বসে আপনার নেমন্তন্ন খাওয়া, এ কি ঠিক মিল খাবে মনে হয়?

সুরেশ হাসলে, বল্লে, মিল খাওয়া না খাওয়ার কোনও হদিস্ই আজ পর্য্যন্ত পেলাম না চাটুয্যে মশায়। ও খাওয়ালেই খায়, আর কিছুতেই খাওয়াব না প্রতিজ্ঞা করে বসলে খাবে কি করে বলুন? অথচ মিলেতেই শান্ত, লড়ালড়ি করে না আছে স্বস্তি না আছে সুখ। আমার বয়স যদিচ ঢের নয়, তবুও এই অভিজ্ঞতাটাকেই আমি সত্য অভিজ্ঞতা বলে মনে করি। আমি আপনার লড়বার পথ বন্ধ করছি না, শুধুমাত্র অনুরোধ কিছু খেয়ে যাবার, আর আপনার উপযোগী খাবার যথেষ্ট সঙ্গে আছে,—কলকাতার ভাল সন্দেশ রসগোল্লা এবং ফলমূল। ব্যবস্থা থাকবে চক্রবর্ত্তীর হাতে, যাঁর নিষ্ঠা সম্বন্ধে বোধ করি আপনারও কোনও সন্দেহ নেই।

চাটুয্যে ঘাড় নেড়ে বল্লে, তা ত' নেই। সুরেশ চক্রবর্ত্তীর দিকে ফিরে বল্লে, গাড়ীতেই সব-গুলো রয়ে গেছে, যা এখানে মল্ল-যুদ্ধ বাধিয়ে ছিলেন আপনারা ভুলেই গিয়েছিলাম ও-গুলোর কথা। ও-গুলো আনিয়ে নিন্। আর চাটুয্যে মশাইকে খাওয়ানর ভার আপনার ওপর। চাটুয্যে মশায়ের মেয়েও আছেন এইখানে গাড়ীর ভিতরে, সমস্ত দিন উৎকণ্ঠায় তাঁরও খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই, আপনার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁকেও খাইয়ে দিন। আর ছিদাম্—

ছিদাম হাত-যোড় করে বল্লে হুজুর! সুরেশ বল্লে, অনেকক্ষণ ধরে লড়ালড়ির আয়োজনে আর কস্তাকস্তিতে তোমাদেরও ক্ষিদে পাবার কথা। খুব ভাল আলো চিঁড়ে আছে, যা তোমরা এদিকে দেখতে পাওনা। দই আর চিনি দিয়ে চলবে না, কলকাতার দু' একটা সন্দেশ রসগোল্লার সঙ্গে?

স্মিত হাস্যে ছিদাম বল্লে, খুব চলবে হুজুর! সুরেশ বল্লে কিন্তু আমার ঘোষে চোবেরাও সমস্ত দিন খাটা-খুটি করেছে, তারাও লড়েনি কম। তোমাদের ঐ আলো চিঁড়ের ভোজে

তাদেরও সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু। মনের কোন-খানটায় যে ধাক্কা লাগল বলা যায় না, ছিদাম এই কথায় একেবারে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

চাটুয্যে বল্লে—কিন্তু,—

সুরেশ হাসলে, বল্লে, দোহাই চাটুয্যে মশায় আর কিন্তু নয়। লড়বেন বলছেন? তা লড়ুননা, সে পথ ত খোলাই রয়েছে, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যা করে এসেছেন তার পথ আমার দুটো কলকাতার সন্দেশ বন্ধ করতে পারবে এ দুরাশা আমিও রাখিনা, আপনিও বা সে আশঙ্কা করবেন কেন? এ সব মেনে নিয়েও একটা সত্য থেকে যায় যাকে অস্বীকার কেউই করতে পারবে না। আমার আপনার মধ্যে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ। বাংলার চিরদিনের মধুর সম্বন্ধ। আমরা লড়েই আসছি এবং হয়ত ভবিষ্যতেও লড়ব, কিন্তু এই সনাতন সম্বন্ধটা অন্ততঃ একঘণ্টার জন্যেও আজ সত্য হতে দিন!

চাটুয্যে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, তার শুষ্ক মন বাঙলার ঐতিহ্যের কি একটা মধুর রসে যেন আর্দ্র হয়ে উঠল, বল্লে, বেশ।

যেখানে মাত্র কিছুক্ষণ আগে ভৈরব রণ-কোলাহল জেগে উঠেছিল, সেখানে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই পরিতৃপ্ত ভোজনের সম্মিলিত শব্দ এ যেন সত্যই ভেল্কী!

খাওয়া শেষে বিদ্রোহী প্রজার দল গড় করে সুরেশকে প্রণাম করে ফিরল। ব্যাপারটার এমনি প্রীতিকর পরিণামে চাটুয্যে ছাড়া সবারই মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন পরিস্ফুট। চাটুয্যেকে খানিকটা এগিয়ে দিতে গিয়ে কিশোরীর গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে সুরেশ বল্লে, অন্ততঃ আজকের এই ব্যাপার থেকে আপনার বাবাকে উদ্ধার করে এনেছি, এর আনন্দ আমি গোপন করব না।

ছই-এর ওপর কম্বল খানিকটা ওঠান—সেইখানে বসে কিশোরী দেখছিল এই আশ্চর্য্য ব্যাপার। অস্তমান সূর্য্যের তামাটে কিরণ তার গৌরবর্ণ মুখে প'ড়ে তাকে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দিয়েছিল। নিটোল সুন্দর দেহ, ভাসা-ভাসা চোখ, কোঁকড়া চুলের দু' একটা গুচ্ছ হাওয়ায় উড়ে পড়েছিল তার কপালে। দৃষ্টি মধুর, গভীর,—অবাধ আকাশের দিকে, পৃথিবীর ধূলামাটির বহু উর্দ্ধে, যেন কোন স্বপ্ন রাজ্যে! মুখে স্নিগ্ধ স্মিত-হাস্য।

সুরেশের কথায় তার দৃষ্টি নেমে এল স্বপ্ন-লোক থেকে, কিন্তু তখনও স্বপ্ন-লোকের মাধুর্য্যে ভরা। পদ্মের মত টলটল করছে, সুষমায় পূর্ণ। সুরেশের মনে হ'ল এমন চোখ সে আজ পর্য্যন্ত দেখেনি,—এমনি শান্ত, স্নিগ্ধ, সুগভীর! মনে হ'ল তাদের অদৃশ্য স্পর্শ যেন তার শরীরকে জুড়িয়ে দিলে।

কিশোরী কিছুই বল্লেনা, শুধু একটু হেসে দুই হাত জোড় করে সুরেশকে প্রণাম করলে। কৃতজ্ঞতার প্রসন্ন হাসি!

গাড়ী যখন পশ্চাতে দীর্ঘ ছায়া ফেলে অনেক দূর চলে গেছে তখনও সুরেশ দাঁড়িয়ে। যখন বাঁকের পথে আর দেখা গেল না, তখন সহসা তার মনে পড়ল যে সে প্রয়োজনের ঢের বেশীই দাঁড়িয়ে আছে।

* * * *

সুধীর জীবনে এত বড় আঘাত এবং অপমান কোনও দিনই পায়নি—তারই জ্বালা আজ বিকাল থেকে যেন তাকে দগ্ধ করছিল। বহু চিন্তা এবং গবেষণা করে সে আজ যে আগুণ জ্বালিয়ে তুলেছিল, এক-মুহূর্ত্তে সুরেশের ইন্দ্রজাল তাকে যে শুধু নিবিয়ে দিলে তা নয়, দুই যুদ্ধমান দলের মধ্যে অপূর্ব্ব সখ্য স্থাপন করলে। কি আশ্চর্য্য কুশলী এই লোকটি,—তার কাছে নিজেকে অত্যন্ত কদর্য্য অশোভন মনে হতে লাগল। এই একদল আমলার সামনে।

সন্ধ্যার পর দেখা। আম্‌তা আম্‌তা করে সুধীর বল্লে, আশ্চর্য্য পলিসি আপনার কিন্তু।

সুরেশ বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাইলে, বল্লে, পলিসি! পলিসি বলছ কাকে?

জবাব দেওয়া আরও শক্ত। বল্লে এই যে ভাবে মিটিয়ে দিলেন।

সুরেশ বল্লে, সুধীর পলিসি আমি একটিমাত্রই জানি, সে অনেষ্টি, সোজা সরল পথে চলা। তুমি যে, পলিসির কথা বলছ সে হয়ত তা নয়। আমি সে পৌচাল পলিসির মর্ম্ম বুঝিনা। আমি এসেই বুঝতে পারলাম, যে অন্যায় হয়েছে ষোল আনা আমাদের। একটা লোককে ধরে এনে

ঘরে বন্ধ করে রাখবার আমাদের অধিকার নেই। তার-পর খাজনা আদায়? তার জন্যে দাবী করতে পার, চাইতে পার, তারপর ত' আদালত খোলা। জানি যে সে সোজা পথ নয়, কিন্তু ওর চেয়ে সোজা পথ আবিষ্কার করতে গেলে দেখা যায় যে সে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়েছে বহু-দীর্ঘ আর বহু বিপদ-সঙ্কুল। আর নিষ্কর জমিকে সকর প্রমাণ করবার তোমার যে চেষ্টা ওর মধ্যে আমার একটুও সায় নেই। হ'তে পারে চাটুয্যে ভয়ানক পাজী লোক, কিন্তু তাকে জব্দ করবার ত ও উপায় নয়, ওতে জব্দ হব সবচেয়ে বেশী আমরাই, প্রথমতঃ সত্যকে ছেড়ে মিথ্যাবাদী হয়ে, এবং দ্বিতীয়তঃ সঙ্গে সঙ্গে থানা-পুলিশ এবং ফৌজদারীর বিপুল পাকে পড়ে, অর্থে, অনর্থে, এবং সম্মান ও সুনামে মস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে।

সুধীর বল্লে, কিন্তু জমিদারী চালাতে গেলে ত' এ-সবের দরকার।

সুরেশ বল্লে জমিদারী আমি ঢের দিন চালাই নি, সুতরাং তার সম্বন্ধে এমন চূড়ান্ত কথা হয়ত বলতে পারব না, যা দশজনে নির্ব্বিবাদে মেনে নেবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে জমিদারী একটা সৃষ্টি ছাড়া কারখানা নয়, দুনিয়ায় এমনি যদি নিয়ম হয় যে সোজা সরল পথই উৎকৃষ্ট ত' জমিদারী সম্বন্ধেও তাকে খাটতেই হবে, সুধীর। কোনও ক্ষেত্রে যদি না খাটে মনে হয়, ত' সে বিশেষ ক্ষেত্রে বরং জমিদারী অচল হওয়া ঢের ভাল, কিন্তু জমিদারীর দোহাই দিয়ে নিজেদের অচল হওয়া কোন কাযের কথাই নয়।

সুধীর বল্লে, কিন্তু কড়া শাসন নইলে চলে কি করে?

সুরেশ হাসলে, বল্লে, এই অতি-কূট-নীতি সম্বন্ধেও আমার বিদ্যে যে অগাধ নয়, তা আমি মুক্তকণ্ঠে বলব। কিন্তু আমার চারিদিকে চোখের ওপর যে আশ্চর্য্য শাসনের পরিচয় প্রতিনিয়তই পাচ্ছি সে ত' নিছক কড়া নয় সুধীর। দুর্দ্দান্ত গ্রীষ্ম আসে বছরে মাত্র একবার, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় সত্যি, কিন্তু তারপর তার চেয়ে ঢের বেশী ক'রে এলো বাকী ঋতুরা,—বর্ষা এলো তার অগাধ স্নিগ্ধ সিঞ্চন নিয়ে, শরৎ এলো তার সুষমা-সম্ভার নিয়ে, শীত এলো তার শীতলতা নিয়ে, হেমন্ত এলো তার মাধুর্য্য নিয়ে এবং বসন্ত এলো তার ফল-ফুলগানের অপূর্ব্ব বিভব নিয়ে! একবার প্রচণ্ড আসে বলে তার প্রতিষেধের এত বিস্ময়কর আয়োজন! যে নিছক কড়া কোনও দিনই সত্যি হয়ে উঠল না কোটি-যুগ-ব্যাপী বিধাতৃ বিধানে, তাকে কেমন করে স্বীকার করে নেবো বল? মিঠে এবং কড়া দুই পাশাপাশি, কিন্তু কড়ার চেয়ে মিঠের পরিমাণ ঢের বেশী, তবেই ত' শাসনের চাকা চলে নির্ব্বিঘ্নে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই।

সুধীর কি বলবে খুঁজে পেলেনা, অথচ কিছু একটা বলা চাই। তাই খানিকটা ভেবে বল্লে, শেষের দিকটা মিঠের পরিবেশন যে-রকম সুপ্রচুর হ'ল, মায় কলকাতার সন্দেশ রসগোল্লা, তাতে মনে হচ্ছে ও-লোকটা বিশেষ রকম মুগ্ধ হয়ে গেছে।

সুরেশ বল্লে, সুধীর, ও লোকটাকে ভাল করে চিনতে পারাও শক্ত। ওর পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস দুটো রসগোল্লা বদলে দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস নেই, থানা-পুলিশ ফৌজদারী যদি ও না করে ত' তার কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে, এবং যদি করে ত' কিছুমাত্র বিস্মিত হয়োনা,—এমন কি আমাদের বোধ করি তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভাল।

সুধীর শুকনো মুখে সুরেশের দিকে চাইলে।

৫

সুরেশের অনুমান যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ পেতে বেশী দেরী হলনা। ফৌজদারী থেকে সমন এলো মহিম চাটুয্যে বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে সুধীর থেকে সুরু করে দোবে, চৌবে কেউ বাদ পড়েনি, এমন কি কৌশল করে তার ভিতরে সুরেশকেও জড়ান হয়েছে। অপরাধের ফর্দ্দে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অত্যন্ত সঙ্গীন ধারাগুলো মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে।

সংবাদ পেয়ে সুরেশ কলকাতা থেকে এসে পৌঁছুল বিকালের ঠিক সেই সময়টিতে।

এসে দেখলে সুধীরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

সুরেশ হাসলে, বল্লে ভয় পেয়ে কোন লাভ নেই সুধীর। বিষ-বৃক্ষের ফল ধরেছে; আর সে বৃক্ষ তোমার স্বহস্তে

পোঁতা। এত সহজে ও-সব কঠিন লোককে আয়ত্ত করতে পারা যায় না, বিশেষ এমন পদ্ধতিতে যাতে আমাদেরই গচ্চা রয়ে গেল এক শো। ওদের জব্দ করবার প্রথা বিভিন্ন,—ক্ষিপ্র এবং গোপন, হাঁক ডাক করে পঞ্চাশটা পাইক পেয়াদা পাঠিয়ে সোর গোল ক'রে নয়। যদি ও-পথের আশ্রয় নিতে হয়, তা হলে শঠে শাঠ্যং। দেখছ, রসগোল্লা সন্দেশ ও বেশ নির্ব্বিবাদে হজম করেছে। ওগুলো হয়ত' তোমার আমার গলায় বাধে কিন্তু ও শ্রেণীর লোকের নয়। যা হক এইবার পূর্ণ উদ্যমে নেমে পড়া যাক রণক্ষেত্রে,—এ কথা ঠিক যে উকীল কৌঁসিলিতে ও আমাদের সঙ্গে পারবে না; এবং সন্দেশ খেতে যে একদিন দেরী ক'রে ফেলেছে, মাত্র সেইটুকুই আমাদের কলকাতার মিষ্টান্নের বাহাদুরী।

তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বল্লে, বাঃ কথায় কথায় ভুলেই যাচ্ছিলাম,—দোবে রতনকে বলো ত' কালো ঘোড়াটা চট্ করে সাজিয়ে নিয়ে আসুক আর দেও ত' আমার বন্দুকটা ততক্ষণে সাফ্ করে নি। বিকালের দিকে এ সময় বত্রিশ-গড়ের জঙ্গলের ওধারে চরে যে রকম পাখীর মেলা, তা কয়েকবার দেখে এসেছি; কলকাতা থেকে মনে করে আসছি আজ শীকারে বেরোতে হবে কিন্তু কথায় কথায় ভুলে যাচ্ছিলাম। নেও চট্-পট করো।

বলে অবিলম্বে বেরিয়ে পড়ল সুরেশ।

সুধীর গোমড়া মুখ করে নিজের ঘরে গিয়ে বসল, চাটুয্যের আচরণে মন অবসন্ন। অথচ এই সুরেশ লোকটি নির্ব্বিকার, কিছুই গায়ে মাখতে চায়না, সে যত বড় বিপদই হ'ক না। ফৌজদারীর খবর পেয়ে সে কলকাতা থেকে এল বটে, কিন্তু সাজ সরঞ্জাম ক'রে বেরোলো শীকারের সন্ধানে! আশ্চর্য্য মানুষ!

সন্ধ্যামুখে হঠাৎ দিক-চক্র পাঁশুটে বর্ণ ধারণ করলে, পাখীরা চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করে তীরের মত উড়তে লাগল এবং দেখতে দেখতে ধূলা-বালি-খড়-কুটি উড়িয়ে এক প্রচণ্ড ঝ্যাত্যা আচ্ছন্ন করলে দিগ্বিদিক।

চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত চিন্তিত হ'ল মালিকের জন্য। এই ঝড়ের মুখে চর এবং জঙ্গলে একাকী তিনি, সঙ্গে একটি লোকও নেননি। অথচ এই ঝড়ে বেরোনোও ত' অসম্ভব। অগত্যা আকাশের দিকে চেয়ে দুর্গা-নাম করতে লাগল এবং দোবে-চোবেদের বলে রাখলে যে ঝড় একটু কমলেই বেরোতে হবে মালিকের সন্ধানে।

* * *

বাইরে ঝড় কমেছে বটে, কিন্তু বিপুল বৃষ্টি এবং মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মেঘ-গর্জ্জন। ঘরের ভেতর একটা স্তিমিত প্রদীপ জ্বলছে, তার কাছে বসে কিশোরী। চাটুয্যে আজ মামলার তদ্বিরে সমস্ত দিন ঘুরে কতকটা ক্লান্ত।

কিশোরী বল্লে, বাবা, শেষ পর্য্যন্ত তুমি ও-দের নামে নালিশ করলে? এত করে খাওয়ালেন ওতে বুঝতে পারলে না যে ও'রা প্রকারান্তরে ত্রুটি স্বীকার করলেন, তবু তোমার রাগ গেল না?

চাটুয্যে বল্লে, তুই শুনলি কোথা থেকে? কিশোরী বল্লে, এ খবর কি চাপা থাকে, ছিদাম-দার কাছে শুনলাম। নালিশই যদি করবে ত' খেলে কেন? বল্লে না কেন যে আমি তোমাদের সঙ্গে লড়াই করব, তোমাদের এখানে খাব না।

চাটুয্যে টেনে টেনে হাসতে লাগল, বল্লে, বেশ ত' দুই কাবই হ'ল, কলকাতার টাটকা সন্দেশ রসগোল্লা ফলমূল-ও খাওয়া হ'ল, আবার নালিশও চল্লো! এখন ভুলোরাম খেলারাম! বাবাজী ভেবেছিলেন দুটো রসগোল্লা খাইয়ে আমাকে ভেড়া বানিয়ে দেবে! বোকা যদি হতাম ত' ও-গুলো ছেড়ে মামলাই লড়তাম, কিন্তু তাতে লাভ? এও হ'ল ও'ও হ'ল—মন্দ কি?

বাপের কথায় কিশোরীর মুখ লাল হয়ে গেল, বল্লে, তোমার কথা ছেড়ে দেও বাবা আমরা বোকা সোকা মানুষ, আমাদের লজ্জা করে!

কথাটার শ্লেষ অনুভব করা শক্ত নয়, চাটুয্যে খানিকটা চুপ্ করে রইল। বল্লে, ছেলেমানুষ তোরা তোদের এ সব কথায় না থাকাই ভাল। থাকত' যদি তোর মা—

সোজা হয়ে বসে কিশোরী বল্লে মা-র কথা বলছ?

থাকতেন যদি তিনি ত' তোমার সাধ্যি কি ছিল বাবা—

এমন সময় বাইরে প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী বস্তু পতনের আওয়াজ এবং তারপর আর্ত্তকণ্ঠের করুণ স্বর, বাবা গো—

চমকে উঠে কিশোরী বল্লে, কি হ'ল? বলে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ছুটলো সেই দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে চল্লো চাটুয্যে।

বাইরে যেন প্রলয় বেধেছে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে, অন্ধকারে দৃষ্টি এক হাতের বেশী চলে না।

সদর দরজার সামনেই যেন মনে হ'ল কে পড়ে রয়েছে। মুখের কাছে লণ্ঠন নিয়ে দেখে, কিশোরী মুহূর্ত্তে চীৎকার করে উঠল, বাবা সুরেশবাবু, জমিদার বাবু।

চাটুয্যে আস্তে আস্তে উঁকি মেরে দেখে বল্লে তাই ত' তা বেশ ত' হয়েছে—থাক না, মামলা নয় মকদ্দমা নয়, যদি বিনা খরচায় রাস্তায় ওর শেষ হয় তা মন্দ কি?

কিশোরী বল্লে বাবা বল কি? অজ্ঞান হয়ে আছেন, ধর বাবা নইলে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

চাটুয্যে দাঁড়িয়ে রৈল। বল্লে, শত্রুকে আদর করে ঘরে ঢোকাতে পারব না।

কিশোরী বাপের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে, বাবা এ সব কি কথা বলছ তুমি? এত বড় বিপদ,—এ সব কি মানুষের কথা? ধর নিয়ে চল।

চাটুয্যে তীব্র কণ্ঠে বল্লে, না আমি নিয়ে যাব না। ওকে ঘরে আনা চলবে না কিশোরী, আর যদি তুমি আনতে চাও ত' তোমারও আসা চলবে না। আমার ঘর মনে রেখো। আমার হুকুম মনে রেখো।

কিশোরী বল্লে, নাই চলুক। বলে সুরেশের সিক্ত মাথা আপনার কোলের ওপর তুলে নিয়ে ডাকতে লাগল— ছিদাম-দা, ছিদাম-দা।

ছিদাম বেরিয়ে এসে বল্লে এ কিরে কিশোরী? এত ঝড়ে বৃষ্টিতে রাস্তায়, এ্যা ওকে?

কিশোরী বল্লে জমিদার সুরেশবাবু, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

ছিদাম বল্লে, আর চাটুয্যে মশায় দাঁড়িয়ে দেখছে। মানুষটা যে মরে!

কিশোরী কান্নার স্বরে বল্লে, ছিদাম-দা নিয়ে চলো তোমার ঘরে। বাবা ওঁকেও নিয়ে যেতে দেবেন না, আমাকেও ঢুকতে দেবেন না।

একবার অগ্নি-দৃষ্টিতে চাটুয্যের দিকে দেখে ছিদাম চেঁচিয়ে উঠল, ভ্যালা রে মরদের পো। তারপর সুরেশের দেহ আপনার সবল স্কন্ধে তুলে নিয়ে এক-হাতে কিশোরীর হস্ত দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরে বল্লে, আয় আমার ঘরকে।

৬

চেতনা যখন ফিরে এল তখন রাত দশটা বেজে গেছে। দুর্ঘটনা ঘটেছিল এই রূপে। হাওয়ার বেগ কাটিয়ে চর এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সুরেশ নিরাপদে ঢুকেছিল গ্রামে কিন্তু সহসা মহিম চাটুয্যের বাড়ীর সামনে প্রবল বজ্রপাতের শব্দে এবং তীব্র বিদ্যুতের আলোয় ঘোড়া ভড়কে গিয়ে আরোহীকে ফেলে দিয়ে দৌড়ায়। আঘাত তেমন গুরুতর নয়, কিন্তু পড়ার 'শকে' চেতনা বিলুপ্ত হয়।

চেতনা হ'তেই সে চোখ চেয়ে দেখলে কিশোরী তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, মুখে নিরতিশয় উৎকণ্ঠা, ডান হাতে পাখা করছে।

দুই চোখে জল আসবার মত হ'ল এই ভেবে যে সে-দিন সূর্য্য-কিরণের ঝলমলে আলোর মাঝখানে যাকে লেগেছিল ভাল, আজ বিপদের দিনে কেমন করে সেই এলো তার সেবার ভার নিয়ে!

সুরেশ চোখ বুজে ভাবলে। তারপর আবার চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করলে ঘোড়া থেকে পড়েছিলাম সেই অবধি মনে আছে। এ কোথায় আমি?

কিশোরী বল্লে ছিদাম-দার বাড়ীতে।

ছিদাম হাত-যোড় করে এগিয়ে এল। বল্লে বড় ভাবনা হয়েছিল রাজা। কেমন বোধ করছেন এখন?

সুরেশ বল্লে, মন্দ না, কিন্তু গায়ে ভারী ব্যথা। ও-যাবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সে-দিন যে ছিদাম লাঠি নিয়ে মারবার জন্যে তৈরী হয়েছিল সবার আগে, আর যে বোধ করি

সব চেয়ে বড় সাক্ষী হবে আমাদের বিপক্ষে, ভগবান এনে ফেল্লেন তারই বাড়ীতে।

ছিদাম হাত যোড় করে বল্লে, ছিদামের ভাগ্য। ও সাক্ষী টাক্ষীর কথা এখন থাক হুজুর।

খবর পেয়ে সুধীর, চক্রবর্ত্তী এবং পাইক-পেয়াদারা পাল্কী নিয়ে এসেছিল। সেখানকার এক ডাক্তারকেও এনেছিল।

সুধীর বল্লে, ডাক্তার বাবু একবার পরীক্ষা করে দেখতে চান।

সুরেশ বল্লে, করুন। বিশেষ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না, তবে সামান্য ক্ষত টত হয়ে থাকবে।

ডাক্তার বাবু বল্লেন, হাঁ সেগুলো আমি ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছি ইতিপূর্ব্বে। আর একবার ভাল করে দেখতে চাই।

দেখে তিনিও মত দিলেন যে আঘাত গুরু নয়, হপ্তা খানেকের মধ্যে সম্পূর্ণ সেরে উঠবার সম্ভাবনা।

সুধীর বল্লে, আমরা পাল্কী নিয়ে এসেছি ডাক্তার বাবু যদি মত দেন ত কাছারী বাড়ীতে নিয়ে যাই।

সুরেশ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বল্লে, থাক্ না আজ রাতটা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, একটু কমলে দেখা যাবে। ডাক্তার বাবু সায় দিয়ে বল্লেন না আজ রাত্রে ত' নয়ই।

৭

লাগছে মন্দ নয়—জীবনের একটা নূতন অভিজ্ঞতা। এই অপ্রচুর আলো বাতাসের খড়ের ঘর, দেহে আঘাতের ব্যথা, তবু যেন মন্দ নয়। যে কমনীয় কোমল হস্তের সেবা পাচ্ছে সে প্রতিনিয়ত এই নিঃশেষে দরিদ্রের ঘরে, তার মূল্য নেই, সেই শুধু যে সহনীয় করেছে দেহের বেদনাকে, তা নয়, যেন একটা নেশার মত কিসের ঘোরে আচ্ছন্ন করেছে। সে যে দিন সেরে উঠবে সে-দিনও যেন এই সেবার প্রতীক্ষা শেষ হবে না—জীবনের পথে যত দূর দেখা চলে তার অন্ধি সন্ধি রন্ধ্র-পথ ভ'রে উঠেছে যেন এই সেবার কনক-দীপ্তিতে, নবোদিত সূর্য্যের কমনীয় কিরণের মত!

তিন-দিনের দিন সকালে বাইরে ক্রুদ্ধ চটি-জুতার চটাপট আওয়াজ শোনা গেল, এবং তারপরেই রুষ্ট কণ্ঠের আওয়াজ, কিশোরী, কিশোরী, শীগগির আয় বলছি।

ছিদাম বেরিয়ে এসে জবাব দিলে, বল্লে, কিশোরী যাবে না; মনে নেই তাকে মানা করেছ ঘরে ঢুকতে, নিজের মুখে!

এত বড় জবাব চাটুয্যে বোধ করি ছিদামের কাছে প্রত্যাশা করেনি, তাই সহসা উত্তর খুঁজে না পেয়ে বল্লে, ওবে! তবে কি হবে শুনি?

ছিদাম বল্লে, শোনবার দরকার নেই। কিশোরী থাকবে আমার বাড়ীতে, তাকে মাথায় করে রাখব আমার ঘরে যতদিন আমার ভাগ্যে থাকবে। যাকে পেলে রাজার ঘরও আলো হয়, তার কদর বুঝলে না চাটুয্যে, তাকে দিলে তাড়িয়ে?

চাটুয্যে বল্লে সে আমার কথার অবাধ্য হয়েছিল কেন সেই রাগেই ত!

ছিদাম খল খল করে হেসে উঠল, বল্লে, চাটুয্যে তুমি যে মানুষের মতন কথা কওনি, বাঘের মত কথা কয়েছিলে! তাই ত' খুব করেছিল শোনেনি তোমার কথা! একটা মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে তোমার বাড়ীর সামনে, আর যে-সে লোক নয়, আমাদের রাজা, তাকে ঘরে আনতে দেবে না! মানুষের মধ্যে এমন কথা কি কেউ কখনো শুনেছে? তুমি না বামুন, চাটুয্যে? ঘেন্না ধরে গেছে বামুনের ওপর। মানুষ ত' নয় শয়তান। কিশোরী ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তাই জন্যে তাকেও দিলে তাড়িয়ে! আবার এখন ফিরে এসেছ,—কিশোরী, কিশোরী,—কেন যাবে কিশোরী তোমার বাড়ী?

চাটুয্যে থ' হয়ে শুনছিল। বল্লে, ছিদাম, এরও উপায় আছে—চল্লাম থানায়।

ছিদাম মুখ বিকৃত করে বল্লে, যাও যাও ঢের দেখেছি থানা-পুলিশ আর তোমার কেরদানি চাটুয্যে। ওই নিয়েই কাটল সারা জীবনটা তোমার, আর মানবের যে গুণ দয়া, ভালবাসা, সব একে একে হারালে। ছিদামকে আর পাবেনা চাটুয্যে! এমন শয়তানের সঙ্গ আর নয়। অনেক পাপ করেছি, কিন্তু সেই দিন কান মলেছি—যে দিন

সেই বিপদের রাত্রে চাটুয্যে হ'ল বাঘ! আর নয় ঠাকুর সরে পড়। তুমি যে থানা-পুলিশ করেছ, তাতেও আর ছিদামকে পাবেনা। এক-পেট কলকেতার সেরা সেরা সন্দেশ রসগোল্লা খেলে যে মনিবের ঘরে বসে পেট ঠেসে তার নামে ফোজদুরি! ছিদাম গিয়ে বলবে যে চাটুয্যে রসগোল্লা খেয়ে এসে মিথ্যে নালিশ করেছে, আমাদেরও ছিল নেমন্তন্ন, আমরাও পেট ভরে খেয়েছি। দিও না সাক্ষী ছিদামকে, দেখো না সে কি বলে!

শুনে চাটুয্যের কপালে বিন বিন ক'রে ঘাম বেরোতে লাগল, সে উঁচু পৈঠেটায় বসে পড়ে বল্লে, বলিস কি ছিদাম। তুই যে আসল সাক্ষী!

ছিদাম বল্লে, আসল নকল বুঝি না। ছিদামের এক কথা ঠাকুর! ছিদামকে কেন, আর কাউকেই পাবে না। সবাই জানতে পেরেছে যে চাটুয্যে মানুষ নয়, নেকড়ে বাঘ!

চাটুয্যে কথার জবাব দিলে না—হাতের ওপর মাথা রেখে চুপ করে বসে ভাবতে লাগল অনেকক্ষণ। ছিদাম বড় বড় পা ফেলে দুম্ দুম্ করে চলে গেল নিজের কাযে।

মাথা যখন তুললে তখন মুখ হয়ে গেছে পাঁশুটে, কপালের শিরা উঠেছে ফুলে। আজ একে একে সবাইকে হারালে সে। ভাঙ্গা ভারী গলায় ডাকলে, কিশোরী কিশোরী!

কিশোরী বেরিয়ে এসে বল্লে, কি বাবা।

চাটুয্যে বল্লে, যাবিনে বাড়ী?

কিশোরী বল্লে, যাব।

তবে চল।

কিশোরী বল্লে, এখন ত' যেতে পারবনা বাবা। উনি এখনও পুরো সারেন নি, ঠিক মত সেবা করবার লোক ও আর নেই, আমি গেলে হয়ত বেড়ে যাবে। সেরে উঠুন তারপর যাব।

চাটুয্যে কিশোরীর মুখের দিকে চেয়ে রইল অবাক্ হয়ে। তারপর হঠাৎ উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, বল্লে ও হ'ল তোর আমার চেয়ে আপনার লোক, নিমকহারাম মেয়ে!

কিশোরী রাগ করলে না, ভয়ও পেলে না, ব্যস্তও হ'ল না। আস্তে আস্তে মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলে, উনি যে অসুস্থ বাবা।

মুখে বিড়বিড় করে বক্‌তে বক্‌তে চটির চটাপট্ শব্দ করে তীরের মত দ্রুত চলে গেল চাটুয্যে।

৮

তার পরদিন সকালে আবার চাটুয্যের গলার আওয়াজ, ছিদাম ছিদাম।

ছিদাম বেরিয়ে এসে চম্‌কে উঠল। বল্লে কি হয়েছে তোমার ঠাকুর, চেহারা এমন শুকনো?

চাটুয্যের কণ্ঠস্বরে সে উগ্রতা নেই। বল্লে কেমন আছেন রে বাবু, একবার দেখা হয় না?

ছিদাম বল্লে দেখা হবে না কেন, যেমন রাজা লোক তেমনি রাজার মতন মন, দেশ শুদ্ধ লোক দেখা করছে আর তোমার সঙ্গে হবেনা? কিন্তু তুমি দেখা করবে কোন মুখে চাটুয্যে?

চাটুয্যে শুকনো মুখে চাইলে ছিদামের পানে। বল্লে, ছিদাম, জানিস্, কাল গিয়ে মামলা তুলে নিয়েছি!

ছিদাম ভারী আশ্চর্য্য হল, বল্লে বেশ করেছ, কিন্তু সত্যি কি?

চাটুয্যে ছিদামের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রৈল। বিড় বিড় করে বলতে লাগল, কেউ আর বিশ্বাস করেনা সহজে, এমনি হয়েছে। উত্তরে বল্লে, হাঁ সত্যি।

ছিদাম খুসী হয়ে বল্লে এই ত মানুষের মত কায। হাঁ দেখা হবে বৈ কি। এস।

চাটুয্যেকে সঙ্গে করে নিয়ে ছিদাম পৌছল সুরেশ যেখানে শুয়ে। একগাল হেসে বল্লে, রাজা, চাটুয্যে কাল মামলা তুলে এসেছে!

সুরেশ ভারি বিস্মিত হয়ে চাইলে চাটুয্যের পানে। বল্লে, দিন চলবে কি করে চাটুয্যে মশাই?

বল্লে চলত না, কিন্তু এবার চলবে। —এদেশে থেকে হয়ত চলা শক্ত হবে তাই ঠিক করছি অন্য কোথাও চলে যাব।

সবাই চুপ করে রইল।

চাটুয্যে বল্লে, পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি এই কায করে

এসেছি, কিন্তু কিছুই ত' লাভ করতে পারলাম না, না অর্থে না মনে!

অর্থ এমনি যে দুবেলা আহার জোটেনা। মন এমনি যে দোর গোড়ায় অচেতন মুমূর্ষুকে ঘরে স্থান দিতে চাইনি, বর্ষা-ঝড়ের বিপদের দিনে।

এ-সব ধরা পড়ল কাল। আমি যাকে পরম বন্ধু ভাবতাম, আমার দক্ষিণ হস্ত মনে করতাম, সেই ছিদাম আমাকে বল্লে শয়তান, নেকড়ে বাঘ!

হাঁ দেখুন জিজ্ঞাসা করতে ভুলেই গিয়েছি, কেমন আছেন আপনি?

সুরেশ বল্লে, অনেকটা ভাল।

চুপ করে বসে রইল চাটুয্যে। চোখ আকাশের দিকে, মনে হচ্ছে একেবারে শুকনো নয়!

তারপর বল্লে, রামায়ণের সেই বাল্মিকীর দশা। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। ছিদামও নেকড়ে বাঘ বলে তাড়িয়ে দিলে।

একে একে সকলকে হারিয়েছি। স্ত্রী অনেকদিন গেছে, তারপর যাদের যাদের বন্ধু করেছি সবাই ছেড়েছে একদিন। কাল ছাড়ল ছিদাম, যে মনে করেছিলাম কোনও দিনই ছাড়বে না।

চুপ করে খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগল। তারপরে বল্লে, কিন্তু সব চেয়ে বড় হারাণো হারিয়েছি—সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গেছে সেই ঝড়ের দিনে। আপনার চোট আমার কাছে ঢের ছোট সুরেশবাবু, আমার বুকের হাড়-কটা সে-দিন খান খান হয়ে গেছে।

সেদিন আমি হারিয়েছি আমার একটি মাত্র আঁধার ঘরের মাণিক কিশোরীকে। ধ্বক্কত, একেবারে ধ্বক্কত!

বলে দুই হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

কিশোরী ঘরেই ছিল। এসে বাবার হাত ধ'রে বল্লে, ও কথা কেন ভাবছ বাবা, আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি।

চোখের জল মুছে মেয়ের হাত শক্ত করে ধরে চাটুয্যে বল্লে, মিথ্যে কথা কিশোরী! কিন্তু তোকে হারিয়ে আরও যেন বড় করে পেয়েছি। বাবা কাল বুঝতে পারলাম। ও-দিকটায় যে একেবারে অন্ধ ছিলাম!

আমি যার মৃত্যুকামনা করেছি সে-ই ঝড়—জল—বজ্রপাতে তাকে সেবা করে বাঁচালে। তাকে হারালাম আমি, কিন্তু সে পেলে নবীন জীবনের আশ্চর্য্য সার্থকতা।

দস্যু রত্নাকরের ঘরে বুঝতে পারলাম ছিল লুকিয়ে জানকী!

বলে আস্তে আস্তে দুলতে লাগল মোড়ায় বসে।

হঠাৎ খপ্ করে কিশোরীর হাত ধরে সুরেশের ডান হাতে চেপে ধরে বল্লে, বাবা জীবনে কোনও দিন যে প্রসন্ন মনে দিতে পারেনি, আজ তার এই প্রথম ষোল আনা মন-খোলা দান, আমি যেমনই হই, এই দানের গৌরব তোমার কাছে অটুট থাকবে জানি।

সুরেশ দুই হাত জড়ো করে নমস্কার করতেই তার মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে কি সব ব'লে, চোখের জল মুছতে মুছতে চাটুয্যে হাওয়ার মত বেরিয়ে গেল,—এবং সেই অবাক নিস্তব্ধতার মধ্যে তার রাস্তায় দ্রুত-চলা চটির একঘেয়ে আওয়াজ অনেকক্ষণ শোনা যেতে লাগল।

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

চণ্ডীদাসের পঞ্চপঞ্চাশৎ প্রকাশিত পদ

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ

একখানি বার পাতার কাগজের পুঁথিতে কেবলমাত্র চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পঞ্চ-পঞ্চাশৎটি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। লিপিকর পঞ্চপঞ্চাশৎ সংখ্যক পদের খানিকটা লিখিয়াই লেখনীত্যাগ করিয়াছেন, আর লেখেন নাই। অক্ষর দৃষ্টে মনে হয়, পুঁথিখানির বয়স সওয়া শত কি দেড়শত বৎসর হইবে।

পদগুলি নূতন নয়, কারণ স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' খুঁজিয়া সবগুলিই পাইতেছি। কিন্তু তবু পুঁথিখানি ধরিয়া কতগুলি কথা বলিবার আছে।

(১) পদগুলি সবই একই চণ্ডীদাসের, এবং তিনি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'। পুঁথিতে তথাকথিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'—রচয়িতা বড়ু-চণ্ডীদাসেরও পদ নাই, এবং দীন-চণ্ডীদাস ভণিতা-যুক্ত পদও নাই।

(২) স্বর্গীয় নীলরতন বাবু তাঁহার সম্পাদিত 'পদাবলী'র ভূমিকায় (পৃঃ ৫) পদ-পর্য্যায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "পদের শ্রেণী-বিভাগ ও ক্রম-নির্দ্দেশ করিবার সময় আমি একটি বিষয় ছাড়া আর সকল বিষয়েই প্রাচীন পদ-সংগ্রাহকগণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছি। কেবল শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ অগ্রে না দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রথমেই দিয়াছি।" ইহাতে বুঝিতেছি, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদগুলি প্রথমে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁহার নিজের,—ওরূপ পুঁথিতে ছিল না। কিন্তু আমার পুঁথির আরম্ভই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের নয়টি পদ লইয়া।

(৩) আমার পুঁথির ও নীলরতন বাবুর 'পদাবলী'র পদের পারম্পর্য্যে মিল নাই; যথা পুঁথির ১ নং পদ (স্থির বিজুরি বিষম পৌরি পেখলু ঘাটের কূলে) পদাবলীর ১২ নং পদ, কিন্তু পুঁথির ২ নং পদ (কনক চরণ কিবা দরপন...) পদাবলীর ১৫ নং পদ, আবার পুঁথির ৩ নং পদ (বেলি অবসন কালে দেখিলু ভালে...) পদাবলীর ৭ নং পদ,—এইরূপ।

(৪) পুঁথির পদের পাঠে ও পদাবলীর পদের পাঠে বহু অসঙ্গতি। পদাবলীর ২৬৫ নং পদের (কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী) ৫ হইতে ১০ লাইন পর্য্যন্ত পুঁথিতে (নং ৩১) অভাব। পদাবলীর ৩১৮ নং পদের (দৈব যুগতি অশেষ গতি) ১৬ লাইন হইতে বাকীটা পুঁথিতে (নং ৪০) নাই। পদাবলীর ২৮০ নং পদের (ওই ভয় উঠে মনে ওই ভয় উঠে) ৫ হইতে ৬ লাইন পুঁথিতে (নং ৪১) নাই। পদাবলীর ৩৪৩ নং পদের (কানুর পীরিতি মনের সহিতি) ১৬ হইতে ১৯ লাইন পুঁথিতে (নং ৫০) নাই। পদাবলীর ২৭৭ নং পদের (পাশরিতে চাহি তারে) ৩-৪, ৯-১০, ও ১২ লাইন পুঁথিতে (নং ৫৩) নাই।

আবার, পুঁথির কোন-কোনও একটি পদের পাঠ পদাবলীর দুই বা ততোধিক পদ মিলাইলে, তবে উদ্ধার করা যায়। যথা, পুঁথির ১৪ নং পদ পদাবলীর ২৯৭ নং পদের খানিকাংশ ও ৩৫৩ নং পদের খানিকাংশ। পুঁথির ৪৫ নং পদ পদাবলীর ৩৩৯ নং পদের প্রথম হইতে ৭ লাইন ও ৩১৯ নং পদের ১০ লাইন হইতে শেষ। পুঁথির ৪৬ নং পদ পদাবলীর ৩১৫ নং পদের প্রথম ৪ লাইন ও ৩৩৯ নং পদের ১২ লাইন হইতে শেষ। পুঁথির ৪৭ নং পদ পদাবলীর ৩১৯ নং পদের ১৪ লাইন হইতে শেষ।

পুনশ্চ, "সেই মরম কহিনু তোরে" পদাবলীর এই ৩০৫ নম্বরের পদটি পুঁথির ৩৬ নম্বরের পদ, কিন্তু পুঁথিতে এই প্রথম লাইনটি ছাড়া পদের অবশিষ্ট অংশ পদাবলীর ৩৩৬ নং পদের নয় লাইন হইতে বাকীটা।

প্রশ্ন এই, (দ্বিজ) চণ্ডীদাস এই সকল পদগুলি কোন্

ভাবে রচনা করিয়াছিলেন? অর্থাৎ পুঁথি ঠিক না পদাবলী ঠিক?

(৫) পদাবলীর ও পুঁথির ভণিতাগুলিতে সর্ব্বত্র মিল নাই। যথা, পুঁথির ১১ নং পদ পদাবলীর ৬৫ নং পদ, কিন্তু পদাবলীর পদের ভণিতায় "দ্বিজ চণ্ডীদাস" আছে, পুঁথিতে 'দ্বিজ' শব্দ নাই, এবং ৺রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণেও (দ্বিতীয় সং, পৃঃ, ১০২) এই পদের ভণিতায় 'দ্বিজ' নাই। পুঁথির ১৬ নং পদ পদাবলীর ২৯১ নং পদ,—পুঁথির ভণিতায় 'বিস খাইলে দেহ যাবে রব রবে দেসে। বাশুলি আদেশ কবি কহে চণ্ডীদাসে।". পদাবলীর ভণিতাও প্রায় এইরূপ, কিন্তু রমণী বাবুর সংস্করণে (পৃঃ ২৪৬) ভণিতায়—'কবি' স্থানে 'দ্বিজ' পাই। পক্ষান্তরে, পুঁথির ২০ নং পদ পদাবলীর ২৯০ নং পদ, কিন্তু পুঁথির ভণিতায়—"বাসুলি য়াদেস কবি কহে—চণ্ডীদাসে" এবং পদাবলীর ও রমণীবাবুর সংস্করণের (পৃঃ ২৪৫) উভয় পদেই 'কবি' স্থানে 'দ্বিজ' আছে। আরও দেখিতেছি, পুঁথির ২৮ নং পদ পদাবলীর ৩৫৫ নং পদ, কিন্তু পদাবলীর পদের ভণিতায় আছে 'চণ্ডীদাস কবি', অথচ উহারও পাঠান্তরের ভণিতায় 'কবি' নাই, এবং পুঁথিতেও নাই, রমণীবাবুর পুস্তকেও নাই।

এই সকল হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, পুঁথি লেখকরা যাঁহাকে স্থানে স্থানে 'কবি চণ্ডীদাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'।

পুঁথির ৩৯ নং পদের (পদাবলী ৩৫৮ নং) ভণিতায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' নাই,—আছে "চণ্ডীদাস কহে যেই জারে জেই ভায়"। রমণীবাবুর সংস্করণেও 'বড়ু চণ্ডীদাস' আছে।

পুঁথির ৪০, ৪৮ ও ৪৯ নং পদের (পদাবলী ৩১৮, ২৯৩ ও ৩৪১ নং পদ) ভণিতায় 'বাশুলি' বা 'বাসুলি' নাই।

পুঁথির ৪২ নং পদের (পদাবলীর ৩৪২ নং) ভণিতায় আছে, "নানরের মাঠে গ্রামের নিকটে বাসুলি আছয়ে যথা"। কিছুদিন এই গ্রামের নামের বানান লইয়া অযথা তর্কাতর্কি চলিয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন লিপিকরের হাতে নামের বানান বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে, এই খেয়ালটা কাহারও হয় নাই।

পুঁথির ৪৮ নং পদের (পদাবলীর ২৯৩ নং রমণীবাবুর সংস্করণের পৃঃ ২৪৭-২৪৮) এবং ৫০ নং পদের (পদাবলীর ২৪৩ নং, রমণীবাবুর সংস্করণে এই পদটি নাই) ভণিতায় 'ধোবিক জন' বা 'রজকী নারী'র উল্লেখ নাই। ইহা একটা গুরুতর কথা। রাগাত্মিক পদগুলির আলোচনা এখন থাক্, কিন্তু অন্যান্য সকল পদে রামী-রজকিনীর যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা কি চণ্ডীদাস নিজে করিয়াছিলেন? কবির কি কোনও কাণ্ডজ্ঞানই ছিল না?

পুঁথির ৩০ নং পদের ভণিতায় আছে "পরস পাসরে ঠেকিয়া রহিলে বড়ু দ্বিজ চণ্ডীদাস"। পদাবলীর ৩৫১ নং পদের ভণিতায় শুধু আছে "কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস"। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চণ্ডীদাসীয় একখানি পুঁথির পরিচয় প্রসঙ্গে এই পদটির ভণিতা লিখিয়াছিলেন, "পরশ পাথরে ঠেকিয়া রহিলা বড়ু দ্বিজ চণ্ডীদাস।" (পৃঃ ১৫৫)। তাহা হইলে, আমারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উভয় পুঁথিতেই ভণিতায় 'বড়ু দ্বিজ চণ্ডীদাস'। কিন্তু ভট্টশালী মহাশয়ের মতে, 'দ্বিজ' শব্দ 'বড়ু' শব্দের সমানার্থক, (কাজেই) পুঁথির লেখক বড়ু ও দ্বিজ একত্র ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আমার মতে, দ্বিজ বলিতে যাহা বুঝায়, বড়ুর অর্থ তাহা নয়, হইলে লেখক সমানার্থক দুইটি শব্দ পাশাপাশি বসাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন।

পুঁথিখানি ব্যতীত একখানি পাত্‌ড়া পাইয়াছি, যাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের একটা সহজিয়া পদ আছে। পদটি নীলরতন বাবুর পদাবলীতে পাইলাম না, সেই হেতু এটিকে নূতন বলিয়া মনে করিতেছি, এবং নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

অথ চণ্ডিদাসের পদ

সোনহে রসিক ভকত ভাই।
সহজ কথার উত্তর চাই॥
কি হেতু গমন হইল তথা।
কেনোবা আইব জাইবে কোথা॥
কেনোবা ধর্‌য়াছ মানব দেহ।
কী হবে কি পাবে বুঝ্যাছ ইহ॥
য়োধিকার দেহে সবহ দেশে।
দেহের সভাব জাইবে কিসে॥
দেহের স্বভাব ছাড়িয্যা ভজে।
তবে ত পাইবা ব্রজেন্দ্ররাজে॥
চণ্ডীদাসে বলে উলট বেদ।
খুজিবে পাইবে ঘুচিবে খেদ॥

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

মুক্তির ডাক

কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

মা!—"মা!—"

প্রৌঢ়, ক্ষীণকায় রামতারণের দেহ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। গভীর ক্লান্তি ভরে তিনি তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্তে মাথা টিপিয়া ধরিলেন।

পাশের ঘর হইতে গৃহিণী বিন্দুবাসিনী স্বামীর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাহিরে রাত্রির জমাট অন্ধকার। বিন্দুবাসিনী দেখিলেন, স্বামীর ললাটে বাহিরের ঘনায়িত অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। স্বামীর এমন বিষণ্ণ মূর্ত্তি, বিচলিত ভাব তাঁহার বিবাহিত জীবনের প্রায় ৩৫ বৎসরের মধ্যে কখনও দেখেন নাই।

বিন্দুবাসিনী উদ্বিগ্ন ভাবে কাছে আসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে? অমন করছ কেন?"

রামতারণ তেমনই ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। লণ্ঠনের মৃদু আলোকে তাঁহার নতমুখের সম্পূর্ণ অংশ দেখা না গেলেও একটা ক্লিষ্ট বেদনা তাঁহার বিবর্ণ, শীর্ণ মুখমণ্ডলে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বিন্দুবাসিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইল না।

স্বামীর স্কন্ধ দেশে হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কি হয়েছে বল্‌বে না?"

সে স্বরে সহানুভূতির যে স্নিগ্ধ ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল, তাহা বোধ হয় রামতারণের ক্লিষ্ট অন্তরে পৌঁছিল। তিনি মুখ তুলিয়া নিবিষ্ট দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিলেন। তারপর গাঢ়স্বরে বলিলেন, "দাসত্বের পরিণামই এই রকম। কি আর শুনবে! সেই চিরকালের এক ঘেঁয়ে সুর!"

পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "ছুটী দিলে না?"

"কেন দেবে?"

রামতারণের বড় বড় চোখ দুইটি সহসা অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলিয়া উঠিল।

গায়ের জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ সোজা হইয়া বসিলেন। তারপর দাঁতেদাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণের ছেলে, চাকরী করতে গিয়েছি। চাকর কুকুর দুই সমান। ত্রিশ বছর চাকরী করছি। কখনো এক সঙ্গে একমাস ছুটী চাইনি। শরীর খারাপ বলে একমাসের ছুটী চাইলাম। বড় বাবু বল্‌লেন, সাহেবকে বল। সাহেব মিষ্টি হেসে বল্‌লেন, বড় কাজের চাপ; এখন মাস ছয়েকের মধ্যে ছুটী দেওয়া চল্‌বে না। অথচ বড়বাবু দশবছরের মধ্যে ছ' মাস ছুটী পেয়েছেন, সাহেব চার বার বিলেত ঘুরে এসেছে।"

বিন্দুবাসিনী বাতাস করিতে করিতে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্বামীর পক্ষে এখন কিছুদিন বিশ্রামের কিরূপ প্রয়োজন তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। হরিডাক্তার ব্যবস্থা দিয়াছেন; অন্ততঃ তিন মাস বিশ্রাম করা দরকার, কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া বদলাইয়া আসিতে পারিলে ভালই হয়। অভাব পক্ষে, কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম—কোন রকম মস্তিষ্ক চালনার কাজ করিলে চলিবে না।

দরিদ্রের সংসার। রামতারণ কোন সদাগরী আফিসে ৫০টি টাকা বেতন পান। ২০ টাকায় কাজ আরম্ভ করিয়া ৩০ বৎসরে ৫০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। প্রতিপাল্যের সংখ্যা বেশী নহে বলিয়া এই সামান্য বেতনে কোন রকমে সংসার প্রতিপালন করা চলিতেছে। বাড়ী ভাড়া লাগে না—সহরের উপকণ্ঠে দশ কাঠা জমির উপর পৈতৃক বাড়ীটা ছিল, তাই রক্ষা। মরিয়া হাজিয়া এখন একটি মাত্র পুত্র সন্তান

ভগবানের আশীর্ব্বাদে টিকিয়া আছে। তাহার কলেজের পড়া এবং একমাত্র অসহায়া বিধবা সহোদরাকে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য করিয়া যাহা বাঁচে তাহাতেই অতিকষ্টে সংসার চলে। স্বামীর দুঃখ বিন্দুবাসিনী বুঝিতেন, তাই তিনি হাসি মুখে সকল কষ্ট সহ্য করিয়া নিপুণ ভাবে সংসার চালাইতেন। এখন স্বামীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, দীর্ঘকালের কঠোর প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর অন্ততঃ একমাস বিশ্রাম পাইলে, আবার হয়ত স্বামী হাসিমুখে সংসারের যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারেন। তারপর সুধীর বি-এ পাশ করিলে—

রামতারণ বলিয়া উঠিলেন, "ছুটী দিলে না। না দিক, ভগবান এর বিচার করবেন। ভাঙ্গা শরীর নিয়েই দেখি কতদিন চলে।"

বিন্দুবাসিনী আশ্বাস ও সান্ত্বনার সুরে বলিলেন; আর বেশীদিন ত নয়। সুধীর এবার পরীক্ষা দেবে। তারপর তার একটা ভাল চাকরী—"

গর্জ্জন করিয়া রামতারণ বলিয়া উঠিলেন, "চাকরী!—সুধীরকে আমি চাকরী করতে দেব? কথ্খনো না। চাকর কুকুরেরও অধম!"

স্বামীর শান্ত, সুন্দর প্রকৃতি কতখানি বিক্ষুব্ধ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে—উপরওয়ালার নির্ম্মম প্রত্যাখ্যানে হৃদয় কিরূপ আহত হইয়াছে, বুদ্ধিমতী বিন্দুবাসিনী তাহা বুঝিতে পারিলেন।

কক্ষমধ্যে কিয়ৎকাল পাদচারণার পর রামতারণ পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আজকে আমার ব্যাভারে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছ। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, আমি কি যন্ত্রণা পাচ্ছি। ত্রিশ বছর এই কোম্পানীতে কাজ করছি। মুখফুটে কোন দিন মাইনে বাড়াবার কথা বলিনি, অথচ আমারই হাত দিয়ে বছর বছর লাখ লাখ টাকার কারবার হয়ে গেছে। জিনিষ পত্রের দর দামের হের ফেরের ফাঁকে ফেলে কোম্পানীর ঘাড় ভেঙ্গে অনেক টাকা রোজগার করতে পার্ত্তুম। তা করিনি। আমার হাতে বিশ্বাস করে সঁপে দিয়েছে। আমি ছাড়া ভিতরের কৌশল আজ পর্য্যন্ত আর কেউ জানেনা। বড়বাবুর চারশ টাকা মাইনে বেড়েছে। আমার মোটে পঞ্চাশ। চাইতে পারিনি বলে আমার ভাগ্যে ঐ পর্য্যন্ত!"

রামতারণের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িতে লাগিল। তাঁহার দীপ্ত চক্ষু হইতে অনল শিখা বাহির হইতেছিল।

বিন্দুবাসিনী তাঁহার হাত ধরিয়া তক্তপোষের উপর বসাইয়া বলিলেন, "তুমি শান্ত হও। ও সব কথা আর ভেবনা।"

প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "এতদিন তোমাদের কারো কাছে কিছু বলিনি। আজ বল্তে দাও। ভেবেছিলুম, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে দাসত্ব করছি, এর চেয়ে মহাপাতক নেই। আবার প্রার্থনা করে পূর্ব্ব পুরুষদের নরকস্থ করব? তাই কখনো কারও কাছে হাত পাতিনি। কিন্তু জীবনে এই প্রথম একদিন হাত পাতলাম—ছুটী চাইলাম। মঞ্জুর হলো না। দাসত্বের মত মহাপাতক আছে, গিন্নি? তাই সুধীরকে জীবনে আমি কোন রকম চাকরী করতে দেবনা।

বিন্দুবাসিনী চাহিয়া দেখিলেন, দ্বার প্রান্তে তাঁহাদের আঁধার ঘরের মাণিক, প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র অবলম্বন সুধীর চন্দ্রের দীর্ঘ, উন্নত সুন্দর দেহ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া। সম্ভবতঃ পিতার শেষ কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

২

মাতার চরণ ধূলি গ্রহণ করিয়া সুধীর আনন্দ বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "মা, ফল বেরিয়েছে, আমি পাশ হয়েছি। বাবা এখনো আসেন নি?"

বিন্দুবাসিনী পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। আজ তাঁহার আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা একে একে তাঁহার অন্ধকার ঘরকে উজ্জ্বল করিয়াছিল বটে, কিন্তু দুই তিন বৎসরের অধিক কাল কাহাকেও তিনি ধরিয়া রাখিতে পারেন। সর্ব্বশেষে আসিল এই সুধীর। গৃহবিগ্রহ রাধামাধবের আশীর্ব্বাদে বড় হইয়া আজ সে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়াছে! দীর্ঘ, সুগঠিত, সুন্দর দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তির কি চমৎকার পরিচয়! মাতৃ-হৃদয় পুত্রগর্ব্বে আনন্দে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল।

পুত্রের হাত ধরিয়া মা বলিলেন, "এদিকে আয় বাবা! উনি এখনো আপিস থেকে ফেরেননি। রাধামাধবকে প্রণাম করবি আয়।"

রামতারণ স্বহস্তে প্রত্যহ গৃহে দেবতার পূজা করিতেন, বিন্দুবাসিনী উপকরণাদি গুছাইয়া দিয়া স্বামীর দেবপূজার সকল রকমে সাহায্য করিতেন। রামতারণের পিতামহ এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন।

ধূপধুনার গন্ধে মন্দির কক্ষ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। রামতারণ আসিয়া সন্ধ্যারতি করিবেন। সুধীরচন্দ্র ভক্তি উদ্বেল চিত্তে দেবতার সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। দেবতা! তুমি সহায় হও। সে যেন পিতার দুঃখ দূর করিতে পারে।

মাতা ও পুত্র বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন।

বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "সেই সকাল বেলা থেকে বেরিয়েছিস্। সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরেনে। আজ গজা ভেজেছি, খাবি চল।"

সুধীর গজা বড় ভাল বাসিত।

হাত পা মুখ ধুইয়া সন্ধ্যাহ্নিক শেষে সুধীর মার কাছে আসিয়া বসিল। বিন্দুবাসিনী ঘরে ভাজা গজা ও চন্দ্রপুলি থালা ভরিয়া পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন।

"বড় চমৎকার হয়েছে, মা! তোমার হাত এত মিষ্টি! যা রাঁধ তাই যেন অমৃত!" পুত্রের প্রতিভা প্রদীপ্ত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া মাতার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন সন্তান! ভগবান ইহাকে দীর্ঘজীবী কর, সুখী কর। এবার একটি টুকটুকে দেখিয়া বৌ ঘরে আনিতে হইবে।

বিন্দুবাসিনী হাসিমুখে বলিলেন, "আমি আর কতদিন। এখন একটি বৌ এলে তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।"

সুধীরের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এত তাড়াতাড়ি নয়, মা। আগে টাকা রোজগার করে বাবার দুঃখ দূর করি, তারপর। আমি বাবাকে আর কখ্খনো চাকরি করতে দেব না।"

হাসিতে হাসিতে বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "আগে একটা ভাল দেখে চাকরী যোগাড় করে নিতে হবে ত!"

সুধীর সহসা মাথা তুলিয়া বলিল, "চাকরী? না, মা, চাকরী আমি করবো না।"

কয়েক মাস পূর্ব্বে স্বামীর উচ্চারিত কথটা বিন্দুবাসিনীর মনে অকস্মাৎ উদিত হইল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তবে টাকা রোজগার করবি কি করে?"

পুত্র হাসিয়া বলিল, "কেন মা? চাকরী যারা করে না, তারা কি টাকা রোজগার করে না, না সংসার প্রতিপালন কর্ত্তে পারে না?"

"তবে তুই কি করবি?"

রহস্যস্মিতমুখে সুধীর বলিল, "সে দেখতে পাবে, আমি কি করি। তুমি কি ভেবেছ, আমি এতদিন শুধু পড়া নিয়েই ছিলুম মা? পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য জিনিষও আমার মাথায় আস্ত। আজ চার বছর ধরে তাই শিখে আস্ছি।"

এমন সময় বাহিরে পদশব্দ হইল।

সুধীর বলিয়া উঠিল, "ঐ বাবা আসছেন। যাই তাঁকে খবরটা শুনিয়ে আসি।"

একলম্ফে সুধীর আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

৬

বিন্দুবাসিনী শঙ্কিত কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু কাজটা কি ঠিক হলো?"

স্বামীর কোনও কথা বা কাজে বিন্দুবাসিনী এতকালের মধ্যে একদিনও প্রতিবাদ করেন নাই। আজ সহসা তাঁহার কণ্ঠ হইতে প্রতিবাদের ধ্বনি শুনিয়া রামতারণ স্থির দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিলেন। তারপর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এ ছাড়া টাকা কোথা হতে আসবে? বাড়ী কার জন্য বল—ওইত আমাদের সর্ব্বস্ব।"

"তা সত্যি। কিন্তু এতটাকা সুদ সমেত সুধীর কি শোধ করে উঠ্তে পারবে? কারবারে লাভ হয় লোকসানও হয়। যদি লোকসানই হয়, তখন?"

রামতারণ হাসিমুখে বলিলেন, "গাছ ওপাঁত কেউ কেড়ে নেয়নি, গিন্নি ওর সাধ ব্যবসা করবে। ছেলেবেলা থেকেই আমি ওর কানে ব্যবসার মন্ত্র ঢেলে দিয়েছি। চাকরী করতে ওকে দেব না। বাঙ্গালী জাতটা চাকরী করে করেই উচ্ছন্ন

গেল। দেখুকনা কেন, যদি চেষ্টা করে অবস্থা ফেরাতে পারে। বাপ হয়ে আমি ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিনে।"

বিন্দুবাসিনী ভাবিতে লাগলেন। তারপর মৃদুস্বরে বলিলেন, "কত টাকায় বন্ধক দিলে?"

প্রশান্ত ভাবে রামতারণ বলিলেন, "আট হাজার। তার মাসে মাসে আশী টাকা সুদ। তিন মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি। তা খোকা বলেছে, সুদ সে জমতে দেবে না।"

অপরিণত বুদ্ধি যুবক ব্যবসায়ের টাল যদি সামলাইতে না পারে? মাতার মনে সে দুর্ভাবনা জাগিয়া উঠিল। সম্ভবতঃ রামতারণ পত্নীর মনের উদ্বেগ অনুমান করিয়া লইলেন। তিনি পত্নীর একখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, "দুঃখ কিসের গিন্নি? বাড়ী আমাদের সঙ্গে যাবে না। ভগবান যদি মুখতুলে চান, খোকা জীবনে আমার মত লাঞ্ছনা ভোগ করবে না। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, ও যেন কারবারে জয়লাভ করতে পারে।"

কোন্ জননী পুত্রের জয় কামনা করেন না? বিন্দুবাসিনী হৃদয়ের সমস্ত বাসনা উজাড় করিয়া রাধামাধবের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়া পুত্রের আশীষ দিনরাত্রি প্রার্থনা করিতেছেন। সুধীর টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলে, স্বামী কর্ম্মভোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। এইবার সে নিদারুণ পরিশ্রমের বিনিময়ে যে সামান্য অর্থ ঘরে আসে; তাহাতে দুই মুখ এক করিতে কি বেগ পাইতে হয়, বিন্দুবাসিনী কি তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন না। তবু। তবু।

যদি কারবার ভাল না চলে, যদি মাসে মাসে সুদ দিবার সামর্থ্য না ঘটে, তাহা হইলে ঋণ বাড়িয়া যাইবে। তারপর বাড়ীখানি দেনার দায়ে বিকাইয়া গেলে তাঁহাদের একমাত্র বংশধর দাঁড়াইবে কোথায়? নারীর মন, মাতার হৃদয় সেই দুশ্চিন্তাতেই ত অধীর হইয়া উঠিতেছে।

এমন সময় "মা!" বলিয়া সুধীর উপস্থিত হইল। তাহার স্বাস্থ্য সবল আননে আনন্দ দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

পিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিয়া উঠিল, "টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এলুম, বাবা।" মাতার দিকে ফিরিয়া সহাস্য মুখে বলিল, "বাড়ীর জন্ত তোমার মন খারাপ হয়েছে, মা? কিছু ভেবোনা। পাঁচ বছরের মধ্যে আমি সব টাকা শোধ করে দেব। শুধু তোমরা আমায় প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করো।"

রামতারণ বলিলেন, "আপিস কোথায় খুলবে, ঠিক করেছ?

বড় বাজারে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি। আপিস দেখে আসবেন বাবা। আমি হিসেব করেই চলব। চার বছর ধরে ব্যবসার অনেক কল কৌশল দেখে আসছি। রোজ বিকেল বেলা চার ঘণ্টা করে আমি একটা বড় কারবারের কাজ কর্ম্ম হাতে কলমে করেছি, মা। তুমি ভয় পেয়ো না। তোমার ছেলে বেঁচে থাকতে বাড়ী নষ্ট হবে না। তবে যদি হঠাৎ মরে"—

বিন্দুবাসিনী তাড়াতাড়ি সন্তানের মুখে হাত চাপা দিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে বলিলেন, "ওকি অলক্ষুণে কথা, সুধীর?

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি মরছিনে, মা। কথার কথা বলছিলাম।"

"আবার ঐ কথা! ফের যদি অমন কথা বলবি, আমি মাথা মুণ্ড খুঁড়ে মরব।"

বারাণ্ডা হইতে রামতারণ ডাকিলেন, "এদিকে এস ত।"

বিন্দুবাসিনী স্বামীর কাছে যাইতেই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আজ আর হবে না। কাল রাধামাধবের ভোগ ভাল করে দিতে হবে। সুধীরের ব্যবসা উপলক্ষে, তার ষোড়শোপচারে পূজো না দিলে, আমাদের অপরাধ হবে না, গিন্নি?

নিশ্চয়ই! দেবতার পদতল ব্যতীত মানুষের আশ্রয় কোথায়? তাঁহার চরণতলে অঞ্জলি নিবেদন করিয়া তাঁহারই নির্ম্মাল্য সুধীরের গলদেশে বিলম্বিত করিয়া দিতে হইবে। সায়াহ্নে সুধীরই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। ঠাকুর! সুধীরকে সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে দীর্ঘজীবী কর। বিন্দুবাসিনী ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গালিনী নহেন। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া পুত্রের হস্তের গঙ্গোদক পান করিয়া তিনি যেন অন্তিমে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারেন। ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কামনা তাঁহার নাই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। আষাঢ়ের

আকাশে মেঘের সঞ্চার হইতেছিল। বিন্দুবাসিনী সে দিকে চাহিয়া মৃদুপদে রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

রামতারণ কলিকাটি হুঁকার উপর বসাইয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন।

সুধীর ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া তাঁহাকে নীচ দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে কি? রাধামাধব! কবে তুমি মুখ তুলিয়া চাহিবে? ব্রাহ্মণ সন্তানকে কবে তুমি বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে?

ধূমপানের অবকাশে একটা দীর্ঘশ্বাস রামতারণের বক্ষপঞ্জর মথিত করিয়া নানা পথে নির্গত হইল।

৪

মানুষের কল্পনা অনুসারে যদি জগৎ চলিত!

মানুষ কল্পনার সাহায্যে যাহা গড়িতে যায়, অদৃশ্য হস্তের আঘাতে তাহা চূর্ণ হইয়া পড়ে। সৃষ্টি লীলার এই বিচিত্রতার মর্ম্ম মনুষ্য শক্তি আজিও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। শক্তির অহঙ্কারে, জ্ঞানের গরিমায়, বুদ্ধিবৃত্তির দম্ভে মানুষ এমনই করিয়া আপনার মহিমা ঘোষণা করিতে চাহে, আধিপত্য বিস্তার করিবার দুঃস্বপ্ন দেখে; কিন্তু তাহার সকল শক্তির অহঙ্কার নিমেষ মধ্যে চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে তাহা কখনও ভাবে না।

আবার যে অহঙ্কারী নহে, শক্তির গর্ব্ব বা বুদ্ধিমত্তার দম্ভও প্রকাশ করে না, ঘটনাচক্রে তাহারও কল্পনার সৌধ অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে চূর্ণ হইয়া যায়। কেন যায়, তাহা চিরদিনই রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে—থাকিবে।

প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রাণপাত চেষ্টা সত্ত্বেও সুধীরচন্দ্র চঞ্চলা, ব্যবসায় লক্ষ্মীকে বাঁধিতে পারে নাই। চঞ্চলা ইন্দিরা প্রতি মুহূর্ত্তেই আশীর্ব্বাদের ঝাঁপি লইয়া তাহার সম্মুখ দিয়া দ্রুতপদে চলাফেরা করিতে থাকিলেও, ঝাঁপির মুখ তাহার শিরে আশীষ ধারা বর্ষণের জন্য উন্মুক্ত হয় নাই।

উপর্য্যুপরি কয়বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা দেশের নানাস্থানে প্রবল বন্যার উৎপাতে ব্যবসায়ি মহলে ক্ষতি দেখা দিয়াছিল। পৃথিবীব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতা বাঙ্গালী দেশের দরিদ্র জন সাধারণকে অত্যন্ত বিমূঢ় ও নিরুপায় করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য স্তব্ধ প্রায়, ব্যবসায়িমহল স্তম্ভিত, নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। অনেককেই ইতিমধ্যে কারবার গুটাইয়া লইতে হইয়াছিল। কিন্তু অসমসাহসী সুধীরচন্দ্র পাঁচ বৎসরের ভীষণ ঝটিকার আঘাত সহ্য করিয়াও তখনও সংগ্রামে নিরুৎসাহ হয় নাই। সে তাহার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তখনও যুঝিতেছিল। সে বিশ্বাস করিত—"যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে।" তাই সে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াও তাহার ব্যবসায়কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল।

রামতারণ ও বিন্দুবাসিনী সবই জানিতেন। বিন্দুবাসিনী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই দুর্দ্দিনের নির্ম্মম পদক্ষেপের শব্দ শুনিতে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি নারী মুখে একটিবারও আশঙ্কার বাণী আর উচ্চারণ করেন নাই।

রামতারণের সদাপ্রসন্ন চিত্ত দুর্দ্দিনের প্রতীক্ষায় আরও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচ বৎসরে তাঁহার দেহ শীর্ণতর হইলেও, ব্রাহ্মণ হৃদয়ে নৈরাশ্যের তীব্রতম আঘাত সহ্য করিবার জন্য যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শরতের সুন্দর অপরাহ্নে শারদলক্ষ্মীর শুভাগমনের পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছিল। রামতারণ সন্ধ্যার বহুপূর্ব্বেই গৃহে ফিরিলেন। এত সকালে, ৩৫ বৎসরের কার্য্যকালের মধ্যে, বিন্দুবাসিনী কখনও তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে দেখেন নাই।

তাড়াতাড়ি স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই ব্রাহ্মণ অট্টহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "গিন্নি, রাধামাধবকে ভাল করে পূজো দেবার যোগাড় কর। আজ আমার মুক্তি—মুক্তি!"

বিন্দুবাসিনী স্বামীর বিকৃত কণ্ঠস্বরে, বিচিত্র ব্যবহারে চমকিয়া উঠিলেন।

"অমন করে চেয়ে দেখছ কি? নতুন সাহেব আজ আমাকে জবাব দিয়েছে। কাল থেকে আপিস যেতে হবে না। গাড়ী টেনে টেনে ঘোড়া বুড়ো হয়ে গেছে, তাকে

বিশ্রাম দেওয়া ত উচিত। দয়াময় সাহেব, তাই আমায় রেহাই দিয়েছেন।"

বিন্দুবাসিনী ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। পঞ্চাশটি টাকা মাসে আসিত, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাহাও বন্ধ হইল! রাধা মাধব! রাধা মাধব!

তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া দরদর ধারে অশ্রু নামিয়া আসিল।

রামতারণ বলিয়া উঠিলেন, "কাঁদছ! এতেই এত অধীর! বুড়ো বয়সে আমি রেহাই পেলাম, কোথায় তাতে আনন্দ করবে—"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গায়ের চাদরখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন। তারপর কাতরকণ্ঠে বলিলেন, কেঁদনা তুমি! তোমার চোখের জল আমি সহ্য করতে পারিনে।

বিন্দুবাসিনী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অনেকক্ষণ পরে আপনাকে সংযত করিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "এখন সংসার চলবে কি করে? সুধীর ত একটা পয়সাও দিতে পারে না। রাধামাধবের পূজো কি হবে?"

রামতারণ বলিলেন, "মাস দুই চলে যাবে। এ মাসের মাইনের সঙ্গে আর এক মাসের মাইনে, সাহেব দয়া করে দিয়েছেন। আপিসের কাজ কর্ম্ম অচল, কাজেই আগে বুড়োদের সরিয়ে দিতে হল। বুঝেছ গিন্নি? অন্য অপিসে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আছে, আমাদের তাও ছিল না।"

প্রাণপাত সেবার ইহাই পুরস্কার! দাসত্বের ইহাই চরম শিক্ষা!

রাত্রিতে সুধীর বাড়ীতে ফিরিয়া পিতার কর্ম্মচ্যুতির সুসংবাদ জানিতে পারিল। মাতা দেখিলেন, এ সংবাদে বিচলিত হইল না। সে বলিল, "যা হয়, ভালর জন্য। বাবা আপনি ভাববেন না। আমি আছি, ভাগ্যকে ফেরাবই।"

তাহার কর্ম্মক্লান্ত আননে উৎসাহের আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

তাই কর, রাধামাধব!—উদ্দেশ্যে বিন্দুবাসিনী দেবতার চরণতলে কাতর নিবেদন-অঞ্জলি দিলেন।

সুধীর বলিল, "বাবা, আমাকে একবার পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে যেতে হবে। অনেক টাকা পাওনা আছে। কালই যাব।"

৫

কয়দিন ধরিয়া ঝড় ও প্রবল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পূজার পূর্ব্বে বহুদিন এমন দীর্ঘকালব্যাপী ঝড়বৃষ্টি দেখা যায় নাই। সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, সমগ্র বাঙ্গালা দেশেই ঝড়বৃষ্টি এমন ভাবে হইয়াছে যে, বহুস্থান জলমগ্ন, ঝটিকায় বহু অট্টালিকা পর্য্যন্ত ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে।

পূজার তখনও এক সপ্তাহ বাকী। সেদিনও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছিল। মেঘপুঞ্জ যেন সাত সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে তাহা ঢালিয়া দিতেছিল।

রামতারণ বাহিরের ঘরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। দুই সপ্তাহ হইল সুধীরচন্দ্র গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছে। প্রত্যহই তাহার একখানি করিয়া পত্র আসিয়াছে। আজ চার দিন তাহার কোনও সংবাদ নাই। আসাম অঞ্চল হইতে সে যাত্রা করিয়া ঢাকা হইয়া অন্যত্র যাইবে। তারপর আর কোনও সংবাদ নাই। একমাত্র পুত্রের জন্য তাঁহার প্রাণটা যে অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা পত্নীর নিকট হইতে গোপন করিবার জন্যই তিনি বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিয়াছিলেন।

"চাটুয্যে মশাই আছেন?"

রামতারণ চমকিয়া উঠিলেন। এ স্বর সুপরিচিত।

বিনোদচন্দ্র আঢ্য যথারীতি প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রামতারণের বুকের মধ্যে তখন সমুদ্র মন্থন চলিতেছিল।

আঢ্য বলিলেন, "আর ফেলে রাখা যায় না, চাটুয্যে মশাই। সুদে আসলে কত হল তা জানেন?"

মৃদুস্বরে রামতারণ বলিলেন, "তা অনেক হয়েছে বৈ কি।"

সহাস্যে আঢ্য বলিলেন, "কত হয়েছে আপনার অনুমান বলুন ত? আসল আট হাজার, তার সুদ, তস্য সুদ ধরে পনের হাজার ছাড়িয়ে গেল যে। আর রাখতে পারব না জেনে রাখুন।"

রামতারণ বলিলেন, "সুধীর বাইরে গেছে। অনেক টাকা বাকি বকেয়া পড়েছে। সে নিশ্চয় মোটা টাকা নিয়ে আস্‌বে।"

মাথা নাড়িয়া আঢ্য বলিলেন, "সুধীরবাবু ত গোড়া থেকেই আমায় খুব সুদ দিয়ে আস্‌ছেন। তাঁর ওপর ভরসা করে বসে থাকলে আমার টাকা উশুল হবে, এ আশা আমার নেই, চাটুয্যে মশাই। তারপর দেখুন, আপনার এ জমী বাড়ীর দাম কি এখন পনের হাজার হবে? কখনো নয়। আপনি যা হোক্‌ একটা বিহিত করুন! কোর্টে যেতে গেলে আবার আরও ত টাকা চাপ্‌বে। বুঝে দেখুন আপনি।"

রামতারণ ভাল করিয়াই বুঝিয়া দেখিয়াছেন। সুদে আসলে যে অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে, বাড়ী বিক্রয় করিলে তাহা এ সময়ে উঠিবে কি না, তাহাতে ঘোর সন্দেহ আছে। তবে একমাত্র ভরসা, সুধীর পাওনা টাকার একাংশ লইয়াও যদি ফিরে, তাহা হইলে ঋণের অনেকটা শোধ করা যাইতে পারিবে।

ব্রাহ্মণ স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন, "আড্ডি মশাই, আর কটা দিন দেরী করুন। যদি টাকা দিতে না পারি, বাড়ীটা আপনাকে লেখাপড়া করে বিক্রী করে দেব। ভগবান গাছতলা হতে অবশ্য বঞ্চিত করিবেন না।"

বিনোদ আঢ্য গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ব্রাহ্মণের বাড়ী নেবার ইচ্ছে আমার নেই, চাটুজ্জে মশাই। কিন্তু এত গুলো টাকা—"

"না, না, সেকি কথা। আপনার প্রাপ্য আপনি নেবেন, এতে আপনি হকদার, আড্ডি মশাই। তবে আর কটা দিন সবুর করুন।"

"বেশ, আমি পুজো পর্য্যন্ত চুপ করে থাকব। তারপর আদালত খুল্‌লে—"

কথাটা সমাপ্ত না করিয়াই প্রমাণাস্তে চলিয়া গেলেন।

রামতারণ স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। হ্যাঁ, এত দিন পরে তিন পুরুষের ভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সস্ত্রীক গাছতলাই সার করিতে হইবে। তা হউক! তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। পুত্রের কল্যাণ কামনায় বাড়ী বন্ধক দিয়াছেন। অন্যায় রূপে, অসঙ্গত পথে অর্থ অপব্যয়িত হয় নাই। ইহাই কি সান্ত্বনা নহে।

কে?—হরকরা? পত্র আছে, দাও দাও।

ব্যগ্রভাবে রামতারণ অপরিচিত হস্তের লিখিত পোষ্ট-কার্ড গ্রহণ করিলেন।

হরকরা চলিয়া গেল। বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল।

"কার চিঠি?"

শূন্য দৃষ্টিতে রামতারণ পত্নীর দিকে চাহিলেন। স্বামীর নিষ্প্রভ চক্ষু এবং বিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া বিন্দুবাসিনী ছুটিয়া আসিলেন।

স্বামীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পোষ্টকার্ড ভূমিতলে লুটাইতেছিল। তিনি উহা তুলিয়া লইলেন।

না, তাঁহার পুত্রের হস্তাক্ষর নহে ত! কে লিখিয়াছে? কি লিখিয়াছে?—

মা! মা! নাই, সে নাই! পদ্মায় ডুবিয়া মরিয়াছে!—

বৃন্তচ্যুত ফলের মত বিন্দুবাসিনীর সংজ্ঞাহীন দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

রামতারণের বিকট হাস্যে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নৃত্য ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিলেন, "সে আমাদের মুক্তি দিয়ে গেছে। পদ্মার ঝড়ে সে ডুবেছিল। মড়া তারা পেয়েছে। সৎকার করেছে। হরেন দাস চিঠি লিখেছে। চেনা লোক—ভুল হবার যো কি! রাধামাধবের পূজোর যোগাড় কর গিন্নি যোগাড় কর। এবার ষোড়শোপচারে।"

পুত্রহারা মাতার আর্ত্ত চীৎকার বর্ষণ বিষণ্ণ শরতের আকাশকে বিদীর্ণ করিয়া দিল।

রামতারণ তখন বৃষ্টিধারা মাথায় করিয়া বাহিরের উঠানে নামিয়া বিকটস্বরে ডাকিতেছিলেন "বিনোদ আড্ডি—আড্ডি মশাই! নিয়ে যাও তোমার টাকা"।

কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

বিতর্কিকা

১। বাঙ্গালী মেয়েদের শালীনতাবোধ

শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক

যতই দিন যাচ্ছে 'বিচিত্রা'র এই 'বিতর্কিকা' বিভাগটী অধিকতর জনপ্রিয় হচ্ছে। 'বিচিত্রা'র দিগন্ত রেখায় একটী নতুন প্রভাত একটু নতুন খ্যাতি নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। আলোচনা ও তর্কের ভিতর দিয়ে দেশের প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিচিত্রা সম্পাদক এই যে আভিজাত রাজপথ খুলে দিয়েছেন এজন্য তিনি আন্তরিকতম ধন্যবাদের পাত্র।

আজ আমার আলোচনার বিষয় হবে 'বাঙ্গালী মেয়েদের শালীনতা বোধ।' তর্কের খুব কিছু নেই কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের দণ্ডনীয় উদাসীনতা সম্বন্ধে সকলে সচেতন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবেন, এই আশা নিয়েই কলম ধরেছি। আভিজাত বংশীয় নয়, বাংলার যে বৃহৎ নারীসমাজ তার গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ছড়িয়ে আছে তারাই প্রধানতঃ আমার আলোচনার বিষয়ীভূত হবে।

লজ্জায় বাঙ্গালী মেয়েরা যে একেবারে লজ্জাবতীলতা এই মধুর ধারণাটী আজও সকলের মনে অটুট আছে, এই উগ্র নারী প্রগতির আবহাওয়াতেও। কিন্তু এই লজ্জার মর্ম্ম বুঝে ওঠা আমার পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য ঠেকছে। লজ্জা যদি দেহের লজ্জা হয় তবে ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙ্গালী মেয়েরাই এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশী উদাসীন। আর সকল প্রদেশেই দেখা যায় সুউচ্চ প্রাসাদবাসিনী থেকে রাস্তার ভিখারিণীটারও পর্য্যন্ত গায়ে একটা জামা আছে। কিন্তু এবিষয়ে সেদিনও আমাদের বাংলাদেশ সাম্যবাদের একেবারে লীলাভূমি হয়ে বিরাজ করছিল। অবশ্য বলা যেতে পারে যে জামা ছাড়া শুধু শাড়ীতেও সমস্ত দেহের লজ্জা রক্ষা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথও একদিন বলেছিলেন যে, আমাদের মেয়েরা গায়ে যথেষ্ট কাপড় রাখে না বটে, কিন্তু পর্য্যাপ্ত পোষাকে নির্লজ্জতার ইঙ্গিত করে না। কিন্তু শুধু শাড়ীতে বাঙ্গালী মেয়েরা যে চমৎকার লজ্জা রক্ষা করে চলেন, তার নমুনা পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই আমরা দেখতে পাই। একটা জামার সাহায্য ছাড়া এ উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারেনা, কোন মতেই।

পাশ্চাত্য নারীদের চালচলন এবং পোষাকের নির্লজ্জতার সম্বন্ধে উত্তাল মুখর হয়ে স্ফূর্ত্তিতে আমরা বেশী করে চা খাই আর মজাসে কাগজে কাগজে প্রবন্ধে লিখি। কিন্তু ঘরের দিকে চোখ ফিরালে চায়ের বাটী আমাদের উল্টে যাওয়া উচিত, উচিত কলমদানীতে কলম তুলে রাখা।

সাঁতারের পোষাক পরে পুরুষদের সহযোগে ওদেশের মেয়েরা সমুদ্র স্নান আরম্ভ করলে। আর অমনি আমাদের দেশের কতগুলি জিহ্বা কী সলীল হয়ে উঠল! কৌতুক, আক্রমণ ও আর নিন্দার সে এক বীভৎস উল্লম্ফন!

তবু ত শিথিল, প্রতিমুহূর্ত্তে খসে খসে যাওয়া শাড়ীর বদলে ওদের মেয়েদের গায়ে একটা আঁটসাট পোষাক থাকে, পোষাক বদলাবার জন্য থাকে একটা তাঁবু।

আমাদের দেশে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, তীর্থে, স্নানযাত্রা উপলক্ষে এই লজ্জাহীনতায় কতটুকু ফাঁক থাকে? ফাঁকত নেইই, লজ্জাহীনতাটা আরও নিরেট হয়ে ওঠে উন্মুক্ত দিবালোকে, সহস্র পুরুষের চোখের সামনে, তার গা ঘেঁষে গা মাথা মুছে বস্ত্র পরিবর্ত্তনে। উদ্দেশ্য পুণ্যলাভ, জলটা গঙ্গা এবং তার পাড়ে কতগুলি মন্দির থাকলেই নির্লজ্জতাটা চোখে কম ঠেকে নাকি? সমাবেশ মাহাত্ম্যে

পুরুষের মন একমুহূর্তে সন্ন্যাসীমনের মত ইন্দ্রিয়-সিদ্ধ হয়ে ওঠে নাকি? তাহলে ভারতবর্ষের মত তীর্থস্থানগুলিই পাপ ও ব্যভিচারের আস্তাকুড়, আর ধাপার মাঠ হয়ে উঠত না!

অনেকে বলেন পাশ্চাত্য মেয়েদের চাল-চলন পোষাক-পরিচ্ছদের নির্লজ্জতাটা সজ্ঞান এবং তাতে একটা প্রচারের ভাব থাকে। আমাদের দেশের মেয়েদের এ দোষটা নাকি একেবারে সর্ব্বপ্রকারে শিশুর মত। কিন্তু একটা উলঙ্গ পাগল, একটা উলঙ্গ ভাল মানুষ—দৃশ্যটা উভয়ক্ষেত্রেই সমান লজ্জাকর ও পীড়াদায়ক। কাশীতে মেয়েদের একটা আলাদা পাকা ঘাট আছে, কোলকাতার গঙ্গার অনেক ঘাটে কাপড় ছাড়বার ঘর আছে কিন্তু অনেক মেয়েরই সেই সুযোগ গ্রহণ করবার শালীনতা বোধটুকু নেই।

পর্য্যাপ্ত কাপড় চোপড় পরে বিকেলে বেড়াতে বের হয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপ করবার জন্য মেয়েদের বেড়া-ঘেরা আলাদা পার্কের দরকার, কর্পোরেশনে এঁরা দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু পুরুষদের চোখের উপর গা মাথা মুছে কাপড় ছাড়তে এঁদের অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ নেই। বেড়া-দেওয়া আলাদা স্নানের ঘাটের দাবী এঁদের কাছ থেকে ত আসছে না!

বাইরে বেরতে ব্যবহার করলেও বাড়ীতে অনেক মেয়েই সেমিজ বা জামা ব্যবহার করেন না। একান্ত ঘরের জনের মধ্যেই চলাফেরা বলে অনেকেরই নাকি এতে আপত্তি নেই। কিন্তু দেহের লজ্জাটা আপেক্ষিক বলে আমার মনে হয়না। তারপর অন্তঃপুরও যে সব সময়েই একেবারে অপরিচিত লোকের চোখের আড়ালে থাকে এমনও নয়। ক্ষিপ্র কাজকর্ম্মে উঠা নামায় শিথিল শাড়ীর সহায়তায় গায়ে একটা জামা থাকা শালীনতার দিক থেকে প্রয়োজনই।

রামানন্দবাবু প্রবাসীর সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে একবার লিখেছিলেন যে পল্লীগ্রামের মেয়েদের দেহের বিশেষত্বের লজ্জা রক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা নারী হরণের অন্যতম প্রধান কারণ।

খাঁটি সত্য বলে একে স্বীকার না করে উপায় নেই।

ঘরে যেমনই হউক বাইরে বাঙ্গালী মেয়েরা চালচলন এবং পোষাক পরিচ্ছদে একান্ত লজ্জাশীল এবং ভব্য, এমন মনে হতে পারে। কিন্তু একেবারে উল্টা!

ঘরে নিয়ত গুরুজনের চাপে লজ্জাশীল এই মেয়েরা বাড়ীর বাইরে পা দিলেই একেবারে চরম নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। ক্ষতিটা ষোল আনা পুষিয়ে নেয়। হেমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালীর মেয়ে' নামে কবিতায় লিখেছিলেন।

হাটবাজারে লজ্জাহীন ঘরে কুঁড়ি ফুল।

মনে হয় লজ্জা পালনের গুরু ও বিশ্রী দায়িত্বটা শুধু শ্বশুর শাশুড়ী, ননদ ভাসুর এবং আত্মীয় স্বজনের জন্যই সংরক্ষিত।

ট্রেনে ষ্টীমারে এঁদের দেখতে পাবেন প্রায় সমস্ত বক্ষ উন্মুক্ত করে ছেলেদের এঁরা স্তন্যপান করাচ্ছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের পাশ ঘেঁষে বিস্রস্ত কাপড় চোপড়ে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী করে (অজ্ঞানতঃই) গভীর নিদ্রা যাচ্ছে। পিষিয়ে মথিত করে দেওয়া ভিড়েও দেবতার দর্শনের জন্য মন্দিরে ঢুকছে।

যশোরের এক নদীতে একটী স্ত্রীলোককে কুমীরে ধরেছিল। কুমীরের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির পর অনেক কষ্টে যখন সে পাড়ে উঠল তখন সে ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন। এমন সময় দূরের নদীর পাড় থেকে কতগুলি লোক স্ত্রীলোকটির সামনে এসে পড়ল। বুদ্ধি করে একটা কাপড় ছুঁড়ে দেওয়া বা দূরে সরে যাওয়ার কোনটাই তারা করল না। তখন স্ত্রীলোকটী ফের নদীর জলে লাফিয়ে পড়ল এবং মুহূর্ত্তেই কুমীরটা তাকে নিয়ে অদৃশ্য হলো। লজ্জার খাতিরে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে সে ইতস্ততঃ করলে না।

দৃষ্টান্তগুলি একান্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বলে মনে হবে।

কিন্তু হিন্দু সমাজের অনেক প্রথাই আশ্চর্য্যরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ।

নারীর সতীত্বকে জগতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে যে দেশ, সে দেশের মেয়েরাই একরাত্রে অতিথি-দেবতার শয্যায় হেলায় তা বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে। সীতা সাবিত্রী যে দেশের মেয়েদের আদর্শ তারাই নাকি ভোরে উঠে অহল্যা কুন্তীকে স্মরণ করবে, এমনি বিধান!

ভাসুর এবং একটু দূর সম্পর্কের গুরুজনদের সঙ্গে আমাদের মেয়েরা প্রায়শঃ কথা বলে না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর

পুরুষ ও ফেরীওয়ালাদের সঙ্গে কী তাদের সহজ ও স্বচ্ছন্দ আলাপ।

শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে আশঙ্কার কারণটা আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকেই বেশী কিনা!

আর অদ্ভুত তাদের লজ্জা!

পরিধানে একখানা ছোট শাড়ী থাকলে হঠাৎ অপরিচিতের সামনে পড়ে বুকের চেয়ে মুখ ঢাকবার দিকেই তাদের মনোযোগ বেশী।

বাংলা দেশটা গরম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই জন্যই নাকি কষ্ট করে গায়ে একটা জামা রাখবার এমন কী দরকার! কিন্তু গরমের দিনে পরিধানে একটা কাপড় রাখতেও কম কষ্ট নয়! সুতরাং আরাম এবং দেহে বাতাস লাগাবার জন্য জামা বর্জ্জনের কথাটা তা হলে এসে পড়ে।

বাংলা দেশটাই পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণতম দেশ নয়। ভারতবর্ষেরই লু-উড়া রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশের কাছে বাংলা দেশের গরম ত নিরীহ!

বাঙ্গালী মেয়েরা সাধারণতঃ যে ঢিলেঢালা ধরণে শাড়ী পরে তাতে একমাত্র সোজা দাঁড়িয়ে থাকলেই লজ্জা রক্ষা হয়।

যক্ষে আর সে আকর্ষণময় সৌন্দর্য্য নেই বলে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা গায়ে কাপড় রাখবার দিকে প্রায় ছোট মেয়েদের মতই উদাসীন। এটার পিছনে খুব শালীন ভাব নিহিত নেই!

একটা অস্বাভাবিক, একটা বিশ্রী, বিজাতীয় আনন্দ লাভ করবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী মেয়েদের শালীনতা বোধকে আমি আক্রমণ করছি না। এ বিষয়ে এঁদের উদাসীনতা চোখকে পীড়িত কোরে হৃদয়কে আহত করে। মনে হয় সভ্য জাতির নারীদিগের পক্ষে এই শৈথিল্য ফৌজদারী অপরাধের প্রায় সমতুল্য অপরাধ! পথেঘাটে এ রকম বিস্রস্ত স্খলিত দৃশ্য দেখে বিদেশীরা আমাদের মেয়েদের সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করে? প্রশংসমান উচ্চ ধারণা নিশ্চয়ই নয়। আমাদেরকে অসভ্য বলে তাদের মনে যে একটী সহজাত ধারণা আছে এ সমস্ত থেকে সেটা দৃঢ়তরই হয়ে থাকে।

মাসিক পত্রে আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়ার অনেক অসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য জাতির সচিত্র বিবরণ পড়েছি। তাতে নগ্নবক্ষা স্ত্রীলোকদের ছবির বিস্তর দর্শন মিলেছে। এমন ছবি আমাদের দেশের পথেঘাটেও প্রচুর সংগ্রহ করা যায় এবং তাই নিয়ে বিদেশে কোন বিদেশী যদি বাংলা দেশ সম্বন্ধে এক ভ্রমণকাহিনী লেখে, পড়ে আফ্রিকা-অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের পাশে অনায়াসে তারা আমাদের দাঁড় করিয়ে দেবে!

তখন বেদ বেদান্তের দোহাই দিলে চলে কি? তার খবর ওদের দেশের ক'জন লোকে রাখে?

শুধু বিদেশী নয়, ভিন্ন প্রদেশবাসীরাও আমাদের মেয়েদের শালীনতা বোধকে নীচু চোখে দেখে। হাওড়ার দিকে গঙ্গার উপর স্নানের একটা ঘাট ছিল। স্নান সেরে ভিজে কাপড় কলসী কাঁখে যখন তারা গ্রামে ফিরত তখন পথের পাশে আশে-পাশের মিলের কুলীরা দাঁড়িয়ে থেকে বাঙ্গালী মেয়েদের নির্লজ্জতা নিয়ে বিশ্রী হাসি ঠাট্টা করত! ব্যাপারটা কাগজ পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল।

গ্রামে পুকুর ছিল নিশ্চয়ই! কিন্তু গঙ্গায় নিত্য স্নান করে পুণ্য অর্জ্জনের এমনি দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা যে তার কাছে অশ্লীল হাসি ঠাট্টা শোনা তাঁরা গায়েই মাখেন নি।

অশিক্ষিতা নারীসাধারণের এই ধরণের লজ্জাহীনতা যদিও অগ্রাহ্য করা যায় কিন্তু শিক্ষিতা মেয়েদের সজ্ঞান এবং সযত্ন নির্লজ্জতা কিছুতেই মাপ করা যায় না।

না বলে পারছি না, তাঁদের বুকের কাপড় দু'দিক থেকে সরে ক্রমশঃ মধ্যস্থলে এসে সঙ্কুচিত হচ্ছে। ব্লাউজের 'V' টা আয়তনে বাড়ছে এবং তার কোণ দ্রুতগতিতে নীচের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। খেলাধূলায় আজকাল মেয়েদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে খুব। অবশ্যি দৈনিক গৃহকর্ম্মের 'ড্রাজারী' থেকে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজেদের মুক্ত রাখলে শরীরটাকে 'বলিষ্ঠ' রাখবার জন্য এক আধটু খেলাধূলার প্রয়োজন আছে বৈকি! কিন্তু এর প্রকাশ্য পরিচয়টা কিশোরীদের পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকলেই বোধ হয় ভাল হয়। হাফ প্যাণ্ট পরে তরুণীরা বেড়াবাজী দৌড়াচ্ছে, দিচ্ছে লম্বা লাফ, উঁচু লাফ, বাথিং কষ্টিউম পরে প্রকাশ্যে সাঁতরাচ্ছে, আমাদের চোখে কতটা সহনীয় হবে বলা যায় না।

লেখাপড়া শিখে আজকালকার মেয়েদের চালচলন আচার ব্যবহার যে আশ্চর্য্য উন্নত, মার্জ্জিত ও সুন্দর হয়েছে এ কথা কে না স্বীকার করবে? এতদিন পরে মেয়েরা যেন তাদের নিজেদের সত্তা খুঁজে পেয়েছে। সুষ্ঠু শাড়ী পরা সপ্রতিভ সচেতন মুখ, নির্ভর সহজ গতি, মেয়েদের পথে দেখলে শ্রদ্ধা না হয়ে পারেনা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারে তারা এমন অভদ্রতার পরিচয় দেয় যে ক্ষণেকের তরেও সমস্ত ভুলে একটী নম্র নতমুখী গ্রাম্য তরুণীর দিকেই মন ফিরে যায়।

মনে হয় নতুন অনভ্যস্ত স্বাধীনতায় এদের অনেকেরই মাথার নেই ঠিক।

একটা পরিপূর্ণ 'বাসে' কোন যুবক নবাগতা একটী তরুণীকে নিজের আসনে এসে বসতে আহ্বান করলে তরুণী উত্তর দিলে, আপনিই বসুন না, আমাদের এত অসহায় ভাবেন কেন?

সহজ ভদ্রতায় কী চমৎকার অভদ্র উত্তর!

কিন্তু আমরা জানি মেয়েদের হষ্টেলের জন্য মাসীমারা ছেলেদের মেস বা হষ্টেলের কাছাকাছি বাড়ীগুলিই পছন্দ করেন, রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ অধ্যুষিত এই কলকাতাতেও।

শিক্ষিত মেয়েদের এমনি অভদ্র রুক্ষ ব্যবহারের বহু পরিচয় আমি জানি। এ কি দারচিনির ঝাল?

কিন্তু আশঙ্কা হয় মিষ্টির চেয়ে দিন দিন ঝালটাই না বেশী হয়ে ওঠে!

২। মেয়েদের শিক্ষা

শ্রীমতী সরলা দেবী

আমাদের দেশে যে নারী জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে এবং নারীদের পর্দ্দাপ্রথা উঠিয়া যাইতেছে ইহা খুবই মঙ্গলের বিষয়, কিন্তু এই জাগরণ যে এক এক বিষয়ে সীমা ছাড়াইয়া অনিদ্রা রোগে দাঁড়াইতেছে, আমি সেই বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে চাই।

জাগরণের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে বিদ্যাশিক্ষা ও পুরুষের সমকক্ষ হইয়া চলা,—তাহার পর আর সব।

কিন্তু এই উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া মেয়েদের মানুষ করিতে গিয়া মেয়েদের জননীরা বা অভিভাবক অভিভাবিকারা অনেক বিষয়ে গলদ পাকাইয়া বসেন।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রঘরের মেয়েদের ১২।১৩ বছর বয়স হইতে না হইতেই বিবাহ হইয়া যাইত। কাজেই অবিবাহিত মেয়েদের কোন রূপ পর্দ্দাপ্রথা ছিল না। কিন্তু এখন যখন ঘর ঘর ১৫।১৬ বা তাহার চাইতেও বেশী বয়সের মেয়েরা অবিবাহিত থাকে (বিদ্যাশিক্ষার জন্যই হউক বা অর্থাভাব বশতই হউক) তখন তাহাদের নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তা ও মাধুর্য্য রক্ষার দিকে বড়দের কড়া নজর রাখা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি দেখিয়াছি অনেক স্থলেই তাহা রক্ষিত হয়না।

আমি যখন রেঙ্গুনে ছিলাম তখন এক সময় আমাদের পাশের বাসায় একঘর মাদ্রাজী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের চাল চলন লক্ষ্য করিবার আমার সুযোগ ছিল।

সেই গৃহস্থের একটী কুমারী কন্যা লছমী অবাধে বাহিরে চলা-ফিরা কথাবার্ত্তা ইত্যাদি করিত—কিন্তু যৌবন-সঞ্চারের পর লছমীকে গৃহকোণে বন্দী করা হইল, পিতা ও সহোদর ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতে দেওয়া হইত না। উহাদের দেশে এইরূপ নিয়ম। সকল মেয়েকেই 'বড়' হইবার পর অন্তঃপুরে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু বিবাহের পরই মেয়েরা পুনরায় স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করে, আর কোন বাধা থাকে না।

বিবাহ হইলেও মাদ্রাজী রমণীরা ঘোমটা দেয় না। সকল পুরুষের সম্মুখে বাহির হয় কিন্তু অপরিচিতের সহিত বাক্যালাপ করেনা, স্বল্প পরিচিতের সহিত অপ্রয়োজনীয়

কথা বলেনা। পুরুষের চক্ষুর সহিত চক্ষু মিলিত করে না, মুখ খোলা থাকে কিন্তু দৃষ্টি থাকে নত।

মাদ্রাজী রমণীদের এই স্বভাবটি আমার বড়ই মধুর লাগে। আমাদের দেশে সকল স্থানে ঠিক এইরূপটি হয় না। বেশীর ভাগ নারীরা (বিবাহিতা অবিবাহিতা দুই) হয় একেবারে অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকেন, আর নয় এমন ভাবে পুরুষদের সাথে মিশিতে থাকেন যে তাঁহারাও যেন পুরুষ হইয়াই জন্মিয়াছেন, পুরুষের নিকট হইতে তাঁহাদের দেহের বা মনের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিবার যেন কোনই প্রয়োজন নাই।

পুঁথি গত বিদ্যা এবং শিল্প শিখিলেই যে নারীর শিক্ষা চরমে উঠে না, শালীনতা ও লজ্জা যে সর্ব্ব প্রথমে দরকার আজকাল অনেকেই তাহা ভুলিতে বসিয়াছেন।

জ্ঞানীদের নিকট আমার প্রার্থনা তাঁহারা যেন এই বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করিয়া জাতির কল্যাণ সাধন করেন।

৩। বাঙ্গালী জাতির পোষাক

শ্রীসুশীলকুমার দেব

বাঙালী পুরুষের পোষাক:

মাপা-জোখা রকমারি পরিচ্ছদ (কোট্ টুপি ট্রাউজার ইত্যাদি) পৃথিবীতে সর্ব্বাগ্রে বোধ হয় চীনেরাই প্রবর্ত্তন করেন; এম্‌নি সভ্যতার আরো নানান উপকরণ সর্ব্বপ্রথম চীনাদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন কাঁটা দিয়ে তুলে আশ্চর্য্যজনক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভাত-তরকারী টেবিল চেয়ারে বসে আহার।

তদানীন্তন ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে সাধারণ পোষাক ছিলো ধুতি ও চাদর। এই ধুতি-চাদর রোমক ও গ্রীকেরাও পরিধান করতেন—ধুতি লম্বা-চৌড়া, চাদর তার চাইতে ছোটো। চাদরখানাই রোমকদের কাছে টোগায় পরিণত হয়েছে, যার থেকে আমরা করে নিয়েছি চোঁগা-চাপকানের চোগা।

ইরান্ জয় করে আলেকজান্দার বনেদি ধুতি-চাদর ত্যাগ করে ট্রাউজার পরতে শুরু করেন। সেই থেকেই কোট্-ট্রাউজারের ফ্যাসান্ চল্‌তি হয়ে দাঁড়ালো। গ্রীসের সভ্যতা গ্রহণ করলে য়ুরোপ; য়ুরোপ থেকে ঐ পোষাক ছড়িয়ে পড়্‌ল মার্কিন দেশে এবং আশ্চর্য্য যে পাশ্চাত্য শ্বেত জাতি যেখানে পদার্পণ করেছে সেখানেই ঐ অদ্ভুতপূর্ব্ব পোষাকের প্রবর্ত্তন করে ছেড়েছে। (অবশ্য ভারতবর্ষেও প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধের পোষাক রূপে লম্বা কোর্ত্তা ও ট্রাউজার ধারণ করতেন।) তাতে পৃথিবীর নানাস্থানে পরিচ্ছদের ঐক্য স্থাপিত হবার পক্ষে সুবিধে—ব্রাদারহুড্ অব্ নেসন্সের তাতে জয়জয়কার হবে বটে!

কিন্তু আধুনিক ভারতের পক্ষে টাল সাম্‌লানো দায়। ভারত ঐক্যের দেশ নয়, বৈচিত্র্যের সমন্বয়ের দেশ; প্রয়োজন-ঘটিত যন্ত্র-সাধিত সাধারণ তন্ত্রের দেশ নয়, ধর্ম্ম ও ললিত-কলা-পরিশীলনোপযোগী বহুমুখী শিল্প-সংরক্ষণের দেশ। এ-দেশে য়ুটিলিটির চেয়ে আর্টের মূল্য বেশী। য়ুটিলিটির বাহন জড়যন্ত্র—ঐক্য সাধনে এর সাফল্য; আর্টের বাহন জীবন্ত ব্যক্তিত্ব—বৈচিত্র্যময় আত্ম-প্রকাশে এর পরিপূর্ত্তি। য়ুটিলিটির ক্ষেত্র সমষ্টি: ঐক্যের সাফল্যের মধ্যে তাই ডেমোক্রেসীর বহর। আর্টের ক্ষেত্র ব্যষ্টি, বৈচিত্র্যের সঙ্গমে তাতে বর্ণাশ্রম বিভাগের উৎপত্তি।

সুতরাং অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় পোষাকেও যে আমাদের বৈচিত্র্য থাক্‌বে, তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হবার নেই। বাঙালীর কাছে পরিচ্ছদ ললিত-কলায় আত্ম-প্রকাশের একটি উপায়। প্রত্যেক বাঙালী যেদিন স্ব-স্ব পরিচ্ছদে অলঙ্করণোচিত স্বাধীন রুচির পরিচয় দেবে, সেদিনই বুঝ্‌তে হবে পরিচ্ছদ-শিল্পে বাঙালী আত্ম-প্রকাশ করেছে।

য়ুরোপের দৃষ্টি ধার করে যাঁরা আমাদের সংস্কার করতে চান তাঁরাই এই বৈচিত্র্য রক্ষার বিরোধী। পোষাককে আমরা দেখি শিল্পীর দৃষ্টিতে তাই বাঙালীর পোষাক শুধু একরকম নয়। কেউ মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরেন, কেউবা সাড়ে তিন হাত কোঁচা দোলান্ সাম্‌নের দিকে; কেউ দেন্ পাঞ্জাবীর 'পরে চাদর, কেউবা সার্টের 'পরে; কেউ আবার সার্ট গায়ে দিয়ে কোট্ পরেন—সার্টের কলারটি কোটের ওপর তুলে দিয়ে, কেউবা সার্টের কলারকে অমন করে তুলে দেন্ না; কারুর বা গলা-বন্ধ কোট্ কারুর বা 'অপ্‌ন্ ব্রেষ্ট্'; আবার কেউ পায়জামার পক্ষপাতী, কেউবা সলোয়ার্ পর্‌তে ইচ্ছুক। সামাজিক নিয়মকে যাঁরা ব্যক্তির খেয়াল কল্পনা ও রুচির চেয়ে বড়ো করে দেখেন তাঁরা আমার কথায় আপত্তি তুল্‌বেন, বোল্‌বেন—এম্‌নি ধারা বিশৃঙ্খলায় সমাজের ডিসিপ্লিন্ বজায় থাকে না। আমি বোল্‌ব, ডিসিপ্লিন্ প্রয়োজনের নোকর—সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানে তার চাকরি; কিন্তু ব্যক্তি যেখানে পোষাকের দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত কর্‌তে চেষ্টিত সেখানে অবিসংবাদিত অধিকার তো ললিতকলার; সমাজের ডিসিপ্লিনে বাধা যদি না জন্মায় তাহলে পরিচ্ছদীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকুক না; তাতে সমাজের ক্ষতি তো নেই বরং তাতে ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের বিকাশ সম্ভব। তাই আমি বাঙালীর পরিচ্ছদ-সাম্যের বিরোধী এবং বৈচিত্র্য-চর্চ্চার পক্ষপাতী।

তাছাড়া বাঙালীর বিচিত্র পরিচ্ছদের উন্নতিরও যথেষ্ট অবকাশ আছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মধ্যে ইরাণী কোট্-ট্রাউজার, রোমক ও গ্রীকোচিত সার্ট, পাঞ্জাবীদের পাঞ্জাবী, আর্য্যদের অনুকরণে ধুতি-চাদর যা-আছে তার মধ্যে সৌষ্ঠব সম্পাদিত করাই পোষাক বিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য। য়ুরোপে যেমন প্যারিস্ থেকে মেয়েদের এবং লণ্ডন থেকে পুরুষের পোষাক নিত্যই নব নব সংস্কারে সংস্কৃত হয়ে বেরুচ্ছে তেম্‌নি বরং আমাদের কোনো কোনো মিল্-ওয়ালা, মার্চ্চেন্ট্ বা পরিচ্ছদ-শিল্পী নর-নারীর পোষাকের সংস্কার-কেন্দ্র স্থাপন করুন।

তবে যাঁরা গরীব তাঁদের সর্ব্বাঙ্গীন আভিজাত্য-বিধায়ক সংস্কারের উপক্রমণিকা-রূপে আর্থিক সংস্কারই প্রথমতম কর্ত্তব্য। তাঁদের পরিচ্ছদ যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় তাহলেই পরিচ্ছদ-কলার প্রাথমিক উন্নতি হলো। অধিকন্তু কল-কারখানার ফলে বাঙালীর মধ্যে শ্রমিক সংখ্যার বাড়্‌তির সঙ্গে পরিচ্ছদ-পরিচ্ছন্নতার আবশ্যকতাও বাড়্‌বে। এই প্রসঙ্গে একটা য়ুটিলিটি-সঙ্গত প্রস্তাব করা যাক্। মজুরদের পক্ষে ধুতি ও কোট্ বা পুরো হাতার সার্ট অনুপযোগী। অতএব আজানু পেণ্ট্ ও আ-কনুই-লম্বিত হাতার সার্ট কলের কর্ম্মী তথা ক্ষেতের চাষীর পক্ষেও উত্তম পরিচ্ছদ বলে গণ্য হতে পারে। টেকসই হেতু খরচও বেশী নয়। এরূপ জাঙ্গিয়া ও ফতুয়ার সঙ্গে একজোড়া জুতো হলে মধ্যবিত্ত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা মার্চ্চেণ্ট্‌কেও বেমানান্ হবে না। কর্ম্মী মধ্যবিত্তের পক্ষে আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী জাঙ্গিয়া-ও-ফতুয়ার সঙ্গে উপ্‌রি পুলোভার ও কোর্ত্তা 'অধিকন্তু' স্থলে 'ন দোষায়' হবে।

যাঁরা অর্থশালী ও তুলনায় বেশী অবসর-ভোগী তাঁদের পক্ষেই পোষাকে রুচির চর্চ্চা সমধিক সম্ভবে: বিলিতি দামী প্যাটার্নের দামী হ্যাট্-কোট্ পেণ্ট্-টাই অথবা দামী দিশী চটকদার পোষাক যথা-অভিরুচি পর্‌তে পারেন। সুতরাং এঁদের পক্ষে তো সার্ব্বজনীন পোষাক একেবারেই অসম্ভব।

পরিচ্ছদ-প্রসাধনের বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রগতিসূচক একটি বিশেষ আইন করা উচিত মনে করি: সকলেরই পোষাক যাতে 'স্মার্ট' হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। Smartness পরিচ্ছদ-শিল্পের একটি বিশেষ গুণ। ভারতে তথা বাঙ্‌লা দেশে পার্শী মহিলা ছাড়া এ বিষয়ে আর কাউকে বড়ো একটা মনোযোগ দিতে দেখা যায় না। অবশ্য বাঙালীদের স্মার্ট হবার পক্ষে গুরুতর বাধা আকৃতির খর্ব্বতা ও কলেবরের বিপুলতা। ডন কুস্তি দ্বারা সুসমঞ্জস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের অভাব এবং অতিমাত্রায় শর্করাজাতীয় খাদ্য আহার এর কারণ। দেহালঙ্করণ শিল্পে আঙ্গিক সুসঙ্গতি যে সুন্দর পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি করে তা প্রতীচ্য দেশ থেকে আমাদের শেখা উচিত।

৪। নামের পদবী

শ্রীস্বরূপ গুপ্ত

গত ফাল্গুন সংখ্যার 'বিচিত্রা'র শ্রীযুক্ত মণি গঙ্গোপাধ্যায় নামের পদবী সম্বন্ধে যে প্রশ্নটি তুলেচেন সেটা সত্যিই প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার। মণিবাবু বলেচেন যে, পুরুষদের বেলায় আমরা সুরেনবাবু বা উপেনবাবু ব'লতে পারি কিন্তু মেয়েদের তেমন কিছু ব'লতে পারিনে। এখন আমরা মেয়েদের রুবিদেবী বা ইলাদেবী ব'লে থাকি, আর বেশী ঘনিষ্ঠ হ'লে অনেক সময় রুবি বা ইলা। সেইটাই চালাতে দোষ কি? এটা মণিবাবুর কাছে 'কেমন কেমন ঠেকে' কেন বুঝতে পারলেম না। সুরেনবাবু ব'লতে কোন মেয়ের যদি সঙ্কোচ না হয় তো পুরুষের ইলা দেবী ব'লতে কেন অসুবিধা হ'বে? এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা ব'লব। অপরিচিত পুরুষকে আমরা 'মশায়' ব'লে সম্বোধন করি, কিন্তু মেয়েদের ডাকবার কিছু নেই (ওদেশে যেমন Madam বা madamoiselle) মেয়েদের সম্বোধন ক'রতে 'ভদ্রে' কথাটি ব্যবহার ক'রলে কেমন হয়।

কথা যখন উঠেইচে তখন আরেকটি বিষয় উত্থাপন ক'রলে বিশেষ ক্ষতি নেই। ইংরাজীতে Miss ও Mrs. ব'লে কথা আছে, ওর কোন বাংলা প্রতিশব্দ নেই। Miss-এর পরিবর্ত্তে আমরা কখন কখন কুমারী শব্দটি ব্যবহার করি, কিন্তু Mrs. এর পরিবর্ত্তে আমাদের ভাষায় ব'লবার কিছু নেই। আমরা যদি শ্রীমতী ও শ্রীযুক্তা এই কথা দু'টি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি তাহ'লে কি হয়, যেমন, Miss Sen না ব'লে শ্রীমতী সেন এবং Mrs. Bose না ব'লে শ্রীযুক্তা বোস।

এ সম্বন্ধে আলোচনা একান্ত প্রার্থনীয়।

৪ক। নামের পদবী

শ্রীবিনয়কুমার মিত্র এম্-এ, এল্-এল্-বি

ফাল্গুন, ১৩৪০-এর "বিচিত্রায়" শ্রীযুক্ত মণি গঙ্গোপাধ্যায় "নামের পদবী" নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। পরিচিতা মহিলাদের—মণি-বাবুর ভাষায় "নারী বন্ধুদের"—ডাকতে হলে আমরা কি বলব, এই হচ্ছে সমস্যা।

মণিবাবু বলেছেন যে "মিস্ বা মিসেস শব্দটা কানে বড় বিশ্রী বাজে।" পৃথিবীতে শ্রুতিকটু ও শ্রুতি-মধুর দুরকমই কথা আছে, আর যতদূর সম্ভব আমাদের কথাবার্ত্তা শ্রুতি-মধুর হওয়া উচিত। তবে আমার বোধ হয় যে আমাদের পক্ষে 'মিস' বা 'মিসেস্' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা উচিত নয়, এই জন্য নয় যে তা ব্যক্তিবিশেষের কানে বাজে, কিন্তু এই জন্য যে ঐ শব্দ দুটি ব্যবহার করতে হলে আমাদেরকে অনাবশ্যক ভাবে ইংরাজদের অনুকরণ করতে হবে, আর সকলেই স্বীকার করবেন যে অনাবশ্যক অনুকরণ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

বাংলায় 'মিস্' বা 'মিসেস্' শব্দের প্রয়োগ অনাবশ্যক কেন, এখন এই হচ্ছে কথা। 'মিস্' শব্দের অনুরূপ যদি কোন শব্দ আমাদেরকে বলতেই হয় তা হলে আমরা 'কুমারী' শব্দের শরণাপন্ন হতে পারি। তা ছাড়া 'মিস্' ও 'মিসেস্' শব্দদ্বয়ের পরিবর্ত্তে আমরা 'দেবী' বা 'শ্রীমতী' শব্দের প্রয়োগ করতে পারি। বিবাহিতার সম্বন্ধে কোন কোন পদবীর সঙ্গে 'জায়া' শব্দ যোগ করিলে চলতে পারে বটে, যেমন 'ঘোষ' জায়া' 'মিত্র জায়া' 'দত্ত জায়া' ইত্যাদি, কিন্তু সব পদবীর পরে 'জায়া' শব্দ যোগ করা সম্ভব হলেও তা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ এই রকম করতে হলে আমাদেরকে অনাবশ্যক ভাবে শ্রুতিকটু শব্দের প্রয়োগ করতে হবে।

তা হলে আমাদের দুটি শব্দ রইল—একটি 'দেবী', অপরটি 'শ্রীমতী'। আজকাল 'দেবী' শব্দ মহিলা সমাজের মধ্যে অনেকটা চলে গেছে। তবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে 'দেবী' শব্দের তত পক্ষপাতী নই, কারণ পুরুষ যেমন দেব নন নারীও তেমনি দেবী নন। "শ্রীমতী" শব্দের প্রয়োগের দ্বারা নারীর যথেষ্ট সম্মান হতে পারে, আর এই শব্দের প্রয়োগ করে আমরা কোন পরিচিতা মহিলাকে অনায়াসে আহ্বান করতে পারি।

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৭

মনের মধ্যে একটা লঘু সুখের হিল্লোল বহন ক'রে প্রত্যূষে সন্ধ্যার ঘুম ভাঙ্‌ল। নিদ্রায় দেখা সুখস্বপ্নের অস্পষ্ট স্মৃতির চেয়ে খুব যে এমন কিছু বেশি তার মূল্য, তা নয়; কিন্তু তবু যেন জমাট দুঃখের কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে ঝির্-ঝিরে একটু হাওয়া প্রবাহিত হয়েচে,—যেন ঈষদুন্মুক্ত কারাদ্বারের ফাঁক দিয়ে বাহিরের লতাপুষ্পময়ী প্রকৃতির সামান্য একটু অংশ দেখা গিয়েছে। তালা খুলে আমিনা যখন আহবান করলে, 'বেরিয়ে এসো সন্ধ্যা', তখন সে লঘু-পদে আমিনার নিকট উপস্থিত হয়ে উচ্ছ্বসিত পুলকে তাকে জড়িয়ে ধরলে; বল্‌লে, "রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল আমিনা?" অর্থাৎ যে প্রশ্নটা আমিনারই তাকে করবার কথা, মনের প্রসন্নতায় সে প্রশ্ন সে নিজেই আমিনাকে ক'রে বস্‌ল।

আমিনা স্মিতমুখে বল্‌লে, "কোথায় হয়েছিল? তোমার ভাবনায় সমস্ত রাত ঠায় জেগে ব'সে ছিলাম।"

কথাটা সে রসিকতা তা অনুমান ক'রে সন্ধ্যা মৃদু হেসে বল্‌লে, "রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল,—না?"

"সে ছিল তোমার ঘরে, বাইরে ত বিষম গুমোট ছিল।"

এটাও যে রসিকতাই হ'তে পারে অতখানি ভাববার সাহস না পেয়ে সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বল্‌লে, "সে রকমও হয় না কি?"

সন্ধ্যার হৃদয়ের এই অকুণ্ঠিত সরলতায় মুগ্ধ হ'য়ে আমিনার চক্ষু সজল হয়ে এল; বল্‌লে, "সব হয়! এখন এসো, তোমার কাজ কর্ম্ম সেরে দিয়ে এক রাশ বাসন নিয়ে আমাকে আবার পুকুরে যেতে হবে। কাল রাত থেকে দবিরের জ্বর হয়েচে, কাজে আসে নি।"

আগ্রহান্বিত স্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমাকেও নিয়ে চল না আমিনা, আমরা দুজনে মিলে বাসনগুলো মেজে ফেলি!"

একটু কৌতুক করবার উদ্দেশ্যে আমিনা ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বিস্ময়ের সুরে বল্‌লে, "শোন কথা! হিঁদু ঘরের মেয়ে হ'য়ে তুমি মোসোলমানের এঁটো বাসন মাজবে কি গো?"

আমিনার ধমকে অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হ'লে না হয় শুধু আমার আর তোমার বাসনগুলো আমাকে দিয়ো—আমি সেই গুলোই মাজ্‌ব।"

এবার আমিনা সজোরে হেসে উঠ্‌ল; বল্‌লে; "এ কিন্তু বেশ কথা বলেছ সন্ধ্যা! তুমি আমি এক জাত, সেই জন্যে আমাদের দুজনের বাসন তুমি মাজ্‌বে,—আর মহবুব্‌ গফুর এরা সব অন্য জাত, তাই তাদের বাসন আমি মাজ্‌ব,—না?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা ক্ষণকাল নিঃশব্দ স্মিত মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বল্‌লে, "তুমি বিশ্বাস করবে কি না বল্‌তে পারিনে আমিনা, তোমার বাসন মাজ্‌তে আমার মনে কিন্তু একটুও খারাপ লাগ্‌বে না।"

আমিনা বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হয়ত লাগ্‌বে না, কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে আমি বাসন মাজ্‌তে দেবো কেন। ও কি তোমার কাজ? তুমি বড় লোকের মেয়ে, বড় লোকের বউ,—তুমি কি এ কাজ কখনো করেছ? তার চেয়ে চল, পুকুরঘাটে ব'সে তুমি আমার সঙ্গে গল্প করবে, আর আমি তোমার গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে বাসনগুলো মেজে ফেল্‌ব। বল ত আমি গফুর ভাইয়ের মত নিয়ে আসি।"

অগত্যা সন্ধ্যা বল্‌লে, "আচ্ছা, তাই তা হ'লে চল।"

"কিন্তু কেউ তোমাকে পুকুরঘাটে দেখে ফেল্‌লে তুমি আমার কে হও বল্‌বে, বল ত?"

সলজ্জ হাস্যের সহিত সন্ধ্যা মৃদু স্বরে বল্‌লে, "ননদ?"

"ননদ কেন? ননদ ত পর হয়ে অন্য বাড়ি চ'লে যায়।

তার চেয়ে জা' বোলো। তবু পাতানো সম্পর্কে মনে-মনেও এক সঙ্গে থাকা যাবে।"

ক্ষণকাল একটু কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্লে, "কিন্তু জা ত' বিয়ে না হ'লে কিছুতেই হয় না,—ননদ আইবড়োও হ'তে পারে।"

জা কথাটা সন্ধ্যার মনে কোন্‌খানে বাধ্‌ছে বুঝ্‌তে পেরে আমিনা বল্লে, "কিন্তু তোমার স্বামীকে আমার স্বামীর ছোট ভাই ব'লে ধরলেও ত কোনো ক্ষতি হয় না সন্ধ্যা।"

আমিনার কথায় সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; মৃদু স্বরে বল্লে, "না, ক্ষতি হয় না।"

হাসিমুখে আমিনা বল্লে, "বেশ, তা হ'লে কারো সাম্‌নে প'ড়ে গেলে দুজনেই দুজনের জা হব,—কেমন?" তারপর সন্ধ্যার সীমন্তের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সে বল্লে, "ননদ হ'লেও ত তুমি আইবড়ো ননদ হ'তে পারতে না সন্ধ্যা? সিঁথের সিঁদুর রয়েছে যে।"

অপহৃত হবার পর থেকে কোন দিনই সন্ধ্যা নূতন ক'রে সীমন্তে সিঁদুর দিতে পারে নি, কিন্তু যেটুকু সিঁদুর তার মাথায় ছিল সেটুকুকে সে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে। ধুয়ে যাবার আশঙ্কায় স্নান করবার সময়ে মাথার সম্মুখ দিক জলে ভিজ্‌তে দেয় নি, ঝ'রে যাবার ভয়ে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াবার কথা মনেও ভাবে নি, তা ছাড়া কেশগুচ্ছের মধ্যে সর্ব্বদা তাকে প্রচ্ছন্ন রেখে সর্ব্বপ্রকার বাহিরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। এই সিঁদুরের বিন্দুটি তার বিবাহিত জীবনের পরিচিতি,—তার দাম্পত্য-দলীল পত্রের শীলমোহর, তার আয়তির সঙ্কেত।

আমিনার কথা শুনে নিরুদ্ধ কণ্ঠে সন্ধ্যা বল্লে, "এখনো দেখা যায়?"

সন্ধ্যার সীমন্তে পুনরায় দৃষ্টিপাত ক'রে আমিনা বল্লে, "ঠাওর ক'রে দেখ্‌লে বোঝা যায়। কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। সিঁদুর পরবে সন্ধ্যা? জোগাড় ক'রে দোবো?"

শুনে সন্ধ্যার চোখে জল দেখা দিলে; বল্লে, "যদি কোনো দিন এখান থেকে মুক্তির জোগাড় ক'রে দিতে পার সেদিন সিঁদুরও জোগাড় ক'রে দিয়ো ভাই; এখন থাক।"

গফুরের অনুমতি পেতে বিলম্ব হ'ল না, বাসন-পত্র নিয়ে আমিনা ও সন্ধ্যা পুকুর ঘাটে গিয়ে বসল। সন্ধ্যার নির্ব্বন্ধ সত্ত্বেও আমিনা কিছুতেই তাকে বাসন স্পর্শ করতে দিলেনা;—বল্লে, "বেশি যদি দুষ্টুমী করো, ঘরে তালা বন্ধ ক'রে রেখে আস্‌ব। আমার পাশে ব'সে লক্ষ্মী হ'য়ে গল্প কর।"

বাসন মাজার কাজে অংশীদার হবার কোনো আশা নেই দেখে অগত্যা সন্ধ্যা বল্লে, "তা হ'লে তুমিই গল্প কর আমিনা।"

"কিসের গল্প করব বল?"

"তোমার স্বামীর গল্প।"

বিস্ময়ের সুর টেনে আমিনা বল্লে, "স্বামীর গল্প? স্বামী বাঘ না ভালুক, ভূত না প্রেত যে স্বামীর গল্প করব? তার চেয়ে একটা ভূতের গল্প বলি।"

সন্ধ্যা বল্লে, "ভূতের গল্প রাত্রে বোলো, ভাল লাগ্‌বে।"

"তা হ'লে রাজকুমারীর গল্প বলি শোন।" বলে সন্ধ্যার মতামতের জন্য অপেক্ষা না ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল, "এক ছিল পরমা সুন্দরী রাজকন্যা, তার বিয়ে হ'ল এক দেশের এক রাজকুমারের সঙ্গে। অল্প সময়ের মধ্যে দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল। রাজকুমারীকে নিয়ে রাজকুমার তার বাড়ি ফিরে চলেছে, এমন সময়ে পথে ডাকাতের দল প'ড়ে রাজকুমারীকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরের দেশে। সেখানে ডাকাতদের বাড়ি বাস ক'রে দুঃখে কষ্টে রাজকুমারী একদিন প্রাণ দিতে তৈরি হয়েছে, এমন সময়ে সে বাড়িতে অন্য গ্রাম থেকে একটি মেয়ে এসে হাজির।—"

আমিনাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে সন্ধ্যা বল্লে, "সে মেয়েটির নাম আমিনা। আর সেই হরণ ক'রে আনা হতভাগিনী রাজকন্যার নাম সন্ধ্যা। প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার জন্য সন্ধ্যা একেবারে দৃঢ় সঙ্কল্প, এমন সময় যাদুকরী আমিনা তার কানে এমন সব মন্ত্র ঝাড়লে যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা পোড়ারমুখীর মুখে বড় একবাটি দুধ একেবারে শেষ হয়ে গেল। তারপর এক নিশীথ রাত্রে কি রকম অদ্ভুত উপায়ে ডাকাতদের বাড়ি থেকে উদ্ধার

ক'রে আমিনা সন্ধ্যাকে তার শ্বশুরবাড়ী পাঠালে সে গল্প শুনবে ভাই ?"

সকৌতুকে আমিনা বল্‌লে, "বেশ ত' বল, শুন্‌ব।"

বলা কিন্তু হ'য়ে উঠ্‌ল না, পদশব্দে উভয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখ্‌লে মহবুব আসছে। মহবুবকে দেখে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি দেহের বস্ত্র সংযত ক'রে নিয়ে পুষ্করিণীর জলের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে রইল। নিমেষের মধ্যে স্বপ্ন-রাজ্যের আলো গেল মিলিয়ে—চোখে মুখে ফুটে উঠ্‌ল অকরুণ কাঠিন্য।

নিকটে এসে মহবুব বল্‌লে, "হামিদাকে এখানে এনেছিস্ যে আমিনা ?"

আমিনা স্মিতমুখে বল্‌লে, "তা হামিদা চিরকালই তালাচাবির মধ্যে বন্ধ থাক্‌বে না কি ?"

আমিনার কথায় আশ্বাস পেয়ে খুসী হয়ে মহবুব বল্‌লে, "না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।" তারপর একটু চেষ্টায় আমিনার মনোযোগ আকৃষ্ট করে মুখ চক্ষুর বিশেষ ভঙ্গী এবং মস্তকের বিশেষ সঞ্চালনের দ্বারা আমিনাকে যে নিঃশব্দ প্রশ্ন করলে, তার অর্থ, পোষ মেনে এল ?

উত্তরে আমিনা তার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর একটুখানি অগ্রভাগ দেখিয়ে যে কথা ব্যক্ত করলে, তার অর্থ, একটু একটু।

তর্জ্জনীর অতটুকু অংশ দেখে মহবুবের পিত্ত উঠ্‌ল জ্বলে! মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল মুখের প্রসন্ন কোমল ভাব। দক্ষিণ পদ সজোরে মাটিতে ঠুকে কঠোরস্বরে গর্জ্জন করে উঠ্‌ল, "তোর বদমাসী আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, তুই আসল শয়তান!"

আমিনার চক্ষু-কণিকা জ্বলে উঠ্‌ল। হাতের বাসনটা একটু ঠেলে দিয়ে পিছন ফিরে ব'সে বল্‌লে, "তোমার যখন বোন, তখন ও কথা তুমি বলতে পার, কিন্তু মনে রেখো মহবুব ভাই, আমি আমার শ্বশুরের পুত্রবধূ!"

মহবুব ব্যঙ্গভরে বল্‌লে, "ওঃ ভারী শ্বশুর! একেবারে দবীপুরের নবাব!"

"না, দবীপুরের নবাব নয়, কিন্তু দবীপুরের ডাকাতও নয়,—ভদ্রলোক!"

"খানদানি বংশ!"

আমিনা কঠোরস্বরে উত্তর করলে, "খানদানি বংশ ত' বটেই, তা ছাড়া তাঁর ইজ্জতের জ্ঞান এত বেশী যে, আমাকে শয়তান বলেছ শুন্‌লে তাঁর বাড়িতে তোমার তলব পড়বে!"

আমিনার অগ্নিমূর্ত্তি দেখে মহবুব তার সঙ্গে আর কোনও কথা না ব'লে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠ্‌ল "হামিদা!"

সন্ধ্যা বিবর্ণমুখে ফিরে দেখ্‌লে।

মহবুব বল্‌লে, "আজ রাতে আমি দারু পিয়ে বাড়ি ফিরব। তুমি তৈয়ার হয়ে থাক্‌বে। সেদিনের মত আজ আমি তোমার ঘরে শোব। দরজা খুল্‌তে গোল করলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দোবো। বুঝলে ?"

উত্তর দিলে আমিনা। দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "বুঝলাম!" তারপর সন্ধ্যার দিকে ফিরে বল্‌লে, "তুমি খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়ো হামিদা, আমি সারারাত তোমার দরজায় পাহারা দোবো। দেখি কে কি করে!"

মহবুব গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল, "আচ্ছা আমিও দেখ্‌ব তুই কত বড়—" সেই শয়তান কথাটাই পুনরায় মুখে আস্‌ছিল—কিন্তু ও কথাটা উচ্চারণ করলে আমিনার শ্বশুরবাড়িতে তলব পড়বার কথা উঠেছে—সুতরাং ওটা মুখেই আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এমন কোনো কথাও মনে এলনা যাতে উষ্মা প্রকাশ হয় অথচ আমিনার শ্বশুরবাড়ি তলব পড়বার কথা ওঠে না। অগত্যা আমিনার প্রতি তীব্র দৃষ্টির একটা অগ্নিবর্ষণ ক'রে বিড় বিড় ক'রে বক্‌তে বক্‌তে মহবুব প্রস্থান করলে।

আমিনা আবার পূর্ব্বস্থানে উপবেশন ক'রে বাসন হাতে নিয়ে সহজ কণ্ঠে বল্‌লে, "নাও সন্ধ্যা, এবার তোমার মুক্তির গল্প আরম্ভ কর।"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখে একটা বিশীর্ণ হাসি ফুটে উঠ্‌ল। আমিনা বুঝ্‌তে পারলে যে-স্বপ্ন নিষ্ঠুর আঘাতে বিলুপ্ত হয়েচে সে আর শীঘ্র ফিরে আস্‌বে না।

৮

দ্বিপ্রহর। মহবুব সকাল সকাল খেয়ে কাজে বেরিয়েছে, আমিনাও তার কোন্ এক বাল্য সঙ্গিনীর বাড়ি বেড়াতে

গেছে; যাবার সময়ে সন্ধ্যাকে ব'লে গেছে, ফিরতে বিলম্ব হবে না, ফিরে এসে তাকে নিয়ে পুকুর ঘাটে গিয়ে বস্‌বে।

সন্ধ্যার ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শিকল টানা। ঘরের ভিতর ভূমির উপর শুয়ে সে নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করছিল। সৎ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে, কলিকাতার কমলা গার্লস্ স্কুলের ছাত্রী, ধনী ও বনেদী বংশের বধূ—এ কী তার দুর্দশা! চিরদিন আদরে যত্নে পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে সে মানুষ,—পিতামাতার আদরিণী কন্যা, স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর প্রিয়তমা ছাত্রী, শ্বশুর গৃহে সকলের আদরের বউ,—সহসা কোন্ মহাপাপে সে বন্দিনী হ'ল ডাকাতের ঘরে?—সেখানে তার সদ্যবিকসিত নারীত্ব কি ঘৃণিতভাবে অপমানিত হ'ল, বিমর্দ্দিত হ'ল! কিন্তু, কেন? কোন্ অপরাধে? যে প্রায়শ্চিত্ত এত প্রকট হ'য়ে উঠ্‌ল তার পাপ চোখে দেখা যায় না কেন? সহসা অন্তরের সমস্ত দুঃখ বেদনাকে অতিক্রম ক'রে একটা তীব্র ক্রোধ জাগ্‌ল, অভিমানে সমস্ত শরীরটা যেন বিষিয়ে উঠ্‌ল। চোখ ফেটে জল বেরোবার উপক্রম হ'ল।

আচ্ছা, মৃত্যু হয় না কেন? প্রাণটা কি এতই কঠিন বস্তু যে, কিছুতেই দেহ ছেড়ে বার হবে না? এত দুঃখ অপমান বেদনাতেও না? একজন সন্ধ্যা মরে গেলে পৃথিবীর কি এমন্ ক্ষতি হবে?—কিছুই না। কিন্তু সে নিজে একেবারে বেঁচে যাবে! দুঃখ লাঞ্ছনার এই কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে জীবনটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার কি কোন অর্থ আছে? কিছু না। একবার ত' সে জীবনটাকে শেষ করবার পথে যাত্রা করেছিল, কিন্তু আমিনা তার মধ্যে এসে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল। সে যদি না আসৃত তা হ'লে এতদিনে হয়ত সন্ধ্যা এই অপবিত্র কারাগার হ'তে চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করতে পারত। আমিনা বলে বটে সে সন্ধ্যাকে হয়ত' একদিন মুক্ত করবে, কিন্তু সে তার মনের সদিচ্ছা মাত্র। হরিণী হয়ে বাঘের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেবার শক্তি তার কোথায়? এ বাড়িতে এসে পর্য্যন্ত সে তাকে অনেকখানি আশ্রয় দিয়েছে বটে, কিন্তু যেদিন আমিনার প্রতি সম্ভ্রম ছিন্ন করে মহবুবের পাশব বৃত্তি উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌বে সেইদিনই সন্ধ্যার আশ্রয় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। সুতরাং যে আশ্রয় পাকা, যে আশ্রয় কোনো অবস্থাতে ভেঙে পড়বার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই, সেই আশ্রয়ের শরণ নিতে হবে। সে মৃত্যু।

আচ্ছা, দুঃখ বেদনার পীড়ন সহ্য করতে না পেরে যারা আত্মহত্যা করে তাদের দুঃখ কি সন্ধ্যার দুঃখের চেয়েও বেশি? কখনই নয়। এর চেয়ে বেশি দুঃখ আর কি হ'তে পারে। এই ঘরের মধ্যেই এমন কোনো উপায় আছে কিনা, যার সাহায্যে জীবনটাকে শেষ ক'রে ফেলা যেতে পারে তা দেখবার জন্যে উঠে ব'সে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতেই সন্ধ্যা দেখলে বাহিরের বারান্দায় জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গফুর।

গফুর বল্‌লে, "এ সময়ে একটু ঘুমিয়ে নিলে না কেন হামিদা? রাত্রে ত নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমতে পার না। তাড়াতাড়ি উঠে বসলে কেন? শরীর ভাল আছে ত?"

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "আছে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এই বেলা একটু ঘুমিয়ে নাও।" ব'লে গফুর পিছন ফিরতেই শুন্‌তে পেলে সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর, "গফুর মিঞা!"

ফিরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার প্রতি সকৌতুক দৃষ্টিপাত ক'রে গফুর বল্‌লে, "গফুর মিঞা! এ ডাক তোমাকে কে শেখালে? আমিনা?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর না দিয়ে আরক্তমুখে দৃষ্টি নত করে রইল।

গফুর বল্‌লে, "আচ্ছা, কি বলবে বল?"

সন্ধ্যা গফুরের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "একবার ভিতরে এস।"

"ভিতরে?"

"হ্যাঁ।"

মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও গফুরের কৌতূহলও কম হ'ল না। ভিতরে কেন? সে কথা ত' জানলা দিয়েও অনায়াসে হ'তে পারত। শিকল খুলে ভিতরে গিয়ে সন্ধ্যার নিকট দাঁড়াতেই চক্ষের নিমেষে যে ব্যাপারটা ঘটল তাতে গফুরের মত শক্ত লোকেরও বিস্ময়ে মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুরণ হ'ল না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রী ঠিক

যেমন ক'রে দ্রুতবেগে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে, তেমনি ভাবে সন্ধ্যা গফুরের উপর লাফিয়ে প'ড়ে দুই বাহু দিয়ে সজোরে তার দুই পা এমন জড়িয়ে ধরলে যে সাধ্য কি তার সেই সুদৃঢ় বাহুবন্ধন থেকে সহজে পা মুক্ত ক'রে নেয়। তারপর গফুরের পদদ্বয়ের উপর বিস্রস্তকেশ মাথা আকুলভাবে ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমাকে বাঁচাও গফুর মিঞা!—আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দাও! আমি জানি তোমার মনের মধ্যে দয়া আছে, আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! আমি এমন ক'রে বেশিদিন বাঁচব না,—গফুর মিঞা, আমাকে ছেড়ে দাও!"

জীবনে গফুর অনেককে বিপন্ন করেছে কিন্তু এমন বিপন্ন নিজে কখনো হয়নি। পা টেনে নিতে গিয়ে দেখ্‌লে বজ্রের মত দৃঢ়! বল্‌লে, "ছি হামিদা, পা ছাড়, ছেলেমানুষী কোরো না!"

গফুরের পায়ের উপর মাথাটা আর একটু জোরে ঘ'ষে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তুমি আগে বল আমাকে ছেড়ে দেবে?"

"সে কথা আমি কি ক'রে বল্‌ব হামিদা? আমার ত' সে এখ্‌তিয়ার নেই।"

"আছে, আছে, গফুর মিঞা, তোমার সব আছে! তোমার দয়া আছে, মায়া আছে! আমি তোমার মেয়ের মতন, বাঁচাও আমাকে!" ব'লে আরো দৃঢ়ভাবে সন্ধ্যা গফুরের পা আঁকড়ে ধরলে। যে শক্তি সে প্রয়োগ করলে তা স্বাভাবিক শক্তি নয়, উত্তেজিত স্নায়ুর শক্তি।

"আরে টেনো না, টেনো না! ফেলে দেবে না-কি?" বলে গফুর পেছিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল, কিন্তু দেখ্‌লে এমন দৃঢ়ভাবে সন্ধ্যা তার পদদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন যে, পেছিয়ে গেলে সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়েই পেছিয়ে যেতে হয়। তখন অগত্যা ভূমির উপর ব'সে প'ড়ে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার দুই হাত বলপূর্ব্বক ছাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, "ভালো ফ্যাসাদ দেখ্‌তে পাই! এমন জান্‌লে কোন্ আহাম্মক্ তোমার ঘরে ঢুক্‌ত!"

ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদতে লাগ্‌ল। "তা হ'লে আমাকে মেরে ফেল গফুর মিঞা, বিষ খাইয়ে হোক, ছোরা মেরে হোক, যেমন ক'রে পার মেরে ফেল! তাতেও তোমার পুণ্য হবে! মেরে ফেল্‌তে ত তোমার কোনো বাধা নেই গফুর মিঞা?"

গফুর বল্‌লে, "তুমি অবুঝ হ'য়ে যদি খালি গফুর মিঞা গফুর মিয়াই করতে থাক তা হ'লে আমি তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাই বল? আমার কথা শোন হামিদা, তোমাকে মেরে ফেলবার এখ্‌তিয়ারও আমার নেই। তুমি আমার কাছে গচ্ছিত আছ। রঘু তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেচে। তুমি তার জিনিস, সে ইচ্ছে করলে তোমাকে ছেড়েও দিতে পারে, মেরেও ফেল্‌তে পারে। আমি পারিনে, আমি শুধু পারি যতদিন আমার বাড়িতে তুমি আছ সাধ্যমত তোমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখ্‌তে, জুলুম জবরদস্তির হাত থেকে তোমাকে রক্ষে করতে।"

উঠে ব'সে সন্ধ্যা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "রঘু কে?"

"তোমার উপর যে ডাকাতি হয়েচে, রঘু সে ডাকাতির সর্দ্দার। চুক্তিমত তুমি তার হিস্‌সায় পড়েছ।"

মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হ'লে আমাকে রঘুর কাছেই নিয়ে চল না?"

"রঘুর কাছে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার বিপদ আছে, তাই রঘুকেই আমি খবর পাঠিয়েছি; সে দু তিন দিনের মধ্যেই এসে পড়বে। তোমার হাঙ্গামা আমি জল্‌দি জল্‌দি চুকিয়ে ফেল্‌তে চাই। রঘু আসা পর্য্যন্ত আমিনা শ্বশুরবাড়ি যাবে না সে কথা আমাদের হয়েচে, কিন্তু সেও বেশি দিন এখানে থাক্‌তে পারবে না, তার শ্বশুরের কাছে দিন আষ্টেকের কথা ব'লে এসেছে। আমিনা থাক্‌তে থাক্‌তে আমি তোমার যা হয় কিছু ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌তে চাই!"

গফুরের কথা শুনে সন্ধ্যা উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ব্যবস্থা করবে গফুর মিঞা? তুমি যে ব্যবস্থাই করবে তা'তে আমার ভাল হবে তা আমি জানি!"

শুনে গফুর হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "এ বেশ কথা! এই দেখ না, তোমাকে ডাকাতি ক'রে নিয়ে এসে বন্দী ক'রে রেখেছি, তাতে তোমার কত ভাল হচ্ছে!"

"সে তুমি দলে প'ড়ে করেছ। আমার জন্যে একা তুমি যা করবে তা'তে আমার কখনই মন্দ হবে না।"

"এ বিশ্বাস তোমার কি ক'রে হল হামিদা?"

"তা বলতে পারিনে, কিন্তু এ আমার বিশ্বাস। এখন তুমি বল গফুর মিঞা, রঘু এলে তুমি কি উপায় করবে।"

পুনরায় গফুরের মুখে হাসি দেখা দিলে; বললে, "সে কথাও তোমাকে বলতে হবে নাকি?—এই ধর, তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে রঘুকে খুব বেশি রকম পীড়াপীড়ি করব।"

চিন্তিতমুখে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু সে যদি না ছাড়ে?"

"তখন কিছু টাকা দিয়ে তোমাকে কিনে নেবার চেষ্টা দেখ্‌ব।"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "যদি না বেচে,— তখন?"

"তখন আর কি? তখন তোমার তক্‌দির,—অদৃষ্ট!" ব'লে গফুর তার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী নিজের কপালে ঠেকালে।

সন্ধ্যার মুখে উৎকট বিহ্বলতার গ্লানি ফুটে উঠ্‌ল। বললে, "অদৃষ্ট? অদৃষ্ট আমার ভাল নয় গফুর মিঞা! তার চেয়ে তুমি আমাকে রঘু আস্‌বার আগে ছেড়ে দাও! আমাকে দয়া কর! আমি তোমার মেয়ের মতন!"

অসম্মতি প্রকাশ স্বরূপ গফুর একবার মাথা নাড়লে, তারপর ঈষৎ দৃঢ়স্বরে বললে, "বুঝলাম তুমি আমার মেয়ের মতন, কিন্তু তুমি যদি সত্যি সত্যি আমার মেয়েই হ'তে তা হ'লেও তোমাকে ছাড়তে পারতাম না। এ যে আমাদের পেশার ইমান হামিদা! আমার শরিকদার তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেচে, আর আমি তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছেড়ে দোবো! এটা কি বেইমানি হবে না? যে কাজ এতটা বয়সে একদিনের জন্যেও করিনি সে কাজ আজ করব? যা হবার নয় হামিদা, তার জন্যে অনুরোধ করোনা।"

"বুঝেচি, তা হ'লে মরণ ভিন্ন আমারও আর উপায় নেই।" ব'লে সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল।

অপরূপ শোভা! বর্ষাধারায় সিক্ত অবনমিত শ্বেতকমল কখনো দেখেছ? কিম্বা ঝঞ্ঝাবাতে ভেঙে-পড়া করবীগুচ্ছ? তা হ'লে সন্ধ্যার এ সময়কার কমনীয় সৌন্দর্য্য কতকটা উপলব্ধি করতে পারবে। সুন্দরী স্ত্রীলোক যখন হাসে তখন তা'তে বসন্তের শোভা, যখন কাঁদে তখন বর্ষার মাধুরী।

মুগ্ধ নির্নিমেষ নেত্রে গফুর ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর নিকটে উপস্থিত হ'য়ে সন্ধ্যার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে সদয়কণ্ঠে বললে, "অত অস্থির হয়োনা হামিদা। দেখনা রঘু এলে কি দাঁড়ায়। সে আমার অনেকদিনের দোস্ত, আমার কথা সহজে টালতে পারবে না। এখন তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখ, আমি চললাম।" তারপর দু পা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললে, "তুমি আমার মেয়ে হ'লে যা করতাম হামিদা, রঘুর কাছে তোমার জন্যে ঠিক তাই-ই করব।"

সন্ধ্যার মুখ কৃতজ্ঞতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, সে নিঃশব্দে যুক্তকরে গফুরকে নমস্কার জানালে।

বাইরে গিয়ে দরজার শিকল টেনে দিয়ে জান্‌লার সম্মুখে এসে গফুর বললে, "আমার কথা শোনো, এখন একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করো।"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা।"

সকালে মহবুব যে কথা শাসিয়ে গিয়েছিল আমিনার মুখে গফুর তা শুনেছিল। নেশায় উন্মত্ত মহবুবের উপদ্রবে রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হ'তে পারে সেই আশঙ্কায় সে সন্ধ্যাকে ঘুমিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করছিল। রাত্রি কিন্তু নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। মহবুব ফিরল নেশা করেই বটে, কিন্তু এত বেশি রাত্রে এবং নেশায় এত বেশি বিবশ হ'য়ে যে গফুর এবং আমিনাকে দুচারটে গালিগালাজ ক'রেই সেই যে শয্যাগ্রহণ করল ঘুম ভাঙ্‌ল একেবারে সূর্য্যোদয়ের পরে।

কিন্তু ঘুম ভাঙার পরই তৎক্ষণাৎ সে ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। দ্রুতপদে গফুরের নিকট উপস্থিত হয়ে চিৎকার ক'রে ডাকলে, "গফুর!"

শান্তভাবে মহবুবের দিকে তাকিয়ে গফুর বললে, "কি?"

"রঘুকে আস্‌বার জন্যে তুই খবর পাঠিয়েছিস?"

"পাঠিয়েছি।"

"কেন?"

"আমি কিছুদিন বেনোড়িতে গিয়ে থাক্‌ব। তার আগে রঘুর সঙ্গে দেনা-পাওনা মিটিয়ে নিতে চাই।" বেনোড়িতে গফুরের প্রথম পক্ষের শ্বশুর বাড়ি।

মহবুব হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, "তুই বেনোড়িতেই যাস্ আর জাহন্নমেই যাস, কিন্তু আমাকে না ব'লে রঘুর কাছে লোক পাঠিয়েছিস্ কেন তার জবাব দে!"

"আমার খুসি।"

"খুসি? দেখাচ্ছি খুসি! যত সব শয়তান আর শয়তানী মিলে সল্লা চলেছে। দিচ্ছি সব এক সঙ্গে শেষ ক'রে!"

গফুর ধীরে ধীরে তার শয্যার উপর উঠে বস্‌ল; তারপর মহবুবের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে গভীর অনুত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লে, "আচ্ছা দিস্ শেষ ক'রে, কিন্তু তার আগে একটা কথা শোন্। কয়েকগাছা চুলে পাক্ ধরেছে ব'লে মনে করেছিস্ বুঝি, হাতের তাকৎ কিছু কমেছে? একবার তাকতের পরখটা হ'য়ে যাবে নাকি?" তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "ভুলে গেছিস যে, সব রকম কসরৎ আমার কাছেই শিখেছিলি। একবার হাতভাঙ্গা কসরৎটা মনে পাড়িয়ে দেবো নাকি?—চিরদিনের জন্যে ডান হাতটা জখম ক'রে দিয়ে? বাঁদর কোথাকার, তুই আমাকে শয়তান বল্‌তে সাহস পাস?—বেরো আমার সাম্‌নে থেকে!—"

মহবুবের মুখে এতক্ষণ চলেছিল পট্‌পটির আওয়াজ, তার কাছে এ যেন বোমা! তবুও এখনো ফাটে নি, ফাট্‌বার উপক্রম করেছে মাত্র। গফুরের জ্বলনোন্মুত ক্রোধের ভূমিকা দেখে তাকে আর অপমান করতে মহবুবের সাহস হল না; বল্‌লে, "আজ রাতে একটা ভারি কাজ প'চে ফেলেচি, তাই আজ আর কিছু হ'ল না,—কাল সকালে এসে হামিদাকে কল্‌মা পড়িয়ে সাদি করব। সঙ্গে থাকবে বৈজু মাঝির আটজন তীরন্দাজ, কেউ বাধা দিতে এলে, লুঠ্ ক'রে নিয়ে যাব হামিদাকে।"

গফুর হাঁক দিলে, "আমিনা!" স্বর কি গভীর! যেন শ্রাবণ মাসের আকাশের মেঘ গর্জ্জন!

আমিনা নিকটে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সামনে এসে বল্‌লে, "ভাইজান?"

"আমার ঘর থেকে ইস্পাতের তার জড়ানো লাঠিখানা এনে দে ত'।"

"কেন?—কি করবে?" আমিনার মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া।

গফুরের মুখে হাসি দেখা দিলে; বল্‌লে, "ভয় নেই তোর। লাঠি আজকে ব্যবহারের জন্যে নয়। কাল তীর ধনুক নিয়ে আটজন অতিথ্ আস্‌বে, তাদের খাতিরের জন্যে লাঠিটা একটু ঘুরিয়ে ঘারিয়ে রাখ্‌তে হবে ত!"

মহবুব বল্‌লে, "কিন্তু হুঁসিয়ার গফুর! সাদা তীর নয়,—তা'তে জহর মেশানো থাক্‌বে।"

গফুর বললে, "তা হলে ত আরো জবর! আমিনা একটু পাট্টা টাট্টা কিছু যোগাড় ক'রে দে, লাঠির তারগুলো চক্‌চকে ক'রে ফেল্‌তে হবে।"

গফুরের এই বেপরোয়া লঘু ব্যবহারে অপমানিত বোধ ক'রে মহবুব বিরক্ত হ'য়ে সেস্থান পরিত্যাগ করলে। যাবার সময়ে আরক্ত নয়নে ফিরে তাকিয়ে ব'লে গেল, "এর জবাব কাল সকালে দোবো।"

দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়ার পর আমিনার নিকট উপস্থিত হ'য়ে গফুর বল্‌লে, "আমি একটু বেরোচ্চি আমিনা, ফিরতে হয়ত দেরী হ'তেও পারে। তুই একটু হামিদার উপর নজর রাখিস।"

এ সময়টা সাধারণত গফুর বাড়িতে থেকেই বিশ্রাম করে, বাইরে যায় না। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে সে প্রায় সর্ব্বদাই বাড়িতে থাক্‌চে। তাই একটু কৌতূহলী হয়ে আমিনা জিজ্ঞাসা করলে, "এমন সময়ে কোথায় যাচ্ছ ভাইজান?"

গফুর মৃদু হেসে বল্‌লে, "শুন্‌লি ত কাল সকালে মহবুব লোকজন নিয়ে আস্‌চে। আমিও একটু ব্যবস্থা ক'রে রাখি। একা একা আটজনের সঙ্গে হয়ত এখনও আমি পারি, কিন্তু এক সঙ্গে আট জনের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। তাই দু চার জনকে ব'লে আস্‌চি,—কাছে কাছে থাক্‌বে, দরকার হ'লে আস্‌বে।"

চিন্তিত মুখে আমিনা বল্‌লে, "কাল তোমরা দুভায়ে সত্যি-সত্যিই একটা খুনোখুনি কাণ্ড করবে নাকি ভাইজান?"

"তা কি করব বল্? সে যে আমার সামনে হামিদার উপর জুলুম করবে, কিম্বা তাকে লুঠ ক'রে নিয়ে যাবে, এ'ক আমি হ'তে দিতে পারিনে! এ জুলুম ত' শুধু হামিদার উপরই জুলুম নয়,—এ আমার উপরও জুলুম।"

"আর কোনো উপায়ই কি এর নেই?"

মাথা নেড়ে গফুর বল্লে, "আর কোনো উপায়ই নেই।"

এ 'আর-কোনো-উপায়ের' অর্থ যে কি তা মনে মনে উভয়েই বুঝ্লে, এবং এ বিষয়ে বাদানুবাদ নিরর্থক হবে তা-ও বুঝ্তে পেরে উভয়েই সে আলোচনায় নিরস্ত হ'ল।

গফুর প্রস্থান করলে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'য়ে আমিনা বল্লে, "সন্ধ্যা, কি করছ?"

সন্ধ্যা বল্লে, "তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

উদ্বেগে কণ্ঠস্বর কম্পিত নয়, দুশ্চিন্তায় মুখ বিরস নয়। লক্ষ্য ক'রে আমিনা বিস্মিত হয়ে গেল। বললে, "সকালে বাড়িতে যে-সব কথা হয়ে গেল শুনেছ সন্ধ্যা?"

"শুনেছি।"

"তবে?"

"তবে কি বল?"

সন্ধ্যার এ প্রতি-প্রশ্নে আমিনা মনে মনে অপ্রতিভ হ'ল। সত্যিই ত' 'তবে' বল্বার কথা ত আমিনারই, সন্ধ্যার নয়। যে বন্দিনী, যে সম্পূর্ণভাবে অসহায় সে 'তবে'র কি জানে? বিস্ময়ের অসংযত অবস্থায় আমিনা বেফাঁস প্রশ্ন করেছে। কথাটা ঘুরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বললে, "কাল সকালে বাড়িতে একটা খুনোখুনি ব্যাপার হবে, কি ক'রে যে সাম্লাব, তা ভেবে কাঠ হয়ে গেছি।"

শান্ত স্বরে সন্ধ্যা বল্লে, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো ভাই, এই সামান্য একটা মেয়েমানুষের জন্যে তোমাদের বাড়িতে খুনোখুনি হবে, তা আমি কিছুতেই হ'তে দোবো না। কালকের ব্যাপার আমি সামলে নোবো।"

সবিস্ময়ে আমিনা বল্লে, "তুমি সামলে নেবে? কি ক'রে সন্ধ্যা?"

"যদি অন্য কোন উপায় না করতে পারি, কাল সকালে মহবুব এলে তার হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করব। বাবার মুখে প্রায়ই শুনতাম, যে-অবস্থাকে কিছুতেই আটকান যায় না তাকে জীবনের মধ্যে সহজভাবে গ্রহণ করতে হয়। আমিও ঠিক করেছি অদৃষ্টের সঙ্গে আর যুদ্ধ করব না।"

চকিতে একবার ঘরের চারিদিক দেখে নিয়ে আমিনা মনে মনে শিউরে উঠ্ল। জানালায় উঠে একটা নীচু বাঁশের আড়ায় শাড়ী বেঁধে ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়লেই উদ্বন্ধনের আর কোন আটক নেই। উদ্বিগ্ন মুখে বল্লে, "অন্য কোনো উপায়ের কথা কি বলছিলে সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বল্লে, "ও কথার কথা। বন্দী ক'রে যাকে একেবারে নিরুপায় ক'রে রেখেছ সে অন্য উপায় আর কি করবে ভাই। আচ্ছা আমিনা, আমাকে বাঁচাবার ত' অনেক চেষ্টা করলে, পারলে না; এখন মরবার জন্যে একটু সাহায্য করতে পার না? এমন একটু বিষ এনে দিতে পার না, যা খেলে তখনি মৃত্যু? তেমন উগ্র বিষ ত' কোল ভীলরা সঞ্চয় ক'রে রাখে শুনেচি।"

আমিনা একটু বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বল্লে, "যা-তা কথা বোলো না সন্ধ্যা।"

নির্ব্বন্ধসহকারে সন্ধ্যা বল্লে, "যা-তা কথা কেন ভাই? একজন পুরুষমানুষকে একথা বল্লে সে যা-তা কথা বল্তে পারত,—কিন্তু, আমিনা, তুমি মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের দুঃখ বুঝ্বে না ভাই? জীবন কি এতই মূল্যবান জিনিস যে, যে-কোনো অবস্থাতেই তাকে বাঁচিয়ে রাখ্তে হবে? তবে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এত লোক আত্মহত্যা করেছে কেন?"

আমিনা অন্যমনস্ক হ'য়ে মনে মনে কি ভাবছিল, হয়ত সন্ধ্যার সমস্ত কথাটা শুনতেই পায় নি, হঠাৎ তন্দ্রামুক্ত হয়ে বল্লে, "শোন সন্ধ্যা, আজ রাত্রে তোমাকে আমি এখান থেকে উদ্ধার করব মনে করেছি। শুধু মনে করেছি কেন, সে বিষয়ে অনেকটা ব্যবস্থাও করেছি, কিন্তু তার আগে এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটা সর্ত্ত আছে।"

হায়রে জীবন-মরীচিকার মোহময় দীপ্তি! কোথায় গেল নিজের দুরবস্থার প্রতি দুর্জ্জয় অভিমান, কোথায় গেল দৃঢ়নিবদ্ধ সঙ্কল্পের অবিচল স্থৈর্য্য! অধীরভাবে আমিনার দুই হাত দৃঢ়ভাবে ধ'রে সন্ধ্যা বল্লে, "আমি রাজি ভাই,

তোমার সর্ত্তে রাজি! আমি জানি তোমার সর্ত্ত আমার পক্ষে অমঙ্গলের হবে না। এখন বল, আমার উদ্ধারের কি উপায় করেছ।"

আমিনা বল্‌লে, "উদ্ধারের উপায় জেনে তোমার বিশেষ কোনো লাভ নেই, আমি তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দোবোই। কিন্তু সর্ত্তটা তোমার জানা উচিত।"

"কি সর্ত্ত বল ?"

"তোমার স্বামী, বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ী, তোমাকে ফিরিয়ে নিলে আমি যে কত খুসী হব তা তোমাকে বলবার দরকার নেই সন্ধ্যা,—কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ যদি তোমাকে ফিরিয়ে না নেন্, বাড়িতে স্থান না দেন, তা হ'লে তোমাকে আমার কাছে আমার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আস্‌তে হবে। পিঁজরেপোলে যেতে পারবে না।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার হাসি পেলে। এই সর্ত্ত! সে ফিরে গেলে যারা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যে ছাড়তে চাইবে না, তাদের সম্বন্ধে এই সর্ত্ত! সন্ধ্যা আনন্দের সঙ্গে বল্‌লে, "আমি তোমার সর্ত্তে রাজি আমিনা, কিন্তু পিঁজরেপোল বলছ কাকে ?"

আমিনা বল্‌লে, "গরু, মোষ, ঘোড়া—এই সব গৃহপালিত প্রাণীরা বুড়ো হয়ে অচল হ'য়ে গেলে তাদের পিঁজরেপোলে দেওয়া হয় তা' ত জান ?"

"হ্যাঁ, তা জানি।"

"সেখানে তারা যতদিন বেঁচে থাকে জীবন-ধারণের মত দানা-পানি পায়। আমার শ্বশুর বলেন, তোমাদের হিঁদুদের মাতৃমন্দির অবলা-আশ্রম নামে যে-সব ব্যাপার আছে সবই ঐ-সব হিন্দু মেয়েদের পক্ষে পিঁজরেপোলের মতন, যারা কোনো-না-কোনো কারণে সমাজের মধ্যে আশ্রয় পায় না। যত দিন বেঁচে থাকে সেখানে তারা ভাত-কাপড় পায়, হয়ত কিছু লেখাপড়া শেখে, হয়ত কিছু কাজ-কর্ম্মও করে, কিন্তু তা ছাড়া তাদের ও-জীবন মরণেরই সমান। মেয়েমানুষ যদি ছেলেপিলের মা হয়ে সংসার না করলে—তা হ'লে কি করলে বল ত ?"

অন্যমনস্ক হয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা সত্যি!"

আমিনা বল্‌লে, "আমার সর্ত্তের কথা আর একবার তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সন্ধ্যা। ফিরে গিয়ে তোমার শ্বশুর বাড়িতে কিম্বা বাপের বাড়িতে যদি তুমি স্থান না পাও তা হ'লে তোমাকে আমার শ্বশুর বাড়িতে ফিরে আস্‌তে হবে। আমার শ্বশুরকে তুমি জান না, অমন উদার লোক আমি আর একটি দেখিনি। তুমি সেখানে একেবারে পুরোপুরি নিজের ইচ্ছামত থাক্‌তে পারবে। যদি সে-বাড়িতে একটা পাকাপাকি ঠাঁই ক'রে নিতে ইচ্ছা কর, আমি আমার দেওর নাসীরের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিইয়ে তাও করে দিতে পারব। ভারী ভাল ছেলে, কল্‌কাতায় কলেজে পড়ে, একটি রত্ন। কিন্তু এ-সবই তোমার ইচ্ছে মত হবে। এখন বল তুমি রাজি কি-না।"

সন্ধ্যার মন তখন মুক্তির স্বপ্নে তন্দ্রিত; বল্‌লে "রাজি!"

"তা হ'লে তোমার উদ্ধারের জন্যে আমি যে ব্যবস্থা করেছি তা শোন। মহবুবের কথা শুনে তখনি আমি একটি বিশ্বাসী লোককে আমার শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছি। রাত্রে গরুর গাড়ি নিয়ে আমার স্বামী আসবেন। কোনো রকমে গফুরের চোখ এড়িয়ে তোমাকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দোবো, আপাতত আমার শ্বশুরবাড়ি। তারপর সেখান থেকে ব্যবস্থা ক'রে তোমাকে তোমার শ্বশুরবাড়ি পাঠাব।"

ব্যগ্রকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আর তুমি সঙ্গে যাবে না আমিনা ?"

আমিনা হেসে বল্‌লে, "আমি কাল সকালে দুই ভায়ের লড়াই দেখে সন্ধ্যার সময়ে যাব। মহবুব এসে যখন দেখ্‌বে চিড়িয়া পালিয়েছে তখন আমি না থাক্‌লে গফুরকে মহবুবের রাগ থেকে বাঁচাবে কে ?"

"আর তোমাকে কে বাঁচাবে ?"

"আমাকে যে বাঁচাবে সে সন্ধ্যেবেলা তোমার কাছে পৌঁছে তোমাকে দুই ভাইয়ের লড়ায়ের গল্প শোনাবে।" ব'লে আমিনা হাস্‌তে লাগ্‌ল।

রাত্রি তখন দশটা, পঞ্চা মাঝি এসে আমিনাকে জানালে যে, ইয়াসিন গাড়ি নিয়ে এসে ধুরিয়ার মোড়ে, অর্থাৎ আমিনাদের বাড়ি থেকে আধ মাইলটাক দূরে অপেক্ষা করছে। আমিনা দেখ্‌লে গফুর আহার ক'রে তার খাটিয়ায় শুয়ে আছে। একটু কাছে গিয়ে লক্ষ্য ক'রে মনে হ'ল

নিদ্রিত। তখন গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ত্বরিত পদে সে ইয়াসিনের নিকট উপস্থিত হ'ল।

ইয়াসিন্ বল্‌লে, "কি হুকুম আমিনা বিবি?"

আমিনা মৃদু হেসে বল্‌লে, "হুকুম, আমাদের বাড়ি হামিদা নামে যে মেয়েটি আছে আপাতত তাকে নিয়ে বাড়ি যাও।"

"তা'ত আন্দাজে বুঝেছি, কিন্তু তোমার দাদাদের লাঠি মাথায় পড়বে না ত?"

"লাঠির ভয় করতে গেলে বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করা যায় না।"

"তা যেন হ'ল, তুমি?"

"আমি? আমার জন্যে কাল গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো। আমি ঠিক বেলা এগারোটার সময়ে রওনা হবো।"

"তোমার নিজের মাথার কথা মনে আছে?"

আমিনা স্মিতমুখে বল্‌লে, "আছে। সে-বিষয়ে কোনো ভয় নেই, কাল সন্ধ্যাবেলা আস্ত মাথাই পাবে। আমি চল্‌লাম, এখনি হামিদাকে নিয়ে আস্‌ছি।"

আধঘন্টাটাক পরে সন্ধ্যাকে নিয়ে ফিরে এসে আমিনা বল্‌লে, "হামিদা ইনি আমার স্বামী। এঁর সঙ্গে নির্ভয়ে যাও, কোনো অসুবিধা হবে না।"

সন্ধ্যা যুক্তকরে ইয়াসিন্‌কে নমস্কার করলে।

ইয়াসিন প্রতি-নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি আমাদের বাড়ি যাচ্ছেন।"

আমিনা বল্‌লে, "ও-সব আদব-কায়দা তোমরা গাড়িতে উঠে কোরো। আমি এখন ফিরে চল্‌লাম। গফুরভাই জেগে ওঠ্‌বার আগে তোমাদের খুব খানিকটা এগিয়ে যাওয়া দরকার।" ব'লে প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই এমন একটা অচিন্তনীয় কাণ্ড ঘট্‌ল যে, যে যেখানে ছিল বিস্ময়ে এবং ত্রাসে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাশের বনের ঘন অন্ধকারের ভিতর থেকে মনুষ্য কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল, "গফুরভাই জেগেই আছে।" এবং পর মুহূর্ত্তেই এক দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্তি বেরিয়ে এসে আমিনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "কিরে আমিনা, এ যে চুরির উপর বাটপাড়ি দেখ্‌তে পাই!" কণ্ঠস্বরে এবং আকৃতিতে সকলেই গফুরকে চিন্‌তে পার্‌লে।

প্রথমে আমিনার গলা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তারপর কতকটা সাহস সঞ্চিত ক'রে সে বল্‌লে, "আমাকে মাপ কর গফুর ভাই!"

গফুর একটু হাসলে তারপর মৃদুস্বরে বললে, "মাফ আর কি করব। যা করেছিস এক রকম ভালই করেছিস, অনেকগুলো ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিলি। কিন্তু তুই যে এদের সঙ্গে যাচ্ছিস্‌নে, ফিরে চলেছিস্?"

আমিনা বল্‌লে, "কাল সকালে মহবুব যখন আস্‌বে তখন আমি তোমার কাছে থাক্‌তে চাই ভাইজান।"

"কেন? আমার হেফাজতে নাকি?"

আমিনা কোনো কথা না বলে চুপ ক'রে রইল।

এক ধমক দিয়ে গফুর বল্‌লে, "ভারি জ্যাঠা হয়েছিস দেখ্‌তে পাই! শীগ্‌গির ওঠ গাড়িতে! এতটা কাল লাঠি ছোরা চালিয়ে এসে এখন ছোট ভাইয়ের ভয়ে বোনের আঁচলের আড়ালে লুকোতে হবে!" তারপর ইয়াসিন্‌কে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, "তুমিও ত আচ্ছা লোক ইয়াসিন্ ভাই, নিজের মাথাটি বাঁচিয়ে স্ত্রীকে পিছনে ফেলে পালাচ্ছ!"

ইয়াসিন্ হাসতে হাসতে বল্‌লে, "কি করি বলুন, বাগ মানে কি? আপনাদের বাড়িরই মেয়ে ত!"

আমিনার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে গফুর বল্‌লে, "আমার জন্যে কোনো ভয় নেই। যা, গাড়িতে গিয়ে ওঠ।" তারপর সন্ধ্যার দিকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, "অনেক কষ্ট পেয়েছ হামিদা, সে-সব ভুলে যেয়ো, কিন্তু গফুর মিঞাকে একেবারে ভুলোনা।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একেবারে নত হ'য়ে গফুরের পদধূলি গ্রহণ করলে। কেউ তাকে আটকাতে পার্‌লে না, গফুরও নয়, আমিনাও নয়। তারপর সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে, "তোমার দয়ার কথা জীবনে কখনো ভুলবনা গফুর মিঞা!"

গফুর সন্ধ্যার মাথাটা নেড়ে দিয়ে বল্‌লে, "দয়া নয়, দয়া নয় বেটি! খোদা তোমার ভাল কর্‌বে। এখন যাও, গাড়িতে গিয়ে ওঠ।"

আরও দু'চারটা কথা হওয়ার পর ইয়াসিন, আমিনা ও সন্ধ্যা গরুর গাড়িতে উঠে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গ্রাম্য মেঠো পথ ভেঙে দবীপুরের দিকে অগ্রসর হ'ল। গাড়ী অদৃশ্য হ'য়ে গেল, কিন্তু চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ বহুক্ষণ ধ'রে শোনা যেতে লাগল। অবশেষে তাও যখন মিলিয়ে এল, তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গফুর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করল। অনেকগুলো দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পেলে বটে, কিন্তু বাড়ি পৌঁছে তার মনে হ'ল বাড়িটা যেন কোনো একটা সম্পদ থেকে সহসা রিক্ত হয়েছে। গফুর মনে মনে ভাবলে, জীবনে সে এই প্রথম দুর্ব্বলতার বশীভূত হ'ল। হয়ত বা এ কোনো নবতর নূতন পথেরই সূচনা! (ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভারতবর্ষ বিপজ্জনক অবস্থার দিকে যাইতেছে কি না

লণ্ডন হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে মেজর জেনারেল Sir John Megaw ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে ভারতের জনসংখ্যার অভিবৃদ্ধি ভারতকে যে বিশেষ বিপজ্জনক অবস্থার দিকে লইয়া যাইতেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন।

সার জন ভারতবর্ষের জনসমস্যা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবাসীদের স্বাস্থ্য, খাদ্য, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আমাদের উপকারে লাগিবে। সত্য অপ্রিয় হইলে, তাহা জানিবার প্রয়োজন ও মূল্য বেশী হয়।

ভারতের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, সে বৃদ্ধি যদি ভারতবর্ষের পোষণ ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা হইলে, দেশের লোকের ভরণপোষণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে। ১৯২১-৩১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর ৫০ লক্ষ করিয়া লোক বৃদ্ধি পাইতেছে এরূপ অনুমান করা হইতেছে। এই বৃদ্ধি কোন প্রকারে রুদ্ধ না হইলে, ৪১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটি হইবে। সার জনের মতে ভারতবর্ষ এমন অবস্থায় পৌছিয়াছে, যখন খাদ্যোৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যার বৃদ্ধি অধিকতর দ্রুতগতিতে হইতেছে।

প্রাচুর্য্যের মধ্যেই সভ্যতার জন্ম। আমাদের জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজনকে মিটাইয়া যাহা বাড়তি থাকে, তাহা হইতেই সভ্য জীবনের বর্দ্ধিত প্রয়োজনের দাবী মিটিয়া থাকে। কাজেই, আমাদের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বাড়িতে থাকিলে, বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই আমাদের সভ্যতা বিপন্ন হইবে।

অবশ্য ভারতের জনসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে শেষ সীমায় পৌছিয়াছে কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য, আমাদের কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি হইলে, উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, ব্যবসা বাণিজ্যাদি সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের হাতে আসিলে, বাহিরের শোষণ বন্ধ হইলে, আরও অধিক সংখ্যক লোক ভাল ভাবে প্রতিপালিত হইতে পারে কিনা তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জাতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, বিরলবসতি স্থান সমূহে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। এই প্রকার বিস্তৃতির জন্য বর্ত্তমানে ইংরাজীভাষীর সংখ্যা গ্রেট ব্রিটেনের জনসংখ্যার পাঁচগুণেরও অধিক হইয়াছে এবং এই ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি জগতে তাঁহাদের শক্তি ও মর্য্যাদা অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য জাতির পক্ষেও এই কথা অল্পাধিক পরিমাণে সত্য। জাপানও ঔপনিবেশিক বিস্তৃতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

ভারতবর্ষ অবশ্য অপরকে পীড়ন করিয়া, শোষণ করিয়া বা ধ্বংস করিয়া বড় হইতে চায় না। কিন্তু, এরূপ না করিয়াও ভারতবাসীরা কোন কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিতেন এবং প্রবেশ পথ রুদ্ধ না থাকিলে, বহু সংখ্যায় বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেন। কিন্তু, ক্ষোভ প্রকাশ করা ব্যতীত, বর্ত্তমান অবস্থায় কলোদায়ক কোন পথ অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা আমাদের নাই।

অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও মুসলমান তরুণ দল

জাতীয় স্বার্থের বিরোধী যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ, তাহা কখনও সমগ্র দেশের কল্যাণ বিধান করিতে পারে না। সব সম্প্রদায়েরই ভবিষ্যৎ উন্নতি সমগ্র দেশের অবস্থার উপর নির্ভর করে বলিয়া, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা পরিণামে কোন সম্প্রদায়ই লাভবান হইতে পারেন না।

আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও সঙ্ঘবদ্ধতা সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহাদের এই সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি তখনই মাত্র দেশের প্রকৃত সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবে যখন সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া এবং দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া সমগ্র দেশের কল্যাণ মূর্ত্তিখানি তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে সমগ্র দেশে নিদারুণ অন্ধতা বিরাজ করিতেছে সত্য কিন্তু, অন্ধকারের মধ্য হইতেই আলোক জন্মগ্রহণ করে। বাংলার মুসলমান তরুণদের মধ্যে, সংখ্যাল্প হইলেও একটি শক্তিশালী দল নিজ সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার যুক্তিবিরুদ্ধ সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন ও সমাজের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও উদার মনোভাব সৃষ্টির জন্য প্রাণপণ করিতেছেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে, সংস্কারপন্থী হিন্দু তরুণ দলের সহিত ইঁহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা নূতন ভাব চিন্তা ও প্রেরণা পাইয়া থাকি। কাজেই, সাহিত্য সেবাকে কেন্দ্র করিয়াই যে প্রধানতঃ এই দলটি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা স্বাভাবিকই হইয়াছে।

খুলনার মোস্‌লেম ক্লাব ও লাইব্রেরীটি এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। ইঁহাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান, মাসিক সাহিত্যিক অধিবেশন নানা প্রয়োজনীয় ও গুরু বিষয় সম্বন্ধে বিতর্কাদির ব্যবস্থা ইহার উদ্যোক্তাদের আগ্রহ কর্ম্মশক্তি ও প্রাণের পরিচয় প্রদান করে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতিষ্ঠানটি মুসলমান যুবকদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিলেও, ইহা খুলনার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সেতুর কাজ করিতেছে। ইহার বহুসংখ্যক হিন্দু সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক আছেন। দেশের প্রয়োজনের অথবা কোন ব্যাপক আকস্মিক বিপদপাতের সময়ও ইঁহারা সময়োপযোগী সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন।

সাহিত্য ও সমাজসেবার মধ্য দিয়া ইঁহারা স্বাধীন চিন্তা বিস্তারের ও নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা করিতেছেন, আশা করি তাহা জয়যুক্ত হইবে।

প্রতিষ্ঠানটির গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ইহার কর্ত্তৃপক্ষ একখণ্ড জমির সন্ধান করিতেছেন। খুলনার মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ বা সমাজ হিতৈষী কোন বদান্য ভদ্রলোক ইঁহাদের এই অভাব মোচন করিবেন, এরূপ আশা করা অন্যায় নহে।

দাঙ্গাকারী বলিয়া অভিযুক্তদের সম্মান

সংবাদপত্রে প্রকাশ মণীন্দ্র নগর (বেলডাঙ্গা) দাঙ্গা সম্পর্কে অভিযুক্ত মুসলমান আসামীরা যেমন আদালতের বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পাইবার পর চার পাঁচ শত লোকের জনতা, তাহাদিগকে বিপুল জয়ধ্বনি শোভাযাত্রা সহকারে, প্রধান হিন্দু বাড়ীগুলির পাশ দিয়া লইয়া গিয়াছে।

হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের পক্ষে গভীর কলঙ্কের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা প্রথম আক্রমণ করে অথবা উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাহারা কোন সম্প্রদায়েরই উপকার করে না। দাঙ্গায় অথবা মোকর্দ্দমায় যাহারাই জয়লাভ করুক তাহাতে প্রকৃতপক্ষে কাহারও উল্লসিত হইবার কারণ নাই; যদি সাময়িক উত্তেজনা বা ভুল-ধারণার ফলে, হাঙ্গামার সময় কাহারও এই কথা মনে রাখিবার মত শান্ত মানসিক অবস্থা থাকে না। কিন্তু, উত্তেজনার মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইবার পরও যাঁহারা এইভাব জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, কোন পক্ষকে উত্তেজিত করিবার, অপমানিত অথবা ক্ষুব্ধ করিবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের ব্যবহারের মধ্যে চ্যালেঞ্জের ভাব প্রদর্শন করেন তবে, তাহা উভয় সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহাতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এই প্রকার মনোভাব লোপ পায় তাহার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

কতকগুলি নির্দ্দোষ লোক অভিযুক্ত হইয়াছিল, এবং তাহারা মুক্তি পাওয়ায় অনেকে আনন্দিত হইয়াছিল এবং তাহারই

ফলে এই জনতা ও উল্লাস, ইহা বলিয়াও এই কার্য্যকে সমর্থন করা যায় না। কারণ যেখানে উভয় সম্প্রদায়েরই সাম্প্রদায়িক অভিমান জড়িত আছে, সেখানে উভয় পক্ষের ব্যবহারেই সংযম ও শোভনতা আবশ্যক। তাহা ছাড়াও এইরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপারে উপযুক্ত সাক্ষ্যাদির দ্বারা, অভিযুক্তেরা প্রকৃতপক্ষে দোষী হইলেও, তাহাদের দোষ প্রমাণ করা সব সময়ে সম্ভব হয়না। কাজেই, বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পাইলেও প্রকৃতপক্ষে সত্যের জয় হইল বলিয়াও এরূপ ক্ষেত্রে কাহাকেও অভিনন্দিত করা যায় না।

বর্ণের বাধা

অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রথম ভারতীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত ডি-এফ্-কারকা কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বক্তৃতায়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রকেই, সাধারণ ইংরেজ ছাত্র অপেক্ষা অনেক অধিক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়।

এসেম্ব্লিতে প্রশ্নকালে, আর্ম্মি সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত জি-আর-এফ টটেনহাম মিঃ এস-জি-জগকে জানান্ যে, বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অফিসারস্ ট্রেণিং কোরে ভারতীয় ছাত্রদের ভর্ত্তি করা হয় না; ইহা শুধু বিশুদ্ধ ইউরোপীয় রক্তজাত ব্রিটীশ প্রজাদের জন্য রক্ষিত। এই বাধা দূর করিবার জন্য ভারত সরকারের চেষ্টা ব্রিটীস বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনিচ্ছার জন্য সফল হয় নাই।'

'মানুষের জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ প্রভৃতি বৈষম্যের অন্তরালে যে ঐক্যের ধারা আছে, সভ্যতা শিক্ষা, ও চিন্তার বিকাশ তাহাকে উদ্ঘাটিত করে। বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষিত ভারতবাসী, জাপানী, তুর্কী, আমেরিকান অথবা ইউরোপীয়ের মধ্যে অধিক পার্থক্য নাই। যে সকল ভারতীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ব্রিটীস বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যান, তাঁহারা মনের গঠনে ইংরাজ ছাত্রদের হইতে খুব বেশী পৃথক নহেন। ইঁহাদের সহিত সমস্থানীয়ের ন্যায় ব্যবহার করা, ইঁহাদিগকে বন্ধু মনে করা বা উপযুক্ত সম্মান দান করা ইংরেজ ছাত্রদের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা হইয়াও থাকে। কিন্তু, শ্বেতাঙ্গজাতিদের বর্ত্তমান বর্ণ বিদ্বেষ এই প্রকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রসূত নহে।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর শ্বেতাঙ্গ জাতি সমূহ প্রধানতঃ এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষদের বর্ণবিশিষ্ট মানুষ বলিয়া থাকেন, যদিও প্রকৃত পক্ষে বর্ণের বৈষম্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। এই সকল লোকদের শোষণ করিয়া, শাসন করিয়া, তাহাদের দেশের নানাবিধ সম্পদ, তাহাদের শ্রমশক্তি, কর্ম্মশক্তি, ও ক্রয়ক্ষমতাকে নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া, ঐশ্বর্য্য ও ভোগের বর্ত্তমান আয়োজন শ্বেতাঙ্গজাতিদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীদের মনে ইউরোপের শিক্ষার আওতায় আসিয়া আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হইলে, তাহারা শিক্ষায়, নানাবিধ বিশেষ বিদ্যায় পারিদর্শিতায় এবং অন্য প্রকারের যোগ্যতায় শ্বেতজাতিদের সমকক্ষতা লাভ করিলে, পরিণামে শ্বেতজাতিদের স্বার্থহানি ঘটিতে পারে, এই ধারণা, শ্বেতজাতিদের মনে অশ্বেত জাতিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবুদ্ধিকে নানাপ্রকার অসদুপায়ে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই স্বার্থান্ধ সমষ্টিগত মনোবৃত্তি ব্যক্তিগত শুভ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও পরাভূত করে। যেখানে স্বার্থের সম্পর্ক যত অধিক, এই বৈষম্য ও বিদ্বেষ ও সেখানে তত প্রবল।

তাই বিলাতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে, ইংরেজের হাতে ভারতবাসীদের যে লাঞ্ছনা ঘটে, অন্যত্র বা অন্য জাতির হাতে ততটা ঘটেনা এবং ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অপেক্ষা ইউরোপের অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের সম্মান, শিক্ষার এবং এই সকল দেশের সামাজিক জীবনে স্থান পাইবার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেক অধিক।

একটি মেয়ের সৎসাহস

গুজরাটের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, বৈশাখী মেলা উপলক্ষে একটি অবিবাহিতা হিন্দু বালিকা, চন্দ্রভাগা নদীতে স্নানান্তে, অসমাপ্তস্নান তাঁহার মহিলাসঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় মুসলমান বলিয়া অনুমিত একদল গুণ্ডা বালিকাটির পাশ দিয়া চলিয়া যায় এবং তাহাদের

মধ্যে একজন অশ্লীল পরিহাস করিয়া বালিকাটির হাত চাপিয়া দেয়। বালিকাটি গুণ্ডাকে তৎক্ষণাৎ ধরিবার চেষ্টা করে এবং সে পলাইতে থাকিলে দ্রুত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। লোকটি দৌড়িবার সময় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যায় এবং বালিকাটি, তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ভাল রকম জুতা পেটা করিয়া দেয়। মেয়েটির সাহস শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষদেরও অনুকরণীয়। মেয়েরা এবং পুরুষেরা বিপদের সময় এইরূপ সাহসের পরিচয় দিতে পারিলে, অনেক নির্য্যাতন এবং গুণ্ডামির হাত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিতাম।

বাংলাদেশেও দুই একটি মেয়ে বিপদে পড়িয়া এইরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। যদিও পরে অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ ও নির্লজ্জ গুণ্ডামির হাতে অনেক ক্ষেত্রে ইঁহাদিগকে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তবুও তাহা কম প্রশংসার কথা নহে।

একটু অবান্তর হইলেও, এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশে মেলা, পর্ব্বাদি উপলক্ষে এবং সাধারণ সময়েও মেয়েদের প্রকাশ্য স্থানে স্নানের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা শীলতাবোধ ও সুরুচির পরিচয় নহে। যাহাতে কিছুমাত্র দোষ আসিতে পারেনা, মেয়েদের এমন গতিবিধির স্বাধীনতা দিতে আমরা অনেকে অনিচ্ছুক অথচ এই প্রকার ব্যাপার আমাদের রুচিকে আঘাত করে না।

বড়লাট মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কেন অস্বীকার করিলেন

অমৃত বাজার পত্রিকার এলাহাবাদস্থ বিশেষ সংবাদ দাতার ২৫শে এপ্রিল তারিখে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত একটি স্থানীয় কাগজে, বড়লাট মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে কেন অনিচ্ছুক, সে সম্বন্ধে একটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনটি কারণের জন্য বড়লাট নাকি মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে চান না। তাহার দুইটি হইতেছে যে, (১) শান্তি এবং মিটমাট সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় তিনি বিশেষ দক্ষ এবং পাকা লোক এবং (২) মুখোমুখি যে কোন কথাবার্ত্তায় তিনি সর্ব্বদা জয়লাভ করিয়া থাকেন।

যে সকল লাট এবং বড়লাট মহাত্মার প্রভাবে পড়িয়া এইরূপ ভুল করিয়াছেন, লর্ড উইলিংডন নাকি তাঁহাদের তালিকাভুক্ত হইতে চান না বলিয়া মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত নহেন।

ইহা সত্য কি না জানিনা। সত্য হইলে বলিতে হইবে, মহাত্মাজীর যে শক্তি এবং ব্যক্তিতে তাঁহার ভক্ত ও সহচরেরা বিশেষ আস্থাবান, তাঁহার সেই প্রভাব অপরপক্ষের অতিপ্রধান ব্যক্তিরাও অনুভব করিয়া থাকেন।

মহাত্মার যোগ্যতা সম্বন্ধে, তাঁহার দেশের লোকের মনে কোন সন্দেহ নাই এবং পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকদের নিকট হইতে তিনি সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আলোচ্য কথাটি সত্য হইলে, তাঁহার যোগ্যতা ও শক্তির ইহাপেক্ষা বড় প্রশংসা আর কিছু হইবে না।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আক্রমণ

বক্সারে ও যোশিদীতে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সনাতনীদের বর্ব্বরোচিত আক্রমণ সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মুখে হিন্দুধর্ম্মের মাথা নীচু করিয়া দিয়াছে এবং বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীকে হীন ও কলঙ্কিত করিয়াছে।

যে সকল ব্যাপারের নিন্দনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও মনে সংশয় থাকিতে পারে অথবা যে ক্ষতির পূর্ণ পরিমাণ সম্বন্ধে সকলের সঠিক ধারণা না হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহার বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

সকলেই সাধারণ ভাবে সনাতনীদের এজন্য দোষ দিতেছেন, কিন্তু সব সনাতনীর বা অধিকাংশ সনাতনীর এই প্রকার ব্যাপারের সহিত যোগ থাকিতে পারে, বা ইহাতে সমর্থন থাকিতে পারে, আমরা এমন কথা মনে করি না।

যদিও আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি, তাহা হইলেও মনে করি যে, সনাতনীদের নিজমত পোষণ করিবার, তাহা প্রচার করিবার এবং প্রয়োজন মনে করিলে শান্তভাবে অসন্তোষ

প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। কিন্তু, আমরা আশা করি, সনাতনীদের মধ্যে যে সকল ভাল লোক আছেন, তাঁহারা এই প্রকার কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিবেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই ধরণের ব্যাপার আর না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন, মহাত্মা প্রাণভয়ে তাঁহার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবেন, অথবা তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত হইবেন, অথবা এই প্রকারে তাঁহার মৃত্যু হইলে, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলন মন্দীভূত হইবে, তাহা হইলে মহাত্মার চরিত্র সম্বন্ধে অথবা ঘটনার গতি নিরূপণ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান বিশেষ অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে।

আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার

মহাত্মাজী স্বরাজলাভের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলন কংগ্রেসের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইলেও মহাত্মাজীই ইহার প্রবর্ত্তক এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই ইহার একমাত্র পরিচালক ছিলেন। কাজেই, আইনতঃ না হইলেও ন্যায়তঃ ইহা প্রত্যাহার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার আছে এবং আইনতঃ না হইলেও কার্য্যতঃ তিনি তাহা করিয়াছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে এবং ইহাতে তাঁহার সকল জিনিস তলাইয়া বুঝিবার এবং অকুণ্ঠিতভাবে সত্যকে স্বীকার করিবার শক্তি আর একবার প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বরাজলাভের জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রচেষ্টার ভার শুধুমাত্র তাঁহার উপর ন্যস্ত রাখিবার পরামর্শ দিয়া এবং তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অপর কোন ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত একমাত্র তাঁহার নির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়াই অপর সকলকে এই আন্দোলনে যোগ দিবার অধিকার দিতে চাহিয়াছেন।

এই আন্দোলন মহাত্মার ধর্ম্মবুদ্ধি ও সত্যোপলব্ধি হইতে প্রসূত; কাজেই, এই উক্তি তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইয়াছে।

কিন্তু, মহাত্মাজী, ব্যাপকভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া আমরা একথা মনে করি না যে, তাঁহার অনুমতি ও নির্দ্দেশ না লইয়া কেহ স্বরাজ লাভের জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, অস্ত্র স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। খুব নিপুণভাবে কোন কাজ সম্পন্ন না করিতে পারিবার আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া, কেহ প্রয়োজন মনে করিলে সেই কাজ করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না, ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। মহাত্মাজীর মত ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস না করিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী পন্থা বলিয়া নিরুপদ্রব প্রতিরোধের পথ কেহ অবলম্বন করিতে পারেন। মানবজাতিকে সত্যপথ দেখাইবার অধিকার সকল লোকেরই আছে; কিন্তু, সেই সত্য প্রয়োগের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করিবার অধিকার কাহারও নাই; সত্য আবিষ্কারকেরও নাই।

অবশ্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেস, মহাত্মাজীর সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

মহাত্মার বাংলায় আগমন

মহাত্মাজী শীঘ্রই বাংলায় আসিবেন। তাঁহার আগমনে দেশের মধ্যে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইলে, কর্ম্মীরা অধিকতর শক্তিও উদ্দীপনা লাভ করিলে, বাংলাদেশে যে আকারেই অস্পৃশ্যতা থাকুক তাহা দূর করিবার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইলে, তাঁহার কষ্ট স্বীকার সার্থক হইবে।

আমাদের সকল দলের এবং সকল মতের লোকের মনে রাখা দরকার যে, মহাত্মাজী জগৎবরেণ্য মহাপুরুষ, ভারতবর্ষের গৌরবকে তিনি বাহিরের লোকের নিকট বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং ভারতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য, তাঁহার ন্যায় এত অধিক ত্যাগস্বীকার এত সদা জাগ্রত চেষ্টা এবং এত অধিক প্রভাব বিস্তার আর কেহ করেন নাই। এই সর্ব্বপূজ্য অতিথির সম্মান রক্ষার দায়িত্ব বাঙ্গালী মাত্রেরই আছে। তাঁহার বিন্দুমাত্র অমর্য্যাদায় বিশ্বসভায় বাঙ্গালীর মাথা হেঁট হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

কবিকুঞ্জ

চিত্রলেখা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

লীলার ছলে বুলায়ে তুলি
আখর আঁক আবির ফুলি
রঙের ডালি আড়ালে খুলি'
যতনে।

উষায় তব চরণধ্বনি,
নূপুর ওঠে নিরবে রণি'
পুলকে ধরা কুসুম-মণি
রতনে।

সূর্য্যঢলা শীতল সাঁঝে
আঁধার-আলো-আভাস মাঝে
যুথিকা বেলা গন্ধরাজে
ভুলালে।

আঁকিছ যাহা অলখে কবি
পরশে তব শোভন সবি'
পরাণ ভরি' কি ছায়াছবি
বুলালে!

দেখেছি তব রঙের রেখা
গোপন লিপি, চিত্রলেখা
খুঁজেছি বৃথা, পাইনি দেখা
নয়নে।

কল্পলোক-সঞ্চারিণী
চপলগতি হে মায়াবিনী,
কী খেলা খেল রজনীদিনি
স্বপনে।

শিশুর চোখে কি আলোখানি
যতন ভরে দিয়েছ আনি,
কোমল মুখে কী কলবাণী
মাখালে;

নবীন-ননী-কোমল দেহে
চেতনা রস ঢালিলে স্নেহে,
কী উৎসব জননী গেহে
জাগালে।

কিশোর চিতে, যুবার বুকে
তুফান তোলো দুঃখে সুখে,
হরষে দেখ তা'দের মুখে
চাহিয়া।

নীরব প্যায়ে হে অপ্সরী
গোপনে ফির ভুবন ভরি'
স্বপনে তব কনকতরী
বাহিয়া।

স্বরগ সনে ধরারে গাঁথি'
দুখের বুকে বিলাসে মাতি
আসন তব নিলে কি পাতি
ধূলিতে?

সুধার আশে তৃষিত আঁখি
ধূলার ধরা বাঁধিল নাকি?
স্বরগে তবু এখনো বাকি
ভুলিতে

ফাগুনে তাই ক্ষণে ক্ষণে
চমকি জাগ কুসুম বনে
প্রলাপ কহ হাওয়ার সনে
আদরে।
বিষাদ-ঘন বেদন খানি
গগনে কভু হারায়ে বাণী
দু'চোখে আনে অশ্রু টানি
ভাদরে।
ভুলিতে তাহা, নদীর চরে
জ্যোছনা রাতে সোহাগ ভরে
স্বরগ পুরী ধূলির পরে
রচনা।
দু' হাত ভরি' কি বৈভব
লুটায়ে দিলে যা ছিল তব,
পুলক রাশি সুখোৎসব
কতনা !

নয়ন ভরি সলিল রাশি
ব্যথার বেগে জমিছে আসি,
সে ধারা জলে গিয়েছে ভাসি
আপনা
তাহারি মাঝে গোপন আশা
খুঁজে কি পেলো হারানো ভাষা ?
কেন এ নিশা সর্ব্বনাশা
যাপনা !
জীবন মহাসাগর তীরে
বিপুল আশা রয়েছে ঘিরে,
স্বপনপুরী খুলিয়া ধীরে
প্রভাতে,
সফল করি সকল দুখে
কামনা-শতদলের বুকে
কমলারূপা জাগিবে সুখে
শোভাতে

চাতুরী

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সংসারে সে কিছুই জানে নাকো
দেখায় যেন এমনি ভাবখানা,
মনেরও তার নাই কোনো নিশানা॥
আর কিছু যে রয়েছে আশেপাশে
না থাকে যদি কী-ই-বা যায় আসে,
কেহ যে আজি তারেই ভালোবাসে
তা-ও নাহি তার জানা॥

হাত দুখানি লতায় কোলে প'ড়ে,
দেয়ালে হেলি' আলসে অযতনে
ছবির মতো বসেছে সখীসনে।

সকলে সেথা কত না কথা কয়,
কত যে হয় ভাবের বিনিময়,
ওই কেবলি নীরবে চেয়ে রয়
নিরর্থ একটানা
অধীরা হয়ে রসিকা এক সখী
সবারে ছেড়ে তাহারি পাশে ঘে
ঈষৎ হেসে শুধালো বাঁকা হে
"বুঝেছি সখী বুঝেছি তোর দশা
ও এক ঢংয়ের ভঙ্গী ক'রে বসা,
চোখ দুটি তোর ও কোন্ রসে রসা,
আমরা কি সব কানা ?

ভিতরে কারে বিলাতে আপনাকে
সবার কাছে বাহিরে এত ছল,
কাহারে তুই খুঁজিস, খুলে বল্ !
ও তনু কার অলখ ফুলশরে
বিবশ হয়ে বিকল কলা করে,
ওকী ! ও ঠোঁটে হাসিটি কেন মরে,
বলিতে কি লো মানা ?"

দরদে ভরা পরিহাসের ঘায়ে
কোথা যে গেল উদাস অবসাদ,
কুয়াসা কেটে আকাশে উঠে চাঁদ।

বলে সে হয়ে সরমে জড়সড়,—
"তোদের সখী সবি কেমনতর,
পরের কথা ভাবিতে দায় বড়ো,—
নিজের কথাই নানা !"
কথার আড়ে লুকাতে নাহি পারে
চতুরা পাশে চতুরা পড়ে ধরা,
কী করা যায় করিতে মহাত্বরা !
ঘরের কৃপণ রেখেছে পুঁতে পুঁজি,
অপরে যেন পেয়েছে তাই খুঁজি,
তবু সে কাঁদে নূতন ছলা বুঝি,—
হেসে দেখি হয়রাণা !

পদ্মাপারের মাঝির গান

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

ভাসাইয়া নিলরে গাঁও, ভাইঙ্গ্যা নিল দেশ,
জনমের মত ছাড়তে হইল বাড়ী।
এমন ডাকাইত্যা নদী যেই দেশের থাকে
তার সাথে ভাই দিয়ো আগেই আড়ি।
ওরে ইলিশ মাছের বেপারী যাইওনারে পদ্মানদীর পাড়
ওসে, কত গাঁয়ের চোখের জল যে বুকে জমা তার,
উদাসী মন যে ঘোরে, বাপের ভিটা আস্‌তে নায়ে ছাড়ি !
এ পারে গাঁও কাঁন্‌ছে চেয়ে ওই পারেরি শোকে,
ছুইটা বোন যে ছিল কাছে পার করিল কে,—
ওরে আকাশ তারি মাঝে বইস্যা বিছায় নীলশাড়ী।
শাওনে তার জলের ডাকে গাঙের কাঁপে বুক,
মমিনপুরের চরে বইস্যা ভাবে অতীত সুখ,
পাড়ল 'বাও' যেই গাজীর নামে ধরল গাঙে পাড়ি।

নানা কথা

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই জীবন বীমা কোম্পানি ভারতবর্ষের জীবন বীমা কোম্পানিগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। বিগত ৫ই মে ১৯৩৪ সালে ভারতের সর্ব্বত্র ইহার হীরকজুবিলি অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। কলিকাতায় টাউন হলে এই জুবিলির অনুষ্ঠান হ'য়েছিল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

স্থানান্তরে প্রকাশিত এই কোম্পানির একটি বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায় এই কোম্পানি কেমন দৃঢ় পদক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্চে। আর্থিক জীবনে ইহা দেশবাসীর যে কতখানি আশ্রয়স্থল, তা সহজেই অনুমেয়। সুদক্ষ পরিচালনার জন্য এই প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জ্জন করতে সক্ষম হ'য়েছে।

বড়ই আনন্দের বিষয় যে এই পরিচালনার ভার কোম্পানির প্রথম পত্তন থেকেই ভারতীয়দের উপর ন্যস্ত ছিল এবং এখনো আছে। বর্ত্তমানে ইহার পরিচালক সংসদের সভাপতি,—সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস। এবং তাঁর অন্যান্য সহকারীরা, সকলেই ভারতবর্ষের ব্যবসায় জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। প্রথম পত্তন থেকে আজ পর্য্যন্ত বরাবরই ইহার পরিচালনার ভার ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের উপরই ন্যস্ত আছে।

১৯২৪ সালে এই কোম্পানির স্বর্ণ জুবিলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে এই দশবৎসরের মধ্যে ইহার যতখানি প্রসার হ'য়েছে, পূর্ব্বের কোনো দশকের মধ্যে ততখানি প্রসার হয়নি। ১৯২৩ সালে এই কোম্পানীর ছিল ১৪টি শাখা ও ৫টি চিফ্ এজেন্সি। গত দশ বৎসরের মধ্যে আরও ৫টি নূতন শাখা খোলা হ'য়েছে,—ঢাকায় ১৯২৩ সালে ; ত্রিচোনোপালী, ভিজিগাপাটম ও বোম্বাসায় ১৯২৯ সালে এবং পাটনায় ১৯৩১ সালে। এই নূতন শাখাগুলির প্রত্যেকটি থেকেই গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিস্তর নূতন কাজ এসেছে, তবে ঢাকায় শ্রীযুক্ত বি-ডি-দাশগুপ্তের কর্ম্মকুশলতায় পূর্ব্ব ভারত থেকে যে পরিমাণ কাজ এসেছে, তা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। একথা থেকে কেউ যেন না মনে করেন, যে এই নূতন শাখাগুলিই বিগত দশকের সন্তোষজনক প্রগতির একমাত্র কারণ,—বিগত দশকের প্রারম্ভের আগে থেকেই যে সমস্ত শাখাগুলি বর্ত্তমান ছিল, সেগুলি থেকেও কর্ম্মস্রোত খরগতিতেই প্রবাহিত হ'য়েছে,—এবং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কর্ম্মের আয়তন বিপুল থেকে বিপুলতরই হ'য়েছে। এই কর্ম্ম-প্রবাহের আয়তন সম্বন্ধে সাধারণের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বোধ হয় সম্ভব নয়, তবে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি থেকে কতকটা আন্দাজ করা যেতে পারবে। বোম্বের প্রধান কার্য্যালয়ে দৈনিক দেশীয় ডাকযোগের কাগজপত্র মোটামুটি ৮০০০। সম্প্রতি একদিন দেশীয় ডাকযোগে যে কাগজপত্র এসেছিল, তার সংখ্যা ১০,০৬৭। তন্মধ্যে ৪,০৭৬ খানি ছিল চিঠি। গত বৎসর বীমার প্রস্তাব এসেছিল ৫৫,২৮০ খানি। তন্মধ্যে বীমা প্রস্তুত ও নিষ্পন্ন হ'য়েছিল—৩৮,১৯১ খানি। যে সকল বীমাকারীদের গত বৎসর ঋণ দেওয়া হ'য়েছিল, তাঁদের সংখ্যা ১১,৮৯১। দাবীর সংখ্যা মেটানো হ'য়েছিল ৩,৭২৮ খানি।

এইখানে একটা কথা বোধ হয় অপ্রসাঙ্গিক হ'বে না,—গত দশ বৎসরের মধ্যে মৃত বীমাকারীদের উত্তরাধিকারীদের দেওয়া হ'য়েছিল তিন কোটী সাতান্ন লক্ষ টাকা। এবং মেয়াদান্তে জীবিত বীমাকারীদের দেওয়া হয়েছিল তিন কোটী তেবট্টি লক্ষ টাকা। বৃদ্ধবয়সে কর্ম্মাবসরে যখন উপার্জ্জন বন্ধ হ'য়েছিল তখন এই অর্থ যে কতলোকের উপকার সাধন করেছে, তা' সহজেই অনুমেয়।

১৯২২ থেকে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তিনটি ত্রৈবার্ষিক হিসাব নিকাশের পর কোম্পানির লাভের অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ২ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকা বীমাকারীদের দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বোনাসের হার অনেক বৃদ্ধি করা হ'য়েছিল। ১৯২২ সালে মেয়াদী বীমায় ও সারাজীবন বীমায় প্রতি হাজার করা ৮৲ ও ১০৲ টাকা হারে বোনাস দেওয়া হ'য়েছিল,—১৯৩১ সালে দেওয়া হ'য়েছিল ২০৲ ও ২৫৲ টাকা হারে।

১৯২৩ সালে কোম্পানিতে সবশুদ্ধ চলতি বীমা ছিল ৮৮,১৪৭টি। ১৯৩৩ সালে চলতি বীমা ছিল তার প্রায় তিন গুণ, অর্থাৎ ২,৩২,০২৯টি। বীমার পরিমাণ ছিল ১৯২৩ সালে ১৭ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা, ১৯৩৩ সালে ৪৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। বৎসরের নূতন কাজের দিক্ থেকে দেখলেও এই কোম্পানির প্রগতি অতীব সন্তোষজনক। ১৯২৩ সালে নূতন বীমা নিষ্পন্ন হ'য়েছিল ৭,৭৯০টি, পরিমাণ ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। ১৯৩৩ সালে নূতন বীমা নিষ্পন্ন হ'য়েছিল ৩৮১৯১ টি, পরিমাণ ৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। বৎসরের নূতন কাজের দিক দিয়ে বিচার করলে ১৯৩৩ সালে অরিয়েণ্টাল দেশী ও বিদেশী সমস্ত বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছিল। ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

পরলোকে সার শঙ্করণ্ নেয়ার

সার শঙ্করণ্ নেয়ারের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন কৃতী নেতা হারালো। অবশ্য তাঁর বয়স হ'য়েছিল প্রায় সাতাত্তর কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বর্ত্তমান যুগে তাঁর মত একজন প্রতিভাবান কর্ম্মীর নেতৃত্ব হারানো কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়। প্রাগ্-গান্ধী যুগের কংগ্রেসের তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সভ্য; এবং সেই যুগের কংগ্রেসের সভাপতির আসন লাভের গৌরবের তিনি অধিকারী হ'য়েছিলেন। যদিচ অন্যান্য কয়েকজন নেতার সঙ্গে তিনিও শেষ জীবনে তাঁর জনপ্রিয়তা কথঞ্চিৎ হারিয়েছিলেন, তথাপি তাঁর স্বদেশ-প্রাণতা, ঐকান্তিক দেশসেবা এবং অসাধারণ প্রতিভার কথা দেশবাসী ভোলেনি এবং কোনদিন ভুলবে না। পাঞ্জাবে সামরিক আইন প্রবর্ত্তনের প্রসঙ্গেই বড়লাটের মন্ত্রণা সংসদের সভ্য পদত্যাগের কথা দেশবাসী চিরদিন মনে রাখবে। সাইমন কমিশনের সংগঠন ও সন্তাব্যতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কিছুমাত্র ছিল না, তথাপি তিনি সেই প্রসঙ্গে ভারতীয় স্ট্যাটুটারি কমিশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বার্থ-বিরুদ্ধ কোন কিছু ঘটায় যতটা সম্ভব বাধাপ্রদান করা। শুধুই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়,—শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও শঙ্করণ নেয়ার অনেক কিছু করেছিলেন। আইনজ্ঞ ও মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবেও তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হ'য়েছিলেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি-কামনা করি।

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন হিসাবে পঁচিশে বৈশাখ তারিখটি বাঙালীর দিন-পঞ্জিকায় চিরস্মরণীয় হ'য়ে রইল। এবার কবি ৭৩ বৎসর সম্পূর্ণ করে ৭৪ বৎসরে পদার্পণ করলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করে আমরা তাঁর চরণে প্রণাম করি।

কবি এখন সিংহলের অতিথি। সিংহল দ্বীপটিকে সভ্যতা ও কৃষ্টির দিক দিয়ে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলেই ধরা যেতে পারে। আমরা আশা করি এবার কবির জন্মদিনে তাঁকে কাছে পেয়ে সিংহলবাসীর মনে ভারতবর্ষ ও সিংহলের গভীর ঐক্যের নিবিড় উপলব্ধি ঘটবার সুযোগ হ'ল।

পোলা নেগ্রি ও উদয়শঙ্কর

নিউ ইয়র্কের ইণ্টারন্যাশনাল লিটারারি এক্সচেঞ্জ থেকে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি পেয়েছি,—বিচিত্রার পাঠক-বর্গের জন্য তা' বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া গেল।

"স্বর্গীয়া এনা পাভ্লোভার পোলা নেগ্রি একজন পরম ভক্ত। ১৯২৩ সালে যখন পাভ্লোভার ভারত-নৃত্য গুলিতে উদয়শঙ্কর ছিলেন তাঁর নৃত্য-সহচর, তখনই শ্রীমতী নেগ্রির সঙ্গে উদয়শঙ্করের প্রথম সাক্ষাৎ কালিফোর্ণিয়াতে।"

পোলা নেগ্রি ও উদয়শঙ্কর

সম্প্রতি চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে' হলিউড যাওয়ার পথে য়ুরোপ থেকে নিউ ইয়র্কে ফিরে শ্রীমতী নেগ্রি শুনলেন—সেণ্ট জেম্‌স' থিয়েটারে উদয়শঙ্করের নৃত্যাভিনয় হচ্চে। তখনি নিজের জন্য ও কয়েকটি বন্ধুর জন্য একখানি বক্স নিয়ে ফেললেন।

প্রথম বিরতির সময়েই শ্রীমতী নেগ্রি রঙ্গমঞ্চের পিছনে গিয়ে উদয়শঙ্করকে ঐকান্তিক অভিবাদন করে বললেন,—

"এমন একটা পুলক আমার বহু বৎসরের শিল্প অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেকদিন পাইনি, সত্য বলতে কি আনা পাভ্লোভার মৃত্যুর পর থেকেই আর এমন পুলক অনুভব করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। মৃত্যুর পূর্ব্বে পাভ্লোভার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি বলে আমি বড়ই দুঃখিত। আপনি জানেন আমি তাঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করতাম।"

উদয়শঙ্কর আবেগ ভরে বললেন, "হ্যাঁ আমি তা জানি, এবং আপনি জানেন আমিও কতখানি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। আমার ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে আমি একদিনও তাঁকে নাচ দেখাতে পারিনি সে জন্য আমিও একান্ত দুঃখিত।"

"আমি যাব ভারতবর্ষে, এবং আশা করি সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

"ভারতবর্ষে আপনাকে অভিবাদন করবার সৌভাগ্য হলে আমি বড়ই সুখী হবো, এবং আমাদের শিল্পের অতুলনীয় গৌরবরাজি আপনাকে দেখাতে পেরে বিশেষ আনন্দিত হবো।"

শ্রীমতী নেগ্রি অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন; এবং শেষ পালা তাণ্ডব নৃত্য যখন শেষ হোলো তখন উঠে দাঁড়িয়ে বারে বারে পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে প্রাণ ভরে শঙ্করকে অভিনন্দিত করতে লাগলেন এবং শঙ্করও দণ্ডায়মানা তাঁকে বারে বারে নমস্কার করতে লাগলেন। তারপর যখন শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার রায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাণ্ডব নৃত্য কেমন লাগল, তখন তিনি দ্বিধাহীন সুরে জোরের সঙ্গেই বললেন:

"চমৎকার! সত্য কথা বল্‌তে কি তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গচালনা চমৎকার, চমৎকার! শঙ্কর একেবারে দেবোপম, জ্যোতিষ্মান্। এর বেশি কিছু বল্‌তে পারি না। এর কমও কিছু বল্‌তে পারি না। শঙ্কর দেবোপম, জ্যোতিষ্মান্।"

কুমারী সাবিত্রীরাণী খণ্ডেলওয়ালা

আট বৎসর বয়সের বালিকা কুমারী সাবিত্রী খণ্ডেলওয়ালা গত ২৯শে এপ্রিল ১৯৩৪ হেদুয়া পুষ্করিণীতে ১৫

সাবিত্রী খান্দেলওয়ালা

ঘণ্টা ব্যাপী সহন সন্তরণ দিয়ে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর বয়সের কোন প্রতিযোগী এ পর্য্যন্ত এরূপ দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হননি। ৬টা ৪৫ মিঃ প্রাতঃকালে সাবিত্রী জলে অবতরণ করেন এবং রাত্রি ৯টা ৪৬ মিনিটে জল থেকে উত্থিত হন। তাঁর শিক্ষাগুরু বিশ্বজয়ী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষের সহিত সাবিত্রী গত বৎসর রেঙ্গুন গিয়ে হাত পা দুই-ই আবদ্ধ করে কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী সাঁতার কেটে রেঙ্গুনের মেয়রের নিকট হতে একটি সুবর্ণ পদক লাভ করেছিলেন। এই বয়সেই এত অসামান্য দক্ষতা দেখে মনে হয় যথাকালে সাবিত্রী একজন বিরাট সাঁতারু রূপে পরিণত হবেন।

আমরা কুমারী সাবিত্রী খণ্ডেলওয়ালাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকিশোর দত্ত রায়

জার্ম্মানীর টেক্‌নিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে Fuel technologyতে উচ্চ গবেষণার কর্ম্মা ক'রে শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকিশোর দত্ত রায় ডক্টর. অফ্ ইঞ্জিনিয়ারিং (Dr. Ing.) ডিগ্রি লাভ করেছেন। ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্ এস্ সি ডিগ্রি লাভ করে ঐ বৎসরই রুক্মিণীকিশোর টাটা আয়রণ ওয়ার্কসে রিসার্চ কেমিষ্ট নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি Low temperature carbonisation of coals, Recovery of by-products এবং Stock coal প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করেন। তৎপরে ১৯৩১ সালে অক্টোবর মাসে জার্ম্মানীর Deutsche Akademie হ'তে বৃত্তি লাভ ক'রে তিনি Fuel technology বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য জার্ম্মানী যাত্রা করেন। তথায় হেনোভার
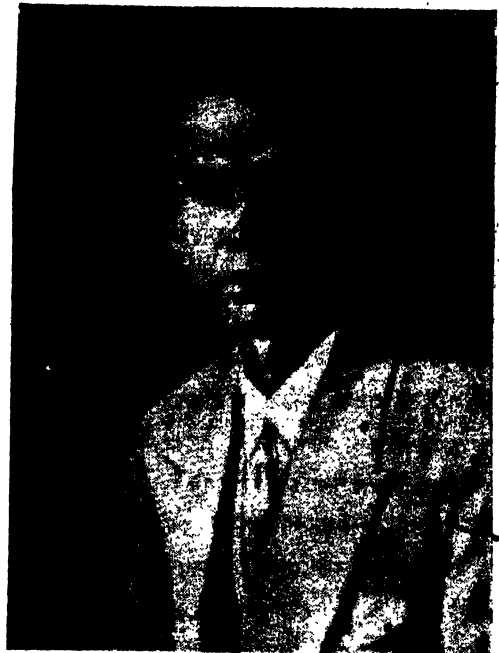
শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকিশোর দত্ত রায়

টেক্‌নিকাল ইউনিভার্সিটির সুবিখ্যাত প্রফেসার এবং টেক্‌নোলজিকাল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টার কেপলারের অধীনে ভারতীয় কয়লা সম্বন্ধে গবেষণামূলক কার্য্য ক'রে উক্ত দেশীয় সর্ব্বোচ্চ ষ্টেট ডিগ্রি Dr. Ing লাভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে ডক্‌টার দত্তরায়ই সর্ব্ব প্রথম এ ডিগ্রি লাভ করলেন। প্রফেসর কেপলার ইঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ইঁহাকে আপন Assistant রূপে কাজ করবার অনুমতি দেন।

ডাক্তার দত্তরায় জার্ম্মানীর আধুনিক উন্নততর বহু Coke-ovens (কোক চুল্লী) ও Gas works এর কার্য্যাবলী সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। ইনি ময়মনসিংহ জিলার অধিবাসী। সম্প্রতি দেশে প্রত্যাগমন ক'রে পুনরায় টাটার লৌহ কারখানায় যোগদান করেছেন।

আমরা এই উন্নতিশীল যুবকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

লিলুয়া ই-আই রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট

বিগত ২৮শে এপ্রিল ১৯৩৪ লিলুয়া ই-আই রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে একটি সান্ধ্য সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কণ্ঠ-সঙ্গীত যন্ত্র-সঙ্গীত, রসাভিনয় প্রভৃতি বহুবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। "সঙ্গীতে বাক্য ও কাব্যের পরিমাণ" বিষয়ে বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক একটি স-গীত প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল। কলিকাতা হতে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ইনষ্টিটিউট সংলগ্ন পাঠাগারটি দেখে আমরা অতিশয় সুখী হয়েছিলাম। প্রয়োজন হিসাবে পাঠাগারে পাঁচটি বিভিন্ন ভাষার বই রক্ষিত হয়েছে। পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও পুস্তক নির্ব্বাচন ও রক্ষণ প্রণালীর সুখ্যাতি করতেই হয়। ইনিষ্টিটিউট ভবনটি সুদৃশ্য, পরিচ্ছন্ন, যত্ন-রক্ষিত। পশ্চিম দিকে নাট্যমঞ্চটি বিস্তৃত, সুপরিসর। ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্তের এবং অপরাপর কর্ত্তৃপক্ষের আদর আপ্যায়ন যত্ন সমাগত অতিথি-গণকে বিমুগ্ধ করেছিল।

আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তার প্রতি আক্রমণ

জগদীশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে বাংলার গভর্ণর বাহাদুর দার্জ্জিলিঙের লেবঙ ঘোড় দৌড়ের মাঠে বিপ্লববাদীর গুলি থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি, এবং প্রার্থনা করি যেন তিনি দীর্ঘজীবি হোন্।

বিপ্লববাদীদের পন্থা যে ভ্রান্ত, নিষ্ফল, কাপুরুষোচিত, ঘৃণ্য, তা ইতিপূর্ব্বে আমরা তাদের দুষ্কার্য্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দেশ-নেতারা এবং সাময়িক পত্র সমূহ সকলেই একবাক্যে বিপ্লব পন্থার তীব্র প্রতিবাদ করে আসছেন। সরকারের তরফ থেকে বিপ্লব দমনের জন্য আইনেরও ত অন্ত নেই। তথাপি এই দুর্নীতি ভারতবর্ষের মত দেশ থেকেও অপসারিত হচ্চে না, এ পরম পরিতাপের বিষয়। যে বালকেরা ঐ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল তারা ত অপূর্ণ বয়স্ক; তাদের চেয়েও তাদের ঐ কর্ম্মে প্ররোচিত করেছে যারা তাদের প্রতি অসীম ঘৃণা জ্ঞাপন ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারি না। বাক্যজাল বুনে আর কোন লাভ নেই।

মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোং'র ক্যালেণ্ডার

ভবানীপুর কলিকাতার সুবিখ্যাত জুয়েলার্স এবং ব্যাঙ্কার্স মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানীর একটি সুদৃশ্য ওয়াল ক্যালেণ্ডার পেয়ে আমরা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259 Upper Chitpore Road. and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

প্রতীক্ষা

আষাঢ়, ১৩৪২

শিল্পী— শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম বর্ষ, ২য় খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৪১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

THE BIRD OF FIRE

SRI AUROBINDO

Gold-white wings a throb in the vastness, the bird of flame went glimmering over a sunfire curve to the haze of the west,
Skimming, a messenger sail, the sapphire-summer waste of a soundless wayless burning sea.
Now in the eve of the waning world the colour and splendour returning drift through a blue-flicker air back to my breast,
Flame and shimmer staining the rapture-white foam-vest of the waters of Eternity.

Gold-white wings of the miraculous bird of fire, late and slow have you come from the Timeless. Angel, here unto me
Bringest thou for travailing earth a spirit silent and free or His crimson passion of love divine,—
White-ray-jar of the spuming rose-red wine drawn from the vats brimming with light-blaze, the vats of ecstasy,
Pressed by the sudden and violent feet of the Dancer in Time from his sun-grape fruit of a deathless vine?

White-rose-alter the eternal Silence built, make now my nature wide, an intimate guest of His solitude.

But golden above it the body of One in Her diamond sphere with her halo of star-bloom and passion-ray !

Rich and red is thy breast, O bird, like blood of a soul climbing the hard crag-teeth world, wounded and nude,

O Flame who art Time's last boon of the sacrifice, offering-flower held by the finite's gods to the Infinite,

O marvel bird with the burning wings of light and the unbarred lids that look beyond all space,

One strange leap of thy mystic stress breaking the barriers of mind and life, arrives at its luminous term thy flight ;

Invading the secret clasp of the Silence and crimson-Fire thou frontest eyes in a timeless Face.

17-10-33 SRI AUROBINDO

বিহঙ্গ-বহ্নি

[The Bird of Fire ইংরাজি কবিতার অনুবাদ]

স্বর্ণ-শুভ্র পর্ণ-যুগল বৃহতের বুকে স্পন্দন-রেখা—ও যে বিহঙ্গ-বহ্নি সৌর-অগ্নির কক্ষা ধরে জ্বলতে জ্বলতে চলে গেল অস্তের কুহেলি মধ্যে,

বাণীবহ পালখানি সে গেল চলে শব্দহীন পথহীন সাগরের ইন্দ্রনীল-নিদাঘ-প্রতিম মরুবিস্তার বেয়ে বেয়ে।

ক্ষীয়মাণ জগতের এই সন্ধ্যায় ফিরেছে বর্ণসম্ভার, ফিরেছে ঐশ্বর্য্য—তারা বাতাসের নীলছটা অতিক্রম করে ভেসে এসেছে আমার বক্ষ অবধি—

আগুনের শিখায়, আলোর বিচ্ছুরণে শাশ্বতের অম্বুরাশি 'পরে আনন্দ-শুভ্রায়িত ফেনচ্ছদ রঙীন হয়ে উঠেছে।

স্বর্ণ-শুভ্র পর্ণ-সুন্দর, হে অপরূপ বিহঙ্গ-বহ্নি, বেলাশেষে ধীরে তুমি এসেছ কালাতীতের পার হতে। হে দেবদূত ! এই হেথায় আমার কাছে,

তপোনিভ পৃথিবীর তরে এনেছ কি মুক্ত সমাহিত অতীন্দ্রিয় আত্মাকে, না, এনেছ ভগবানের ভাগবত আরক্ত আবেগ ?

ফেনোজ্জ্বল কমলরক্তিম মদিরার শুভ্রকিরণ কলস তুমি—জ্যোতির তপ্ততেজে আকণ্ঠপূর্ণ কুণ্ড হতে, পরম আনন্দেরই আপন কুণ্ড হতে যে মদিরা আহরিত,

যে মদিরা অভিষুত কালারূঢ় নটরাজের আচম্বিত তাণ্ডব পদক্ষেপে, মৃত্যুঞ্জয়ী কোন্ লতায় ফলিত তাঁরই তপন-সার দ্রাক্ষা হতে।

হে শ্বেত-কমল বেদি! সনাতন নৈঃশব্দ্য গড়েছে তোমায়—বিস্তীর্ণ করে ধর তবে আমার প্রকৃতি, কর আমাকে তাঁর নিঃসঙ্গতার অন্তরঙ্গ অতিথি—।

কিন্তু আরও ঊর্দ্ধে রয়েছে রহস্যময়ী কার তনু, তাঁর হীরক-দীপ্র লোকে—নক্ষত্রের আভায়, তীব্র আবেগের রশ্মিজালে গড়ে দিয়েছে তাঁর প্রভামণ্ডল।

হে বিহঙ্গ! কঠোর জগতের দংষ্ট্রায়িত শৃঙ্গে উঠে চলেছে যে অনাবৃত ক্ষতাক্ত হৃদয়, তারই শোণিতের মত তোমার বক্ষ সান্দ্র শোণ;

চন্দ্রমা-প্রান্তক রাত্রি আর উদীয়মান দিবসের সঙ্গমে যে রজত-রুক্ম বেদি-ভৃঙ্গার, তারই অন্তরে তুমি অগ্নিশিখাপল্লবে প্রস্ফুটিত প্রেমের পদ্মরাগমণি।

হে শিখা! কালপুরুষের যজ্ঞ হতে সর্ব্বশেষে উদ্ভব তোমার—সান্তের দেববৃন্দ অনন্তের উদ্দেশ্যে তোমাকেই অর্ঘ্যপুষ্পরূপে ধরে রয়েছে।

হে অনুপম বিহঙ্গ! তোমার পক্ষ আলোকে প্রজ্বলিত, তোমার অর্গলমুক্ত দৃষ্টি পড়েছে গিয়ে বিশ্বব্যোমের ওপারে;

তোমার অনির্ব্বচনীয় আবেগের অপূর্ব্ব একটি মাত্র টানে, মনের প্রাণের জাঙ্গাল সব ভেঙ্গে দিয়ে, তোমায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে তার জ্যোতিষ্মান লক্ষ্যে—

তুমি প্রবেশ করেছ গিয়ে স্তব্ধ সমাহিতির, রক্তোজ্জ্বল বহ্নিদেবের নিবিড় আশ্লেষের মধ্যে—কালের অতীত একখানি মুখের সাক্ষাৎ সম্মুখী হয়েছ তুমি।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

গীতিকবি অতুলপ্রসাদ

শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ

হিন্দুস্থানী সুরের প্লাবনে যে শাব্দিক কবিত্বের কচুরীপানার দুর্ব্বার ব্যাপকতায় আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যক্ষেত্র আজ আক্রান্ত, অতুলপ্রসাদের গীতাবলী তাহার সগোত্র নয়।

গোত্রের এই ভিন্নতাটুকু একদিকে যেমন কৌলীন্যজ্ঞাপক বাংলা গীতিকাব্যের পক্ষেও তেমনি তাহা কল্যাণকর। মাত্র গুটীকয় গান বা গীতাংশ কাব্যরসজ্ঞ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলেই, এ সত্য স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কারণ সৌন্দর্য্যানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে, সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া চিনিয়া লইবার জন্য ঐ দর্শনটুকুই যথেষ্ট। অপর পক্ষে, বিভিন্ন মতবাদের কচ্‌কচিতে কাব্যের সহজ মাধুর্য্য ও অর্থকে আচ্ছন্ন ও দুর্ব্বোধ্য করিয়া তোলা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু রসতৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা আলোচনার মধ্যে নাই। আলোচনা আস্বাদিত রসের কতকটা ইঙ্গিত-মাত্র করিতে পারে, এতদধিক কিছুই নহে। বস্তুতঃ যুক্তি দ্বারা সৌন্দর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা কতকটা যেন প্রকৃতি-অভিশপ্ত সুরতালহীনকে অঙ্কের সাহায্যে সঙ্গীত-রসিক করিয়া তোলার জবরদস্তির মতই।

গীতিকাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। গীতিকবিতার ভাষা সাধারণ কবিতার ভাষার মত সর্ব্বাংশে আভিধানিক নয়। প্রয়োজন মত সুর-রূপ ভাষার সাহায্য লইয়া তবে গীতিবাণীকে বাক্যাতীত করিতে হয়। ভাষা ও সুরের এই প্রয়োজনানুসারিণী সংমিশ্রণ-নৈপুণ্যই গীতিকবির বৈশিষ্ট্য; এবং এই মিশ্রণ ব্যাপারে কোন্‌টা হইতে কে কী অনুপাতে গ্রহণ করিবেন, তাহা কবি বিশেষের অভিরুচির উপর নির্ভর করে। কবি-গুরুর সুরের অভিনবত্বটুকু মানিয়া লইলেও, রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে কাব্যপ্রধান না বলার কোনো হেতু নাই। ব্যঞ্জনার অনন্ত-সাধারণত্বই বৌধহয় তাহার কারণ, এবং সে জন্যই তাঁহার গানগুলি পড়িতে পড়িতে পাঠকচিত্তে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়তা আন্দোলিত হইয়া ওঠে। কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানে সুরাংশের অবদানই সমধিক। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় সঙ্গীতকেন্দ্রে বাস করার প্রভাব। এই প্রভাব-প্রাবল্যে তিনি কথনো কথনো কাব্যরীতি সজ্ঞানে লঙ্ঘন করিয়াছেন, সে দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

'কাকলি'তে আমরা অতুলপ্রসাদের কাব্যধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম প্রত্যক্ষ করি। দেবতা, প্রেম ও প্রকৃতি। কবি স্বয়ং এই তিনটি বিভিন্নধারার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু এই ধারাত্রয়ের যত বিভিন্নতাই থাকুক না কেন, কবির গভীরতম বাস্তবচেতনা ও সৃষ্টিমুখী হৃদ্‌স্পন্দনই ইহাদের উৎ-পত্তি স্থান কিনা, এবং ত্রিধারা সৌন্দর্য্যমহাসিন্ধুপ্রবাহিনী কিনা, মাত্র ততটুকুই আমাদের বিচার্য্য।

অতুলপ্রসাদের দুইশতাধিক প্রচলিত গানের মধ্যে কোনটী মরমিয়াতত্ত্বাশ্রিত, কোন্‌টীতে বা বৈষ্ণবভাব উঁকি মারিতেছে, কোন্‌টী বাউলধর্ম্মী, কোন্‌টাতে বা একটু নাড়া পড়িলেই সুফিমতবাদ ধরা পড়িতে পারে,—সে সব জটিলতত্ত্বমীমাংসা সুধীজনের অপেক্ষা রাখে, এবং সে ইচ্ছা বা সামর্থ্যও বর্ত্তমান লেখকের নাই। আমরা মোটামুটি এ সহজ কথাটাই বুঝি যে, বেলা, চম্পক, বকুল, গোলাপ, শেফালি, যুঁথি, মল্লিকা প্রভৃতি জাতিতে যত বিভিন্নই হোক, সকলগুলিই এক পুষ্পশ্রেণীভুক্ত; এবং পৃথিবীর এক অজ্ঞের শক্তিই এই বৈচিত্র্যময় লাবণ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; এবং কবির মধ্যেও এমনি একটি সংজ্ঞাতীত শক্তি রহিয়াছে, যাহা নব নব সৌন্দর্য্যে সতত বিকচোন্মুখী। সে-শক্তি যে কোনও ভাব বা তত্ত্বকে আশ্রয় করিতে পারে। আমরা বরং দূরে দাঁড়াইয়া নাম-না-জানা ফুলের গন্ধে বর্ণে মুগ্ধ হইব, আবিষ্ট বিস্ময়ে এক অজ্ঞাতবিকাশিনীশক্তির অস্পষ্ট ধারণা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিব,

কিন্তু সে ফুলটিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া উদ্ভিদতত্ত্ব-নিরূপণে লাগিয়া যাইতে রাজী নই।

এখানে বহুমর্ম্মের ভাষাবাহিনী একটী গানের উল্লেখ করিব।

'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে?
উজল নয়নে কে গো হাসিলে?
মোহন সুরে
ধীরে মধুরে
পরাণ-বীণায় কে গো বাজিলে?
হেম-যমুনায়,
প্রেম-তরী বায়,
ডাকে আমায়—আয় গো আয়!
প্রভাত বেলায়
সোণার ভেলায়
কেমনে চলে যাবে হায়!
তব সে-কূলে
যাবে কি ভুলে
যে-ভালবাসা বাসিলে?'

জ্যোৎস্না রাতের বেদনাবহ এ গানখানি বাংলা গীতি-কাব্যে সত্যই অপূর্ব্ব। রচনাগত সুরটির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, আগাগোড়াই তাহা সুন্দর, পতনহীন। কিন্তু চতুর্থচরণে, সুনিপুণশিল্পীসুলভ একটী 'স্পর্শ'-সংযোজনায় সে সৌন্দর্য্য যেন বহুগুণিত হইয়া গেল! সে সুষমা এমনি, কোমল, কমনীয় যে, তাহাকে ভাষা দ্বারা বুঝাইতে যাওয়া আর শেফালির দললগ্ন শিশির কণাকে অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করার চেষ্টা একই বস্তু। অল্প কথায় শব্দচিত্রঅঙ্কন, সার্থক শব্দচয়ন ও সর্ব্বোপরি ভাবের সহজ সুন্দর প্রকাশ প্রভৃতি দুর্লভ সুকাব্যলক্ষণগুলি উল্লিখিত গানটিতে বিদ্যমান।

আজ এমন মধুর রাতে আসিয়া নিমেষমধ্যে যে-জন হৃদয় হরণ করিয়া লইল, কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই যে সোনার ভেলায় চলিয়া যাইবে, সেই অজ্ঞাত কূলে পৌঁছানোর পরেও কি গত রজনীর স্মৃতি সুখ-বেদনার মত তাহার অন্তরে ঝঙ্কৃত হইতে থাকিবে? অথবা প্রভাতে বিস্মৃত সুখ-স্বপ্নের মতই তাহা অতল বিস্মৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে? কে জানে?

এই যে কাব্যময়ী, কবি যাহার নিশ্চিত আসন্ন বিরহে বিধুর হইয়াছেন, সে কল্পনাছবিমাত্র হইলেও কবির perfection of experienceএর ফলে সে যথার্থই "The very image of life expressed in its eternal truth." তাই সে স্পর্শনীয় ও প্রাণময়ী। তাই সে জীবনরসের রসিক অ-কবিজনের চিত্তেও দোলা জাগাইয়া 'মোহনসুরে ধীরে মধুরে পরাণ-বীণায়' বাজিয়া উঠিল।

যে কবি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া একটী চিরন্তন সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, যাহাতে বিশ্ব-মানবের মর্ম্মকথা আপনি বাজিয়া ওঠে, অলঙ্কার শাস্ত্র তাঁহার নাম দিয়াছে 'লিরিক কবি'। উল্লিখিত গানখানি রচয়িতাকে সে-গৌরব অবশ্যই দান করিয়াছে।

কাব্য রূপাশ্রিত রসসৃষ্টি। সুতরাং Aestheticsকে উপেক্ষা করিয়া কেবল মাত্র idea ধরিয়া কাব্য বিচার করা চলে না। অপর পক্ষে, এই সৌন্দর্য্যজ্ঞানই (Aesthetic sense) পশ্চাতে থাকিয়া, ধ্বনি, ভাব ও চিত্রের বিচিত্রসঙ্গতি দ্বারা কাব্য সৃষ্টি করে। 'গীতিগুঞ্জের' কয়েকটী রচনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আমায় ক্ষমা করিও যদি তোমারে জাগায়ে থাকি;
দু'দিন গাহিয়া গান চলিয়া যাইবে পাখী।
তোমার নিকুঞ্জ-শাখা,
বসন্ত পবন-মাখা;
প্রাণের কোকিলে, বল, কেমনে ভুলায়ে রাখি?

* * * *

আমার করুণ গানে
যদি দুখস্মৃতি আনে,
ফুরাইয়া গেলে গান মুছিয়া ফেলিও আঁখি।

শুধু আন্তরিকতাই নয়, এ গানখানি হৃদয়স্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষ ভাবে প্রকাশ সঙ্গতির গুণেই।

অন্যত্র·······। প্রেম-অধীরা,
কণ্ঠ মদিরা,
পরাণ-পাত্রে এ মধু রাত্রে ঢাল গো ?
নয়নে, চরণে, বসনে, ভূষণে গাহ গো,
মোহন রাগ-রাগিনী ?
ওগো নব-অনুরাগিনী ?

কথাগুলি বসন্ত রাতের নর্ম্মসঙ্গিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলা, এবং নিরতিশয় সাধারণ। কিন্তু তাহা অসাধারণ অথবা কবিতা হইয়া উঠিয়াছে কবিসুলভ রূপায়িত অভিব্যক্তির জন্যই। পৃথিবীর জল যেমন প্রকৃতির সৃষ্টি কৌশলে আকাশের বর্ণলোক হইয়া ওঠে, ঠিক তেমনি।

সামান্যকে অসামান্য করিয়া তোলার কবির মধ্যে এই দিব্যশক্তিটি তাহা পরশমনিরই তুল্য। তাহারই স্পর্শে হৃদয়ের গভীরতম ক্রন্দনও হইয়া ওঠে মধুরতম সঙ্গীত; এবং যা-কিছু দুঃসহ তাহাই হয় উপভোগ্য। নহিলে 'Our sweetest songs are those that tell of the saddest thoughts'—হইত না; দুঃখ স্বভাবতঃই কঠোর ও নির্ম্মম। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি তাহারই সমর্থক।

"···তোমার সকলই সুন্দর হে—
অতি সুন্দর।
···তব গমন সুন্দর, থমক সুন্দর,
সুন্দর তব আলস;
তব গরব সুন্দর, অশ্রু সুন্দর,
সুন্দর হাসি-বিকাশ
তব রচন সুন্দর, বচন সুন্দর,
সুন্দর তব গীতি;
তব মরম সুন্দর, সরম সুন্দর
সুন্দর তব ভীতি।

* * * *

তুমি সোহাগে মধুর, কলহে মধুর, মধুর যবে অভিমান;
তুমি মিলনে মধুর, বিরহে মধুর, মধুর যবে ভাঙা প্রাণ।

তুমি মধুর হে যবে আমায় ভালবাস, মধুর যবে বাস অন্তে,
তুমি মধুর যবে বস কনক আসনে, আমার কাটে দিন দৈন্যে।"

উপেক্ষার সে কালো মেঘ কখন কবির অন্তরাকাশে ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, কবিত্বের জ্যোৎস্নাধারাস্পর্শে তাহা হইতে কী অনুপম সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে।

অপর এক স্থানে—

সখা, দিওনা, দিওনা মোরে, এত ভালবাসা।
জগতে তা হ'লে মোর রবে না কিছুরই আশা।
তুমি দিলে সারা মন,
কি করিব আরাধন ?
আসিয়া তোমার দ্বারে পাব কি শুধু নিরাশা ?
প্রতিদিন ফুল তুলে
যাইব তোমার কূলে;
সে দিনের মত শুধু মিটায়ো প্রেম-পিয়াসা।
লয়ে কোটী কোটী কান,
যাব শুনিবারে গান;
সরমে কহিও মোরে একটি মরম ভাষা।
আমার জীবন-নদী,
এত প্রেম পায় যদি,
ভাঙিয়া ভাসিয়া যাবে মোর স্বপনের বাসা।

কবিতাটি উৎকর্য-মূলক রসসৃষ্টিক্ষমতার (Shaping power) উজ্জ্বল প্রমাণ।

বাংলা ভাষা ভাব প্রকাশের পক্ষে কিরূপ অনুকূল, এবং তাহার সম্পন্নতা আজ বিশ্বসাহিত্যিকের নিকট কিরূপ আকর্ষণের বস্তু, মাতৃভাষার বন্দনাচ্ছলে—সে কথাটি বলার মধ্যে কবি চমৎকার রসসঞ্চার করিয়াছেন।

মোদের গরব, মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা!

* * *

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনল মালা জগত জিনে।
তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগত করে যাওয়া আসা।

এরূপ চিত্তাকর্ষক কবিকর্ম্ম 'গীতিগুঞ্জে'র বহুসংখ্যক রচনাকে উৎকৃষ্ট কাব্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যবোধ সকল সময়ে কবির মধ্যে জাগ্রত দেখিতে পাই না। প্রকৃতির একটি গান উল্লেখ করা যাক্।

'প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল্ লো বধূ!
ঘোমটাখানি খোল্।
আছি আজ পরাণ মেলি', দেখ্‌ব বলি'
তোর নয়ন সুনিটোল লো বধূ!
নয়ন সুনিটোল।
কত আর নীরব রবি,
কবে তুই ফিরে চাবি,
মোরে বরি ল'বি বধূ।
কবে জীবন-বাসর ঘাটে
বাজ্‌বে শঙ্খ ঢোল লো বধূ
বাজ্‌বে শঙ্খ ঢোল?
আজি নিখিল কুঞ্জবনে,
মিল্‌ব পরম বধূর সনে,
বড় সাধ মনে বধূ?
এ মোহন রাতে, আমার সাথে
বিশ্ব দোলায় দোল্ লো বধূ!
বিশ্ব দোলায় দোল্।

উপরি উদ্ধৃত কবিতাটিতে কোন্ তত্ত্ববিশেষ নিহত আছে, সে সূক্ষ্ম বিচারে আমাদের প্রয়োজন হইবে না। অতি মাত্রায় তত্ত্বপ্রধান কাব্যালোচনা দর্শনালোচনারই নামান্তর।

প্রকৃতি-অবগুণ্ঠিতা কে একজন রহিয়াছে, কবি কল্পনা-চক্ষে তাহাকেই দেখিতেছেন। এখানে কবিশক্তি (poetic faculty) সে অলক্ষিতার সঙ্গে কোন মধুরতম সম্বন্ধ-সূত্রে বিকশিত হইতে চাহিতেছে, সেটুকু বুঝিলেই হইল, এবং তাহা খুবই স্পষ্ট।

'সুনিটোল' নয়নদর্শনে কাহারো কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু গুণ্ঠনমুক্তার নয়নের ব্যাকুল প্রতীক্ষা দৃষ্টিটি উপলব্ধি করিতে সকলেই বাঞ্ছা করিবেন। আমারাও, করি। তার পর 'এ মোহন রাতে' নিখিল কুঞ্জবনে সেই 'পরম বধূর সনে' বিশ্ব দোলায় দুলিবার যে সাধ, তাহাও কবিজনসুলভ। কবি নিজেই প্রতীক্ষায় আছেন যে, এক দিন সে তাঁহার পানে ফিরিয়া চাহিবে; মঙ্গল উৎসবের মধ্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইবে। সেদিন জীবন বাসর ঘাটে বাজবে শঙ্খ ঢোল।

মাঝখানে ঐ বস্তুটির ধ্বনি 'হঠাৎ' যেন মিলন উৎসবকে আহত করে।

'ঢোল' না বাজাইয়া, বাঁশীর (সানাই) বন্দোবস্ত করিতে পারিলে শুভ কর্ম্মের অঙ্গচ্ছেদ করিতে হইত না, পরন্তু— বাঁশীর কোমল কারুণ্যটুকু কি উৎসবের সর্ব্বাঙ্গময় এক অকথিত সুষমা পরিব্যাপ্ত করিতে পারিত না?

অন্য একস্থানে আছে;—

আমি অলকে পরিতে প'ড়ে গেল মালা
তার পায়, ওগো, তার পায়।
আমি খেলিতে খেলিতে ভুলে গেনু খেলা;
একি দায়, ওগো, একি দায়!

এবং তারপরেই আছে,—

আমি পুকুর ভাবিয়া দেছিনু সাঁতার;
বুঝি নাই, ওগো, বুঝি নাই
শেষে দেখি এ যে অকূল পাথার
যত যাই, ওগো, যত যাই।

এখানে 'পুকুর' কথাটির স্থানে 'সরসী' হইলে, ছন্দ পতন ঘটিত না, অপর পক্ষে, কল্পনাগত ছন্দটিও রক্ষা পাইত। কারণ কাব্যের অনুকূল কল্পচিত্র জাগাইবার শক্তি 'পুকুর' শব্দটির মধ্যে নাই, তাই গা'নে তাহা অচল।

সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সাময়িক দুর্ব্বলতা আলোচ্যকবির রচনায় কখনও কখনও চোখে পড়ে; কিন্তু তাহা পার্থিব ত্রুটিবিচ্যুতি মাত্র। কাব্য যে নিবিড়তম উপলব্ধির সুন্দরতম প্রতিরূপ, সেটুকুর অভাব ঘটিলেই কবির পক্ষে তাহা হয় কলঙ্কের কারণ। কারণ, তাহা মিথ্যাচার, এবং সেই মিথ্যারূপী কুৎসিতের অঙ্গে যতই অলঙ্কার চাপান হয়, ততই তাহার অকিঞ্চিৎকরত্ব হয় পরিস্ফুট। রূপ-রসিকের চক্ষু তাহাতে প্রতারিত হয়না। অন্যদিকে গভীর উপলব্ধিজাত কাব্য বসনে ভূষণে অতিমাত্রায় সাবধানী না হইয়াও, তাহা হৃদয়দ্বারা সহজেই আদৃত। সে নিরাভরণতাকে আবেষ্টন করিয়া এক নম্র সৌন্দর্য্যলোক আপনি গড়িয়া ওঠে। নিম্নের বর্ষার গানটি সেই শ্রেণীর কাব্য।

বঁধু, এমন বাদলে তুমি কোথা?
আজ পড়িছে মনে মম কত কথা!
গিয়াছে রবিশশী গগন ছাড়ি;
ঝরবে বরষা বিরহ-বারি;

আজিকে মন চায়, জানাতে তোমায়
হৃদয়ে হৃদয়ে শত ব্যথা।
দমকে দামিনী বিকট হাসে ;
গরজে ঘন ঘন, মরি যে ত্রাসে ;
এমন দিনে, হায়, ভয় নিবারি,
কাহার বাহু পরে রাখি মাথা ?

কবির অনুভূতি এখানে এত প্রবল যে, তাহাকে সংক্রামক বলা যাইতে পারে।

এর পাশাপাশি অতি আধুনিক তরুণ কবিদের একটা রচনা উদ্ধৃত করিতে পারিলে—Contrastটা ভালরূপে পরিস্ফুট হইত। কিন্তু, নাগরা, চাদর, লম্বাচুল, ঢিলেপাঞ্জাবী, চশমা প্রভৃতি কবির অবশ্য বাহ্যচিহ্নগুলি বহন করিয়া সগৌরবে যাহারা বিচরণ করেন, তাহাদের সংখ্যা ত কম নয়। সুতরাং তাহাদেরই দু'একজনের রচনা উদ্ধৃত না করিয়া সম্প্রদায় হিসাবে বলাই সমীচীন।

ইহাদের রচনা দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয়, কবি হইতে হইলে প্রকৃতিদত্তদান ও স্বকীয় সাধনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল গোটা দুই প্রচলিত গজলের বই, 'বুলবুল্', 'সাকী', 'সরাব', 'পেয়ালা' প্রভৃতির সঙ্গে আরও শ'দুই অভিধান-মথিত 'ল'বছল শব্দ তৃণস্থ করিতে পারিলেই, কাব্যজগতে অর্জ্জুন হওয়া সম্ভব। ফলে, যে অনুভূতি-গঙ্গা মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে অবহিত শত শব্দ-শরনিক্ষেপেও তাহার বহিরাবরণ বিদ্ধ হয়না। কী করিয়াই বা হইবে ? এ যে অসম্ভব চেষ্টা। নিজের মধ্যেই যাহার ভাবের বিদ্যুৎ সঞ্চার হয় নাই, অপরের অন্তরে সে তাহা প্রবাহিত করাইবে কোথা হইতে ? শব্দও তাহার বাহন মাত্র। এই শ্রেণীর কবিদের লক্ষ্য করিয়াই গেটে বলিয়াছেন :—

"If feeling does not prompt, in vain you strive ;
If from the soul the language does not come,
By its own impulre to inpel the hearts
Of hearts, with communicated power,
In vain you strive, in vain you study earnestly."

কিন্তু, অতুল প্রসাদের কাব্যের উৎস-সন্ধান তাঁহার নিজের উক্তিতেই মেলে :—

যখন তুমি গাওয়াও গান
তখন আমি গাই
গানটি যখন হয় সমাপন
তোমার পানে চাই।

যাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়া থাকুক, কবি যে অনুপ্রেরণার কতখানি মুখাপেক্ষী, কথাগুলি তাহারি দ্যোতক।

অতুলপ্রসাদের কাব্যে এমন একটি সর্ব্বতোমুখী স্বকীয়তা দেখিতে পাই, যাহা কবির পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। কোনো কারণেই সে বৈশিষ্ট্য তাঁহার চাপা পড়িয়া যায় নাই।

জল বলে চল্, মোর সাথে চল
তোর আঁখিজল হবে না বিফল।
চেয়ে দেখ্ মোর নীল জলে,
শত চাঁদ করে টলমল্।
মোরা বাহিরে চঞ্চল,
মোরা অন্তরে অতল,
সে অতলে সদা জ্বলে রতন উজল।
নহে তীরে, এই নীরে হবিরে শীতল।

রচনার মধ্যেই কবি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিয়া আছেন, —নাম জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য মাত্র। তাহা ছাড়া, উক্ত রচনার মধ্যে জলের তরলতা ও জলধির গম্ভীর সৌন্দর্য্য কিরূপ বিচিত্রভাবে ছন্দিত হইয়াছে, তাহাও লক্ষনীয়। রচনাটি বাস্তবিকই "বাহিরে চঞ্চল", কিন্তু "অন্তরে অতল"।

অতুলপ্রসাদের কাব্যে স্পষ্টতা আছে বলিয়া তাহাকে গতানুগতিক মনে করিবার কোনো কারণ নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিই :—বহুজ্ঞাত মতবাদ ও 'ঝুলন', 'হোলি' প্রভৃতি কতকগুলি প্রচলিত ধর্ম্মোৎসবকে আশ্রয় করিয়া, এ পর্য্যন্ত বহু বিভিন্নধর্ম্মী রচয়িতার কবিত্বশক্তি আত্মপ্রকাশ খুঁজিয়াছে। সাধারণত উষার অরুণরাগকে ফাগ কল্পনা করিয়া 'হোলি'র গান রচনায় 'রেওয়াজ' আছে। কাহারো কাহারো কল্পনায় বা একটু ইতরবিশেষ আছে। কিন্তু অতুলপ্রসাদের হোলির গান একটু ভিন্ন ধরণের। তাঁহার 'কালো'র

(কৃষ্ণ) রূপ ও ফাগের বর্ণ দুই'ই মৌলিকত্বজ্ঞাপক। যা-কিছু মনুষ্যদৃষ্টি অভেদ্য, রহস্যময়, তাঁহার 'কালো'র পরিকল্পনা তাহাই, এবং নিজের বহুপ্রকাশ জীবনের বর্ণে সেই 'কালো'র সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করাই তাঁহার অভিলাষ। তাঁহার 'কালো'র যে অলক্ষিত বাঁশীটি দৃশ্য ও অনুভূতির জগতে নিয়ত ভাসমান, রহস্যাবৃত বলিয়াই তাহা তাঁহার নিকট এত মধুর।

তাই তিনি বলেন—

…হে মোর কালো

* * *

হে মোর নিয়তি,

শ্যাম মূরতি,

তোমার বাঁশী যে—

"আঁধারে বাজে ভাল।"

এক্ষণে ছন্দ ও মিলের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব। অবশ্য শ্রুতিমাধুর্য্য ও ছন্দের চুলচেরা হিসাবটি বজায় থাকা সত্ত্বেও রচনা-বিশেষ আবর্জ্জনা-কুণ্ডে স্থান পাইবার যোগ্য হইতে পারে তথাপি ছন্দকে একেবারে নাকচ করিয়া দেওয়া চলে না। শ্রুতি-সুখকরতার চেয়েও বড় প্রয়োজন ছন্দের রহিয়াছে। সঙ্গীতে সুর তালের অনুবর্ত্তী হইলে গীতিমাধুর্য্য বৃদ্ধিই পায়; তেমনি ছন্দানুগত্য বাক্যের অর্থকে আড়ষ্ট করে না, প্রত্যুত সুদূর-গামী করে। ছন্দের মধ্যে বাক্য কতকটা অনির্ব্বচনীয়তা লাভ করে। ছন্দের অস্বচ্ছন্দ প্রবাহে কাব্যের সৌরভ পরিপূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়গত হয় না। অতুলপ্রসাদের গান গুলিতে সুরের হিল্লোল আছে, কিন্তু ছন্দের প্রবাহ অতি ক্ষীণ। এই কারণেই সে গুলির কাব্য সঙ্কলন অপেক্ষা গীতি সঙ্কলন বহুগুণ অধিক সমাদর দাবী করিতে সক্ষম। কাকলির ভূমিকায় যে দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্বরলিপি প্রকাশের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মূলেও বোধ করি ঐ ছন্দের প্রশ্ন।

সানাই-এর 'পোঁ' ধরা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধন পথে সুরটি যখন ক্ষণিকের অবকাশ গ্রহণ করে, তখন ঐ পোঁটিই সুরের হৃদয়াবেগ জাগাইয়া রাখে। কাব্যক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে গানে 'মিল'ও ছন্দের অনুরূপ সহায়ক। কিন্তু আলোচ্য কবির কাব্যে ছন্দের মত 'মিল'ও সকল সময়ে যথাযথভাবে আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেছে না। তাহাতে কাব্যানুরাগী পাঠকের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, অতুলপ্রসাদের রূপ-রস-শিল্পী মন যথেষ্ট অবহিত, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় প্রায়শঃই অন্যমনস্ক।

অতুলপ্রসাদের কাব্য ব্যক্তিগত অনুভূতিতে যতটুকু ধরা দিয়াছে, মোটামুটি ভাবে তাহাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। চূড়ান্ত সমালোচনার দাবী তাহাতে রাখি না। পরন্তু, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতুলপ্রসাদের কাব্য প্রকৃতির এতটুকু আভাস ফুটিয়া থাকিলেও যথেষ্ট মনে করিব।

অতুল প্রসাদের গানগুলি সম্বন্ধে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, অতি অধুনিক নিষ্প্রাণ মিথ্যাচারের ভারে পীড়িত বিমুখ হৃদয়ের নিকট এগুলির প্রচুর প্রাণশক্তির মূল্য অত্যন্ত বেশি। তাঁহার গানগুলি যে নিখুঁত, আদর্শস্থানীয় এমন কথা কোথাও বলি নাই। ভ্রম-প্রমাদ তাহাতে আছে, এবং প্রয়োজন বোধে সে সত্যটুকু প্রকাশও করিয়াছি। তথাপি, যে সুরটি মানুষের চিত্তকে আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ করে, সমস্ত অপূর্ণতাকে ছাপাইয়া তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্রই তাহা ধ্বনিত হইয়েছে। সযত্ন-রচিত কুসুমস্তবকের নিপুণ আনন্দ হয়ত তাহাতে মিলিবে না, কিন্তু ঝরা শেফালির স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ হৃদয়ের নিকট কখনও ব্যর্থ হইবে না।

শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ

অবসাদ

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

চৌদিকে মোর প্রাচীর দিলে যে ঘেরি',
তোমার কুটীর-প্রাঙ্গণ ছাড়া কিছু আর নাহি হেরি।
কোথা সে উদার পথ মাঠ ঘাট,
সবুজে ধূসরে বুনানি জমাট,
ছায়া তরু বীথি কই ?
নীলের টুকরা আকাশের পানে বিস্ময়ে চেয়ে রই,
—কোথা গেল তার দিগ্বলয়ের রেখা ?
বিশাল বিপুল নীল গম্বুজ আর ত যায় না দেখা !

কোথা নদী তট আঁকা বাঁকা পথ শেষে ?
ঝলমল জলে আজিও কি চলে ভরা পালে তরী ভেসে ?
উষা সন্ধ্যার কিরণের ঝারি
দেয় কি রাঙায়ে প্রবাহিনী বারি ?
জানিতে পারি না আর,
—সে উছল জলে এখনো কি গলে মধু হাসি জোছনার ?
হৃদয় আমার অধীর হয়েছে আজি,
কোথা সে তটিনী সাগর-গামিনী শ্যামঘন বনরাজি !

অঙ্গন মাঝে খনন করেছি কূপ,
গাগরি ভরিয়া তুমি তোল জল, অঙ্গে উছলে রূপ।
সে মাধুরী আমি হেরি অনিমিখে
কুহক পরিখা মোর চৌদিকে
যেন রচিয়াছে কারা,
এই আঙিনায় পথ নাহি পায় বড় কাছে ছিল যারা।

আজিকে তাহারা স্মরণে আসিছে মোর,
ও ভুজ-বলয় কেন মনে হয় নিরদয় মায়া-ডোর ?

গৃহদীপখানি জ্বা'ল যবে নিজ হাতে,
মনে হয় যেন নিভে যায় চাঁদ মধুপূর্ণিমা রাতে।
বাতায়ন পথে দখিণা বাতাস
ভেসে আসে যবে জাগে হাহুতাশ
এ নিথর বুক ভরি,'
নিদ্রাশিথিল মিলন গ্রন্থি ধীরে বিমোচিত করি'
কেমনে পলা'ব খুলি' এ কারার দ্বার,
সেই ভাবনায় রজনী পোহায়, মুক্তি নাহিক আর।

তুমি এলে যবে আমি ভেবেছিনু মনে,
—আমার নিখিল দিল বুঝি ধরা অভিসারিণীর সনে।
ওই নদীতট অরণ্যভূমি
নিজ মাধুরীতে ভরি দিতে তুমি,
নীলিমা ঘনা'ত নভে,
কাননে কুসুম উঠিত ফুটিয়া গাঢ়তর সৌরভে।
সবাকার মুখে পড়িত তোমার আলো,
মনে হ'ত তাই পর কেহ নাই, সবারে বেসেছি ভালো।

তোমার লাগিয়া বাঁধিনু কুটীরখানি,
গৌরবে সেথা পাতিনু আমার নিখিলের রাজধানী।
রাণীর মতন কেশরী আসনে
বসিলে যখন, ভাবি মনে মনে

আমি বিশ্বেশ্বর,
ভুবনমোহিনী ঘরণী যাহার তার পদে চরাচর।
তোমারে লভিয়া আপনারে গেনু ভুলি,
আমার বলিতে যাহা কিছু ছিল তোমারে দিলাম তুলি।

আজি মনে হয় হয়েছি সর্ব্বহারা,
বাঁধনের মাঝে কভু বাঁচেনাত গিরিনির্ঝর ধারা।
রবি শশি তারা নভোনীলিমায়
কভু বাঁধে না ত অচল কুলায়,
হারায় না কভু গতি;
চিরচলিষ্ণু চঞ্চল হিয়া হ'ল অনন্যমতি,
কমল-কবরে অলি সম হ'ল লীন,
বনে বনান্তে উদ্‌ভ্রান্তের পক্ষে বাজে না বীণ।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

ভূদেব

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

অমোঘ পশ্চিম মেঘে ঘেরিয়াছে আকাশ-অঙ্গন,
উড়ে যায় ঝড়ো বায়ে গৃহস্থের যা-কিছু সম্বল,
তরণী থাকে না স্থির—মানে না কহালের বন্ধন—
ঘাট ছাড়ি ভেসে চলে ; যাত্রীদল বিপন্ন চঞ্চল !
আপনার যাহা কিছু—ভার বলি' টানি দুই হাতে
জলে ফেলি' দিয়া ভাবে—কি ক'রে বাঁচিবে শুধু প্রাণ,
সমাজ সংসার ভুলি' সে সঙ্কটে ভাবে আশঙ্কাতে
যায় যাক্ চিরাভ্যস্ত নীতি ধর্ম্ম, যায় যাক্ মান।

কে তুমি ব্রাহ্মণ দৃপ্ত—সর্ব্বনাশা সে আসন্ন কালে
নিপুণ কাণ্ডারীসম দৃঢ় হস্তে ধরি' হাল তার,
ঘুরায়ে তরণীমুখ, কাটাইয়া সে দুর্য্যোগজালে
বাঁচাইতে চাহ সবে নিঃসঙ্গ বহিয়া সর্ব্বভার ?
স্বাধীন সংযত বুদ্ধি তোমাসম কে ধরেছে কবে ?
হে দেব, ভূদেবই তুমি বাঙ্গালীর চিন্তারি গৌরবে।

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ চুঁচুড়ায় ভূদেব স্মৃতি-সভায় পঠিত

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৯

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে সকাতর ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ ধ্বনি কানে প্রবেশ করতেই সন্ধ্যার মনে পড়্‌ল গরুর গাড়ি ক'রে সে আমিনার শ্বশুরবাড়ি চলেছে এবং সুদীর্ঘ পথের এখনও শেষ হয়নি। গাড়ি ছাড়ার পর চাকার শব্দের এবং গাড়ির ঝাঁকানির তাড়নায় কথাবার্তা বেশি কিছু আর হ'তে পারে নি, তারপর আদি-অন্তহীন চিন্তার মধ্যে মগ্ন থাক্‌তে থাক্‌তে কখন্ অতর্কিতে নিদ্রাকে আশ্রয় ক'রে অচেতন দেহ শয্যার উপর লুটিয়ে পড়েছে সে কথা মনেও পড়ে না। বিচালি, তোষক এবং চাদর দিয়ে রচিত শয্যা নরমই ছিল এবং বায়ুও ছিল সুশীতল। সুতরাং ঘুমটা এমনই প্রগাঢ় হয়েছিল যে, এর আগে আর একবারও ভেঙেছিল কিনা তাও মনে পড়ে না। আকাশে প্রত্যুষের স্তিমিত আলোক, প্রভাতের সুশীতল জোলো বায়ু ঝির্ ঝির্ ক'রে বইছে। ছইএর জন্যে গাড়ীর দুপাশ দিয়ে দৃশ্য দেখা যায় না, কিন্তু সম্মুখের ফাঁক দিয়ে পথপার্শ্বের গাছ-পালা বন-জঙ্গল পাহাড়-প্রান্তর সবই কিছু-কিছু দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গাছে গাছে যেন দুচারটে পাখীর কাকলীও শোনা যাচ্ছে।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! সন্ধ্যা সহসা ধড়মড় ক'রে উঠে বস্‌ল। রাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যে মুক্তির যে পরিপূর্ণ মূর্ত্তি সে দেখ্‌তে পায় নি, প্রত্যুষের আলোকে গাছ-পালা পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্য দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে তাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলে! এ-ই ত' মুক্তি! একেই ত বলে মুক্তি! এ ত' মহবুবের শিকললাগানো কারাকক্ষ নয়, এ যে বিশ্বপ্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণ! এখানে পশু পক্ষীর সঙ্গে তার মিতালী, তরুপল্লবের সঙ্গে আত্মীয়তা; ইচ্ছা করলেই সে যে-কোনো গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, যে-কোনো লতা থেকে ফুল তুল্‌তে পারে, যে-কোনো পাখীর গান শুন্‌তে পারে! ঐ যে দূরে বন্ধুর প্রান্তরের একটু খানি অংশ দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছে করলে ওখানে গিয়ে সে কাঁটাগাছে দু'পা ক্ষতবিক্ষত করতে পারে। এমন কি কাছাকাছি যদি কোনো বন্যা-উদ্বেল পার্ব্বত্য নদী থাকে, তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতেও পারে। এ-ই ত মুক্তি! একেই ত বলে মুক্তি! মুক্তি যে এত মধুর আগে কে তা জান্‌ত!

কি আশ্চর্য্য! সে গতি লাভ করেছে! অবিরত চলেছে সে,—বাধা নেই, আটক নেই! এ চলার শেষ হবে কলকাতায়, যেখানে তার বাপ মা আছে, স্বামী আছে। সন্ধ্যার ইচ্ছা হল লাফ দিয়ে পথের উপর প'ড়ে একটা ছুট্ দেয়। এমনই মন্থর গতি এই গরুর গাড়ীর, যেন চলতেই চায় না।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে আমিনা তখনো শুয়ে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু ইয়াসিন গাড়ীর ভিতরে নেই। আমিনার গায়ে হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে সন্ধ্যা ডাকলে, "আমিনা! আমিনা!"

নিদ্রালস চক্ষু উন্মীলিত করে আমিনা বল্‌লে, "কি?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "এবার ওঠ! সকাল হয়েচে।"

আমিনা চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে সহাস্য মুখে বল্‌লে, "তা'ত হয়েচে, কিন্তু তোমার সকাল কখন হয়েছে শুনি? একটু আগেওত তোমাকে ঘুমন্ত দেখেচি।"

অপ্রতিভ হয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সত্যি ভাই, এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে, এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে গেছে। কিন্তু ইনি কোথায়?"

"কিনি?"

সন্ধ্যা ইয়াসিনের নাম ভুলে গিয়েছিল, স্মিতমুখে বল্‌লে, "কেন বুঝতে পারছ না কি?"

"না।"

"তোমার—তোমার স্বামী?" বলেই সন্ধ্যার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল।

নিষ্প্রভ আলোকেও আমিনা তা লক্ষ্য করে বললে, "আমার স্বামী! তা তোমার এত লজ্জা কেন? রাত্রে গাড়ীতে উঠে ইয়াসিন গাড়ীর পিছন দিকে পা ঝুলিয়ে বিপরীত দিকে মুখ ক'রে ব'সে ছিল। সে দিকে দৃষ্টিপাত করে আমিনা বলে উঠল, "ওমা তাই ত! আমার স্বামী কোথায় গেল? ডাকাতে হরণ করে নিয়ে গেল না ত!"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল; বললে, "সবাই কি হতভাগিনী সন্ধ্যা যে ডাকাতে হরণ করে নিয়ে যাবে।" তারপর সাগ্রহে আমিনার হাত চেপে ধরে বললে, "না ভাই, সত্যি করে বল, কোথায় গেলেন তিনি।"

আমিনা স্মিতমুখে বললে, "তিনি? তিনি লাফ দিয়ে রাস্তায় গেলেন।"

"তার মানে?"

"তার মানে, কাল রাত্রে ঢুলতে ঢুলতে তুমি যাই শুয়ে পড়লে, উনিও ওদিকে একটি পরিষ্কার লাফ মেরে রাস্তায় প'ড়ে গাড়ির পিছনে পিছনে পথ চলতে আরম্ভ করলেন।"

সবিস্ময়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"তা হ'লে তোমার শোবার জায়গার আর একটু সুবিধা হয়,—বোধহয় সেই ভেবে। তা ছাড়া—

ঔৎসুক্যের সহিত সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা ছাড়া কি?"

"তা ছাড়া, তুমি ঘুমিয়ে থাকলে একগাড়িতে ওঁর জেগে ব'সে থাকা উচিৎ হয় না, সে কথাও ভেবে।"

দুঃখিত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "তা'তে কি হয়েছিল? না, না, এ ভারী অন্যায়! আচ্ছা, তাই যদি, তুমি আমাকে তুলে দিলেনা কেন আমিনা?"

হাসতে হাসতে আমিনা বললে, "তা বটে, সেইটেই ভুল হয়ে গিয়েছিল!"

"আচ্ছা, এখন ত' ওঁকে উঠে আসতে বল!"

"কেন, তুমি নিজে বল না?—ভদ্রতা তো তুমিই করতে চাচ্ছ!"

"ভদ্রতা নয় আমিনা,—করুণা। আহা, দেখ দিকিনি সমস্ত রাতটা মুখ বুজে পথ হাঁটছেন!" তারপর আমিনার হাত চেপে ধ'রে বললে, "নাও, গাড়ি থামাও!"

আমিনার আদেশে গাড়ি স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। ইয়াসিন গাড়ির পাশে পাশেই চলছিল, গাড়ি থামতে পিছন দিকে এসে দেখলে গাড়ির ভিতর আমিনা এবং সন্ধ্যা দুজনেই জেগে ব'সে রয়েছে। সন্ধ্যাকে সেলাম ক'রে হাসিমুখে বললে, "উঠে পড়েছেন? রাত্তিরে ঘুম বোধহয় একটুও হয়নি?"

সন্ধ্যা প্রতি-নমস্কার ক'রে লজ্জিত মুখে বললে, "আপনি সমস্ত রাত হেঁটে এসেছেন, আর আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসেছি! ছি ছি, কি লজ্জার কথা! আপনি উঠে আসুন।"

সন্ধ্যার অপ্রতিভ ভাব দেখে ব্যস্ত হ'য়ে ইয়াসিন্ বললে, "না, না, তার জন্যে আপনি একটুও লজ্জিত হবেন না। এ-সব রাস্তা ত' আমরা হেঁটেই শেষ করি। শুধু আপনাদের জন্যেই গাড়ি আনা।"

"আচ্ছা, এখন উঠে আসুন!"

স্মিতমুখে ইয়াসিন বললে, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, কিছু প্রয়োজন নেই। আর ত' সবে পোন্ ক্রোশ টাক পথ বাকি। একেবারে কাছে এসে পড়েছি; ঐ যে দবীপুরের গাছপালা মালুম দিচ্ছে।"

আমিনা বললে, "মালুম দিলেই কি কাছে হ'তে হয়? এই ত' আমিও এখান থেকে মালুম দিচ্ছি, তাই ব'লে কি তোমার খুব কাছে আছি বলতে চাও?"

আমিনার পরিহাসে ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ইয়াসিন্ দেখলে নিঃশব্দ হাস্যে তার মুখ উচ্ছলিত। বললে, "একটু না হয় শুয়ে পড়ুন, এখনো খানিকটা ঘুমতে পারবেন!"

মৃদুস্মিত মুখে সন্ধ্যা বললে, "না, আর ঘুমোবার দরকার নেই।"

"ঘুম একটু হয়েছিল কি?"

"বেশ ভালই হয়েছিল।"

"আচ্ছা, আমি পাশেই রইলাম। আপনারা ততক্ষণ

কথাবার্ত্তা করুন।" ব'লে ইয়াসিন গাড়ির পাশে গিয়ে গাড়ি চালাবার আদেশ দিলে।

গাড়ি চল্‌তে আরম্ভ করতেই সন্ধ্যা আমিনাকে দুই বাহুর দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ ক'রে ধরলে, তারপর মিনতি-করুণ স্বরে বল্‌লে, "ভাই আমিনা, আজই আমাকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো।—কেমন, করবে ত?"

আমিনা সন্ধ্যার ব্যাকুলতা দেখে মনে মনে দুঃখিত হ'লেও হাসিমুখে বল্‌লে, "কেন, সবুর সইছে না না-কি?"

কাতরস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সয় কি? তুমিই ভেবে দেখ আমিনা! বন্দী যখন ছিলাম তখন একরকম ছিলাম, এখন তোমার দয়ার মুক্তি পেয়ে সত্যিই সবুর সইছে না। মনে হচ্চে কি জানো, গাড়ি থেকে নেবে প'ড়ে ছুট দিই। আজই আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো ভাই।—কেমন? লক্ষীটি!"

আমিনা বল্‌লে, "আমি কি তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পারছিনে সন্ধ্যা? খুবই বুঝ্‌তে পারছি। আজকেই তোমাকে পাঠাবার বিশেষ চেষ্টা করব, তবে আমার শ্বশুর সব দিক বিবেচনা ক'রে যেমন করবেন তাই হবে ত ভাই। তোমাকে পাঠাবার মধ্যে ভাববার অনেক কথা আছে, শুধু তোমার দিক দিয়েই নয়, আমাদের দিক দিয়েও।"

আগ্রহ সহকারে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের দিক দিয়ে কি?"

"আমাদের দিক দিয়ে পুলিস। তোমার শ্বশুর বড় মানুষ, পুলিসের পাহারা চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। যে তোমাকে নিয়ে যাবে সে যদি ধরা পড়ে তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত গফুর মহবুবরাও ধরা পড়বে। জান ত' ভাই, কান টান্‌লে মাথাও আসে।"

"কিন্তু এ বিশ্বাস ত' আছে আমিনা, যে, আমার দ্বারা তোমাদের কখনো কোনো বিপদ হবে না? আমার মুখ দিয়ে কেউ কখনো কিছু বলিয়ে নিতে পারবে না—এ বিশ্বাস ত' করো?"

সন্ধ্যার কথা শুনে আমিনা হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "এ বিশ্বাস না করলে তোমাকে কি ঘরে এনে ঢোকাতাম সন্ধ্যা? তোমার কোনো ভাবনা নেই, যত শীঘ্র তোমাকে কলকাতা পাঠানো সম্ভব তার চেয়ে এক মিনিটও দেরী হবে না। আমার শ্বশুর অত্যন্ত দয়ালু লোক।"

"তা' ত তাঁর ছেলেকে দিয়েই বুঝ্‌তে পারছি ভাই! তোমার শাশুড়ি আছেন আমিনা?"

"না।"

"বাড়িতে আর কে কে মেয়েমানুষ আছেন?"

আমিনা হেসে বল্‌লে, "আর কেউ না। আমিই একমাত্র।"

সন্ধ্যা হেসে উত্তর দিলে, "তাই এত আদরের বউ!"

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি একটা বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। আমিনা বল্‌লে, "এইটে আমাদের বাড়ি, আর ঐ দেখ বারান্দায় আমার শ্বশুর ব'সে রয়েছেন।"

সন্ধ্যা আগ্রহভরে তাকিয়ে দেখ্‌লে একটি দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ বৃদ্ধলোক লুঙ্গি প'রে অনাবৃত দেহে মোড়ায় ব'সে তামাক খাচ্চেন। মূর্ত্তি সৌম্য—প্রশান্ত।

গাড়ি নিকটে উপস্থিত হ'তে আমিনার শ্বশুর মহীউদ্দীন গাত্রোত্থান ক'রে নেমে এসে বল্‌লেন, "কি, বউমা এলে না-কি?"

গাড়ী থেকে নেমে পড়ে অবনত হয়ে শ্বশুরকে সেলাম করে হাসিমুখে আমিনা বল্‌লে, "হাঁ আব্বা, এলুম।"

আমিনার পিছনে পিছনে সন্ধ্যাও নেমে এসে আমিনার মত মহীউদ্দিনকে সেলাম করে নতমুখে দাঁড়াল।

সন্ধ্যাকে দেখে মহীউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "এ মেয়েটি কে বউমা?"

"এটি আমার একটি বন্ধু আব্বা। বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছে।"

"তোমার বন্ধুর যখন বিপদ তখন তোমারো বিপদ বউমা। আর তোমার যখন বিপদ তখন আমারো বিপদ।" বলে মহীউদ্দিন হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন, "এস, মা, এস। বউমার যখন সুপারিশ, তখন তোমার এ বুড়ো চাচার দ্বারা যা কিছু হবার সবই হবে। পরে সব কথা শুনব, এখন বাড়ীর ভিতর গিয়ে প্রথমে একটু ঠাণ্ডা হও। লজ্জা করো না, এ তোমার আপন বাড়ি।"

এবার হিন্দু প্রথার যুক্তকরে মহীউদ্দিনকে নমস্কার ক'রে সন্ধ্যা আমিনার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করল। (ক্রমশ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দুই দিক

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

নিজের মনটাকে নিয়ে লতিকা ভারি বিপদে পড়েছে। আব্দারে ছেলের মতো তার মনটা কদিন কেবলই খুঁত খুঁত করছে, অথচ কী যে চায় তা'ও স্পষ্ট করে বলছে না। ছুটির পর কলকাতা তার অসহ্য বোধ হচ্ছিল, তাই বাবা মা'কে রাজী করে সে "মন্দার হিল্‌স্‌"এ নিয়ে এসেছে। ইঁট কাঠের স্তূপ বা ট্রাম-বাসের ঘড়ঘড়ানি কিছুই এখানে নেই; আকাশ এখানে ধূমমলিন নয়—নির্ম্মল নীল। তাইতে সাদা মেঘের টুকরো অলস-মন্থর গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে সবুজের প্রাচুর্য্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। তার ওপর, সময় কাটাবার জন্যে সে বাংলা আর ইংরাজী উপন্যাস এক ঝুড়ি নিয়ে এসেছে। কাজেই নালিশ করবার তার কিছু নেই। তবু—

যে সব বইয়ের ভেতর সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হ'য়ে ডুবে থাকতো, আজকাল দু'পাতা পড়তে না পড়তে তাইতে তার বিতৃষ্ণা ধরে যায়। আজ ঠিক তাই হয়েছিল। "ব্যারণেস্‌ অর্ক্‌জি"র "স্কারলেট পিম্পারনেল্‌" বইখানা তার কোলের ওপর খোলা পড়েছিল, অথচ তার মনটা যে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল, তা সে নিজেও বলতে পারতো না। যখন খেয়াল হোল, দেখলে আধ ঘণ্টার ওপর সে বই নিয়ে বসেছে অথচ পড়া তার সেই ১৩৫ পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। বিরক্ত হয়ে সে বইখানা ছুঁড়ে ফেলে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। বাগানে অজস্র ফুল ফুটেছে। চামেলি, গোলাপ, জবা, নীজ্‌ন্‌ ফ্লাওয়ার কিছুরই অভাব নেই। হঠাৎ পাশের বাড়ীটার দিকে চোখ পড়তেই সে কৌতূহলী হয়ে উঠলো। বাড়ীটার সব দরজা জানালা খোলা; লোকের সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি বাড়ীটায় নূতন লোক এলো? কারা? তার বয়সী কেউ যে তো আছে কিনা কে জানে! গভীর আগ্রহে লতিকা বাড়ীটার দিকে দেখছে, এমন সময় তার চোখে পড়লো একটী ২৪।২৫ বছরের ছেলে বারান্দায় রেলিংএর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে তাকে লক্ষ্য করছে। তার রং খুব ফরসা আর নাকটা বেশ টিকলো। এইটুকু দেখেই লতিকা ফিরে দাঁড়ালো। তারপর যেন কিছুই দেখতে পায়নি, এম্নিভাবে বারান্দার অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাগান দেখলে। তারপর ফিরে এসে একটা গানের কলি গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে বাড়ীর ভেতর চলে গেল। তবে চকিত দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে গেল যে ছেলেটী সেই একভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সে পরিত্যক্ত বইখানা তুলে নিয়ে আর একবার মন বসাতে চেষ্টা করছিল, আর ভাবছিল পাশের বাড়ীতে কারা এলো কি করে খোঁজ পাওয়া যায়। এমন সময় পেছন থেকে কে তার চোখ দুটী টিপে ধরলে। হাতে চুড়ি দেখে সে বুঝলে—মেয়ে ছেলে। কিন্তু এই নির্জ্জন প্রবাসে তার চোখ টিপে ধরবার মত বান্ধবী কে আছে সে কিছুতেই ভেবে পেলে না। অবশেষে, সে বল্লে, "হার মানছি ভাই, ছেড়ে দাও।"

চোখ থেকে হাত অপসারিত হলো। ফিরে চেয়েই লতিকা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, "ও-মা, কম্‌লি! তুই! আমি কি স্বপ্ন দেখছি?"

২

এম্‌, এ পাশের খবর পেয়েই অজয় মনে আঁটছিল নতুন কেনা মোটরটা করে রাঁচি পাড়ি দেবে। সেখান থেকে হাজারিবাগ, গিরিডি ইত্যাদি শেষ করে পাটনায় মামার কাছে দিন কতক থেকে আসবে। সঙ্গীও তার

মেলাই জুটে গিয়েছিল, এখন শুধু মায়ের অনুমতিটা আদায় করতে পারলেই হয়। তবে কাজটা খুব সোজা হবে এমন আশা তার ছিল না, কারণ বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ সন্তোষ মিত্রের স্ত্রী হয়েও তার মা একটু সেকেলে ধরণের ছিলেন। বিশেষতঃ অজয় যে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এ কথাটা তিনি যেন ধারণার মধ্যে আনতে পারতেন না।

কিন্তু অজয়ের প্ল্যানটা ভেস্তে গেল অন্য কারণে। সেদিন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তার মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অজয় যাই তার মোটর ভ্রমণের কথা বলেছে, অমনি তার মাস্তুতো বোন কমলা গালে হাত দিয়ে বলে উঠলো "ওমা, সে কি ছোড়দা? তুমি যে আমাদের সঙ্গে "মন্দার হিল্‌স্" যাবে!" তারপর একপালা ঝগড়া, চেঁচামেচি সুরু হোলো। কিন্তু যখন কমলার নাকের ডগাটা লাল হয়ে উঠলো, চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগলো, ঠোঁট ফুলিয়ে সে বল্লে, "বেশ গো বেশ। তোমার যেতে হবে না।" তখন অজয় বেচারা বেজায় অসহায় বোধ করতে লাগলো। তার নিজের ভাই বোন নেই, তাই কমলাকে সে অত্যন্ত ভালবাসে। পরাজয় স্বীকার করে সে কথার মোড় ফেরাবার জন্যে বল্লে "তা, এত জায়গা থাকতে "মন্দার হিল্‌স্" কেন? না হয় মামার কাছে পাটনাতেই চল্ না?" মেঘ কেটে গিয়ে রোদ দেখা দিলে। ফিক করে হেসে কমলা বল্লে, "তা তো যাবোই। তার আগে লতি পোড়ারমুখিকে একটু অবাক করে দিতে হবে যে! ওরা উমেশবাবুদের বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীটাই নিয়েছে, আমি বাবাকে বলেছি মাস খানেকের জন্যে মন্দার হিল্‌স্‌এ উমেশবাবুদের বাড়ীটা নিতে—ওঁরা এবার সেখানে যাবেন না কি-না। লতিকে কিছু জানাই নি।"

"তা যেন হোলো। কিন্তু লতি পোড়ারমুখিটি কে?"

"ও-মা, তাও জানো না? লতি গো—লতিকা রায়। যে আমাদের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে মেয়েদের মধ্যে ফার্ষ্ট হয়েছিল, আমাদের সঙ্গে ডায়োসেশনে আই, এ পড়ছে। কনসাল্টিং ইন্‌জিনিয়ার সুরেন রায়ের মেয়ে। আমার ভীষণ বন্ধু।"

"তা বেশ। কিন্তু তাকে যেন আমার পরিচয় দিস্ নি। শেষটা "এস্কিমো" বানান করতে বলে বসবে, কিম্বা হয়তো জিজ্ঞেসা করবে 'ওয়ার-শ' কোথায়। আমি কোনটাই বলতে পারবো না। তার চেয়ে বরং বলিস্, একটা ভ্যাগাবণ্ড। খায় দায়—আর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।' মিথ্যেও বলা হবে না, আমিও রেহাই পেয়ে যাবো।"

"আচ্ছা বেশ, তাই বলবো।" তার পরের ঘটনাটা আগের পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে।

৩

সেদিন কমলাদের বাড়ীতে কথায় কথায় লতিকা জিজ্ঞেস করলে "তোর ছোড়দা কী করেন, ভাই কম্‌লি?"

অজয়ের শেখানো মত কমলা বল্লে, "কী আবার করবে? খায় দায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।"

"পড়া শুনো?"

"যৎসামান্য।" এটা অবিশ্যি কমলা নিজের বুদ্ধি খরচ করে বল্লে। লতিকা হঠাৎ বলে ফেল্লে "মাকাল ফল বল্ তাহলে?"

একটু দুষ্টু হাসি হেসে কমলা বল্লে, "কী জানি ভাই, রূপের বিচার নিজের বোনেদের চেয়ে পরের বোনেরাই ভালো করতে পারে। তোর চোখে ছোড়দাকে যদি রাঙা মনে হয়ে থাকে—তবে তাই।"

বিব্রত হয়ে লতিকা কমলার মুখ চেপে ধরে বল্লে, "চুপ, মুখপুড়ি। তুই যে যা-নয়-তাই বলতে সুরু করলি।"

"নয়? তা আমি কেমন করে জানবো? তুইই-তো এখুনি বল্লি মাকাল ফল; মানে, দেখতে সুন্দর।"

তার সঙ্গে পেরে উঠবে না জেনে লতিকা চুপ করে রইল। এমন সময়, "কম্‌লি" বলে ডেকে অজয় ঘরে এসে ঢুকলো। তারপরই "ওঃ, লতিকাদি রয়েছেন।" বলে সসম্ভ্রমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা কমলার দৃষ্টি এড়ালো না। সে খিলখিল করে হেসে উঠলো। আরো বিব্রত হয়ে কমলার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে লতিকা বল্লে, "কী সঙের মতো হাসিস্ শুধু শুধু?"

হাসতে হাসতে কমলা বল্লে, "তোর ভাগ্যি ভালো, তুই ছোড়দারও "লতিকাদি" হয়ে গেলি। ছোড়দা কী বলে জানিস? বলে, 'কলেজে পড়া মেয়েতে আর পাঠশালার গুরুমশায়ে কোনো তফাৎ নেই।' তাই ঐ দুটোকেই ও সমীহ করে এড়িয়ে চলে। বলে, "বাপ্ রে! বলে বসলেই হোলো, 'বানান করো তো 'ম্যানুভার'।' তাহলেই তো গেছি!' স্থাখ্ তো, ভাই, লোকে শুধু শুধু ওকে বানান করতেই বা বলবে কেন?"

"তুই বুঝি আর কলেজে পড়া মেয়ে নোস্?"

"সে জন্মে আমার ওপর রাগ কি কম? কথায় কথায় মাকে বলে, "সেইকালেই মাসীমাকে বলেছিলুম, মেয়েকে কলেজে দিয়ো না। এখন বোঝো!"—সে যাক্, আজ বিকেলে কোথায় যাবি বল্। চল্ না, আজকে ঐ পাহাড়টায় ওঠা যাক্?"

"কিন্তু ভাই, বাবার আজকে সর্দ্দির মত হয়েছে, তিনি তো বেরুবেন না। কে নিয়ে যাবে?"

"কেন, ছোড়দা?"

"তিনি 'গুরুমহাশয়দের' নিয়ে যেতে রাজী হবেন কি?" মুখ টিপে হেসে লতিকা বল্লে।

"নাঃ, হবে না! দেখছি হয় কি-না।" বলে কমলা অজয়ের খোঁজে গেল। অজয় তখন টেবিলের কাছে বসে একখানা কাগজে একটা circle এঁকে তাইতে পাশাপাশি দুটো চেরাপটল, তার মাঝখানে লম্বাকরে একটা বাঁশি আর তারই নীচে গোল গোল দুটো বিম্বফল এঁকে, সেই কিম্ভূত-কিমাকার মূর্ত্তিটার নীচে লিখে দিয়েছিল—"কম্লি।" চুলের বদলে সে খানিকটা মেঘের মত এঁকে দিয়েছিল। সেইটের পাশে সে গভীর মনোযোগে আর একটা কী আঁকবার উপক্রম করছে, এমন সময় কমলা এসে কাগজটা কেড়ে নিলে। ছবিখানা দেখে একটু হেসে সে পেন্সিলটা তুলে নিয়ে "কম্লি" কেটে "লতিকা" লিখে দিলে। তারপর অজয়ের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে, "ঢের চিত্রকলা চর্চ্চা হয়েছে। এখন ওঠো। আমাদের আজ ঐ সামনের পাহাড়টায় নিয়ে যাবে।"

"এই সেরেছে!" বলে অজয় লাফিয়ে উঠলো। "ঐ-টা আমার দ্বারা হবে না।" বলে ঘাড় নেড়ে সে তার দৃঢ় অসম্মতি জানালে।

"কেন হবে না, শুনি।"

"তোমাদের চলা তো? 'চল্লেও হয়, না চল্লেও হয়'—গোছ। পাহাড়টায় রাত্রিবাসের কোনরকম ব্যবস্থা আছে বলে তো শুনিনি। তাছাড়া আমার 'মোটর-ট্রিপ'-টা এখনো দেওয়া হয়নি, কাজেই বাঘ বা সাপের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করবার আগ্রহ আমার একটুও নেই।"

"ভাখো ছোড়দা, আমায় রাগিও না বলছি। যা বল্লুম মনে থাকে যেন।" বলে কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তবে যাবার সময় সেই অপরূপ ছবিটা নিয়ে যেতে ভুললো না।

৪

ঘণ্টাখানেক পরে গৃহিনী দু'জন আর মেয়েদের নিয়ে অজয় পাহাড়ের দিকে রওনা হোলো। অসুস্থ মিঃ রায়ের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে অজয়ের মেশোমশায় থেকে গেলেন। পাহাড়ের তলায় পৌঁছেই অজয়ের মাসিমা একটা বড়ো পাথরের ওপর আসন গ্রহণ করলেন, এবং ঘোষণা করলেন যে তিনি আর এক পা'ও এগুতে রাজী নন্। মিসেস্ রায়ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। মেয়েরা কিন্তু নাছোড়-বান্দা, কাজেই অজয়, কমলা আর লতিকা আরোহণ সুরু করলে।

পাহাড়টা খুব উঁচু নয়। তারা চূড়ায় পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তবর্ণ সূর্য্য অন্য একটা পাহাড়ের আড়ালে ডুবে গেল; কিন্তু সারা পশ্চিম আকাশে তখন যেন আগুন ধরে গেছে। সেই রক্তিম আকাশের বুকে কালো পাহাড়ের শ্রেণী যেন কোনো সুনিপুণ শিল্পীর আঁকা অপরূপ ছবিটার মতো দেখাচ্ছিল। সুদূর বিস্তৃত অসমতল প্রান্তর, মাঝে মাঝে সবুজ ধানের ক্ষেত, তারি মাঝে এক একটা ছোটো ছোটো কুটীর, আর সমস্ত দৃশ্যপটটার ওপর পড়েছে গোধূলির নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ আলো। অজয়ের মুখ দিয়ে আপনা হতেই বেরিয়ে গেল, "বাঃ!" তরুণী দুটীর মুগ্ধ দৃষ্টিও তখন সেই দিকে নিবদ্ধ।

কিছুক্ষণ বসে শ্রান্তিদূর করে অজয় বল্লে, "কম্লি, একটা গান গা না ভাই।"

কমলা বলে উঠ্‌লো, "ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো, ছোড়দা। লতি বেশ ভালো গাইতে পারে। আমার গান তো রোজই শুনছো। গা-না ভাই, লতি, একটা গান।" কিন্তু অনেক সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও লতিকা কিছুতেই গাইলে না। তখন অগত্যা কমলাই গাইলে, "দিন-শেষের রাঙা মুকুল জাগলো চিতে।" আসন্ন সন্ধ্যায় সেই করুণ পূরবী সুর তিনজনের মনই কেমন যেন উদাস বিধুর করে তুল্লে।

বাড়ী ফেরবার জন্যে উঠেই কিন্তু তাদের সে উদাস গাম্ভীর্য্য কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। কারণ, দেখা গেল ওঠাটা যত নির্ব্বিঘ্নে হয়েছে, নামাটা ঠিক তত সহজে সম্পন্ন হবে না। পাহাড়টা বেশী উঁচু না হলেও, ভীষণ খাড়াই আর ছোটো ছোটো নুড়ি পাথরে ভর্ত্তি। নামবার সময় কেবলই পা হড়কে যায় আর কমলার তীক্ষ্ণ হাসি ও চীৎকার চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। লতিকা ভারি বিপদে পড়েছিল। একটা পাথরের উপর সে দাঁড়িয়েছিল; সেখান থেকে নামবার জন্যে যতবার সে পা বাড়ায়, প্রত্যেক বারই পা পিছলে যায়। অজয় কমলার একটা হাত শক্ত করে ধরে লতিকাকে বল্লে, "এখান থেকে গড়িয়ে পড়ার চেয়ে আমার সাহায্য নেওয়াটা বোধ হয় বেশী বুদ্ধিমানের কাজ।" একটু স্বর নামিয়ে বল্লে, "যদিও বানান ভুল শোধরাবার আমার কোনোই আশা নেই।" এই বলে সে লতিকার দিকে আর একটা হাত বাড়িয়ে দিল। লতিকা কোনো ওজর আপত্তি না করে তার হাতটা ধরে আস্তে আস্তে নামতে সুরু করলে।

নীচে এসে তারা গৃহিণীদের কাছে খুব একচোট বকুনি খেলে দেরীর করার জন্যে। তারপরও ফেরবার পথে যতবারই রাস্তার ধারে সন্দেহজনক "সর সর" শব্দ শোনা গেল, ততবারই অজয়ের মাসীমা তাদের কাণ্ডজ্ঞান-হীনতা স্মরণ করে খেদোক্তি করলেন। অবশেষে তারা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার বেশ একটু পরেই বাড়ী এসে পৌঁছল।

৫

দিন আষ্টেক পরের কথা। অজয়ের পড়াশুনোর খবরটা লতিকা পেয়ে গেছে। সেদিন যখন পিওন চিঠি দিয়ে যায় লতিকা তখন কমলাদের বাড়ীতে বসে ছিল। একটা চিঠির শিরোনামায় হঠাৎ তার চোখ পড়ে গেল "অজয়কুমার মিত্র এস্কোয়ার, এম্, এ।" অজয়ের কোনো বন্ধু তার নবলব্ধ ডিগ্রী-গৌরবে অজয়কে ভূষিত করে মহিমান্বিত করবার প্রয়াস পেয়েছিল। মৃদু হেসে লতিকা বল্লে, "তবে যে তুই বল্লি তোর ছোড়দা লেখাপড়া জানেন না।"

কমলা মুখ বেঁকিয়ে বল্লে, "ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির এম্, এ আবার লেখাপড়া! দাঁড়া বিলেতটা ঘুরে আসুক, তারপর না হয় একটু খাতির করা যাবে।"

"বিলেতে যাবেন বুঝি এইবার? কী পড়বেন?"

"আসচেবার ল' ফাইনেল দিয়ে ব্যারিষ্টার হতে যাবে। ভালো কথা, জানিস্, আমরা পরশু যাচ্ছি?"

"কোথায়?"

"আমি আর ছোড়দা যাবো পাটনায় মামার বাড়ী। মা আর বাবা কলকাতায় যাবেন। বাবার হঠাৎ কী কাজ পড়েছে। তোরা আর কদিন থাকবি?"

"বোধ হয় আরো দিন পনেরো। বাবার তো জায়গাটা বেশ ভালই লেগেছে। তোরা ছিলি বেশ মজা করে কাটান যাচ্ছিল। তোরা চলে গেলে ভারি ফাঁকা ঠেকবে।"

অজয় এসে বল্লে, "কম্লি, কাল সেই পাহাড়ী ঝরণাটার পাশে পিকনিক করা যাক্ চল্।" তারপর লতিকার দিকে ফিরে বল্লে, "যাবেন লতিকাদেবী?"

"বেশ তো। মাকে বলি।" কমলা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। "চল্ আমিও যাই। তুই ঠিক করে বল্‌তে পারবি না। আমি রাজী করিয়ে তবে ছাড়বো, দেখিস্।"

পরদিন পিক্‌নিক্ সসমারোহে অথচ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হোলো। সঙ্গে অভিজ্ঞ প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার দল ছিলেন, কাজেই খিচুড়ি পুড়ে যাওয়া বা চাটনি ধরে যাওয়া রূপ অঘটন ঘটতে পারে নি। চাকর, বাবুর্চ্চির হাতে রান্নার ভার ছেড়ে দিয়ে সকলে বেড়াতে বেরুলেন। অজয়, কমলা আর লতিকা বুনো ফুল তুলে আর বেরি সংগ্রহ করে বেড়াতে

লাগলো। কতকগুলো ফুল একত্র করে কমলা একটা তোড়া বাঁধছিল; বাঁধা শেষ হলে সে অজয়কে দেখতে পেলে না। লতিকাকে জিজ্ঞাসা করতে, সে বল্লে, "এইমাত্র তো ছিলেন। মা'দের ওখানে গেছেন, বোধহয়।"

একটু এগিয়ে তারা দেখলে একটা পেয়ারা গাছের তলায় বসে অজয় পরম নির্ব্বিকার ভাবে পেয়ারা চর্ব্বণ করছে। কমলা ছুটে গিয়ে বল্লে, "আমায় দু'টো দাও ভাই, ছোড়দা।" কে যেন কাকে বলছে এম্নিভাবে অজয় চোখ বুজে চিবিয়েই চল্লে। কথায় কাজ হবে না জেনে কমলা সটান্ অজয়ের পকেটে হাত পুরে দিলে। এইবারি অজয়ের ধ্যান ভঙ্গ হোলো। "এই, সবগুলো নিস্‌নে।" বলে সে কমলার হাত চেপে ধরে পেয়ারাগুলো বার করে কমলাকে আর লতিকাকে ভাগ করে দিলে। তারপর সকলে হাসি গল্প করতে করতে রান্নার জায়গায় ফিরে এলো। একটা পরিষ্কার জায়গায় তখন কমলার বাবা মা আর লতিকার বাবা মা বসে গল্প করছিলেন। সামে একটা গ্রামোফোন বাজছিল। তারাও এসে সেখানে বসে পড়লো।

যে কারণেই হোক আজ আর লতিকা গান গাইতে আপত্তি করলে না। একটী একটী করে তার অনেকগুলো গান হোলো। হাসি, গল্পে, গানে সেই দিনটী ভারি আনন্দে কেটে গেল।

পরদিন। বেলা ১১টার সময় কমলারা রওনা হবে। তাই সকাল বেলাই লতিকা এ বাড়ীতে এসেছে। কমলা তখন স্নান করতে গেছে, অজয়ও কোথায় যেন বেরিয়েছে। কর্ত্তা গৃহিনী মোট-ঘাট বাঁধাতে ব্যস্ত। লতিকা টেবিলের উপরের বই খাতা গুলো নাড়াচাড়া করতে করতে দেখলে খোলা লেটার-প্যাডটায় কবিতার আকারে কী সব যেন লেখা রয়েছে। কৌতূহলী হয়ে সে পড়লে—

"স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে
জাগার বেলা হোলো,—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।
ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো—
বেদনা হবে পরম রমণীয়,
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায় ক্ষণে ক্ষণেক তরে যদি
সজল আঁখি তোলো।"

লতিকার বুক দ্রুততালে স্পন্দিত হতে লাগলো। কাকে উদ্দেশ করে এ কবিতা লেখা? কার লেখা এটা? সে চেয়ারে ব'সে প'ড়ে আবার কবিতাটা পড়তে লাগলো। হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে সে চমকে দাঁড়িয়ে উঠে লেটার প্যাডটা টেবিলের ওপর রেখে দিলে।

অজয় ঘরে ঢুকে লতিকাকে দেখে একটু ম্লান হেসে বল্লে, "এই যে আপনি এসেছেন। আজ যাচ্ছি। আপনাকে অনেক জ্বালাতন করেছি, কিছু মনে করবেন না।"

লতিকা হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে বল্লে, "আপনি কবিতা লিখতে পারেন, তা তো কই জানতাম না।" এই বলে সে লেটার প্যাডটা আবার তুলে নিলে।

সেটার দিকে একবার চেয়েই অজয় বল্লে, "না, ওটা কবিগুরুর লেখা।" তার পর গভীর আগ্রহে লতিকার দিকে চেয়ে বল্লে, "না বলতে পারার বেদনায় আমাদের সারাপ্রাণ যখন টনটন করতে থাকে তখন তিনি তাঁর অপরিমেয় ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য্য দিয়ে আমাদের সহায়তা করেন। আমি যা বলতে চাই তা এর চেয়ে পরিষ্কার করে আমি কিছুতেই বলতে পারতাম না। লতিকা, আমি চলে গেলে আমার কথা তোমার মনে থাকবে?"

লতিকা মাথা নীচু করে ছিল। শুধু বল্লে, "কলকাতায় গিয়ে দেখা করবেন।" তার গলাটা একটু কেঁপে উঠলো। এরা চলে গেলে "মন্দার হিল্‌স্" আবার কি ভীষণ ফাঁকা হয়ে যাবে মনে করে তার চোখে জল এলো। "আপনাদের জন্তে তারি মন কেমন করবে।" বলে সে তার ঘন-পক্ষ্ম-ঘেরা ডাগর দুটি চোখ মুহূর্ত্তের জন্তে অজয়ের মুখের দিকে তুলে ধরলে। আসন্ন বিদায়ের করুণ বিষাদ তার দৃষ্টিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

ছোটো দুটি কথা। অপরিসীম কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত এর পেছনে নেই। তবু অজয়ের সারা বুক

উদ্বেল হয়ে উঠলো। সে আবেগ ভরা কণ্ঠে বল্লে, "হাঁ, আবার দেখা হবে। নিশ্চয়ই দেখা হবে। আমি অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণবো।"

...সেই দিন সন্ধ্যা বেলা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার জানালার কাছে বসে অজয় পশ্চিম দিগন্তের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়েছে। যাত্রীর কোলাহল, ফেরীওয়ালার চীৎকার, মুটেদের অসন্তুষ্ট অনুযোগ—শত সহস্র তুচ্ছ খুঁটিনাটির মধ্যে একটি মূল্যবান মুহূর্ত্ত হারিয়ে গিয়েছিল। অস্তাকাশের ব্যথা-রক্তিম-রাগের মধ্যে অজয় তাকে খুঁজে পেয়েছে। বিদায়ের শেষ-চাউনি তার যাত্রাপথকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে তুলেছে। ভুলে যাওয়া একটা গানের কলি অকারণে তার কানের কাছে গুঞ্জন করতে লাগ্‌লো—

"তার বিদায় বেলার মালাখানি আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে পলে পলে রে॥"

তোমার অস্তিত্ব মাঝে

[প্রাচীন আসামীর অনুবাদ]

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

তোমার অস্তিত্ব মাঝে রহস্য-বধির
জ্ঞানের গোপন দ্বার মোর কাছে সখি,
রাখিয়োনা রুদ্ধ করি ; যত হেরি তোমা
তত বেড়ে যাও তুমি লঙ্ঘিয়া উপমা
ভাঙ্গি কল্পনার সীমা ; তোমার মদির
আঁখির আলোকপাতে সহসা ঝলকি
ওঠে দু'একটি গান, দু'একটি ব্যথা,
তবু থেকে যায় বাকি লক্ষ লক্ষ কথা॥

জনমে জনমে সখি নব নব বেশে
মরিয়াছি অন্ত খুঁজে তব অস্তিত্বের।
ললিতা ধানশ্রী যেথা ব্রহ্মপুত্রে মেশে
এবার সেথায় তোমা লভিলাম ফের।
আধখানি ইন্দ্রধনু নীলিমার দেশে
আর অর্দ্ধ, দেখ সখি, ছায়াতে জলের॥

একদিন দিয়েছিনু

[প্রাচীন আসামীর অনুবাদ]

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

একদিন দিয়েছিনু বিদায়ের ক্ষণে
করবীর গুচ্ছ এক ; তুমি তারে সখি,
কি জানি কি ভেবে মনে কবরীর সনে
গেঁথেছিলে, কালো চুলে উঠিল ঝলকি
বাসনা-বিদ্যুৎলতা ; তারপরে কবে—
সন্ধ্যার কেশের মাঝে ফুল সূর্য্যমুখী
যেমন ঝরিয়া যায়—তেমনি নীরবে
ঝরে গেছে পুষ্প মোর—সব গেছে চুকি॥

সেই হ'তে পুষ্পদল রক্ত করবীর
লভিয়াছে গুণ সখি, স্পর্শমাণিকের।
যেখানেতে ছোঁয় সেথা ওঠে ঝলকিয়া
বেদনা-কনক-বহ্নি! বুভুক্ষু স্মৃতির
অসংখ্য নাগিনী দল ভেদি পাতালের
বাসনার তপ্ত গুহা ওঠে চমকিয়া॥

মুক্ত-ছন্দ * (Vers Libre)

শ্রীঅনিলবরণ রায়

পদ্য ছন্দের এই নূতন ও বন্ধনমুক্ত রূপের বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হইতেছে ইংরাজ ও আমেরিকান কবি কার্পেণ্টার এবং হুইট্‌ম্যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকবিতার যে-সকল ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, সেইগুলিও এই রীতিকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে সেইগুলি বস্তুতঃ প্রাসঙ্গিক নহে। কারণ, এই অনুবাদগুলি সুন্দর ছন্দান্বিত গদ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর এই ধরণের রচনা, ছন্দান্বিত গদ্য-কবিতা খুব প্রচলিত হইলেও, ইহা ছন্দে কবিতা রচনা করিবার সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না, বা করিবার চেষ্টাও করে না। ইহা এক প্রকার বিলাস (indulgence), একটা সামান্য রকমের ব্যতিক্রম ও বৈচিত্র্য ; ইহারও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে এবং ইহার দ্বারা এমন কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, যাহা অন্য ভাবে যথাযথ সম্পাদিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহার সম্পাদনে বোধ হয় এইটিই একমাত্র পন্থা—কবিতার কবিত্বময় গদ্যানুবাদ, যাহাতে মূলের সঠিক ভাব ও অ লক্ষ্যটি বজায় থাকে। কারণ অন্য এক ভাষার বাঁধাধরা ছন্দে অনুবাদ করিতে যাইলে মূল ধারাটির জন্য কেবল যে এক নূতন অবয়ব তৈয়ারী করা হয় তাহাই নহে, পরন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তনে ভিতরের আত্মাটিও প্রায় বিভিন্ন হইয়া পড়ে, কাব্যের ছন্দ এমনই শক্তিশালী, এমনই বিশিষ্ট ও সৃজনশীল জিনিষ। কিন্তু কবিত্বময় গদ্যের বন্ধন অনেকটা শিথিল, তাহার দাবী পূরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহা মূল ভাবটিকে ধরিয়া এইরূপ সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয় না ; এমন কি একটা সুদূর, ক্ষীণ ছায়া, প্রতিধ্বনি আভাসও দিতে পারে, যদি তাহার পিছনে অনুরূপ ভাব-প্রেরণা থাকে। ইহাতে কখনও সেই একই শক্তি থাকিতে পারে না, তবে অনুরূপ ব্যঞ্জনার কতকটা প্রতিধ্বনি থাকিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন ইংরাজীতে লিখিলেন,

That I should make much of myself and turn it on all sides, thus casting coloured shadows on thy radiance—such is thy *maya.*

Thou settest a barrier in thine own being and then callest thy severed self in myriad notes. This thy self-separation has taken body in me.

The great pageant of thee and me has overspread the sky. With the tune of thee and me all the air is vibrant, and all ages pass with the hiding and seeking of thee and me

> আমি আমায় করব বড়, এইত আমার মায়া ;
> তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে, ফেলব রঙিন ছায়া।
> তুমি তোমায় রাখবে দূরে, ডাকবে তারা নানা সুরে
> আপনারি বিরহ তোমার আমার নিল কায়া।
> বিরহ গান উঠলো বেজে বিশ্বগগনময়।
> কত রঙের কান্নাহাসি কতই আশা ভয়।
> কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে, কত স্বপন ভাঙে গড়ে,
> আমার মাঝে রচিলে যে আপন পরাজয়।
> আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে তোমার আমার মেলা।
> দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে তোমার আমার খেলা।
> তোমার আমার গুঞ্জরণে, বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
> তোমার আমার যাওয়া আসায় কাটে সকল বেলা।

আমরা পাইলাম এক অতি সুন্দর সুললিত-কবিত্বময় গদ্য, কিন্তু তাহার অধিক আর কিছুই নহে। মুক্ত ছন্দের

* শ্রীঅরবিন্দের Future Poetry হইতে সঙ্কলিত

(vers libre) কয়েকজন ফরাসী লেখক যাহা, এবং হুইটম্যান ও কার্পেন্টার যাহা নহেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাই,—তিনি একজন সুকুমার ও সূক্ষ্ম শিল্পী, এবং তিনি তাঁহার কার্য্য অনবদ্য কমনীয়তা এবং আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতার সহিতই সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু যে কাজটি হাতে লওয়া হইয়াছে তাহার বেশী আর কিছু করিবার প্রয়াস এখানে নাই, পদ্যের যে পুরাতন রীতিতে তিনি স্বীয় ভাষায় এমন সব আশ্চর্য্যময় জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার স্থলে কাব্যরচনার কোন নূতন নীতি প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্য নাই। যদি এরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। এই ইংরাজী গদ্যটী যদিও সুন্দর, ইহার সহিত মূল কবিতাটি তুলনা করিলেই বুঝা যায় যে, এই পরিবর্ত্তনের ফলে কতখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কৃতিত্বের সহিত একটা পরিবর্ত্তিত জিনিষ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজী পাঠক তৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কবির নিজ স্বভাবসিদ্ধ সুরের ইন্দ্রজাল একবার আস্বাদন করিয়াছে তাহার শ্রবণ মন ইহাতে কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। আর ইহা এইরূপই, যদিও বুদ্ধিগম্য সারার্থটি, সঠিক ও সুনির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারাটি অনুবাদে অনেক সময় আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, কারণ মূলে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়বস্তুটিকে চিন্তার সীমানাগুলিকে পুনঃ পুনঃ অতিক্রম করিয়া চলা হয়, সুর মাধুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে যে ব্যঞ্জনার তরঙ্গ উদ্ভূত হয় তাহার মধ্যে কখনও সে সব একেবারে ডুবিয়া যায়; যাহা বলা হইল, তাহা অপেক্ষা এত বেশী শুনা যায় যে অন্তরাত্মা শুনিতে শুনিতে সেই অনন্ততার মধ্যে ভাসিয়া যায় এবং বুদ্ধির সুস্পষ্ট অবদানটুকুর মূল্য অতি অল্প বলিয়াই গণনা করে। ঠিক এইখানেই কাব্যছন্দের মহত্তম শক্তি, ইহারই দ্বারা নবযুগের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে, এবং কাব্যের প্রাচীন রূপকে একেবারে ভাঙ্গিয়া না দিয়া কাব্য-রীতির নূতন নূতন প্রয়োগের দ্বারাই যে ইহা সম্ভব হইবে, রবীন্দ্রনাথের মাতৃ-ভাষায় রচিত গীতি-কবিতাগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

নব জাগরণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজি বাজ্‌ল বংশী প্রাণকুঞ্জে—
ধ্বনি' ধূসর দিগন্তর মন্থর অন্তর
সেই আলো বসন্তে মুঞ্জে!
ব্রত ধর্ম্মে—
শত কর্ম্মে—
এ কী রাঙ্‌ল শ্রান্তিহর লগ্ন!
এ কী জাগ্‌ল তরঙ্গিত স্বপ্ন:
যেন শ্রবণ শুন্‌ল তার চন্দ্রমা-ঝঙ্কার
নয়ন দেখ্‌ল রবিরন্ধ্র!
সেই রূপালি সোনালি করপুঞ্জে
কোটি অমৃতভৃঙ্গ বুকে গুঞ্জে:
ধ্বনি' ধূসর দিগন্তর মন্থর অন্তর
সেই আলো বসন্তে মুঞ্জে!

এ কী দীপ্‌ল বংশী প্রেমছন্দ!
যত পুঞ্জ বিষণ্ণতা ছুটল,—শুভব্রতা
দুরাশা টুটল অমাবন্ধ।
বাধা ঘুচায়ে—
লোর মুছায়ে—
এ কী জ্বল্‌ল অগুণ্ঠা প্রদীপ্তি!
তাহে ঘুচ্‌লো যে তৃষ্ণা-অতৃপ্তি:
যেন ঝরালো অভয়বারি পলকে মলয়বারি
ফুলে প্রতিদান দিল পৃথ্বী।
পেয়ে সে নব-মিলন-মধু-গন্ধ
হ'ল মলিন মরন্ত—জীবন্ত:
যত পুঞ্জ বিষণ্ণতা ছুটল,—শুভব্রতা
দুরাশা টুটল অমাবন্ধ।

বর্ষারাত্রি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

অন্ধকার গ্রামপথ, বরিষে আষাঢ়
সুষুপ্ত গহন রাত্রি, স্তব্ধ চারিধার।
একাকী নির্জ্জন গৃহে শুনিতেছি বসি'
অশ্রান্ত বর্ষণ-গান, বায়ু যায় শ্বসি'।
গম্ভীর গরজে মেঘ, চমকে বিজলী,
হেন রাত্রে আঁখি কার উঠে ছলছলি' ?

কে যেন চলিছে বনে, বাজিছে মঞ্জীর,
তিমিরে কাঁপিছে তার হৃদয় অধীর ;
বারিধারা সিক্ত তার সুনীল বসন
সম্বরি' চলিছে ধীরে চাপিয়া চরণ,
চলিয়াছে অন্তহীন যুগ যুগ ধরি'
কণ্টকিত কাননের পথ অনুসরি'।

গাগরীর বারি ঢালি' করিয়া পিছল
কণ্টক গাড়িয়া পথে, সামালি' আঁচল,
বরষার অভিসার শিখিয়া গোপনে
কে চলিত পাগলিনী প্রেমের স্বপনে ?
তিমির-কাননে তারি কম্পিত চরণ
বুঝিবা মিলায় ধীরে ছায়ার মতন।

তারি সাথে আজি মোর বিরহী পরাণ
নীরব বরষা রাত্রে করিছে প্রয়াণ।
ভাসিতেছে কানে কোন্ স্বপ্নময় সুর
চিরন্তন বেদনার—আকুল, মধুর।
অন্ধকার টানিয়াছে গাঢ় অন্তরাল;
আমারে ঘিরিয়া আছে অন্তহীন কাল

কোন্ সে মন্দির চির-নিরুদ্ধ-দুয়ার ?
চিরন্তনী বিরহিনী করে অভিসার ?
ভুজগে পূরিত পথ,—সংসার সুদূরে,—
আমি আজি চলিয়াছি সেই কল্পপুরে।
স্বপ্নাকুল দুই নেত্র, হৃদয় অধীর
রণিয়া রণিয়া ওঠে সুন্দর মঞ্জীর।

চিত্রে ভাব-সৌন্দর্য্য

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

কবি ও শিল্পী উভয়েই ভাবরাজ্যের অধিবাসী। কবি যেমন ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়া ভাবের প্রকাশ করেন, শিল্পীও তেমনি রেখা ও বর্ণসম্পাতে ভাবসৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ভাবহীন কবিতা যেমন নিরস এবং পাঠের অযোগ্য মনে হয়, ভাবসৌন্দর্য্যবিহীন চিত্রও তেমনি চিত্রানুরাগীর নিকট সমাদরের যোগ্য বিবেচিত হয় না। ভাবই চিত্রের প্রাণ। ভাবহীন চিত্র শিল্পীর অক্ষমতাই প্রকাশ করে।

চিত্রের অঙ্কন পদ্ধতি বা বর্ণবিন্যাস যথাযথ হইয়াছে কি না, তাহা কেবল চিত্রশিল্পী বা অভিজ্ঞ শিল্প-সমালোচকেরাই বলিতে পারেন; আমাদের মত সাধারণ শিল্পানুরাগী দর্শকের সে বিষয়ে কোন কথা বলার অধিকার নাই। কিন্তু কোন চিত্রের ভাবসৌন্দর্য্য দর্শনে আনন্দলাভ করিলে, সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলিলে বোধ হয় কাহারও পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কিউরেটর, শিল্পী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের অঙ্কিত যে কয়েকখানি চিত্র আমাদের আনন্দ দান করিয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাদের সামান্য পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

শিল্পীর অধিকাংশ চিত্রই রূপক। তিনি রূপকের মধ্য দিয়াই নিজের কৃতিত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন। "শবরী" চিত্রে যৌবন-পরিপুষ্টা তরুণী ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মানা, নয়নে তীব্র দৃষ্টি। চিরকুমারকে লক্ষ্য করিয়া তরুণী যেন বলিতেছেন—যৌবন-ধনু ও রূপ-শর দিয়া তোমায় বশ করিব। যদি তাহাতে অপারগ হই, আমার তূণে যে পঞ্চশর রহিয়াছে, সেগুলি একে একে নিক্ষেপ করিলে তোমাকে জয় করা কিছুতেই অসম্ভব হইবে না। নারী যে জগতের নরচিত্ত জয় করিয়া আসিতেছে, চিরকাল জয়

নতজন্ম
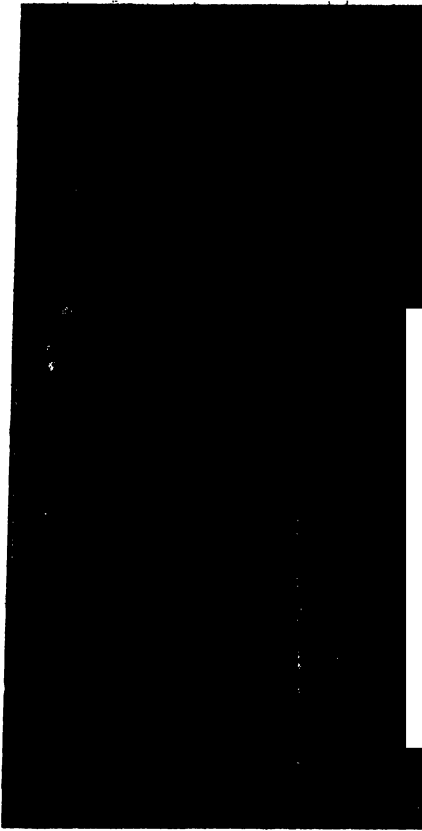
করিবে এবং নিজ শক্তি সম্বন্ধে তাহার আত্মপ্রত্যয় সর্ব্বদা জাগরূক, শিল্পী ইঙ্গিতে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

মাতা ধরিত্রী ভূগোলক রচনা একরূপ শেষ করিয়া, সর্ব্বশেষ তুলিকা পরিচালনার সময় যেন চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িয়াছেন। "বসুমতী" চিত্রে এই ভাবই প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রসাধন যেন কিছুতেই মনঃপূত হইতেছে না। এত করিয়াও হয়ত পৃথিবীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিলাম না—এই ভাবনা।

"বেসুরা" নৈরাশ্যের প্রতিমূর্ত্তি। পর্দ্দার অন্তরাল হইতে তরুণী নিজ প্রণয়ীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সসঙ্কোচে বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু নয়ন-মন যাহাকে চায় তাহাকে পাইতেছে না। নিরাশা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

"নষ্টজন্ম" চিত্রে, স্নানান্তে কলসী ভরিয়া জল আনিবার সময় তরুণী নারী পথমাঝে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ কানের দুলটী খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ায়, তাহা কুড়াইতে গিয়া গায়ের আবরণ ও কলসীর জল উভয়ই স্থানচ্যুত হইয়া যাইতেছে। তরুণীর অসহায় বিব্রত ভাবটী অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

"পল্লীশ্রী" প্রকৃতই পল্লীশ্রী। "প্রকৃতি" চিত্রের ভাবও সুন্দর।
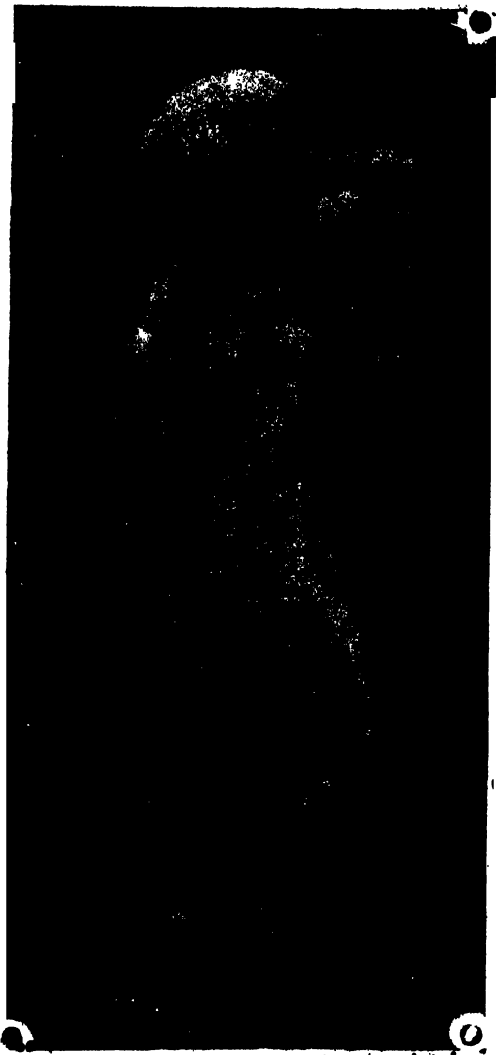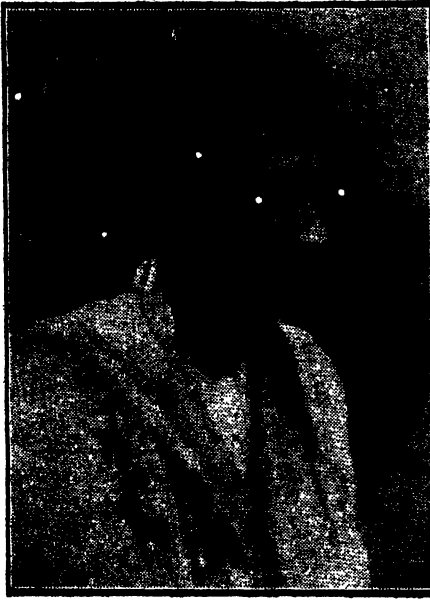
নিশীথ রাত্রি

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

"নিশীথ রাত্রি" চিত্রখানি ভাবসৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। নিশীথ রাত্রের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাকিরণে পৃথিবীর নগ্ন সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্ধকারের আবরণে পৃথিবীর যে সৌন্দর্য্য এতক্ষণ লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, তাহা যেন সুন্দরী তরুণীরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত। এই রূপ অতি স্নিগ্ধ ও পবিত্র। ইহাতে রৌদ্র কিরণদীপ্তির তীব্রতা নাই। ইহা অন্তরে কোন কামনার উদ্রেক করে না, স্নিগ্ধতাই প্রদান করিয়া থাকে।

কয়েকখানি প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রও চিত্রানুরাগীর আনন্দদায়ক। "সাগরিকা" চিত্রে অনন্ত সমুদ্রের কূলে মাতা শিশুসন্তানসহ ঝিনুক সংগ্রহ করিতেছেন। অনন্তের কাছে আমরা সকলেই শিশু—অতি ক্ষুদ্র। সেখানে মাতা ও শিশুর ব্যবধান কিছুই নাই।

"কাঞ্চনজঙ্ঘা" তুষারমণ্ডিত হিমালয় শিখরের চিরসুন্দর অতুলনীয় দৃশ্য।

"কর্ণফুলী"—নদীর বাঁকের মুখের কতকাংশের দৃশ্য। নদীবক্ষে কয়েকখানি 'সাম্পান' নৌকা ও দুই তীরের মনোরম দৃশ্যে চট্টলভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

শিল্পীর তুলিকা সেখানেই সার্থক, যেখানে চিত্রানুরাগী তাহার জয়গান করে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

একলব্য

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

পরাজয় নহে গুরু, এ আমার জয়,—
বরেণ্য বিজয়—দীপ্ত-রক্তরাগময়!
মুখে হাসি, তবু—তবু অশ্রুবাষ্প চোখে?
উদ্ভাসিত দিবা মোর ত্যাগের আলোকে;—
জয়ের আনন্দ মোর আজি যে অসহ!
হে গুরু, দক্ষিণ করে দক্ষিণা এ লহ।

শিষ্যশ্রেষ্ঠ অভিজাত অর্জ্জুন তোমার,
কেন তার অধোমুখ?—বিন্দুও আমার
নাহি ক্ষোভ, অনুযোগ। আমি শুধু ভাবি,
অখ্যাত, অজ্ঞাত—তার নিভৃত সাধনা
গৌরবী গর্ব্বীরে দিল কিসের বেদনা?
গুণ—তারো 'পরে হায় কর্ণ রাখে দাবী?

সে তোমার প্রিয়—তুমি দিলে তারে প্রেয়
আমি দীন,—দয়া তব—লভিয়াছি শ্রেয়॥

নব্য জড়বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক এরিষ্টটল্ (Aristotle) প্রণীত Deductive Logic বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করিলেও বেকন্ (Bacon) প্রবর্ত্তিত Inductive method হইতেই প্রধানতঃ আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। নিউটন্ (Newton) গ্যালিলিও (Galileo) প্রভৃতি মনীষিগণের অক্লান্ত বারি-সেচনে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া এক্ষণে মহামহীরূহে পরিণত হইয়াছে। নিউটন্ জড়জগৎকে যে দিক্ হইতে দেখিয়াছিলেন তাঁহার অসামান্য প্রতিভাচ্ছটায় উদ্ভাসিত পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে নব্য বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বপন্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য একদিক্ হইতে বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কিয়দংশ পূর্ব্ব হইতে পরিজ্ঞাত থাকিলেও স্থূলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ফরাসী পণ্ডিত লাবুসিয়ার (Lavoisier) কর্ত্তৃক নব্য রসায়ন-বিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের মতে জগতে লক্ষাধিক বিভিন্ন প্রকার পদার্থের সমাবেশ দৃষ্ট হইলেও কিঞ্চিন্ন্যূন একশত মূল পদার্থের (elements) সংযোগে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রাচীন গ্রীস্ দেশীয় পণ্ডিত ডিমক্রিটস্ (Democritus) লেউসিপাস (Leucippus) এবং লিউক্রেটিয়াস (Lucretius) এর পরমাণুবাদ অনুসরণ করিয়া সকল ভূত পদার্থ (elements) অতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণাসমষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—এই মতের পোষকতায় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ড্যালটন (Dalton) তাঁহার নব পরমাণুবাদ প্রবর্ত্তিত করেন। অস্মদ্দেশে মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক-দর্শনেও ঐ মতের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। দার্শনিকপ্রবর হারবার্ট স্পেনসর (Herbert Spencer) এবং যতিশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য উভয়েই প্রায় এক প্রকার যুক্তির দ্বারা পরমাণুবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরমাণু যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহার দক্ষিণ ও বাম দিক্ আছে; অতএব তাহাকে কোন প্রকারে বিভক্ত করিতে পারা যায় না—ইহা কল্পনাবিরুদ্ধ। যাহা হউক উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ বিজ্ঞান-জগতে আদৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ তিনটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত জাগতিক প্রক্রিয়ার রহস্য উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। প্রথম—জড়ের আকারগত নানা প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইলেও তাহার বস্তু-পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না (conservation of mass)। দ্বিতীয়—শক্তি (energy) উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও তন্মধ্যে একের কিয়দংশের বিনিময়ে অন্যের নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং সমগ্র শক্তির পরিমাণের ইতরবিশেষ হয় না (conservation of energy)। তৃতীয়—কার্য্যকারণবাদ (causation)। নির্দ্দিষ্ট কারণ উপস্থিত হইলে তদনুরূপ কার্য্য অবশ্যই সাধিত হইবে। প্রকৃতি সুগঠিত রাজ্যতন্ত্রের ন্যায় আপনার নিয়মজালে আপনি বদ্ধা। তাহার পক্ষপাতিত্ব দোষ, স্বৈরাচার বা কোনরূপ খামখেয়ালী ভাব নাই।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ক্রুক্স্ (Crookes) নামে এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কাচের নলের ভিতর হইতে বায়ু নিষ্কাষণ করিয়া তন্মধ্যে তড়িৎ সঞ্চালিত করিয়া এক প্রকার অতি বেগে ধাবমান উজ্জ্বল সূক্ষ্ম কণাশ্রেণী আবিষ্কার করেন। এই কণাগুলির গুণ কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের গুণের বিসদৃশ বলিয়া তিনি ইহাদিগকে জড়ের "চতুর্থ বিকৃতি"

(fourth state of matter) এই আখ্যা দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ নানা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে ইহা স্থূল জড়পদার্থ নহে, কেবল ইলেক্‌ট্রন (electron) নামে এক প্রকার তড়িৎকণা। এই ইলেক্‌ট্রনের আকার ও গুণাবলী অনেক পরিমাণে নির্ণীত হইয়াছে। ইহাদিগকে এতাবৎ কেহ ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ বা বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই। পরবর্ত্তী কালে প্রোটন (proton) নামে আর এক প্রকার বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তড়িৎকণা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইলেক্‌ট্রন অপেক্ষা প্রোটনের গুরুত্ব প্রায় ১৮৫০ গুণ অধিক।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এম্, বেকারেল (M. Becquerel) ইউরেনিয়ম নাইট্রেট্ (uranium nitrate) নামক পদার্থ-বিশেষ হইতে উদ্ভূত এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মি দ্বারা অন্ধকার গৃহেও ফটোগ্রাফ ছবি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে রদারফোর্ড (Rotherford) ও অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক এইরূপ গুণবিশিষ্ট আরও কয়েকটি পদার্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মাদাম কারি (Mme. Curie) নাম্নী এক ফরাসী বিদুষী পিচ্‌ব্লেণ্ড (Pitch Blende) নামক এক প্রকার খনিজ পদার্থ হইতে বহু আয়াসসাধ্য পরীক্ষা দ্বারা রেডিয়াম (Radium) নামক এক প্রকার ধাতু প্রাপ্ত হন; তাহা হইতে ঐরূপ রশ্মি বহুল পরিমাণে উদ্ভূত হয়। এই প্রকার পদার্থকে রেডিও-একটিভ্ (Radio-active) পদার্থ বলে। রেডিয়াম্ জাতীয় পদার্থ হইতে ক্রমাগত উত্তাপ ও তিন প্রকার রশ্মি বিকীরিত হয়; তন্মধ্যে দুই প্রকার রশ্মি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী তড়িৎকণা হইতে উদ্ভূত এবং চুম্বকসান্নিধ্যে বিপরীত দিকে বক্রভাবাপন্ন হয়, কিন্তু তৃতীয় রশ্মির কোন পরিবর্ত্তন হয় না এবং তাহা রন্‌জেন্‌রশ্মির ন্যায় কাষ্ঠাদির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে রেডিয়াম্ হইতে অবিশ্রান্তভাবে ভূরি ভূরি ইলেক্‌ট্রন উদ্গত হইতেছে। এই রেডিয়াম বর্ত্তমানকালে ক্যান্‌সার (cancer) রোগচিকিৎসায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে রেডিয়াম ধাতুতে এত অধিক পরিমাণ শক্তির সমাবেশ কি প্রকারে সম্ভব হয়? শক্তির অক্ষুণ্ণতা (conservation of energy)র নীতি হইতে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিলেন যে রেডিয়াম-এর পরমাণুগুলির মধ্যে ইলেক্‌ট্রনগুলি অবস্থিত ছিল এবং পরমাণুগুলি স্বতঃই ভগ্ন হওয়াতে তন্মধ্য হইতে ইলেক্‌ট্রন্ বিকীরিত হইতেছে। এইরূপে নানা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে পরমাণুগুলি অবিভাজ্য নহে। প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রভূত শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; পরমাণুগুলি ভগ্ন হইলে সেই শক্তির বিকাশ হয়। দশ মণ অঙ্গার দগ্ধ করিলে যত শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় এক গ্রেণের শতাংশ পরিমাণ হাইড্রোজেন বায়ুর পরমাণুগুলি চূর্ণ হইলে ততোধিক শক্তির উদ্ভব হয়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে জগতে প্রতিদিন অগ্নি-উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণে খনিজ অঙ্গার ব্যবহৃত হইতেছে, সেইরূপ ব্যবহৃত হইলে সহস্র বৎসর পরে ভূগর্ভে আর অঙ্গার প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ হইবে, এবং অঙ্গারই সমস্ত সভ্যতার মূল বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে কয়েক শতাব্দী পরে বর্ত্তমান সভ্যতার গতি প্রতিরুদ্ধ হইবে, পরমাণুর অন্তর্নিহিত প্রভূত শক্তির আবিষ্কার হেতু তাঁহারা বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হইবেন। এবং "সমস্ত জাগতিক শক্তি ক্রমশঃ উত্তাপে পরিণত হইয়া অকার্য্যকরী হইতেছে এবং কোটী কোটী বৎসর পরে জগতের প্রলয় সম্ভবপর"—লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) অশীতি বৎসর পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া বিজ্ঞান-জগতে যে চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় কথঞ্চিৎ উপশমিত হইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রত্যেক পরমাণু ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন দ্বারা নির্ম্মিত। সৌরজগতে সূর্য্যের ন্যায় প্রোটন একাকী অথবা ইলেক্‌ট্রন ও অন্যান্য প্রোটনের সমভিব্যাহারে পরমাণুর কেন্দ্র স্থলে উপবিষ্ট এবং ইলেক্‌ট্রনগুলি গ্রহাদির ন্যায় তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান। মূল পদার্থের (element) পরমাণুর গুরুত্ব ও গুণাবলী ঘূর্ণায়মান ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। এইরূপে সর্ব্বাপেক্ষা লঘু হাইড্রোজেন (Hydrogen) পরমাণুতে একটি প্রোটনের চতুর্দ্দিকে একটি মাত্র ইলেক্‌ট্রন ঘুরিতেছে এবং গরিষ্ঠ ইউরেনিয়ম ধাতু পরমাণুতে অনেক সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন ঘূর্ণায়মান। বিশেষ বিশেষ কারণে

এক পরমাণুর দুই একটি ইলেক্‌ট্রন স্ব স্ব কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পরমাণুর প্রোটনের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করে। সুতরাং পরমাণুদ্বয়ের গুণাবলীর তারতম্য লক্ষিত হয়। প্রকৃষ্ট উত্তাপ ও অন্যান্য কারণে ইলেক্‌ট্রনগুলির নৃত্যভঙ্গীও বৃত্তাকার হইতে বৃত্তাভাসাকারে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রোটনগুলি কেবল-মাত্র সম্রাটের ন্যায় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সানন্দে ইলেক্‌ট্রনদিগের উদ্দাম নৃত্য দর্শন করে। এই নৃত্যের অবসান হইলে পরমাণুর অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। সুতরাং ড্যালটনের পরমাণুবাদ কিয়ৎ পরিমাণে ভিত্তিহীন হইল। জগতে কেবল মাত্র ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন রাজত্ব করিতেছে। তাহারা ক্রীড়াচ্ছলে পরমাণু গঠন করিতেছে ও ভগ্ন করিতেছে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে রেডিয়াম হইতে বিকীরিত রশ্মি হইতে হেলিয়ম (Helium) নামক এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ ও সীসক (Lead) উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং স্পর্শমণির (Philosopher's stone) সাহায্যে তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করা আর কবি-কল্পনা বা রূপকথা মাত্র নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অধ্যাপক জে, জে, টমসন্ (J. J. Thomson) গণিতসম্বন্ধীয় গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে তড়িৎ-সংযুক্ত বস্তু (electrified body) গতিশীল হইলে তাহার বস্তু পরিমাণ (mass) বর্দ্ধিত হয়, এবং তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ এই মতবাদের অনুকূলে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি একটি মাত্র তড়িৎকণার (ইলেকট্রনের) বেগ বর্দ্ধিত হইলে তাহারও বস্তুপরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। যদি কোন ইলেক্‌ট্রনের বেগ আলোকের গতির সহিত সমান হয় অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল হয় তাহা হইলে তাহার জড় পরিমাণ অসীম (infinite) হইবে এবং তাহা একই সময়ে পৃথিবী ও সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী নক্ষত্র স্পর্শ করিবে। এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে ইলেকট্রনের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১০০০০০ মাইল পর্য্যন্ত হইতে পারে। এবং যেহেতু প্রত্যেক জড়পদার্থ ইলেক্‌ট্রন দ্বারা নির্ম্মিত, অতএব প্রত্যেক জড়পদার্থ গতিশীল হইলে তাহারও বস্তু-পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে এবং প্রতি সেকেণ্ডে তাহার বেগ ১৮৬০০০ মাইল হইলে তাহারও বস্তুপরিমাণ অসীম হইবে। অতএব কোন জড় পদার্থের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইলের অধিক হইতে পারে না। ইহাই জড়ের বেগের শেষ সীমা। সুতরাং প্রত্যেক পরমাণুর দুই প্রকার বস্তু-পরিমাণ আছে—স্থিতিজ বা গতিজ। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি পরিবর্ত্তনশীল। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত—যে জড়ের বস্তুপরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না (mass of a body remains constant)—তাহা এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। আধুনিক মতে জড়ের বস্তুপরিমাণ তাহার গতিসাপেক্ষ (mass of a body is a function of its velocity)।

বৈজ্ঞানিকগণের মতে উত্তাপ নামে কোন বস্তুবিশেষ নাই। কোন জড় পদার্থের পরমাণুগুলি কম্পান্বিত হইলে তাহাতে উত্তাপ বোধ হয়। এবং কম্পনের পরিমাণের তারতম্যে তাহার উষ্ণতাবেরও (temperature) হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় পদার্থের পরমাণুগুলি একেবারে নিশ্চল হইলে তাহার যে শৈত্যভাব উৎপন্ন হইবে তদপেক্ষা অধিকতর শৈত্যভাব (low temperature) আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সেণ্টিগ্রেড্ তাপমান যন্ত্রের (thermometer) তুষারবিন্দু (freezing point) হইতে ২৭৩ ডিগ্রি নিম্নে এইরূপ অবস্থার উৎপন্ন হয়। অতএব কোন পদার্থের শীতলতা উক্ত শৈত্যভাব অপেক্ষা নিম্নতর হইতে পারে না। এইরূপে বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গতিশীলতাই জীবনের পরিচায়ক।

এ স্থলে পূর্ব্ব পক্ষ হয়ত আপত্তি করিতে পারেন যে পরিশ্রমকাতর, সদাবিশ্রামশীল ধনীগণের উদরের বহির্ভাগের পরিধি ও আয়তন গতিবিহীন হইয়াও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। তদুত্তরে বৈজ্ঞানিক বলিবেন যে ধনী ব্যক্তিগণ কিঞ্চিন্মাত্র গতিশীল হইলে তাঁহাদের উদরের অনাবশ্যকীয় মাংস ও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেহকে শক্তিশালী করিত।

বৈজ্ঞানিকগণ ইথর (Ether) নামে একপ্রকার সর্ব্বব্যাপী রূপরসাদি-গুণবিহীন অতীন্দ্রিয় পদার্থের কল্পনা করেন।

জড়ের অণু-পরমাণুমধ্যেও এই ইথর বর্ত্তমান থাকিলেও জড়ের গুণ ইহাতে লক্ষিত হয় না। অনেকগুলি ইথরের সুরম্য মূর্ত্তি যথাবিহিত পূজান্তে যথাক্রমে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। এক্ষণে কেবলমাত্র আলোকবাহী ইথর (luminiferous ether) বিজ্ঞান-মন্দিরে পূজিত হইতেছে। এই ইথরগুলি লৌহ অপেক্ষা অধিকতর স্থিতিস্থাপক (elastic) ও কঠোর এবং বায়ু অপেক্ষাও তরল ও মৃদু (subtle),—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি"। সুতরাং ইথরের প্রকৃত স্বরূপ সাধারণ মানবের অগোচর হইলেও সাধনতৎপর বৈজ্ঞানিক যোগিগণের ধ্যাননেত্রে দৃষ্ট হয়। ইহার একমাত্র গুণ কম্পনশীলতা। ইহার কোন অংশ আন্দোলিত হইলে সেই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। লর্ড সল্‌স্‌বারী (Lord Salisbury) তাঁহার এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে ইথর কিরূপ তাহা হইলে আমি বলিব যে ইহা আন্দোলন-ক্রিয়ার কর্ত্তা (nominative case to the verb "to undulate"। ইথরের এই আন্দোলন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া জড়মধ্যস্থ ইথর-কণাগুলিকে স্পন্দিত করিলে তাহা হইতে আলোক উৎপন্ন হয়। এইরূপে আলোক স্বয়ং অদৃশ্য হইয়াও অন্যকে আলোকিত করিতে পারে। এই জড়মধ্যস্থ ইথর-কণাগুলির স্পন্দন সংকীর্ত্তনে নৃত্যের ন্যায় সংক্রামক, এবং তজ্জন্য জড়কণাগুলিও স্পন্দিত হইলে তাহা হইতে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এইরূপে ইথর-কণাগুলির স্পন্দনের তারতম্যে উত্তাপ ও আলোকের উদ্ভব হয় এবং তাহার আতিশয্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যে সমস্ত অদৃশ্য রশ্মি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহায়তা করে তাহাদিগকে আল্ট্রা ভাওলেট্ (ultra-violet) রশ্মি বলে।

তড়িৎসংযুক্ত বস্তু (electrified body) এবং চুম্বক ও গতিশীল তড়িতের চতুর্দ্দিকে যে প্রভাব দৃষ্ট হয় তাহাদের হ্রাস বৃদ্ধিবশতঃ ইথরে ঘাত-প্রতিঘাতজনিত (the stress and the strain) যে বিক্ষোভের উৎপত্তি হয় ম্যাক্‌সোয়েল (Maxwell)-এর মতে তাহাই আলোকের উৎপাদক। এবং বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় তড়িৎস্পন্দনজনিত (electric oscillation) ইথরে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহাও আলোকের গতিতে প্রবাহিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ অধ্যাপক হার্ট্‌স্ (Hertz) পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ ইথর তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রথমে প্রমাণিত করেন। পরে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও মারকণি (Marconi) এই বিষয়ে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু স্যার জগদীশচন্দ্রের "বাঙ্গালী মস্তিষ্ক" ক্রমশঃ তড়িৎ বিজ্ঞান হইতে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইয়া অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে, এবং মারকণির ইউরোপীয় "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি" বেতার টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। মহাসমরের সময় হইতে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক মারকণির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বেতার টেলিফোন যন্ত্র উদ্ভাবন করিলে এক্ষণে রেডিও কোম্পানির সৌজন্যে বহু দূরে গীত সুমধুর সঙ্গীত কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে প্রত্যেক পল্লীতে এবং এমন কি প্রত্যেক গৃহে গৃহে শ্রুত হইয়া জনসাধারণের কৌতূহল ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

এই সমস্ত ব্যাপার সাধনের জন্য কেবল ইথরই ধন্যবাদার্হ। ইথর সর্ব্বশক্তির আধার। কোন জড় পদার্থ উত্তোলন করিলে তজ্জন্য যে শক্তির আবশ্যক হয় সেই পদার্থ সন্নিহিত ইথরকে তাহা উপঢৌকন প্রদান করে; এবং তাহার পতন-কালে ইথর দয়াপরবশ হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে সেই শক্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করে। সুতরাং ইথর কেবলমাত্র শক্তির ভাণ্ডার নহে, অপিচ শক্তি-বণ্টনকারী। জড়জগতে ইথরই সর্ব্বময় কর্ত্তা, সুতরাং ইথরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিকের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও ম্যাকসোয়েল, কেলভিন প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত এক সুরে বলিয়াছিলেন যে ইথরের অস্তিত্বের প্রমাণ জড়ের অস্তিত্বের প্রমাণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। মোহনবাগানের ফুটবল ম্যাচ, এম্-সি-সির ক্রিকেট ম্যাচ, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিশ প্রহরীগণের মৃদু লাঠি-চালনা সত্ত্বেও যে সকল হতভাগ্যের অদৃষ্টে দৃষ্ট হইল না, তাহাদের যেরূপ জন্ম বিফল হয়, তাহারা "কৃপণ" এবং ক্রীড়ামোদী সুধীগণের কৃপার পাত্র হয়, সেইরূপ ইথরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই বৈজ্ঞানিকগণের অতিশয় কৃপার পাত্র

হইয়াছিল। এক্ষণে জগৎ কেবল ইথর, ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনের লীলাভূমি। প্রোটন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইলেক্‌ট্রনকে ইথরের বিকৃতিবিশেষ বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অনুমান করিয়াছিলেন যে ইথর এক রস (homogeneous uniform) নহে। তাহার মধ্যে মধ্যে অবকাশ বা ফাঁক আছে। এই ফাঁকগুলিই ইলেক্‌ট্রন্ এবং ইহাদের দৌড়াদৌড়িতে জড়ের পরমাণু উৎপন্ন হয়। সুতরাং যে পদার্থের পরমাণুতে অধিক সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন্ আছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে সেই অনুপাতে লঘু। ইলেক্‌ট্রন্ ইথরের ফাঁক হইলে জড়জগৎও ফাঁকি বা অসৎ হইয়া গেল। যাহা হউক অন্যান্য বৈজ্ঞানিক এই মতবাদ অনুমোদন করেন না। বিজ্ঞান বেদান্তের তোরণ-দ্বারে উপনীত হইয়াও তন্মধ্যে প্রবেশ-লাভ করিতে পারিল না।

সমপাঠিগণের বিদ্রূপবাক্য, শিক্ষক মহাশয়ের বেত্রাঘাত ও পরীক্ষকের ভ্রূকুটির ভয়ে ভূগোলপাঠার্থী অনেক বালক, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হইলেও সূর্য্যকে গতিশীল বলিতে সাহসী হয় না। কিন্তু মেকানিক্‌স্ (mechanics) পাঠার্থী বালক মাত্রেই জানে যে গতি ও স্থিতি অন্যোন্যসাপেক্ষ (Relative) নিরপেক্ষ বা ঐকান্তিক (absolute) নহে। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে কোন একটিকে কেন্দ্র মনে করিলে, অপরটি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া মনে করা যায়। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণের মতে আকাশস্থ কোটি কোটি নক্ষত্র, পরস্পরের নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থিত থাকিয়া, প্রতি সেকেণ্ডে বহু সহস্র মাইল বেগে অবিশ্রান্তভাবে দৌড়িতেছে। আমাদের সূর্য্যও এইরূপ একটি নক্ষত্র এবং ইহাও ঘূর্ণায়মান গ্রহ-উপগ্রহাদি পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে ক্রমাগত ধাবিত হইতেছে। গম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন সমস্ত 'জগৎ' সর্ব্বদাই গতিশীল। দৃশ্যমান নক্ষত্ররাজ্য হইতে কোটী কোটী মাইল দূরে কোন পদার্থ নিরপেক্ষ স্থিতিসুখ (absolute rest) উপভোগ করিতেছে কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই।

আলোকের গতি অত্যন্ত অধিক হইলেও পূর্ব্ব পশ্চিমে ধাবমানা পৃথিবীর গতির সহিত তুলনায় তাহার আপেক্ষিক গতির উত্তর দক্ষিণ অপেক্ষা পূর্ব্ব পশ্চিমে কিঞ্চিৎ হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মাইকেলসন (Michelson) এবং মর্লের (Morley) পরীক্ষা দ্বারা ঐরূপ কিছুমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষিত হইল না। বৈজ্ঞানিকগণ আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত না হওয়ায় স্তব্ধ হইলেন। অনেকের ললাটে ইথরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের রেখা দৃষ্ট হইলেও তাহারা "চিত্রার্পিতারম্ভের" ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন— (as a painted ship upon a painted ocean)। ইথর-সাম্রাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী আর অধিক দিন শান্তি সুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না, কারণ কমলা সতত চঞ্চলা। অবশেষে ফিট্‌জিরাল্ড্ (Fitzerald) এবং লোরেঞ্জ (Lorenz) ইথরের পক্ষ হইতে ওকালতনামা গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান-আদালতে সওয়াল জবাব করিতে আরম্ভ করিলেন। লোরেঞ্জ বলিলেন "তোমাদের গোড়ায় গলদ হইয়াছে, কোন একটি মাপকাঠি উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত থাকিলে তাহার যে দৈর্ঘ্য থাকে পূর্ব্ব পশ্চিমে থাকিলে তাহার দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয়।" লোরেঞ্জের এই উক্তিতে প্রতিবাদিগণ তাঁহাকে উপহাস করিবেন ও বিকৃতমস্তিষ্ক বলিবেন, ব্যবসায়িগণ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন, কবিরাজ মহাশয় তাঁহার বায়ু প্রশমনের জন্য মধ্যমনারায়ণ তৈলের ব্যবস্থা করিবেন, মনস্তত্ত্ববিৎ চিকিৎসক তাঁহাকে রাঁচি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবেন, এবং নবীন প্রত্নতাত্ত্বিক বাগবাজারে তাঁহার পৈত্রিক আবাসের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের জন্য সুগভীর গবেষণা করিবেন। সে যাহা হউক এইরূপ বহু বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি দ্বারা জগতে অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। কলম্বসের ভূপ্রদক্ষিণ-পরিকল্পনা তাৎকালিক অনেক পণ্ডিতের নেত্রে উন্মাদের লক্ষণ স্বরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল। গৌতম-বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাতুলাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল বাতুলের অভীষ্টসিদ্ধি হইতে তাঁহারা মহাপুরুষাখ্যা প্রাপ্ত হন, এবং তদ্বিপর্য্যয়ে উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। লোরেঞ্জের শিষ্যগণ বলেন যে তাঁহার উক্তি অযৌক্তিক নহে। দ্রুতগামী বাষ্পীয়পোতের আরোহীগণ মনে করেন যে তাঁহারা স্থির আছেন, কেবল বায়ু তন্মধ্য দিয়া অতি প্রবল বেগে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং বায়ুর চাপে পোতের দৈর্ঘ্য কিঞ্চিন্মাত্র

হ্রাস হইয়া যায়। এইরূপে বৈজ্ঞানিকগণ গণিতের সাহায্যে নির্ণয় করিয়াছেন যে পৃথিবী ঠিক গোলাকার হইলে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২০ মাইল বেগবশতঃ তাহার পূর্ব্বপশ্চিমের ব্যাস ৬০০ ফুট ক্ষুদ্রতর হইয়া যাইত। অতএব পূর্ব্বপশ্চিমে অবস্থিত প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্যের ন্যূনতা হওয়া অসম্ভব নহে। লোরেঞ্জ আকাশ (space) সম্বন্ধে আর একটি নূতন কথা বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কোন জড় পদার্থের বেগ আলোকের বেগ অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। অতএব দুইটি জড়কণা বিপরীত দিকে আলোকের গতিতে ধাবিত হইলে তাহাদের আপেক্ষিক বেগ আলোকের বেগের দ্বিগুণ হইয়া যায়। কিন্তু, যে হেতু তাহা অসম্ভব, অতএব তন্মধ্য আকাশ স্বতঃই ক্ষুদ্রতর হইয়া যাইবে। যাহা হউক লোরেঞ্জের এই যুক্তিযুক্ত উক্তিতে নবীন বৈজ্ঞানিকদল (extremist) আশ্বস্ত হইলেন না। তাঁহারা ইথরের অধীনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্ত্তে পূর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতী। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যপদেশে সূক্ষ্মদর্শী রাজপুরুষগণ সি, আই, ডি-রূপ অনুবীক্ষণে বঙ্গদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্রোহের রেখাচ্ছায়া দর্শন করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে জার্ম্মেণীর এক প্রান্তদেশে নাজী (বা নাট্‌সী) বিধ্বস্ত ইহুদী-জাতীয় আইনষ্টাইন্ (Einstein) নামে এক বীণাবাদক "হরিজন" ইথর-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশিত ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন যে কোন বস্তুর নিরপেক্ষগতি নির্ণয় করা অসম্ভব। "Nature is such that it is impossible to determine absolute motion by any experiment whatever।" ইহাই তাঁহার আপেক্ষিকবাদের Relativity) মূল সূত্র। দ্বিতীয় জড়কণা ব্যতিরেকে কেবল ইথরের সহিত তুলনায় কোন বস্তুর গতিকে তাহার ঐকান্তিক বা নিরপেক্ষগতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইথরের এরূপ কোন লক্ষণ নাই যদ্দ্বারা ঐ প্রকার বেগ নির্ণয় করিতে পারা যায়। অতএব প্রমাণাভাব হেতু ইথরের অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইয়া যায়। দেশ ও কালের (space এবং time) মধ্যে এক নূতন সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আইনষ্টাইন্ ইথরের অধীনতা স্বীকারে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। দেশ ও কালের মধ্যে প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। ইংলণ্ডের প্রাচীন দার্শনিক লকের (Locke) মতে আমাদের মনে বিভিন্ন ভাবোদয়ের পারম্পর্য্যের উপর সময়ের জ্ঞান নির্ভর করে। ডেকার্টের (Descartes) মতে বিভিন্ন জড় পদার্থের অবস্থিতি বশতঃ তন্মধ্যস্থ আকাশের প্রতীতি জন্মে। ম্যাক্সোয়েলের মতে আকাশ সম্পূর্ণ গতিহীন ভাবে নিশ্চল ("immovably fixed") এবং সময় সমবেগে প্রবহমান (uniformly flowing)। হার্বার্ট স্পেনসরের মতে দেশ ও কাল সান্ত কি অনন্ত তাহার কোনটিই আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যাহা হউক এই সকল দার্শনিকদিগের মতে দেশ ও কাল সম্পূর্ণ পৃথক্ তত্ত্ব। প্রত্যেক বস্তুর যেমন দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ আছে, আকাশেরও সেইরূপ তিনটি দিক্ (dimension) আছে। তদতিরিক্ত দিক আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আইনষ্টাইন্ বলিলেন যে সময়ই আকাশের চতুর্থ দিক্ (Time is the fourth dimension of space) কোন সামতলিক ক্ষেত্রে একটি জড়কণার গতি নির্দ্দেশ করিতে হইলে, ঐ ক্ষেত্রের একটি বিন্দু হইতে দুইটি সরলরেখা পরস্পর লম্বভাবে অঙ্কিত করিতে হয়—একটি সময়ের এবং অন্যটি দূরত্বজ্ঞাপক; এবং তন্মধ্যস্থ একটি রেখা দ্বারা ঐ জড়কণা কোন্ সময়ে কতদূর গমন করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা যায়। পূর্ব্বোক্ত রেখাদ্বয় ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতিজ্ঞাপক নহে; তাহারা আকাশের একদিক (dimension of space) এবং সময়ের সমন্বয়। এইরূপে আকাশে কোন এক জড়কণার অবস্থিতি নিরূপণ করিতে হইলে কোন এক বিন্দু হইতে তিনটি সরল রেখা পরস্পর লম্বভাবে অঙ্কিত করিতে হয় এবং রেখাত্রয় হইতে ঐ জড়কণার দূরত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তাহার অবস্থান (position) নির্ণীত হয়। কিন্তু ঐ জড়কণা গতিশীল হইলে তাহার গমনরেখানির্দ্দেশক আকাশে কালের একটি দিক্ অনুমান করা আবশ্যক। সুতরাং দেশ ও কাল অন্যোন্যসাপেক্ষ। এই দেশকাল-সমন্বয়কে আইনষ্টাইন্ Time-space continuum আখ্যা দিয়াছেন। এক সময়ে এক ব্যক্তিকে গৃহের ছাদ হইতে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া আইনষ্টাইন্ তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট যাইয়া তিনি আহত হইয়াছেন কিনা তদ্বিষয়ে প্রশ্ন না

করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যখন পড়িয়া যাইতেছিলে তখন দেশকাল সম্বন্ধে তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল?" নব্য তরঙ্গবাদ (Wave mechanics) গতিশীল ইলেক্‌ট্রনকে তরঙ্গের ন্যায় কল্পনা করে। একটিমাত্র ইলেক্‌ট্রন ঘূর্ণায়মান হইলে আকাশ সম্বন্ধে তাহার তিন দিক্ (dimensions) এবং সময় সম্বন্ধে এক দিক্ (dimension)। এইরূপ দুইটি ইলেক্‌ট্রন ঘূর্ণায়মান হইলে আকাশ সম্বন্ধে প্রত্যেকের তিন দিক্ কিন্তু কাল সম্বন্ধে এক দিক্; সুতরাং একত্র যোগে আকাশের সাত দিক্। এইরূপ তিনটি ইলেক্‌ট্রন গতিশীল হইলে, আকাশ সম্বন্ধে তাহাদের নয় দিক্ এবং কাল সম্বন্ধে এক দিক্; একত্র যোগে আকাশের দশ দিক্। এইরূপে আকাশের নানাদিক্ অনুমিত হইলেও সময়ের কেবলমাত্র একটি দিক্ আছে। ভূত ভবিষ্যৎ নাই; আছে কেবল বর্ত্তমান। "সূত্রে মণিগণের" ন্যায় সমস্ত জাগতিক ঘটনা কেবল কালেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, আমরা তাহাদের পর পর দেখি মাত্র। কাল "অখণ্ড একরস," দেশ ও কাল "বাক্য ও অর্থের ন্যায় সম্পৃক্ত"। ব্যোমরূপী প্রকৃতি লোহিত, শুক্ল কৃষ্ণ ইতি ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও মহাকালরূপ পুরুষ গুণহীন, অথবা কেবল "সৎ"-গুণ-সম্পন্ন। ব্যোমরূপী প্রকৃতির মহদাদি আকারে নানা অভিব্যক্তি হইলেও মহাকালরূপ পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নিরবস্থ, নিরঞ্জন। ব্যোমরূপী প্রকৃতি দশদিক্-বর্ত্তিনী দশমহাবিদ্যারূপিণী দশপ্রহরণধারিণী হইলেও মহাকালরূপ পুরুষ কেবল "ঈশান" দিগ্‌বর্ত্তী, অবিদ্যাদি দোষবিমুক্ত, এবং এক প্রহরণধারী—শূলপাণি। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন যে আকাশের বহু দিক্ কল্পনা "অধ্যাসমূলক" "অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিমাত্র"। তৎ-প্রত্যুত্তরে বৈজ্ঞানিক বলিবেন, যে গণিত তাহার আর্ষ দৃষ্টিতে, যে মুক্তি ধ্যানে, উপলব্ধি করিয়াছে সেই অপেক্ষানু-ভূতির পরিকল্প বহির্জগতে লক্ষিত না হইলেও গণিতের সিদ্ধান্তের ইতরবিশেষ হয় না।

এইরূপে নব্য বৈজ্ঞানিকদল ইথরের সাহায্য না লইয়া সমান্তর দ্বিতীয় শাসনকার্য্যের (Government on parallel lines) পক্ষপাতী। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মানীর অপর এক প্রান্ত হইতে পরিমাণবাদের (Quantum theory) প্রবর্ত্তক Max Planck ইথরের (flank attack) পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিতেছিলেন। ইথর তরঙ্গবাদের সাহায্যে আলোকের সরল রেখানুগমন (Rectilinear Propagation of light) প্রমাণ করিতে অক্ষম হইয়া নিউটন আলোকের পরমাণুবাদ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জলের উপর আলোকরশ্মি পতিত হইলে তাহার কিয়দংশ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অপরাংশ প্রতিফলিত হইয়া যায়—ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি প্রকারান্তরে বলিয়াছিলেন যে ধনী লোকের গৃহে সমারোহ উপলক্ষে দ্বারবান্ তাহার স্বেচ্ছাক্রমে ব্যক্তিবিশেষকে তন্মধ্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করে এবং অপরকে বিতাড়িত করিয়া দেয়, প্রকৃতিও সেইরূপ খাম-খেয়ালবশে আলোককে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে আজ্ঞাদান করে, এবং পরক্ষণে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। নিউটনের এই উক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকদল আলোকের পরমাণুবাদ স্বীকার করিতেছেন।

ধাতু পাত্রে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি পতিত হইলে তাহাতে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া ইলেকট্রন বিকীরিত হয়। ফটোগ্রাফ-প্লেটে আলোক পতিত হইলে তাহার গুরুত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং আলোকের গুরুত্ব আছে। একটি প্রোটন ও একটি ইলেক্‌ট্রনের সংযোগে একটি আলোককণা (light quanta বা photon) উৎপন্ন হয়। এই আলোককণাগুলি অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। কাহারও কাহারও মতে তাহারা সরলভাবে গমন না করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হয় তজ্জন্য তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, আলোকবাহী ইথরের আর বিশেষ কোন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট রহিল না (Ether's occupation is gone). নবীন দলের কোন কোন অত্যুৎসাহী সভ্য মনে করিয়াছিলেন যে দুইশতবর্ষবয়স্ক পলিতকেশ ইথর বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন অথবা বৃত্তিভোগী তালিকাভুক্ত হইবেন। এবং স্মার্ত্ত বিজ্ঞানাচার্য্যগণ আশা করিয়াছিলেন যে অচিরে ইথরের শ্রাদ্ধবাসরে অধ্যাপকবিদায়ের বন্দোবস্ত হইতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে অধ্যাপক-মণ্ডলীর উল্লসিত হইবার বিশেষ কারণ দেখা যাইতেছে না, কারণ প্রবীণ রক্ষণশীল দল (conservative) প্রাচীনের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃ তাঁহাদের যত্নপালিত ইথরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সহায়তা করিতে অক্ষম, কারণ "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।" অপিচ দার্শনিকপ্রবর হিউম (Hume) এর ন্যায় নবীন বৈজ্ঞানিকদলও পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত কার্য্যকারণবাদে আর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। প্রকৃতি কেন রেডিয়ামের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি ইলেকট্রনকে পরমাণু-রূপ কারাগার হইতে মুক্তি দান করে এবং অপরগুলিকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখে তাহার কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং প্রকৃতির কার্য্যকলাপে যথেষ্ট পরিমাণ পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্যদোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। নৈতিক জগতেও "সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশ" সর্ব্বথা দৃষ্ট হয় না। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা বশতঃ উত্তর বিহারে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে লক্ষ লক্ষ নরনারী কোন্ অপরাধে পাইকারী দণ্ড প্রাপ্ত হইল, তাহা কতিপয় বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ মানবের দুর্জ্ঞেয়।

এই রূপে দেখা যাইতেছে যে উনবিংশ শতাব্দীর অনেকগুলি মতবাদ এক্ষণে রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। ইথরের পরিবর্ত্তে দেশকাল সমন্বয়ের প্রাধান্য স্বীকার করাতে পূর্ব্বপক্ষ বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিবেন যে উদারনৈতিক দল তাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে প্রমাণ করিয়াছেন যে গৃহ অগ্নিদগ্ধ না করিয়াও শূকরের মাংসের কাবাব প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার প্রত্যুত্তরে নব্যদল বলিবেন যে "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়, সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ হেতু যেমন এক হইতে বহুর উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ বহুত্বকে একত্বে পরিণত করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, কারণ "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"। Science arises out of identity amongest diversity.

আইনষ্টাইনের আর একটি সিদ্ধান্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সূর্য্যগ্রহণকালীন আলোকরশ্মি কিরূপে আকৃষ্ট হয়, তৎকালীন গৃহীত ফটোগ্রাফ ছবি দেখিয়া বৈজ্ঞানিকপ্রবর সার জে, জে, টমসন্ বলিয়াছিলেন যে নেপচুন্ গ্রহের আবিষ্কারের পর হইতে গণিতের গবেষণার ফল এরূপ আশ্চর্য্যরূপে আর কখনও প্রমাণিত হয় নাই। এক ধূমকেতু নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে পৃথিবীর সন্নিহিত হইলে এক বিশিষ্ট জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত গবেষণার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছিলেন যে কোন অনাবিষ্কৃত গ্রহের আকর্ষণ বশতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে। তিনি সেই গ্রহের অবস্থিতি, দূরত্ব, গুরুত্ব ও বেগ গণিতের সাহায্যে নির্ণয় করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে নেপচুন গ্রহ আবিষ্কৃত হইলে তাহার গবেষণার ফল সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। এইরূপ স্বনামধন্য রাসায়নিক মেণ্ডেলিফ (Mendelieff) মৌলিক পদার্থগুলিকে তাহাদের পরমাণুর গুরুত্ব অনুসারে নূতনভাবে সাজাইয়া কতকগুলি অনাবিষ্কৃত ভূত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তৎতৎগুণবিশিষ্ট অনেকগুলি ভূত পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জলবুদবুদের ন্যায় আকাশের বক্রভাবাপত্তি (Curvature of space) এবং তন্মধ্যস্থ জড় পদার্থের গতিবৃদ্ধিবশতঃ আকাশের প্রসারণ—আইনষ্টাইনের এই তৃতীয় সিদ্ধান্ত এক্ষণে বিচারাধীন (Sub-judice)। ডি সিটার (De Sittar) নামক এক প্রকৃষ্ট গণিতজ্ঞ আকাশের বক্রভাব স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহার মতে আকাশ ক্রমাগত কুঞ্চিত হইতে চেষ্টা করে।

বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে এক্ষণে তিনটি মাত্র নট—দেশকাল-সমন্বয়, ইলেকট্রন্ ও প্রোটন—নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বহুরূপে অভিনয় করিতেছে। তাহারা কি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, বা অন্যোন্যসাপেক্ষ, বা "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং যৎকিঞ্চিদ্ভাবরূপং" কোন এক অব্যক্ত পদার্থের বিকৃতি—তাহা এক্ষণে নির্ণীত হয় নাই।

কয়েক মাস পূর্ব্বে বিজ্ঞানজগতে দুইটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—নিউট্রন এবং পজিট্রন। এই দুই নবজাত শিশুর মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রোটনের সগোত্র এবং গুরুত্বে ইলেকট্রনের সদৃশ, এবং দ্বিতীয়টি ইলেকট্রন ও প্রোটনের সম্মেলনে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। জ্যোতিষিগণ ইহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোষ্ঠী বিচারে বিশেষ ব্যস্ত, ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বর্ত্তমান কালে আইনষ্টাইনের Relativity বা আপেক্ষিকভাব, প্ল্যাঙ্কের Quantum theory বা পরিমাণবাদ, হাইজেনবার্গ (Heisenberg) বর্ন্ (Born) এবং জর্ড্যানের (Jordan) Wave mechanics বা পরিমাণনির্ণয়বাদ এবং ডি ব্রগ্‌লী (de Broglie), শ্রোডিঙ্গার (Schrodinger) এবং ডিরাকের (Dirac) New wave mechanics বা নব তরঙ্গবাদ বিজ্ঞান জগৎকে আলোড়িত ও উদ্ভাসিত করিতেছে। জড়জগতের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ এক্ষণে বিজ্ঞানের অধিকার হইতে বিশুদ্ধ গণিতের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে। কিন্তু গণিতের ভাষা ক্রমশঃ এত দুর্ব্বোধ্য হইতেছে যে তন্মধ্যে পূর্ণ প্রবেশপত্র লাভ মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভবপর।

বিজ্ঞান জগতের সমস্যায় সরলতাসম্পাদন করিলেও তাহার পূরণ বা পূর্ণ মীমাংসা করিতে সমর্থ হয় নাই। The equation though simplified has not been solved। বিজ্ঞান জগতে জীবের আবির্ভাবের কোন সন্তোষজনক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই।

দার্শনিকগণ দুই প্রকার জগতের বিষয় উল্লেখ করেন— ব্যাবহারিক ও বাস্তব; তন্মধ্যে প্রথমটি ইন্দ্রিয়জ্ঞানসাপেক্ষ ও সর্ব্বজনবিদিত, এবং দ্বিতীয়টি অনুমানগম্য হইলেও তাহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রমাণ করা সুকঠিন। বিজ্ঞান এক নূতন জগতের অবতারণা করিতেছে, এবং এই জগতে জীব ও জীবেতর পদার্থের মধ্যে এক সম্বন্ধের অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধ কোথায়? বাহিরে না অন্তরে?*

শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়

* রিপন কলেজ অধ্যাপক-সঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

সাগর দোলায় ঢেউ

শ্রীনবগোপাল দাস আই-সি-এস

পরের দিনও অভ্যাসমত মোহিত সেকেণ্ডক্লাশের ডেকের নির্দ্দিষ্ট কোণটিতে বসেছিল—সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে। লোহিত সাগরে এসে অবধি সূর্য্যোদয়ের দিক্ গিয়েছিল বদ্‌লে, ফার্ষ্ট ক্লাশের যাত্রীরা তাই বড় একটা সেকেণ্ডক্লাশে আস্‌ত না। গরমের জন্য মোহিত সেদিন ডেকের উপরই শুয়েছিল। ঘুম যখন ভাঙ্‌ল তখনও আঁধার অনেকখানি রয়েছে—দূর থেকে প্রভাতী তারার আলো তখনও ভেসে আস্‌ছিল বাতাসে।

চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাক্‌তে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না। উঠে গিয়ে তাই সে রেলিংটার পাশে বস্‌লে। আধ-আলোর ছায়ায় সাগরের জল মথিত ক'রে চল্‌ছিল বিশাল জাহাজ···মালার মত জাহাজের আলোগুলো জ্বলছিল, যেন মানুষের ইতিহাসের প্রতীক ধারাবাহিক একটা সমাবেশ।

হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে অদূরে ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের উপর বসে রেলিং ধরে একটি নারীমূর্ত্তি এক দৃষ্টিতে সাগরের জলে তাকিয়ে আছে—যেন ঢেউ গুণ্‌ছে!

মুহূর্ত্তের জন্যে মোহিতের বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠ্‌ল। একটু ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে মোহিত দেখ্‌লে মেয়েটি আর কেউ নয়···শীলা রজার্স···

মোহিতের একবার খেয়াল হ'ল শীলাকে ডাকে। নিস্তব্ধ জলরেখা, তার মাঝে এঞ্জিনের অস্ফুট শব্দ আর বিদার্য্যমান সাগরের চাপা কান্নার সুর···একটুখানি সাহস করে ডাক্‌লেই হয়ত উত্তর দিবে!

শীলা কিন্তু মোহিতকে দেখেনি। সে আপন মনে স্তব্ধনেত্রে জলের ফেণার রাশির উচ্ছ্বাস এবং বিকাশ লক্ষ্য করছিল।···মিস্ ফিল আগের দিন রাত্রিতে তাকে তাঁদের তরফের চরম-বাণী শুনিয়ে দিয়েছিলেন এবং খুবই গম্ভীর ভাবে শাসিয়ে বলেছিলেন, যদি সে তার স্বভাব না শোধ্‌রায় তাহ'লে যে শুধু তার বিপদ হ'বে তাই নয়, যাদের নিয়ে এই বিপ্লব তাদেরই লাঞ্ছনা হবে সবচেয়ে বেশী এবং সকলের আগে।

এই শেষের কথাটিতেই তার মন এত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। যোশীর সহজ কথাবার্ত্তা তার অপছন্দ হয়না, আর মোহিতের সলজ্জ অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গী তার কাছে বেশ মধুর বলেই ঠেকে, কিন্তু তার এই ভালো লাগার জন্যে যদি তাদের বিপদ বা লাঞ্ছনার সুরু হয় তাহ'লে সে কি নিজের তুচ্ছ একটা আনন্দকে বড় করে দেখ্‌তে পারে? ··তার চোখের দু' কোণ ছাপিয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়্‌ছিল, কিন্তু সে তা' মনের দৃঢ়তা দিয়ে রোধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল।

অন্যমনস্ক ভাবে শীলা একবার সেকেণ্ডক্লাশ ডেকের দিকে তাকালে। তার চোখ কিন্তু মোহিতের দিকে গেল না। মোহিতকেও অতিক্রম ক'রে সে দেখ্‌ছিল শাদা ঢেউগুলো, যা চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে তাদের জাহাজ চল্‌ছিল মিশরের পথে···খেইহারা সমুদ্র যেন উদয়রশ্মি উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপনার মুখ তুলে ধরেছে!

ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে শীলা রজার্স সেখানে থেকে উঠে গেল।

দুপুর বেলা মোহিত ভাব্‌লে, দূর হোক্‌গে ছাই, এমন ক'রে চুপচাপ বসে থাকা কি আমার শোভা পায়?···খুব গম্ভীর ভাবে সে Sherlock Holmes এর চমকপ্রদ কাহিনীর মধ্যে মনোনিবেশ করবার প্রয়াস কর্‌লে।

ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাসের রসের মধ্যে তার মন ডুবে

আস্‌ছিল এবং তার অন্তর্নিহিত বুদ্ধি চলেছিল Sherlock Holmesএর সাথে মৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে, এমন সময় যোশী এসে বল্‌লে, চল মোহিত, আজ জাহাজটার টপোগ্রাফী একবার ভালো ক'রে দেখে নেওয়া যাক্।

জাহাজের খুঁটিনাটি দেখা এবং তার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা যোশীর একটা বাতিক। বিলেতে সে অনেক বড় বড় জাহাজের অভ্যন্তর সুদক্ষ expert এর মত পর্য্যবেক্ষণ করে এসেছে, উচিত-অনুচিত মত প্রকাশ করতে একটুও কার্পণ্য করেনি' সে; আজ ছোট্ট এবং সাধারণ এই জাহাজখানার টপোগ্রাফী জান্‌বার জন্যে তার হঠাৎ এমন আগ্রহ কেন মোহিত বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

কিন্তু সে আপত্তি কর্‌লে না। চুপচাপ বসে থেকে থেকে এবং একই বিষয় নিয়ে চিন্তা ক'রে তার বিরক্তি ধরে গিয়েছিল; এখন এই অলস কর্ম্মহীনতা থেকে খানিকক্ষণের জন্যেও মুক্তি পাবার সুযোগ পেয়ে সে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌লে। Sherlock Holmesটা হাতেই রেখে সে উঠে বল্‌লে, চল···

প্রথমে তারা ঢুক্‌লে এঞ্জিন-রুমে। যোশী অনেক রকমের এঞ্জিন দেখেছে, এর খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও সে অনেক কিছু জানে। বেশ অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে সে এঞ্জিনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছিল আর তার প্রশ্নে সেখানকার লোকদের বিব্রত ক'রে তুল্‌ছিল। মোহিতের কাছে এসব দুর্ব্বোধ্য; এঞ্জিনরুমের শব্দে এবং কলকব্জাগুলোর বিশালতায় তার মনে হচ্ছিল আরব্যোপন্যাসের সেই দৈত্যের কথা যে প্রদীপাধিকারীর একটি মাত্র আদেশে সব মূল পদার্থকে বাঁধতে পার্‌ত···দূর দূরান্তর থেকে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যাকে এনে দিত আলাদিনের সম্মুখে, আবার নিমেষের মধ্যে তাকে গিরি-পর্ব্বতের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে যেত!

ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে ইট্যালিয়ান্ এঞ্জিনিয়ারটি যোশীকে জানালে যে তাদের লাইনে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে নতুন এঞ্জিন; এর গতি বেশী এই এর একমাত্র গুণ নয়, এর প্রতিবন্ধও সাধারণ এঞ্জিনের চেয়ে ভালো।

যোশী খুব গম্ভীরভাবে মন্তব্য প্রকাশ কর্‌লে, কিন্তু ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক লাইনে আপনাদের এবং জার্ম্মান কোম্পানীর যে সব ষ্টীমার আছে সে গুলোর তুলনায় এ এঞ্জিন খেলার কল বই আর কিছুই নয়!

ইট্যালিয়ান্ যুবকটি খুবই সম্ভ্রমভরা সুরে স্বীকার কর্‌লে যে যোশীর কথা সত্যি।

এঞ্জিনরুম থেকে তারা খালাসীদের থাক্‌বার জায়গা, তাদের রান্নাঘর, জাহাজের সার্জ্জারী প্রভৃতি দেখে ফার্ষ্ট ক্লাশ corridor দিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশ lounge এ ঢুক্‌লে। সেখানে বসেছিলেন কর্ণেল গ্রীণ, মিস্ হিল এবং আরও অনেকে। কর্ণেল যোশীকে দেখে একটু স্মিতহাসি হাস্‌লেন, যোশীও মাথাটি হেলিয়ে তাকে অভিবাদন জানালে।

মোহিত জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, ভদ্রলোকটি কে?

—সেই কর্ণেল, যার কথা তোমায় বলেছিলাম।

মোহিত একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কর্ণেল গ্রীণের দিকে তাকালে। মুখখানা বেশ শান্ত আর হাসিভরা। মোহিত ভেবেছিল তাকে দেখেই তার মনে বিজাতীয় একটা ঘৃণার উদ্রেক হবে, কিন্তু আসলে কর্ণেলের স্মিতহাসিটি তার কাছে বেশ ভালোই লাগ্‌ল।

হঠাৎ যোশী বল্‌লে, ওই যাঃ—আসল জায়গাটাই যে দেখা হল না!

—সে আবার কী?

—নীচে, এঞ্জিনরুমের পাশ দিয়ে যেতে হয়, যেখানে ডেক্‌প্যাসেঞ্জাররা থাকে।

এই জাহাজে যে ডেক্‌প্যাসেঞ্জার বলে এক শ্রেণার যাত্রী আছে তা' মোহিত জান্‌ত না। সে বল্‌লে, এখানে আবার ডেক্‌প্যাসেঞ্জার আসবে কোত্থেকে?

যোশী বল্‌লে, আছে হে, মোহিত, আছে···। সবাই ত আমাদের মত পয়সাওয়ালা এবং catholic নয়, ডেককে আশ্রয় করেই তাদের গতি।

চকিতের মত মোহিতের মনে ভেসে উঠ্‌ল শরৎবাবুর বর্ণিত রেঙ্গুনষ্টীমারে ডেক্ প্যাসেঞ্জারদের কোলাহলের

ছবি...। মনে হতেই তার proletarian মনও একটুখানি শিউরে উঠ্‌ল। বললে, কী আর হবে ওসব দেখে, তার চেয়ে আমাদের নিজেদের ডেকে ফিরে যাই।

যোশী বললে, সে কি হয়?...ওখানে অনেক কিছু interesting জিনিষ মিল্‌তে পারে! চাই কি, কিছু দিশী হালুয়া আর পুরীও পেতে পার!

হালুয়া বা পুরীর প্রতি মোহিতের বিশেষ লোভ ছিল না। তবু, বন্ধুর অনুরোধে এবং ডেকযাত্রীদের অবস্থাটা নিজের চোখে পরখ ক'রে নেবার কৌতূহলে সে যোশীর অনুগমন করলে।

অতি অপ্রসর সিঁড়ি বেয়ে তারা সোজা নীচে নেমে চ'লে গেল। লোটাকম্বল নিয়ে একজন বিশালকায় সিন্ধুদেশীয় ভদ্রলোক হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন, যোশী আর মোহিতকে আসতে দেখে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বস্‌লেন।

যোশী হাসিমুখে প্রশ্ন করলে, এখানে আপনার কেমন লাগ্‌ছে, জী?

সিন্ধুদেশীয় ভদ্রলোকটি, নাম তাঁর কৃপালানি, বললেন, আপনাদের মত আলোবাতাস পাইনে বটে, বাবুজী, কিন্তু কোন অসুবিধা বোধ হচ্ছেনা—সমুদ্র শান্ত আছে ব'লে।... তা' ছাড়া ষ্টুয়ার্ডের সাথে ভাব করে নিয়েছি, মাঝে মাঝে ডিম আর আলুসেদ্ধ দিয়ে যায়, তাতে মন্দ খাওয়া হয়না।

মোহিত বললে, ঝড় উঠ্‌লে আপনার ভয়ানক কষ্ট হবে কিন্তু!

হেসে কৃপালানি বললেন, ওরকম কষ্ট আমাদের সওয়া আছে, বাবুজী!...তবুও দিব্যি আরামে পা' ছাড়িয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের দেশে যারা করাচী থেকে বম্বে বা বসরা যায় তাদের অবস্থা কি দেখেছেন কখনও?

মোহিতের অভিজ্ঞতা খুবই অল্প। সে ঘাড় নেড়ে জানালে সে দেখে নাই। কিন্তু তার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল সেই রেঙ্গুনগামী জাহাজের ছবি···সেই মুরগীগুলোর ক্যাক্‌ক্যাক্‌ শব্দ, টগরের কলহ, জাহাজের আবদ্ধ খোলের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ হ'তে আগত যাত্রীদের মহা-সঙ্গীতের সমবেত অনুশীলন···

যোশী কৃপালানির সাথে বেশ জমিয়ে নিলে। তার লোটা-বাসন সম্বন্ধে গোটাকয়েক প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করে সে তার কম্বলটার উপর দিব্যি আঁটসাঁট হয়ে বসলে।

কৃপালানি যাচ্ছে দক্ষিণ ফ্রান্সে, সেখানে তার জাতভাই কয়েকজন আছে তারা মুক্তোর ব্যবসা করে। সেখানে সে তার ভাগ্যপরীক্ষা করবে। ইংরেজী ভাষার উপর দখল তার সামান্য, ফরাসীর বিন্দুবিসর্গও সে জানেনা, তবু সে চলেছিল অনিশ্চিতের ডাকে, কারণ তার কাছে নিশ্চয়তাও অনিশ্চয়তার মতই দুর্ব্বোধ্য এবং চঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মোহিত চুপটি ক'রে আগ্রহভরা চোখে কৃপালানির কথাগুলো শুনছিল। কিছুকালের জন্য তার সমস্ত মনটি গিয়েছিল তার কাহিনীতে আচ্ছন্ন হয়ে···ভাব্‌ছিল, তার নিজের দেশেও অনাগতের আহ্বানে উত্তর দেয় এমন লোকের অভাব নেই! শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে তার চিত্ত ভরপুর হয়ে উঠ্‌ছিল।

কৃপালানি ডেকের অপর প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন, ওই যে ওদিকে দুটো লোক শুয়ে আছে, বাবুজী, ওরা আস্‌ছে বিহার থেকে। ওরা এসেছিল খুবই উৎসাহ নিয়ে, কিন্তু জাহাজের দোলানি খেয়ে ওদের মন গিয়েছে ভেঙে। ওরা যাচ্ছিল জার্ম্মাণিতে, হাম্‌বুর্গ্‌ না কোথায়··· কিন্তু এখন বলছে পোর্ট সেডে পৌঁছেই ওরা দেশে ফিরে যাবে···এসব কষ্ট নাকি ওদের সহ্য হয় না!

যোশী একটুখানি কৃপাপূর্ণ চক্ষে লোকদুটোর দিকে তাকালে। কম্বলমুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে তারা আচ্ছন্নের মত পড়ে রয়েছিল।

কৃপালানি বলতে লাগ্‌লেন, আরে দেশ থেকে যখন বেরিয়েছি তখন এরকম সৌখীন হ'লে কি চলে? সাধে কি আর আমাদের দেশের নাম খারাপ?···কিছু মনে করবেন না, বাবুজী, এক পঞ্জাব আর সিন্ধ্‌ ছাড়া কোথাও মরদ্‌কা-বাচ্চা ত দেখ্‌লুম না!

কথাটা হয়ত সত্যি নয়, কিন্তু এমনই আগ্রহ এবং বিশ্বাসের সুরে কৃপালানি কথাটি বললেন যে মোহিত বা যোশী কেউই প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত মনে আন্‌তে পারলে না।

কৃপালানি বললেন, বাবুজী, তোমরা এসেছ, আমি ভারী খুসী হয়েছি কিন্তু!...তোমাদের কী দিয়ে যে অভ্যর্থনা করব বুঝতে পারছি না; আমার সাথে আমার বন্ধুর দেওয়া কিছু মেওয়া আছে, কিন্তু সে ত তোমাদের ভালো লাগবে না! তবে, কিছু মশলা আছে, খাবে কি?

যোশী এবং মোহিত আগ্রহভরা সুরে বললে, মশলা খানিকটা পেলেত বেঁচে যাই, কৃপালানিজী!...এখানকার বিলিতি খাবার খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, একটুখানি মুখশুদ্ধি হওয়া ত' দরকার!

কৃপালানি বললেন, ঐ ত তোমাদের দোষ, বাবুজী; তোমরা বড্ড impulsive, যেই আমি মশলার নাম উল্লেখ করলুম অমনি এমন ক'রে তোমরা তার স্তুতিগান আরম্ভ করে দিলে যে কেউ শুনলে মনে করবে এর অভাবে তোমাদের সারারাত ঘুম হচ্ছিল না!...অথচ, আমি জানি, এই মশলার কথা যাক্, দেশের কথাটি একটিবারও তোমাদের মনে হয়নি'!

যোশী কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কৃপালানি বাধা দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের মন্দ বলছি না, বাবুজী, এ হচ্ছে এই সমুদ্রের গুণ। কী যে আছে এর মাঝে বলা শক্ত, কিন্তু এর হাতে পড়ে আমরা যেন হয়ে যাই এর খেলনার মত, আমাদের মন, আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের সমস্ত সত্তাকে নিয়ে সমুদ্র ছিনিমিনি খেলে...অনুভূতির গভীরতা কমে যায়, তার প্রসারতা বেড়ে ওঠে...

মোহিত কৃপালানির কথাগুলোর মধ্যে তার নিজের মনের সুরের ছন্দ দেখতে পাচ্ছিল। এই নিরক্ষর ব্যবসায়ীর বিচারক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি দেখে সে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে উঠছিল।

যোশী বললে, কৃপালানিজী, আমি দেশবিদেশ একটু আধটু ঘুরেছি, নানাদেশের লোকের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে...আমি দেখেছি আমাদের দেশের লোক যদি অবসর পায় তবে যেমন ভাবতে পারে অনেক দেশের লোকই তেমন ভাবতে পারেনা।

কৃপালানি হেসে বললেন, ঐখানেই ত আমাদের মস্ত দোষ, বাবুজী!' ভাবতে আমরা জানি বেশ, ভাবুক ব'লে আমাদের খ্যাতিও আছে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের শক্তির অবসান হয় ঐখানেই! ভাবতে আমরা এতখানি পারি বলেই কাজ করবার সময় যখন আসে তখন একেবারে গুলিয়ে যায় সব, কাজের বিশালতা আর জটিলতা দেখে আমাদের মন হয়ে যায় বিকল!

বলতে বলতে কৃপালানি তাঁর পুটলী খুলে একটা শিশি বার ক'রে তার থেকে খানিকটা মশলা মোহিত আর যোশীর হাতে দিলেন। অভ্যাসমত মোহিত আর যোশী তাঁকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিল, কৃপালানি বাধা দিয়ে বললেন, বিলিতী সুরে ঐকথাটি বলে আমার এই তুচ্ছ জিনিষটুকুর মর্য্যাদার হানি ক'রোনা, বাবুজী!...সত্যি কথা বলতে কি, বাবুজী, এদের অনেক কিছুই আমার ভালো লাগে, কেবল এই ছলে-অছিলায় ধন্যবাদ দেবার বাড়াবাড়িটা ছাড়া!

ঐই কথা যদি কৃপালানির মুখ থেকে না বেরিয়ে ডাঃ বর্ম্মণ বা চিদম্বরম্‌এর মুখ দিয়ে বেরুত তাহ'লে যোশীর সাথে তাদের একপ্রস্থ খণ্ডযুদ্ধের অভিনয় হয়ে যেত, কিন্তু কী জানি কেন কৃপালানির গভীরতা এবং সরলতার সামনে যোশীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

মোহিত বললে, ধন্যবাদ দেওয়াটা আমিও পছন্দ করতুম না, কৃপালানিজী, কিন্তু এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি জিনিষটা আগে যতটা শ্রুতিকটু ঠেকত আজকাল যেন আর তা' মনে হয়না। এর পেছনে যে সৌজন্যটুকু প্রচ্ছন্ন আছে তা' আমাদের মনকে একটু স্পর্শ করে বৈ কি!

কৃপালানি সায় দিয়ে বললেন, সে কি আমি বুঝিনা, বাবুজী?...তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমাদের মধ্যে ওটার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে গেছে।...মুখের ভাষাতে আমাদের মধ্যে মনের আদানপ্রদান হয়না, তার চেয়ে বড়ো আমাদের চোখের ভাষা, আমাদের অঙ্গভঙ্গীর গতিটুকুর তাৎপর্য্য...

এমনিধারা কথাবার্ত্তার কখন যে লাঞ্চের সময় হয়ে এল তা' দু'জনের কারোরই খেয়াল ছিলনা। হঠাৎ উপরে সতর্ককারী ঘণ্টার শব্দে তারা একটু আত্মস্থ হয়ে উঠল। কৃপালানি বললেন, আপনাদের সময় হ'লো, বাবুজী...ঘড়ি বলছে, খিদের সময় হয়েছে, খেতে এসো...

যোশী আর মোহিত উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্‌লে, আপনাকে মাঝে মাঝে এরকম বিরক্ত কর্‌তে আস্‌ব হয়ত, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।

অভিবাদন ক'রে কৃপালানি বল্‌লেন, বলো কি বাবুজী? তোমরা এরকম মাঝে মাঝে আস্‌লে যে কী আনন্দ পাই তা কী ক'রে বোঝাব?···তোমাদের তরুণ সরল মনের সংস্পর্শে এলে বুঝ্‌তে পাই যে জরা আমায় এখনও এসে ধরেনি'!

ডাইনিংরুমে যেতে যেতে যোশী জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লে, কৃপালানিকে কেমন লাগ্‌ল, মোহিত?

উচ্ছ্বসিত স্বরে মোহিত বল্‌লে, ভারী চমৎকার লোক, যোশী। আমাদের দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত লোকদের মাঝেও যে এমন সুষ্ঠু অথচ সরলমনা লোক আছে তা' আমি জানতুম না।···দেশটাকে আজ নতুন ক'রে ভালো-বাস্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে কৃপালানির মত লোককে জন্ম দিয়েছে বলে!

যোশী বল্‌লে, আমি ত এই পথে এবার নিয়ে চারবার আনাগোনা কর্‌ছি; প্রত্যেকবারই এই ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করি, আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রত্যেকবারই এদের মধ্যে এমন লোকের সাথে আলাপ হয় যে আমার মনে গভীর একটা দাগ রেখে যায়!

মোহিত সায় দিয়ে বল্‌লে, তোমার কথা একটুও অবিশ্বাস হচ্ছেনা, যোশী···কৃপালানিকে যে ভাবে আবিষ্কার কর্‌লুম আমরা, তাতে আমার মনে হয় আমাদের আশেপাশে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত অনেক কৃপালানি পড়ে আছে যাদের আমরা কোন খবরই রাখিনা বা খোঁজ নেই না!

যোশী বল্‌লে, তাহ'লে ডেক্‌যাত্রীদের আস্তানাটা দেখ্‌তে যাওয়া নেহাৎ ব্যর্থ হয়নি'?

গভীর সুরে মোহিত জবাব দিলে, পাগল!···

লাঞ্চের পর Sherlock Holmes টা খুলে মোহিত ডেক-চেয়ারে শুয়ে ঝিমুচ্ছিল। সকালবেলাতেও যে অবসাদ তার তরুণ মনকে পীড়া দিচ্ছিল তা' আস্তে আস্তে যেন কেটে যাচ্ছিল। বেদনার বিরাট পুঞ্জীভূত একটা ইতিহাস যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তা' বাইরের নানা জিনিষের সংঘাতে আস্তে আস্তে হাল্‌কা হয়ে আস্‌ছিল—অল্প কয়েকদিনের অতীতকে সরিয়ে দিয়ে অন্তরকমের একটা নিবিড় বর্ত্তমান তার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মার্‌ছিল।... বন্ধুবর যোশী পাশেই বসে ছিল, সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোহিতের মনের লীলা বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল।

যোশী বল্‌লে, ফার্ষ্টক্লাশের দু'একটা জিনিষ কিন্তু আজ সকালে দেখা হ'ল না!

—কী?

—সেখানকার জিম্‌ন্যাসিয়াম আর সুইমিং বাথ···

জিম্‌ন্যাসিয়ামের সম্বন্ধে মোহিতের ধারণা খানিকটা ছিল, কল্‌কাতার কলেজে সে জিম্‌ন্যাসিয়ামে মাঝে মাঝে ডন-বৈঠকও করেছে। ধরে নিলে যে জাহাজের জিম্‌ন্যাসিয়াম্‌ও সেই গোছের একটা জিনিষেরই ছোটখাট সংস্করণ হ'বে।...সুইমিং বাথের সম্বন্ধে কিন্তু তার ধারণার চেয়ে কল্পনাই ছিল বেশী, আমেরিক্যান ফিল্‌ম্‌এর কল্যাণে। কল্পনা যা ছিল তাতে সে খুব উৎসাহিত বোধ কর্‌লে না, বল্‌লে, কী হবে আর ঐসব ছাইভস্ম দেখে?···তার চেয়ে না হয় কৃপালানির সাথে একটু গল্প করিগে···বেচারী একলাটি পড়ে আছে!

যোশী বল্‌লে, সেখানে ত যাবই, তার আগে একটা অছিলায় ফার্ষ্টক্লাশের এই দুটো জিনিষ দেখে নিতে পার্‌লে মন্দ হত না!

মোহিত জান্‌ত, সম্মতি আদায় কর্‌তে যোশী সিদ্ধহস্ত। কাজেই সে আর কোন প্রতিবাদ কর্‌লেনা।

চা'এর পর যাবে স্থির হ'ল। মোহিত আবার Sherlock Holmes এ মনোনিবেশ কর্‌লে।

চা'এর ঘণ্টা যখন পড়্‌ল তখন মোহিতের বই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এক নিঃশ্বাসে গল্পগুলো শেষ ক'রে তার মনে ভারী আনন্দ হচ্ছিল—যোশীকে দু'একটা জায়গা সে পড়িয়ে শোনাচ্ছিল। মোহিতের মনের অবস্থা সাধারণ গতিতে ফিরে এসেছে দেখে যোশীও একটু আশ্বস্ত বোধ কর্‌ছিল, এবং ফার্ষ্টক্লাশ ছেড়ে একবার শ্রীলা ব্রজ্যাস্‌এর

মুখোমুখি হয়ে সে মোহিতের মনের এই প্রকৃতিস্থতাটা দৃঢ় ক'রে তুলবে কিনা ভাবছিল।

চা'এর পর দুপুরবেলার প্রোগ্রাম মত তারা গেল ফার্ষ্ট ক্লাশ জিমন্যাসিয়াম আর সুইমিং বাথ দেখতে। জিমন্যাসিয়াম ছিল তখন খালি, মোহিত আর যোশী মহা-উৎসাহে সেখানকার সাজসরঞ্জাম নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলে।…কলের ঘোড়া দেখে মোহিতের যা' হাসি! বললে, সমুদ্রের বুকে বুঝি এমনি ক'রে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়?

তারপর সুইমিং বাথএর পালা। যোশী বললে, এবার হয়ত কিছু রঙীন্ জিনিষ চোখে পড়বে।…মোহিত একটু বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করলে।

আসলে কিন্তু সেরকম রঙীন্ কিছুই চোখে পড়ল না। স্নানের পালা আরম্ভ হয় সন্ধ্যার ঠিক আগে, তাই এখনও স্নানার্থী-স্নানার্থিনী বড় কেউ ছিল না। মোহিত আর যোশী কাছেই একটি রেলিংএর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালে।

মোহিত বললে, চল, এবার কৃপালানির কাছে যাই।

যোশী বাধা দিয়ে বললে, আর একটু অপেক্ষা কর… বেশ সুন্দর বাতাস বইছে এখানে…

খানিকক্ষণ পর তারা যখন নীচের ডেকের দিকে রওনা দিবে এমন সময় পথে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যার জন্য পরে যোশীর মনস্তাপের অবধিমাত্র ছিলনা।

সুইমিং ডেকের সিঁড়ি দিয়ে দু'জনে নাবছিল, মোহিত আগে আর যোশী পেছনে। এমন সময় তারা দেখলে সিঁড়ির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে—দু'জনেই সুইমিং কষ্টিউম্ পরা। মেয়েটি আর কেউ নয়—শীলা রজার্স। সুইমিং কষ্টিউম্এর উপর একটা বাথ-গাউন জড়ানো—নিতান্ত বেপরোয়া ভাবে।…কষ্টিউম্এর আঁটসাঁট বাঁধুনীতে তার দেহের প্রত্যেক রেখা যেন ফুটে উঠেছিল অগ্নিশিখার মত…আর তার হাঁটবার লীলায়িত ভঙ্গীটি মোহিতের মনে তাণ্ডবনৃত্য সুরু করে দিয়েছিল।

সঙ্গের লোকটিকে মোহিত চিনতে পারেনি', কিন্তু যোশী দেখেই চিনেছিল—সে হচ্ছে কর্ণেল গ্রীণ। খুব হাসতে হাসতে কর্ণেল গ্রীণ শীলার পাশাপাশি আসছিলেন।

শীলা আর কর্ণেল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় লক্ষ্য করলে দুটি ছেলে সিঁড়ির আগায় দাঁড়িয়ে আছে—নামবার প্রতীক্ষায়।

মোহিত পলকের জন্য থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যোশী তার বাহুটি ধরে তাকে সিঁড়ির এপাশে টেনে আনলে, আগন্তুক এবং তার সহচরীকে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে।

শীলা মোহিত এবং যোশীকে দেখে মুহূর্ত্তের জন্য রাঙা হয়ে উঠেছিল…হয়ত বা তার একবার ইচ্ছা হয়েছিল সাহস-ভরে সত্যকে সম্পূর্ণ ক'রে স্বীকার করে নেয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার আগে তাই সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কর্ণেল গ্রীণ শীলার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা লক্ষ্য করছিলেন। অবস্থাটা যে একটু অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে সেটা তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ এড়ায়নি'। ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে নেবার জন্যে তিনি বললেন, দেরী হয়ে যাচ্ছে, মিস্ রজার্স, চটপট উঠে পড়ো…

কর্ণেলের কথায় শীলার চেতনা যেন ফিরে এল। দমকা একটা হাওয়ার মত সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে সুইমিং বাথের দিকে ছুটে পালালে।…যোশী বা মোহিতকে একটা সম্ভাষণ করবার সামর্থ পর্য্যন্ত তার হ'লনা; অশান্ত মন নিয়ে সদ্যোজাত ঝর্ণার গতিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কর্ণেল গ্রীণ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন। যোশীকে দেখে সান্ধ্য-সম্ভাষণ জানালেন। যোশী অস্ফুটস্বরে তার প্রতি-উত্তর করলে।

মোহিত এতক্ষণ যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কর্ণেল গ্রীণ দৃষ্টির বহির্ভূত হতেই সে দাঁতে দাঁত চেপে শীলার উদ্দেশে উচ্চারণ করলে, বৈরিণি!…

ডেক্প্যাসেঞ্জারদের আস্তানায় যাবার সিঁড়ির সন্মুখে আসতেই মোহিত হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললে, তুমি একা যাও এখন, যোশী, আমি একটু পরে আসছি।

যোশী বুঝলে মোহিত খানিকক্ষণের জন্যে নিজের মধ্যে আশ্রয় নিতে চায়। সে আর কোন আপত্তি না ক'রে নীচে চলে গেল।

কৃপালানি তাঁর আগের জায়গাটিতে ছিলেন না। তাঁর লোটাকম্বল পুরাণো জায়গায়ই প'ড়ে ছিল, কিন্তু তিনি গিয়েছিলেন জাহাজের সম্মুখভাগে। যোশী তাঁকে অতি সহজেই খুঁজে নিলে।

যোশীকে আসতে দেখে কৃপালানির মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। একটা লোহার নঙ্গরের উপর চাদর ছড়িয়ে বসেছিলেন, যোশীকে দেখে অভ্যর্থনা করে বললেন; আইয়ে বাবুজী···

যোশী বললে, বেশ জায়গাটি খুঁজে বার ক'রে নিয়েছেন কিন্তু!

হেসে কৃপালানি বললেন, আমাদের ত সৌখীন আরাম কেদারা আর অর্কেষ্ট্রার গান জুটবেনা, বাবুজী, আমাদের কোন রকমে টি'কে থাকলেই হ'ল! তবে ভগবানের দয়ার কণা থেকে আমরাও বঞ্চিত হইনে···সমুদ্রের জল, ফুরফুরে হাওয়া আর আকাশের গায়ে হোরিখেলার ছবি কারোরই এক চেটে নয় বলে এই জায়গায় বসেও তার আস্বাদ আমরা মাঝে মাঝে পাই!

জায়গাটা মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, এদিক ওদিকে নঙ্গর, লোহার শিকল, দড়িদড়া, অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি প্রভৃতি ছড়ানো...কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেখানে, সেখানকার গভীর নীরবতা ভাঙতে কোন লোকেরই সমাগম ছিল না! দূরে উপরে ফার্ষ্ট ক্লাশ ডেক থেকে হাসির লহরী ভেসে আসছিল বাতাসের সাথে!

কৃপালানি একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, ওরা চোখের উপর দূরবীণ লাগিয়ে মেঘ আর জলের বিশ্লেষণ করছে, বাবুজী, আর আমি আমার শাদা চোখ দিয়ে দেখছি ঝাপসা একটা রেখা! ওদের মনে কৌতূহল আছে প্রচুর, সময়ের দামও ওদের বেশী—আর আমি আমার নিরবচ্ছিন্ন অবসর নিয়ে মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটিয়ে চলেছি একটি আকাশ-কুসুমের দিকে তাকিয়ে, বিশ্লেষণ করবার উত্তেজনা আমার মনের ত্রিসীমানায়ও ঠাঁই পাচ্ছেনা!

যোশী চুপ করে শুনছিল···কৃপালানির কথার স্রোতে বাধা দিতে তার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না।

কৃপালানি প্রশ্ন করলেন, তোমার সেই বন্ধুটা কোথায় গেল, বাবুজী?

—ও আমার সাথেই আসছিল, হঠাৎ কী মনে হওয়ায় থমকে দাঁড়াল, বললে, একটুখানি পরে আসবে!

একটুখানি চিন্তিতস্বরে কৃপালানি বললেন, ছেলেমানুষী ভাবটা তোমার বন্ধুর মন থেকে এখনও যায়নি' বাবুজী!··· ওর সর্বাঙ্গে যেন একটা উচ্ছ্বাস—এতদিন ছিল তা' রুদ্ধ হয়ে, জাহাজে উঠে বোধ হয় সাগরের বাতাস লেগে তা' উঠেছে ফেনিল হয়ে।···মনের উপর যে কৃত্রিম একটা যবনিকা ছিল সেটা গেছে সরে, তার ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে তার কল্পপ্রবণতা, নয় কি বাবুজী?

যোশী কৃপালানির চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল, বললে, আপনি কী ভীষণ প্রাজ্ঞ, কৃপালানিজী!

হেসে কৃপালানি বললেন, পাগল!···আমি কতটুকুই বা দেখিছি বা পড়েছি?...তোমাদের জ্ঞান আমাদের চেয়ে কত বেশী!

গভীরস্বরে যোশী বললে, অমন কথা বলবেন না, কৃপালানিজী!···আমার দুঃখ হচ্ছে শুধু এই ভেবে যে কেন এতদিন আপনাকে খুঁজে বার করিনি'...ক'টা দিন শুধু শুধু নষ্ট হয়ে গেছে!

যোশীর হাতের উপর একটা চাপড় মেরে কৃপালানি বললেন, তুমিও ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে, বাবুজী!...নতুনের মাধুর্য্য বড় ভয়ানক—সেটা তোমায় পেয়ে বসেছে এখন!

কথাটা আংশিকভাবে হয়ত সত্যি, তবু যোশী প্রতিবাদ করে বললে, কিন্তু এমন অনেক নতুনত্ব আছে যা' কখনও পুরাণো হয়না!

হেসে কৃপালানি বললেন, সেটা বিচার করবার সময় এখনও আসেনি', বাবুজী···পুরাণো হবার মুহূর্ত্ত যখন আসবে তখন সেটা পরখ ক'রে দেখো!

কী একটা কথা মনে হওয়ায় যোশী প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, আপনার বয়স কত, কৃপালানিজী?

—আন্দাজ কর, দেখি ··

—পঞ্চাশ ?·.

—আমাকে কি ততখানি বুড়ো দেখায়, বাবুজী ?

একটুখানি লজ্জিত হয়ে যোশী বললে, না, ঠিক নয়... আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে বোধ হয়, নয় কি ?

হেসে কৃপালানি বললেন, হ'লনা, বাবুজী...আমার একটি ধমকেই তুমি কক্ষভ্রষ্ট হয়ে গেলে!...আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি ছাড়িয়ে গেছে...দেশে আমার বড় ছেলে আছে, দোকান করছে, তার বয়সই ত প্রায় পঁয়তাল্লিশ হতে চলল!

সম্ভ্রম এবং বিস্ময়ভরা চোখে যোশী বললে, আপনি আমায় কক্ষভ্রষ্ট করেছেন বলে আমার একটুও লজ্জা হচ্ছে না, কৃপালানিজী···আমার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ লোককেও আপনি কক্ষচ্যুত করতে পারেন!

এমন সময় হাসিমুখে মোহিত এসে হাজির হল। কৃপালানির দিকে তাকিয়ে বললে, মনটা একটু বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল, কৃপালানিজী, তাই খোলা বাতাসে সেটাকে সুস্থ ক'রে আনলুম...

কৃপালানি সস্নেহদৃষ্টিতে মোহিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার জন্য কেন যেন আমার ভয়ানক ভয় হয়, বাবুজী! তোমাকে দেখলে আমার নাতিটার কথা মনে পড়ে, সে তোমারই বয়সী হবে, কিংবা হয়ত তোমার চেয়ে বছরখানেকের ছোট···তোমার মত অন্যমনস্ক কল্পনাপ্রবণ মন তারও···

মোহিত বললে, জানইত, কৃপালানিজী, এ হচ্ছে বাতাসের দোষ···বাতাস যদি মনকে চঞ্চল ক'রে দেয় তবে আমি আর কী করতে পারি ?

তিরস্কারভরা কণ্ঠে কৃপালানি বললেন, এ আমি কখ্খনই মানতে রাজী নই, বাবুজী···বাতাসত বইবেই, সমুদ্রের দোলা গায়ে এসে ত লাগবেই, তাই বলে কি তাতে মন এলিয়ে দিয়ে থাকাটা খুব সুমীচীন ?

মোহিতের তর্কের স্পৃহা চেপে উঠেছিল। কৃপালানির মনের স্বচ্ছতা তাকে স্পর্শ করেছিল এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে তর্ক যদি সে করে তবুও কৃপালানির মনের ছড়িয়ে-পড়া আলো তাতে একটুও কমবেনা। বললে, তুমি আগে থেকেই ধরে নিচ্ছ, কৃপালানিজী, যে বাতাস এবং সমুদ্রের এই চঞ্চল-করিয়ে-দেওয়া স্বভাবটা খারাপ, অন্ততঃ কৃত্রিম · তাই তুমি উপদেশ দিচ্ছ, সাবধানে চলো!... আমি যদি সেটা না মানি ?

কৃপালিনি বললেন, তোমার ইঙ্গিত আমি বুঝতে পারছি, বাবুজী, তোমার কথা যে একেবারে ভুল সেও আমি বলতে পারিনে, কারণ যা' স্বভাবজ তার সাথে আমার ঝগড়া কোনদিনই নেই।...তবু আমার মনে হয় তুমি যখন আকাশ-বাতাসের এই প্রকৃতি থেকে নিজকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছ তখন এই চেষ্টাটাই তোমার স্বভাব, চঞ্চল-হয়ে-যাওয়াটা তোমার স্বভাবের বাইরে!

হেসে মোহিত বললে, কিন্তু এমনও ত' হতে পারে যে, আমার স্বভাব হচ্ছে দুটো এবং তাতে সংঘাত লেগেছে আজ! ···তাদের সামঞ্জস্য করতে পারছি না বলেই নিজের খেয়ালমত একটাকে বড় ক'রে আর একটাকে নির্ম্মূল করবার চেষ্টা করছি!

সন্ধ্যার ছায়ায় মোহিত এবং যোশী যখন উপরে নিজেদের ডেকে ফিরে এল তখন মোহিতের মন অনেকখানি প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। সারাটা পথ সে যোশীর সাথে কৃপালানির কথা আলোচনা করছিল...কৃপালানির সাথে পরিচয় তার মর্ম্মের একটা অধ্যায় খুলে দিয়েছিল।···প্রকৃত সাত্ত্বিকের অনুভূতি নিয়ে এই অভিজ্ঞতাটুকু সে নানা রংএ রাঙিয়ে দেখছিল...মনে এক অভূতপূর্ব্ব অনুবেদনার সঞ্চার সে উপলব্ধি করতে পাচ্ছিল···

সোমবার জাহাজ সুয়েজে যখন পৌঁছল তখন ভোর হয়ে গেছে। এর আগের সোমবারটিতে মোহিত দেশের মাটির কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল—এবার তার বিদায় নিতে হবে শুধু দেশ থেকে নয়, সমস্ত প্রাচ্যভূমির স্নেহ-আলিঙ্গনের বন্ধন থেকে।···অজানা দেশে সে চলেছে,

কতদিনের জন্ম কে জানে?···জলে ভাসা অবধি জাহাজের দোলানি থামেনি', উত্থানপতনের বেগ মাঝে মাঝে মন্দীভূত হয়ে এসেছে, কিন্তু স্তব্ধ হয়নি'।

শীলার সাথে এ কয়দিন তার দেখা হয়নি'। সেই যে সেদিন সুইমিংবাথের সিঁড়ির কাছে একটা খণ্ডদৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেল তার পর সে যেন একেবারে চিরদিনের জন্ম নেপথ্যে সরে গেল—ভুলেও সে সেকেণ্ডক্লাশের সীমানায় আর পা' দিল না।

যোশীর একএকবার তীব্র ইচ্ছা হচ্ছিল শীলা রজার্স-এর সাথে গিয়ে আলাপ করে, মোহিতের প্রতি তার ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের বেগ কোথায় গেল প্রশ্ন করে। কিন্তু সে যে সেদিন তাদের না চিন্‌বার ভাণ করে সম্ভাষণটুকু পর্য্যন্ত করেনি' তার অপমানবেদনা তার মনে ভীষণভাবে বেজেছিল। তারপর যখন সে দেখ্‌লে মোহিতের বিক্ষুব্ধ মনও শান্ত হয়ে এসেছে তখন সে ভাব্‌লে, যা হয়ে গেছে তা' নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কী লাভ? ক্ষতকে নেড়ে চেড়ে তা' নতুন করে দেওয়ায় ত কোন সার্থকতা নেই!

বিক্ষুব্ধ চিত্ত যদি সত্যি সত্যিই শান্ত হয়ে গিয়ে থাক্‌ত তাহ'লে কোন কথাই ছিলনা, কিন্তু মোহিত নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না তার মন শান্ত হয়ে গেছে কি না। বাইরের সমতাতে ত আর অন্তরের সমতার পরীক্ষা হয়না, আর অন্তরের সমতা বিচার করবার মত শক্তিও যেন সে হারিয়ে ফেলেছিল!...সাগর দোলায় যে ঢেউ ওঠে, তা কি শুধু জলের উপরেই খেলে, না তার অভ্যন্তরেও দোলানি লেগে একটা ফল্গুস্রোত বয়?

তবু সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলে যে তার মনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই। তাই যোশী যখন কৃপালানির কাছে প্রস্তাব করলে যে তিনজনে একটা ট্যাক্সিভাড়া ক'রে মিশরের পিরামিড আর Sphynx দেখে না আসাটা ভয়ানক একটা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হবে তখন সে গভীর উৎসাহে তাতে সম্মতি দিলে।

কৃপালানি বল্‌লেন, বাবুজী, আমি মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ তোমাদের বিদ্যা নিয়ে ত' ওসব জিনিষ আমি দেখ্‌ব না, আমি দেখ্‌ব আমার সহজ বুদ্ধি দিয়ে। আমার সাধারণ চোখ দিয়ে দেখ্‌ব একটা সভ্যতার বিকাশ যার আলো বহু শতাব্দী আগে আমাদের দেশের মত অনেক দেশে ফুটে উঠেছিল।...আর তোমাদের সংসর্গ এই বুড়ো বয়সে ভালো লাগে দেখতেই পাচ্ছ...লোভ সামলানো দায়!

সুয়েজ থেকে পোর্ট সেড্‌ পর্য্যন্ত জাহাজ যেতে ঠিক্‌ আঠারো ঘণ্টা লাগে। ঠিক হ'লো, যোশী, মোহিত আর কৃপালানি তিনজনে ট্যাক্সি করে যাবে মরুভূমির ভিতর দিয়ে। প্রথম কায়রো সহরটা দেখে সেখানে কোন একটা রেস্তঁরায় লাঞ্চ খেয়ে বিকালের দিকে যাবে পিরামিড্‌ আর Sphynx দেখ্‌তে...কায়রোর উপকণ্ঠে। সেখান থেকে ট্রেনে করে তারা আস্‌বে পোর্ট সেডে, জাহাজ ধর্‌বে সেখানে।

সুয়েজে জাহাজ ভিড়্‌বার আগেই যোশী ষ্টুয়ার্ডকে গিয়ে তাদের প্রোগ্রাম জানালে। ষ্টুয়ার্ড বল্‌লে, ট্যাক্সি পেতে তাদের কোন অসুবিধা হবেনা, তারা যদি বড় একটা পার্টি করে তাহ'লে মোটরবাস্‌এরও বন্দোবস্ত করা যেতে পারে!

মোহিত প্রশ্ন কর্‌লে, পথে যদি কোন ব্রেক্‌ডাউন্‌ হয় তাহ'লে কী উপায় হবে? ষ্টুয়ার্ড একটু হাসলে; বল্‌লে, তার উপায় করবে ড্রাইভার...আমাদের জাহাজ নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে পোর্ট সেড্‌ ছাড়্‌বেই!

মোহিত ক্ষণেকের জন্ম একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, ষ্টুয়ার্ড হেসে তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে, ব্রেক্‌ডাউন খুব কচিৎই হয়, আর যদিও বা হয় তার জন্মে কারোর পোর্ট সেডে জাহাজ ধরাটা আটকে থাকেনা।

কৃপালানি কথোপকথনের মর্ম্ম শুনে বল্‌লেন, ব্রেক্‌ডাউন হ'লে কোনই ভয় নেই, বাবুজী...আমি কলকাত্তার বিষয় একটুআধটু জানি···আর যদি কপালে মিশরের ভাত লিখে থাকে তাহ'লে না হয় তার স্বাদটুকু নেওয়া যাবে ...কী বল?

ট্যাক্সি ক'রে তারা রওনা হ'ল মরুভূমির মধ্য দিয়ে। কৃপালানির কাছে মরুভূমি নতুন জিনিষ কিছুই নয়, রাজপুতানা আর সিন্ধ্‌এ এর খানিকটা আভাষ সে দেখেছে। যোশী আর মোহিত কিন্তু দেখে ভয়ানক পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল।

একটা ছোটখাট ওয়েসিস্‌এর পাশ দিয়ে তারা যখন যাচ্ছে তখন যোশী হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লে, আজ অনেকগুলো দল কিন্তু এপথ দিয়ে যাবে, মোহিত...আমাদের শীলা রজার্স এর সাথে যদি হঠাৎ দেখা হয় তাহ'লে চম্‌কে উঠো না কিন্তু...

তাচ্ছিল্যভরা সুরে মোহিত জবাব দিলে, তুমিও যেমন!... যেন শীলা রজার্স এর ভাবনায় আমার ঘুম হয়না!

কৃপালানি এদের কথোপকথন শুনছিলেন, একটু ঔৎসুক্যভরা সুরে প্রশ্ন কর্‌লেন, শীলা রজার্স টী কে?

যোশী কিছু বল্‌বার আগেই মোহিত বল্‌লে, একটি মেয়ে, পশ্চিম দেশের type বল্‌লেও চলে··· বিদ্যুৎ আছে যথেষ্ট, তার গুণগুলো তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান...

কৃপালানি ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে প্রশ্ন কর্‌লেন, তার মানে?

—মানে আর কিছুই নয়—তিনি বিদ্যুতের মত একটুখানি চমক দেখান মাঝে মাঝে, ভাবেন তাঁর ঝলকে সবাই উদ্ভাসিত হয়ে যাবে!···কিন্তু তাঁর ক্ষণিক ঝলকের ফল হয় এই যে মুহূর্ত্তের আলোর পর সবই হয়ে আসে অন্ধকার। যাঁরা উদ্ভাসিত হন তাঁদের চোখে তাঁর ছবি কতক্ষণ থাকে জানা যায়নি', তবে অনেকের মধ্যে তা' স্থায়ী হয়না একথা আমি শুনেছি!

মোহিতের কথার ঝাঁঝ দেখে যোশী একটু হাসলে। কৃপালানি গম্ভীর ভাবে চুপ করে রইলেন।

কায়রোর দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখে তারা ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে, একটা মিশরীয় কোন রেস্তোঁরায় নিয়ে যেতে। প্রস্তাবটা এল কৃপালানির কাছ থেকে। বললেন, যে দেশের এত সব প্রাসাদ, দুর্গ আর মসজিদ দেখলুম সেখানকার আহার আর পানীয় কেমন দেখা যাক্‌।

কায়রোর্‌ বাজারের বিসর্পগতি গলিগুলোর মধ্য দিয়া এঁকেবেঁকে typical একটা মিশরীয় রেস্তঁরায় গিয়ে তারা উপস্থিত হ'ল। যোশী একটুআধটু ফরাসী জান্‌ত, সে menu বাছ্‌বার ভার নিলে।

বিচিত্র মিশরীয় পোষাকপরিহিত ওয়েটার এসে জানালে যে খাবার তৈরী হ'তে প্রায় আধঘণ্টা দেরী হবে।

যোশী ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, এরাও কি আমাদের দেশেরই মত? সামান্য খাবার তৈরী হতে লাগ্‌বে একযুগ?

কৃপালানি সান্ত্বনার সুরে বল্‌লেন, রাগ করোনা, বাবুজী, পূব-দেশের আব্‌হাওয়ার শেষ ত এখানেই, সেটুকু না হয় প্রসন্ন মনে মেনে নাও! তারপর যখন উদ্দাম গতির ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়্‌বে তখন এই আলস্যভরা গতিহীনতার অভাব অনুভব ক'রে হয়ত মনে দুঃখও পাবে!

মোহিত বাইরে জনপ্রবাহ এবং তার কোলাহল লক্ষ্য করছিল। খাবার তৈরী হ'তে দেরী হ'বে শুনে সে প্রস্তাব কর্‌লে যে ইতিমধ্যে মিশরের বাজারের মধ্যে একবার ঘুরে আসা যেতে পারে।···তারপর একটুখানি আরক্ত মুখে সে বল্‌লে, তাছাড়া এদের মেয়েদের বিচিত্র অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কালো চোখের যা' চাউনী দেখ্‌ছি তাতে আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে সেটা আমি অসঙ্কোচে স্বীকার কর্‌ছি।

যোশী আর কৃপালানি কিন্তু তখনই সেখান থেকে উঠ্‌তে রাজী হ'লনা। বল্‌লে, মিশরসুন্দরীদের কটাক্ষ আর মিশরসুন্দরদের বাজার ত এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে না; ফেরবার পথে সে সব ভালো করে দেখা যাবে!

মোহিতের চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছা কর্‌ছিল না। সে কিছুক্ষণ পরে উঠে বল্‌লে, আমি একটু ঘুরে আসি যোশী···আধঘণ্টা শেষ হবার আগেই ফিরে আস্‌ব অবশ্যি!

যোশী এবং কৃপালানি বল্‌লে, দেখো, পথ হারিয়ে যেয়োনা কিন্তু···এখানকার সুন্দরীদের ছেলে ভুলাবার সুনাম আছে, মোহিত···

মোহিত হেসে বল্‌লে, যদি পথ হারিয়েই যাই তাহ'লে পিরামিডের মরুর সম্মুখে দেখা হবে অবশ্যই!

কথাটা সে বলেছিল উপহাসের সুরেই···সেটা যে সত্যি সত্যি ঘট্‌বে তা' সে ভাবেনি'।

রেস্তঁরা থেকে বেরিয়ে মোহিত সোজা বাঁ-দিকে চলে গেল। খানিক ঘুরে গিয়েই প্রকাণ্ড বাজার, তার গোলক-

ধাঁধার মধ্যে সোজা ঢুকে পড়লে সে, কোন রকম অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই !

একটা দোকানের সো' কেস্‌এর বাইরে সে মিশরের গৃহশিল্পের অর্ঘ্যসম্ভার মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করছিল এমন সময় ভেতর হতে একজন লোক এসে পরিষ্কার ইংরেজীতে তাকে বল্‌লে, দয়া করে একবার ভেতরে আস্‌বেন কি ?... আপনার ভালো-লাগ্‌তে-পারে এমন দু' একটা জিনিষ আপনাকে দেখাতে পারি...

প্রথমে মোহিত ভাব্‌লে যে দোকানের ভেতর ঢুক্‌লেই অসম্ভব রকম দেরী হ'য়ে যাবে, ওদিকে রেস্তঁরায় হয়ত খাবার সম্মুখে নিয়ে যোশী আর কৃপালানি বসে থাক্‌বে। কিন্তু কতকটা নিজের কৌতূহলে, কতকটা দোকানদারের আগ্রহে সে ভেতরে ঢুকে গেল।

দোকানি ত ছোটখাট নানা জিনিষ তার সম্মুখে খুলে ধর্‌লে। মোহিত প্রশংসমান চোখে সে সব পরীক্ষা করছিল এবং মনে মনে ভাব্‌ছিল সুভেনিয়র্‌ স্বরূপ ছোট একটা কিছু কিনে নিয়ে যাবে কিনা, এমন সময় সে ভয়ানক ভাবে চমকে উঠ্‌লে তার বাঁ-পাশে একটি মেয়ে কণ্ঠে অভিনন্দন শুনে...কেমন আছ, মোহিত ?

পাশ ফিরে দেখ্‌লে, শীলা রজার্স...একা...

মুহূর্ত্তের মধ্যে মোহিতের মনের এতদিনকার রুদ্ধ আবেগ হাল্‌কা হয়ে গেল—আর-সমস্ত কিছু সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্ত্তমান ওর মর্ম্মের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার ফুটিয়ে তুল্‌লে। একটা অস্বাভাবিক এবং অসাময়িক ঘুম থেকে যেন সে জেগে উঠ্‌লে...নিজের মনের মুখোমুখি হয়ে সে দাঁড়ালে।

কী যে বল্‌বে মোহিত প্রথমে ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌লে না। শীলা বোধ হয় তার মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই প্রথম প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা আর না করে সে আবার প্রশ্ন কর্‌লে, সুভেনিয়রের খোঁজে আছ বুঝি ?

এবার মোহিত কথা বল্‌বার মত ভাষা খুঁজে পেলে, অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বল্‌লে, হ্যাঁ...এতগুলো জিনিষ সম্মুখে ফেলে দিয়েছে, এর কোন্‌টা যে নেব ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিনা...

শীলা ডানদিকে একটু ঝুঁকে জিনিষগুলো গভীর উৎসাহের সহিত পরীক্ষা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।...সিগারেটের নল, সিগারেটের কেস্‌, কলম, ছুরী, প্রবালের এবং কাচের মালা, পাউডার-বক্স, আয়না, মেয়েদের ভ্যানিটি-ব্যাগ, রং-বেরংএর পাথরের cube, টাই, মোজা—অসংখ্য এবং অগুণ্‌তি, সবগুলোর মধ্যেই মিশরের কোন বিশেষ ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক ছাপ...

শীলা হেসে বল্‌লে, আমার পছন্দ কি তোমার মনে ধর্‌বে ?

—কেন ধর্‌বে না ?

—তাহ'লে এইটি নাও।...ব'লে সে ফ্রেমে বাঁধানো ছোট্ট একটি পিরামিড আর sphynxএর ছবি তুলে ধর্‌লে।...মিশরীয় এক আর্টিষ্ট্‌এর আঁকা, মরুভূমির আকাশ হয়ে এসেছে কালো, বাতাসে ধরেছে গুমোট্‌...যেন প্রলয়ের আবাহন · আর তারি মাঝখানে sphynxএর ভ্রূকুটি-কুটিল মূর্ত্তি পথ আগ্‌লে বসে আছে বিশ্বস্ত প্রতিহারীর মত... মিশর-সম্রাট্‌দের সমাধিগুলো আগ্‌লে !

ছবিটি মোহিতের খুবই পছন্দ হ'ল। সে দাম জিজ্ঞেস্‌ কর্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় শীলা তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, এবার তোমার পালা, মোহিত...তুমি আমার জন্যে একটা সুভেনিয়র্‌ বেছে দেও দেখি...

মোহিত ভয়ানক মুস্কিলে পড়্‌লে, বল্‌লে, কিন্তু তোমার কোন্‌টা পছন্দ-অপছন্দ হ'বে তা' যে আমি জানিনে...

যেন ভয়ানক ছেলেমানুষের মত মোহিত প্রতিবাদটা করেছে এম্‌নি একটা ভাব দেখিয়ে শীলা বল্‌লে, বাঃ রে !... আমি তোমার সুভেনিয়র্‌ পছন্দ কর্‌লুম কী ক'রে ?

সত্যিই ত ! এর জবাব দিবার কিছু মোহিতের ছিল না। সে নতশিরে জিনিষগুলো নাড়াচাড়া করে একটু-খানি ইতস্ততঃ ক'রে ছোট্ট একটা পাউডার-বক্স এগিয়ে ধর্‌লে। তার ঢাক্‌নার উপর প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছবি-ওয়ালা ভাষায় লেখা দুটো লাইন, আর নাইল্‌ নদের ছবি—সবটা এনামেলের কাজ করা।

শীলা প্রস্তাব কর্‌লে যে মোহিতের ছবিটির দাম দিবে সে, আর মোহিত দেবে তার পাউডার-বক্সটির দাম। মোহিত তার প্রস্তাবে অবাক্‌ হয়ে প্রশ্ন কর্‌লে, কেন ?

—একটুখানি খুসীর কাছে আত্মসমর্পণ এ···

মোহিত আর কোন আপত্তি করলে না।

দাম চুকিয়ে দিয়ে দু'জনে দোকান থেকে বেরিয়ে যখন এল তখন মোহিতের মনে পড়ল যোশী আর কৃপালানি তার অপেক্ষায় হয়ত রেস্তঁরায় বসে আছে। তাড়াতাড়ি ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলে দোকানের হাওয়ায় এবং শীলার সংসর্গে কখন যে একটি ঘণ্টা কেটে গেছে সে টেরও পায়নি'।

শশব্যস্তে সে বললে, আমায় এখখুনি যেতে হবে, শীলা, যোশী আর আর একটি বন্ধু আমার জন্যে এক রেস্তঁরায় বসে আছে···

শীলা বললে, রেস্তঁরায়? কোথায় সেটা?

—এই বাজারের বাইরেই—একটা মিশরীয় রেস্তঁরা···

—বাজারের বাইরেই ত? একটা জুয়েলারের দোকানের পাশে? আমার ট্যাক্সিও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, চল···

—তুমিও কি সেখানেই যাচ্ছ, শীলা?

—হ্যাঁ, তোমার আপত্তি নেই ত?

মোহিত একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, না, না, আপত্তির কথা বলছিনা···তোমার সঙ্গীসাথীরা সব কোথায়?

ভারী চমৎকার একটি হাসি হেসে শীলা জবাব দিলে, আজ আমি সঙ্গীসাথীর বন্ধন এড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছি, মোহিত ···মরুভূমির মাঝ থেকে একটি সহচর খুঁজে নিতে, বেদুইন বা fellahin যেই হোক্ সে···

বাজারের গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে শীলা রজার্স যখন তাকে জুয়েলারের দোকানের পাশে এক মিশরীয় রেস্তঁরার সামনে এনে হাজির করলে তখন মোহিত দেখলে যোশী আর কৃপালানি যেখানে ছিল এ সে নয়।···কায়রোর বাজারের সামনে জুয়েলারের দোকানের পাশে যে এত মিশরীয় রেস্তঁরা রয়েছে তা' কে জানত?

সে শীলাকে জানালে যে সে ভুল জায়গায় এসেছে।

—তাই ত, এখন কী করা যায়?

ট্যাক্সিওয়ালাকে মোহিত প্রশ্ন করলে। ট্যাক্সিওয়ালা বললে বাজারের আশেপাশে এরকম অন্ততঃ পঞ্চাশটা রেস্তঁরা আছে, রাস্তার নাম না জানলে খুঁজে বার করা মুস্কিল।

মোহিত রাস্তার নাম মুখস্থ করে রাখেনি', সে অসহায় ভাবে শীলা রজার্স'এর দিকে তাকালে। শীলা চিন্তিতস্বরে বললে, আমারই অন্যায় হয়ে গেল, মোহিত···তোমার বন্ধুরা ভাববেন কী?

মোহিত বললে, এস, একটু খোঁজা যাক্, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে তাহ'লে দেখা মিলেও যেতে পারে ত।

ট্যাক্সিওয়ালা তাদের নির্দেশমত এদিক ওদিক প্রায় আধঘণ্টাখানেক ঘুরলে, কিন্তু মোহিতের পরিচিত রেস্তঁরার সন্ধান আর মিলল না। ঘুণাক্ষরেও মোহিতের মনেই হ'লনা যে তারা খুঁজছে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে, যোশী আর কৃপালানি বসে আছে বাজারের অপর সীমান্তে।

শীলা বললে, তাহ'লে কী করবে, মোহিত?

মোহিত বর্ত্তমানের স্রোতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ক'রে বললে, কী আর করব?...ওরা ত পিরামিড্ দেখ্তে যাচ্ছেই···আমিও একটা ট্যাক্সি নিয়ে সেখানে চলে যাই—দেখা সেখানে নিশ্চয় মিলবে...

শীলা একটুখানি সঙ্কোচের সহিত বললে, আমার সাথে আসতে তোমার আপত্তি আছে, মোহিত? আমিও ত সেখানে যাব...

একটুখানি ভেবে মোহিত বললে, আপত্তি থাকলেও আপত্তি করবনা, শীলা। যার উপর হাত নেই সেই ভবিতব্য বলে পদার্থটা যখন আমায় এমন ঘোরাচ্ছে তখন তার সাথে সন্ধি করাই ভালো···

শীলা প্রস্তাব করলে, তাহ'লে কোথাও খেয়ে নেই, কী বল?...তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়...

—খিদে ত বেশ পেয়েছে, শীলা, তবে খুব বেশী দেরী করা উচিত হবেনা, ওদের সাথে দেখা হওয়া চাইই কিন্তু ...নইলে বিষম একটা গোলমাল হয়ে যাবে।

—বেশী দেরী হবেনা, মোহিত। আর, তোমার বন্ধুরা কি রোদটা একটু না পড়লে সেই মরুভূমির মাঝখানে

যাবেন?···শুনেছি. সেখানে আশে পাশে এক বিন্দুও জল নাকি নেই, সব ওয়েসিস্ শুকিয়ে গেছে বালুর ঝড়ে...

কথাটা সত্য। পোর্ট সেডে পৌঁছ্‌বার ট্রেন ত' ছাড়্‌বে সন্ধ্যায়...এত শীগ্‌গীর ক'রে তারা নিশ্চয়ই পিরামিড্ দেখ্‌তে যাবেনা···হয়ত বা বাজারের মধ্যে তার জন্তে একটু ঘোরাফেরাও কর্‌বে!

রেস্তঁরায় বসে মোহিত অবাক্ হয়ে ভাবছিল কী ক'রে এমন আচম্‌কা দেখার পরও তার আর শীলার কথাবার্তা এত সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে এল। যেন কিছুই হয়নি'... দুজন বন্ধু যেন অপরিচিত কোলাহলের মাঝখানে পরস্পরের সুর চিন্‌তে পেরে নিজেদের নিগূঢ় বন্ধনটি নিবিড় করে নিয়েছে!

হঠাৎ শীলা রজার্স প্রশ্ন কর্‌লে, তুমি আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছিলে মোহিত, নয় কি?

স্বপ্নোত্থিতের মত তন্দ্রাজড়িতসুরে মোহিত বল্‌লে, ভয়ানক করেছিলুম কি না বল্‌তে পারিনা, শীলা, তবে একটু করেছিলুম···এবং সেটা বোধ হয় রাগ নয়—বেদনা-মেশানো অভিমান···

খুবই খোলাখুলিভাবে মোহিত নিজের মনটি শীলার সম্মুখে তুলে ধর্‌লে। এরকম ক'রে তুলে ধর্‌তে আর কেউই বোধ হয় পার্‌তনা, অন্ততঃ সাহস হতনা অনেকেরই।···শীলা গভীরসুরে বল্‌লে, অভিমান কখন হয়, জানো?

—জানি···

ছোট্ট একটি উত্তর। এর মধ্যে না আছে উচ্ছ্বাস, না আছে দীপ্তি।· কিন্তু অনুভূতির গভীরতার রঙীন্ আলোয় ছোট্ট কথাটি ঠিক্‌রে যেন স্নেহ ঝরে পড়্‌ছিল।

শীলা তার সদ্য-কেনা পাউডার-বক্সটি নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে, তোমার এই উপহারটি আমার কাছে চির-অমূল্য হয়ে থাক্‌বে, মোহিত...

মোহিত কোন জবাব দিলে না।

শীলা বল্‌তে লাগ্‌লে, জানি তুমি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভেবেছ। সেসব প্রতিবাদ কর্‌বার মত শক্তি বা সাহস আমার নেই।···তবে একটি অনুরোধ, সেসব আজকের কয়েকটি ঘণ্টার মত ভুলে যাও...হঠাৎ-পাওয়া এমন অবসরটুকু নির্ম্মল এবং ক্লেদহীন করে তোলো।

মোহিত বল্‌লে, তোমার উপর খানিকটা শ্রদ্ধা এবং প্রীতি যদি অটুট না থাক্‌ত, শীলা, তবে অভিমানের রেখাটুকু পর্য্যন্ত আমার মনে স্থান পেতনা, এটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

শীলার মুখ দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল।

লাঞ্চের পর ট্যাক্সি করে তারা পিরামিড্ অভিমুখে রওনা হ'ল। ট্যাক্সিওয়ালা তাদের নির্দ্দেশমত নাইলের পাশ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেল। নয়নাভিরাম ঘনসবুজ গাছের শ্রেণী দুধারে, পাশে নাইলের স্রোত বয়ে চলেছে।

শীলা মুগ্ধভাবে বল্‌লে, কী সুন্দর!

মোহিত বল্‌লে, এদেশের লোকে নাইল্‌কে দেবতার মত পুজো করে—এর জল হচ্ছে চাষীদের প্রাণ, এর গভীরতা হচ্ছে বাণিজ্যের সম্ভার···

ট্যাক্সি নাইলের উপর বিশাল ব্রিজ্ অতিক্রম করে চল্‌ল পিরামিডের দিকে—মরুভূমির পথে। মোহিত বল্‌লে, বেজায় গরম লাগ্‌ছে, না?

—হাঁ···এদেশে যদি এই নাইল না থাক্‌ত তাহ'লে এদের কী অবস্থা হত!

মরুভূমির মধ্য দিয়ে ট্যাক্সি চলেছে। হটাৎ ট্যাক্সিওয়ালা বলে উঠ্‌লে, ঐ দেখুন, বাঁ-দিকে একটা জলের রেখা বলে মনে হচ্ছে, ওখানে আসলে কিন্তু বালু···ও হচ্ছে mirage!

Mirage!...মরীচিকা!—ছেলেবেলায় ভূগোলে এর সংজ্ঞা পড়েছে, কল্পনার চোখে তখন কত কী ছবিই না এঁকেছে!···এই সেই!

শীলা প্রশ্ন কর্‌লে, সত্যিই ওখানে জল নেই, মোহিত?··· আমি যে দিব্যি দেখ্‌তে পাচ্ছি জলের উপর ঢেউএর রেখা!

মোহিত হেসে বললে, তোমার দিবাচক্ষুও যে নির্ভুল নয় তার প্রমাণ হচ্ছে এখানেই...

—তুমি আমায় খোঁচা দিতে পারলে খুব খুশী হও, না মোহিত?...শীলা মোহিতের দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্নটি করলে।

মোহিত একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বললে, এই দেখত—আবার অভিমান হ'ল!...যাই বল, শীলা, তোমাদের মনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভার!

মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত ক'রে তার হাতের পকেট গাইড-বুকটা মোহিতের কোলের উপর ফেলে দিয়ে শীলা বললে, এখনও বলবে অভিমান করেছি?

ট্যাক্সি যখন পিরামিডের সম্মুখে রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন একপাল গাইড্ শীলা আর মোহিতকে ছেঁকে ধরলে। শীলা আর মোহিত গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে তাদের এড়িয়ে এগিয়ে চললে—যেন তাদের ভাষা কিছুই বুঝ্তে পারছেনা! একটা গাইড কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইট্যালীয়ান, ডাচ্, স্প্যানিশ্, অ্যারেবিক্ সব ক'টা ভাষায় প্রশ্ন ক'রেও যখন কোন জবাব পেলেনা তখন তার শেষ অস্ত্র ছাড়্লে মুখ এবং হাতের ভঙ্গী দিয়ে ভাবপ্রকাশ।...মোহিত ভয়ানকভাবে খুসী হয়ে লোকটাকে বক্‌শিস্ দিয়ে বিদায় করলে, বললে, এর পরও যদি আমরা বলি যে ওর ভাষা বুঝ্তে পারিনি' তাহ'লে ভয়ানক ভণ্ডামি করা হবে!

রোদ যদিও তখন পড়ে এসেছে তবু মরুভূমির বালু একেবারে তেতে রয়েছে কিন্তু পিরামিড্ দেখ্বার উৎসাহ দু'জনেরই এত প্রবল যে সব অগ্রাহ্য করে তারা এগিয়ে গেল।

Sphynxএর সম্মুখে এসে শীলা মুগ্ধনেত্রে দাঁড়িয়ে রইলে।

মোহিত বললে, এই যে Sphynx দেখ্ছ এ হচ্ছে এখানকার প্রহরী...শান্তিসুপ্ত অধিবাসীদের বিশ্রামে যাতে কেউ বিঘ্ন না ঘটায় তারই জন্য এর স্থাপনা...

শীলা প্রশ্ন করলে, তুমি এসব বিশ্বাস কর, মোহিত?

—আমি যে দেশের মানুষ, শীলা, সেদেশে লোকে এরকম অনেক জিনিষই বিশ্বাস করে...

—আমি লোকের কথা জিজ্ঞেস্ করছিনা, মোহিত, তোমার কথা জিজ্ঞেস্ করছি...

—বিশ্বাস করি কি না জানিনে, তবে যারা সত্যি বিশ্বাস করে তাদের অন্তরের গভীরতার কাছে আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে আমি একটুও ইতস্ততঃ করিনে'।

বড় পিরামিডের সম্মুখে এসে মোহিত প্রস্তাব করলে যে সে ভেতরে ঢুকবে—তার অভ্যন্তরে রাজা এবং রাণীর ঘরগুলো দেখে আস্‌বে...

—উঠ্বার পথ আছে, মোহিত?

—গাইড্‌বুক ত বলছে, আছে...তবে একটুখানি কষ্ট হবে তোমার...

—তুমি যাচ্ছ ত?

—হ্যাঁ...

—তাহ'লে আমিও যাব। তুমি কি মনে কর আমার সাহস তোমার চেয়ে কম? তা'ছাড়া দরকার হ'লে তুমি সাহায্য করতে পারবে ত?

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির উপর দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি কাটতে কাটতে উভয়ে রাজা এবং রাণীর ঘর দুটিতে প্রবেশ করলে। মোহিত শীলার হাত ধরে তাকে প্রায় টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে উঠ্‌লে। ঘরে এসে শীলা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, বাগো! কী যে সখ তোমার!

শুব্ধ গাম্ভীর্য্যে ভরা ঘর।... কবে কত সহস্র বর্ষ আগে মানুষ তৈরী করে রেখে গিয়েছে—দেয়ালের গায়ে তার রেখা এখনও বর্ত্তমান!...মোহিত বললে, জানো, এই ঘর যখন প্রথম আবিষ্কার হ'ল তখন এর মেঝেতে লোকে ছয় হাজার বছর আগেকার পায়ের দাগ দেখ্‌তে পেয়েছিল—আর তা' দেখে প্রথম আবিষ্কারক আনন্দে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন!

—সত্যি?...শীলা বললে।

তার মন কিন্তু তখন মোহিতের কথার দিকে ছিলনা। মনের দুঃসহ আবেগ কেটে বেরিয়ে পড়্‌তে চাচ্ছিল অশ্রু-ধারায়...আজ সমস্ত পৃথিবীর বাইরে এই অর্দ্ধালোকিত

কক্ষাভ্যন্তরে যেন সে দেখতে পাচ্ছিল নিজের আসল ছবিটি। তার সমস্ত সত্ত্বা লুপ্ত হয়ে যেন একটি অনুবেদনার শিখায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, এ যেন এক নতুন আরম্ভ, এর শেষ যে কোনদিন আস্‌বে তা' তার চিন্তার গণ্ডীরেখার মধ্যে আস্‌ছিল না।

শীলা বল্‌লে, আজ যদি তোমার সাথে এমন আচম্‌কা দেখা না হ'ত মোহিত, তাহ'লে তুমি আমার সম্বন্ধে কত বিশ্রী ধারণাই না পোষণ করতে!

সহানুভূতিভরা কণ্ঠে মোহিত জবাব দিলে, আমার তা' মনে হয়না, শীলা···তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু খারাপ ভাব্‌বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেসব ধারণা মরীচিকার মতই গেছে মিলিয়ে।...কী জানি কেন, পেছনের অন্ধকারের উপর আলোর ছবিটাই জ্বলে উঠেছে তীব্রভাবে···

খুব মৃদুকণ্ঠে শীলা বল্‌লে, সে তোমার মহানুভবতা, মোহিত···

একটুখানি ইতস্ততঃ ক'রে গভীর স্নেহভরে শীলার হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তাতে একটুখানি চাপ দিয়ে মোহিত বল্‌লে, আমার মহানুভবতা নয়, শীলা··· তোমার প্রাণের তরঙ্গধ্বনি এর জন্যে দায়ী···এর উত্থান-পতনের মধ্যে কী রহস্য লুকানো রয়েছে তা' আমি জানিনা, তবে তার যে ছন্দটুকু কানে শুনতে পাই মাঝে মাঝে—···

বাধাদিয়ে হঠাৎ শীলা প্রশ্ন কর্‌লে, আমরা ··· ···ন সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে নই, মোহিত, নয় কি?

—না···

তুমি কি মনে কর যে আমাদের মনের এই জানাজানিটুকু সম্ভব হয়েছে এই সাগরদোলায় শুধু, মোহিত?···না, এছাড়াও বড় সত্য এর পেছনে আছে?

একটুখানি চিন্তিতসুরে মোহিত বল্‌লে, ভেবে দেখিনি', শীলা···এর জবাব দেব পরে...

শীলা আর কিছু বল্‌লেনা, ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলে।

বাইরে এসে মোহিত বল্‌লে, তাইত, যোশীদের দেখা যে পেলাম না! কী করি বলত, শীলা!

—ওরা কি তাহ'লে পিরামিড দেখতে আসেনি'?

—আসাত' উচিত ছিল। এত শীগ্‌গীরই দেখে চলে গেল, না আমারই খোঁজে কোথাও গিয়েছে কিছুই বুঝতে পারছিনা যে!

পিরামিডের নিকটেই ছোট্ট একটি কক্ষেতে বসে তারা লেবুর রস খাচ্ছিল এমন সময় মোহিত প্রশ্ন কর্‌লে, আজ তুমি হঠাৎ একা চলে এলে কেন, শীলা?

একটুখানি দুষ্টামিভরা হাসি হেসে শীলা বল্‌লে, তোমার খোঁজে···

—না, সত্যি, ঠাট্টা নয়...বলনা···

—সত্যি বল্‌ব?

—বল···

—কেন যেন আজ সকাল থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে একটু মুক্তির হাওয়া আমার পক্ষে ভয়ানকভাবে দরকার। মিস্ হিল আর কর্ণেল গ্রীণএর সংসর্গে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, মোহিত।···ওরা যেন ঘন অন্ধকারের প্রতীক, আমার মনের নানারংএর পাপ্‌ড়ীগুলো ওদের ছায়ায় বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল এবং রুদ্ধ আবেগে সেগুলো যেন গুমরে গুমরে উঠ্‌ছিল।···তুমি আমার অবস্থাটা বিবেচনা করে আমায় ক্ষমা করো, মোহিত···

আর্দ্রকণ্ঠে মোহিত বল্‌লে, তোমাকে ত' আগেই বলেছি, শীলা, তোমার উপর হয়েছিল আমার অভিমান। সেটা কেন হয়েছিল তুমি জানো এবং তা' হতে পারতনা যদি তোমার সম্বন্ধে আমার মনের কোণে একটু ছাপ না থাক্‌ত।···সে অভিমান অনেকক্ষণ কেটে গেছে—মনের সব ফাঁক এখন সুগভীর এক আনন্দে ভরে উঠ্‌ছে।

শীলা প্রশ্ন কর্‌লে, সেদিন যখন তোমায় না চিন্‌বার ভাণ করে চলে গিয়েছিলুম তখন তুমি খুব রাগ করেছিলে, না?

—রাগ বিশেষ হয়নি, শীলা, হয়েছিল একটু ব্যথা।··· একটা মূর্ত্তিকে যদি বহু অনুষ্ঠান দিয়ে গড়ে তোল্‌বার পর হঠাৎ টের পাওয়া যায় যে সেটা শুধু পাথরের, তার মধ্যে প্রাণ নেই, তখন মনে লাগে বিষম একটা ধাক্কা।···শিল্পীর চোখ দিয়েও দু'এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

—তুমি চোখের জলও ফেলেছিলে, মোহিত?

—একটুখানি…

স্তব্ধবিস্ময়ে শীলা চুপ করে রইলে। সে ভাবতেও পারেনি' যে তার কল্পনার অন্তরালে মোহিত তাকে এতখানি ভালোবেসেছে। অথচ মোহিতের স্বভাবই এই যে সহজে সে তার মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করে বলে না—নিজেকে নিয়ে নিজের সাথেই খেলা করতে ভালোবাসে বেশী…

মোহিত বললে, এবার আমাদের উঠতে হবে, শীলা, নইলে ট্রেন ফেল করব কিন্তু…

কায়রো ষ্টেশনে গিয়ে দু'জনে একটা সেকেণ্ডক্লাশ কামরায় উঠতে যাবে এমন সময় সামনের এক গাড়ী থেকে যোশী তাদের ডাকলে। মোহিত এগিয়ে যেতেই যোশী হেসে বললে, বেশ যা' হোক্!…মিস্ রজার্স'এর মোহিনীশক্তি আছে তা' না হয় মানলুম, কিন্তু তাই বলে কি ক্ষুধিত বন্ধুদের অমন করে রেস্তোঁরায় ফেলে পালিয়ে যেতে হয়?

ভয়ানক ভাবে লজ্জিত হয়ে মোহিত বললে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, যোশী…কিন্তু মিস্ রজার্স'এর সাথে আমার আচমকা দেখা হয়ে যাওয়াতেই এই গোলমাল হয়েছে!

শীলা মোহিতের কথায় সায় দিয়ে বললে, ওর কোনই দোষ নেই, যোশী, সুভেনিয়র্ কিনতে গিয়ে আমিই ওকে আটকে রাখি, তারপর পথ ভুলে যাওয়ায় তোমাদের খুঁজে বার করতে আমরা পারিনি'।

ব'লে সে সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ বললে।

যোশী বললে, এবারকার মত তোমাদের মাপ করছি, মিস্ রজার্স আর মোহিত, কিন্তু ভবিষ্যতে এত সহজে ক্ষমা মিলবেনা তা' বলে রাখছি!

মোহিত এবার প্রশ্ন করলে, আমায় খুব খুঁজেছিলে কি, যোশী?

—আমাদের সৌভাগ্য যে বেশী খুঁজতে হয়নি'। জানতুম বাজারে গিয়েছ—সেখানে একটা দোকানের বাইরে উঁকিঝুঁকি মারছি এমন সময় একটি ছোকরা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলে আমরা কিছু কিনতে চাই কিনা।…আমরা বললুম আমরা এক বন্ধুর খোঁজ করছি।…রংটা ত দেখছ, ভুল করবার জো নেই…ছোকরাটি বলে উঠল, ওঃ, আপনার বন্ধু?…তিনিত খানিকক্ষণ আগে এখান থেকে জিনিষ নিয়ে গেছেন, তিনি থাকতে থাকতেই আরেকজন মহিলা এলেন, তাঁর সাথে বেরিয়ে গেলেন।…আমরা তখন আঁচ করে নিলুম ব্যাপারটা কী। তোমার সন্ধানে ঘোরা তখন আলেয়ার পেছনে ছোটার চেয়েও বেশী অনিশ্চিত মনে করে সোজা চলে গেলুম পিরামিড্ আর sphynx দেখতে।

—ওঃ, তাই আমরা তোমাদের দেখা পাইনি সেখানে!…আমরা গিয়েছিলুম চারটের ওপরে…

কৃপালানি এতক্ষণ গাড়ীর কামরার ভেতরে বসে এদের কথোপকথন শুনছিলেন। এবার মুখটা জানালার কাছে এনে বললেন, বাবুজী, অনাদিকালের এই সব রহস্যগুলো লুকোচুরির সাথে আমাদেরও কিছু পরিচয় আছে…তাই আমরা নিশ্চিন্ত মনে এখানে বসে আছি আপনাদের প্রতীক্ষায়…

শীলা আরক্তমুখে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। মোহিত তাকে ডেকে কৃপালানির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে, এর মুখের কথাগুলো হ'ল পাহারওয়ালার চোরধরা বুষ-চক্ষু লণ্ঠনের মত—ঘাবড়ে যেয়োনা কিন্তু…

শীলা হাসিমুখে কৃপালানিকে অভিবাদন করলে। কৃপালানি তার প্রতি-অভিবাদন করে তাঁর ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বললেন, বাবুজীর কথায় বিশ্বাস করবেন না আপনি; আমি বুড়োসুড়ো মানুষ, অহিংস্র এবং নিতান্ত নির্জীব চেহারা আমার…

শীলা একটু হাসলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবগোপাল দাস

স্ত্রীরত্নং

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

সেশনস্ কোর্ট হইতে বাহির হইয়া ব্যারিষ্টার হিমাংশু সেন একটা সিগার ধরাইলেন।

অনেকক্ষণ মৌতাত বন্ধ।

সতেরোটা মোহরের প্রলোভন কম না হইতে পারে শুধু এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া একাদিক্রমে জেরার পরিশ্রম, তার উপর চুরোট না ধরাইতে পারা—ইহার চিন্তাও কষ্টকর।

তাঁহার পিছনেই সার্জেণ্ট প্রকাণ্ড দরজাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

ওভার-ব্রীজ পার হইয়া উকিলদের কামরা পার হইয়া, রেজিষ্ট্রারের কোর্ট পার হইয়া, হাইকোর্টের লম্বা করিডোর ধরিয়া তিনি চলিলেন, জুতার মাপকরা খটাখট্ শব্দ, হাওয়ায় উড়িয়া যাওয়া গাউনের প্রান্ত, মোটা বর্ম্মা সিগারের ধূমের অন্তরালে তাঁহার চশমা-শোভিত Clean-shaved মুখমণ্ডল—পশারওয়ালা এড্‌ভোকেটের সমস্ত মর্য্যাদা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল।

এখানে ওখানে মক্কেলদল পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

বার লাইব্রেরীর সামনে যাহারা চা বানাইতেছিল তাহারাও একটু সরিয়া দাঁড়াইল—এইচ্ সি সেনকে কে না চেনে?

অরিজিন্যাল সাইডের একটা কোর্টে তাঁহার কেস আছে।

কোর্টরুমে ঢুকিয়া দেখিলেন সামনের দুইসার চেয়ার সমস্ত ভর্ত্তি, তিনি আগাইয়া যাইতেই একজন জুনিয়ার জায়গা ছাড়িয়া দিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

সেদিনের রোজগার, প্রায় হাজার টাকার নোট, প্যাণ্টের পকেটে গুঁজিয়া এড্‌ভোকেট এইচ সি সেন বরিন্দার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এটর্নী উকিল ও মক্কেলের দল চারিপাশে ঘিরিয়া ফেলিল। সকলকে চেম্বারে দেখা করিতে বলিয়া তিনি রৌদ্রচ্ছায়াচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ বাগানের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া দিলেন।

অতি বৃহৎ প্রাসাদোপম বাড়ীটার একতলা, দুতলা, তিনতলার অসংখ্য ঘরে অসংখ্য রকমের কাজ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে, এখান হইতে সকলদিকের কাজের বিপুলতার আভাষ পাইতে দেরী হয়না।

নীচে কলে জল আসিয়াছে, সেখানে লোকের ভিড়। রাঙা রাস্তা দিয়া মালী জলের ঝারি লইয়া চলিয়াছে, আরেকটা ওধারে সিজ্‌ন ফ্লাওয়ারের বিচিত্র বেড্ তৈরী করিতেছে।

মাঝখানের ফোয়ারায় জল ছিটকাইয়া পড়িতেছে, তারই নীচে গোল বাঁধানো চৌবাচ্চায় লালমাছ রাখা আছে, সমস্তটা এখান হইতে নজরে পড়েনা, তবু হিমাংশুর —বিখ্যাত আইনজ্ঞ হিমাংশু সেনের ইচ্ছা করে ঐখানে গিয়া বসিয়া অন্ততঃ খানিকক্ষণ খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লয়।

কিন্তু সে হইবার নয়। তাঁহার মত লোককে ঐ ময়লা জলের বিশ্রী জলাশয়ের পাশে দেখা অনেকের পক্ষেই boring হইবে।

হয়ত আগামীকালের কাগজে সে সম্বন্ধে প্যারা বাহির হইতে পারে।

তবু ভালো লাগে ছাতিমগাছটার অন্তরালে কোকিলের ডাক। নীরস আইনব্যবসায়ের তিক্ত আবহাওয়ার মধ্যে সার্জেণ্ট পাহারা পেয়াদার কুশ্রী ভীতিপ্রদ আনাগোনার অবকাশে নির্ভীক কুহুধ্বনি দূর বনানীর এক পাগলকরা পাখীর।

হিমাংশুর মন কল্পনার রসে উধাও হইয়া ছুটিতে চায় কোন্ মহাপারাবারের শেষ রেখারও শেষে।

'বাবু' আসিয়া সবিনয়ে বলে, বিস্তর ক্লায়েন্ট অপেক্ষা করিতেছে।

চেম্বারের কাজ মিটিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। মরিস্ অক্সফোর্ড কার্‌খানা যখন সদররাস্তায় পড়ে, তখন সিগার ধূমের কুয়াসা ভেদ করিয়া হিমাংশুর নজর চলিয়া যায় কলিকাতা হাইকোর্টের চূড়ার মাথায়। সূর্য্যের শেষ রশ্মি আর সেখানে লাগিয়া নাই, লম্বালম্বা বারান্দাগুলা জনহীন। এই তাঁর স্বপ্নমন্দির, মাসে মাসে চল্লিশ হাজার মুদ্রা এখান হইতে অবলীলাক্রমে তিনি লুটিয়া লইয়া যান।

বাবুঘাটের ধার দিয়া ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়া গঙ্গার তীর ধরিয়া কোর্টকে প্রদক্ষিণ করিয়া মোটর ছুটিয়া চলে। একদিকে জাহাজে জাহাজে আলো দিয়াছে, আর একদিকে ধরালোক স্বপ্নলোক ময়দান।

প্রিন্সেপস্ ঘাটে গাড়ী থামাইয়া পাথরের বৃহৎ সিঁড়িটার পিঠের উপর একটু ক্ষণের জন্য চড়িয়া বসিয়া সন্ধ্যার গঙ্গার স্নিগ্ধ বাতাসটুকু আরামে উপভোগ করিবারও গোপন বাসনা জাগে।

তাও হইবার নয়। বাড়ীতে বৈঠকখানায় হয়ত লোক বসিয়া আছে।

সত্যই বসিয়া আছে। কাপড়জামা বদ্‌লাইবার অবসর হয়না, নথীপত্র লইয়া বসিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে চা বিস্কুট আর পোরিজ জলযোগ করিয়া লইতে হয়।

অধিকাংশই মাড়োয়ারি, আটলাখ দশলাখ ছাড়া কথা নাই।

তবুও এগারোটার আগে কথা শেষ হয়না।

তারপর শোবার ঘরে ঢুকিয়া কাচের একগ্লাসে জল লইয়া মুখ ধুইয়া টেবিলে রাখা খানকয়েক লুচি আর মাংসের কোর্মা, নবরত্ন কারী আর আদার চাটনী। তারপর একটা সিগার ধরাইয়া রাত্রি ২টা অবধি আইনের বই পাঠ, মাঝে মাঝে দুই এক চুমুক বিয়ার।

আড়াইটায় নিদ্রা এবং ছয়টায় ওঠা, তারপর চা ওমলেট আর খবরের কাগজের সঙ্গে মক্কেলের কাগজ আসিয়া হাজির হয়।

বয়স হইয়া গেছে চল্লিশ, এদিকে ঘরে মাতা নাই পত্নী নাই, সেবা করিবার ভর্ৎসনা করিবার কেহ নাই। তার উপরে এত পরিশ্রম!

নিউ পার্ক এক্‌টেন্‌শনের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বাবুর্চ্চি খানসামা মালী প্রভৃতি কয়েকটা লোকজন, আর বিপুল ব্যাঙ্ক ব্যালান্স,—ইহাতে কি মনের ক্লান্তি মেটে?

লোকে বিশ্বাস করিবেনা কিন্তু হিমাংশু সেনের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন একটা ইম্পর্ট্যান্ট কেস চালাইয়া হিমাংশু আর চেম্বারে ঢুকিলেন না। একরকম সকলকে ফাঁকি দিয়াই টাউনহলের দিকে গাড়ী চলাইতে বলিলেন, আজ সেখানে একটা মিটিংএ রবীন্দ্রনাথের আসিবার কথা।

রবীন্দ্রনাথকে তিনি অনেকদিন দেখেন নাই, আজ আকাশে মেঘ করিয়াছে, এমনি অন্ধকার দিনেই বর্ষার কবিকে তিনি দেখিবেন।

টাউনহলের সুরকিঢালা রাস্তায় হর্ণ দিয়া মোড় ঘুরিতেই একটু দু-এক পশলা বৃষ্টি ঝরিল।

গাড়ীবারান্দার নীচে অনেকেই কবির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, হিমাংশু তাহাদেরই মাঝে দাঁড়াইলেন।

হঠাৎ একটী মেয়ে—বয়স কত আন্দাজ করা শক্ত, পঁচিশও হইতে পারে, পঁয়ত্রিশ হওয়াও অসম্ভব নয়—মুখের লালিত্য দেখিয়া তারুণ্য জাগিয়া আছে মনে হয়—হিমাংশুর অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চোখ পড়িতেই হিমাংশু দেখেন সাহায্য প্রার্থনায় দক্ষিণ কর সে মিলিয়া দিয়াছে।

লম্বা একহারা চেহারা, কৃশ বলা যায়—মাথার আবরণের মধ্যে শাড়ীর পাড় খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, গায়ে সেমিজ একটা থাকিলেও তত পরিষ্কার নয় অথচ সমস্ত চেহারাটা দেখিলে খানিকটা সম্ভ্রান্ত-ভাবি মনে হয়। হিমাংশু প্যান্টের পকেট হইতে ব্যাগটা টানিয়া বাহির করিলেন কিছু দিবার জন্য। খুলিয়া দেখিলেন সবগুলই নোট তিন হাজার টাকার।

খুচরা কিছু নাই। কাজেই ব্যাগটা আবার পকেটে পুরিতে হইল। 'মাপ করো' কথাটা মুখে যোগাইল না, এদিক হইতে নিঃশব্দে হিমাংশু ওদিকে সরিয়া গেলেন, যেখানে শাঁখ হাতে করিয়া পুরনারীরা দাঁড়াইয়া আছেন, এবং লাল শালুর দুইপাশে ক্ষুদে পাম্ দুলিতেছে।

হঠাৎ একসঙ্গে শাঁখ বাজিয়া উঠিল এবং সমবেত নরনারীরা এধারে ওধারে সরিয়া সচকিত হইয়া উঠিল—কবি আসিতেছেন!

কবি আসিবার মুখে ভিড়ও কিছু বাড়িয়া উঠিল, দৃষ্টিও সকলের কবি ও কবির মোটরের দিকে ছুটিল, এই অবসরে হিমাংশু অনুভব করিলেন তাঁহার প্যাণ্টের পকেটের কাছে কাহার করস্পর্শ। ফিরিয়া দেখিতে না দেখিতে সেই মেয়েটি সরিয়া গেল তাঁহার পাশ হইতে যে কিছুক্ষণ আগে সাহায্যের আশায় আসিয়াছিল, এবং হিমাংশু দেখিলেন মনিব্যাগ অন্তর্হিত।

ঘটনাটা কাকতালীয়বৎ, মেয়েটি পাশ হইতে বিদ্যুৎগতিতে সরিয়া গেল, এবং মনিব্যাগও সেই মুহূর্ত্তে লোপাট। হয়ত সে না লইতে পারে কিন্তু অধিকতর সন্দেহজনক কাহাকেও ধারে কাছে পাওয়া যাইতেছে না। অতএব—

অতএব হিমাংশু তাহাকেই অনুসরণ করিলেন।

দেখা গেল মেয়েটির পা অত্যন্ত জোরে চলে।

টাউনহলের ফটক পার হইয়া হাইকোর্টের দিকে সে চলিল, খানিকটা অগ্রসর হইয়া বেঙ্গল কাউন্সিলহাউসের সামনেই একটা ট্যাক্সি আসিতে দেখিয়া সে অঙ্গুলিসঙ্কেতে থামাইল। গাড়ীতে উঠিতেই গাড়ী ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটে ঢুকিল।

হিমাংশু নিজের গাড়ী ভিতরে বাগানে ফেলিয়া আসিয়াছেন, সোফারকে জানাইয়া আসেন নাই, এখন ডাকিবারও সময় নাই, আর একখানা ট্যাক্সি গভর্ণমেন্ট্ হাউসের দিক হইতে আসিতে দেখিয়া তিনি সেটাকে ধরিলেন এবং বলিলেন ঐ কারখানাকে ফলো করো।

বাঙালী ড্রাইভার, মুচকি হাসিয়া স্পীড্ বাড়াইয়া দিল।

ডালহাউসি স্কোয়ার ওয়েষ্ট, নর্থ, লালবাজার ষ্ট্রীট রাধাবাজার ষ্ট্রীট—একটা বড় গহনার দোকানের সামনে মেয়েটির ট্যাক্সি থামিল।

হিমাংশুর ট্যাক্সিও পিছনে দাঁড়াইল। মেয়েটি কোনদিকে না চাহিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

দোকানের গ্লাসকেসে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়া দিয়াছে।

হিমাংশু ঢুকিয়া দেখিলেন, মেয়েটি চুড়ী, হার, কানের দুলের কয়েক রকম ডিজাইন দেখাইতে বলিল এবং পাছে মাথার পিছনদিকের ছোঁড়াটা নজরে পড়ে এইজন্যই হয়ত এলোখোঁপাটা আগে হইতেই বাহির করিয়া রাখিয়াছে।

হিমাংশু সেন একটা ঘড়ির ক্যাটালগ চাহিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন, মেয়েটির অলক্ষ্যেই।

দোকানের খোলা দরজার দিকে চাহিয়া হিমাংশু দেখিলেন, মেয়েটি অনেক কিছুই কিনিল এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহারও যে নাড়ীস্পন্দন দ্রুততর হইতে লাগিল সে কথা না বলিলেও চলে।

মেয়েটি গাড়ীতে উঠিতেই গাড়ী সোয়ালো লেন দিয়া বাহির হইয়া রাধাবাজার মুর্গীহাটার মাঝ দিয়া চলিল কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকানে গাড়ী থামিতে অনুসরণকারী গাড়ী হইতে হিমাংশু নামিয়া পড়িলেন।

গাড়ীভাড়া চুকাইতে গিয়া দেখিলেন পকেট খালি। তার ট্যাক্সিভাড়া চুকাইয়া দিয়া তখন মেয়েটি দোকানে ঢুকিয়া গেছে।

হিমাংশু তাঁহার ড্রাইভারকে বলিয়া দিলেন গাড়ীটা আগাইয়া রাখিতে এবং নিজে ফুটপাথে পায়চারী করিতে লাগিলেন। দুঃসাহসিকা মেয়েটির কার্য্যকলাপ তাঁহাকে অবাক করিয়া তুলিয়াছিল।

খুব বেশীক্ষণ লাগিল না, একটা পিজবোর্ডের বড় বাক্স হাতে করিয়া মেয়েটি বাহির হইয়া আসিল, গহনার বাক্সগুলা তাহারই সহিত লালফিতা দিয়া বাঁধা ছিল।

সামনের ট্যাক্সিখানাকে দেখিয়াই হাঁক দিল এই খোল্ দেও।

হিমাংশুর ইসারায় ড্রাইভার দরজা খুলিয়া দিতেই মেয়েটি চট করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং সে বসিতে না বসিতে হিমাংশু সেনও উঠিয়া তাহার পাশেই বসিয়া বলিলেন—চিনতে পারেন?

আতঙ্কের ভাব মেয়েটির মুখে ফুটিয়া উঠিল, জোর করিয়া সে বলিল, কে আপনি?

হিমাংশু জবাব দিলেন, কে আমি? যার মনিব্যাগ তোমার কাছে রয়েছে। সেটা যে আমার, তার প্রমাণ সোনার জলে ওর ওপরে আমার নামলেখা আছে, আর সমস্ত নোটগুলোর নম্বরও টোকা আছে। পুলিশে ইতি-মধ্যে খবরও চলে গেছে। এখন বুঝেছ কে আমি? এখন, সব চেয়ে কাছে যে থানা আছে সেইখানেই সোজা চল, গয়না কাপড়গুলো পরবার আর সুযোগ হলনা, কি করব বলো? টাকাটাও ত নিতান্ত কম নয়?

মেয়েটি নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া ব্যাগটা বাহির করিয়া গ্যাসের আলোয় দেখিল, ছোট করিয়া লেখা রহিয়াছে H. C. Sen, Advocate, High Court, Calcutta.

বলিল, দেখুন, আমি পেশাদার চোর নই, তবে কেন এ কাজ করলুম আপনাকে কি-ই বা অনুরোধ করব, হঠাৎ কিছু বলতে পারছি না, দোহাই আপনার খানিকটা ময়দানের দিকে গাড়ীটা নিয়ে যেতে বলুন, খোলা হাওয়ায় মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিই, তারপর একে একে সব বলব।

হিমাংশু ময়দানের দিকেই ড্রাইভারকে চালাইতে বলিলেন।

অ্যালফ্রেড থিয়েটার পার হইয়া হিমাংশু বলিলেন, প্রে করতে পারো চমৎকার! শ্রীঘর বাস করবার বাসনা কেন হল?

মেয়েটি বলিল,—জানি আপনি বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস না করুন অন্ততঃ তিনঘণ্টা—এখন কটা বেজেছে?

ঘড়ি দেখিয়া হিমাংশু জবাব দিলেন—সাড়ে সাতটা।

উত্তেজিত কণ্ঠে মেয়েটি বলিল—অন্ততঃ সাড়ে দশটা অবধি আমাকে সময় দিন, সাড়ে দশটার পর আমাকে থানায় দিতে হয় হাজতে রাখতে হয়—যা খুসি আপনি করবেন—যা আপনার মন চায় আমার কিছু বলবার থাকবে না—

স্নেহপূর্ণ স্বরে হিমাংশু বলিলেন, কেন ইতিমধ্যে কোথায় অভিসারে যাত্রা হবে?

অভিসার নয়—ব্যাপারটা আপনাকে সব খুলে বলি—গাড়ী ততক্ষণে বৌবাজার থানার কাছে আসিয়াছে।

হয়েছে কি—সংক্ষেপেই বলি—কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার পূর্ণেন্দু গুহকে চেনেন?

খুব চিনি। অবশ্য আমার সঙ্গে মৌখিক আলাপ নেই, নাম শোনা আছে।

অবিচলিত কণ্ঠে মেয়েটি বলিল—তাঁরই স্ত্রী আমি।

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া হিমাংশু বলিলেন তাঁরই স্ত্রী আপনি, যিনি বছরে দশহাজার টাকা ইনকমট্যাক্স দেন—তাঁরই স্ত্রী আপনি পথে পথে পকেট কেটে বেড়ান লোকের?

বাধা দিয়া মেয়েটি বলিল—শুনুন সব কথা—বিয়ের বছরখানেক বাদে জানতে পারলাম চরিত্র তাঁর খারাপ—তখন আমার কতই বা বয়েস, সতেরো কি আঠারো, একলেডি ডাক্তারের বাড়ীতে চ'লে যান। সমস্ত রাত একলা আমি—আমার ভাশুর জানেন ত প্রসিদ্ধ এটর্ণী, নাম আর করব না—দরজায় ধাক্কা মারেন। এরকম অবস্থায় শ্বশুরবাড়ীতে থাকা আমার পোষালনা, একদিন স্পষ্টই বলে দিলুম ভায়ের কীর্ত্তি কথা। শুনে তাঁর ওপর রাগ করা দূরে থাক, আমার উপরেই গেলেন চটে—জানিয়ে দিলেন আমি অসতী, আমাকে তিনি ত্যাগ করবেন। প্রথম সন্তান হল মেয়ে, স্বামী বললেন তার জন্মে তিনি সন্দেহ পোষণ করেন। আমি অত্যন্ত আহত হলুম তর্কও করলুম খুব,—অবশ্য তাঁরও চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট শুনিয়ে দিলুম। তাতে লাভ হল এই, একবস্ত্রে তিনি আমায় বাড়ী থেকে তাড়ালেন, মেয়েকে আটকে রেখে। শুধু তাড়ালেন নয়, আমাদের যাতে যথেষ্ট কষ্ট হয় সংসার অচল হয় তার জন্মে উঠে প'ড়ে লাগলেন। আমার নাবালক ভাই আর বুড়ো মা, তাদের নিয়ে যেন অকূল পাথারে ভাসলুম। মা মারা গেছেন, ভাইটি আছে, সেই সামান্য কিছু রোজগার করে, দুই ভাইবোনে একপাশে পড়ে থাকি।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়া ট্রামের সঙ্গে রেস

দিয়া গাড়ী তখন হুহু করিয়া চলিয়াছে। হিমাংশু বলিলেন, বেশ জমে উঠেছে। তারপর?

আজ আঠারো বছর আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সকল অপমানের মাঝখানেও আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা চেয়েছি আমার মেয়েকে—নাম রেখেছিলাম শঙ্খ—সে শাঁখের মত সাদা হয়েছিল—একটিবার দেখব। শুধু একটিবার চোখের দেখা—তাও তিনি দেখতে দেননি। ধাই রেখে মেয়েকে মানুষ করেছেন, বলেছেন তাকে জানিয়েছি তার মা নেই। তাতে আমি বলেছি মাতৃপরিচয় দোবনা, শুধু দূর থেকে একবার দেখে নিঃশব্দে আমি চ'লে আসব। তিনি অনুমতি দেননি, চুরি ক'রে বাড়ী ঢুকতে গিয়ে ঝি-চাকর তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ—

এইখানে মেয়েটি—মিসেস্ গুহ—থামিল।

হিমাংশু জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ—কি হয়েছে?

আজ দুপুরবেলা তাঁর চিঠি পেয়েছি, তুমি দেখা করতে পারো ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময়, আর তুমি যে তার মা একথাও জানাতে পারো। আজ তাই আনন্দ রাখবার আমার জায়গা নেই, আজ সঙ্গতি ছিলনা মা সাজবার—তাই চুরি করতেই বেরিয়েছিলাম। অন্ততঃ একখানা পরিষ্কার কাপড় আর দুটো গিল্টির গয়না আমার দরকার ছিল। আজ দুঃখিনীর বেশে ত আমি যেতে পারব না, যদি সে বিশ্বাস না করে, সে আঘাত যে বড্ড লাগবে। আপনার ব্যাগ থেকে পেলাম আশার অতিরিক্ত, তাই কাপড়ে গয়নায় কার্পণ্য আমি করলুম না। যাক্ চুরিই করেছি আপনার টাকা। দশটা থেকে দশটা দশ অবধি সময়—তারপর আপনি আমাকে পুলিশে দিন, জেল খাটতে হয়, কোনো আক্ষেপ আমার থাকবে না, কিন্তু পায়ে পড়ি আপনার তার আগে কিছু করবেন না—তাহলে আঠারো বছরের স্বপ্ন আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে।

হিমাংশু সেন মন দিয়াই সব শুনিতেছিলেন···বলিলেন, তাই হবে—তিনঘণ্টা খুব বেশী সময় নয়, কিন্তু একদণ্ড আমি তোমাকে চোখের 'আড়াল' হতে দোবনা, এমন কি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার সময়ও আমাকে সঙ্গে রাখতে হবে—

অসঙ্কোচে মেয়েটি বলিল—বেশ।

হিমাংশু সেন বলিলেন—এখন চলো আমার বাড়ী, কাপড় গয়নাগুলো প'রে নেবে, তারপর দশটার কিছু আগে বেরোনো যাবে—

চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল—মেয়েটি কহিল—আপনাদের বাড়ীর কাউকে আমার পরিচয় দেবেন না—

কেউ নেই সেখানে—

কেউ না? আপনার স্ত্রী?

এখনো সে অনাগতা। কিন্তু তুমি বেশ অভিনয় করতে পারো। কোন্ থিয়েটারে ছিলে বলো দেখি?

মেয়েটি জবাব দিল না।

কি নামে ডাকব তোমায়, মিসেস্ গুহ?

না, ও নামে নয়—বলবেন শঙ্খর মা—কিম্বা—কিম্বা ঊর্ম্মিলাও বলতে পারেন।

ঊর্ম্মিলাই বলব। মিস্ ঊর্ম্মিলা কোনো থিয়েটারের প্ল্যাকার্ডে মনে পড়ছেনা। হিমাংশু সিগারের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে দেখিলেন রেস্ কোর্সের মাঠ শেষ হইয়া গেছে, বলিয়া দিলেন, বাড়ী চলো।

হিমাংশু সেন ড্রয়িংরুমে বসিয়া ছবির বই দেখিতে লাগিলেন, আজ তিনি কোন কাজ করিবেন না।

ইতিমধ্যে বাবুর্চ্চি খাবার দিয়া গেল দুজনকার।

প্রসাধন ও সজ্জা শেষ করিয়া ঊর্ম্মিলা যখন এঘরে প্রবেশ করিল তখন বিজলীর তীব্র আলোকে তাহাকে আর চেনা যায় না। এতই সুন্দর দেখাইতেছে!

খাবার সময় বিশেষ কিছুই কথা হইল না, অজ্ঞাত সংশয় ও আশঙ্কার একটা দীর্ঘপর্দা যেন ঘর জুড়িয়া বিলম্বিত রহিয়াছে।

এতক্ষণে মিতের গাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।

দশটা বাজিতে পনেরো মিনিট থাকিতে হিমাংশু গাড়ী বাহির করিতে বলিলেন।

লাউডন স্ট্রীটের দিকে গাড়ী ছুটিল।

ডাক্তার পূর্ণেন্দু গুহর দরজার মাথায় তখনো আলো জ্বলিতেছিল। গাড়ী গিয়া থামিতেই বেহারা বৈঠকখানা ঘর খুলিয়া দিয়া সাহেবকে খবর দিতে গেল।

ডাক্তার সাহেব পর্দা তুলিয়া ঢুকিয়া উর্ম্মিলার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—একলা আস্‌বার কথা ছিল যে? উনি কে?

উর্ম্মিলা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—উনি—উনি আমার একজন বিশেষ বন্ধু—

বন্ধু! বলিয়া ডাক্তার একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন।

রাগে হিমাংশুর গা জ্বলিয়া গেল, নিজের পরিচয়টা দিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। পুরুষ কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ আমি ওর বন্ধু, আজ যদি উনি মেয়ের সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে কোনো কারণ বশতঃ আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

ডাক্তার বলিলেন—কোন কারণ বশতঃ। যাক্‌গে, কারণটা আমি জান্‌তে চাইনা আপনাদের নিজেদের মধ্যেই যখন এমন বন্দোবস্ত হয়েছে তখন আমার কিছু বলবার নেই। তারপর হাতের রিষ্ট্‌ ওয়াচটার দিকে চাহিয়া ডাক্তার গুহ বলিলেন—Just ten. Ten minute's time—এই পথে সোজা ওপরে, সামনের ঘরে সে আছে।

জানে জানে উর্ম্মিলা—সাম্‌নের সে ঘর। ও ঘর তাহার মধুচন্দ্রমা যাপনের দিনে কি মধুরই না হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন, প্রথমে গিয়া সে কি বলিবে। বলিবে না কিছু, শুধু বুকে চাপিয়া ধরিবে কিছুক্ষণ, তারপর আসিবার সময় শুধু বলিয়া আসিবে—আমি তোর মা। চলিতে চলিতে পা কাঁপিতে লাগিল, উত্তেজনায়, না আনন্দে, না ভয়ে?

ভয় কিসের? কিছুই না। নিজের মেয়েকে সে দেখিতে চলিয়াছে। মেয়ে যদি না চিনিতে পারে তাহাতেও দুঃখ নাই, মেয়েত তাহারই। তাহার আঠারো বছরের মেয়ে, তাহার শখ—

সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই নজরে পড়িল—বিছানায় কাত হইয়া শুইয়া—মেয়েত' নয়, ও কি? রূপকথার ওর নাম নাই, ভাষারও কিছু নাই, স্বর্গ ছাড়িয়া অমৃত, জ্যোৎস্নার সুধা এমনি ধরণের একটা কিছু—

মাগো, বলিয়া উর্ম্মিলা সজোরে ঘুমন্ত মেয়েকে জড়াইয়া ধরিল, চুমায় চুমায় তাহার নমিত আঁখিপল্লব সিক্ত করিয়া দিল, কয়েকটি মুহূর্ত্ত—তারপরই তাহার চমক ভাঙিল—একি! এ যে বরফের মত ঠাণ্ডা!

তবে কি?

না-না তাকি হইতে পারে? ফিরিয়া দেখে ডাক্তার ক্রুর হাসি হাসিতেছে, হিমাংশুর দৃষ্টিতে আকুল উৎকণ্ঠা—

হিমাংশু ও উর্ম্মিলা দুইজনে খানিকটা নাড়াচাড়া করিতেই বোঝা গেল সন্দেহ মিথ্যা নয়, অনেকক্ষণ প্রাণ বাহির হইয়া গেছে।

নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে!

মাথা ঘুরিয়া গিয়া উর্ম্মিলা ঢলিয়া পড়িতেই হিমাংশু দুই বাহু বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিল।

ঘড়ি দেখিয়া ডাক্তার গুহ বলিল—দশ মিনিট হয়ে গেছে, আর সময় দিতে পারিনা।

সময় চাইও না, বলিয়া তিক্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হিমাংশু সেন উর্ম্মিলাকে সাবধানে ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

উর্ম্মিলার মনের অবস্থা তখন শোক দুঃখ রাগ অনুরাগের অতীত প্রায়। সে যেন স্তম্ভিত, যেন বজ্রাহত।

গাড়ীতে তুলিয়া দিতে উর্ম্মিলা প্রশ্ন করিল—এখন আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন?

অকম্পিতকণ্ঠে হিমাংশু সেন বলিলেন—, আমার বাড়ীতে।

—হাজতে নয়?

—না।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

নবযুগের সাধনা*

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, এম্, এল্. সি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আমল হইতে আমাদের কলিকাতা করপোরেশান প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করে, এবং সাধারণ পুস্তকাগারের সাহায্য জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন তাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে শ্লাঘনীয়। এটা বাংলার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। তাই শুনিয়া ব্যথিত হইলাম—ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে কলিকাতা করপোরেশান সাধারণ পুস্তকাগারে দানের বহর কমাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। নাগরিকদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করিবার জন্য লাইব্রেরী অপেক্ষা সহজ উপায় দ্বিতীয় নাই। সেই জ্ঞানের পথ সঙ্কোচের ব্যবস্থা শুনিলে বস্তুতঃই ক্ষুব্ধ হইতে হয়।

ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক ম্যাণচাস্ সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন
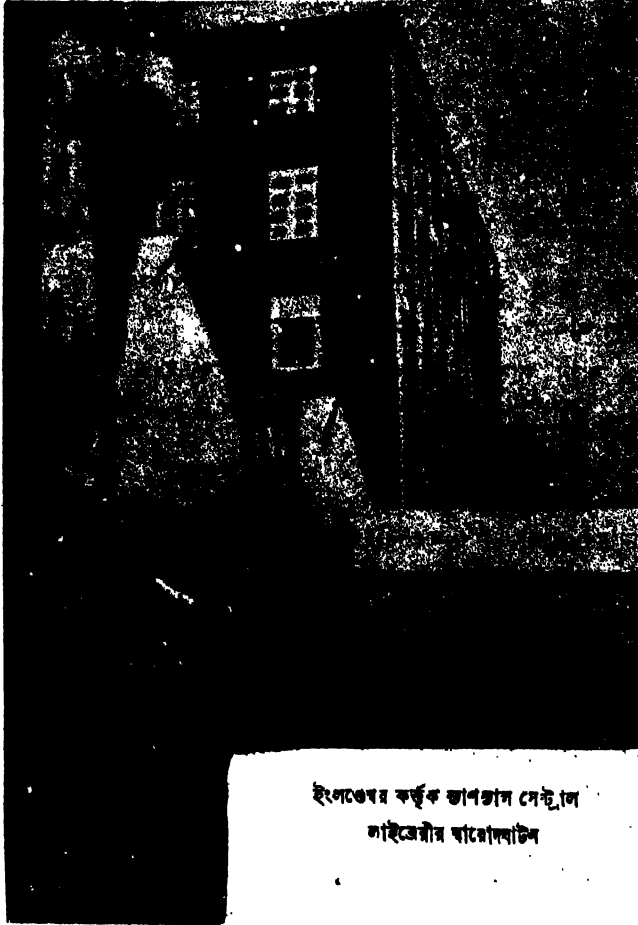
অর্থনৈতিক অবসন্নতা কেবল বাংলা বা ভারতে সীমাবদ্ধ নয়, জগতের সর্ব্বত্রই এরূপ অবসন্নতা ঘটিয়াছে। সে সব দেশে অন্য বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইতেছে বটে কিন্তু শিল্পোন্নতি-কল্পে-ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকা যুক্তরাজ্যের উল্লেখ করিতেছি। সেখানে Public Works, Civil Works এবং Relief Administrationএর তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরীর গৃহ নির্ম্মাণ এবং উন্নতি কল্পে ব্যয়ের বরাদ্দ অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় একদিকে বেকার সমস্যার সমাধান এবং অপরদিকে জ্ঞানবিস্তারের এই অভিনব যন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হইতেছে। কিভাবে কাজ চলিতেছে তাহার একটু আভাস দিতেছি। Public Works Administrationএর অধীন লাইব্রেরী গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, এই গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় জন্য এই বিভাগ হইতে শতকরা

* খিদিরপুর হেমচন্দ্র লাইব্রেরীতে কলিকাতার মেয়র শ্রীসন্তোষকুমার বসুর সভাপতিত্বে প্রদত্ত বক্তৃতা

ত্রিশ টাকা লাইব্রেরীকে দান স্বরূপ দেওয়া হইতেছে এবং বাকী শতকরা সত্তর টাকা দীর্ঘকালের জন্য অতি সহজ কিস্তিতে লাইব্রেরীকে হাওলাৎ স্বরূপ দেওয়া হইতেছে। Civil Works Administration ৪০ লক্ষ নরনারীকে অন্যূন তিনমাসের জন্য কাজ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।
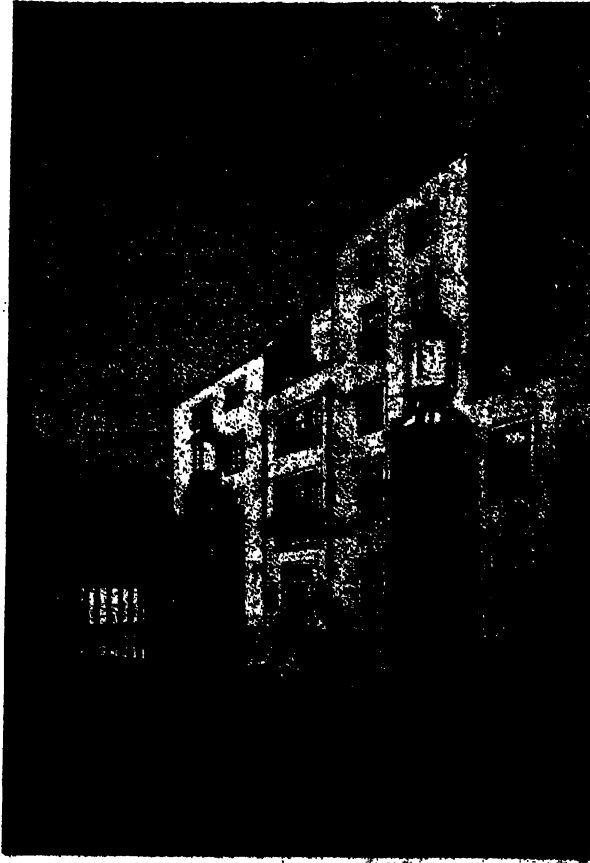
প্রবেশ পথ হইতে ন্যাশনাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী

এইজন্য চল্লিশ ক্রোড় ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে। বেকারদের মধ্যে অর্দ্ধেক এবং সরকার হইতে আহার্য্য সাহায্য বা dole যাহারা পাইতেছে তাহাদের মধ্য হইতে অর্দ্ধেক লোককে এই সব কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বেকারদের যুক্তরাজ্যের কর্ম্ম নিয়োগ (United States Employment) আপিসে নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিতে হয়। তাহাদের মধ্য হইতেই লোক লওয়া হয়। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে কিছু নির্ম্মাণ কার্য্য থাকিলে তাহাই Civil Works Administration দ্বারা পরিচালিত হয়। গৃহ সংস্কার, গৃহ চিত্রণ, বৈদ্যুতিক আলোর সংযোগ, কাগজের কাজ, ছাদ সংস্কার, আসবাবপত্র মেরামত আর আধুনিক প্রণালীতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের আঞ্জাম Civil Works‑এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। লাইব্রেরী বোর্ডকে তাহাদের যে যে কার্য্যের আবশ্যক তাহার একটা ফর্দ্দ (project) Civil Works এর কর্ত্তাদের দিতে হয়।

আবার Federal Emergency Relief Administration‑এর হাত দিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত আরও নানারূপ কাজ করাইয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। আশু শিক্ষা সংক্রান্ত ফর্দ্দের মধ্যে ১। পল্লীর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন বা উন্নতি সাধন ২। বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য ক্লাস স্থাপন ৩। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে কার্য্যকরী বা vocational শিক্ষার ব্যবস্থা ৪। শ্রমশিল্পের পুনঃ সংস্থান ৫। বয়স্কদের জন্য সাধারণ ভাবে শিক্ষার বন্দোবস্ত ৬। শিশুদের খেলাধুলার সঙ্গে শিক্ষা দিবার বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি ঐ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইলেও যুক্তরাজ্যের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রধান পরিচালক (Commissioner of Education) এসব কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন।

সাধারণে এই রকম সব কাজের জন্য ঘণ্টা বা দৈনিক হিসাবে সচরাচর যে মজুরী দিয়া থাকেন সেইরূপ জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী (living wage) এই সব কাজের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। লাইব্রেরীর দাখিলি ফর্দ্দের (project) জন্য যে যে বিষয়ে ব্যয় মঞ্জুর করা হয় তাহার তালিকায় উল্লেখ করিতেছি :—

১। সমাজের শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ এবং সুবিধার পরিমাণ বা survey.

ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী—প্রধান প্রবেশ পথ
উপরে গ্রন্থাগারিকের কক্ষের জানালা দেখা যাইতেছে

২। সকল বয়স্ক লোকের শিক্ষাকল্পে পুস্তক সরবরাহ।

৩। স্থানীয় লাইব্রেরীতে পাঠককে উপদেশ দিবার লোক নিয়োগ।

৪। লোক ধরিয়া ধরিয়া লাইব্রেরীতে পাঠের সুযোগ এবং সুবিধা বুঝাইয়া তাহাদিগকে লাইব্রেরীতে পুস্তক ব্যবহার শিখাইবার উপদেষ্টা নিয়োগ।

৫। পাঠচক্র বা study circle স্থাপন।

৬। জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচারের জন্য অতিরিক্ত কর্মীর ব্যবস্থা।

৭। বিশেষভাবে বয়স্ক এবং বেকারদের টানিয়া আনিয়া পুস্তকের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক বাড়াইবার ব্যবস্থার জন্য লোক নিয়োগ। বেকার বা যাহারা অল্প স্বল্প কাজ করিয়া কোনও রকমে জীবিকার্জন করে তাহাদের পাঠের সুবিধার জন্য দীর্ঘকাল লাইব্রেরী খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

লাইব্রেরী সংক্রান্ত আরও অনেক কাজ পূর্বোক্ত বিভাগ হইতে করাইয়া লওয়া হইতেছে যেমন গ্রন্থপঞ্জী (bibliography) নির্ঘণ্ট বা কতকগুলি লাইব্রেরীর পুস্তক লইয়া যুক্ত তালিকা প্রস্তুত এবং অন্যান্য গবেষণামূলক কার্য্য, পুস্তক বাঁধাই, মানচিত্র, সংবাদপত্র এবং মুদ্রিত দ্রব্য সংরক্ষণ, নব প্রণালীতে পুস্তক তালিকা প্রণয়ন, পুরাতন কার্ড পাল্টাইয়া নূতন কার্ড স্থাপন, টাইপের, ফাইলের আসবাবপত্রের তালিকা, সংগৃহীত পুস্তক নূতন করিয়া সাজাইয়া রাখা, গল্প কথন, ছবি বাঁধাই, তালিকা সংগ্রহ প্রভৃতি। এই সব কাজের প্রস্তাব স্থানীয় সাহায্য সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের নিকট পেশ করিতে হয়—প্রস্তাবকালে লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন কাজ লোকর না হয় এবং নিত্যনৈমিত্তিক লাইব্রেরীর কাজের যেন ক্ষতি না হয়। এই সব কাজে যে সব লোক নিযুক্ত করা হয় তাহাদের কাজ দিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেবল স্থানীয় সাহায্য সমিতির একজন সভ্যের সুপারিশ পত্র দাখিল করিতে হয়। মেয়েদের জন্যও নানারূপ কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। লাইব্রেরীয়ানের কাজ শিখাইবার জন্য যুক্তরাজ্যের অনেক বিদ্যালয় তো আছেই, তাছাড়া প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় বা বড় কলেজ মাত্রেই লাইব্রেরীয়ানের কার্য্যে বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত করার আবশ্যকতা আছে। সেজন্য লাইব্রেরী অপেক্ষা সেদেশে লাইব্রেরীয়ানের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। এই সব নূতন ব্যবস্থায় কোনও

ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী—ভিতরের ছবি
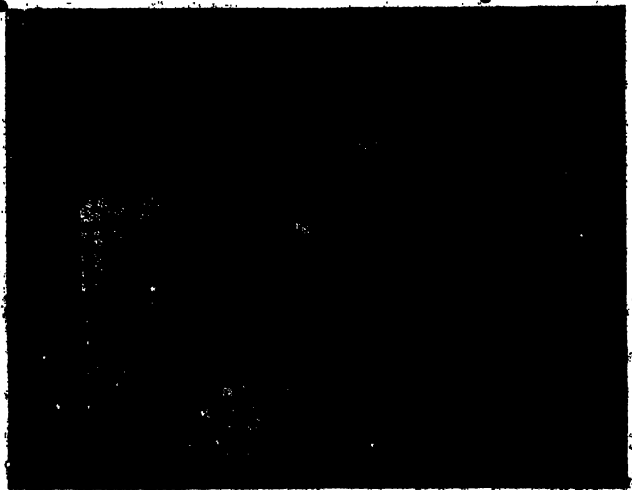
লাইব্রেরীয়ানই এখন আর বেকার অবস্থায় নাই—লাইব্রেরীর কোনও না কোনও বিভাগে কাজ জুটিয়া গিয়াছে। এই

ম্যানচেস্টার সেন্ট্রাল লাইব্রেরী—ইউনিয়ন ক্যাটালগের একটি অংশ

দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে সকল দিক দিয়া লাইব্রেরীর পরিপুষ্টি সাধিত হইতেছে, লাইব্রেরীর প্রসার এবং কার্য্যকারিতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। সেজন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। সদাকর্ম্মনিরত লোক পুস্তকের সদ্ব্যবহার করিবার বেশী অবকাশ পান না। একণে কাজ কর্ম্ম ফুরাইয়া যাওয়ায় লোকের অবকাশ কাল বাড়িয়া গিয়াছে। এই সুযোগে [illegible] দেশের [illegible] [illegible] [illegible] চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক নব নব তথ্য শ্রমশিল্পের ও হাতে কলমে কাজ শিখিবার [illegible] সংক্রান্ত পুস্তক প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হইতেছে, আর আবার চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার ফলে বহু জ্ঞানবান শিল্পী প্রস্তুত হইতেছে। জগতে অর্থনৈতিক অবসন্নতা কিছু চিরস্থায়ী হইবে না, যখন ব্যবসা বাণিজ্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তখন এই সব বিশেষজ্ঞগণ শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা এবং নব নব আবিষ্কার দ্বারা স্বীয় দেশকে গরীয়ান করিয়া তুলিবে। যুক্তরাজ্যের লাইব্রেরীগুলির পাঠক সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইতেছে যে লাইব্রেরীতে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না,—লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষের পক্ষে চাহিদামত পুস্তক সরবরাহ কঠিন হইয়া পড়িতেছে। অর্থনৈতিক অস্থিরতা মানসিক অশান্তি উৎপাদন করে, তাহার প্রতিকার কল্পে নরনারী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। আবার অবসর ও অর্থাভাব চিত্ত-বিনোদনের অন্যতম উপায় স্বরূপ পুস্তকের দিকে লোককে আকৃষ্ট করে। যাহারা [illegible] বাধ্য হইয়া [illegible] কাজ শিখিয়া জীবিকার্জ্জন
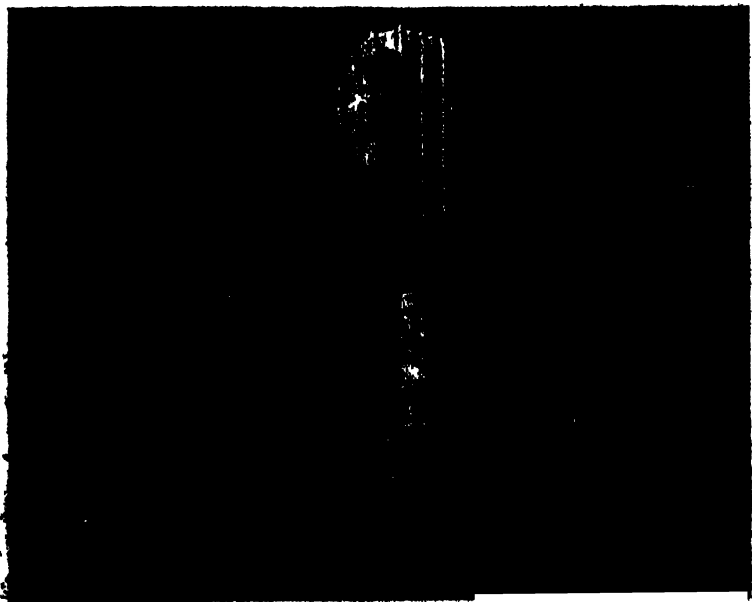
[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের বেবি রীড লাইব্রেরী

পুস্তকের অভাব দূরীকরণের সুব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দানবীর কার্ণেগী ট্রাষ্টের সাহায্যে National Central Libraryর গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। আমাদের সম্রাট সম্রাজ্ঞী সমভিব্যাহারে সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। এই Nationl Central Library বিলাতের বহু লাইব্রেরীকে একসূত্রে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে।

রি ইনফোর্স্‌ড কনক্রিট নির্ম্মিত সাধারণ পাঠাগার—জুরিক

সমর্থ হইতে পারে, যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে, সেজন্য লাইব্রেরীতে পুস্তকের আশ্রয় লয়। সাধারণের নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রমশিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং চিন্তাধারার উন্নত করিবার জন্য পুস্তকাগারের প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে দানের সার্থকতা সে দেশের লোক ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। তাই আমেরিকায় এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রী এবং [illegible]— সে জাতি গৌরবশালী [illegible] [illegible] প্রবল [illegible] চলিয়াছে। এখন আমেরিকা যুক্তরাজ্য ছাড়িয়া বিলাতের কথা বলি।

স্মিথ্‌ হিল শাখা লাইব্রেরী

এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনে বিলাতে লোকের জ্ঞানস্পৃহা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা মূল্যবান

জগতে নানাবিষয়ে পুস্তকের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে কোনও লাইব্রেরীর পক্ষে তাহার সামান্য ভগ্নাংশ সংগ্রহ

একটি আদর্শ পাঠাগার প্রতিষ্ঠান
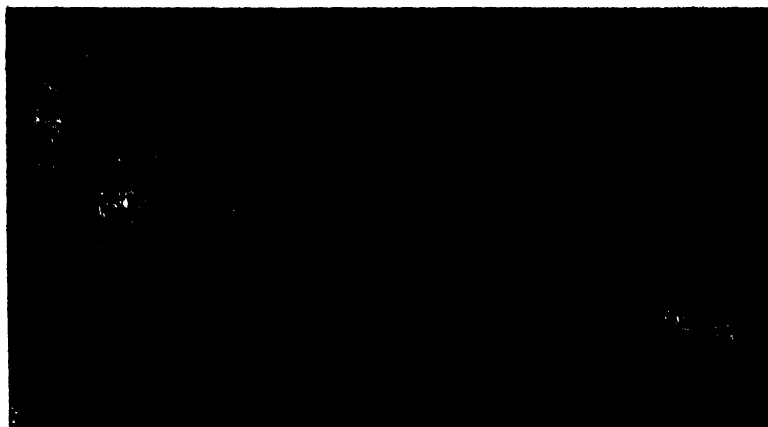
লাইব্রেরীগুলির মধ্যে যদি মূল্যবান পুস্তকের লেন দেন চলে তাহা হইলে সব রকমের পাঠকের চাহিদার পূরণ কতকটা সম্ভবপর হয়। একমাত্র সহযোগিতার দ্বারা সব অভাব পূরণ হইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংলণ্ডে পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা পুস্তক লেন দেনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। National Central Libraryকে কেন্দ্র করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান পুস্তকের সংখ্যা তিন কোটী বিশ লক্ষ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। British Museum জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় লাইব্রেরী; তাহারই পুস্তক সংখ্যা ৪০ লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ প্রতি ৮ খানি পুস্তকের মধ্যে কেবল ১ খানি মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্মিংহাম, গ্লাসগো প্রভৃতি সহরে খুব বড় বড় লাইব্রেরী আছে বটে, কিন্তু British Museum-এর পুস্তকের তুলনায় ইহাদের পুস্তক সংগ্রহ অকিঞ্চিৎকর। আর ছোটখাট লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা কমবেশী নির্দিষ্ট সংখ্যার সীমাবদ্ধ তো থাকিবেই। পাঠকের পুরা চাহিদা পূরণ করা সব লাইব্রেরীর পক্ষে সম্ভবপরও নয়। তাছাড়া যে সব নূতন পুস্তক প্রতিবর্ষে বাহির হইতেছে তাহার সংখ্যাও এত বেশী যে তাহার সামান্য ভগ্নাংশের স্থান করাটা লাইব্রেরীতে দিতে পারে।

সেণ্ট্‌ হেলেন্‌স্‌ জুনিয়র লাইব্রেরী—পাঠাগার, ল্যাঙ্কাশায়ার, ইংলণ্ড

করিয়া সুষ্ঠুভাবে এই লেন দেন কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। এই National Central Libraryতে এক লক্ষাধিক এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ক (Special) লাইব্রেরীর যত কিছু মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ আছে পাঠকদের তাহা সহজ-লভ্য করা হইয়াছে।

তিনটি ক্ষুদ্র ক্লাসরুমের যোগে প্রস্তুত একটি আদর্শ পাঠাগার

বিলাতে ৩২টী কৌন্টিতে (County) যে সব লাইব্রেরী আছে সেগুলি পাঁচটী কেন্দ্রভুক্ত করা হইয়াছে। উত্তরে কর্ণওয়াল (Cornwall), পশ্চিমে মিড্ল্যাণ্ডস্ (Midlands) দক্ষিণে ওয়েল্‌স্ সমেত পূর্ব্বদিকের কাউন্টিগুলিতে যে ২২২টী লাইব্রেরী আছে সেগুলিকে লইয়াই কেন্দ্রগুলি গঠিত হইয়াছে। পাঁচটী কেন্দ্রের

জোসেফ্ হেন্রী ক্লাব পাঠাগারে ছেলেমেয়েরা বই হইতে শিল্পসমস্যা সমাধান করিতেছে

পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে গ্রন্থপঞ্জী বা bibliography সংক্রান্ত সংবাদ বিভাগ আছে। আর সব লাইব্রেরীর সংগৃহীত পুস্তকের যুক্ত (union list) তালিকা প্রস্তুত করা আছে। তাহার পুস্তকের সংখ্যা দশ লক্ষ। বিলাতে যে সকল লাইব্রেরী আছে তাহাদের মধ্যে যাহারা পুস্তক লেন দেন ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয় তাহারা সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সহিত সংযুক্ত বা affiliated হয়। যুক্ত তালিকায় এই সব লাইব্রেরীর সংগৃহীত পুস্তক স্থান পাইয়াছে। এই সব লাইব্রেরী outliers আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ১৫০, আর পুস্তক সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ।

National Central Libraryর হাত দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—Regional Library System—আবার এই পাঁচটী National Central Libraryর সহিত সংযুক্ত আছে।

ইংলণ্ড ও ওয়েলসে যত লোক আছে তাহাদের মধ্যে শতকরা তিন জন লাইব্রেরী এলাকার বাহিরে বাস করে। তাহাদের নিকটস্থ যে লাইব্রেরী আছে, তাহা মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীই হউক, কৌন্টি লাইব্রেরীই হউক, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ক লাইব্রেরীই (Special Library) হউক, সেইখানে লিখিলেই বই যোগান হইয়া হইয়া থাকে। যদি ঐসব লাইব্রেরীতে কোনও বই না পাওয়া যায় তাহা যত দুষ্প্রাপ্য বই-ই হউক না কেন,
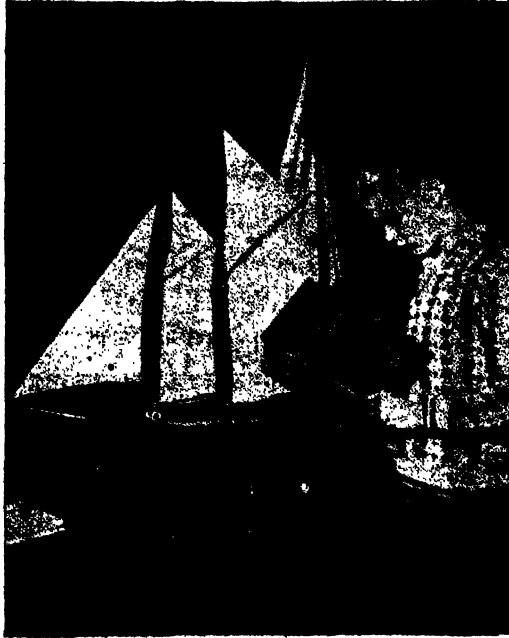
একটি বালক লাইব্রেরী পুস্তকের অন্তর্গত নির্দ্দেশ দেখিয়া পালওয়ালা জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছে

National Central Library যেখানে সেই বই আছে তাহা আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। National Central Libraryতে প্রত্যহ এইভাবে বাহির হইতে ২০০ হইতে ৪০০ পুস্তক যোগাইবার চাহিদা আসিয়া থাকে। গত বর্ষে ৬১, ৬৩০ খানি পুস্তক এই লেনদেনের সাহায্যে আনাইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া ১৩টী বিভিন্ন দেশের ২৯টী লাইব্রেরীর সহিত পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

National Central Library বাহির হইতে পুস্তকের চাহিদা পাইলে প্রথমে দেখেন তাঁহাদের লাইব্রেরীতে সেই বই আছে কি না; যদি না থাকে যুক্ত পুস্তক তালিকা দেখিয়া আর কোনও লাইব্রেরীতে সেই বই আছে কি না দেখা হয়; যদি তালিকায় না থাকে কোথায় সে বই পাওয়া যাইতে পারে তখন তাহার খোঁজ খবর লওয়া হয়।

বিশেষ বিশেষ বিষয়ক বই আবশ্যক হইলে তৎ তৎ বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে এমন Outlier লাইব্রেরীতে চাহিদা পাঠান হয়। এইরূপ ৮০টীর উপর বিশেষ বিষয়ক Special Outlierএর সহিত National Central Library যুক্ত আছে এবং তাহাদের সংগৃহীত পুস্তকের নির্ঘণ্টও পৃথক ভাবে রাখা হইয়া থাকে।

বিশেষ বিষয়ক (Special) Outlierএ সাধারণ বিষয়ক Outlierএ সপ্তাহে দুইবার চাহিদা পাঠান হইয়া থাকে।

আবার Outlierএর পুস্তক তালিকায় সে পুস্তক না থাকিলে ৫টী regional bureauxএ সপ্তাহে দুইবার চাহিদা পাঠান হয়। Regional এলাকার ভিতর যে ২২২টী লাইব্রেরী আছে তাহাদের লইয়া একটী যুক্তপুস্তক তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। তাহার একখণ্ড National Central Libraryতে রাখা হইবে, তাহাতে কাজের আরও সুবিধা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের চাহিদা আসিলে সেগুলি সপ্তাহে দুইবার ৩৪টী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ লাইব্রেরীতে পাঠান হইয়া থাকে।

বিদেশীয় পুস্তক যাহা বিলাতে পাওয়া যায় না তাহার চাহিদা আসিলে যে দেশ হইতে সেই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে সেই দেশের লাইব্রেরী কেন্দ্রকে সেই বই পাঠাইবার জন্য লেখা হয়। আবার সে সব দেশের চাহিদা আসিলে National Central তাহা যোগাইয়া থাকে।

গুরুতর বিষয়ের পুস্তকের চাহিদা সম্বন্ধেই এই সব ব্যবস্থা আছে। সস্তা বই বা নাটক নভেল এভাবে যোগান হয়না।

স্কটল্যাণ্ড (Scotland) এবং আইরিশ-ফ্রী ষ্টেটও

(Irish Free State) regional scheme প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব চলিতেছে। তবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য এখন Scottish Central Library এবং Irish Central Libray অজস্থান হইতে দুষ্প্রাপ্য বা মূল্যবান বই আনাইয়া দিয়া থাকে। এই দুইটী দেশের Central Library বিলাতের regional bureaux-র মত National Central Library'র সহিত সংযোগ রাখিয়াছে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে বেসরকারী ভাবে regional

দুইটি বালিকা কাগজের পুতুল এবং সজ্জা প্রস্তুত করিয়া সাধারণ লাইব্রেরীর প্রদর্শনীতে দিয়াছে

system প্রচলিত আছে। বেলফাষ্ট সাধারণ পাঠাগারের হাত দিয়া National Central Library'র সহিত পুস্তক লেন দেন চলিয়া থাকে।

এই সব পুস্তক যোগানর জন্য বা খবরাখবরের জন্য কোনও খরচা লাগে না, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে পুস্তকগ্রহীতাকে পুস্তক পাঠান এবং ফেরৎ আনার ডাক খরচা দিতে হয়। বিশেষ National Central Library সম্বন্ধে এতটা বিশদভাবে বলার উদ্দেশ্য হইতেছে—কলিকাতায় ঐ ভাবের কোনও ব্যবস্থা হইতে পারে কি না তাহার আলোচনা করা। কলিকাতা করপোরেশান যদি একটী সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং কলিকাতায় সব লাইব্রেরী তাহাতে সংযুক্ত হয় এবং পরস্পর পুস্তক লেন দেনের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মূল্যবান পুস্তক ক্রয়ের অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়। সে টাকায় অন্য বিষয়ে লাইব্রেরীর উন্নতির ব্যবস্থা হইতে পারে।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইন এখন বিলাতে বোর্ড অফ্ এডুকেশনের সভাপতি। তিনি বিলাতের লাইব্রেরী এসোসিয়েশানের নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে বলেন যে, সে দেশে অন্যান্য সকল বিভাগে ব্যয় সংকোচ করা হইয়াছে বটে কিন্তু কেবল পাঠাগারগুলির বরাদ্দ না কমাইয়া বরং স্থানে স্থানে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতে বরোদা রাজ্যে লাইব্রেরীর জন্য বরাদ্দ বাড়িয়াই চলিয়াছে। কলিকাতা করপোরেশানকে আমরা ভারতের আদর্শস্থানীয় দেখিতে পাই। এখানে আদর্শ পাঠাগার যাহাতে পরিচালিত হয় তাহার জন্য বরাদ্দ না কমাইয়া বরং বাড়ানই আবশ্যক। কলিকাতায় যত পাঠাগার আছে সব সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিৎ। পরস্পরের মধ্যে পুস্তক বিনিময় প্রচলন অত্যাবশ্যক হইয়াছে সে কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লাইব্রেরীগুলি কেবল বরাদ্দের টাকা—কতকগুলি বই কিনিয়া তাহার খরচ দেখাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; এই দুর্দ্দিনে তাহারা কিরূপে করদাতাদের কাজে আসিতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। আর অপেক্ষাকৃত বড় লাইব্রেরীতে বিশেষজ্ঞ লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ আবশ্যক। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট জানিতে চান, তাঁহারা লাইব্রেরী বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ করিবার জন্য ক্লাস খুলিতে প্রস্তুত আছেন কি না। সিণ্ডিকেট একটী কমিটীর উপর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের ভার দেন। কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের ক্লাস খুলিবার পরামর্শ দেন। সিণ্ডিকেট সেই পরামর্শ জন্য

গবর্ণমেন্টকে লাইব্রেরীয়ান শিক্ষা ক্লাস খুলিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। খুব সম্ভব গভর্ণমেন্ট এই প্রস্তাব

কানেকটিকাটের একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা বেতারের বার্ত্তা প্রেরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে

অনুমোদন করিবেন। তাহা হইলে বড় বড় লাইব্রেরীতে বিশেষজ্ঞ লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ সম্ভবপর হইবে।

পরিশেষে আর এক কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। আজকাল সাহিত্যের নানা আবর্জ্জনা আসিয়া বাণীমন্দির কলুষিত করিতেছে। লঘু সাহিত্যের বা light literture এর দোহাই দিয়া trash literature বা আবর্জ্জনা যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, বাণীমন্দিরের পবিত্রতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য সকলে অবহিত হউন। কেহ কেহ বলেন চাহিদা বুঝিয়া মাল না যোগাইলে লাইব্রেরী টিকিবে কি করিয়া? তাহার উত্তরে আমি বলিতে চাই—সাধারণের রুচি উন্নত করিবার গুরুভার প্রত্যেক লাইব্রেরীর 'কর্ত্তৃপক্ষকে' লইতে হইবে—কর্ম্মক্লিষ্টের চিত্ত-বিনোদনের উপযোগী চিত্তোৎকর্ষসাধক সাহিত্যের (recreative literature) অভাব নাই তাহার দিকে লোকের চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয় তাহা করিতেই হইবে। যাহাতে নৈতিক অবনতি ঘটে এরূপ পুস্তকের স্থান লাইব্রেরী নহে। কলিকাতা করপোরেশনের বর্ত্তমান প্রধান কর্ম্ম-কারক (Executive Officer) কিছুদিন পূর্ব্বে অভিযোগ করিতেছিলেন যে কলিকাতার বেশীর ভাগ লাইব্রেরীর পুস্তক দাদনের বহি (Issue Register) দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন যে, গুরুতর বিষয়ক পুস্তকের (Serious reading) পাঠক দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, অপরদিকে নাটক নভেলের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। আমার বোধ হয় গুরুতর বিষয়ের পাঠক বাড়াইবার জন্য নাটক নভেল ছাড়া আর সব বই বিনা চাঁদায় পাঠককে দেওয়ার ব্যবস্থা করা

সর্ব্বজাতির আধার—ক্যালিফর্ণিয়া
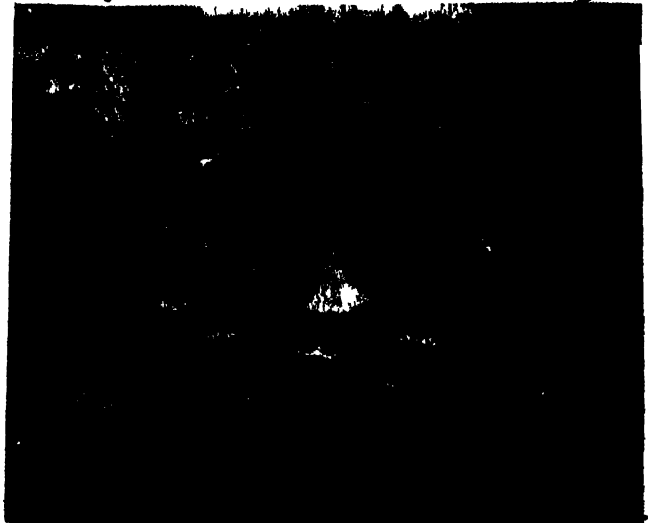
আবশ্যক। আমরা এবিষয়ে ২।১টী লাইব্রেরীতে পরীক্ষা করিয়াছি, তাহার ফল মোটের উপর সন্তোষজনক দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশে উপযুক্ত কর্মীর অভাব বোধ করায় শ্রীপ্রমিলচন্দ্র বসু নামক জনৈক উৎসাহী যুবককে আমরা বরোদা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করিয়াছি। তিনি এপ্রেল মাসেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আমরা যাহাতে তাঁহাকে কাজে লাগাইতে পারি ও তাঁহার সাহচর্য্যে কতকগুলি কর্ম্মী তৈয়ারী করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সকল লাইব্রেরীই সকাল ও বৈকাল তো খোলা থাকা চাই-ই, তাছাড়া দুপুরবেলা যাহাতে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মধ্যে সেখানে লইয়া যান এবং গ্রন্থাগারিক তাহাদের পাঠাগারের ব্যবহার শিখান তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পাঠাগারগুলিকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যায়াম প্রভৃতি পল্লীর সকল সদনুষ্ঠানের এবং নাগরিকের কর্ত্তব্য শিক্ষার কেন্দ্র করিতে হইবে। আর প্রত্যেক লাইব্রেরীর সহিত যাহাতে শিশুদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকে তাহার ব্যবস্থা করাও অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

হাওয়াই শিশু লাইব্রেরীতে শিক্ষিতা গ্রন্থাগারিক মিস্ স্যাডি হফ্‌ম্যান শিশুদিগকে গল্প শুনাইতেছেন

শৈশব হইতে পাঠানুরাগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে—তবেই পাঠানুরক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। পুস্তকের মত সৎসঙ্গ আর কোথায় মিলিবে? জগতের যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু চিত্তরঞ্জক, যা কিছু স্পৃহনীয়—সবই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ আছে,—গ্রন্থাগারের ন্যায় বিশুদ্ধ আনন্দের স্থান জগতে আর আছে কি? যুগে যুগে কত মহাপুরুষের উদ্ভব এবং বিলয় ঘটিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার ধারা এখানে আটক পড়িয়া গিয়াছে। স্কুল কলেজ নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের শিক্ষার স্থান—সে শিক্ষা পাইতে হয় কড়া শাসন এবং নিয়ম কানুনের ভিতর দিয়া। আর গ্রন্থাগারের শিক্ষার কালাকাল নাই,—ইহা আজীবন শিক্ষার স্থান,—স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান সঞ্চয়। প্রত্যেক গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট পাঠচক্র থাকিলে জ্ঞানার্জ্জনের উৎকর্ষ সাধিত হয়। শিশু বিভাগে তেমনি গল্পের ক্লাস বড় লোভনীয় বস্তুতে দাঁড়াইয়া যায়। শিশু হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের এমন সহজ উপায় আর নাই। গল্পের আশ্রয় লইয়া ইতিহাস, জীবন চরিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি জটিল বিষয়ও হৃদয়গ্রাহী করা যাইতে পারে। খেলাধুলার মধ্যে দিয়াও কত শিক্ষণীয় বস্তু সহজে বোধগম্য করা যাইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম যদি জাতিকে বড় করিতে হয়—মানুষের মত মানুষ তৈয়ার করিতে হইবে। গোড়ায় পত্তন ভাল করিতে হইবে—গোড়ায় গলদ থাকিয়া গেলে আর উপায় থাকে না, সেজন্য শিশুদের বাদ দিলে চলেবে না,—তাহাদের জন্যও প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়

স্বপ্নাতুর

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

রান্না প্রায় সবই হইয়া গিয়াছে, বাকী খালি কুমড়া আর পটোল ভাজা। কুমড়ারখণ্ড আর পটোলগুলিতে হলুদ আর নুন মাখাইয়া উনানের উপর কড়াতে চাপাইতে গিয়া দেখে ভাঁড়ে আর একবিন্দু তেল নাই। যে দু'এক ফোঁটা আছে, ইহা দিয়া ওগুলি ভাজা তো হইবেই না, মাঝখান হইতে সবই পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। সকালবেলাই তেল আনা উচিৎ ছিলো, কিন্তু ভাবিয়াছিল, এ বেলার মতো ইহাতেই কুলাইয়া যাইবে। তা' প্রায় কুলাইয়া গিয়াছিলও, ভাজায় আসিয়া ঠেকিয়া পড়ে।

কড়াটা ফের উনান হইতে নীচে নামাইয়া রাখিয়া ভাঁড় হাতে করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রূপসী ডাকিল, দাদা!

ঘরের ভিতর হইতে সাড়া আসে, ডাক্‌ছিস নাকি রূপু?

—হাঁ। শাগ্‌গীর গিয়ে দোকান থেকে তেল এনে দাও। রান্না আমার উনুনের ওপর, ভাঁড়ে একফোঁটাও তেল নাই। ওঠো তাড়াতাড়ি—

শোনা যায়: আধঘণ্টাখানেক পরে গেলে হয়না রে রূপু? হাতের কাজটুকু—

রূপসী চটিয়া উঠে। কি যে তোমার আক্কেল দাদা, রান্না আমার ওদিকে নষ্ট হ'য়ে যায়, আর তুমি আধঘণ্টা পরে যাবে? ও ঘোড়াডিম ফেলে রেখে এখন বেরিয়ে এসো, এক মুহূর্ত্ত আমার ব'সে থাক্‌বার জো নেই।

অগত্যা সুকুমার কাছাটা গুঁজিতে গুঁজিতে বাহির হইয়া আসে, দে তোর তেলের ভাঁড়। কতোটুকু আন্‌তে হবে?

—এখনকার মতো পোয়াটাকখানেক তো নিয়ে এসো। আর দেরি করোনা কিন্তু মোটেই, এই গেলে আর চোখের পলকে ফিরে আসবে।...হ্যাঁ, আর পয়সা চারেকের সোডা নিয়ে এসোতো, লেপের ওয়াড়, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর কতোগুলো ময়লা হ'য়ে র'য়েছে, পারিতো আজকেই সব কেচে ফেল্‌বো। শোয়া যায় না আর। কি নোংরা হ'য়েছে—রাম্।

তেলের ভাঁড়টাকে হাতে লইতে লইতে সুকুমার বলে, সোডাতো আন্‌বো, কিন্তু পয়সাই যে—

রূপসী ঝঙ্কার দিয়া উঠে। তা' হবেও না কোনোদিন তোমার পয়সা। অদৃষ্টে তোমার অনেক কষ্ট আছে।—

হাসিয়া সুকুমার বাহির হইয়া যায় কৈলাস বৈরাগীর দোকানের দিকে।

সুকুমারকে লইয়া রূপসী সত্যই বড়ো ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কি যে তাহার খেয়াল, লেখাপড়া শিখিয়াছে—অথচ কোনো কাজ করিবে না কাম করিবে না—হইবে নাকি মস্ত বড় একজন সাহিত্যিক! ঘরের কোণে বসিয়া দিবারাত্রি কি যে সব ছাইমাটি মাথামুণ্ডু লিখিতেছে। —মানা করিলেও শুনিবে না, বুঝাইয়া বলিলেও বুঝিবে না। এই অভাবের সংসার—অথচ সে সব দিকে উপযুক্ত হইয়া উপার্জ্জনের কোনো চেষ্টা করিবে না। হাঁ, টাকা পয়সা যদি আসিত, তবে সে গল্প লিখুক, পদ্য লিখুক, আকাশের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া হাই তুলুক—যাহা খুসি তাহা করুক, কাহারো তাহাতে আপত্তি করিবার কোনো কারণ ছিলোনা। কিন্তু এ তাহার কি কাণ্ড! এতোকাল ধরিয়া লিখিতেছে—ছাপা হইয়াছে মাত্র গোট্টা পাঁচ সাত; আর টাকা তো পাইয়াছে মোটে একটি কাগজ হইতে—অন্য কোনোটা হইতেই কিছু দেয় নাই। দশটি টাকা পাইয়াই তাহার ফূর্ত্তি দেখে কে—একদিন নাকি সে মাসে পাঁচশো টাকা রোজগার করিতে পারিবে। হায়রে, আকাশ-কুসুম, মাথা খারাপ আর কাহাকে বলে।

ইতিমধ্যে সাড়া পাওয়া যায়—আছেন নাকি কেউ ?

রূপসী আগাইয়া আসে, কে, পিওন নাকি ?

—হ্যাঁ, এই নেন্ আপনাদের চিঠি। সুকুমার বাবুর।

চিঠি নয়, একটি বুক পোষ্টের প্যাকেট। মাঝে মাঝে এরূপ প্যাকেট রূপসী আসিতে দেখে সুকুমারের নামে, তবে কি আসে তাহা জানিবার জন্য তাহার বিশেষ কোনো কৌতূহল নাই। তাহার লেখা সংক্রান্তই হয়তো বা কিছু। সুকুমারের এই সাহিত্য-চর্চ্চার কথা মনে হইতেই রূপসী মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠে। সে প্যাকেটটি হাতে করিয়া সুকুমারের অপেক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—

তেল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রূপসীর হাত হইতে প্যাকেটটি লইতে লইতে সুকুমারের মুখখানা একটু শুকাইয়া উঠে।

ঘরে আসিয়া খুলিয়া দেখে, প্রায় মাস কয়েক আগে সে একটি গল্প পাঠাইয়াছিল, তাহাই ফেরৎ আসিয়াছে।

সম্পাদক লিখিয়াছেন :

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আপনার গল্পটি আমাদের পত্রিকার জন্য মনোনীত করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। উহা আপনাকে ফেরৎ পাঠাইলাম। ইতি—

ভবদীয়,

ইত্যাদি ইত্যাদি।…

সম্পাদকগণের এইরূপ অশেষ দুঃখের বোঝা বহন করিয়া কতো গল্পই যে ফেরৎ আসিল! তা' আসুক, ইহাতে সুকুমারের মনে ক্ষোভ নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেকটি ফেরৎ আসিত, আজকাল দু'একটি ছাপা হয়, আর দুদিন পরে অধিকাংশ ছাপা হইবে এবং শেষে যাহা সে পাঠাইবে তাহাই ছাপা হইবে। এমন অবস্থাই হয়তো হইবে যে সম্পাদক আর লেখাটা সম্পূর্ণ করিয়া পড়িবেন ও না—শুধু তাহার নামটা দেখিলেই যথেষ্ট।

এমন খ্যাতি তাহার হয়তো ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে সম্পাদকের চিঠির জ্বালায় সে একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িতেছে—একটি লেখা, অনুগ্রহ করিয়া একটি লেখা……

স্নানের অবকাশ নাই, আহারের অবকাশ নাই, এমন কি রাত্রে ঘুমাইবারো তাহার অবকাশ নাই! ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে লিখিয়া চলিয়াছে—এক একদিনে এক একটি গল্প শেষ, সাতদিনে এক একখানা উপন্যাস শেষ। কবিতা তো দৈনিক পাঁচটা করিয়া!

মাসিকে তাহার লেখার সমালোচনা, সাপ্তাহিকে তাহার লেখার সমালোচনা, দৈনিকে তাহার লেখার সমালোচনা। একদল হয়তো তাহার লেখাগুলিকে বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে, আরেক দল স্তুতির চীৎকারে আকাশ ফাটাইয়া দিয়াছে! তাহার গল্প, উপন্যাসের কথা ছেলেদের মুখে পথে, ঘাটে, মাঠে, লাইব্রেরীতে, ডিবেটিং সোসাইটিতে, প্রভৃতি সাহিত্য সভায়…প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের সাহিত্য আলোচনা!

অসংখ্য মেয়ে হয়তো তাহার কবিতা আওড়ায়, হয়তো বন্ধুবান্ধবের ভিতরে তাহাকে লইয়া আলোচনা করে, কবিতা পড়িবার সাথে সাথে তাহার চেহারার একটি অস্পষ্ট ছায়া হয়তো তাহাদের মনের চোখে ভাসিয়া উঠে…এমন কি কেহ হয়তো মনে মনে তাহাকে ভালোই বাসে, তাহার সহিত আলাপ হইলে হয়তো সে অত্যন্ত সুখীই হইবে!

সুকুমারের সারাদেহে একটি শিহরণ জাগিয়া উঠে।…

আর শুধু বাংলা দেশেই কি? এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন তাহার প্রতিভার সৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীকে উন্মুখ করিয়া তুলিবে। বাংলাভাষার সীমানা পার হইয়া তাহার লেখা যাইবে ইংরাজীতে, ইংরাজী হইতে ফরাসীতে, ফরাসী হইতে জার্ম্মাণীতে! সমস্ত সভ্য-জগত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিবে তাহার দিকে—তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজেরা নিজেদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিবে, এবং তাহার অপূর্ব্বদান তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়া তুলিবে অত্যন্ত একান্ত ভাবে। আর টাকা? সুকুমারের মুখবি প্রায়। আজিকার দারিদ্র্য, আর সেদিনের বিত্তের কথা কল্পনা করিয়া সুকুমার ভাবে—রূপসীটা কি জেলসায়ুব। এমন কি…এমন কি…যদি একদিন সে নোবেল প্রাইজই পায়।

অসম্ভব? কেন অসম্ভব? নোবেল প্রাইজ মানুষে পায় নাই? তাহার পক্ষেও সে পুরস্কার পাওয়া কি ভয়ানক রকমই অসম্ভব? কঠিন হইতে পারে, ভয়ানক কঠিন হইতে পারে, কিন্তু—অসম্ভব? নিশ্চয়ই নয়। যদি···যদি ···একদিন সত্যই সে নোবেল প্রাইজ পায়! রূপীটা যে কি পাগল, এসমস্ত কথা কিছু সে বুঝিবে না। এ যে কি জীবন—এই যশ, এই সম্মান, এর মূল্য কিছুই সে বুঝেনা। আর অর্থেরই বা কিসের চিন্তা? রূপু কি বোঝে যে এমন সময় তাহার আসিতে পারে যখন লোকে তাহার প্রত্যেকটি লাইনের জন্যে টাকা গণিয়া দিবে?··· লক্ষী বোন্ রূপু—আর কিছুটা দিন চুপ্ ক'রে থাকো, ভাখো, আচ্ছা ভাখোই!

সুকুমার সদ্য ফেরৎ প্রাপ্ত গল্পটির দিকে তাকায়। সবই তো ভবিষ্যতের কথা; কিন্তু আপাততঃ তো ভারি মুস্কিলের ব্যাপারই হইয়া উঠিল! সুকুমার বুঝিতেই পারে না যে কেন, কি কারণে এই গল্পটি অমনোনীত হইল। অত্যন্ত চিন্তা করিয়া, অত্যন্ত যত্ন করিয়া এটি সে লিখিয়াছে। ইহার ভিতর অশ্লীলতা কিছু নাই, সিডিসাস্ কিছু নাই এমন কি লিখিবার ধরণটাও নিতান্ত খারাপ হয় নাই এবং গল্পের প্লটটিতেও নূতনত্ব আছে!

সুকুমার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গল্পটি আবার পড়ে, কিন্তু উহার ত্রুটি কোথায় ভাবিয়া পায়না।

যাক্, এক পত্রিকায় অমনোনীত হইলেই বা কি, অন্য পত্রিকায় পাঠানো যাইবে। এরূপভাবে তাহার আরো দুইটি লেখা ছাপা হইয়াছে। এক কাগজের রুচির সহিত মিলেনা, কিন্তু অপর কাগজের সহিত মিলিয়া যায়।

সুকুমার গল্পটি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিয়া পুনরায় পূর্ব্বের কার্য্যে হাত দিল।

এটিও আরেকটি গল্প এবং এটিও গত সপ্তাহে ফেরৎ আসিয়াছে।

এ গল্পটি সত্যই ভালো হয় নাই। ঝোঁকের মাথায় লিখিয়া চট্ করিয়াই পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু ফেরৎ আসিবার পরে সুকুমার দেখিল যে প্রকৃতই বিশ্রী হইয়াছে। তাহার যেন লজ্জা বোধ হয়—যে এতোবড় একজন সাহিত্যিক হইতে চাহে, এরূপ যাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এরূপ লিখিলে তো তাহার চলিবে না!

অথচ গল্পের বিষয় বস্তুটি ভালো—লিখিতে পারিলে একটি সুন্দর রচনায় দাঁড় করানো যাইতে পারে। সুকুমারের ইচ্ছা হয়না যে লেখাটি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে।

পুনরায় সে সেটিকে লিখিতে সুরু করিয়াছে—কতোক্ষণই বা লাগিবে। শেষ করিয়াই আবার নূতন আরেকটি গল্প সুরু করা যাইবে। সিকিটাক খানেক লেখা প্রায় হইয়াও গিয়াছে, রূপীটা তেল আনিতে না পাঠাইলে আরো খানিকটা ইহার মধ্যে হইয়া যাইত। এবারে এমন চমৎকার করিয়া এটিকে শেষ করিতে হইবে যে ফেরৎ দেওয়া তো দূরের কথা, পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্ত্তী সংখ্যায় ছাপিতে দিয়াও সম্পাদকের তৃপ্তি হইবে না।

অত্যন্ত মনঃসংযোগের সাথে সুকুমার গল্পটি লিখিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল।

দুপুরবেলা খাইতে বসিলে রূপসী সুকুমারের পাতে ডাল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিতে থাকে, দাদা, ব'ল্লে তো তুমি শুন্‌বেও না, ব'ল্‌তে আর ইচ্ছেও করেনা। আগেও ব'লেছি, তবুও আরেকবার একটা কথা ব'ল্‌তে চাই।

ভাত দিয়া ডালটা মাখিতে মাখিতে সুকুমার বলে, আচ্ছা ব'লেই ফ্যাল্ না।

—ব'ল্‌লে রাখ্‌বে তুমি কথাটা?

—আচ্ছা শুনে তো নিই।

—ভাখো এরকম ক'রে তো আর সংসার চলে না। তোমার মতলব কি বলো দেখি? আমার এক এক সময়ে ইচ্ছে হয় যে তোমার ওই সব কাগজ, খাতাগুলোকে উনোনের ভেতর দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে দি। তুমি বুদ্ধিমান্ ছেলে, অথচ তুমি নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে পারোনা—এ তো ভারি আশ্চর্য্যি।

সুকুমার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, এই কথা আবার ব'ল্‌তে চাইছিলি?

—না, খালি এ কথা নয়, ব'ল্‌তে চাইছিলুম যে তুমি

একটা চাক্‌রীর চেষ্টা ভাখো। আর বে'থা-ও তো কর্‌বে—না কি? আমি বাপু তোমার সংসার এভাবে আর চালাতে পার্‌বো না।

সুকুমার হাসিতে থাকে। রূপু, চাক্‌রীর যে কি বাজার, তুই তো জানিস্ নে! হাজার হাজার ছেলে চাক্‌রীর অভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাঁ'রা চাক্‌রী কর্‌তো, তা'দের হাজার হাজারের চাক্‌রী খতম হ'য়ে হ'য়ে যাচ্ছে। দেশের যে কি ভয়ানক অবস্থা জানিস্ নে তো! এই তো সেদিন এক ব্যারিষ্টারের কথা শুন্‌লুম, বাজার-খরচ চালাতে পার্‌ছেনা! বিলেতের এক সহরে এক ডাক্তারের কথা খবরের কাগজে পড়্‌লুম, দেয়ালে বিজ্ঞাপন এঁটে দৈনিক যা' সংস্থান হয়, তাই দিয়ে পেট্ চালাচ্ছে। দুনিয়ার সব্বার অবস্থাই এক রকম হ'য়ে উঠেছে, কেউই বড়ো সুখে নেই।...আর বে'র কথা বল্‌ছিস্...হাসিয়া সুকুমার বলে, ক'র্‌বো বৈ কি, বে নিশ্চয়ই ক'র্‌বো। তবে আর কয়েকটা দিন সবুর কর রূপু। এর মাঝে বউকে এনে খেতে দেয়া তো চাই! ভাখ্‌না, এখন তুই ঘাব্‌ড়ে যাচ্ছিস্, কিন্তু আমার যে একটা ভবিষ্যৎ—

—চুলোয় যাক্ তোমার ভবিষ্যৎ। রূপসী মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলে, দুনিয়ার খবর রাখিনে বটে, কিন্তু অন্ততঃ গাঁয়ের খবর তো রাখ্‌ছি! সবারই যতো খারাপই হোক্ অবস্থা আগের চাইতে, ওরি ভেতরে সব্বাই একরকম ক'রে চালিয়েও তো নিচ্ছে। তোমার মতো কেউই নয়। দেশের অবস্থা যা-ই হোক্‌না কেন, তাই ব'লে চুপ ক'রে ব'সে নেই। কাজ-কর্ম্মও থেমে নেই। সবই চ'ল্‌ছে। আর তোমার মতো সব দিক দিয়ে এমন লক্ষীছাড়া হ'য়ে কেউ আছে এ আমার বিশ্বাস হয়না দাদা।

স্মিতমুখে সুকুমার জিজ্ঞাসা করে, এই সব কথাই ব'ল্‌তে চেয়েছিলি তো?

—না, খালি এই সব কথাও নয়। আরো একটি কথা।

—বল্।

—ভাখো দাদা, তুমি একটা দোকান কর্‌োনা কেন! নাই বা ক'র্‌লে চাক্‌রী। চাক্‌রীর চেষ্টা ক'র্‌তে বল্‌লেই তুমি এতোদিনও নানারকম অজুহাত দেখিয়ে এসেছো, আজো যে ওই ধরণেরই কথা ব'ল্‌বে, সে আমি আগেই জান্‌তুম। আমি বলি কি, ব্যবসার কাজে অসম্মানেরো কিছু নেই, অথচ দু'চার পয়সা যে না হবে—

সুকুমার যেন একটু বিরক্ত হয়। তুই কিচ্ছুই খবর রাখিস্‌নে রূপী, তাই এসব কাজে কথা ব'ল্‌ছিস্। ব্যবসার কি সেই দিন আছে নাকি? লাখ লাখ টাকার যার কারবার, এমন সব লোকেরা লালবাতি জ্বেলে গণেশ উল্‌টিয়ে বসাচ্ছে। আর খালি কি আমাদের দেশে? দুনিয়ার—

—ভাখো দাদা, কথায় কথায় দুনিয়া দুনিয়া ক'রো না, আমার ভারি রাগ ধরে। তোমার ওই সব লম্বা চওড়া কথা তো আমি শুন্‌তে আসিনি, যা' ভাব্‌রে একটু ছোট খাটোর ওপর দিয়েই প্রথমটা ভাব্‌তে চেষ্টা করো। এই তো ভাখো, আমাদের এতোবড় গ্রামটায় একখানা ভালো দোকান নেই। একটি জিনিষের দরকার পড়্‌লে ছুটতে হবে কৈলেশ বোরেগীর দোকানে; কিন্তু সে কি একটা দোকান? না, ছাই? কিচ্ছুই তো থাকেনা—তবুও তো এক দোকান! গাঁয়ের লোক অহরহ ওর দোকানে যাচ্ছে, ও বেশ নিজেরটা নিজে চালিয়ে নিচ্ছে। আমি বল্‌ছি কি, তুমি একখানা দোকান বাড়ীর ওপর দাও। একটু ভালো ক'রে যদি চালাতে পারো, খালি যে সংসার খরচ চ'ল্‌বে তা-ই নয়, তোমার হাতে দু'চার পয়সা জম্‌বেও। কি বলো?

সুকুমার বিব্রত হইয়া বাঁ হাত দিয়া মাথা চুল্‌কাইতে থাকে।

—ব'লে ফ্যালো, যা' ব'ল্‌তে চাও। আর বলা-বলিও বুঝি বুঝিনে, এটা তোমার কর্‌তেই হবে।

—ওসব আমার দ্বারা হবে টবেনা।

বিস্মিত হইয়া রূপসী জিজ্ঞাসা করে, হবে টবেনা কি রকম?

—তার মানে দোকান পত্তর করা আমার চল্‌বে না। ওসব আমি বুঝিই নে মোটে!

রূপসীকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই

সুকুমার উঠিয়া পড়ে; রূপসী রাগে সাতটা উনোনের আগুনে জ্বলিতে থাকে বসিয়া বসিয়া।

কিন্তু রূপসী একেবারে ছাড়িবার পাত্র নয়। আরেক সময়ে গিয়া দাদার কাছে বসে।

—লক্ষী দাদা, কথাটা ভেবে ছাখো। চাকুরি-বাকুরির ওপর আমারো সত্যিই ছেদ্ধা নেই। ক'র্‌তে হ'লে তো সেই পঁচিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি—রাম্। তুমি এই দিকই ধরো। চিরদিনই কি আর বাড়ীর ওপর এতটুকুন্ এই দোকান নিয়েই ব'সে থাক্‌বে—পুঁজিপাটা বাড়্‌বার সাথে সাথে তোমারো মস্ত বড় ক'রে চালাতে হবে ব্যবসা। গরীব হ'য়ে থাকাটা খুব বড়ো কথা তো নয় দাদা, অবস্থার উন্নতি যে ক'রে হোক্ ক'র্‌তেই হবে। এ সব খামখেয়ালী ক'রে কেন নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌বে? তোমার রাজার সংসার হোক্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—

বোনের গলার সুরে একটি শ্রান্ত বেদনার আভাষ। সুকুমার আজ আর বিরক্ত হইয়া উঠিতে পারেনা। আস্তে আস্তে বলে, সবই তো বুঝ্‌তে পারি; কিন্তু তুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌না রূপু, আমার হাতে নেই ব'ল্‌তে কিছুই নেই। দোকান দেবার কথা ব'ল্‌ছিস্, কিন্তু তা'তেও তো প্রথমে টাকার দরকার। তাইবা কোত্থেকে যোগাড় করি। এর মধ্যেই দু' এক জনের কাছে দিব্যি দেনা ক'রে ফেলেছি।

—তা' তুমি ভেবোনা দাদা, যা' সামান্য দু' একখানা জিনিষ আমার র'য়েছে তা থেকে রুলী দুটো কারু কাছে বন্ধক রেখে টাকা সংগ্রহ করো। আর প্রথমেই তো তুমি এমন একটা জহরলাল-পান্নালাল দিয়ে ব'স্‌ছোনা—এখন অল্প থেকেই সুরু করতে হবে।

সুকুমারের মনটা ব্যথিত হইয়া উঠে। রূপসী তাহার আরো দু' একখানি অলঙ্কার পূর্ব্বেই বাঁধা দিয়াছে—নইলে সংসার চলেনা। সুকুমারের তো কোনোই উপার্জ্জন নাই! তাদের একটি সংস্থান যাহাতে হয়, তাদের যাহাতে কল্যাণ হয় সেই চিন্তা যেন রূপসীর আর সমস্ত কিছুই ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

সুকুমার লজ্জিত হইয়া বলে, না, রূপু, সে আমি পার্‌বো না। তোর জিনিষে আর আমি হাত দোবোনা। যা' আগেই বাঁধা পড়েছে—তা-ই ফিরিয়ে আন্‌তে পারছি না! আর ব্যবসা-বুদ্ধি সত্যিই আমার নেই, এসবে মাথা আমার মোটেই ঘুর্‌বে না। শেষে টাকাগুলো সবই একেবারে জলে যাবে।

রূপসী কিন্তু আবার রাগিয়া উঠে। মাথা না ঘুর্‌লে চল্‌বেনা—ঘোরাতেই হবে। এই রকম নিত্য ভাবনায় থাক্‌তে থাক্‌তে তুমি একেবারে কুঁড়ের বাদ্‌শা হ'য়ে উঠেছো। আরো কিছুদিন গেলে দোকান কেন, কোনো কাজেই তুমি লাগ্‌বে না। সত্যি, তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার মুখে ওই রকম কথা শুনলে আমার ভারি রাগ ধরে। উঠে প'ড়ে লাগো, নিশ্চয়ই পার্‌বে। আগে থেকেই পিছিয়ে যাচ্ছো কেন? আর গয়নার ভাব্‌না আমি করিনে। ঘরে ফেলে রেখে ওগুলোতে মরচে ধরিয়েও তো কোনো লাভ নেই! গয়নাটা বিপদ আপদের সম্পত্তি—কি বড়লোক কি গরীব লোক—সবারই। ও সব কিছু ভেবোনা। ছাখোনা, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গয়না তুমি খালাস করে আন্‌তে পারবে—মা লক্ষী যদি মুখ তুলে চান্।

রূপসী সুকুমারকে বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিয়া যায়, কিন্তু সুকুমারের মনের ভিতর খচ্‌খচ্ করিতে থাকে। রূপী বলিয়া গেল—যদি মা লক্ষী মুখ তুলিয়া চান্। যদি!! যদি চান্, তাহা হইলে তো ভালোই হইল; কিন্তু যদি না চান্ মুখ তুলিয়া? তাহা হইলে?

রূপসী মাঝে মাঝে খোঁচাইতে থাকেই। সুকুমার অবশেষে এক এক সময় কথাটা ভাবিয়াই দেখে।

মন্দ হয় কি একটা দোকান দিয়া বসিলে? সেদিন রূপসী একটা 'যদি' বলিয়াছিল বটে, কিন্তু লিখিয়া অবস্থা ফিরাইবার চাইতে দোকান করিয়া আপাততঃ সংসারে মোটামুটি স্বচ্ছলতা আনাটা ওই 'যদি' সত্ত্বেও অধিক সহজ এবং সম্ভব বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে—স্বচ্ছলতাটার নিতান্ত প্রয়োজনও। তা' ছাড়া দোকান দিলেই বা কি? তাহার যে সাহিত্য-চর্চ্চা ছাড়িয়াই দিতে হইবে, এমন তো

কোনোই কথা নাই। কাঁকে কাঁকে সে লিখিয়াও চলিতে থাকিবে, এমন কি দোকানে বসিয়া বসিয়াই লিখিবে। আর প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ সাহিত্যিকই, অন্ততঃ এই পোড়া দেশের, শুধু লেখার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজও করিতেছে। ভবিষ্যতের কথা নিতান্তই ভবিষ্যতে। আপাততঃ আর্থিক অবস্থা কিছু ফিরাইতে না পারিলে খাওয়া পরাই যে বন্ধ হইবার জোগাড়! এ পর্য্যন্ত সে যতো লেখা পাঠাইয়াছে তাহার কয়টাই বা ছাপা হইল, কতোগুলির তো উদ্দেশই নাই! ছাপা হইল কিনা, অথবা আদৌ হইবে কি-না—কিছুই জানিতে পারে নাই; চিঠি লিখিলেও জবাব পাওয়া যায় না। কি বিশ্রী সত্যি! একটি লেখার মাত্র কিছু পাইয়াছে তাহাতে বোধ হয় এতোদিনকার ষ্ট্যাম্পের খরচও উঠিয়া আসে নাই! অথচ হাজার বিরক্ত হইয়াও কোনো লাভ নাই, এই রূপই অবস্থা।

রূপী মন্দও বলেনা যাই হোক্। আর চাকুরীর আশা এ বাজারে ছাড়িতে হইবেই; এটা কাজও স্বাধীন, কিছু হইবারো সম্ভাবনা আছে। তাইতো, এভাবে রূপী আর কতোদিন চালাইবে!

রূপীও উড়াইয়া দিয়াই চলিয়াছে, কি ঠিক বল্লে দাদা?...

আরেকদিন খাইতে বসিয়া সুকুমার প্রস্তুত করিয়াই ফেলে। বলিল, বেশ, তোর কথাই শুনলুম রূপু, করাই যাক্ একখানা দোকান।

রূপসী খুসি হইয়া বলে, এতোদিনে বুদ্ধির গোড়ায় জল গেল।

রাত্রে দু'জনে মিলিয়া পরামর্শ আঁটিতে থাকে। কি কি জিনিষ দোকানে রাখা যাইবে, কোন্ কোন্টা ভালো চলিবে, কিসের দর কি রকম। রূপসী এমন চমৎকার করিয়া গুছাইয়া সব বলিতে থাকে, সুকুমার অবাক হইয়া যায়। নিজের যতোই অজ্ঞতা থাকুক, রূপসীর উপর নির্ভর করিয়া সে ভরসা এবং সাহস গড়িয়া তুলিল। রূপসী বলিল, ষ্টেশনারী জিনিষ পত্র থেকে সুরু ক'রে মুদি দোকানে যা' যা' থাকে, সবই রাখ্‌তে হবে অল্প বিস্তর। তুমি কিচ্ছু ভাব্‌না ক'রোনা দাদা। সুরু ক'রে দিলেই কাজ দেখ্‌বে সহজ হ'য়ে আস্‌বে ক্রমে ক্রমে।

রাত্রেই সমস্ত সিদ্ধান্ত দু' ভাই বোনে স্থির করিয়া ফেলিল।

পরদিন অলঙ্কার বাক্স হইতে বাহির করিতে গিয়া রূপসী কিছুতেই চোখের জল রাখিতে পারে না। হারছড়া, এক জোড়া দুল, দুটি রুলী এবং কয়েকগাছা চুড়ি রহিয়াছে। দরিদ্র পিতা বিশেষ কিছু দিতে পারিয়াছিলেন না। ইহা তাহার স্বামীর দেওয়া এবং ইহাই তাঁহার শেষদান। মাতৃহীনা কন্যাকে পিতা দেবতার মতো সুন্দর স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। পিতা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন, তাহার পরে স্বামী। ক'টি দিন? হয়তো তিনটি বৎসরও পূর্ণ হইয়াছিল না। সেই তিনটি বৎসরের মধুর, করুণ স্মৃতি রূপসীর বুকের ভিতরে চাপা আগুনের মতো ধিক্ ধিক্ করিয়া জলিয়া উঠে, বুকের সবটুকু যেন নিঃশেষে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

পাছে সুকুমার কিছু টের পায়, নীরবে চোখের জল মুছিয়া দেবতার দেওয়া শেষ চিহ্নগুলি হইতে রুলী দুটি তুলিয়া বাহিরে আসিয়া সহজ, শান্ত, হাসিমুখে সুকুমারের হাতে তুলিয়া দেয়। রূপসী বহুকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করে; কিন্তু বক্ষের পূজা-বেদীর সম্মুখে স্পষ্টতম, সুন্দরতম, জাগ্রত-তম আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া ভায়ের কল্যাণ কামনায় তাহার অন্তর সহসা যেন অত্যন্ত উদার মহান হইয়া উঠে। তাহার আজিকার প্রিয়তম সামগ্রী দিয়া সে দাদাকে সাহায্য করিবে। দাদা উন্নতি করুক, দেবতার শেষ আশীর্ব্বাদ তাহার নিকটে আবার শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া ফিরিয়া আসিবে।...

চার মাইল দূরে নদীরধারে খুব বড়ো না হইলেও আলমগঞ্জ বন্দর নিতান্ত ছোট নয়। সেখান হইতেই জিনিষপত্র সব আনিতে হইবে।

যেদিন সুকুমার রওনা হয়, রূপসী বার বার করিয়া ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিল, টাকা পয়সা খুব হুঁসিয়ার। আর মালপত্রও দেখিয়া শুনিয়া বুদ্ধি খরচ করিয়া কিনিতে

হইবে, হিসাবটিসাবও সর্ব্বদা মিলাইয়া রাখিতে হইবে; কিছু যেন গোলমাল না হয়। রূপসীর উপদেশগুলি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুকুমার রওনা হইল অবশেষে আলমগঞ্জে।

বাজারের ভিতরে জন চারেক কুলী লইয়া সুকুমার এ-দোকান হইতে ও-দোকানে ঘুরিতে থাকে। কেরোসিন তেল, নারিকেলের তেল, খেজুরে গুড়, সরিষার তেল ইত্যাদিতে কয়েক টিন হইল। কয়েক রকমের ডাল, লবণ, চিনি, মিছরি, তেজপাতা—বস্তা বোঝাই আলাদা গেল। ষ্টেশনারী জিনিষপত্রও কম হইল না—কাগজ, পেন্সিল, নিব, দোয়াত, সাবান, চা, ছুঁচ, সুতা……ইত্যাদি ইত্যাদি। গোটা পাঁচ সাত খালি কেরোসিন কাঠের বাক্সও সুকুমার কিনিল, ইহার ভিতরেই জিনিষগুলি গুছাইয়া রাখিতে হইবে।

সুকুমার আলমগঞ্জে পৌঁছিয়া প্রথমেই গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। কুলীরা সেই গাড়ী বোঝাই করিয়া সমস্ত মাল সাজাইতে সুরু করিল।

এক রকম প্রায় সমস্তই কেনা হইয়াছে, এইবারে গাড়ী বোঝাই সারা হইয়া গেলেই রওনা হওয়া যায়।

সকালে দশটার সময়ে খাইয়া বাহির হইয়াছে, এতোটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে, তাহার পর এতোক্ষণ ছুটোছুটি করিয়া পরিশ্রম কম হয় নাই। বিকালবেলা সুকুমার যে বাড়ীতে কিছু খায় তাহা নহে, কিন্তু আজ যেন ক্ষুধা লাগে। জল-তেষ্টাও পাইয়াছে দারুণ। সুকুমার সামনের একটি মিঠাইএর দোকানে আসিয়া দাঁড়াইল।

দোকানী বলে, এই মাত্তর সন্দেশটা নামালাম বাবু, খান্ ব'সে। আপনাকে আর বাসী খাবার দেবনা, খেয়ে দেখুন এই টাট্‌কা জিনিষটা—দাম ইচ্ছে হয় দেবেন্ ইচ্ছে হয় দেবেন না। তবে আর কারো তৈরি সন্দেশ খাওয়ার সময়ে এই গদাই ময়রার নামটা না নিয়ে পারবেন্ বলে তো বোধ হয় না। এ কথা বল্‌তেই হবে যে হ্যাঁ খেয়েছিলাম বটে।

বাস্তবিকই তাই। গদাই খাসা সন্দেশই বানাইয়াছে। সুকুমার বসিয়া বসিয়া পোয়া দেড়েক খাইয়া ফেলে। শেষে জল খাইবার সময়ে মনে পড়িয়া যায় রূপসীর কথা। কিছু লইয়া গেলে মন্দ হয় না। এমন চমৎকার সন্দেশ সে একলা খাইয়া গেল, আর রূপু খাইবে না?

সুকুমার বলে, একটা পুঁটুলী ক'রে সের দেড়েক ওজন ক'রে দাও দেখি গদাই, বাড়ী নিয়ে যাই। বেশ বানিয়েছো।

হাসিয়া গদাই বলে, কাছাকাছি দশটা গঞ্জের ভিতরেও এই গদায়ের দোকানের খাবারের মতো খাবার আর পাবেন্ না, একথা গদাই বড়াই ক'রেই বল্‌ছে বাবু। বিনোদপুরের রায় সায়েব-মশার নাতনীর বিয়েতে ক্ষীরমোন্ দিয়ে মেডেলও এই গদাই পেয়েছিলো।

সুকুমার সন্দেশের দামটা গদাইএর হাতে দিয়া পুঁটুলীটি হাতে করিয়া আসিয়া দেখে গাড়ী তৈরি। গাড়োয়ান বলিল, আর দেরী করবেন না বাবু, এক্ষুণি বেলা প'ড়ে আসবে। আপনার মাল পৌঁছে দিয়ে ফের আমার রওনা হ'য়ে আস্‌তে হবে। বেশী রাত্ হ'য়ে গেলে বড়ো মুস্কিলে পড়বো।

সুকুমারও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। গাড়োয়ান গরু দুটির লেজ মুচ্‌ড়াইয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলো।

মেঠো রাস্তার উপর দিয়া চলিতে চলিতে সুকুমার আন্‌মনা ভাবে দূর আকাশের গায়ে আসন্ন সন্ধ্যার আভাষের দিকে তাকাইয়া থাকে। আকাশের দূর-সীমানায় মেঘের উপরে বিচিত্র বর্ণে ছড়াইয়া পড়া ওই অস্তসূর্য্যের রশ্মিগুলির গায়ে এমন মুহূর্ত্তে কি অসীম রহস্য জাগিয়া উঠে, রূপু তাহা বুঝেনা। ওই যে বিলের কচুড়ি পানার ভিতর হইতে ডাহুক পাখীগুলি শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দ এমন উদাস অপরাহ্নে তাহার মনকে কিরূপ তোলপাড় করিয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহাও রূপু জানেনা। রূপু জেদ্ ধরিয়াছে তাহাকে দোকান করিতে হইবে। তাহাই অবশ্য সে করিবে, সেইজন্যই এতো আয়োজন। কিন্তু অর্থের চিন্তা না থাকিলে এমন সময় এই স্থানে আসিয়া সে বসিয়া বসিয়া কবিতা লিখিত—রূপু চায় সংসারের স্বচ্ছলতা। দোকানের ডানায় ভর করিয়া তাহা উড়িয়া আসিবে।…

হয়তো ইহা সত্য যে আগাছার মতো লেখক গজাইতেছে

সহস্র সহস্র, আনাচে কানাচে। হয়তো ইহাও সত্য যে সম্পাদককে ত্রস্ত করিয়া বন্যার স্রোতের মতো মাসিক পত্রিকার আপিসে লেখা ঢুকিতে থাকে। কিন্তু তাহার এই একান্ত সাধনা কি ব্যর্থই যাইবে? মানুষেই নাকি ভগবানকেও লাভ করিয়া থাকে—আর তাহার সিদ্ধিই কি কেবল সম্পূর্ণ অসম্ভবের দুর্লঙ্ঘ্য-শিখরে বসিয়া তাহাকে উপহাস করিতে থাকিবে?

আকাশের গায়ে আর খানিকক্ষণ পরেই যে তারাটি টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে, সেই তারাটি হইতে সুরু করিয়া এই পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ধূলিকণা পর্য্যন্ত কবিতা! ওই যে তাহার বনে-ঘেরা গ্রামটির উপর ছায়া নামিয়া আসিয়াছে, এই যে পথটি মাঠের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই যে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে ঝাঁকানির তালে তালে এই গরুর গাড়ীখানার একটানা গতি—ইহার প্রত্যেকটি এক একটি কবিতা! বাহিরের আলো, আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, বন—সমস্ত কিছু তাহার প্রাণের স্পর্শের ভিতর দিয়া কবিতায় রূপান্বিত হইয়া উঠিতে পারে! সে করিবে সৃষ্টি, তাহারি ভিতর দিয়া সকলে তাহাকে বুঝিবে, তাহার যোগ্যতার সন্ধান লাভ করিবে! তাহার সাথে সাথে সেই কবিতায় বিশ্বের সমস্ত গূঢ়-রহস্যের সহিত পরিচিত হইবার আনন্দ প্রত্যেক মানুষে বাটিয়া লইবে, তাহাদের জীবন-যাত্রার প্রত্যেকটি অঙ্গ সুন্দরতর হইয়া উঠিবে! থাক্। রূপু থাক্, দোকান থাক্, এই পারিপার্শ্বিকের ভিতরেই তাহার এই মধুর ধ্যান অন্তরের এক নিভৃত কোণে জন্মভর বাঁচিয়া রহিবে।—

বাড়ী পৌঁছিয়াই সুকুমার প্রথমে সন্দেশের পুঁটুলীটি হাতে করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া রূপসীর সন্ধান করে।

শুনিয়া এবং দেখিয়া রূপসী কিন্তু তেমন খুসি হয় বলিয়া মনে হয়না। বলে, এ আবার কেন নিয়ে এসেছো দাদা আমার জন্যে, গোড়াতেই বেহিসেবী হ'লে কি চলে? তোমার দোকান ভালো ক'রে চলুক, এর পরে তখন সন্দেশ এনে দিয়ো।

একটু অপ্রস্তুত হইয়া সুকুমার বলে, নে রূপু, ভারি তো ওতে গিয়েছে, অতো হিসেব আমার দ্বারা হবে টবেনা। কালকে তোর একাদশীর দিন, খাস্। তুলে রেখে দে।

সে যে দোকান করিতেছে এ খবর পূর্ব্বেই পাড়ার উপরে নিজেই রটাইয়া দিয়াছিল। পরদিন দু'চারজনে দেখিতে আসেন। সকলেই সুকুমারকে উৎসাহ দেন, বলেন, এবার থেকে তাহ'লে সুকুমারের কাছ থেকেই জিনিষ নিতে হবে।

পাশের বাড়ীর বটু আসিয়া বলে, তোমার ওপর কৈলেশ বোরেগী যা' খাপ্পা হ'য়েছে সুকুদা!

সুকুমার একটু আঁচ করিতে পারে, জিজ্ঞাসা করে, কেনরে?

—তুমি তা'র দোকান মাটি ক'রে দিলে, সে চটবে না? এখন কি আর কৈলেশের দোকানে কেউ যাবে? তবে কৈলেশ বলছিল সে নাকি বাজারের ওপর গিয়ে দোকান দেবে—আরো বড় ক'রে।

হাসিয়া সুকুমার বলে, বেশ, তাই দিক।...

বাহিরের ঘরখানার চেহারা একদিনেই বদলাইয়া গেল। সুকুমারের বাবা বাঁচিয়া থাকিতে এই ঘরটিতে গাঁয়ের বৃদ্ধদের প্রাত্যহিক তাশ পাশার আড্ডা বসিত। তা' ছাড়া বাহিরের যে কেউ আসিলে এইটাই ছিলো বসিবার ঘর, এবং থাকার মধ্যে থাকিত কতোগুলি হুঁকা, কয়েক ডিবা তামাক, একটি ভাঙা টিন বোঝাই টিকা এবং একটি গাড়ু।

তিনি মারা যাইবার পরে ঘরটা এক রকম পড়িয়াই ছিল। রূপসী উহার ভিতর টানিয়া আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল কতোগুলি বাজে জিনিষ পত্র।

সেগুলি সরাইয়া ফেলিয়া ঘরটাকে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সুকুমার দিব্য দোকান সাজাইয়া ফেলিল।

দোকান চলিতে থাকে। কেহ যখন জিনিষ কিনিতে আসে, তাহাকে তাহা দিয়া সুকুমার বসিয়া বসিয়া গল্পের প্লট ভাবিতে থাকে। এখন তাহার লিখিয়া চলিতে হইবে অবিশ্রান্ত ভাবে—বহুদিকে মন দিয়া অপব্যবহার করিবার মতো সময় এবং শক্তি তাহার নাই এখন। হাতে আর একটাও গল্প নাই, শীঘ্রই দু'চারিটা লিখিয়া ফেলিবার প্রয়োজন। কয়েকটি কবিতা আছে, সেগুলি কয়েক

কাগজে পাঠানো চলিবে, কিন্তু আপাততঃ টাকার জন্ত কয়েকটি গল্প শীঘ্র যাহাতে বাহির হয় তাহার ব্যবস্থা না করিলে হইবে না। যশ চাই—অর্থ চাই! ছ'মাস এক বছর পরে একটি লেখা ছাপা হইলে কেহ তাহাকে জানা দূরে থাক্, নামটাও মনে করিয়া রাখিবে না। প্রত্যেক মাসে তাহার লেখা ছাপা হওয়া চাই—প্রত্যেক কাগজে তাহার নাম লোকের নজরে পড়া চাই। যশ, অর্থ আপনি আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে!

গিরি ঠাকুরাণী আসেন। বলেন, শুকু বাবা, তোমার দোকানে তামাকের পাতা আছে বাবা? ভালো পাতা?

শুকুমার বলে, হ্যাঁ পিসি, রেখেছি সের দু'তিন্। তা' তোমার কত্তোটুকু দরকার?

—তা' বাবা গোটা তিনেক পাতা যদি আমাকে দিতে! ওবাড়ীর সরোজিনীর কাছ থেকে সেদিন আধখানা পাতা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, পুড়িয়ে গুঁড়ো ক'রে যেটুকু হ'ল, তা' দু'দিনেই ফুরিয়ে গেল। কাল থেকে এ অবৃধি একটু গুঁড়ো মুখে দিতে পারিনি, মুখ যেন একেবারে তেতো হ'য়ে উঠেছে।

শুকুমার একটি বাক্সের ভিতর হইতে তিনটা পাতা তুলিয়া লইয়া বলিল, এই নাও পিসি, ধরো।

—তা' বাবা দামটাম কিন্তু আমি দিতে পারবো না—

—দাম তোমায় দিতে হবেনা, এম্নিই তুমি নিয়ে যাও।

—আহা, বাঁচালি বাবা। ওই যে সরোজিনী, বুঝ্‌লিনে, ও একেবারে কেপ্পনের হাঁড়ি। আচ্ছা, তুই-ই বল্ বাবা, সংসারে ওদের কিসের অভাব? পাঁচ পাঁচটি ছেলে—সকলে রোজগেরে। জমি-জাতিও বড়ো নিতান্ত কম নয়। অথচ এমন ছোট স্বভাব যে তা' আর তোকে কি বলি বাবা। সেদিন আমি সের দুই চাল চাইলাম, সরোজিনী পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিলো। হাত দিয়ে একটু বিন্দু জিনিব গলাতে চায়নারে বাবা!

গিরি ঠাকুরাণী চলিয়া গেলে শুকুমার এই স্ত্রীলোকটির জীবনের কথা ভাবিতে থাকে। মানুষের জীবনের কি ভয়ানক মূর্ত্ত ট্র্যাজেডী! বর্মা মুলুকে স্বামী এক সাহেবের কাছে ভালো চাকরী করিতেন। যেমন উপার্জ্জন করিতেন, উড়াইয়াছেনও দুই হাতে। গিরি ঠাকুরাণীর গায়ে তখন গহনা ধরে নাই, মাটিতে পা ফেলিতে পর্য্যন্ত চাহিতেন না। এক একবার দেশে আসিতেন, ঝি, চাকর, বামুনে বাড়ী একেবারে সরগরম। পাড়ার সকল মেয়ে বউ দেখা করিতে গিয়াছে, তিনি যাহার বাড়ীর উপরে বেড়াইতে আসিয়া আপ্যায়িত করিয়া গিয়াছেন, সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। গিরি ঠাকুরাণী ছিলেন গ্রামের প্রত্যেকের ঈর্ষার বস্তু; ছেলে নাই, পেলে নাই, এক বিন্দু ঝঞ্ঝাট নাই। রাণীর হালে বারো মাস ত্রিশ দিন পায়ের উপর পা দিয়া শুইয়া বসিয়া কাটাইয়াছেন।

সেই গিরি ঠাকুরাণীর আজ এই অবস্থা। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত একটি বাড়ীতে দু'বেলা রান্না করিয়া দিতেন। তার বদলে খাওয়া, থাকা এবং দু একখান কাপড় পাইতেন। তাহারা জবাব দিয়া দিয়াছে—এখন দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা বৃত্তি হইয়াছে সম্বল। এমন কি কখনো কখনো এমনও শুনা গিয়াছে, কাহারো কাহারো বাড়ী হইতে সুবিধা পাইয়া হাতের কাছের দুটি একটি জিনিষ চুরিও করিয়াছেন; কিন্তু ইহা লইয়া কেহ আর কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই।

মন হইয়া উঠিয়াছে অত্যন্ত নীচ আর কুৎসিত। যাহাদের কাছে হাত পাতিয়া সাহায্য পাইতেছেন—তা সে যাহাই হউক্ না কেন—তাহাদেরই নিন্দা প্রত্যেকের নিকটে অতিঃ রঞ্জিত ভাবে না করিয়া জলস্পর্শ করেন না। মানুষের নিকট হইতে যাহা পান তাহার জন্ত কৃতজ্ঞতার লেশ নাই। যাহা পান না তাহাই লইয়া তাঁহার অশ্রান্ত অভিযোগ। পূর্ব্বের মনোভাব এখনো নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই, এখনো চাহেন যে তাঁহাকে সকলে একটু খাতির করে। কিন্তু খাতির চাহিয়া যাহা লাভ করেন—তাহা সকলের ঘৃণা এবং অসীম উপেক্ষা। দিনের পর দিন গিরি ঠাকুরাণী রুদ্ধ আক্রোশে হিংস্র হইতে হিংস্রতর হইয়া উঠেন।

সমস্ত গিয়াছে, অথচ উহারই মধ্যে বিলাসিতা। দাঁতে তামাকের গুঁড়া না ঘসিলে মুখটা ভালো থাকে না। চাহিয়া, বিনা মূল্যে—যে তামাকের পাতা লইতে আসিয়াছেন, তাহা ভালো হইবে কি মন্দ হইবে সেই সম্বন্ধে প্রথমেই সন্ধান লইবার নির্লজ্জতার অভাব ঘটে না। রান্নায় একটু মিষ্টি

না দিলে মুখে রুচে না। পাতে একটু ঘি না হইলে ভাত গলাধঃকরণ করিতে পারেন না। ভিক্ষা করিয়া গালিমন্দ শুনিয়াও এ সব সংগ্রহ করেন। অস্তগত অতীতের ক্রূর পরিহাস।

অথচ তাঁহাদের জীবনের এমন ঘটনাটী ঘটিল অত্যন্তই সহসা। স্বামী নাকি সাহেবের আফিসের ক্যাশ হইতে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা ভাঙিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন সাহেবের হইল সন্দেহ এবং একটি বীভৎস মুহূর্ত্তে দুজনের ভিতরে বচসা। শুধু যে পুলিশে দিবেন, কেবল সেই ভয়ই দেখানো নয়, আফিসের বহু লোকের ভিতরে সাহেব যখন তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন—সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বোধ হয় ইহার সমস্তটুকু পরিশোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রহিলেন।

পরের দিন দেখা গেল কুঠীর বারেন্দায় সাহেব রক্তাক্ত কলেবরে মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। বুক ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলি চলিয়া গিয়াছে। বাবু উধাও।...

তার পরে প্রায় চোদ্দ-পনের বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাঁহার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কোথায় গেলেন, কোথায় আছেন—কেহই জানে না।

একখানি চিঠি নাকি গিরি ঠাকুরাণীকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—তিনি দূরদেশে গা ঢাকা দিলেন, আবার ফিরিয়া আসিবেন; সে যেন অস্থির না হইয়া পড়ে।—

গিরি ঠাকুরাণী এখনো স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছেন। এখনো তাঁহার কপালে সিঁদুরের উজ্জ্বল, প্রকাণ্ড ফোঁটা। পরণে চওড়া লাল পেড়ে কাপড়। একটু মাছ নিজে জেলে পাড়া পর্য্যন্ত গিয়ে প্রত্যহ চাহিয়া লইয়া আসেন। স্বামী বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়া গিয়াছেন—কিছুই জানা নাই। কিন্তু তবুও গিরি ঠাকুরাণী আশা ছাড়েন নাই। মানুষের সহস্র গঞ্জনা সহ্য করিয়াও কলসী গলায় বাঁধিয়া জলে ঝাঁপ দেন নাই।

প্রথম প্রথম হাতে যাহা কিছু ছিল, কিছুদিন চালাইয়াছিলেন। তাহার পরেই আসিল অভাব। ক্রমে যেনা—তাহার পর ভদ্রভাবে অপরের সহানুভূতি এবং প্রকৃত বেদনা মিশ্রিত সাহায্য গ্রহণ—অবশেষে রাঁধুনী বৃত্তি। এখন তো সম্পূর্ণ ভিক্ষা বৃত্তি। গ্রামের লোকে গিরি ঠাকুরাণীকে লইয়া তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাড়ীর দুয়ারে আসিলে তাড়াইয়া দিতে পারিলে বাঁচে।

কিন্তু সুকুমারের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। গিরি ঠাকুরাণীর কোনো কথায়, কোন কুৎসিত আচরণে সে ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে না—মানুষের জীবনের এমন নিদারুণ অবস্থা বিপর্য্যয়গুলির কথা ভাবিয়া তাহার মন পাষাণের মত ভারি হইয়া উঠে।

চট্ করিয়া সুকুমারের মাথার ভিতরে খেলিয়া যায়—এই গিরি ঠাকুরাণীর জীবন লইয়াই একটি গল্প লিখিয়া ফেলা যায় না?

যে দিন কমল আসিয়া ক্লিপ আছে কি না জিজ্ঞাসা করে, সেই দিনই সুকুমার গেল বিপদে পড়িয়া। নাই শুনিয়া ভুরু, চোখ, মুখ কুঁচকাইয়া ছোট মেয়েটি গভীর বিস্ময়ের সুরে বলে, কিলিপ নেই এ তোমার কেমন দোকান সুকুদা? এতো সব এনেছো, কিলিপ আনতে তোমার কি হয়েছিলো?

সুকুমার উত্তর দেয়, আনতে একদম ভুলে গিয়েছিলাম রে কমলি। আচ্ছা দাঁড়া, সাম্নের বারে ক্লিপ নিয়ে আসবো তোর জন্যে।

কমল সুকুমারের দোকানের এটা ওটা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে থাকে।

সুকুমার চুপ করিয়াই বসিয়া আছে, একটুক্ষণ পরে বলে, আমার পিঠটা একটু টীপে দিবি কমলি? তোকে বিস্কুট দেবোখন্।

—পীঠটা? টিপে? আচ্ছা দিচ্ছি।...কমল লাগিয়া গেল।

—ক'খানা বিস্কুট দেবে সুকুদা?

আরামটুকু উপভোগ করিতে করিতে সুকুমার উত্তর করে—ক'খানা? যদি পনর মিনিট দিস্ তবে পাবি আট খানা। আর যদি আধ ঘণ্টা দিস্ তবে পাবি কুড়ি খানা। যদি এক ঘণ্টা দিস্ তবে পাবি পঞ্চাশ খানা।

—আচ্ছা, তা হলে তোমার এক ঘণ্টাই দেব সুকুদা। খালি টিপেই দেবো নাকি? গুড় গুড়ি দেই? কিলিয়ে দেই?

সন্ধ্যাবন্দনা

হাসিয়া সুকুমার বলে—কর্ যা খুসী।

এক ঘণ্টা অবশ্য কমলকে আর পরিশ্রম করিতে হয় না; মিনিট পনের পরেই সুকুমার তাহাকে ছুটি দেয়। তবে বিস্কুট আর গনিয়া কিছু দেয় না—একটা টিনের কিছুটা খালি হইয়াছিল, সেই টিনটা ধরিয়াই কমলির হাতে দেয়। বেশ লাগে মেয়েটিকে—যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি বাধ্য। উহারাও সুকুমার সাথে মহা ভাব।

সুকুমার বলে, সব গুলোই তোকে দিচ্ছি না। খান কতো তুলে নেবো। আমি বসে বসে খাবো।

কমলি যাহা পাইয়াছে ইহা তাহার আশাতিরিক্ত। বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বলে, তা নাও তুলে যে কখানা ইচ্ছে।

কমল বিস্কুটের টিন বগলে করিয়া মহা খুসী হইয়া চলিয়া যায়, সুকুমার বসিয়া বসিয়া যে কখানা বিস্কুট কমলিকে দিবার পূর্ব্বে টীনের ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহা মুড়্ মুড়্ করিয়া খাইতে থাকে।

পথে কমলিকে হঠাৎ রূপসী দেখিয়া ফেলে। জিজ্ঞাসা করিল, এ কী নিয়ে যাচ্ছিসরে কমলি?

কমলির সারা মুখে চোখে খুসীর আভাষ। হাসিয়া হাসিয়া বিস্তারিত খুলিয়া বলে।

সুকুমার নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া বিস্কুট খাইতেছিল। সহসা রূপসী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করে, কি চাসরে রূপু? একখানা বিস্কুট খাবি? এই নে, খেয়ে ছাখ্। এমন চমৎকার কড়মড়ে—

আচ্ছা দাদা, তোমাকে কি বলি আমি, তাই বলতো?

উৎসুক হইয়া সুকুমার জিজ্ঞাসা করে, কেন রে রূপু?

—রূপু রূপু আর তুমি করো না আমাকে।

—আঃ হাঃ কি হয়েছে, তা বলবিনা আমাকে?

—তুমি এই রকম করে দোকান করবে—না কি? একটা টিন বিস্কুট তুমি কমলিকে দিয়ে দিলে, আবার বসে বসে নিজেও দিব্যি মুখ নাড়ছো! তুমি এখন কি কচি খোকাটি? কি আক্কেল তোমার তাই ভাবি।

সুকুমার চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া হাসিতে থাকে।

—আর হেসোনা, হেসোনা।...দাঁড়াও আজ আমি তোমার দোকানের সমস্ত হিসেব নেবো। এতোদিন দোকান আরম্ভ করেছো কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। রোজ কতো করে বিক্রী হচ্ছে, কে ধারে কি জিনিষ নিচ্ছে, নগদেই বা কি নিচ্ছে এসব খাতায় মিলিয়ে টিলিয়ে রাখছো তো?

মাথা চুলকাইয়া সুকুমার বলে, খাতা-টাতা নেই বটে, কিন্তু মিলিয়ে রাখছি বৈ কি? সবই আমার মনে আছে।

রূপসী যেন আকাশ হইতে পড়ে। খাতা পত্র নেই, সে কি কথা? রোজ দোকান থেকে এতো লোকে এসে এক পয়সা দুই পয়সা থেকে সুরু করে আট দশ আনা এক টাকার জিনিষ নিয়ে যাচ্ছে—এ সমস্তই তোমার মনে রয়েছে? দোকানের আদ্দেক জিনিষ তো প্রায় ফুরিয়ে আসবার যোগাড় হ'ল। আচ্ছা এ কথাও তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি তাই বলতো?

—ছাখ্ রূপু, ওসব হিসেব-টিসেব আমি লিখ্তে পারিটারিনে। যে বাকী নিচ্ছে, সকলেই তো দামটা দিয়েই যাবে, না হয় দু'দিন পরেই দেবে। আর নগদ যা' বিক্রী হ'চ্ছে সে পয়সা তো হাতে ক'রেই নিচ্ছি—তার আবার মেলানোর কি আছে? তা' ছাড়া আমার সকলেই প্রায় বাঁধা কাষ্টমার হ'য়ে উঠেছে, গোলমাল হ'তে দিচ্ছি না। এই ধর না—

—দাদা, ছোট ভাই হ'লে এখন তোমায় পিটিয়ে আমি ঠিক ক'রতাম। তা' যখন পারছি না, ব'লে যাচ্ছি ভালোয় ভালোয় আজকেই খাতা তৈরি ক'রে সমস্ত লিখে ফেলো, আর দান খয়রাতি বন্ধ ক'রে দাও।...

আর একটি কথাও বলিবার বা শুনিবার চেষ্টা না করিয়া ক্রুদ্ধা রূপসী দুড়দাড়্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দোকানের কাজের ফাঁকে ফাঁকেই সুকুমার গল্প লিখিয়া চলে। নুন মাপিয়া দিতে দিতে কবিতার লাইন স্মরণ করিতে থাকে।

সকালেই লোকজনের উপদ্রব বেশী। দুপুর বেলাটা প্রায় অবসর। আগেও যেমন বসিত, এখনও সুকুমার ঠিক তেমনিই খাতা পেন্সিল লইয়া নিজের নিরালা ঘরের কোণটিতে আসিয়া বসে। বিপুল একাগ্রতায় মনের অলিগলির সন্ধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সমস্ত ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, লুকানো চিন্তাগুলিকে একত্র জড়ো করিয়া একটি বিশিষ্ট রূপে, বিশিষ্ট রসে প্রাণবন্ত করিয়া বাহিরে ফুটাইয়া তুলিতে যত্নবান্ হয়।...সুকুমারের চোখের সামনে যেন ভাসিয়া উঠে—তাহার সম্মুখে যেন দাঁড়াইয়া আছেন শ্বেত-শতদলের উপর শুভ্র-দেহা, শুভ্র-বসনা বীণাপাণি—দুটি আরক্ত অধরে স্নিগ্ধ হাসি, কোমল বক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া স্নেহের সহস্রধারার উৎস, করুণা-সুন্দর প্রশান্ত দুটি চোখে অনন্ত আশীর্ব্বাদের নীরব বাণী।...

গ্রামের কেদার চাটুয্যে মশায় সহসা বড়ো বিপন্ন হইয়া পড়েন।

সুকুমারকে আসিয়া বলেন, বাবাজী, কোনোমতে মেয়েটার একটা গতি করবার তো সমস্ত ঠিক ক'রে আনলাম। এই তো আসছে মাসেই বিয়ে। কিন্তু বাবাজী খরচ পত্র যে কেমন ক'রে সঙ্কুলান করি, কিছুই তো ভেবে পাচ্ছিনে। জামাইকে বিশেষ কিছু দিতে না হ'লেও মেয়েটাকে তো একেবারে ন্যাংটা ক'রে দিতে পারিনে, যাই হোক্ ওরি মধ্যে কিছু খরচ ক'রতেই হবে। জন কতো মানুষ-জনও খাবে: কি ভাবে কি করি বলতো বাবাজী?

সুকুমার বলিল, কি বা আপনাকে বলব জ্যাঠাবাবু, তবে আমার দ্বারা যেটুকু সাহায্য আপনার হওয়া সম্ভব তা' আমি নিশ্চয়ই করবো।

চাটুয্যে মশায়কে একেবারে নিরাশ হইয়া আর ফিরিতে হয় না। কেদারের মেয়ের বিবাহের দিনে সুকুমার নিজের দোকান হইতে তেল, নুন, ময়দা সমস্তই পাঠাইয়া দেয়।

চাটুয্যে মহাশয় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলেন, বাবাজী দাম-টামগুলো চট ক'রে কিন্তু শোধ ক'রে উঠ্‌তে পারবো না। বুঝ্‌তেই তো পারছো—

সুকুমার ব্যস্ত হইয়া উঠে। না, না জ্যাঠাবাবু, দামের জন্যে আপনার মোটেই ভাবনা করতে হবে না। আপনার দায়টা ঈশ্বরের ইচ্ছেয় ভালোয় ভালোয় উদ্ধার হ'য়ে যাক্। টাকা আপনি পাঁচ বছর ফেলে রাখুন না।

কেদার নিশ্চিন্ত হইয়া অপর কাজে মন দেন।

কিন্তু রূপসী আসিয়া তম্বী করিয়া বলে, আচ্ছা দাদা, এই ভাবে কেমন ক'রে দোকান চলবে তাই তোমায় জিজ্ঞেস করি? একদিক থেকে তুমি বাকি দেয়া সুরু ক'রে দিয়েছো—আর ওই তো তোমার দোকান। এ দু'দিনে উঠে যাবে না? তোমায় নিয়ে বাস্তবিক আর আমি পারি না হ'কে হ'কে। জ্যাঠাবাবুকে যে তুমি কি ব'লে অতোগুলো জিনিস বাকি দিলে, ভেবে অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি। ওঁর মতো অমন ধূর্ত্ত লোক আর গাঁয়ে আছে নাকি? টাকার ওঁর বুঝি অভাব? কিছু জানো না তো! এসব টাকা আর তুমি কস্মিন্ কালেও আদায় করতে পারবে ভেবেছো নাকি? আর আরেকদিক দিয়ে তো তোমার দান-সাগরও চলেছে। ছেলেমানুষের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের দোকানের জিনিষ নিজেও খাচ্ছো। তা' ছাড়া আজকাল দোকানের সমস্ত হিসেব-নিকেশগুলো খাতায় সব ঠিকভাবে রাখ্‌ছো তো, না কি? আর লাভ-টাভ দস্তুর মতো নিচ্ছো তো?

—রাখ্‌ছি বাপু রাখ্‌ছি। না হয় দেখে আয়গে, যা। আর লাভ নিচ্ছি না, তবে নিচ্ছি কি?

—দেখ্‌বোই তো, দেখ্‌বোনা ভাব্‌ছো? তুমি যা খুশী তাই করবে দোকানটা নিয়ে, আমি বুঝি এম্নি এম্নিই সইবো? কালকেই আমি সব দেখ্‌বো। লাভ যা' তুমি ক'রছো সব জানি; তোমার মতো গোবর গণেশের কম্মো নাকি?

রূপসী চলিয়া যায়, কিন্তু ঠিক এক মিনিট পরেই পুনরায় ঝড়ের বেগে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া রাগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার মতো হইয়া বলে, আচ্ছা দাদা, তোমার কি আক্কেল বলতো? ঘরের দরজা খুলে রেখে দোকান ফেলে এসেছো, আর ভ্যাখোগে তো একটা গরু ঢুকে কি কাণ্ড ক'রেছে! ডালগুলো খেয়ে গেছে, আরো সব জিনিষ পত্র মেজেয় ছড়িয়ে একাক্কার ক'রে গেছে! আমি শুনতে চাই যে তোমার এই—

রাগে আর কান্নার আবেগে রূপসীর গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসে।

সুকুমার বলে, আমাকে দিয়ে ওসব দোকান-টোকান সত্যিই হ'ল না রূপু। আমার ধাতে মোটে পোষায়ই না। বললুম তা শুনলিনে—যা' হবার হয়েছে, এখনো যে জিনিষ-গুলো আছে—ওসব কৈলেশ বৈরেগীর কাছে বিক্রী ক'রে ফেলে দিই। মিছিমিছি তোর রুলী জোড়া বাঁধা দিলুম। যাক্, একরকম ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারবোই—না হয় দু'দিন দেরী হবে। আর ছাখ্ রূপু, কালকে আমি চিঠি পেলাম, আমার দুটো গল্প শীগ্‌গীরই ছাপা হ'চ্ছে, ওদের নাকি খুব ভালো লেগেছে। বে'র হ'লেই তো বিশ পঁচিশ টাকা পেয়ে যাবো। আর ছাখ্ না, নাম আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়্‌ছে, লেখার আদর হ'চ্ছে, আমারও মাথা আর হাত দুইই যাচ্ছে খুলে! কিছুটা দিন কষ্ট ক'রে থাক্ রূপু, শেষে দেখ্‌বি দাদার কথা ভাব্‌তে তোরই গর্ব্ব হবে। ওসব বেণেতী ক'রে আমার এমন জীবনটা নষ্ট হয়, তাই কি তুই চাস্?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া চোক মুখ লাল করিয়া রূপসী ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, সুকুমারের কানে তাহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে—মরো তুমি!
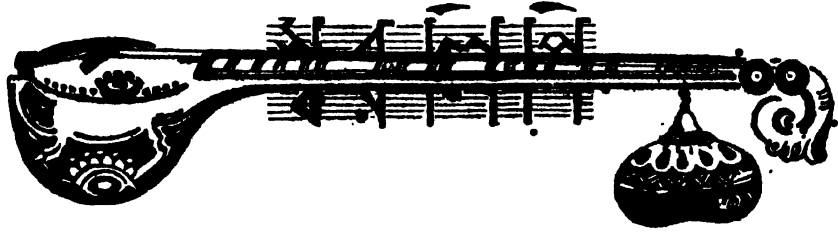
শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

আমার আঁধার ভালো।
আলোর মাঝে বিকিয়ে দেবে-আপনাকে সে।
(আঁধার ভালো)

আলোরে যে লোপ ক'রে খায়
সেই কুয়াশা সর্ব্বনেশে।
(আঁধার ভালো)

অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে
সহজ মনে বিহার করে,
অভিমানী জ্ঞানী তোমার
বাহির দ্বারে ঠেকে এসে।
(আঁধার ভালো)

তোমার পথ আপনায় আপনি দেখায়
তাই বেয়ে, মা, চলব সোজা,
যারা পথ দেখাবার ভিড় করে গো
তারা কেবল বাড়ায় খোঁজা।

ওরা ডাকে আমায় পূজা-ছলে,
এসে দেখি দেউল তলে
আপন মনের বিকারটারে
সাজিয়ে রাখে ছদ্ম বেশে।
(আঁধার ভালো)॥

"বিসর্জ্জন"এর গান

কথা ও সুর ঃ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানা দেবী

I জ্ঞা জ্ঞা । সা জ্ঞা -া । ঋা সা -া II
আ মার্ আঁ ধা র্ ভা লো •

II {সা দা -া । পা মা পা I জ্ঞমা জ্ঞা রজ্ঞা । ঋা সা -া I
ও • • আ মা র্ আঁ ধা র্ ভা লো •

র্সা র্সা -া । র্ঋা র্সা -া I ণা ণর্সা দণা । দা পা দা I
আ লো র্ মা ঝে • • বি কি য়ে দে বে •

মপা মা জ্ঞা । রা জ্ঞা -া I সা জ্ঞা -া । ঋা সা -া I}
আ প না কে সে • আঁ ধা র্ ভা লো •

+								+							
পাঃ	দ়ঃ	র্সা	।	ণা	ণদা	পা	I	মা	-া	মা	।	মা	মপা	দা	I
আ	প্	নি		দে	খা	য়		তা	ই	বে		রে	মা	০	
মপা	-া	পমা	।	জ্ঞরা	মজ্ঞা	-া	I	-া	-া	ঋসা	।	-া	সা	ঋা	I
চ	ন্	দ০		সো০	না০	০		০	০	০০		০	ঝা	রা	
জ্ঞা	মা	মা	I	মা	মা	-া	I	মমা	পদা	দা	।	পা	মা	পা	I
প	থ	দে		খা	বা	র্		ভি০	ড়্০	ক		রে	গো	০	
মা	জ্ঞাঃ	রঃ	।	জ্ঞরা	জ্ঞা	-া	I	জ্ঞমা	জ্ঞরা	জ্ঞা	।	ঋা	সা	-া	I }
তা	রা	০		কে০	ব	ল্		বা০	ড়া০	য়		খোঁ	জা	০	
-া	-া	-া	।	-া	দা	পা	I								
০	০	০		০	ও	রা									

+								+							
{ মা	ণদা	-া	।	দা	দা	ণা	I	ণা	র্সা	-া	।	র্ঋা	র্সা	-া	I
ডা	কে	০		আ	মা	য়		পূ	জা	০		ছ	লে	০	
ণা	র্সা	র্ঋর্জ্ঞা	।	র্জ্ঞর্ঋা	র্সা	-া	I	ণা	ণণা	র্সর্ঋা	।	ণর্সা	ণদা	পা	I }
এ	সে	০০		দে	খি	০		দে	উ০	০ল		ত	লে০	০	
পর্সা	র্সা	-া	।	র্সর্ঋা	র্সা	-া	I	ণর্সা	ণা	ণণা	।	দা	পা	মা	I
আ০	প	ন্		ম	নে	র্		বি০	কা	র্		০টা	রে	০	
পা	ণর্সা	র্সা	।	ণা	দা	পা	I	মা	-া	জ্ঞা	।	ঋা	সা	ঋা	I
সা	জি	য়ে		রা	খে	০		ছ০	০	দ্ম		বে	শে		
জ্ঞা	মা	জ্ঞা	।	ঋা	সা	-া	II II								
আ	গা	র্		জা	লা										

মহাসাগরের গান

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেন

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" বলিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারাই আবার স্বীকার করিয়াছেন "রসো বৈ সঃ"। সুতরাং কাব্যের প্রকৃতি আলোচনা করিবার সময় ভূমার সহিত ইহার সম্বন্ধের কথা আসিয়া পড়ে। যাহা অতীন্দ্রিয় জগতের অন্তহীন বিরাটতার সহিত মানবের ক্ষুদ্র মনের সংযোগ সাধন করে, সাধনক্ষেত্রে তাহাকে বলে যোগ, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহাকে বলে কাব্য। প্রকৃত কাব্য যেন বিশাল মুক্ত আকাশকে ক্ষুদ্র গৃহকোণের সহিত মিলাইয়া দিবার একখানি মুক্ত বাতায়ন।

আজ আমরা এইরূপ একখানি বাতায়ন দিয়া একবার বাহিরের দিকে তাকাইতে চেষ্টা করিব। এই বাতায়ন-পথে বাহিরের বিশাল সাগরের পানে যিনি পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, কান পাতিয়া অনাদি অনন্ত সমুদ্র-কল্লোল শুনিয়াছিলেন, নয় বৎসর পূর্ব্বে এই ১৬ই জুন তারিখেই দার্জ্জিলিংএর "ষ্টেপ এসাইড-এ" তাঁহার প্রাণস্রোত মহাসাগরের স্রোতে মিলাইয়া গিয়াছে। আমরা "সাগর-সঙ্গীত"এর কবি ৺চিত্তরঞ্জন দাশের কথা বলিতেছি।

কবি বিশ্বাস করিতেন, প্রাণ দিয়া পরিপূর্ণভাবেই বিশ্বাস করিতেন, সমুদ্র জড় প্রকৃতির অংশ নহে, সে মানুষের মতই প্রাণবান। বাহিরের আকার এবং আয়তনগত পার্থক্য থাকিলেও মানব এবং সাগরের আত্মা ভিন্ন প্রকৃতির নহে। উহারা একই প্রাণস্রোত হইতে উদ্ভূত এবং অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। উহাদের মধ্যে যেন নাড়ীর টান রহিয়াছে।

> "অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
> দু'জনে এসেছি যেন দুটি প্রাণস্রোতে।
> তারপর কতবার জনমে জনমে
> আমরা মিলেছি, দোঁহে মরমে মরমে—"

দুইটি হৃদয় যেন দুইটি একসুরে বাঁধা বীণা। একটিতে কোমল করাঘাত করিলে আর একটিতে ঝঙ্কার উঠিতে থাকে। অদৃশ্য কাহার করস্পর্শে সমুদ্রের বুকে যখন মহাগান বাজিতে থাকে কবির মনও তখন সমধর্ম্মী কম্পনে (Sympathetic vibrationএ) কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে।

> "মনখানি মম
> শত শত তন্ত্রীভরা গীতযন্ত্র সম,—
> পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
> গরবে গৌরবে আজি উঠিছে বাজিয়া।"

সমুদ্রের বাধাহীন উৎসবে মনও বাধা মানিতে চাহে না,—অজানিত সুখ দুঃখের বিচিত্র অনুভূতিতে মন ভরিয়া যায়। সকল অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, সকল সুখ পুষ্প হইয়া ফুটিতে থাকে, সব দুঃখ গানরূপে দেখা দেয়।

এই "অতল অগাধ সঙ্গীতমণ্ডলের নীরব গর্জ্জনে" কবি আপনার অনন্তের ছায়াভরা প্রাণ-এর সাড়া পান, তাই হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সমুদ্রের গানের মাঝে আপনাকে খুঁজিয়া বেড়ান।

দিবস রজনী ভরিয়া "আলোকে আঁধারে" "তরুণ উষার মায়ালোকে" "মেঘাক্রান্ত দ্বিপ্রহরে," "বাসনাহীন উদাস সন্ধ্যায়" নির্জ্জন তীরে বসিয়া "যন্ত্রী" সমুদ্র মানবের হৃদয়যন্ত্রে বিচিত্র ঝঙ্কার তুলিতে থাকে। কবি সমুদ্রের বিচিত্র রূপ দেখিতে পান, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও হৃদয়ের রং ফিরিতে থাকে।

প্রভাতের সমুদ্র যেন তরুণ প্রেমিক রাজার সাজে সাজিয়া আসে—

> "তরুণ উষার আলো প্রতি অঙ্গে তব,
> সোনার ঢেউয়ের মত বহে চলে যায়,…
> সোনায় ভরিয়া গেছে হৃদয় আমার…
> রেখে যাব আজ তব চরণতলায়—"

তারপর দ্বিপ্রহরে নির্জন গগনতলে "গীতশ্রান্ত চোখে"-সেই রহস্যময় বন্ধু ঘুমাইতে থাকে।

"মেঘাক্রান্ত দ্বিপ্রহর, স্তব্ধ চারিধার...
দুই চোখে চেয়ে আছি তব মুখপানে!
ঘুমাও ঘুমাও তুমি। হৃদয় আমার
জাগিছে কাঁপিছে কোন শব্দহীন গানে।
কবে পাব পরিচয় হে বন্ধু আমার!
কখন জাগিবে তুমি?—"

সন্ধ্যায় যখন চারিদিকে আলোক আঁধার ঝরিয়া পড়ে, তখন মনে হয় সমুদ্র যেন কোন এক প্রশ্নভারাক্রান্ত আত্মা।

"ওগো সিন্ধু! অন্ধ তুমি কোন ছায়ালোক-জুড়ে
গাহিছ করুণ গীতি দ্বিধায় জড়িত সুরে?
কোন প্রশ্ন উঠিয়াছে পাওনি উত্তর তার?
হৃদয় ভরিয়া আছে কোন সমস্যার ভার?
জীবন মরণ সনে কি কথা কহিছ আজি?
কোন তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে, কি ব্যথা উঠেছে বাজি?
তোমার পরাণ হতে আমার পরাণ 'পরে
সকল আলোক আর সকল আঁধার ঝরে।"

আকাশে এখনও তারা ফোটে নাই,—সমুদ্র যেন বাসনা-লেশহীন আত্মস্থ মহাযোগী। ধীরে ধীরে কাহার যেন অর্চ্চনা আরম্ভ হয়, পূজারী যেন কাহার পূজায় বসিয়া যায়। আরতির শঙ্খ বাজিয়া উঠে, ধূপ-ধূনাগুগ্গুলের সমারোহ চলিতে থাকে, কবির "পরাণপ্রদীপ" ঊর্দ্ধে কাহার পানে তুলিয়া ধরিয়া মহাসিন্ধু কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে। সাধক আপনার মাঝে আপনাকে ডুবাইয়া ফেলে, কবিও আপনাতে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন।

তারপর জ্যোৎস্না ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে থাকে। স্বপ্নময় জ্যোৎস্নার তরঙ্গে তরঙ্গে স্বপ্নের মত দূর অতিদূর হইতে পূর্ব্ব জন্মের কথা ভাসিয়া আসে,—এজন্ম, পূর্ব্বজন্ম, সকলজন্ম যেন এক হইয়া যায়।

"পূর্ব্বজনমের একি স্বপনের ছায়া
কোন পূর্ব্ব পুণ্যফলে উঠেছে ভাসিয়া
তোমার হৃদয়তলে। কোন পূর্ব্বমায়া
রচিতেছে স্বপ্ন তব জীবনে আসিয়া।
আমার পরাণে আজি কাঁপিছে কেবল
জোছনা তরঙ্গে শত স্মৃতিপুষ্পদল।
শত জনমের যেন হাসি-অশ্রুভারে
পরাণ উঠেছে গাহি গীত পারাবারে।
সকল জনম যেন এক হয়ে গেছে,
একটি পুষ্পের মত স্বপ্নে ভাসিতেছে।"

তখন ধীরে ধীরে মনে পড়ে সমুদ্রের সহিত পুরাতন প্রণয়ের কথা। সে তো আর একদিনের নয়, চিরজন্মের জন্মজন্মান্তরের। তাই যেন মনে হয় মুখখানি চেনা-চেনা—

"শুধু মনে হয়
তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন দেশে।
তোমার পরশখানি মনে জেগে রয়,
এতকাল পরে তাই আসিয়াছি ভেসে।"

আর সকলের সহিত যেমন, কবির সহিত সমুদ্রের তো তেমন বাহিরের পরিচয় নয়, তাহাদের পরিচয় যে অন্তরের! তাই বাহিরের গীতে কবির মন উঠে না।

"বাহিরের গীত র'বে বাহিরে পড়িয়া
সবাই শুনে যা' সেত' সবাকার তরে"—

তাহা কি আর ভাল লাগে! মিলন তাহাদের হইবে নির্জ্জনে গোপনে অন্ধকারে।

"গা'ব দু'জনায়
চারিদিকে অন্ধকার রহিবে প্রহরী।
তুমি এক গান গাবে আমি গা'ব আর
দু'জনে ভাসিয়া যাব অনন্ত হরষে!
আমারে ডুবায়ে দিবে তোমার পরশে।"

শান্তরূপে যে সাগর সোনার স্বপ্ন সৃজন করে, যে বন্ধুকে আবেগে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে "একসূত্রে বাঁধা রব আমরা দুজনে, তরুণ ঊষার কোলে স্বপন বিজনে,"—সে-ই যখন আবার ভীমরূপে ভয়ালরূপে রুদ্রের প্রলয় বিষাণ বাজাইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে,—যখন দেখা যায়—

"তরঙ্গ তরঙ্গ 'পরে ঝাঁপায়ে পড়িছে
অশান্ত বেদনাভরে দুলিছে দুলিছে,
কাঁপিছে গর্জ্জিছে যেন ক্রুদ্ধ হাহাকার।..

ঘনঘোর অট্টহাসে মরণ উদয়ে
লাফায়ে ঝাঁপায়ে পড়ে পাতাল অম্বরে ;
বিদ্যুৎবিহীন নিশা অশনি বরষে
ছিন্ন ভিন্ন বক্ষে তার মরণ গরজে !
উন্মত্ত তরঙ্গে তার অযুত ফণিনী
বিস্তারে অসংখ্য ফণা অনন্তরঙ্গিনী…
লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে
মন্দ্রিছে মরণগীতি অনন্ত আঁধারে।"

তখন কবির বক্ষ ভরিয়া "অনন্ত প্রভঞ্জন" চলিতে থাকে। "অনাদি কালের বক্ষে" যে "সৃষ্টি শতদল" "আপনারি সুখ দুঃখে টলমল" করে এ মহাপ্রলয়ে তাহা ধ্বংস হইতে যায় দেখিয়া সাগরের কবি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠেন।

"হে রুদ্র মরণ দেব। জটী জটাধর।
প্রলয় ত্রিশূল তব সংহর! সংহর!…
রাখ, রাখ রণ তব হে অন্ধ বিজয়ী,"—

কি তুমি চাও? কি আহুতি দানে তোমার এ ভয়ঙ্কর ক্ষুধা মিটিবে? আমার প্রাণ? তাই কি? কিন্তু—

"আমার পরাণ ভরে মিছে যুদ্ধ করা
আমি ত' আপনা হ'তে দিতেছিনু ধরা!"

সমুদ্রের আত্মা মানবের আত্মাকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আপনার বিশাল বক্ষে টানিয়া লয়। তারপর দুই মুক্ত আত্মার মিলিত কণ্ঠ হইতে কত শত "শব্দহীন সঙ্গীত" উঠিতে থাকে।

"আমার বক্ষের মাঝে কি যে বিপুলতা।
কত শত শব্দহীন সঙ্গীত জাগিছে,
কত শত সঙ্গীতের পূর্ণ নীরবতা।
সকল শব্দের মাঝে শব্দাতীত বাণী
সকল সঙ্গীত" মাঝে অগীত কি জানি।

মহাসাগর ও মহামানবের এই নীরব সঙ্গীত কোলাহল-মুখরিত ধরিত্রীর ক্ষুদ্র বক্ষ ছাড়িয়া উর্দ্ধে বহু উর্দ্ধে এক অন্তহীন শব্দহীন অতীন্দ্রিয় জগতে উঠিয়া যায়। হেথাকার শব্দময় চপল স্পন্দন সেই উর্দ্ধলোকে উঠিতে পারে না, বাক্যহীন নীরবতার বিচিত্র সঙ্গীতে সেখানে অসীমের অর্চনা চলিতে থাকে। শুভ মুহূর্ত্তে সসীমের সহিত অসীমের যোগ হইয়া যায়।

হৃদয়ে আবেগ না আসিলে এই শব্দহীন সঙ্গীত রচিত হইতে পারে না। সমুদ্র আবেগের আধার,—তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে হয় সে যেন ব্যথারই সাগর।—

কাঁদিতেছে, একি ক্ষুধা একি তৃষা অনিবার
একি গরজিছে ব্যথা শ্রান্তিহীন দুর্নিবার?

বলিতে ইচ্ছা করে—

'নিভারি' ও বক্ষভরা সর্ব্ব আকুলতা,
গীতধ্যানে রচিতেছ শব্দনীরবতা।
হে গায়ক অনন্তের। কোথা গীত বাজে?
শব্দহীন কোন লোকে কোন উষা মাঝে?

কাহার লাগিয়া এ আকুলতা? কাহার লাগিয়া তাহার এ "অন্তহীন ক্রন্দন"? বুঝিতে দেরী হয় না যখন সমুদ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া কবিও বলিয়া উঠেন—

"দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি! কি মধু বিরহ দিয়া!"

সমধর্ম্মী কম্পনে কবিরও বন্ধনমুক্ত মনে আকুলতা আসে। ব্যাকুলভাবে তিনিও বলেন—

"প্রাণারাম। প্রাণারাম। তোমা পাই কি না পাই,
আমি ভেসে ভেসে উঠি, আমি ডুবে ডুবে যাই।"

ধরণীর সান্ত সাগর এইবার অনাদি অনন্ত এক মহাসাগরের দিকে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছে। তৃষ্ণার্ত্ত আকুল হৃদয় লইয়া কবি ভাবেন, ওপারে গেলে কি তাঁহার প্রার্থিত শান্তি মিলিবে?

"আমি যে তৃষিত বড়, ওগো মহাপ্রাণ।
আমি যে তৃষ্ণার্ত্ত আজি পরাণ মাঝারে।
আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ।
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপারে।
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন?
কাঙ্গাল পরাণ হবে রাজার মতন?"

শান্তির আশায় 'এপার' এবং 'ওপারের' চিন্তায় কূল না

পাইয়া সব চিন্তা ত্যাগ করিয়া কবি শেষে জীবন-দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণ করিতেছেন—

"এপার ওপার করি পারি না ত' আর
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই।…
হে মোর আজন্ম সখা, কাণ্ডারী আমার!
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!"

"আজন্মসখা" "কাণ্ডারীর" কানে কবির আকুল আবেদন পৌঁছিয়াছিল, তাই অকালে তিনি কবিকে তাঁহার "অপারে" টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। মহাসাগরের সহিত মহাস্রোতের মিলন ঘটিয়াছে।

দীর্ঘ দিন হইল তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অসীমকে সসীমের সহিত বাঁধিবার জন্ত যে গান তিনি গাহিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ইহার সুরে সুরে আমাদের প্রাণের সুর বাজে, ইহারে মৌন বেদনায় আমাদের হৃদয়ের ব্যথা ফোটে, ইহার তরঙ্গে তরঙ্গে দূর সাগরের হিমকরস্পর্শ আমাদের গায়ে আসিয়া লাগে। ধরণীর সাগরের অন্ত আছে,—ধরণী হইতে বহু উর্দ্ধে অন্তহীন যে মহাসাগর তাহারও মধুর গম্ভীর গান জলকলতান এই "সাগর সঙ্গীত"এর মধ্য দিয়া আমাদের কানে ভাসিয়া আসিতে থাকে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেন
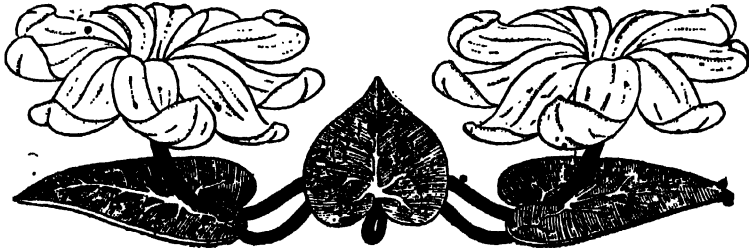
আজি বৃষ্টি হ'ল এইক্ষণ

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, বার্‌-এট-ল

আজ যদি বর্ষা নামে আজ যদি বর্ষা নামে
আজ যদি বর্ষা নামে মাঠে,
টুপ্‌টাপ্‌ টুপ্‌টাপ্‌ গৃহমাঝে চুপ্‌চাপ্‌
একেলা বাদলবেলা কাটে।
মেঘলা আকাশখানি অব্যক্ত নিস্তব্ধ বাণী
কলোচ্ছ্বাসে করিবে নিঃশেষ,
একা এই ছোট ঘরে বাহিরেতে জল ঝরে,
বাদল নামিলে হয় বেশ।

ঝরিবে কদম গাছে ঝরিবে কদম গাছে
ঝরিবে কদম গাছে জল;
নীপবন শিহরিয়া অশোকে আবেশ দিয়া
বকুল ঝরায়ে নামে ঢল!
ঝিকিমিকি লিচুপাতা কেবলি নাড়ায় মাথা
কেবলি গলিত স্নেহাশীষ,
নতুন আমের গুটি, করে শুধু লুটোপুটি,
জামের আগায় দোলে শিষ্‌!

হিজলের মরা ডালে হিজলের মরা ডালে
হিজলের মরা ডালে কাক,
ছুটি পক্ষ বিছাইয়া শাবকেরে আবরিয়া,
ভয়ে তার মুখে নাই ডাক।
ঝড় ওঠে সাঁই সাঁই, 'বুঝিবা নিস্তার নাই;
স্নেহমুগ্ধ নগণ্য বায়স!
ঘনঘটা বরিষায় আর্দ্র বায়ু বহে' যায়
মাতৃহৃদে অদম্য সাহস।

আজ যদি কাছে র'ত আজ যদি কাছে র'ত
আজ যদি কাছে র'ত হেম,
নিবিড় ভুরাহু দিয়া আদরে হৃদয়ে নিয়া
আকুল আবেগ জানাতেম।
যে কথা পায়নি ভাষা আজি ঝড় সর্ব্বনাশা
ভিতরকে করিত বাহির;
কেড়ে নিত কণ্ঠ হ'তে ঢালিত শ্রবণ পথে
চিরসুধা বাণী ধরণীর।

আঁধারিয়া এল ধরা আঁধারিয়া এল ধরা
আঁধারিয়া এল ধরাতল,
কলধ্বনি জলোচ্ছ্বাসে, তটিনী ছুটিছে ত্রাসে,
অবিরল ঝরিতেছে জল।
তীরে শ্যাম অরণ্যানী শিরে করাঘাত হানি'
ছিঁড়িতেছে শাখাপত্র রোষে—
ঘূর্ণীবায়ু ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়া চলেছে রুখে,
বিধ্বস্ত ধরণী শুধু ফোঁসে!

বুঝি বৃষ্টি থেমে এল বুঝি বৃষ্টি থেমে এল
বুঝি বৃষ্টি থেমে এল মাঠে,
বেতসের সরু পত্রে সপ্তপর্ণ শিরচ্ছত্রে
নবদূর্ব্বাদল শ্যাম বাটে।
মসৃণ চিক্কণ চারু ঘনকৃষ্ণ দেবদারু
সত্তস্নাত কান্তি বিমোহন।
আজি বৃষ্টি ঝরে গেল আজি বৃষ্টি ঝরে গেল,
আজি বৃষ্টি হ'ল এইক্ষণ।

বাংলা সাহিত্যে একশত ভালো বই

শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল্

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন গত ফাল্গুনের প্রবাসীতে বাংলা সাহিত্যে একশত খানি ভালো বইএর তালিকা প্রকাশিত করিয়া বাংলা সাহিত্য জগতে এক অভিনব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তৌলে মাপিয়া পুস্তকের সুনিশ্চিত মূল্য নির্ণয় করিয়া এই রকম এক স্থূল সীমাপরিবেষ্টিত তালিকা প্রকাশিত করা যে অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই রকম তালিকা বাহির না করাই ছিল সব দিক দিয়া ভালো। অনেকের মনে তিনি দুঃখ দিয়াছেন, ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছেন, আবার অনেকের মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছেন। যাহাতে অনেকের বিরাগভাজন হইতে হয়, সে-রকম কাজে হাত না দেওয়াই ভালো। অবশ্য, সে-দিক দিয়া আমি এই প্রবন্ধে কিছু বলিব না।

তাঁহার তালিকা দেখিয়া দুইটি বিষয়ে আমি অবাক্ হতবাক্ হইয়াছি। প্রথমতঃ, এমন অনেক প্রসিদ্ধ মূল্যবান গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে আছে বলিয়া আমার মনে হয় যাহার স্থান তিনি তালিকায় দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তালিকায় এমন সব বইএর স্থান হইয়াছে যাহাদের কোন দিক দিয়া কোন মূল্যই ও সাহিত্যপ্রতিষ্ঠা নাই। বাংলা ভাষায় ভালো বইএর কেমন খবর তিনি রাখেন জানি না; কোথায় কোন্ অখ্যাতনাম লেখক পাঁচদিনে কি উপন্যাস লিখিয়াছেন, সাতদিনে কি প্রবন্ধ পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নাম তালিকায় উঠিল, অথচ যে সব অক্লান্তকর্ম্মী সাহিত্যসেবী বহু বৎসর ধরিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, বহু দিক দিয়া নানা উপকরণ ও আনুষঙ্গিক মালমশলা সংগ্রহ করিয়া যে সব অমূল্য রত্নরাজি বাংলা ভাষায় দান করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন সন্ধানই তিনি লন্ নাই। অনেক ভালো বইএর নাম তিনি বাদ দিয়াছেন। আমি শুধু একখানি গ্রন্থের নাম করিব। আমার নিজের একটি লাইব্রেরী আছে, তাহাতে বাংলা, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনেক অনেক ভালো ভালো পুস্তকই আছে, সেই সব বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রন্থের পাশেও এই বইখানিকে কোন অংশে নিষ্প্রভ স্তিমিতাভ দেখায় না। এই বইখানিকে দেখিলে মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের একটি অমর অক্ষয় অবদান, একটি অপরিম্লান chef-d'œuvre। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' বইখানির কথাই আমি বলিতেছি। এমন একখানি সুন্দর বই তাঁহার তালিকায় স্থান পায় নাই। তারপর, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারত', কাশীরামদাসের 'মহাভারত,' কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'—এই সব বইগুলির কি কোন মূল্য নাই? ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া নাই বা ধরিলাম, কাব্য হিসাবেও কি এগুলি তালিকাতে উঠিতে পারে না? 'স্বর্ণলতা'র মত উপন্যাস, 'শ্রীশ্রীরাজ-লক্ষ্মী'র মত উপন্যাস, 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' এর মত বই বাংলা ভাষায় কয়খানা আছে? যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বঙ্গের মহিলা কবি' বইখানি বহুদিনের পরিশ্রমের ফল; এই বইখানি প্রকাশিত না হইলে অনেক মহিলা কবিদের নাম পর্য্যন্ত আমরা শুনিতাম না; এমন সরল, সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থখানিকেও তিনি লক্ষ্যের মধ্যে আনেন নাই। কবিদের মধ্যে তিনি করুণানিধানকে কোন আমলই দেন নাই; অথচ নিছক রূপের বর্ণনায় বাংলার কোন্ কবি তাঁহার সমকক্ষ? যে স্বভাবকবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসের কবিতা পড়িতে পড়িতে চোখের জল রাখিতে পারা যায় না, যাঁহার

> 'প্রেমদা' পদ্মার কূলে, কোমল শেফালী-ফুলে,
> করিয়া বাসর-শয্যা ডাকিছে আমায়,
> 'সারদা' চিলাই-তীরে, আম-কাঠ দিয়ে-ঘিরে,
> আঁচল বিছায়ে কাকে চিতা-বিছানায়!

বুকের মধ্যে রুদ্ধশ্বাস মেঘের সমারোহ জমাইয়া তোলে, বুকের পাঁজরের মধ্যে বেদনা-মুখর, বিরহ-ফেনিল অশ্রুর বান ডাকায়, সেই সত্যিকারের কবি গোবিন্দদাসকেও তিনি তাঁহার তালিকা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। কাজী নজরুল, মোহিতলালও কি নূতন কিছুই বাংলা কাব্য সাহিত্যে দান করেন নাই?

ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঁহাদের কোন উপন্যাসই কি তালিকায় স্থান পাইবার যোগ্য নহে? অথচ, এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কয় জন লেখকের আছে? আমার তো মনে হয়, নরেশচন্দ্র একজন বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী লেখক। তারপর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস। * * * * ছেলেদের বইএর মধ্যে 'আবোল-তাবোল' এর নাম করিয়াছেন, অথচ 'জীবজন্তু'র মত একখানি বইএর তিনি নাম করেন নাই।

তারপর আধুনিক সাহিত্যিকদের এতটুকু আমল তিনি দেন নাই। জগদীশ গুপ্তের 'মহিষী' ও শৈলজা মুখোপাধ্যায়ের 'ঝড়ো-হাওয়া'র নাম তিনি করিয়াছেন, অথচ যে বইগুলি শৈলজা বাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাদের কোন খোঁজই তিনি লন নাই। আর সব আধুনিক সাহিত্যিকদের কি দোষ তাহা বুঝিলাম না। হয় তো তাঁহারা বড় বেশী আধুনিক, বড় বেশী দুঃসাহসী, হয় তো বড় বেশী অশ্লীল। অশ্লীল বলিতে তিনি কি বোঝেন, জানি না। এ সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখা যায়। অশ্লীলতা যদি artistic setting-এর পরিবেশের মধ্যে ও 'সত্যম্ শিবম্‌সুন্দরম্'-এর পটভূমিতে তাহার রূপ উদ্ঘাটন করে, তাহা হইলে তাহা অশ্লীল নহে। Swinburneএর 'Poems and 'Ballas'd (প্রথম খণ্ড), Paul Verlaine, Baudelaire, Whitmanএর অনেক কবিতাই তো নিতান্ত অশ্লীল, কিন্তু অমন সুন্দর সুসমৃদ্ধ কবিতা কাব্য-জগতে কয়টা আছে। বাইবেলের 'Song of Songs'এর মত বই আর নাই, কিন্তু তাহাও তো কম অশ্লীল নয়? সূক্ষ্ম যৌনপ্রবৃত্তি ও লালসার বহু-বর্ণায়মান চিত্র লইয়া অনেক বিখ্যাত উপন্যাসই তো লেখা হইয়াছে, তাহাদের লেখকেরা তো অনেকেই নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। Maupassant, Sigrid Undset, Knut Hamsunএর অনেক বই তো চূড়ান্ত অশ্লীল। এঁরা তবু পদে আছেন, কিন্তু W. L. Georgeএর 'Second Blooming,' Theodore Dreiserএর 'Sister Carrie', Floyd Dellএর 'Janet March', James Joyceএর 'Ulysses', D. H. Lawrence এর 'The Rainbow,' 'Women in Love,' James Branch Cabellএর 'Jurgen'—এসব বইগুলির কথা আমরা কল্পনা করিতেও পারিব না। সে-সব বিশদীকৃত বহুবিবৃত নগ্নচিত্র পড়িতে পড়িতে প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। অথচ ও-রকম শক্তিপূর্ণ পরম সুন্দর লেখা পৃথিবীর কোন যুগে সম্ভবপর হইয়াছে? ধরুন Tennysonএর বিখ্যাত Godiva কবিতাটি। অমন অশ্লীল বিষয় যে কবিতায়—সুন্দরী তরুণী সম্পূর্ণ বিবসনা হইয়া রাস্তায় ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতেছে—তাও কবি কি সুন্দর নিষ্কলঙ্ক ভাবে আঁকিয়াছেন! লেখার মধ্যে এতটুকু আবিলতার আমেজ পাওয়া যায় না। কবিতাটি পড়িয়া আমরা বলি সুন্দর। কিন্তু রোসেটি বা সুইনবার্ণ যদি কবিতাটি লিখিতেন, তাহা হইলে কবিতাটি হইয়া উঠিত নিতান্ত অশ্লীল, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহা যে সুন্দরতর, অনন্যসাধারণ ও পরিপূর্ণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুইনবার্ণ যদি লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রত্যেক অপূর্ব্ব সুন্দর, মন্থর-ঘন লাইনের মধ্যে পাইতাম স্পর্শ-সহিষ্ণু স্থূল শারীরিক স্পর্শ। তাই বলিতেছি, যাহা সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্য-সমারোহে আবৃত তাহা কখনই অশ্লীল নহে।

এই তালিকায় এমন অনেক লেখকদের নাম দিতে পারিলাম না যাঁহারা অনেক কিছু লিখিলেও এমন কিছুই লেখেন নাই যাহার কোন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা আছে বা ভবিষ্যতে থাকিতে পারে। Victor Hugo বলিয়াছেন 'Prolificity is a sign of genius'; কথাটা খুবই সত্য, কিন্তু এই সব লেখকদের প্রতিভা থাকিলেও, কালের নিকষমণিতে ইঁহাদের লেখা টিকিবে কি না সন্দেহ। বিহারীলালের কবিতা ও দ্বিজেন্দ্র

নাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি স্পষ্টধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের লেখার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা সত্যিকারের আনন্দ দিতে পারে।

পরিশেষে আমার বিনীত বক্তব্য এই যে, হয় তো অনেকেরই কাছে এ তালিকা মনঃপূত হইবে না, কিন্তু এই তালিকা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ দোষবর্জ্জিত ও ভ্রমলেশহীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের মত আমিও বলিতেছি যে ইহা পুস্তক বিশেষের বিজ্ঞাপন নহে।

এক শত বইয়ের তালিকা

লেখক		বই
অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত ...	১।	প্রচ্ছদ পট (উ)
অন্নদাশঙ্কর রায় ...	২।	যার যেথা দেশ (উ)
অতুল প্রসাদ সেন ...	৩।	গীতিগুঞ্জ (কা)
অনুরূপা দেবী ...	৪।	পোষ্যপুত্র (উ)
...	৫।	মন্ত্রশক্তি (উ)
অক্ষয় কুমার বড়াল ...	৬।	এষা (কা)
অমৃতলাল বসু ...	৭।	চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে (না)
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৮।	দিকশূল (উ)
	৯।	শশিনাথ (উ)
	১০।	অন্তরাগ (উ)
কামিনী রায় ...	১১।	জীবন পথে (কা)
কালিদাস রায় ...	১২।	পর্ণপুট (কা)
কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৩।	আমরা কি ও কে?
কাশীরাম দাস ...	১৪।	মহাভারত (কা)
কৃত্তিবাস দাস ...	১৫।	রামায়ণ (কা)
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৬।	শতনরী (কা)
কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত ...	১৭।	সাবিত্রী (গ)
কাজি নজরুল ইস্লাম ...	১৮।	অগ্নিবীণা (কা)
কুলদারঞ্জন রায় ...	১৯।	আশ্চর্য্য দ্বীপ (উ)
কেদারনাথ মজুমদার ...	২০।	রামায়ণের সমাজ (প্র)
কালীপ্রসন্ন সিংহ ...	২১।	মহাভারত
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ...	২২।	সারিন্ (গ)
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ...	২৩।	প্রফুল্ল (না)
	২৪।	বলিদান (না)
গোবিন্দচন্দ্র দাস ...	২৫।	কস্তুরী (কা)
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৬।	সওগাত (গ)
জলধর সেন ...	২৭।	হিমালয় (প্র)
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ...	২৮।	বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (প্র)
জগদানন্দ রায় ...	২৯।	পোকা-মাকড় (প্র)
জসীম উদ্দীন ...	৩০।	নক্সী কাঁথার মাঠ (কা)
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৩১।	স্বর্ণলতা (উ)
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়...	৩২।	কঙ্কাবতী
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ...	৩৩।	সাজাহান (না)
	৩৪।	দুর্গাদাস (না)
	৩৫।	হাসির গান (কা)
দীনবন্ধু মিত্র ...	৩৬।	সধবার একাদশী (না)
দীনেশচন্দ্র সেন ...	৩৭।	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্র)
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ...	১৮।	জীবজন্তু (প্র)
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৩৯।	ঠাকুরমার ঝুলি (গ)
দুর্গাচরণ রায় ...	৪০।	দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন (উ)
দেবেন্দ্রনাথ সেন ...	৪১।	অশোকগুচ্ছ (কা)
ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ...	৪২।	আমরা ও তাঁহারা (প্র)
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৪৩।	ব্রজনাথের বিবাহ (উ)
নবীনচন্দ্র সেন ...	৪৪।	পলাশীর যুদ্ধ (কা)
নিরুপমা দেবী ...	৪৫।	অন্নপূর্ণার মন্দির (উ)
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ...	৪৬।	তৃপ্তি (উ)
	৪৭।	বিপর্য্যয় (উ)
	৪৮।	সর্ব্বহারা (উ)
নরেন্দ্র দেব ..	৪৯।	ওমর খৈয়াম (কা)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৫০।	ষোড়শী (গ)
	৫১।	দেশী ও বিলাতী (প্র)

লেখক		বই
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৫২।	নবীন সন্ন্যাসী (উ)
প্রমথ চৌধুরী ...	৫৩।	চার ইয়ারী কথা (প্র)
প্রেমেন্দ্র মিত্র ...	৫৪।	উপনায়ন (উ)
প্রবোধচন্দ্র সান্যাল ...	৫৫।	মহাপ্রস্থানের পথে (প্র)
বিনয়কুমার সরকার ...	৫৬।	বর্ত্তমান জগৎ (প্র)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৫৭।	বিষবৃক্ষ (উ)
	৫৮।	কপালকুণ্ডলা (উ)
	৫৯।	কৃষ্ণকান্তের উইল (উ)
	৬০।	চন্দ্রশেখর (উ)
বিপিনবিহারী গুপ্ত ...	৬১।	পুরাতন প্রসঙ্গ (প্র)
বিবেকানন্দ ...	৬২।	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (প্র)
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৩।	সংবাদ পত্রে সেকালের কথা (প্র)
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৪।	অপরাজিত (উ)
	৬৫।	পথের পাঁচালী (উ)
বুদ্ধদেব বসু ...	৬৬।	বন্দীর বন্দনা (কা)
শ্রীম— ...	৬৭।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (প্র)
মণীন্দ্রলাল বসু ...	৬৮।	রমলা (উ)
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ...	৬৯।	মেঘনাদবধ কাব্য (প্র)
মোহিতলাল মজুমদার ...	৭০।	স্বপন পসারী (কা)
মনোজ বসু ...	৭১।	বন-মর্ম্মর (গ)
যোগীন্দ্রনাথ বসু ...	৭২।	মাইকেল জীবনী
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ...	৭৩।	সমসাময়িক ভারত (প্র)
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ...	৭৪।	শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (উ)
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৭৫।	বঙ্গের মহিলা কবি (প্র)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৬।	নৌকাডুবি (উ)
	৭৭।	গোরা (উ)
	৭৮।	গল্পগুচ্ছ (গ)
	৭৯।	বলাকা (কা)
	৮০।	পূরবী (কা)
	৮১।	কথা ও কাহিনী (কা)
	৮২।	সোনার তরী (কা)
	৮৩।	চিত্রা (কা)
	৮৪।	শিশু (কা)
রজনীকান্ত সেন ...	৮৫।	বাণী (কা)
রাজশেখর বসু ...	৮৬।	গড্ডলিকা (গ)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৮৭।	চরিত্রহীন (উ)
	৮৮।	বিন্দুর ছেলে (গ)
	৮৯।	শ্রীকান্ত (উ)
	৯০।	দেবদাস (উ)
	৯১।	পল্লীসমাজ (উ)
	৯২।	বিরাজ-বৌ (উ)
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৯৩।	নারীমেধ (গ)
	৯৪।	বধূবরণ (গ)
সীতা দেবী ...	৯৫।	পরভৃতিকা (উ)
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৯৬।	অভ্র আবীর (কা)
	৯৭।	বেলাশেষের গান (ক)
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৮।	চিত্রবহা (উ)
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৯৯।	কাজরী (উ)
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১০০।	কবিতাবলী (ক)

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভারতের সাধারণ ভাষা

হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োবিংশ অধিবেশনের সভাপতি রূপে বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড় হিন্দীকে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে চালাইবার পক্ষে ওকালতি করিতে যাইয়া যতটা আবেগ ও অধীরতার পরিচয় দিয়াছেন, যুক্তি অথবা তথ্যের আশ্রয় ততটা গ্রহণ করেন নাই। হিন্দীর পক্ষে এই প্রকার প্রচার নানা উপলক্ষে আমরা অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি।

ভারতবর্ষ খুব বড় দেশ, এখানে অনেক ভাষা প্রচলিত। ভারতের আয়তন ১,৮০০,০০০ বর্গ মাইল, এবং '৩১ সালের গণনা অনুসারে ২২৫টি স্বতন্ত্র ভাষা এখানে কথিত হয়। যে দেশে ৩৫৩,০০০,০০০ লোক বাস করে, সে দেশে ভাষার সংখ্যা বেশী হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। সমগ্র ইউরোপের জনসংখ্যা ৪৭৫,০০৫,০০০ এবং আমেরিকার জন সংখ্যা ১২৩,০০০,০০০। তাহা হইলেও ভারতের এই সকল ভাষার অত্যন্ত বেশীর ভাগ, খুব অল্প লোকের দ্বারাই ব্যবহৃত হয়, এবং ভারতের অধিকাংশ লোক বাংলা, হিন্দী, মারাঠি, ওড়িয়া, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি কোন না কোন প্রধান ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন। এই সকল ভাষার সাহিত্যিক বিষয়বস্তু ও ভাবধারা প্রধানতঃ সংস্কৃত হইতে গৃহীত বলিয়া এবং এই সকল ভাষাভাষী লোকদের আচার, ধর্ম্ম, রীতিনীতি প্রভৃতিতে মিল থাকায় সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্যের ধারা বরাবর রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু, সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাষ্ট্রিকতা, অথবা সকল ধর্ম্মের, সকল প্রদেশের এবং সকল ভাষাভাষী ভারতীয়দের লইয়া একজাতি গঠনের কল্পনা, সম্পূর্ণ আধুনিক কালের। ইংরেজ শাসন ও ইংরাজী সাহিত্য প্রত্যক্ষ ভাবে এবং এই পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের প্রভাব পরোক্ষ ভাবে আমাদের এই ইচ্ছাকে গড়িয়া তুলিয়াছে ও পুষ্ট করিয়াছে।

সমগ্র ভারতের মধ্যে পূর্ব্বে ঐক্য থাকিলেও, বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। কাজেই ইহা কতকটা শিথিল ছিল এবং রাষ্ট্রীয় বা অন্য প্রয়োজনে প্রযুক্ত হইবার মত উপযোগিতা ইহার ছিল না। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আমাদের ঐক্যের শক্তিকে যখনই প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইল, তখনই আমাদের নেতারা দেখিলেন, আমাদের পরস্পরের দৃঢ়ভাবে মিলিত হইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা হইতেছে—আমাদের বহু ভাষা। প্রথমে অবশ্য ইংরাজীর সাহায্যেই কাজ চলিয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত তাহাই চলিতেছে। কিন্তু, রাষ্ট্রিক আন্দোলনে জনসাধারণের যোগ যত ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল, ততই ইংরাজীর জন্য অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু, এই অসুবিধা অপেক্ষা আমাদের ক্রমবর্দ্ধিত জাতীয় অভিমান, ভিন্নদেশীয় ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য্য মনে করিতে বিশেষ ভাবে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। এই জন্য সকলের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, এমন একটি ভারতীয় ভাষা বাছিয়া লইবার চেষ্টা রাষ্ট্রিক আন্দোলনের মধ্যেই জন্মলাভ করিল।

সকল রাজনীতিক নেতাই একবাক্যে হিন্দীর পক্ষে রায় দিলেন; বাঙ্গালী নেতারাও ইহাতে সায় দিলেন। কিন্তু, মহাত্মাজীর প্রভাবকে পক্ষে পাইয়াই হিন্দী বর্ত্তমানে এতটা শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, সকল প্রদেশের রাজনীতিক এবং অরাজনীতিক সকল প্রকার লোকেই হিন্দীর দাবী অবিসংবাদী বলিয়া মনে করেন। অন্য কোন ভাষার অনুরূপ দাবী বা এতদপেক্ষা বেশী দাবী আছে কিনা, তাহা তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

কয়েকটি কারণের সমবায়ে হিন্দীর এই অসাধারণ গৌরব ও সুযোগ লাভের সুবিধা ঘটিল। মহাত্মার উপর এবং মহাত্মার সময়ে কংগ্রেসের উপর হিন্দীভাষী নেতাদের অপ্রতিহত প্রভাব যে হিন্দীকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাত্মার নিজের মাতৃভাষা গুজরাটীর সকল ভারতের সাধারণ ভাষা হইবার সম্ভাবনা কোন দিক দিয়া কোন প্রকারেই ছিল না। কাজেই, এ সময়কার সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী নেতাদের অধিকাংশের মাতৃভাষা এবং গুজরাটীর প্রতিবাসী ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ভাষা হিন্দীর উপর স্বভাবতঃই তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকে হিন্দী বলে এবং হিন্দী বুঝে এই কথা বলা হইল। এসময়ে বাংলার নেতারা বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে পারিতেন। ইহা না করায় মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের যে সহজ কর্ত্তব্য ছিল, তাহা অবহেলা করা হইয়াছে। তাঁহারা ইহা সহজেই প্রমাণ করিতে পারিতেন যে, হিন্দীভাষীর সংখ্যা যত অধিক বলিয়া ধরা হয় ইহার প্রকৃত সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক কম এবং বাংলাভাষীদের অপেক্ষাও কিছু কম। পূর্ব্ব এবং পশ্চিমী হিন্দীর মধ্যে এতটা ব্যবধান যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাষাই বলা সঙ্গত। বিহারীকে হিন্দীর অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয় এবং বিহারীরাও হিন্দীভাষা ও সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে বিহারী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা এবং হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সহিতই ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। হিন্দীভাষী মুসলমানেরা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা উর্দ্দু নামে অভিহিত হয়। হিন্দীর সহিত ইহার পার্থক্য এত বেশী যে, হিন্দী শিখিয়া কেহ সহসা উর্দ্দু বুঝিতে সমর্থ হইবেন না।

হিন্দী হইতে বিহারীদিগকে বাদ দিলে, পূর্ব্ব হিন্দী পশ্চিমী হিন্দী এবং উর্দ্দুর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিলে এবং অন্যপক্ষে সমগ্র বঙ্গভাষীদের ভাষাগত ঐক্যের কথা, এবং আসামী, ওড়িয়া ও বিহারীর সহিত বাংলাভাষার নিকট সম্পর্কের কথা বিবেচনা করিলে, সংখ্যার শক্তিও যে বাংলার পক্ষে থাকিত তাহা বঙ্গীয় নেতারা দেখাইতে পারিতেন।*

হিন্দীকে ভারতের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার অন্যতম কারণ ইহাই হইতে পারে যে, সাধারণ ভাষাটিকে যাহাতে মুসলমানেরা মানিয়া লইতে পারেন, তাহারও প্রয়োজন ছিল এবং হিন্দী ও উর্দ্দু একভাষা (যদিও তাহা সত্য নহে) এই কথা বলিয়া হিন্দীর পক্ষে তাঁহাদের সমর্থন পাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু, বাঙ্গালী নেতারা দেখাইতে পারিতেন যে উর্দ্দুভাষী অপেক্ষা বাংলা-ভাষী মুসলমানের সংখ্যা অধিক।

সাধারণ ভাষা নির্ব্বাচনের সময়, ভারতীয় প্রধান ভাষা-গুলির মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষ কোনটির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাও বিবেচনা করা যাইত এবং তাহাতে বাংলার জয়লাভ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

বাংলার দাবীর কথা অন্যান্য প্রদেশবাসীদের স্মরণ না হইবার অন্য কারণ এই হইতে পারে যে, বাংলা ভাষীদের সংখ্যা অধিক হইলেও, ইঁহারা প্রধানতঃ বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। অন্যান্য প্রদেশবাসীদের বাংলা ভাষার সংস্রবে আসিবার অধিক সুযোগ ঘটে নাই। যে সকল বাঙ্গালী সাধারণতঃ অন্যান্য প্রদেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষিত লোক বলিয়া, ইংরাজীর সাহায্যেই কাজ কর্ম্ম চালাইয়াছেন অথবা সহজেই নিজেদের কর্ম্মভূমির ভাষা শিখিয়া লইয়াছেন।

অন্যপক্ষে হিন্দীভাষী লোকেরা বিপুল উদ্যমের সহিত তুচ্ছতম হইতে বৃহত্তম সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা সূত্রে, শ্রমসাধ্য, কষ্টসাধ্য, সাহস-সাপেক্ষ নানাপ্রকার কার্য্যে ভারতের সকল প্রদেশে বহুসংখ্যায় ছড়াইয়া পড়েন। পুলিশ ও সৈন্য বিভাগের সাহায্যেও হিন্দীভাষী লোকেরা ভারতের নানা প্রদেশে যাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। ইঁহারা কখনও নিজ মাতৃভাষা পরিত্যাগ করেন নাই; কাজেই, অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যাতীত লোককে হিন্দীভাষার সংস্পর্শে

* ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা বিচিত্রায় 'বঙ্গভাষা প্রচলন' শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথা লেখক কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আসিতে হইয়াছে, প্রত্যেক প্রদেশের লোকের মনে ক্রমে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, অন্য প্রদেশবাসীদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে হইলে, হিন্দীই শিক্ষা করিতে হইবে। হিন্দীকে বহু লোকের ভাষা মনে করিবার আর একটা কারণ এই হইতে পারে যে, অহিন্দীভাষীরা হিন্দীভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য উত্তর ভারতের সকল ভাষাকেই হিন্দী মনে করিয়া থাকেন। হিন্দীর সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে, এমন অন্যান্য ভাষাকেও হিন্দী মনে করিয়া থাকেন।

উর্দ্দু সারা ভারতের মুসলমানদের সংস্কৃতির ভাষা বলিয়া গৃহীত হয়, এবং সকল প্রদেশের মুসলমানেরাই ইহা শিখিবার চেষ্টা করেন। হিন্দীর সহিত ইহার সাদৃশ্য খুব নিকট বলিয়া, ইহাও হিন্দীর বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য হিন্দীভাষী লোকদের হাতে থাকায়, অভারতীয় বণিকেরাও ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দীই শিক্ষা করেন। যে সকল অভারতীয় বণিক বা রাজকর্ম্মচারী এদেশে বাস করেন, তাঁহারা এবং সকল প্রদেশের ভারতীয় ধনী লোকেরাও প্রধানতঃ হিন্দীভাষী লোকদের মধ্য হইতেই ঝি, চাকর, দারোয়ান প্রভৃতি শ্রেণীর লোক সংগ্রহ করেন। ইহার মধ্য দিয়াও হিন্দীভাষা ভারতের সকল প্রদেশে ছড়াইয়াছে এবং ভিন্ন-প্রদেশীয় ভারতীয়দের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে হইলে হিন্দী ব্যবহার করিতে হইবে লোকের মনে ক্রমে এই ধারণা জন্মিয়াছে। এইরূপে ধীর ও দৃঢ়ভাবে হিন্দী ভাষা সকল প্রদেশেই স্থান করিয়া লইয়াছে এবং ইহার সর্ব্বজনগ্রাহ্যতা সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে, সেকথা সহসা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু, আলোচ্য ব্যাপারে হিন্দীর পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া মহারাজা গাইকোয়াড় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বাঙ্গালীদের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন এবং বহু বর্ষের চেষ্টায় উপহাস্য "বাবু ইংরাজী" শিক্ষার পরিবর্ত্তে কয়েকদিনের মধ্যে হিন্দী শিক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অনেক লাভের এই সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কোন প্রদেশের কোন শ্রেণীর লোকই যে বাঙ্গালীদের আক্রমণ করিবার কোন সুযোগই (অনুযোগকেও সুযোগে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া) বাদ দেন না, ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরব বোধ করিতে পারেন। তাঁহাদের 'বাবু ইংরাজী' সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, কোন জাতির বহু লোককে যখন কোন বিদেশী ভাষা শিখিতে এবং ব্যবহার করিতে বাধ্য করা যায়, তখন তাহাদের দ্বারা কতকটা হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নহে। প্রথম ইংরাজী শিখিতে অগ্রণী হওয়াতেই বাঙ্গালীরা এইরূপ উপহাসের পাত্র হইয়াছিলেন। একদিন যাহা মাত্র বাঙ্গালীর পক্ষে সত্য ছিল, এখন তাহা সকল প্রদেশের লোকের পক্ষেই সত্য।

আর বাঙ্গালীদের পক্ষে হিন্দী শিক্ষা করা যতটা সহজ, হিন্দীভাষীদের পক্ষেও বাংলা শিক্ষা করা ততটা সহজ, এবং বাংলার অধিকতর সমৃদ্ধিশালী সাহিত্যের জন্য, বাঙ্গালীদের হিন্দী শিক্ষা করা অপেক্ষা তাঁহাদের বাংলা শিক্ষা করা অধিকতর লাভের হইবে। সাধারণ ভাবে অহিন্দীভাষী এবং অবাংলাভাষী লোকদের পক্ষে হিন্দী ও বাংলা শিক্ষা করা সমানই সহজ অথবা সমানই কঠিন এবং কতকগুলি লোকের পক্ষে হিন্দী শিক্ষা করা যেমন কতকটা সহজ, আসামী, উড়িয়া এবং বিহারীদের পক্ষে বাংলা শিক্ষা করা তেমনই অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সকলের পক্ষেই বাংলা শিক্ষা করা অধিকতর লাভের।

যাঁহারা ভাষার মধ্য দিয়া সারা ভারতবর্ষের ঐক্য চান, তাঁহারা একীভূত ভারতবর্ষকে দেখিবার আগ্রহে এই সহজ কথাটা ভুলিয়া যান যে, সকল প্রদেশের সকল ভাষাভাষী লোকদের প্রত্যেকের মহত্তম বিকাশেই আমাদের লাভ এবং তাহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই বিকাশ প্রত্যেকের মাতৃভাষায় উন্নতির এবং তাহার মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীত সম্ভব নহে। কোন এক প্রদেশের ভাষা সকলের উপর চাপাইয়া দিলেই আমাদের সকল উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না।

কোন একজন অবাঙ্গালী নাকি একবার বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের মত লোককে চাননা, কেননা তিনি প্রাদেশিক ভাষাকে পুষ্ট করিয়া ভারতের আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাকে বাড়াইয়া দিয়াছেন। কোন বৃহৎ জিনিসের সুপুষ্ট বিভিন্ন অংশ সমূহের যে স্বাভাবিক সংযোগ তাহাই তাহার শক্তি বিধান করে; কিন্তু একের অতি-প্রাধান্যের

মধ্যে সকলের আত্মবিলোপ শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের হ্রাসই ঘটায়।

ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা কোন ভারতীয় ভাষা হওয়া উচিত কি না

সংখ্যা দেখিয়াই হউক অথবা সাহিত্যিক উৎকর্ষ দেখিয়াই হউক, কোন ভারতীয় ভাষাকেই, রাষ্ট্রে এবং অন্যত্র সাধারণ ভাষার স্থান দান করা উচিত কিনা, তাহাও বিশেষ ভাবে বিচার্য্য।

বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যাইতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনের গতি এবং উন্নতি প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে এই প্রতিযোগিতাও বাড়িয়া যাইবে। ইহার পশ্চাতে কোন প্রকার বিদ্বেষ না থাকিলে, এই প্রতিযোগিতার ভাব ক্ষতির কারণ না হইয়া, আমাদের উদ্যম ও সচেষ্টতা বাড়াইয়া দিবে।

কিন্তু, সকল প্রদেশের লোকেই যাহাতে সমান সুযোগ প্রাপ্ত হইতে পারেন, কেহ কাহারও উপর কোন অন্যায় সুযোগ না লইতে পারেন, সকলের প্রতি ন্যায় ও সুবিচারের জন্য তাহার ব্যবস্থা রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে। ভারতবর্ষের কোন এক প্রদেশের ভাষাকে যদি রাষ্ট্রিক ভাষা করা হয়, তাহা হইলে সেই প্রদেশের লোকেরা সহজেই অন্য প্রদেশের লোকেদের উপর কতকটা সুবিধা লইতে পারিবেন। প্রথমতঃ ইঁহাদিগকে নিজেদের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা শিক্ষা না করিলেও চলিবে এবং এই জন্য অন্যান্য প্রদেশের লোকদের অপেক্ষা শিক্ষায় তাঁহাদের কম সময়ও উৎসাহ ব্যয় করিতে হইবে। বক্তৃতা, তর্ক, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রভৃতিতে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত সুবিধা হইবে। তদ্ব্যতীত নিজেদের ভাষা রাষ্ট্রিক ভাষা বলিয়া অন্যান্য প্রদেশের ভাষাও সাহিত্যকে কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখা, ইঁহাদের পক্ষে কতকটা স্বাভাবিক হইবে। সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি কৃত্রিম সাধারণ ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা সেইজন্য অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

Esperanto, Volapuk প্রভৃতি ভাষা সৃষ্টির কার্য্য এই প্রকার প্রয়োজন ও চেষ্টার ফলে কতক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা বর্ত্তমানে পৃথিবীর সাধারণ ভাষার কার্য্য যদিও কতক পরিমাণে চালাইয়া দিতেছে, তাহা হইলেও ইহাতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির লোকেরা সন্তুষ্ট নহেন।

নিজের মাতৃভাষা নহে, এমন যে কোন ভাষা শিক্ষা করা এবং নিজের মাতৃভাষার ন্যায় তাহা আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। অতি অল্প সংখ্যক লোকের পক্ষেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। এই ভাষা আবার যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের সহিত এই ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায়ই যদি প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহা হইলে বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হিন্দী হইলে, অহিন্দী-ভাষীদিগকে এই সকল অসুবিধায় পতিত হইতে হইবে। নিজেদের মাতৃভাষা ব্যতীত হিন্দী শিক্ষা করিতে হইবে বলিয়া, শিক্ষার জন্যও অন্যান্য প্রদেশবাসীদের অধিক সময় ও উদ্যম ব্যয় করিতে হইবে।

অন্যদিকে আবার বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার জন্য কতক লোককে বাধ্য হইয়া ইংরাজী শিখিতে হইবে। ভারত সরকারেরও বাহিরের সহিত সম্পর্ক রাখিতে হইবে এবং তাহার জন্য ইংরাজী রাখিতে হইবে। এই সকল বিভাগে যে সকল অহিন্দীভাষী চাকরি করিবেন, তাঁহাদিগকে, নিজেদের মাতৃভাষা, হিন্দী এবং ইংরাজী, তিনটিই ভাল ভাবে শিখিতে হইবে।

অথচ, যদি প্রাদেশিক সকল কাজে প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহৃত হয়, এবং নিখিল ভারতীয় ব্যাপার সমূহে ইংরাজীর ব্যবহার হয়, তাহা হইলে এই সকল অসুবিধা কিছুই থাকে না। ইহাতে কেহ কাহারও উপর অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না, অথবা কেহ অন্যায় ভাবে কোন ন্যায়-সঙ্গত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন না, বহির্জগতের সহিত আমাদের সম্পর্ক অটুট থাকিবে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যেও যোগাযোগ নষ্ট হইবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা এখনও অবতীর্ণ হই নাই, কাজেই, অন্যান্য জাতির ন্যায়, কোন বিশেষ জাতির

ভাষাকে গ্রহণ করায় আমাদের কোন ক্ষতি বা ক্ষোভের কারণ থাকিবে না।

কাহারও প্রতি কোন অবিচার না করিয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগের এই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যে, কোন বিশেষ ভাষার উপর নির্ভর না করিয়া, আমাদের শিক্ষার কোন একটা স্তরে ছাত্রকে নিজের মাতৃ-ভাষা ব্যতীত অন্য কোন একটি প্রধান ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। একজন বাঙ্গালীর পক্ষে কাজ চালাইবার মত হিন্দুস্থানী বা মারাঠি শিক্ষা বা একজন হিন্দুস্থানীর পক্ষে বাংলা বা উড়িয়া শিক্ষা করা খুব কষ্টসাধ্য নহে। নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া ইহার কোনটির মধ্যবর্ত্তিতা গ্রহণ করিতে হইবে না বলিয়া কেহ কোন অসুবিধায় পতিত হইবেন না। ইহাতে সমগ্র ভারতের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইবে অথচ কাহারও কোন অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রে ঘরোয়া ব্যাপারে প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহৃত হইলে, কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কিত ব্যাপার সমূহে ইংরাজী ব্যবহৃত হইলে, এবং ভারত সরকার বর্ত্তমানের ন্যায় শুধুমাত্র ইংরাজী ব্যবহার করিলে, সাধারণ লোকের পক্ষে নিজ মাতৃভাষা শিক্ষা করিলেই চলিতে পারিবে এবং যে সকল বিভাগে ইংরাজীর জ্ঞান প্রয়োজন, সেখানে যাঁহারা চাকরি করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা তাহার জন্য বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অবশ্য যাঁহারা উচ্চ শিক্ষালাভ করিবেন, প্রতিভা অথবা কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম হইবেন, তাঁহাদের জন্য ইংরাজী অথবা অন্য বিদেশী ভাষা শিক্ষার এবং শিক্ষার মধ্যস্তরে নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা কি প্রকারে রাখিতে হইবে, তাহা নির্ণয়ের জন্য, অনুসন্ধান, বিবেচনা এবং বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্য ও পরামর্শ প্রয়োজন হইবে।

ভারতের সকল প্রদেশের জন্য সাধারণ অক্ষর

মহারাজা গাইকোয়াড় সকল ভারতবর্ষের জন্য এক সাধারণ বর্ণমালার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলিয়াছেন এবং দেবনাগরী অক্ষরকেই এই উদ্দেশ্যের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া মত দিয়াছেন। তাঁহার এই কথাও নূতন নহে।

উর্দ্দু ব্যতীত ভারতের সকল প্রধান ভাষার বর্ণমালাই এক। অক্ষরের আকৃতি এক হইলে, নানাদিক দিয়া আমাদের সুবিধা হইতে পারিত এবং ভারতের প্রধান ভাষাগুলিতে এক আকৃতির অক্ষর গৃহীত হইলে, এখনও এই সকল সুবিধা হইতে পারে। পুরাতন অক্ষর বর্জ্জন করিলে অনভ্যাস ও নূতন বানানপদ্ধতির জন্য যে-সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, আমাদের বর্ণমালা এক এবং সংস্কৃতমূলক বলিয়া তাহার অনেকগুলি আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে না। বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে বলিয়া, নিজের মাতৃভাষা জানা থাকিলে, ইহার যে কোন ভাষাভাষীর পক্ষে অল্প জানিয়াই অন্য সকল ভাষার সাহিত্যাদির আংশিক রসগ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। কারণ, ইহা অন্যভাষা শিখিয়া, তাহা মাতৃভাষার ন্যায় ব্যবহার করার ন্যায় কঠিন নহে। ইহাতে মুদ্রণকার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারিবে এবং বিক্রয়ের সম্ভাবনা অধিক থাকায় উন্নত ধরণের টাইপরাইটার প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইবে।

কিন্তু, অক্ষর নির্ব্বাচনের সময় সকল প্রকার গোঁড়ামি বাদ দিয়া, যে অক্ষরের মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য, যে অক্ষর ছাপিতে সর্ব্বাপেক্ষা কম স্থান লাগে, যে অক্ষর ছোট করিয়াও পরিষ্কার ভাবে ছাপা যায়, যে অক্ষর হাতে, তাড়াতাড়ি ও সহজে পড়িতে পারা যায় এমন ভাবে দ্রুত লেখা যায়, তাহাই নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সম্ভবতঃ এদিক দিয়া বাংলার কিছু দাবী থাকিতে পারে।

রাজনীতি ও অর্থনীতি শিক্ষার বিদ্যালয়

মাদ্রাজ জুনিয়র লিবারেল লিগের উদ্যোগে, ওয়াই এম্ সি এ-এর বাড়ীতে মাদ্রাজের এড্ভোকেট জেনারেল, স্যার এ-কৃষ্ণস্বামী আয়ার, রাজনীতি ও অর্থনীতি শিক্ষাদানের জন্য একটি গ্রীষ্ম বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করিয়াছেন।

রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে

সকলকে আধুনিক জ্ঞান দান করাই এই বিত্তালয়টির উদ্দেশ্ত। ভারতবর্ষের মধ্যে এই ধরণের ইহাই প্রথম স্কুল।

আমাদের চারিপাশের ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই বর্দ্ধিত হইবে, আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যের পক্ষে আমাদের সঠিক বুঝিবার পক্ষে, আমাদের চিন্তা স্পষ্ট হইয়া উঠিবার পক্ষে ততই সুবিধা হইবে।

কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিত্তালয় ও অন্তান্ত আরও দুই একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাংলাদেশে অনুরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব নহে।

অসাম্প্রদায়িক দান

জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে, ছোটনাগপুরের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ম, রাঁচির বিশিষ্ট মুসলমান বণিক ও জমিদার খান্ বাহাদুর হবিবুর রহমান, লক্ষ টাকা মূল্যে সম্প্রতি ক্রীত তাঁহার হাত্মা জমিদারী দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সাধারণের হিতকল্পে কৃত সর্ব্বপ্রকার দানই প্রশংসনীয়। যাহার দ্বারা দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকই উপকৃত হইবেন, এই সাম্প্রদায়িকতার দিনে তাহার মূল্য আরও বেশী।

পাঁচ লক্ষ টাকা দান

বেকার পার্শী যুবকদের জন্ম একটি শ্রমশিল্প-নিবাস প্রতিষ্ঠার জন্ম বোম্বায়ের কোন একজন পার্শী মহিলা, আত্মনাম গোপন করিয়া ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

মহাত্মার বাংলা ভ্রমণ স্থগিত

মহাত্মা তাঁহার ভ্রমণের অবশিষ্টাংশ পদব্রজে সমাধা করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করায়, বর্ত্তমানে তাঁহার বাংলায় আসা হইল না। মহাত্মা এই নূতন সঙ্কল্প গ্রহণের কারণ স্বরূপ—অন্তান্ত কথার মধ্যে বলিয়াছেন যে, শ্রদ্ধা ও আগ্রহশীল শ্রোতাদের, সত্যের বাণী শুনাইতে পারিলেই মাত্র তাহা জনসাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে। দ্রুতগামী যানে আরোহণ করিয়া, পরস্পর হইতে বহুদূরে অবস্থিত তিনটি স্থানে প্রত্যহ যাইবার সময় এই সুযোগ পাওয়া কষ্টকর। শান্ত আবহাওয়া ব্যতীত আধ্যাত্মিক বা অন্ত কোন প্রকার সত্যের বিস্তার সম্ভব নহে। এই আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম আন্দোলন। বিস্তার লাভের জন্ম ইহা দ্রুতগামী যানের অপেক্ষা রাখে না, এবং ইহা খুবই সম্ভব যে, অন্তর হইতে যদি সত্য উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে রেল অথবা মোটর অপেক্ষা পদব্রজে ইহা অধিকতর দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করিবে।

দ্রুতগামী যানে ভ্রমণ করায় এবং কোন স্থানে বেশী সময় থাকিবার সুবিধা না হওয়ায়, মহাত্মাকে দেখিবার জন্ম এবং তাঁহার বাণী শুনিবার জন্ম লোকের অত্যন্ত ভীড় হওয়া এবং তাহাদের পক্ষে অধৈর্য্য হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। এবং একথাও সত্য যে, শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে শ্রদ্ধা ও আগ্রহান্বিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে কোন কথা বলিলে, তাঁহারা সেই কথার দ্বারা যতটা প্রভাবিত হইতে পারেন, অধৈর্য্য এবং উত্তেজনার মধ্যে ততটা হওয়া সম্ভব নহে। কোনও একটি বিশেষ শ্রোতৃমণ্ডলীর কথা ধরিলে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, দ্বিতীয় অবস্থা অপেক্ষা প্রথম অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিলে, তাহা অনেক লাভের হইতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ স্থানের লোক মহাত্মার লক্ষ্য নহে, সকল ভারতবর্ষ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। কাজেই, কথা আসিয়া দাঁড়ায়, একটা বিশেষ স্থানের লোককে কোন কথা ভাল করিয়া শুনান এবং সকল ভারতবর্ষের লোককে উদ্বুদ্ধ করিবার সুযোগ গ্রহণ করা, এই দুইটির মধ্যে কোনটি অধিক ফলদায়ক হইবে। সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যে কাজ করিতে হইবে, কোন একটা বিশেষ স্থানের কাজের মধ্য দিয়া, তাহা এই ভাবে সফল হইতে পারে যে, কোন একটা বিশেষ স্থানে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে, ক্রমে তাহা সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইবে এবং সাময়িক উত্তেজনার ঝোঁকে যে কাজ হয়, তদপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক হইবে।

হরিজন আন্দোলনকে শক্তিদান করিবার জন্তই মহাত্মা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি

যেখানে যেখানে যাইতেছিলেন, সে সকল স্থানে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইতেছিল, কর্ম্মীরা নূতন শক্তি পাইতেছিলেন এবং লোকে মহাত্মাকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রতীক মনে করে বলিয়া তাঁহার আগমনে অস্পৃশ্যতার কঠোরতা আপনা হইতেই শিথিল হইতেছিল। তাঁহার নূতন সঙ্কল্পে দেশ এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। কোনও একটা বিশেষ স্থানের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে পারিবে, এমন মনে হয় না। এরূপ সম্ভব হইলেও, যত অল্প সময়ে আমরা কাজ চাহিতেছি, ইহাতে তাহা যে হইবে না ইহা সুনিশ্চিত।

সমগ্র দেশময় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য যে আন্দোলন চলিয়াছে, মহাত্মার প্রভাব হইতেই তাহা উদ্ভূত হইলেও মহাত্মার সহিত জনসাধারণের সংস্পর্শের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। মহাত্মার চিন্তা ও চরিত্রের প্রভাব কর্ম্মী-মণ্ডলীর চেষ্টায় ও কার্য্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। মহাত্মাজীর এই ভ্রমণের ফলে বিভিন্ন প্রদেশের কর্ম্মীরা নূতন উৎসাহ ও প্রেরণা পাইতেন। ইহা দেখা গিয়াছে যে, কোন নূতন ভাব প্রচারের পক্ষে উত্তেজনা-পূর্ণ আবহাওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনের মধ্যেও তাহা দেখা গিয়াছে। মহাত্মার আগমনে নানাস্থানে যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইত, তাঁহার বর্ত্তমান ভ্রমণের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তাহা নিঃসন্দেহ সহায়তা করিত।

মহাত্মাজী এই প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মান্দোলন বলিয়াছেন। আমাদের সামাজিক জীবনের স্বাস্থ্য বিধানের পক্ষে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ অত্যাবশক বলিয়া অনেকে ইহার জন্য চেষ্টা করেন এবং এই প্রচেষ্টাকে সংস্কার প্রচেষ্টা বলিয়া মনে করেন। কাহারও ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ করা নৈতিক বিচ্যুতি এই জন্য এই অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে নৈতিক বলা যাইতে পারে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রচেষ্টাকে এই জন্য নৈতিক ও সংস্কারমূলক বলা যাইতে পারে এবং নৈতিক বলিয়া শিথিলভাবে ইহাকে ধর্ম্মান্দোলন বলা যাইতে পারে। কিন্তু, মহাত্মাজী সম্ভবতঃ ইহাকে গভীরতর অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধারণের মধ্যে মহাত্মাজীর ন্যায় সত্যোপলব্ধি বা আধ্যাত্মিক দর্শন নাই বলিয়া ইহার দ্বারা ধর্ম্মান্ধতার সৃষ্টি হইতে পারে। একবার অন্ধতার ফলে, বহু অন্যায় এবং গর্হিত কার্য্যকে আমরা ধর্ম্ম মনে করিয়া মরিয়াছি। এই নূতন অন্ধতা আবার আমাদিগকে নূতন অন্যায়ের পথে লইয়া যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনা অথবা আত্মিক শক্তিকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আমরা যে হিংসাবর্জ্জিত হইয়া, সদিচ্ছা এবং ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অন্যান্য কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারি, তাহার পথ মহাত্মাই আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কিন্তু, এই 'ধর্ম্ম' কথাটার যাহাতে অপপ্রয়োগ না হয়, যাহাতে ইহা মানসিক জটিলতার সৃষ্টি করিয়া আমাদের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে না পারিলে আমাদিগকে আবার নূতন প্রকার দুর্গতি ভোগ করিতে হইতে পারে।

মহাত্মাজীর এই পদব্রজে ভ্রমণকে কোথায়ও কোথায়ও বুদ্ধ এবং শ্রীচৈতন্যের পদব্রজে ধর্ম্ম প্রচারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এরূপ কথা শুনিতে ভাল এবং ইহাতে আমাদের আধ্যাত্মিক বাতিকগ্রস্ত মন আবিষ্ট হইয়া উঠিতে পারে এবং ভাবাবেশে আমাদের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতে পারে বটে, কিন্তু, কার্য্যে সিদ্ধিলাভের পক্ষে ইহাতে কোন সুবিধা হইবে কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

প্রাচীন কালে যখন মানুষ, তাহার সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিত, তখন মানুষের মনে ধর্ম্মের যে প্রভাব ছিল, বর্ত্তমান কালে তাহা আছে কি না এই সকল ধর্ম্মমতও বহু লোকের এবং বহু ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের বহুকালব্যাপী চেষ্টায়ই মাত্র নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল কি না, কোন একটা বিশেষ ফল লাভের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা ইহার সম্মুখে ছিল কি না, প্রভৃতি কথা এই প্রসঙ্গে বিচার করিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তির উৎস নিহিত আছে, তাহা আমরা জানি। ইহা মানুষকে চরম বিপদ ও সর্ব্বস্ব ত্যাগের মধ্যে আহ্বান করিতে পারে। মহাত্মা এই আধ্যাত্মিক শক্তিকে আমাদের গণ জীবনে সঞ্চারিত করিয়াছেন।

অন্যদিকে দেখিতে পাই, সঙ্ঘবদ্ধতা, শৃঙ্খলা, বুদ্ধি ও চাতুর্য্যপূর্ণ নীতির বলে, ইউরোপ অভূতপূর্ব্ব শক্তির অধিকারী হইয়াছে।

ইউরোপের এই শৃঙ্খলা ও সঙ্ঘবদ্ধতা হয়ত সব মানুষের কল্যাণ এবং একমাত্র সত্যকেই সম্মুখে রাখিতে পারে নাই এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির ঝোঁকে মানুষকে যন্ত্র করিয়া রাখিতে অথবা তাহাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে দ্বিধা করে নাই। আমরাও আবার অন্য দিকটাকে এত বেশী করিয়া দেখিয়াছি যে, সাফল্য লাভের জন্য পথ এবং কৌশলের কথা ভাবি নাই। তাহার ফলে আমাদের অনেক শক্তি অপব্যয়ে নষ্ট হইয়াছে। ভিন্ন ভাবে ভিন্ন অভিপ্রায়ে এবং ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেও ইউরোপের বহু পরীক্ষিত নীতি ও পন্থা ও কৌশলকে আমরা বর্জ্জন করিতে পারি না।

ভারতের সমগ্র অতীত ইতিহাস, আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতা, শৃঙ্খলা এবং নীতিকুশলতার অভাবের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। পুনরায় যদি আমরা সেই সকল ভুল করিতে থাকি, তবে তাহা বিশেষ ক্ষোভের ও দুঃখের কারণ হইবে।

মহাত্মার পাদস্পর্শ করিবার ঝোঁক

মহাত্মা বলিয়াছেন, তাঁহার অনিচ্ছা ভিড় জমান এবং তাঁহার পাদস্পর্শ ও জয়ধ্বনি করা হইতে লোককে বিরত করিতে পারে নাই। এমন দিন যায় না, যে দিন পুণ্য-লোভীদের নখের আঁচড়ে তাঁহার পায়ে ক্ষত উৎপাদিত না হয়।

এই ব্যাপার হইতে আমাদের শিক্ষা পাওয়া এবং কোন দিক হইতে বিপদ আসিতে পারে তাহা অনুমান করিতে পারা উচিত।

মানুষের মনে ধর্ম্মভাব যখন বুদ্ধির আলোকপ্রদীপ্ত পথে না আসিয়া বিশ্বাসের গুপ্তদ্বার দিয়া প্রবেশ করে, তখন এইরূপ নানা অনর্থ ঘটিতে থাকে।

অজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতাপ্রসূত অন্ধবিশ্বাস, আমাদের সকল উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যে পথ দিয়া আলোক প্রবেশ করিতে পারিত, ইহা যদি সে পথও আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আর উদ্ধারের উপায় কি।

কংগ্রেস কর্ত্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার

মহাত্মার আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার মূলক বিবৃতিকে ভিত্তি করিয়া কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি, পাটনা অধিবেশনে সাধারণ ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং শুধু মাত্র মহাত্মাজীর উপর অনির্দ্দিষ্ট ভাবে স্বরাজ লাভের জন্য আইন অমান্য করিবার অধিকার ন্যস্ত করিয়াছেন।

যে কারণেই হউক দেশে আইন অমান্য আন্দোলন প্রায় কমিয়া গিয়াছে। এরূপ সময় ইহা প্রত্যাহার করায় দেশ নিরুদ্যম অথচ আতঙ্কিত অশান্তির অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবে এবং কর্ম্মীরা নূতন কর্ম্মে ও প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন।

যাঁহারা পূর্ব্বে এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখন তাঁহাদের প্রাক্ আন্দোলন জীবনে ফিরিয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন (সম্ভবতঃ করিবার মত কোনও কর্ম্মপন্থার অভাবে)। কাজেই আইন অমান্য করিবার ফলে যাঁহারা এখনও জেলে আছেন, তাঁহাদের উপর বিশেষ অবিচার করা হইতেছিল। এই কথা অন্য লোকের চোখ এড়াইলেও মহাত্মাজীর চোখ এড়ায় নাই। অন্য দিকে দেশে কোথায়ও আইন অমান্যের চেষ্টা প্রকৃত পক্ষে না থাকিলেও আইন অনুসারে ইহা বলবৎ থাকায়, যদি এই অবস্থা বন্দীদের মুক্তি পাইবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাঁহাদের উপর অবিচার হইতেছিল। এই আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া মহাত্মা ইঁহাদের প্রতি নেতার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। নূতন কর্ম্মনীতি অনুসারে অকপটে কাজ করিয়া কর্ম্মীরা, তাঁহাদের জেলে আবদ্ধ সঙ্গীদের প্রতি কর্ত্তব্য করিবার সুযোগ পাইবেন।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বরাজ লাভের জন্য আইন অমান্য করিবার ভার সম্পূর্ণ ভাবে মহাত্মাজীর উপর ন্যস্ত রাখিবার কারণ, আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। কোনও লোকের একক চেষ্টার দ্বারা স্বরাজ লাভ সম্ভব হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। যদি মহাত্মার সেই শক্তি

থাকিত, তাহা হইলে গত আন্দোলন অধিকতর সফল না হইবার কারণ কি? অন্যান্য কর্ম্মীদের দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু মহাত্মা ত ইহাতে তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কোনও একজন লোক আমাদের অজ্ঞাত কোন অলৌকিক শক্তির বলে যদি স্বরাজ আনয়নে সমর্থও হন, তবে সে স্বরাজ তাঁহারই মাত্র হইবে; সাধারণ লোকের হইবে না। ইহার উত্তরে মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের মধ্য দিয়া প্রত্যেক লোকই স্বরাজ লাভ করিবে। ইহা যে জনসাধারণের মধ্যে নূতন শক্তি ও চেতনা আনয়ন করিয়াছে, কয়েকদিন তাঁহার সহিত যাপন করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

মহাত্মার প্রভাবে যে দেশের মধ্যে নূতন শক্তি ও চেতনা জাগিয়াছে, অন্ধ ব্যতীত সে কথা আর কে অস্বীকার করিবে। কিন্তু এই যে নবজাগ্রত শক্তি, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই ইহা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই আন্দোলনে জনসাধারণের অংশ ছিল বলিয়াই, বহু লোকে দুঃখ ও বিপদকে বরণ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই, ইহা দেশকে নূতন শক্তি ও উৎসাহ দান করিতে পারিয়াছে, লোকের মধ্যে পৌরুষ ও আত্মবিশ্বাস জাগাইয়াছে, এবং সত্য ও আত্মমর্য্যাদার প্রতি লোককে শ্রদ্ধাবান করিয়াছে। জনসাধারণ যদি এই সংঘাতের মধ্যে আসিয়া না পড়িত, একমাত্র মহাত্মা যদি তাহাদের হইয়া এই সকল কার্য্য করিতেন তবে দেশের মধ্যে এই নূতন প্রাণের সাড়া কখনই পাওয়া যাইত না।

একথা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, কোন অলৌকিক প্রভাবে মহাত্মা স্বরাজ আনয়ন করিতে সমর্থ হইলে, দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সৃষ্টি হইবে, তাহা হইলেও বলিব, সেই উৎসাহ দেশকে যোগ্যতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিবে না। কারণ, সংঘাতের মধ্যেই শক্তি এবং পরীক্ষার মধ্যেই যোগ্যতা জন্ম লাভ করে। যাহারা পুণ্য-লোভে মহাত্মার পদে ক্ষত উৎপাদন করে, মহাত্মার প্রভাব তাহাদিগকে ধর্ম্মান্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে যোগ্যতা, চেতনা বা শক্তি দান করিতে পারে নাই।

মহাত্মার উপর তাঁর ভার রাখিবার যদি এই ব্যাখ্যা করা যায় যে, কোন্ সময়ে কি ভাবে ভবিষ্যৎ নিরুপদ্রব সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, কাহাদের লইয়া কোন্ কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ইহা পরিচালিত হইবে, তাহা স্থির করিবার ভার বর্ত্তমানে শুধুমাত্র মহাত্মার উপর রহিল, সময়, সুযোগ ও যোগ্যতা বুঝিয়া তিনি অন্যদেরও ইহার মধ্যে আহ্বান করিবেন, তাহা হইলেও বলিব, দেশের শক্তি ও উপযুক্ততা বিবেচনা করিবার, উপযোগী কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিবার এবং অসমর্থ হইলে ভুল করিবারও অধিকার দেশের লোকের অর্থাৎ কংগ্রেসেরই থাকা উচিত ছিল। মহাত্মাজী খুবই বড়, কিন্তু ভারতবর্ষ আরও বড়। আমাদের কর্ত্তব্য নির্ণয়ের সব দায়িত্ব একজনের উপর চাপাইয়া সেই ভারতবর্ষকে আমরা ছোট করিলাম এবং আমাদের নাবালকত্বের পাকা প্রমাণ রাখিয়া দিলাম।

মহাত্মাজী একস্থানে বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময় এবং পদ্ধতি একমাত্র সেনাপতিই নির্ণয় করিবেন, তিনিই সৈনিকদের যোগ্যতার পরীক্ষা করিবেন এবং কিভাবে কাজ করিতে হইবে, তাহা তিনিই স্থির করিবেন। যুদ্ধ যতক্ষণ চলিয়াছিল ততক্ষণ একথার যুক্তিযুক্ততা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু, যুদ্ধ যখন সাধারণভাবে স্থগিত হইল, তখন পুনরায় কখন্ কিভাবে ইহা আরম্ভ হইবে, তাহা নির্ণয়ের ভারও সেনাপতি রাখিতে চাহিলে, নিজ প্রাপ্য অপেক্ষা তাঁহার দাবী কি অধিক হইয়া যায় না?

কংগ্রেসের আলোচ্য প্রস্তাবের যদি এই ব্যাখ্যা করা যায় যে, বর্ত্তমানে দেশে গঠনমূলক কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা আছে, শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে যাহাতে তাহা চলিতে পারে, তাহার জন্য সাধারণভাবে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং কংগ্রেস যে তাহার এ পর্য্যন্ত অনুসৃত নীতি বর্জ্জন করিয়া সম্পূর্ণভাবে নত হয় নাই, তাহার প্রমাণ রাখিবার জন্য মহাত্মার উপর আইন অমান্য করিবার ভার রহিয়াছে, তাহা হইলে বলিব, প্রয়োজন হইয়া থাকিলে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ চেষ্টা প্রত্যাহার করা নিশ্চয়ই ভাল হইয়াছে, কিন্তু, যদি শুধুমাত্র মহাত্মার উপর ইহার সম্পূর্ণ ভার রাখিয়া আমরা একথা মনে করিয়া থাকি যে, কৌশল করিয়া

কংগ্রেসের নীতিকে বাঁচাইয়া রাখা হইল, তবে তাহাতে কতকটা আত্মপ্রতারণা করিবার চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র এবং সমগ্র ব্যাপারটিকে তাহাতে লঘু করিয়া ফেলা হইয়াছে। চোখ বুজিয়া না দেখিবার নীতির সহিত মহাত্মার যোগ কখনই থাকিতে পারে না, বলিয়া, সর্ব্বশেষোক্ত উদ্দেশ্যে কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

যদি এই কথা বলা যায় যে, মহাত্মাজীর উপর নিরুপদ্রব সংগ্রাম চালাইবার ভার রাখিয়া, দেশ হইতে যাহাতে সত্যাগ্রহের প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহার মধ্য দিয়াই যাহাতে লোকের মন্ সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার উপায় রাখা হইয়াছে, তাহা হইলে বলিব, এই ভার মহাত্মাজীর উপর না থাকিলেও তিনি দেশকে প্রভাবিত করিবার এবং লোককে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত করিবার কম সুযোগ পাইতেন না; অথচ ফলদায়কভাবে যাহা প্রয়োগ করা যাইবে না, কাগজপত্রে তাহার ব্যবস্থা রাখিয়া, তাহাতে কংগ্রেসকে লঘু করা হইত না।

মহাত্মার লোকোত্তর সাধু চরিত্রের উপর, তাঁহার অসাধারণ শক্তির উপর, দেশকে জয়ের পথে চালিত করিবার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস আছে বলিয়াই এত কথা বলিতে হইল।

মহাত্মা গান্ধী ও বাংলা

মহাত্মা গান্ধী বাংলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কোন কোন বাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা আমাকে বাংলার দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতি উদাসীন মনে করিয়া দোষ দেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আমার বাংলার প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী অস্বীকার করেন।"

"বাংলার প্রতিনিধিত্ব যদি আমি না করিতে পারি, তবে, আর কোন প্রদেশেরই প্রতিনিধি আমি নহি। আমি বাংলার কবিতা এবং ভাবপ্রবণতার স্তাবক। আমি প্রেমের রেশমসূত্রের দ্বারা এই প্রদেশের সহিত সংযুক্ত, কিন্তু, আজ আমি নিঃসহায়।"

তাহা হইলে বাংলার প্রতি অবিচারের কথা কি মহাত্মা পরোক্ষে স্বীকার করিতেছেন?

সত্যাগ্রহ ও জনসাধারণ

মহাত্মা সত্যাগ্রহকে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য পূর্ণফলপ্রদ অস্ত্র বলিয়া দাবী করিয়াছেন; কিন্তু, অনুপযুক্ত বলিয়া ইহা প্রয়োগের অধিকার সাধারণকে দিতে সম্মত হন নাই।

যদি ইহা যুদ্ধের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য হয়, তাহা হইলে, শিক্ষা ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া সাধারণের পক্ষে ইহা আয়ত্তযোগ্য হওয়া চাই। মহাত্মার ন্যায় অতি শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব মানুষের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। তিনি বা তাঁহাপেক্ষা উপযুক্ততর লোক ব্যতীত যদি ইহা আর কেহ প্রয়োগ করিতে না পারে, তাহা হইলে কখনই ইহাকে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যাইবে না।

প্রজ্ঞাশ্রী

শ্রীসুশীলকুমার দেব

আশ্চর্য্য মেয়ে হিল্ডা। দেশ তার জার্ম্মেণীতে—বাড়ী মিউনিক্। বলে কি না অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের বই ইংরেজীতে পড়েছে; হিন্দুদের মতন সেও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করে। তারি কথা বসে বসে ভাবছি। আর জাহাজ চল্‌ছে—বোম্বে থেকে পাড়ি দিয়েছে ভেনিসের পথে। তাতে হিল্ডা আমার সহযাত্রিণী।

সেদিন দুপুরে আকাশ একটু মেঘলা। ডাইনিং সেলুন থেকে মধ্যাহ্নের আহার শেষে বিশ্রামাগারে গিয়ে বসলুম। চোখ দুটো একবার সাগরের ঘোলা জল একবার আকাশের ঘোলা মেঘের দিকে তাকিয়ে যেন কী অকস্মাতের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে নিচ্ছে। ঔৎসুক্যের শেষ নেই, দেখারও বিরাম নেই।

এমন সময় সহসা উচ্চ হাসির শব্দে আমার ধ্যান ভাঙ্‌ল। চেয়ে দেখি একজন কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় ভদ্রলোক ও একজন শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী হাতে হাত ধরে খুব কথাবার্ত্তার মধ্যে একে অন্যকে সহাস্য অথচ নিষ্পলক নয়নে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘরে ঢুক্‌লেন। ঢুকেই কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাটিকে প্রায় এক রকম ঠেলেই একখানা কৌচে আদর করে বসিয়ে ঐ কৌচের হাতার 'পরে নিজে বসে পড়্‌লেন। তারপর অনতি-বিলম্বে মহিলার হাত নিজের দু'হাতে নিবিড় করে জড়ালেন।

ইতি মধ্যে জাহাজটি বেশ দুলছে। ঝাঁকানি খেয়ে ঘরের ভেতর থেকে চোখ আমার বাইরের দিকে ছুটল। বৃষ্টি পড়্‌তে সুরু হয়েছে তখন।

আবার একটা হাসির শব্দ। এবার অবিমিশ্র স্ত্রীকণ্ঠ। অতএব পুনর্ব্বার কক্ষাভ্যন্তরে দৃষ্টি ফিরে এলো; পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক মহিলাটিকে কাতুকুতু দিয়ে হাসাচ্ছেন—তারি শব্দ। মহিলাটিও হাস্‌তে কিছুমাত্র গররাজি নন্; শুধু মিনতি করে বল্‌ছেন, "তুমি বড়ো দুর্দান্ত। আমার শরীরে প্রায় জ্বালা ধরিয়ে দিলে। আমায় একটু ছাড়ো না, বাপু। কাতুকুতু দিয়ে বিধ্বস্ত করে তুলে ফেল্‌লে। আর কতো? থামো—দুষ্টু!" কথাগুলো সুষ্ঠু চাপা সুরে বলা হলো। এবং তিনি যে নিতান্ত সীরিয়স্‌লি বল্‌ছেন তা তাঁর দৃষ্টির একটানা ভঙ্গিমা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক কিন্তু নাছোড়বান্দা। তবু যেন হার মান্‌লেন, এম্‌নিতর একটুখানি করুণ ভাব মুখ-চোখে প্রকাশ পেলো। অবশ্য অত্যন্ত সুবোধ বালকের মতো গোলমালে না যেয়ে; তারপরই মহিলাটির "বব্‌ড" কুন্তল-দাম মৃদুল স্পর্শ দ্বারা কণ্ডূয়ন করতে লাগ্‌লেন। মহিলা এবে বাদ সাধলেন না, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন তন্দ্রালু হলেন দু'জনের ব্যবহারে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখে আমারও মনটা বেশ পাতলা হলো।

এম্‌নি কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই নৃত্যচ্ছন্দে দেহকে হিল্লোলিত করে মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকও একটা স্মার্ট লম্ফ দিয়ে উঠে আনতশির হয়ে বল্‌লেন—ধন্যবাদ মিস কার্‌টার্।

আমি তখনো বসে আছি। কিন্তু আমার বসে থাকাটা তেমন মনোযোগ দেবার মতন ঘটনাই নয় এম্‌নিধারা চতুরালি দেখিয়ে দু'জনেই ঘর ছেড়ে রওনা দিলেন ডেকের দিকে। যাবার সময় আবার সেই হাসি—এবার মিলিত কণ্ঠের হাসি। ব্যাপারটি এতো তাড়াতাড়ি মিট-মাট হয়ে দেখে আমি পূর্ব্ববৎ বসে রইলুম্। খালি মনে হতে লাগ্‌ল যেন বাস্তব জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে এক কল্পলোকের মধ্যে সমুদ্র-পাড়ি দিচ্ছি। চলন-বলন-ধরণ-ধারণের কতো নিত্য নতুন নমুনা এখন হামেশাই দেখ্‌ছি। আঁর হিল্ডার কথা কথা বার বার মনে পড়্‌ছে। হিল্ডার জুড়ি কেউ নেই জাহাজের ত্রিসন্ধ্যা পানাহার, বৈকালিক চা, প্রতিযোগিতা-মূলক খোস্ ভ্রমণ, অলস সাঁঝে ডেক্-চেয়ারে পুস্তক পাঠ সময়ে অসময়ে সর্ব্বসময়ে খেলা খেলা খেলা, রাত্রে ডিনার

শেষে কফি সিনেমা নাচ গান গল্প গুজব মজ্‌লিস—রোজকার রুটিন্ একেবারে বেটপ ঠেকছে। দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন কাটছে। জাহাজ চল্‌ছেই। আর আমি উৎপিপাসু হ'য়ে দেখ্‌ছি—শুধু জল আর আকাশ, আকাশ আর জল। মাঝে মাঝে বন্দর পেলেই নেমে বেড়িয়ে এসে আমি যে সত্যিই স্থলচর সমাজে মানুষ হয়েছি, জলচর জাহাজের যাত্রী মাত্র নই—তাই পরখ করে দেখি। বেড়াবার সঙ্গিনী আমার হিল্ডা।

অবশ্য হিল্ডার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক কথোপকথন সব সময়ে জমেই জমে।

হিল্ডা বলে—ভ্রমণের জন্যে ভ্রমণ আদৌ সুখদ নয়। উদ্দেশ্য-মূলক লম্বা ভ্রমণের মধ্যে যে মৌজ তার তুলনা মেলা ভার। কারণ লম্বা ভ্রমণের মধ্যে উদ্দেশ্যের বাইরে যা-কিছু অনাকাঙ্ক্ষিতরূপে ঘটে তার সবটুকুই অকস্মাতের দ্বারা পরিপ্রেক্ষিত। অকস্মাতের সাক্ষাৎ মানেই বিস্ময়; তার মানেই আনন্দ। সুতরাং সমুদ্রযাত্রায় নিরানন্দের হেতু নেই: এইতো যথা, রাত্তিরে আজ জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজার ডিনার। আনুষঙ্গিক "ফেন্সী-ড্রেস্ নাচ", আরো কতো-কি সমারোহ আছে—কে জানে!

হিল্ডা নির্ভুল কথা বল্‌তে পারে। হীরের টুক্‌রো মেয়ে!

* * * *

আজ সমুদ্রযাত্রার তেরো দিন। রাত্রে ডিনারের পর ডেক্‌টি নাচ-বাজনার উৎসব-স্থলীতে পরিণত হয়েছে। একটা ঘটনার মতন ঘটনা—ফেন্সী-ড্রেস্ নাচ; নৃত্যাঙ্গণের কাছেই বসে আয়োজন-উদ্যোগ দেখ্‌ছি, এম্‌নি সময় হিল্ডা এসে বল্লে, 'কী—তুমি যে একলা বসে আছো মিঃ বেঙ্গল। নাচের পোষাক কই?'

হিল্ডা আমাকে প্রথম পরিচয়ের সঙ্গেই মিঃ বেঙ্গল বলে ডাকে। আমিও তাকে তার ডাক নামে সম্বোধন করি—হিল্ডা। মিস্ এলক্রাস বলে ডাকি না।

উত্তর করলুম, 'কেন—তোমাকে বলিনি আমি বিলিতি নাচ জানিনে।'

'ও! ভুলেই গেছ্‌লুম' বলে সে পাশে একখানা চেয়ার টেনে বস্‌ল।

নাচের বাজনা শুন্‌তে শুন্‌তে বল্লুম, 'হিল্ডা, তুমি নাচে যাবে না?'

'বেশ কথা তোমার। তুমি এখানে বসে খবরদারি করো, আর আমায় নাচ্‌তে পাঠাও ওখানে। তুমি এ নাচ শিখবে কবে, বলো!'

আমি হাস্‌লুম উত্তর দেবার কিছু নেই তাই। হিল্ডাকে দেখেই মন খুসী হয়। তাকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে—ওগো, তুমি যে আমার দেখন-হাসি। কিন্তু হিল্ডা বাংলা জানে না। মুস্কিল আরকি!

হিল্ডার বোলচাল সব স্বতন্ত্র। আধুনিকদের হালফ্যাসান্ তার নখদর্পণে। কিন্তু তার মনের একটা নিজস্ব ছাঁচ আছে যা কিছুতেই দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। মনে মনে সে তার চিন্তাগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে; যখনই যে বিষয়ে বিতর্ক চলে সে বেশ চমৎকার সজ্জায় সে গুলো প্রকাশ করতে পারে। হিল্ডা ধীমতী। কিন্তু বয়স তার উনিশ। নিতান্ত ছেলেমানুষ। যেমন কথাবার্ত্তায় তেম্‌নি তার ব্যবহারের সহজ ভব্যতা আমার কাছে তাকে অন্য সকলের থেকে আলাদা বলে সর্ব্বদা মনে করিয়ে দিত। তার সৌম্য মানসিকতার সঙ্গে তারুণ্যের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য মিশে এম্‌নি চরিত্র রচিত হয়েছে যে তার মাধুর্য্য আমাকে যখন তখন আকর্ষণ করে।

এর সঙ্গে আমার পরিচয় একদিন ঘনিষ্ঠতায় গিয়ে দাঁড়ালো। বিকেল বেলা। ডেকে বেড়াতে বেড়াতে হিল্ডা আমায় বল্লে, 'জানো, আমি সুখী নই—দুঃখী।'

আমি বল্লুম, 'বাজে কথা রাখো। তোমার দুঃখের কোন কারণই থাকৃতে পারে না।'

হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে আমরা ডেকের এক কোণে এসে পৌঁছেচি। হিল্ডা আমার চোখে চোখ্ রেখে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলো।

জিজ্ঞেস করলে, 'কখনো প্রেমে পড়েছো?' প্রশ্ন বটে!

একটু বিস্মিত হলুম। বল্লুম, 'না।'

'আমাকে কেমন লাগে?'

ছোট্ট প্রশ্নটি। কিন্তু যেন জোয়ারের ঢেউ গুছল্ পাছল্ করে উঠল। বল্লুম, 'চমৎকার লাগে।'

উচ্ছ্বসিত হয়ে কথাটা বল্লুম। ফটিকের ঢেউ জাহাজের গায়ে লেগে ভাঙল—ছল ছলাৎ, ছল ছলাৎ। আমার মনে হলো, কি একটা বিরাট গহ্বরের তটে দাঁড়িয়েছি; একবার ওতে ঝাঁপ দিলে কোন্ অতলে তলিয়ে যাবো। ভয় হতে লাগল। হৃদয়ে একটা প্রাচুনে গতি অনুভব করলুম। জাহাজও হয়তো দুলছিল।

হিল্ডা দেখলুম নিস্পন্দ হয়ে তখনো চেয়ে আছে আমার চোখে। ধীরে ধীরে আমার কোটের তিনটি বোতামের মাঝের বোতামটি এঁটে দিয়ে বল্লে, 'তোমায় কী সুন্দর মানায় এই সুটে! যেন গ্রীক্ দেবতাটি—মাইকেলেঞ্জেলো নিজ হাতে টিপে গড়েছে।'

মনে পড়ে গেল "পুরুষের উক্তির" সেই লাইন্—'তরুণ দেবতা সম দাঁড়ানু সম্মুখে।' হায়, হিল্ডা যদি বাঙলা জানত তাহলে তাকে এই লাইনটির কথা বলতুম। তবু এমন মধুর কথা কোনো মানুষের মুখে যে এতো মধুর শোনাতে পারে তা আমি এর আগে বুঝিনি। হিল্ডার কথা মধুক্ষরা।

বল্লে, 'জানো?—গত জীবনে আমিও বাঙালী ছিলুম, তোমার স্ত্রী!' স্পষ্ট দেখলুম হিল্ডার ওষ্ঠাধর কাঁপছে। আমি নীরবে শুনছি। যেন সাগরের জলে বান ডাকল—আনন্দের বান; আর আমি অথই জলে বে-সামাল হয়ে পড়লুম। তারপর কেন জানিনা, আমার চোখে জল ভরে এলো। বুঝি কাঁদতে লাগলুম। আমি কাঁদছি দেখে হিল্ডাও কাঁদতে সুরু করেছে।

হিল্ডা সুধোলে, 'তুমি আমায় ভালোবাসো?'

আমি সুধোলুম 'হিল্ডা! তুমি কি আমায় ভালোবাসো?'

কে কার প্রশ্নের উত্তর দেয়? বেশ মনে আছে, কারো কথার কোনো উত্তর আমরা দিইনি। শুধু হিল্ডার হাতখানা আমার হাতে তুলে নিলুম। দু'জনের হাতজোলাই ঘামছে।

'উঃ! বড্ড গরম, হিল্ডা, চলো হেঁটে বেড়ানো যাক্।'

আমার কথার কোনো মৌখিক জবাব না দিয়ে হিল্ডা চলল হাঁটতে আমার সঙ্গে।

এ সেই হিল্ডা। তার আর অন্য পরিচয় কি দেবো? জানি নিশ্চয়—সে প্রেমিকা। সে-ই এখন নাচের আসরে আমার কাছে এসে বসেছে।

নাচ আরম্ভ হয়ে গেছে। হঠাৎ জোড় বেঁধে দুজনে অপরূপ সাজে আসরে নেমেছেন। কে? কে?—ও! সেই মাণিকজোড়, মিস্ কার্টার্ আর কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোকটি।

আমার দিকে চোখ্ ফিরিয়ে হিল্ডা ব্যঙ্গোক্তি করলে, 'তুমি ও ঐ ভারতীয়টি একই দেশের চালান্ তো; অথচ তা বোঝা শক্ত। দেখো দিকিন্, উনি রীতি মতন হী-ম্যান্। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পাকা ওস্তাদ। আর তুমি কি না কুঁকড়ি সুঁকড়ি হয়ে এখানে বসে রয়েছো। বড্ড shy তুমি।'

তার পর বল্লে, 'এসো আমার সঙ্গে। তোমাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাব। এখানে বসে আর কি ছাই হবে?'

আমিও খুসী হয়ে নাচের আসর ছেড়ে বিশ্রামাগারে গেলুম। হিল্ডা পিয়ানোর পর্দা টিপে বাজাতে আরম্ভ করলে বীঠোভেনের নবম সিম্ফোনি। কিছুক্ষণ বাজানোর পরে আমার বিরক্তি ধরে গেল।

বল্লুম, 'ওসব সিম্ফোনি এখন রাখো। আমি কি কিছু বুঝি? তার চাইতে বাইরে গিয়ে ওপরতলার ডেকে বসে বসে গল্প করা যাক্ চলো।'

বাজানো বন্ধ করে হিল্ডা বল্লে, 'তুমি অরসিক।'

'আচ্ছা তাই সই। তুমিও বড়ো কম নও বন্ধু! তুমি কেন নাচে গেলে না? তোমার কি শরীর খারাপ করেছে?' জিজ্ঞেস করলুম।

'শরীর খারাপ নয়। শোনো, তোমায় একটা কথা বলা আমার দরকার। তুমি ঐ মিঃ টেগুন্‌কে জানো? লোকটা একেবারে পশু।'

'কেন কি করেছে?'

'কাল রাতে কাপড় ছেড়ে সবে মাত্র শুয়েছি। আমার কেবিনে যে আরেক জন বৃদ্ধা আছেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আস্তে আস্তে দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্ছে শুনে দরজা খুলে দেখি দাঁড়িয়ে এই টেগুন্। শোবার পোষাকে তার সঙ্গে দেখা হলো এই জন্যে তার কাছে ক্ষমা চাইলুম। সে আমার ঐ কথায় বড়ো একটা কান দিলে না। অহ্নরের একটানা সুরে একটা ভয়ানক কু-প্রস্তাব করলে। শুনেই আমি তাকে একটা চড় বসালুম। 'ক্ষমা করবেন' 'ক্ষমা করবেন' বলতে বলতে যেমন চোরের মতন এসেছিল

তেম্‌নি নিঃশব্দে পা টিপে টিপে দ্রুতগতিতে নিজের কেবিনের দিকে চলে গেল।

আমি দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ কর্‌লুম—সয়তান! আমার গা জ্বালা কর্‌তে লাগ্‌ল।

আরো কি একটা কথা মুখে উঁকি দিচ্ছিল এম্‌নি সময় ঝড়ের বেগে কক্ষে ঢুক্‌লেন সেই মাণিকজোড়।

টেগুন্‌ সঙ্গিনীকে বল্‌ছে, 'তুমি আমায় ভোগা দিচ্ছো, ডীয়ার্‌।'

মহিলাটি সুর করে এক লাইন গান করছেন, 'If I give in to you.'

হিল্ডাকে দেখা মাত্র টেগুন্‌ কেমন আচম্‌কা মনমরা গোছের হয়ে অস্বস্তি অনুভব করছে দেখ্‌লুম। কিন্তু চটপট্‌ আত্মস্থ হয়ে সে বল্লে, 'মিস্‌ এলক্রাস, আপনার সঙ্গে নাচ্‌বার আনন্দ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত কর্‌লেন আজ।' মনের ভাব চেপে রাখ্‌বার আচ্ছা আর্টই দেখালে লোকটা।

মিস্‌ কার্‌টার্‌ মাঝখান থেকে জবাব দিলেন, 'আজ জাহাজে তেরো রাত। এবং তেরো সংখ্যাটি অলুক্ষণে। অশুভ রাত আজ কিন্তু। সেদিকে খেয়াল আছে?'

হিল্ডা কৌতুক করে বল্লে, 'কুসংস্কার!'

টেগুন্‌ সঙ্গিনীকে বল্লে, 'শুন্‌লে ওঁর মত? আজ হলো আনন্দের রাত। ফূর্ত্তি করো, 'আত্মপ্রকাশ' করো। তুমি কিনা নিজেকে সঙ্কুচিত কর্‌তেই ব্যস্ত। Don't be stupid, dear.'

'আত্মপ্রকাশ' কথাটি শুনেই আমার মনের টনক নড়্‌ল। ও! শ্রীমান্‌ তাহলে "এক্স্‌প্রেসনিজম্‌"-এর তত্ত্ব ব্যাখ্যান কর্‌ছেন। ফস্‌ করে বলে ফেল্লুম, 'আমি এক্স্‌প্রেসনিজম্‌ মানি না।

আমার মন্তব্যটি মুখ থেকে বেরোতে না বেরোতেই মাণিকজোড় যথারীতি তারস্বরে হাস্য-রোল করে আমাকে দমিয়ে দিলেন। টের পেলুম, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল; এঁরা হেসে আমার দোষ স্খালন কর্‌লেন।

হিল্ডা আমার পক্ষ নিয়েই বল্লে, 'এবিষয়ে মিঃ টেগুনের মতটাই আগে শোনা যাক্‌ না কেন?'

টেগুন্‌ বল্লে, 'তা বেশ তো! কিছুক্ষণ না হয় আপনাদের সঙ্গেই একটু আলোচনা হবে, মন্দ কি। আসুন, তাহলে বসা যাক্‌।' এই বলেই মিস্‌ কার্‌টারকে হাতে ধরে নিয়ে বসালে।

হিল্ডা ও আমি পিছু পিছু গিয়ে আসন নিলুম। ডেকের ঐক্যতান বাতাসে ঘরের মধ্যে ভেসে আস্‌ছে। হিল্ডা আমাকে লক্ষ্য করে বল্লে, 'ঐ স্ট্রস্যান্‌ হচ্ছে।'

'একটু ক্ষমা কর্‌বেন' বলে টেগুন্‌ উঠে গিয়েই জনৈক পরিচারককে ডেকে আন্‌লে। তারপর প্রশ্ন কর্‌লে, 'কার কি চাই? আজ ফূর্ত্তির রাতে ভালো পানীয় দেদার আছে। বলুন, কি চাই?—স্যাম্পেন্‌, বিয়ার্‌, ষ্টাউট্‌, হোয়াইট অয়াইন্‌? মিস্‌ কার্‌টার্‌?—'

'আমি—হোয়াইট অয়াইন্‌।'

'মিস্‌ এল্‌ক্রাস্‌?'

'ধন্যবাদ, আমি শুধু বিয়ার নেবো।'

'মিঃ—'

আমি এতোক্ষণেও কিছু ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌ছিলাম না। 'না' বল্লে পাছে মাণিকজোড় অসভ্য ভেবে আবার হাস্য করেন তাই হিল্ডার সঙ্গে পক্ষপাতটা বজায় রেখে বল্লুম, 'আমিও তাই—বিয়ার।' আসল কথা হচ্ছে, মদ আমি কখনো এর আগে খাইনি।

পরিচারক পানীয় পরিবেশন করে গেল। মহারাজার ডিনার। যার যতো ইচ্ছে খাও—পয়সা লাগ্‌বে না।

মদ খেতে আরম্ভ করেই টেগুন্‌ অভ্যাগতা ও (আমি) অভ্যাগতকে নন্দিত করার চেষ্টায় বল্লে, 'এক্স্‌প্রেসনিজম্‌ আর-কি?—দেহে মনে প্রথমত নেশা মেতে ওঠা চাই। তবেই তো প্রাণের প্রকাশ হবে। তারপর সাহিত্যে তদনুসারী ছায়াপাত কর্‌লেই হবে বাস্তব সাহিত্য।'

লোকটার নির্লজ্জ বাক্যালাপে আমি কুণ্ঠিত হচ্ছিলুম। লজ্জায় আমার কর্ণমূল মধ্যে মধ্যে লাল হয়ে উঠ্‌ছিল। আশ্চর্য্য যে এই স্মার্ট পুঙ্গবের কীর্ত্তিকলাপ তেরোদিন সমানে দেখেও আমি সম্‌ঝিতে পার্‌ছিলুম না যে, লজ্জা ঘৃণা ভয় আত্মপ্রকাশের শাস্ত্রে টেবু।

টেগুন্‌ বলে যাচ্ছে, 'দেখুন, সাবলীল জীবন-যাপনের সব চেয়ে উগ্র বাধা হচ্ছে—মনোবিজ্ঞান যাকে বলে কম্‌প্লেক্স্‌। কম্‌প্লেক্স্‌ আত্মসঙ্কোচের চিহ্ন। যিনি সর্ব্বাঙ্গীন আত্মপ্রকাশ

কর্‌তে পেরেছেন তাঁর. কোনো কম্‌প্লেক্স্‌ থাকবে না। অবশ্য এহেন লোক জীবনে আমরা সচরাচর দেখতে পাইনে। কিন্তু যাই হোক্‌, সেই হচ্ছে আদর্শ। অকুণ্ঠিত হয়ে স্বেচ্ছায় নিজের আদর্শানুযায়ী কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে কম্‌প্লেক্স-গুলোর মহতী বিনষ্টির একমাত্র ওষুধ।'……

আরো কি বল্‌তে যাবে এমন সময় মিস্‌ কার্‌টার্‌ আমার প্রতি মেহেরবানি করে তাকিয়ে আদেশ কর্‌লেন, 'আপনি বলুন না যে, আত্মপ্রকাশেরও একটা সীমা আছে। এমন যদি হয় যে, এই আত্মপ্রকাশবাদী ভদ্রলোকটি জীবনে সাবলীলগতি হতে গিয়ে অপরের প্রতি (এখানে টেঁগুনের দিকে তীক্ষ্ণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হান্‌লেন) অন্যায় করেন, নিজের স্বার্থটাই দেখেন, অপরের স্বার্থটা দেখেন না, তাহলে সেটা সমাজের পক্ষে ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষে, চাই-কি মানবসমাজের পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। নয় কি? চোরের কাছে যেটা আত্মপ্রকাশ, গৃহস্থের কাছে সেটা মহাক্ষতি এবং সমাজের আইনে দণ্ডনীয়।'

আমার উত্তর দেবার আগেই টেঁগুন্‌ সুরু কর্‌লে, 'আঃ আমি কি সেকথা বল্‌ছি? আমি বল্‌ছি, কম্‌প্লেক্স-এর উচ্ছেদ সাধন করা মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায়—একটি বিশেষ উপায়। মিস্‌ এল্‌ক্রাস্‌ নিশ্চয়ই জানেন, (হিল্ডার দিকে মুখ করে) জার্ম্মেণী হতে যে কম্‌প্লেক্স্‌ তত্ত্বটি বেরিয়েছে তার থেকে য়ুরোপের কোনো-কোনো দেশে nudist colony করার প্রস্তাব কার্য্যে কিঞ্চিদধিক অনুশীলিত হচ্ছে। আমেরিকায় কেউ কেউ কম্‌প্লেক্স এড়ানোর জন্যে একটি বিশেষ ব্রতও উদ্‌যাপন কর্‌তে লেগে গেছেন। সেটি হচ্ছে—ইচ্ছা মাত্র ইচ্ছার পরিপূরণ করা। ইচ্ছার নিরোধ পাপ। ইচ্ছার পূরণই জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাঁরা এও বল্‌ছেন যে, এই স্বভাব-ধর্ম্ম উদ্‌যাপনের প্রকৃষ্ট অবকাশ যৌবন। কুণ্ঠাকে বিসর্জ্জন দিয়ে অকুণ্ঠকর্ম্মী হওয়াই আত্মপ্রকাশের রীতি।'

হিল্ডা বল্লে, 'আইন করে এসব হুজুক্‌ বন্ধ করে দেবারও ব্যবস্থা হচ্চে—এও ঠিক।'

'কিন্তু সত্যের জয় একদিন হবেই' বলেই টেঁগুন্‌ মিস্‌ কার্‌টারের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলো।

মিস্‌ কার্‌টার্‌ নরম-গরম সুরে চেঁচিয়ে বল্‌লেন, 'না-না-না'। বলেই হাস্‌তে লাগ্‌লেন। এবং বারবার বল্‌তে লাগলেন, 'না-না-না-না…That can't be.'

পরিচারক আগের আদেশ মতো আরো কিছু পানীয় নিয়ে এলো। এবার আর কেউই খেতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু অকুণ্ঠকর্ম্মী টেঁগুন্‌ অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্লাসের পর গ্লাস খালি করছে। তাঁর পানের তোড়জোড় দেখে আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে আমি ক্রমেই নিঃসন্দেহ হতে লাগ্‌লুম। সাহিত্যালোচনা চাপা পড়্‌ল। সাহিত্য ধর্ম্মের চেয়ে প্রাণ ধর্ম্মের চর্চ্চাতেই টেঁগুনের প্রীতি বেশী। তাই অলস বসে না থেকে, গলার সুরকে খানিকটা খাদে নামিয়ে অকুণ্ঠকর্ম্মী মিস কার্‌টার্‌কে নাচের অনুরোধ জানালে। বাইরে নাচের বাজনা বাজ্‌ছে। সুতরাং অবাধে নাচ চল্‌তে পারে। বিশ্রামাগারেই তাদের নাচ চল্‌ল।

হিল্ডা ও আমি আগেকার বিষয় নিয়ে মতামত দিতে লাগ্‌লুম।

হিল্ডা: 'জীবনে আত্মপ্রকাশেরও একটা দিক আছে বৈকি। প্রতিভা হচ্ছে এই আত্মপ্রকাশের ভিত্তি। কিন্তু প্রতিভাই মনুষ্যত্ব বিকাশের শেষ নয়। প্রতিভা একরকম স্বার্থপরতা। নিজের দেহমনের সুপ্ত শক্তি সামর্থ্যকে যখন চর্চ্চা দ্বারা কোনো বিশিষ্ট প্রণালীতে কাজে নিয়োগ কর্‌তে পারি তখনই অর্জ্জন করি প্রতিভা। প্রতিভাবান্‌ নিজেকে নিয়েই মস্‌গুল। অপরের স্বার্থ সুবিধার প্রতি নজর দেবার মতন তাঁর মনের অবস্থা নয়—সময়ও নেই। বরং অপরের স্বার্থ-সুবিধাকে অল্পাধিক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ কর্‌তেও তিনি পেছ্‌-পা নন্‌।'

শ্রীমতী হিল্ডার মুখে খৈ ফুটছে। আমি শুন্‌ছি আর হিল্ডা বলে যাচ্ছে, 'মনুষ্যত্ব বিকাশের স্বপক্ষে প্রতিভাই সর্বোচ্চ সহায় নয়। মানবকে যে-শক্তি মহামানবে পরিণত করে তা পরার্থপরতা—পরের জন্য নিজের শক্তিকে নিয়োগ করা। সঞ্চয়ের ফল প্রতিভা, দানের ফল মহামানবত্ব। অবশ্য প্রতিভার পক্ষে অব্যর্থ প্রয়োজনীয় স্বার্থপরতা-টুকুর মর্য্যাদা দিতেই হবে।'

হিল্ডার মুখের কথা কী সুন্দর! তাই আমি মনে মনে তার একটি নামকরণ করেছি—প্রজ্ঞাশ্রী।

এদিকে অকুণ্ঠকর্ম্মী নাচ্‌তে নাচ্‌তে মিস্ কার্‌টার্‌কে বাহুবদ্ধা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ কর্‌লেন। মিস্ কার্‌টার্‌ও অকুণ্ঠকর্ম্মীর কাণ্ড-কারখানায় যথেষ্ট অভ্যস্ত। অতএব তিনিও নিরাপত্তিতে বাহুবদ্ধা হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে নাচের তালে পা বাড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি বল্‌লুম, 'হিল্ডা, তুমি কিন্তু ঐ মিস্ কার্‌টারের মতন মেয়ে নও। দেখো না, উনি কেমন স্বচ্ছন্দ-স্বভাব।' শুধু ঐ ছোক্‌রা নয়, আরো কতোজনকে তিনি অনুগ্রহের ক্ষুদ কুঁড়ো দিয়ে খুশী করে যাচ্ছেন—যেন আনন্দের মন্দাকিনী। ঐ ছোক্‌রাটির গুণ, সে বেশ্‌ কায়দা জানে; তাই ওঁর কাছে থেকে বেশী বেশী আদায় করে নেয়। তোমার কাছে কিন্তু কায়দা-ফায়দা টেঁকে না। আমার কাছে ছাড়া তুমি আর পাঁচ জনকে বড় একটা জিজ্ঞাসাবাদও করো না।'

হিল্ডা: ঐ আত্ম-প্রকাশের ঢেঁপোমি তোমার নেই কিনা, তাই। তদুপরি তুমি আমার নারীর মর্য্যাদা বাড়িয়ে তুলেছো। তোমাকে আমি যতোখানি প্রশ্রয় দিয়েছি, অতোখানি দিলে ঐ আত্ম-প্রকাশবাদী টেগুন্ আমার সর্ব্বনাশ না করে ছাড়্‌ত না।'

'হিল্ডা, আমি কি বল্‌ছি—জানো? আমি মিস্ কার্‌টারের কথা বল্‌ছি। তাঁর সঙ্গে তোমার অনেক প্রভেদ।'

'প্রভেদ? এদ্দিনেও বোঝোনি? আমি কি আত্ম-প্রকাশী পুরুষের হাতের শীকার নাকি?'

হিল্ডার প্রাণখোলা মন্তব্য যতোই শুন্‌ছি ততোই সে আমার আপনার হতে আপনার হয়ে আস্‌ছে।

'হিল্ডা! তুমি মাত্র রূপসী নও। তোমার অন্তরে প্রজ্ঞার আলোক। তুমি প্রজ্ঞাশ্রী।'

'বেশ তাই ভালো। আচ্ছা, গত জীবনে তুমি আমায় কি বলে ডাক্‌তে তাই আমার জানতে ইচ্ছে করে। ওগো, তুমি যদি জাতিস্মর হতুম!'

হিল্ডার ক্ষ্যাপামিতে আমি হাসি। কিন্তু হাসি ঠোঁটের নীচের চেপে রাখি। একবারটি যদি হিল্ডা বোঝে যে তার সরল বিশ্বাসকে আমি তুচ্ছ কর্‌ছি, তাহলে তার চোখের জলের অবধি থাকবে না। আমি চুপ করে থাকি। হিল্ডা তার বিশ্বাস ব্যক্ত করে।

আমাদের কথা উঠলে কথার আর বিরাম থাকে না। কথার রাশ যদিও টেনে ধর্‌তে পারি তবু আমাদের মনের ভাবের জমাট বাঁধতে এতোটুকুও বাধে না। একজনের অস্তিত্বের অনুভূতিতে আরেকজনের অস্তিত্ব জম্ জম্ কর্‌তে থাকে।

আমাদের কথা চল্‌ল। আমি বল্‌লুম, 'হিল্ডা, স্বার্থপরতার মর্য্যাদা প্রতিভারই প্রাপ্য। ইতর সাধারণ রামু-শ্যামুর প্রাপ্য নয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, রামু-শ্যামু নিজেকে পুরাদমে নেপোলীয়ন বা নীটশে ভেবে বসে; সুপারম্যানের প্রহসন করে মরে।'

'ঠিক,' হিল্ডা বল্লে, 'আরেকটি মুস্কিল আছে। আত্ম-প্রকাশের নামে প্রতিভার যে অভিব্যক্তি আজকাল সাহিত্যে প্রচলিত মতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—তুমিই সেদিন তোমাদের সাহিত্যের কথা বল্‌ছিলে—তাতে অনেকের মনেই ধারণা জন্মাচ্ছে যে নেপোলীয়ন্-নীটশের চেয়ে বড়ো মহামানব আর কেউ নেই। প্রতিভাই যেন পরম কাম্য। কিন্তু তোমাদের দেশের সভ্যতার দিকে তাকিয়ে আমার একটা কথা প্রায়ই মনে হয়, প্রতিভার চেয়ে বড়ো পুণ্য এবং অন্তের প্রতিভা-স্ফুরণে কর্ম্মকুণ্ঠতার একশেষ করায় পুণ্য। প্রতিভায় গৌরব আছে, কীর্ত্তি আছে, শক্তি আছে, কিন্তু পুণ্য নেই।'

প্রজ্ঞাশ্রীর মুখ থেকে কথা লুফে নিয়ে আমি বল্‌লুম, 'য়ুরোপের গৌরব সুপারম্যান্, ভারতবর্ষের গৌরব সি-আর্-দাশ। প্রতিভার বলে ভোগের চূড়ান্ত করেই ইনি ক্ষান্ত থাকেননি; আপনার সমস্ত সঞ্চয়কে সকলের মধ্যে নির্ব্বিচারে কল্যাণ কামনায় বিলিয়ে হয়েছেন পুণ্যাত্মা।'

কথাটা আমার মুখ থেকে টেনে নিয়ে হিল্ডা বল্লে, 'প্রতিভা পুণ্যের সোপান। স্বাধীকরণের নাম প্রতিভা। আর সঞ্চিত ক্ষমতা পরাধীকরণে পুণ্য। প্রতিভায় প্রাণের প্রকাশ অর্দ্ধেক—পূর্ণ প্রকাশ পুণ্যে।'

আমার মনের কথা হিল্ডার মুখে। এরকমটি প্রায়ই হয়। সত্য বল্‌ছি, প্রায়ই হয়। আমার প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। হিল্ডাতে আমাতে গলায় গলায় মিল।

একটা চিন্তা থেকে থেকে আমার মনে কুট্ কুট্ কর্‌ছিল। সুধোলুম, 'হিল্ডা তুমি বলেছিলে তুমি দুঃখী। আমায় বুঝিয়ে বল্‌তে হবে এর অর্থ।'

সোঁ সোঁ শব্দে এক ঝট্‌কা বাতাস কক্ষের এক দরজায় ঢুকে আরেক দরজায় বেরিয়ে গেল।

হিল্ডা বললে, 'এখনো সময় হয়নি। আরেকদিন।'

তারপর বল্লে, 'আমি মিউনিক্ থেকে জান্‌তে চাই তুমি কবে দেশে ফিরে যাবে। তোমার সঙ্গে জন্মের শোধ দেখা তখন লণ্ডনে এসে সেরে যাবো। তারপর পরজন্মে—

জন্মান্তর সম্পর্কিত তার খামখেয়ালী কথা আমি যখন তখন নির্ব্বাক্ হয়ে শুনি; কিন্তু এমন একবারও হয়নি যখন শুনে অবাক্ হয়ে যাইনি, এই ভেবে যে, এই পরদেশিনী-মেয়ে বলে কি ?

আস্তে আস্তে রাত বাড়্‌ছে। নাচ থেমেছে। সবাই যার যার কেবিনে যাবার জন্যে প্রস্তুত। এম্‌নি আর কতোক্ষণ বসে থাক্‌ব। হিল্ডাকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরোতেই বাইরের আকাশের দিকে চোখ্ পড়্‌ল। সুনীলাকাশে চাঁদ তার সুধার ভাণ্ডার উজাড় করে জ্যোৎস্না ঢাল্‌ছে দিক্‌বিদিকে আমাদের জাহাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, হিল্ডার শুচিস্মিত মুখের 'পরে।

আমি ডাক্‌লুম, 'প্রজ্ঞাশ্রি হিল্ডা !'

হিল্ডা বাক্যব্যয় না করে আমাকে টেনে ওপরের ডেকের দিকে নিয়ে চল্‌ল। যে দিকে চাঁদ ভালো দেখা যায় সেখানটায় রেলিং ধরে হিল্ডাকে কাছে টেনে দাঁড়ালুম। বল্‌লুম, 'হিল্ডা, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

'কি ?'

'দেখ্‌তে পাচ্ছো ঐ ষ্টীমারের পাশের ঢেউগুলিতে আকাশের চাঁদ মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যাচ্ছে।'

'তা তো দেখ্‌ছি।'

'আমার কি মনে হচ্ছে বোল্‌ব ? একটা বঁড়্‌শি ফেলে ঐ চাঁদটাকে জল থেকে একেবারে এই ডেকে এনে তুলি।'

'তারপর ?'

'জলের চাঁদ জলো হবেই কাজে কাজেই। যেমন ডিম ভাঙলে তার কুসুম বেরোয় তেমনি এই চাঁদটাকে যেন ভাঙলুম। কি বেরোবে জান ?—তরলায়িত সুধা। তা-ই দিয়ে তোমার অঙ্গ পরিলিপ্ত করে দি'।'

ডাক্‌লুম, 'প্রজ্ঞাশ্রি !'

'কি ?'

'একটি চুমু।'

'তুমি আমায় একটিও চুমু দিলেনা। আমি কি সম্বল নিয়ে এ জীবন কাটাবো বলো দিকিন্ ?'

* * * * *

ডেকের ওপাশ থেকে একটা আর্ত্তনাদ কানে এলো। হিল্ডার হাত মুঠোয় চেপে সেই দিকে গেলুম। কার যেন অসহায় কান্না শুন্‌তে পাচ্ছি। আরো কাছে গেলুম। একী ! এ যে সেই অকুণ্ঠকর্ম্মী আর মিস্ কার্‌টার্। মিস্ কার্‌টার্ কাকুতি মিনতি জানিয়ে লোকটার হিংসাচার থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা কর্‌ছেন। অসম্ভব দৃশ্য ! এক মুহূর্ত্তে আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করলুম। অকুণ্ঠকর্ম্মীকে সজোরে পদাঘাত করলুম। চাবুক খাওয়া কুকুরের মতন লেজ গুটিয়ে অস্পষ্ট স্বরে কি কতোগুলো বিড়্ বিড়্ কর্‌তে কর্‌তে টেগুন পালালো।

মিস্ কার্‌টার্ কাঁপতে কাঁপতে আমার হাত ধরে ধন্যবাদ জানালেন। বল্লেন, 'লোকটা জাহাজে ওঠা অবধি ভীষণ জ্বালাতন করছিল। আমি শান্ত রাখবার জন্যে মাঝে মাঝে ওর ছোটোখাটো আব্দার রাখতে দিয়ে খুশী করতুম। আজ সে আমার সৌজন্যের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়ে গলা টিপে ধরেছিল। আপনারা এসে পড়াতেই বেঁচে গেছি।'

অকুণ্ঠকর্ম্মীর আত্মপ্রকাশের দৌড় আরো যে অনেকখানি গড়াতে পারে তা-ই বুঝিয়ে দিয়ে মিস্ কার্‌টারকে তার কেবিন অবধি পৌঁছে দিয়ে এলুম। সাবধান করে দিলুম, আর আমল দেবেন না।

ভাবলুম, এই ত্রয়োদশ রজনীটি সুলক্ষণা না কুলক্ষণা ?

সেই রাত্রের জন্যে বিদায়ের কালে হিল্ডা বল্লে, 'প্রিয়তম তোমার প্রেমে আজ আমার দীক্ষা হলো। আগামী জন্মে আমার এই আরব্ধ সাধনার সিদ্ধি।'

আবার সেই জন্মান্তরের কথা। কি উত্তর দেবো। আরেকবার চুমু নিয়ে বিদায় নেবো ভাব্‌ছি, হিল্ডা বল্লে—, দীক্ষা একবারই হয়। সাধনার সিদ্ধির জন্যে আমায় আরেক জন্ম অপেক্ষা কর্‌তে হবে। প্রিয়তম, তোমায় দুঃখ দিলুম, তুমি আমায় ক্ষমা করবে তো ?'

আশ্চর্য্য মেয়ে হিল্ডা !

তারপর দেড় বছর কাটল। লণ্ডনে একদিন টমাস্ কুকের বেঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গেছি। দেখি মিস্ কার্টার সেই গদি আঁটা বেঞ্চিতে বসে।

মিস্ কার্টার্ বলে' অভিবাদন করতেই বল্লেন তাঁর কার্টার্ নাম বদ্‌লেছে। এখন তিনি মিসেস্ টেণ্ডন্।

'আপনাদের বিয়ে হয়েছে শেষে ?' আমি একটু উত্তেজিত ভাবেই প্রশ্ন করলুম।

'আস্তে কথা বলুন। আপনাকে সব বলছি, বসুন।'

তিনি যা বল্লেন তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে যে, টেণ্ডন্ তাঁকে টাকার লোভ দেখিয়ে ফুস্‌লাতে আরম্ভ করে। লণ্ডনেই তার একখানা ফ্ল্যাট আছে; তার বাপের একমাত্র ছেলে ব'লে বাপের সব সম্পত্তিই নাকি সে পেয়েছে। তার বাপ পাটের ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছেন। সব টাকাই এখন টমাস্ কুকে ছেলের খরচ পত্রের জন্যে রাখা হয়েছে। সে যাই হোক্, বিয়ের পর সত্যি সত্যি একটা ফ্ল্যাটে টেণ্ডন্ দম্পতী গিয়ে উঠ্‌ল। তাদের একটি ছেলে হতেই স্বামী বল্লে পুত্র প্রতিপালন করা তার কর্ম্ম নয়। মার কাছ থেকে ছিনিয়ে ছেলেকে 'অরফ্যান্' নামে চালিয়ে একটা হাঁসপাতালে রেখে দিলে। স্ত্রীকে শাসিয়ে দিলে যে, ছেলের সমস্ত সংশ্রব তাকে ছাড়তে হবে। মা মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে ছেলেকে দেখে আসত। অতঃপর একদিন ঝগড়ার পর খুব রাগ দেখিয়ে ফ্ল্যাটে তাকে একলা ফেলে টেণ্ডন্ পালিয়েছে। আর তার দেখা নেই। স্ত্রী পরে জানলে যে, টমাস্‌কুকে লোকটার এক কাণাকড়িও ছিল না। বস্তুত স্ত্রীর অর্থেই এদ্দিন চলেছে। ফ্ল্যাটের বাকী ভাড়া সব চুকিয়ে দিয়ে অবশেষে মিসেস্ টেণ্ডনকে ইণ্ডিয়া অফিসে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে হলো। ছেলেকে অনেক কষ্টে হাঁসপাতাল থেকে এনে এখন সঙ্গেই রেখেছে। তার বেঙ্কে লটারীতে পাওয়া ২০০ পাউণ্ড জমা ছিল। তাইতেই চলে যাচ্ছে ?

স্বকৃতকর্ম্মীর কাণ্ড শুনে আমার কিছু বলবার রইল না।

এদিকে আমার দেশে ফিরে আসার দিন ঘনিয়ে আসছে। মিউনিক্ একবার যাওয়া চাই-ই। গেলুম সেখানে হিল্ডাদের বাড়ীতে। হিল্ডার মা চিঠি-পত্রের সূত্রে আমায় জানতেন। এবার আমায় সশরীরে দেখে খুব আহ্লাদ করে বাড়ীতে রাখলেন, কিন্তু হিল্ডা বাড়ীতে নেই, সুইজারল্যাণ্ডে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন করতে গেছে। তার মা বল্লেন, ভারতবর্ষ থেকে মেয়ে ম্যালেরিয়া নিয়ে ফিরেছে। গত বছর থেকে প্রায়ই জ্বর হত। ডাক্তারের পরামর্শ মতো এখন স্বাস্থ্য-নিবাসে আছে।

সুতরাং গেলুম সুইজারল্যাণ্ড। আমাকে পেয়ে খুব খুশী হিল্ডা। দেখ্‌লুম ভয়ানক শুকিয়ে গেছে। চোখ্ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল।

যে দু'দিন তার সঙ্গ পেলুম তার মুখে বার বার একটি অনুরোধ—আমি তার জন্মান্তরের দয়িত হয়ে যেন তাকে গ্রহণ করি। আর সে সেই মহা-মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় রইলো।

আমি তাকে বললুম, 'হিল্ডা, তুমি কি শবরী ?'

শবরীর গল্প আগাগোড়া আমার কাছে শুনলে—বাল্যে যৌবনে বার্দ্ধক্যে শবরীর প্রতীক্ষার কথা। তারপর হাততালি দিতে দিতে ছোট খুকীর মতন বল্লে, 'আমি শবরী, আমি শবরী।'

সেদিন সকালে খুব বরফ পড়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার বিদায়ের দিন ভারাক্রান্ত।

'হিল্ডা, তুমি বলেছিলে তুমি দুঃখী। সে কথা আমায় এখনো কিছু বলোনি।'

'উঃ, আমার কী ভোলা মন। এই কথাটাই তোমাকে বলিনি। আগে বলো, তুমি আমায় ক্ষমা করবে।'

'ক্ষমা তোমায় আমি কি কোরব, হিল্ডা ? আমাদের দু'জনকার ভালোবাসার সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করুন ভগবান্।'

'শোনো তাহলে। একবার আমি একটি পুরুষকে আমার সর্ব্বস্ব দান করেছিলুম। ভেবেছিলুম সে-ই বুঝি তুমি—আমার চিরকালের অভীষ্ট প্রেমের দেবতা। (হিল্ডা কাঁদছে) সে ভুলের অবসান হলো যেদিন সে আমার দেহ কলঙ্কিত করে আমার আত্মাকে খেলো বানিয়ে বল্লে, 'জীবনের পথে চলতে চলতে হাতের কাছে ফুল হয়ে ফুটেছিলে তুমি, ভুলে ওঁকে আমি আবার ফেলে যাচ্ছি। কি দুঃখ তোমার ?' কী স্বার্থপর !'

'হিল্ডা, তুমি কাঁদছো কেন ?'

'কাঁদছি কেন ? তাও বোঝো না ? যেদিন জুতক্ষণ

এলো দেবতার পায়ে অর্ঘ্য হয়ে উৎসর্গীকৃত হবার, সেদিন আমার বিয়ের ফুলে পোকা ঢুকেছে। অপবিত্র ফুল আমি তোমায় নিবেদন করি কি করে? পর জন্মে, প্রিয়তম—

পরজন্মের কথায় বললুম, 'পরজন্ম যদি না থাকে?'

খোঁচা খেয়ে সাপ যেমন ফণা তুলে ফোঁস্ করে ওঠে, তেম্নি ভাবে হিল্ডা বললে, 'হিন্দু হয়ে তুমি পুনর্জন্ম মানো না?'

কোনো বিতর্ক সভা হলে এ প্রশ্নের ওপর হয়তো ঝাড়া আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিতুম। কিন্তু হিল্ডার মুখের এই কথায় আমি একেবারে মুহ্যমান্ হয়ে রইলাম। কণ্ঠরোধ হয়ে এলো।

'গত জীবনে তোমাকে আমি বড়ো কষ্ট দিয়েছি!'

'কি করে জান্লে, হিল্ডা?'

'দেখো, তোমরা পুরুষ মানুষ বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বুঝ্তে চাও। এ বুদ্ধি দিয়ে বোঝার নয়। আমি যা অনুভব করি তা-ই তোমায় বলি। এজন্মে সেই কষ্টের প্রায়শ্চিত্ত না কর্লে তোমায় ফিরে পাবার আমার অধিকার নেই। আমার আত্মপ্রকাশে বাধা পড়েছে।'

'হিল্ডা, তুমি অস্থির মনে যা তা বক্‌ছো।'

'প্রিয়তম, তুমি আমার জন্মে অপেক্ষা কোর্‌বে তো?'

'নিশ্চয় কোর্‌ব। বলো কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। মিউনিক্ থেকে তোমার চিঠি যেন আমি সর্ব্বদা পাই। মনে থাকে যেন।'

'না—না, এজন্মে নয় প্রিয়তম। পরজন্মে আমার অপেক্ষা কোরো। আমি তোমায় পাবই। তুমি আমায় নেবে তো তখন? দেখে চিন্‌বে তো?'

এই বলেই কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। হৃদয় আমার ভেঙে শতখান্ হলো।

'প্রিয়তম, একটি অনুরোধ।'

'কি হিল্ডা?'

'তুমি কিন্তু বিয়ে করো।'

'আর তুমি?'

'আমার জন্যে ভেবো না। তোমায় আমি এই জন্মে খুঁজে পেয়েছি। এর চেয়ে বেশী আমি কিছু চাইনে। তবে তোমায় আমি চিনে নেবো—সে আগামী জন্মে। মনে রেখো—প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম।'

আমার চোখ থেকে জল টস্‌টস্ করে পড়্‌ছে। ঝাপ্‌সা চোখে ভালো লক্ষ্য কর্‌তে পারিনি, বিদায়ের সময় প্রজ্ঞাশ্রী হিল্ডার মুখখানা দেখ্‌তে কিরকমটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

* * *

আজ দু' বছর হলো দেশে ফিরে এসেছি। সেদিন মিউনিক্ থেকে একখানা চিঠি এসে উপস্থিত। হিল্ডা আর বেঁচে নেই। দশ দিনের জ্বরে মারা গেছে। তার শেষ প্রেম-নিবেদন করে বিদায় নিয়েছে আমার কাছে: আমি যেন তাকে আগামী জন্মে চিনে নেই।

হিল্ডাকে মনে মনে আমি কদাপি উপেক্ষা কর্‌তে পারিনি। তাই ব্যাকুল হলাম। তার পুনর্জন্মে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটা আমার কাছে খামখেয়ালী বলেই মনে হত। কিন্তু তার শেষ অনুরোধকে আমি অবহেলা কর্‌তে পার্‌লাম না। তার কি কোনো মানসিক রোগ ছিল? বিখ্যাত মনোবিশ্লেষক শশাঙ্কশেখর বসুকে তার বৃত্তান্ত আগাগোড়া বিবৃত করে চিঠি লিখ্‌লাম। তাঁর উত্তর পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, হিল্ডা আমায় অত্যন্ত ভালোবাস্‌ত। অথচ প্রচলিত সংস্কার বশে তার ধারণা হয়েছিল যে এ জীবনে তার সঙ্গে আমার মিলন পরিপূর্ণ সুখময় কিছুতেই হবে না। তাই রমণীসুলভ তীব্র কল্পনার আবেগে বর্ত্তমান অপূর্ণতাকে মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে সম্পূর্ণতা দান করে সে ভাব্‌লে যে, গত জীবনে সে আমার ছিল—পর-জীবনেও সে আমার হবে।

এই শুধু? এর বেশী নয়? হিল্ডা সত্যিই আমার চিরকালের নয়?

হিল্ডার প্রেমের ঋণ পরিশোধ করার সঙ্কল্প আমার কোথায়, এই কথাই খালি ভাব্‌ছি।

সুশীলকুমার দেব

শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ঘোষের কৃতিত্ব

শ্রীশান্তি পাল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সহরের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন মোটেই আমাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে নাই। কয়েকদিবস হইতেই গৃহে প্রত্যাগমনের প্রবল বাসনা আমাদের সকলকেই অত্যন্ত উদব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল ; এমন সময়ে হঠাৎ কামায়ুথের বাঙ্গালী মহিলা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইলাম। কামায়ুথ রেঙ্গুন সহর হইতে ৫.৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটি বাঙ্গালী পল্লী বলিলে অত্যুক্তি হয়না। এই স্থানের অধিকাংশ অধিবাসীই কর্ম্মজীবী মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী।

রবিবার ২৪শে নভেম্বর সভার অধিবেশনের দিন ধার্য্য হইল। আমরাও ঐ দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় মহিলাবৃন্দ প্রফুল্লকুমার ও বধূমাতাকে হিন্দু সনাতনপ্রথা অনুযায়ী সভামধ্যে বরণাদির দ্বারা যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন। চতুর্দ্দিক শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণের জন্য মনে হইল যেন আমরা বাঙলা মায়েরই স্নেহকোমল ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছি। তাঁহাদের এই আন্তরিকতা বহুকাল আমাদের স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া থাকিবে। ইহার পর যোগনের মহিলা সমিতির সভ্যারাও প্রফুল্লকুমারের সাফল্যের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।

তাঁহাদের প্রদত্ত মান-পত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা উপভোগ করিবেন।—

"জগৎ বরেণ্য শ্রেষ্ঠ সন্তরণবীর, বাঙলা মায়ের সুসন্তান, প্রিয় ভ্রাতা শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষ মহাশয়ের করকমলে—

প্রফুল্লকুমার, তোমাকে আমরা যথাবিহিত অভিবাদন করিতেছি, তুমি আজ দিগ্বিজয়ী বীর। তোমার বীরত্বে কেবল ব্রহ্ম বা বাঙলা দেশ নহে, সমগ্র প্রাচ্যভূমি গৌরবান্বিত। অনেক কথা মনে হয়েছে জল মধ্যে তোমার বীরত্ব দেখে। বীরত্ব বীরত্বই বটে ; মনস্তত্ত্ববিদের চক্ষে সামরিক বা অন্তবিধ বীরত্বে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়না ; কাজেই মনে হয়েছে "বঙ্গের শেষ বীর" লেখার এখনও আমাদের সময় হয়েছিল না ; মনে হয়েছে বক ও ভীমের জল যুদ্ধের কথা ; সর্ব্বোপরি মনে হয়েছে পাষাণ বক্ষে প্রহ্লাদের জলে ভেসে থাকার কথা এবং যুগপৎ মনে হয়েছে যোগলব্ধ শক্তির কথা; কেহ স্বীকার করুক বা না করুক আমরা একথা ঠিক জানি যোগ সাধন ভিন্ন তোমার মত অত দীর্ঘকাল জলে থাকা সম্ভব হতেই পারে না। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তুমি এই কৃচ্ছ্র সাধনের নিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করেছ সে কথা বলতে আমাদের এতটুকুও কুণ্ঠা আসে না।

ভগ্নী হিসাবে তোমার নিকট এক নিবেদন আছে আমাদের হিন্দু মাত্রই নিমিত্ত স্বীকার করে। পাঞ্চজন্য হাতে বিষ্ণু যদিনা রথাগ্রে সারথী রূপে অধিষ্ঠিত থাকতেন কে পার্থের ক্লৈব্য দূর করে যুদ্ধজয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করতো তাঁকে? নিমিত্ত ভুলে গেলে চলবে না, ভাই। যে বাঙলা দেশ দশবৎসর পূর্ব্বেও ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, আজ নিমিত্ত ও সারথীতে অবিশ্বাসী হয়ে সেই বাঙলা হাল-ভাঙ্গা ডিঙ্গার মত বঙ্গোপসাগরের জলে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে। তুমি যখন জলে সাঁতার কাটছ, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি তোমার অনুরক্ত বন্ধুগণ ডাঙ্গায় বসে চিন্তাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তোমার কথা মনে হ'লে তাদের সেই আকুলি ব্যাকুলি এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে। পরন্তু, একথাও মনে রেখো যে ব্যায়ামক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ নাই ; জলে ও স্থলে ব্যায়াম—ব্যায়াম নামেই আখ্যায়িত হয়েছে এবং হবে। অযথা বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন কেউ আমাদের করতে চাইলে তার কথা আমরা স্বজাতিদ্রোহীর কথার মত উপেক্ষা করবো। শতধা বিভক্ত হয়ে যুগে যুগে ভুগে ভুগে আজ আমরা বড় ক্লান্ত। ভারতবাসীর এই ক্লান্তি বিদূরিতকরণ মানসে ভারত-ললনা ব্রত নিয়ম উদ্‌যাপন করেন। জগত সভায় ভাইরা মোদের মাথা তুলে দাঁড়াক্ ভারতের মাতা ও ভগ্নীগণের ব্রত নিয়ম সার্থক হবে তাই তাই ঠাঁই ঠাঁই আর নাই এই আমরা দেখতে চাই। বীরোত্তম! তুমি আয়ুষ্মান্ হয়ে প্রাচ্যের গরিমা পাশ্চাত্যে প্রচার ক'রে ভারতের মুখোজ্জ্বল কর ও নিজে যশস্বী হও এই আমাদের শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা।"

বৃহস্পতিবার ২৮শে নভেম্বর "আরানকোলা" জাহাজে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার দিনস্থির হইল। আমরা গৃহে একখানি "তার" করিলাম। যাহাতে আমরা ঐ দিবস কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে না পারি তজ্জন্য নিয়োগী বাবুরা এবং রায় বাহাদুর বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহাদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে আমরা আরও কিছুকাল রেঙ্গুনে অবস্থান করি। এমন কি তাঁহারা আমাদের অগোচরে কলিকাতায় পৃথক তার প্রেরণ করিবার উদ্যোগও করিতেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের এই প্রগাঢ় স্নেহের অত্যাচারের হস্ত হইতে কোনোরূপে নিষ্কৃতি পাইয়া পরদিবস যথা সময়ে জাহাজে আরোহণ করিলাম। অনোন্যপায় হইয়া ইহারাও আমাদের বিদায় অভিনন্দনের জন্য ব্রুকিংষ্ট্রীট জেটিতে আসিলেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় জাহাজখানি বন্দর ছাড়িল। আমরাও ইহাদের স্নেহের কঠোর বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দেখিতে দেখিতে জাহাজখানি লহরকে পশ্চাতে ফেলিয়া মংকি-পয়েন্টের দিকে ছুটিল। ডেকের উপর দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত উঁহাদের হস্ত সঞ্চালিত বিদায়-সূচক রুমাল দেখিতে দেখিতে অবশেষে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলাম।

প্রত্যাগমন কালে জাহাজে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এবার সামুদ্রিক জর আমাদিগের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া বোধ করি বিশাল সমুদ্র গর্ভে আশ্রয় লইয়াছে পথের এক ঘেয়েমী কাটাইবার জন্য অধিকাংশ সময় প্রফুল্লকুমার তাস খেলিয়া কাটাইত। আমি ঐ রস গ্রহণে অক্ষম হওয়ায় আমার দিন অতিকষ্টেই কাটিতে লাগিল। রবিবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় জাহাজ গঙ্গাসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কুলের দিগন্তব্যাপী শ্যামল ক্ষেত্র, বিচ্ছিন্ন তালীবন, ছোট ছোট আঁকা বাঁকা গেঁয়োপথ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মনে মনে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। পথের ক্লান্তি এক নিমিষেই দূর হইয়া গেল। আনন্দে বিহ্বল হইয়া বিমুগ্ধ নেত্রে আমার বাঙলা মায়ের পল্লী-মাধুরী দেখিতে দেখিতে গান ধরিলাম—"আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।" কত মধুর! কত মিষ্ট এই বাঙলা দেশ!!

বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় "আরাণকোলা" উট্রাম ঘাটের জেটিতে আসিয়া ভিড়িল। আমরা পথিমধ্যে "পাইলট" বোটের কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ পাইয়াছিলাম যে উট্রাম ঘাটের জেটিতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। জাহাজখানি জেটিতে ভিড়িতেই আমাদের সমিতির অন্যতম সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কয়েকজন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বরাবর জাহাজের উপরে আসিয়া প্রফুল্লকুমারকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন। জেটি হইতে অবতরণ করিতেই উৎসাহী জনতা ও কলিকাতার বিভিন্ন সমিতির সভ্যাবৃন্দ প্রফুল্লকুমারকে অভিনন্দিত করিলেন।

এই বিজয় উৎসব উপলক্ষে "শৈলেন্দ্র স্মৃতি" সমিতির তরফ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু মহাশয়া ও বিলাতের পার্ল'ইয়ামেন্টের মহাসভার সভ্য মিঃ এইচ্ কে হেল্‌স-ও আসিয়াছিলেন। মিঃ হেল্‌স, এই দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণের জন্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম—"কমন্স সভার পক্ষ হইতে আমি আপনাকে বিজয় অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনার কার্য্যে ভারত তথা সমগ্র সাম্রাজ্য গৌরব বোধ করিতেছে।" ইস্কুল অফ্ ফিজিক্যাল কালচারের অধ্যক্ষ আমাদের পরম সুহৃদ্ মিঃ জে কে শীল-ও (মুষ্টি যোদ্ধা) এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

জাহাজ ঘাটের অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর আমরা সমিতি অভিমুখে রওনা হইলাম। এখানে পূর্ব্বেই প্রফুল্লকুমারের বিজয় গৌরবের জন্য কর্ত্তৃপক্ষেরা সমিতির প্রাঙ্গণও বিচিত্র আলিপনা, মঙ্গলঘট, ও আম্রশাখা প্রভৃতির দ্বারায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। দ্বারে প্রবেশ মাত্রই কর্ম্মমঞ্চের উপর হইতে শানাইয়ের গুরু গম্ভীর "ভৈঁরো-র" আলাপ আমাদের শুভাগমন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে জ্ঞাপন করিল। সমিতির কুমারী-সাঁতারুবৃন্দ এই অবকাশে আমাদের দুজনকেই পুষ্পমাল্য ও চন্দনের দ্বারায় বিভূষিত করিয়া মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। এই চিত্তস্পর্শী দৃশ্যে আমার অন্তর বিচলিত হইল, মনের মধ্যে একটা বিশেষ রকম গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমাদের প্রত্যাগমনের প্রায় এক সপ্তাহ পরে "শৈলেন্দ্র স্মৃতি" সমিতির সভ্যেরা কলিকাতা "ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট" হলে সহরবাসীর তরফ হইতে প্রফুল্লকুমারের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি বৃহৎ সভা আহ্বান করেন। এই সভার পৌরহিত্যের ভার রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ) মহোদয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। সভায় বহু সম্রান্ত মহিলা এবং ভদ্রব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু মহাশয়া তাঁহার স্বভাব সুলভ সুললিত কণ্ঠে সভায় নিম্নলিখিত মান-পত্রখানি পাঠ করেন।

"পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তরণ বীর বঙ্গজননীর প্রিয় সন্তান প্রফুল্লকুমার ঘোষ করকমলেষু (শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবের উদ্যোগে)—

হে সন্তরণপটু বঙ্গবীর, আমরা তোমাকে স্বাগত জানাই।

তোমার আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও সহ্য গুণে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ, তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরাও যাহাতে ধৈর্য্য ও সহ্য শক্তিতে অনুপ্রাণিত হই। নিষ্ঠার সহিত অবহিত চিত্তে, দেশ মুখোজ্জ্বল করিতে ব্রতী হইতে পারি, সেই দীক্ষা দান করো। আমরা তোমাকে অভিনন্দন করি।

তপস্যার শ্রেষ্ঠ অর্জ্জন, আত্মশক্তির বিকাশ, তিতিক্ষা তাহার প্রথম সোপান, অধ্যবসায় ও সংযমের অধিকারী, হে তরুণ, আমরা ভক্তবৃন্দ তোমার অটুট স্বাস্থ্য কামনা করি।

তোমার চিত্তবল অপূর্ব্ব। সেই অতুলনীয় উৎকর্ষেই আজ আমাদেরও জাতগৌরবের নব প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে। তুমি আমাদের বিস্মিত হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করো।

মঙ্গলময়ের চরণে সাধনার নিত্য প্রার্থনা, ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ। হে তপস্বীসমান সাধক, তোমার সে কামনা কখনো ব্যর্থ না হউক এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

যিনি চিরন্তন, যিনি ধর্ম্মলোক প্রকাশক সেই বরণীয় দেবতা, মাভৈঃ মন্ত্রে দীক্ষিত তোমাকে বরাভয় দান করুন, পার্থের ন্যায় তুমি ভুবন-বিজয়ী হও।

হে সাহসের প্রতীক, মূর্ত্তরূপ, আমরা তোমাকে নমস্কার জানাই।

কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ

আজকাল সংবাদপত্রে সন্তরণের দ্বারা ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংলিশ-প্রণালীটিকে হেদুয়ার পুষ্করিণী বা কলিকাতার ভাগীরথীর অংশে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর, যিনি এক সময় ইংলণ্ডে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে ইংলিশ প্রণালী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে উহা নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিতে হইলে বৎসর দুই রীতিমত শিক্ষাধীনে থাকিয়া ইংলিশ প্রণালীতে নিয়মিতরূপে সাঁতার অভ্যাস ও ঐ স্থানের আবহাওয়ার সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এতাবৎ কাল বাঙ্গলা দেশে যতগুলি সাঁতারু সৃষ্টি হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্মশানেশ্বর সন্তরণ সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র মালিক ও প্রফুল্লকুমারের মধ্যে সে শক্তির কতকাংশ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। উপস্থিত ক্ষেত্রে শেষোক্ত ব্যক্তিই বাঙ্গলা দেশে একমাত্র উপযুক্ত। প্রফুল্লকুমারের অবিচলিত ধৈর্য্য, মানসিক দৃঢ়তা, অদম্য উৎসাহ ও সহনশীলতার পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। মনে পড়ে ২৩ মাইল সন্তরণকালে বৈদ্যবাটীর নিকট আসিয়া হঠাৎ উদরে খাল ধরিল, এমন সময়ে প্রফুল্লকুমার জল হইতে উঠিবার জন্য আমার অনুমতি চাহিল। অনুমতি না পাইয়া এক হস্তে উদরের ব্যথিত অংশ চাপিয়া ধরিয়া অন্য হস্তে সাঁতার দিয়া বৈদ্যবাটী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু বিচারকদিগের সুবিচারে তাহাকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইল! জে পি উল্ফ্ নামে একব্যক্তি ইংলিশ প্রণালীতে সপ্তমবার সাঁতার দিয়া অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হন নাই। বহু সাঁতারু স্রোতের করাল কবলের মধ্যে পড়িয়া অপর পারের তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সমস্ত অভিজ্ঞ সাঁতারু দলের মধ্যে কেহ কেহ ৭০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া তীরে উঠিতে সক্ষম হন নাই। যদিচ ডোভার হইতে ক্যালের দূরত্ব ২১ মাইল মাত্র। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সমস্তই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। এমন কোন সাঁতারু নাই, যিনি সদর্পে বলিতে পারেন যে, তিনি প্রথম চেষ্টাতেই অতিক্রম করিবেন। ইংলিশ প্রণালী সাঁতার দিয়া অতিক্রম করিবার উপযুক্ত সময় জুলাইয়ের প্রথম হইতে আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত।

রাজা মন্মথনাথ রায়ের সহিত একদিন সন্তরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি প্রফুল্লকুমার সম্বন্ধে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, আমার অন্যান্য ছাত্রেরা প্রফুল্লকুমারের সমকক্ষ হয় নাই কেন?

আমি রাজা সাহেবকে আমার অন্যান্য ছাত্রের সহিত প্রফুল্লকুমারের যে কি পার্থক্য তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার অন্যান্য ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই মাইল, অর্দ্ধ মাইল, সিকি মাইল, ২২০ গজ, ১১০ গজ, ওয়াটার-পোলো ডাইভিং ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় বহুবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এমন কি অনেক প্রতিযোগিতার সময় নির্দ্দেশ অদ্যাবধি কেহ অতিক্রম করিতেও সক্ষম হয় নাই। ইহা আমাদের সমিতির কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু একটা কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। হিন্দুস্থানী ভাষায় একটি কথা—আছে—"গুরু মিলে লাখে লাখ, লেকিন্ চেলা মিলে এক।" এ কথাটি ধ্রুব সত্য। প্রফুল্লকুমারের একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, সাহস, বিশ্বাস এবং সর্ব্বশেষে অবিচলিত গুরুভক্তি আজ উহাকে জগতের সম্মুখে ধরিয়াছে।

আমার প্রতি উহার এরূপ বিশ্বাস যে, আমি সম্মুখে থাকিলে অসাধ্য সাধন করিতে সে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না। মনে আছে ১৯৩০ সালে যে বার ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট কাল অবিরাম সাঁতার দিয়াছিল, সেই সময় একদিন প্রত্যুষে পঞ্জার দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করায় আমাকে জলে নামাইয়া বলিয়াছিল—"গুরুদেব তোমার পা-দুটা আমার মস্তকে এবং বক্ষে একবার বুলাইয়া দাও এবং কিছুক্ষণের জন্য আমার নিকট থাক। আমি এই মুহূর্ত্তে আর্থার রিজের সময় নির্দ্দেশ ভাঙ্গিয়া দিব।" তখন মাত্র ৬০ ঘণ্টা হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতে এরূপ অবিচল গুরুভক্তি সত্যই অতি বিরল! ধন্য প্রফুল্লকুমার তুমি কত শ্রেষ্ঠ ও কত মহৎ তাহা এই দীন লেখক কল্পনাতেও আনিতে পারে না!

প্রফুল্লকুমার দমিবার পাত্র নহে। আশা করিয়াছিল, তাহার এই ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সন্তরণের সময় নির্দ্দেশ শীঘ্রই ভঙ্গ হইবে এবং সেই সঙ্গে ১০০ ঘণ্টা নিরবসর সন্তরণের জন্য পুনরায় ঘোষণা করিবে। যখন এই সময় নির্দ্দেশ ভঙ্গ হইল না তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া অভিনব কৌশলে হাতকড়া বদ্ধ হইয়া ২৪ ঘণ্টা কাল সাঁতার কাটিবার সঙ্কল্প করিল। এই ধরণের দীর্ঘকাল সাঁতার কাটা সন্তরণ ইতিহাসে এই প্রথম। আমরা মাত্র ২।১ ঘণ্টার জন্য অভ্যাস করিয়াছিলাম। হঠাৎ ২৪ ঘণ্টার কথা উত্থাপন হইতেই আমি চিন্তিত হইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, একবার ১২ ঘণ্টার জন্য গোপন পরীক্ষা করিয়া পরে ২৪ ঘণ্টার জন্য জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করিব। কিন্তু এই প্রস্তাব উত্থিত হওয়ায় প্রফুল্লকুমার হাসিতে হাসিতে বলিল, "গুরুদেব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি পি, কে, জি। আপনি কম্পমঞ্চের উপর চুপ করিয়া বসিয়া দেখুন আমি কি করি।" আমিও আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বলিলাম,—"তবে তাই হউক।"

শনিবার ৩১শে মার্চ্চ সাঁতারের দিন ধার্য্য হইল। ঐ দিবস কলিকাতার মেয়র এবং পুলিশের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক হাতকড়া বদ্ধ হইয়া বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ৫-৩৪ মিনিটে প্রফুল্লকুমার জলে অবতরণ করিল। সহস্র সহস্র দর্শক হেদুয়ার চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিয়া বিস্মিত নেত্রে প্রফুল্লকুমারের এই অভিনব কৌশলযুক্ত হাতকড়াবদ্ধ অবস্থায় সন্তরণ দর্শন করিতে লাগিলেন। সুকুমার ভড়,—যিনি ৫০ ঘণ্টা একাদিক্রমে সন্তরণ দিয়াছিলেন—জীবনরক্ষক রূপে প্রফুল্লকুমারের সহিত অবতরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পর দিবস অর্থাৎ রবিবার প্রাতে হঠাৎ রক্ত বমন করায় জল হইতে তাঁহাকে উঠাইতে বাধ্য হইলাম।

এই ঘটনার পর হইতে প্রফুল্লকুমার বিনা জীবন-রক্ষকে ২৪ ঘণ্টা কাল সহাস্য বদনে পরিপূর্ণ করিয়া রবিবার ৫-৪৪ মিনিটের সময় বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং জল হইতে সিঁড়ি বহিয়া মঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার এই অলৌকিক কার্য্যে সহস্র সহস্র দর্শক স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় আসিয়া হাতকড়া উন্মোচন করিয়া প্রফুল্লকে অভিনন্দিত করিলেন। শরীর হইতে চর্ব্বি বিমোচন করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য মুক্ত বাতাসে নৌকা বিহার করিতে

লাগিল। এই ঘটনার অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে-ই স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির মতো প্রফুল্লকুমার রাজপথে বহির্গত হইল।

নিরবসর সন্তরণের খাদ্যদ্রব্যের তালিকা :—

১২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট কালে—

১। বার্লি
২। হর্লিকস্
৩। গ্লুকোস্
৪। সন্দেশ
৫। পান

৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিঃ কালে—

১। কাফি
২। কোকো
৩। হর্লিকস্
৪। দুগ্ধ
৫। সন্দেশ
৬। পান

২৪ ঘণ্টা হস্তবদ্ধ অবস্থাকালে—

১। গ্লুকোস্
২। কোকো
৩। কাফি
৪। সিঙ্গাড়া
৫। সন্দেশ
৬। ডাব
৭। পান

অবিরাম সন্তরনের আবশ্যকীয় দ্রব্য তালিকা :—

১। চর্ব্বি
২। ভেসলিন
৩। নারিকেল তৈল বা সর্ষপ তৈল
৪। কলোডিয়াম
৫। রঙীন চশমা
৬। গোলাপ জল
৭। স্পিরিট
৮। তুলা
৯। পাউডার
১০। ফিডিং কাপ
১১। আইস্ ব্যাগ
১২। ষ্টোভ
১৩। আই ড্রপ

উপরিলিখিত খাদ্য দ্রব্য চার্ট হিসাবে এবং সাতারুর অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তিতরূপে খাওয়াইয়া থাকি

শ্রীশান্তি পাল।
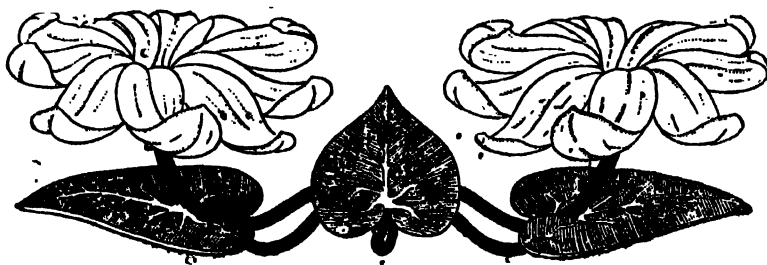
বিতর্কিকা

১। বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা, না-বাংলা ?

শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

আজকাল যাঁহারা বাঙ্গালা মাসিকের খবর রাখেন—তাঁহারা জানেন যে, আমরা যে-দেশে বাস করি ও যে-ভাষায় কথা কহি—সেই দেশ, ও সেই দেশ-ভাষার নামের বানান হরেক রকম দেখা যায়।

এমন কি প্রাচীর বিজ্ঞাপনী হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্র "জয়ন্তী-উৎসর্গে" পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের হোমরা-চোমরা, মাথাওয়ালা, বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোকেরা দেশ ও দেশ-ভাষার নামের বানান প্রয়োগে শিরোনামাদ্ধৃত কোন না কোন একটা বানান লইয়া—একই অনুচ্ছেদে বিভিন্ন পংক্তিতে শব্দটীকে বিভিন্ন হরপের দ্বারা সাজাইয়া—নিজেদের কেরামতি ও বানানের "তাজমহল" সৃষ্টি করিয়াছেন।

অনেকেই হয়ত বলিবেন, ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি ? সমস্ত বানানগুলিকেই যদি ভাষায় স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ত কোন গণ্ডগোলই থাকে না। কিন্তু কথা হইতেছে—বটী ও কলসীকে যথাক্রমে ছুরি ও হাঁড়ি বলিলে কেহ কি স্বীকার করিয়া লইবেন ?

বিভ্রাট অনেক,—সহরের বুকে দুটি নাট্যশালা,—একটী—"রঙ্গমহল" অপরটী—"রঙ্‌ মহল"। আমরা "রং" তামাসা দেখিতে যাই, দোলে "রঙ্‌" খেলি, আর "রঙ্গ"-রস বোধ হয় উপভোগ করি। আবার লোকে নেহাৎ হ্যাংলা লোককেই "ক্যাংলা" বলিয়া থাকে, কিন্তু শচীর দুলাল নিমাই প্রেমের "কাঙ্গাল"। এই বানান সমস্যার মাঝে পড়িয়া গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে ছাত্রের পিঠ বাঁকিয়া যায়; নাবালক শিশু ও বুড়া বাপকে বোকা বানাইয়া দেয়।

আপত্তি হইতেছে অনেক দিক হইতে। প্রথমতঃ ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের বিচারে ঐ বিভিন্ন বানানগুলির শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া হরপের আকারে বানানগুলি কেমন দেখায় তাহাও দেখিতে হইবে।

ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের দিক হইতে বিচার করিয়া সুনীতিবাবু 'বাংলা'কে নির্ব্বাসন দিয়াছেন। তাঁহার মত এই—"সুতরাং বাঙ্গালা ও তজ্জাত বাঙলাকে বাংলা রূপে লিখিলে অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ (অর্থাৎ কিনা বাংলা বাঙ্‌লা ধরিলে) এই বানানকে অশুদ্ধ বলিতে হয়, অপিচ সমপর্য্যায়ের বাঙ্গালী বাঙালী শব্দের সহিত বানানের দৃষ্টিগত সাদৃশ্যকে অনাবশ্যক ভাবে লোপ করিয়া দেওয়া হয়।"

(বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ।০—।৶০)

'শব্দকল্পদ্রুমে' "রাংলা" দেখিতে পাওয়া যায় না। 'বিশ্বকোষ'কার ও ঠিক "বাংলার" অনুমোদন করেন না। কারণ তিনি বরাবর "বাঙ্গালাই" লিখিয়াছেন। 'চলন্তিকা' এ বিষয়ে নীরব।

আশা করি, এ বিষয়ে "বিচিত্রার" সুধী পাঠকবর্গ ও বহুদর্শী সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিবেন।

২। "বাঙ্গালী মেয়েদের শালীনতা বোধ"

শ্রীমতী লতিকা সেন

জ্যৈষ্ঠমাসের বিচিত্রার বিতর্কিকায় শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মৌলিকের লেখা "বাঙ্গালী মেয়েদের শালীনতা বোধ" পড়লাম। মোটামুটি তাঁর সঙ্গে আমার মতের অমিল না থাকলেও তাঁর কয়েকটি অবান্তর কথা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

তাঁর উদ্দেশ্য সাধু, সে বিষয়ে আমি সন্দেহ করি না—তবে, তিনি নিজে পুরুষ, এবং মেয়েদের মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নেহাতই ভাসাভাসা, এবং স্থানে স্থানে ভুল।

মেয়েদের পরে পুরুষদের ব্যবহারের বোধহয় মোটামুটি তিনটে ভাগ করা যায়; প্রথমটি প্রাক্-শিভাল্‌রি যুগ বা খাঁটি সনাতন আর্য্যযুগ (?) যে সময় মেয়েদের তৈজসপত্র বা খুব বেশী হলে গরু বাছুর হাঁস মুরগীর সামিল করা হত। দ্বিতীয় যুগ হল ভিক্টোরিয় যুগের শিভাল্‌রির সময়, যখন নারী দেবী এবং অপ্রাপনীয়া, পুরুষদের পক্ষে তাকে পুজো করা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। আর তৃতীয় যুগ যে সময় নর ও নারী যথাসম্ভব সমান, যা আজকাল সমস্ত সভ্যদেশে চলছে, এবং যে হিসেব ধরলে, ভারতবর্ষ, তথা বাঙ্গলাদেশকে সভ্যতার বাইরে ফেলতেই হবে।

বাঙ্গলাদেশে এখনও সনাতন, তথাকথিত আর্য্যযুগ শেষ হয় নাই। তবে বোধ হয় এখন ভিক্টোরিয় যুগের আধিপত্যই বেশী। সেই কারণে একদল, মেয়েদের বাসে উঠ্‌তে দেখলে, ভুরু কুঁচ্‌কে ভাবেন এ হতভাগীরা এখানে অনধিকার-চর্চ্চা করতে আসে কেন, হাতাবেড়ি ফেলে? আর একদল মেয়েদের দেখলেই সিট ছেড়ে সসম্মানে উঠে দাঁড়ান। আর মেয়েদের যাঁরা নিজেদের সমকক্ষ মনে করেন, সে রকম ছেলে, আর ছেলেদের নিজেদের সমকক্ষ মনে করেন একরকম মেয়ে বাংলাদেশে যদি জন্মে থাকে, তবে তার সংখ্যা এত কম যে তার জন্য আনুবীক্ষণিক লেন্সাসের দরকার। সেই কারণে কোন ছেলের পাশে কোন অপরিচিত মেয়ে বসতে রাজী নন্ এবং কোন মেয়ের পাশে কোনও আত্মসম্মানজ্ঞান বিশিষ্ট ছেলে বসেন না, কণ্ডাক্টারের তাড়ার ভয়ে; কণ্ডাক্টারদের এসব ক্ষেত্রের শিভাল্‌রী স্যার ফিলিপ সিডনির প্রভৃতি গোলটেবিলের নাইটদের অনুকরণীয়। সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ে এসবে চরম আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

যে মেয়েটির কথা লেখক মহাশয় লিখেছেন তার অস্তিত্ব হাজারে একটি, অথবা তার চাইতেও কম। কোন মেয়ে যদি সত্যি সত্যিই অমনি জবাব দিয়ে থাকে তবে, তাঁকে আমি প্রাণখুলে প্রশংসা করব। আর লেখক যাকে সহজ ভদ্রতা বলে ভুল করেছেন, তা হচ্ছে কৃত্রিম শিভ্যাল্‌রী, এবং বাসের যাত্রী সাধারণের সঈর্ষাদৃষ্টি লাভের আনন্দ, এই দুইএর সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

আর মেয়েটির ব্যবহারকে লেখক অভদ্রতা বলে ভুল করলেও আসলে তা অত্যন্ত বড় কথা এবং বাংলাদেশে অল্প মেয়েই অমন চমৎকার জবাব দিতে পারে।

বাসের কথা নিয়েই অনেকখানি বলা হয়ে গেল। লেখকের আর একটি কথা সম্বন্ধেও আমার কিছু বলার আছে। মেয়েদের ব্লাউস্ সম্বন্ধে তিনি অহেতুক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। বাঙ্গালী পুরুষের পোষাক সম্বন্ধে বাঙ্গালী মেয়েদের অনেক অভিযোগ আছে কিন্তু তাঁরা ভুলেও তাঁদের পোষাকের কোন সত্যিকারের কাজের পরিবর্ত্তন করেন কি? তা যখন করেন না তখন মেয়েদের পোষাক সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত অশোভন।

বাঙ্গালী তরুণী শর্ট শার্ট পরে শরীর চর্চ্চায় যোগ দিলে লেখকের চোখে মোটেই ভাল লাগে না। বেশ, তবে কি হ'লে ভাল লাগে? বাঙ্গালী তরুণী কুড়ি বছর বয়সে পাঁচটি অপোগণ্ডের মা হয়ে যক্ষাক্লিষ্ট দেহ নিয়ে সন্তান গর্ব্বে বিচরণ করলে? লেখকের পক্ষে আশা ও আনন্দের কথা যে তিনি শর্ট শার্ট পরে শরীরচর্চ্চানিরতা বাঙ্গালী যতকম দেখতে পাবেন, চার পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা ঠিক সেই অনুপাতেই বেশী দেখতে পাবেন। বাংলাদেশের এ অসহনীয় ন্যাকামোভরা শিভাল্‌রী কবে শেষ হবে?

২ ক। মেয়েদের শালিনতাবোধ

শ্রীসলিলকুমার হাজরা

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ মৌলিক লিখিত "মেয়েদের শালিনতাবোধ" এই প্রবন্ধ মনকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ ধরণের প্রবন্ধ লেখার জন্য যে সাহসের দরকার, সেটা লেখক মশায়ের আছে—তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

কিন্তু অনেকস্থলে লেখক দু'চারটি কুশিক্ষিতা নারীর অশোভন ব্যবহার দেখে, তাই নির্ব্বিচারে সমস্ত বাঙালী মহিলাকে আক্রমণ করেছেন, একথা না বল্লে চলে না। সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগল্ লেখক যখন বল্লেন, ইউরোপীয় মহিলাদের আঁট-সাঁট Costume পরা বাঙালী মহিলাদের আল্গা শাড়ী সেমিজ পরার চেয়ে অনেক বেশী সুশোভন। এতে অনেক বেশী শালিনতা রক্ষা পায়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ যেরকম কাপড় জামা ব্যবহার করেন, তা'তে নাকি কোনরকমে সোজা হ'য়ে চল্লেই শালিনতা রক্ষা পায়; আর দেহ একটু ঋজু হ'লেই বেশবাস এমনই আল্গা হ'য়ে যায় যে তা' দেখে বিদেশীয়গণ তাঁহাদের অর্দ্ধনগ্না আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য রমণীদের সাথে এক পর্য্যায়ে ফেলিতে কুণ্ঠিত হন্ না। আর মাসিমারা (?) নাকি মেয়েদের হোষ্টেল ছেলেদের হোষ্টেলের পাশে করিতেই বেশী পছন্দ করেন।...ইত্যাদি

এই রকমের বহু অভাবনীয় কথা লেখক বলেছেন যেগুলো সর্ব্বাংশে সত্য নয়।

যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে যে, সত্যই যদি মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার তাই হ'য়ে থাকে (লেখক যেরকম বলেছেন), তবে এ বিষয়ে সংস্কার আবশ্যক কিনা। কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে বলার কিছু নেই; কেননা 'শালিনতা' কথাটার ঠিক অর্থ কোন অভিধানেই পাওয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে মানুষের সমাজ আর রুচির উপর। আবার মানুষের রুচি সুচির-কাল-স্থায়ী; তাই দেশে দেশে, যুগে যুগে মেয়েদের বেশ-বাসের তারতম্য দেখা যায়।

আর একটা কথা, যেটাকে কোনমতেই উঠিয়ে দেওয়া চলে না। সেটা হ'চ্ছে, আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েরা যে ছোট কাপড় পরে বা সেমিজ পরে না তার কারণ (তাদের কোন অসদভিপ্রায় নয়) (১) অনেক স্থলেই অর্থাভাব (২) কৃপণতা (৩) আমাদের দেশের শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষদের আর যাই থাক এই সুনাম এখনও আছে যে তাঁহারা নারী দেহকে ভোগ-বিলাসের লীলাক্ষেত্র ব'লে মনে করেন না। সেই জন্যও হয়তো, এদেশের মেয়েরা অন্যের শালিনতার দিকে একটু কম দৃষ্টি রাখেন।

৩। নামের পদবী

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

মাননীয়েষু,

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিচিত্রায় "নামের পদবী" সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে, সাগ্রহে সেটি পড়েছি। শ্রীযুক্ত স্বরূপ গুপ্ত বলেন যে পরিচিত পুরুষদের উল্লেখ করতে হলে আমরা যেমন তাঁদের নামের সঙ্গে 'বাবু' জুড়ে দিই, পরিচিতা মহিলাদের উল্লেখ করতে হলেও তেমনি তাঁদের নামের পিছনে 'দেবী' লিখে দেওয়া উচিৎ। এ সম্বন্ধে আমার কোনই আপত্য নাই। কিন্তু তিনি যদি বলেন যে অপরিচিত পুরুষদের ডাকবার সময় আমরা যেমন 'মশাই' বলে সম্বোধন করি। অপরিচিতা মহিলাদের ডাকবার সময় তেমনি 'ভদ্রে' কথাটি ব্যবহার করা যেতে পারে, তা' হলে আমি অনুযোগ ক'রব।

'ভদ্রে' কথাটি খুবই ভদ্র সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু এ কথাটির গায়ে কি রকম যেন একটু নাটকীয় গন্ধ আছে বলে মনে হয় না কি? পুরাকালের নাটকগুলিতে 'ভদ্রে' কথাটির খুবই প্রচলন দেখা যায়; পথে ঘাটে, মুখে মুখে এই কথাটি চল্‌তে থাকলে কানে হয়ত খুব সুললিত শোনাবে না। 'ভদ্রে' বা 'আর্য্যে' এ দুটির কোনটি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

বাংলা দেশে চিরকাল একটা রীতি চলে আসছে;

সেটি হচ্ছে সকলের সঙ্গেই একটা না একটা সম্বন্ধ স্থাপন করার প্রচেষ্টা। সেইজন্যই দেখতে পাওয়া যায় যে ভিন্ন জাতীয় হলেও অনেক স্থলে আমরা গ্রাম সম্পর্কে 'খুড়া', 'দাদা', 'দিদি' বা 'মাসী' পাতিয়ে বসি। আগে আমাদের দেশের রীতি ছিল যে অপরিচিতা মেয়েদের সম্বোধন করতে হলে 'মা' বলেই তাদের ডাকা হত। এখনও প্রাচীনেরা কোনও মহিলাকে সম্বোধন করতে হলে 'মা' বলেই তাঁকে ডাকেন। যাঁরা পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছেন তাঁরাই জানেন যে মন্দিরের পাণ্ডা আর টোঙ্গাওয়ালা থেকে আরম্ভ করে সকলেই অপরিচিতা পুরমহিলাদের 'মাঈ' বা 'মা-জী' বলে সম্বোধন করে।

আমার বক্তব্য এই যে যদি অপরিচিতা মহিলাকে সম্বোধন করার সময় আমরা "দিদি" বা শুধু "মা" বলে তাঁকে ডাকি, তাতে ক্ষতি কি? অবশ্য একথা উঠতে পারে যে যদি মহিলা স্বল্পবয়স্কা হন তাহলে কি উপায় হবে? ১৭।১৮ বা তারও কম বয়স্কা তরুণীদের মাতৃসম্বোধন করা হয়ত অনেকের পছন্দ হবে না। অনেকেই হয়ত বলবেন যে ইস্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের যদি কেউ 'মা' বলে সম্বোধন করে, তাহলে তাকে হাস্যাস্পদ হতে হবে। কিন্তু কেন যে এক্ষেত্রে হাসির অবতারণা হতে পারে, আমি তা বুঝি না। 'মা' বলে ডাকার অর্থ এ নয় যে যাঁকে ডাকা হচ্ছে তিনি সত্যই সন্তানের জননী। এমন খুবই সম্ভব যে তাঁর সীমন্তে এখনও সিন্দুরের রেখাই পড়েনি। কিন্তু তা' হলেও 'মা' সম্বোধনটিতে হাসির কি আছে? এই একটি মাত্র কথায় যতখানি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যায় এমন আর কোনও একটি কথায় পারা যায় কি? আর তা' ছাড়া শব্দটি যে খুবই মোলায়েম ও শ্রুতিমধুর এ কথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন।

Madam শব্দের উৎপত্তি Madame এই ফ্রেঞ্চ শব্দটি থেকে। *Dame শব্দের অর্থ প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা* বা মান্যা। ইটালী দেশে আগে Madam শব্দের পরিবর্ত্তে Madonna শব্দটি ব্যবহৃত হত। সুতরাং Madam শব্দটির মধ্যে যে মাতৃভাবের একটি ব্যঞ্জনা আছে এ কথা বোধহয় স্বীকার করা যেতে পারে।

তাই আমি বলছি যে আমরা যদি অপরিচিতা মহিলাদের 'মা' বলে সম্বোধন করি তাহলে বোধহয় বিশেষ অন্যায় করা হবে না। 'মা' কথাটির মধ্যে যে দ্যোতনা আছে 'ভদ্রে' কথাটির মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

বেশ বুঝছি যে অনেকেই আমার বিপক্ষে সজ্জিত হচ্ছেন। আধুনিক যুবকেরা অপরিচিতাদের 'মা' বলে সম্বোধন করতে রাজী হবেন, মনে হয় না। তাঁরা হয়ত এমন একটি অভিধা খুঁজবেন যেটি হবে বেশ একটু Chivalrous ও একটুখানি কবিত্ব মাখা। একজন যুবক একটি অপরিচিতা তরুণীকে 'মা' বলে সম্বোধন করছে এই দৃশ্য তাঁদের চোখে অত্যন্ত কটু বলে মনে হবে। তাঁরা হয়ত বলবেন যেখানে মাতৃভাব মনে জাগে না সেখানে 'মা' বলে ডাকা যেতে পারে কেমন করে? অপরিচিতা তরুণীর প্রতি আধুনিক যুবকের কি ভাব জাগতে পারে সে বিষয়ে আমি যখন কিছুই জানি না, তখন কি বলে সম্বোধন করলে যে তাঁদের মনোমত হবে তা-ও আমি বলতে অপারগ।

কথাটা যখন আরম্ভ হয়েছে তখন আরও একটু বিশদ করে আলোচনা হওয়া ভালো। অপরিচিত পুরুষের প্রতি একজন পুরুষের যে মনোভাব হয়, অপরিচিতা নারীর প্রতি একজন পুরুষের মনোভাব ঠিক সে শ্রেণীর নয়। এমন একটা অসমসাহসিক কথা বলে ফেললাম বলে নারী ও পুরুষ সমাজ যেন আমাকে ক্ষমা করেন কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই জানা যায় যে আমি যা বলছি সে কথা কতদূর সত্য। কি বলে অপরিচিত পুরুষকে ডাকব এ সমস্যা কোনদিন আমাদের মনে জাগে না। তাঁকে আপ্যায়িত করতেও আমরা চাইনা। দরকার হলে 'মশাই' বলে আলাপ করি; কাজ হয়ে গেলেই ছুটি। কিন্তু অপরিচিতা নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একটু অন্যরকমের। এক্ষেত্রে আমরা যেন একটুখানি বেশী ভদ্র হতে চাই, একটুখানি *বেশী বিনয়ী; কথাগুলি কইতে চাই আর একটু মোলায়েম* করে। ইংরাজীতে বলতে হলে বলা যেতে পারে—We want to create a good impression. এই যে মনোভাব আমি একে দূষণীয় বলি না কারণ মানুষের প্রকৃতিই এই, আর যা' প্রকৃতি তা' ভালো বা মন্দের বাইরে।

অপরিচিতা নারীকে প্রথম-সম্বোধন করার সময় মনোভাব যে কেমন হয়, সে সম্বন্ধে আমি কোনও কথাই বলতে পারব না; কারণ প্রথমতঃ আমি মনস্তত্ত্ববিদ্ নই এবং দ্বিতীয়তঃ কোনও নারীকে সম্বোধন করার সৌভাগ্য আমার কখনও ঘটে নি। আমি শুধু বলতে চাই যে 'ভদ্রে' কথাটির মধ্যে এমন একটি ইঙ্গিত আছে, যাকে যৌবনের ইঙ্গিত বলা চলতে পারে। নারী জাতিকে সম্বোধন করার সময় কথাটিকে আরও একটু ধীর, গম্ভীর, ও সশ্রদ্ধ (ঠিক যাকে বলে Sober) করে নেওয়া উচিৎ। 'ভদ্রে' কথাটি শুনলেই আমার যেন মনে হয় নায়ক নায়িকাকে সম্বোধন করছে। যিনি সম্বোধন করবেন এবং যাঁকে সম্বোধন করা হবে, তাঁদের যদি কদাচিৎ একথা মনে হয় তা হ'লে ব্যাপারটি নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে না।

অর্থাৎ ব্যাপার হয়েছে এই যে, ইউরোপে মেয়েরা স্বাধীন হয়েছে অনেক দিন। পুরুষেরা অপরিচিতা মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সেখানে মেয়ে পুরুষে এতই বেশী মেলামেশা হয় যে মেয়েরা সেখানকার পুরুষদের চোখে তাঁদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও ঠিক সে রকম হয় নি। আমাদের মেয়েরা পথে, ঘাটে, ট্রামে, বাসে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র কিছুদিন। এখনও শাড়ীর আঁচল বা এলো খোঁপা দেখলে আমাদের মধ্যে অনেকেই একটু চঞ্চল হয়ে ওঠেন। পথে ঘাটে এখনও নারী জাতির এত বাহুল্য ঘটে নি যে তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের আর কোনও কৌতূহল নাই। এখনও আমাদের ইচ্ছা হয় মেয়েদের সামনে এমন ব্যবহার করতে যাতে তাদের চোখে আমাদের ভাল লাগে। 'ভদ্রে' সম্বোধনটির পরিবর্ত্তে আমি 'মা' সম্বোধনটি বসাতে চাই এই ইচ্ছাটি একটুখানি প্রতিবেধ করতে।

এ সম্বন্ধে আরও বিশদ করে বলা অনুচিত হবে। যাঁরা বুঝতে চান, এইটুকু ইঙ্গিত তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

এইবার শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় বিষয়টির সম্বন্ধে আলোচনা করব। তিনি বলেন যে ইংরাজীতে Miss ও Mrs. বলে যে শব্দটী আছে, বাংলায় তার প্রতিশব্দ নাই। কিন্তু সব ভাষার সব কথারই প্রতিশব্দ যে বাংলা ভাষায় থাকতেই হবে এমন কোনও কথা আছে কি? Miss ও Mrs. শব্দ ব্যবহৃত হয় উল্লিখিত মহিলা বিবাহিতা কি কুমারী, সেইটি বোঝবার জন্য। কিন্তু এ কথা বোঝান কি নিতান্তই প্রয়োজন? তা-ই যদি হয় তাহলে মহিলাটি সধবা না বিধবা, সে কথাও ত' বুঝিয়ে দেওয়া উচিৎ। শুধু নামটি উচ্চারণ করলেই যে তাঁর সকল পরিচয় দিয়ে দিতে হবে—নামের স্কন্ধে এতখানি কাজ চাপান অবিচার হবে। আমরা উপেন বাবু কিংবা সুরেন বাবু বলি কিন্তু তাঁরা বিবাহিত কি অবিবাহিত সে কথা সেই সঙ্গে জানিয়ে দিই কি। কেউ যদি সে খবর জানিতে চান, তাঁকে আবার প্রশ্ন করতে হবে। মেয়েদের সম্বন্ধে সেই রকম করলে ক্ষতি কি? যে নাম জানতে চায় সে শুধু মহিলাটির নামই জানবে। তিনি বিবাহিতা না কুমারী, সধবা না বিধবা, সে কথায় কি প্রয়োজন? আর যে এ খবরগুলিও জানতে চায় সে ত আবার প্রশ্ন করলেই পারে।

নামের আগে Miss লেখার এই যে ফ্যাসান এ-টি ইউরোপের আমদানী। বিদেশী যখন সবই বর্জ্জন করছি, এ-টি বর্জ্জন করব না কেন? আর মিস্ না লিখে যদি কুমারী লিখি তাহলে ব্যাপার হবে খাস্ সাহেবকে ধুতি চাদর পরালে দেখতে যেমন লাগে তেমনই।

শ্রীমতী আর শ্রীযুক্তা এই দুটি কথা নিয়ে আমরা একেবারে গোলমাল করে ফেলেছি। ছোটদের শ্রীমতী বা শ্রীমান্ ও বড়দের শ্রীযুক্ত বা শ্রীযুক্তা কেন যে বলা হয় তার কোনও কারণ নাই। ব্যাকরণের হিসাবে ছোট ও বড় উভয়েই শ্রীমান্ বা শ্রীযুক্ত হতে পারে না-কি? Miss Sen না বলে শ্রীমতী সেন ও Mrs. Bose না বলে শ্রীযুক্তা বোস বলার পক্ষপাতী আমি নই। উভয়কেই শ্রীমতী বা শ্রীযুক্তা বলতে রাজী আছি।

তবে যদি মহিলাটি বিবাহিত কি না এ কথা বোঝান নিতান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে 'গৃহিনী' বা ঠাকুরাণী শব্দের প্রয়োগ করলে কেমন হয়? বোস গৃহিনী ও সেন ঠাকুরাণী শুনতে কি শ্রুতিকটু? গৃহিনী ও ঠাকুরাণী যদিই বা মুখে মুখে গিন্নী ও ঠাকরুণে পরিণত হয় তা হলেও কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে করি না।

আমার বক্তব্য শেষ হল। এ বিষয়ে নূতন কথা আরও যদি কেউ বলেন, শুনবার প্রতীক্ষায় থাকলাম।

৩ ক। নামের পদবী

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নামের পদবী সম্বন্ধে শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায় নারী বন্ধুদের ডাকার যে সমস্যা উত্থাপন করেছেন তার সমাধান ক্রমশঃ জটিল হয়ে পড়ছে।

বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীনীহার রুদ্র লিখছেন—"যদি কোন নারী বন্ধুকে ভিড়ের ভিতর থেকে ডাকতে হয় তবে তার নাম ধরে দূর হতে ডাক্‌তে কোন বাধা আছে কি? শ্রীমতী রুবী দেবী, বা ইলা দেবী যদি কোন পুরুষের intimate friend হন তবে তাঁকে নাম ধরে ডাক্‌তে বাধা কি?"

এখন আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে শ্রীমতী রুবী দেবী বা ইলা দেবী যদি পুরুষের intimate friend না হন তা হলেও কি নাম ধরে ডাকা যেতে পারে? তিনি লিখছেন "যদি শুধু মুখ চেনা বা ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলবার বা জিজ্ঞাসা করবার দরকার থাকে দিদি বা বৌদি বললেই চলবে।" এখানেও জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, আগে থেকে দিদি বা বৌদি সম্বন্ধ পাতানো যদি না থাকে বা ঐ সম্বন্ধ পাতাবার মত ঘনিষ্টতা না জন্মে থাকে তাহলেও কি "শুধু মুখ চেনা" বা ভদ্রতার খাতিরে দিদি বা বৌদি বলে ডাকলেই etiquette বজায় থাকে? শ্রীনীহার রুদ্রের এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কতখানি জানি না। নারী বন্ধুদের নাম ধরে ডাকা বা দিদি ও বৌদি বলে ডাকার মত ঘনিষ্ঠতা না থাকলে তাঁদের ঐ রকম ডাকে ডাকলে নারী বন্ধুরা যে খুব সন্তুষ্ট হবেন তা মনে হয় না।

পুরুষদের বেলায় যেমন আমরা উপেন বাবু বা সুরেন বাবু বলতে পারি মেয়েদের বেলায় কি বলতে পারা যায় এইটাই হচ্ছে এখন প্রশ্ন। তখনকার সমাজে পুরুষদের উপাধির শেষে "মশাই" যোগ করে 'চক্কোত্তি মশাই', 'বাড়ুয্যে মশাই' ইত্যাদি চল্‌তো, বর্ত্তমানে সমাজে westernisation এর ফলে চক্কোত্তি মশাইকে replace করেছে Mr. Chakravarty কাজেই মেয়েদের বেলাও যদি আমরা তাঁদের Miss Sen বা Mrs. Gupta বলে ডাকি তাহলে আর কোন গণ্ডগোল উঠতে পারে না, আর সবদিকও বজায় থাকে। তাছাড়া এইটাই এখন চলছে বেশ ব্যাপক ভাবে। শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে কেন যে এ শব্দটি শ্রুতিকটু হয়ে উঠলো তা জানি না।

মোটামুটী ভাবে দেখতে গেলে Miss বা Mrs. শব্দ দুটির ব্যবহারে সকল শ্রেণীর-নারী বন্ধুদের, অপরিচিতই হউক আর পরিচিতই হউক, ডাকা যেতে পারা যায়। এ ছাড়া অন্য পদবী সব জায়গায় সমান ভাবে প্রযোজ্য হয় বলে মনে হয় না।

৩ খ। নামের পদবী

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিতর্কিকাতে "নামের পদবী" নিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ওটা কেবল মহিলাদের পদবী সম্বন্ধে—পুরুষের পদবী সম্পর্কে নয়।

এ কথা বোধ হয় মেনে নেওয়া যেতে পারে যে আমাদের দেশে মহিলাদের নামে পদবী সংযোগ খুবই আধুনিক; কয়েক বছর পূর্ব্বেও আমাদের মহিলাদের নিজ নিজ নামের পরে শুধু "দেবী" অথবা দাসী যোগ করেই তাঁদের পরিচয় দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইংরেজী রীতির অনুকরণেই এখন, কাল যিনি "বাসন্তী মিত্র" ছিলেন আজ বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই "বাসন্তী বসু" হ'য়ে পড়লেন। সে রকম প্রতিভা

নাগ প্রতিভা মজুমদার; শিশিরকণা চাটুয্যে শিশিরকণা মুখুয্যে হ'য়ে পড়ছেন।

এতে যে শুধু আমাদের অনুকরণপ্রিয়তারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা নয়, জটিলতাও অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

নীহারিকা দাশ গুপ্ত বি,এ, পাশ করে ভবশঙ্কর সেনকে বিয়ে করে নীহারিকা সেন হয়ে পড়লেন, কিন্তু তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের নিদর্শনগুলোতে নীহারিকা দাশ গুপ্তই লিখা রয়েছে। অনুকণা বসু ব্যাঙ্কে চলতি হিসাব খুলে টাকা গচ্ছিত রাখলেন, পরে বিশ্বরমণ মজুমদারকে বিয়ে করে অনুকণা মজুমদার লিখে ব্যাঙ্কে চেক পাঠালেন; ব্যাঙ্ক কিন্তু টাকা দিলেন না। অবশ্য উভয়স্থলেই বিস্তর লেখালেখির পরে পরিবর্তন মেনে নেওয়া হলো। ব্যাঙ্কের চেক দস্তখত সম্বন্ধে আরো একটা প্রথা আছে বটে, কিন্তু তাতেও পদবী পরিবর্তনের কৈফিয়তের মতো—Anukana Mazumdar Miss Basu লিখতে হয়।

সুরুচি গুহ ছেলেমেয়েদের প্রতিযোগিতামূলক আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে সুবর্ণপদক পেলেন, কিন্তু বিয়ের পরে সুরুচি ঘোষ হ'য়ে পড়াতে সন্দেহ জন্মালো কে সে পদক পেয়েছিলেন।

আমাদের মনে হয় নিঃসম্পর্কীয়া কোনো মহিলাকে তাঁর নামের পরে "দেবী" ("দাসী" এ যুগে সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণ অচল) যোগ ক'রে সম্বোধন করা চলে। "দিদি" অথবা "বৌদিদি" প্রভৃতি সকলে হয়তো পছন্দও করবেন না এবং তাতে কাজের সুবিধাও হবে না। যেখানে একাধিক "দিদি" অথবা "বৌদিদি" উপস্থিত থাকবেন, সেখানে ওরকম সম্বোধনে কাকে ডাকা হচ্ছে তা বোঝা সহজ হবে না।

যদি ইংরেজী মিস্ ঘোষ, মিসেস্ ঘোষ প্রভৃতির দাবীই বেশী ব'লে মনে হয় তা হ'লে কুমারী ঘোষ ও ঘোষ জায়া প্রভৃতির প্রচলন করা যেতে পারে। প্রথমে একটু বেখাপ্পা বোধ হ'লেও পরে স'য়ে যাবে। এখনো কেউ কেউ কুমারী আশালতা সেন, শৈলবালা ঘোষজায়া ইত্যাদি লিখে থাকেন।

৪। বাঙ্গালীর শিরস্ত্রাণ

শ্রীঅমিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ

বাঙ্গালীর পোষাক নিয়ে 'বিতর্কিকা'তে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে যদিও বলবার আরও অনেক কথা আছে, আমি পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবার আশঙ্কায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই না।

পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্য জাতিই বোধ হয় বাঙ্গালীর ন্যায় কোনও প্রকার মস্তকাবরণ শূন্য হইয়া চলা ফেরা করিতে লজ্জিত বোধ করে। বস্তুতঃ বাঙ্গালীর head-dress বলিয়া কোনও কালেই কিছু ছিলনা—আজও নাই। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই এবং বলা বাহুল্য বাঙ্গালী জাতি ইহাতে লজ্জিত নহে; পরন্তু এইটাই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজন বোধ করিলে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী একটা কিছু শিরস্ত্রাণ উদ্ভাবন করিত। কিন্তু সেরূপ প্রয়োজন, আমরা কোনও দিন বোধ করি নাই। এখন যদি আমরা newly-awakened nationalism-এর খাতিরে একটা শিরস্ত্রাণ উদ্ভাবন করিতে যাই—সেটা যেমন অনাবশ্যক, সেরূপ লজ্জাকর ও হাস্যাস্পদ হইবে। কেন, সত্যই কি আমাদের কোন প্রকার head-dress এর প্রয়োজনীয়তা আছে? খালি মাথায় চলিলে যাঁহাদের রৌদ্র লাগে—ছাতা আছে তাঁহাদের জন্য। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া ফেলি। কলিকাতায় M. C. C. খেলিতে আসিয়াছিল যখন, সকলেই দেখিয়াছিলেন বাঙ্গালী বাবুরা (যুবক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত) কাপড়, পাঞ্জাবীর উপর এক বিলাতী টুপি পরিয়াছিলেন। কি কদর্য্য দেখায়, বাঙ্গালী পোষাকের সহিত টুপি পরিলে। থাক্ ও প্রসঙ্গ। যেহেতু অন্যান্য সকল জাতিই একটা না একটা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে—আমাদেরও করিতে হইবে। এমন কি কথা আছে? বাঙ্গালী জাতীর বিশেষত্বই এইখানে! অনাবশ্যক আড়ম্বর বাড়াইয়া ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।

৫। বাঙালীর জাতীয় পোষাক

শ্রীনীহার রুদ্র

বাঙালীর জাতীয় পোষাক কী হওয়া দরকার আমার আগে তা অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন। কেউ বা পায়জামার পক্ষপাতী আবার কেউ বা ধুতিচাদরের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। আবার হয়ত কেউ বা বলবেন কেন হ্যাট কোট আমাদের জাতীয় পোষাক হওয়া দরকার, দরকারটা যে কী তা আজও আমরা ঠিক করে নিতে পারিনি তাই আজও এ বিষয়ের আলোচনা দরকার।

প্রথম আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে যে আমরা এই পোষাক নির্ণয় করবার আগে শুধু কী সহরের জনকয়েক ভদ্রসম্প্রদায়কে নিয়ে আলোচনা করব না যাদের অশিক্ষিত বলে' দূরে ঠেলে দিয়েছি সেই কৃষক সম্প্রদায়কেও আমাদের দলে টেনে নেবো। যদি কেউ বলেন যে ওদের কথা ছেড়ে দিন তা হ'লে আমি বলব তবে ও বিষয়ের কোন আলোচনা না হওয়াই দরকার, কারণ নানান আবহাওয়ার মধ্যে সহরের দূষিত বায়ুর মধ্যে আমাদের সহরে জীবন এমনি ভাবে বেড়ে উঠেছে যে নিত্য নূতন ফ্যাসানে নকল করাই আমাদের একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাজেই যদি কৃষক সম্প্রদায়কেও দলে টানা যায়, তবে মিঃ ফকির আহম্মদের নির্দ্দেশানুযায়ী পায়জামা প্রথমে বাদ দিতে হবে আমাদের, তার কারণ আমাদের দেশের কৃষকরা দরিদ্র, নিজেদের চাষ করে খেতে হয়। এ অবস্থায় মাঠের এক হাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে বলদের পেছনে পেছনে পায়জামা পরে ঘুরা খুবই অসম্ভব। আবার যদি ধুতি চাদর পরে নেহাৎ বাবু সেজে যাই তাহলেও ঐ অসুবিধা হবে। আর তা ছাড়া দুশ বৎসর আগের বাঙালীর কী পোষাক ছিল তা আবিষ্কার করে নিলেও চলবে না, কারণ আমরা আজ অনেক এগিয়ে এসেছি পুরাণো দিনের ছোট গণ্ডির ভিতর আর নিজেদের বেঁধে রাখলে হাঁফিয়ে উঠব।

কাজেই এমন একটা জিনিষ বেছে নিতে হবে যার দ্বারা ছোটখাট অসুবিধা কেটে গিয়ে চলাফেরার অনেক সুবিধা আমাদের হবে। ওটা বিদেশী আর এটা দিশি, কাজেই হ্যাট কোট পরা একটা ঘোরতর পাপ, আর ধুতি চাদর পরা খুবই পুণ্য তা ভাবা আমাদের চলবে না, দিশিই হোক আর বিদেশীই হোক আমাদের জীবনের দৈনন্দিন চলাফেরার সঙ্গে যদি খাপ খায় তবে সেই পোষাকই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। দিনে দিনে অনেক কিছুর পরিবর্ত্তন হবে ও হতেছে।

ফুটবল খেলা আমাদের দেশে আগে ছিলনা কিন্তু আজকাল ওর চলন এত বেশী যে মনে হয় ওটা যেন আমাদের জাতীয় খেলারই একটা অংশ সেই রকম অনেক কিছু নূতন হয়তঃ আজ আমাদের পোষাকের মধ্যে যোগ করতে হবে আবার তেমনি অনেক কিছু কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে দিতে হবে।

আমরা দরিদ্র সেই দিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যে পোষাকে আমাদের খরচ খুব বেশী হয়ে না যায়। উৎসবের সময় ধুতি চাদর আবার খেলার মাঠে প্যাণ্ট অফিসে সুট, এত হরেক প্রকারের পোষাক ব্যবহার করার কোন মানেই হয়না। অতগুলি ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন না হলেই ভাল হবে বলে মনে হয়। জাতীয় পোষাকই যখন নির্ণয় করতে হবে তখন এমনি একটা পোষাক চাই যার দ্বারা আমাদের উৎসব সভাসমিতি অফিস প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করা চলবে।

মোহম্মদ আবদুল হামিদ মহাশয় বলেছেন যে কোট প্যাণ্ট পরলে কেউ সাহেব হয়ে যায় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার মনের গতি ঘরের দিকে তাকায়। বাস্তবিক তাই, কোট প্যাণ্ট পরলেই যে আমাদের বাঙালীত্ব ঘুচে গিয়ে সাহেবত্ব এসে যাবে তার কোন মানে নাই তবে আমাদের দেখতে হবে হ্যাট কোট আমাদের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে মানাবে কিনা, প্রথমতঃ ওতে খরচ পড়বে ঢের বেশী আর দ্বিতীয়তঃ এ গরমের দিনে এই "হোদল কুতকুত" একটা পরে থাকলেও বেশ নিরাপদ হব বলেও মনে হয় না।

দিনে দিনে আমাদের যুবকরা মেয়েলীভাবাপন্ন হয়ে

পড়ছে। সাহস ধৈর্য্য নাই, উৎসাহ নিবে এসেছে ধীরে ধীরে। এ হেন অবস্থায় বেশ সহজে অল্প খরচে এমন একটি পোষাক চাই যার দ্বারা আমাদের প্রায় সব কাজই বিনা বাধায় হয়ে যাবে আর আমরা কাজকর্ম্মেও বেশ উৎসাহ পাব। আমার মনে হয় এর জন্য বাঙালীর পোষাক হওয়া উচিত মালকোঁচা মারা কাপড় ও গায়ে সার্ট অর্থাৎ হাফ সার্ট হলে বেশ ভাল হয় কারণ তাতে খরচও কম পড়ে আর কাজকর্ম্ম করার সুবিধাও হয় অনেক, আর পায়ে থাকবে নাগরা বা সু। অফিসে খেলার মাঠে, উৎসবে ও সভা সমিতিতে প্রত্যেক যায়গায় এ পোষাক চলতে পারে বিনা বাধায়। দিনের মধ্যে চারবার পোষাক বদলানোর কোন দরকার নাই। লম্বা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরে তার উপর লম্বা ঝুলের সার্ট বা পাঞ্জাবী গায়ে দেওয়া মেয়ে পেটার্ণ চেহারা করে আমাদের কোন কাজই হয়না। আর বাধা আসে পদে পদে।

আর শিরস্ত্রাণ, জিতেন্দ্রনারায়ণ মহাশয় বলেছেন যে বম্বে মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশের লোকেরা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে বলে ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে তাদের চুল পেকে যায় আমার মতে এর মূলে কোন ভিত্তি নাই। কারণ যদি তাই হতো তবে পাশ্চাত্যি জগতে আজ কালকার ২০।২৫ বৎসরের যুবকরা অকালে বার্দ্ধক্যের দুঃখভোগ করত, কারণ তারা সবাই সব সময় হ্যাট পরে থাকে।

তবে আমাদের দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী আমাদের শিরস্ত্রাণ চাই সাদা রংএর কারণ সাদা রং রৌদ্র নিবারক, কালো রং রোদ absorb করে নেয় কাজেই এই গরমের দেশে সাদা টুপীই আমাদের শিরস্ত্রাণ হওয়া দরকার। বাজারে গান্ধী ক্যাপ বলে যা বিক্রি হয় তা মন্দ হবে না। ফুটফাটা রোদে শিরস্ত্রাণ থাকলে মাথাটাকে কিঞ্চিৎ রক্ষা করা যাবে বলে মনে করি প্রখর রোদের হাত হতে।

ধূলির শিশু

শ্রীমতী রাজকুমারী অর্চ্চনা ঘোষ

রামরাজাতলা শঙ্কর মঠ
ছাতিম গাছের তলে
দেখিলাম এক নবজাত শিশু
শ্যামল ধরণী কোলে।

ভিখারী মাতার আহরণ করা
মলিন বিছানা গুলি
পারেনি ঢাকিতে তনুটুকু, তাই
সারা অঙ্গে মাখা ধূলি।

জননী তাহার কাছে সে ত নাই,
গিয়াছে বুঝিবা হায়
জঠর অনল নিবাইতে, ভুলি
তনয়ের মমতায়!

দেখিবারে তারে কাছে কেহ নাই,
শুধু এক "সারমেয়"
কি জানি কি ভেবে বসিয়া রয়েছে
আগুলিয়া শিশু দেহ।

ঝিমায়ে ঝিমায়ে দেখিতেছে আর
ভাবিতেছে মনে মনে,
ইহার স্বজাতি মানবের দল
ইহারে কেননা চেনে।

ঐ যে চলেছে রাজপথ দিয়া
জনমেলা অগণন,
কথা কৌতুকে হাস্য পুলকে
সকলেই নিমগন,—

ওরা একবার দেখেনা ত ফিরে
এ ধূলির শিশুটিকে,
স্নেহ মমতায় দু বাহু বাড়ায়ে
নেয়না ত তুলে বুকে।

ঐ যে রয়েছে উপবন ঘেরা
রাজহর্ম্ম্যের রাজি,
বিশুদন্তে গম্বুজ তুলি
সাক্ষ্য দিতেছে আজি,—

এখনো খুঁজিলে ঐ প্রাসাদের
ভিত্তির পাদমূলে
ইহাদের পিতৃ- পিতামহদের
অস্থি মজ্জা মিলে!

এখনো খুঁজিলে ঐ প্রাসাদের
প্রতি ইষ্টক ফাঁকে
ওদের ত্যাগের কীর্ত্তি কাহিনী
রক্ত আখরে লেখে!

উহারাই আজো পাথর ভাঙিছে,
গড়িতেছে রাজপথ,
পাহাড়ের বুকে ভিত্তি গাড়িয়া
তুলিতেছে ইমারত,

কাঁকর মাখান নীরস মাটিতে
দেহের ঘর্ম্ম ঢেলে
রঙ্গিন করিয়া তুলিছে নিতুই
তিল সরিষার ফুলে।

শ্রাবণের ধারা বুকে ধ'রে এরা
ধান্য রোপণ করি
চৈত্র দিনের ভীষণ খরায়
গরুর গাড়ীতে ভরি

লয়ে যায় দূর মুনিবের বাড়ী
অবনত করি শির,
ফিরে অবশেষে নিশ্বাস ফেলি
চক্ষে ভরিয়া নীর!

যাদের লাগিয়া মুখের অন্ন
ইহারা তুলিয়া ধরে,
বিনিময়ে হায়, ছোটলোক নাম
উপাধিটি ক্রয় করে।

ইহারাই গেলে দেবের দেউলে
দেবতা অশুচি হয়,
সমাজের যত পরগাছা বয়ে
দেবতা ক্লান্ত নয়?

যুগ যুগ ধরি যাহারা কেবল
ত্যাগের সাধনা করি
স্বর্গ তীর্থ বিমল সলিল
বক্ষে লয়েছে ভরি,—

সুগত অতীত সম্যাগত যুগে
পরার্থে ত্যাগে দানে
হইল কেবলি বঞ্চিত যারা
সম্মানে ধনে মানে,—

তাহাদেরি ওই নিরুপায় শিশু
শেফালি-শুভ্র প্রাণ,
তোমাদের ঘরে হয় নাকি তার
হাত পরিমান স্থান?

ঘুমাও ঘুমাও ধরণীর শিশু
আকাশ ধরণী অঙ্কে;
ডুবে যাক্ তারা ডুবে গেছে যারা
বিলাস-প্রমোদ-পঙ্কে।

বায়ুকোণে ওই তুলিতেছে পাল
ঝড়ের দেশের মাঝি,
মহাপাপ ভরে বাসুকির ফণা
টল মল করে আজি।

গণদেবতার হোমের অনল
লক্ লক্ শিখা লয়ে
ভূমিকম্পের রূপে আসিতেছে
অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে।

রাজকুমারী অর্চ্চনা ঘোষ

স্বর্গীয় অনু ঘোষ ও তাঁহার আবিষ্কার

শ্রীরমেশ বসু এম-এ

স্বর্গীয় অনুকূল চন্দ্র ঘোষ, এফ, সি, এস্; এফ্, জি, এস্; এম্, আই, এম্, ই, সাধারণতঃ অনু ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক ও নানা বিদ্যায় উৎসাহশীল লোক খুব অল্পই দেখা যাইত। তিনি নানা

স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র ঘোষ

রকমে খ্যাতি অর্জন করিয়াও কখনও নিজেকে জাহির করিতে চাহিতেন না, সেই জন্য বিশেষজ্ঞ ও রসজ্ঞ সমাজের বাহিরের অনেকেই তাঁহার নামও বোধ হয় জানেন না। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আত্মীয় ও বন্ধুজনদের এবং দেশের যে কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার আবিষ্কারের ক্ষুদ্র একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

তিনি মেজর এফ্, সি, ঘোষ, এম, বি, আই, এম, এস, মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। বঙ্গদেশের হিন্দুদিগের মধ্য হইতে প্রথম তাঁহার পিতা ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে (Indian Medical Service) প্রবেশ লাভ করেন। তখন উহা বঙ্গীয় চিকিৎসা বিভাগ (Bengal Medical Service) নামে পরিচিত ছিল। স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষা বিষয়েও এই পরিবার অগ্রণী ছিল। তাঁহার ভগিনী স্বর্গীয়া কুমারী ঊষা ঘোষ হিন্দু বালিকাদের মধ্য হইতে প্রথম যুগে লোরেটো বিদ্যালয়ে (Loretto House) এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ করেন।

পরলোকগত অনু ঘোষ মহাশয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অ্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুল ও হিন্দু স্কুল হইতে পাঠ সমাপন করিয়া সেন্ট জেভিয়ার কলেজে ভর্ত্তি হন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি কলেজে বেশী দূর পড়িতে পারেন নাই, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় নিজের বিশেষত্বের পরিচয় দেন। এই সময়েই তিনি বৈজ্ঞানিক নানা বিষয় সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বহু প্রবন্ধ "উদ্বোধন" এবং ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। তখন উক্ত ইনষ্টিটিউট Society for the Higher Training of Youngmen নামে পরিচিত ছিল।

ইহার অল্প কাল পরেই তিনি কলিকাতার যাদুঘরে Reporter on Economic Products এবং পরে Economic Chemist ডক্টর হুপারের (Dr. Hooper) অধীনে দুর্ভিক্ষকালীন খাদ্যদ্রব্য (famine products)

সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করেন। তাঁহার এই বিশেষত্ব-পূর্ণ গবেষণা একটি প্রবন্ধাকারে—ঐ প্রবন্ধের নাম Asphodelus Tennifolius, an Indian Famine Food—সুপ্রসিদ্ধ সরকারী কৃষি পত্রিকা Agricultural Ledgerএ প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি "Jambon & Co"তে প্রথম বিশ্লেষণ রাসায়নিক (Analylical Chemist) ও পরে ভূতাত্ত্বিক ও খনিবিদ্যাবিশারদ (Geologist and Mineralogist) রূপে কাজ করেন। তিনি শীঘ্রই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ম্যাঙ্গানিজ খনি বলিয়া প্রসিদ্ধ সন্দুর ম্যাঙ্গানিজ খনি আবিষ্কার করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। এই খনি সম্বন্ধে তাঁর উপাদেয় প্রবন্ধ Mining and Geological Institute of India কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় এবং উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ যথা Sir Thomas Holland, Sir Henry Haydn এবং ভারতের ভূবিদ্যা বিভাগের কর্ত্তা Dr. Fermor কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। ইঁহারা সকলেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাকে সন্দুর খনি সম্বন্ধে মৌলিক, মূল্যবান গবেষণামূলক পুস্তকের জন্য ভারত গবর্ণমেন্টের পুরস্কার (Govt. of India prize) দেওয়া হয়। উপরোক্ত Jambon & Co তাঁহার দ্বারা সন্দুর খনি আবিষ্কারের ফলে প্রভূত লাভবান হয়; পরে যখন এই কোম্পানীর কারবার The General Sandur Mining Co. নামে রূপান্তরিত হয় তখন উহা তাঁহার কাজের জন্য সন্তোষ প্রকাশের হিসাবে তাঁহাকে ২৫০০০৲ টাকা বোনাস প্রদান করেন।

এখন হইতে তিনি নিজে খনির মালিক হইলেন। তিনি খনির সন্ধানে ভারতবর্ষের উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম বহু স্থানে পরিভ্রমণ ও পরিশ্রম করেন। তাহার ফলে তিনি বহুস্থানে manganese, galena, তামা, barytes, হীরা, cement এবং steatite এর মহামূল্যবান সঞ্চয়-ক্ষেত্র (deposit) আবিষ্কার করেন। তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত দক্ষিণ ভারতের barytes এর খনি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বিগত মহাযুদ্ধের সময় রং প্রস্তুত করিবার জন্য যে পরিমাণ barytes ভারতবর্ষে সরকার হইয়াছিল প্রায় তাহার সবটাই তিনি সরবরাহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে তখন লোকের খুব টাকা হইয়াছিল।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান খুব গভীর ও বিস্তৃত ছিল এবং সে বিষয়ে তিনি হাতে কলমে ও স্বয়ং কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রশংসিত হইয়াছিল। Indian Industrial Commissionএর সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্য তিনি মাদ্রাজ সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সুদক্ষ ও উপযোগী আলোচনার জন্য তিনি উক্ত কমিশনের সভাপতি Sir Thomast Holland কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত কমিশনের সম্মুখে সরকারের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় Indian Chemical Service নামে একটি বিভাগ খুলিবার জন্য খুব জোর দিয়া বলেন, কেন না তিনি মনে করিতেন যে ভারতীয় শিল্প সাধনের সহায় রূপে এইরূপ একটি বিভাগ অত্যন্ত আবশ্যক। যখনই Indian Mines Actএ কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইত অথবা ঐ আইনের অনুসরণে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হইত তখনই সরকার তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। খনির মালিক স্বরূপে তিনি যত বেশী সংখ্যক ইজারা ও সনদ (Leases and licenses) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ততগুলি কখনও কোন একজন ভারতীয়ের ভাগ্যে জোটে নাই। দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র তিনি খনির মালিক ও ব্যবসা বিষয়ে অগ্রণী রূপে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিও তাঁহার ঐ সব প্রচেষ্টার কোন খবরই রাখিতেন না।

তিনি বহু পণ্ডিত-সমাজের সভ্য ছিলেন, যথা, বিলাতের The Chemical Society, The Geological Society, The Institute of Mining Engineers এবং ভারতবর্ষের The Mining and Geological Institute of India—এই শেষোক্ত সমাজের তিনি পরিচালন সভার সভ্য বহু বৎসর ছিলেন। উপরে উল্লিখিত সমাজগুলির মধ্যে শেষ দুইটি দ্বারা পরিচালিত সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় তিনি বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

তাঁহার আবিষ্কার শুধু ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি রাসায়নিক গবেষণা ও আবিষ্কারেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় অন্যান্য ব্যবসার ন্যায় খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়েও কিছু কাল প্রচুর উন্নতি ও সম্পদ লাভের যুগ আসিয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার তাহাতে দুর্যোগ দেখা দেয়। তখন তিনি রাসায়নিক দ্রব্য নির্মাণে কৃতসঙ্কল্প হন এবং The Century Chemical Company নামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানী নানা রকমের সার, বিষনাশক, ও কীট পতঙ্গ নাশক দ্রব্যাদি (fertilizers, disinfectants, insecticides, germicides) প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। এই সকল দ্রব্য অতি প্রবল শক্তি সম্পন্ন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ দোকান The Planters Stores এই সকল দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিবার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছে। এই কোম্পানীর প্রস্তুত "Empranin" ম্যালেরিয়া বিষয়ে সরকারী বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা অতি কার্য্যকর ম্যালেরিয়া বিনাশক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সব ভিন্ন তিনি বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের কৃষিকার্য্যের প্রধান কণ্টক কচুরি পানা (water hyacinth) বিনাশ করিবার জন্য একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের বিবরণ ও ব্যাখ্যা তিনি বঙ্গদেশের তৎকালীন গভর্ণর লর্ড লীটনের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে উৎসাহ দান করার পরিবর্ত্তে একজন বিদেশীকে সুযোগ দেন। এই বিদেশী ম্যালেরিয়া দূর করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া দাবী করেন, এবং গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নানা রকম পরীক্ষা চালাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু সে পরীক্ষায় কোনই ফল হয় নাই।

যদিও তিনি ব্যবসা এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাপার লইয়া বিশেষরূপে ব্যস্ত থাকিতেন তথাপি তিনি পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। অনেক সময় এই সব রচনা The Madras Mail, The Times of India এবং The Mythical Society-র পত্রিকায় প্রথম ও গৌরবান্বিত স্থান লাভ করিত। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। বাস্তবিক, যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন তাঁহারাই তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞানসেবীর পক্ষে এতটা প্রত্নানুরাগ দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। তিনি প্রাচীন ভারতের গৌরবে অতিমাত্রায় গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় তিনি নিজের খনিবিদ্যা সম্পর্কিত কাজের পরেই পুরাতত্ত্বের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার জীবনের এই একটি বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি খুব বড় পুরাতত্ত্ব বিষয়ক আবিষ্কার করিবেন। এই আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছিল। তিনি মূল্যবান্ খনিজ দ্রব্যের সন্ধান করিতে করিতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কর্ণুল জেলার পত্তিকোণ্ড তালুকের মধ্যে য়ারগুড়ি নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে একস্থানে একত্র স্থিত অশোকানুশাসন সমূহ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের কথা সাধারণ্যে প্রচার করিতে যাইয়া ভারতীয় 'প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অস্থায়ী অধ্যক্ষ মিষ্টার এইচ্. হারগ্রীভস্ বলেন যে ইহা "the greatest in Mauryan Epigraphy made during the last half of a century." কিন্তু প্রথম তিনি ভয় পাইয়াছিলেন যে সরকারী পুরাবিদ্‌গণ তাঁহার এই আবিষ্কারে তাঁহার কৃতিত্ব স্বীকার না করিতে পারেন, তাই তিনি বহু বৎসর ধরিয়া এই আবিষ্কারের কথা গোপনে রাখেন। কিন্তু শেষে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের প্ররোচনায় তিনি ইহা প্রকাশ করেন। যাহা হউক তাঁহার কৃতিত্ব সরকারী বিবরণে স্বীকৃত হইয়াছে (Annual Report of the Archœological Survey of India, 1928-29, pp. 114, 161). পুরাতত্ত্ব বিভাগের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহ্‌নী ও প্রত্নলিপিজ্ঞ ডক্টর হীরানন্দ শাস্ত্রী উভয়েই ঘোষ মহাশয়ের আবিষ্কারকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তির অন্তরালে তাঁহার মনে প্রবল সৌন্দর্য্যানুরাগ ছিল। অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি প্রাচীন শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহার সংগ্রহ রসিক-সমাজের নিকট কলিকাতার একটি দর্শনীয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বহু রকমের শিল্প সংগ্রহের মধ্যে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল বৌদ্ধ শিল্প সম্বন্ধীয়

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এ ধরণের যে সকল সংগ্রহ আছে সেগুলির মধ্যে এ সংগ্রহের স্থান অতি উচ্চে। তিনি ভারতবর্ষ, নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, সিংহল, চীন ও জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে নির্ম্মিত অসাধারণ শিল্প-সৌষ্ঠব সম্পন্ন বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞেরা এরূপ সংগ্রহের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। ঘোষ মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে এই অপূর্ব্ব বৌদ্ধমূর্ত্তি সংগ্রহের একটি বিবরণী বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। তিনি উহা সচিত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সে কাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। শুধু মূর্ত্তি নয়, চিত্রসংগ্রহেও তাঁহার সমান অনুরাগ ছিল। তিনি কাংড়া চিত্রের যে সংগ্রহ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার অনুপম রসজ্ঞানের পরিচয় দেয়। কাংড়ার অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বহু চিত্র তাঁহার সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। সেগুলি স্বয়ং চক্ষে না দেখিলে বর্ণনা দ্বারা তাহাদের মাধুর্য্য বোঝান অসম্ভব হইয়া পড়ে। তিনি শিল্প বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও সমালোচনা "রূপম্" ও "রূপলেখা" নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত করেন।

তিনি বিগত ১৯১৯ সালে কলিকাতার কায়স্থ সমাজে এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নানা কাজে সত্যই সঙ্গিনী স্বরূপ ছিলেন।

হঠাৎ এবং আকস্মিক ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ১৯৩২ সালের ২৬শে জুন তারিখে পরলোকগত হন। তাঁহার ন্যায় গুণী, সরল, অমায়িক এবং উৎসাহশীল ব্যক্তির মৃত্যু পরিচিত সকলেরই শোকের কারণ হয় এবং মাত্র ৫২ বৎসরে তাঁহার ন্যায় জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যপন্থী, বহু কর্ম্মান্বিত এবং অগতানুগতিক জীবনের অবসানে দেশের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে।

শ্রীরমেশ বসু

পুস্তক পরিচয়

মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ-আর-ই-এস্ বিরচিত। ৯০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-হইতে শ্রীঅরুণ-কুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

"শনৈঃ কন্থা শনৈ পন্থা"—একটি প্রাচীন প্রবাদ। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় শনৈঃ শনৈঃ অনেকগুলি 'জীবন চরিত' লিখিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার 'হেমচন্দ্র', 'রঙ্গলাল,' 'কালীপ্রসন্ন সিংহ,' 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,' 'কিশোরীচাঁদ মিত্র,' 'ভোলানাথ চন্দ্র' প্রভৃতি চরিতাখ্যানের এক পংক্তিতে আসিয়া সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে 'রাজকৃষ্ণ'। বহিগুলির একটা বৈশিষ্ট্য সমস্ত পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকেরই ভাষা সহজ, স্বচ্ছন্দ-গতি ও স্থানে স্থানে অনাড়ম্বর কবিত্ব-পূর্ণ। প্রত্যেক পুস্তকেই অসাধারণ শ্রমলব্ধ উপকরণ সংগ্রহ পাঠকের প্রত্যেকেরই উদ্দিষ্ট গ্রন্থ নায়ক সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ হইবে। তৃতীয়তঃ, বহিগুলির আকার যত বড়ই হউক না কেন, ইহাদের মধ্যে প্রাচীন চিত্রের এতটা বাহুল্য যে এক একখানি পুস্তক যেন চিত্রশালা। পুস্তকগুলি সযত্নে গ্রন্থাগারে রাখার যোগ্য, একবার পড়িয়া ছাড়িয়া দেওয়া বা হারাইয়া ফেলিবার নহে। ইহাদের বাইণ্ডিং কাগজ ও ছাপা সুন্দর। যদি কোন পাঠক ঘূর্ণমান একটি সেল্‌ফ তৈরী করিয়া বইগুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন, তবে টেবিলের সামনে থাকিলে অনেক সময়েই দরকারে লাগিবে। ইঁহার নূতন পুস্তক "রাজকৃষ্ণ" আমার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছে, মূল নায়কের বিবরণের সঙ্গে যে চালচিত্র দেওয়া হইয়াছে—সেই সাময়িক অবস্থা চিত্রণ ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগুলি বড়ই উজ্জ্বল হইয়াছে—তাহা বঙ্গদেশের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ। এই বইখানিতে অন্যান্য ছবির সঙ্গে বঙ্কিম বাবুর তরুণ বয়সের যে একখানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে অনেকেই হয়ত পরিচিত নহেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম—শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র অনূদিত, ৬১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে ডি, এম, লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য আট আনা।

শুধু অনুবাদ নহে—রসের অনুবাদ। কোন পরদেশী কাব্যকে ভাষান্তরিত করিতে হইলে ভাষা ও ছন্দের উপর যত অধিক অধিকার থাকা আবশ্যক, সতীশচন্দ্রের তাহা আছে। তাঁহার রচনা-রীতি অতি সুন্দর। বইখানি পড়িয়া সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেম ও প্রতিমা—শ্রীরমেশচন্দ্র দাস প্রণীত। প্রকাশক এম্-সি সরকার এণ্ড সন্‌স্। ৪৫ পৃষ্ঠা দাম ১৲

তুমি আর আমি—শ্রীসুধীর মিত্র প্রণীত। প্রকাশক পি-সি সরকার এণ্ড কোং। ২৮ পৃষ্ঠা, দাম আট আনা,—বাঁধানো বারো আনা।

এই দুটি তরুণ কবির কাব্যদুখানি পড়ে আমরা পরম প্রীত হ'য়েছি। বাংলাদেশে আজকাল কবির অভাব নেই; কবিতার বই যে আরো বেশি ছাপা হয় না,—তার কারণ দেশের কবি-প্রতিভার অভাব নয়,—দেশের অর্থাভাব। তার উপর, এই দুটি বই-এরই কবিতাগুলির বিষয়-বস্তু কিছু নূতন নয়,—প্রেম,—যা' নিয়ে সাহিত্যের আদিকাল থেকে রাশি রাশি কবিতা রচিত হ'য়েছে। তথাপি আলোচ্য বই দুখানির মধ্যে কিছু নূতন রসের আস্বাদন পাওয়া গেল।

একথা এই তরুণ কবিদের পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নয়,—বিশেষতঃ যখন ভাবি যে বৈষ্ণবযুগ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্য প্রেমের কবিতায় পৃথিবীর সমৃদ্ধতম সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম।

বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে বা বর্ত্তমান যুগের অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের তুলনা করা আমাদের মোটেই উদ্দেশ্য নয়,—শুধু বলতে চাই প্রেমের কবিতায় সমৃদ্ধ যে বাংলা সাহিত্য,—তারও সম্পদ যে এ বই দু'খানি বৃদ্ধি

করবে,—একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। ভাবের গভীরতায় ও সরসতায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, প্রকাশ-ভঙ্গীর নবীনত্বে, ছন্দের ঝঙ্কারে,—জীবনের গভীরতম আবেগকে যে একটা নূতন অনির্ব্বচনীয় রসরূপ দান করা হ'য়েছে—এই বই দুখানিতে, তা পড়লে পাঠকের অন্তর পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে,—জীবনের উপর যেন একটুখানি আলোক সম্পাত হয়। সর্ব্বোপরি কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে কবির যে মন উঁকি মারে,—তা' যেমন সরল ও অকপট, তেমনি সতেজ ও নির্ভীক,—আড়ম্বরহীন ও সামাজিক জটিলতা থেকে মুক্ত,—অথচ আবেগ-চঞ্চল ও বেদনা-সমৃদ্ধ এবং শেষ পর্য্যন্ত আত্মনিবেদনের মধ্যে প্রশান্ত।

"প্রেম ও প্রতিমার" কবিতাগুলির মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য আছে। প্রথমদিকের কবিতাগুলির মধ্যে মিলন ও সম্ভোগের সুর; প্রতিদিনকার জীবনের আনন্দ মুহূর্ত্তগুলিকে লঘু ছন্দে বেঁধে রাখা হ'য়েছে।—

"আল্গা চুড়ির রিনিক্-ঝিনি দেয় কত সংবাদ,
গৃহকর্ম্মে ফাঁকে ফাঁকে ঘটায় পরমাদ।
তোমার সজাগ ডাগর আঁখি
হাতছানি দেয় থাকি থাকি
আমায় দেখে যায় যে বেঁধে তোমার চরণদ্বয়,
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস-পরিচয়।

"বুকের রক্ত ক্ষীর হয় যবে" কবিতাটিতে মাতৃত্বের প্রথম বিকাশের ছবিখানি চমৎকার—শেষ চার লাইন উদ্ধৃত করে দিলাম—

"সারা শরীরের শোণিতের দল সুধার আকারে জাগি
যেদিন বক্ষে উঠিল জমিয়া আরেক জীবন লাগি,—
জগৎ জুড়িয়া সে কী সঙ্গীত মানবের ঘরে ঘরে,
দেবতা ভাবিছে স্বর্গে বসিয়া—এত সুখ কোথা ধরে।

প্রতিদিনকার তুচ্ছ বিস্মৃত মুহূর্ত্তের মধ্যে যে কতখানি অকপটতা ও রহস্য আছে,—রমেশবাবুর কবিদৃষ্টিতে তা' ধরা পড়েছে। প্রিয়াকে কত কাছে কত রকমে রোজই পাওয়া যায়,—তবু সহসা একদিন প্রভাতে মনে হয়,—

"কোন্ সে রহস্যময়ী চির-সঙ্গোপনে
রেখেছে প্রিয়ারে ঢাকি রহস্য বেষ্টনে।"

অথবা,—

"তুমি এলে,—তুমি এসে জানাইলে মোরে
আমার দিবসগুলি সচেতন করে।"

শেষ ভাগের কবিতাগুলির মধ্যে অন্য সুর। এখানে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু কোনো আশা নেই। এই ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় জর্জ্জরিত কবির মন স্তরে স্তরে উঠে গিয়েছে দৈহিক জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতে। বলা বাহুল্য এই ভাগের কবিতাগুলি আরো উচ্চ অঙ্গের,—কেননা মানুষের বেদনার গানই মধুরতম। এই কবিতাগুলিতে কবির গোপন প্রাণের অন্তরতম নিবিড় অনুভূতির যে অকপট নির্ভীক ও সকরুণ পরিচয় গম্ভীর ছন্দের মধ্যে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে, তা' সত্যই অনবদ্য। কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে দিলাম—

"তোমারে বেসেছি ভালো, একথা তুমিও সখি
স্বপনেও জানিবে না কভু
তবুও গোপনে হায়, বাঁচায়ে রাখিতে হবে
সবার মনের অন্তরাল;
এমনি নিঃসঙ্গ হ'য়ে মনেরে বঞ্চনা করি
স্পর্শ সুখ পেতে হ'বে তবু,—
একটি সে নারী দেহ,—তিল তিল রেখা তার
বিস্ফুরিত দিক্ চক্রবাল।"

আবার—

"একটি ভবনে তুমি কারারুদ্ধ, মোর কাছে
চিরমুক্ত উদাসী আকাশে
তোমার দেহটি দেখি নবশ্যাম শষ্পপরে,
আঁখি তব দীঘির অতলে,
তোমার কথা যে শুনি রোমাঞ্চিত অন্ধকারে,
নাম তব ভোরের নিঃশ্বাসে—
আমার অনন্ত দুঃখ বেদনায় রাঙা হ'য়ে
দিবসের চিতা হ'য়ে জ্বলে।"

শ্রীযুক্ত সুধীর মিত্রের কবিতাগুলির অন্য সুর, চির-বিচ্ছেদের পর মিলনের মুহূর্ত্তগুলি অমর ছন্দে গ্রথিত। এর মধ্যে মিলনের সুখস্মৃতি আছে, বিচ্ছেদের বেদনা আছে, কাতর প্রাণের ব্যাকুল আত্ম নিবেদনের সান্ত্বনা আছে,—

নিবিড় অনুভূতি ও আবেগের গভীরতায় মানব জীবনের কয়েকটি চরম সত্যের অনির্ব্বচনীয় রস প্রকাশ আছে। আটাশটি কবিতার মধ্যে ঘুরে ফিরে এই সুরগুলি পাঠকের অন্তরকে, সকরুণ আঘাত করে, দরদে ও সমবেদনায় ভরিয়ে দিয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় রসলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়। "তুমি ও আমি" নামটি সার্থক,—এই "তুমি" ও "আমি"র মিলনে ও বিচ্ছেদে যে জগতের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে পাঠকের মন কয়েকটি বিরল মুহূর্ত্তের সন্ধান পায়।

একটি কবিতায় আছে—

"কতোদিন আগে কোন্ বিস্মৃত বরষে
এমনি সে স্তব্ধ রাতে তোমার পরশে
জেগে উঠেছিনু মোরা! নিস্তব্ধ আঁধার
দুয়ারে লুটিতেছিল করি হাহাকার,—"

একদিন প্রিয়া কুণ্ঠাহীন অসঙ্কোচে নিবেদন করেছিল—
"একটি কবিতা লিখো মোর নাম দিয়া!"

"হায় প্রিয়া, চেয়েছিলে তুমি মোর কাছে
নশ্বর ধরার বুকে অনন্ত জীবন,
আমি ক্ষুদ্র দীন কবি! মোর সাধ্য আছে
তোমারে বাঁচায়ে রাখি জিনিয়া মরণ?"

আবার—

"যা পেয়েছি ক্ষণিকের, হোক না সে ছায়া—
জীবনের গোধূলিতে সেইটুকু দান,
যত না ভঙ্গুর হোক মরীচিকা মায়া
চিরন্তন স্বপ্নসম রহিবে অম্লান!
আমরা ভাসিয়া যাবো, মহা খরস্রোতে,
প্রেম তবু বেঁচে রবে সন্ধ্যার আলোতে।

সুশীলচন্দ্র মিত্র

স্বর্ণ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রস্তাব—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন শর্ম্মা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, ৮৩নং বেচু চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

পুস্তকখানির নাম পড়িয়াই মনে হইতে পারে, ইহাতে বোধ হয় প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যথার্থ পুনঃ প্রতিষ্ঠার পক্ষেই গ্রন্থকার যুক্তি চিন্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তকটির আলোচনা বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। ইহাতে গ্রন্থকার প্রাচীন তথ্য বা তত্ত্বগুলি আধুনিকতার কষ্টিপাথরে ঘষিয়া দেখিয়াছেন, এবং সেগুলিকে কিরূপে যুগোপযোগী করা যায় সে বিষয়ে প্রচুর গবেষণা ও আলোচনা করিয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, কেননা তিনি তাঁহার যুক্তির সপক্ষে বহুশাস্ত্র বচন উদ্ধার করিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন যে, হিন্দুর শাস্ত্রাদিতে ঔদার্য্যের অভাব আছে, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, সে ধারণা যথার্থ নহে। সেই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, বর্ত্তমান গ্রন্থকারের মনও গোড়ামি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। হিন্দুর জাতিবিভাগকে বর্ত্তমানকালের উপযোগী করা বিষয়ে তাঁহার মতামত অনুধাবনযোগ্য হইয়াছে।

ইহা ছাড়া জ্ঞান, ভক্তি এবং সৃষ্টি ও ঈশ্বর বিষয়ক প্রচুর আলোচনাও ইহাতে আছে।

সর্ব্বশেষে, বৈদ্য জাতির ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কীয় যে আলোচনা আধুনিক কালে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে একটি অত্যন্ত সারবান সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর নিবন্ধ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পুস্তকখানিতে কয়েক জায়গায় ছাপার ভুল লক্ষিত হইল। তথাপি বিষয় গুণে পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

নানা কথা

ভূদেব স্মৃতি-সভা

দেশের যে সকল মহাপুরুষ নিজেদের জীবদ্দশায় প্রতিভা ও পরিশ্রমের দ্বারা দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে দিয়ে গেছেন তাঁদের স্মৃতি মন থেকে বিলুপ্ত করলে কর্ত্তব্য-বিচ্যুতি ঘটে। বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পরলোকগত মহাত্মা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে সমারোহের সহিত তাঁহার স্মৃতি-পূজার আয়োজন করে চুঁচুড়ার অধিবাসীগণ উক্ত কর্ত্তব্য-বিচ্যুতির অপরাধ থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন। সভার কার্য্যে যোগদান করার জন্যে কলিকাতা এবং অন্যান্য দূরবর্তী স্থান থেকে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী এবং ৺ভূদেব বাবুর গুণানুরাগী ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সভার কার্য্য আরম্ভ হলে "স্মৃতি সমিতি"র সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও "চুঁচুড়া সমাচার" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত "সুবোধচন্দ্র রায়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের সুলিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া সকলে বিমুগ্ধ হন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন ৺ভূদেব বাবুর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তন্মধ্যে ৺ভূদেব বাবুর পার্শ্বচর বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দীর্ঘকাল একত্র অবস্থান হেতু তিনি ভূদেব বাবুর সম্বন্ধে এত কথা জানেন যে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে তা "ভূদেব চরিতে"র উপসংহাররূপে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ হ'তে পারে। সভায় সমবেত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, রাজা ক্ষিতিশদেব রায় মহাশয় (বাঁশবেড়িয়া), কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, কুমার শরৎকুমার রায়, পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ শেঠ, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, হুগলী জেলা বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত তারক নাথ মুখোপাধ্যায়, "চুঁচুড়া সমাচারের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৺ভূদেব বাবুর পৌত্র শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায়, এবং শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়, দৌহিত্র শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রপৌত্র শ্রীঅনিলদেব ও শ্রীগৌরদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী সভাপতিকে ও সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করলে রাত্রি ৯টার সময়ে সভা ভঙ্গ হয়।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন
দ্বাদশ অধিবেশন

বর্ত্তমান বৎসরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় হ'বে স্থির হ'য়েছে। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হ'য়েছিল ১৩২৯ সালে কাশীধামে কবিবর রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। তারপর প্রতি বৎসর উত্তর ভারতের কোন-না-কোন প্রধান সহরে সম্মেলনের অধিবেশন হ'য়েছে। গত একাদশ অধিবেশনে গোরক্ষপুরে স্থির হয় যে, আগামী দ্বাদশ অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হ'বে। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন বাংলা দেশের কলিকাতায় হওয়া সহসা অসমীচীন মনে হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের মনে হয় সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের এ ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে সন্তোষজনকই হ'য়েছে। প্রবাসী বাঙালীর সহিত বাঙলা দেশের যোগ সর্ব্বতোভাবে থাকা বাঞ্ছনীয়, এমন কি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের মধ্য দিয়েও। সম্মেলনের জন্মের প্রথম যুগান্তের শেষে সম্মেলনের অধিবেশন বাঙলা দেশে অনুষ্ঠিত হ'ল। আমরা আশা এবং কামনা করি দ্বিতীয় যুগান্তেরও অধিবেশন বাঙলা দেশেরই কোনও সহরে হ'বে। সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে প্রতি বৎসর বহু ব্যক্তি উত্তর ভারতে গমন করেন। এবার উত্তর ভারতের বাঙালী প্রবাসীগণ বাঙলায় আগমন করবেন। [illegible]

আমাদের মনে হয় প্রবাসী বাঙালীদের সহিত বাঙলাদেশের অধিবাসীগণের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর এবং দৃঢ়তর হ'বে। আমরা সম্মেলনের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি এই সাফল্যকে অধিগত করবার জন্যে সকলেই যথাসম্ভব সহায়তা করবেন।

আপাতত সম্মেলনের পক্ষ থেকে যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হ'য়েছে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় যথাক্রমে তার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন। সম্মেলন সম্বন্ধে খবরাখবর জানবার জন্যে ৪৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতার ঠিকানায় কলিকাতা দ্বাদশ অধিবেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়ের সহিত পত্রব্যবহার করলে চলবে।

প্রবাসে রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত ৩০শে বৈশাখ ১৩৪১ রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মীরাট শাখার উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চতুঃসপ্ততিতম জন্মোৎসব মীরাট দুর্গাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রথমে 'জনগণ-মন অধিনায়ক জয় ভারতভাগ্যবিধাতা' গানটি ছোট ছোট বালিকারা সমস্বরে (কোরাস) গান করে। তার পর কুমারী নীহার সেনগুপ্তা "আমার নম হে নম, তোমায় নম হে নম" গানটি গেয়ে পঞ্চ প্রদীপ শঙ্খ বরণডালা প্রভৃতি দ্বারা রবীন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছবির আরতি করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রবাসী বাঙালীর পক্ষ হ'তে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। কুমারী কণিকা গুহ "প্রলয় নাচন নাচলে যখন" গানটি নৃত্যসহযোগে করেন; কুমারী লীলা দত্ত এবং শোভা দত্তও নৃত্যসহযোগে গান করেন। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। কুমারী সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় "পঁচিশে বৈশাখ" আবৃত্তি করেন। স্থানীয় বান্ধব নাট্য সমিতি "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয় করেন। রাত্রি ১১৷০ টার সময় উৎসব শেষ হয়। স্ত্রী পুরুষের এতাদৃশ জনসমাগম অন্য সভায় দেখা যায় নাই।

জলধর-প্রীতি-সম্মিলনী

আমরা শুনে সুখী হ'লাম গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ২রা জুন, শনিবার, সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায়, ৫।৩ রসম্‌জী ষ্ট্রীটে দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এণ্ড কালেক্টার রায় কুমার শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের ভবনে বালীগঞ্জের বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান "রূপ-বাসর" একটি জলধর-প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন করেছিলেন। বাঙলাদেশ সত্যসত্যই সাহিত্যিকের যোগ্য সম্মান দিতে প্রস্তুত হ'য়েছে দেখলে বড়ই আনন্দ হয়। জলধর বাবু আজীবন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করেছেন, সুতরাং "রূপ-বাসর" তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে যে প্রীতি-সম্মিলনীর ব্যবস্থা করেছিলেন তজ্জন্য এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানটি বাঙলাদেশের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। সভায় জলধর-সাহিত্যের আলোচনা, প্রবন্ধ ও কবিতাপাঠ, সঙ্গীতাদি হয়েছিল। আমাদের "বিচিত্রার" অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম-এ, বি-এল "রূপ-বাসরের" সম্পাদক হিসাবে রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুরকে পরিশেষে একটি সুদৃশ্য মান-পত্র উপহার দেন। রায় শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মিঃ এ, কে, ঘোষ, বার-য়্যাট্-ল, রায় শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী বাহাদুর, রায় শ্রীঅমৃত ভট্টাচার্য্য বাহাদুর, বেঙ্গল পুলিশের মিঃ যামিনীনাথ চন্দ, ডাঃ মোহিনী ভট্টাচার্য্য পি-এইচ-ডি, মিসেস্ রেণুকা চন্দ, শ্রীসুকোমল বসু, মিঃ পি, দত্ত প্রভৃতি বালীগঞ্জের বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা "রূপ-বাসরের" দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্সের নূতন অট্টালিকা

বিগত ২রা জুন ১৯৩৪, শনিবার, কলিকাতার সুবিখ্যাত কাগজ-ব্যবসায়ী "ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স"-এর নূতন বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন

হয়েছে। গৃহটি পুরাতন চিনাবাজার এবং জ্যাক্‌সন্ লেনের সংযোগস্থলে অবস্থিত, এবং ইহাতে ব্যবসার হেড্ অফিস্ স্থাপিত। দ্বারোদ্‌ঘাটন ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন শ্রদ্ধেয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়, এবং তদুপলক্ষে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, ভারতবর্ষীয় এবং ইয়োরোপীয় উভয়ই, উৎসব সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের, বিশেষতঃ কোম্পানীর সুযোগ্য জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এবং ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাসের সুমিষ্ট আতিথেয়তায় এবং সৌজন্যে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

এই দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবটি আমাদের দুই বিভিন্ন দিক থেকে ভালো লেগেছে। প্রথমত, কাগজ আমাদের মাসিক-পত্র কারবারের একটি প্রধান উপকরণ ব'লে কোনো কাগজ ব্যবসায়ীর অনন্যসাধারণ উন্নতি এবং সাফল্য দেখ্‌লে আনন্দ লাভ করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এ আনন্দের মূলে অবশ্য কিয়ৎ পরিমাণে আত্মীয়তার স্বার্থ নিহিত আছে। কিন্তু আনন্দের প্রধান এবং প্রকৃত কারণ, একটি বাঙালী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের এরূপ বিপুল সফলতা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ। এই বৃহদায়তন অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত কাগজ এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির বিরাট ভাণ্ডার এবং সেই সকল দ্রব্যসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পূর্ণ আধুনিক সুব্যবস্থা যাঁরা দেখেছেন, এবং সেই সঙ্গে সুবিগত ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের এই কারবার সংযুক্ত সামান্য একটি ঘটনার কথা অবগত আছেন, তাঁরা আমার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন। কোনো আত্মীয়ের নিকট হ'তে সহসা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামান্য একটু সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ
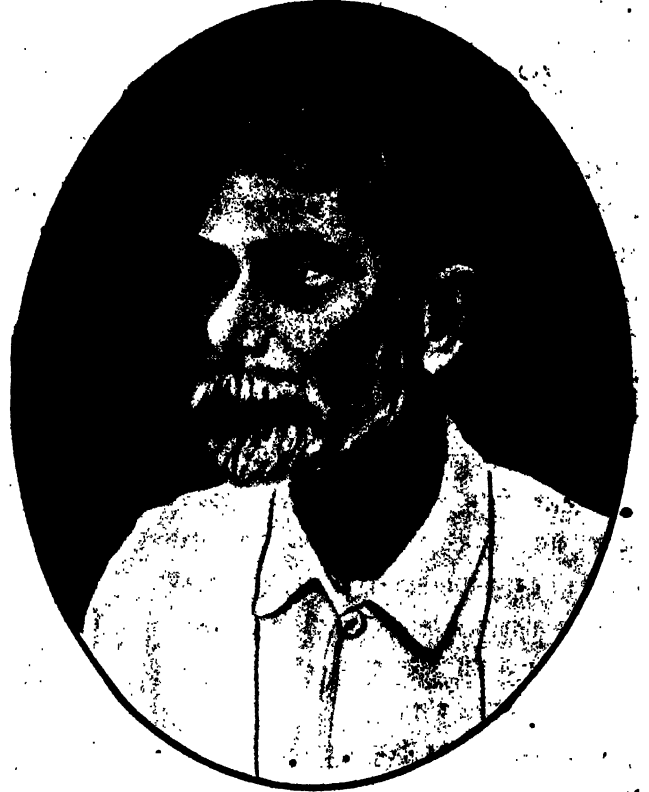
আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মাত্র আট শত টাকা মূলধন নিয়ে এই কারবারের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত ভোলানাথ দত্ত মহাশয় কলিকাতার চিনাবাজার অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র খুচরা বিক্রয়ের কাগজের দোকান স্থাপিত

করেন। সেইটি বীজ। তা থেকে অঙ্কুরোদগম হ'য়ে ক্রমশ ধীর অথচ নিশ্চিত উন্নতির পথ দিয়ে আজকের এই মহামহীরুহের পরিণতি। সুবিস্তৃত আটষট্টি বৎসরের মধ্যে মাথার উপর দিয়ে তবুও কত ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেছে।

যাঁরা মনে ভাবেন, বিপুল অর্থ ফেল্‌তে না পারলে কোনো ব্যবসার সূত্রপাত হ'তে পারে না, তাঁরা ভোলানাথ বাবুর দৃষ্টান্ত অবলোকন ক'রে সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে দরিদ্র ভোলানাথ মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে চিনাবাজারের কাগজ ব্যবসায়ী ঠাকুরদাস নাগের দোকানে সামান্য চাকরী গ্রহণ করেন, কিন্তু পরের দাসত্বে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে উন্নতিকামী যুবক কয়েক বৎসর পরেই ১৮৬৬ সালে তথায় নিজ দোকান স্থাপিত করেন। তারপর বিপুল পরিশ্রম উদ্যম, অধ্যবসায় এবং সততার ফলে উত্তরোত্তর ব্যবসাকে উন্নতির পথে নিয়ে গিয়ে ১২৭৮ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। ১৮৬৬ সালের বীজ তখন সতেজ বৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে। ভোলানাথ দূরদর্শী ছিলেন, পূর্ব্ব হতেই পুত্রদিগকে ব্যবসাতন্ত্রে শিক্ষিত করেছিলেন, সুতরাং পুত্রদের হস্তে ব্যবসা বানচাল না হ'য়ে উত্তরোত্তর উন্নতির মুখেই ধাবিত হ'ল।

৺ভোলানাথ দত্তের তিন পুত্র শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর দত্ত, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত এবং পৌত্র (রঘুনাথ বাবুর পুত্র) শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দত্ত উপস্থিত ব্যবসাটি পরিচালিত করছেন। এঁদের উৎসাহ-এবং-উত্তমশীল পরিচালনার ফলে নানা বিভাগে এবং শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত হয়ে কারবার এখন বৃহৎ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

যে ব্যবসা এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে, তার মূলে যে উত্তম অধ্যবসায় প্রভৃতি বাণিজ্যসংক্রান্ত গুণ আছে তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সর্ব্বোপরি যে, সততা বিদ্যমান, সেই কথাই আমরা বিশেষ ক'রে বলতে চাই। সততাপরায়ণতা ভিন্ন ব্যবসারে এতটা সফল হওয়া একেবারেই অসম্ভব! এই সত্যটি ব্যবসাপরায়ণ ইংরাজ জাতির 'Honesty is the best policy' কথাটির মধ্যে সুপরিব্যক্ত হয়েছে। Honestyকে সে ক্ষেত্রে তারা virtue হিসাবে দেখেনি,—দেখেছে কৌশল রূপে, ফন্দীরূপে; ব্যবসাদার হ'তে হ'লে honest না হয়ে উপায় নেই! আমাদের দেশে ব্যবসাদারদের মনে এই ব্যবসা-বুদ্ধিটি ব্যাপকভাবে কতদিনে জাগ্রত হবে তা কে জানে!

৺ভোলানাথ দত্ত

দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবদিনে যে উদ্বোধন সঙ্গীতটি গীত হয়েছিল, এই সম্পর্কে আমরা তার মধ্য থেকে চারটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করলাম,

ভিত্তি এ সৌধের সততায় বদ্ধ,
পুণ্যের দণ্ডে চূড়া লগ্ন,
অনাগত দিবসের বৈভবে উন্মুখ,
অতীতের মহিমায় মগ্ন।

"ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স"এর নবনির্মিত গৃহ
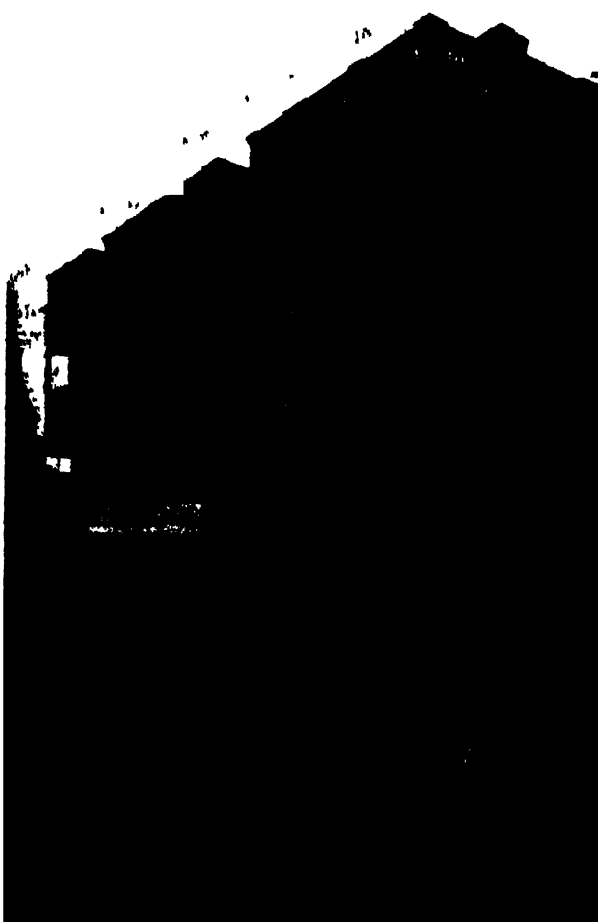
আমরা আশা করি এই স্বস্তি-বাক্য সার্থক হ'য়ে আলোচ্য বাণিজ্য-সৌধের অনাগত কালকে বৈভবশালী ক'রে রাখবে।

পরলোকগত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ বাঙলায় সুবিখ্যাত নাট্যকার এবং অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৫৯ বৎসর হয়েছিল। অপরেশচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের যে গুরুতর ক্ষতি হল তা শীঘ্র পূরণ হবার নয়। আমরা অপরেশচন্দ্রের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ভ্রমসংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বিচিত্রা'র ৬৬৭ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধে দ্বিতীয় কলমের ২২-২৩ পংক্তি এইরূপ হইবে:—"পুঁথির ৪৭ নং পদ পদাবলীর ৩১৯ নং পদের প্রথম হইতে ৭ লাইন ও ২৬৩ নং পদের ১৪ লাইন হইতে শেষ।"

রবীন্দ্র-পদক

দিল্লী হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত পত্রখানি আমরা পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করলাম।

"রবীন্দ্র সাহিত্যে বাংলার পল্লীচিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পাটনা ল'কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত রাধামোহন ভট্টাচার্য্য লিখিত প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায়, তিনিই এ বৎসর "রবীন্দ্র-স্বর্ণপদক" পুরস্কার পাইলেন।

"রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উৎসবকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য দিল্লীর বেঙ্গলী ক্লাব "রবীন্দ্র-পদক" নাম দিয়া প্রতি বৎসর একটি করিয়া স্বর্ণ-পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রবাসের বাঙালী ছাত্র ও ছাত্রীগণের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলনের সহায়তা এই আয়োজনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আগামী বৎসরের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় এবং তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী আগামী ১লা ভাদ্রের পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত করা হইবে।

বেঙ্গলী ক্লাব, দিল্লী
২৫শে বৈশাখ, ১৩৪১ সাল

শ্রীযামিনীকান্ত সোম,
সম্পাদক
"রবীন্দ্র-পদক" কমিটি।

আরতি সাহিত্য সম্মিলনী—কাশী

কাশীর আরতি-সাহিত্য সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত বিবরণীটি আমরা সাধারণের অবগতির জন্ম প্রকাশিত করলাম।

'প্রায় দুই বৎসর হইল কাশীধামে কতিপয় সাহিত্যানুরাগী উৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় 'আরতি সাহিত্য সম্মিলনী' নামে একটি সাহিত্য সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাহিত্য-চর্চা দ্বারা জীবনের উৎকর্ষ লাভ ও বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। তরুণদিগের মহৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ম অনেক প্রবীণ সাহিত্যিক ও বিদুষী মহিলা ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে খ্যাতনামা সুরসিক শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুসাহিত্যিক রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, প্রবীণ কবি কিরণচাঁদ দরবেশ, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সুলেখক শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায়, শ্রীশম্ভুনাথ দত্ত (আর্টিষ্ট), শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী (উত্তরার সম্পাদক), সুকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া, শ্রীযুক্তা পূর্ণশশী দেবী, শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী, শ্রীউমাশশী দেবী, শ্রীবেলা দেবী, শ্রীগিরিবালা রায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সম্মিলনী হইতে "আরতি" নামে একটী হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়। অনেক প্রবীন ও নবীন লেখকের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট এবং সুনিপুণ শিল্পীগণের চিত্রে ইহা সুশোভিত। সম্মিলনীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ['বাণী' পত্রিকার ভূতপূর্ব্বক সম্পাদক] ইহার সম্পাদক ; সহকারী সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী।'

নিবেদন

বর্ত্তমান সংখ্যায় বিচিত্রা'র সপ্তম বর্ষ পূর্ণ হইল। **আগামী শ্রাবণ মাসে অধিকতর সৌষ্ঠবের সহিত অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইবে।** বিচিত্রা পাঠ করিয়া যাহাতে পাঠকগণ জ্ঞান শিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করিতে পারেন তজ্জন্ত আমরা পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। নিয়মিতভাবে মাসে মাসে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলা সাহিত্যের বহু খ্যাতনামা লেখকের প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রহসনাদি বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্র-সম্পদ বিচিত্রার গর্ব্বের বস্তু, এবং স্বরলিপি বিচিত্রার বৈশিষ্ট্য। সুরের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বিশেষরূপ মাধুর্য্য না থাকিলে কোনো গানেরই স্বরলিপি বিচিত্রায় প্রকাশিত করা হয় না। 'দেশের কথা' বিচিত্রার পাঠকগণকে দেশের প্রধান এবং গুরুতর সমস্যাগুলির সহিত নিয়মিতভাবে পরিচিত রাখে, এবং 'বিতর্কিকা' পাঠকচিত্তে কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তুলে। এই সকল কারণে বিষম অর্থসঙ্কটের দিনেও বিচিত্রার চাহিদা অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। আগামী বর্ষে যাহাতে বিচিত্রা আরও অধিক পরিমাণে পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে তজ্জন্য, আমরা অধিকতর বৈচিত্র্য সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছি।

বিচিত্রার বার্ষিক মূল্য মনিঅর্ডারে ৬৷৷০, ভি. পিতে ৬৸০, এবং যাণ্মাসিক মূল্য মনিঅর্ডারে ৩৷০, ভি, পিতে ৩৸০। সুতরাং **খরচের দিক দিয়া মনিঅর্ডারেই টাকা পাঠানো সুবিধা।** কিন্তু যে-সকল গ্রাহক আষাঢ় মাসের মধ্যে মনিঅর্ডারে টাকা না পাঠাইবেন তাঁহারা ভি, পিতেই কাগজ লওয়া সুবিধাজনক ভাবেন মনে করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রাবণ মাসের বিচিত্রা ভি, পিতে পাঠানো হইবে। কোনো কারণে কেহ যদি উপস্থিত গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকেন তাহা হইলে আষাঢ় মাসের কাগজ পাওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব আমাদিগকে সে কথা অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। অন্যথা ভি, পিতে কাগজ পাঠাইয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। **এ বিষয়ে বর্ত্তমান গ্রাহকদিগকে আর স্বতন্ত্র পত্রাদি দেওয়া হইবে না।**

টাকা পাঠাইবার সময়ে পুরাতন গ্রাহকেরা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক মনিঅর্ডারের কুপনে গ্রাহক নম্বর (বিস্মরণে 'পুরাতন' কথাটি) লিখিয়া দিবেন, এবং নূতন গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া 'নূতন' বলিয়া উল্লেখ করিবেন, অন্যথা টাকা জমা করিবার সময়ে গোলযোগ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে।

Edited by Upendranath Gangvly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works
259 Upper Chitpore Road. and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.